

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ১৯শে পৌষ, ১৩৫৩ সাল। Saturday, 4th January, 1947 [৯ম সংখ্যা

..সম সংগ্রাম

ইংরেজি নববর্ষ সমাগমের সংগে ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। সেদিন গান্ধীজী নেতৃবৃন্দের শ্রীরামপুরে আগমন সম্পর্কে আমাদের সম্মুখে সমাগত এই রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, 'কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নেতারা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কার্যক্রমে এখন যদি একটুও ভুল হয়, তবে ভারতবর্ষ এ পর্যন্ত যাহা অর্জন করিয়াছে, তাহার সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের আশাও তিরোহিত হইবে।' পণ্ডিত জওহরলাল, রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনী এবং শ্রীযুত শঙ্কর রাও দেও গান্ধীজীর সহিত আলোচনা সম্পন্ন করিয়া নয়া-দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই আলোচনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এই মাত্র জানা গিয়াছে যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মণ্ডলী গঠন সম্পর্কে যে ভাষ্য প্রদান করিয়াছেন, কংগ্রেস কোন অবস্থাতেই তাহা মানিয়া লইবে না। কারণ সে ভাষ্য গ্রহণ করিলে কোনও প্রদেশ ভোটাধিক্যে মন্ত্রী মিশনের নির্দেশিত কোন মণ্ডলীর অন্তর্গত অনিচ্ছুক প্রদেশের জনসাধারণের উপর জোর করিয়া শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিতে পারিবে। এই অবস্থায় নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার, নির্বাচকমণ্ডলী এবং নির্বাচন-কেন্দ্র ও আইনসভা সংক্রান্ত যেসব নিয়মাবলী প্রস্তুত হইবে, সেগুলিতে কোন প্রদেশ যদি পরে মণ্ডলীর বাহিরে যাইতে চায়, তাহার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে। প্রকৃতপক্ষে মণ্ডলী গঠনের এই প্রশ্নটিই গণ-পরিষদের সম্মুখে প্রধান সমস্যাস্বরূপে দেখা দিয়াছে। এ সম্বন্ধে

সাময়িক প্রসঙ্গ

আলোচনার নিমিত্ত ৫ই জানুয়ারী নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আহূত হইয়াছে। এই অধিবেশনে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, আমরা এখনও বলিতে পারিতেছি না; তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, কংগ্রেস কোনক্রমেই জাতীয়তার ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবাদকে আশ্রয় করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে লীগকে অবলম্বন করিয়া যে মারাত্মক কূটনীতি প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, কংগ্রেস কিছুতেই তাহার সংগে আপোষ করিতে সম্মত হইবে না। সুতরাং বর্তমানের এই অবস্থায় কংগ্রেসের দায়িত্ব যে অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সংকটে কংগ্রেসকে তাহার লক্ষ্যীভূত সর্বভারতীয় কল্যাণের আদর্শ স্বাধীনতার প্রেরণার আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। মুসলিম লীগ যে নীতি লইয়া চলিতেছে, তাহাতে কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় আদর্শের সংগে লীগের কোনক্রমেই মীমাংসা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না; পক্ষান্তরে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কোন প্রেরণাও লীগ নেতৃবৃন্দ অন্তরে উপলব্ধি করেন না। এরূপ অবস্থায় লীগ গণ-পরিষদে যোগদান করিলেও ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা নির্ণয় সম্পর্কিত [এই সমস্ত] সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। বস্তুত গণ-পরিষদে যোগদান করিলেও লীগ সদস্যগণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির দ্বারাই প্রভাবিত হইবেন এবং ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিবার দিকেই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকিবে। তাঁহারা নিখিল ভারতের প্রশ্নকে পরোক্ষ করিয়া নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ভেদবাদকে জিয়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন এবং নানা কৌশলে তাহাকে পাকাইয়া তুলিয়া অদূর ভবিষ্যতে নিজেদের পাকিস্থানী আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য ব্যগ্র থাকিবেন। ফলত, মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবনায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের অগ্রগতির পথে এরূপ জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি করিয়াছে যে, কংগ্রেস যদি আজ অভ্রান্ত দৃষ্টিতে এবং বলিষ্ঠ নীতির প্রয়োগে সেই গ্রন্থি ছেদন না করিতে পারে, তবে তাহার সুদীর্ঘ সাধনা ব্যর্থ হইবে, এমন আশঙ্কার কারণ আছে। আমরা জানি, বহু সংগ্রামে বিজয়ী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীরবৃন্দের দৃষ্টি এ বিষয়ে আচ্ছন্ন হয় নাই। তাঁহারা এই সমস্যার সম্মুখীন হইবার জন্য সর্বতোভাবেই প্রস্তুত হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আজ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বশেষ পর্যায় আরম্ভ হইয়াছে এবং জাগ্রত ভারত কংগ্রেস-নেতাদের আহ্বানে যে কোন মুহূর্তে আত্মোৎসর্গের জন্য সেই সংগ্রামে অগ্রসর হইবে, এ বিষয়ে আমাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বাধীনতাকামী ভারতের সমুদয় প্রচেষ্টার প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদী দল তাহাদের স্বার্থান্ধ অনুগামীদের ঘাঁটিসমেতই যে অচিরে এদেশ হইতে উৎখাত হইবে, ইহাও সুনিশ্চিত।

মহাত্মাজীর সাধনা

গান্ধীজী নোয়াখালির পল্লীর পিচ্ছিল পথ বাহিয়া চলিয়াছেন। দিনের পর দিন, এই গতিপথে তাঁহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই। কতদিনে তাঁহার এই গতির নিবৃত্তি ঘটিবে এবং তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, তিনি নিজেও বলিতে পারেন না। গত ২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনা-সভার বক্তৃতায় বলেন, 'আজ আমার অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা। যদি আমি ব্যর্থ হই, তবে আমার মনে হয়, ভগবান আমাকে এই জগৎ হইতে সরাইয়া লইবেন।' মানবতার যে বেদনা অন্তরে লইয়া মহাত্মাজী নোয়াখালিতে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার তীব্রতা তাঁহাকে কতখানি উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে, ঐ উক্তি হইতে তাহা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করা যায়। প্রকৃতপক্ষে মোস্লেম লীগের ভেদবিদ্বেষপূর্ণ কূটনীতির ফলে পূর্ববঙ্গের বিপুল অঞ্চল আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে এবং সেই বিভীষিকাময় অন্ধকার সমগ্র বাঙলার বুকে ছায়া বিস্তার করিয়াছে। গান্ধীজী এই অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশানে আলোকের সন্ধানে প্রবৃত্ত আছেন। মহাত্মাজীর উক্তিতে প্রকাশ, সম্প্রতি তিনি সেই অন্ধকারে আলোকের একটি ক্ষীণ রেখা দেখিতে পাইতেছেন। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর একখানা চিঠির উল্লেখ করিয়া মহাত্মাজী বলেন যে, মিঃ সুরাবর্দী তাঁহার ব্রতের সাফল্য কামনা করিয়াছেন এবং তিনি গান্ধীজীকে ইহাও জানাইয়াছেন যে, গান্ধীজীর ব্রত সাফল্যলাভ করিলে তাহা দ্বারা শুধু বাঙলা নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ উপকৃত হইবে। প্রধান মন্ত্রী আরও জানাইয়াছেন যে, গান্ধীজীর পর্যটনের সময় রক্ষীর ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতেই হইবে। গান্ধীজীর আদর্শের সাফল্য সম্বন্ধে মিঃ সুরাবর্দীর এই মন্তব্য লীগ-নীতির প্রতি সুরাবর্দী সাহেবের একান্ত নিষ্ঠার আলোকের পটভূমিকায় লইয়া দেখিতে গেলে কতটা স্বতোবিরুদ্ধতাপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে, এ বিষয়ে আমাদের মনে যথেষ্টই সন্দেহ রহিয়াছে; কিন্তু মহাত্মাজী সুরাবর্দী সাহেবের উক্তির বাহিরের দিকটাই বড় করিয়া দেখিয়াছেন এবং এই পথে নিজের ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করিয়া তিনি লীগ-নীতির মূলীভূত ভেদ-বিদ্বেষকে জয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। লীগের পথ ভেদ-বিদ্বেষের পথ। সে পথ সাম্প্রদায়িকতার পথ। প্রকৃতপক্ষে মানবতার মহিমায় সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিদ্বেষের বিষ যদি বাঙলার সমাজদেহ হইতে বিলুপ্ত হয়, তবে লীগ-নেতাগণ নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া পড়েন। ডক্টর সৈয়ফুদ্দিন কিচলু সেদিন বলিয়াছেন, নোয়াখালির ঘটনা অনুষ্ঠানের দ্বারা কোন জাতি গঠিত হইতে পারে না। বস্তুত নোয়াখালিতে অনুষ্ঠিত পাপকে সমাজদেহ হইতে প্রক্ষালন করিয়াই জাতি গঠন সম্ভব হইতে পারে এবং মুসলমান সমাজকে শক্তিশালী করিবারও তাহাই পথ। দুঃখের বিষয়, বাঙলার লীগ নেতাগণ সংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধির বশে এই সত্যটি স্বীকার করিয়া লইতে চাহিতেছেন না। সুতরাং মহাত্মাজীর সাধনার সাফল্য তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে প্রকৃতপক্ষে অন্তরায় হইয়াই যে দাঁড়ায়, ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতেছেন। মিঃ সুরাবর্দীও তাহাই বুঝেন। এজন্যই দেখিতেছি মহাত্মা গান্ধীর অ-সাম্প্রদায়িক আদর্শের সম্বন্ধে তিনি মুখে অনুরাগ প্রকাশ করিলেও কার্যত তিনি তাঁহার শাসন-নীতিতে সাম্প্রদায়িকতার ধারাই সুকৌশলে বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। ইহার ফলে দেখা যাইতেছে, নোয়াখালিতে এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উৎপীড়কদের সম্বন্ধে যথোচিত-ভাবে কঠোর নীতি প্রযুক্ত হইতেছে না। লীগ সরকারের মহিমায় তাহারা এখনও অনেকেই মশগুল রহিয়াছে এবং নিজেদের দুষ্কার্যের জন্য মনে মনে গৌরববোধ করিতেছে। গান্ধীজীর ত্যাগময় সাধনায় যদি এই অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সঞ্চার হয়, তবে ভারতের বর্তমান সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে সত্যই নবীন উষার অভ্যুদয় ঘটিবে। দুষ্ট রাজনীতি মানবধর্মকে ক্লিষ্ট এবং পিষ্ট করিয়া পশুবৃত্তির প্রশ্রয়ে নিজের ঘৃণ্য অভীষ্ট পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইবে না।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় সরকারী নীতি

নোয়াখালি অঞ্চলে যত অত্যাচার এবং উপদ্রব বাহির হইতে গুণ্ডারা আসিয়া করিয়াছে, সুতরাং ঐ অঞ্চলের লোকেরা সব নির্দোষ। এই ধরণের প্রচারকার্যের দ্বারা লীগের দল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার এবং উৎপীড়নকারী ঐ অঞ্চলবর্তী তাঁহাদের অনুগতদিগকে আইনত দণ্ডভোগ হইতে নিষ্কৃতিদানের জন্য ব্যগ্র আছেন। আমরা আগাগোড়াই তাঁহাদের এই মনোভাবের পরিচয় পাইতেছি। 'আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় নোয়াখালির বিস্তৃত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, সম্প্রতি তাহা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিতেছেন। সেদিন তিনি 'বহিরাগত ও গুণ্ডা' শীর্ষক আলোচনায় উপর্যুক্ত যুক্তিকে অভ্রান্তভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ [illegible]। চপলাবাবু ঘটনার বিবরণে লি[illegible] বিধ্বস্ত বাজারে সমবেত জনতা। বিভিন্ন পক্ষের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত। জনৈক প্রৌঢ় বয়স্ককে শরৎচন্দ্রের সহিত পরিচয় করাইয়া বলা হইল, তিনি স্থানীয় মাতব্বর এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। বিশাল ও বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"আপনারা থাকিতে এই সব ঘটিল?" মাতব্বর উত্তরে বলিলেন,—"আমরা কি করিব? নোয়াখালির দিক হইতে একেবারে পাঁচ সাত হাজার লোক এক সঙ্গে আসিয়া এই কাণ্ড করিয়া গিয়াছে।" মাতব্বরের এই কথা শুনিয়া উপদ্রুত সম্প্রদায়ের জনৈক বৃদ্ধ উত্তেজনার সঙ্গে আগাইয়া গিয়া বলিলেন,—"মাথার উপরে ভগবান আছেন। উপরের দিকে চাহিয়া কথা কহিবেন। আপনি নিজে দাঁড়াইয়া অর্ডার দিয়া এই সব করান নাই?" ইঁহার কথা শুনিয়া আমরা বুঝিলাম, ইঁহাদের নষ্ট সাহস ফিরিয়া আসিতেছে; কিন্তু মাতব্বর মহাশয় একেবারে রাগিয়া ফাটিয়া পড়িলেন। তবে তাহাতে কিছু হইল না। প্রতিবাদকারী বৃদ্ধও হটিবার পাত্র নহেন। অতএব, তখনকার মত হার স্বীকার করাইয়া ব্যপারটা চাপা দিতে হইল। এই মাতব্বর মহাশয়ের নামে অভিযোগ অনেক এবং অভিযোগ গুরুতর। কর্তব্য পালনে উৎসাহী জনৈক পুলিশ অফিসার সাহসী হইয়া ইঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিয়াছিলেন। গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়ামাত্র উচ্চস্থলে শাসক মহলের অন্তর্ভুক্ত সম্মেলন বসিয়া গেল—দিগ্বিদিক হইতে দিক্‌পালগণ ছুটিয়া আসিলেন। মাতব্বর জামিনে খালাস হইলেন, পুলিশ অফিসার বেচারা স্থানান্তরিত হইল।" নোয়াখালিতে আইন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের সাম্প্রদায়িক সংস্কারাচ্ছন্ন এই দৃষ্টিই সেখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার পথে অন্তরায় ঘটাইতেছে এবং লীগপন্থীদের কূটনীতির অন্ধকার এইভাবে সেখানে মানবতার জাগরণের পথকে অবরুদ্ধ করিতেছে। বস্তুত বাঙলার প্রধান মন্ত্রী লীগের সাম্প্রদায়িক সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া যদি নোয়াখালির সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইতেন, তবেই গান্ধীজীর সাধনার প্রশংসায় তাঁহার আন্তরিকতা প্রকাশ পাইত।

নোয়াখালিতে পণ্ডিত জওহরলাল

শ্মশানে শক্তির উদ্বোধন ঘটিতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল, আচার্য কৃপালনী এবং শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেওকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীরামপুরের ন্যায় ক্ষুদ্র গ্রামে সেদিন যে উৎসাহ-উদাম পরিলক্ষিত হয়, তাহাতেই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বস্তুত প্রাণই

এই অধিবেশনের দু'বৎসর পরেই কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই কলেজেরই অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেংকট রমণ নোবল পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতা অধিবেশনের পর যথাক্রমে মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, ব্যাঙালোর, লাহোর, বোম্বাই, নাগপুর ইত্যাদি সহরে প্রতি বৎসর বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন



ডক্টর জি ডি ভালেরাও
প্রাণি-বিদ্যা ও কীটপতঙ্গাদি বিষয়ক বিজ্ঞান শাখার সভাপতি (১৯৪৭)

বসছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৪ বৎসরের তিহাসের মধ্যে এর একটিও অধিবেশন বাদ য়নি। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পর ২০ সাল পর্যন্ত বোধহয় কোনো উপযুক্ত রতীয় পাওয়া যায়নি, যিনি সভাপতিত্ব তে পারেন, কারণ এই কয় বৎসরই ইংরাজ স্থ কর্মচারীরাই সভাপতিত্ব করেছিলেন।



অধ্যাপক শ্রীগণপতি পাঁজা
ভৈষজ-বিদ্যা ও পশু চিকিৎসা শাখার সভাপতি (১৯৪৭)

১৯২০ সালে নাগপুরে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আজ পর্যন্ত আটজন বাঙালী বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের গোড়ার দিকে মাত্র পাঁচটি শাখা ছিল, এখন হয়েছে তেরটি, যথা অঙ্কশাস্ত্র, সংখ্যাবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-শাস্ত্র, ভূগোল ও ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণী ও কীটতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব, চিকিৎসা বিদ্যা, কৃষিতত্ত্ব, শারীরবৃত্ত ও মনোবিদ্যা ও যন্ত্র ও খনিজবিদ্যা।

১৯৩৮ সালে কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। সেবার ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক লর্ড রাদারফোর্ডকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল, কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি আসতে পারেননি।



ডক্টর ইরাবতী কার্ভে
নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখার সভানেত্রী (১৯৪৭)

পরিবর্তে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্যার জেমস্ জীনস্ এবং সেই সংগে বিদেশ থেকে বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এসে যোগদান করেছিলেন।

এবার সভাপতিত্ব করবেন পণ্ডিত জওহরলাল। তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়নি, মর্যাদা বৃদ্ধি হ'ল বিজ্ঞান কংগ্রেসের। ১৯৪৩ সালের অধিবেশনের জন্য তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে যেতে হয় কারা প্রাচীরের অভ্যন্তরে।

এ বৎসরের অধিবেশনে ইংলণ্ড, ক্যানাডা, রুশিয়া, চীন ও মার্কিণ যুক্তরাজ্য থেকে ২৮ জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আসছেন। ভারত যখন স্বাধীনতার দ্বার-দেশে উপস্থিত তখন এই সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপদেশ নতুন ভারত গড়ে তোলবার কাযে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করবে। এই বৈজ্ঞানিকদল ভারতে একমাস থাকবেন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে বক্তৃতা দেবেন ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের সংগে বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। এই প্রতিনিধিদলের অধিনায়কত্ব করবেন স্যার চার্লস ডারুইন।



ডক্টর কে ব্যানার্জী
পদার্থ-বিদ্যা শাখার সভাপতি (১৯৪৭)

যাঁরা আসছেন তাঁদের নাম দেওয়া হ'ল:—

ডক্টর অ্যালবার্ট এফ ব্লেক্ স্লি। ইনি বখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্। অ্যামেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রসিদ্ধ কার্ণেগী ইনস্টিটিউটের পাঁচ বৎসর ডিরেক্টর ছিলেন এবং অ্যামেরিকান অ্যাসোসিয়েসান ফর অ্যাডভান্সমেণ্ট অভ সায়েন্সের ১৯৪০ সালের জন্য সভাপতি



অধ্যাপক [illegible] সি ব[illegible]
পরিসংখ্যান শাখা[illegible] সভাপতি (১৯৪৭)

ছিলেন। বোডয়েন মেডাল, ক্রেসি মরিসন এবং হাঁরি দ্য জুভেনে'ল ইত্যাদি পুরস্কার তিনি পেয়েছেন।

ডক্টর উইলিয়াম এডওআর্ড'স্ ডেমিং। বয়সে ইনি সর্বকনিষ্ঠ, ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইনি সংখ্যাতত্ত্ববিদ। মার্কিণ যুক্তরাজ্য সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিভাগের একজন উপদেষ্টা। আটাশ বৎসর



অধ্যাপক এ সি ঘোশ।
উদ্ভিদ-বিদ্যা শাখার সভাপতি (১৯৪৭)

বয়সে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেন।

ডক্টর এডমান্ড নেওটন হার্ভে। ইনিও মার্কিন যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত প্রাণতত্ত্ববিদ্। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অভ্ টেক্নোলোজির অধ্যাপক ছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউটের জন প্রাইস ওয়েদারিল মেডাল দ্বারা ভূষিত হ'ন।

ডক্টর অসকার রিডল। মার্কিণ প্রাণতত্ত্ববিদ্। ওদেশের বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমিতির সঙ্গে যুক্ত আছেন। বর্তমানে কার্ণেগী ইনস্টিটিউটের অভিব্যক্তি-বাদ শাখায় গবেষণায় নিযুক্ত।

ডক্টর হার্লো শেপ্লি। হার্ভার্ড কলেজের মানমন্দিরের অধ্যক্ষ, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। বহু দেশ তাঁকে নানা সম্মানে ভূষিত করেছেন।

স্যার চার্লস গল্টন ডারুইন। ইংলণ্ডের ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষ। একদা রয়েল সোসাইটির সহ-সভাপতি ছিলেন। রয়েল সোসাইটির রয়েল মেডাল দ্বারা ভূষিত হয়েছেন। নিউ কনসেপসান অভ্ ম্যাটার এ'র লিখিত বিখ্যাত পুস্তক।

এ'রা ছাড়া আছেন অধ্যাপক বি পি মেনার্ড স্টুয়ার্ট ইংলণ্ডের খ্যাতনামা পদার্থবিদ্যাবিদ্। অধ্যাপক হ্যারল্ড মনরো ফক্স, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণতত্ত্বের অধ্যাপক। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার স্যার আর্থার পার্সি মরিস্লিমিং, যাঁকে ফ্যারাডে মেডাল দেওয়া হয়েছিল; আর আছেন গ্রীণউইচ মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদ্ স্যার হ্যারল্ড স্পেন্সার জোন্স। আরও আছেন সাউথ কেন্সিংটনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অভ্ সায়েন্স অ্যান্ড টেক্নোলজির অধ্যক্ষ ডক্টর উইলিয়াম ব্রাউন। এ'রা ছাড়া আরও সাতজন বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁরা নিজ নিজ বিষয়ে কৃতী'দ্দ।

এবারের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখার সভাপতিত্ব করবেন নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিকগণঃ—

১। **ডক্টর কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়**; পদার্থবিদ্যা,

২। **ডক্টর পি কে বসু**, রসায়ন শাস্ত্র; নামকোম লাক্ষা গবেষণাগারের অধ্যক্ষ।

৩। **শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র বসু**, সংখ্যাবিদ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। **শ্রীযুক্ত গণপতি পাঁজা**, চিকিৎসা বিদ্যা, কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল অভ্ মেডিসিন।

৫। **শ্রীমতী ইরাবতী কার্ভে**, নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব, ডেকান কলেজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক।

৬। **অধ্যাপক সি এস পিচাম্থু**, ভূগোল ও ভূতত্ত্ব, বাঙালোর ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ।

৭। **শ্রীযুক্ত এচ পি ভৌমিক**, যন্ত্র ও খনিজ বিদ্যা, ডাক ও তার বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

৮। **শ্রীযুক্ত পি এস নাইডু**, মনোবিদ্যা, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়।

৯। **অধ্যাপক এম ও রহমান**, শারীরবৃত্ত, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ।



অধ্যাপক এম এ রহমান
শরীর-বৃত্ত শাখার সভাপতি (১৯৪৭)

১০। **শ্রীযুক্ত এস এন দত্ত**, কৃষিবিদ্যা, কোয়েম্বাটোরে নিযুক্ত ইক্ষু বিশেষজ্ঞ।

১১। **ডক্টর জি ডি ভালেরাও**, প্রাণ ও কীটতত্ত্ব, বর্তমানে ভারত সরকার কর্তৃক উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত বিশেষ পুস্তক রচনায় নিযুক্ত আছেন।

১২। **অধ্যাপক এ সি যোশী**, উদ্ভিদতত্ত্ব, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়।

অধিবেশন আরম্ভ হ'বে **২রা জানুয়ারী** ও সমাপ্ত হ'বে ৬ই জানুয়ারী।



অন্তরূপ

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মিস কুন্তলা চৌধুরী। না, এরকম ভুল তো কোনদিন হয় না তার—অন্তত বিশ বছরের শিক্ষয়িত্রী জীবনে কখনও হয়নি, একথা অনায়াসে বলা যেতে পারে। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন আর নিয়মিত জীবনযাত্রা—অকারণে থামা নেই, অথবা কৌতূহলও নেই কোন বিষয়ে। মিস কুন্তলা চৌধুরীর জীবনে অবসর আসেনি কোনদিন, এলেও সেই মুহূর্তে প্রত্যেকটি অবসর রূপান্তরিত হয়েছে অখণ্ড কর্মপ্রবাহে। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট চৌকো রুমাল বের করে কপালের দুটো পাশ সে মুছে নেয়। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালের দুপাশে। সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে আবার ওপরে উঠে আসে। দরজার পাশে ভারি পর্দাটা সরিয়ে কৌচের ওপরে ছেড়ে দেয় নিজেকে। আজ স্কুলে মিনিট দশেক লেট তো নিশ্চয়! হেড মিস্ট্রেস মিস কুন্তলা চৌধুরীর এক মিনিটও যে লেট হতে পারে, কোনদিন একথা স্বপ্নেও ভাবা যায় নি। সহ-শিক্ষয়িত্রীদের কাছে এ একটা প্রচণ্ড দুর্ঘটনা। আশে পাশের লোকেরা মিস চৌধুরীকে দেখে সময় নিয়ন্ত্রিত করে নিজেদের। মোড়ের চৌরাস্তার কাছে মিস চৌধুরীকে দেখা গেলে সকলেই বুঝে নেয় যে, দশটা বাজতে আর মিনিট পাঁচেক হয়ত বাকি আছে। তারপর চৌরাস্তা পার হয়ে বাঁ-দিকের পায়ে-চলা রাস্তাটা ধরে 'শ্রীভিলা'র গেট ছাড়িয়ে স্কুলে ঢোকার সংগে সংগেই পাশের ক্যাথলিক গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে ওঠে। এ এক-আধ দিনের ব্যাপার নয়, দীর্ঘ বিশ বছরের মধ্যে কোনদিন এর ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু আজ দুদিন কি যেন হয়েছে মিস চৌধুরীর। রবিবারের সুদীর্ঘ অবসরে প্রায় ভোর থেকেই মিস চৌধুরীকে বাগানে দেখা যায় মালীর পাশে পাশে গাছ-গাছড়ার তদারক করতে। অনেক দূরের নার্সারি থেকে নানা জাতের ফুলের গাছ সংগ্রহ করা হয়েছে,—মরশুমি ফুলের গাছ। গাছের গোড়ায় সার দেওয়া থেকে শুরু করে, পাতা ছাঁটা পর্যন্ত সব কিছুতেই নির্দেশ থাকে মিস চৌধুরীর। সময়ে সময়ে এও দেখা গিয়েছে ছোট একটা শাবল নিয়ে গাছের গোড়া খুঁড়ে নতুন মাটি চেপে চেপে দিচ্ছে মিস চৌধুরী। স্কুলের নবাগত সেক্রেটারী মিঃ বসাক অনুযোগও করেছেন অনেক দিন

ঃ আপনি নিজের হাতে করেন এসব?

ঃ সব জিনিস পরের হাতে কি তুলে দেওয়া যায়? মুচকি মুচকি হাসে মিস চৌধুরী। তারপর ক্রিসান্থিমামের শুকনো পাতাগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে ঃ অবশ্য আপনাদের কথা আলাদা, নিজের ছেলেমেয়েদেরও অনায়াসে আপনারা তুলে দেন গভর্নেসের হাতে।

কাল সমস্ত দিন কিন্তু বাগানের ধারে-কাছে দেখা যায়নি মিস চৌধুরীকে। সকাল থেকে বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছে—পরীক্ষার খাতাগুলো মাথার কাছে রেখে।

অপর্যাপ্ত অবসর। কেমন যেন একটা নিশ্ছিদ্র আলস্য সমস্ত শরীরটাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। পুরানো জীবনের ম্লান ছবি-গুলো ভেসে আসে চোখের সামনে। বালিশের তলা থেকে অনেকবার পড়া পরীক্ষার খাতাটা আবার সে টেনে নেয় ঃ দীপ্তি বসু। মেয়েটিকে কিছুতেই মনে করতে পারে না সে। সব ক্লাসে অবশ্য পড়াতে হয় না তাকে। কিন্তু এ-ভাষা কোথায় পেলো মেয়েটি! এ যে অত্যন্ত চেনা সুর মিস চৌধুরীর। আজও কাজকর্মের অবসরে এই সুরের প্রতিধ্বনি ভেসে আসে তার কানে।

ঃ বিদেশী ঐতিহাসিকদের লেখনী সিপাই-বিদ্রোহকে যতই মসীলিপ্ত করুক, আমরা জানি এই বিদ্রোহ শুধু একটা সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত নয়, নিষ্পেষিত সর্বহারা জাতির লুপ্ত অধিকার লাভের দুর্বার প্রতিজ্ঞা। সিপাই-বিদ্রোহ ভারতের রাজনৈতিক আকাশের শুকতারা, রাত্রির অবসান ঘোষণা করাই এর উদ্দেশ্য নয়, আগামী দিনের রক্তাপ্লুত সংগ্রামের প্রথম বলিষ্ঠ ইংগিত এই সিপাই-বিদ্রোহ।

অবিকল্প এই ভংগী, এমনই দৃপ্ত প্রকাশ। সামনে ছোট একটা টেবিলের ব্যবধান। অনেক কম বয়স তখন কুন্তলার, কলেজের ছাত্রী—ব্যারিস্টার অতনু চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। টেবিলের ওপরে পাতা খোলা ইতিহাসের বই। ওপাশে প্রশান্ত বোস, খদ্দরে-মোড়া জ্বলন্ত ইস্পাতের পাত। য়ুনিভার্সিটির সেরা ছেলে, প্রফেসররা পর্যন্ত রীতিমত সমীহ করেন ওকে। কুন্তলাকে ইংরেজি আর ইতিহাস পড়ায় প্রশান্ত। হাত দুটো মুঠো করে সোজা হয়ে সে বসে। সোনালি চশমাটা জ্বলে জ্বলে ওঠে। পুরু কাঁচের অন্তরালে চোখ দুটো ভালো করে দেখা যায় না, কিন্তু অনুমান করতে পারে কুন্তলা কি আগুন সে দুটি চোখে।

ঃ জানো কুন্তলা, এই সিপাহী-বিদ্রোহ মুষ্টিমেয় সিপাইর ধর্মান্ধতা নয়। কার্টিজে নিষিদ্ধ মাংস দেওয়া ছিল বলে ইংরাজের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান নয়। এর শিকড় আরো অনেক নীচে। মরণাপন্ন জাতির বাঁচবার প্রচেষ্টা, নিষ্পেষিত জাতির অধিকার লাভের দুর্বার প্রতিজ্ঞা। রাজনৈতিক আকাশের শুকতারা, আগামী দিনের রক্তাপ্লুত সংগ্রামের প্রথম বলিষ্ঠ ইংগিত। শেষের দিকটায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠতো প্রশান্ত। ফুলে উঠতো ওর গলার শিরাগুলো, সারা মুখে আবীরের ছোঁয়াচ।

ঠিক সেই একইকথা। আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে কেমন যেন লাগে কথাগুলো। প্রশান্ত বোসের স্বপ্ন কার চোখে নতুন রূপ নিলো আবার!

কৌচ ছেড়ে উঠে পড়ে মিস চৌধুরী। টেবিলের ওপর জড়ো করা পরীক্ষার খাতা-গুলো তুলে নেয় তারপর ঝুঁকে পড়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে। আবার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালের দুপাশে। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে গিয়েই থমকে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। কপালের দুপাশে পাক ধরেছে চুলে। কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে পাকা আর আধ পাকা চুলের আভাস। সেদিনের কুন্তলা চৌধুরী আজ প্রৌঢ়া হ'তে চলেছে,—জরা নেমেছে সারা দেহে আর মনে। অকাল স্থবিরত্বই বুঝি। হঠাৎ মনে পড়ে যায়—প্রশান্ত বোসও আর তরুণ নেই সেদিনের মত। ওরই মত হয়ত পাক ধরেছে তার চুলে, নিষ্প্রভ হ'য়েছে দুটি চোখের দৃষ্টি, স্তিমিত হয়ে এসেছে সেদিনের উচ্ছ্বাস।

খাতাগুলো গুছিয়ে নিয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে মিস চৌধুরী। গেটের কাছে লালিয়া দাঁড়িয়েছিলো। মিস চৌধুরীর গৃহস্থালীর সমস্ত কিছু ভার এই প্রৌঢ়া পাহাড়ী স্ত্রীলোকটির ওপর। গেটের কাছ বরাবর যেতেই আস্তে বলে লালিয়াঃ মাইজীর আজ খুব লেট হ'য়ে গেলো।

একটু চমকে ওঠে মিস চৌধুরীঃ সত্যিই লেট হ'য়ে গেলো। দীর্ঘ বিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম লেট। চলার গতি সে আরো বাড়িয়ে দেয়।

[illegible] সময় চেয়ারটা টেনে নিয়ে [illegible] দাঁড়িয়ে বসে মিস চৌধুরী। সামনের [illegible] করেছে মেয়েরা। অপেক্ষাকৃত

ঝড়ো মেয়েরা গাছের তলায় তলায় জটলা করছে। রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে সে দেখে।

অনেক দিনের কথাগুলো সব ভেসে আসে মনে।

সারা আকাশ ভেঙে পড়ছে ঝড় আর বৃষ্টিতে। জানলার কাঁচের শার্সি ঝাপসা হ'য়ে এসেছে। চুপ করে বসেছিলো কুন্তলা দুহাতের তালুতে মুখটা রেখে। আজ চারদিন আসেনি প্রশান্ত, কলেজও যায় নি। অপেক্ষা ক'রে ক'রে হতাশায় ভেঙে পড়েছে কুন্তলা। অদ্ভুত ছেলে এই প্রশান্ত। কোনদিন কারুর জন্য একটুও কি থামতে পারে না ও!

খুব জোর কড়া নাড়ার আওয়াজ আসে নীচে থেকে। চমকে ওঠে কুন্তলা, তারপর শাড়ীটা ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে ধীর পায়ে নীচে নেমে আসে।

দরজা খুলতেই দমকা হাওয়ার মত ঘরের মধ্যে ছুটকে পড়ে প্রশান্ত। ঝড়ে ভেজা কাকের চেয়েও সংগীন অবস্থা তার। চশমাটা কাপড় দিয়ে মুছতে মুছতে বলেঃ উপায় নেই, তোমার সংগে দেখা করবার জন্য এই দুর্যোগ মাথায় নিয়েই বেরোতে হলো।

ঃকিন্তু তা বলে এই দুর্যোগে বাড়ি থেকে বেরোয় কেউ?

ঃ 'হায় পথবাসী, হায় গৃহহারা' গানটা মনে পড়ছে বুঝি। আমাদের মত লক্ষ্মীছাড়াদের কথা ছেড়ে দাও। যাক, কাজের কথা শোন, আজ রাত্রেই আমি মেদিনীপুরে রওনা হচ্ছি, যদি ফিরে আসি অক্ষত দেহে,তবে দেখা হবে আবার।

তার মানেঃ প্রায় চীৎকার ক'রে ওঠে কুন্তলা।

ঃমানে এবার একটু বড়ো রকমের কাজের ভার নিয়ে যাচ্ছি। না ফেরার আশাই বেশী। তা ছাড়া আগের দুজনও ফেরে নি।

ঃহেঁয়ালী রাখো প্রশান্ত, আমি কোথাও যেতে দেবো না তোমাকে। নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না তোমার,—দুটো হাত দিয়ে তাকে সবলে আঁকড়ে ধরে কুন্তলা। ওর চোখে তখন জল এসে গেছে।

প্রশান্ত আস্তে ছাড়িয়ে নেয় হাতদুটোঃ ছি, পাগলামী করো না। একটা যজ্ঞ পূর্ণ করতে হ'লে অনেক আহুতির দরকার। এতো সবে সুরু।

কুন্তলা এবারে প্রশান্তর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বলেঃ আমি যাবো তোমার সংগে। আমাকে নাও প্রশান্ত, তোমার পাশে তোমার যোগ্য করে নাও,—কান্নায় ভেঙে পড়ে কুন্তলা।

অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে প্রশান্ত,—কুন্তলার মুখটা তুলে ধরে তার মুখের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে থাকে, তারপর [illegible] আস্তে বলেঃ লোভ হয় কুন্তলা, মা[illegible] লোভ হয় তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে [illegible] জানা গৃহস্থালী আর নিশ্চিন্ত আরাম। কথার মাঝখানেই হঠাৎ সে থেমে যায়। জোর গলায় বলেঃ না, না, তোমাদের এ স্বপ্ন দেখাও পাপ। আজ আসি কুন্তলা। নিতান্ত একলা যাচ্ছি না, সংগী রয়েছে একজন,—জামার তলা থেকে চকচকে নতুন একটা রিভলভার বের ক'রে দেখায় প্রশান্ত।

মাথাটা ঝিমঝিম ক'রে ওঠে কুন্তলার। চোখের সামনে অসংখ্য আলোর বিন্দু। অনেকক্ষণ পরে চেতনা ফিরে তার। চেয়ে দেখে, —সামনের মেঝের ওপরে অনেকখানি জুড়ে জলের দাগ—এইখানেই ভিজে জামাকাপড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো প্রশান্ত।

এসব অনেক দিনের কথা। আচমকা খেয়াল হয় মিস চৌধুরীর। সামনের লন খালি। অনেকক্ষণ ঘণ্টা পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি নিজের রুমের দিকে সে পা চালায়।

কয়েকদিন পরের কথা। মিসেস রাহা হন্তদন্ত হ'য়ে ঢোকেন হেড মিস্ট্রেসের রুমেঃ শুনেছেন ব্যাপারটা!—অত্যধিক পরিশ্রমে হাঁপাতে শুরু করেছেন তিনি।

কোন ব্যাপারটা বলুন তোঃ মিস চৌধুরীকে একটু উদ্বিগ্নই মনে হ'লো।

ঃ সেকেণ্ড ক্লাসের মেয়েরা মিলে সুভাষ-জয়ন্তী উৎসব করতে চায়। Government aided স্কুল, এ সমস্ত allow করা কি ক'রে চলবে?

ঃ এ সব হুজুগ তো আগে ছিলো না কোন দিন এখানে?—খুব কঠিন গলার আওয়াজ মিস চৌধুরীর।

ঃ না, কোন দিন শুনিনি। এ বছর কলকাতা থেকে মেয়ে এসেছে গোটা কয়েক, তারাই সমস্ত মেয়েদের নাচাচ্ছে।

ঃ হুঁ, আজকের ছুটির পরে তাদের একবার দেখা করতে বলবেন আমার সংগে, আমি আলাপ ক'রে দেখবো।

সারাটা দিন কাজে মোটেই মন যায় না মিস চৌধুরীর। কেবলই পুরোনো কথাগুলো ভীড় করে আসে মনে। প্রশান্তর মৃত্যুর কথাও শুনেছিলো সে,—না কাগজেই বুঝি দেখেছিলো একদিন। কোথাকার দুঃস্থ অনাথা বিধবার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেছে আন্দামান-ফেরৎ বিখ্যাত বিপ্লবী প্রশান্ত বোস। সংগে একটা ছবিও বের হয়েছিল প্রশান্তর,—ছেলেবেলাকার একটা ছবি।

ছুটির ঘণ্টার সংগে সংগেই মিস চৌধুরীর রুমে ঢোকে তিনটি মেয়ে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে মেয়ে তিনটির দিকে চোখ বুলায় মিস চৌধুরী। বেশ কিছুক্ষণ সে নিস্পন্দ হ'য়ে থাকে, হঠাৎ খেয়াল হয় একটি মেয়ের গলার আওয়াজেঃ আপনি ডেকেছেন আমাদের?

হ্যাঁঃ কথার সংগে সংগে সচেতন হয়ে ওঠে মিস চৌধুরী। ওর মধ্যেকার ঘুমন্ত অভিভাবকত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। টেবিলের ওপরে কনুই দুটো রেখে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করেঃ তোমরা নাকি সুভাষ-জয়ন্তীর আয়োজন করছো! সুভাষবাবু একজন শিক্ষাব্রতী হ'লে আমাদের বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু রাজনীতির সংগে ছাত্রজীবনের কোন সম্পর্ক নেই।

ঃ তাই কি?

গলার আওয়াজে চমকে ওঠে মিস চৌধুরী। না, ভুল হ'য়েছিলো তার। কথা বলছে কোণে দাঁড়ানো লম্বাগোছের মেয়েটি।

ঃ আমার তো মনে হয়, রাজনীতি বাদ দিয়ে আমাদের জীবন কোন সময়েই চলে না। পরাধীন জাতির রাজনীতিই একমাত্র সম্বল।

একটু যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে মিস চৌধুরী। অনেক দিনের একটা কথা মনে পড়ে যায় তার। জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে নিশান হাতে নিয়ে বেরোবার মুখেই বাধা পেয়েছিলো সে, তার বাপ হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেনঃ তোমার এখন পড়বার বয়স—এই বয়সে এই সব বাজে হুজুগে মাতামাতি করার সময় নয়। রাজনীতি তোমাদের জন্য নয়।

নিশান উঁচিয়ে বাপের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলো সে ঃ পরাধীন জাতের রাজনীতিই একমাত্র সম্বল। প্রতি মুহূর্তে পায়ে শিকল বাজছে যার, তার অন্য পথ আছে নাকি কিছু?

এই মেয়েটিও সেই কথাই বলছে কিন্তু। ওরই হারানো দিনের কথাগুলো। একটু যেন উত্তেজিত মনে হয় মিস চৌধুরীকে। বার বার অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছে সে।

ঃ এই রাজনীতি কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে তা জানো ঃ কেমন যেন নিস্তেজ হ'য়ে আসে মিস চৌধুরীর গলা।

ঃ সর্বনাশের মানে সকলের কাছে এক নয়। কেউ মনে করে লেখাপড়া শিখে ভালো ঘরে পড়লেই জীবন সার্থক হ'য়ে যায়, আবার কেউ মনে করে দেশের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই চরম সার্থকতা। কাজেই এর মীমাংসা কোনদিনই হবে না। আমি আগে মিশনারী স্কুলে পড়তাম, সেখানে St Michael আর St Peter-এর উৎসব হ'তো, কিন্তু এই সব Apostleদের চেয়ে সুভাষবাবু কোন অংশে কম আমায় বলতে পারেন?

এবার দাঁড়িয়ে ওঠে মিস চৌধুরী। সারা মুখে একটি কাঠিন্যের ছায়া ভেসে আসে তার। আশ্চর্য মনে হয় সব কিছু। নাবালিকা কয়েকটা মেয়ের ঔদ্ধত্য কি ক'রে এতক্ষণ সহ্য করছে সে। এই প্রতিষ্ঠানে এমন কারো সাহস নেই, মাথা তুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে!

রক্তের রক্ত তিল তিল ক'রে দিয়ে বিশ বছরে এই শিক্ষায়তনের যথেষ্ট উন্নতি সে করেছে। না, এসব হুজুগ কিছুতেই চলবে না এখানে।

ঃ শোনো, তোমাদের সংগে অযথা তর্ক আমি করতে চাই না। স্কুলের discipline আমি রক্ষা করতে চাই। এসব উৎসব এ স্কুলে কোনদিন হয়নি, আর হবেও না। এই আমার শেষ কথা, তোমরা যেতে পারো।

মাথা নীচু করে চলে যায় মেয়ে তিনটি। কিন্তু দু হাতের মধ্যে মাথা রেখে অনেকক্ষণ নিঝুম হ'য়ে বসে থাকে মিস চৌধুরী। কেবলই মনে হয়, প্রশান্তই বুঝি ফিরে গেলো মাথা নীচু ক'রে—অবজ্ঞায় আর অপমানে।

পরের দিন মিস চৌধুরীর সংগে সংগেই রুমে ঢোকে বালকের সেই লম্বা গোছের মেয়েটি।

ঃ কি ব্যাপার—থমথমে মুখের ভাব মিস চৌধুরীর।

ঃ আমরা ঠিক করলাম সুভাষ-জয়ন্তী আমরা অন্য জায়গাতেই করবো। বাবাও সেই কথা বলছিলেন। উনি বললেন যে, ও'রা যখন পছন্দ করেন না, তখন কি দরকার স্কুলে ওসব অনুষ্ঠান করার। তার চেয়ে বরং অন্য কোন জায়গাতেই আয়োজন করো। আস্তে এগিয়ে আসে মেয়েটি। মিস চৌধুরীর টেবিলের ওপরে হাতে লেখা একটা নিমন্ত্রণ-লিপি রেখে দিয়ে বলে ঃ সামনের সোমবার হবে উৎসব। যদি বাধা না থাকে কোন, আসবেন দয়া করে।

একটু যেন কঠিন হয়ে আসে মিস চৌধুরীর মুখের রেখা ঃ আমাকে নিমন্ত্রণ করা সম্বন্ধেও কি তোমার বাবাই বলে দিয়েছেন?

ঃ বাবা বলেছেন এসব ব্যাপারে জোর করে আনা যায় না কাউকে। তাঁর আদর্শকে যাঁরা মানেন, সত্যিকারের ভালোবাসেন তাঁকে, তাঁদেরই আসা উচিত এ অনুষ্ঠানে। অনেক লোকের ভীড় জমাবার অনুষ্ঠান এ নয়।

মেয়েটি চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকে মিস চৌধুরী। সামনের নিমন্ত্রণলিপির ওপরে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে। চিঠির নীচে সই করেছে দীপ্তি বসু—আহ্বায়িকা হিসাবে। ও, এই মেয়েটিই বুঝি দীপ্তি।

অনেক কথা মনে পড়ে যায় মিস চৌধুরীর। ওর মাথার বালিশের নীচে অনেকদিন লুকোনো ছিল সুভাষের একটা প্রতিকৃতি—প্রশান্তরই দেওয়া। রোজ সকালে উঠে সেই ছবিতে মাথা ছোঁয়াতো সে। ছবিটা ভারি ভালো লাগতো তার—পূর্ণ প্রাণশক্তির প্রতীক মূর্তিমান বিদ্রোহই বুঝি!

অনেকক্ষণ পরে হুঁস ফিরে আসে মিস চৌধুরীর। ইতিমধ্যে বেয়ারা দুতিনবার ডেকে গেছে তাকে, কিন্তু সাড়া পায় নি। পাশে রাখা ছাতাটা তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে রুম থেকে। ঝিম ঝিম করছে মাথাটা আর সমস্ত শরীরে ক্লান্ত অবসাদ। মিসেস রাহাকে অসুস্থতার কথা জানিয়ে সে পথে নেমে পড়ে। বেশ লাগছে এইভাবে হাঁটতে! পাইন আর দেওদারের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। মাঠ পার হয়ে পাইনের ছায়ায় গিয়ে সে বসে পড়ে। পথ থেকে অনেকটা দূরে, হঠাৎ কারুর নজরে পড়বার সম্ভাবনা নেই।

হাঁটুর ওপর হাতদুটো রাখে আলতো-ভাবে। বিশবছরের পরিমিত জীবনযাত্রা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ধ্বসে গিয়েছে যেন, তার সব কিছু সংযম ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

অনেকদিনের কথা।

ব্যারিস্টার অতনু চৌধুরী যেন ফেটে পড়েছিলেন রাগে। চিঠিটা দুহাতের মধ্যে পাকিয়ে গর্জন করে উঠেছিলেন খোঁচা খাওয়া বাঘের মত। ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরে-ছিলো কুন্তলা। বাপের সামনে গিয়ে সে দাঁড়িয়েছিলো মাথা উঁচু করে।

What a Check! আমার মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায়? কালাপাণি-ফেরৎ একটা স্কাউণ্ড্রেল! সামনে পেলে চাবকে লাল করে দিতাম। একশো টাকার প্রাইভেট টিউটারের স্পর্ধা। কুন্তলাকে সামনে দেখে আরো যেন জ্বলে উঠলেন অতনু চৌধুরী। চিঠি তার দিকে ছুড়ে ফেলে চীৎকার করে উঠলেন ঃ দেখ কুন্তী, রাসকেলটার audacity আদর দিয়ে একেবারে মাথায় তুলেছিলি তুই।

কোন কথা বলেনি কুন্তলা। চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে সে শোবার ঘরে চলে এসেছে। প্রশান্ত কথা রেখেছে নিজের। আন্দামান থেকে ফিরেই সে আহ্বান করেছে কুন্তলাকে। পথ তার দুর্গম—সেই জন্যই সঙ্গী চায় সে। কুন্তলা একদিন পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলো তার, আজ সে কি আসতে পারবে সব ফেলে?

বিছানার ওপরে লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কেঁদেছিলো কুন্তলা। হ্যাঁ, পারবে, আজো সে পারবে প্রশান্তর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। প্রশান্তর পথই তার পথ। তার জন্য সর্বকিছু ছাড়তে পারে সে।

গভীর রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে-ছিলো কুন্তলা। পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে লোহার ফটকটা খোলবার মুখেই কিন্তু বাধা পেয়েছিলো সে। বজ্রমুষ্টিতে তার একটি হাত ধরে ব্যারিস্টার চৌধুরী তাকে টেনে নিয়ে এসেছিলেন ভিতরে। আচমকা এতটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলো কুন্তলা যে একটু শব্দও মুখ থেকে বের হয়নি তার, চাপা কান্নার একটু আওয়াজও নয়।

তারপরে কতদিনের জন্য বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তাকে দূর সম্পর্কের এক রায়বাহাদুর জ্যাঠার তত্ত্বাবধানে। অনেকদিন কোন খবর পায়নি প্রশান্তর। ইতিমধ্যে ওর বাপের আকস্মিক মৃত্যুর খবর এসেছে, উল্কাচ্ছন্নের মত সে খবর সে শুনেছে, আরো শুনেছে প্রচুর টাকার অধিকারিণী নাকি হয়েছে সে। কিন্তু সব যেন কেমন অর্থহীন মনে হয়েছে তার কাছে,—এই সম্পদ আর এই প্রাচুর্য।

আত্মীয়-অনাত্মীয়ের ভীড় থেকে সন্তর্পণে সরে এসেছে কুন্তলা। দীর্ঘ বিশবছর বেশ তো ভুলেছিলো সব। অজস্র কাজের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলো নিজেকে। কিন্তু তার শান্ত-জীবনে আবার যেন ঝড়ের বেগ আসতে শুরু হয়েছে। সবকিছু আবার ভেসে আসছে মনের সামনে।

সকাল থেকে কেমন যেন মনে হয় মিস চৌধুরীর। সত্যিই কি অধিকার আছে তার সুভাষ-জয়ন্তীতে যোগ দেবার। ওর রক্তের কণিকায় কোথায় সেই বিদ্রোহের উত্তাপ! পুরানো দিনের সে আদর্শ আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পরিমিত জীবনের অন্তরালে। কিন্তু এক সময়ে আপনার মনেই প্রায়-ভুলে যাওয়া চাঁপা রংয়ের খদ্দরের শাড়িটা গায়ে জড়ায়।—সেই রংয়েরই ব্লাউজ পরে একটা। দুটোই প্রশান্তর দেওয়া। প্রশান্ত বলেছিলো,—এই আমাদের পোষাক। ধার করা পোষাকে নিজের দেহ সাজিও না কখনও। দেশের মাটি আর দেশের লোকের স্পর্শ এই শাড়ীতে। এতদিন এগুলো তুলে রেখেছিলো মিস চৌধুরী। এদের প্রয়োজন বুঝি নিঃশেষিত হয়েছিলো ওর জীবনে।

গেট পার হয়ে ও চলতে শুরু করে—সংকোচ আর জড়তা দুপায়ে মাড়িয়ে। ঠিক রাস্তার সামনেই দেখা হয় দীপ্তির সংগে। বাস্তবিকই আশ্চর্য হয়ে যায় দীপ্তি ঃ সত্যি আপনি এসেছেন? আমরা কিন্তু ভাবতেও পারিনি আপনি আসবেন।

ঃ যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে একটা কাজে, ভাবলাম তোমাদের উৎসবটা দেখে যাই একবার—একটু আমতা আমতা করে মিস চৌধুরী।

ঃ বেশ করেছেন—একটু যেন ইতস্তত করে দীপ্তি। ও চেয়ে চেয়ে দেখে মিস চৌধুরীর সজ্জার দিকে। খুব বড় রকমের একটা পরি-পরিবর্তন সারা দেহে, ওর গলার আওয়াজেও যেন সে পরিবর্তনের ছোঁয়াচ লেগেছে। নয়ত এত মিষ্ট করে কি করে কথা বলছেন মিস চৌধুরী।

ঃ আমাদের উৎসবের এখনও তো ঘণ্টা-খানেক দেরী। চলুন, বাবার সংগে দেখা করবেন ততক্ষণ।

গেট পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মিস চৌধুরী। ঠিক সামনের দেয়ালেই প্রকাণ্ড একটা ছবি টাঙানো

—প্রশান্তর ছেলেবেলাকার ছবি। চেয়ে চেয়ে দেখে মিস চৌধুরী। ওর রক্তে যেন ঝড় ওঠে আর সমস্ত শিরা আর স্নায়ুতে অবসাদ নামে।

ঃ বাবার ফটো—যখন কলেজে পড়তেন, সেই সময়ের। আসুন ভিতরে।

মাথাটা নীচু করে স্যান্ডালের স্ট্র্যাপটা ঠিক করে মিস চৌধুরী। ভারি আলগা হয়ে গিয়েছে স্ট্র্যাপটা। চলার পথে খালি বাধার সৃষ্টি করে। কি মুস্কিলই যে হয়েছে। অনেকক্ষণ পরে সে মুখ তোলে। বিকালের পড়ন্ত রোদে লাল টকটকে দেখায় তার মুখ। রুমাল দিয়ে চোখ দুটো সে মুছে নেয়।

ঃ আসুন এই দিক দিয়ে।

সবুজ রংয়ের পর্দাটা হাত দিয়ে একপাশে সরিয়ে দেয় দীপ্তি। ঘরের কোণে ছোট একটা টেবিল, স্তূপাকার কাগজ, তারই পিছনে কে একজন বসে রয়েছে।

ঃ বাবা, আমাদের হেড মিস্ট্রেস মিস চৌধুরী এসেছেন তোমার সংগে দেখা করতে। ইনি আমার বাবা।

কোণে-রাখা চেয়ারটা সামনে টেনে দেয় দীপ্তি ঃ বসুন আপনি। চলে যাবেন না কিন্তু, আমি আসছি এখুনি।

মিস চৌধুরীর বসতে বেশ একটু দেরী হয়। কেমন যেন একটা আড়ষ্টতা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না সে।

ঃ নমস্কার, আপনার কথা শুনেছি দীপ্তির কাছে—হাত দুটো জোড় করে কপালে ঠেকায় প্রশান্ত।

চেয়ে চেয়ে দেখে মিস চৌধুরী। বিরাট একটা ভগ্নস্তূপ। ইট আর চুনের প্রলেপ খসে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। সমস্ত কাঠামোটার ওপর দিয়ে অনেক দুর্যোগ বয়ে গেছে যেন। পুরু দুটো কাঁচের অন্তরালে তেমন করে আর যেন জ্বলে ওঠে না চোখ দুটো। সেদিনের বিপ্লবী দুটি বাহু আজ নিস্তেজ, শিথিল।

ঃ দীপ্তি বলছিলো যে, স্কুলে সুভাষ-জয়ন্তী করাতে আপনি মানা করে দিয়েছেন। বলেছেন রাজনীতির পথ ছাত্রীদের নয়। উচিত কথাই বলেছেন আপনি। আমিও দীপ্তিকে সেই কথাই বুঝিয়েছিলাম. কিন্তু মা-মরা পাগলী মেয়ে; কিছুতেই কথা শোনে না।

কেমন যেন মনে হয় মিস চৌধুরীর। একি কথা বলছে প্রশান্ত। গৃহীর মত মেপে মেপে হিসাব করে কোনদিন তো কথা বলে নি সে?

ঃ কথাটা ঠিক সেভাবে বলি নি আমি। Government Aided স্কুল কিনা, এসব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আপত্তির কথাটাও আমাদের ভাবতে হয়। দেশকে আর দেশনায়ককে ভালবাসা কোন সময়েই যে অপরাধ নয়, তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু এই কাঁচা বয়সে ভালো-মন্দ বিচার করার মত বুদ্ধি থাকে না এদের, সব কিছুতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ঃ এতক্ষণ পরে যেন কথা বলবার মত সাহস সঞ্চয় করে মিস চৌধুরী।

সামনের কাগজের স্তূপগুলো সরিয়ে এক-দৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থাকে প্রশান্ত। হাত দুটো টেবিলের ওপর সোজা করে রাখে আর কুঞ্চিত হয়ে আসে তার ভ্রূ দুটো। ভারি অস্বস্তি বোধ করে মিস চৌধুরী। এতক্ষণ পরে বুঝি চিনতে পেরেছে প্রশান্ত। সমস্ত কিছু বাধা সরে গিয়েছে বুঝি। পুরানো দিনের মত সে আর প্রশান্ত বসেছে মুখোমুখি।

ঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়, ঠিক কথা। আপনি যা বলছেন তাও ঠিক। কাঁচা বয়সে এই অপরাধ যারা করে ফেলে, সারা জীবন তাদের উল্কার মত ঘুরে বেড়াতে হয়। ঘর ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তাদের। আমার নিজের চোখে দেখা কিনা। সর্বনাশ হয়ে গেছে অনেক মেয়ের—জীবন নষ্ট হ'য়ে গেছে তাদের। তাই, বার বার সাবধান করে দিই দীপ্তিকে—এ আগুনে ঝাঁপ দিসনি মা, পুড়ে ছাই হয়ে যাবি।

সত্যিই স্তিমিত হয়ে গেছে প্রশান্ত। যে আগুনে মশাল জ্বালানো চলতো, তাই দিয়ে জ্বেলেছে ঘরের প্রদীপ। মিস চৌধুরীর সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যায়। কিন্তু সত্যিই কি তাকে চিনতে পারছে না প্রশান্ত? এমনই এক টেবিলের ব্যবধান তো সেদিনও ছিলো। এতই কি বদলে গেছে কুন্তলা। অসংখ্য টুকরো টুকরো কথা ভীড় করে আসে গলার কাছে। মনে হয় চীৎকার করে বলে একবার ঃ সত্যিই কি চিনতে পারছো না প্রশান্ত? না, অভিমানে না-চেনার ভাণ করছো তুমি? এতই কি দূরে সরে গেছি তোমার কাছ থেকে? —কিন্তু এ সমস্ত কথা বলতে ভারি লজ্জা করে তার, লজ্জা করে এমনি করে নিজের পরিচয় দিতে।

ঃ ভালো লাগে না কিছু। কেমন যেন একটা ক্লান্তি এসেছে জীবনে। মেয়েটার বিয়ে-টিয়ে দিতে পারলেই কোন একটা তীর্থস্থানে চলে যাবো নিজে—কতকটা যেন নিজের মনেই বলে প্রশান্ত।

এইবার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে মিস চৌধুরী। অসহ্য, আর কিছুক্ষণ থাকলে বুঝি পাগলই হয়ে যাবে ও। ওর যৌবনের সমস্ত ছবি নিঃশেষে মুছে যাবে। বলিষ্ঠ বিপ্লবী প্রশান্ত বসুর বদলে স্থবির নির্জীব প্রশান্তর ছবি নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না ও।

হাত দুটো তুলে কপালে ঠেকায় মিস চৌধুরী ঃ আজকে উঠি মিঃ বোস, বিশেষ একটা কাজ রয়েছে হাতে। পারি তো আসবো আর একদিন।

ঃ ও, কাজ রয়েছে বুঝি। তাহলে আর আটকে রাখবো না আপনাকে। আমার নিজের সব কাজ ফুরিয়ে গেছে কিনা, তাই পৃথিবীতে আর কারুর কাজের কথা আর মনেই থাকে না ঃ কথার শেষে মুচকে মুচকে হাসে প্রশান্ত। ওই হাসিটাই শুধু মনে করিয়ে দেয় পুরানো দিনের প্রশান্তর কথা—সেই ঠোঁট মুচকে নিঃশব্দ হাসি।

কিন্তু কিছুতেই কি তাকে চিনতে পারলো না প্রশান্ত। ওকে চেনার মন আর চোখ দুই বুঝি বদলে গেছে তার।

দরজার গোড়াতেই দেখা হয়ে যায় দীপ্তির সংগে।

ঃ একি চলে যাচ্ছেন। উৎসবে থাকবেন না আপনি?

ঃ না, আমার বোধ হয় থাকা হবে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—স্কুল কমিটির জরুরী একটা মিটিং আছে সেক্রেটারীর বাড়িতে।

মুখটা তুলে অনেকক্ষণ মিস চৌধুরীর দিকে চেয়ে থাকে দীপ্তি। তারপর আস্তে আস্তে বলে ঃ বাবার সংগে কথা বলতে অসুবিধা হলো খুব না? সত্যি, আরো আগে যদি দেখতেন বাবাকে। আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছেন। বাবা। তাছাড়া চোখে একেবারেই দেখতে পান না কিনা।

ঃ দেখতে পান না চোখে—কাতর আর্তনাদের মত শোনায় মিস চৌধুরীর গলার স্বর।

ঃ না, একবার জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করার সময় গুলী লাগে চোখে, তারপর থেকে আস্তে আস্তে দুটো চোখই নষ্ট হয়ে গেছে।

সে কি? পায়ে পায়ে আবার প্রশান্তর ঘরের কাছে ফিরে আসে মিস চৌধুরী। চোখে দেখতে পায় না প্রশান্ত, তাই বুঝি মুখোমুখি বসেও চিনতে পারে নি তার কুন্তলাকে।

জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে প্রশান্ত। বিকালের রোদের ঝলক চশমার কাঁচের ওপর এসে পড়েছে। ঝলসে ওঠে পুরু কাঁচগুলো—চাওয়া যায় না সে দিকে।

শাড়ির খস খস আওয়াজে ফিরে দাঁড়ায় প্রশান্ত।

ঃ কে দীপ্তি! মিস চৌধুরী চলে গেলেন কোথায় বুঝি দরকারী কাজ আছে। তোমাদে[র] মিস চৌধুরীর গলার আওয়াজটা কিন্তু খ[ুব] চেনা চেনা মনে হচ্ছে আমার। কোথায় যে[ন] শুনেছি এই গলা, ভারি চেনা গলা—

আর দাঁড়ায় না মিস চৌধুরী। রুমাল [দিয়ে] করে কপালের দুটো পাশ আর চোখের কোণ মুছে নেয়, তারপর বারান্দা পার হয়ে তর ত[র] করে নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে।



দস্তুরমতন সাহিত্যিক। স্মৃতির সুরক্ষিত মণি-কোঠায় অজস্র শব্দ ঘুমিয়ে আছে, স্বপ্নের মতন থরে-বিথরে। শুধু কি তাই? শব্দের ভাবানুষঙ্গের শৃঙ্খলে দেখা দেয় নানান টুকিটাকি, এটা-সেটা-ওটা—আর জীবনের অবিস্মরণীয় 'ভুলো না—আমায়'। অবন ঠাকুরের অনবদ্য ছবিলেখা, পরিভাষায় যাকে বলে 'কুটুম-কাটাম'। মনের যাদুঘরে সঞ্চয়ী-মন কত জিনিষই না জড়ো করে? দীর্ঘ জীবনের খরা আর বাদলের শেষে, অনেক তুষার গলানো বসন্তের অন্তে, পরিণত স্টাইলিস্ট মানুষের লেখায় যে নিবিড় রস পাই, যে-জীবন-সমীক্ষা দেখি, তার তুলনা কোথায়? কথার দুটি দিক আছে—ছবি ও গান। প্রাঞ্জল সাহিত্যিক গদ্যের কেরামতি হল, সে কথা দিয়ে ছবি আঁকে আবার গানও গায়। সে গদ্যের শুরু ও সারা কঠিন লেখার চেয়ে বাদ দেওয়া হল মহৎ আর্ট।

রঙিন ফুরফুরে গোলাপি গদ্যের মধ্যে রঙের উপস্থিতি ত স্বাভাবিক। কালিদাস কিংবা কাদম্বরীতে যে রঙের ছড়াছড়ি মণীন্দ্র-লাল বসুর বাঙলায় যে রঙের অরাজকতা সে বর্ণাঢ্য রঙের কথা বলি না। শব্দের চরিত্র অনুসারে তার মেজাজ বা 'মুড'এর উপর রঙের আভাস পাওয়া যায় সে রঙ নয়। পৌর্বাপৌর্যের সূত্র হারানো এমন অনেক স্বাধীন বা অ-দলবদ্ধ কথা, আমার কাছে বিশেষ একটি রঙ নিয়ে দেখা দেয়। জানি না শব্দ কেবলি, আপনাদের কাছে, শব্দময় বর্ণহীন ঝঙ্কার কি না? ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু মশায় কি বলেন জানি না বহু শব্দ আমার কাছে বর্ণময়—বিশেষ একটি রঙের নির্দেশ করে। শৈশব স্মৃতি, কিংবা অবচেতন মনে কোন বা কিসের প্রভাবের জন্য মনের নিভৃতে শব্দটা রঙিন হয়ে ওঠে সে খবর কে দেবে? বিলেত শব্দ আমার কাছে শাদা রঙের দ্যোতক। কিন্তু ইংল্যান্ড সবুজ, বোতল-রঙা সবুজ সারা পাঞ্জাব প্রদেশ ফিকে আসমানি। যশোর, ত্রিভাঙ্কুর, হলুদ। কলকাতা ঢাকা কিন্তু কালো। মান্দ্রাজ গাঢ় ব্রাউন। কটক রাঁচি কাশ্মীর, করাচি, কাশী, রাজসাহী ও রাশিয়া শাদা। বোম্বাই, দিল্লী, লাহোর লক্ষ্ণৌ লাল। শিলং ঘাসের মতন সবুজ, তালচের ছাইরঙা ধূসর আর বাঁকুড়া, বগুড়ার রঙ শাদাটে সবুজে মেশানো কাঁচ শসার মত। পালামৌ সবুজ। পুরী বালু-রঙা হলদে। গঙ্গার রঙ গেরুয়া, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র কিন্তু নীল। দেশবিদেশ বা শহরের রঙ কোন নির্দেশক কিংবা ম্যাপ খানিকটা গড়তে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু কেন এমন হয় ভাবতে মজা লাগে। এ ছাড়া বাঙালী মনীষীদের সম্পর্কে আমার বর্ণবিচার আছে।

শাদা রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জন ও আশুতোষ।

লাল চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, শ্রীঅরবিন্দ ও অবনীন্দ্রনাথ।

কালো মাইকেল মধুসূদন, ঈশ্বর গুপ্ত গুরুদাস।

নীল হেমচন্দ্র।

সবুজ বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র।

হলুদ দীনবন্ধু মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুভাষচন্দ্র বসু।

প্রেম, পরিমল, পরাগ, ষোড়শী স্ত্রী হলুদ। আবার অম্র, সৌরভ, প্রতিভা, স্বদেশ, স্বদেশী ও কামিনী শাদা। বিবাহ, যৌবন যুবতী, কিশোরী এরা হল লাল। তরুণ, তরুণী পত্নী, রমণী সবুজ। মৃত্যু, নারী কালো। নির্মল, নির্মাল্য, মরণ নীল। বালিকা ধূসর।

উপরের এই রঙের তালিকাওয়ালা কথামালা নিজের কাছেই মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য ও 'আর্বিট্রারী' বলে মনে হয়েছে। এই রঙিন শব্দতত্ত্বের কোন ব্যাকরণগত আইন আজও আবিষ্কার করতে পারিনি। আবার এরা একেবারে মনগড়া, সুতরাং বাজে বলে এক লাইনে বরখাস্ত করতে মন সরে না। উপমান আর উপমেয়ের যোগসূত্র টানতে গিয়ে সারা দুনিয়া উজাড় করেও মনে হয়েছে কবির উপমা বড়ো দুরানীত। রবীন্দ্রনাথেরঐ গানের কলি সম্পর্কে আপনি কি কোনদিন ভেবেছেন: আলোর রঙ কি জাগলো পাখির রবে? অদ্ভুত, সুন্দর আর ব্যঞ্জনাময় নয়? এডিথ সিটওয়েলের একটি কবিতার একটি চরণ নিজে তর্জমা করা গেল: যখন পিংক ফুলদের মনে হ'ল যেন একটি মোৎসার্টের সুর। তাহলে দেখা যাচ্ছে মোৎসার্টের সুরের রঙ আছে আর তা বোধ করি গোলাপির রকমফের। চৈতন্য দেবের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের মিল খুঁজে মেলা ভার, কিন্তু তবুও তাঁরা লাল গ্রুপভুক্ত। প্রেমের সঙ্গে ষোড়শীর কিংবা ষোড়শী স্ত্রীর যোগ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এরা হলদে হ'ল কেন? আপনাদের সমবেত মাথা একত্রিত করে আমার এ রঙিন শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে ভাববেন কি?

ব্যথা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

তোমার জীবন মোরে সাদরে দিয়াছে উপহার
নিরুপম শুভ্র শুচি ব্যথা। অমলিন পুষ্পহার
ব'লে তারে নিছি তুলিয়া সাগ্রহে, মধু স্পর্শ রসে
অমৃত নিষেকে তারে লতা সম যতনে হরষে
মর্মতলে রাখি বাঁচাইয়া, প্রীতির শিশির জলে
নিত্য বিকশিত রাখি পেলব পল্লবময় দলে
সুগোপনে; স্মৃতির সৌরভসারে দিই বাড়াইয়া
মৃদু গন্ধ তার। ছিল মরু, মালঞ্চ করেছি হিয়া।

স্নিগ্ধদীপ্ত সুকুমার সন্ধ্যার প্রথম তারা সম
ভাতিছে উদয়াকাশে নাশিয়া আমার সব তম
অনিমেষ চাহি'; শান্ত সুগভীর স্তব্ধ রজনীর
অতল সাগরতলে কল্লোলিত বেদনা ধ্বনির
আভাসের মত গান তবুও যে ভেদি' নীরবতা
কথা কয়ে উঠে প্রাণে; তব দান, ওগো এ যে ব্যথা।

বৈদেশিকী

বৈদেশিক ভারত

দিল্লীর নবপ্রতিষ্ঠিত 'কনস্টিটিউশন্যাল ক্লাবে' বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেছেন যে, ভারতের বৈদেশিক নীতি পৃথিবীর সকল দেশের সর্বশ্রেণীর লোকেদের নৈতিক সমর্থন' পেয়েছে। তিনি সম্মিলিত রাষ্ট্র সংঘ সম্পর্কে বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে ভারতের যে জয় হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে ঐ সংঘেরই জয়, কারণ ঐ প্রস্তাব যদি হেরে যেতো, তবে সেটা হ'ত জাতিসংঘেরই মূল নীতির পরাজয়, তাহলে ঐ সংঘের অস্তিত্বের কোনও সার্থকতা থাকতো না।

বিলাতের 'ইভনিং নিউজ' পত্রিকার সংবাদদাতার এক সংবাদে প্রকাশ যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত জাতিসংঘে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের বাজিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র সম্বন্ধে। তিনি বলেন যে, স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র সম্বন্ধে রাশিয়া, ইউক্রেন, বিয়েলো-রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, নরওয়ে এবং মেক্সিকোর পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গিয়েছে। এই সমর্থনের কথা জানতে পেরেই পণ্ডিত নেহরু মুসলিম লীগের অসহযোগিতার সম্ভাবনা সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রের প্রস্তাব এনেছেন। অর্থাৎ এই সংবাদ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ইংলণ্ডের সংকীর্ণ গণ্ডি ও তার বাধা কাটিয়ে পণ্ডিত নেহরু একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পটভূমিকায় তাঁর স্বাধীন ভারতের চিত্র এঁকেছেন।

সম্প্রতি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আর একবার একটি মূল্যবান বৈদেশিক মতামত পাওয়া গিয়েছে। লীগ নীতি সম্বন্ধে রাশিয়ার মনোভাব বোঝা গিয়েছিল, যখন সিন্ধুর লীগনেতা মিঃ হারুণ প্যারিসে মঃ মলোটভকে পাকিস্তানী নীতি বোঝাতে গিয়েছিলেন ও মলোটভ তাঁর সঙ্গে দেখা না করে তাঁকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। তার পরে রাশিয়ার বিভিন্ন কাগজে দ্বিখণ্ডিত ভারত নীতির বিরুদ্ধে লেখা বেরিয়েছে। গত সপ্তাহে মস্কো রেডিও থেকে ঐ বিষয়ে কড়া মন্তব্য করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, দ্বিখণ্ডিত ভারতের নীতি দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলাই ব্রিটিশের কূটনীতি, যাতে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও অশান্তি জিইয়ে রাখা যায়, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বর্তমান থাকার ওজরস্বরূপ। এখনে উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজের মতো দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি 'ওয়েস্টার্ন ব্লকের' জাতিগুলি ভারতের সাম্প্রদায়িক বিভেদ নিয়ে খুব দুঃখ যখন তখন প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু রাশিয়ার ঐ বেতার মন্তব্যের মতো ব্রিটিশ কূটনীতিকেই সোজা-সুজি সকল সময়ে দায়ী করেন না তার জন্য। ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ঐ বৈদেশিক অন্তর্দৃষ্টি ও ক্রমবর্ধমান সহানুভূতি বৈদেশিক ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শুভ।

দক্ষিণ আফ্রিকাঃ জেনারেল স্মাটস্

ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়া শহরে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে জেনারেল স্মাটস্ সম্মিলিত জাতিসংঘের অভিজ্ঞতার পুঞ্জিত ঝাল কিছু পরিমাণে মিটিয়েছেন। তিনি বলেন যে, 'সাম্যের আদর্শ দক্ষিণ আফ্রিকায় অচল। সেখানে শ্বেতচর্মীরা অশ্বেত জাতিদের ছোট নজরে দেখে।' অর্থাৎ তাঁর মতে মনে হয় সেইটেই আদর্শ হওয়া উচিত। তিনি বলেন যে, 'সম্মিলিত জাতিসংঘে তিন ভাগের দুভাগ প্রতিনিধিই হ'ল অশ্বেত জাতিগুলির। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও মাত্র দু'লক্ষ শ্বেত মনুষ্যদের চারপাশে ঘিরে রয়েছে পনেরো কোটি অশ্বেত জাতির মানুষেরা। সুতরাং সমান অধিকারের আদর্শ মানতে গেলে শ্বেতচর্মীদের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তল্পীতল্পা গুটোতে হয়। সেটা অসম্ভব।' সম্ভব কি অসম্ভব সেটা অবশ্য বর্তমানের সংবাদ নয়, ভবিষ্যতের খবর।

তবে একটা ভাববার কথা স্মাটস বলেছেন। তিনি বলেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যা ঘটেছে সেইটেই শেষ নয়। অর্থাৎ তিনি সম্ভবত জাতিসংঘের ঐ সিদ্ধান্ত মানবার জন্যে খুব ইচ্ছুক নন। যাই হোক আমরা আশা করি সম্মিলিত জাতিসংঘের ভারতীয় প্রতিনিধি দল তাঁদের প্রাথমিক সাফল্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করেই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা : ভারতীয় বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ বিল

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকেই সেই দেশের কৃষি খনিজ সম্পদ প্রভৃতির ব্যবসা চালু করে দেশকে শক্তিশালী করবার জন্য প্রয়োজন হয় দলে দলে ভারতবর্ষ থেকে চুক্তি করে' সেখানে শ্রমিক আমদানী করা। কোনও কালেই তাদের প্রতি মানুষের মতো ব্যবহার করা হত না। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে মহাত্মা গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন ও সফল হ'ন, তখন থেকেই আফ্রিকাবাসী ভারতীয়রা নিজেদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সক্রিয়ভাবে সচেতন হয়। তখন থেকেই সেখানকার শ্বেতচর্মী মালিকেরা বহিরাগত ভারতীয়দের আমদানী কমাবার জন্য চেষ্টা করছেন। বর্তমান ভারতের অসন্তোষ দক্ষিণ আফ্রিকায় আমদানী করে সেখানকার আন্দোলন আরো শক্তিশালী হোক, এটা যে শ্বেত মালিকরা চান না, একথা বলা বাহুল্য।

সম্প্রতি কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা ও জাঞ্জিবারে বহিরাগত ভারতীয়দের আগমন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি নূতন বিল রচিত হ'য়েছে। সেই সম্পর্কে স্থানীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার জন্য ভারত সরকার থেকে রাজা স্যার মহারাজ সিংএর নেতৃত্বে ও মিঃ সারওয়ার হাসান ও মিঃ সি এস ঝাকে নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। তাঁদের একটি প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট গত সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁরা বলেন যে, বিলে যে বলা হয়েছে আর বহিরাগত শ্রমিকের প্রয়োজন নেই, বহিরাগত অশ্বেত জনসংখ্যা এমনিতেই বেশী হয়ে গিয়েছে, সে যুক্তির কোনও ভিত্তি নেই। তাঁরা বলেন যে, এক জাঞ্জিবার ছাড়া দক্ষিণ-আফ্রিকার আর সর্বত্র এত জমি খালি পড়ে রয়েছে যে, এখনও বহু বহিরাগতকে আমদানী করা যায়। তা ছাড়া বহিরাগতদের জন্য যে সেখানে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে কথাও ভুল কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনও শ্রেণীর মধ্যেই বেকার নেই। তাঁদের মতে দক্ষিণ-আফ্রিকার মত দেশে যেখানে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা অত্যন্ত কম, সেখানে জাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ বাড়াতে গেলে, 'প্ল্যান' দরকার ও সেই অনুসারে জনবল বাড়ানো; সুতরাং প্রয়োজন হ'লে বহিরাগতদের সংখ্যা না কমিয়ে বাড়ানো দরকার। অথচ ঐ প্ল্যান্ করবার জন্যে কোনও হিসাব দক্ষিণ-আফ্রিকায় নেই। আদম সুমারী শেষবার হয়েছিল ১৯৩১ সালে, তার পর আর হয় নি। কতো বেকার কতো নয় তার কোনও পাকাপাকি হিসাব নেই। সেইজন্য বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ বিল-এর কোনও বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই।

দেখা যাক, ভারতীয় প্রতিনিধিদের যুক্তিপূর্ণ কথার কোনও ফল ফলে কি না।

মিশরে ইংরেজ

মিশর সম্বন্ধে গত সপ্তাহে বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমরা পেলে বারে বলে রেখেছি এবার ঐ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করব, বিশেষত মিশরের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির মূল গতি ভালো ভাবে জানা থাকলে সমসাময়িক ঘটনাগুলি বুঝবার পক্ষে সুবিধা হয়, এমন কি মিঃ জিন্নার মিশর ভ্রমণের রহস্যও কিছু পরিষ্কার হয় মনে করে এবারে আমরা মিশরীয় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

মিশরের রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, উভয় দেশেই ইংরেজের একই সাম্রাজ্যবাদী লোভ ও একই জাল-জুয়াচুরিমূলক কূটনীতিক খেলা এবং উভয় দেশেই তার বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের উন্মেষ ও শক্তি বৃদ্ধি।

কামাল পাশার নব্যতুর্কী প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত মিশর ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পর থেকেই ইংরেজের দরকার হয়, ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত আগমনের পথটি পরিষ্কার রাখা ও সেই পথের মাঝে মাঝে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঘাঁটি বসানো। গোড়াতে এই পথ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে। সেই প্রয়োজনেই দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। পরে যখন সুয়েজ খাল কাটা হল, তখন থেকে যাতায়াতের পথ দাঁড়ালো ভূমধ্যসাগর। প্রধানতঃ তখন থেকেই মিশরে বৃটিশ কূটনীতির খেলা ও মিশরের দুর্ভাগ্যের সুরু।

মিশরের খেদিভ সৈয়দ পাশা ১৮৫৪, ৩০শে নবেম্বর তারিখে ফার্দিনান্দ দা লেসেপ নামে এক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারকে সুয়েজ খাল কাটবার জন্য কণ্ট্রাক্ট দেন। ঐ সর্ত অনুসারে ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের এক কোম্পানী হয়। তার শতকরা ৩০টি শেয়ার ছিল ফরাসী ও ৭০টি ছিল মিশর গবর্ণমেণ্টের। ১৮৫৯, ২৫শে এপ্রিল খাল কাটার কাজ আরম্ভ হয়। বৃটিশ সরকার গোড়াতে ছিল এই পরিকল্পনার বিরোধী, পরে ১৮৬৯, ১৭ই নবেম্বর যখন সুয়েজ খাল যাতায়াতের জন্য খোলা হল, তার আগেই বৃটেন এর রাষ্ট্রনৈতিক মূল্য বুঝতে পারে। তখন থেকে তার দরকার হয় কোম্পানীর শেয়ার জোগাড় করার। ফরাসী শেয়ার পাওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং মিশরী শেয়ারগুলি আয়ত্ত করায় ও মিশরে বৃটিশ ঘাঁটি বসাবার দরকার হয়। তার জন্য যে জঘন্য নীতির আশ্রয় ইংরেজ নিয়েছে তার বিস্তৃত কাহিনীর প্রয়োজন এখানে নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সৈয়দ পাশার পরে মিশরের খেদিভ ইসমাইল পাশা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল ও বিলাসী প্রকৃতির মানুষ। তাঁর দৌর্বল্যের সুযোগ নিয়ে তাঁকে বিলাতে নিমন্ত্রণ করা হয় ও চব্বিশ ঘণ্টা আমোদ-প্রমোদে ডুবিয়ে রাখা হয় এবং তার জন্যে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড তাঁকে ধার দেওয়া হয়। পরে তিনি মিশরে ফিরে এলে টাকা শোধের চাপ দেওয়া শুরু হয়। খেদিভ রাজকীয় সমস্ত হীরে জহরৎ বেচে বিলাতী ঋণ শোধ করতে চাইলেন, কিন্তু কূটনীতিক ইংরেজ তাতে রাজী হল না। চাপ দিয়ে সুয়েজ খালের শেয়ারগুলি এবং আরও কিছু কিছু সুবিধা আদায় করা হল। তখন থেকে কার্যতঃ ইংরেজই সুয়েজ খালের হর্তাকর্তা।

মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও ইংরেজ নাক ঢোকাতে শুরু করলো। কতকটা এখানে হিন্দু মুসলমানের মতো মিশরেও দুইটি সম্প্রদায় ছিল, মিশরী ও চারকাসি। খেদিভের কাণে মন্ত্র দিয়ে তাঁর প্রাণের ভয় দেখিয়ে ইংরেজ খেদিভকে দিয়েই দুই সম্প্রদায়ে ঝগড়া ও দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। একবারকার দাঙ্গার ফলে মিশরী সমরমন্ত্রী এরাবী পাশার নেতৃত্বে বিদ্রোহী দল রাজপ্রাসাদের সামনে গিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন-প্রথার দাবী জানায়। তারিখ ছিল, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১, অর্থাৎ ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার চার বৎসর পূর্বে। এই সময় থেকেই জাতীয় মিশরের জন্ম বলা যায়। এরাবী পাশা ও তাঁর জাতীয় দল ক্রমশ অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন। এ দিকে ইংরেজ এর নামে ওকে, তার নামে একে গোপনে লাগানি ভাঙানির ফলে, তুর্কীর সোলতান ও মিশরের খেদিভে এবং মিশরের খেদিভে ও এরাবী পাশায়, ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। একবার এই ঝগড়ার সময়ে খেদিভকে বোঝানো হয় যে, তাঁর প্রাণ বিপন্ন ও ইংরেজ তাঁর সহায়। সঙ্গে সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে ইংরেজের ও ফরাসীর রণতরী এসে নোঙর ফেলে। খেদিভ ভয়ে ইংরেজের জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং ইংরেজের প্ররোচনায় এরাবী পাশাকে পদচ্যুত করে ফার্মান পাঠান। এরাবী সে ফার্মান অগ্রাহ্য করে মিলিত মিশরী সৈন্য ও জাতীয় দল নিয়ে ইংরেজের জাহাজকে সুয়েজ খাল পর্যন্ত ধাওয়া করেন। সেখানে উৎকৃষ্টতর অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ইংরেজ জেতে এবং ১৮৮২, ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজের বিজয় বাহিনী কায়রো নগরে প্রবেশ করে সেখানকার দুর্গ অধিকার করে। তখন থেকে আজ ৬৪ বৎসর মিশরের ওপর ইংরেজ প্রভুত্ব করে আসছে এবং বৃটিশ সৈন্য সেখানে চেপে বসে আছে। নামেমাত্র মিশরের সুলতান ইংরেজের হাতের পুতুল। এই ৬৪ বৎসর ধরে এখানকার জাতীয় কংগ্রেসের মতো মিশরের জাতীয় দল (যাদের বর্তমান নাম 'ওয়াফদ') ইংরেজের বিরুদ্ধে এবং তার সঙ্গে মিশরের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে। এই দলের প্রধানতম দাবী, বৃটিশ সৈন্যের মিশর ত্যাগ। ১৯৩৬ সালে ইংরেজ তাতে রাজি হয়েছে এবং বার বার প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করেছে, এমন কি, পার্লামেণ্টে ঘটা করে বক্তৃতাও দিয়েছে, কিন্তু কার্যত এখনও তা হয় নি এবং বার বার ঐ ধরণের চুক্তিভঙ্গের জন্য মিশরের জাতীয়তাবাদী দল ও ছাত্রেরা বৃটিশের ও বৃটিশ ক্রীড়নক সুলতান ফারুকের মিশরী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। এছাড়া এদেশী পাকিস্থানের মতো মিশরের সুদানী পৃথকীকরণের সমস্যাও আছে ওয়াফদী দল যার ঘোর বিরোধী এবং যাদের হাতে জিন্না সাহেব কায়রো ভ্রমণের আক্কেল সেলামি দিয়ে এসেছেন। এবারে মিশর সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।

যাই হোক, ভারতের সঙ্গে মিশরের যোগ কত ঘনিষ্ঠ এবং সেই ঘনিষ্ঠ যোগ সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী ওয়াফদী দল কত সজাগ, সে বিষয়ে বোঝা যায় ঐ দলের মুখপত্র 'আল মিশরী' নামক পত্রিকায় মিশরীয় মুসলমান ফারুক আব্বাসীর একটি সম্প্রতিক চিঠি থেকে। এই চিঠিতে তিনি লিখছেন : "ইংরেজ ভারতে যে কূটনৈতিক খেলা চালিয়ে দিয়েছে সেইটির সাফল্য-অসাফল্যের উপর মিশর থেকে সৈন্যাপসারণের প্রশ্ন নির্ভর করছে। ইংরেজের কূটনৈতিক চালের ফলে ভারতে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে গিয়েছে, মিশর সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে আসবার জন্যে ইংরেজ তার ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে যদি ইংরেজের সামনে ভারতীয় স্বাধীনতাকামীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রভুত্ব কায়েম রাখার মত অবস্থা দেখা দেয়, তবে সে মিশর থেকে সহজে নড়তে চাইবে না। কিন্তু যদি ভারত থেকে ইংরেজের অন্নজল উঠে যায় তাহলে সে একান্ত ভালোমানুষ সেজে কেবল মিশর নয়, প্যালেস্টাইন ও মধ্য প্রাচ্যের অপরাপর দেশগুলি থেকেও সাম্রাজ্যবাদের জাল গুটিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করতে বিলম্ব করবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে মিশরীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং উভয় স্থানেই ঘাঁটি বজায় রাখার জন্য জিন্না সাহেবের পাকিস্থানী নীতি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের একটি প্রধান ভরসা। অতএব জিন্না সাহেবের কায়রো ভ্রমণের প্রয়োজন ইংরেজের স্বার্থের তাগিদে। তবে সুখের বিষয় ভারতে ও মিশরে দু' জায়গাতেই স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী দল জিন্না সাহেবের স্বরূপ চেনেন।

বর্মা এবং ইন্দোচীন সম্বন্ধে আমরা আগামীবারে আলোচনা করব।

মৃগী ও মূর্চ্ছারোগ চিরতরে নিরাময় হয়।

মূর্চ্ছার সময় অত্যাশ্চর্য এই ঔষধ শুঁকিলে ১½" লম্বা একটি ব্রক ওয়ার্ম রোগীর হাঁচির সহিত বাহির হইয়া আসিবে। এইরূপ রোগী চিরতরে রহস্যজনকভাবে আরোগ্য লাভ করিবেন।

ইংরাজীতে আবেদন করুনঃ—

শ্রী ১০৮ মহাত্মা সিদ্ধ বাবা

পোঃ নাগদ,
(জব্বলপুর)

রেজিষ্টার্ড

অনসূইয়া পার্বত্য মহৌষধ

চিত্রকূটের সিদ্ধ মহাত্মা প্রদত্ত ১৫০ বৎসরেরও অধিক কাল যাবৎ প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত হাঁপানির অনন্যসাধারণ ঔষধ। মাসে পূর্ণিমা তিথিতে (৭।১।৪৭) মাত্র একবারই সেবন করিতে হয়।

ইংরাজীতে পত্রাদি লিখুনঃ—

শ্রীমহাত্মা এস, কে, দাস

শ্রীসন্ত দেবাশ্রম

পোঃ চিত্রকূট (বান্দা)

"সীতাগুণ কদম্ব"

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-রত্ন

(১)

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তিরোধানের পূর্বে—তাঁহার প্রকটকালেই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। সাধারণ বৈষ্ণবগণের উপাস্য হইলেন—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

নিতাই গৌর সীতানাথের উপাসনা আজিও প্রচলিত রহিয়াছে। অপর কতকগুলি বৈষ্ণব নিতাই গৌরের উপাসনা করিতেন। এই সম্প্রদায়ও বর্তমান আছেন। ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে সমান দৃষ্টিতে দেখিলেও ইঁহাদের মধ্যে কেহ-বা গৌরচন্দ্রকে প্রাধান্য দিতেন, কেহ নিত্যানন্দকে প্রধান মনে করিতেন। নিত্যানন্দগণের মধ্যে সেকালে বেশভূষণেরও বৈচিত্র্য ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজ সখা।
শিঙ্গা বেত্র গোপ বেশ শিরে শিখীপাখা॥

কৃষ্ণদাসের বাটীতে নৈহাটী ঝামটপুরে অহোরাত্র নাম-সংকীর্তন উপলক্ষে আগত নিত্যানন্দ-ভক্ত রামদাসের হাতে বাঁশী ছিল। কৃষ্ণদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামদাসের নিকট কথা-প্রসঙ্গে নিত্যানন্দের প্রতি অমর্যাদা প্রকাশ করেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সম্প্রদায় মধ্যে নিত্যানন্দের বিরুদ্ধ পক্ষের অভাব ছিল না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ইহার আভাস দিয়াছেন—

কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ প্রতি।
মন্দ বলে হেন দেখ সে কেবল স্তুতি॥
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
তবে সে কলহ দেখ সব কুতূহল॥
ইথে একজনের পক্ষ হইয়া যে।
অন্য জনের নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে॥

অন্যত্র—

এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শংকর।
এই পাপে অনেকে যাইবে যম ঘর॥

অপর একটি সম্প্রদায় গৌর-গদাধরের উপাসনা গ্রহণ করেন। সুরসিক ভক্তগণ গোপী-অনুগত ভজনে যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন, এখনো করিয়া থাকেন গৌর-গদাধরের উপাসকগণ সেইভাবেই শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনপ্রণালী প্রবর্তন করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ইঁহাদের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন—

অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥

সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ যেমন শ্রীগৌরাঙ্গকে, কেহ-বা শ্রীনিত্যানন্দকে প্রধান উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনই অপর কতকগুলি বৈষ্ণব শ্রীল অদ্বৈত আচার্যকেই প্রধান উপাস্যরূপে বরণ করেন। ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকটকালেই অদ্বৈতের প্রাধান্য স্থাপনের বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এইরূপ একজন অদ্বৈত-সেবকের নাম আছে কমলাকান্ত বিশ্বাস। ইনি অদ্বৈত আচার্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়া উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপ রুদ্রের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে আচার্যের ঋণ পরিশোধের জন্য তিনশত টাকা সাহায্য প্রার্থনা ছিল। এই অপরাধে শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে 'দ্বার মানা' অর্থাৎ দর্শন করিতে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আচার্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপনে মহাপ্রভু বিরক্ত হন নাই। বিরক্ত হইয়াছিলেন অর্থসাহায্য প্রার্থনায়। পরে আচার্যের অনুরোধে মহাপ্রভু কমলাকান্তের অপরাধ মার্জনা করেন। অচ্যুত ভিন্ন আচার্যের অপর পুত্রগণও পিতৃদেবের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনে অগ্রবর্তী হইয়াছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে ইহার ইঙ্গিত আছে—

অদ্বৈতেরে ভজে গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের তবু তেঁহ গেলা॥

অদ্বৈতপক্ষগণ গদাধরেরও নিন্দা করিতেন।

এবে পাপী সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর নিন্দা করে মরয়ে পুড়িয়া॥

এই বিসম্বাদ যখন চরমে চড়িয়াছিল, তখন অনুগত ভক্তগণের ও শিষ্যগণের নিকট প্রতিপত্তি রক্ষার্থ পুস্তক রচনার প্রয়োজন হইয়াছিল। এইরূপ প্রয়োজনের তাড়নায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সীতাগুণ কদম্ব' অন্যতম। দ্বারভাঙ্গা মিথিলা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত হৃষীকেশ কাব্যব্যাকরণ পুরাণ সাংখ্যতীর্থ বেদান্ত শাস্ত্রী, এম-এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদনপূর্বক বৈষ্ণব-জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। সম্পাদক নদীয়া জেলার মাণিক্য ডিহির অধিবাসী। পুস্তকখানি শ্রীডোমনপ্রসাদ গোস্বামী কর্তৃক মাণিক্য ডিহি হইতেই প্রকাশিত।

ইতিপূর্বে ঈশান নাগর রচিত বলিয়া কথিত 'অদ্বৈত প্রকাশ' প্রকাশিত হইয়াছে। সীতাগুণ কদম্ব বিষ্ণুদাসের রচিত। অদ্বৈত-প্রকাশে বিষ্ণুদাসের কথা আছে, বিষ্ণুদাসও ঈশানের কথা বলিয়াছেন। ঈশান বলিতেছেন, অচ্যুতের পাঁচ বৎসর বয়সে যেদিন হাতেখড়ি হয়, সেই দিন পাঁচ বৎসরের ঈশানকে লইয়া তাঁহার মাতা অদ্বৈত মন্দিরে উপস্থিত হন। অদ্বৈত প্রকাশের মতে অচ্যুত ১৪১৪ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন। আটান্ন বৎসর বয়সে অদ্বৈতের প্রথম পুত্র অচ্যুতের জন্ম হয়। বিষ্ণুদাস বলিতেছেন, আমি আচার্যের বিবাহের ঘটকালি করিয়াছি। ঈশান ও বিষ্ণুদাস আচার্য-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী হইলেও ঈশান অপেক্ষা বিষ্ণুদাস অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে।

বিষ্ণুদাস বলিতেছেন—

কতোদিনে গোসাঞি আইলা গঙ্গাতীরে।
উপস্থিত হৈলা আসি মাধবিন্দ্র ঘরে॥
বিষ্ণুপুরে মাধবিন্দ্র আচার্য আলয়।
বুদ্ধিহীন মূঢ় আমি তাহার তনয়॥

সম্পাদক মহাশয় এই মাধবেন্দ্র আচার্যকে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী বলিয়া সপ্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্বৈত প্রকাশ প্রণেতা ঈশান চতুর্থ অধ্যায়ে বলিতেছেন—অদ্বৈতাচার্য নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া মধ্বাচার্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের অনেক সাধু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শাণ্ডিল্যসূত্র শ্রীনারদসূত্র আদি ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ভক্তি-ব্যাখ্যা শুনিয়া আচার্য মূর্ছিত হইয়া পড়েন। তাহা দেখিয়া মহোপাধ্যায় মাধবেন্দ্র পুরী অদ্বৈতাচার্যকে ভক্তিধর্মের উত্তমাধিকারী বলিয়া চিনিতে পারেন। এইরূপে মধ্বাচার্য স্থানেই মাধবেন্দ্রের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্যের পরিচয় হয়। তখনো আচার্যের বিবাহ হয় নাই। অতঃপর ঈশান পঞ্চম অধ্যায়ে বলিতেছেন—

একদিন পুরীরাজ শ্রীমন্মাধবেন্দ্র।
শান্তিপুরে উদয় হৈলা ভক্তিচন্দ্র॥

মহাভাগবত পুরী গোস্বামী অদ্বৈতের নিকট বিশাখা নির্মিত চিত্রপট দেখিয়া শ্রীরাধিকার চিত্রপট নির্মাণ করিতে উপদেশ দেন। কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহজ উপায় ও রাধাকৃষ্ণ যুগল সেবার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনপূর্বক পুরী গোস্বামী অদ্বৈতকে বলিলেন—

আর এক কথা কহি শুন মন দিয়া।
কৃষ্ণার্থ সংসার কর বিবাহ করিয়া॥

কৃষ্ণ কৃপায় হৈবে তোঁহার বহুত সন্তান।
জীব নিস্তারিবে সঙে দিয়া কৃষ্ণ নাম॥

ইহার বহুদিন পরে নারায়ণপুরের নৃসিংহ চাদুড়ীর কন্যা সীতার সঙ্গে অদ্বৈতের বিবাহ হয়। নৃসিংহের আর একটি কন্যার নাম শ্রী।

সম্পাদক মহাশয় সীতাগুণ কদম্বের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, সীতাগুণ কদম্ব রচয়িতা বিষ্ণুদাস মাধবেন্দ্র পুরীর পুত্র। (২১ পৃঃ) ভূমিকার অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—(৩৬—৩৭ পৃঃ) "পুরী পদবীধারী মাধবেন্দ্রের পক্ষে গার্হস্থ্য জীবন কি সম্ভব? অসম্ভব কিসে? পূর্ব জীবনে তিনি গৃহ পরিগ্রহ করিয়া পরজীবনে সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়াছিলেন।" আমাদের জিজ্ঞাস্য—অদ্বৈত প্রথম কৈশোরে অথবা যৌবনে বিষ্ণুপুরে মাধবেন্দ্র আচার্যের গৃহে আসিয়াছিলেন। এখন এই মাধবেন্দ্র যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম মাধবেন্দ্র থাকিবে কি না? অদ্বৈত তীর্থভ্রমণ কালে ইঁহারই সন্ন্যাস মূর্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন কি না? এই মাধবেন্দ্রই শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে আসিয়া বিবাহের আদেশ দিয়াছিলেন কি না? বিষ্ণুদাস অদ্বৈত আচার্যের তীর্থযাত্রার কোন উল্লেখ করেন নাই, বিষ্ণুপুর হইতে শান্তিপুরে বাস ও সীতার সঙ্গে বিবাহের কথাই বলিয়াছেন। মাধবেন্দ্র যে অদ্বৈতকে পূর্ব হইতে চিনিতেন, মধ্বাচার্যক্ষেত্রে পরিচয়ের সময় ঈশান সেইরূপ কোন কথার ইঙ্গিত মাত্র করেন নাই। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বিষ্ণুদাসের পিতার সঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরীর ঐক্য কল্পনা যে নিতান্তই কষ্ট-কল্পনা, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

ঈশান বলিতেছেন, সীতার পিতা নৃসিংহ ভাদুড়ী, তাঁর নিবাস নারায়ণপুরে। বিষ্ণুদাস বলেন, সীতার পিতা গোবিন্দ, তিনি শান্তিপুরের অধিবাসী। বিষ্ণুদাস বলেন, আমি অদ্বৈতের বিবাহের ঘটকালি করিয়াছি। ঈশান বলেন, বিবাহের 'মধ্যস্থ ঘটক শ্রীমান্ শ্যামদাসাচার্য।' অথচ দুইজনই প্রত্যক্ষদর্শী। সুপণ্ডিত সম্পাদক মহাশয় এই সমস্ত প্রশ্নের কোনরূপ মীমাংসা করেন নাই।

ঈশান দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—'বার বৎসর বয়সে অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে আসেন।' তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—অদ্বৈত একখানি পত্র লিখিয়া লাউড়ে লোক পাঠাইয়া দেন। অদ্বৈতের পত্র পাইয়া তাঁহার পিতামাতা শান্তিপুরে আসেন। পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া তিনি পূর্বাটী গ্রামে শান্ত বিদ্যাবাগীশ দ্বিজবরের বাটীতে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে যান। ঈশানের এই কাহিনীর সঙ্গে বিষ্ণুদাসের পিত্রালয়ে আগমনের কাহিনীর কোন ঐক্য নাই। ঈশান বলিতেছেন—

ক্রমে শ্রীঅচ্যুত পাঁচ বৎসরের হৈলা।
শুভক্ষণে প্রভু তার হাতেখড়ি দিলা॥
যেই দিন শ্রীঅচ্যুত বিদ্যারম্ভ কৈলা।
সেই দিন মোর মাতা শান্তিপুরে আইলা॥
শ্রীঅদ্বৈত পদে আমি লইয়া শরণ।
পঞ্চম বৎসর মোর বয়স তখন॥

(১১শ অধ্যায়)

চৌদ্দশত সাত শতকে শ্রীমহাপ্রভুর জন্ম। ১৪১৪ শকে অচ্যুতের জন্ম, সুতরাং ঈশানেরও জন্ম ১৪১৪ শকাব্দায়। বিষ্ণুদাস বলিতেছেন—ঈশান অদ্বৈত-ভবনে আসিলেন। আচার্য তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। তারপর ঈশান নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র ভবনে আসেন।

শচী কহে কোথা হইতে আইলা কিবা নাম।
ঈশান কহে ঘর মোর শান্তিপুর গ্রাম॥
ঈশান আখ্যান মাতা পিতা বন্ধুহীন।
গৃহ মার্জনাদি কর্মে আমিহ প্রবীণ॥
আজ্ঞা হৈলে দাস হৈআ রহি তোমার ঘরে।
আর যেবা গুণ আইসে কহিএ তোমারে॥
স্ত্রিলোক যৈছে করে বালক পালন।
তাহা মোর আসে ভাল, কৈনু নিবেদন॥
শচী কহে নিমাইর হইয়া দোসর।
জাবৎ কাল সুখে তুমি রহ মোর ঘর॥

ঈশান নিজে বলিতেছেন—'আমি নিমাই অপেক্ষা সাত বৎসরের ছোট'। এখানে বিষ্ণুদাস বলিতেছেন, ঈশান যখন নবদ্বীপে আসিলেন, তখন তিনি গৃহকর্মে প্রবীণ এবং মেয়েদের মত শিশুর লালন-পালন করিতে পারেন। শচী নিশ্চয় তাঁহাকে শিশু নিমাইএর দোসর হইয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সের ঈশান শান্তিপুরে আসিয়া কত বৎসর বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং কত বৎসর বয়সে গৃহকর্মে এবং শিশু-পালনে নৈপুণ্য অর্জন করিয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন? চৌদ্দ-পনের বৎসরের কম বয়স্ক বালকের দীক্ষা ও গৃহকর্মাদিতে দক্ষতা লাভ সম্ভব মনে হয় না। নিমাইএর বয়স তখন একুশ-বাইশ। তাহা হইলে কোন্ শিশু-পালনের ইঙ্গিতে ঈশান কর্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শচী দেবী তো তাঁহাকে নিমাইএর ভার দিয়াছিলেন। এখানে বিষ্ণুদাস না ঈশান নাগর কাহার কথা বিশ্বাস করিব?

বিষ্ণুদাস বলিতেছেন—ঈশান একাদিক্রমে বহুদিন নবদ্বীপে ছিলেন।

শচী বিষ্ণুপ্রিআ জবে অপ্রকট হঞা।
নিত্য স্থানে গেলা দুহে নিত্যদেহ পাঞা॥
তবে পুন শান্তিপুরে ইসান আইলা।
অদ্বৈত পদারবিন্দে দণ্ডবৎ হইলা॥

ঈশান নিজে বলিতেছেন—অদ্বৈতের জ্ঞান-ব্যাখ্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌর বিশ্বম্ভর যেদিন নবদ্বীপে আসেন, সেদিন সীতাদেবী অনেক কিছু রন্ধন করিয়াছিলেন। ঈশান সেদিন শান্তিপুরে—

মুঞি অধম কৈলা তার জলের টহল।
মোর প্রতি মাতা স্নেহ করয়ে অটল॥

(১৪ অঃ)

নিতাই গৌরাঙ্গ কি ঈশানকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে গিয়াছিলেন? মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক পুরীধামে আছেন। রথযাত্রা উৎসবে এক বৎসর অদ্বৈত ও সীতাদেবী পুরী গিয়াছেন। ঈশান বলেন, আমিও পুরী গিয়াছিলাম। একদিন অদ্বৈত ও সীতাদেবী দুঃখ করিতেছেন, গৌরাঙ্গকে একাকী নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে সুযোগ পাই না। সেদিন ভয়ানক মেঘ ঝড় শিলাবৃষ্টি। শ্রীগৌরাঙ্গ একাকী আসিয়া অদ্বৈতের বাসাঘরে উপস্থিত হইলেন। ঈশান বলিতেছেন—আমি কীট, গৌরের পা ধোয়াইতে গেলে তিনি বলিলেন, 'রহ রহ বিপ্র বিষ্ণু তনু।' আমি ভাবিলাম, ব্রাহ্মণ বলিয়া যদি পদসেবা করিতে না পাই, তো পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিই। পৈতা ছিঁড়িলাম বলিয়া মহাপ্রভু উপদেশ দিয়া পুনরায় পৈতা দিলেন ও পাদসেবনের অনুমতি দিলেন। সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর নিকট গ্রন্থি দেওয়া পৈতা ছিল, অথবা তিনি অদ্বৈতের নিকট পৈতা চাহিয়া লইয়া ঈশানকে দিয়াছিলেন, ঈশান সেকথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ঈশান বলিতেছেন—আমি উপদেশ চাহিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন—

শুনহ ঈশান শাস্ত্র যাহা প্রকাশিলা॥
সাধুস্থানে করিবে সদ্ধর্মের শিক্ষন।
সর্বধর্ম শ্রেষ্ঠ হরিনাম সংকীর্তন॥ ইত্যাদি

(১৮ অঃ)

যে ঈশান শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার তিরোধান পর্যন্ত নবদ্বীপে ছিলেন, তিনি হঠাৎ তাঁহাদের জীবদ্দশায় পুরীধামে গেলেন কিরূপে? মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, শচী মাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া শোকে আকুলা। একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য, তাঁহার নামও ঈশান, নবদ্বীপে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তিনি ঈশান নাগর নহেন এবং তিনি কখনো তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া নীলাচলে যান নাই। এক্ষেত্রে অদ্বৈত প্রকাশ ও সীতাগুণ কদম্ব—কোন্ পুস্তকের কথা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিব? অদ্বৈতের যৌবন-সঙ্গী বিষ্ণুদাসের না ঈশান নাগরের?

ঈশান বলিতেছেন—

চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে॥
শ্রীধাম লাউড়ে মুঞি আইনু যে কারণে।
সংক্ষেপে সে গূঢ়তত্ত্ব কহি সাধুস্থানে॥

একদিন প্রভু অদ্বৈতাচার্য আমাকে বলিলেন, আমি শীঘ্রই জীবলোকের অগোচর হইব। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, পুত্র তুল্য। আমার জন্মস্থানে গৌর নাম প্রচার করিও। কিছুদিন পরে প্রভু তিরোহিত হইলেন। সীতাদেবী আমাকে বলিলেন, ঈশান, তুমি বিবাহ করিও। আমি

বলিলাম, সত্তর বৎসর আমার বয়স, কে আর আমাকে কন্যাদান করিবে? তাহাতে সীতাদেবী বলিলেন, জগদানন্দকে সঙ্গে লইয়া পূর্বদেশে যাও। ইনিই তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করিবেন। সীতা মাতার আজ্ঞা ধরিয়া আমি জগদানন্দ সঙ্গে পূর্বদেশে চলিয়া আসিলাম।

বংশ রক্ষা করি প্রভুর আজ্ঞা পালিবারে।
ঝাট চলি আইনু মুঞি শ্রীধাম লাউড়ে॥
ইহা রহি এই গ্রন্থ করিনু লিখন।
গুরু আজ্ঞা মাত্র মুঞি করিনু রক্ষণ॥

বিষ্ণুদাস বলিতেছেন—সীতাদেবী ঈশানকে বলিলেন—

না কর রোদন বাছা স্থির কর মতি।
ঝাটপাল গ্রামে জাঞা করহ বসতি॥

অদ্বৈত প্রকাশে অদ্বৈত বলিলেন, আমার জন্মস্থানে গিয়া গৌর নাম প্রচার কর। সীতাদেবীও প্রকারান্তরে তাহাই বলেন। ঈশান লাউড়ে যান। সীতাগুণ কদম্বে সীতা তাঁহাকে ঝাটপালে যাইতে বলেন। কোন উপায়েই এই দুই বিরুদ্ধ উক্তির মীমাংসা করা যায় না। সীতাগুণ কদম্বের সম্পাদকও ইহার কোন মীমাংসা করেন নাই। বোধ হয় তিনি অদ্বৈত প্রকাশ বইখানি ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই।

(২)

যাঁহারা অদ্বৈত প্রকাশাদি গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, অথবা সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিরত্নাকর নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ইতিহাস গ্রন্থখানিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। কারণ এই গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করিলেই উপরোক্ত গ্রন্থাদির কৃত্রিমতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অদ্বৈত প্রকাশে ঈশান নিজে বলেন নাই যে, তিনি নবদ্বীপ শচী দেবীর গৃহে ছিলেন। বিষ্ণু দাস সংশোধন করিয়া বলিতেছেন, ঈশান শান্তিপুরে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক নবদ্বীপে শচীগৃহে যান, পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার তিরোধানের পর শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে ফিরিয়া আসেন। ভক্তিরত্নাকর বলিতেছেন—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া নবদ্বীপে আসেন তখন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ও খড়দহে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। নরোত্তম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন।

করে কত খেদ প্রভু প্রাঙ্গণে পড়িয়া।
ব্রহ্মচারী স্থির কৈল কত প্রবোধিয়া॥
তথা নরোত্তম প্রভু প্রিয় ঈশানেরে।
করিতে প্রণাম ধৈর্য ধরিতে না পারে॥
শ্রীঈশান নরোত্তমে করি আলিঙ্গন।
অতি স্নেহাবেশে মুখ করে নিরীক্ষণ॥
(ভক্তিরত্নাকর ৫৩৩ পৃঃ)

* * *

প্রভুর ভবনে আসি ঈশান ঠাকুরে।
আজ্ঞা মাগিলেন নীলচল যাইবারে॥
প্রভুপ্রিয় ঈশান ঠাকুর অতি স্নেহে।
ব্যাকুল হইয়া নরোত্তম প্রতি কহে॥
(৮ম তরঙ্গ)

এই ঈশান ঠাকুরই শচী দেবীর গৃহে ছিলেন এবং ইনি ঈশান নাগর নহেন। ইনি কখনো অদ্বৈত গৃহের পরিচারক ছিলেন না। এই ঈশানের সঙ্গে অদ্বৈত প্রকাশের কিম্বা সীতাগুণ কদম্বের কোন সম্বন্ধ নাই। এই ঈশান যে মর্তধাম ত্যাগের দিন পর্যন্ত—শ্রীশচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার তিরোধানের পরও নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মন্দিরেই অবস্থিতি করিতেন, ভক্তিরত্নাকরে তাঁহার সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ঈশান শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের তিরোধানের পরেও শ্রীধাম নবদ্বীপেই বাস করিতেছিলেন। সুতরাং ঝাটপাল ও লাউড় প্রভৃতি স্থানে যে ঈশান বাস করিয়াছিলেন, সেই তথাকথিত ঈশানের সঙ্গে এই নবদ্বীপস্থ ঈশানের কোন সম্বন্ধ নাই।

যে ঈশান বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোধানের পরও নবদ্বীপেই ছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধেই ভক্তিরত্নাকর বলিতেছেন—(১২শ তরঙ্গ)

ওহে বাপু কহিতে কি জানি ক্রিয়া তান্।
নিমাই চান্দের অতি প্রিয় সে ঈশান॥
ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই।
ঈশান বিহনে না যায়েন কোন ঠাঁই॥
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়।
যে আখুটি করে তা ঈশান সমাধয়॥

বিষ্ণুদাস অদ্বৈত প্রকাশের ত্রুটী চূর্ণকাম করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন।

ঈশান নরোত্তমকে শ্রীনিবাস যাহাতে নবদ্বীপ আসেন, তজ্জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গে বর্ণিত আছে যে, শ্রীনিবাসাচার্য রামচন্দ্র ও নরোত্তমকে লইয়া নবদ্বীপে যান এবং ঈশান তাঁহাকে নবদ্বীপ দর্শন করান। এই ঈশানই—

সেবিলেন সর্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দশ লোক মধ্যে মহাভাগ্যবান॥
শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল।
কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাতে দেখিল॥
(চৈঃ ভাগবত)

লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র নামে একখানি গ্রন্থ আছে। তাহার সঙ্গে সীতাগুণ কদম্বের কয়েকটি স্থানের আশ্চর্য ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈত গৃহিণী সীতা দেবী নন্দিনী ও জঙ্গলীকে মন্ত্র দিয়া বলিতেছেন—

সীতা বলে যে বলিলে সেই সত্য হয়।
প্রকৃতি না হৈলে দাসী কেমনেতে হয়॥
(সীতা চরিত্র)

সীতাগুণ কদম্বে আছে—

সীতা কহে যে কহিলা সেহি মিথ্যা নয়।
প্রকৃতি নহিলে দাসি কৈছে হয়॥

এতদ্ভিন্ন শঙ্খ পরিধান, ধাউত আভরণ ধারণ ইত্যাদি বিষয়েও পুরুষ বেশ ছাড়িয়া প্রকৃতি বেশ ধারণ, একজন নবাব বা সুবাদার নন্দিনীকে পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সীতা চরিত্রের ২০ পৃষ্ঠা, ২১ পৃষ্ঠা ও ২৪ পৃষ্ঠার সঙ্গে সীতাগুণ কদম্বের ৮২ পৃঃ, ৮৩ পৃঃ, ৮৪ পৃষ্ঠা ও ৯৮ পৃষ্ঠা মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, একজন আর একজনকে নকল করিয়াছেন। সীতা চরিত্রের লেখককে শ্রীযুত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় ঠাকুর নরোত্তমের গুরু বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কোনরূপ মন্তব্য করা বাহুল্য মাত্র।

আর একটি গুরুতর বিষয়ে সীতাগুণ কদম্বের সঙ্গে সীতাচরিত্রের ঐক্য রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব সংবাদ অবগত হইয়া সীতাদেবী তাঁহাকে দেখিতে যান।

তবে সিতা ঠাকুরাণী আনন্দিত মনে।
প্রত্যক্ষ দেখিল সব ঈশ্বর লক্ষণে॥
অন্তরে চিন্তিয়া দেবী মায়া উপজিল।
শচী জগন্নাথ মিশ্র আদি আচ্ছাদিল॥

* * *

তবে নেত্র মেলি গৌর মন্দহাস্য করি।
নবীন মৃণাল জিনি দ্বিভুজ্জ পাসরি॥
রাধা আইস বলি ডাকে শচীর নন্দন।
শুনি সীতা দেবী কহে সমর্ম্ম বচন॥
(সীতাগুণ কদম্ব)

সীতাচরিত্র প্রণেতা লোকনাথ বলিতেছেন—

তবে সীতা ঠাকুরাণী মায়া আচ্ছাদিল।
অচেতন রূপে শচী দেবীরে রাখিল॥

* * *

তবে হাসি মহাপ্রভু চক্ষু মেলি চায়।
রাধা বলি সীতা পানে শ্রীভুজ বাড়ায়॥

বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় এই তথ্যের গুরুত্ব রহিয়াছে। সীতাগুণ কদম্ব প্রণেতা বিষ্ণু দাস বলিতেছেন, শিশু নিমাই রাধা সম্বোধন করিলে সীতাদেবী বলিলেন, আমি রাধা নই, আমি অদ্বৈত ঘরণী সীতা। এত শুনি শচীনন্দন বলিলেন, আমাকে তুমি কি কারণে ভাণ্ডাইতেছ। তুমি যে রাধা আমি ইহা ভালরূপেই জানি। তোমাকে নিত্য রাধা বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখ্যান করিয়াছে। তুমি সর্বকাল আমার লীলার সহায়। তোমার মহিমা সর্ব পুরাণেই গাহিয়াছে। তুমি পৌর্ণমাসী, তুমি রাধিকার অংশ। তুমি কৃষ্ণের নিকট রাধাকে পঠাইয়া মায়া রাধারূপে আয়ানের ঘরে থাক। তুমি বৃন্দাবনে অপ্রকট যাত্রা দিনে কনকসুন্দরী নামে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে অভিলাষী হইয়া কৃষ্ণকে কটাক্ষ বিক্ষেপে মুগ্ধ কর। শ্রীকৃষ্ণ তোমার সঙ্গে মিলনে আনন্দ পাইয়া তোমাকে নিত্য-রাধা বলিয়া আখ্যান করেন। ইত্যাদি...

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় যোগমায়ার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। আচার্যগণ যোগমায়া তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে নিত্যারাধা বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। একমাত্র বৈষ্ণব সহজিয়াগণই পৌর্ণমাসীকে নিত্যারাধা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য সম্মোহন তন্ত্রে এইরূপ একটি শ্লোক আছে—

যান্নাম্না নাম্নি দুর্গাহং গুণৈর্গুণবতীহ্যহম্।
যদ্বৈভবান্মহালক্ষ্মী রাধা নিত্যা পরাম্বয়া॥

কিন্তু ইহার মধ্যে নিত্যারাধার কোন প্রসঙ্গ নাই।

বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের মতে বৃন্দাবনে বৃষভানু-নন্দিনী প্রেমরাধা, মথুরায় কুব্জা কামরাধা, আর পৌর্ণমাসীই নিত্যারাধা। সহজিয়া, সম্প্রদায়ের অমৃততন্ত্র নামক গ্রন্থে নিত্যারাধার ধ্যান এইরূপ—

পীতবস্ত্র পরীধানাং বংশযুক্ত করাম্বুজাম্।
কৌস্তুভোদ্দীপ্ত হৃদয়াং বনমালা বিভূষিতাম্॥
শ্রীকৃষ্ণ ক্রোড় পর্যাঙ্কনিলয়াং পরমেশ্বরীম্।
সর্বলক্ষ্মীময়ীং দেবীং পরমানন্দ নন্দিতাম্॥
রাসপ্রিয়াং নিত্যরাধাং কৃষ্ণানন্দ স্বরূপিণীম্।
ভজেদ্ যোগমায়াং দেবীং পূর্ণানন্দ মহোদধিম্॥

সহজিয়াগণ বলেন, নিত্যলীলায় যোগমায়ার সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা থাকে না ইনি তখন শ্রীরাধার স্বরূপেই অবস্থিতি করেন। প্রকট লীলায় ইনি রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার সাহায্যকারিণী। বিষ্ণু দাসের সীতাগুণ কদম্বের মধ্যে এই মতের প্রভাব সুস্পষ্ট।

বিষয়টি আর একদিক দিয়াও বিচার করিতে হইবে। কিছু কম প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ শিবানন্দ সেনের পুত্র সুকবি শ্রীল কবিকর্ণপুর মহাশয় 'গৌর-গণোদ্দেশ' রচনা করেন। গৌর-গণোদ্দেশে শ্রীঅদ্বৈত সদাশিবের অবতার এবং তাঁহার পত্নী যোগমায়ারূপে উক্ত হইয়াছেন। গৌর-গণোদ্দেশে লিখিত আছে—

"একদা কার্তিক মাসে দীপযাত্রা মহোৎসবে রাম ও কৃষ্ণের নৃত্য দেখিয়া শঙ্কর নৃত্যাভিলাষী হন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে সদাশিব দুইরূপে হইয়াছিলেন। এক মূর্তি সাক্ষাৎ শিব ও অন্য মূর্তি গোপাল বিগ্রহ। যক্ষেশ্বর কুবেরের প্রার্থনায় শিব তাহার পুত্রত্ব স্বীকার করেন। তিনিই এখন মহাদেব (অদ্বৈতের) জনক কুবের পণ্ডিত। * * * যোগমায়া ভগবতী সম্প্রতি তাঁহার গৃহিণী হইয়াছেন। তিনি সীতারূপে অবতীর্ণা এবং শ্রী তাঁহার প্রকাশ। অথবা শ্রী তাঁহার অপর নাম। মূলে আছে "সীতারূপে নবাত্তীর্ণা শ্রী নাম্না তৎপ্রকাশতঃ॥" নন্দিনী ও জঙ্গলী তাঁহার জয়া বিজয়া সখী।

লক্ষ্য করিবার বিষয় গৌর গণোদ্দেশে কার্তিক মাসে দীপযাত্রা মহোৎসবে শিব-নৃত্যের কথা, 'আর সীতাগুণ কদম্বে (২৮।২৯ পৃঃ) বিষ্ণু দাসের অন্নকূট যাত্রা দিনে যোগমায়ার শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমে অভিলাষ যেন কাকতালীয়বৎ হইয়াছে। দীপান্বিতার পর-দিনেই অন্নকূট মহোৎসব। বিষ্ণু দাসের জীবনকালে অবশ্য তিনি যদি অদ্বৈতের বিবাহের ঘটক হন, গৌর গণোদ্দেশ উল্লিখিত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গৌর গণোদ্দেশ রচিত হইবার পরও সে মত প্রচারিত হইতে কিছুদিন সময় লাগিয়াছিল। সুতরাং সীতাগুণ কদম্ব যে পরবর্তীকালের রচনা, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই জাতীয় গ্রন্থগুলি অত্যন্ত কৌশলী লোকের রচনা হইলেও ইহার মধ্যে এত অসামঞ্জস্য যে, জাল বলিয়া স-প্রমাণ করিতে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। আমি এই প্রবন্ধের পূর্বাংশে অদ্বৈত প্রকাশের সঙ্গে সীতাগুণ কদম্বের গুরুতর অসামঞ্জস্যের কয়েকটি মারাত্মক উদাহরণ দিয়াছি। অদ্বৈতাচার্য, সীতা দেবী, জঙ্গলী ও নন্দিনী প্রভৃতির মাহাত্ম্য খ্যাপন জন্যই এই সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিকাশ তথা ক্রমাবনতির অতি পরিষ্কৃত ঐতিহাসিক উপাদান রহিয়াছে। এই জন্যই এই সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশের একটি বৃহত্তর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অদ্বৈত প্রকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। সীতা চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সীতাগুণ কদম্ব প্রকাশিত হইল। সীতাগুণ কদম্ব প্রকাশে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ কাব্য-পুরাণ সাংখ্য দর্শনতীর্থ বেদান্ত শাস্ত্রী এম এ মহাশয় গ্রন্থ অনুসন্ধানের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অন্তরের প্রগাঢ় নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। গ্রন্থ সম্পাদনে এবং পাঠোদ্ধারেও তাঁহাকে অশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহাকে অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গৌর গণোদ্দেশ রচনার পর অদ্বৈতের সদাশিব তত্ত্ব কেমন প্রচারিত হইয়াছিল; তাহার আর একটি উদাহরণ দিতেছি।

শ্রীখণ্ডের কবিরাজ গোবিন্দদাস প্রথমে শাক্ত ছিলেন। ইঁহার প্রথম জীবনে দাসখণ্ড কবিতায় "সখা যার শৈলজাপতি", 'চন্দ্রচূড় গতি' ইত্যাদি ভণিতার পাঠ পাওয়া গিয়াছে। প্রেমবিলাসের গোবিন্দদাস রচিত একটি পদের দুই চরণ পাওয়া গিয়াছিল।

"ন দেব কামুক না দেবী কামিনী
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরী শঙ্কর চরণে কিঙ্কর
ভনয়ে গোবিন্দদাস॥"

এই পদটি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে শ্রীখণ্ডের গোবিন্দ-পরবর্তী বৃন্দাবন দাসের "রস-নির্যাস" নামক পদসংগ্রহ গ্রন্থে। গোবিন্দ কবিরাজ এই পদে হরগৌরীর মিলন বা অর্ধনারীশ্বর রূপের বর্ণনা করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস তাঁহাকে অদ্বৈত-বর্ণনায় চালাইয়া দিয়াছেন। ক্ষণদাগীত চিন্তামণিতে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পূর্বরাগাদি রসের ভাবানুরূপ শ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দবন্দনাবিষয়ক পদ বর্ণনা করিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুর ও বৈষ্ণব দাস প্রভৃতি মাত্র গৌরাঙ্গবিষয়ক গৌরচন্দ্র বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস পূর্বরাগের "গৌরচন্দ্রে" শ্রীমহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত —তিনজনের পদই দিয়াছেন। অদ্বৈতের বর্ণনায় তিনি এই পদের সংকলন করিয়াছেন—

হেম হিমগিরি দুই তনু ছিরি
আধ নর আধ নারী।
আধেক জর্জর আধ কাজর
তিনই লোচনধারি॥
দেখ দেখ দুঁহু মিলিত এক সাত।
ভকত পূজিত ভুবন বন্দিত
ভুবন মাতরি তাত॥
আধ ফণিময় আধ মণিময়
হৃদয় উজর হার।
আধ বাঘাম্বর আধ পট্টাম্বর
পিঁধন দুঁহু উজিয়ার॥
ন দেবী কামিনী না দেব কামুক
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরী শঙ্কর চরণে কিঙ্কর
কহই গোবিন্দ দাস॥

কিছু কম চারিশত বৎসর পূর্বে গৌর-গণোদ্দেশ রচিত হইয়াছিল। সুতরাং সীতাগুণ কদম্ব যদি আড়াইশত এমন কি তিনশত বৎসর পূর্বেও রচিত হইয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। গৌর গণোদ্দেশের সঙ্গে মিল রাখিয়া এবং সহজিয়াগণের মতবাদ গ্রহণ-পূর্বক তাহার সঙ্গে নিগূঢ় সমন্বয় সাধন করিয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। অদ্বৈত পার্ষদ বিষ্ণুদাস যদি মাণিক্যডিহির গোস্বামী-গণের পূর্বপুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে এ গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এ গ্রন্থে চৈতন্য মঙ্গলের সুস্পষ্ট অনুকরণ রহিয়াছে। লোচন দাস এই, অখ্যাতনামা ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছেন. এ মত অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়। সুপণ্ডিত সম্পাদক সীতাগুণ কদম্বে কয়েকস্থানে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রভাব দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—'নৈহাটী ঝামটপুর মাণিক্যডিহির অতি নিকট।' কিন্তু কবিরাজ কৃষ্ণদাস কিশোর বয়সে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তখন হইতে তিনি সীতাগুণ কদম্বের কথা মনে রাখিয়াছিলেন। অথবা বিষ্ণুদাস বৃন্দাবন গেলে সেই সময় বিষ্ণুদাসের নিকট হইতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা লইয়া সুবিখ্যাত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাহার ভাব বা আক্ষরিক অংশ নকল করিয়াছিলেন, এ কথা

যে কত অসম্ভব, তাহা সুপণ্ডিত সম্পাদকের সরল বিশ্বাসে উদিত হয় নাই। লোচনের ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের নকল দেখিয়া এই বইখানাকেই পরবর্তী সাব্যস্ত করাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ছিল।

পুস্তকখানিতে পাঠোদ্ধারেরও কিছু ত্রুটি আছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত—৩৪ পৃষ্ঠা "আনাইয়া চিবুক ভার" পাঠ হইবে—আলাইয়া চিকুর ভার।

৩৬ পৃঃ "বাছা" পাঠ হইবে "বাঞ্ছা"
৫৩ পৃঃ "হানে" পাঠ হইবে "হালে"
৬৩ পৃঃ "সাচিবেনে" পাঠ হইবে "শচীমেনে"
৭৫ পৃঃ "অপ্রাত" পাঠ হইবে "অপ্রাকৃত"
৭৫ পৃঃ "চন্দ্রাবতী" ,, "চন্দ্রকান্ত"

১০৭ পৃষ্ঠায়—যো পহু গুজ ভুবন রস উল্বসিত প্রকৃত পাঠ হইবে—যো পঁহু গুণে ভুবন রস উলসিত। এইরূপ কয়েকটি ত্রুটি আরো আছে।

স্নানযাত্রা

পৃথিবীর কোনো দেশের লোক বোধহয় আমাদের মতো স্নানপ্রিয় নয়। কি ধর্মানুষ্ঠান, কি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও আনন্দোৎসব—স্নান আমাদের সমাজ-জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই একটি অঙ্গবিশেষ। কাজেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবনযাত্রাকে বিরাট



একটি স্নানযাত্রার সঙ্গে তুলনা করলে অত্যুক্তি করা হবে না। দৈনন্দিন জীবনেও একদিন সুষ্ঠুভাবে স্নান করতে না পারলে সেদিন আমাদের মন অতৃপ্তিতে ভরে থাকে। স্নানের আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে 'রেণু' সাবান মেখে স্নান করে দেখবেন। 'রেণু'-র সুগন্ধি ফেনরাশি শরীর স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করে স্নানের প্রকৃত প্রশান্তি ফুটিয়ে তোলে মনে। এত গুণের তুলনায় দামেও 'রেণু' সুলভ।



SRK 5

সোল সেলিং এজেন্টস :—হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল কর্পোরেশন লিঃ সুটনং ৫২, হিন্দুস্থান বিল্ডিং, ৬এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিঃ।



শ্রীবিমল মিত্র

[তেইশ]

দেখতে দেখতে বছর কেটে যায়। যুদ্ধ কোথায় সুরু হয়ে কোথায় এসে কোন্ দিকে মোড় ঘুরেছে বোঝা শক্ত। অনেক বোমা, অনেক এরোপ্লেন আর অনেক বারুদ নষ্ট হয়েছে, কিন্তু তবু যেন শান্তি আসবে না পৃথিবীতে। তক্তপোষের ওপর শুয়ে শুয়ে সদানন্দবাবু ভাবেন, একটা হিংসার প্রতিরোধ করতে দশটা হিংসা করতে হয়। হিটলারকে মারতে হলে কি হিটলারের চেয়েও মারাত্মক হতে হবে মানুষকে? ভেবে ভেবে সদানন্দবাবু কুল-কিনারা পান না কোনও। হিটলারের বোমার চেয়ে আরো মারাত্মক বোমাই কি হিটলারের পতন ঘটাতে পারবে। তাই যদি হয়, তা' হলে এখন একটা হিটলার আছে আর তখন যে হাজারটা হিটলার জন্মাবে।

দত্ত মশাই এলেন সকালবেলা।

সদানন্দবাবু তখন শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন। দত্ত মশাইকে দেখে সদানন্দবাবু যেন কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন। বললেন—আসুন দত্ত-মশাই—আসুন—

দত্তমশাই বসলেন। বললেন—কেমন আছেন আজ, বলুন—

আজ দু'মাস ভাড়া দেওয়া হয়নি। আজকেই আসতে বলেছিলেন দত্তমশাইকে। কিন্তু টাকা তো জোগাড় হয়নি! কি বলে আজ দত্তমশাইকে ফেরাবেন, ভেবে পেলেন না। একদিন দত্ত-মশাই বাড়ির ভাড়া নিতেই রাজী হন্নি। তখন কলকাতা ফাঁকা হয়ে গেছে। বাড়ি দেখাশোনা করবারই লোক পাওয়া যায় না। আজকাল শহরে লোক ধরে না। এখন টাকা দিলেও খালি বাড়ি পাওয়া যায় না। দত্তমশাই মাসের পয়লা এসেই আজকাল তাগাদা দিতে সুরু করেছেন।

দত্তমশাই আবার বললেন—শরীরটা কেমন আপনার মাস্টার মশাই—

সদানন্দবাবু বললেন—ভাল থাকলে কি আর বিছানায় শুয়ে থাকি? সেবার পা ভেঙে গিয়ে ক'মাস বিছানায় পড়ে রইলাম তরপরে আর সারতে পারিনি। বেশী পরিশ্রম করলেই মাথাটা ঘোরে। বুকটা কেমন হাঁপিয়ে ওঠে। সুরুচি আমায় বিছানা থেকে উঠতে দেয় না, তাই বাড়ির ভেতরে থেকেই যেটুকু পারি, করি—

সদানন্দবাবুর স্বাস্থ্যের অবস্থা জানবার জন্যে দত্তমশাই-এর তেমন আগ্রহ নয়। শেষ পর্যন্ত কথাটা তাঁকে তুলতেই হলো। বললেন—আজকে আমার আসার কথা ছিল মাস্টার মশাই, বাকি ভাড়াটা—

ব্যস্ত হয়ে সদানন্দবাবু বললেন—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—

তারপর ডাকলেন—রুচি ও রুচি—

ভেতরে রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিল সুরুচি। সাড়ে নটায় অফিস, তার আগে খোকাকে স্নান করিয়ে খাইয়ে, বাবার কাছে রেখে যেতে হয়। তারপর বাসে ট্রামে আজকাল যা' ভীড়! অনেক খানি সময় হাতে না থাকলে ঠিক সময়ে অফিসে গিয়ে পৌঁছুনো যায় না।

দু'হাতের হলুদের দাগ মুছতে মুছতে এসে সুরুচি এ ঘরে ঢুকলো। দত্তমশাইকে দেখেই ব্যাপারটা বুঝে বললে—আপনি একটু দাঁড়ান, আমি টাকা আনছি—

খানিক পরেই ফিরে এসে সুরুচি গুণে গুণে পাঁচখানা নোট দত্তমশাই-এর হাতে দিয়ে বললে—বাবার অসুখের জন্যে গত মাসে দিতে পারিনি এবার থেকে মাসে মাসে পাবেন—

দত্তমশাই চেতলার হাটে বঁড়শী, তালাচাবি, ছিপ্ বিক্রী করে সম্পত্তি করেছেন। সুতরাং পয়সা কেমন করে আদায় করত হয় জানেন। বললেন—তাতে কি হয়েছে মালক্ষ্মী? বিপদ-আপদ মানুষের আছেই—কিন্তু আমার তো বাড়ি ভাড়ার ওপর নির্ভর করে সংসার চালাতে হয়—

সুরুচি চলে' আসছিল। তার অত কথা শুনতে গেলে ওদিকে অফিসে লেট হয়ে যাবে। কিন্তু দত্তমশাই ডেকে থামালেন। বললেন—একটা কথা মা লক্ষ্মী, আসছে মাস থেকে পাঁচটি টাকা ভাড়া বাড়াতে হবে—নইলে আর পারিনে—বৃহৎ সংসার—চালের দাম পঁয়তাল্লিশ টাকা মণ—

সুরুচির হঠাৎ কিছু মুখে কথা যোগালো না।

সদানন্দবাবু বললেন, বলেন কি, আরও পাঁচ টাকা বেশী দিতে হবে?

দত্তমশাই বললেন,—মাস্টার মশাই, আপনার কাছে আমি মিথ্যে বলবো না—গাদা গাদা লোক আসছে আমার কাছে বাড়ির জন্যে—আপনার এই পঁচিশ টাকার বাড়িই পঞ্চাশ টাকা বললে লুফে নেবে সবাই—নেহাৎ ঠিক মালিক-ভাড়াটে সম্পর্ক নয় আপনার সঙ্গে তাই...

সদানন্দবাবু অবাক হয়ে গেলেন। কী করা যায় এখন! সুরুচির চাকরীর ওপরেই ভরসা। ষাট টাকার চাকরী তার। তার মধ্যে বাড়ি ভাড়ার জন্যে তিরিশ টাকা দিলে থাকবে কি!

সুরুচি আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলে না। এখনও অনেক কাজ বাকি। চট করে রান্নার কাজটা সেরে ফেলেই খোকার স্নান আর কাপড়-গুলো সাবানকাচা করে নিতে হবে।

অল্প অল্প কথা ফুটেছে খোকার। বলে—মাম্মা—মাম্মা—

অমূল্যবালা বেড়াতে এসেছিল রবিবার। দেখে অবাক হয়ে গেল। বলে—ওমা, তোমাকেই যে মা বলে' ডাকছে—আহা, মা কেমন জিনিষ দেখতে পেলে না—

মানদা এসে সেদিন যা'হোক দুকথা শুনিয়ে দিয়ে গেল। বললে—বলিহারী আক্কেল বটে তোমার পিসীর, তোমার ঘাড়ে ওইটুকু ছেলের ভার দিয়ে কাশী গিয়ে ধম্মে কম্মে মন বসবে কেমন করে' কে জানে মা—

কেউ কেউ বলে—ধন্যি মেয়ে পেটে ধরেছিল বটে তোমার মা—এক হাতে কোলের ভাইকে মানুষ করা, এক হাতে বুড়ো অথর্ব বাপকে সেবা করা, আবার আর এক হাতে অফিসে গিয়ে টাকা রোজগার করা—

আজকাল চেতলার বহু মেয়ে অফিসে চাকরী করে। কাঠের পুল পার হয়ে সোজা রাসবিহারী এভিনিউর মোড়ে গিয়ে বাস ট্রাম ধরা। কিন্তু খোকাকে বাবার কাছে একলা রেখে মনে শান্তি থাকে না সুরুচির।

আশে পাশের বাড়ির লোকজনকে বলে যায় সুরুচি—আপনাদের ভরসায় খোকাকে আর

খোকাকে রেখে যাই—যদি দরকার-টরকার হয় একটু দেখবেন—

জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে আর কিছু দেখবার সময় থাকে না। খোকার মুখে লম্বা করে একটা চুমু খেয়ে বেরিয়ে পড়ে সুরুচি। রাস্তার ভিখিরীর সংখ্যা বড় বেড়েছে। অফিস যাবার পথে চারিদিক থেকে ছেঁকে দাঁড়ায়।

প্রথম বাসটায় ওঠা যায় না। কয়েকটা বাস ছাড়তে হয়। শেষে যেটাতে ওঠা গেল, তাতে লেডিজ সিটেও জায়গা নেই। দাঁড়িয়েই সব দিন অফিসে যেতে হয়।

অফিসে গিয়ে যখন পেঁছুল তখন সারা শরীর ঘেমে গেছে। নিজের সিটে যেতেই চাপরাশী বললে—একটু আগেই আপনার টেলিফোন এসেছিল—

টেলিফোন! নিশ্চয়ই শ্রীলতার টেলিফোন। শ্রীলতা জীবনে সুখী হয়নি। তার স্বপ্নের য়্যাডোনিস্, তার কল্পনার য়্যাডোনিস্ বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছে। সেখানে সেদিনকার য়্যাডোনিসের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। য়্যাডোনিস রাত্রে এক একদিন বাড়ি আসে না, য়্যাডোনিস মদ খায়, য়্যাডোনিস জুয়া খেলে। শ্রীলতার গার্হের অর্ধেক গয়না কেড়ে নিয়েছে সে। কয়েকদিন দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ ছিল। সুরুচির বেশী সময় হাতে নেই। তবু এক একদিন অফিস ফেরতা শ্রীলতার বাড়ি যায়। দু'চার মিনিট বসে গল্প করে চা খায়।

শ্রীলতা কাঁদে। তার ভাগ্যের জন্যে নয়, তার স্বপ্নভঙ্গের জন্যে। তার যে অনেক সাধ ছিল। ছোটবেলা থেকে ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ সে। তবু য়্যাডোনিসের সঙ্গে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল বৌবাজারের এক গলিতে। ভাঙাঘরের দারিদ্র্যের মধ্যে ভেবেছিল সে স্বর্গ রচনা করবে কিন্তু সে ভুল ভাঙতে তার দু'দিনও লাগল না! সেদিন সুরুচি গিয়ে দেখেছে ঘরে চাল নেই। শুধু আলু সিদ্ধ আর চা খেয়ে তার দিন কাটছে।

টেলিফোন থাকে সেক্রেটারীর টেবিলে।

সুরুচি টেলিফোন তুলে নম্বর বললে।

খানিক পরে উত্তর এল। সুরুচি বললে—দেখুন, আপনার পাশের বাড়ীর একতলার শ্রীলতাকে একবার ডেকে দেবেন?......আমি তার বন্ধু সুরুচি কথা বলছি......

ওপার থেকে উত্তর এল—আপনি সুরুচি দেবী—একটু আগেই আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম—আপনি এখনি চলে' আসুন—ভীষণ বিপদ—

কীসের বিপদ?—সুরুচি অবাক হ'য়ে গেছে যেন। শ্রীলতার আবার কি বিপদ হলো নতুন করে'!

ওপার থেকে উত্তর এল—আপনার বন্ধু...... আপনার বন্ধু আত্মহত্যা করেছেন......

—কী বললেন?

বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন আপনার বন্ধু, শিগ্গীর চলে' আসুন—

মাথার ওপর যেন সজোরে বজ্রাঘাত হয়েছে সুরুচির। টেলিফোনের রিসিভারটা হাত থেকে নামাতে ভুলে গেল। যখন সচেতন হ'য়ে পেছন ফিরে চাইলে সুরুচি দেখলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর দাঁড়িয়ে আছেন তা'কেই লক্ষ্য করে।'

চোখে চোখ পড়তেই বাসু সাহেব বললেন—এখুনি আমার ঘরে একবার দেখা করবেন—

বলে' বাসু সাহেব নিজের কামরায় চলে' গেলেন। সুরুচি বুঝতে পারলে না কী জন্য তা'র এই ডাক! তবু ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে ভাল লাগে না তা'র! কতদিন অফিস থেকে বেরুবার মুখে গাড়ীতে তুলে নিয়েছেন, তারপর সোজা রাস্তায় নিয়ে যাবার বদলে নিয়ে গেছেন কোনও জনবিরল হোটেলে।

আজ টেলিফোনটা পাবার পর থেকেই মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। বাসু সাহেবের ঘরে যেতেই বাসু সাহেব বললেন—অফিসের টেলিফোন ফ্রি নয় এটা বোধহয় আপনার জানা আছে—তবে কোম্পানী তার জন্য মাসে মাসে বিল্ও পাঠায়, আর আমরা টাকা নিয়েও থাকি, কিন্তু প্রাইভেট কল্......

সুরুচি বুঝলো আজকের এই অপমানটা অকারণ নয়। সেদিনের গাড়িতে করে' বাসু সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে না-যাওয়া এবং আরও অনেকদিনের অর্থপূর্ণ আচরণের প্রতিঘাত এটা!

সুরুচি বললে—বিপদ আপদ হ'লে টেলিফোন করেই থাকে সবাই—এ-অফিসের প্র্যাক্টিসও তাই—আপনিও করেন পারসোন্যাল কল্—

বাসু সাহেব পাইপ বেঁকিয়ে ধরলেন। কটাক্ষপাত করে' বললেন—আমার সঙ্গে তুলনা করবেন না—অফিসের ডিসিপ্লিন বলে' একটা পদার্থ আছে—

সুরুচি বললে—আজ যদি অফিসের একটা দরোয়ানের কলেরা হয়, এবং খবর পেয়েও যদি টেলিফোনে হাসপাতালে খবর না দিই—তা' হলে আপনার ডিসিপ্লিনের গর্ব থাকবে? কিম্বা ধরুন যদি আগুন লাগে দু'শ গজ দূরে—

বাসু সাহেব পাইপটা এমনভাবে ধরে আছেন যেন গোখ্রো সাপ নিয়ে খেলাচ্ছেন। বললেন—তর্ক করবেন না—সিটে যান—

—সিট-এ আর যেতে চাইনে—বলে' সুরুচি পার্স খুলে চার আনা পয়সা টেবলের সামনে রেখে দিয়ে বললে—রইল আপনার টেলিফোনের দাম, আমার আর সময় নেই—আমি চললুম—

বাসু সাহেব একবার ব্যস্তভাবে ডাকলেন—শুনুন, শুনুন—

—শোনবার সময় আমার নেই—বলতে বলতে সুরুচি সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাস্তায় এসে পড়ল। বহুদিন থেকে ছাড়বে ছাড়বে করছিল সে কিন্তু আজ এ' ভালোই হ'লো! এ-অফিসটা ভাল নয়। বাসু সাহেব লোকটা প্রথম তাকে দেখেই চাকরী দিয়েছিল একরকম। প্রথম প্রথম অত্যন্ত ভালো ব্যবহারই করতো। প্রথম থেকেই নজরটা তা'রই ওপর পড়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই বোঝা গেল এখানে চাকরীতে উন্নতি করতে চাইলে কিম্বা চাকরী স্থায়ী করতে চাইলে আর একটা জিনিষের প্রয়োজন যেটা সুরুচির পক্ষে অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে সুরুচির মনে পড়লো চালের মণ পঁয়তাল্লিশ টাকা—এক এক সময়ে পয়সা দিয়েও পাওয়া মুস্কিল। দত্ত মশাই মাসের পয়লা তারিখেই আসবে আবার। বাড়ী ভাড়া আরো পাঁচ টাকা বাড়িয়েও দেবে হয়ত! তা' হোক্—শেষ পর্যন্ত সে সংগ্রাম করবে। একদিন সফল সে হবেই! নইলে বৃথাই সে লেখা-পড়া শিখেছে! মা'র গয়নাগুলো একে একে সবই হয়ত বন্ধক দিতে হবে! সামান্য ক'খানাই আছে! তবু বুবাকে সে বিশ্রাম করতে দেবে। খোকাও একদিন মানুষ হবে তা'র!

ধর্মতলার মোড়ে চলতি বাসে উঠতে গিয়ে হয়ত পড়েই যেত। কিন্তু কোনরকমে সামলে নিয়েছে। লেডিস্ সিট ভর্তি। পুরুষেরা কেউ উঠে দাঁড়াবে তাও সুরুচি চায় না। আশে পাশের পুরুষদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই চলতে হচ্ছে। বাসের ঝাঁকুনীতে ব্যালেন্স ঠিক থাকবার কথা নয়। তবু তাতে এমন কিছু জাত যাবে না সুরুচির।

শ্রীলতার কথা ভাবতে লাগলো সুরুচি। কেন সে এমন করলে! বড় সেণ্টিমেণ্টাল ছিল ও বরাবর। বড় বেশী আশা করতো ও তাই বড় বেশী ঠকলো। সুরুচি এতদিনে বুঝেছে, এ-পৃথিবীতে কান্নার কোন মূল্য নেই! যে কাঁদে সেই হারে! কান্না দিয়ে, আত্মহত্যা দিয়ে কি আর জয় করা হয়! জয় করতে হলে চাই দুঃখ সহ্য করবার শক্তি। তোমাকে কে মনে রাখে বলো যদি তুমি মনে রাখাতে না পারো? আর কাঁদতেই যদি হয় তবে আড়ালে কাঁদো, তোমার কান্না দেখলে লোকে হাসবে যে!

বৌবাজারের মোড়ে এসে বাস থেকে নেমে পড়লো সুরুচি। কিন্তু শ্রীলতার বাড়ীর সামনে গিয়ে দেখলে ভীষণ ভীড় জমে' গেছে এরি মধ্যে! পুলিশও এসে গেছে। এখানে শ্রীলতাকে সে কেমন করেই বা দেখবে! এলই বা সে কেন এখানে—যে মারা গেছে, সারা জীবনে যা'র সঙ্গে আর দেখা হবে না তাকে নিয়ে তার কী প্রয়োজন।

সকাল সকাল বাড়ি ফেরাতে সদানন্দবাবু আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন। বললেন—আজ যে এত

সকাল, সকাল এলি রুচি,—শরীর খারাপ হ'লো না তো—

সুরুচি খোকাকে চুমু দিয়ে বললে—না, ছুটি নিয়ে এলুম—

অফিসে যাবার নাম করে' প্রত্যেক দিন বাড়ী থেকে বেরুতে হয়, কিন্তু অফিসে যায় না সুরুচি। এখানে সেখানে ঘুরে চাকরী একটা শীঘ্র জোগাড় করতেই হবে। কয়েক জায়গায় দরখাস্ত করে' দিয়েছে।

বহুদিন পরে প্রীতির সঙ্গে দেখা।

প্রীতি বললে—হ্যাঁ রে, শ্রীলতা নাকি সুইসাইড্ করেছে—

তারপর এ-কথা সে-কথার পর বললে—শুনলাম তুই চাকরী ছেড়ে দিয়েছিস্—এখন করছিস্ কি?

সুরুচি বললে—একটা চাকরী জোগাড় করে দিতে পারিস—তোদের অফিসে এখনও রিক্রুট হচ্ছে?

প্রীতি বললে—চাকরীর তো এখন ছড়াছড়ি,কিন্তু তুই চাকরী করিস্ কোন্ দুঃখে সুরুচি, বিয়ে করে' ফেল না—তোর মত চেহারা পেলে কি ষাট টাকার চাকরী করতাম—সত্যি ভাই বিয়ে করা এর চেয়ে ঢের আরামের—

বেশী সময় ছিল না। প্রীতির অফিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় বললে—নিস একখানা অ্যাপ্লিকেশন লিখে আমার হাতে—আর একটা নতুন অফিস হচ্ছে কলকাতায়, সেখানেও মেয়ে নেবে—এক কাজ করতে পারিস—স্টেনোগ্রাফিটা শিখে নে না, ওটা শিখলে খুব ব্রাইট ফিউচার—

প্রীতি চলে গেল। সুরুচি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভাবতে লাগলো। মা'র যে ক'টা গয়না ছিল একে একে সব তো প্রায় খরচ হ'য়ে এল! নতুন করে' যদি আবার শর্টহ্যান্ড শিখতে হয় তা' হ'লে আরো টাকা খরচ। কিন্তু দুপুরবেলা যদি একটা চাকরী থাকতো তা' হ'লে বেশ হতো। সারাদিন চাকরী করার পর একঘণ্টা শর্টহ্যান্ড ক্লাশ, কয়েক মাস কষ্টই না হয় করা গেল।

মাস শেষ হয়ে আসছে। ও-মাসের পয়লাই আবার দত্ত মশাই বাড়ী ভাড়ার তাগাদায় আসবে। চাল পাওয়া ক্রমেই দুর্ঘট হ'য়ে উঠছে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভিখিরীর দল বাড়ীর সামনে চীৎকার করে—ভাত চাইনে মা, শুধু ফ্যান দাও একটুখানি—

সদানন্দবাবুর এক এক-সময় আর সহ্য হয় না। বাড়ীতে সুরুচি নেই, অফিসে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এসে বলেন—কোন্ জেলায় বাড়ী তোমাদের বাছা—

একজন হাড়-লিক্লিকে ঘোমটা দেওয়া মূর্তি এগিয়ে এসে বলে—বাবা আমরা কিছু খেতে চাইনে, এই আমার শাশুড়ীকে আপনারা বলে' ক'য়ে কিছু খাওয়ান—

শাশুড়ী বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে পুরো একটা সংসার একেবারে সহরে চলে' এসেছে। গ্রামে ভাত নেই। সদানন্দবাবু দেখলেন বুড়ী আধমরা শাশুড়ীর একটা হাত ধরে' পুত্রবধু ভিক্ষে চাইছে।

বউটি বলে—আমরা দু'মুঠো এদিক-ওদিক থেকে পাচ্ছি খাচ্ছি, কিন্তু শাশুড়ীকে খাওয়াতে পারছিনে বাবা,......তিন দিন ধরে' কিছু খায়নি—

সদানন্দবাবু জিগ্যেস করলেন—খায়না কেন তোমার শাশুড়ী? হয়েছে কী?

—শাশুড়ী বলে চোখের সামনে জলজ্যান্ত ছেলে না খেতে পেয়ে মরে' গেল—আর আমি কিনা খেয়ে বেঁচে থাকবো—

ছেলেদের পেটগুলো ফোলা, চোখ বসা। সরু পা দু'টোর ওপর মস্ত দেহটা কেমন খাপছাড়া লাগে। বেশীক্ষণ দেখতে পারেন না সদানন্দবাবু। চোখ দু'টো দু'হাতে বন্ধ করে ঘরে চলে' আসেন। সহ্য হয় না। কিন্তু কোথায় যে প্রতিকার তা-ও ভেবে ঠিক করতে পারেন না।

সেদিন রবিবার। সদানন্দবাবু সুরুচিকে বললেন—আজ একটু বেশী করে' ভাত রাঁধতে পারিস রুচি—এই দু'তিন জনের মত—ওদের দেখলে বড় কষ্ট হয়—

ভাত সেদিন বেশী করেই রাঁধলে সুরুচি। কিন্তু পরের দিন ভীড় আরো বাড়লো।

সুরুচি বললে—নিজেদেরই আর কুলোবে না বাবা—যা' চাল ছিল ভাঁড়ারে সব তো শেষ হ'য়ে এল—

সুরুচির একটা ছুটির দিন দেখে সদানন্দবাবু বেরুলেন। চালের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। এতটুকু হাঁটতে বড় বেশী কষ্ট হয়। রাস্তায় চেতলার বাজারে লম্বা লাইন লাগিয়েছে চালের। এরা কাল থেকে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে। এরপর টিকিট বিলি হবে। টিকিট যারা পাবে, তারাই পাবে চাল। এখানে দাঁড়িয়ে চাল নেওয়া কি সম্ভব!

হাজরা রোডে ভোলানাথের দোকান। একদিন ভোলানাথই ডেকে খাতির করে' দোকানে বসিয়েছিল সদানন্দবাবুকে। আজ আবার ভোলানাথের দোকানে গেলেন। ভোলানাথ সদানন্দবাবুর উপকার ভুলতে পারবে না। তার যখন চাকরী যায় তখন সদানন্দবাবুই বাড়ীতে বসে' খাইয়েছেন। মৃন্ময়ী ভোলানাথের কার্বাঙ্কল হওয়ার সময় নিজে হাতে তা'র সেবা করেছেন। সাবান দিয়ে কাপড় কেচে দিয়েছেন।

ভোলানাথের দোকানেও বেশী ভীড়।

সদানন্দবাবুকে দেখে ভোলানাথ অনেক ভীড় ঠেলে এগিয়ে এল। বললে—আসুন সদানন্দবাবু—আসুন—সদানন্দবাবু হাতে স্বর্গ পেলেন। বললেন—তুমি বলেছিলে তোমার দোকান থেকে চাল নিতে, তাই এলুম—

সদানন্দবাবু দেখলেন এরি মধ্যে ভোলানাথের যেন চেহারা বদলে গেছে। কয়েকটা ভদ্রলোককে নিয়ে ভোলানাথ কথাবার্তা কইতে লাগলো। অনেকক্ষণ বসে' রইলেন সদানন্দবাবু। কথা আর শেষ হয় না ভোলানাথের।

সকলের সঙ্গে কথা শেষ করে' সকলকে বিদায় দিয়ে ভোলানাথ সদানন্দবাবুর কাছে এল। বললে—ক'মণ চাই আপনার? বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবো খন্—

কথা বেরুল না সদানন্দবাবুর মুখ দিয়ে। এতখানি আশা করেন নি সত্যি সত্যি!

বললেন—বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে তুমি—কত করে' মণ নেবে?

—বাজার দরের চেয়ে কম দেবেন কিছু—

সন্ধ্যেবেলা মুটের মাথায় চা'ল পাঠিয়ে দিলে ভোলানাথ। সঙ্গে সঙ্গে বিল পাঠিয়েছে। আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে বিলটা দেখে সুরুচি চমকে উঠলো—পঁচানব্বই টাকা চালের দাম আর মুটে ভাড়া আট আনা!

সদানন্দবাবু বললেন—ভোলানাথ ঠকাবে না, ও বাজার দরের চেয়ে কম নেবেই—

সুরুচি মুটেকে বলে' দিলে—তুমি যাও, বাবুর কাছে কাল আমরা টাকা পাঠিয়ে দেব—

মৃন্ময়ীর আর একখানা গয়না কালই বাঁধা রেখে টাকা আনতে হবে।

রাত্রে ঘুমোবার আগে খোকাকে পাশে শুইয়ে সুরুচি নিজের আনুপূর্বিক জীবনটা ভাববার চেষ্টা করে। শুধু ক্ষতির অঙ্কটাই স্ফীত হ'য়ে চারিদিক থেকে গ্রাস করতে চাইছে তাকে! প্রতি পদক্ষেপ তা'র কাছে দিন দিন দুরূহ হ'য়ে উঠছে। মা'র স্নেহনিবিড় পক্ষপুটে ছোটবেলার বিগত দিনগুলো এখন স্মৃতির পর্দায় ধূসর। ঘুমের ঘোরে খোকা হেসে ওঠে! রাত্রে দু'একবার খোকাকে ঘুম ভাঙিয়ে ওঠাতে হয়। সারা রাত তরল ঘুমের সমুদ্রে সুরুচি দোল খায়। তারপর সকালে যখন ওঠে তখন অল্প অল্প অন্ধকার! আগে রাত থাকতে মা উঠতো সংসারের কাজ করতে। পিসীমা ছিল। তখন সুরুচি বেলা করে' উঠেছে ঘুম থেকে। চা খেয়েছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। তখন অর্থ উপার্জনের চিন্তা করতে হোত না। কোথা থেকে টাকা আসে, কোথা থেকে রান্না খাওয়া চলে কিছু খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি!

সকাল বেলা উঠেই একটার পর একটা কাজ করতে করতে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যায়। সময় হ'য়ে যায় বেরুবার। বিকেল বেলা শর্টহ্যান্ড ক্লাশ ছিল আগে। কোন রকমে পাশ করে' বেরিয়েছে সুরুচি। কিন্তু আজ চাকরী একটা জোগাড় হয়নি। মার গয়না—

গুলো একে একে সব শেষ হয়ে গেছে। খোকার জামা কিনতে হবে। সুরুচির নিজের কাপড়ও নেই। তা' ছাড়া চাল ডাল কিনতেই আর খোকার দুধের জন্যেই সব খরচ হ'য়ে যাচ্ছে।

সদানন্দবাবু আজকাল বেশীর ভাগ সময়ই শুয়ে থাকেন। বাইরে ভিখিরীদের চীৎকার—একটু ফ্যান্ দাও মা—একটু ফ্যান দাও—

সেদিন রাস্তায় এক অভিনব দৃশ্য দেখে থেমে গেল সুরুচি। বৌবাজারের মোড়ে অনেক ভিখিরীর দল জমেছিল। একজন আমেরিকান এসে একটা পুলিশকে ডেকে একটা টাকা দিয়ে সকলকে টাকাটা ভাগ করে' দিতে বললে।

আমেরিকানটা চলে' গেল। পুলিশটা টাকা ভাঙিয়ে বারো আনা নিজে নিয়ে চার আনা পয়সা দিলে ভাগ করে। এক পয়সা দু'পয়সা ভাগে পড়লো। তা'তেই খুসী সবাই।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে যা'রা দেখছিল তা'রা কিছুই বললে না। অবাক হ'য়ে যে-যার মুখের দিকে চাইলে শুধু।

অনেকগুলো পয়সা বাসে ট্রামে বাজে খরচ হয় আজকাল।

চার পাঁচটা জায়গায় দরখাস্ত করে' দিয়েছে। প্রীতির অফিসেও দিয়েছে একটা পাঠিয়ে। সব জায়াগায় এক একবার করে' খবর নিয়ে আসতে হয়। একশো টাকার নীচে হলে তা'র চলবে না। বাড়ী ভাড়া, খোকার দুধ, বাবার ওষুধ—কেমন করে' সব চলবে তা'র।

দু'খানা দরখাস্তের উত্তর এল সেদিন। মাইনের কথা কিছু লেখেনি। তবু দেখা করতে লিখেছে।

ডালহৌসি স্কোয়ারের অফিসের নম্বর দেখে সুরুচি সকালে গিয়েই হাজির হ'লো। লিফ্‌টে উঠে চারতলায় গিয়ে দেখা করলো। সামনে বসে ছিল একজন কেরাণী। সুরুচি তা'কে গিয়েই জিগেস করলে—চাকরীর দরখাস্ত করেছিলাম এই অফিসে, এই উত্তর পেয়েছি এখান থেকে। কার সঙ্গে দেখা করবো বল্‌তে পারেন?

কেরাণী ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। চিঠিটা হাতে নিয়ে চশমা পরে' পড়লেন। বললেন—আসুন আমার সঙ্গে—

সুরুচি সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। অফিসে সবই পুরুষ। মুখ তুলে দেখলে সুরুচিকে। একটা চেম্বারের সামনে এসে ভদ্রলোক বললেন—একটা শ্লিপে আপনার নাম লিখে এই দরোয়ানের হাতে ভেতরে সায়েবের কাছে পাঠিয়ে দিন—আপনার ডাক আসবে-'খন্—

ভদ্রলোক চলে' গেলেন।

সুরুচি দাঁড়িয়ে রইল। উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। এই এখানে এই ছাদের নীচে বসে' তা'কে দিনের পর দিন কাজ করতে হবে! আশে-পাশের লোকগুলো লুকিয়ে সুরুচির দিকে দেখছে। নিজের কাছে নিজেকে যেন খুব ছোট মনে হ'লো। চারিদিকে তার যেন অগ্নিগোলক—তাকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরছে। অপমানের আগুনে মুখটা তা'র রাঙা হ'য়ে উঠলো। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হ'লো না তা'কে।

ভেতর থেকে শ্লিপ ফিরে এল। শ্লিপে লেখা—রিগ্রেট্—

দরোয়ানটা বোধ হয় সুরুচির মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিল। বললে—কাল সায়েব একজন মেম সায়েবকে চাকরী দিয়ে দিয়েছে—আপনি দেরীতে এসেছেন বড়—

এক মুহূর্তও দেরী করা আর উচিত নয়। সুরুচি মুখটা নীচু করে' বাইরে বেরিয়ে এল। পেছনে অনেক লোকের নিঃশব্দ দৃষ্টি তা'কে অনুসরণ করছে নিশ্চয়ই। লিফটে নামা আর হ'লো না। সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে নেমে একেবারে রাস্তায় দিনের আলোর সামনে জনতার ভীড়ে এসে দাঁড়াল সুরুচি।



কোরে

সত্বর বেদনা নিরাময়ের ঔষধ
ভারতে আসিতেছে

একণে ভারতবাসী প্রত্যেকেই ইংলণ্ডে প্রস্তুত কোরে ব্যবহারে সত্বর ব্যথা-বেদনা নিরাময় করিতে পারেন। ইহা এই জাতীয় অন্যান্য ঔষধের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ অধিক ফলপ্রদ। এই অত্যাশ্চর্য মহৌষধ কোরে ব্যবহারে স্নায়ুশূল, মাথাধরা, দাঁতের বেদনা, বাত, স্নায়ুপ্রদাহ, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিজনিত ব্যথা-বেদনা ও অস্বস্তি সত্বর উপশম হয়। সর্বদাই হাতের কাছে কাল ও হলদে রঙে একটি প্যাকেট রাখিতে ভুলিবেন না। ব্যথা-বেদনায় আক্রান্ত হইলেই ঈষৎ লাল বর্ণের কোরে একটি ট্যাবলেট সেবন করিবেন। ৬ ট্যাবলেটের একটি প্যাকেটের মূল্য দুই আনা। ৩০ ট্যাবলেটের একটি প্যাকেটের মূল্য দশ আনা। সমস্ত সম্ভ্রান্ত ডীলারের নিকট পাওয়া যায়।





ইহার বদলে অন্য কোন জিনিষ লইবেন না। চিত্রে প্রদর্শিতানুরূপ প্যাকেটে করিয়া কোরে বিক্রীত হয়। অন্য কোন ঔষধই ইহার মত ফলপ্রদ নহে।

কোরে লিমিটেড
২৫, হ্যানোভার স্কোয়ার,
লণ্ডন, ডব্লিউ ১
ভারতবর্ষস্থিত প্রতিনিধিঃ
জি এথারটন এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা ও বোম্বাই।

মনে হ'লো আর দরকার নেই। আর একটা অফিসের চিঠি ছিল হাতে। কিন্তু এত দেরী করে' গেলে কিছুই হবে না জানা কথা।

ফিরেই আসছিল, সুরুচি কিন্তু একটা পানের দোকানের আয়নাতে হঠাৎ নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে কী যেন ভাবলে একবার। কোথায় গেল সেই কলেজ জীবনের মুখের জৌলুষ। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে গায়ের রং। রৌদ্রে ঘুরে তামাটে হয়েছে মুখ। আজ এক বছর ধরে একটানা যে পরিশ্রম যে কৃচ্ছ্রসাধন চলছে—কলকাতার ভীড়ে হারিয়ে যায়নি এই তো যথেষ্ট!

প্রীতির অফিসটা কাছেই। এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরে গিয়েই বা করবে কী! প্রীতির অফিসে যাবার জন্যে মুখ ফেরাতেই হঠাৎ নজর পড়লো একটা অফিস-বাড়ির দিকে। ওই নম্বরেই তো তার যাবার কথা।

গেট দিয়ে ঢুকে ওপরে চলে' গেল সুরুচি। ছুতোর মিস্ত্রী চারিদিকে কাজ করছে। দেখে বোঝা যায় নতুন অফিস হচ্ছে। কয়েকজন লোক কাজকর্ম সুরু করেছে। ভালো করে' সাজ-সরঞ্জাম তৈরী হয়নি এখনও।

কা'কে গিয়ে যে জিগ্যেস করবে ভেবে ঠিক করতে পারলে না। চুপ করে' সুরুচি দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে লাগলো একবার মনে হ'লো ফিরেই যায়। প্রথম অফিসের মত এখানেও হয়ত ওই একই উত্তর আসবে! আগে থেকে সমস্তই ঠিক থাকে, শুধু শুধু কাগজে এরা বিজ্ঞাপন দেয়।

সুরুচি সিঁড়ির দিকে আবার ফিরে এল। দরকার নেই এখানে।

হঠাৎ সিঁড়ি থেকে কে যেন ডেকে উঠলো—দিদিমণি—

চিনতে একটু দেরীই হ'লো সুরুচির। তবু খানিক পরে চিনতে পেরে সুরুচি অবাক হ'য়ে বললে—গোপাল, তুমি এখানে?

গোপালও কম অবাক হয়নি। সুরুচির চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

গোপাল বললে—আমি আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছি দিদিমণি—

সুরুচি বললে—তুমি এ অফিসে কবে ঢুকলে?

গোপাল বললে—এ তো আমার বাবুরই অফিস—

—তোমার বাবু? কী নাম বলো তো—মনে পড়ছে না ঠিক—সুরুচি অবাক হ'য়ে গেল।

গোপাল বললে—ভুলে গেলেন সেই টাটানগর স্টেশনে? বাবুর নাম বিলাসভূষণ চৌধুরী—

বিলাস চৌধুরী! সেই ছফুট দীর্ঘ চেহারার মানুষটির চেহারা আবার ভালো করে' মনে করতে চেষ্টা করলে সুরুচি। তাঁরই অফিস। তাঁরই কাছে কাজ করতে হবে! নিজের দীনতা নিয়ে আবার তাঁরই সামনে হাজির হ'তে হবে প্রার্থী হ'য়ে! যা' হোক, ভালোই হয়েছে! তাঁর সংগে দেখা হয়নি ভালোই হয়েছে যেন।

সুরুচি জিগ্যেস করলে—তোমার বাবু কি তা' হলে' হাজারিবাগে থাকেন না আর?

গোপাল বললে—বাবু তো কলকাতায় একটা বাড়ি কিনেছেন—এখানেই এখন অফিস করেছেন বাবু—

সুরুচি চুপ করে' অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলো!

গোপাল বললে—বাবুর সংগে দেখা করবেন না দিদিমণি?

—তোমার বাবু কোথায়?

—এখুনি অফিসে আসবেন, আমাকে আগে পাঠিয়ে দিলেন। ছুতার মিস্ত্রী খাটছে—আমিই তো সব দেখা শোনা করছি—গোপাল বললে।

—তবে আমি চললুম—বলে সুরুচি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

তারপর খানিক থেকে বললে—গোপাল—শোন—

গোপাল কাছে এল।

সুরুচি বললে—আমার সংগে যে তোমার দেখা হয়েছিল তা' তোমার বাবুকে বলবার দরকার নেই—বুঝলে—

কিন্তু সামনের দিকে মুখ ফেরাতেই সুরুচি দেখলে সেই ছফুট দীর্ঘ লোকটিই তা'র দিকে চেয়ে ওপরে উঠে আসছেন।

গোপাল বললে—ওই যে আমার বাবু এসে পড়েছেন—

কী করা উচিত এখন সুরুচি ভেবে ঠিক করতে পারলে না। হয়ত কর্তব্য বোধে কিম্বা নিজের আড়ষ্টভাব এড়াবার জন্যেই সুরুচি দু'হাত জোড় করে' নমস্কার করলে।

বিলাস চৌধুরীও সামনে এসে দু'হাতে নমস্কার জানালেন। তারপর বললেন—আমার চিঠি পেয়েছিলেন?

কী জবাব দেবে সুরুচি বুঝতে পারলে না। চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

সুরুচিকে পাশ কাটিয়ে বিলাস চৌধুরী ওপরে উঠতে উঠতে বললেন—আসুন—আমার অফিসে বসে' কথা হবে—

সুতরাং সুরুচির ওপরে ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি ছিল না। বিলাস চৌধুরীকে আসতে দেখে সামনের দিকের কেরাণীরা সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বিলাস চৌধুরী চলতে চলতে বললেন—আমি তো বলে' গিয়েছিলাম আপনি এলে বসতে বলতে—বলেনি কেউ—?

সুরুচি এবারও কোনও জবাব দিলে না। ঘটনার এই অভূতপূর্ব বিপর্যয়ে সে যেন হতবাক হ'য়ে গেছে।

বিলাস চৌধুরী একটা ঘরের দোলানো দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে বললেন—আসুন—

সুরুচি ঢোকার পর বিলাস চৌধুরী একটা চেয়ারে গিয়ে বসে' বললেন, আপনি এখানে এসেছিলেন অথচ দেখা না করে' ফিরে যাচ্ছিলেন কেন বুঝতে পারলুম না—

সুরুচির শরীর যেন ভেঙে পড়ছিল। আর সে দাঁড়াতে পারবে না। তা'র মনে হ'লো সে যেন ধরা পড়ে' গেছে। তা'র সমস্ত দৈন্য আজ আর অনাবিষ্কৃত নেই। সেদিনকার সেই গর্ব আর আত্মাভিমান আজ নিঃশেষে ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সুরুচি বসে' পড়লো।

(ক্রমশ)

শাইকো

খোস, একজিমা, হাজা, কাটা, ঘা, পোড়া ঘা নালীঘা, ফুস্কুড়ি চুলকানি, ও চুলকানিযুক্ত সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগে অব্যর্থ

এরিয়ান রিসার্চ ওয়ার্কস

ফোন—ক্যাল ৪৭৩১ ৩২৭৫ গ্রাম—লাইভ ব্যাঙ্ক লিঃ

গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ

— স্থাপিত ১৯৩০ —

হেড অফিস—২১-এ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভবানীপুর শাখা :

৮৪ আশুতোষ মুখার্জি রোড কলিকাতা

আরো ২৩টি শাখা বাংলা, বিহার ও আসামে প্রতিষ্ঠিত

চেয়ারম্যান—রায় জে. এন. মুখার্জি বাহাদুর

গভঃ প্লিডার ও পাবলিক প্রসিকিউটর হুগলী।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়



বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘের প্রধান সচিব মিস্টার সুরাবর্দী বলিয়াছেন অর্থাৎ সরকারী বিবৃতিতে বলিয়াছেন—

"বিহার হইতে আমাদিগের যে সকল মুসলমান ভ্রাতা-ভগিনী হত্যা ও অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বাঙলায় আসিয়াছে, তাহাদিগকে যে আশ্রয় দিতে পারিয়াছি, তাহা আমরা সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি।"

বলা বাহুল্য, যে রাজস্ব হইতে ইহাদিগের জন্য ব্যয় করা হইতেছে, তাহা কেবল বাঙলার মুসলমান অধিবাসীরাই প্রদান করে না এবং তাহা অন্য প্রদেশের লোকের জন্য ব্যয়িত হইবার জন্যও প্রদত্ত হয় না।

ব্যয়ের একটা হিসাব সরকারী বিবৃতিতে দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কোনরূপেই সম্পূর্ণ বলা যায় না। যে সকল জিলায় বিহারী মুসলমানদিগকে আশ্রয় প্রদান করা হইয়াছে, সেই সকল জিলার ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে তাহাদিগের জন্য ব্যয় করিতে নিম্নলিখিতরূপ বরাদ্দ করা হইয়াছে—

বর্ধমান	৩,৪৬,০০০ টাকা
হাওড়া	১,০০,০০০ „
বাঁকুড়া	২৫,০০০ „
দিনাজপুর	১২,০০০ „
মেদিনীপুর	১০,০০০ „
হুগলী	৫,০০০ „
রাজসাহী	৫,০০০ „

ইহা ব্যতীত—এই সকল লোককে আনিতে ও তাহাদিগের জন্য নিয়াজ মহম্মদ খান প্রমুখ সরকারী কর্মচারীদিগের ব্যয়-বাবদে এ পর্যন্ত কত টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার হিসাব কোথায়?

এই বিহারীদিগকে যখন আসানসোলে প্রথম আনা হয়, তখনই নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসীরা এত ভয় পাইয়াছিল যে, তথায় আম্ধাআইন জারি করা এই বাঙলা সরকারই প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। এখন বাঁকুড়ার সংবাদ—

"বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) আশ্রয়-শিবিরের সন্নিকটস্থ কয়েকটি গ্রামের হিন্দুরা স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে লইয়া গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতেছে। আশ্রিতগণ নাকি লোকের উপর উপদ্রব করিতেছে।"

সরকারের স্বীকৃতি অনুসারে ৪০ হাজার বিহারী মুসলমানকে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্রয় প্রদান করা হইয়াছে—

কেন্দুলী	৬,৭৫০ জন
শ্রীপুর বাগান	১,০৫০ „
নীলা	৫১৯ „
খৈরা	৪,৪৭৪ „
চান্দা	১,৬৬৯ „
স্টেশন কারখানা	১,২৬০ „
মাধাইগঞ্জ	৪,১৩৯ „

আসানসোলে এই সব লোককে রাখিয়া এখন ব্যবস্থা হইয়াছে—আরও লোককে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রাজসাহী, দিনাজপুরে রাখা হইবে। তদ্ভিন্ন হুগলী ও হাওড়া জিলাদ্বয়েও লোক রাখা হইয়াছে এবং বর্ধমান ঘুসকরায় আশ্রয়-শিবির হইতেছে।

কলিকাতায় সরকারী বারটি আশ্রয়-শিবিরে ৯,৬৩৬ জন ও বে-সরকারী ১৯টি আশ্রয়-শিবিরে ৭,৭৯৪ জন রক্ষিত হইয়াছে। বে-সরকারী আশ্রয়-শিবিরেও সরকার বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করেন। প্রত্যেকের জন্য প্রতিদিন দেওয়া হয়—

চাউল	৩ ছটাক
আটা	২ „
দাইল	১ „

আবার শুক তরকারি, মাছ, মাংস, ডিম্ব প্রদান করা হয়।

মিস্টার সুরাবর্দীর ব্যবস্থায় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষকালে বাঙালী দুর্গতদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হইত, তাহাতে জীবনরক্ষা হয় না। সেই দুর্ভিক্ষে যে ৩০।৩৫ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অর্ধাংশ মুসলমান ছিল মনে করা অসংগত হইবে না। তাহাদিগের যে সকল আত্মীয়স্বজন বাঁচিয়া আছে, তাহারা কি বিহারী মুসলমান-দিগের এইরূপ আহার্যের ব্যবস্থা সমর্থন করিতেছে?

যে হিসাব দেখা গেল, তাহাতেই বুঝা যায়, ব্যয় কোটি কোটি টাকা হওয়া অসম্ভব নয়। আর যে খাদ্যদ্রব্য ইহাদিগকে দেওয়া হইতেছে, তাহা বাঙলার লোককে বঞ্চিত করিয়াই দেওয়া হইতেছে।

বস্ত্র সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। সরকারের হিসাব অনুসারে দেওয়া হইয়াছে—

আসানসোলে—

কম্বল	৯,০৭০ খানি
ধুতি	১,৫০০ জোড়া
শাড়ি	১,৫০০ জোড়া
শিশুদিগের পরিধেয়	২,০০০

বাঁকুড়ায়—

কম্বল	৫,০০০
চাদর	২,০০০
শাড়ি	৯৮০ জোড়া
ধুতি	৪৮০ জোড়া
লুঙ্গী	৫০০ খান
শিশুদিগের পরিধেয়	৪,০০০

মেদিনীপুরে—

কম্বল	৫,০০০
শাড়ি	৫০০ জোড়া
লুঙ্গী	৫০০ খান
শিশুদিগের পরিধেয়	৩০০

দিনাজপুরে—

সুতী কম্বল	৩০০
পশমী কম্বল	১০০
ধুতি	১৬০ জোড়া
শাড়ি	১৫০ জোড়া
চাদর	৫০ খানি
শিশুদিগের পরিধেয়	২৫০

রোগীদিগের জন্য—কলিকাতা, আসানসোল ও বিষ্ণুপুর প্রত্যেক স্থানে হাসপাতাল হইয়াছে—তাহাতে প্রত্যেকটিতে একশত লোকের স্থান হয়।

বলা বাহুল্য, এ সকলেই বাঙলার লোকের অধিকার এবং তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া বিহারী মুসলমান আশ্রিতদিগকে দেওয়া হইতেছে।

বিহার সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারা কেবল দুর্গতদিগের পুনর্বসতির ব্যবস্থাই করেন নাই, পরন্তু তাহাদিগের নির্বিঘ্নতার জন্যও আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মিস্টার সুরাবর্দী—বাঙলার রাজস্বে এইরূপে বদান্যতা প্রকাশকালে—বলিতেছেন, যাহারা আশ্রয়প্রার্থী, তাহারা বিহারে ফিরিয়া যাইবে কিনা তাহা তাহারাই স্থির করিবে এবং যাহারা আসিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে বিধবা ও শিশুরা বাঙলা সরকারের পোষ্যই হইবে।

কিন্তু যাহারা আসিয়াছে, তাহারা যে প্রাণ-ভয়ে বা অত্যাচারের জন্য আসে নাই, তাহার প্রমাণ—১১ই নবেম্বর হইতে ইহাদিগের আমদানী আরম্ভ হয় এবং ২৫শে।২৬শে নবেম্বর প্রতিদিন প্রায় দেড় হাজার আমদানী হয়। বলা বাহুল্য, তখন বিহারের হাঙ্গামা সম্পূর্ণরূপে দমিত হইয়াছে। তখন যাহারা নীত হইয়াছে, তাহারা কি কোনরূপ প্রচার-কার্যের ফলে প্রলুব্ধ হইয়া বাঙলায় আসে নাই? কে বা কাহারা তাহাদিগকে আনিয়াছে?

বাঙলা সরকার যখন তাঁহাদিগের কর্মচারীকে—বিহার সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষাও না রাখিয়া—বিহারে প্রেরণ করেন, তখনই কি বিহারে হাঙ্গামা নিবৃত্ত হয় নাই? গত ১১ই নবেম্বর বাঙলার কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব "বিশেষ কার্যের" জন্য নিয়াজ মহম্মদ খানকে বিহারে পাঠাইবার আদেশ দেন। আর ১২ই তারিখেই 'স্টেটসম্যান' পত্রে প্রকাশিত হয়—বিহারে হাঙ্গামার উৎকট অবস্থার অবসান হইয়াছে। ৪ঠা নবেম্বর হইতে ১০ই নবেম্বরের মধ্যেই হাঙ্গামা নিবৃত্ত হয়।

কাজেই বাঙলা সরকার যখন বিহারের দুর্গত মুসলমানদিগকে আশ্রয় দানের সৌভাগ্যের সন্ধান লাভ করেন, তখন বিহারে লোকের মনে পুনরায় আস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে।

অবশ্য যে প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া বিহারী মুসলমানগণ বাঙলায় আসিয়াছিল তাহা বলা হয় নাই। কারণ মাসাধিক কাল তাহারা বিনাশ্রমে আশ্রয়, আহার, বস্ত্র প্রভৃতি সবই পাইয়াছে—বিহারে থাকিলে তাহাদিগকে পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জন করিতে হইত। মিস্টার সুরাবর্দী এখন বলিতেছেন, আশ্রয় শিবিরে লোককে লঘু শ্রমের কাজ করিতে দেওয়া হইবে। বোধ হয়, তাঁহার ভয়, তাহা না হইলে তাহারা 'বাবু' হইয়া যাইবে—আর তাহাদিগের সকলকেই পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী করা চলিবে না।

বিহার হইতে আগত বা আনীত মুসলমানদিগের প্রসঙ্গে মিস্টার সুরাবর্দী বলিয়াছেন—তাহারা বিহারে ফিরিয়া যাইবে কিনা, তাহা তাহারাই বিবেচনা করিয়া স্থির করিবে—বাঙলা সরকার সে বিষয়ে তাহাদিগকে কোন উপদেশ বা নির্দেশ দিতে পারেন না।

অথচ বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অন্যরূপ। গত ২৬শে ডিসেম্বর নোয়াখালির জিলা ম্যাজিস্টেট এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন—কুমিল্লায় যে সকল লোক নোয়াখালি হইতে আসিয়া আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় লইয়াছে তাহাদিগকে সাত দিনের মধ্যে স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

ভয় দেখান হইয়াছে—

(১) সাত দিন পরে আর কাহাকেও আশ্রয়-শিবিরে থাকিতে দেওয়া হইবে না;

(২) তাহাদিগকে আর আহার্য প্রদান করাও হইবে না।

এ বিষয়ে বাঙ্গালী দুর্গতদিগের বিচার-বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার স্বাধীনতা অস্বীকৃত হইয়াছে।

যাহাদিগকে এইরূপে স্ব স্ব গ্রামে যাইতে বাধ্য করা হইয়াছে, তাহাদিগের যাইতে দ্বিধার কারণ যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার পথে চৌমুহনীতে যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্রনিক্ষেপ হইয়াছে, তাহাতে কি প্রতিপন্ন হয়? তাহাতেই কি বুঝিতে পারা যায় না—এখনও দুর্বৃত্তদিগের সকলের মনোভাবের পরিবর্তন হয় নাই?

যে কারণ দেখাইয়া কেন্দ্রী সরকার বিহার হইতে বাঙলায় মুসলমানদিগের আমদানীতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, সে কারণ কি এখনও বিদ্যমান? অর্থাৎ এখনও কি তাঁহারা বলিতে পারেন?

(১) বিহারী মুসলমানগণ প্রাণভয়ে বা অত্যাচারের ভয়ে বিহার ত্যাগ করিয়া বাঙলায় যাইতেছে?

(২) বাঙলা সরকার বাঙলার রাজস্ব হইতে ব্যয়নির্বাহ করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয়াদি দিবেন, তাহা সমর্থিত হইতে পারে?

বাঙলায় চাউলের মূল্য বর্ধিত করিতে হইয়াছে কেন?

যখন নিয়াজ মহম্মদ খানকে বিহারে পাঠান হয়, তখনই লোকে সন্দেহ করিয়াছিল, বিহার হইতে মুসলমানদিগকে আনিয়া বাঙলায় বসবাস করাইবার পরিকল্পনা হইয়াছে। এখন—যত দিন যাইতেছে ততই সেই সন্দেহ ঘনীভূত হইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙলায় সরকারী ব্যবস্থা কিরূপ, তাহার পরিচয় তাঁহাদিগের সাম্প্রতিক সর্বপ তৈল সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনেই সুপ্রকাশ। তাঁহারা বাঙ্গালীর জন্য আবশ্যক তৈলের সরবরাহ-ব্যবস্থাও করিতে পারেন না। অথচ ৪০ হাজার বিহারীকে চাউল, আটা, মাছ, মাংস, ডিম্ব, বস্ত্র, কম্বল সব দিতে পারেন। সে-কাজ কাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া করা হইতেছে, তাহা কি সহজেই বুঝিতে পারা যায় না?

কেন্দ্রী সরকার কি দেখেন নাই, বাঙলার পাকিস্থানী সংবাদপত্রসমূহ বলিতেছেন—বাঙলার বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম—এই কয়টি জিলার সব 'পতিত জমি' এই সকল মুসলমানকে দেওয়া হইবে? কার্যেও কি তাহাই দেখা যাইতেছে না?



উজ্জ্বল যৌবন

যৌবনোচিত স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যের অভাবে জীবন হয়ে পড়ে দুর্বহ, একান্ত নৈরাশ্যময়। কিন্তু 'ট্যামিনল'-এর সাহায্যে আপনি অবশ্যই ফিরিয়ে পাবেন আপনার লুপ্ত যৌবন, দৃপ্ত পৌরুষ, জীবনকে ভোগ করবার অসীম আগ্রহ ও সামর্থ্য। শারীরিক, মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্বল্যে এবং গ্রন্থি-বিকলতায় ট্যামিনল-এর কার্য্যকারিতা সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু এর মধ্যে 'মুহূর্ত্তে শক্তিদান' করবার সস্তা ও সর্বনাশা যাদু নেই। ট্যামিনল্ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত ও মাদকদ্রব্য-বর্জ্জিত। দেহের কেন্দ্রগুলিকে স্থায়ীভাবে শক্তিশালী ও সক্রিয় করে তোলাই এ'র কাজ—পরিণামই এ'র লক্ষ্য।

দীপ্ত পৌরুষ নারীমাত্রেরই কাম্য।

মূল্য ২৪ বড়ির টিউব—৬।০
একত্রে ৩ টিউব—১৬৷৷০

ভি, পি, চার্জ্জ আলাদা।

সকল সম্ভ্রান্ত দোকানেই পাওয়া যায়। অথবা লিখুন—পোষ্ট বক্স ১০৮৩, কলিকাতা।

ট্যামিনল — যৌবনোচিত তেজ ও শক্তিবর্দ্ধক

সেণ্ট্রাল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল কোং — পোষ্ট বক্স ১০৮৩

BC85/

ট্যামিনলের কলিকাতার ষ্টকিষ্ট

এম ভট্টাচার্য ৮০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও উহার সমস্ত শাখায় বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং লিঃ; বেঙ্গল ব্রস এণ্ড কোং লিঃ ১৫।৭ চৌরঙ্গী; রাইমণ্ড এণ্ড কোং ১১৪ আশুতোষ মুখার্জি রোড এবং উহাদের সমস্ত শাখায় ও অন্যান্য সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যাইবে।

আর, বি, রোজ নস্য

প্রস্ফুটিত গোলাপ গন্ধে ভরপুর
ভি পি সমেত ২০ তোলা টিন ৩৷৷/০
ননীলালকুমার পাল এণ্ড ব্রাদার
পোষ্ট বক্স নং ১০৮০৪ কলিকাতা ৯।



বড়দিন উপলক্ষে মহামান্য ভারত সম্রাট তাঁর ভাষণে বলিয়াছেন—"Our task is to mobilize the Christmas Spirit and apply its power of healing to



our daily life."—সম্রাটের নির্দেশ যে প্রজা-পুঞ্জ লঙ্ঘন করেন নাই তা গ্র্যাণ্ড—ফারপো প্রভৃতি হোটেলে "Spirit"এর জোয়ার দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম।

* * * *

এবার বড়দিনের বড় খবর—ভারতীয় Owner এবং trainer প্রথম Viceroy's Cupটি পাইয়াছেন; —সুতরাং "বল বল বল সবে, ভারত এবার রেসের মাঠেতে শ্রেষ্ঠ আসন ল'বে"!

* * * *

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন,—"Rishis of India and China will convert the world to peace"—এবং এই সঙ্গে মহামান্য সম্রাট বলিয়াছেন—"God will lead the world into ways of peace." ঈশ্বর ধরা ছোঁয়ার বাইরে এবং ঋষি পৃথিবীর সুখদুঃখের অতীত সুতরাং শান্তি-কামী সাধারণ মানুষের পক্ষে রাজা এবং রাজাগোপালের আশ্বাস দুই-ই সমান।

* * * *

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি হইতে অবিলম্বে ফিরিয়া আসুন ইহাই নাকি কোন সম্প্রদায়ের কোন কোন লোকের ঐকান্তিক ইচ্ছা। অন্য এক সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এই ইচ্ছাকে দুরভিসন্ধিযুক্ত বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ—এই অভিযোগ শুনিয়া প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ নাকি বলিয়াছেন—"মহাত্মা সকলকে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন, আমরাও তাঁহাকে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেই বলিতেছি, ইহার মধ্যে দুরভিসন্ধিটা কোথায়" খুড়ো বলেন—"সত্যই তো এর জবাব নাই, একেবারে cold-blooded logic"।

ম মহাত্মাজীর গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণের প্রস্তাব উপলক্ষ্যে সুরাবর্দী সাহেব বলিয়াছেন—"I hope Mr. Gandhi will not be embarrassed by the measures for his protection that I shall have to take when the commences his march." বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমরা শুনিয়াছিলাম—রাম-নামই নাকি মহাত্মাজীর একমাত্র protection বা রক্ষা কবচ। সুতরাং সুরাবর্দী সাহেবের রক্ষীদের মুখে রাম নাম শুনিলে মহাত্মাজী নিশ্চয়ই embarrassed হইবেন!"

* * *

লীগ বলিতেছেন—বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নাকি কংগ্রেসের প্রতি তোষণ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, পাল্টা অভিযোগে কংগ্রেসও লীগ সম্বন্ধে এই কথাই বলিতেছেন। শ্যামলাল বলিলেন,—"এতক্ষণে ধরা হ্যায়, এই জন্যই বাজারে সরিষার তেল পাওয়া যাইতেছে না!"

* * *

কর্পোরেশনের কর্মীরা ধর্মঘট করিলে কলিকাতায় অপরিস্রুত জলের অভাব হইবে, নর্দমা প্রভৃতি পরিষ্কারের ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া যাইবে এবং রাস্তায় আর আলো জ্বলিবে না। এই সম্বন্ধে পূর্বে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হইয়াছিল যে, এই ধর্মঘটে শ্মশান ঘাটের কাজে অবশ্য কোন ব্যাঘাত হইবে না। "সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত এবং হয়ত পৌর কর্তারাও সেইজন্যই নাকে তেল দিয়া (এঁদের তেলের অভাব নাই নিশ্চয়ই) ঘুমাইতেছেন"—কথাটা খুড়োর।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, অন্তর্বর্তী সরকার নাকি মৎস্য প্রজননের চেষ্টা করিতেছেন। সু-সংবাদ সন্দেহ নাই, কিন্তু পূর্ববর্তী সরকার যে সব রাঘব বোয়ালের চাষ করিয়াছিলেন সেই সব সমূলে ধ্বংস না করিলে নূতন পোনা মাছ বাঁচানো যাইবে না।

* * *

খুড়ো কি একটি কাগজ চোখের সামনে ধরিয়া উচ্চ কণ্ঠে পড়িয়া গেলেন—"House that is rent free"—কথাটা শুনিবা মাত্র আমরা ট্রামের সীটের মায়া ত্যাগ করিয়া (কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ এর কাছে তুচ্ছ) খুড়োর ঘাড়ের উপর গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িলাম এবং আমাদের সমবেত কণ্ঠের যুগপৎ "কোথায়? কোথায়?" —চীৎকার ইনকিলাব জিন্দাবাদকেও হার মানাইয়া গেল। দেখিলাম কৌতূহলী প্রশ্নকর্তাদের মধ্যে কংগ্রেস-লীগ-তপশীলী সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিই রহিয়াছেন, বুঝিলাম, C. R.এর intermarriage নয়, বাড়ি ভাড়ার সুবিধা করিয়া দিলেই নিমেষে লীগ কংগ্রেস এক হইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক আমাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য খুড়ো সেই বাড়ির ঠিকানাটা যেখানে কাগজে লেখা আছে সেইখানে অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন। পড়িলাম—at Henly-on-Thames Oxfordshire, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সীটে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম সীটও ততক্ষণে বেদখল হইয়া গিয়াছে।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, বর-সমস্যা-সমাধানের জন্য বৃটেনে নাকি জার্মাণী হইতে অনেক লোক আমদানী করা হইতেছে। কয়েকদিন



আগে ঘটা করিয়া যাঁরা উদ্বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাঁরাই এখন ঘটা করিয়া উদ্বাহের ব্যবস্থা করিতেছেন—"কি বিচিত্র এই দেশ"।

* * *

অন্য একটি সংবাদে প্রকাশ যে, পৃথিবীর নানা ফার্মে পঁচিশ কোটি জন্তু জানোয়ার (animals) নাকি কাজ করে। খুড়ো বলিলেন



—"ক্লাইভ স্ট্রীটের ফার্মে যাঁরা দশটা-পাঁচটা ঘানি টানেন—তাঁহাদের হিসাবটা নেওয়া হইয়াছে কি?"

শামুক সন্ধান সমিতি!

বিদেশের এক খবরে জানা গেছে যে, সম্প্রতি গ্রেট বৃটেনের ইয়াটেনডন অঞ্চলের বার্কশায়ার গ্রামের পিটার-জে-হেনিকার হিটন ও তাঁর স্ত্রী মিসেস হিটনের চেষ্টায় শামুক নিয়ে গবেষণা করার জন্য British Snail-watching Society স্থাপিত হয়েছে। এই সমিতিতে শামুককে নিয়ে এত বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন হিটন দম্পতি যে, প্রকৃতি-অনুরাগী জনসাধারণের মধ্যে এই সমিতির সদস্য হওয়ার আগ্রহটা রীতি-মতই দেখা দিয়েছে। বৃটেনের প্রায় ৭০।৮০ জন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমিতিতে যোগ দিয়ে—শামুক নিয়ে নিয়মিত মাথা ঘামাচ্ছেন। এ ব্যাপারটা যে শুধু তাঁদের খেয়াল বা খেলা তা মনে করবেন না। মোটেই তা নয়। শামুক সন্ধান সমিতি বলেন যে—'শামুককে যতটা তুচ্ছ মনে করা হয়, ঠিক ততটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বস্তু ঐ জীবটি নয়।' মিঃ হিটন বলেছেন যে, শামুকের জীবনধারা ও গতি-বিধি মন দিয়ে দেখলে এবং তা যথাযথ অনুসরণ করতে পারলে জীবজগতের বহু রহস্যকে বোঝবার পথটি সুগম হয়। মিঃ হিটনের শামুক গবেষণাগারে নানারকমের জীবন্ত শামুক পোষা হচ্ছে—অবসর সময়ে তাদের নিয়ে সদস্যরা নানারকম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিশেষ আনন্দ পান। এসব



পরীক্ষার মধ্যে শামুকের দৌড়, শামুকদের বাজনা শুনিয়ে বা রকমারী খাবার দিয়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখা—ইত্যাদি দেখাই প্রধান কাজ। বিদেশের শামুক-সন্ধান সমিতির সন্ধান তো পেলেন—এখন সদস্য হওয়ার জন্য দরখাস্ত পাঠাবেন কিনা ভেবে দেখুন।

নিজের শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ!

খবরের শিরোনামা দেখে নিশ্চয়ই এই ভেবে চমকে উঠছেন যে নিজের শ্রাদ্ধের মন্ত্র নিজে কি করে পড়া যায়? যায় বৈকী। তবে বুদ্ধির দরকার হয়। সম্প্রতি ইংলণ্ডে এই রকম ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পেয়েছি—সেটাই আপনাদের জানাচ্ছি। কেন্টাবী প্রদেশের এক পাদরী রেভারেণ্ড হেনরী সি-স্লেড্ সম্প্রতি মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কর্মক্ষেত্র গীর্জাটিতে এক উপাসনা সভার আয়োজন হয়েছিল। এই উপাসনা সভায় তার বহু অনুরাগী বন্ধু সমবেত হয়েছিলেন। উপাসনা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে পরলোকগত পাদরী রেভারেণ্ড স্লেড-এর কণ্ঠেই শোনা গেল তাঁর নিজের মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে উপাসনা-বাণী সুরু হলো। "The Lord giveth and the Lord taketh away"—গীর্জায় সমবেত বিরাট জনতা তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরটি চিনতে পেরে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। যা হোক পরে এই রহস্যটি প্রকাশ করা হলো সকলের কাছে। তাতেই জানা গেল যে,—মাত্র কিছুদিন আগে রেভারেণ্ড স্লেডের কণ্ঠস্বর গ্রামোফোন রেকর্ডে গৃহীত হওয়ার পর তিনি তা শুনে এত খুশী হয়েছিলেন যে, তখন তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করে-ছিলেন—যে তিনি তাঁর নিজের মৃত্যু-উপাসনার বাণীটি আগে থেকেই রেকর্ড করিয়ে রাখতে চান এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেই উপাসনা-বাণী যেন সকলকে শোনানো হয়। সেই ব্যবস্থানুসারেই তাঁর ভক্তরা তাঁর মৃত্যু-উপাসনায় গীর্জার পাদপীঠের আড়ালে একটি বৈদ্যুতিক গ্রামোফোন যন্ত্রে তাঁর রেকর্ডে গৃহীত উপাসনা-বাণীটি বাজিয়ে সকলকে শোনান। রেভারেণ্ড স্লেডের নিজের মৃত্যু-উপাসনা যদি এইভাবে নিজে শোনাতে পেরে থাকেন, তাহলে নিজের শ্রাদ্ধের মন্ত্র নিজেই পড়া যাবে কিনা তাই বলুন?

শামুক-অনুসন্ধান সমিতির সদস্যরা নানারকম জীবন্ত শামুক নিয়ে পরীক্ষা

দেশের কথা

(৭ই পৌষ—১৩ই পৌষ)

কংগ্রেস—নোয়াখালি—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—গান্ধীজীর নিকট নেতৃবৃন্দ—গান্ধীজী ও বাঙলা সরকার—গণ-পরিষদ—ভারতের প্রাপ্য—অন্তর্বর্তী সরকার ও চাকরী—রবীন্দ্র-ভবন—শরৎচন্দ্র বসু—হিন্দু মহাসভা—বিহারী ও বাঙালী দুর্গত—চাউল ও তৈল।

কংগ্রেস—কংগ্রেসের কামটি আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এক অধিবেশনে বর্তমান সমস্যার আলোচনা করিবেন। প্রথমে শুনা গিয়াছিল, কুমিল্লায় অধিবেশন হইতে পারে। তাহা হয় নাই। গত ৬ই ডিসেম্বর বিলাতের সরকার মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত কংগ্রেসের গৃহীত ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য নাই। সেই অবস্থায় কংগ্রেসের কর্তব্য কি তাহাই এই অধিবেশনে বিবেচিত হইবে। কাজেই এই অধিবেশনের গুরুত্ব যে অসাধারণ, তাহা বলা বাহুল্য। যিনি দীর্ঘকাল কংগ্রেসের নীতি ও পদ্ধতি পরিচালিত করিয়া আসিয়াছেন, সেই গান্ধীজী এবার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন না। সেই জন্য বিবেচ্য বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ প্রয়োজন বুঝিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের সভাপতি তাঁহার সহিত সকল বিষয়ে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলেন। কংগ্রেস কি করিবেন, তাহা কমিটির নির্ধারণের উপর নির্ভর করিবে। কিন্তু ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি প্রকাশের পরেও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতারা বলিয়াছেন—তাঁহারা পদত্যাগ করিবার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, যদি আবার সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তবে অন্তর্বর্তী সরকার তাহার উদ্ভব স্থল হইতে পারে। তাহা হইলে যে গণ-পরিষদই প্রথম যুদ্ধক্ষেত্র হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। গণ-পরিষদেই প্রথম শক্তি পরীক্ষা হইবে। মুসলিম লীগ এখনও গণ-পরিষদে যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু বিলাত হইতে মিস্টার জিন্না কি নির্দেশ লইয়া আসিয়াছেন তাহা বলা যায় না। জনরব, তিনি তথায় রক্ষণশীল দলের নেতৃবৃন্দের সহিত ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে সর্ববিধ বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন এবং যদি পরিষদ ভাঙ্গিয়া যায়, তবে লর্ড ওয়াভেল তাহাতে বাধা দিবেন না—বিনিময়ে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত করিয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান করিতে বৃটিশ সরকার সম্মতি দিবেন: এই অবস্থায় কংগ্রেসই দেশকে সাম্য পথে লইয়া যাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কাজ করিবেন।

নোয়াখালি—পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত নোয়াখালির দিকে আজ সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি নিবদ্ধ। তথায় গান্ধীজী প্রাণপণ করিয়া তাঁহার অহিংস নীতির অগ্নি-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত। তিনি বলিয়াছেন—এতদিনে তিনি অন্ধকারে আলো-বিকাশ সম্ভাবনা লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহার উপদেশে ও আদর্শে উপদ্রবকারীর উপকৃত হইয়াছে কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু উপদ্রুতগণ যে আস্থা ফিরিয়া পাইতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যদি শতকরা যাহারা ৩০ জন তাহারা সাহস লাভ করে এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে—আপনাদিগের অধিকারের ন্যায় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারে, তবে তাহারা কি করিতে পারে—মুসলমানদিগের দ্বারা উপদ্রুত শিখ সম্প্রদায় তাহা দেখাইয়াছে। গুরুগোবিন্দের আদর্শ স্মরণীয়। গান্ধীজী স্থির করিয়াছেন, নববর্ষে গ্রামে গ্রামে গমন আরম্ভ করিবেন। অনেকের বিশ্বাস, তাহার ফল তাঁহার লবণ সত্যাগ্রহ উপলক্ষে ডাণ্ডী অভিযান অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ হইবে। নোয়াখালি যদি জাতীয় জীবনে নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ করিতে পারে, তবে তথায় হিন্দুদিগের উপদ্রব ভোগ করাও যে সার্থক হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—মিস্টার আসফ আলী আমেরিকায় ভারতের দূত নিযুক্ত হওয়ায় বড়লাটের শাসন-পরিষদে যে সদস্য পদ শূন্য হইয়াছে, তাহাতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নিযুক্ত হইয়াছেন। বিভিন্ন বিভাগের ভার সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন করা হইবে কি না, তাহা জানা যায় নাই। জনরব, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদও শাসন-পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিবেন; কারণ, গণ-পরিষদের সভাপতির কার্যে তাঁহার সমগ্র সময় প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

গান্ধীজীর নিকট নেতৃবৃন্দ—পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল বিলাতের সকল বিষয় তাঁহাকে জানাইয়াছেন এবং ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি প্রকাশের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রদেশ সঙ্ঘ গঠন সম্পর্কে গান্ধীজী তাঁহার মত আসামের প্রতিনিধিদিগকে পূর্বেই জানাইয়াছেন। আসাম হইতে আরও কয়জন তাঁহার সহিত আলোচনার জন্য গমন করিতেছেন, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, কংগ্রেসের পক্ষে গণ-পরিষদে ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া কাজ করা এবং প্রদেশ-সঙ্ঘের সমস্যার সময় প্রদেশগুলিকে যথাবুদ্ধি কাজ করিবার নির্দেশ প্রদান সংগত হইবে।

পূর্ববঙ্গের অবস্থা স্বাভাবিক হইয়াছে, ইহা বাঙলার সচিবরা যতই কেন বলুন না, অবস্থার পরিচয়ে ইহাই যথেষ্ট যে পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ ব্যক্তিরা যখন গান্ধীজীর নিকট গমন করিতেছিলেন, তখন পথে চৌমুহনীতে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইষ্টক নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং লোষ্ট্র খণ্ড পণ্ডিতজীকে আহতও করে। তিনি বলিয়াছিলেন—তিনি লোষ্ট্র, লাঠি বা গুলীর ভয়ে ভীত নহেন। গান্ধীজী কংগ্রেসকে কি উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কমিটির অধিবেশনে বুঝা যাইবে।

গান্ধীজী ও বাঙলা সরকার—গান্ধীজী পূর্ববঙ্গে উপদ্রুত স্থানসমূহে পুনর্বসতির যে ব্যবস্থা করিতেছেন, সে সম্বন্ধে তিনি বাঙলা সরকারের কতটুকু সহযোগ লাভ করিতে পারেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; কিন্তু বাঙলা সরকার তাহার উত্তর এখনও দেন নাই। গান্ধীজী কোন কাজেই বাঙলার মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের ক্ষমতা কোনরূপ ক্ষুণ্ণ না হয়, এমন ব্যবস্থাই করিতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহার পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ক্ষেত্রে গমনই যখন সেই সচিব সঙ্ঘের অভিপ্রেত ছিল না, তখন তাঁহার অবস্থিতি যে তাঁহাদিগের অস্বস্তির কারণ হইয়াছে, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। কিন্তু তিনি যখন সোদপুরে ছিলেন, তখন প্রধান-সচিব যেমন তাঁহার "শান্তি কমিশনারকে" লইয়া গান্ধীজীর বিশেষ আনুগত্য দেখাইয়াছিলেন, তেমনই হয়ত এখন সহযোগের পথও গ্রহণ করিবেন। কিন্তু লোক জিজ্ঞাসা করিতেছে—যে সকল সরকারী কর্মচারীর সম্বন্ধে একদেশদর্শিতার অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে এবং যাহারা পূর্বাহ্নে সংবাদ পাইয়াও লোকের ধনপ্রাণ রক্ষার কোন ব্যবস্থা করে নাই বা তাহার পরেও বিশেষ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে বাঙলা সরকার কি করিয়াছেন বা করিতেছেন? যদি তাঁহারা সে বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা না করেন, তবে কি লোকের মনে আস্থার উদ্ভব বিলম্বিতই হইবে না? তাঁহারা লোককে আস্থা পাইবার জন্য কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং পুনর্বসতির ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, সে সকল কি সরকার প্রকাশ করিবেন। বিহার সরকার তাঁহাদিগের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন—বাঙলা সরকার সে কার্যে বিরত কি জন্য? গান্ধীজীর পুনর্বসতি ব্যবস্থার সহিত বাঙলা সরকার সহযোগ করিতে আপত্তি করিতে পারেন কি? গান্ধীজীর ব্যবস্থা যে একদেশদর্শী নহে, তাহা মনে করাই সংগত ও স্বাভাবিক।

গণ-পরিষদ—গণ-পরিষদের কাজ এখনও স্থগিত আছে। জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে যখন কাজ পুনরায় আরম্ভ হইবে, তখন মুসলিম লীগ তাহাতে যোগ দিবে কি না, তাহা দেখিবার বিষয়। সভাপতি ড.

রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন, গণ-পরিষদে বহুমতে যে শাসন-পদ্ধতি রচিত হইবে, লোককে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাহা গ্রহণ করিবেন কি না, তাহা বলা যায় না। এদিকে ভারতের প্রধান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি পাকিস্থান প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহাতে আপত্তি করিবেন বলিয়াই মনে হয়। সে অবস্থা ঘটিলে বৃটিশ সরকার তাঁহাদিগের ব্যাখ্যানুসারে যদি সেই শাসন পদ্ধতিতে সম্মতি দিতে অস্বীকার করেন, তবে অবস্থা কিরূপ হইবে? তাহা হইলে একদিকে যেমন গৃহ-যুদ্ধের অপরদিকে তেমনই শাসক শক্তির সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্ঘর্ষেরও সম্ভাবনা ঘটিবে। সেই জন্যই মনে হয়, গণ-পরিষদ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইতেও পারে। আসামের প্রতিনিধিরা ব্যবস্থা পরিষদের নির্দেশ পালন করিলে বাঙলা ও আসাম প্রদেশদ্বয়ের অংশের অধিবেশনে যোগ দিতে বিরত থাকিবেন এবং তাহা হইলে বৃটিশ সরকার কি আসামকে বাঙলার প্রতিনিধিদিগের (তাঁহাদিগের মধ্যে মুসলমানরাই সংখ্যায় অধিক) রচিত শাসন-পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য করিতে পারিবেন?

ভারতের প্রাপ্য—যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ বৃটেনকে, প্রধানতঃ উপকরণে যে সাহায্য দিয়াছে, তাহার ফলে বিলাতের নিকট তাহার প্রাপ্য অনেক টাকা জমিয়া গিয়াছে। সেই ঋণ বৃটেন কিভাবে পরিশোধ করিবে, তাহার আলোচনার জন্য বিলাতী সরকারের কয়জন প্রতিনিধি ভারতে আসিতেছেন। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ—বৃটিশ শোষণে তাহার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে; এ অবস্থায় ভারতবর্ষ যদি তাহার প্রাপ্যের সামান্য অংশেও বঞ্চিত হয়, তবে তাহা তাহার প্রতি অবিচার করাই হইবে। তবে সে দুর্বল পক্ষ আর বটেন যে রাজনীতিক অত্যাচারের বাহু প্রসারিত করিয়া ভারতের সমৃদ্ধ বয়নশিল্প বিনষ্ট করিয়া স্বদেশে সেই শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা ইংরেজ ঐতিহাসিকই স্বীকার করিয়াছেন।

অন্তর্বর্তী সরকার ও চাকরী—অন্তর্বর্তী সরকার ভারতে সরকারী চাকরী সম্বন্ধে নিয়মের পরিবর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এখন কতকগুলি চাকরীতে বিলাতে লোক নিয়োগ হয়—চাকুরীয়ারা ভারত সচিবের সহিত চুক্তি করিয়া এদেশে চাকরীতে আগমন করেন। অন্তর্বর্তী সরকার সেই ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিতে চাহিয়াছেন, কারণ, সে ব্যবস্থা দেশের স্বাধীনতার সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন নহে। বাঙলার সচিব সংঘ কিন্তু সেই পরিবর্তনে সম্মত নহেন।

রবীন্দ্র-ভবন—বাঙলার পক্ষে গৌরবের কথা—নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক ভবনের যে সকল অংশ বিক্রীত হইয়াছিল, সে সকল সমিতির জন্য ক্রয়ার্থ বাঙলা সরকারকে ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ২ শত ৩০ টাকা দিয়াছেন। সমিতি বিশ্বভারতীকে প্রথম কিস্তি দান হিসাবে ৫ লক্ষ টাকা দিয়াছেন এবং রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার তহবিলের জন্য এক লক্ষ টাকা রাখিয়াছেন। এইরূপ কার্য যে গান্ধীজী ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইতে পারে, তাহা বর্ষকাল পূর্বেও অনেকের ধারণাতীত ছিল। সংবাদপত্রের পরিচালক সুরেশচন্দ্র যে অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, সেজন্য ভারতীয়মাত্রই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

শরৎচন্দ্র বসু—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে—এই সংবাদে সকলেই দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইবেন। আমরা তাঁহার নিরাময় কামনা করিতেছি।

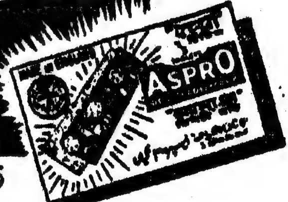
হিন্দু মহাসভা—গোরক্ষপুরে হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। সভাপতি মিস্টার ভোপৎকার সভার জন্য নূতন কার্য-পদ্ধতির উল্লেখ করেন।

বিহারী ও বাঙ্গালী দুর্গত—বাঙলার সরকার একদিকে বিহারী মুসলমান দুর্গতদিগের আশ্রয়, আহার ও পরিধেয়াদির ব্যবস্থা করিতেছেন, আর একদিকে ত্রিপুরার ম্যাজিস্ট্রেট নোয়াখালী হইতে আগতদিগকে ৭ দিনের মধ্যে স্ব স্ব গ্রামে ফিরিবার আদেশ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত স্থানে দুর্গতদিগকে সরকার যে চাউল দিতেছেন, তাহা যে মানুষের ব্যবহার্য নহে, তাহা গান্ধীজীও বলিয়াছেন।

চাউল ও তৈল—বাঙলা সরকারের বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের সুব্যবস্থায় চাউলের মূল্য বর্ধিত ও সরিষার তেলের পরিমাণ হ্রাস করা হইল।

পি, সি, দাস এণ্ড সন্স সুবাসিত
তরল আলতা
শত বৎসরের সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসাধন
এ. পি. দাস এণ্ড কোং ৭, অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, কলিকাতা।

'অ্যাসপ্রো'
পাওয়া যাচ্ছে!



জাল জিনিস নিয়ে প্রতারিত হবেন না। প্রত্যেকটি বড়ির উপরে 'অ্যাসপ্রো' নাম লেখা আছে কিনা দেখে নেবেন। "অ্যাসপ্রো" দশ মিনিটের মধ্যেই ব্যথা বেদনা ও জ্বর বন্ধ করে। বুকের বা পেটের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।



'অ্যাসপ্রো'র
নিয়ন্ত্রিত মূল্য
এক আনায় ৩টি বড়ি
দশ আনায় ৩০টি বড়ি

পরিবেশক:
জে. এল্. মরিসন, সন অ্যাণ্ড জোনস্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ : পোষ্টবক্স ৩০৭ কলিকাতা,
• টেলিফোন Calcutta 796

'অ্যাসপ্রো'
সব দোকানেই পাওয়া যায়

লাঞ্ছিত নোয়াখালি

(প্রত্যক্ষদর্শী)

(৫)

ইতিপূর্বে নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক আক্রমণ সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত না করিয়া পারা যায় না যে, এই বিরাট অপকাণ্ড পূর্ব বাঙলার নোয়াখালি নামক একটি জিলাতে ঘটিয়া থাকিলেও, ঘটনার মূল কারণগুলি নোয়াখালিতেই উদ্ভূত নহে। সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল যে আক্রমণমূলক কার্যক্রমের প্রচারকার্য প্রত্যক্ষভাবে করিয়া আসিতেছে, তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি নোয়াখালি। অপরদিকে নোয়াখালিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে আক্রমণ হইয়াছে, তাহার প্রকোপ পরোক্ষভাবে সমগ্র পূর্ব বাঙলার উপরেই পড়িয়াছে। নোয়াখালির প্রত্যক্ষ উপদ্রুত অঞ্চল হইতে যত সংখ্যক লোক বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বহু বেশি সংখ্যক লোক পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জিলার তথাকথিত 'অনুপদ্রুত' অঞ্চল হইতে আত্মরক্ষার আশায় অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। নোয়াখালিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে প্রাণ ও মর্যাদার নিরাপত্তা সম্পর্কে যে সংশয়, তাহা পূর্ব বাঙলায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সমস্যাটি আর নিছক নোয়াখালির সমস্যা নহে। ইহা সমগ্র পূর্ব বাঙলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা।

সরকার তরফে বলা হইয়া থাকে, ইহা 'আতংক' মাত্র, অর্থাৎ কাল্পনিক ভীতি। পূর্ব বাঙলার প্রতিটি জিলায় 'নোয়াখালি' অভিনীত হইবার পূর্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কেন ছুটাছুটি করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল, ইহা বোধহয় সরকারের চক্ষে বড় খারাপ লাগিয়াছে। সরকারের চক্ষে খারাপ লাগুক আর নাই লাগুক, বাস্তব সত্য হইল—নোয়াখালির ঘটনায় সমগ্র পূর্ব বাঙলা উপদ্রুত হইয়াছে।

চৌমুহনীতে আশ্রয়প্রার্থীদিগের নিকট প্রতিদিন আমরা যে বিবরণ শুনিয়াছি এবং নোয়াখালি পুনর্বসতি সমিতির নিকট আশ্রয়-প্রার্থীরা যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে শুধু অত্যাচারের ব্যাপকতা প্রমাণিত হয় নাই, অত্যাচারের 'বৈচিত্র্য'ও সমভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে, প্রতিবেশী হইয়া প্রতিবেশীর উপর নির্বিকারভাবে এত বিচিত্র অত্যাচার করিবার প্রেরণা দুর্বৃত্তেরা কোথায় পাইল? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যথেচ্ছা নিপীড়ন করা যাইতে পারে, মনে মনে এই আশ্বাস দুর্বৃত্তদিগের মনোবল (?) নিশ্চয় বৃদ্ধি করিয়াছিল। নোয়াখালি পুনর্বসতি সমিতি কয়েক শত নরনারীর নিকট হইতে যে বিবৃতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার এক কপি



আপন ভিটা ছাড়িয়া গ্রামবাসীদের বিদেশ যাত্রা

থানাতে এবং এক কপি জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সবই হয়তো উপেক্ষার সহিত একপাশে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে।

লুণ্ঠিত সামগ্রী কোথায় গেল?

আমরা বিস্মিত না হইয়া পারি নাই যে, ঘটনার পর এক মাসের মধ্যেও পুলিশ লুণ্ঠিত সামগ্রী উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হয় নাই। শুনিয়াছি, দুই-এক ক্ষেত্রে সামান্য কিছু লুণ্ঠিত দ্রব্য পুলিশ উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু তাহা 'পথে পাওয়া চৌদ্দ আনা' গোছের হঠাৎ প্রাপ্তির ব্যাপার মাত্র; তল্লাসী করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তল্লাসী করিয়া লুণ্ঠিত সামগ্রী উদ্ধার করা হয় নাই। থানাতে এজাহার পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে বিস্তৃতভাবে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। জীবন্ত গরু হইতে আরম্ভ করিয়া তৈজসপত্র, কাঠের আসবাব প্রভৃতি বৃহদাকার সামগ্রী সবই লুণ্ঠকের ঘরে বিরাজ করিতেছে, অথচ পুলিশ উঁকি দিয়া তাহার সন্ধান করিতে প্রস্তুত নহে। ঘরের চালা হইতে শত শত টিন অপহৃত হইয়া লুণ্ঠকের আঙিনায় নূতন গৃহের শোভা বর্ধন করিতেছে, কিন্তু কেন যে তাহা কর্তৃপক্ষের চোখে পড়ে না, তাহার রহস্য বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া ইতিমধ্যে একটা বড় রকমের কারবারও হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানিতে পারিলাম এবং এই অপব্যবসায়ে যাহারা মহাজনী করিয়াছেন, তাঁহাদের গৃহে তল্লাসী হয় নাই। লুণ্ঠিত বন্দুকগুলির মধ্যে একটিও উদ্ধার হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। নৌকা ভর্তি করিয়া বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য অন্য জিলায় স্থানান্তরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কলিকাতার হাঙ্গামার সময়ে লুণ্ঠিত বহু দ্রব্য বিহারে নানা জেলায় পুলিশ উদ্ধার করিয়াছে, এইরূপ সংবাদ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু নোয়াখালির লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি পূর্ব-বাঙলার কোন জেলায় পুলিশ সন্ধান করিতে পারিয়াছে, এরূপ সংবাদ শুনা যায় নাই। অথচ লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিছু অংশ যে নোয়াখালির পার্শ্ববর্তী জিলাগুলিতে গিয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

জনৈক আশ্রয়প্রার্থীর নিকট আমরা তাঁহার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া দুঃখের মধ্যেও হাসিয়াছিলাম। ভদ্রলোক স্ব-গ্রাম ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন গ্রামের ভিতর দিয়া বহুকষ্টে দুর্বৃত্তদিগের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চৌমুহনীর দিকে আসিতেছিলেন। তাঁহার গৃহ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছিল। স্ব-গ্রাম হইতে পনের মাইল দূরে একটি গ্রামে অটক অবস্থায় জনৈক স্থানীয় ব্যক্তি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে এক গেলাস জল পান করিতে দেন।



নোয়াখালিতে প্রার্থনা-সভায় মহাত্মাজী

গেলাসটি তাঁহারই, ভদ্রলোকের নাম গেলাসে চিহ্নিত ছিল।

বিচিত্র ঘটনাবলী

অত্যাচারের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য আমরা পাইয়াছি এবং নোয়াখালি পুনর্বসতি সমিতিতে প্রদত্ত বিবৃতিগুলি হইতেই তাহার সার সংকলন করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল: গ্রামগুলির নাম উহ্য রহিল।

(১) শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদারের বিবৃতি—"আমাদিগের গ্রামে এক হিন্দু দম্পতিকে আক্রমণকারীরা পুনরায় নূতন ধর্মমতে বিবাহ দিয়াছে।"

(২) শ্রীযতীশচন্দ্র দত্তের বিবৃতি—"আমাদের বাড়িতে প্রতিদিন লোক আসিয়া ভোর হইতেই নূতন ধর্মমতে প্রার্থনা করিবার জন্য আমাদিগকে লইয়া যাইত। দিনে পাঁচ-বার এইরূপ করা হইত। ফলে আমরা আহার্য রন্ধন করিবার সময় পাইতাম না। মেয়েদিগকে নূতন ধর্মমতে প্রার্থনা পাঠ করাইবার জন্য নিয়মিতভাবে বাড়িতে লোক আসিত।"

(৩) দুর্গাপ্রসন্ন আচার্যের বিবৃ[illegible] "আমার ভ্রাতার দুইটি মেয়েকে ভিন্ন ধ[illegible] দিগের সহিত বিবাহ দিবার জন্য, দুর্বৃ[illegible] প্রস্তাব করে।"

(৪) উপেন্দ্র দাসের বিবৃতি—"আ[illegible] বাড়ির লোকদিগের দ্বারাই আমার বাড়ির [illegible] জবাই করান হইয়াছে। আমার গ্রামের [illegible] ২২ বৎসর বয়স্কা মেয়ের সহিত তা[illegible] জেঠতুতো ভ্রাতাকে (বয়স ১৯ বৎসর) [illegible] ধর্মমতে বিবাহ করান হইয়াছে।"

(৫) যজ্ঞেশ্বর কুরীর বিবৃতি—"[illegible] পিতা মারা গেলে তাঁহার দেহ কবরস্থ [illegible] আমাদিগকে বাধ্য করা হয়।"

(৬) রমেশচন্দ্র সূত্রধরের বিব[illegible] "আমার গ্রামের জনৈকা স্ত্রীলোক মারা [illegible] তাহার দাহকার্যে বাধা দেওয়া হয় এবং [illegible] দেহ কবর দিতে বাধ্য করা হয়।"

(৭) সূর্যমোহন সাহার বিবৃতি "[illegible] দল বাঁধিয়া যখন সশস্ত্র পুলিশ প্র[illegible] রক্ষণাধীনে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে[illegible] তখন একদল দুর্বৃত্ত আমাদিগকে আক্রমণ[illegible]



নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি গান্ধীজী যখন স্বল্পাহার গ্রহণ করিতেন সেই সময় তিনি কাজিরখিল হইতে রামগঞ্জ প্রার্থনা সভায় যাইতেছেন।

দুর্বৃত্তদিগের নেতারা ইংরেজি ভাষায় কথা বলিতেছিল, যথা—Halt! You go! ইত্যাদি।"

(৮) তরণীকান্ত লোধের বিবৃতি—আমার গ্রামের একটি গাভিকে জবাই করিয়া আমাদিগকে খাওয়ান হইয়াছে।"

(৯) ক্ষমাকান্ত ভৌমিকের বিবৃতি—দুর্বৃত্তেরা আক্রমণ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নানা অশ্লীল ভাবভঙ্গী ও কথা বলিতে বলিতে হাতের শাঁখা ভাঙিতে ও সিঁথির সিঁদুর মুছিতে থাকে।"

(১০) রমেশচন্দ্র ধুপীর বিবৃতি—আমাদের গ্রামের বিবাহযোগ্যা মেয়েদের ভিন্নধর্মীয় পুরুষদিগের সহিত বিবাহ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইতেছে।"

(১১) নিত্যানন্দ সরকারের বিবৃতি—আমাদের একটি বাছুর (দুর্বৃত্তেরা) হত্যা করে এবং আমাদের বাড়িতেই রান্না করিয়া ভিন্ন লোকজনকে খাওয়ায়।"

(১২) হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর বিবৃতি—আমাদের গ্রামের এক বৃদ্ধকে চিঠিতে দেবতার নাম লিখিতে দুর্বৃত্তেরা বাধা দেয়, কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।"

(১৩) সতীশচন্দ্র দাসের বিবৃতি—আমাদের গ্রামের একটি প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে অন্যধর্মীয় ছয় ব্যক্তি বিবাহ করিবার দাবী জানাইয়া রাখিয়াছে।"

(১৪) হারানচন্দ্র দত্তের বিবৃতি—"আমার গ্রাম হইতে লোকজন অন্যত্র চলিয়া যাইতেছিল। দুর্বৃত্তদিগের একটি জনতা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কতিপয় সশস্ত্র পুলিশসহ হাবিলদার ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। হাবিলদার আক্রমণকারী জনতার উপর গুলী চালাইবার নির্দেশ দেয়, কিন্তু পুলিশ নির্দেশ অমান্য করে।"

(১৫) বসন্তকুমার নন্দদাসের বিবৃতি—"আক্রমণকারীরা লুঠের পর বাড়ির সমস্ত পুরুষকে বাঁধিয়া লইয়া যায়। পুরুষেরা পরে বাড়ি ফিরিয়া জানিতে পারে যে, মেয়েদের



শ্রীরামপুরে পরিভ্রমণে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহরু: পণ্ডিতজী একটি [illegible] লাফাইয়া পার হইতেছেন; কিন্তু মহাত্মাজী যুবকের ন্যায় সাঁকোর উপর দিয়া যাইতেছেন।

অনেকের ধর্মনাশ করা হইয়াছে। গ্রামের দুইটি স্ত্রীলোক নিখোঁজ হইয়াছে। থানার দারোগা এজাহার লইতে অস্বীকার করে। ......আক্রমণকারী দলের কয়েকজন আসিয়া আমার নিকট সাদা কাগজে দস্তখত লইয়া যায়।"

(১৬) প্রমদাচরণ জলদাসের বিবৃতি—"নয়-দশজন দুর্বৃত্ত আক্রমণ করিয়া আমাকে বাঁধিয়া রাখে এবং আমার সৎমাতা ও স্ত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে। থানার দারোগা আমার এজাহার লইতে অস্বীকার করে। দুই দিন পরে নোয়াখালি গিয়া আমি জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ঘটনার বিবরণ জানাইয়াছি।"

(১৭) হরিকুমার চক্রবর্তীর বিবৃতি—"আমার দুইটি নাবালিকা কন্যার উপর দুর্বৃত্তগণ নানাপ্রকার অত্যাচার করে।"

(১৮) ইন্দ্রকুমার দে'র বিবৃতি—"মেয়েদের কপালের সিঁদুর (দুর্বৃত্তেরা) পা দিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে।"

(১৯) পরিমল সেনের বিবৃতি—"আমার পরিচিত জনৈক গ্র্যাজুয়েট ব্যক্তিকে মক্তবে শিক্ষালাভ করিবার জন্য দুর্বৃত্তেরা ভর্তি করিয়া দিয়াছে।"

(২০) বিজয় রায়ের বিবৃতি—"আমার গ্রাম লুঠ করিবার পর দুর্বৃত্তেরা আমাকে ধর্মান্তরিত করে এবং অন্য একটি গ্রাম লুঠ করিবার সময় আমাকে তাহাদের দলে মিশিয়া সঙ্গে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে।

এই সকল বিচিত্র অত্যাচারের আরও উদাহরণ আছে। কোন কোন গ্রামে ধর্মান্তরিত লোকেরা আঙিনায় গোবর নিকাইতে গিয়া পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে: উল্লিখিত ঘটনাবলী ইহাই প্রমাণিত করে যে, দুর্বৃত্তদিগের উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য 'লুণ্ঠন' নহে। লুণ্ঠন উদ্দেশ্য সাধনের অন্যতম পন্থা মাত্র। উদ্দেশ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ধর্ম ও সংস্কৃতিভ্রষ্ট করিয়া একটি স্ব-ধর্মীয় ক্রীতদাস শ্রেণীর পর্যায়ে পরিণত করা; কিন্তু এই দুঃসাহস আসিল কোথা হইতে?



দত্তপাড়া গ্রামে একটি সভায় গান্ধীজীর উপস্থিতিতে নোয়াখালির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বক্তৃতা দিতেছেন

সাহিত্য সংবাদ

ভাগলপুরে প্রতিযোগিতা

ভাগলপুর বাণী সঙ্ঘের উদ্যোগে 'সরস্বতী-পূজা' উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছোট গল্প ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছে। রচনার বিষয় যে কোন একটি—(১) স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংসার স্থান, (২) বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাঙালীর প্রধান সমস্যা। ছোট গল্পে প্রথম, দ্বিতীয় এবং রচনায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হইবে। যাঁহারা প্রতিযোগিতায় যোগদানে ইচ্ছুক অনুগ্রহপূর্বক ২৫শে জানুয়ারী ১৯৪৭ তারিখের মধ্যে বাণী সঙ্ঘের সম্পাদকের নিকট রচনা পাঠাইবেন। বিশেষ বিবরণের জন্য শ্রীবিভূরঞ্জন দে, সম্পাদক, বাণী সঙ্ঘ, সতীশ সরকার রোড, ভাগলপুর—এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।



আমরা যখন ইস্কুল কলেজের ছাত্র তখন বাঙালী যে অত্যন্ত সেণ্টিমেণ্টাল জাত সে কথাটা ঘরে পরে সর্বত্র শুনতে হ'ত। সেণ্টিমেণ্টাল কথাটা গালাগালের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি নিজে ভাবপ্রবণতাকে কখনো দুর্বলতার চিহ্ন বলে মনে করিনি। ভাবপ্রবণতা ছাড়া পৃথিবীতে কোনো বড় কাজ হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। ইদানীং এ অপবাদটা আর তেমন শোনা যায় না। সেটা সুলক্ষণ কি দুর্লক্ষণ জানিনে। আজকালের ইস্কুল কলেজের ছেলেদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি, তারা বাস্তবিক আমরা যা ছিলুম তার চাইতে একটু বেশি সেয়ানা। এটা অবশ্য হতে বাধ্য। সংসার যত বেশি কুটিল এবং নির্মম হবে মানুষের মন তত বেশি কঠিন হবে। ওটা আত্মরক্ষার ধর্ম। সৃষ্টির প্রথম জীব ছিল জেলি মাছের মতো তুলতুলে নরম দেহ, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে সেই জীবই ক্রমে অস্থিসবল হয়ে উঠেছে। এটা স্বভাবের নিয়ম। জাপানি বোমার অপমৃত্যু আর দুর্ভিক্ষের অপমৃত্যুর ধাক্কায় বাঙালী ছেলেরা এই ক'বছরেই অনেকখানি সবল হয়ে উঠেছে। আর এখন দেশময় যে অগ্নিজ্বালা চলছে তার ফলে আরো কঠিন হবে বাঙালীর মন, বাঙালীর পণ।

আমরা কলেজে পড়বার সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের একেবারে উদ্‌ব্যস্ত করে তুলেছিলেন। আমরা তখন শুদ্ধ অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ আয়ত্ত করবার চেষ্টায় নিযুক্ত আর আচার্যদেব নিরন্তর আমাদের কানে জপ করতে শুরু করেছেন—

It is not simply the British conquest but the Marwari conquest of Bengal that has impoverished the Bengali people.

বাঙালীকে তিনি রাতারাতি মারোয়াড়ী করে তুলবার চেষ্টা করছিলেন। সেদিনকার সমগ্র ছাত্রসমাজকে তিনি রীতিমতো চঞ্চল করে তুলেছিলেন। কেবল মাত্র লোটা কম্বল সম্বল করে মারোয়াড়ী ব্যবসাদার বাঙলা দেশ থেকে কোটি কোটি মুদ্রা নিয়ে যাচ্ছে। আমহার্স্ট স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মোড়ে একজন মারোয়াড়ী পান বিড়ি এবং সরবৎ বিক্রি করে যে কি পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করছে তারই ফিরিস্তি দিয়ে তিনি আমাদের চমৎকৃত করেছিলেন। সে লোকটা আমাদের চোখে রীতিমতো একটি hero হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর trade secretটা আয়ত্ত করবার জন্য বহুদিন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তার সরবৎ খেয়েছি।

আচার্যদেবের উপদেশ একেবারে মাঠে মারা যায়নি। তার কারণও ছিল। তখন চাকরির বাজার মন্দা, বেকার সমস্যা ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। কলেজ স্কোয়ার থেকে ডালহাউসি স্কোয়ারের রাস্তাটা ক্রমে দুর্গম হয়ে উঠছিল। গোলদীঘির জীবেরা লালদীঘিতে গিয়ে আর থৈ পায় না। ধীরে ধীরে বাঙালী ছেলেরা ব্যবসায় নামতে লাগল। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে, শিক্ষার গুমোর যায় না ব্যবসায় নাবলে। দেখা দিল গ্রাজুয়েট দর্জির দোকান, গ্রাজুয়েট মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ইত্যাদি। বাঙালী যে মনে প্রাণে ব্যবসাকে গ্রহণ করেনি এখানেই তার প্রমাণ। অর্থাৎ ব্যবসাটার মধ্যে dignity নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলমোহর দিয়ে কোন রকমে ব্যবসাটার মানরক্ষা। কিন্তু ঐখানেই প্রহসনটার শেষ নয়। বাঙালীর কাব্যিয়ানা যাবে কোথায়? মরবার সময়ও বাঙালীর ছেলে কাব্যি করে তবে মরে, গলায় দড়ি দেবার আগে নীল কাগজে লিখে রেখে যায়—যে বুঝবার সে বুঝবে! কাজেই দোকানদারি করতে গিয়ে শিক্ষিত ছেলেরা কাব্যিয়ানা করবে তাতে আর বিচিত্র কি! অতএব দর্জির দোকানের নাম হ'ল সীবনালয়। সীবন কথাটার মানে ঠিক জানা ছিল না। আমি ভেবেছিলাম বোধ করি কবরেজি ওষুদের দোকান টোকান হবে,—ওষুদ পথ্যি সেবনের নির্দেশ পাওয়া যায়। জুতোর দোকানের নাম—শ্রীচরণেষু, উপানৎ শিল্প কিম্বা পাদুকা প্রতিষ্ঠান। আর চা-এর দোকানের নাম—পান্থ পেয়াবাস।

অপরের কথা বলে লাভ কি? এবার আমার কীর্তির কথাটা শুনুন। আমি যে কোনোকালে ব্যবসার কথা কল্পনাও করতে পারি এমন কথা আমার বন্ধুরা কিছুতে বিশ্বাস করতেই চান না। সবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছি। যেদিন ওখানে প্রবেশ করেছিলাম সেদিন পৃথিবীটি ছিল বিরাট। ছ'বছর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাট পার হয়ে দেখি পৃথিবীটা সংকুচিত হয়ে বাড়ির উঠোনটির মতো ছোট হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়-নিষ্ক্রান্ত ব্যক্তি সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় অসহায়। তখন ছেলেদের একমাত্র উপায় ছিল মোটা পণে বিয়ে করে বিবাহলব্ধ অর্থের দ্বারা ব্যবসার ফিকির দেখা। অর্থাৎ বড়বাজার মাৎ করবার জন্য বউবাজারে উঁচু দর হাঁকা। আমাদের ভাগ্য দোষে সেদিকেও আমাদের সুবিধে হয়নি। কাজেই আমরা তিন বন্ধুতে স্থির করলুম, আমাদের সামান্য সংস্থান নিয়ে আমরা ছোটখাট একটি চা-এর দোকান দিয়ে বসব। খুব সামান্য আরম্ভ, কিন্তু ব্যবসা যখন ফেঁপে উঠবে তখন বিরাট আকারে করা যাবে—সে জিনিসের খুব অভিনব প্ল্যান আমাদের মাথায় ছিল। নানা রকমের খবরের কাগজ, দিশি বিলিতি ম্যাগাজিন, এমন কি, বাছা বাছা বই-এর একটি ছোটখাট লাইব্রেরী থাকবে। বাঁধা খদ্দেরদের নিয়ে প্রতি মাসে একটি লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হবে এবং লাঞ্চ-সভায় সাহিত্য এবং রাজনীতির আলোচনা হবে। আমাদের দোকানকে কেন্দ্র ক'রে একটি নতুন ইনটেলেকচুয়াল সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠবে ভেবে আমরা বিষম পুলকিত হ'য়ে উঠেছিলাম। বাঙালী সন্তানের ইনটেলেকচুয়েল স্নবারি যাবে কোথায়? ভাবটা যেন ব্যবসাটা উপলক্ষ্য মাত্র নব্য বাঙলা সৃষ্টির জন্যই আমাদের এই কৃচ্ছ্রসাধন।

যাক্‌গে, মির্জাপুরে অঞ্চলে একটি ছোট্ট ঘর নিয়ে আমাদের দোকান খোলা হ'ল। দোকানের নাম—Tea and Gossip. মস্ত একটা টেবিলের চার পাশে খানদশেক চেয়ার বসিয়ে আমরা তো জাঁকিয়ে বসলুম। আমাদের জনকয়েক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাঁরা দু'বেলাই এসে বসেন। এক কাপ চা নিয়ে এমন প্রভূত পরিমাণ Gossip শুরু করেন যে আর উঠবার নাম নেই। নতুন কোনো খদ্দেরের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ। দিনের পর দিন যায়, একটি লোকের দেখা নেই। অথচ আমাদের দোকানের ঠিক সুমুখেই একটা প্রকাণ্ড মেস। ঐ মেসটা ছিল আমাদের মস্ত বড় ভরসা। কিন্তু ওখান থেকে একটি প্রাণীও আমাদের চা চেখে দেখবার জন্য এল না। এদিকে আমাদের যৎসামান্য মালধন দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে। কিন্তু আমাদের আড্ডা সমানভাবেই চলছে—জন দশেকে জটলা করি চেয়ার চেপে বসে। একদিন একটি ব্যক্তি সসংকোচে প্রবেশ করলেন। ইনি ঐ মেসের অধিবাসী। খুব বিনীতভাবে জিগ্‌গেস করলেন, এটা কি চায়ের দোকান? আমরা তো অবাক! সে কি মশাই, আপনাদের নাকের তলায় বসে আছি এ্যাদ্দিন ধ'রে আর আপনারা কিনা—। ভদ্রলোক বল্লেন, আর বলবেন না, এই নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে, সবাই বলছিলেন, ওটা দোকান নয়, নিশ্চয় ক্লাব ট্লাব হবে। দোকানটার নামও এমন দিয়েছেন, ঠিক দোকান বলে বোঝা কঠিন। আর খদ্দের তো দেখছি বাঁধা ক'জন। আমরা ভাবলুম, নিশ্চয় ওটা ক্লাব।

মাস ছয়েক মাত্র দোকান টিকেছিল। Gossipএর কল্যাণে পরম আনন্দেই দিন কাটছিল। এমন কি, ব্যবসা expand ক'রে খদ্দেরের সংখ্যাও চৌদ্দ পনেরোতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পকেট-এর পয়সা খরচ ক'রে আরো কিছুদিন আমরা ব্যবসা চালাতাম যদি না হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলুম যে, নতুন খদ্দেরদের মধ্যে অধিকাংশই পুলিশের স্পাই। এছাড়া আরো দু' একজন বন্ধু সপ্তাহে এক আধদিন আসতেন। এর মধ্যে নী—বাবু (তিনি এখন অতিশয় পদস্থ ব্যক্তি) রোজই যাবার বেলায় আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে কানে কানে বলতেন, টেবিলটা বিক্রি কর[illegible] আগে আমাকে অবশ্য জানা[illegible] টেবিল হবে।

অনুবাদ সাহিত্য

মর্মান্তিক

অ্যান্টন শেকভ

শীতের সন্ধ্যা। ভীষণ বরফ পড়ছে। বরফে একেবারে চারিদিক ছেয়ে গেছে। রাস্তায় সদ্য-জ্বালা আলোর সার,—ঘরের ছাদ, ঘোড়ার পিঠ গলা, লোমওয়ালা চামড়ার টুপী সব কিছুতে বরফ। গাড়োয়ান-জোনাহ্ পোটাপভের সারা গা বরফে এমনি সাদা হয়ে গেছে যে, দেখাচ্ছে তাকে একটা ভূতের মত। তার 'স্লে'-গাড়ির উপর হাত পা গুটিয়ে চুপ করে বসে আছে সে,—একটুও নড়ছে না। আকাশের সমস্ত বরফ যদি এক সঙ্গে তার গায়ে গড়িয়ে পড়ত তা'লেও বুঝি সে হাত দিয়ে গায়ের বরফ ঝেড়ে ফেলত না।... তার ছোট্ট ঘোড়াটাও বরফে একেবারে সাদা হয়ে গেছে,—নড়বার লক্ষণ তারও নেই। চুপ করে পা না নেড়ে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে যে, খুব কাছে থেকে দেখলেও মনে হবে এ বুঝি এক পেনি দামের কাঠের খেলনা ঘোড়া। বোধ হয় ঘোড়াটা আপন মনে কিছু ভাবছে। আশ্চর্য নয়। লাঙল থেকে খুলে ধূসর মাঠ থেকে ছিনিয়ে কেউ যদি তাকে এই চোখ ধাঁধানো আলোর ঘূর্ণি কোলাহল মুখর জন-সমুদ্রের মাঝে ঠেলে দেয় তবে ভাববে সে এ আর আশ্চর্য কি!...

জোনাহ্ আর তার ঘোড়া বহুক্ষণ এমনি নিশ্চল হয়ে আছে। দুপুরের খাওয়ার আগে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে,—এ পর্যন্ত একটি ভাড়া জোটে নি। এইবার কুয়াশা নামছে শহরে,—রাস্তার আলোগুলি যেন একটু খোলসা হতে শুরু করেছে,—রাস্তায় লোক চলাচলও যেন একটু বেড়ে উঠেছে। কোলাহল বাড়ছে।

হঠাৎ জোনাহের কানে এল,—এই গাড়োয়ান,—ভাড়ায় যাবে? ভাইবর্গের দিকে যেতে হবে।

শুনে চমকে উঠল জোনাহ্,—চোখের পাতার লোমগুলিও বরফে ছাওয়া,—তারই ভিতর দিয়ে সে কোন রকমে দেখলে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক সামরিক কর্মচারী,—গায়ে তার মাথায়-ঢাকনাওয়ালা এক ওভার কোট।

অফিসারটি বললে,—ভাইবর্গের দিকে যাব,—বুঝলে?...একি ঘুমুচ্ছ না কি তুমি,—শুনতে পাও না,—ভাইবর্গের দিকে...

গাড়োয়ান একটিও কথা না বলে তার সম্মতি জানাতে শুধু ঘোড়ার লাগামটায় একটা ঝাঁকি দিলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাঁধ আর ঘোড়ার পিঠ থেকে ডেলা ডেলা বরফ সব এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল...অফিসারটি 'স্লে'র ভিতরে উঠে বসলেন। গাড়োয়ান ঠোঁটটা একবার চেটে নিলে,—তারপর রাজহাঁসের মত [illegible] একটু সিধে হয়ে বসলে। লম্বা চাবুকটা দিয়ে ছপা[illegible] একটা শব্দ করলে সে,—সেটা এখন প্রয়োজন বলে নয়,—পুরানো অভ্যাস! ঘোড়াটাও গলা বাড়িয়ে লগির মত পা কয়টা বাঁকিয়ে চলতে শুরু করলে। ভাবটা যেন—যেখানে খুশি নিয়ে চল!

—এই উল্লুক,—গাড়ি চালাতে জানো না? কোথায় চালাচ্ছ? জোনাহ্ শুনলে জনতার ভিতর থেকে কে যেন তাকে উদ্দেশ্য করেই কথা-গুলি বলে উঠল,—তাল কানা নাকি হে,—ডাইনে ঘেঁষে চালাও।

অফিসারটিও রুক্ষ মেজাজে বলে উঠলেন, —গাড়ি চালাতে শেখ নি? ডাইনে ঘেঁষে চালাও।

একজন কোচ্‌মান্ মুখ খিঁস্তি করে উঠল, —কে একজন দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে ঘোড়ার মুখে ধাক্কা খেয়ে কটমট করে চেয়ে নিজের আস্তিন থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেল। জোনাহ্ তার জায়গায় বসে ছটফট করতে লাগল—তপ্ত কয়লার মাঝে পড়েছে যেন সে। একবার কনুইটা এগিয়ে দেয়—একবার পাগলের মত এদিক ওদিক তাকায়,—কি করতে হবে—কোথায় আছে সে—কেনই বা এখানে—কিছুই বুঝে উঠে না।

অফিসারটি তার অবস্থা দেখে ঠাট্টা করে বলেন,—লোকগুলো কি পাজি—না? ওরা যেন একেবারে ষড়যন্ত্র করে এসেছে—তোমার সঙ্গে ধাক্কা লাগাবে,—তোমার ঘোড়ার ক্ষুরের তলে এসে পড়বে...

জোনাহ্ তার গাড়ীর আরোহীর দিকে চায় একবার,—ঠোঁট দুটো তার নড়ে ওঠে...কি যেন একটু বলতে চায় সে,—কিন্তু এক অদ্ভুত কর্কশ গরগর শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরোয় না তার গলা থেকে।

কি,—ব্যাপার কি? অফিসার জিজ্ঞাসা করেন।

গলাটা অতি কষ্টে একটু পরিষ্কার করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জোনাহ্ বলে,—এক হপ্তাও হয়নি,—সার,—আমার ছেলেটা মারা গেছে।

আহা,—কি হয়েছিল?

জোনাহ্ তার সারাদেহটা আরোহীর দিকে এগিয়ে নিয়ে বলে,—ভগবান জানেন,—হয়েছিল বোধ হয় জ্বরই,...তিনদিন হাসপাতালে ছিল,—তারপর সব শেষ হয়ে গেল...সবই তাঁর ইচ্ছা।

সামনের অন্ধকারের ভিতর থেকে কে যেন ধমকে ওঠে,—এই,—কি করে চালাচ্ছ গাড়ি তুমি,—দেখে চালাতে পারো না,—কানা না কি?

সঙ্গে সঙ্গে আরোহীও তাড়া দিতে থাকেন,—এই, জোরে হাঁকাও,—জোরে,—এমনি করে চালালে কালও পৌঁছুতে পারব না আমরা,—জোরে—

গাড়োয়ান নিজের ঘাড়টা সিধে করে নিয়ে অর্ধেক দাঁড়িয়ে মুখখানা বিকৃত করে ঘোড়ার পিঠে শপাং করে লাগাল এক চাবুক। এরপর আরোহীর মুখের দিকে কয়েকবার তাকালে সে, —অফিসার চোখ বুজে পড়ে রয়েছেন,—জোনাহের কথায় কান দেবার ইচ্ছা আর তাঁর নেই।...ভাইবর্গের দিকে ভাড়া নামিয়ে দিয়ে এক সরাইখানার বাইরে সে তার গাড়ি রাখলে, তারপর আবার জড়োসড়ো হয়ে চুপ করে বসে রইল সে। উপর থেকে বরফ পড়ে আবার তার —আর তার ঘোড়ার দেহ চুণকাম হতে লাগল। একঘণ্টা কেটে গেল,—তারপর দু ঘণ্টা...

রাস্তা দিয়ে 'পলোশ' পরে ছপ্ ছপ্ শ[...] করতে করতে তিনটি অল্প বয়স্ক লোক আস[...] —তারই গাড়ির দিকে। তাদের দু'জনের [...] ছিপছিপে চেহারা,—আর একজন কুঁজো।

খনখনে গলায় কুঁজো বললে,—এই গাড়োয়ান,—ভাড়ায় যাবে—পুলিশ ব্রিজ?—আমরা তিনজন,—কুড়ি কোপেক দেব।

জোনাহ্ ঠোঁট চেটে—ঘোড়ার লাগামটায় দিলে—এক ঝাঁকি। মাত্র কুড়ি কোপেকে অবশ্য এতদূর যাওয়া যায় না,—কিন্তু পয়সা-কড়ির কথা এখন তার মনেও আসছে না—এক রুবল—কি পাঁচ কোপেক—সবই সমান—এখন তা[...] কাছে: সে চায় শুধু যে কোন একটা ভাড়া খাটতে।...তরুণ তিনটি নিজেদের মাঝে ঠেলা ঠেলি আর মুখ খিস্তি করতে করতে—গাড়িতে উঠল,—কিন্তু মুস্কিল হল—এখন কোন দুইজন বসবে,—আর কে দাঁড়াবে! গাড়িতে তিনজনের বসবার জায়গা নেই। অনেক তর্কাতর্কি [...] মুখখিস্তির পর ঠিক হ'ল—কুঁজোটি দাঁড়াবে—কারণ সে বেঁটে। সেই সুবিধে!

কুঁজো জোনাহ্‌র ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে তার পিঠের উপর নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে হুংকার দিয়ে উঠল,—এই ফুর্তিসে চালাও,—আচ্ছা করে চাবুক লাগাও তোমার ঘোড়াকে,—এ ত দেখছি আবার মাদি ঘোড়া।......বাপরে, কি টুপি পরেছ তুমি হে,—সারা পিটার্সবা[...] শহরে এমন টুপি আর দ্বিতীয় মিলবে না।

কি রকম একটু অদ্ভুত বিকট হাসি[...] আওয়াজ করে জোনাহ্ বলে,—আমার ঐ ভা[...]

নাও, নাও,—এখন জোরে হাঁকাও। সা[...] পথ তুমি এমনি করে চালাবে না কি?—ঠিক[...] চালাও,—নইলে এমনি রদ্দা লাগাব.....[...] লোক দুটির একটি আবার এর মাঝে বল[...] শুরু করেছে,—মাথাটা আমার একেবারে গে[...] হে,—কা'ল 'ডাকম্যাসভ'দের বাড়িতে টমি অ[...] আমি চার বোতল কগ্‌নাক সাবাড় করেছি।

অপর ঢেঙাটি অমনি বলে উঠল,—এ[...] যা তা মিছে কথা বলিস না—মাইরি!

একেবারে খাঁটি সত্যি কথা বলছি,—কি[...]

করে বলতে পারি।

তোর কিরে—রেখে দে!

একটা চাপা উদ্ভট হাসির শব্দ বেরুল জোনাহ্‌র মুখ থেকেঃ বেশ ফূর্তি করছেন আপনারা,—অ্যাঁ!

চুপ রও,—কুঁজো হুংকার দিয়ে উঠল,—একটু জোরে চালাবে তুমি,—না এমনিই চলবে—একনি করে গাড়ি চালাও তুমি না কি?—চাবুক লাগাও ঘোড়াকে,—জোরসে চালাও—

কুঁজোর বাঁকা বেঁটে দেহ—এবং তার খনখনে গলার আওয়াজ জোনাহ্ এবার বেশ অনুভব করতে পারছে,—ওর ধমকানিও সে বেশ শুনতে পাচ্ছে,—চারিদিকের লোকজনও এখন তার বেশ চোখে পড়ছে। বুকের চাপা ভাবটা এখন যেন অনেকটা কেটে কেটে যাচ্ছে। কুঁজো যা মুখে আসছে তাই বলে বকে যাচ্ছে—আর মুখখিস্তি করছে। অবশেষে ভীষণ রেগে কি একটা বলতে গিয়ে সে কেসে ফেললে। ঢেঙা দুটি তখন ভেরা পেট্রোভনা নামে একটি মেয়েকে নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। জোনাহ্ অপেক্ষা করছিল—কখন ওরা একটু থামে। একবার যখন ওরা একটু থামল তখন এদিক ওদিক একবার চেয়ে সে বলে উঠল,—এই সপ্তাহে—বুঝলেন—আমার ছেলেটা...... মারা গেল।

কুঁজো কাসির পরে রুমাল দিয়ে মুখ মুছেচিল,—একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে,—আমাদের সবারই ঐ দশা হবে একদিন।...... চাবুক লাগাও ঘোড়াকে—করছ কি!..... আর এমন গাড়িতে চড়ছি না আমি কোনদিন। কি চলে, বাপ রে!......কখন পেঁছব আমরা!

দে না বুড়োকে এক ঘা বসিয়ে,—একটু চাঙ্গা হয়ে উঠুক।

এই বুড়ো,—শুনছ,—ঠিক ঠিক চালাও,—নইলে গাট্টা লাগাব বলছি। ঘোড়াটা ঠিক মত চালিয়ে তুমি বরং হেঁটে চল।......শুনছ আমার কথা,—না কানেই ঢুকছে না?—হতভাগা!—

—বলেই কুঁজো জোনাহ্‌র পিঠে লাগালে এক ঘুষি।

জোনাহ্—ঘুষিটা স্পর্শেন্দ্রিয়ের চেয়ে শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করলে বেশি। অদ্ভুত এক রকম হাসির আওয়াজ করে সে আপন মনেই বলে উঠল, ফূর্তিরই সময় এদের,—ভগবান এদের সুখে রাখুন।

ঢেঙা লোক দুটির একটি একটু নরম সুরেই জিজ্ঞাসা করলে,—গাড়োয়ান,—কে কে আছে তোমার, তোমার পরিবার আছে?

কি রকম একটা অদ্ভুত বিকট আওয়াজ করে—জোনাহ্ বললে, আমার পরিবার?—আমার পরিবার—বন্ধু—সব কিছুই এখন এই মাটি......কবর......আমার ছেলেটা ছিল সেও মারা গেল। সে চলে গেল—আর আমি বেঁচে থেকে—জ্বলে মরছি।......কি অবিচার দেখুন মরণের—যে বুড়ো বাপকে নেবার কথা তার—তাকে সে নিলে না,—নিয়ে গেল ছেলেটাকে...

জোনাহ্ সবিস্তারে তার ছেলের মৃত্যুর কথা বর্ণনা করবার আয়োজন করছিল,—কিন্তু কুঁজো তখনই একটি স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল,—যা'ক বাঁচা গেল,—এইবার এসে গেছি আমরা! জোনাহ্‌র হাতে কুড়ি কোপেক তুলে দিয়ে আঁধার পথে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।......জোনাহ্‌র বুকে আবার শোক উথলে উঠল,—অনেক কষ্টে সে তা চেপে রাখতে চেষ্টা করতে লাগল। বেদনার্ত ব্যগ্র দুটি চোখে সে তাকিয়ে রইল ব্যস্ত জনাকীর্ণ রাস্তার দিকে, ভাবতে লাগল—এত লোকের মাঝ থেকে কেউ এসে কি তার দুঃখের কথা শুনবে না? কিন্তু জগতে কে কার কথা শোনে—তাদের ফুরসৎ কই—যে যার নিজের কাজে ছুটে চলেছে। জোনাহ্‌র দুঃখের কথা শুনতে কেউ তার দিকে ফিরে তাকায় না।......কি বিপুল শোক যে জমা হয়ে রয়েছে জোনাহ্‌র বুকে সে কথা কেউ জানে না। তার বুকটা ফেটে শোক যদি জলধারার মত ছুটে বেরুতে পারত—তা'লে বুঝি সমস্ত জগৎ প্লাবিত হয়ে যেত,—কিন্তু মনের ব্যথা ত দেখবার জিনিস নয়। এমন একটা ছোট আধারে—সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে যে দিনের বেলায় আলো জ্বেললেও তা দেখবার উপায় নেই......

একটা সইস আসছে তারই দিকে—কিসের একটা বস্তা কাঁধে নিয়ে। জোনাহ্ তার সঙ্গে যা হয় কিছু নিয়ে একটু কথাবার্তা বলতে চায়—

কটা বাজল, ভাই,—বলতে পার?

নটা বেজে গেছে।......এখানে এসে গাড়ি থামিয়ে বসে আছ কেন,—এগিয়ে যাও।

জোনাহ্ কয়েক কদম এগিয়ে যায়,—তারপর আবার গাড়ি থামিয়ে ভাবতে বসে।...না, লোকের কাছে কোন কিছু বলতে গিয়ে কোন লাভ নেই। পাঁচ মিনিট চুপ করে বসে থেকে—অসহ্য বোধ হওয়ায় জোর করে নিজের মাথাটা একবার ঝাঁকি দিয়ে নিলে সে—যেন এমনি করেই মনের ব্যথাকে সে উড়িয়ে দিতে পারবে। তারপর ঘোড়ার লাগাম ধরে দিলে এক টান।......মোট কথা এ অবস্থা আর সহ্য করতে পারছে না সে।

বাড়ি—বাড়িই যাওয়া যাক এবার—জোনাহ্ মনে মনে ভাবতে থাকে।

ঘোড়াটা তার প্রভুর মনের কথা বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে। ঘণ্টা দেড়েক পরে—জোনাহ্ বাড়ি এসে ময়লা বড় চুল্লীটার ধারে বসল। চুল্লীর উপরে, মেঝেয়, বেঞ্চিতে শুয়ে লোকগুলি সব নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।......তাদের দিকে চেয়ে মাথা চুলকে সে ভাবতে লাগল,—বড্ড সকাল সকাল এসে গেছি।

ঘোড়ার আর আমার খাবারের পয়সা পর্যন্ত কামাই করতে পারি নি, তাই বুঝি এত খারাপ লাগছে আমার। নিজের কাজ ঠিক ঠিক করতে পারলে......নিজের আর ঘোড়ার খোরাকির যোগাড় করতে পারলে—তবেই ত শান্তি।

ঘরে এক কোণে এক অল্প বয়সী গাড়োয়ান ঘুম থেকে উঠে বসে—হাই তুলতে তুলতে জলের কুজোর দিকে হাত বাড়াচ্ছে দেখে—জোনাহ্ বলে উঠল,—কি, জল তেষ্টা পেয়েছে?

তাই ত মনে হচ্ছে।

ঠিকই ত,—খাও, জল খেয়ে নাও।........ তারপর আমার কথা জান ত?—আমার ছেলেটা মারা গেছে।—শুনেছ?......এই হপ্তায়ই—হাসপাতালে মারা গেল।

কি আর করা যায়,—বলো।

জোনাহ্ তবু একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে—তার কথা শুনে তার মনে একটু সমবেদনা জাগল কি না!—না, কিছুছু না,—ও দিব্বি কম্বল মুড়ি দিয়ে এর মাঝেই নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে মাথা চুলকাতে থাকে।..... তৃষ্ণার্ত হয়ে এই ছেলেটি যেমন করে জল খেতে চেয়েছিল—তেমনি সে কথা বলতে চায়। প্রায় এক হপ্তা হতে চলল—তার ছেলেটা মারা গেছে—এর মাঝে একটি লোকের কাছে সে ঠিকমত মনের দুঃখ খুলে বলতে পারল না। একটু প্রাণ খুলে—সব কথা খুটিয়ে বলতে চায় সে,—আর কি! সে বলবে—তার ছেলে কি করে অসুখে পড়ল,— কত কষ্ট পেল,—মরবার আগে কি সব কথা বলেছে সে,—কি করে মরেছে সে ......তারপর তার সৎকারের কথা,—হাসপাতাল থেকে তার জিনিস পত্র আনা।......অনিস্যা বলে তার একটা মেয়ে,—পাড়াগাঁয়ে পড়ে রয়েছে সে—তার কথা।......এমনিধারা কত কথাই যে তার বলতে ইচ্ছা করে! শ্রোতা শুনে একটু আহা উহু করবে—তার দুঃখে একটু সমবেদনা প্রকাশ করবে,—আর কি!......জোনাহ্ ভাবে—মেয়েদের কাছে বলতে পারলেই সব চেয়ে ভাল। ওদের বুদ্ধি একটু কম বটে,—কিন্তু দুঃখের দুটি কথা শুনলেই ওদের চোখে জল এসে যায়।

যাই,—ঘোড়াটাকে একবার দেখে আসি গিয়ে—জোনাহ্ ভাবে—ঘুম ত রয়েছেই,—এখন আর কি—যত ইচ্ছে ঘুমোও।

জামাটা গায়ে চড়িয়ে—জোনাহ্ আস্তাবলে তার ঘোড়াটার কাছে যায়। মনে আসে তার জই, খড়—আর আবহাওয়ার কথা......ছেলের কথা। একা একা যখন থাকে—ছেলের চিন্তা সে আর সহ্য করতে পারে না।......কারো সঙ্গে তার সম্বন্ধে কিছু কথা বলা,—তা বরং......কিন্তু একা বসে তার চেহারাটা মনে করে [illegible] ভাবা একেবারে অসহ্য।

প্রভুকে কাছে আসতে দেখে ঘোড়ার চোখ দুটি জ্বল জ্বল করে ওঠে। জোনাহ্ তাকে আদরের সুরে বলে,—খড় চিবুচ্ছিস,—চিবো, চিবো,......কি আর করবি বল,—জই জুটাতে যদি না পারি—খড়ই খেতে হবে তোর।...... আমি আর পারছি না,—হাঁ-রে,—বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আমি—গাড়ি চালাতে আর পারছি না। ......এ ত এখন আমার ছেলেরই করবার কথা,—সেই ত এখন গাড়ি চালাবে...আর কি সুন্দরই শিখেছিল চালাতে সে গাড়ি।......সে যদি আমায় ছেড়ে না যেত, তা'লে......

বলতে গিয়ে জোনাহ্ একটু থামে,—তারপর আবার বলতে থাকে,—কি যে হ'ল,—রে,... ...কুজ্মা আমার ছেলে কুজ্মা—সে আমায় ছেড়ে চলে গেল,—মরে গেল সে, হাঁ মরে গেল, —আর দেখতে পাব না তাকে।... ধর তোর নিজর কথাই ধর,—তুই ত মাদী,—ধর তুই মা হয়েছিস,—একটা বাচ্চা হয়েছে তোর,—তারপর সে বড় হ'ল,—তারপর একদিন কি করে তোর বাচ্চাটা গেল মারা,—ব্যথা লাগে না তোর,—বল?

ঘোড়া ঘাস চিবুতে চিবুতে যেন জোনাহ্‌র কথা কাণ পেতে শুনতে থাকে,—হঠাৎ তার একটা নিশ্বাস পড়ে প্রভুর হাতের উপর—দীর্ঘনিশ্বাসের মত।

জোনাহ্ উৎসাহ পেয়ে সমস্ত ঘটনা—খুটিয়ে খুটিয়ে তাকে বলতে থাকে......

অনুবাদক—শ্রীতারাপদ রাহা।

রঙ্গজগৎ

'৪৬-এর সালতামামী

শেষ কবছর চলচ্চিত্র ব্যবসা যে পরিমাণ ফে'পে উঠেছিল তা দেখে এই শিল্পের দিকে সবায়ের নজর আকৃষ্ট হওয়া অত্যন্ত সহজই হ'য়েছিল। তাছাড়া চোরাবাজারে কবছর ধ'রে পয়সা-করা লোকেদের চোরা টাকা খাটাবারও একটা সহজপথ হ'য়ে দাঁড়ালো এই ছবির ব্যবসা। তাই এবছর ছবি তোলার ভীষণ হিড়িক বছর আরম্ভ হওয়া থেকেই দেখা দেয়। প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠতে উঠতে এত বেশী সংখ্যায় গিয়ে পে'ছিল যে শেষ পর্যন্ত তার হিসেব রাখা অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। এই সব প্রতিষ্ঠানের কোনটিই সুনির্ধারিত কোন পরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লো না। এমন কি ছবির ব্যবসা যে কি, তার লাভ লোকসানের গণ্ডি কোথায়, কিভাবে কি হয়, কোন বিষয়েই কেউ কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থাকা দরকার মনে করলে না। পঞ্চাশ লাখ বা এক কোটি টাকা নিয়েও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'লো, কিন্তু কার্যত তারাও সমগ্র চিত্রশিল্পের মঙ্গলজনক কিছুই করবার আভাস দিতে পারলে না। এই এক বছরে যত মূলধন নিয়োজিত হ'য়েছে এবং যত নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা ঠিক তার পূর্বেকার পাঁচ বছরে নিয়োজিত সম্মিলিত সম্পূর্ণ মূলধনের সমান হবে এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পনেরো বছরের সমগ্র প্রতিষ্ঠান সংখ্যার সমানে গিয়ে দাঁড়াবে। অথচ এবছরের আয় পূর্ব বৎসরের আয়ের তুলনায় স্বাভাবিকভাবে প্রায় শতকরা তিরিশ ভাগ কমে গিয়েছে, তার ওপর আগস্টের দাঙ্গার ফলে আয়ের হ্রাস আরও বিশ পার্সেণ্ট বেশী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ একুনে এবছরের আয় গত বছরের অর্ধেকে নেমে যাওয়ার হিসেব পাওয়া যাচ্ছে। [illegible]ওপর থেকে সরকারী যাবতীয় কণ্ট্রোল [illegible] সংখ্যায় নতুন প্রতিষ্ঠান বেড়ে যাওয়ায় কাঁচামাল পা[illegible]র অসুবিধে প্রায় আগের মতই আছে, এখনও বহুলোককে চোরাবাজারের ওপর নির্ভর ক'রে থাকতে হ'চ্ছে। কাঁচামাল ছাড়াও আর সবদিকেও প্রচণ্ড অভাব ও অসুবিধে বেড়ে গিয়েছে। স্টুডিওর অভাব হচ্ছে এর মধ্যে একটি—অনেকগুলি নতুন স্টুডিও স্থাপিত হওয়ার কথা বিজ্ঞাপিত হ'লেও কার্যত মাত্র একটি স্টুডিওই তৈরী হ'য়েছে এবং তিনটি নির্মীয়মান অবস্থায় রয়েছে; এছাড়া সৈন্যবিভাগ কর্তৃক অধিকৃত এখানকার চারটি স্টুডিওর মধ্যে তিনটি ফিরে পাওয়া গেলেও মাত্র একটিতে কাজ আরম্ভ হওয়ার আভাস পাওয়া গিয়েছে। ফলে বর্তমানে ন'টি স্টুডিও নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে। এখানকার স্টুডিওতে গত বছরে তোলা ছবির সংখ্যা হ'চ্ছে নির্মাণসম্পূর্ণ বাঙলা ৩২ খানা আর হিন্দী ১৪ খানা এবং নির্মীয়মান অবস্থায় রয়েছে মোটামুটি হিসেবে ৪২ খানি বাঙলা এবং ১০ খানি হিন্দী—মাত্র ৭টি স্টুডিওর ১৭টি ফ্লোরে ঐ ছবিগুলির কাজ হ'য়েছে—স্টুডিওগুলি যে কি পরিমাণ কাজ ক'রেছে এ থেকেই তা অনুমান করা যায়। এই বিপুল সংখ্যক ছবি তোলার জন্যে যতজন কলাকুশলী ও শিল্পীর দরকার তার সিকি সংখ্যকও আমাদের ছিল না, তাই যখন চাপ এসে পড়লো তখন একেবারে অজ্ঞ তৃতীয় চতুর্থ সহকারীরা প্রধান কুশলীর পদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে গেল। পরিচালনা ব্যাপারেও তাই-ই হ'লো, তাছাড়া একদা সহকারী-পরিচালকদের স্বাধীনভাবে পরিচালনা ক্ষমতার ওপর আস্থা স্থাপন ক'রতে পারলেন না এমন বহু প্রযোজক নিজেরা স্বয়ং বা নিজেদের মোসাহেব শ্রেণীর লোকেদের পরিচালকরূপে নিযুক্ত করে দিয়েছেন কোন দ্বিধা না ক'রেই। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, এবছর এখানকার চিত্রশিল্পের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ছবি গৃহীত এবং মুক্তিলাভ ক'রলেও আনুপাতিক হিসেবে এতো রদ্দি ছবি আর কোন বছরেই হয়নি। নতুন লোক এলে ছবির উন্নতি হবে ব'লে যে আমরা এতকাল তান ধ'রে এসেছি, নতুনদের কৃতিত্ব দেখে আমরা তা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই পরিহার ক'রতে বাধ্য হ'য়েছি। এতো অজ্ঞ এবং নির্গুণদের একত্র সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও আর কোন শিল্পে ঘটেছে ব'লে আমাদের জানা নেই। এবছর মুক্তিপ্রাপ্ত ১৪ খানি বাঙলা ছবিতে ১০ জন নতুন পরিচালক আমরা পেয়েছি কিন্তু মাত্র একজন ছাড়া পুরনোদের মধ্যে অতি বাজে নিতান্তই অকর্মণ্য পরিচালকের সমকক্ষ হবার মত যোগ্যতাও কেউ দেখাতে পারেনি, নতুন কলাকুশলীদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা। দেশে যে নতুন হাওয়া বইতে আরম্ভ ক'রেছে, এত যে ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগ আমরা পার হ'য়ে এসেছি তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ নতুন ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির বলিষ্ঠ পরিচয় পাব ব'লে যে আশা আমরা পোষণ ক'রে এসেছি তা ফলবতী হবার রেণু পরিমাণ আভাসও কেউ দিতে পারলে না। এবছর কেবল সামাজিক বিষয় নিয়েই ছবি তোলা হয়েছে, কিন্তু বিষয়বস্তু বা বক্তব্যের মধ্যে কোন নতুনত্বই পাওয়া যায়নি, একান্ত চিরাচরিত ধারা ঘে'ষেই গিয়েছে। বাঙলা বা হিন্দী কোন একখানি ছবির ভাগ্যে কোন রেকর্ড করা সম্ভব হয়নি, মানে সত্যিই রেকর্ড করার মত ছবিও একখানিও মুক্তিলাভ করেনি।

ছবি মুক্তিদানের অবস্থা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ ক'রেছে। আগে যে পরিমাণ ছবি তোলা হ'তো তাই সব মুক্তি দেওয়া সম্ভব হ'তো না সেই বছরের মধ্যে। এখন ছবির সংখ্যা যে পরিমাণ বেড়েছে চিত্রগৃহের সংখ্যা সে অনু-

পাতে মোটেই বাড়েনি। বছরের গোড়ার দিকে নতুন চিত্র-নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের মত নতুন চিত্রগৃহ খোলার বহু ঘোষণা শোনা গিয়েছিলো, কিন্তু কার্যত কলিকাতা ও হাওড়ায় মাত্র ৬টি নতুন চিত্রগৃহ উদ্বোধিত হ'য়েছে এবং এ পর্যন্ত আরও ১২টি চিত্রগৃহ নির্মীয়মান অবস্থায় রয়েছে। ছবি মুক্তিলাভ ক'রেছে বাঙলা ১৪ খানি এবং হিন্দী ৫২ খানি, বাঙলা ছবি হাতে রয়েছে আরও ১৮ খানি এবং হিন্দী প্রায় ১০০ খানি এবং দাংগা না হ'লে আরও অন্যূন ৪ খানি বাঙলা ও ৮ খানি হিন্দী মুক্তি পেতো, তবুও এখন যে-সংখ্যক চিত্রগৃহ নির্দিষ্ট রয়েছে বাঙলা ও হিন্দী ছবির জন্যে পৃথকভাবে, অন্তত ঠিক তার দ্বিগুণ চিত্রগৃহ চালাবার রসদ মজুদ থেকে যাচ্ছে। সমগ্র বাঙলা কেন্দ্রে (বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, ব্রহ্ম, আসাম) এবছরে মোট মাত্র ৬০টি নতুন চিত্রগৃহ নির্মিত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। যুদ্ধের সময়ে মানুষের আর্থিক স্বচ্ছল অবস্থার দিনে সমগ্র বাঙলা কেন্দ্রে যত দর্শক ছিল এখন তার প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ কমে গিয়েছে এবং পরে আরও কমে গিয়ে যদি তার অর্ধেক সংখ্যাকে দর্শক বলে ধরা যায় তাহ'লে সমগ্র বাঙলা কেন্দ্রের সমস্ত চিত্রগৃহগুলির যত আসন আছে তার দ্বিগুণেরও বেশী আসন দরকার হবে। এবছরও প্রদর্শকরাই চিত্রশিল্পের মাথার চড়ে রয়েছে, সেটা অবশ্য স্বাভাবিকই। ছবির অর্থকরী ক্ষমতা কমে গেলেও তার জন্যে কোন প্রদর্শককেই এতটুকু ভুগতে হয়নি, তাদের আয় প্রায় যুদ্ধকালীন সময়ের মতই আছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সংগে প্রতিযোগিতার জন্যে বিদেশী ব্যবসায়ীদের কার্যকরী প্রচেষ্টা এবছরের একটি প্রধান সংবাদ। এই বিদেশী ব্যবসাদারদের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ভারতের সর্বত্র চিত্রগৃহ নির্মাণ, প্রধান প্রধান এবং অতি-নামকরা ইংরেজী ছবিতে ভারতীয় ভাষায় সংলাপ যোগ করা এবং নবোদ্ভাবিত ১৬ মি/মিঃ প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা। এই প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিশ্চেষ্ট ভাব এবং নীরবতা লক্ষ্য করার বিষয়। কলকাতার চিত্রনির্মাণ ক্ষেত্রের আর এক প্রতি-যোগী হচ্ছে বম্বের ব্যবসায়ীরা। বম্বেতে স্টুডিওর টানাটানি পড়ায় ওখানকার বহু প্রযোজক কলকাতায় ছবি তোলার পরিকল্পনা ক'রেছিল; গত দাংগার কৃপায় দু'একজন ছাড়া সে পরিকল্পনাকে কেউ কাজে লাগাতে পারেনি, তবে আবার যে তারা আসতে চেষ্টা করবে না তেমন কোন আভাস পাওয়া যায়নি। ওরা এলে ওদের টাকার খেলের কাছে এখানকার বহু প্রযোজককেই ময়দান ছেড়ে সরে আসতেই হবে: তাহ'লে মোটামুটিভাবে ১৯৪৬ সালের হিসেব পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখা যাচ্ছে, এ বছরে এমন কিছু লক্ষণ নেই যা চিত্রশিল্পের মংগলসূচক ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে বিশৃংখল-ভাবে হ'লেও চিত্রশিল্পের পরিধিটা যে দ্রুত-গতিতে প্রসারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিবিধ

গৌহাটীতে আসামের প্রথম স্টুডিও নির্মিত হয়েছে, নাম ইস্টার্ন মুভীজ লিমিটেড। এখানকার প্রথম ছবি হবে আসামের জাতীয় বীর বদন বরফুকনের দেশাত্মবোধক কাহিনী অবলম্বনে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বরফুকন দেশকে স্বাধীন করার চেষ্টা ক'রে-ছিলেন। গত মহাষ্টমীর দিন ছবিখানির মুহরৎ কার্য কামাখ্যাধামে সুসম্পন্ন হয়েছে। নাম-ভূমিকায় অভিনয় ক'রছেন কামাখ্যানাথ ঠাকুর এবং বিভিন্নাংশে বহু সম্ভ্রান্তবংশীয়রা অভিনয় করলেন। ডাঃ সূর্যকুমার ভূঞার ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবলম্বনে নাট্যকার লক্ষ্য চৌধুরী কাহিনী রচনা করেছেন।

* * *

ভারতের কৃষ্টি, শিল্প, কলা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় খণ্ড-চিত্র তোলার জন্যে ট্রপিক্যাল ফিল্মস্ অফ্ ইণ্ডিয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। এদের প্রথম ছবি হ'চ্ছে আসামের এণ্ডি, মুগা, পাট শিল্প নিয়ে।

* * *

প্রায় মাস দুই হ'লো 'মিলন' তোলা শেষ হ'য়ে গেলেও বম্বে টকীজে নতুন কোন ছবির ঘোষণা শোনা যাচ্ছে না—লোকে বলছে, অবস্থা নাকি আবার খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমরেন্দ্রমোহন রায় ও
নির্মলেন্দু ঘোষ সম্পাদিত
"কল্পনা"
সংগ্রামক্লিষ্ট বাঙলার নতুন আলোর নিশানা নিয়ে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবে। খ্যাতনামা ও নতুন প্রতিভাদের লেখায় সমৃদ্ধ শিল্পীর কল্পনায় উজ্জ্বল ভাবী বাঙলার অভিনব মুখপত্র। আগামী দোলে আত্মপ্রকাশ করবে। আজই আপনার সংখ্যা 'বুক' করুন।
দাম—এক টাকা।
কল্পনা প্রকাশনী
১৮, বাবুরাম শীল লেন, কলিকাতা ১২
(সি ১৮৪৭)

কোন মিথ্যার রাংতা মোড়া রঙ্গীন গল্প নয়। মানব মনের বিচিত্র পরিচয়ের বলিষ্ঠ কাহিনী।
মুভি টেকনিকের
প্রতিমা
কাহিনী: শৈলজানন্দ
পরিচালনা: খগেন রায়
সংগীত: সমরেশ চৌধুরী
ভূমিকায়—শিপ্রা, অজিত, আরতি, পূর্ণেন্দু, প্রমীলা ত্রিবেদী ইত্যাদি
=চলিতেছে=
মিনার * বিজলী
ছবিঘর
মুক্তিপথে !!
এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্সের
মন্দির
কাহিনী: প্রণব রায়
পরিচালনা: ফণী বর্মা
—এ. ডি. রিলিজ—

তারা কি কোন দিন বাঁচবার অধিকার নিয়ে দাঁড়াবে? বঞ্চিত অপমানিত মানবাত্মার প্রথম—প্রতিবাদধ্বনিত—
ছায়ানট পিকচার্সের
'দুঃখে-যাদের জীবন গড়া'
কাহিনী ও পরিচালনা:
হিমাদ্রি চৌধুরী
ভূমিকায়:—রেণুকা (ই. টি), প্রভা, রাজলক্ষ্মী, অহীন্দ্র, জহর, সন্তোষ, রবি রায়, কানু, ভুজঙ্গ প্রভৃতি
শ্রী রূপম রূপালী
পরিবেষক—ক্যালকাটা ফিল্ম্স্ ষ্টুডিও

খেলাধূলা

ক্রিকেট

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বাঙলা বনাম যুক্তপ্রদেশ দলের খেলা শীঘ্রই কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে। বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ সেইজন্যই মনে হয় সম্প্রতি একটু কর্মক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। ইহা খুবই সুলক্ষণ। তবে দল গঠন ব্যাপারে ইঁহারা যেভাবে চলিয়াছেন তাহাতে আশংকা হয় চিরাচরিত প্রথাই ইঁহারা অনুসরণ করিবেন। তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড়গণ ইঁহাদের সুদৃষ্টিতে পড়িবেন বলিয়া মনে হয় না। সকল প্রাদেশিক দলের পরিচালকগণ যখন তরুণ খেলোয়াড়দের উপরই বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন তখন বাঙলার পরিচালকগণের সেই পথ অনুসরণ করিলে ক্ষতি কি? যদিও উল্লেখ করা অন্যায় হইবে তাহা হইলেও জোর করিয়া আমরা বলিতে পারি বাঙলা দল বর্তমানের হোলকার দলের সহিত সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে। ঐ দল একরূপ নিখিল ভারতীয় খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত। যুক্তপ্রদেশ দল খুব শক্তিশালী নহে। সুতরাং এই দলের বিরুদ্ধে অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড়দের লইয়া দল গঠন করিলে ভবিষ্যতের দল গঠন ব্যাপারটি অনেকখানি সহজ ও সরল হইয়া থাকিবে। কারণ আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে বর্তমানে বাঙলায় এইরূপ কতকগুলি উৎসাহী তরুণ খেলোয়াড় আছেন যাঁহারা এইবার বাঙলার পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলে পরবর্তী বৎসরে অভাবনীয় উন্নতি করিতে পারিবেন। পরিচালকগণকে এইটুকু ভরসা আমরা দিতে পারি যে, এই সকল খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করিলে বাঙলার দল শক্তিহীন হইবে না, উপরন্তু আশাতীত ফলাফল প্রদর্শন করিবে। এই প্রসংগে আমরা তিনটি তরুণ খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ করিতে চাই। গত দুই মাস ধরিয়া ইঁহারা প্রত্যেক খেলায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র, স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলোয়াড় শ্রীমান্ পি চ্যাটার্জি প্রথমেই আমাদের স্মরণে জাগে। শ্রীমান্ চ্যাটার্জি বাম হস্তে বল করেন। বোলিংয়ের মধ্যে অভিনবত্ব আছে ও বিশেষ কার্যকরীও হয়। প্রায় প্রত্যেক খেলাতেই ৫।৬টি করিয়া উইকেট দখল করে। ইহার পরেই নাম করিতে হয় স্পোর্টিং ইউনিয়নের অপর তরুণ খেলোয়াড় শ্রীমান্ পি রায়ের। ব্যাটিং বিষয়ে ইনি বিশেষ পটু। প্রত্যেক খেলায় রান তুলিতে অদ্বিতীয়। ইহার পরে আর একটি মাত্র নাম উল্লেখ করিব, সে হইতেছে কালীঘাট ক্লাবের এ দাস। প্রত্যেক খেলাতেই ব্যাটিংয়ে অপূর্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। এই তিনজন খেলোয়াড়ের বাঙলা দলে স্থান হওয়া উচিত। যদি ইহাদের মধ্যে একজনও নির্বাচিত হয় আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি অভিজ্ঞ, খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের অপেক্ষা ভাল খেলিবে।

অধিনায়ক নির্বাচন বিষয়ে পরিচালকগণ কোন নূতনত্ব করিবেন কিনা জানি না। তবে আমরা বিশেষ সুখী হইতাম যদি এইবার শ্রীযুত নির্মল চ্যাটার্জিকে বাঙলা দলের অধিনায়কত্বের গুরুভার অর্পণ করা হইত। এই কথা বলিতে আমাদের কোন দ্বিধা বোধ হইতেছে না যে, কুচবিহারের [illegible] কথা ও শ্রীযুত কার্তিক বসু অপেক্ষা বর্তমানে শ্রীযুত চ্যাটার্জি অনেক ভালভাবেই দল পরিচালনা করিতে পারিবেন। কুচবিহারের মহারাজা পূর্বে যেটুকু খেলিতে পারিতেন দীর্ঘ কয়েক বৎসর যুদ্ধের কাজে ব্যস্ত থাকায় তাহা সম্পূর্ণভাবেই হারাইয়াছেন। শ্রীযুত কার্তিক বসুর খেলিবার শক্তি নষ্ট না হইলেও অধিনায়ক হইবার যে অনুপযুক্ত তাহা ইতিপূর্বে বহুবারই প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়াই বাঙলা দলের অধিনায়ক নির্বাচন করিবেন।

সর্বশেষে পরিচালকদের নিকট আমাদের অনুরোধ যেন তাঁহারা এইবার বাঙলা দলে কোন ইউরোপীয় খেলোয়াড়কে স্থান না দেন। বাঙালী যে কোন ভাল খেলোয়াড় ইউরোপীয় যে কোন খেলোয়াড় অপেক্ষা ভাল খেলিতেছেন। সুতরাং ইউরোপীয় খেলোয়াড়কে স্থান দিয়া লাভ কি?

বাঙলা দল ঠিক কোন খেলোয়াড়কে লইয়া গঠিত হইবে বলা শক্ত। তবে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ যে স্থান পাইবেনই সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ:—নির্মল চ্যাটার্জি, ধ্রুব দাস, মাডলেওয়ালা, এন চৌধুরী, এস মুস্তাফ, এম সেন, পি সেন ও এস ব্যানার্জি।



কৃতী ভগ্নীদ্বয়—মিস সুন্দর দেওধর ও মিস সুমন দেওধর। ইঁহারাই নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার মহিলাদের ডাবলসের চ্যাম্পিয়ান। মিস সুন্দর দেওধর ইহা ছাড়াও মহিলাদের সিংগলস ও মিক্সড ডাবলসেও সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

টেনিস

আমেরিকান টেনিস খেলোয়াড় দল ডেভিস কাপ বিজয়ী হইয়াছেন। পূর্ব বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ান দল শেষ খেলায় আমেরিকান দলের নিকট পর পর পাঁচটি খেলাতেই পরাজয় বরণ করিয়াছেন। অস্ট্রেলিয়ান দলের এই শোচনীয় পরাজয় কল্পনাতীত। ১৯৩৯ সালে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় দল যে গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন ১৯৪৬ সালে এইরূপভাবে বঞ্চিত হইতে হইল ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। আমেরিকান খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। আগামী বৎসরে ভারতীয় দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে। আমেরিকান খেলোয়াড়দের সহিত সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে কতখানি উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইতে হইবে তাহা ভারতীয় খেলোয়াড়দের এখন হইতেই স্মরণ করিতে বলি।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার খেলার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

সিংগলস্

স্রোডার (আমেরিকা) ৩-৬, ৬-১, ৬-২, ০-৬, ৬-৩ গেমে ব্রমউইচকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

জ্যাক ক্রামার (আমেরিকা) ৮-৬, ৬-২, ৯-৭ গেমে পেলসকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

জ্যাক ক্রামার (আমেরিকা) ৮-৬, ৬-৪, ৬-৪ গেমে ব্রমউইচকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

গার্ডনার মুলয় (আমেরিকা) ৬-৩, ৬-৩, ৬-৪ গেমে ডিনী পেলসকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ডাবলস্

জ্যাম ক্রামার ও টেড স্রোডার (আমেরিকা) ৬-২, ৭-৫, ৬-৪ গেমে ব্রমউইচ ও কুইস্টকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ব্যাডমিণ্টন

নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন জানুয়ারী মাসের শেষভাগে সিংহলের বিভিন্ন স্থানে ব্যাডমিণ্টন খেলায় যোগদান করিবার জন্য একটি দল প্রেরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে দল প্রেরিত হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বাংগলার খেলোয়াড় মনোজ গুহ এই দলে স্থান পাইয়াছেন। বাংগলার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সুনীল বসু নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় যোগদান না করায় বোধ হয় দলভুক্ত হন নাই। আমরা আশা করি মনোজ গুহ সিংহলে বাংগলার সুনাম প্রচারিত হইবার মতই খেলিবেন। নিম্নে সিংহল ভ্রমণকারী ভারতীয় দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল:—জি লুইস (পাঞ্জাব) অধিনায়ক, দেবীন্দর মোহন (পাঞ্জাব), প্রকাশনাথ (পাঞ্জাব), মনোজ গুহ (বাংগলা), চিরঞ্জীব (দিল্লী), বি ডি স্রফ (বোম্বাই), মিস চিনয় (বোম্বাই), ও মিস সুন্দর দেওধর (মহারাষ্ট্র)।

দেশী সংবাদ

২৩শে ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য-পদে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ইস্তফা দেওয়ায় কলিকাতা অ-মুসলমান কেন্দ্রে যে উপনির্বাচন হয় তাহাতে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

অদ্য নয়াদিল্লীতে পুনরায় গণ-পরিষদের গোপন অধিবেশন হয় এবং কতিপয় কার্যপ্রণালী গৃহীত হইবার পর অধিবেশন ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়। অদ্যকার অধিবেশনে তিনটি কমিটিও গঠিত হয়।

কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক ও কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্মণ পরলোকগমন করিয়াছেন।

২৪শে ডিসেম্বর—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোস্থিত পৈতৃক বাসভবনটির যে অংশ কিছুকাল পূর্বে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল উহার দখল লইবার জন্য রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাঙলা গভর্নমেন্টের হস্তে ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ২৩০ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া স্মৃতিরক্ষা কমিটি প্রথম কিস্তিতে বিশ্বভারতীকে ৫ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার তহবিলের জন্য আরও এক লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

অমৃতসরে শিখ প্রতিনিধি পন্থিক বোর্ডের এক সভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া শিখগণকে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে শিখদের স্বার্থ সংরক্ষণের সন্তোষজনক ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে আহ্বান জানান হইয়াছে।

২৫শে ডিসেম্বর—সীমান্তের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ খান্না এক বিবৃতিতে বলেন যে, স্বাধীনতার জন্য সীমান্তের হিন্দু ও শিখগণ প্রয়োজন হইলে চরম ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত। কোনপ্রকার হুমকিতেই হিন্দু ও শিখগণ তাহাদের ঘর বাড়ি ত্যাগ করিয়া যাইবে না।

তে-ভাগা আন্দোলন সম্পর্কে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় ৭৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া নেত্রকোণা (ময়মনসিংহ), চট্টগ্রাম এবং যশোহর জেলার পাঁজিয়াতে তে-ভাগা আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর—অদ্য প্রাতে অন্তর্বর্তী গভর্নমেন্টের শিক্ষাসচিব শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী শান্তিনিকেতনে টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট "বিনয় ভবনের" ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। এই ভবন বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক-দিগকে শিক্ষাদানের কেন্দ্রস্বরূপ হইবে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ঘোষণা করেন যে, ভারত গভর্নমেন্ট এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এককালীন ৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা এবং বাৎসরিক ৭৫ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনার আশ্রয়-প্রার্থী শিবিরে বর্তমানে নোয়াখালি জেলার যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী আছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নোয়াখালির সমস্ত উপদ্রুত অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসায় তথাকার আশ্রয়প্রার্থী-দিগকে এই নোটিশ জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে স্ব স্ব গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়া যাইতে বলা হইয়াছে।

বাঙলা গভর্নমেন্টের এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, বিহারের প্রায় ৪০ হাজার অসহায় ও

সাপ্তাহিক সংবাদ

দুর্গত অধিবাসীকে বাঙলা দেশে সরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ আশ্রয় ও সাহায্যদান করা হইতেছে। ইহা ছাড়া বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবিশেষের মারফৎ আরও বহু বিহারবাসী আশ্রয় ও সাহায্য পাইতেছে।

ময়মনসিংহের চরনালক্ষ্যা ডাকাতি মামলায় ৫ জন আসামী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অপর এক আসামী ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

২৭শে ডিসেম্বর—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, আচার্য জে বি কৃপালনী এবং শ্রীযুক্ত শংকররাও দেও নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিমানযোগে দিল্লী হইতে কলিকাতা হইয়া শ্রীরামপুর অভিমুখে রওনা হইয়া যান। ফেণী বিমান ঘাটিতে হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট জনতার নিকট বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ গ্রহণের জন্য তাঁহারা শ্রীরামপুরে যাইতেছেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব-বঙ্গের ঘটনাবলী ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মসীলিপ্ত করিয়াছে।

নোয়াখালির সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ নোয়াখালি জিলার হাঙ্গামা সম্পর্কে ধৃত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য গোলাম সারোয়ারের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে নরহত্যা, গৃহদাহ প্রভৃতি অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। তাঁহাকে কুমিল্লা জেলে রাখা হইয়াছে। গোলাম সারোয়ার ব্যতীত আরও প্রায় সাত শত লোককে হাঙ্গামা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মিঃ আসফ আলী ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্র-দূত নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার স্থলে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্মের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী এবং অন্তর্বর্তী গভর্নমেন্টের সদস্য উ স অদ্য কলিকাতায় এক বিবৃতিতে বলেন, "আমরা, ব্রহ্মবাসীরা ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশে প্রচুর পরিমাণ চাউল পাঠাইতে আশা করিয়াছি এবং আমাদের বিশ্বাস বাঙলা অথবা ভারতবর্ষের কোন স্থানেই দুর্ভিক্ষ হইবে না।"

গোরক্ষপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সপ্তবিংশতিতম অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত এল বি ভোপৎকার তাঁহার অভিভাষণে বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবের ও মুসলিম লীগের হিংসাত্মক নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

২৮শে ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং শ্রীযুক্ত শংকররাও দেও গতরাত্রে শ্রীরামপুরে পৌঁছেন। আজ সকালে তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সারাদিন তাঁহাদের মধ্যে মন্ত্রণা হয়। পণ্ডিত নেহরু গণ-পরিষদের প্রথম অধ্যায়ের কার্যক্রম এবং লণ্ডন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মহাত্মাজীর গোচর করেন।

আকোলায় লেডী রমা রাওয়ের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের ১৯তম অধি-বেশন হয়।

নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর রাজ্যের কর্তৃপক্ষের শাসন ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৯শে ডিসেম্বর—শ্রীরামপুরের সংবাদে প্রকাশ, প্রদেশমণ্ডল গঠন সম্পর্কে বৃটিশ গভর্নমেন্ট যে ভাষ্য করিয়াছেন, কংগ্রেস কোন অবস্থাতেই তাহা মানিয়া লইবেন না বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে একটি মধ্যপন্থা উদ্ভাবনের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

এলাহাবাদে পুনরায় হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়ায় শহরে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে। অদ্যকার হাঙ্গামায় ৪ জন নিহত ও ২০ জন আহত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৪শে ডিসেম্বর—ওয়াশিংটনে সম্মিলিত রাষ্ট্র খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান ১৯৪৬ সাল ও ১৯৪৭ সালের খাদ্য পরিস্থিতি আলোচনা করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ, চীন, মাঞ্চুরিয়া, মালয় ও ইউরোপের কোন কোন অংশে ১৯৪৭ সালেও খাদ্যাভাব দেখা দিবে।

২৫শে ডিসেম্বর—অদ্য চীনা জাতীয় পরিষদের ৪০ দিবসব্যাপী অধিবেশনের শেষ দিনে চীনের শাসনতন্ত্রের সংশোধিত খসড়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। অধিবেশনে ১৪৮৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল কম্যুনিস্ট পার্টি পরিষদের অধিবেশন বর্জন করে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও সান-ইয়াৎ সেনের আদর্শের সংমিশ্রণ করিয়া শাসনতন্ত্রটি রচিত হইয়াছে।

প্যারিসের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মঙ্গলবার সরকারীভাবে ফ্রান্সের চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর—উত্তর ইন্দোচীনে টংকিনে ফরাসী ও আনামীদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলিতেছে। ফরাসী হেডকোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, হ্যানয়ের দক্ষিণ অঞ্চলে শত্রু সৈন্য উচ্ছেদের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ফরাসী সৈন্যরা প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়াছে।

ভিয়েৎনাম রেডিও প্রচারিত বড়দিন উপলক্ষে ভিয়েৎনাম প্রেসিডেন্ট ডাঃ হো-চি-মিন প্রদত্ত বলিয়া বর্ণিত এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, টংকিং-এর রাজধানী হ্যানয়-এ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য ফরাসীরা দায়ী। কারণ, ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে এক চরমপত্রে পুলিশের কর্তৃত্ব ফরাসীদের নিকট হস্তান্তরিত করিবার দাবী জানান হয়। কিন্তু আনামীরা এই দাবী প্রত্যাখ্যান করে, ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

২৭শে ডিসেম্বর—ইন্দোচীনে হ্যানয়ের উত্তর-পূর্বে অগ্রসর ফরাসী বাহিনী আনামীদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং কয়েক ঘণ্টা তুমুল সংগ্রামের পর আনামীরা বিপর্যস্ত হয়।

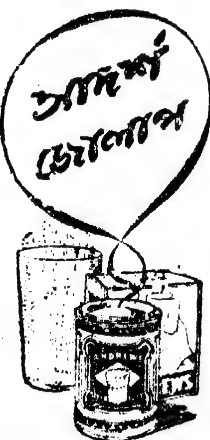
২৮শে ডিসেম্বর—প্যারিসের এক ইস্তাহারে ঘোষিত হয় যে, উত্তর ইন্দোচীনে ফরাসী ও ভিয়েৎনাম সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে এবং ইন্দোচীনস্থ ফরাসী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষ তথায় আরও সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। সাইগন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, ফরাসী সৈন্য বহনের জন্য ইন্দোচীনের সমস্ত যাত্রীবাহী বিমান চলাচল ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

২৯শে ডিসেম্বর—সাইগন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ভিয়েৎনাম কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ ইন্দোচীনে ভিয়েৎনাম গুপ্ত মুক্তি [illegible] কর্মপরিষদের প্রতি [illegible] আদেশ জারী করিয়াছেন।

"সাফ করুন!"



শিশুদের জন্য ও!
"দেহাভ্যন্তরের আবর্জ্জনা দূর করা স্বাস্থ্য-তত্ত্বের মূলকথা"



কাগজের বাক্সের মধ্যে টিনে প্যাক করা থাকে। সর্ব্বদা নূতন মাল পাওয়া যায়।

শরীরের ভিতরটাকে পরিষ্কার রাখা স্বাস্থ্যরক্ষার মূলকথা। এই সহজ সত্য নতুন নয়—আর এই সত্যটিকে শিশুদের মধ্যে সহজেই প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কেননা ভিতর পরিষ্কার রাখার মানেই এণ্ড্রুজ খাওয়া এবং এই ফেনিলোজ্জ্বল স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয় শিশুরা পছন্দই করে। এণ্ড্রুজ খাওয়াতে তাদের পীড়াপীড়ি করতে হয় না এবং এর প্রতিটি গ্লাস নিরাপদে ধীরে ধীরে পরিষ্কার ও সংশোধনের কাজ করে। শিশু কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের পক্ষেই এণ্ড্রুজ আদর্শ জোলাপ। সামান্য মাত্রাতেই কাজ হয় বলে এণ্ড্রুজ সেবন অভ্যাসে পরিণত হয় না। এণ্ড্রুজ নিম্নোক্ত কারণে স্বাস্থ্যপ্রদ :—

এণ্ড্রুজ মুখ ও জিহ্বা পরিষ্কার ও সঞ্জীবিত করে। এণ্ড্রুজ পাকস্থলীকে অম্লশূন্য করে স্বাভাবিক রাখে। এণ্ড্রুজ লিভারকে সবল রাখে ও পিত্তাধিক্য দমন করে। এণ্ড্রুজ ধীরে ধীরে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে দেহাভ্যন্তর সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন রাখে। ইহা যন্ত্রণাদায়ক বিষবস্তু দূর করে, কোষ্ঠকাঠিন্য ভাল করে এবং রক্ত বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ রাখে।

ANDREWS

এণ্ড্রুজ লিভার সল্ট

স্বাস্থ্য সতেজ ও সবল করে

পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের আয়ুর্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করুন এবং ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত আপনার পাকা চুল কালো রাখুন। আপনার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হইবে এবং মাথাধরা সারিয়া যাইবে। অল্প সংখ্যক চুল পাকিলে ২৷৷৹ টাকা মূল্যের এক শিশি বেশী পাকিয়া থাকিলে ৩৷৷৹ মূল্যের এক শিশি, যদি সবগুলিই পাকিয়া থাকে, তাহা হইলে, ৫, টাকা মূল্যের এক শিশি তৈল ক্রয় করেন। ব্যর্থ হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে।

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবলে কয়েক দিন এই ঔষধ প্রয়োগের পর আশ্চর্যজনক ফল দেখা যায়। এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই ভয়াবহ ব্যাধির হাত হইতে মুক্তিলাভ করুন। সহস্র সহস্র হাকিম ডাক্তার, কবিরাজ বা বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক ব্যর্থ হইয়া থাকিলেও ইহা নিশ্চয়ই কার্যকরী হইবে। ১৫ দিনের ঔষধের মূল্য ২৷৷৹ আনা।

বৈদ্যরাজ অখিলকিশোর রাম

নং ১০৪, কাতরাসরাই, গয়া।

শ্বাস

অর্থাৎ হাঁপানি কাসির দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহৌষধ। ইহা দুই দিন মাত্র সেবন করিতে হয়। মৃতপ্রায় রোগীর ইহাই একমাত্র প্রাণদাতা। মূল্য ডাকব্যয়-সহ ২৸৴৹। কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী। মূল প্রতিষ্ঠান—পুলশিটা মেদিনীপুর। শাখা—৬নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চিঠিপত্র মূল প্রতিষ্ঠানে পাঠাইবেন।



রূপ-পরিচর্য্যায়

কেশকল্যান ও সন্ধ্যা স্নো



কোহিনুর পারফিউম কোং
কলিকাতা



'ওভালটিন' দৈনিক কোটি কোটি গৃহে স্বাস্থ্য আনয়ন করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে পরিবারের প্রত্যেকের শরীর গঠন এবং স্বাস্থ্য, ক্ষমতা ও জীবনীশক্তি সংরক্ষণে সুপ্রমাণিত গুণাবলীর জন্য অগণিত গৃহে 'ওভালটিন' নিয়মিতরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

'ওভালটিনের' সুগন্ধ আবালবৃদ্ধ সকলেই পছন্দ করে। ইহাতে যে পরিমাণে উৎকৃষ্টতম প্রচুর পূর্ণাঙ্গ ও প্রাণপ্রদ পুষ্টিকর খাদ্য বিদ্যমান আছে তাহাতে সকলেরই স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়া থাকে। সুপরিমিত এই পুষ্টিকর উপকরণ অতি সহজ পাচ্য এবং সত্বর পরিপাক হইয়া দৈহিক উপাদানে পরিণত হয়। ইহা প্রকৃতির শক্তিবর্দ্ধক— সুপক্ক বার্লির মণ্ড, টাটকা ও ননির সংযুক্ত গোদুগ্ধ, প্রাকৃতিক ভাইটামিন ও অন্যান্য খাদ্যোপকরণ দ্বারা তৈয়ারী।

'ওভালটিন' নিয়মিতভাবে আপনার গৃহে ব্যবহৃত হইতেছে কিনা সে সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখুন ও ইহার পরিবর্তে অন্য জিনিষ ব্যবহার বর্জ্জন করুন।

[illegible] ঔষধালয়ে এবং বড় [illegible] দোকানে বিক্রয় হয়।

ওভালটীন

'OVALTINE বলকারক পানীয় (খাদ্য)'

ডিষ্ট্রিবিউটারস—গ্রেহাম ট্রেডিং কোং (ভারতবর্ষ) লিঃ
৬নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা; মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং করাচি।

OV/104

কিছু সময় অন্তর অন্তর ওভালটীনের টাটকা মাল নিয়মিতভাবে আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যায়। সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য গবর্ণমেণ্ট ধার্য করিয়া দিয়াছেন। ইহার বেশী দিবেন না।

সতীশ কবিরাজের

শ্বাসারি

হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটিসে

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ
নিরাময়কারী মহৌষধ

১ দমকা হাঁপ কমে
১ নিশ্চিত আরোগ্য

মূল্য—প্রতি শিশি ১৷৷৹
ডাক মাশুল ৷৹

সর্বত্র বড় বড় দোকানে
পাওয়া যায়:

কবিরাজ
এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড সন্স

প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

তৃতীয় সংস্করণ বর্ধিত আকারে বাহির হইল।
বাঙ্গালী হিন্দুর এই চরম দুর্দিনে
প্রফুল্লকুমারের পথনির্দেশ
প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য।
মূল্য—৩
—প্রকাশক—
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।
—প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা।
ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

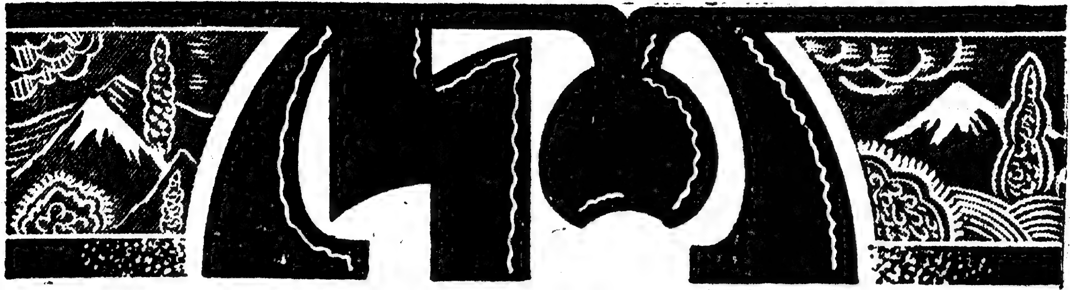
ম্যাডানের ফরমূলা বই

MADAN'S FORMULA BOOK

এই বইএর 'ফরমূলা' অনুযায়ী সাবান, তেল, সিরাপ, এসেন্স, স্নো ইত্যাদি প্রস্তুত করুন এবং অর্থোপার্জ্জন করিয়া লাভবান হউন।

প্যারাডাইস পারফিউমারী হাউস
৭, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ]   শনিবার, ২৬শে পোষ, ১৩৫৩ সাল।   Saturday, 11th January, 1947   [১০ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান

গত ৩রা জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। পণ্ডিতজী ১৯৪৩ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কারারুদ্ধ হওয়ায় কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের তৎকালীন অধিবেশনে সম্মিলিত সুধিবৃন্দ তাঁহার উদ্বোধনী বাণী শুনিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন। পণ্ডিতজী তাঁহার অভিভাষণে ভারতের জনগণের অর্থনীতিক দুর্দশা প্রতিকারের জন্য বিজ্ঞান সাধনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন—"বিজ্ঞানানুশীলন ব্যক্তিবিশেষের সত্যানুসন্ধিৎসা মাত্র নয়। সমাজসেবার সুমহান্ ব্রত লইয়া এই সাধনাকে পরিচালনা করা প্রয়োজন হইয় পড়িয়াছে। ক্ষুধিত নরনারীর পক্ষে সত্যানুসন্ধিৎসা নিতান্ত অর্থহীন। তাহার পক্ষে প্রয়োজন খাদ্যের। ক্ষুধিত মানুষের কাছে ভগবানের কোন স্থান নাই। ভারতের নরনারী আজ ক্ষুধা ও অনশনের জ্বালায় জর্জরিত; এরূপ অবস্থায় তাহাদের নিকট সত্য ও ভগবানের মহিমা প্রচার অথবা জীবনের অন্যান্য সদ্‌গুণাবলীর কীর্তন নিছক ভণ্ডামি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা ইত্যাদি মানুষের জীবনধারণের অপরিহার্য দ্রব্যাদি সংস্থান করাই আজ আমাদের প্রথম এবং প্রধান করণীয়। এই প্রয়োজন যথাযথভাবে মিটাইতে সমর্থ হইলে তবে আমরা দর্শনের তত্ত্বকথায় ও ভগবচ্চিন্তার সঙ্গে [illegible] করিতে পারিব।" পণ্ডিতজী [illegible] কথা [illegible] প্রাণবান্ পুরুষ। তাঁহার অ[illegible]ণে দেশপ্রীতির অগ্নিশিখাই উদ্দীপ্ত হইয়া উ[illegible]াছে। কিন্তু ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা কোনদি[illegible] লোকসংগ্রহ সাধনে বিজ্ঞানের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে নাই. পরাধীন দুর্গত এই ভারতেই অধ্যাত্ম সাধনা যেন কতকটা জনগণের বাস্তব জীবনের ধার হইতে বিচ্ছিন্ন তত্ত্বমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম সাধনায় জাগ্রত ভারত যেদিন জগতে জড় বিজ্ঞানের সাধনায় মানবসমাজকে সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে সমুন্নত করিয়া তুলিয়াছিল, সেদিন জগতের অন্যত্র বৈজ্ঞানিক বিচারের কিছুমাত্র বিকাশ ঘটে নাই। আজ যদি ভারতবর্ষকে জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয় তবে অধ্যাত্ম সাধনার প্রজ্ঞাবলের সঙ্গে বিজ্ঞানের শক্তিতেও তাহাকে সমভাবে সমৃদ্ধ হইতে হইবে বস্তুত লোকসেবা ব্যতীত অধ্যাত্ম-সাধনার কোন সার্থকতাই নাই এবং ব্যক্তিগত সত্যানুসন্ধান যদি লোকসেবার জন্য প্রেম এবং প্রীতির ভাবকে প্রণোদিত না করে, তবে তাহা কার্যত স্বার্থমূলক ব্যাপারেই পর্যবসিত হয়। পরাধীন অবস্থার অন্ধকারের মধ্যেও ভারতের মনীষিবৃন্দ এই সত্যের দিকে জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং ভারতের, বিশেষভাবে বাঙলা সংস্কৃতি তেমন মনীষীদের সাধনায় প্রগাঢ় বেদনায় উদ্দীপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পরাধীন অবস্থা বাস্তব জীবনে তাঁহাদের সে প্রেরণাকে সর্বতোভাবে সার্থকতা লাভে সুযোগ দান করে নাই। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতার তোরণদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে আজ বিজ্ঞান সাধনায় এই দিকটার উপর গুরুত্ব প্রয়োগ করা বিশেষভাবেই প্রয়োজন। পণ্ডিতজী তাঁহার অভিভাষণে রাষ্ট্রের সাহায্য নিরপেক্ষভাবে বিজ্ঞান সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান অবস্থায় ব্যাপকভাবে কোন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে হইলে রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না এবং জাতির সর্বাঙ্গীন অভ্যুন্নতিমূলক বিজ্ঞান-সাধনার পক্ষে স্বাধীনতাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপে রাশিয়ার কথা বলা যাইতে পারে। রাশিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় অভ্যুন্নতি সাধনে বিজ্ঞানের বহুবিধভাবে প্রয়োগ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা ব্যতীত তাহার এই অভ্যুন্নতি কখনই সম্ভব হইত না। ভারতবর্ষ অচিরে ব্রিটিশের সর্বগ্রাসী শোষণ প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে এবং তাহার অধ্যাত্ম-প্রেরণার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সাধনাকে প্রযুক্ত করিয়া লোকধ্বংসী বৈজ্ঞানিক আসুরিকতা হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবে। সমগ্র মানব-সংস্কৃতি তাহারই প্রত্যাশা করিতেছে।

অপ্রতিহত সাধনা

নোয়াখালির পল্লী অঞ্চলে গান্ধীজীর পদব্রজে ভ্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। চণ্ডীপুর পরিত্যাগ করিয়া তিনি এক রাত্রির অধিক কোন গ্রামে অবস্থান করিতেছেন না। অশীতি-প্রায় বৃদ্ধ যষ্টি ভর করিয়া বিধ্বস্ত অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছেন এবং নিজের বলিষ্ঠ চরিত্রের প্রভাবে মানবতার মহিমা হিংস্র বর্বরতার তাণ্ডবে ম্রিয়মান নরনারীর অন্তরে বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার কঠোর এই তপশ্চর্যার ফল ইহার মধ্যেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং নোয়াখালির পল্লী অঞ্চলের উপদ্রুত অধিবাসীদের মধ্যেও ধীরে ধীরে আশ্বস্তির ভাব ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু গান্ধীজীর তপঃপ্রভাব সঞ্জাত আশ্বস্তির এইভাবে সম্প্রসারণে লীগের দল উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাকে কেন বাঙলা দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে না, ইঁহারা এই আর্তনাদ তুলিয়াছেন। লীগের কয়েকজন নেতা খোলাখুলিই এই কথা প্রচার করিতেছেন

যে, গান্ধীজীকে নোয়াখালিতে কাজ করিতে দেওয়া বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবদীর পক্ষে অন্যায় হইয়াছে। কারণ, গান্ধীজী পাকিস্থানীদের মূলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে বসিয়াছেন। তিনি কার্যত কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারকার্য করিতেছেন। একদিক হইতে দেখিতে গেলে সত্যই গান্ধীজীর বিরুদ্ধে লীগ-ওয়ালাদের এই যে অভিযোগ ইহার যাথার্থ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুত লীগের নীতি সর্বপ্রকার মানবতার বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-বিদ্বেষের উপরই সে নীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে কংগ্রেস সর্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই মুখ্যভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ় করিয়াই সে স্বাধীনতার প্রেরণাকে দুর্জয় করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ অবস্থায় যদি মানবতার মহিমা বাঙলাদেশে সর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রসারিত হয় এবং তাহার ফলে ঐক্য ও সংহতির ভাব গড়িয়া উঠে, তবে স্বভাবতই তদ্দ্বারা লীগের তন্দুদার অভিসন্ধির প্রতিকূলতা ঘটে। সুতরাং মহামানব গান্ধীজীর উদার আদর্শের আলোকে নোয়াখালির সর্বত্র উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে লীগওয়ালারা যে সন্ত্রস্ত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। এ সত্য এখন প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়াই লীগ-ওয়ালারা ভেদবাদের ব্যবসা জমাইয়া তুলিবেন এবং সুযোগ বুঝিয়া অপর সম্প্রদায়কে হুমকী দিয়া দাবাইয়া রাখিবেন, এই আশায় ছিলেন। এই কৌশলটা গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিক্রমার ফলে পাছে হাতছাড়া হইয়া যায়, তাঁহাদের মনে এই আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়াছে এবং তাঁহারা ইহাও বুঝিতেছেন যে, ভীতি প্রদর্শনের এই কৌশলটিই মিঃ জিন্নার সর্ব প্রধান অস্ত্র। বলা বাহুল্য জিন্না সাহেবের অনুগত দল নেতার প্রতি বশংবদভাবে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে অস্ত্রটি অব্যর্থভাবে প্রয়োগ করা চলে তেমন সুযোগও তাঁহারা হাতের কাছে রাখিতে চাহেন। প্রকৃতপক্ষে ভীতি প্রদর্শন রূপ অস্ত্রের মহিমা বাঙলার লীগওয়ালারা অন্তরে একান্তভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন এবং এখনও তাঁহারা নিজেদের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন। গত ৩১শে ডিসেম্বর বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ভৈরবে এক জনসভায় বলিয়াছেন, লীগ মন্ত্রিমণ্ডল বাঙলার শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন বলিয়াই পূর্ববঙ্গের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ উত্তেজনার কারণ সত্ত্বেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করিয়াছে। এক্ষেত্রে বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর উক্তির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য প্ররোচিত করিবার ইঙ্গিতটি একটু চাপা আছে। কিন্তু ইহার পর শ্রমসচিব মিঃ সামসুদ্দিন কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের বক্তৃতায় সে অভাব সম্যক্‌ভাবে পরিপূরণ করিয়াছেন। তিনি সেদিন আসামের মন্ত্রিমণ্ডলীকে আক্রমণ করিয়া বলেন, আসাম যদি বহিরাগতদের উচ্ছেদ সম্পর্কে তাহার বর্তমান নীতি পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে লীগের প্রতি ইহার প্রতি-শোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দেওয়া নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কর্তব্য হইবে। আমাদের স্মরণ আছে, সামসুদ্দীন সাহেব ইহার পূর্বেও একবার প্রতিশোধ গ্রহণের এইরূপ হুমকী দেখাইয়াছিলেন। কলিকাতার দাঙ্গার ব্যাপারে লীগ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে উঠিয়া তিনি বলিয়া-ছিলেন, "কলিকাতায় মুসলমানেরা সংখ্যায় কম; কিন্তু যদি মুসলমানগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত তবে পূর্ব বাঙলার অবস্থা কি দাঁড়াইত?" বলা বাহুল্য, এই প্রশ্ন উত্থাপনের কয়েকদিন পরেই ত্রিপুরা এবং নোয়াখালিতে তাহার উত্তর মিলিয়া যায়। সুতরাং বোঝা যায়, বাঙলার লীগ মন্ত্রীরা মুখে যাহাই বলুন, গান্ধীজীর পরিকল্পনাকে তাঁহারা বিশেষ প্রীতির চোখে দেখিতেছেন না। এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়া মাদ্রাজের সহযোগী "হিন্দু" সেদিন মন্তব্য করিয়াছেন, "মহাত্মাজী নোয়া-খালিতে যে অভিযান করিয়াছেন, তাহাতে গভর্নমেণ্টের আন্তরিক সহযোগিতা করা উচিত ছিল, কিন্তু বাঙলা গভর্নমেণ্ট তাহা করেন নাই; ইহা বাস্তবিক দুঃখের বিষয়।" কিন্তু প্রেমের আগুন যাঁহার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কোনরূপ প্রতিকূলতাই তাঁহার গতিকে প্রতিহত করিতে পারে না; পক্ষান্তরে প্রতিকূলতায় তাঁহার অন্তরের বল উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে এবং মৃত্যুর ভিতর দিয়াই তিনি অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। গান্ধীজী এমনই অমরত্বের বাণী লইয়া বাহির হইয়াছেন। সেদিনও তিনি নোয়াখালির কর্মীদিগকে উদ্দীপ্ত করিয়া বলিয়াছেন, "দেশের সেবা করিবে এবং প্রয়োজন হইলে মৃত্যুকে বরণ করিবে।" গান্ধীজীর মানব প্রেমের বেদনাদীপ্ত অভিযান লীগ-নীতির কুটিল গতিতে বিপন্ন বাঙলার প্রাণশক্তিকে অপরিম্লান করিয়া তুলিবে, আমরা এই আশা করি।

বিচারের প্রহসন

চাঁদপুর মহকুমায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি সম্পর্কে ধৃত প্রায় ছয়শত আসামীর বিরুদ্ধে নরহত্যা, ডাকাতি, গৃহদাহ, নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার, বলপূর্বক বিবাহ ইত্যাদি গুরুতর অভিযোগে মামলা আনা হয়। তথাকার মহকুমা হাকিম মিঃ আতাওর রহমান এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলী এই সব আসামীকে জামীনে মুক্তি দিবার আদেশ দান করেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে দায়রা জজের আদালতে আপীল করিলে দায়রা জজ ৩৯৯ জন আসামীর জামীন নাকচ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্ন আদালতের আদেশের সম্বন্ধে যে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দায়রা জজ বলেন, মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইতে পারে এমন সব গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যেভাবে উপযুক্ত কারণ ছাড়াই জামীন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কার্যত আইনের অপব্যবহার করা হইয়াছে। যদিও আসামীদের বিরুদ্ধে নরহত্যা, ডাকাতি, গৃহদাহ, বলপ্রয়োগে ধর্মনাশ ও বিবাহ, ধর্মস্থান অপবিত্রীকরণ এবং পাশবিক অত্যাচারের গুরুতর অভিযোগসমূহ রহিয়াছে, তথাপি চাহিবামাত্রই তাহাদিগকে জামীন দেওয়া হইয়াছে; উপযুক্ত কারণ ব্যতীত এভাবে জামীন দেওয়া কোনক্রমেই সংগত হয় নাই।" এই মোকদ্দমাগুলিতে আরও একটি অস্বাভাবিক ব্যাপারের প্রতি দায়রা জজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কতকগুলি মোকদ্দমায় দেখা যায়, আসামীরা স্থানীয় হিন্দুদের প্রদত্ত সততার সার্টিফিকেট বিচারালয়ে দাখিল করিয়াছে; কিন্তু নোয়াখালি চাঁদপুর অঞ্চলে দুর্বৃত্তদের জোর করিয়া সার্টিফিকেট আদায়ের কাহিনী যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাহারা এই সকল সার্টিফিকেটের সততায় স্বতঃই দ্বিধাবোধ করিবেন; অথচ নিম্ন আদালতের হাকিমেরা তাহা করেন নাই। বলা বাহুল্য, পাকিস্থানী মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহারা স্পষ্টত এক্ষেত্রে ন্যায়ের মর্যাদা পদদলিত করিতে সাহসী হইয়াছেন এবং উপরওয়ালা লীগ মন্ত্রীদের মনোভাবই ইঁহাদিগকে যে এমন অন্যায় কাজ করিতে উৎসাহিত করিয়াছে, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। সাম্প্রদায়িকান্ধতার কাছে ন্যায়ের মর্যাদা যদি এইভাবে ক্ষুণ্ণ হয়, তবে বাঙলার বিরাট অঞ্চল অচিরে বন্য বর্বরের হিংস্রতার লীলা ভূমিতে পরিণত হইবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হয়। আমরা জানি, গান্ধীজীর প্রচেষ্টার ফলে সাম্প্রদায়িক প্রীতির ভাব ফিরিয়া আসিলে দুর্বৃত্তদের প্রতি ন্যায় দণ্ড বিধানের গুরুত্বের এই দিকটা চাপা পড়িয়া যাইবে এবং সেই সুযোগে লীগ শাসনের পাকিস্থানী মহিমাও সম্প্রদায় বিশেষকে দৃপ্ত করিয়া তুলিবে, বাঙলার লীগ নেতাদের মধ্যে একদল গান্ধীজীর নোয়াখালিতে অবস্থানকে এই দিক হইতে দেখিতেছেন এবং গান্ধীজী যখন নোয়াখালি পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই প্রস্তুত হইলেন না, তখন [illegible] সুযোগটা তাঁহারা [illegible] ফিকিরে আছেন। [illegible]তু ইঁহারা এই সত্যটি একান্তভাবে উপলব্ধি করিতেছেন না যে,

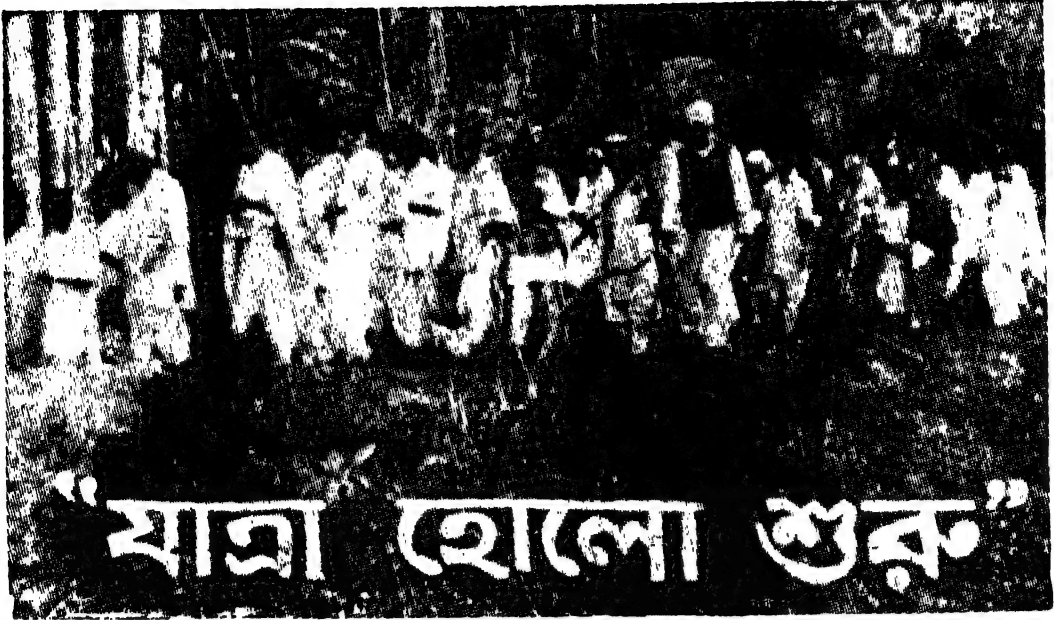
শাসন নীতিতে এমন দুর্বলতা প্রশ্রয় পাইলে সমগ্রভাবে সভ্যতা সংস্কৃতিরই অপহ্নব ঘটে এবং গুণ্ডামীর উপর ভিত্তি করিয়া কোন জাতি বা সম্প্রদায়ই আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। পক্ষান্তরে আভ্যন্তরীণ পাপে নিজেরাই অবসন্ন হইয়া পড়ে।

দুরভিসন্ধিপূর্ণ প্রচেষ্টা

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী বিহারের আশ্রয়-প্রার্থীদের সম্বন্ধে বিহার গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নিকট কতকগুলি অভিযোগ উপস্থিত করেন। সম্প্রতি বিহার গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদল এ সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিকট একটি স্মারকলিপি দাখিল করিয়াছেন। প্রতিনিধি দলের বিবৃতিতে দেখা যায় সুরাবর্দী সাহেবের অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই। কার্যত ৫ই নভেম্বরের পর বিহারে আর কোন গুরুতর ঘটনা ঘটে নাই এবং সর্বত্র স্বভাবিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি সম্বন্ধে বিহার গভর্নমেণ্ট সকল রকম সুব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুত বিহারের উপদ্রুত অঞ্চলের অধিবাসীদের বর্তমানে অন্যত্র অবস্থানের কোনই সংগত কারণ নাই। তথাপি বাঙলার লীগ গভর্নমেণ্ট বিহারের আশ্রয়-প্রার্থীদিগকে বাঙলাদেশে আনিয়া বসবাসের ব্যবস্থা করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন এবং নানাভাবে সেই কার্যে তাহাদিগকে প্ররোচিত করা হইতেছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙলার লীগ সরকার পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্থানে পরিণত করিবার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং এইভাবে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল লীগনেতা মিঃ জিন্না কর্তৃক নির্দেশিত অধিবাসী স্থানান্তরের নীতিই বাঙলা দেশে বাস্তব রূপ দিতে চাহেন। লীগ-নীতির এই কূটচক্রে পড়িয়া বাঙলা দেশ আজ সমগ্র ভারতের পক্ষে রাষ্ট্রনীতিক সমস্যা স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রতিক্রিয়াপন্থী সর্ববিধ পাপ-প্ররোচনার চাপ বাঙলার উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং সংগে সংগে তজ্জনিত যত রকমের তাপ বাঙলার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে ভোগ করিতে হইতেছে। এদিকে দেখিতেছি, বাঙলা গভর্নমেণ্ট নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার দুর্গতগণকে রক্ষা করিবার যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না। নোয়াখালির আশ্রয়প্রার্থীদিগকে উপদ্রুত অঞ্চলে একপ্রকার বলপূর্বকই পাঠান হইতেছে। এই শীতের দুর্দিনে ইহাদের অনেকেরই মাথা গুঁজিবার স্থানটুকু পর্যন্ত নাই। উদার বাঙলা সরকার ইহাদের প্রত্যেক পরিবারের ঘরবাড়ী [illegible] জন্য মাত্র আড়াইশত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন; কিন্তু [illegible] মূল্যের বাজারের এই টাকায় যে একখানা কুঁড়ে [illegible] তোলা যায় না, ইহা তাঁহারা জানেন; ইহা [illegible] গৃহে গিয়া জীবিকা অর্জন করিবার মত সংস্থানও ইহাদের জন্য করা সরকারের দরকার ছিল এবং সেজন্য বিনা সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল; কিন্তু সেদিকে সরকারের দৃষ্টি নাই। পুনর্বসতির জন্য সরকার দুইশত টাকা প্রতি পরিবারকে মুষ্টি ভিক্ষাস্বরূপে মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সামান্য অর্থে স্থায়ীভাবে জীবিকার কোন সংস্থানই করা সম্ভব হইতে পারে না। বাঙলাদেশে দুর্গতদের অবস্থা এইরূপ; অথচ আড়কাঠি লাগাইয়া বিহার হইতে লোক ভাঙাইয়া আনিবার জন্য বাঙলার লীগ সরকারের ভাণ্ডার দ্বার চারিদিক হইতে উন্মুক্ত হইয়াছে। বাঙলা সরকারের মুখপাত্রগণ বিহারের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে দলে দলে বাঙলায় আসিতে আমন্ত্রণ করিতেছেন। সরকারের পক্ষ হইতে প্রচার করা হইতেছে যে, বিহারের আশ্রয়প্রার্থী-দিগকে তাঁহারা বিনামূল্যে জমির বন্দোবস্ত দিবেন এবং নবাগতদের উপজীবিকার সর্ববিধ ব্যবস্থাও করা হইবে। বলা বাহুল্য, বিহারী মুসলমানদের পক্ষে এই প্রলোভন সামান্য নয়। ইহার ফলে বিহারের অনুপদ্রুত অঞ্চল-সমূহ হইতেও দলে দলে লোক বাঙলায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং দুর্গত বাঙলার গরীবদের পয়সায় লীগ সরকারের দানসত্র ভোগ করিতেছে। মানবতার বেদনা আমরা বুঝি। বিপন্নকে রক্ষা করার কর্তব্যবোধ বাঙলার জাতীয়তাবাদীদের অন্তরে কাহারও অপেক্ষা কম নয়। আত্মাবদানে উজ্জ্বল বাঙলার অতীত ইতিহাসই সে পক্ষে প্রমাণ। সুতরাং ঐ সব মানবোচিত গুণরাজীর জন্য লীগনেতাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণের কোন প্রয়োজন আমাদের নাই। কিন্তু বাঙলা সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়া-ছেন, তাহা মানবতা নহে কিংবা বিপন্নের রক্ষার মহৎ ব্রতও তাহা নয়। দুরভিসন্ধিপূর্ণ এই সাম্প্রদায়িকতা বাঙলার জাতীয় জীবনকে নানা দিক হইতে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, এই ভয়েই আমরা বিচলিত হইয়াছি।

রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের ভবিষ্যৎ

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি দুই দিবস বিতর্কের পর ৯১—৫২ ভোটে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহীত প্রস্তাবে নির্দেশ আছে—"সংশ্লিষ্ট সকল দলের শুভেচ্ছা লইয়াই গণ-পরিষদ স্বাধীন ভারতের শাসন-তন্ত্র রচনা করিবে, নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা। মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার ফলে যে সকল অসুবিধা দেখা দিয়াছে, তাহা দূরী-করণের উদ্দেশ্যে সেকশনের কার্য পরিচালনা সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কাজ করিতে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি নির্দেশ দিতেছেন।" রাষ্ট্রীয় সমিতি তাঁহাদের প্রস্তাবে এইভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী গণ-পরিষদের কার্যে অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইলেও মণ্ডলী গঠন সম্পর্কে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নীতির উপর জোর দিয়াছেন। মোটামুটিভাবে প্রস্তাবের সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, কংগ্রেস এতদ্দ্বারা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সহিত সংগ্রামের মনোভাব পরিত্যাগ করেন নাই; পক্ষান্তরে রাজনীতিক চাতুর্যের সংগে নিজেদের শক্তিকে ভারতের আভ্যন্তরীণ এবং বাহিরের সমর্থনে সংহত করিয়া সেই সংগ্রামে আত্মপক্ষ দৃঢ় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার ফলে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠামূলক শাসনতন্ত্র গঠনের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছে, আমরা এরূপ মনে করি না; কারণ, আমাদের এই বিশ্বাস যে, কংগ্রেস এতদ্দ্বারা গণ-পরিষদে প্রবেশ করা সম্পর্কে লীগের দাবী তুষ্ট করিতে চাহিলেও লীগ সরল মনে সেই আহ্বান গ্রহণ করিবে না। বস্তুত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আজ ভারতের স্বাধীনতার পথে সর্বপ্রকারে বাধাদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহারা লীগের পশ্চাতে থাকিয়া ভারতকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করিয়া এদেশে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করিবার কূটনীতি সুক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করিতেই তৎপর থাকিবে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সে প্রবৃত্তির নিরসন ঘটিবে না। আসাম এবং সীমান্ত প্রদেশকে মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী লীগকে চলিতে হইবে। তাহা-দিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, গণ-পরিষদে থাকিয়া লীগের প্রতিনিধিদল এই দুই প্রদেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শাসনতন্ত্র তাহাদের উপর চাপাইতে চেষ্টা করিবেন না। কার্যত লীগকে যদি এই প্রতিশ্রুতি দিতে হয়, তবে গণ-পরিষদের ভিতর দিয়া পাকিস্থানী বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া তাহাকে পল্লবিত করিবার যে স্বপ্ন লীগ দেখিতেছে, তাহা সফল হইবে না; সুতরাং লীগ অতঃপরও সোজা পথ ধরিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কাজেই ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পথে সংগ্রামের অনিবার্যতা সমানভাবেই থাকিয়া যায় এবং বাহির হইতে ভারতের ব্যাপারে অপর শক্তির হস্তক্ষেপের স্পর্ধাকে প্রতিহত করিবার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা মুখ্য হইয়া পড়ে। ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্তানদিগকে আজ অতন্দ্রিত উদ্যমে এই অব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে এবং স্বাধীনতার সাধনায় বৈপ্লবিক শক্তিকে সর্বপ্রকারে জাতীয়তার পথে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে।



গান্ধীজীর যাত্রা শুরু হয়েছে। ভারতের পূর্বপ্রান্তে এক বিস্তীর্ণ পল্লী অঞ্চলের পথে ও প্রান্তরে এবং মাঠে ও কটীরে তিনি স্বয়ং তাঁর সমগ্র সত্তার আবেদন নিয়ে উপস্থিত হবেন। যেখানে মনুষ্যত্ব অবমানিত, যেখানে প্রীতি ও শুভবুদ্ধি নির্বাসিত এবং রূঢ় দলীয় পলিটিক্সের ঔদ্ধত্যে দুর্বল ও অসহায় লাঞ্ছিত হয়েছে, সেইখানেই তিনি এক সুদীর্ঘ পরিক্রমার পথ বেছে নিয়েছেন।

বাঙলা দেশের একটি জেলা নোয়াখালি, তারই অভ্যন্তরে শ্রীরামপুর নামে একটি গ্রাম। শ্রীরামপুর থেকে চণ্ডীপুর, চণ্ডীপুর থেকে মাসিমপুর—তার পর আর একটি গ্রাম এবং তার পর আরও—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের বাণী নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সংবাদ হিসেবে এইভাবে ঘটনাটির একটি পরিচয় দিতে পারা যায়। তবু এই ছোট সংবাদটির তাৎপর্য সাময়িক ঘটনার পরিধি অতিক্রম করে আমাদের মনে ক্ষণিকের জন্য একটি ঐতিহাসিক অনুভবের প্রসন্নতা এনে দেয়। এ যেন ঠিক নোয়াখালির ঘটনা মাত্র নয়, সভ্যতার ইতিহাসে মহামানবেরা এইভাবেই একদিন পথ চলেছিলেন। 'রাজা করে রণযাত্রা, বাজে করতাল, কম্পমান বসুন্ধরা'। কিন্তু এ রাজার অভিযান নয়, পদভরে পৃথ্বী টলমল করে দেবার শক্তিমত্ত আয়োজন এর মধ্যে নেই। কঠিন মৃত্তিকাকে সুরসিত করে গ্রামে-প্রান্তের মধ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার মত গান্ধীজীর যাত্রা। কোন বীরত্বের কীর্তিস্তম্ভ-রচনার উদ্যোগ এর মধ্যে নেই। দিগন্তে সন্ধ্যা-তারার উদয় হয়েছে, এইটুকু দেখতে পেলেই যেন তাঁর যাত্রা সফল হবে।

মানুষেরই ইতিহাসের চিরকেলে অভিযাত্রীর মত গান্ধীজী হারানো স্বর্গের সন্ধানে বেরিয়েছেন। এটা নোয়াখালির সমস্যা মাত্র নয়, পলিটিক্স নয়। মৃত্যুলোকের রহস্যভেদ করে অমৃতত্ত্বের উপলব্ধি করার জন্য নচিকেতা মৃত্যুলোকেই অভিযান করেছিলেন। শিবকে শ্মশানেই ব্যস্ত হয়ে ঘুরে ফিরতে দেখা যায়। যাঁরা ধূলির ওপর স্বর্গ গড়ে তুলতে চান, উত্তপ্ত ধূলিধূসর পথে সকল গ্লানি ও মালিন্যের সংগে বোঝাপড়া করার জন্য তাঁদের দাঁড়াতে হয়।

"যেই গ্রাম দিয়া যান
যাঁহা করেন স্থিতি।
সেই সব গ্রামের লোকে
হয় প্রেমভক্তি॥

* * *

গৌড়বঙ্গ উৎকল দক্ষিণ দেশ গিয়া
লোক নিস্তার কৈল আপনি ভ্রমিয়া॥

'আপনি ভ্রমিয়া' 'লোক নিস্তার' করার এই পদ্ধতি মহাপুরুষ মাত্রেরই পদ্ধতি। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে এই পরীক্ষার সাফল্য কীর্তিত হয়ে আছে। তাঁরও পূর্বে জেরুশালেমের পথে এবং মাউন্ট সিনাইয়ের শিখরে পথিক মানবপুত্র গ্রাম্য জনতাকে যে প্রীতির দীক্ষা দিয়েছিলেন, তার আবেদন পৃথিবীর সকল মানুষের অন্তরকে দীক্ষিত করেছে। তাঁরও আগে কপিলাবস্তুর এক রাজপুত্রের মহানিষ্ক্রমণের ঘটনা। পৃথিবীর মানুষকে মৈত্রী ও মহাকরুণায় তিনি দীক্ষিত করেছেন। পল্লীর এক বটদ্রুমের ছায়ায় ভারতের প্রথম সত্যাগ্রহী যে সংকল্প নিয়ে বসেছিলেন, তাঁরই প্রতিধ্বনি নোয়াখালির শ্রীরামপুরে আজ আবার নতুন করে শোনা যায়।

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।

এই আসনে বসে আমার শরীর শুকিয়ে যাক, ত্বক অস্থি মাংস ক্ষয় হয়ে যাক......তবু সত্য উপলব্ধি না করে আমি উঠবো না। "নোয়াখালির মাটিতে আমি সমাধি গ্রহণ করবো, তবু আমার সাধনা সফল না করে ফিরে যাব না"—দুই সাধকের উক্তির মধ্যে আড়াই হাজার বছরের ব্যবধান, তবু দুই বাণী একই অখণ্ড ইতিহাসের সূত্রে এক হয়ে আছে।

গান্ধীজীর যাত্রা, নোয়াখালির নিপীড়িত মানুষের সংশয়ের আঙিনা একের পর এক পার হয়ে তিনি এগিয়ে যাবেন। পথে পথে ভস্মীভূত কুটীর, লুণ্ঠিত গৃহ ও নিহত মানুষের অস্থি-কঙ্কালের সাক্ষ্য তাঁর চক্ষু সজল করে তুলবে, তবু তিনি নিরুৎসাহ হবেন না। তিনি শ্রেয়ের সন্ধানে বেরিয়েছেন। তাঁর মুখে প্রতিশোধের বাণী নেই, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেই। তিনি অত্যাচারী ও অত্যাচারিতকে, শত্রুকে এবং দুর্বলকে—উভয়কেই মানবতার দীক্ষা দেবার জন্য আকুল হয়েছেন। [illegible] কংগ্রেসের তরফে উপস্থিত হননি মুসলিম লীগকে বিড়ম্বিত করার জন্য যাননি। চুক্তি-

BAPUJI
12.4.1930



কথা

হক বাজারে অনুষ্ঠিত গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা। জনৈক মৌলবী সভায় বক্তৃতা করিতেছেন।

বন্ধ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রলুব্ধ নন। তিনি শান্তি, প্রীতি ও প্রতিবেশীসুলভ সৌহার্দ্যের রীতিকে সহজ ও স্বাভাবিক ধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যই ব্রত গ্রহণ করেছেন।

গান্ধীজীর জীবন বহু যাত্রা ও পরিক্রমার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু অভিযান (March) তিনি করেছেন এবং সাফল্য অর্জন করেছেন, তাঁর পরিকল্পিত সত্যাগ্রহ পদ্ধতির মধ্যে এই ধরণের নৈতিক অভিযান একটি বড় কার্যক্রম। ভারতবর্ষেও তাঁর 'ডান্ডী অভিযান' এবং 'হরিজন যাত্রা' বিখ্যাত হয়ে আছে। মূলত গান্ধীজীর অভিযানের মধ্যে আমরা একটা ঐতিহাসিক ও নৈতিক আদর্শের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু গান্ধীজীর বর্তমান অভিযানের কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য কি একেবারেই নেই?

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর চাতুর্যে যে নূতন কূটনীতির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার ভেতর এই আশংকার প্রমাণই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যাবার আগে ভারতবর্ষে গৃহযুদ্ধের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে যাবার সংকল্পই সাম্রাজ্যবাদীরা করেছেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নিকটবর্তী হয়ে এসেছে, কিন্তু এ স্বাধীনতার সকল প্রসাদ ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি ভারত গৃহযুদ্ধের আসর হয়ে দাঁড়ায়। গান্ধীজীও কি সাম্রাজ্যবাদীর এই কূট-কল্পনাকে ব্যর্থ করার জন্য আগে থেকেই তৈরি হচ্ছেন?





শ্রীবিমল মিত্র

[চব্বিশ

রোজ অফিস যাওয়ার প্রয়োজন হয়না বিলাস চৌধুরীর। তবু নতুন অফিস। নিজে একবার সব কাজ চালু করে' দিলে তখন বাড়ীতে বসে' শুধু চালনা করা। অফিসে যাওয়ার চেয়ে বেশী দরকার সপ্তাহের মধ্যে দু'তিনবার আসল কাজের জায়গায় গিয়ে তদারক করে' আসা। মিলিটারীর ব্যাপার—কাজ যেমন-তেমন হোক, ঠিক সময়ে কাজ শেষ করা চাই। হাজার হাজার ফুট রাস্তা—কিম্বা কয়েক হাজার খড়ের ছাউনি তৈরী করা—কিম্বা এরোড্রোমের কাজ। কাজের যেন শেষ নেই। কাজ করে' ওঠা শক্ত। লক্ষ লক্ষ টাকা মিনিটে মিনিটে ব্যয় হয়। ভারতবর্ষকে জাপানের হাত থেকে যে-করে' হোক বাঁচাতেই হবে!

তারপর বিলাস চৌধুরী আবার নতুন কাজ পেয়েছেন একটা। চাল, আটা, চিনি রেশন হ'য়ে যাচ্ছে [illegible] পেয়েছেন। সুতরাং অফিস করতে হয়েছে বিশেষ করে সেই কারণে।

সকালবেলা বিশেষ কাজে আজ অফিস যেতে হবে বিলাস চৌধুরীকে। জামা কাপড় পরা হ'য়ে গেছে। চাকরকে বললেন—গাড়ী বার করেছে কিনা দেখ তো—

গাড়ী একটু পরেই বেরুল। কিন্তু নীচে নেমেই বিলাস চৌধুরীর মনে পড়ল—গোপাল তো এখনও এল না।

ভোর বেলাই গোপালকে পাঠানো হয়েছে। এত দেরী করলে আর অপেক্ষা করা চলে না। নীচে নেমে গাড়ীতে আর উঠলেন না। টবের ফুলগাছগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। এবার ঝড়বৃষ্টির জন্যে ক্রীসানথিমাম্ ভাল হলো না। গোলাপের গোড়াগুলো খুঁড়ে দিতে হবে। বড় মুস্কিল করে চড়াই পাখীরা। বাড়ীটার দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। পুরোন বাড়ীই কিনেছিলেন—কিন্তু এখন আর পুরোন বলে' চেনা যায় না।

গাড়ীর দরজা খুলে ড্রাইভার দাঁড়িয়েছিল। বিলাস চৌধুরী বাগান পেরিয়ে গেট খুলে রাস্তার ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঘড়ি দেখলেন। এবার পুজোর সময় হাজারিবাগে যেতে হবে এক ফাঁকে। সব দিকে না দেখলে চলে না। মোটরে যাওয়াই ভালো। একটা দিন থাকবেন সেখানে। গোপালের ওপর সব কাজের ভার ছেড়ে দিলে কি চলে! কিন্তু এই বয়েস কি চিরকাল তাঁর থাকবে। একদিন তিনি যখন বিশ্রাম নেবেন—সমস্ত পরিশ্রম আর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন......কিন্তু সে কথা এখন ভেবে লাভ কী। সে তো এখনও বহুদিন!

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে গোপাল এল। বললে—দিদিমণির বাড়ীতে বড় বিপদ—আসতে পারবে না এখন—

বিলাস চৌধুরী বললেন—তোর দিদিমণির সঙ্গে দেখা হ'লো?

—দেখা হ'লো—গোপাল বললে।

—কী বললি তুই?

—আমি বললুম পয়লা তারিখে আপনার জয়েন্ করার কথা আর আজ পনেরো তারিখ হ'য়ে গেল দেখা সাক্ষাৎ নেই, একটা খবরও দেননি, তাই বাবু আমাকে পাঠালেন।—দিদিমণি বললে—'বাবার অসুখ এখন অফিসে যেতে পারবো না—

গাড়ীতে উঠে বিলাস চৌধুরী বসলেন। গোপালও উঠলো।

যেতে যেতে বিলাস চৌধুরী জিগ্যেস করলে—বাবার কি খুব অসুখ দেখলি গোপাল—

গোপাল বললে—দেখলুম শুয়ে আছেন—উঠতে পারেন না বিছানা থেকে, শুয়ে থাকেন দিনরাত—কথা বলতে কষ্ট হয়—

অফিসে বিলাস চৌধুরীর ঘরের পাশেই সুরুচির জন্যে একটা ঘর তৈরী করা হয়েছে। সাজসরঞ্জাম সমস্ত প্রস্তুত। পয়লা তারিখ থেকে সুরুচির অফিসে আসার কথা। আজ পনেরো তারিখেও তাকে অনুপস্থিত দেখে বিলাস চৌধুরী গোপালকে পাঠিয়েছিলেন।

অফিসে গিয়ে কিন্তু বেশীক্ষণ বসলেন না। গোপালকে বসতে বলে' নিজে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

গাড়ী যশোর রোড ধরে' চললো। এক একবার গাড়ীর গতি কমে' আসে আর একটা মিলিটারী লরী পাশ দিয়ে বিপরীত দিকে চলে' যায়। কোটের বোতামটা এঁটে দিলেন। গাড়ী যখন বেশী জোরে চলে তখন শীত করে সমস্ত শরীরে। ফাঁকা রাস্তায় পড়ে' গাড়ীর স্পীড আরো বাড়লো। অনেকদিন আগের কথা মনে পড়লো। হাজারিবাগ থেকে কলকাতায় আসার পথে একবার এক মোটর দুর্ঘটনা হয়েছিল। তখন বিলাস চৌধুরীর স্ত্রী মারা গেছেন। ছেলেও তখন কাছে নেই। বিলাস চৌধুরী যখন ভাঙা মোটরের কাছে গেছেন তখন বেঁচে কেউ নেই। আধমরা অবস্থায় যে-মেয়েটি তখনও একটু একটু বেঁচেছিল তাকে দেখতে অনেকটা সুরুচির মত। টাটানগরের সেই প্লাটফর্মের কথাটাও আবার মনে পড়লো। সেদিনের আচরণের মধ্যে অন্যায় কিছু হয়নি তা'র।

গাড়ী ভীষণ জোরে চলতে সুরু করেছে। অনির্দিষ্ট যাত্রা। তবু আজ আর কাজ তা'র ভাল লাগছে না। হাজারিবাগের বারান্দায় সেই একক পায়চারী, আর এখানে এই কলকাতায় অফিস যাওয়া আর আসা, নয়ত বাড়ীতে বাগানের সামনে বসে' খবরের কাগজে চোখ বুলোন। প্রথম বিয়ের দিনগুলো বেশ ছিল। একটিমাত্র ছেলেকে নিয়ে মায়ার ছিল যত ভাবনা। তখন সংসারের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত তিনি। অত বড় জমিদারী, মাথার ওপর কেউ নেই, সাহায্য করবারও কেউ নেই—ছেলের লেখাপড়া, কোথায় কা'র সঙ্গে মিশছে, কী পড়ছে, কিছুই খোঁজ রাখবার সময় ছিল না। মাস্টার রেখেছিলেন ছেলের লেখাপড়ার জন্যে। কর্তব্য সেখানেই শেষ হয়েছে বলে' ধরে' নিয়েছিলেন। সেই ছেলে যে একদিন অমন হবে কে জানতো!

হঠাৎ এক জায়গায় আসতেই বিলাস চৌধুরী গাড়ী ঘোরাতে বললেন ড্রাইভারকে।

—কলকাতায় ফিরে চল নাগেশ্বর—

অফিসে ফিরে এলেন বিলাস চৌধুরী। গোপাল টিফিন তৈরী রেখেছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিসের কাগজপত্র দু' একটা দেখতে লাগলেন। অনেকগুলো ফাইল এসে টেবিলে

জমেছে। সব কাগজ আজ দেখা হবে না। চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। গোপালকে বললেন, আমার সংগে একবার চেৎলায় চল।

তখন বিকেল সুরু হয়েছে বলা যায়। গোপালই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। বিলাস চৌধুরী এদিকে আগে কখনও আসেননি। চেতলার হাটের টিনের চালা পেরিয়ে শবজী-বাগানের গলির মোড়ে এসে গাড়ী থামল। বিলাস চৌধুরী গাড়ি থেকে নামলেন। বললেন, গাড়ি এখানে থাক নাগেশ্বর।

অল্পবিত্ত সমাজ, ছোট পুরোন নতুন বাড়ি, কয়েকটি নারকেল গাছ, একটা পানা-ওয়ালা পুকুর — কলকাতার ধারে কাছেই যে এমন না-সহর-না-গ্রাম আছে বোঝা শক্ত। কলকাতা করপোরেশনের ভেতরে এমন জায়গা বোধ হয় দুটি নেই। তবু বিলাস চৌধুরীর ভালো লাগলো। উন্নাসিক বালিগঞ্জিয়ানার চেয়ে এ ঢের ভালো।

নির্দিষ্ট বাড়িতে এসে গোপালই প্রথমে ঢুকলো। বিলাস চৌধুরী বাইরে দ্বিধান্বিত-ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

খানিক পরে গোপাল বেরিয়ে এসে ডাকলে —আসুন ভেতরে—আসুন—

ছোট একটি ঘর। ঘরের পুব কোণে একটা তক্তপোষ পাতা। তা'রই ওপর শুয়ে আছেন সুরুচির বাবা! বিলাস চৌধুরী কথা বলবার পূর্বেই সদানন্দবাবু ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। ওঠবার ক্ষমতা নেই সদানন্দবাবুর। তবু শুয়ে শুয়েই যেন অভ্যর্থনা করতে চেষ্টা করলেন তিনি।

বিলাস চৌধুরী নিজেই এগিয়ে গিয়ে বললেন—ব্যস্ত হবেন না আপনি—

সদানন্দবাবু বললেন—সুরুচি বাড়ী নেই, আমার ওষুধ আনতে গেছে, এমন সময়ে এলেন —আমি উঠে বসে' আপনাদের......

বিলাস চৌধুরী বললেন—আপনি বেশী কথা বলতে চেষ্টা করবেন না—সকালে আমি গোপালকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, শুনলাম আপনার খুব অসুখ, তাই নিজেই এলাম একবার—

সদানন্দবাবু চিৎ হ'য়ে শুয়েছিলেন, এবার বিলাস চৌধুরীর দিকে পাশ ফিরে শুলেন—। বললেন—আগের চেয়ে অনেকটা ভাল হ'য়ে এসেছি, আর কিছুদিন শুয়ে থাকলেই সুস্থ হবো,...সব ওষুধ পাওয়াও যায় না আজকাল—

খানিকক্ষণ বিলাস চৌধুরীও কিছু কথা বললেন না। কী কথা বলতে হবে যেন ভেবে পেলেন না। কেমন করে' এ-পরিবারটির সংগে টাটানগর স্টেশনে আলাপ হয় এবং ঘটনাসূত্রে কেমন করে' একটু ঘনিষ্ঠতা হয়, তারপর এতদিন পরে চাকরীর চেষ্টায় আবার দৈবাৎ কেমন করে' সুরুচির সংগে বিলাস চৌধুরীর যোগাযোগ ঘটেছে, সকালবেলা সে-খবর গোপাল নিজে সদানন্দবাবুকে জানিয়ে গেছে।

অনেকদিন পরে পাশে একটি সহানুভূতি-শীল শ্রোতা পেয়ে অনেক গল্প সুরু করলেন সদানন্দবাবু। তা'র মধ্যে নিজের এই শোচনীয় দুরবস্থার কথাটাই বার বার ঘুরে ফিরে আসতে লাগল। তা'র বিগত জীবনের আদর্শনিষ্ঠা, সরকারী চাকরী ছেড়ে দেশের কাজে জেল খাটা, লাহোর জেলের ভেতর সেই অমানুষিক অত্যাচার, তারপর সংসার জীবনের দৈনন্দিন বিড়ম্বনা, স্কুলজীবনের মানুষ গড়ার স্বপ্ন, শেষে এই যুদ্ধ, এবং এই যুদ্ধের পটভূমিকায় পারিবারিক জীবনের বিপর্যয়, অর্থনৈতিক সংকট, সবশেষে তা'র নিজের দুর্বল স্বাস্থ্য —যা'র জন্যে অনন্যোপায় হ'য়ে সুরুচিকে চাকরীর জন্যে পরের স্বারস্থ হ'তে হচ্ছে! উপরন্তু একটি নাবালক শিশুর ভার নিতে হয়েছে সুরুচিকে! অবশ্য সদানন্দবাবুর স্ত্রীর মৃত্যুই এই ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে দায়ী তা-ও জানালেন তিনি!

বিলাস চৌধুরী বললেন—আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব, আমি করতে পারি—আমি আপনাদের পরিবারে ঋণী রয়েছি, কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি থেকে এ'রা বাঁচিয়েছিলেন আমাকে —তাই খবর নিতেও এসেছিলাম যে পয়লা তারিখে জয়েনিং ডেট, আর আজ পনেরো দিন হ'য়ে গেল কোনও খবরাখবর নেই,......

সদানন্দবাবু বললেন—আমাকে কিন্তু সে-কথা জানায়ও নি সুরুচি,......কিন্তু আপনি কেন কষ্ট করে' এলেন, আমি ওকে পাঠিয়ে দেব কাল, কাল নিশ্চয়ই যাবে—দেখবেন নিশ্চয় যাবে—

এইবার ওঠা উচিত হবে কি না সেই কথাই ভাবছিলেন বিলাস চৌধুরী।

হঠাৎ ভেতর থেকে ছোট শিশুর কান্নার শব্দ এল। সদানন্দবাবু বিব্রত হ'য়ে উঠলেন—খোকা উঠেছে!

গোপাল বললে—ওই খোকা উঠেছে—বলে' ভেতরে চলে' গেল। এবং খানিক পরেই খোকাকে কোলে করে এনে হাজির। নতুন লোক দেখে কান্না থেমে গেছে তার। বাড়ীতে এত অচেনা মুখ কখনও দেখেনি খোকা!

গোপাল জিগ্যেস করলে—আমাদের বাড়ী যাবে খোকা ?

সদানন্দবাবু বললেন, সুরুচিকে ছেড়ে মোটে থাকতে পারে না খোকা, রাত্রে আমার কাছে কিছুতেই শোবে না—

খোকার ছোট ছোট দাঁত বেরুতে সুরু হয়েছে। অল্প অল্প কথা বলতে শিখেছে। কিন্তু কী যে তার অর্থ বোঝা ভার। গড় গড় করে' অনেক কথা বলে গেল গোপালের সংগে।

বিলাস চৌধুরী বললেন এবার আমরা উঠি তাহলে সদানন্দবাবু......

সদানন্দবাবু উঠে বসতে পারলেন না, তবু বললেন—আবার আসতে বলবো এমন সাহস হয় না—কিন্তু আমি জানি আপনি আসবেনই—তা' হ'লে কালকে কি সুরুচিকে আপনার অফিসে যেতে বলবো—?

—নিশ্চয়ই বলবেন—যদি অসুবিধে না হয় তা' হ'লে কালই যেন যান্—আর তাঁকে বলবেন —এই পনেরো দিন যে গেলেন না এটা আমরা ছুটি হিসেবেই ধরবো—এরজন্যে মাইনে থেকে কাটা যাবে না টাকা—

বিলাস চৌধুরীর কথা শেষ হ'লো না। কথার মাঝখানে সুরুচি ঘরে ঢুকেই চমকে উঠেছে। গলির মোড়ে বিরাট গাড়িটা দেখে খানিকটা যেন আন্দাজ করত পেরেছিল। তবু নিজের অস্বস্তিটুকু ঢেকে নিয়ে বাইরে মিষ্টি হাসির ছদ্মবেশ টেনে জিগ্যেস করলে—কতক্ষণ হ'লো এসেছেন আপনি?

সুরুচিকে দেখে খোকা গোপালের কোল থেকে লাফিয়ে উঠলো—দিদি—দিদি কাছে যাবো—

খোকাকে কোলে নিয়ে সুরুচি বললে—ওষুধ আনতে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু পেলুম না—

বিলাস চৌধুরী বললেন—সকালবেলা গোপালের কাছে আপনার বাবার অসুখের খবর শুনে চলে এলাম—তা' ছাড়া আপনার কাছে আমারও একটা কৈফিয়ৎ চাওয়ার আছে. অফিস আদালত যা-কিছু বলুন সবই একটা বিধিনিয়ম মেনে চলে—

সদানন্দবাবু বললেন—নিশ্চয়, নিয়ম মানে না কে? সবাই মানে। গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য সৌরমণ্ডলীই বলুন আর এত বড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই বলুন......

সুরুচি হঠাৎ যেন কঠোর হ'য়ে উঠলো।

বললে—চাকরী করলুম না একদিনও, অথচ কৈফিয়ৎ দিতে হবে—এ কি রকম বিধি?

বিলাস চৌধুরী তেমনি হাসিমুখেই খানিকক্ষণ সুরুচির দিকে চাইলেন। তারপর বললেন—যে বিধানে প্রতিবেশীর বিপদে প্রতিবেশী সাহায্য করতে দৌড়ে আসে, যে বিধান বলে 'মানুষের সংসারে কোনও মানুষই পর নয়' অন্য বিধান না মানুন এ বিধানটা তো মানবেন?

সুরুচি বললে—আমি ঠিক-দিনে না যাওয়াতে যদি আপনার অফিসের কাজের কোন ক্ষতি হ'য়ে থাকে তো আপনি কৈফিয়ৎ চাইবেন বৈকি—

বিলাস চৌধ[illegible] এটা রাগের কথা হলো আ[illegible]নার, কিন্তু তা থাক্—কাল অফিসে যাচ্ছেন [illegible]—

সুরুচি এ প্রশ্নের হঠাৎ কোনও জবাব

দেবার আগেই সদানন্দবাবু বিছানা থেকে বলে উঠলেন—নিশ্চয়ই যাবে—কাল তুই যাবি রুচি, আমি ভাল আছি, আমার জন্যে ভাবতে হবে না—

সুরুচি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। সদানন্দবাবু বাধা দিয়ে বললেন—সে তোকে কিছু ভাবতে হবে না, বিলাসবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে, কাল তুই খেয়ে-দেয়ে সাড়ে দশটায় অফিসে যাবি—

হঠাৎ বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

—কে—বলে' সুরুচি দরজার বাইরে গিয়ে উঁকি দিলে। ফিরে এসে বললে—সিংজী এসেছে বাবা—

সিংজী! যেন অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছেন এমনিভাবে বললেন—সিংজীকে বলে দে মা রুচি যে ওর টাকা আমি দেব, একটু সুস্থ হয়েই সব টাকা শোধ করে দেব—আর একটা মাস......

সুরুচি যেন ঠিক অল্প-পরিচিতদের সামনে এ-প্রসঙ্গের অবতারণা চায়নি। বাবার একটুকু মাত্রা বোধ নেই। সিংজী জানালে টাকার তাগাদায় সে আসেনি। এ-পথে যাচ্ছিল, মাস্টার সাহেব কেমন আছেন দেখতে এসেছে।

বিলাস চৌধুরীরও ঠিক এই প্রসঙ্গের মধ্যে থাকা যেন ভাল লাগছিল না। তিনিও নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

সবাই চলে যাওয়ার পরে সুরুচি বললে, বাবা, তুমি পরের সামনে সব ঘরের কথা নিয়ে আলোচনা করো কেন বল তো?

সদানন্দবাবু বললেন—পর কে? তবে যে বিলাসবাবু বললেন, তোদের সঙ্গে টাটানগরে খুব আলাপ হয়েছিল—তোদের খুব ভাল রকম চেনেন—সব মিথ্যে নাকি?

চারদিকে ফাইল। প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে বসেছে সুরুচি। সকাল সাড়ে দশটায় আসতে হয়, তারপর পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করেও শেষ হয় না। সাতটা এরোড্রোমে কাজ চলেছে একসঙ্গে। পানাগড়ের কুলিরা ম্যালেরিয়ায় পড়েছে দলকে দল। কেউ যেতে চায় না সেখানে। সাহেবকে বলে' কুলিদের দৈনিক রেট বাড়িয়ে দিতে হয়েছে। রেলের ওয়াগন ঠিক সময়ে পৌঁছোয় না। আর্মেনিয়ান ঘাটে তিনদিন ধরে' লোক গিয়ে ফিরে ফিরে আসছে। অদ্ভুত ওই রেলের বাবুরা। কথায় কথায় ঘুষ। ঘুষ না দিলে একটা কথা তাদের মুখ দিয়ে বের করা শক্ত।

কলিং বেলটায় একটা টোকা দিলে সুরুচি।

আওয়াজ পেয়ে ছোকরা চাপরাশি ঘরে ঢুকলো।

সুরুচি জিগ্যেস করলে—সাহেব অফিসে এসেছে কি না, দেখ তো—

চাপরাশি ফিরে এসে জানালে, সাহেব আসেনি।

অনেকগুলো ফাইল আটকে রয়েছে সাহেবের অভাবে। একলা সুরুচির ঘাড়ে সমস্ত অফিসের ভার ছেড়ে দিয়ে সাহেব বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। চার-পাঁচ দিনের জন্যে কলকাতা ছেড়ে কোথাও চলে' যান অফিসের কাজে—আবার একদিন হঠাৎ অফিসে এসে হাজির। নতুন কনট্রাকটের সময় সাহেব নিজে হাজির থাকেন। প্রথম প্রথম ভয় লেগেছিল সুরুচির। সমস্ত অফিসের পরিচালনা ভার নিজের হাতে নেওয়া শক্ত বৈ কি! এ অফিসটা নতুন। তবু বুড়ো ক্যাশিয়ার রঘুনাথবাবু সামনে এসে মাথা চুলকোন। বলেন—এ চেক দুটো ডিসঅনার্ড হয়ে ফিরে এসেছে—

রাগ হয়ে যায় সুরুচির। বলে—তা' হলে পার্টিকে লিখতে হবে। আমার কাছে রেখে যান, আমি চিঠি ড্রাফট করে দেব খন—

দু-মিনিট পরই রঘুনাথবাবু আবার ঢোকেন। বলেন—এই এখানটায় একটা সই দিয়ে দেবেন—আরো রাগ হয়ে যায় সুরুচির। বলে—সই করেছি দেখতে পাচ্ছেন না—?

চশমা তুলে ভালো করে' নজর দিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে রঘুনাথবাবু নীরবে চলে' যান। তারপর আসে অফিসের দারোয়ান চাপরাশি আর বেয়ারারা। চাঁদার খাতাখানা এগিয়ে ধরে বলে—পুজোর পার্বণী দিতে হবে—

সুরুচি ফাইল থেকে মাথা তুলে বলে—পুজোর পার্বনী আমি দেবার কে?—সায়েব এলে বলো।

আপনিইতো দিতে পারেন—আপনিই আমাদের মনিব—

ওরা কেমন করে বুঝেছে সুরুচির এখানে অনেকখানি ক্ষমতা। কিন্তু সে ক্ষমতা যে কতটুকু তা' সুরুচি নিজেই জানে না। তবু বিলাস চৌধুরী সুরুচিকে ক্ষমতার অপব্যবহারের মধ্যে একটুকু অপ্রিয় কথা শোনান নি কোনও দিন।

একজন ডেসপ্যাচ ক্লার্কের পোস্ট খালি ছিল। বুড়ো রঘুনাথবাবুর ছোট ছেলে ম্যাট্রিক ফেল। বুড়োমানুষ ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন হাজির। বললে—ইটি আমার ছোট ছেলে, আপনার কাছে এসেছিলুম চাকরীর জন্য...

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে একটা দরখাস্তও দিলেন।

সুরুচি বললে—আমার কাছে কেন, সায়েব এলে সায়েবকে দেবেন—

রঘুনাথবাবু বললেন—সায়েবের কাছে গিয়েছিলুম, সায়েব আপনার কাছে আসতে বললেন, আপনি যা' বলবেন সায়েব তাতে 'না' বলবেন না—

অফিসের চাপরাশি দারোয়ান থেকে সুরু করে বুড়ো ক্যাশিয়ার রঘুনাথবাবু পর্যন্ত জেনে গেছেন। কিন্তু সুরুচি এর জন্যে একটুকু দায়ী নয়। আড়াই শ' টাকা মাইনের পরিবর্তে সুরুচি মনে প্রাণে অকুণ্ঠভাবে অফিসের কাজ নির্বাহ করে আসছে। সকালবেলা নিজে হাতে ভাত রেঁধে খোকাকে খাইয়ে রুগ্ন বাবাকে পরিচর্যা করে বাসে ঝুলতে ঝুলতে এসে সকাল সাড়ে দশটায় অফিসের চেয়ারে বসে তারপর দুপুর বেলা নিজে হাতে ঘরের মধ্যে একটু চা করে নেয়। সেই সময়টুকু যা বিশ্রাম তারপর ঘড়িতে পাঁচটা বাজলে খোঁপাটা ঠিক করে কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে ভীড় ঠেলে আবার বাড়ীর দিকে যাত্রা। বিলাস চৌধুরীর সঙ্গে তার মনিব ভৃত্যের সম্পর্ক।

বিলাস চৌধুরী বলে দিয়েছেন—অফিস সম্বন্ধে তুমি সমস্ত দেখবে, আমি আউট-ডোর কাজগুলো করবো—

বিশেষ দরকার থাকলে টেলিফোন করতে হয় বাড়ীতে।

বিলাস চৌধুরী ওদিক থেকে বলেন—স্পীকিং...কে? সুরুচি?

সুরুচি বলে—চাঁদপুর থেকে রায় খবর পাঠিয়েছে মাল সর্ট পড়ছে পেমেণ্ট ভাটিকে দিয়েছে—কী করবে জানাতে বলেছে—

—এখুনি 'তার' করে দাও রায়কে ক্যাম্প ছেড়ে যেন কালই আমার সঙ্গে একবার দেখা করে।

সুরুচি বলে—আর একটা কথা, অফিস স্টাফ-এর সবাই এসেছিল আমার কাছে, বলছিল এক মাসের মাইনে পুজোর সময় বোনাস চায়—পরশু থেকে পে-বিল তৈরী হবে—

বিলাস চৌধুরী বিরক্ত হন। বলেন—অফিস সম্বন্ধে তুমি যা' ভাল বুঝবে করবে, অফিসের আয় বুঝে খরচ করবে—আমাকে আর ও-সব বিষয়ে বিরক্ত করো না—

এতখানি স্বাধীনতা অবশ্য সুরুচির ভাল লাগে না। নিজের মাথা খাটিয়ে বিলাস চৌধুরীর ভালো দেখতে হয়। সুতরাং সমস্ত দিন অফিসের কাজে আর মাথা তোলবার সামর্থ্য থাকে না। দুপুরবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ডালহৌসী স্কোয়ারের খণ্ড আকাশটার দিকে জানালার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখে। এতক্ষণ খোকা হয়ত ঘুম থেকে উঠে বাবাকে জ্বালাতন করছে। তবু যা হোক—সুরুচি এখন দুটো পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে বলতে হবে। নইলে দত্ত মশাইকে বাড়ী ভাড়ার তাগাদায় এসে শুধু হাতে ফিরতে হোত। সিংহজীর দেনাটা কিছু কিছু করে শোধ হচ্ছে। তবু জিনিসপত্রের যা দাম। এই দুর্ভিক্ষের বাজারে চাকরীটা না পেলে হয়ত

সুরুচিকেও কোনও লঙ্গরখানায় গিয়ে পাতা পাততে হোত।

তারপর অফিস থেকে বাড়ি ফেরবার পথে খাবার জন্যে ফল, ওষুধ, খোকার জন্যে দুধ কিনে আনতে হয়। এক এক সময় মনে হয়, এমন করে আর কতদিন চলবে কে জানে! প্রতীক্ষায় সমস্ত অন্তর শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। একদিন খোকা বড় হবে। জন্ম থেকে যে মিথ্যা তার জীবনে সুরু হয়েছে তাই হবে চিরস্থায়ী। তখনও সুরুচি পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে সত্য ঘোষণা করবার সাহস খুঁজে পাবে না। কিন্তু সে যদি আসে। শেখরদা যদি কখনও আবার ফিরে আসে। কোথায়, কতদূরে, কীভাবে সে আছে কে জানে। বেঁচে আছে কিনা কে বলবে।

লেডীস্ সীটে বসে বাইরের দিকে দেখতে দেখতে সুরুচি নিজের মনেই এই সব ভাবে।

বিকেল চারটের সময় সেদিন টেলিফোন এল। অফিসের কাজ বিশেষ ছিল না। সকাল সকাল বাড়ি গেলে ভাল হয়। বাবার শরীর কয়েকদিন ধরে ভাল যাচ্ছে না। আজ সকালে বাবার শরীর খারাপ দেখে এসেছে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে সুরুচি বললে—হ্যালো—

ওপাশে ছিলেন বিলাস চৌধুরী। বললেন—এখনি একবার আমার এখানে চলে এসো সুরুচি—আমার গাড়ী যাচ্ছে—

একটু দ্বিধা হলো সুরুচির। আজ সকাল সকাল বাড়ি যাওয়ার কথা। ডাক্তারকেও ডেকে নিয়ে যেতে হবে। বললে—আজ বাড়িতে একটু সকাল সকাল যেতাম, বাবার অসুখটা একটু বেড়েছে আজ—

—সেই সম্বন্ধেই ডেকেছি—আমার গাড়ী গিয়ে পেঁছোলেই চলে আসবে—বললেন বিলাস চৌধুরী।

—আচ্ছা—বলে' সুরুচি ফোন ছেড়ে দিলে।

মাঝে মাঝে অফিসের জরুরী কাগজপত্র নিয়ে সাহেবের বাড়ি যেতে হয় অবশ্য। কিন্তু তবু দাসত্ব যখন তখন যেতেই হবে।

রঘুনাথবাবুকে দু একটা কাজ বুঝিয়ে দিয়ে নিজের জরুরী কাজ সেরে নিলে সুরুচি। বিলাস চৌধুরীর গাড়ি খানিক পরেই এসে পেঁছুলো। নতুন গাড়িটা পাঠিয়েছেন।

নাগেশ্বর সেলাম করে দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়াল। সুরুচি উঠতে দরজা বন্ধ করে গাড়ী ছেড়ে দিলে।

বিকেলের শহর। তবু অফিস ছুটি হয়নি এখনও। গত বছরের দুর্ভিক্ষের চিহ্ন শহরে এখন নেই। সেই দল বেঁধে মৃত্যু, সেই মৃত্যু মিছিল এখন অবশ্য আর দেখা যায় না। তবু এখানে ওখানে দু-একটা ক্লান্ত নিরন্নের পদক্ষেপ এখনও নজরে পড়ে। অনেক কষ্টে সেই মৃত্যু-মন্থর দিনগুলো অতিক্রম করে এসেছে সুরুচিরা। সামনে এখন প্রত্যাশার প্রশান্তি। সুরুচির জীবনে যে মৃত্যুমেধ সুরু হয়েছিল আজ যেন তার কিছুটা নিঃশেষ হয়েছে।

বিলাস চৌধুরীর নতুন বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো। একটা মানুষ সংসারে—। তবু প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই বাড়ির অনেক ঘর। প্রয়োজন কম হ'তে পারে, কিন্তু তা বলে প্রয়োজনটাই সব নয়।

সুরুচি গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। নিস্তব্ধ নীরব পরিবেশ, নিবিড় পরিচ্ছন্নতা। চারিদিকের সাজানো ঐশ্বর্য চোখে আঙুল দিয়ে আত্মঘোষণা করে।

সামনে দু' একটা চাকর এসে অপ্রস্তুত হ'য়ে সসম্মানে পাশে সরে দাঁড়ায়। কোনও দিকে দৃকপাত না করে সুরুচি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো।

নির্দিষ্ট ঘরটিতে এসে সুরুচি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো।

অনেক কাগজপত্র নিয়ে বিলাস চৌধুরী বসেছিলেন। সুরুচিকে দেখে বললেন—এসো—

সুরুচি সামনের চেয়ারে বসলো।

বিলাস চৌধুরী বললেন—আমি হাওড়া স্টেশনে আজই এসে পেঁছেছি—পেঁছে একবার ভবানীপুরের দিকে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে তোমার বাবাকে একবার দেখতে গিয়েছিলাম—

সুরুচি কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। কানের দুলে দুটো একবার দুলে উঠে আবার স্থির হ'য়ে গেল। বিলাস চৌধুরী সেদিকে একবার দেখলেন। পশ্চিমের রোদ এসে দুলের ওপর পড়েছে—চিক চিক করছে সোনার দুল।

বিলাস চৌধুরী মুখ সরিয়ে বললেন—তোমার বাবার কাছ থেকে একবার ডাক্তার সেনের কাছে গিয়েছিলাম—

এবারও সুরুচি কোনও কথা বললে না।

বিলাস চৌধুরী বললেন—বাবার অবস্থা খুবই খারাপ দেখে এলাম—

সুরুচি কোনও উত্তর দিলে না।

বিলাস চৌধুরী আবার বললেন—আমার একটা প্রস্তাব আছে সুরুচি, ডাক্তার সেনেরও তাই মত—

সুরুচি বললে—বলুন—

—আমার মতে তোমার বাবাকে আমার এখানে নিয়ে এলে ভাল হয়। এখানে সব রকম সুবিধে আছে, তা ছাড়া ডাক্তার সেনের বাড়িরও কাছে পড়বে, তাঁরও দেখাশোনা করা সুবিধে হবে—

বিলাস চৌধুরী চুপ করলেন। সুরুচির দিক থেকে কোনও উত্তর হয়ত প্রত্যাশা করছিলেন।

খানিক পরে বিলাস চৌধুরী আবার বললেন—ভালো করে তুমি ভেবে দেখো, ওখানে ওই চেতলায় একলা পড়ে থাকা আমি ভাল বুঝছি না—আর এখানে আমি নিজেও দেখাশোনা করতে পারবো—তা ছাড়া......

বলতে গিয়ে যেন কী বললেন না বিলাস চৌধুরী।

সুরুচি চুপ করে রইল। চেতলার সংসার তুলে নিয়ে এখানে আসা—সে কেমন করে সম্ভব? তা ছাড়া খোকা।

বিলাস চৌধুরী বললেন—যতদিন বাবা অসুস্থ থাকেন ততদিন তুমি আর খোকাও এখানে থাকবে—তারপর বাবার শরীর ভাল হলে তখন আবার তোমরা চেতলায় গিয়ে উঠবে—

সুরুচি কী যে করবে ভেবে কূলকিনারা পেলে না। কৃতজ্ঞতাবোধ, কর্তব্যবোধ, সমস্ত বোধের আইনে এমন ব্যবহার বাধে কিনা কে জানে।

বিলাস চৌধুরী বললেন—আপত্তি ক'রো না সুরুচি, অন্তত তোমার বাবার জীবনের মুখ চেয়ে আপত্তি তোমার করা উচিত নয়—ও ছাড়া সামাজিকতার দিক থেকে তোমার যদি আপত্তি হয়ই আশা করি তুমি সে আপত্তি মানবে না। মানুষের বাঁচা, মরা, জীবনের সুখ, দুঃখ, তার অভিজ্ঞতা, অনুভূতি কিছুই আইন বা সংস্কারের বাঁধা ধরা পথ ধরে চলে না—জীবন বড় ব্যাপক—এই পৃথিবী এই সৌর মণ্ডলের মত অখণ্ড, একে গণ্ডী টেনে সীমাবদ্ধ করা চলে না—তুমি তো সব বোঝ...

বিলাস চৌধুরীর মুখে এতখানি লম্বা বক্তৃতা কোনও দিন শোনেনি সুরুচি। শুনে একটু অবাক হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোনও উত্তরও বেরুল না। (ক্রমশ)

শিক্ষা ও শিল্প

সন্তোষকুমার ভঞ্জ চৌধুরী

(৩)

বিদ্যালয়ে শিল্প প্রবর্তনের ইতিহাস

বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে শিল্পের স্থান থাকা যে সত্যকার শিক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজন, একথা আমাদের দেশে সম্প্রতি অনেকে উপলব্ধি করিতেছেন। এই শিক্ষা ও শিল্পের মিলন সম্বন্ধে পৃথিবীর অপরাপর দেশে কবে, কাহারা, কিভাবে চিন্তা করিয়াছেন, চিন্তাকে কার্যে পরিণত করিতে কোন্ দেশ কি উপায় অবলম্বন করিয়াছে, নূতন করিয়া একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে কি প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছে ও কিভাবে শিক্ষাশিল্প মিলনের ক্রমবিকাশ হইয়াছে, তাহা আমাদের জানা একান্ত আবশ্যক। যে ভুল একবার এক দেশে ঘটিয়াছে যাহাতে তাহা পুনরায় না ঘটে—এজন্য সুচতুর জাতি পৃথিবীর ইতিহাসের পাতাগুলি বারবার উল্টাইয়া দেখে। বর্তমানে আমরা অপরাপর দেশের তুলনায় শিক্ষাব্যবস্থায় কতদূরে পশ্চাতে পড়িয়া আছি তাহা কয়েকটি দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে।

সাধারণ শিক্ষার সহিত প্রাথমিক বিদ্যালয়েই যে শিল্পশিক্ষা আবশ্যক হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে Roussaeu নামক একজন ফরাসী শিক্ষাবিদ বহু পূর্বে বিশেষ জোর দিয়া বলেন। তাঁহার সেই অভিমতকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে সুইডেনের Pestalozzi ও জার্মানীর Froebel-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বেলজিয়ামে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্পের সংযোগ সাধনের চেষ্টা হয়। এই সময়ে Froebel প্রবর্তিত কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে প্রথমে একেবারে শিশুদিগকে ও পরে ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসরের শিশুদিগকে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হইত। গভর্নমেণ্ট এই প্রচেষ্টার সুফল দেখিয়া ইহার প্রসারের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইলেন। বিদ্যালয়ে অবকাশকালে শিক্ষকদিগকে Slojd প্রথানুযায়ী কাঠের কাজ, পিজবোর্ডের কাজ ও মাটির কাজ শিখাইবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাসেলস নগরীতে আন্তর্জাতিক শিল্পবিজ্ঞান সম্মেলনে শিল্প শিক্ষাদানের পদ্ধতি বিষয়ে যাঁহারা মৌলিক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচয়িতাদিগকে গভর্নমেণ্ট পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করেন। Monfort এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথানুসারে বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষাদানের কার্য চলিল, নিম্নশ্রেণীগুলিতে শিল্পশিক্ষা আবশ্যিক এবং উচ্চশ্রেণীসমূহে শিক্ষার্থীর ইচ্ছাসাপেক্ষ করিয়া দেশে শিল্পশিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট বিশেষ উদ্যোগী হন, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য এই সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার বাধা জন্মে। তৎপরে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বেলজিয়াম নানা দেশে প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে সতত অবহিত থাকিয়া সংস্কৃতির জন্য শিল্পানুশীলন—এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিদ্যালয়ে শিল্পপ্রবর্তনে মনোনিয়োগ করিয়াছে।

জার্মানীর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই সুপরিচিত। এই পদ্ধতির প্রবর্তক Froebel-এর নাম ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি প্রকৃতির নিকট হইতে তাঁহার মহৎ পরিকল্পনার ইঙ্গিত লাভ করিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া Pestalozzi-র মতবাদ তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। স্বাভাবিক নিয়মেই শিশুকে বাড়িতে দেওয়া উচিত এবং শিশুর স্বভাবজাত খেলাধুলা করিবার ইচ্ছা ও প্রয়াসের ভিতর দিয়া তাহার সৃষ্টি করিবার বা কোন কিছু গড়িবার স্বাভাবিক বাসনাকে জাগ্রত করা উচিত—ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগে শিশুকে কোন কিছু করিতে বাধ্য করিবার প্রথা নিতান্ত ভ্রমাত্মক—Froebel ইহা বিশ্বাস করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি নিজের দেশে বিশেষ কিছু করিবার সুযোগ পান নাই। সুইটজারল্যাণ্ডে তিনি বহু শিক্ষককে শিক্ষাদান করেন এবং সেই দেশে থাকিয়াই তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক মহৎ কার্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বহু ছাত্র ইউরোপের নানাস্থানে তাঁহার প্রবর্তিত প্রথা অনুসারে শিক্ষা বিস্তার করেন। আক্ষেপের বিষয়, আইন করিয়া জার্মানীতে তাঁহার পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেওয়া হয় নাই। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষায় প্রবল হইল। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে অনেকগুলি কুটিরশিল্প বিদ্যালয় অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে একটি শিল্পশিক্ষক মণ্ডলীর প্রচেষ্টায় এই বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হইয়া যায় এবং পুনরায় সাধারণ বিদ্যালয়ে যখন শিল্প স্থানলাভ করে, তখন শিল্পের অর্থনৈতিক মূল্য এবং শিক্ষার দিক হইতে বিচার করিয়া শিল্পের যে একটি মূল্য আছে এতদুভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইল। ১৯১০ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিল্পের প্রবর্তন করা হয় বটে, কিন্তু শিল্প আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯২২ সাল হইতে ১৯২৫ সালের মধ্যে জার্মানীতে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হয়। ইহাতে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদিগের ইচ্ছা ও শক্তি থাকিলে শিল্প শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প আবশ্যিক করা হইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীতে তিনটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শিল্পশিক্ষার কার্যকারিতা বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতে থাকে। একদল শিক্ষক হস্তনিপুণতার উপর বিশেষ আস্থাবান ছিলেন, তাঁহারা প্রস্তুত করণের প্রণালী বা টেকনিক শিশুরা যাহাতে যথাযথভাবে শিক্ষা করে তাহার প্রতি মনোযোগী হইলেন। অপর একদল শিক্ষক শিল্পকে অবলম্বন করিয়া উৎসব, খেলাধুলা, উদ্যানরচনা প্রভৃতির ভিতর দিয়া শিশুর ক্রমবর্ধমান শক্তির অনুপাতে নানাবিধ শিক্ষাদান করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। শিশু কিরূপ সামগ্রী প্রস্তুত করিল ইহার পরিবর্তে কেমন করিয়া সৃষ্টি করিল ইঁহারা তাহা দেখিতেন। তৃতীয় দলের শিক্ষকগণ বিশ্বাস করিতেন যে, চারুশিল্পকে কারুশিল্প হইতে পৃথক করা যায় না, উভয়বিধ শিল্পই দৃষ্টির গভীরতা দান করে ও রুচি সংস্কারে সহায়তা করে এবং শিল্প হইতে এই জ্ঞানলাভ করিয়া শিশুরা ভবিষ্যতে জাতীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয়। এই তিনটি আদর্শের মধ্যে যেটি অনুসরণ করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট ফললাভ হইবে সেই আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার ইচ্ছাই জার্মানীর ছিল।

ইংলণ্ডে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের Act অনুসারে School Board সমূহ গঠিত হয়। সেই সময়ে মাত্র কয়েকটি শহরে একেবারে শিশুদের বিদ্যালয়ে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে সহজ ধরণের অল্পস্বল্প হাতের কাজ প্রচলিত হইল। ইহার পনেরো বৎসর পরে উচ্চ বিদ্যালয়েও শিল্প প্রবর্তন করিবার প্রচেষ্টা হইলেও শিল্প

তেমন প্রসারলাভ করে নাই। ১৮৮৯ সালে Technical Institution Bill পাশ করিবার ফলে এগারো বৎসরের অধিক বয়সের বালকদিগের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট কাঠের কাজ ও ধাতুর কাজ এবং বালিকাদিগের জন্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, রন্ধনশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল। সাত বৎসর বয়সের নিম্নে এবং এগারো বৎসর বয়সের ঊর্ধ্বে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু মধ্যবর্তী চার বৎসরকাল শিল্পশিক্ষার একেবারে কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই সময়ে Country Council গঠিত হইয়া Junior School-এ কারুশিল্প প্রবর্তন করিবার প্রচেষ্টা হইল। ইহার পর কুড়ি বৎসর যাবৎ এই প্রথায় কার্য হয় তথাপি Junior School-এ সর্বত্র শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা যে আশানুরূপ হইয়াছিল এমন কথা বলা চলে না। এই সময়ে বিদ্যালয়ের কার্যতালিকায় শিল্পের জন্য যথেষ্ট সময়ও দেওয়া হয় নাই। তৎপর Hadow পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যালয়ে শিল্প প্রবর্তনের কার্যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। Senior School-এর শিক্ষার্থীদিগের নানাবিধ শিল্পশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে শিল্প আবশ্যিক করা হইয়াছে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর বালক-বালিকারা পরীক্ষার চাপে শিল্প অনুশীলনের সময় পায় না। শিল্পের সাহায্যে সৌন্দর্যজ্ঞান ও পরিমার্জিত রুচি লাভ করাই যে সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় বস্তু, এই অভিমত ক্রমেই প্রবল হইতেছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিল্প প্রবর্তন ছাড়াও যে সকল শিশুর দেহ বা মন স্বাভাবিক অথবা সুস্থ নহে তাহাদের জন্য শিল্পপ্রধান বিদ্যালয় আছে। দেশের মধ্যে শিল্পচেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে Froebel Society, Educational Handwork Association, London School Guild of Arts and Crafts, Institute of Handicraft Teachers প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের বা হস্তকুশলতা সৃষ্টি করিবার শক্তিকে এবং অর্থনৈতিক উপকারিতাকে শিল্প বা কারিগরি বিদ্যালয়েই মূল্য দেওয়া হয়।

জাপান কারুশিল্পের জন্য পৃথিবীর মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করে সন্দেহ নাই, কিন্তু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সে দেশে সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্পের যোগ ছিল না। বিদ্যালয়ে ঐ সময়ে শিল্প প্রবর্তিত হইলেও শিল্পশিক্ষা আবশ্যিক করা হয় নাই বা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পের মূল্য উপলব্ধ হয় নাই। প্রথম অবস্থায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কতকটা Slojd প্রথানুসারে কাঠের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইত, কিন্তু শিল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারায় শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদিগের হস্তকুশলতার প্রতিই অত্যধিক দৃষ্টি দিতেন। ফলে ক্রমে ক্রমে শিল্পশিক্ষায় শিথিলতা দেখা দিল। তারপর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে টোকিও নগরী যখন ভূমিকম্পের ফলে একরূপ ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয় তখন একদল উৎসাহী ও শিক্ষিত শিল্পশিক্ষক 'Society of Creative manual Training' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া পুনরায় বিদ্যালয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শিল্পের প্রবর্তন করিলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিদ্যালয়-গুলির সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষকেরা শিশুদিগকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করিলেন। বিপুল উদ্যমে শিক্ষার্থীরা নানারূপ শিল্পকার্যে আত্মনিয়োগ করিল। অনেক প্রকার নষ্ট মালমশলা হইতে বালক-বালিকারা আপন আপন ডেস্ক বেঞ্চ প্রভৃতি সর্বপ্রকার আসবাবপত্র এবং হ্যাণ্ডব্যাগ, বই রাখিবার থলি প্রভৃতি নানাবিধ জিনিস প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। প্রকারান্তরে Project প্রথায় শিক্ষাদান হইল। এই সময়েই প্রকৃতপক্ষে জাপানে শিক্ষার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। কারুশিল্পের সাহায্যেই জাপানের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন হইয়াছে একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শিল্পের ভিতর দিয়া সত্যকার শিক্ষা কিরূপে হইতে পারে জাপানবাসী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহা নিরীক্ষণ করিল এবং ইহার পর হইতেই বিদ্যালয়ে শিল্প প্রবর্তনের প্রতি পুনরায় উৎসাহ দেখা দিল। ইতিপূর্বে যেখানে হস্তকুশলতার উপর শিক্ষকের প্রধান দৃষ্টি ছিল সেখানে তখন সৃজনশক্তি ও রুচি গঠনের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য পড়িল। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ে কারুশিল্প আবশ্যিক করা হইয়াছে। অধুনা জাপানে যে অভূতপূর্ব শিল্পোন্নতি হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ আর কিছুই নয়, আবশ্যিক শিল্পশিক্ষা ও শিল্প প্রসারের বিরাট প্রচেষ্টা।

সুইডেনেই Froebel-এর আদর্শে গঠিত বিখ্যাত Slojd প্রথার উদ্ভব। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ডে গ্রামের স্কুলগুলিতে Uno Cynaeus প্রথম Slojd প্রথা অনুসরণ করিয়া শিক্ষার সহিত শিল্পের সংযোগ স্থাপন করেন। তাহার পরে তাঁহার একজন Salomon নামক শিষ্য শিক্ষকদিগের জন্য একটি বিদ্যালয় করেন। ইউরোপের সকল স্থান এবং সুদূর আমেরিকা হইতেও বহু ছাত্র এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে আসিত। ঐ সময়ে সে দেশে কুটিরশিল্পের পুনর্গঠন কাজে Slojd প্রথা বিশেষরূপে কার্যকরী হওয়ায় গ্রামের কৃষকগণ কৃষিকার্য ত্যাগ করিয়া দলে দলে শহরে যাইয়া বাস করা বন্ধ করিল। প্রথমদিকে এই প্রথায় ছাত্রদিগের দ্বারা বিক্রয়োপযোগী পণ্য প্রস্তুত করান হইত এবং সহজে প্রস্তুত করা যায় এইরূপ সামগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে কঠিন শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। ছাত্রগণ শিক্ষান্তে যাহাতে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কার্য করিতে সক্ষম হয় অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া সেইরূপ শিক্ষাই তাহাদিগকে দেওয়া হইতে লাগিল। কিন্তু পরে শিল্পশিক্ষার এই আদর্শ বর্জন করিয়া শিক্ষার জন্যই শিল্প এই মনোভাব লইয়া কার্য চলিতে থাকে। শিল্পের স্থান তখন বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত সমান হয়। সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীর পক্ষেই শিল্প শিক্ষণীয় করিয়া সপ্তাহে অন্তত চার ঘণ্টা শিল্পের জন্য নিয়োগ করা হয়। বিদ্যালয়ে যে ছাত্রদিগের শিল্পে শক্তি ও প্রতিভা আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বিদ্যালয়ের পড়াশুনা সমাপ্ত হইলে শিল্প বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।

রাশিয়াতে বিপ্লবের পূর্বে একমাত্র ধনীরাই সন্তানকে শিক্ষাদান করিতে পারিত। আট বৎসর বয়সের আগে প্রায় কোন শিশুই বিদ্যালয়ে যাইত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে Victor Della-Vos শিল্পশিক্ষা দিবার একটি পদ্ধতি প্রচলন করেন। তাঁহার মতে শিল্পের ভিতর দিয়া যে শিক্ষালাভ হয় সেই শিক্ষাই শিল্পের শ্রেষ্ঠ দান শিক্ষার্থী যে শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত করিল তাহা শ্রেষ্ঠ নহে। বলা বাহুল্য যে তাঁহার এই মতবাদ Froebel-এর নীতির দ্বারাই প্রভাবান্বিত। রাশিয়ায় বিপ্লবের পরে শিল্পশিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য বহুবিধ প্রচেষ্টা হইয়াছে। ১৯২২ সাল পর্যন্ত শিল্প বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকাভুক্ত করা হয় নাই কিম্বা ১৯২৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত শিল্প-শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়াতে পৃথকভাবে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয় না। সকল বিদ্যালয়েই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্প, যন্ত্রশিল্প, কৃষি প্রভৃতি উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতির (Productive Processes) সহিত ছাত্রদের পরিচিত করা হয়। ষোল বৎসর বয়সে শিল্পে অনুরাগ বা শক্তি আছে এরূপ শিক্ষার্থীকে শিল্পবিদ্যালয়ে পারদর্শিতা লাভের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। ছয় সাত বৎসরের শিশু প্রথমে প্রধান প্রধান যন্ত্রের ব্যবহার ও মাটি, কাঠ প্রভৃতি নানাবিধ উপাদানের সহিত পরিচয়ের ভিতর দিয়া জ্ঞান লাভ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ছোটখাট যন্ত্রপাতি তৈয়ারী, মাটির কাজ, কাঠের কাজ করে খেলনার ইঞ্জিন, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শেখে। মেয়েরা রন্ধন, সূচিশিল্প ও গৃহস্থালীর নানারূপ কাজ শিক্ষা করে। শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকার মধ্যে কাগজের, পিজবোর্ডের, টিনের

তারের, তাঁতের ও মেরামতি কাজ প্রভৃতি অনেক শিল্পই আছে। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা স্কুলের আসবাবপত্র ও নানাপ্রকার সাজসরঞ্জাম নিজেরাই তৈয়ারী করিয়া লয়। এমন কি বড় বড় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, মেশিন, রেডিও সেট ইত্যাদিও প্রস্তুত করিতে শেখে। মধ্যে মধ্যে তাহারা বড় বড় শিল্পের কারখানায় যাইয়া জ্ঞান সঞ্চয় করে। এগারো বৎসর বয়সের পর হইতে শিক্ষার্থিগণ বিশেষজ্ঞের পরিচালনাধীনে শিল্প শিক্ষা করিয়া থাকে। ষোল সতেরো বৎসর বয়সে যখন স্কুলের পাঠ সমাপ্ত হয় তখন হাতে ও আধুনিক বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে কৃষি ও শিল্পের কাজ ও ঐ সকলের পশ্চাতে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে তাহা মোটামুটি শিখিয়া লয়। বর্তমানে বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের প্রণালী শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এই শিক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য হইল শিক্ষণীয় অপর বিষয়গুলির সহিত শিল্পের সংযোগ সাধন করিয়া শিক্ষার্থীর প্রকৃতি রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলা এবং বাস্তব জীবনের সহিত বিদ্যালয়ে লব্ধ শিক্ষার প্রকৃত মিলন বা সম্বন্ধ স্থাপন করা।

আমেরিকায় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রথম চিন্তা করিতে আরম্ভ করা হয় ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে। রাশিয়ার Victor Della-Vos এর প্রচেষ্টার সুফল দেখিয়া আমেরিকার কয়েকজন শিক্ষাবিদ তাঁহার পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হন ও স্কুলে শিল্প প্রবর্তন করেন। এই সময়ে St. Luis manual Training School প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিদ্যালয়ে কাজ শিখিয়া শিক্ষার্থীরা Washington Universityতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত। ইতিপূর্বে যে প্রথানুসারে আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষা দান করা হইত তাহাতে কয়েকজন ধনীর দুলালের কিছু উদ্দেশ্য সাধিত হইত বটে, কিন্তু তাহার সহিত সাধারণের জীবনের বা বাস্তবতার কোন যোগ নাই, একথা সকলেই উপলব্ধি করিল এবং ক্রমে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সমাজের সকল স্তরের লোকই সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে লাগিল। দেশের সর্বত্রই অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। সুইডেনের Slojd প্রথাও রাশিয়ার পদ্ধতির সহিত পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কিন্তু অধিক দিন আর দুই পদ্ধতি একত্রে চলিল না। এই সময়ে Ruskin ও Morris নামক দুইজন শিক্ষাবিদ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের বস্তুতে সৌন্দর্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। শিল্প শিক্ষায় যে দৃষ্টি এতদিন হস্তনৈপুণ্য লাভের প্রতি [illegible] [illegible] লাভের দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু অধিকদিন আর আমেরিকার ন্যায় শিল্পপ্রধান দেশে এই আদর্শ অবলম্বন করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। পুনরায় স্কুলের শিল্প শিক্ষায় পেশাদারী বা বৃত্তিমূলক মনোবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল, ফলে সৃষ্টি করিবার শক্তির বিকাশে বাধা জন্মিতে থাকিল। এই সময়ে সে দেশে শিল্প শিক্ষাদান সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচলিত ছিল তাহা লক্ষ্য করিলে একটি বিষয় বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হস্তকুশলতার সহিত পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা ও নির্ভুলভাবে কাজ করিবার শক্তি শিল্পের সাহায্যে লাভ করিতে হইবে, এই মনোভাব প্রধান থাকিলেও তথায় কেবল ইহাকেই শিল্পের একমাত্র দান বলিয়া মনে করা হয় নাই, ধৈর্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি মনের শক্তি এমন কি সাধুতা, সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি নৈতিক শক্তিও মানুষ শিল্পানুশীলনের দ্বারা অর্জন করিতে সমর্থ হয়, একথাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন কিন্তু অর্থনৈতিক মতবাদ তখন আমেরিকায় শক্তিশালী বা প্রবল থাকায় শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া শিল্পানুশীলন তখন সম্ভব হয় নাই। সৌভাগ্যবশত সে দেশের লোক শিক্ষা যে জাতি গঠনের মেরুদণ্ড স্বরূপ সেই জ্ঞানের বিষয়ে অজ্ঞ ছিল না, তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনানুযায়ী সংস্কারের প্রতি সে দেশবাসীর সজাগ দৃষ্টি ছিল। শিল্প যখন কেবলমাত্র হাতের কাজে পর্যবসিত হইতে চলিল তখন Harvard, Stanley Hall প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিল্প শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইলেন। মনীষী শিক্ষাবিদ Dewey শিল্পের যে দেহ ও মন এতদুভয়ের শক্তির বিকাশ সাধনে ক্ষমতা আছে এবং সেই দুই শক্তির কোনটিকেই যে অবহেলা করা যায় না, দুয়ের সমন্বয় বিধান করিয়া চলিতে পারিলে যে প্রকৃত কল্যাণ হয়, শিল্পের এই নূতন অথচ অত্যান্ত সত্য রূপের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। আজকাল, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা দানের জন্য একজন বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভর করা হয়। তিনিই শিল্পের পূর্বোক্ত উভয় দিকের সমতা রক্ষা করিয়া চলেন। একটি মাত্র শিল্পের সহিত শিশুর পরিচয় না করাইয়া কয়েকটি শিল্পের মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয়ে যাহাতে তাহার জ্ঞান জন্মে তাহা করা হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া বহু শিল্পে মনোযোগ দেওয়ার ফলে শিশু কোনটিই যথোপযুক্তভাবে শিখিতেছে না এমন যাহাতে না ঘটে, সেদিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হয়। উচ্চশ্রেণীগুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে শিক্ষার্থী যতদূর সম্ভব শিল্পজীবীর সমান নিপুণতা যাহাতে লাভ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। অবশ্য সে দেশে শিল্পজীবী সাধারণত বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করে, কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর পক্ষে বৃহৎ যন্ত্রে কাজ করিবার সুযোগ ঘটে না, তথাপি ছাত্রেরা শিল্প-সামগ্রীর সৌন্দর্য বিচার করিবার জ্ঞান লাভ করে বলিয়া বৃহৎ যন্ত্র নির্মিত সামগ্রীর গুণাগুণ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। বহু উৎসাহী শিক্ষাবিদ ও শিল্পী কেমন করিয়া দেশের শিল্প ও শিক্ষার অভীপ্সিত মিলন করিতে পারে সে বিষয়ে সর্বদা যে সচেতন আছেন ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় কথা।

প্রসিদ্ধ শিক্ষাগুরু Pestalozzir কথা পূর্বে বলিয়াছি, তিনি সুইটজারল্যাণ্ড-বাসী ছিলেন। তাঁহারই প্রেরণায় Froebel ও Montessori অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষা জগতে অনেক মহৎ কার্য করিতে সমর্থ হন। Pestalozzi কতকগুলি দীন দরিদ্র শিশুদের লইয়া আপনার নিকট রাখিয়া সযত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন। চিরপ্রচলিত কঠোর ব্যবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে না রাখিয়া তিনি পরম স্নেহে রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদানে ব্রতী হইলেন। শিশুদের স্বভাবজাত মনোবৃত্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া এবং তাহাদের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা নানা উপায়ে সজীব রাখিয়া তিনি শিক্ষা দিতেন। তাহার শিক্ষা পদ্ধতির অপূর্ব সফলতা দেখিয়া গভর্নমেণ্ট নিঃস্ব শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তাঁহাকে সাহায্য করেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি তাঁহার শিক্ষানীতির বিশেষ কার্যকারিতা শক্তি দেখিতে পান। তিনি বলিতেন, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির ভিতর দিয়া সৃষ্টি বা কাজ করিতে করিতে এবং নানা বস্তু ও উপাদানের সহিত পরিচয়ের ফলে শিশু অনেক তথ্য ও সত্য আবিষ্কার করে এবং নানা বিষয়ে নানা ইঙ্গিত লাভ করে। Leonard and Gartrude নামক তাঁহার একখানি শিল্প শিক্ষা বিষয়ে অমূল্য গ্রন্থ আছে। শিক্ষক মাত্রেরই শিক্ষা শাস্ত্রের এই গ্রন্থখানি পাঠ করা উচিত।

অন্যান্য দেশের ন্যায় এই দেশেও বহুবিধ শিক্ষা প্রণালী অনুসরণ করিয়া দেখা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে শেষ পর্যন্ত দুইটি মত এখনও প্রচলিত আছে। একটি মত অনুসারে হস্ত-নিপুণতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অপরটিতে শিশুর ক্রমবিকাশে, তাহার আপন বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিতে যাহাতে কোনরূপ বাধা না ঘটে, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। Council Schoolগুলিতে প্রথমোক্ত মতবাদ অনুসারে, কাঠ, ধাতু, পিজবোর্ড মাটি প্রভৃতির কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে State School সমূহে Pestalozzir প্রণালীতে শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা চলিতেছিল। এই প্রণালীতে সৃষ্টি করিবার কাজে শিশুর স্বভাবজাত আগ্রহের সুযোগ লইয়া সে দেশে শিশুদিগকে অঙ্কন শিক্ষা দানের কার্য বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় Pestalozzir মতবাদ-

অবলম্বনের জন্য শিক্ষাবিদগণ অগ্রহী হইয়া উঠিলেন।

সুইটজারল্যাণ্ডের কতকগুলি গ্রামে কৃষক-দিগের শিশুরা নিজেদের খেলার জন্য নানারূপ অদ্ভুত অদ্ভুত খেলনা তৈয়ারী করিয়া থাকে। কোনরূপ শিক্ষা না পাইয়া শিশু যে এইরূপ অপূর্ব সৃষ্টি করিতে পারে এবং খেলার ছলে এই এই যে কাজ ইহার প্রতি সেখানকার অনেক শিক্ষাবিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এই সত্যের সাহায্য লইয়া শিক্ষা-বিষয়ক নানারূপ গবেষণা চলিতেছে। ইহা Pestalozzi প্রবর্তিত প্রণালীকেই সমর্থন করে।

এ পর্যন্ত নানা দেশের যে সকল শিক্ষা-নীতির কথা আলোচনা করা হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কখনও হস্ত-কুশলতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে, কখনও সৌন্দর্য-বোধ ও মনের সৃজনী শক্তি-বিকাশের উপর মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, আবার কখনও বা শিল্পানুশীলনের এতদুভয় কার্যকারিতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, বিদ্যালয়ে শিল্প-প্রবর্তনের ইতিহাসের প্রারম্ভে শিল্পের যে আদর্শই থাকুক না কেন, বর্তমানে শিল্প-শিক্ষাদানের মধ্যে রুচি, সংস্কার ও মনকে বিকশিত ও উন্নত করিবার শক্তিকে মুখ্য বলিয়া সকল দেশই গণ্য করিয়াছে এবং শিল্পের সাহায্যে হস্তকুশলতা লাভ ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই।

ভারতবর্ষে বিদ্যালয়ে আজও শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে শিল্পকে স্থান দেওয়া হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, কারণ অতি অল্প-সংখ্যক বিদ্যালয়েই শিল্পকে শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু শিল্প-নির্বাচনে, শিক্ষক-নিয়োগে, শিক্ষা-পদ্ধতিতে যে নীতি অনুসরণ করা হইতেছে এবং যে দৃষ্টি-ভঙ্গি লইয়া শিক্ষাদান করা হইতেছে তাহাতে আমার মনে হয় অন্যান্য দেশে বিদ্যালয়ে শিল্প-প্রবর্তনের ইতিহাসে প্রথম যুগে যখন শিল্পের সাহায্যে হস্তকুশলতা লাভ ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রতি সর্বাধিক লক্ষ্য রাখিয়াই শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইত, আমরা আজ সেই যুগে বাস করিতেছি। কারিগরী শিক্ষায়তনে যে পদ্ধতিতে বৃত্তিমূলক শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় সাধারণ বিদ্যালয়ে অপরিবর্তিতভাবে সেই পদ্ধতিই অনুসৃত হইতেছে। যে সকল বিদ্যালয়ে শিল্প প্রবর্তিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই হইল এইরূপ। ভারতবর্ষে আরও দুইটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার সহিত শিল্পের সংযোগ সাধন হইতেছে দেখা যায়। একটি হইল মহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত শিল্প-কেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা এবং অপরটি রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত শ্রীনিকেতন শিক্ষা-সত্রের শিক্ষা ব্যবস্থা।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় একটি মূল শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া ইতিহাস, গণিতাদি নানা শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয় এবং সেই সংগে সংগে যে শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার সাহায্যে যাহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থী গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে সক্ষম হয় এরূপভাবে সে শিল্প আয়ত্ত করে। ভবিষ্যতে যাহাতে সে সমাজের সেবা করিবার উপযোগী হয় এরূপ শিক্ষাও তাহাকে দেওয়া হয়। অধিকন্তু শিক্ষালাভ করিবার কালে শিক্ষার্থিগণ যে শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত করিবে তাহা বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বেতনের ব্যয়ভার সম্পূর্ণভাবে না হইলেও বহুলাংশে যাহাতে লাঘব করিতে পারে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখার কথা এই পরিকল্পনায় চিন্তা করা হইয়াছে। কয়েকটি প্রদেশে এই পরিকল্পনা লইয়া অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ Poet's Schoolএ যে আদর্শের কথা লিখিয়াছেন শ্রীনিকেতন শিক্ষাসত্রে সেই আদর্শে শিশুদের গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা হইতেছে। ইহাতে শিল্পের অতি উচ্চ স্থান আছে। শিল্পকে কেবলমাত্র হাতের কাজ বলিয়া ভাবা হয় নাই, শিশুকে মানুষ করিয়া তোলার একটি উপায় স্বরূপে গণ্য করা হইয়াছে। ইহাতে শিল্পানুশীলনের সংগে সংগে তাহার পশ্চাতে যে জ্ঞান বিজ্ঞান রহিয়াছে তাহার সহিত শিশুকে পরিচিত করিবার কথা চিন্তা করা হইয়াছে। শিশুর শিক্ষা জীবনে সকল কর্মের সহিত শিল্প জড়াইয়া আছে এবং তাহা অবিচ্ছেদ্যভাবেই। শিল্প শুধু কারখানার ঘরে বিচ্ছিন্নভাবে আবদ্ধ নাই। তাহার বসনভূষণে, আচার-ব্যবহারে, তাহার বাসস্থান ও ব্যবহৃত জিনিসপত্রে, তাহার ক্ষুদ্র উদ্যান রচনায় ভ্রমণে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে, অভিনয়ে, উৎসবে, সাহিত্য সভায় সকল ক্ষেত্রে সে শিল্পের সাধনা বা সুন্দরের সন্ধান করে।

আজ রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প, কলা ও সংগীত বিভাগ ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে মূল্যবান দান করিয়াছে তাহা দেশের বহু প্রগতিশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই প্রভাবান্বিত করিয়াছে।


রক্তদুষ্টজনিত গোলমাল?
হতাশ হইবেন না।

প্রারম্ভে ক্লার্কস ব্লাড মিকশ্চার ব্যবহারে উহা নিরাময় হয়। রক্ত দুষ্টিজনিত যাবতীয় উপসর্গ দূরীকরণে বিশেষ ফলপ্রদ পৃথিবীখ্যাত রক্ত-পরিষ্কারক এই প্রাচীন ঔষধটীর উপর অনায়াসেই নির্ভর করিতে পারেন।

বাত, ঘা, ফোড়া, বিখাউজ, সন্ধির বেদনা এবং অনুরূপ অন্যান্য অসুখ এই ঔষধ ব্যবহারে অবশ্যই নিরাময় হইবে।





সমস্ত সম্ভ্রান্ত ডীলারদের নিকট তরল ও বটিকাকারে পাওয়া যায়।



কুলাঙ্গার

সুশীল রায়

পঞ্চাননের তিন ছেলে। তিনটি ছেলেই যখন এক সঙ্গে বড় হ'য়ে উঠ্‌লো, তখন পঞ্চাননের আনন্দ আর ধরে না। এবার আর কি এতদিন এত কষ্ট ক'রে এত খেটে-খুটে এবার সে আরাম করতে পারবে একটু। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে কাপড়-জামা কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসতে হ'তো তার একার, এক হাতে কেচে ও এক হাতে ইস্ত্রী ক'রে তাকেই আবার ধোয়া কাপড় বিলি ক'রে দিয়ে আসতে হ'তো বাড়ি বাড়ি। কিন্তু এখন, এখন গুণধর কাপড় নিয়ে আসে, মনোহর কাপড়ে দাগ দেয়, আর নটবর কাচা কাপড় বাড়ি বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসে। ভাটি থেকে নামিয়ে বাপ-বেটা চারজনে মিলে ভোর রাত থেকে হুসহাস শব্দ ক'রে পাটে আছড়ে আছড়ে কাপড় কাচে। পঞ্চাননের বৌ মাড় জ্বাল দিয়ে দেয় আর ভাত রাঁধে। পঞ্চাননের সংসারের চেহারা ফেরার এবার একটু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ছেলে তিনটে খাট্‌তে পারে অসাধারণ। কাজে উৎসাহও তাদের খুব। শহর থেকে মাইলখানেক দূরে তাদের ভাটিখানা। এখানে ডোবার পাশেই তাদের কুঁড়ে ঘর। ভেঙে চুরে কাৎ হ'য়ে গিয়েছিল, অল্পদিন হ'লো আবার সোজা ক'রে গ'ড়ে নিয়েছে তারা। ডোবার ধারে পাশাপাশি খান চারেক পাট বসানো। এখানে লাগাড়ে কাপড় কাচা চলে।

নটবর বাপকে বলে, কাজ যা বেড়েছে—এবার একটা গাধা কিনলে বেশ হয়।

পঞ্চানন গামলায় নীল গুলছিলো, বললো, হবে। ঘরটা আগে মেরামত ক'রে তুলি ভাল ক'রে।

—এই তো সেদিন মেরামত করা হ'লো।

—ও কি আর মেরামত হ'য়েছে?—গোঁজ দিয়ে গুঁজে সোজা ক'রে রাখা হয়েছে মাত্র। এক ঝড়ের ধাক্কাই সামলানো দায়। হবে রে হবে, শুধু গাধা কেন? তোরা যদি এমনি মন দিয়ে কাজ করিস, তবে ঘোড়া হ'তেই বা কতক্ষণ। পঞ্চাননের পেশীবহুল হাতের কটা কটা লোম নীলের জলে ভিজে যায়।

জীবনকে এমনি রাঙিয়ে তুলতে ততক্ষণ। সংসারকে জাগিয়ে তুলতে লাগে ক'দিন। পঞ্চানন একা যা পারেনি, গুণধর, মনোহর ও নটবরের চেষ্টায় তা-যে হবে, এ-বিষয় সে নিশ্চিত। পঞ্চাননের বৌও তাই বলে।

অদূরে বড় রাস্তার ওপর মেয়েদের ইস্কুল। দশ বছর আগে করগেটের একটা আটচালা ঘরে পঞ্চাশ জন মেয়ে নিয়ে ইস্কুল আরম্ভ হয়। আর এই দশ বছরের মধ্যে ইস্কুলের চেহারাই গেছে বদলে। দোতলা কোঠা বাড়ি হ'য়েছে, উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হ'য়েছে সীমানা, মেয়ের সংখ্যা হ'য়েছে হাজারের ওপর। শহরের সবাই এক সঙ্গে মিলে মিশে চেষ্টা ক'রেছিলো ব'লেই-না পঞ্চাননদের চোখের ওপর এমনভাবে বড় হ'য়ে উঠ্‌লো ইস্কুলটা। তার তিন ছেলে যদি চেষ্টা করে, তাহ'লে পঞ্চাননেরও ছোট একটা কোঠাবাড়ি হ'তে কতদিন আর লাগবে। গাধা কিনতে চায় নটবর, ধোপার ঘরে গাধা না থাকলে অবশ্য মানায় না, বোঝে পঞ্চানন। কিন্তু গাধার আগে ঘরে চাই লক্ষ্মী। সংসারকে পঞ্চানন আগে লক্ষ্মীমন্ত ক'রে তুলতে চায়।

তাই গুণধরের হ'লো বিয়ে। মেয়েটার নাম ময়না। বছর বার বয়সের একটা খুকি। লম্বা ঘোমটা দিয়ে পুতুলের মত ঘুরে বেড়ায়। গার্ল স্কুলের মেয়েরা দোতলার রেলিঙে দাঁড়িয়ে গুণধরের বৌকে দেখে মজা করে। ঘোমটার নীচে ফিক ফিক ক'রে হাসে ময়না।

পঞ্চাননের আনন্দ আর ধরে না। গার্ল স্কুলের ফটকের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘোমটা তুলে বৌ-এর মুখ দেখিয়ে আসে পঞ্চানন। মেয়েরা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে বলে, নাম কি পাঁচু?

পঞ্চানন বিনয়ে গ'লে গিয়ে বলে, ময়না।

গুণধর দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে মন দিল। বড় বড় কাপড়ের বোঝা সে যথানিয়মে নিয়ে আসতে লাগলে কাঁধে ক'রে। মনোহর আর নটবর ভোর থেকে উঠে হুসহাস ক'রে কাপড়ে আছাড় দিতে লাগলো। ভোরের কাজ থেকে গুণধরকে তারা আপাতত কিছুদিনের জন্য রেহাই দিয়েছে। বিবেচনা আছে মনোহরদের।

কিন্তু আশ্চর্য, কে-যেন কি প্রলোভন দেখিয়েছে—নটবর উধাও হ'য়েছে দেশ থেকে। নটবরের অন্তর্ধানের পর মনোহরের ঘাড়ে চাপ একটু বেশিই প'ড়েছিল। সেই অভিমানে বুঝি মনোহরও পালিয়েছে।

পঞ্চানন হতভম্ব হ'য়ে গেছে। গুণধর বেকুব ব'নে গেছে। গাধা, গাধা—পঞ্চানন চেঁচিয়ে ওঠে এক এক সময়,—গাধা কিনতে সখ হ'য়েছিলো, তোরাই-যে রামগাধা।

গুণধর বাপের সামনে বড় একটা আসতে চায় না। দুই ভাই-এর কোনো সংবাদ না পেয়ে তার বাপ এখন পাগল হ'য়ে আছে। এ-সময় ভালো কিছু বলতে গেলেও একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌তে পারে পঞ্চানন। গুণধর বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাপড় নিয়ে আসে, যতটা পারে একাই কাচে। পঞ্চানন একেবারে ভেঙে প'ড়েছে। পঞ্চাননের বৌ তো খাওয়া-দাওয়াই বন্ধ ক'রেছে প্রায়।

খবর নেবে কার কাছ থেকে? অথচ খবর না নিলেও তো চলে না। পঞ্চানন নিজের কথা তত ভাবে না, তার বৌ-কে যদি বাঁচাতে হয়, তাহ'লে খবর একটা যে দরকার। ও যে খাচ্ছে-দাচ্ছে না একেবারে।

গার্ল স্কুলের মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে, হ'লো কি পাঁচু?

পঞ্চানন জবাব দেয় না। তার ছেলে দুটো গেলো কোথায়—এই কথাই সে ভাবে শুধু।

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান তার ইস্কুলের সেক্রেটারী সরলবাবু যাচ্ছিলেন। পঞ্চানন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, কোনো রকমে খবর করা যায় না, বাবু?

—খবর করবি কোথায়? দুনিয়া কি একটুখানি জায়গা। নিশ্চয় যুদ্ধের কাজ নিয়ে চ'লে গেছে কোথাও।

যুদ্ধের কাজ! বলেন কি চেয়ারম্যানবাবু। পঞ্চানন থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। যুদ্ধ করতে চ'লে গেছে তার ছেলেরা! যুদ্ধ করতে যাবে কেন তারা!

—মোট্টা টাকা মাইনে দিচ্ছে। ভাল-ভাল খেতে দিচ্ছে, পোষাক দিচ্ছে। যাবে না কেন? সরলবাবু বললেন।

ধোপার ছেলে করবে যুদ্ধ! কাপড় কাচা যার কাজ, যুদ্ধের সে জানে কি? বন্দুক কামান নিয়ে লড়াই করবে পঞ্চাননের ছেলেরা। এ যে ভাবতে পারা যায় না। কিন্তু পরদিন নয়াবাজারে মৃগাঙ্কবাবুর কাছে পঞ্চানন শুনে এসেছে, কত নাপিতের ছেলে, কত জোলার ছেলে, কত তাঁতীর ছেলে যুদ্ধে চ'লে গেছে নাকি। যুদ্ধ কেমন ক'রে করে, তা তাদের শিখিয়ে নেয়, তবেই তাদের দিয়ে যুদ্ধ করায়।

বৌকে একথা বল্‌তে পারে নি পঞ্চানন। একেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ ক'রেছে, একথা শুনলে সে ডুকরে কেঁদে উঠ্‌বে। যুদ্ধ যারা করে, তারা তো বাঁচে না কেউ। এ-কথা কে না জানে? বৌকে সে তো ব'লেই নি, গুণধরের কাছেও সে গোপন রেখেছে কথাটা। বলা যায়

না। গুণধরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে কতক্ষণ। পঞ্চানন নিজের বুকের মধ্যে এই তাপ চাপা দিয়ে রাখলো। সেই চাপা আগুনে তার বুকের ভেতরটা তো পুড়লোই, বাইরেটাও তার ঝলসে গেলো। সাবান আর সোডার জলে তার হাত-পায়ের লোম কটা হ'য়ে গিয়েছিলো, দুর্ভাবনায় তার মাথার চুলে ধরলো পাক।

ইতিমধ্যে মনোহরের চিঠি এলো, আরও কিছুদিন পর নটবরেরও চিঠি এলো। তারা ভাল আছে। মনোহর জাহাজে কাজ নিয়েছে, আর নটবর হ'য়েছে সেপাই।

আর গোপন রেখে লাভ নেই। এবার সব জানাজানি হয়ে গেলো। নামটাই কি উচ্চারণ করা যায়, না মনে রাখা যায় ভাল করে। মনোহর আছে মাদাগাস্কারে আর নটবর মাল্টায়। লিখেছে, খুব ভাল আছে তারা, অনেক দেশ দেখছে তারা। জীবনে এত জানাশোনা হবে, জীবনে এমন জ্ঞান হবে তাদের—এ-সব তারা নাকি ভাবেনি কথনো। তারা দেখেছে মাত্র নওগাঁর মহকুমা শহরটা, আর তাদের ঘরের কাছের পবা থানাটা। অতটুকু জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর এত জায়গায় তারা যে বেড়াতে পারবে—কে ভেবেছিলো আগে। যাই হোক, অনেক দেখেছে তারা, অনেক জেনেছে। যুদ্ধ এবার প্রায় শেষ হতে চলেছে। যুদ্ধ শেষ হলেই তারা ঘরে ফিরবে।

মনোহর আর নটবরের যুদ্ধে যাবার পর সাড়ে তিন বছরের ওপর কেটে গেছে। এর মধ্যে মস্ত একটা মড়ক হয়ে গেছে। এর মধ্যে ময়না ডাগর হয়ে উঠেছে। কত-কি পরিবর্তন ঘটে গেছে এর মধ্যে—কিছুই জানলো না মনোহর আর নটবর। তারা অনেক দেশ দেখেই বেড়ালো শুধু, নিজের দেশের দুরবস্থাটা তাদের আর দেখা হলো না। পঞ্চাননদের মাথার ওপর দিয়ে কত বড় বিপদ যে কেটে গেলো, তাও জানলোনা তারা।

এই সাড়ে তিন বছরের মধ্যে পঞ্চাননের বয়স বিশ বছর বেড়ে গেছে। সে এখন প্রায় পংগু, কষে কাপড় নিঙড়ানো দূরের কথা, একটা ছোট জামা ইস্ত্রী করাও তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। পঞ্চাননের সব ভার এখন গুণধর একা টানছে। যুদ্ধ এখন শেষ হয়েছে, কিন্তু তাদের জীবনযুদ্ধের নতুন করে আবার সূত্রপাত হয়েছে। সংসারটা জেগে উঠতে উঠতে আবার আকস্মিক এক প্লাবনে অথৈ জলে তলিয়ে গেছে।

এমন সময় নটবর এসে উপস্থিত হলো। তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। নটবর একেবারে নতুন মানুষ হয়ে এসেছে, একেবারে লায়েক হয়ে এসেছে। কথায় কথায় ইংরেজি বলে শীষ দেয় আর হাসে, কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে কথা বলে। পরণে খাকির কোট আর প্যাণ্ট, মাথায় খাকীর টুপী।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো পঞ্চানন আর গুণধর। ময়না বেড়ার ফাঁক দিয়ে সভয়ে দেখছিলো নটবরকে। আশ-পাশ থেকে বাচ্চা-কাচ্চা আর মেয়ে-বৌরা নটবরকে দেখার জন্যে ভিড় করে এসে দাঁড়ালো। প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত ভরে দিয়ে ঘাড় কাৎ করে পায়চারি করছিলো আর শীষ দিচ্ছিলো নটবর। নটবর যেন এই পবা থানার কেউ নয়, সে যেন সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের একখণ্ড দ্বীপ। সবার চোখে এমনি বিস্ময় ও ঔৎসুক্য তাকে দেখার জন্যে। কারো সংগে বিশেষ কথা বলছে না নটবর, পায়চারি করছে আর গুণগুণ করে ইংরিজি গান করছে। পঞ্চাননের আজ আবার মনে পড়লো, এই নটবর একদিন একটা গাধা কেনার বায়না ধরেছিলো তার কাছে। ধোপার ঘরে গাধা না থাকলে কি মানায়?

কারো সংগে কথাটথা বলে না নটবর। খায়-দায় আর পায়চারি করে। সারাদিন কি-যেন চিবোয় আঠা-আঠা মত। প্রতিবেশীদের একেবারে তাজ্জব করে দিয়েছে নটবর।

সকালে উঠে হাই তোলে। বলে, টাইম মত চা-বিস্কুট বাটার-টোস্ট না হলে এ হাই থামবে না।

তার কথার মানে বোঝে না কেউ। সবাই বলে, কি বললে?

ফিক করে হেসে নটবর বলে, ফুঃ! ড্যামিট!

তার চারদিক থেকে ভিড় দূরে সরে যায়। দূরে থেকে ভীত চোখে সবাই তাকায় নটবরের দিকে। আড়ালে থাকে ময়না, তার বুক দুড়দুড় করে কাঁপে। বিয়ের পর কত রংগতামাশা করতো নটবর, একেবারে ভুলে গেলো নাকি তাকে? একবারও জিজ্ঞেস করছে না তার কথা। একবারও ফিরে তাকাচ্ছে না।

নটবরের মা বললো, দুঃখ কি? ধীরে ধীরেই বলবে কথা।

নটবর তো এলো, এবার মনোহর ফিরে এলেই হয়। সে আবার জাহাজে কাজ নিয়ে গেছে। জাহাজীদেরও কাজ শেষ হয়ে গেছে কিনা—নটবরকে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত জানা যাবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করবে কে?

দিনের পর দিন কেটে যায়। নটবর একটুও বদলায় না। বদলের মধ্যে এইটুকু মাত্র হয়েছে—ময়নার সংগে কথা বলছে অল্পস্বল্প। পরনের প্যাণ্টকোট ময়লা হলেই কাপড়ের পাঁজা থেকে যার-তার একটা কাপড় টেনে নিয়ে পরে। আর ময়নাকে বলে, তার পোষাক কেচে দিতে।

বেশ সভ্যভব্য হয়ে ফিরেছে নটবর। মনোহরের কথা জিজ্ঞাসা করলে বলে, ছোঃ জাহাজে কাজ করে কোনো ভদ্দরলোক?

—জাহাজে কি কাজ করতে হয়?

—ঝাড়পোঁছ। জাহাজ ছিমছাম রাখা।

—আর তোমাদের কি কাজ ছিলো?

—ফাইট। লড়াই। বুক চিতিয়ে বললো নটবর।

হাঁ করে শুনছিলো সবাই। লড়াই? লড়াই করেছে নটবর। বুকের পাটা আছে নটবরের। পাটা বলে পাটা? একদিন সে নাকি ধূধূ মরুভূমির মধ্যে সাতজন জার্মানকে তাড়া করে তিন মাইল দূরে নিয়ে এমন বেকায়দায় ফেলেছিলো তাদের, যে, ধরা না দিয়ে তাদের আর উপায় ছিল না। তারপর বেদম কান্নাকাটি করায় নটবর তাদের নাকি ছেড়ে দিয়েছে।

নটবরের কথা শুনে সকলে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলো। নটবর চোখ বুজে তখন গান সুরু করে দিলো,—আই আই আই লাবিউ-উ উ—।

বিকৃত ও বীভৎস সুর গানের। ছেলেবেলা থেকেই নটবরের গানের দিকে টান আছে। কত বাউল কত ভাটিয়াল গান শুনেছে গাঁয়ের লোক এই নটবরের গলায়। সন্ধ্যা নামলে ধউমারীর বটতলায় বসে গলা ছেড়ে দিতো নটবর। তার সেই গলার স্বর ঝির্ঝির ঝংকারকে ছাপিয়ে কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়তো। সাঁঝের পিদিম নিয়ে তুলসীমঞ্চের দিকে যেতে যেতে কত কুলবধূর হাত থেকে ছলকে পড়ে যেতো পিদিমের তেল। সেই প্রাণউদাসী সুর নটবর ভুলে গেলো কেন?

গার্ল স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে নটবর এক চোখ ছোট করে এর ওর দিকে তাকায় আর গান গায়। পরনে অর্ধ-ছেঁড়া খাকির কোট-প্যাণ্ট। প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত গলানো। মেয়েরা ইস্কুলে ঢুকতে গিয়ে থমকে থেমে দেখে নটবরকে। নটবর মুচকে হেসে এক চোখ আদ্দেক বুজে গান করেঃ

আই লাবিউ সুইটি
আই লাবিউ বিউটি
হাগ মি কিস মি
কল মি ডারলিং—

তার গানের দু-একটা কলি বোঝা যায়। দু-একটা কথার মানেও বোঝা যায়। এ-কুৎসিত গান এখানে এসে গাইবার মানে কি? মেয়েরা গা টেপাটেপি করে।

ময়না কোট ইস্ত্রি করে দিচ্ছিলো নটবরের। কড়া ইস্ত্রি না করলে মানায় নাকি কথনো। লাউএর ডগার মত নকনকে ওই হাত দিয়ে কড়া ইস্ত্রি হয় কথনো। জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে কোট, প্যাণ্টের সেলাই গেছে খুলে। গা জ্বলে যায় নটবরের। শুধু ইস্ত্রি করে দিলেই কাজ শেষ হয়ে গেলো বুঝি?

যে-সব জায়গা ফেটেছে, সেখানে একটু আধটু সুঁচ চালালে হয় না? ময়নার ওপর রাগ হলেও তা প্রকাশ করে না নটবর। বলে, তোর কাজ নয়, তোর বরকে দিয়ে করিয়ে আন গিয়ে।

ময়না যখন আগুনের ওপর ইস্ত্রী বসিয়ে চলে যাচ্ছিলো, নটবর এক চোখ ছোট করে তার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুচকে হাসলো। গুণ গুণ করে সুর ধরলো, আই আই আই—

গার্ল স্কুলের মেয়েরা ক্লাশে বসে কান খাড়া করলো, পাঁচু ধোপার ছেলে এসেছে নিশ্চয়। তারা শুনতে পাচ্ছে সুর, আই আই আই—

নটবর পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সুর ধরেছে। এদিক ওদিক উঁকি দিয়ে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। উঁহু, নেই তো কেউ। সবাই তখন ঘরে ঘরে বসে ক্লাস করছে। নটবর সুর চড়িয়ে দিলো। কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে নটবর রওনা হলো সেখান থেকে। দূর থেকে তাদের কোমর ভাঙা কুঁড়েটা দেখে নটবর নাক সিঁটকালো। ধোপাগিরি করেই মরলি শালারা, নিজের ঘর মেরামত করতে পারলি নে আজো। ওই যে তার বাপ আর তার মা দুটো ভাঙা কামানের মত বসে আছে কাৎ হয়ে, নটবরের ইচ্ছে করছিলো একটা ভারি ট্যাঙ্ক চালিয়ে দি ওদের গুঁড়ো করে। নটবরকে বলে কিনা কাপড় আছড়াতে, বাবুদের বাড়ি থেকে কাপড় নিয়ে আসতে। নটবরের ইজ্জতের দাম দিতে পারে না যারা, তাদের গুঁড়ো করে দেওয়াই দরকার।

বউমারীর বটতলায় গিয়ে বসলো নটবর। নির্জন জায়গাটা পেয়ে নটবরের মন উদাস হয়ে গেলো। এখানে বসে ওদের কুঁড়েটা দেখা যায় না। গার্ল স্কুলের দোতলার কার্নিশের খানিকটা নজরে পড়ে ডালপালার ফাঁক দিয়ে। বেনগাজি, তুরুক, লিবিয়া, মাল্টা নানা জায়গার কথা মনে পড়ে নটবরের। শুধু কি সেই সব জায়গার কথাই মনে পড়ে, সেই সঙ্গে কত স্মৃতিও মনে পড়ে যায় নটবরের। কত দিন কত বিপদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। এই সব বীভৎস স্মৃতির সঙ্গে অনেক মিষ্টি স্মৃতিও জড়ানো আছে অবশ্য। মনোহরটা না ফিরে এসে ভালোই করেছে। বেশ আছে সে নিশ্চয়। আবার একটা যুদ্ধ যে বাধবে কবে! গুণধর তার বৌকে কী কষ্টটাই দিচ্ছে! অমন সুশ্রী একটা মেয়ে, তাকে না দিচ্ছে ভাল খেতে, না দিচ্ছে ভাল পরতে। এই বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে নিবারণ পারেখ তার বৌকে মেরে ফেলেছিলো, তার গুণধর দাদাটা বউকে অমন দগ্ধে না মেরে, এই ডালে ঝুলিয়ে বউটাকে খতম করে দিলেই পারে।

কোট প্যাণ্টটা আর পরা চলে না। অনেক সেলাই ও অনেক সুঁচের ঘায়ে তার পোষাক দুটো অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নটবর কাপড়ের পাঁজা হাটকে ভাল ভাল জামা কাপড় বাছাই করে করে পরতে লাগলো অগত্যা। গুণধর একটু আধটু আপত্তি করলে নটবর রুখে দাঁড়াল। পাঁচু কিছু বলতে ভরসা করে না। বাবুদের চোখে যদি পড়ে যায় তাহলে যে দু-চারঘর এখনো জামা-কাপড় কাচতে দিচ্ছে, তারাও যে দেওয়া বন্ধ করে দেবে। নটবরের কোন পরোয়া নেই। তাকে পরতে হবে কিছু একটা। কিন্তু কাপড়-জামা পরলে তাকে যেন মানায় না তেমন। কোটপ্যাণ্ট পরলে শরীরের রক্ত যেমন সজোরে চলাচল করে, জামাকাপড় পরলে কি তেমন করে। জামাকাপড় পরে গার্ল স্কুলের দিকে যেতে লজ্জা করে নটবরের। মেয়েরা ভাববে কি তাকে!

ছেঁড়া কোটপ্যাণ্ট চড়িয়েই নটবর তৈরি হয়ে বসে থাকে। গার্ল স্কুলের ছুটির ঘণ্টা বাজামাত্র সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই পকেটে হাত গলিয়ে দিয়ে গুণগুণ করে গান ধরে। চলে আসে সে ফটকের সামনে। এক চোখ আদ্দেক বুজে বলে—

ও মাই হেভেন, উনিভার্স,
দাই বাকসাম বুজম্—

কী, এত বড় স্পর্ধা? ক্ষেপে উঠলো উঁচু ক্লাসের মেয়েরা। সটান তারা চলে গেলো হেড মাস্টারের কাছে, ডেকে নিয়ে এলো সেক্রেটারীকে। অনেক দিন থেকে তারা লক্ষ্য করছে লোকটার বেয়াদপি। অনবরত কুৎসিত ইঙ্গিত করে, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করে লোকটা এখানে পায়চারি করে আর গান গায়। এ-গানের মানে কি? কী বলতে চায় লোকটা?

সরলবাবু বললেন, কি চাই এখানে?

—কিছু না। ঘাড় শক্ত করে দাঁড়িয়ে জবাব দিলো নটবর।

হেড মাস্টার মশাই রুখে এসে বললেন, নিকালো হিঁয়াসে।

—কেন? নটবর বললো, সরকারী রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। আপনি আমাকে গালাগাল দেবার কে?

সরলবাবু বললেন, তুই পাঁচু ধোপার ছেলে না?

মাথাটা হেঁট হয়ে গেলো নটবরের। এতগুলো মেয়ের সামনে তাকে এই অপমান? তার বাপ ধোপা হতে পারে, সে ধোপা নয়। সে সেপাই।

সরলবাবু বললেন, কাল থেকে যেন এখানে আর না দেখি তোমাকে। যাও, চলে যাও!

বিষ-দাঁতটা যেন ভেঙে দিয়েছেন সরলবাবু। আর ছোবল দেবার শক্তি তার নাই। পাঁচু ধোপার ছেলে নটবর! নটবর ধীরে ধীরে চলে গেলো। কিন্তু যাবার সময় সরলবাবুর দিকে বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো একবার।

সরলবাবু পঞ্চাননকে ডেকে নানা রকম উপদেশ দিলেন। পঞ্চানন কেঁদে ফেললো, বললো, সব আমার গেছে বাবু। আমার কোনো শক্তি নেই, যা করার আপনারা করুন। বাবুরা আর কাপড়ও দিচ্ছেনা কাচতে। এই বাজারে বাবুরা সহ্য করবে কেন, তাদের কাপড়-জামা পরে পরে নটবর বাবু সেজে বেড়াতো। কত মানা করেছি, শোনেনি।

কিছুক্ষণ থেমে পঞ্চানন বললো, এমন কেন হলো বাবু?

সরলবাবু জবাব দিলেন না।

কিছু ভেবে পেলোনা পঞ্চানন। কত নাপিতের ছেলে, কত জোলার ছেলে, কত তাঁতীর ছেলে এমনি নাকি যুদ্ধে গিয়েছিলো, মৃগাঙ্কবাবু বলেছিলেন একদিন। তারাও কি দেশে ফিরে নটবরের মত হয়ে গেছে?

সরলবাবু বললেন, হওয়ার তো কথা!

—এমনি হয়েছে সবার? আতঙ্কে শিউরে উঠলো পঞ্চানন, বললো, তবে তাদের কি হবে?

সরলবাবু বললেন, পরের কথা আর ভেবে লাভ কি? নিজের কথা ভাবো আগে।

পঞ্চানন উঠে চলে গেলো। তার চোখের সামনে তখন পৃথিবীর সহস্র পঞ্চানন ভেসে উঠছে। সহস্র নটবরের মিছিল বয়ে চলেছে তার চোখের সামনে দিয়ে। মনোহরের কথা তার মনে পড়ছে। না না, মনে পড়তে দেবে না পঞ্চানন। কিছুতে সে মনোহরকে স্থান দেবে না তার মনে। সে চায় না মনোহরকে। এক নটবরের কাছ থেকেই সে মনোহরকেও পেয়ে গেছে বলে মনে করে নেবে।

পঞ্চানন ফিরে এলো ঘরে। তার ঘর ভাঙছে। বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকিয়ে কতদিন আর খাড়া রাখা যায় একে? ঝরে ঝরে পড়ছে খড়ের ঘর, ঘরে শুয়ে দেখা যায়, আকাশের আনাচ-কানাচ। গুণধর মনের দুঃখে টইটই করে ঘুরে বেড়ায় শুধু। ডোবার ধারের পাটে শ্যাওলা জমে উঠেছে। বৃষ্টির জল পড়ে গামলাগুলো জলে থইথই করছে। ময়না ঘরের এক কোণে চোরের মত চুপচাপ বসে আছে। নটবরের পায়ের শব্দ পেলে চমকে ওঠে।

পাঁচুর বৌ বলে, সে আত্মহত্যা করবে। পাঁচু বলে, তার আগে আমাকে খতম করে দিয়ে যা। আর সহ্য হয় না আমার। বেঁচে আছি শুধু ময়নার মুখ চেয়ে। ও যদি না থাকতো, তাহলে কবে শেষ হয়ে যেতাম।

ময়না শ্বশুরের কথা শোনে আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকায়। না, নটবর নয়। গুণধর ফিরে আসছে। ময়না উঠলো।

বাইরে এসে বললো, পেলে কিছু?

বউ-এর কথা শুনে ক্ষেপে উঠলো গুণধর, বললো, কথার ছিরি নেই? পেলে কিছু মানে? আমি কি ভিক্ষুক? ভিক্ষে করতে

বেরিয়েছিলাম নাকি?

জবাব দিলো না ময়না। ক্রুদ্ধ আক্রোশে তাকালো গুণধরের দিকে। বউকে খেতে দেবার মুরোদ নেই যে মরদের সে আবার মরদ কিসের? চোখ রাঙালেই হলো? ময়নার রক্তও যেন বিষিয়ে উঠেছে।

নটবর বাড়ির হালচাল দেখে দূরে দূরে থাকে। বাড়ির কাছে বিশেষ আসতে চায় না আর। কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে সজনে-তলা থেকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করে ময়নাকে। নটবর আর থাকবে না এখানে। প্ল্যান সে বাৎলে নিয়েছে একটা। পাঁচু ধোপার ছেলে হয়ে থাকতে হবে এখানে—তাতে রাজি নয় নটবর। চলে যাবে সে। থাক্ ওরা এখানে।

সেই রাত্রেই নটবর সত্যি সত্যি কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে গুটি-শুটি পায়ে পালিয়ে যাচ্ছে নটবর। বগলে খান দুই শাড়ি নিয়ে নিয়েছে। নটবরের পাশে পাশে ছোট্ট একটুকরো ছায়ার মত আর একজন কে যেন চলেছে। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। নটবর হাতটা তার কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বললো, ভয় কি? মস্ত শহরে চলে যাবো এবার, মস্ত একটা চাকরি নেব। আমি কি গুণধরের মত অপদার্থ!

ব্যবসা বানিজ্য

ভারতের ষ্টার্লিং সমস্যা

শ্রীঅনিলকুমার বসু

কিছুদিন পূর্বে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের নিকট ভারতের যে স্টার্লিং পাওনা হইয়াছে সেই স্টার্লিং ঋণ পরিশোধ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের ডেপুটি গভর্নর প্রমুখ একটি ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল আগামী জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতে আগমন করিবেন। দেনাদারের পক্ষ হইতে দেনা পরিশোধের উপায় উদ্ভাবনের প্রস্তাব করা পাওনাদারের কাছে আশার বাণীই বহন করে এবং পাওনাদার পক্ষ এইরূপ আলাপ-আলোচনায় সর্বদাই উৎসুক থাকে। কিন্তু এইখানে প্রশ্ন হইল—দেনাদার ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পাওনাদার ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট ঋণ পরিশোধের কথাবার্তা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই উত্থাপন করিলেন, না বাহিরের চাপে পড়িয়া এইরূপ সদিচ্ছার ভাণ করিলেন? এই প্রশ্নটি একটু তলাইয়া বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে নিছক দেনা চুকাইবার সদিচ্ছাতেই অপর পক্ষ স্বেচ্ছায় আমাদের দ্বারে করাঘাত করিতেছে না—করিতেছে ইংগ-মার্কিন আর্থিক চুক্তির চাপে পড়িয়া। উক্ত চুক্তি অনুসারে ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে যে ৪·৮ বিলিয়ন ডলার ধার পাইল তাহারই অন্যতম প্রধান সর্ত এই ছিল যে, ইংলণ্ড তাহার স্টার্লিং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা অতি সত্বর সম্পূর্ণ করিবে এবং পরস্পর ব্যবস্থানুযায়ী যে সকল স্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করা হইবে তাহা উক্ত চুক্তি সম্পাদনের এক বৎসরের মধ্যে যে কোন দেশে নিত্যনৈমিত্তিক লেনদেনের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হইবে। কাজেই ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে স্টার্লিং দেনার একটা মীমাংসাব্যবস্থা না হইলে তাহাকে সর্তভংগের দায়ে পড়িতে হয় বলিয়াই আমাদের প্রতি অপরপক্ষের এতখানি আবেগ সঞ্চার। স্বেচ্ছায়ই হউক কিংবা চাপে পড়িয়াই হউক দেনাদারের দেনা পরিশোধের ইচ্ছা যখন একবার প্রকাশিত হইয়াছে, পাওনাদার তখন একটু আশান্বিত হইবেই। অন্নপূর্ণার দ্বারে শিব যখন সমুপস্থিত, ফিরিয়া যাওয়ার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কাজেই পাওনাদার ভারত দেনাদার ইংলণ্ডকে আলাপ-আলোচনায় স্বভাবতই সাগ্রহে আহ্বান করিবে।

এখন দেখা যাক এই প্রাপ্য স্টার্লিং জিনিসটি কি এবং কি ভাবেই বা ইহার সৃষ্টি হইল। সমুদ্র মন্থনকালে একসংগে যেমন অমৃত ও বিষের সৃষ্টি হইয়াছিল সেইরূপ যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থার ভিতরেই, স্টার্লিং ব্যালেন্সের উৎপত্তি মানুষের সুখ-দুঃখের নির্যাস। দ্বিতীয় মহাসমরে জয়লাভের জন্য ভারত, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, মিশর প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি গ্রেট ব্রিটেনকে বিরাট সমর-সম্ভার যোগান দেয়। একা ব্রিটেনের পক্ষে এরূপ বিরাট সমর কার্য চালান একপ্রকার দুঃসাধ্য ছিল। খাদ্য, বস্ত্র, সমরোপকরণ প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি জয়যাত্রার কণ্টককীর্ণ পথ সুগম করিয়া দেয়। এই সরবরাহের জন্য উক্ত দেশগুলির ইংলণ্ডের নিকট মূল্য বাবদ অনেক অর্থ পাওনা হয়। এই পাওনা অর্থই Sterling balances নামে পরিচিত। যেহেতু ব্রিটিশ মুদ্রার নাম স্টার্লিং।

এইরূপে ইংলণ্ডের নিকটে প্রাপ্য ভারতের স্টার্লিং ব্যালেন্সের পরিমাণ গত যুদ্ধের শেষে ১,৭২৪ কোটি পর্যন্ত উঠে। কিন্তু গত মার্চ মাসে উহা কমিয়া মোট ১,৬২০ কোটি টাকা দাঁড়ায়। এই পর্যন্ত উক্ত স্টার্লিং ব্যালেন্স কৃপণের ধনের মত ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের হাল-খাতায় আমাদের নামে বিনা সুদে জমা পড়িয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের কোন উন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত হয় নাই। বিনা সুদে এত টাকা পড়িয়া থাকা ভারত সরকারের জমা-খরচে লোকসানের অংকই বাড়ায় বলিয়া, উক্ত স্টার্লিং ব্যালেন্সের কিয়দংশ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ঋণপত্রে (sterling securities) বিন্যস্ত হয়। উদ্দেশ্য—ঋণপত্রে কিছুটা সুদ বাবদ আয় করা। কিন্তু C N. Vakil প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ উক্ত Sterling Securities-এর অন্তরালে ব্রিটিশ সরকারের একটি গোপন অভিসন্ধি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রমাণ করেন যে উক্ত Sterling Securities-এর পরিমাণ রিজার্ভ ব্যাংকের জমা খাতায় প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে মজুত করিয়া ব্রিটিশ সরকার অধীনস্থ ভারত সরকার মারফৎ রিজার্ভ ব্যাংক দ্বারা উক্ত Securities-এর জামিনে যুদ্ধ ব্যয়ভার মিটাইবার জন্য অধিক সংখ্যক নোট ছাপাইয়া মুদ্রাস্ফীতিজনিত গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারত সরকারের জমান তহবিলের সাহায্যেই ভারত সরকারের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিলেন। ফলে মুদ্রাস্ফীতিজনিত সমস্ত কুফলই ভারতকে পূর্ণমাত্রায়ই ভোগ করিতে হইল। ব্রিটিশ সরকার দূর হইতে গোঁফে তা দিবার পূর্ণ সুযোগ পাইলেন। প্রকারান্তরে মুদ্রাস্ফীতিজনিত উচ্চমূল্যের কথা পাড়িয়া ভারতের পাওনা স্টার্লিং ব্যালেন্স কম করিয়া পরিশোধ করিবার একটি অজুহাত ইংলণ্ডেশ্বরের গভর্নমেণ্ট খুঁজিয়া পাইলেন। তাঁহাদের কোন কোন ধুরন্ধর অর্থনীতিবিদগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, ভারতের নিকট হইতে যে সকল দ্রব্যসম্ভার, কাঁচামাল, সমরোপকরণ, ইংলণ্ডে যুদ্ধকালে প্রেরিত হইয়াছিল তাহার জন্য এত চড়া মূল্য ধার্য করা হয় যে, সেই হইতেই এত কোটি স্টার্লিং ব্যালেন্স জমা [illegible]ভব হইয়া থাকে। আসল কথা এই যে, তাঁহাদের মতে ভারত ইংলণ্ডের কাছ হইতে ন্যায্য মূল্যের চাইতে অনেক বেশী

দাবী করিয়াছে। কাজেই ন্যায্য মূল্যের মানদণ্ডে ভারতের স্টার্লিং ব্যালেন্স অনেক কম হওয়াই সমীচীন। ভারতের দিক হইতে এই প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা বহুবার দর্শান হইয়াছে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারত হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যসম্ভার, কাঁচামাল ও সমরোপকরণের জন্য গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যই (controlled price) ধার্য হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত কোন মূল্যই চাওয়া হয় নাই। এতদ্দ্বারা চোরাকারবারী (blackmarketing) ও অতিরিক্ত লাভের (profiteering) যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ভারত সম্বন্ধে করা হইয়াছিল তাহাই খণ্ডন করা হইল। বরঞ্চ এই যুক্তির মোড় ঘুরাইয়া ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতি শেঠ জি ডি বিড়লা আরও বেশী করিয়া স্টার্লিং ঋণ আদায় করার একটি সূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তিনি বলেন, স্টার্লিং ব্যালেন্স সম্বন্ধীয় কোন বিলি ব্যবস্থা করিতে হইলে যে যে সময়ে ঐ ব্যালেন্স জমিয়াছে সেই সেই সময়কার জীবনযাত্রার ব্যয় অনুমাপে (scale of cost of living) যে সূচক সংখ্যা (Index number) তৈরী করা যায় সেই সংখ্যার অনুপাতে স্টার্লিং ব্যালেন্স পরিশোধের পরিমাণ নিরূপণ করা উচিত। এই সূত্র অনুসারে ভারতের অনেকগুণ স্টার্লিং প্রাপ্য হয়। বাস্তবতার কষ্টিপাথরে শেঠ বিড়লার এই সূত্র গ্রহণযোগ্য না হইলেও ইহার দ্বারা প্রতিপক্ষের পাল্টা জবাবকে নীরব করা যায়। আসল কথা এই—ত্যাগের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া যদি এই বলা হয় যে ভারতের পাওনা বেশী হইয়াছে এবং কাজেই ইংলণ্ডের কমাইবার প্রস্তাব অধিকতর ত্যাগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে শেঠ বিড়লার সূত্রই আমাদের উত্থাপন করিতে হইবে। স্টার্লিং ব্যালেন্স জমিবার পেছনে ভারতের অসহায় অগণিত নরনারীর কত যে দুঃখ, ত্যাগ ও অশ্রু সঞ্চিত হইয়াছে সেই করুণ কাহিনী অবর্ণনীয়। বাঙলায় যখন দুর্ভিক্ষে অর্দ্ধকোটি হতভাগ্য প্রাণ দিল, সেই সময় (১৯৪৩) ৪৩·৯০ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য বাহিরে রপ্তানি হইয়া গেল, ৪৯·৪৬ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচামাল বিদেশে প্রেরিত হইল। ১৯৪৩ সালে ভারতে যখন নিদারুণ বস্ত্রাভাব (লজ্জা নিবারণের জন্য নারীদের আত্মহত্যার উদাহরণও আছে) সেই সময় ভারতবাসীকে বঞ্চিত করিয়া ৪২·১১ কোটি টাকা মূল্যের কার্পাসজাত দ্রব্য ও সূতা বাহিরে প্রেরিত হইল। তিলে তিলে আত্মত্যাগের এই যে অশ্রুঘন কাহিনী লোকচক্ষুর অন্তরালে রচিত হইল, তাহাই অ[illegible]কালের দরবারে প্রকটিত হইয়াছে। বঞ্চিত ভারতবাসীর মূক-বেদনার অশ্রুসিক্ত ইতিহা[illegible] প্রতিটি স্টার্লিং বহন করিতেছে। কাজেই ভারতবাসীর প্রতিটি পাওনা স্টার্লিং কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিবার ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের কোন কোন মহল হইতে এই পাওনা স্টার্লিং কমাইয়া ধরিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চুক্তির কোন সর্তে অনুরূপ কমাইবার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও রহিয়াছে। ভারতের পক্ষ হইতে এইরূপ কমাইয়া ধরার প্রাথমিক সর্তের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মত জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্বে একাধিকবার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় মার্কিণ ডলার মিত্রশক্তিদের মধ্যে সুলভ করিবার জন্য যে EmpireDollar pool-এর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার আশু অবসান যুদ্ধান্তেই হওয়া উচিত ছিল। কারণ, যে উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যবস্থায় জন্ম তাহা সম্পূর্ণভাবেই সুসিদ্ধ হইয়াছে। কাজেই ঐ ব্যবস্থার অবসান না ঘটাইলে স্টার্লিং পাওনা শুধু জমিবেই এবং এরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে স্টার্লিং পরিশোধের উপায় উদ্ভাবন আরও জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল হইয়া পড়িবে। কাজেই পরোক্ষে সমস্যাটা এরূপ দাঁড়াইল—স্টার্লিং ব্যালেন্স পরিশোধ করা যেমন চিন্তনীয় সেইরূপ যাহাতে আর অধিক স্টার্লিং জমিতে না পারে তাহার জন্য বাহির হইতে পণ্যসম্ভার আমদানীর পরিমাণও বাড়ান অবশ্য কর্তব্য। এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে বর্তমান আমদানী নিয়ন্ত্রণ (Import Control) নীতির পরিবর্তন করা দরকার। এখন পর্যন্ত আমেরিকার সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে ভারতের অবস্থা অনুকূলে আছে, কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যে মার্কিন দেশ হইতে উদ্বৃত্ত আমদানীর (Import Surplus) পরিমাণ ২৪১ মিলিয়ন ডলার এবং ভারতের মার্কিন দেশ হইতে উদ্বৃত্ত রপ্তানীর জন্য পাওনা হয় ৪৪ মিলিয়ন ডলার, যেহেতু Empire Dollar Pool"এর সাহায্যে এই বিনিময় কারবার চলে, কাজেই ভারতে যে পাওনা চুকাইয়া দেওয়া হয় তাহা আবার ইংলণ্ডের স্টার্লিং ব্যালেন্সের পরিমাণই বৃদ্ধি করে। সুতরাং ভারতের দিক হইতে এই "Pool" উঠাইয়া দিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে স্টার্লিং ব্যালেন্স জমিবার পথটাও রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং ভারতের পক্ষে এই ব্যবস্থাই কল্যাণকর।

স্টার্লিং ব্যালেন্স জিনিষটি কি, এবং কি ভাবে তাহা সঞ্চিত হইল এ পর্যন্ত আমরা তাহার মোটামুটি আলোচনা করিলাম। এখন কিভাবে এই স্টার্লিং ব্যালেন্স ইংলণ্ডের নিকট হইতে আদায় করা যাইতে পারে এবং তাহা ভারতের কল্যাণকল্পে কিভাবে ব্যয়িত হইতে পারে তাহার আলোচনা করিব।

স্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করিবার ব্যাপারটি বড়ই জটিল। ইতিমধ্যে বহু জল্পনা কল্পনা ও পরিকল্পনা এই সম্বন্ধে হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রেট ব্রিটেন হয়ত বা এই স্টার্লিং ব্যালেন্স ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করিতে পারে। আমাদের মতে এরূপ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ গ্রেট ব্রিটেনের মত একটি প্রথম শ্রেণীর জাতির পক্ষে ন্যায্য ঋণ সরাসরি অস্বীকার করা অবিশ্বাস্য। ইহা ছাড়া এই পাওনা স্টার্লিং পরিশোধ করা ব্রিটেনের পক্ষে মোটেই সাধ্যাতীত নয়, যেহেতু এই ঋণের পরিমাণ তাহার জাতীয় আয়ের আনুমানিক শতকরা ১০/০ ভাগের মত। তেমনি এই স্টার্লিং সম্পত্তিকে সর্বদেশে অব্যাহতভাবে বিনিময়যোগ্য করাও গ্রেট বৃটেনের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। কারণ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে দেয় স্টার্লিং-এর পরিমাণ প্রায় £৪০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড। বিশেষত এই নীতি অনুসরণ করিলে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্যকরী করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে। ইহা ছাড়া এই নীতি অনুসৃত হইলে পাওনাদার দেশগুলিরও ক্ষতি হইবে এই জন্য, যেহেতু স্টার্লিং ব্যালেন্সকে ডলার প্রভৃতি মুদ্রায় ভাঙ্গাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে এমন একটা হিড়িক পড়িয়া যাইবে যে ইহাতে স্টার্লিং-এর বহির্মূল্য পড়িয়া গিয়া পাওনাদার দেশগুলিকে বেশী মূল্যে কম জিনিস গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই পাওনাদার দেশগুলিকে নিজেদের স্বার্থের খাতিরেও এমন নীতি বর্জন করিতে হইবে যাহা দ্বারা স্টার্লিং-এর মূল্য ও স্থায়িত্ব কোন প্রকারে ব্যাহত হয়। কাজেই আমাদের "Complete repudiation" ও "free multilatual convertibility" এই দুই নীতির মাঝামাঝি কোন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকাকেও অনুরূপ সমস্যায় পড়িতে হইয়াছিল। সেই দেশের পাওনা স্টার্লিং-এর সহায়তায় ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কিনিয়া ফেলার চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। এমনও করা হইয়াছিল, যাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী ঋণপত্রগুলি যে সব বিদেশী ইংরাজদের হাতে ছিল তাহাদের কাছ হইতে স্বদেশবাসিগণ কিনিয়া ফেলিতে পারে। কানাডাতেও অনুরূপ নীতি অনুসৃত হয়। ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কিনিয়া পাওনা স্টার্লিং-এর কিছুটা পরিশোধের একটা উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে।

যুদ্ধোত্তর ভারত শিল্পোন্নতির সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। শিল্পোন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর

বেরিয়েছিলাম নাকি?

জবাব দিলো না ময়না। ক্রুদ্ধ আক্রোশে তাকালো গুণধরের দিকে। বউকে খেতে দেবার মুরোদ নেই যে মরদের সে আবার মরদ কিসের? চোখ রাঙালেই হলো? ময়নার রক্তও যেন ফিরিয়ে উঠেছে।

নটবর বাড়ির হালচাল দেখে দূরে দূরে থাকে। বাড়ির কাছে বিশেষ আসতে চায় না আর। কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে সজনে-তলা থেকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করে ময়নাকে। নটবর আর থাকবে না এখানে। প্ল্যান সে বাৎলে নিয়েছে একটা। পাঁচু ধোপার ছেলে হয়ে থাকতে হবে এখানে—তাতে রাজি নয় নটবর। চলে যাবে সে। থাক্ ওরা এখানে।

সেই রাত্রেই নটবর সত্যি সত্যি কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে গুটি-শুটি পায়ে পালিয়ে যাচ্ছে নটবর। বগলে থান দুই শাড়ি নিয়ে নিয়েছে। নটবরের পাশে পাশে ছোট্ট একটুকরো ছায়ার মত আর একজন কে যেন চলেছে। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। নটবর হাতটা তার কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বললো, ভয় কি? মস্ত শহরে চলে যাবো এবার, মস্ত একটা চাকরি নেব। আমি কি গুণধরের মত অপদার্থ!

ব্যবসা বাণিজ্য

ভারতের ষ্টার্লিং সমস্যা

শ্রীঅনিলকুমার বসু

কিছুদিন পূর্বে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের নিকট ভারতের যে স্টার্লিং পাওনা হইয়াছে সেই স্টার্লিং ঋণ পরিশোধ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের ডেপুটি গভর্নর প্রমুখ একটি ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল আগামী জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতে আগমন করিবেন। দেনাদারের পক্ষ হইতে দেনা পরিশোধের উপায় উদ্ভাবনের প্রস্তাব করা পাওনাদারের কাছে আশার বাণীই বহন করে এবং পাওনাদার পক্ষ এইরূপ আলাপ-আলোচনায় সর্বদাই উৎসুক থাকে। কিন্তু এইখানে প্রশ্ন হইল—দেনাদার ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পাওনাদার ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট ঋণ পরিশোধের কথাবার্তা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই উত্থাপন করিলেন, না বাহিরের চাপে পড়িয়া এইরূপ সদিচ্ছার ভাণ করিলেন? এই প্রশ্নটি একটু তলাইয়া বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে নিছক দেনা চুকাইবার সদিচ্ছাতেই অপর পক্ষ স্বেচ্ছায় আমাদের দ্বারে করাঘাত করিতেছে না—করিতেছে ইংগ-মার্কিন আর্থিক চুক্তির চাপে পড়িয়া। উক্ত চুক্তি অনুসারে ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে যে ৪·৮ বিলিয়ন ডলার ধার পাইল তাহারই অন্যতম প্রধান সর্ত এই ছিল যে, ইংলণ্ড তাহার স্টার্লিং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা অতি সত্বর সম্পূর্ণ করিবে এবং পরস্পর ব্যবস্থানুযায়ী যে সকল স্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করা হইবে তাহা উক্ত চুক্তি সম্পাদনের এক বৎসরের মধ্যে যে কোন দেশে নিত্যনৈমিত্তিক লেনদেনের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হইবে। কাজেই ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে স্টার্লিং দেনার একটা হালব্যবস্থা না হইলে তাহাকে সর্তভংগের দায়ে পড়িতে হয় বলিয়াই আমাদের প্রতি পরপক্ষের এতখানি আবেগ সঞ্চার। স্বেচ্ছায়ই হউক কিংবা চাপে পড়িয়াই হউক দেনাদারের দেনা পরিশোধের ইচ্ছা যখন একবার প্রকাশিত হইয়াছে, পাওনাদার তখন একটু আশান্বিত হইবেই। অন্নপূর্ণার দ্বারে শিব যখন সমুপস্থিত, ফিরিয়া যাওয়ার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কাজেই পাওনাদার ভারত দেনাদার ইংলণ্ডকে আলাপ-আলোচনায় স্বভাবতই সাগ্রহে আহ্বান করিবে।

এখন দেখা যাক্ এই প্রাপ্য স্টার্লিং জিনিসটি কি এবং কি ভাবেই বা ইহার সৃষ্টি হইল। সমুদ্র মন্থনকালে একসংগে যেমন অমৃত ও বিষের সৃষ্টি হইয়াছিল সেইরূপ যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থার ভিতরেই স্টার্লিং ব্যালেন্সের উৎপত্তি, মানুষের সুখ-দুঃখের নির্যাস। দ্বিতীয় মহাসমরে জয়লাভের জন্য ভারত, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, মিশর প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি গ্রেট ব্রিটেনকে বিরাট সমর-সম্ভার যোগান দেয়। একা ব্রিটেনের পক্ষে এরূপ বিরাট সমর কার্য চালান একপ্রকার দুঃসাধ্য ছিল। খাদ্য, বস্ত্র, সমরোপকরণ প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি জয়যাত্রার কণ্টকাকীর্ণ পথ সুগম করিয়া দেয়। এই সরবরাহের জন্য উক্ত দেশগুলির ইংলণ্ডের নিকট মূল্য বাবদ অনেক অর্থ পাওনা হয়। এই পাওনা অর্থই Sterling balances নামে পরিচিত। যেহেতু ব্রিটিশ মুদ্রার নাম স্টার্লিং।

এইরূপে ইংলণ্ডের নিকটে প্রাপ্য ভারতের স্টার্লিং ব্যালেন্সের পরিমাণ গত যুদ্ধের শেষে ১,৭২৪ কোটি পর্যন্ত উঠে। কিন্তু গত মে মাসে উহা কমিয়া মোট ১,৬২০ কোটি টাকা দাঁড়ায়। এই পর্যন্ত উক্ত স্টার্লিং ব্যালেন্স কৃপণের ধনের মত ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের হাল-খাতায় আমাদের নামে বিনা সুদে জমা পড়িয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের কোন উন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত হয় নাই। বিনা সুদে এত টাকা পড়িয়া থাকা ভারত সরকারের জমা-খরচে লোকসানের অঙ্কই বাড়ায় বলিয়া, উক্ত স্টার্লিং ব্যালেন্সের কিয়দংশ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ঋণপত্রে (sterling securities) বিন্যস্ত হয়। উদ্দেশ্য—ঋণপত্রে কিছুটা সুদ বাবদ আয় করা। কিন্তু C N. Vakil প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ উক্ত Sterling Securities-এর অন্তরালে ব্রিটিশ সরকারের একটি গোপন অভিসন্ধি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রমাণ করেন যে উক্ত Sterling Securities-এর পরিমাণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জমা খাতায় প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে মজুত করিয়া ব্রিটিশ সরকার অধীনস্থ ভারত সরকার মারফৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা উক্ত Securities-এর জামিনে যুদ্ধ ব্যয়ভার মিটাইবার জন্য অধিক সংখ্যক নোট ছাপাইয়া মুদ্রাস্ফীতিজনিত গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারত সরকারের জমান তহবিলের সাহায্যেই ভারত সরকারের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিলেন। ফলে মুদ্রাস্ফীতিজনিত সমস্ত কুফলই ভারতকে পূর্ণমাত্রায়ই ভোগ করিতে হইল। ব্রিটিশ সরকার দূরে হইতে গোঁফে তা দিবার পূর্ণ সুযোগ পাইলেন। প্রকারান্তরে মুদ্রাস্ফীতিজনিত উচ্চমূল্যের কথা পাড়িয়া ভারতের পাওনা স্টার্লিং ব্যালেন্স কম করিয়া পরিশোধ করিবার একটি অজুহাত ইংলণ্ডেশ্বরের গভর্নমেণ্ট খুঁজিয়া পাইলেন। তাঁহাদের কোন কোন ধুরন্ধর অর্থনীতিবিদগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, ভারতের নিকট হইতে যে সকল দ্রব্যসম্ভার, কাঁচামাল, সমরোপকরণ, ইংলণ্ডে যুদ্ধকালে প্রেরিত হইয়াছিল তাহার জন্য এত চড়া মূল্য ধার্য করা হয় যে, সেই হইতেই এত কোটি স্টার্লিং ব্যালেন্স জমা [illegible]ভব হইয়া থাকে। আসল কথা এই যে, তাঁহাদের মতে ভারত ইংলণ্ডের কাছ হইতে ন্যায্য মূল্যের চাইতে অনেক বেশী

দাবী করিয়াছে। কাজেই ন্যায্য মূল্যের মানদণ্ডে ভারতের স্টার্লিং ব্যালেন্স অনেক কম হওয়াই সমীচীন। ভারতের দিক হইতে এই প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা বহুবার দর্শান হইয়াছে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারত হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যসম্ভার, কাঁচামাল ও সমরোপকরণের জন্য গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যই (controlled price) ধার্য হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত কোন মূল্যই চাওয়া হয় নাই। এতদ্দ্বারা চোরাকারবারী (blackmarketing) ও অতিরিক্ত লাভের (profiteering) যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ভারত সম্বন্ধে করা হইয়াছিল তাহাই খণ্ডন করা হইল। বরঞ্চ এই যুক্তির মোড় ঘুরাইয়া ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতি শেঠ জি ডি বিড়লা আরও বেশী করিয়া স্টার্লিং ঋণ আদায় করার একটি সূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তিনি বলেন, স্টার্লিং ব্যালেন্স সম্বন্ধীয় কোন বিলি ব্যবস্থা করিতে হইলে যে যে সময়ে ঐ ব্যালেন্স জমিয়াছে সেই সেই সময়কার জীবনযাত্রার ব্যয় অনুমাপে (scale of cost of living) যে সূচক সংখ্যা (Index number) তৈরী করা যায় সেই সংখ্যার অনুপাতে স্টার্লিং ব্যালেন্স পরিশোধের পরিমাণ নিরূপণ করা উচিত। এই সূত্র অনুসারে ভারতের অনেকগুণ স্টার্লিং প্রাপ্য হয়। বাস্তবতার কষ্টিপাথরে শেঠ বিড়লার এই সূত্র গ্রহণযোগ্য না হইলেও ইহার দ্বারা প্রতিপক্ষের পাল্টা জবাবকে নীরব করা যায়। আসল কথা এই—ত্যাগের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া যদি এই বলা হয় যে ভারতের পাওনা বেশী হইয়াছে এবং কাজেই ইংলণ্ডের কমাইবার প্রস্তাব অধিকতর ত্যাগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে শেঠ বিড়লার সূত্রই আমাদের উত্থাপন করিতে হইবে। স্টার্লিং ব্যালেন্স জমিবার পেছনে ভারতের অসহায় অগণিত নরনারীর কত যে দুঃখ ত্যাগ ও অশ্রু সঞ্চিত হইয়াছে সেই করুণ কাহিনী অবর্ণনীয়। বাঙলায় যখন দুর্ভিক্ষে অর্দ্ধ-কোটি হতভাগ্য প্রাণ দিল, সেই সময় (১৯৪৩) ৪৩·৯০ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য বাহিরে রপ্তানি হইয়া গেল, ৪৯·৪৬ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচামাল বিদেশে প্রেরিত হইল। ১৯৪৩ সালে ভারতে যখন নিদারুণ বস্ত্রাভাব (লজ্জা নিবারণের জন্য নারীদের আত্মহত্যার উদাহরণও আছে) সেই সময় ভারতবাসীকে বঞ্চিত করিয়া ৪২·১১ কোটি টাকা মূল্যের কার্পাসজাত দ্রব্য ও সুতা বাহিরে প্রেরিত হইল। তিলে তিলে আত্মত্যাগের এই যে অশ্রুঘন কাহিনী লোকচক্ষুর অন্তরালে রচিত হইল, তাহাই অ[illegible]কালের দরবারে প্রকটিত হইয়াছে। বঞ্চিত [illegible]ভারতবাসীর মূক-বেদনার অশ্রুসিক্ত ইতিহা[illegible] প্রতিটি স্টার্লিং বহন করিতেছে। কাজেই ভারতবাসীর প্রতিটি পাওনা স্টার্লিং কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিবার ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের কোন কোন মহল হইতে এই পাওনা স্টার্লিং কমাইয়া ধরিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চুক্তির কোন সর্তে অনুরূপ কমাইবার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও রহিয়াছে। ভারতের পক্ষ হইতে এইরূপ কমাইয়া ধরার প্রাথমিক সর্তের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মত জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্বে একাধিকবার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় মার্কিণ ডলার মিত্রশক্তিদের মধ্যে সুলভ করিবার জন্য যে EmpireDollar pool-এর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার আশু অবসান যুদ্ধান্তেই হওয়া উচিত ছিল। কারণ, যে উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যবস্থায় জন্ম তাহা সম্পূর্ণভাবেই সুসিদ্ধ হইয়াছে। কাজেই ঐ ব্যবস্থার অবসান না ঘটাইলে স্টার্লিং পাওনা শুধু জমিবেই এবং এরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে স্টার্লিং পরিশোধের উপায় উদ্ভাবন আরও জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল হইয়া পড়িবে। কাজেই পরোক্ষে সমস্যাটা এরূপ দাঁড়াইল—স্টার্লিং ব্যালেন্স পরিশোধ করা যেমন চিন্তনীয় সেইরূপ যাহাতে আর অধিক স্টার্লিং জমিতে না পারে তাহার জন্য বাহির হইতে পণ্যসম্ভার আমদানীর পরিমাণও বাড়ান অবশ্য কর্তব্য। এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে বর্তমান আমদানী নিয়ন্ত্রণ (Import Control) নীতির পরিবর্তন করা দরকার। এখন পর্যন্ত আমেরিকার সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে ভারতের অবস্থা অনুকূলে আছে, কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যে মার্কিন দেশ হইতে উদ্বৃত্ত আমদানীর (Import Surplus) পরিমাণ ২৪১ মিলিয়ন ডলার এবং ভারতের মার্কিন দেশ হইতে উদ্বৃত্ত রপ্তানীর জন্য পাওনা হয় ৪৪ মিলিয়ন ডলার, যেহেতু Empire Dollar Pool"এর সাহায্যে এই বিনিময় কারবার চলে, কাজেই ভারতে যে পাওনা চুকাইয়া দেওয়া হয় তাহা আবার ইংলণ্ডের স্টার্লিং ব্যালেন্সের পরিমাণই বৃদ্ধি করে। সুতরাং ভারতের দিক হইতে এই "Pool" উঠাইয়া দিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে স্টার্লিং ব্যালেন্স জমিবার পথটাও রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং ভারতের পক্ষে এই ব্যবস্থাই কল্যাণকর।

স্টার্লিং ব্যালেন্স জিনিষটি কি, এবং কি ভাবে তাহা সঞ্চিত হইল এ পর্যন্ত আমরা তাহার মোটামুটি আলোচনা করিলাম। এখন কিভাবে এই স্টার্লিং ব্যালেন্স ইংলণ্ডের নিকট হইতে আদায় করা যাইতে পারে এবং তাহা ভারতের কল্যাণকল্পে কিভাবে ব্যয়িত হইতে পারে তাহার আলোচনা করিব।

স্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করিবার ব্যাপারটি বড়ই জটিল। ইতিমধ্যে বহু জল্পনা কল্পনা ও পরিকল্পনা এই সম্বন্ধে হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রেট ব্রিটেন হয়ত বা এই স্টার্লিং ব্যালেন্স ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করিতে পারে। আমাদের মতে এরূপ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ গ্রেট ব্রিটেনের মত একটি প্রথম শ্রেণীর জাতির পক্ষে ন্যায্য ঋণ সরাসরি অস্বীকার করা অবিশ্বাস্য। ইহা ছাড়া এই পাওনা স্টার্লিং পরিশোধ করা ব্রিটেনের পক্ষে মোটেই সাধ্যাতীত নয়, যেহেতু এই ঋণের পরিমাণ তাহার জাতীয় আয়ের আনুমানিক শতকরা ১০/০ ভাগের মত। তেমনি এই স্টার্লিং সম্পত্তিকে সর্বদেশে অব্যাহতভাবে বিনিময়যোগ্য করাও গ্রেট বৃটেনের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। কারণ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে দেয় স্টার্লিং-এর পরিমাণ প্রায় £৪০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড। বিশেষত এই নীতি অনুসরণ করিলে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্যকরী করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে। ইহা ছাড়া এই নীতি অনুসৃত হইলে পাওনাদার দেশগুলিরও ক্ষতি হইবে এই জন্য, যেহেতু স্টার্লিং ব্যালেন্সকে ডলার প্রভৃতি মুদ্রায় ভাঙ্গাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে এমন একটা হিড়িক পড়িয়া যাইবে যে ইহাতে স্টার্লিং-এর বহির্মূল্য পড়িয়া গিয়া পাওনাদার দেশগুলিকে বেশী মূল্যে কম জিনিস গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই পাওনাদার দেশগুলিকে নিজেদের স্বার্থের খাতিরেও এমন নীতি বর্জন করিতে হইবে যাহা দ্বারা স্টার্লিং-এর মূল্য ও স্থায়িত্ব কোন প্রকারে ব্যাহত হয়। কাজেই আমাদের "Complete repudiation" ও "free multilatual convertibility" এই দুই নীতির মাঝামাঝি কোন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকাকেও অনুরূপ সমস্যার পড়িতে হইয়াছিল। সেই দেশের পাওনা স্টার্লিং-এর সহায়তায় ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কিনিয়া ফেলার চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। এমনও করা হইয়াছিল, যাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী ঋণপত্রগুলি যে সব বিদেশী ইংরাজদের হাতে ছিল তাহাদের কাছ হইতে স্বদেশবাসিগণ কিনিয়া ফেলিতে পারে। কানাডাতেও অনুরূপ নীতি অনুসৃত হয়। ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কিনিয়া পাওনা স্টার্লিং-এর কিছুটা পরিশোধের একটা উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে।

যুদ্ধোত্তর ভারত শিল্পোন্নতির সম্ভাবনাপরিপূর্ণ। শিল্পোন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর

হইতে হইলে বিদেশ হইতে "Capital goods"-এর আমদানির অধিক প্রয়োজন। শিল্প দ্রব্যের আমদানি হইলে উহাদের মূল্য বাবদ আমাদের পাওনা ষ্টার্লিং-এর সদ্ব্যবহার হইতে পারে। ইংলণ্ডের কোন কোন মহলের এই অভিমত যে, ভারত যদি শুধু সেই দেশ হইতেই তাহার প্রয়োজনীয় শিল্প সামগ্রী ক্রয় করে, তাহা হইলে ষ্টার্লিং ব্যালেন্স পরিশোধের পথ একেবারে সহজ ও সরল হইয়া পড়ে। কিন্তু বাস্তবতার দিক হইতে এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়, এই হিসাবে যে, ভারতকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কোন ব্রিটিশ মাল কিনিতে বাধ্য করা যায় না। ভারত অন্য দেশের সহিত যাচাই করিয়া মাল কিনিবে। অন্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড যদি সুলভ মূল্যে সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পসামগ্রী দিতে পারে, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে কোনই আপত্তি থাকিতে পারেনা। কিন্তু যুদ্ধাবসানের পর ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সেখানে উৎপাদনশক্তি মাত্র শতকরা ১২½% বাড়িয়াছে। পক্ষান্তরে আমেরিকায় উহা ইতিমধ্যেই ২৯% বাড়িয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ ইংলণ্ডের দ্বিগুণেরও বেশী এবং দেখা যায় যে, আমেরিকাজাত শিল্পসামগ্রী ইংলণ্ডের চাইতে অনেক কম খরচে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুবিধার দিক হইতে ভারতকে আমেরিকার মাল ক্রয় না করিতে দেওয়া একেবারে অসমীচীন। তাহা ছাড়া শুধু ইংলণ্ডের কাছ হইতেই মাল ক্রয় করিবার কোন স্থায়ী চুক্তি সম্পাদন করার ফল হইবে ষ্টার্লিং ব্যালেন্সের উপযোগিতা উক্ত দেশের বিকিকিনিতেই সীমাবদ্ধ করা। উক্ত অর্থ যদি আমাদের সুবিধামত বাহিরের শিল্পসামগ্রী ক্রয় করায় ব্যয়িত না হইতে পারে, তবে ঐ অর্থের পুরাপুরি সার্থকতা কোথায়। কাজেই চাই Sterling Balance-এর Multilatual Convertibility "অর্থাৎ একাধিক দেশে বিনিময় যোগ্যতা।

আর একটি উপায়, ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং নিজের আর্থিক উন্নয়নকল্পে নিজের ইচ্ছামত নিয়োগ করা। কিন্তু ভারতের পরাধীনতা এই নীতি অবলম্বনের পথে প্রধান অন্তরায়। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং কি ভাবে বিনিময় হার পরিবর্তন করিয়া কর্পূরের মত নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা ভারতবাসী মাত্রই মনে রাখিয়াছে। অনেকে মনে করেন, যুদ্ধকালে যে ১ শিঃ ৬ পেঃ হিসাবে টাকার বিনিময় হার নির্দিষ্ট রাখা হইয়াছিল তাহা তদানীন্তন অবস্থানুমোদিত নয়। কাজেই যুদ্ধকালীন অবস্থায় অস্বাভাবিকরূপে টাকার বিনিময় হার ১ শিঃ ৬ পেঃ নিরূপিত করায় ভারতের ন্যায্য পাওনা ষ্টার্লিং-এর অনেক অংশ এইভাবে বিনিময় হারের ভোজবাজিতে অনেক ক্ষয়িত হইয়াছে। অবশ্য যুদ্ধোত্তরকালে উক্ত ১ শিঃ ৬ পেঃ বিনিময় হারের নিরূপণ এখন অবস্থানুকূল বলিতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধকালে তাহা ছিল না। বর্তমান অবস্থায় ভারতের প্রয়োজন Capital goods এবং সেই জন্য ভারত যাহাতে তাহার শিল্পোন্নয়ন কাজের জন্য ঐ সকল Capital goods কিনিতে পারে, সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে ষ্টার্লিং ঋণের কিছুটা সদ্ব্যয় হইতে পারে। কাজেই এক সঙ্গে সমস্ত ষ্টার্লিং না ছাড়িয়া যদি ভারতের প্রয়োজন মত উহাদের কিয়দংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাও ফলপ্রসূ হইতে পারে এবং সেই সংগে গ্রেট ব্রিটেনও এক সঙ্গে ঋণ পরিশোধ করার তাগিদ হইতে অব্যাহতি পায়। আর একটি বিচার্য বিষয় এই যে, শিল্পোন্নয়নের জন্য কতটা "Capital goods" বাহির হইতে পাওয়া যাইতে পারে এবং কতটা আমাদের দেশের সঞ্চয় (Savings) হইতে কেনা যাইতে পারে। কারণ সঞ্চয় (Savings) ও নিয়োগের (Investment) মধ্যে সমতা রক্ষিত না হইলে আর্থিক দায়িত্ব রাখা সম্ভব নয়। কাজেই বিদেশ হইতে "Capital goods" আনয়নের জন্য ভারতের যে বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন, তাহার অভাব পূরণের জনাই ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং এর নিয়োগ দরকার এবং যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে, ভারতের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি বছরে ১০০ কোটি টাকা হইবে, তবে এই ঘাটতি পূরাইবার জন্য সঞ্চিত ষ্টার্লিং নিঃশেষ করিতে প্রায় ১৬ বৎসর লাগিবে। তাহা হইলে গ্রেট ব্রিটেনও এই ঋণ পরিশোধ করিতে ১৬ বছর সময় পাইল। যে নিরন্ন ভারতবর্ষ ব্রিটেনের রণসম্ভার যোগাইবার জন্য বিগত তিন বৎসরে কঠোর আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া গড়পড়তা ৩৭২ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যসম্ভার প্রেরণ করিয়াছে, সেই ব্রিটেন ভারতের চাইতে শতগুণে অর্থবান হইয়াও যদি উপরোক্ত ব্যবস্থানুযায়ী ১৬ বৎসরের দীর্ঘ মেয়াদে ভারতের সমস্ত পাওনা ষ্টার্লিং পরিশোধ না করে, তবে পৃথিবীতে ইহার চাইতে বড় অকৃতজ্ঞতার কাজ আর কি হইতে পারে? এই ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় গ্রেট ব্রিটেনের নিকট দাবী করিতে হইবে: এই দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা কালে যদি ষ্টার্লিংএর বহির্মূল্য কমিয়া যায় তবে সমতা রক্ষার জন্য অনুরূপ স্বর্ণ ভারতের খাতায় জমা দিতে হইবে। ১৯৪০—৪১ সালের ইঙ্গ-আর্জেনটাইন চুক্তি অনুসারে আর্জেনটাইনকে উপরোক্তভাবে স্বর্ণ দানের ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছে। যে আর্জেনটাইন দেশ ফ্যাসিষ্ট শক্তির সহযোগী বলিয়া অপকীর্তি অর্জন করিয়াছিল সেই দেশই যদি এইরূপ সুবিধা পাইয়া থাকে, তবে গণ-মুক্তির প্রতীক এই ভারত তাহা পাইবে না কেন? ষ্টার্লিং ব্যালেন্স সম্পর্কীয় আসন্ন বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ যেন ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন।

(১) ভারত তাহার ইচ্ছানুযায়ী ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে যে কোন মুদ্রানীতি গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা দাবী করিবে। এ পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রা ষ্টার্লিংএর সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ ছিল। প্রয়োজন হইলে ভারত রুপি-ষ্টার্লিংএর বিবাহ বিচ্ছেদ দাবী করিবে।

(২) ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দিলে ষ্টার্লিং সম্পত্তির উপর যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে সেই ঘাটতি পূরণের জন্য প্রয়োজন হইলে ভারতকে অন্যান্য দেশের ন্যায় স্বর্ণ দানের অঙ্গীকার করিতে হইবে।

(৩) ষ্টার্লিং সম্পত্তি একসঙ্গে কোষমুক্ত না করিয়া ভারতের প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন কিস্তিতে যাহাতে "Capital goods" ক্রয়ে সহায়তা হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৪) গ্রেট ব্রিটেনের সহিত এরূপ বোঝাপড়া হওয়া কর্তব্য যাহাতে ভারত ইংলণ্ডের কাছ হইতে ঋণ পরিশোধ বাবদ বিদেশী মুদ্রা (foreign exchange) লইতে পারে।

(৫) বর্তমান অবস্থান্তর মুহূর্তে (transitional period) ভারতের বিনিময় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত যাহাতে ভারতের বর্তমান অবস্থার সুযোগ বিদেশীয়রা না নিতে পারে এবং ভারতের প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রা যাহাতে ভারতের কল্যাণকল্পেই ভবিষ্যতে ব্যয়িত হইতে পারে।

(৬) "Empire Dollar pool"এর সভ্য থাকার প্রয়োজন যুদ্ধান্তে মোটেই নাই। কথায় বলে "ভাগের মা গঙ্গা পায় না"। ভারতের অবস্থাও তাই। ভারতের বর্তমান বাণিজ্যানুকূল্যে আমেরিকা হইতে যে ডলার পাওনা হইতেছে উহা যৌথভাণ্ডে পড়িয়া অন্যান্য সভ্য দেশের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া পড়িতেছে। হিসাব দৃষ্টে দেখা যায় যে ভারতের বেসরকারী বাণিজ্যানুকূল্যেই প্রায় ৫৭·৪৫ কোটি টাকার ডলার উক্ত "pool"এ জমা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারত তার পুরাতন যন্ত্রাবলীর পরিবর্তে নূতন কোন "Capital goods" কিনিবার জন্যও ডলার পায় নাই। কাজেই ভারতকে উক্ত "Empire Dollar pool" হইতে অবসর গ্রহণ করা উচিত।

(৭) ভারত যাহাতে ডলার ঋণ আমেরিকা হইতে সরাসরিভাবে পাইতে পারে এমন ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

দেশের কথা

(১৪ই পৌষ—২০শে পৌষ)

কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত—গান্ধীজী—উপাধি উৎপাত—বিহারী মুসলমান—বাঙলা সরকারের অর্থ-সমস্যা—নোয়াখালীর চরের কথা—সর্দার অজিৎ সিংহ—বিজ্ঞান কংগ্রেস—মুন্সীর ব্যাখ্যা—শরৎচন্দ্রের আবেদন—কংগ্রেস কমিটির বিবৃতি—লবণের শুল্ক।

কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত—সমগ্র দেশ বৃটিশ সরকারের গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখের বিবৃতি সম্বন্ধে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। ঐ বিবৃতিতে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে প্রদেশসংঘ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার সহিত কংগ্রেসের ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য নাই। কাজেই গণ-পরিষদে কার্য সম্পর্কে কংগ্রেস বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের ব্যাখ্যানুসারে কাজ করিবেন কিনা, তাহাই বিবেচ্য ছিল। সেই বিষয় বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্যই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। অধিবেশনের পূর্বে ঐ বিষয়ের ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের আলোচনা করিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালনী প্রমুখ কয়জন নোয়াখালীতে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে গান্ধীজীর মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। গণ-পরিষদে যখন বিভিন্ন অংশের অধিবেশন হইবে, তখন অনিচ্ছুক প্রদেশগুলি তাহাতে যোগ দিবেন কিনা এবং প্রদেশসংঘ গঠনে সম্মত হইবেন কিনা তাহাই বিবেচ্য ছিল। ইতিমধ্যে সে বিষয়ের অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গত ২০শে পৌষ জানা গিয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, কোন প্রদেশকে বা প্রদেশাংশকে—পাঞ্জাবে শিখদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থায় যোগদান করাইতে পারা যাইবে না এবং সেরূপ চেষ্টায় তাঁহারা জনগণের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে পারিবেন। আসামের, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ও পাঞ্জাবে শিখদিগের যে অসুবিধা ঘটিয়াছে, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

গান্ধীজী—গান্ধীজী পূর্ববঙ্গে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁহার এই কার্য ব্যঙ্গের বিষয় বিবেচিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহা ব্যঙ্গের বিষয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা গান্ধীজীর উদ্দেশ্যের মহত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাঁহারা এমন কথাও বলিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, বহুদিন পূর্বেই তাহার অবসান হইয়াছে এবং গান্ধীজীর তথায় অবস্থিতিই উপদ্রুত সম্প্রদায়ের স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্তনে বিঘ্ন ঘটাইতেছে! কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পূর্ব-বঙ্গে এখনও উপদ্রবের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং তাঁহারা যে সচিবসংঘের প্রশংসাকীর্তন করেন, সেই সচিবসংঘই গান্ধীজীকে নিরাপদ মনে করিতে না পারিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। গান্ধীজীর পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত স্থানে গমনের ও অবস্থিতির গুরুত্ব অসাধারণ। তাহাতেই পূর্ব-বঙ্গের ঐ সকল স্থানে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে ও পাইতেছে এবং সে বিষয়ে সমগ্র সভ্যজগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সমগ্র সভ্যজগতের লোকমত কেহই অবজ্ঞা করিতে পারেন না এবং সে মত যখন ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার কারণ ও সমাধানের কার্যে প্রবৃত্ত হইবে তখন যে তাহার সুফল ফলিবে, এমন মনে করা সংগত। যাঁহারা গান্ধীজীর পূর্ববঙ্গে গমনে আপত্তি করিয়া-ছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার তথায় অবস্থানে অস্বস্তি অনুভব করিতেছেন। অবশ্য তাঁহাদিগের আপত্তির ও অস্বস্তির কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায় এবং তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়, তাঁহারা অনুতপ্তও নহেন। তাঁহারা যতদিন সত্য সত্যই অনুতপ্ত না হইবেন, ততদিন দুর্ঘটনার পুনরুদ্ভব সম্ভাবনা দূর হইবে না। গান্ধীজী সেই জন্যই তাঁহা-দিগের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাইতে চাহিতেছেন।

উপাধি উৎপাত—এবার নববর্ষে ভারত সরকার উপাধি বিবরণে বিরত হইয়াছেন। অন্তর্বর্তী সরকার উপাধিদানের বিরোধী। কিছুদিন পূর্বে মুসলিম লীগের প্রধান পরি-চালকগণও সরকারের কার্যের প্রতিবাদে উপাধি বর্জন করিয়াছেন। উপাধির জন্য বহুলোক যে উদ্যম ও অর্থ ব্যয় করেন, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ যেমন সমাজের কল্যাণকর—লোকের আত্মসম্মানজ্ঞানের অনুশীলনের উপকার তদপেক্ষাও অধিক।

বিহারী মুসলমান—এখনও বাঙলায় বিহার হইতে মুসলমান নীত হইতেছে। বিহার সরকার উপদ্রুতদিগের পুনর্বসতির জন্য যেমন ভবিষ্যতে তাহাদিগের নির্বিঘ্নতার জন্যও তেমনই ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহারা পুনর্ব-সতির জন্য অর্থও যেমন দিতেছেন, তেমনই আবার উপদ্রুত অঞ্চলে থানার সংখ্যা বৃদ্ধিও করিতেছেন এবং যাহাতে প্রয়োজন হইলে অল্প সময়ের মধ্যে সাহায্য প্রেরণ সম্ভব হয়, সে ব্যবস্থাও করিতেছেন। তথাপি যে বাঙলার প্রধান সচিব প্রভৃতি বিহার সরকারের ব্যবস্থার নিন্দা করিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাঙলায় মুসলিম লীগ যে প্রচারকার্য পরিচালিত করিতেছেন, তাহাতে গান্ধীজী বিচলিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের পরে দিল্লী যাইবার পথে পণ্ডিত জওহরলাল বিহার সরকারের ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশান্তে তাঁহাদিগকে গান্ধীজীর নিকট সকল বিষয় বিবৃত করিতে যাইতে বলেন। তদনুসারে বিহার সরকারের একজন সচিব ও সাহায্যদান বিভাগের ২ জন কর্মচারী গান্ধীজীর নিকটে যাইয়া সকল বিষয় জানাইয়া আসিয়াছেন। মিস্টার সুরাবর্দি বিহার সরকারের সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিকট যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন, বিহার সরকার সে সকলের উত্তর দিয়া এক বিবৃতি গান্ধীজীকে দিয়া আসিয়াছেন। বিহার সরকারের ব্যবস্থা যে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ তাহাই জানা যায়।

ইংরেজ সৈনিকদিগের কু-ব্যবহার—খাসীর সংবাদে প্রকাশ, গত খৃষ্টমাসের সময় কোন অনুষ্ঠানে তথায় অবস্থিত কতকগুলি বৃটিশ সৈনিক কয়জন ফিরিঙ্গী তরুণীকে তাহাদিগের সহিত নৃত্য করিতে বলিলে তাহারা অসম্মত হইয়াছিল। পরদিন প্রায় ২ শত ইংরেজ সৈনিক দলবদ্ধ হইয়া সশস্ত্র অবস্থায় স্থানীয় রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের অনুষ্ঠানে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে লাঞ্ছিত ও আসবাবপত্র ভগ্ন করে। তাহাদিগের কৃত ক্ষতির পরিমাণ ১৫ হাজার টাকা হইবে। মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক এণ্টনি এবিষয়ে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিবের ও যুক্তপ্রদেশের প্রধান সচিবের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। এদেশে বৃটিশ সৈনিকদিগের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ নূতন নহে। দুঃখের বিষয় দেশীয় সৈনিকদিগের সম্বন্ধে সময় সময় অভিযোগ পাওয়া যায়।

বাঙলা সরকারের অর্থ-সমস্যা—গত ৩১ ডিসেম্বর মিউনিসিপ্যালিটীসমূহের প্রতিনি[ধি] সম্মেলনে বাঙলা সরকারের অর্থসচিব মি[স্টার] মহম্মদ আলী জানাইয়াছেন—বাঙলা সর[কার] আয় বৃদ্ধির উপায় সন্ধান করিতেছেন। ইহ[াতে] বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে [না।] বাঙলা সরকার ব্যয়সংকোচের কোন চে[ষ্টা] করেন নাই, পরন্তু ব্যয়ের উপর ব্যয় পুঞ্জী[ভূত] করিয়াছেন ও করিতেছেন। বিহারের দ[ুর্গত] মুসলমানদিগের জন্য, তাঁহাদিগের আগ[মনে] বাজেটে কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইতেছে, [তাহা] জানিবার বিষয়। সেই বাবদে যে ব্যয় হইতে[ছে] তাহা, আমরা দেখিতে পাইতেছি।

মেধাবী মুসলমান শিক্ষার্থীদিগের জন্যও বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। সচিবসংঘে সচিবের সংখ্যাও বর্ধিত করা হইয়াছে। অথচ বাঙলায় অন্নাভাব—বস্ত্রাভাব—সরিষার তৈলেরও অভাব।

নোয়াখালীর চরের কথা—যে সময় বাঙলার সচিবরা বলিতেছেন, পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে; পাকিস্থানী পত্রগুলি বলিতেছেন, গান্ধীজীই উপদ্রুত ব্যক্তিদিগের স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তনে বিঘ্ন জন্মাইতেছেন; আর একদল তথাকথিত তপশীলী বলিতেছেন, বর্ণহিন্দুরাই তাঁহাদিগের শত্রু—মুসলিম লীগ বন্ধু, সেই সময়ে নিখিল ভারত হরিজন সেবকসংঘ নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জিলাদ্বয়ের মধ্যবর্তী—মেঘনার পূর্বকূলে অবস্থিত ৩০ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল প্রশস্ত চরের যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা কি বাঙলা সরকার পাঠ করিয়াছেন? এই স্থানে প্রায় ৭৫ খানি গ্রামে প্রায় ৪৫ হাজার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকের বাস। গ্রামগুলি লুণ্ঠিত ও পরে বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, এই অঞ্চলে নমঃশূদ্রদিগের (অর্থাৎ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যে শ্রেণীর সেই শ্রেণীর লোকের) ক্ষতির পরিমাণ—৭৫ লক্ষ টাকা। লক্ষ্মীপুর থানার এলাকায় ৪ শত নমঃশূদ্র পরিবারের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা, আর রায়পুর থানার এলাকায় গয়ের চর ও কেওরাদগ দুইখানি গ্রামের প্রায় ৩ শত নমঃশূদ্রের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। হাইমচর বাজারের ক্ষতি ৩০ লক্ষ টাকা। এই বাজার বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।—এখন ধ্বংসস্তূপ। গত ২৩শে নভেম্বর বাঙলার গভর্নর এই বাজারের দাঙ্গা দেখিয়া কলিকাতা হইতে যে সকল দ্রব্য পাঠাইবেন বলিয়াছিলেন, ডিসেম্বর মাসের শেষেও সে সকল তথায় প্রেরিত হয় নাই। *তিনি অবিলম্বে গ্রামসমূহে ...ন্ধনপাত্র পাঠাইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু ৪০ ...নেও তাহা হয় নাই। রিলিফ কমিশনার ...ষ্টার লার্কিন যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, ...স্ত ধর্মস্থান সরকারের ব্যয়ে পুনর্নির্মিত ... সে নির্দেশ ব্যাপকভাবে প্রচার করাও ...ই। তিনি বলিয়াছেন যে সকল সরকারী ...ার উপর কার্যভার আছে, তাঁহাদিগের ...াকের সহ্য করিবার সীমা অতিক্রান্ত ...। এ সম্বন্ধে কি বাঙলা সরকারের ও গভর্নরের বলিবার কিছু আছে?*

...র অজিৎ সিংহ—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ...ঞ্চলের কূলে বসতি আন্দোলনের নেতা ...জিৎ সিংহ লালা লজপত রায়ের সহিত ...নে বিনা বিচারে নির্বাসিত হইয়া-... তিনি বিদেশে ছিলেন এবং লণ্ডনে ... কর্মীদিগের সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য জার্মানী হইতে বিলাতে যাইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি ধর্মনির্বিশেষে ভারতীয়দিগকে একযোগে মাতৃভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বলেন। সমিতির সদস্যগণ তাঁহাকে দেড় হাজার টাকা উপহার দেন। তিনি আমেরিকায় ১৮ বৎসর ছিলেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেস—দিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বিদেশ হইতেও বৈজ্ঞানিকগণ যোগ দিতে আসিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের উদ্বোধনে ভারতে বিজ্ঞানের আলোচনার ও গবেষণার প্রয়োজন প্রসঙ্গে বলেন, ভারতবর্ষের ৪০ কোটি অধিবাসীর জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নূতন কার্য-পদ্ধতি প্রবর্তিত করিতে হইবে। যে দেশে লোক অন্ন ও বস্ত্র পায় না—বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী না হইলে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—যে দেশে স্বাস্থ্য, শিল্প, সেচ সবই অবজ্ঞাত সে দেশে বিজ্ঞানের দ্বারা উন্নতি-সাধনের প্রয়োজন যত অধিক তত আর কোন দেশে নহে। কিন্তু পরাধীন দেশে এবিষয়ে যাহা হয়, তাহা দেশের লোকের সীমাবদ্ধ শক্তিতেই হয়। এপর্যন্ত এদেশে তাহাই হইয়াছে এবং আমাদিগের ক্ষমতার সংকীর্ণতা বিবেচনা করিলে যাহা হইয়াছে, তাহা অল্পও বলা যায় না। আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সরকারের অধিক অর্থ নিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতে সমবেত বৈজ্ঞানিক-দিগকে রোগশয্যা হইতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বৃটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতিত্বে লিখিত পত্রের বিষয় বিবেচনা করিতে বলিব। যখন বিলাতে বৈজ্ঞানিকগণ জার্মানীর নাৎসীবাদের নিন্দা করিতেছিলেন তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন,—নাৎসীবাদেরই মত ভারতবর্ষ প্রভৃতি পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদ মানবের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের চেষ্টা ব্যর্থ করে। *দেশের সমৃদ্ধির জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। অথচ ভারত সরকার যেমন এদেশে মোটর শিল্প প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়াছেন, বিলাতী সরকার তেমনই ভারতবর্ষে একশ্রেণীর ইঞ্জিন নির্মাণের বিরোধিতা করিয়াছেন। ইহা পরবশ্যতার দুঃখ।*

মুন্সীর ব্যাখ্যা—মিস্টার মুন্সী গত ২রা জানুয়ারী গণ-পরিষদের সার্বভৌমত্ব দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বৃটিশ সরকার দয়াবশে বা উদারতাবশতঃ ভারতবর্ষকে গণ-পরিষদে শাসন-পদ্ধতি রচনার অধিকার প্রদান করেন নাই। উহা ভারতবাসীর সহিত বৃটিশ সরকারের চুক্তি। নানারূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে চুক্তিলাভ করা গিয়াছে, তাহা এদেশের লোক উপেক্ষা করিতে পারে না। উহা উভয় পক্ষে মীমাংসা। এই গণ-পরিষদ আয়ার্লণ্ডের গণ-পরিষদেরই মত বিবেচনা করিতে হইবে। সে পরিষদ আইরিশ নেতৃগণের সহিত বৃটিশ সরকারের চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হইয়া কার্য-পরিচালন করিয়াছিল। গণ-পরিষদই শেষে অস্থায়ী সরকার গঠিত করিবে এবং সেই সরকার ভারতের সহিত বৃটেনের সন্ধির চুক্তি সম্পাদন করিবে। আয়ার্লণ্ডের রাজনীতিক ইতিহাসের ও মুক্তিচেষ্টার সহিত ভারতবর্ষের রাজনীতিক ইতিহাসের ও মুক্তি-চেষ্টার সাদৃশ্য অসাধারণ। মিস্টার মুন্সী যে আইরিশ গণ-পরিষদের কথা উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহার উদ্ভবও আয়ার্লাণ্ডের সহিত বৃটেনের মীমাংসা-চুক্তিতে। সে মীমাংসা বৃটেন দয়া করিয়া বা উদারতাবশে করেন নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল—তাহার ভিত্তি মুক্তিকামী আইরিশ-দিগের অসাধারণ ত্যাগ—প্রবল দেশাত্মবোধ—একাগ্র দেশসেবা। বৃটেন সে সকল দলিত করিতে অসমর্থ হইয়াই মীমাংসা করা সুবুদ্ধির কাজ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের আবেদন—প্রধানতঃ রুশিয়ার ও আমেরিকার সাহায্যে জার্মান যুদ্ধে জয়ীর দলে থাকিয়া ফ্রান্স আজ আবার তাহার সাম্রাজ্যবাদের মোহে অভিভূত। সে ইন্দোচীনের অধিবাসী-দিগের স্বাধীনতা লাভের স্বাভাবিক আগ্রহ অস্বীকার করিয়া বাহুবলে তাহা বিনষ্ট করিতে চেষ্টিত। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলিয়াছেন, সমগ্র এশিয়ার ভাগ্য আজ ইন্দোচীনের রণক্ষেত্রে নির্ণীত হইতেছে। যদি ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদ জয়ী হয়, তবে তাহা সমগ্র এশিয়ার দুর্ভাগ্য-দ্যোতক হইবে। তিনি ভারতবর্ষের তরুণ-দিগকে ইন্দোচীনের অধিবাসীদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন। এই আবেদন তাঁহারই উপযুক্ত।

***কংগ্রেস কমিটির বিবৃতি*—*নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও ও আচার্য যুগলকিশোর সমগ্র দেশকে অহিংস বিপ্লবের দ্বারা মুক্তির জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে—গঠনমূলক কার্যের জন্য প্রতি গ্রামে কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। প্রত্যেক গ্রামে যেন অন্তত একজন কংগ্রেসকর্মী গ্রামবাসীদিগের বন্ধু ও পথপ্রদর্শকরূপে কাজ করেন।*

লবণের শুল্ক—মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের পূর্বে সেই সরকার লবণের শুল্ক বিলুপ্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহার পরে মুসলিম লীগ শাসন-পরিষদে যোগ দিয়াছেন এবং লীগের একজন প্রতিনিধিই ভারত সরকারের অর্থ-সদস্যের পদ পাইয়াছেন। প্রকাশ, লীগের প্রতিনিধি সদস্যগণই লবণের শুল্ক বিলোপ করিবার বিরোধী।

রেসকোর্সের গ্যালারি

শ্রীঅমর সান্যাল

পুরাতন শহরের রেসকোর্স। কবে এখানে ছিল একটা ক্যান্টনমেণ্ট, স্কটল্যাণ্ডের অজ্ঞাত এক পার্বত্য উপত্যকার অধিবাসীরা রাইফেলের মহিমায় ক্যান্টনমেণ্টের মাটি কাঁপিয়ে সগর্বে পদচারণা করত। তাদের খেয়ালে আমদানী হ'ল রেসের ঘোড়া, শহরের একপ্রান্তে তৃণাস্তীর্ণ মাঠে গড়ে উঠল একটা রেসকোর্স; দেশী বিলাতী সাহেব মেমদের সুবিধার জন্য তৈরী হল একটা গ্যালারি। সবুজ ঘাসে ভরা বাঙলাদেশের মাঠ অস্ট্রেলিয়ান অশ্ববরের পদধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল।

কিছুদিন গেল কেটে, আরামের নেশা হয়ে উঠেছে জমাট। হঠাৎ দেশের লোক গেল ঝিমিয়ে, বিলাতী দাওয়াই আকণ্ঠ পান করে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হল। ক্যান্টনমেণ্টের রেজিমেণ্ট বদলি হল ফ্রণ্টিয়ারে, সেখানে দুর্দ্ধর্ষ পাঠানের বুক তখনও আরামের নেশায় ভরে ওঠেনি। এক-মাসের মধ্যে রেসকোর্স পরিণত হল গোচারণ মাঠে। বর্ষার জলে আর শরতের শ্যামলিমায় ঘোড়ার পায়ের দাগ গেল মিলিয়ে, পুরাতনের সাক্ষী শুধু রইল কাঠের একসার গ্যালারি।

রোজই এসে বসি এখানে। পশ্চিম আকাশে রবি-রশ্মির শেষ বন্যার ঝলসানিটুকু চোখে পড়ে। সামনে ধু ধু করে খোলা মাঠ, পিছনে শহরের অস্পষ্ট কোলাহল, উপরে মহাশূন্য। রোমাণ্টিক আমি নই, তবুও কি একটা চাঞ্চল্য জাগে শিরায় শিরায়। অবশ্য রক্তে আমার সমুদ্রের ঢেউ নৃত্য করে না, কিম্বা অরণ্যের ব্যাকুলতা হৃদয়ের মধ্যে জাগে না। কিন্তু যখন দূর রেললাইন কাঁপিয়ে ঝড়ের বেগে এক্সপ্রেস ট্রেণটা চলে যায়, পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যা-তারার মৃদু কম্পন ঝরে পড়ে ধরিত্রীর বুকে, রেসকোর্স ঘিরে একটানা চলে শিবাকুলের উন্মত্ত কলকোলাহল, তখন আমার বুকেও যেন ঘনিয়ে ওঠে শ্রাবণের বাদলরাত্রি। আমিও যেন শুনতে পাই—

ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক,
আগুনের ডাক,—
পাঁজরের উপরে আছাড়-খাওয়া
মরণ-সাগরের ডাক,
ঘরের শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।

একদিন এল একটা ছুটির বার। সকাল থেকে মেঘ জমছে আকাশের গায়ে। শীতের সকাল, আমার ঘর থেকে দেখতে পাচ্ছি কুয়াসার ধোঁয়া থমকে রয়েছে নদীর বুকে। চারিদিকে একটা ধুসর বিবর্ণ ভাব। বড় একটা চায়ের কেটলি সামনে নিয়ে পিতামহের আমলের বালাপোষ জড়িয়ে আছি বসে। কাপের পর কাপ চা পাঁচ মিনিট অন্তর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রতীক্ষা করছি কেটলি শেষ হওয়ার অপেক্ষায়। এমনি দিনে কি ঘরে থাকা চলে? প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বাইরে থাকতেই আমার ভাল লাগে, তবে শেলির মত মত্ত ঝটিকার তোড়ে বীণাযন্ত্রে পরিণত হতে আমি রাজী নই। আমার ক্ষীণ, চা-সংপুষ্ট দেহে অত সাহস নেই। তবুও এই দুর্যোগের মধ্যেই কাজের নেশা, ঘুরে বেড়াবার নেশা আমাকে পেয়ে বসে। আমি যেন খুঁজে পাই আপনার গরিমা, উড়ে চলি অজানা শূন্য পথে প্রথম ক্ষুধায় অস্থির গরুড়ের মত। সাহিত্যিক চেস্টারটনও ভালবাসতেন এমনি দিনে পথের পথিক হতে।

যাহোক, সেদিন ত পথ চলছি বালাপোষটি ভাল করে গায়ে জড়িয়ে। মনে মনে তারিফ করছি সেকালের কারিকরদের, তিনপুরুষ ধরে গায়ে দিচ্ছি একটা জিনিষ, যত্ন করে রাখলে আমার ছেলেও ব্যবহার করতে পারবে।

প্রশস্ত উন্মুক্ত রাজপথ, দূরে শিশিরাক্ত তৃণাচ্ছন্ন রেসকোর্স। প্রতিদিনের মত প্রসন্ন প্রভাতসূর্য আজ সেখানে শিশিরবিন্দু মুছে নেয়নি, কুয়াসার আড়ালে গ্যালারি পড়েছে ঢাকা। আত্মহারা হয়ে পথ চলছি আমি, খেয়াল হলে দেখি পুরাতন একটা সমাধিস্থানে আমি দাঁড়িয়ে। কতদিনের সমাধি কে জানে! সব কীর্তির অবসান হয়েছে এখানে, পিঞ্জরস্থ আত্মা ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে কবে সেদিন আসবে,—মহামুক্তির দিন। সামনে একটি ছোট ছেলের কবর, প্রস্তরমূর্তি সাভিমানে নতনেত্রে তাকিয়ে আছে ধরিত্রীমায়ের দিকে,—কেন আমাকে ফেলে দিলে তোমার কোল থেকে!

সম্মুখে এগিয়ে চলেছি আমিও সমাধিস্থ অবস্থায়। রেসকোর্সের গ্যালারি আমাকে হাত-ছানি দিচ্ছে। কুয়াসার পরদা আমার চঞ্চল-গতিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। গ্যালারির সিঁড়ি বেয়ে আমি উঠছি, চোখে নেমে আসছে মহানিদ্রা। জীবনের সকল চিহ্ন যেন পরম অচিনের মধ্যে মিশে যাচ্ছে।

প্রেম রোমাণ্টিক, কিন্তু স্বপ্ন আরও রোমাণ্টিক। কিন্তু একি অদ্ভুত স্বপ্ন! পুষ্কর-হ্রদে একটা গাছ থেকে ঝুলছে সংগ্রামী দেশ-সেবীর দেহহীন মস্তক; আর দুজন পিণ্ডবৎ পড়ে আছে তালগোল পাকিয়ে; আরেক-জনের কাটামুণ্ড মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে; পাশেই একজনের ভুলুণ্ঠিত দেহে শকুন বসেছে; শুধু অনতিদূরে একজন দেশ-সেবক বিরাটকায় একটি ভালুকের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত। কিন্তু তাঁরও প্রায় শেষ অবস্থা। ভালুকের হিংস্র একটি বোম্বাই থাবার আঘাতে তিনিও ধরাশয্যা গ্রহণ করলেন। কি বিকট হাসি তখন শুরু করে দিল ভালুক-রাজ। আমারই দিকে যেন এগিয়ে আসছে।

আতঙ্কে জেগে উঠলাম আমি। স্বপ্ন, নেহাত দুঃস্বপ্ন! শুধু শহরের রাস্তা দিয়ে হকারটা হেঁকে চলেছে,—পড়ুন, ৭০ লক্ষ লোক বেকার হইবে—আমার প্লীহা পর্যন্ত কাঁপন ধরল, আমিও পড়ব নাকি এই সত্তর লক্ষের মধ্যে! তার চীৎকার আবার শোনা গেল, পড়ুন, লাঙ্গল যার জমি তার, জাল যার জল তার! এই রে! সেরেচে! আমার রাঁধুনির কানে এই বাণী পৌঁছলেই সর্বনাশ! সে যদি মনে করে, রন্ধন যার ভোজন তার! কাল রাতের বাসি ইলিশমাছ চারখানা আছে। গ্যালারির নেশা, রোমান্স, স্বপ্ন, এক মুহূর্তে কোথায় মিলিয়ে গেল। পড়ি ত মরি করে আমি ছুটলাম বাড়ির দিকে।

আমার দোতলার ঘরখানা একেবারে গঙ্গার উপর। ভোরের দিকে ভিজা হাওয়া ঘরে ঢোকে পরম আত্মীয়ের মত অনুমতির অপেক্ষা না করেই। আমি এসে দাঁড়াই উন্মুক্ত বাতায়নপথে। অবশ্য করুণ-নয়ন তরুণ পথিক রাজপথে দেখা দেয় না, শূন্য রাজপথে দেখা দেয় আমার ঝি-এর সচল মূর্তি। তাড়াতাড়ি টেবিলের উপরে ছড়ান দুচার-আনা পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে দরজা খুলে দি।

আমার ঝি-টি ভাল, নাম সাবিত্রী। শরৎ-বাবুর সাবিত্রীর সঙ্গে তফাত শুধু বয়সে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, সম্প্রতি মস্তক মুণ্ডন হয়েছে। তার সঙ্গে এক ব্রাহ্মণসন্তান কুড়ি বৎসর কাটিয়ে হয়েছে গঙ্গাপ্রাপ্ত। মহা-গুরু নিপাত, কাজেই প্রায়শ্চিত্ত মস্তকমুণ্ডন। আখেরে লাভ হয়েছে আমারও। সাবিত্রীর ভাত-ডালের পরিমাণ গেছে অর্ধেক কমে।

সেদিন সকালে সাবিত্রী এসে বলল,—একটু ছুটি চাই দাদাবাবু, মিটিনে যাব।

আমিত চমকে উঠলাম। —মিটিঙ! কিসের মিটিঙ!

—হবে রেসের মাঠে। আমাদের ঝিয়েদের সব দল হবে।

আমার কৌতূহল হল। আমিও ছুটলাম রেস-কোর্সের দিকে।

দূর থেকে দেখি গ্যালারি বোঝাই। পুরুষ নয়, মেয়ের দল। রেস কি আবার আরম্ভ হল নাকি? বাঙালী মেয়েরাও ত আজকাল রেস-কোর্সে যায়। কাছে গিয়ে ভুল ভেঙে গেল। গ্যালারি ভর্তি ঝি। বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র বেশের,—আপন মহিমায় আপনি সমুজ্জ্বল। চিনতে পারলাম অনেককেই। আমার বাড়ির সাবিত্রী ত আছেই; তাছাড়া রমেশবাবুর পেট-মোটা ঝি ক্ষান্ত, সনতবাবুর ঝগড়াটে ঝি পদি, ইত্যাদি। বস্তুতঃ এত ঝি একসঙ্গে এই প্রথম চোখে পড়ল।

কিন্তু ব্যাপার কি? এই সকালবেলা রেস-কোর্সের গ্যালারি এদের টেনে এনেছে কোন্ মোহে? প্রাতর্ভ্রমণ করতে না মাঠের তাজা হাওয়া খেতে! বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব হল খ্যাঁদার। আমাদের পাড়ার রমেশবাবুর ছেলে খ্যাঁদা, সম্প্রতি ওকালতিতে নাম লিখিয়েছে। কিন্তু এই সকাল বেলায় খ্যাঁদা এখানে কেন? মক্কেল নেই ওর?

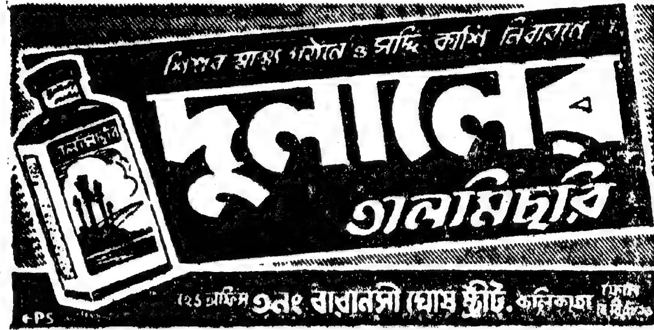
আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। খ্যাঁদা বক্তৃতা শুরু করেছে গ্যালারির সামনে দাঁড়িয়ে। বক্তৃতার সারমর্ম এই,—মান্ধাতার আমল থেকে ঝিদের ওপর যে অত্যাচার চলে আসছে, আজ থেকে তার অবসান হল। ঝিরা সেই দেশেরই মেয়ে যেদেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লক্ষ্মীবাঈ ও অহল্যাবাঈয়ের মত মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। আজ তারা বাঙলাদেশের বুর্জোয়াদের জানিয়ে দিক তারা মরেনি। বুর্জোয়া সমাজের সেবায় ঝিরা আত্মনিয়োগ করেছে, কিন্তু বাবুদের ভাল করে জানিয়ে দিক তারা, বাসন যে মাজে সে বাসন তারই।

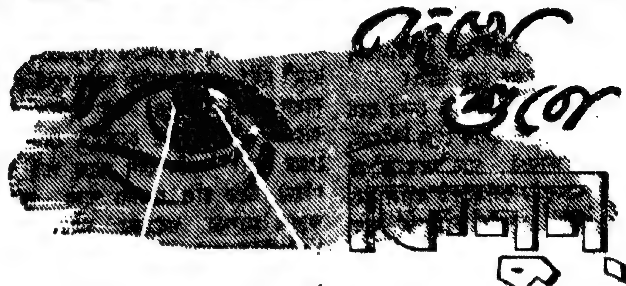
খ্যাঁদার শেষ কথা যেন আমাকে কশাঘাত করে বসল। দফা সেরেচে! বাসন মাজা শেষ হয়নি তখনও সাবিত্রীর। এই যা রক্ষে!

যা ভেবেছিলাম তাই হল শেষকালে। চার-টাকা সের কইমাছ সেদিন কিনলাম চারটে, কিন্তু আমার পাতে মাছ এক টুকরাও পড়ল না। রাঁধুনি ও সাবিত্রী গেছে গঙ্গাস্নান করতে; চুপি চুপি রান্নাঘরে ঢুকে দেখি কইমাছ চারটে ভাগাভাগি করে দুজনের পাতের শোভা বর্ধন করছে।

শরীরের সারা রক্ত ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠল ব্রহ্মরন্ধ্রে। চোখের সামনে ভাসতে লাগল রক্তবর্ণ গোলক। রাঁধুনি ও সাবিত্রী চোখের সামনে ছিল না তাই রক্ষে, নইলে সেদিন হয়ত নারীহত্যা হয়ে যেত। কিন্তু সামলে নিলাম মুহূর্তের মধ্যে। এক নিমেষে মাছ চারটের সদ্গতি করে উপরের বারান্দায় দাঁড়ালাম।

সেদিন বোধ হয় কিসের একটা পরব ভিড়ের ঢেউ লেগেছে গঙ্গার ঘাটে। স্নানার্থীদের পাশেই আমাদের পাড়ার লছমন গাড়োয়ান তার ঘেয়ো ঘোড়া দুটোকে স্নান করাচ্ছে। ঘোড়াদুটোর মুক্তিও বোধহয় আসন্ন, লছমনের দয়ায় তাদের পরকালের পথ ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে। দূরে ধূ ধূ করছে বিস্তীর্ণ বালুচর। মাঝিদের ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে খেলা করছে। আকাশভরা পাতলা মেঘের ধোঁয়া। চারিদিকের আবহাওয়া যেন শীতে শিরশিরিয়ে উঠছে। সরমজড়িত কিশোরীর মত মধ্যাহ্ন সেদিন নূতন রূপে ধরা দিল আমার কাছে।





সদাজাগ্রত দৃষ্টি
সিদ্ধান্তে দ্রুত উপনীত হইতে
সাহায্য করে। কিন্তু বিশ্বাসপ্রবণ
ক্রেতাগণকে সহজেই অন্যায় প্রতি-
যোগীতার কবলে ফেলা হইয়া থাকে, ফলে
আসল জিনিষের পরিবর্ত্তে নকল নিয়ে ঠকতে
হয়। গুণে ও কার্য্যে "কণ্ডুদাবানল" সকল
নিকৃষ্ট অনুকরণকে পরাজিত করিয়াছে। ইহাতে পাচড়া,
ফোড়া, কাটা, পোড়াঘা বা যে কোনও প্রকার ক্ষত নিশ্চিত
আরোগ্য হয়। সুতরাং এই মালিশযুক্ত এ্যাণ্টিসেপ্‌টিক
কিনিবার সময় বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন
যেন সামান্য নামান্তরে নিকৃষ্ট অনুকরণে প্রবঞ্চিত না হন্।
শুধু আসল ঔষধের জন্যই দাম দিন্।



এল, এম, সাহা শঙ্খনিধি এণ্ড
কোং লিঃ - ঢাকা
ব্রাঞ্চ ৩২বি, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

আমার স্বপন ভেঙ্গে গেল কি একটা কোলাহলের ঝঙ্কারে। স্নানের ঘাটে তুমুল কলহ,—নারী-পুরুষে। লছমন বনাম রাঁধুনি ও সাবিত্রী। হিন্দী বাঙলা মিশিয়ে লছমন যা বক্তৃতা দিচ্ছে তার সারমর্ম এই,—ঘাটে এলে ছোঁয়াছুয়ি হবেই, তার জন্য এত গোশা কেন। অর্থাৎ ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় লছমন সাবিত্রীকে ছুঁয়ে ফেলেছে, গাড়োয়ানের স্পর্শে তার গঙ্গাস্নান হয়েছে নিষ্ফল, তাই এই কলহের অবতারণা।

বিরক্ত হয়ে বিছানায় এসে বসলাম। ওদের কণ্ঠস্বর—মুগুরের ঠোকাঠুকির মত কানে বাজছে। খ্যাঁদার বক্তৃতায় ফল হয়েছে দেখছি। হয়ত ফরাসী-বিদ্রোহের রঙ্গিনীদের মত বাঙলা-দেশের ঝিরাও রণমত্ত হয়ে উঠবে।

বেশ বুঝতে পারছি দিবাস্বপ্ন দেখছি। কিন্তু বিষ্ণুশর্মার মতে চিন্তাগ্রস্তেন 'জন্তুনা দৃষ্টঃ স্বপ্নো নিরর্থকঃ।' আমি ত চিন্তাগ্রস্ত জন্তু (মানুষ), আবার স্বপ্নও তেমনি।—খ্যাঁদা ছুটেছে রেসকোর্সের চারিদিকে তাকে তাড়া করেছে সাবিত্রী। প্রায় ধরে ফেলল খ্যাঁদাকে, সাবিত্রী হাসছে খিলখিল করে পানের ছোপওয়ালা দাঁত বার করে।

হাসির শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কারা যেন হাসছে নীচে। তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম। সর্বাগ্রে নজর পড়ল রান্নাঘরের উপর। ঘর একেবারে খালি। বাসনের চিহ্নমাত্র নাই, থালা গেলাস বাটি যেন উধাও হয়েছে মুক্তির আনন্দে। খ্যাঁদাকে সাবিত্রীরা সত্যিই ধরে ফেলেছে। চিন্তাগ্রস্ত জন্তুর স্বপ্ন হয়েছে সফল, আর বিষ্ণুশর্মা পরাজিত।

পরাধীন জাতির উপর বিতৃষ্ণা এসে গেল। ভেবেচিন্তে এবার এক নেপালীকে আমার কাজে বহাল করলাম। একাধারে পাচক ও ভৃত্য। দু'একদিনের মধ্যেই বাহাদুর নিজেকে কাজের লোক বলে প্রমাণ করে দিল। আমি নিশ্চিন্ত মনে রেসকোর্সের গ্যালারিতে যাতায়াত আবার শুরু করে দিলাম।

কিন্তু এদেশে নিশ্চিন্ত থাকার জোটি নেই। এইতো মাত্র সেদিন দুর্ভিক্ষের ধাক্কা সামলে উঠেছি। দুর্গন্ধ চাল আর তেলেভাজা খেয়ে বেঁচে ছিলাম কোনরকমে। তার জের কাটিয়ে না উঠতেই রাজধানীর বুকে শুরু হয়ে গেল প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের তাণ্ডব-লীলা। আমাদের শহরেও নানারকম গুজব ও জল্পনা-কল্পনার আভাস পাওয়া গেল। অবস্থাপন্নেরা মূল্যবান সম্পত্তি (বাড়ীর মেয়েরা সমেত) পশ্চিমে চালান দিতে আরম্ভ করলেন। আমাদের পাড়া প্রায় অর্ধেক খালি হয়ে গেল। আমাকে সকলে বলে, বেশ আছেন মশায় আপনি, পরিবার নেই, ইত্যাদি।

আমার সহকর্মী নিবারণবাবু একদিন এলেন দেখা করতে। চুপিচুপি আমার কানের কাছে মুখ এনে বল্লেন,—সাবধানে থাকবেন একটু, আজ রাতে পাড়া অ্যাটাক হতে পারে। ভাইপো-দের পাঠিয়ে দিলাম আসামে দাদার কাছে। আমি চল্লাম এই দুপুরের ট্রেনে দুমকা,—চেঞ্জে। ছুটি মঞ্জুর হয়েছে দু হপ্তা।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে প্রস্থান করলেন নিবারণবাবু। আমি অবাক হয়ে ভাবছি নিবারণবাবুর কথা,—হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ সবল মানুষ এই নিবারণবাবু! নাঃ, সব পরাধীন থাকার দোষ।

হঠাৎ দরজার গোড়ায় আবির্ভাব হল আমার নেপালী পাচক। বললাম,—খবর কি বাহাদুর! বাজারের পয়সা দেব?

কোন কথা না বলে মেঝের উপর বসে পড়ল বাহাদুর। হাঁটুর উপর মুখ রেখে বলল,—হাম কেয়া করেগা বাবু!

—কিসের 'কেয়া করেগা' রে!

নেপালীসুলভ বাঙলায় বাহাদুর বলল,—আজ রাতে পাড়া লুট হবে, মারপিট হতে পারে। সবাই চলে গেছে হাম কেয়া করেগা!

কারণ অসহায় স্বর, কিন্তু বাহাদুর ত পরাধীন নয়।

শেষ পর্যন্ত কুকার কিনতে হল। সহকর্মী বন্ধু সনৎবাবু বললেন,—আপনার কম্মো নয়। ঝি রাখুন একটা।

অদ্ভুত মানুষ এই সনৎবাবু। তাঁর ধারণা তিনি ছাড়া জগতে আর সকলেই বোকা ও অকেজো। দাম্পত্য-জীবন থেকে শুরু করে খুঁটিনাটি সকল ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান সবচেয়ে বেশী, একথা তিনি জোর গলায় প্রচার করেন। আমি থাকি চুপ করে, কিন্তু মুস্কিল বাধে নিবারণবাবুর হাত নিবারণবাবুকে নিয়ে। নিবারণবাবুর হাত দেখে নাকি এক জ্যোতিষী বলেছিলেন, মোড়লি করেই তাঁর জীবন যাবে। এই দুই মোড়লের মাঝখানে পড়ে শুধু আমার হয় নাকালের একশেষ।

এই দুঃসময়ে দরদী বন্ধু আমার রেস-কোর্সের গ্যালারী। কীটদষ্ট বাস্তব জগত থেকে বহুদূরে স্বপ্নের সিঁড়ি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে আমারই জন্য। বেলাশেষের আলোটুকু সোহাগে জড়িয়ে থাকে সমাধি-মন্দিরের উষ্ণ চূড়ায়। গোধূলিলগ্নে আমি যাত্রা করি আমার মিলনবাসর রেসকোর্সের গ্যালারীর উদ্দেশে।

ইদানীং আমার নিত্যসঙ্গী হয়েছেন সনৎবাবু। নীরব ও নিরপেক্ষ শ্রোতা হিসাবে আমি তাঁর সুখ্যাতিভাজন হয়েছি। তাঁর নিষ্কলুষ জীবনের নানা কীর্তি কাহিনী আমাকে তিনি অযাচিতভাবে বলেছেন ও দেশের নামকরা পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, একথারও আভাস দিয়েছেন। আমি একটু লজ্জিত হই; পণ্ডিতদের সঙ্গে আমার পরিচয় ত দূরের কথা; তাঁদের গবেষণা ও উপাধির বহর আমার প্রাণে ভীতিসঞ্চার করে।

সনৎবাবু ছাড়া রেসকোর্সের গ্যালারী আর একজন অতিথিকে আপ্যায়িত করতে লাগল। মোড়লিতে সনৎবাবু তাঁকে টেক্কা দেবে, এটা নিবারণবাবুর সহ্য হল না। সন্ধ্যাবেলা কাজ-কর্ম ছেড়ে তিনিও আমাদের কাছে নিয়মিত হাজিরা দিতে আরম্ভ করলেন।

প্রথমদিন নিজে থেকেই গ্যালারীতে আসার কারণ বললেন নিবারণবাবু।—কি করি মশাই, রাতে ঘুম হয় না, তা ছাড়া আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট টক্ আছে।

খ্যাঁক করে উঠলেন সনতবাবু। কেন মশায়, পরিবার ত এখন এখানে নেই আপনার, ঘুম হবে না কেন?

মোলায়েম সুরে নিবারণবাবু বললেন,—দেখুন সনতদা, আপনি ফার্স্ট ক্লাশ এম-এ, আমিও তাই। আমাদের দুজনের স্বার্থই সমান, কিন্তু আমার দুঃখ হয় আপনি আমাকে অপছন্দ করেন।

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। আবার ঝাঁপিয়ে উঠলেন সনতবাবু। নিবারণবাবুর রজনীর অনিদ্রা, অভিন্ন স্বার্থের দোহাই ইত্যাদি তাঁর সুপ্ত মোড়লীপনাকে জাগ্রত করেছিল। দুজনের উড়ো তর্ক চলতে লাগল তুমুলভাবে।

সম্ভবতঃ আমার অস্তিত্ব তাঁদের মনে ছিল না। শুক্ল পক্ষের শেষ তিথি সেদিন। আপন মনে গুন্ গুন্ করছি,—চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙ্গেছে, উছলে পড়ে আলো, ইত্যাদি। হঠাৎ মনে হল, রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হলে এ গান এভাবে গাইলে চলবে না। তখন গাইতে হবে,—চাঁদকা হাসি বাঁধ ভাঙ্গা হ্যায়, উছলে পড়তা হ্যায় আলো, ইত্যাদি।

যাক, পরের কথা পরে হবে। আপাতত সনত-নিবারণের তর্ক ছাপিয়ে শুনতে পাচ্ছি সেই হুকারের গুরুগম্ভীর নিনাদ,—ময়মনসিংহে তেভাগা আন্দোলনের সাফল্য, চাষিগণ কর্তৃক ধান কর্তন ও নিজ গৃহে অপসারণ।

আমার মাথায় কে যেন প্রচণ্ড এক গাঁট্টা বসিয়ে দিল। ময়মনসিংহে যে আমারও কয়েক বিঘা জমি আছে। এ কি হতভাগা আন্দোলন রে বাবা! বুড়ো রহমৎউল্লা কি ফাঁকি দেবে এবার! তাই বোধ হয় চিঠিপত্র দেয়নি অনেক দিন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি শেষ ট্রেনের তখনও আধঘণ্টা বাকী। তার্কিকদের অলক্ষ্যে লাফিয়ে পড়লাম গ্যালারি থেকে। রেসকোর্স ধরে ছুটে চলেছি উন্মত্তের মত,—দূরে স্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে



চায়ের দোকান

আমি যে আড্ডাচারী মানুষ সে কথা আগেই বলে নিয়েছি। আমার এই লেখার মধ্যে গোড়া থেকেই একটি আড্ডার সুর লেগে আছে। যাঁরা এর নিয়মিত পাঠক বোধ করি তাঁরাও আমার মতোই আড্ডাধারী মানুষ, তা নইলে এর মূল সুরটি ঠিক ভালো লাগবে না। সেদিন এক ভদ্রলোক বলছিলেন এই লেখাগুলোর মধ্যে কেবল আড্ডার আমেজ নয় একটু যেন চায়ের গন্ধও পাওয়া যায়। কথাটা শুনে আমার ভারী ভালো লাগল। যিনি এ কথা বলেছেন তিনি আমার সব চাইতে বড় সমঝদার। চায়ের পেয়ালাকে আশ্রয় করেই আমার রসের কারবার। চা হচ্ছে আড্ডার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; এ যুগের ডিমোক্রাটিক দেবতাদের সোমরস। অতি আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে চা'কে বলব আড্ডাচক্রের পেট্রল; চা নইলে আড্ডার চাকা ঘোরে না। উষ্ণ পানীয়ের ধোঁয়াটি মগজের মধ্যে প্রবেশ করে আর জাম্‌ধরা মস্তিষ্কের কোষগুলি আপনিই মেলে যেতে থাকে। রসের সঙ্গে রসনার অতি নিকট সম্পর্ক। চায়ের রস জিভে লাগলেই রসনা মুখর হয়ে ওঠে। অবশ্যি এমন অনেক রস আছে যা পেটে পড়লে রসনা আর রাশ মানে না। আর সব নেশাতে মাতামাতি হয়, হাতাহাতি হয়, কিন্তু আড্ডাটি হয় না। এদিক থেকে চা নিষ্কলঙ্ক পানীয়, এমন কি মাত্রা ছাড়িয়ে পান করলেও মাত্রাজ্ঞান ঠিক থাকে, ইংরেজ কবি যে জন্য বলেছেন—the cup that cheers but not inebriates.

আমার জীবনের সব চাইতে রসস্নিগ্ধ প্রহরগুলি কেটেছে চায়ের দোকানে। ছাত্রাবস্থায় এবং কলেজোত্তর দিনেও কি প্রভূত পরিমাণে আড্ডা দিয়েছি এই সব দোকানে। চায়ের আড্ডাগুলি ছিল শহরের হৃৎপিণ্ড, শহরের প্রাণস্পন্দন এখানেই অনুভব করা যেত। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালাটিকে কেন্দ্র করে টেবিলের চারধারে এক একটি মণ্ডলী। কোথাও সাহিত্যালোচনা, কোথাও রাজনীতিচর্চা, কোথাও সামাদ, গোষ্ঠপালের গুণকীর্তন, কিছুবা সিনেমা তারকাদের নামগান। সেদিন যাঁরা সাহিত্যের আড্ডা জমাতেন তাঁদের কেউ কেউ আজ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। পাশের টেবিলে বসে নিজেকে এঁদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী মনে করে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি এবং চায়ের দোকানটিকে mermaid tavernএর সঙ্গে তুলনা করে কতদিন রোমাঞ্চিত বোধ করেছি। রাজনীতির চর্চা যাঁরা করতেন, তাঁরা কেউ নামজাদা খ্যাতি লাভ না করলেও অনেকে দেশের জন্য নানা রকম দুঃখ ক্লেশ সহ্য করেছেন। ক্রীড়ামোদীদের কথা ঠিক জানিনে। তবু এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বর্তমান বাঙলার খুব বড় একটা অংশ এইসব চা চক্র থেকেই ছিটকে বেরিয়েছে। সেদিনের চা-এর আড্ডাগুলি যা ভেবেছে আজকের বাঙলা অনেকখানি তাই থেকেই গড়ে উঠেছে। ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সে কথা আলাদা। আসল সত্যটা হ'ল—what the tea-shops think today Bengal thinks to-morrow.

বহুদিন পরে সেদিন আমার অতি পরিচিত চায়ের দোকানটিতে গিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য এখন আর চায়ের দোকানে আড্ডা জমাই না। এখন আমাদের আড্ডা বসে নিভৃত গৃহকোণে, সেটা বদ্ধ জলাশয়ের মতো। দোকানের আড্ডা অনেক বেশি প্রাণবান। রাজপথের জনপ্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত বলেই এর মধ্যে একটা স্রোতের বেগ আছে। ঘরের আড্ডা তোলা জলে স্নান, দোকানের আড্ডা অবগাহন স্নান। ওর মধ্যে তৃপ্তি বেশী। গৃহগত আড্ডা নিষ্প্রাণ হতে বাধ্য কারণ একদিকে গৃহ অপরদিকে গৃহিণী তার টুঁটি চেপে ধরেন। চায়ে সোয়াদ থাকে সোয়াস্তি থাকে না, পেট ভরে তো মন ভরে না। এর মধ্যে একটা অস্বস্তিকর, এমন কি বলা যেতে পারে অস্বাস্থ্যকর respectibility আছে যেটা একেবারে আমার ধাতে সয় না।

হ্যাঁ, বলছিলুম কি অনেক দিন পরে সেই চায়ের দোকানটিতে ঢুকলুম। দোকানের মালিক ভোলেন নি—এই যে আসুন, আসুন... কতকাল পরে, কি আশ্চর্য। কুশলবার্তা জিগ্‌গেস করলেন। পুরোনো দিনের বন্ধুদের খবর জেনে নিলেন, নিজেও দু-একজনের খবর দিলেন। দোকানের আসল মালিক গৌরবাবু মারা গেছেন এখন ইনিই কর্তা। ইনি আমাদের বয়েসী লোক, আমাদের সঙ্গেই এঁর আত্মীয়তা। চারদিকে যাঁরা কুণ্ডলীকৃত ধূমোদ্গীরণের সঙ্গে মণ্ডলী করে বসেছেন তাঁরা নতুন generation এর লোক। এঁদের চোখে অনাত্মীয় দৃষ্টি, এঁরা স্বতন্ত্র।

কিন্তু স্বতন্ত্র হলে কি হয়, বাঙালীর স্বভাব যায় না ম'লে। সেই সাহিত্যালোচনা, সেই রাজনীতি, সেই খেলা আর সিনেমা। চায়ের কাপটি সুমুখে নিয়ে খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বসে আছি। টুকরা টাকরা কথাগুলি কানে আসছে—নোয়াখালি, বিহার, জহরলাল—Bengal is being neglected ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। হঠাৎ যদি ফস্‌ করে বলে বসতুম—It's because Bengal has made herself negligible, তবে বোধ করি একটা মারাত্মক কাণ্ড হয়ে যেত। ভাগ্যিস্‌ বলে ফেলিনি, কেননা বা বলব? বলবার কি অধিকার আছে? সতেরো আঠারো বছর আগে আমরা যারা এখানে আড্ডা দিয়েছি, সেদিন আমরাই ছিলাম rising generation. জাতি গঠনের ভার নাকি ছিল আমাদের হাতে। আজকের ছেলেরা যদি ব্যর্থতার কথা বলে তবে সেটা আমাদেরই ব্যর্থতা। আমরাই এঁদের গড়ে তুলতে পারিনি। এ generationএর ব্যর্থতা আগের generationএর ওপরে indictment. ১৯১৪ সনের লড়াইতে চার্চিল ছিলেন ইংলণ্ডের অন্যতম সমরমন্ত্রী, ১৯৩৯ সনের যুদ্ধেও চার্চিল ইংলণ্ডের বিপত্তারণ মধুসূদন। স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা দুঃখ করে বলেছিলেন—গত পঁচিশ বৎসরের শিক্ষা ইংলণ্ডে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ দেশকে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন এমন মানুষের সৃষ্টি হয়নি। বাঙলা দেশেও তাই। আমরা যখন কলেজের ছাত্র, তখন রাজনীতির ক্ষেত্রে সুভাষবাবুর আবির্ভাব। আজকের দুর্দিনেও নেতাজীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনাটাকেই আমরা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বসে আছি। গত পঁচিশ বছরে দ্বিতীয় কোন নেতার জন্ম হয়নি। সে ধিক্কার পূর্বগামী generationএর অর্থাৎ আমাদের। যে শ্লেষবাক্য আমার মুখে এসে গিয়েছিল এক ঢোঁক চায়ের সঙ্গে সেটি হজম করে নিলাম। নিন্দা করব কাকে? ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি, মাথা কর নত, এ আমার, এ তোমার পাপ—।... এক যুগ পরে দোকানটিতে গিয়ে ভালই করেছিলাম—বাঙলার হৃৎস্পন্দনটি আর একবার অনুভব করলাম। মনে মনে আমি উৎফুল্ল হয়েছি। ছেলেদের মনে এই যে বেদনাবোধ এইটি সুলক্ষণ। বেদনাকেই আমি বলি চেতনা। বেশ বুঝতে পারছি বাঙলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

রঞ্জ-টোন

স্নায়বিক ও সর্বপ্রকার দৌর্বল্যে শক্তিবর্দ্ধক ওয়াইন টনিক।

মাত্রা—চায়ের ১ চামচ অথবা ২ চামচ আহারান্তে প্রত্যহ তিনবার।



রঞ্জ[illegible] ল্যাবরেটারীজ

[illegible]নং হে[illegible] দাস রোড, ঢাকা।



রোগজয়ের কাহিনী

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডি-টি-এম

এখনকার কালে মানুষ যত রকম রোগে ভোগে, ইতিহাসের আদিমকালে নিশ্চয়ই এত রকমের রোগ ছিল না। বন্য-জন্তুর যেমন খুব কমই রোগ হয়, বন্য মানুষেরও তেমনি খুব কমই রোগ হতো। কালের বিবর্তনে যতই আমরা অগ্রসর হচ্ছি ততই যেন নতুন নতুন রোগের সংগে পরিচিত হচ্ছি। হয়তো সভ্যতার জয়যাত্রায় মানুষের পক্ষে এও একটা অবশ্যম্ভাবী, যুগে যুগে উত্তরোত্তর তাকে রোগের কণ্টকগুলো সরাতে সরাতেই জীবন সংগ্রামে উত্তীর্ণ হতে হবে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, আমাদের যাবতীয় রোগের মধ্যে সবচেয়ে আদিম রোগ কোনটা, আর আধুনিক কালের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রোগ কোনটা —তাহ'লে দুই প্রশ্নের উত্তরে ঐ একটি মাত্র রোগেরই নাম করতে হবে যাকে আমরা বৈজ্ঞানিকের শিক্ষায় এখন টুবারকুলোসিস বলে থাকি। বস্তুত মানুষ আর তার এই রোগটি বোধ হয় এক সংগেই জন্মগ্রহণ করেছিল, তারপর মানুষও যেমন জগতের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করতে থেকেছে, এই রোগটিও তেমনি মানুষের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করতে থেকেছে। বাইবেলে কথিত আছে, সৃষ্টিকার্য শুরু ক'রে বিধাতা ষষ্ঠ দিনে প্রাচীন এশিয়া ভূখণ্ডের মাটি দিয়ে প্রথম মানুষের সৃষ্টি করেছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে ঐ মাটিতে নিশ্চয়ই অনেক টি বি (যক্ষ্মা রোগের বীজাণু) ছিল। নইলে সেই জন্মকাল থেকেই মানুষে এই রোগে আক্রান্ত হ'তে শুরু করলো কেমন ক'রে।

আমরা যে ঠিক কতকালের পুরানো জীব তা এখন প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে কতক কতক অনুধাবন করতে পারছি। সেই প্রত্নতত্ত্ব যদিও বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বলতে পারে, কিন্তু প্রাক্ টুবারকুলোসিস কোনো যুগের কথা বলতে পারে না। সর্বপ্রাচীন নিওলিথিক যুগের যতটা খবর আমরা পেয়েছি তাতে তখনকার দিনেও যে মানুষের হাড়গোড় টি বির দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে ঘুণ ধরে যেতো, তার অভ্রান্ত অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তারপর ঐতিহাসিক ও সভ্যতার যুগ যখন শুরু হলো তখনকার সময়ে এর অস্তিত্বের প্রমাণ আরও অনেক বেশী রকমই আছে। এখন থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে মিসরে আর ব্যাবিলোনিয়াতে যখন প্রথম মনুষ্য সভ্যতার অভ্যুদয় হয়, তখনকার যুগের প্যাপাইরাসে লিখিত যে সমস্ত হস্তলিপি পাওয়া গেছে তাতে এই রোগের কোনো নাম না থাকলেও এর লক্ষণগুলির হুবহু বর্ণনা পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, তখনকার দিনের সযত্ন রক্ষিত যে সকল মামির আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যেও এই রোগের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে। সেই সব দেখে শুনে বেশ বোঝা যায় যে, মিশরীয় সভ্যতার উন্নতির সংগে সংগে এই রোগের প্রসারও বেড়েছে। প্রথম যুগের প্যাপাইরাসগুলিতে দাঁতের রোগের বা অন্যান্য কোনো রোগের উল্লেখ না থাকলেও এই রোগের আছে। পরবর্তী গুলিতে দাঁতের রোগের কথা, সর্দিরোগ প্রভৃতির কথাও আছে, কিন্তু এই রোগের কথাও বিশেষভাবেই আছে। আশ্চর্যের বিষয় সিফিলিস বা ক্যানসার রোগের কোনো উল্লেখই ঐ সকল মিশরীয় প্যাপাইরাসে পাওয়া যায় না। সম্ভবত এই সব রোগের তখনো জন্মই হয়নি।

সভ্যতার অগ্রদূত হিসাবে চীন দেশকেও আমরা অত্যন্ত প্রাচীন বলি। চীনারা বহুকালের সভ্য এবং পুরাকাল থেকেই তারা ইতিহাস রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত আগেকার বর্ণনা বহুলে ইতিহাস তাদের দেশে পাওয়া যায়। তাতে লাও পিং বলে যে কাসি ও জ্বরযুক্ত রোগের বর্ণনা আছে, সেটা বর্তমান দিনের টুবারকুলোসিস ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের বৈদিক যুগও প্রায় ওর সমসাময়িক। তখনকার ঋগ্বেদেও যক্ষ্মা রোগের আরোগ্য কামনায় মন্ত্রাদি রচিত হয়েছে। সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে তো এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশদভাবে অনেক কথাই আছে। পারস্য দেশের প্রাচীন জেন্দা ভেস্তা নামক ধর্ম পুস্তকেও এই রোগের চিকিৎসায় পাইন গাছের তেলের কথা এবং অন্যান্য ঔষধাদির কথা উল্লেখ করা আছে।

বাইবেল গ্রন্থে যক্ষ্মা রোগের লক্ষণগুলির হুবহু বর্ণনা পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, স্বয়ং যীশু খৃষ্টও যে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এমন কথাও কেউ কেউ বলে। তাঁরই সমসাময়িক একজন লেখকের গ্রন্থে দেখা যায় যে, তিনি রোগপীড়িত দরিদ্র ইহুদীদের মধ্যেই বাস করতেন, তাদের সংগে অনেক রকমের কষ্ট সহ্য করতেন, মরুভূমির মধ্যে গিয়ে অনেক-কাল অনাহারেই কাটিয়ে দিতেন, এতে তাঁর শরীর অত্যন্ত শীর্ণ ও পীড়িত হয়। যীশুর সেই শীর্ণ দেহ মূর্তির যে বর্ণনা লেখক করেছেন, তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে, তিনি এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁকে ক্রসবিদ্ধ করবার সময় যখন বক্ষের বাঁদিকে শূলচ্ছেদ করা হয় তখন সেখান থেকে নাকি প্রচুর জল এবং রক্ত নির্গত হয়েছিল। তাই থেকে একজন জার্মাণ বৈজ্ঞানিক বলেন যে, সম্ভবত তাঁর প্লুরিসি ছিল। কথাটা হাস্যকর মনে হ'লেও নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। মানুষের সকল দুঃখের সংগে সংগে তার চরম দুঃখ স্বরূপ এই রোগটিকেও যদি তিনি আপন শরীরে গ্রহণ করে থাকেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অতএব মানুষ বহুকাল পর্যন্ত এই রোগটিকে নির্বিবাদে সহ্য ক'রে এসেছে, নিতান্ত অপরাজেয় জ্ঞানে এর বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রাম শুরু করতে পারেনি। মনু একে ক্ষয় রোগ বলে গেছেন, এবং ক্ষয় রোগীকে অস্পৃশ্য এবং পাপযুক্ত জ্ঞানে তাকে সাধ্যমত পরিহার করতে বলে গেছেন। এমনিভাবেই তখনকার সমাজের দুর্ভাগা রোগীরা এই রোগকে সহ্য ক'রে নিতান্ত অসহায়ের মতো মৃত্যু বরণ করেছে। নিতান্ত অসহায়ের মতোই তারা কেবল দেবতার কাছে প্রাণভিক্ষা করেছে, অপদেবতার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে, কতরকম অলৌকিক উপায়ের অবতারণা করেছে এবং অবশেষে একে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত বলে মেনে নিয়েছে। সময় থাকতে এই মৃত্যুদূতের আগমন যাতে এড়িয়ে যেতে পারা যায় সেজন্য অনেক লৌকিক এবং অলৌকিক উপায় তারা উদ্ভাবন করেছে, কিন্তু একে জয় করবার উপযুক্ত সাধনা কেউ করেনি। সকলেই ভেবেছে এই বুঝি আমাদের ভাগ্য কিন্তু এ যে আমাদের নিবার্য শত্রু সেই কথাটি কেউ ভাবতে পারেনি। একেও যে আমাদেরই শক্তিতে পরাভূত এবং পদানত করতে পারা যাবে এমন কেউ কল্পনাও করেনি। হাজার হাজার বছর এই ভাবেই কেটেছে।

রোগের পরিচয় লাভ করা যখন মানুষের শিক্ষার বিষয় হলো, আর রোগ চিকিৎসার উপায়কে যখন ফলিত ও লিখিত বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা শুরু হলো, তখন থেকে আমরা জানতে শুরু করলুম, এই যক্ষ্মা রোগের স্বরূপ কি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি গুরু হিপোক্রেটিস খৃষ্টজন্মের চারশত বছর আগে এই রোগের নাম দিলেন 'থাইসিস', আর

মানে শরীর ক্রমশ শীর্ণ ও সংকুচিত হ'য়ে যাওয়া। তিনিই প্রথম বললেন যে, এই রোগে ফুসফুসের মধ্যে ছোটো ছোটো ট্যুবারকল জন্মে তাকে ক্ষতযুক্ত করে, এতে সন্ধ্যায় জ্বর হয় এবং সকালে কাসি হয়, আর আঠারো বছর থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই রোগের পক্ষে মারাত্মক। এই থাইসিস রোগে আক্রান্ত কেউ তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য গেলেই তিনি তাকে বলতেন,—খাঁটি দুধ আর বিশুদ্ধ বাতাস হলো এর একমাত্র চিকিৎসা। একটি গরু কিংবা দুটি ছাগল কিনে নিয়ে চলে যাও নির্জন পাহাড়ে, ভালো ক'রে তাদের খেতে দাও, আর কেবল তাদের বাঁটের দুধ খেয়েই সেখানে পড়ে থাকোগে।

ঐ সময়েতে প্লেটো ছিলেন একজন দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি বললেন এটা ধাতুগত ব্যাধি, এর কোনো চিকিৎসাই হ'তে পারে না, সে চেষ্টা করতে গেলে অনর্থক সময় নষ্ট আর অর্থের অপব্যয়। খৃীষ্টজন্মের কিছুকাল পরে এলেন রোম দেশীয় চিকিৎসা বিশারদ গালেন, তিনিও হিপোক্রেটিস প্রভৃতির কথাই অকাট্য বলে ছেড়ে দিলেন। আরব দেশে জন্মালেন আভিসেনা, তিনিও খাঁটি দুধ আর ফাঁকা হাওয়ার উপকারিতা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই বলতে পারলেন না।

এমনিভাবে খৃষ্টজন্মের পরেও যখন আঠারো শত বছর পার হ'য়ে গেল, তখন থেকে অকস্মাৎ আমাদের নতুন রকম জ্ঞানোদয়ের শুরু হলো। তখন থেকে হিপোক্রেটিস প্রভৃতির শিক্ষা উল্টে যেতে লাগলো। একবার যখন আলোকপাত হওয়া আরম্ভ হলো তখন থেকে নব নব সত্যের আবিষ্কার হ'তে লাগলো, তখন থেকে এই রোগের অনেক রহস্যই ধরা পড়ে গেল। যে রোগ সাত হাজার বছরেরও বেশি সময় মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে এসেছে তার বিরুদ্ধে এতদিনে প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হলো। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে, এই শত্রু দুর্ধর্ষ হলেও মোটেই অজেয় নয়। প্রাচীন পণ্ডিতদের ধারণা একেবারেই ভুল।

বর্তমান যুগে এই সার্থক সংগ্রাম যারা প্রবর্তন করেছে তাদের নাম করতে হ'লে আগেই বলতে হয় লেইনেকের কথা। ইনি ছিলেন অতি দরিদ্রের সন্তান, ফ্রান্সের এক শহরে স্থানীয় মেডিকেল স্কুলে পাঁচবার বৃথা চেষ্টার পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে প্যারিস শহরে যান উচ্চ ডাক্তারি শিক্ষা করতে। সেখানে বেলি নামক এক ছাত্রের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা হয়। এ'দের দু'জনের কৌতূহল হলো, হাসপাতালের যক্ষ্মা রোগীরা সকলেই মরে কিসে? শত শত মৃতদেহকে এ'রা ব্যবচ্ছেদ ক'রে দেখতে লাগলেন, এবং প্রত্যেক রোগীর ফুসফুসের মধ্যে একই-প্রকারের ছোটো ছোটো ট্যুবারকল আবিষ্কার করতে লাগলেন। দু'জনে মিলে তখন বললেন, এ রোগের নাম প্রকৃত হিসাবমতো ট্যুবারকুলোসিস হওয়া উচিত। সেই থেকে এখন ঐ নামটাই বহাল হয়েছে।

শিক্ষার পরে লেইনেক প্র্যাকটিস শুরু করলেন। কিন্তু মৃতদেহের ফুসফুসে ট্যুবারকল দেখে যেমন ট্যুবারকুলোসিস ধরা যায়, জীবিত রোগীর শরীরে তেমনি এই রোগকে খুব গোড়া থেকেই ধরবার উপায় কি? রোগটা অবশ্য বুকের দোষেই হয়, কিন্তু তার একটা কিছু চিহ্ন তো আমাদের জানা উচিত। রোগীর বুকে পিঠে কান লাগিয়ে একরকম অদ্ভুত শব্দ শোনা যায় বটে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সে শব্দ নানাকারণে পাওয়া যায় না। একদিন তিনি দেখলেন রাস্তার ছেলেরা একটা ফাঁপা গাছের গুঁড়ি নিয়ে খেলা করছে। এক প্রান্তের ছেলেরা তার ওপর যা শব্দ করছে, অন্য প্রান্তের ছেলেরা গুঁড়িতে কান পেতে তাই শুনছে। শব্দ তাহলে ফাঁপা নলের ভিতর দিয়ে শোনা যেতে পারে। হাসপাতালে ফিরে গিয়ে একটা খাতা পাকিয়ে নল তৈরি ক'রে রোগীর বুকে লাগিয়ে কান দিয়ে শুনে দেখলেন, চমৎকার শব্দ পাওয়া যেতে লাগলো। তখন তিনি একটি কাঠের নল তৈরি ক'রে তাই দিয়ে রোগীর বুক পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। যক্ষ্মার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আয়োজনে এই জন্মালো প্রথম অস্ত্র। কিন্তু এর নাম কি দেওয়া যায়? গ্রীক ভাষায় 'স্কোপ' কথাটির মানে পর্যবেক্ষক, আর 'স্টিথো' কথাটির মানে বুক। দুই মিলিয়ে তাই এর নাম রাখা হলো স্টিথোস্কোপ।

এই নলযন্ত্রের সাহায্যে তিনি যক্ষ্মারোগ চেনবার উপায় আবিষ্কার করলেন এবং ঐ রোগের প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থাগুলিতে কোন সময় কোনপ্রকার শব্দ পাওয়া যায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়ে একটি অমর পুস্তক রচনা করলেন। কিন্তু এত কালের পুরানো রোগের অভেদ্য রহস্যমন্দিরে যিনি প্রথম প্রবেশ করলেন, রোগ তাঁকে নিষ্কৃতি দিলে না। তাঁর বন্ধু বেলিও ট্যুবারকুলোসিস রোগে মারা গেলেন, এবং তিনি নিজেও চুয়াল্লিশ বছর মাত্র বয়সে এই রোগেই মারা গেলেন। তথাপি তাঁর ঐ পরিচয়যন্ত্র নিয়ে রোগের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম শুরু হ'য়ে গেল। আগে পরিচয়, তবে তো পরাজয়। পরিচয়ের পর থেকেই লোকের মনে পরাজয়ের কথা উদয় হ'তে লাগলো।

এতকাল পর্যন্ত লোকে জানতো যে, বাতাসেই থাকে রোগের বিষ, অতএব সব দ্বার রুদ্ধ ক'রে বাতাসের প্রবেশ বন্ধ ক'রে দাও, তাহ'লে আর রোগও শরীরে প্রবেশ করতে পারবে না। চিরকাল লোকে এই নিয়মই পালন ক'রে এসেছে, রোগীকেও রেখেছে বন্ধ ঘরের মধ্যে, আর নিজেরাও থেকেছে বন্ধ ঘরের মধ্যে। কিন্তু লেইনেক বলে গেছেন যে, খোলা বাতাস, সমুদ্র ভ্রমণ, আর পরিপূর্ণ বিশ্রাম, এইগুলিই হলো রোগকে দমন করবার প্রকৃষ্ট উপায়। মুক্ত বাতাসকে কোনোক্রমে বর্জন করা চলবে না, কারণ মুক্ত বাতাস রোগের নিবারণের পক্ষেও উপকারী, আর আরোগ্যের পক্ষেও উপকারী। সেই দিকেই তখন সকলের দৃষ্টি গেল। ১৮৪০ সালে বোডিংটন প্রথম মুক্ত বাতাসে রোগীকে রাখবার পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। চিকিৎসকেরা রোগীদের মুক্ত বাতাসে রেখে আশ্চর্য সুফল পেতে লাগলেন এবং সেই কথা প্রচার করতে লাগলেন। বোডিংটন বললেন যে, মুক্ত বাতাসে কাসি বন্ধ হ'য়ে যায় আর ফুসফুসের ক্ষতও আরোগ্য হ'য়ে যায়, সেইজন্য যক্ষ্মা রোগীদের মুক্ত বাতাসে রাখবার উপযোগী স্বতন্ত্র হাসপাতাল স্থাপনা করা উচিত। এই ধারণা অনুযায়ী ১৮৫৯ সালে জার্মান ডাক্তার ব্রেমার প্রথম যক্ষ্মা চিকিৎসার উপযোগী সম্পূর্ণ খোলা যায়গায় স্বতন্ত্র স্যানাটোরিয়ামের প্রতিষ্ঠা করলেন। এই ধরণের স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার আশ্চর্য উপকারিতা দেখে তার পরে পৃথিবীর সর্বত্রই অনুরূপ স্যানাটোরিয়ামের প্রতিষ্ঠা হ'তে লাগলো। ঐ সকল স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে সকলেই যে আরোগ্য হ'য়ে যেতে লাগলো তা নয়, কিন্তু সকলেরই যে অনেক উপকার হলো তাতে সন্দেহ নেই। খানিকটা অনুকূল অবস্থা দেখে সকলেরই মনে সংগ্রাম জয়ের আশা হলো। তখন এই রোগের জন্য আরো অন্যান্য চিকিৎসার অনুসন্ধান হ'তে লাগলো। আঘ্রাণের দ্বারা ওষুধ প্রয়োগ করা হ'তে লাগলো। আইডিনের ব্যবহার হ'তে লাগলো, এই রোগে শরীরের ক্যালসিয়াম কমে যায় দেখে ক্যালসিয়াম প্রয়োগ করা হ'তে লাগলো, এবং স্বর্ণঘটিত ওষুধগুলির ব্যবহার হ'তে লাগলো।

কিন্তু রোগের প্রকৃত কারণস্বরূপ মূলে বীজাণুর তখনো আবিষ্কার হয়নি। কেউ জানতো না যে একজাতীয় নির্দিষ্ট বীজাণুই এই রোগের জন্য দায়ী। লুই পাস্তুর যখন এই পরম সত্যের আবিষ্কার করলেন যে, প্রত্যেক সংক্রামক রোগের মূলেই এক এক স্বতন্ত্র ধরণের 'জার্ম' আছে, তখন জগতের বিভিন্ন চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন রোগের জার্মের অনুসন্ধানে লেগে গেলেন। ঐ সময় জার্মানির মফঃস্বল অঞ্চলে রবার্ট কক নামে একজন দরিদ্র ডাক্তার ছিলেন। তিনি যে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন এমন কথাও বলা যায় না। গ্রামের পল্লীতে পল্লীতে ছেলেমেয়েদের সর্দিকাসির জন্য কফ-মিক্সচার প্রস্তুত ক'রে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু মনটা ছিল অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু। তিনি শুনেছিলেন যে, ফ্রান্স

দেশে পাস্তুর কুকুরে-কামড়ানো রোগের জার্ম আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তিনি নিজের ট্যুবারকুলোসিস রোগীদের সমস্যা নিয়েই তখন ব্যস্ত। ভেবে দেখলেন যে, এই রোগটাকেও সংক্রামক বলা যেতে পারে। কুকুরে-কামড়ানো রোগের মতো এই রোগেরও তো কোনো জার্ম থাকতে পারে! সেটা খ্‌ুঁজে দেখা দরকার। কিন্তু এই কাজের জন্য আগেই একটা মাইক্রো-স্কোপ যন্ত্র চাই, তার অনেক দাম। দ্‌ুই বছরের প্র্যাকটিসে যা কিছ্‌ু সঞ্চয় করেছিলেন তাই দিয়ে তিনি এক মাইক্রোস্কোপ কিনলেন, আর তারই সাহায্যে জার্মের অন্‌ুসন্ধানে লেগে গেলেন।

তিনি জানতেন যে, অনেক স্‌ূক্ষ্ম স্‌ূক্ষ্ম জার্মকে ঐ যন্ত্রের সাহায্যেও ভালোভাবে দেখা যায় না। যাতে তাদের উত্তমর্‌ূপে চিহ্নিত ক'রে দেখা যায় এইজন্য এমন কতকগ্‌ুলি রঙের ব্যবহার করতে লাগলেন যাতে জার্মগ্‌ুলিকে স্বতন্ত্রভাবে রাঙিয়ে নিয়ে দেখা যায়। এ ছাড়া কোনো রোগের জার্ম হয়তো সংখ্যায় কম থাকতে পারে, হয়তো তারা দ্‌ৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। যাতে খাদ্য দিয়ে প্‌ুষে রেখে তাদের প্রচুর সংখ্যাব্‌ৃদ্ধি করা যেতে পারে তারও উপায় তিনি আবিষ্কার করলেন। এইর্‌ূপভাবে দশ বছর যাবত নানা চেষ্টা করতে করতে অবশেষে তিনি অভ্রান্তর্‌ূপে টি বি'র আবিষ্কার করলেন। অভ্রান্তর্‌ূপে তিনি প্রমাণ করলেন যে এই টি বি'র দ্বারাই ট্যুবারকুলোসিস জন্মায়। ১৮৮০ সালে লণ্ডন শহরের মহাসভায় এ কথা প্রমাণ করবার জন্য তাঁর ডাক পড়লো, সেই সভাতে ল্‌ুই পাস্তুরও উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় তিনি বললেন, আমার বিশ্বাস আমি ট্যুবারকুলোসিস রোগের প্রকৃত জার্ম আবিষ্কার করেছি! আসন থেকে উঠে গিয়ে পাস্তুর তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সহস্র সহস্র বছরের নিগ্‌ূঢ় প্রহেলিকার অভেদ্য আবরণ তিনি উন্মোচন ক'রে দিয়েছেন। তিনিই এই বীজাণ্‌ুর নাম দিলেন ট্যুবারকল ব্যাসিলাস অর্থাৎ টি বি।

রবার্ট কক এতেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি ভেবে দেখলেন যে, বসন্ত বীজের টিকা নিলে বসন্তের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। পাস্তুরের প্রস্তুত কুকুরে কামড়ানো বীজের ইনজেকশন নিলে ঐ রোগ থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তবে ট্যুবারকুলোসিস বীজের টিকা নিলে এই রোগ থেকেই বা নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না কেন? টি বি-কে খাদ্য দিয়ে প্‌ুষে কালচার ক'রে অতঃপর সেই বীজাণ্‌ুকে আগ্‌ুনের উত্তাপে নষ্ট ক'রে নানা উপায়ে তার থেকে তিনি ট্যুবারকুলিন নামক এক ভ্যাক্সিন বা বীজের স্‌ৃষ্টি করলেন। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেল যে, ঐ ট্যুবারকুলিন বীজের ইনজেকশন দিলে গিনিপিগের শরীরের টি বি ঘটিত ক্ষত আরোগ্য হয়ে যায়। তিনি মনে করলেন যে এই বীজের দ্বারা অতঃপর মান্‌ুষের রোগও ব্‌ুঝি আরোগ্য হ'য়ে যাবে। অবশ্য তার পরে তিনি নিজের ভ্রান্তি ব্‌ুঝতে পারলেন। ট্যুবারকুলিনের দ্বারা রোগ নিবারণ করা গেলেও রোগ আরোগ্য করা যায় না, কিন্তু ট্যুবারকুলিনও যে এই রোগের বির্‌ুদ্ধে সংগ্রামের একটি মহা অস্ত্র তাতে সন্দেহ নেই।

, লেইনেকের দ্বারা স্টিথোস্কোপের আবিষ্কার হ'য়ে গেল, ব্রেমার প্রভৃতির দ্বারা স্যানাটোরিয়ম চিকিৎসার শ্‌ুর্‌ু হ'য়ে গেল, রবার্ট ককের দ্বারা টি বি ও ট্যুবারকুলিনের আবিষ্কার হ'য়ে গেল। কিন্তু তব্‌ুও রোগটিকে সার্থকভাবে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি, তার কারণ খ্‌ুব গোড়া থেকে ধরতে না পারলে কোনো রোগকেই অনায়াসে দমন করা সম্ভব হয় না, আর এমন একটি মারাত্মক রোগকে তো নয়ই। স্টিথোস্কোপের দ্বারা রোগের পরিচয় পাওয়া গেলেও খ্‌ুব প্রথম অবস্থায় সনাক্ত করা বড়ো কঠিন অথচ চিকিৎসার কৃতকার্যতার জন্য সেটাই বিশেষ দরকার।

অতঃপর বলতে হয় সেই রোণ্টজেনের কথা, যিনি আবিষ্কার করলেন এক্সরে বা রঞ্জনরশ্মি, —যার সাহায্য ব্যতীত যক্ষ্মা রোগটিকে প্রথম অবস্থাতেই নিখ্‌ুঁতভাবে নির্ণয় করা আর তার গতিবিধি অভ্রান্তভাবে পর্যবেক্ষণ করা কোনো-মতেই সম্ভব হয়নি। রোণ্টজেন ছিলেন ব্যাভেরিয়ার একজন খাঁটি বৈজ্ঞানিক অণ্টপ্রহর ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরিতে পদার্থ বিজ্ঞানের নানাবিধ এক্সপেরিমেণ্ট নিয়েই নিয্‌ুক্ত থাকতেন। ১৮৯৫ সালে একদিন তিনি কয়েকটি ইলেকট্রিক যন্ত্র ও কাচের ভ্যাকুয়ম টিউব নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে অকস্মাৎ এই অদ্ভুত অদ্‌ৃশ্য রশ্মির আবিষ্কার ক'রে ফেললেন। এই রশ্মি নিতান্ত সহজাত নয়, তেজস্বী বৈদ্যুতিক শক্তি কোনো ভ্যাকুয়ম টিউবের ভিতর দিয়ে চালনা করলে একপ্রকার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পন্দনের দ্বারা এর উদ্ভব হয়। এই রশ্মি চক্ষ্‌ুষে দ্‌ৃশ্যমান না হ'লেও বহ্‌ুপ্রকার কঠিন পদার্থের অবরোধের ভিতর দিয়ে অনায়াসে ভেদ ক'রে চলে যেতে পারে, কেবল ভারী ভারী ধাতু বা ধাতুঘটিত কোনো পদার্থের ভিতর দিয়ে যেতে পারে না। এর আর এক গ্‌ুণ এই যে, স্‌ূর্যরশ্মির সাহায্যে যেমন ফটোগ্রাফ তোলা যায় এই রশ্মির সাহায্যেও তেমনি ফটোগ্রাফ তোলা যায়। তবে এই দ্‌ুইরকম ফটোগ্রাফের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। একটা হাতের ওপর স্‌ূর্যরশ্মি ফেলে যদি তার ফটো তোলা যায় তাহলে হাতের কেবল ওপরকার চেহারাটাই ফটোতে উঠবে, কিন্তু রঞ্জনরশ্মি ফেলে ফটোগ্রাফ তুললে তার ভিতরকার কাঠামোর চেহারাটা ফটোতে উঠবে, তার কারণ রঞ্জনরশ্মি হাতের মাংস প্রভৃতি আলোক-দ্‌ুর্ভেদ্য সমস্ত পদার্থকেই ভেদ ক'রে চলে যাবে, কিন্তু হাড়ের মধ্যে ক্যালসিয়াম ধাতু রয়েছে বলে তাকে ভেদ করতে পারে না। স্‌ুতরাং শেষ পর্যন্ত ফটোগ্রাফের কালো জমির ওপরে তার দ্‌ুই রকমের সাদা ছায়া পড়তে দেখা যাবে—একটা হাতের উপর... আকৃতির পাতলা ছায়া, আর একটা ... ভিতরকার হাড়গ্‌ুলির গাঢ় ছায়া। ঐ ... ছায়ার দ্বারা কোথায় কোন হাড় কেমন আ... আছে তা স্পষ্টই দেখা যাবে। শ্‌ুধ্‌ু তাই ... এই রঞ্জনরশ্মির আরো এক বিশেষ গ্‌ুণ ... যে, স্বয়ং দ্‌ৃষ্টিগোচর না হ'লেও একপ্র... ধাতু মাখানো (ক্যালসিয়াম টাংস্টেট ও জি... সালফাইড) পর্দার ওপর পড়লে এই র... সেখানে এমন স্ফ্‌ুরজ্যোতির স্‌ৃষ্টি করে ... আলোর মতো দ্‌ৃশ্যমান হয়। স্‌ুতরাং কারো ... পিঠের দিকে রঞ্জনরশ্মি ফেলে যদি তার ব্‌ুকে... সামনে ঐ জাতীয় একটি পর্দা ধরা যা... তাহলে রঞ্জনরশ্মি তার ব্‌ুক পিঠ ভেদ ক'... এসে ঐ পর্দার উপর তার শরীরের ভিতর... কঠিন যন্ত্রগ্‌ুলির ছায়াবাজি দেখাতে থাক... এবং স্পষ্টই দেখা যাবে কেমনভাবে ... ব্‌ুকের মধ্যে হ্‌ৃদস্পন্দন ইত্যাদি ঘটছে। স্‌ুত... এক্সরে বা রঞ্জনরশ্মির দ্বারা দ্‌ুই কাজই ... যায়। শরীরের ভিতরকার ফটোও তোলা যা... তার নাম রেডিওগ্রাফি। আর পর্দা ফেলে ... সরি ভিতরকার ছায়াও দেখা যায়, তার না... রেডিওস্কোপি।

এই রশ্মিকে রোগ নির্ণয়ের কাজে লাগি... চিকিৎসা কার্যের যে খ্‌ুবই স্‌ুবিধা হ'য়ে গে... তাতে সন্দেহ নেই। শরীরের কোনো বিকলতা... সাক্ষাৎ চোখে দেখে চিকিৎসা করা, অ... আন্দাজে ব্‌ুঝে চিকিৎসা করার মধ্যে নিশ্চ... অনেক পার্থক্য আছে। আর বিশেষ ক... এই কথাটা যক্ষ্মা রোগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য... স্‌ুস্থ লোকের ফ্‌ুসফ্‌ুস অত্যন্ত নরম পদার্থে... তৈরি বাতাসে ফাঁপা যন্ত্র, স্‌ুতরাং রঞ্জনরশ্মি... দ্বারা তার কোনো স্‌ুস্পষ্ট ছায়াপাতই হ... না, পাঁজরার সাদা সাদা হাড়গ্‌ুলির ফাঁ... ফাঁকে অনেকটা কালো জমির মতোই দেখা... কিন্তু যক্ষ্মাতে ফ্‌ুসফ্‌ুসের মধ্যে যে ট্যুবারক... গ্‌ুলি জন্মায়, তার মধ্যে অনেক কঠিন পদা... থাকে, ক্যালসিয়ম মিশ্রিত গ্‌ুটি থাকে, স্‌ুত... কালো জমিতে সেইগ্‌ুলির সাদা সাদা ছ... দেখলেই বোঝা যাবে ফ্‌ুসফ্‌ুসের মধ্যে কো... কি বিকৃতি ঘটেছে। যদি ফ্‌ুসফ্‌ুসের কো... স্থান গলে গিয়ে তার মধ্যে ক্যাভিটি বা গ... হয়ে যায়, তবে তার চারিপাশে যেন সাদা ... দেওয়ার মতো দেখা যাবে এবং ভিতর... অংশটি অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অধিকতর ক... দেখাবে। এমনিভাবে রঞ্জনরশ্মির ফ... স্পষ্টই বোঝা যাবে কোন ফ্‌ুসফ্‌ুসের ক... অংশ আক্রান্ত হয়েছে, আর রোগটি ... অবস্থায় পৌঁছেছে। চিকিৎসাকালে এই র...

য়ায় মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে আগেকার ছবির সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে রোগ কতটা আরোগ্য হলো অথবা সম্পূর্ণ আরোগ্য হলো কিনা। শুধু তাই নয়, বর্তমান যুগে এক্সরে দ্বারা ক ছবি নেবার পদ্ধতির এতই উন্নতি হয়েছে যে, যক্ষ্মা রোগের সূত্রপাতের অবস্থাও এর দ্বারা অনায়াসে আর অভ্রান্তভাবে নির্ণয় করতে পারা যায়, এবং রোগটি আদৌ হয়েছে কি হয়নি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

একে কেবল আবিষ্কার বললেই যথেষ্ট হয় না, বিধাতার নূতন সৃষ্টির মতো একে একটা নূতন সৃষ্টি বলা যেতে পারে। রোণ্টজেনের এই সৃষ্টির মাহাত্ম্য যে মনুষ্য জগতের পক্ষে কতখানি মঙ্গলের তা সহজেই অনুমেয়। আমরা এমন একটি যন্ত্র এখন হাতে পেয়েছি যার সাহায্যে দিনের আলোতে পথ চলবার মতো আমরা অবলীলাক্রমে পথ চিনে চিনে যক্ষ্মা রোগীকে আরোগ্যের পথে পরিচালনা করতে পারি, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলবার কোনোই প্রয়োজন হয় না। বস্তুত আজকাল এক্সরে ব্যতীত যক্ষ্মা রোগের সম্যক নির্ধারণ আর রীতিমত চিকিৎসার ভার নেওয়াই চলতে পারে না।

এই তো গেল রোগ নির্ণয়ের দিক। আবার আসল চিকিৎসার দিকেও কয়েকটি অভিনব উপায়ের আবিষ্কার হয়েছে। ১৮৯২ সালে এই জাতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রথম সূত্রপাত করলেন রোম নগরের চিকিৎসক ফোরলানিনি। যুগের সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় মানুষ এই-আগের থেকেই বুঝেছিল যে কোনো উপায়ে রোগীর শরীরকে বিশ্রাম দিতে পারাই রোগটিকে দমন রাখবার প্রকৃষ্ট উপায়। ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছে তাকে কোনো গতিকে বিশ্রামের অবস্থায় রাখতে পারলেই এ রোগ তার বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। মুক্ত বাতাসে রেখে স্যানাটোরিয়াম চিকিৎসার তাই মূলনীতি। ফোরলানিনি ভাবলেন যে, যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত নির্দিষ্ট ফুসফুসটিকেও যদি দীর্ঘকালের জন্য বিশ্রাম দিতে পারা যায়, তাহলে নিশ্চয় তাতে আরো বেশি উপকার হতে পারে। কিন্তু কেমন ক'রে তা সম্ভব? বাঁচার জন্য মানুষকে নিশ্বাস নিতেই হবে আর নিশ্বাস নিলে দুই ফুসফুস একসঙ্গেই কাজ করতে থাকবে। বক্ষগহ্বর স্বভাবত বায়ুশূন্য বলেই এটা হয়। কিন্তু আক্রান্ত দিকের গহ্বরে যদি বাইরের থেকে বায়ু প্রবেশ করিয়ে তার চাপে ঐ দিকের ফুসফুসটিকে কৃত্রিম উপায়ে চুপসে সংকুচিত ক'রে রাখা যায়, তাহলে সেটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিশ্রাম পেতে পারে। এই যুক্তিতে তিনি কৃত্রিম নিউমোথোরাক্স চিকিৎসার অবতারণা করলেন। এর ফল অতি আশ্চর্যরকম হ'তে দেখা গেল। ফুসফুস নিষ্ক্রিয় হ'য়ে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে থাকলেই তার ভিতরকার ক্ষত স্বাভাবিক শক্তিতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, তার টুবারকলগুলি ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যায়, আর বীজাণুগুলিও ক্রমে ক্রমে মরে যায়। এতে কয়েকমাসের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে গিয়ে আবার আগের মতো কার্যক্ষম হ'তে পারে। অবশ্য বুকের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া কাজটাও কঠিন আর কিছু বিপজ্জনকও বটে। কিন্তু এর জন্যে যখন উপযুক্ত রকমের যন্ত্র তৈরী হয়ে গেল, আর তার দ্বারা কতটা বায়ু গিয়ে কতটা চাপের সৃষ্টি করছে তাও নির্ধারণ করবার উপায় হ'য়ে গেল, তখন শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে এ কাজ করা জলের মতো সহজ হ'য়ে গেল। তখন দেখা গেল যে, যক্ষ্মা চিকিৎসার পক্ষে এর মতো সহজ উপায় আর কিছুই নেই। নানা কৌশলে তখন এমন উপায় করা হলো যাতে এই চিকিৎসায় রোগীর কোনোই কষ্ট না হয় আর কোনোই বিপদের সম্ভাবনা না থাকে। মাঝে মাঝে কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু প্রবেশ করিয়ে দিলেই রোগীর ফুসফুসটি বরাবর নিষ্ক্রিয় থেকে ক্রমে আরোগ্য হ'য়ে যায়, এবং এই প্রক্রিয়া ক্ষান্ত ক'রে দিলেই কিছুদিন পরে সেই ফুসফুস আবার স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে শুরু করে।

কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে বায়ু প্রবেশের পথ না থাকায় এই নিউমোথোরাক্স চিকিৎসা করা যায় না। দুই দিকের ফুসফুস একসঙ্গে আক্রান্ত হলেও এই চিকিৎসা করা যায় না। অথচ ঐ সকল রোগীর পক্ষেও ফুসফুসকে বিশ্রাম দেওয়া বিশেষ দরকার। তখন তার জন্য আরো অন্যান্য উপায়ের আবিষ্কার হতে লাগলো। তার মধ্যে একটি উপায় হলো ফ্রেনিক নার্ভের ছেদন। ফ্রেনিক নার্ভের দ্বারাই মধ্যচ্ছদার (ডায়াফ্রাম) মাংসপেশীগুলি পরিচালিত হয়, এবং ঐ ক্রিয়ার দ্বারাই বক্ষদেশকে সংকুচিত ও প্রসারিত করে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি। যদি ঐ ক্রিয়াটিকে একদিকে অচল করে দেওয়া যায় তাহলে পক্ষাঘাতযুক্তের ন্যায় ঐদিকের বক্ষদেশ শ্বাসপ্রশ্বাসের কোনো ক্রিয়াই করতে পারবে না। সুতরাং বাধ্য হয়েই ফুসফুসকে নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে। এতেও অনেকের সমূহ উপকার হয়। আর একরকম চিকিৎসাপদ্ধতির আবিষ্কার হলো যার নাম থোরাকোপ্লাস্টি। এতে এক বা একাধিক পাঁজরার হাড়ের খানিকটা অংশ কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। বক্ষপিঞ্জরটি এইভাবে ফাঁক করে দিলে বায়ুর চাপে তার গহ্বরটি বহুকালের জন্যই চুপসে গিয়ে ফুসফুসকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে দেয়, এবং তার ভিতরকার সমস্ত ক্ষত তখন ধীরে ধীরে আরোগ্য হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া আরো একরকম পদ্ধতি আছে যার নাম ওলিওথোরাক্স। বায়ুর চাপ শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায় বলে এতে বায়ুর বদলে বুকের মধ্যে কোনো তেল প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, এবং তার চাপ বহুকাল স্থায়ী হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য সবগুলিই যে প্রকারান্তরে অস্ত্র চিকিৎসা তাতে সন্দেহ নেই। দেখা গেল যে, এই রোগে ঔষধ প্রয়োগের চেয়ে এই সকল অস্ত্র চিকিৎসাই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। আগেকার যুগের লোকে কল্পনাই করতে পারতো না যে কেবল এমন অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারাই যক্ষ্মা রোগ আরোগ্য করা সম্ভব হবে।

যক্ষ্মা রোগের সেই ভয়াবহতার দিন আর নেই। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন অন্তর্হিত হয়েছে। ন্যূনপক্ষে সাত হাজার বছর যাবৎ যে শত্রু মানুষের বুদ্ধিকে পরাজিত করে তার ওপর বিভীষিকার আধিপত্য করে এসেছে, এখন তার কাছেই সে পরাজিত। লেইনেকের প্রদত্ত স্টিথোস্কোপের সাহায্যে এখন আমরা প্রথম পরীক্ষাতেই রোগটিকে অনুমান করে নিতে পারি। রবার্ট ককের প্রণালীতে রোগীর নিষ্ঠীবন পরীক্ষার দ্বারা অনায়াসেই আমরা নির্দিষ্ট বীজাণুটিকে ধরে ফেলতে পারি। তাঁরই প্রদত্ত টুবারকুলিনের দ্বারা সন্দেহস্থলে এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-শক্তির সৃষ্টি করতে পারি। রোণ্টজেনের আবিষ্কৃত এক্সরের সাহায্যে নিখুঁতভাবে আমরা রোগের অবস্থা নির্ণয় ও রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। ব্রেমার প্রবর্তিত স্যানাটোরিয়ম চিকিৎসার দ্বারা রোগীকে মুক্ত বাতাসে রেখে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিয়ে এবং পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে রীতিমত আরোগ্য করতে না পারলেও তৎক্ষণাৎ তার অগ্রগতি স্থগিত করে দিতে পারি। অবশেষে ফোরলানিনি প্রবর্তিত অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা রোগটিকে সম্পূর্ণই আরোগ্য করে ফেলতে পারি। সুতরাং যে রোগকে এক সময় লোকে শিবের অসাধ্য বলেই বিবেচনা করতো, তার সে প্রতাপ এখন আর কোথায় রইল? সত্য বটে যে আমাদের দেশে এই রোগের সম্বন্ধে যে বদ্ধমূল বিভীষিকা রয়ে গেছে তা এখনও তেমনভাবে ঘোচেনি। তার কারণ আর কিছুই নয়, এক্সরে পরীক্ষার উপকারিতা এখনও সকলের কাছে তেমন হৃদয়ঙ্গম হয়নি, স্যানাটোরিয়ম-নির্দিষ্ট বিধানগুলি এখনও চিকিৎসকদের মধ্যেই তেমনভাবে প্রচলিত হয়নি, আর আধুনিক চিকিৎসা এখনও সকলের পক্ষে সুলভ হয়নি। কিন্তু আর বেশিদিন আমাদের দেশেও এমন অবস্থা থাকবে না।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গত ৩১শে ডিসেম্বর হাওড়ায় বাঙলার মিউনিসিপ্যালিটিগুলির চেয়ারম্যান প্রভৃতির যে সভা হয়, তাহাতে বাঙলার অন্যতম সচিব মিস্টার মহম্মদ আলীকে সভার উদ্বোধন করিবার জন্য আহবান করা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন সে সকল বিবেচনা করিলে বাঙলার লোকের আশঙ্কার কারণ দেখা যায়। তিনি বলিয়াছেন:—

(১) মিউনিসিপ্যালিটিগুলির পক্ষে আর্থিক ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে হইবে—সরকার আর তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন না। কারণ—

(ক) বাঙলা সরকার যে সকল ব্যয় করিতে বাধ্য সেই সকলও তাঁহাদিগের পক্ষে সম্পন্ন করা দুষ্কর;

(খ) বাঙলা সরকার এতদিন গ্রামের উন্নতি সাধনে অনবহিত ছিলেন, এবার সেই দিকে মন দিবেন;

(গ) মিউনিসিপ্যালিটিগুলি স্বাধীনতা দাবী ও সম্ভোগ করেন—সরকারের অর্থ সাহায্যে নির্ভর করা সে স্বাধীনতার বিরোধী।

(২) বাঙলা সরকার নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের পরিবর্তন করিবার বিষয় গবেষণা করিতেছেন:—

(অ) ছোট ছোট মিউনিসিপ্যালিটির সম্মেলন।

(আ) মিউনিসিপ্যালিটিতেও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রাখিবার উপায় নির্ধারণ।

বাঙলা সরকারের আর্থিক অবস্থা বাঙলার করদাতাগণের অজ্ঞাত নাই। বাঙলা সরকার মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে যে যুক্তি দিতেছেন, আপনাদিগের পক্ষেও যে তাহা প্রযোজ্য তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন। কারণ, বাঙলা সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনশীল বলিয়াই কেন্দ্রী সরকার কলিকাতার ও পূর্ববঙ্গের ব্যাপারে তাঁহাদিগের অবলম্বিত নীতিতে হস্তক্ষেপ করেন নাই; কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের ব্যয়ের জন্য কেন্দ্রী সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা সরকারের ব্যয় যেভাবে বর্ধিত করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বিহারের যে সকল মুসলমানকে বাঙলায় আনা হইয়াছে, তাহাদিগের জন্য বাঙলা সরকার অকাতরে যে অর্থ ব্যয় করিতেছেন এবং সে জন্য যে স্বতন্ত্র দপ্তর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি না, তাহা বাঙলার [illegible]তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারে। বাঙলা বলিতে যখন বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা বুঝাইত, তখন যে শাসন ব্যয় হইত তাহার সহিত আজ কেবল বাঙলার শাসন ব্যয়ের তুলনা করিয়াই আমাদিগের উক্তি বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙলা সরকার খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও বৎসর বৎসর অর্থ-ব্যয় করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু তাহার ফলে বাঙালী উপকৃত হয় নাই—চাউলের মূল্য সম্প্রতিও বর্ধিত হইয়াছে, নিত্য ব্যবহার্য সরিষার তৈলের একান্ত অভাব, বস্ত্রাভাব সমভাবেই লোককে বিব্রত করিতেছে।

এই অবস্থার সহিত রোলাণ্ড কমিটির মন্তব্যের সম্বন্ধ আছে কি না, সে বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করিয়া প্রতীকারের উপায় অবলম্বিত হইয়াছে কি না, তাহা বাঙলার লোক জানিতে পারে নাই। সেই সরকারী কমিটির মন্তব্য:—

"অনাচার (অর্থাৎ উৎকোচ দান ও গ্রহণ ইত্যাদি এত বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং তাহা নিবারণ অসম্ভব, এইভাব যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমরা মনে করি, তাহা দূর করিবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন না করিলে হইবে না—এই অনাচার জনগণের ও সরকারী চাকরীয়াদিগের নৈতিক অবনতি ঘটাইয়াছে।"

এই নৈতিক অবনতির বিষয় দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনও উল্লেখ করিয়াছিলেন। সরকারী চাকরীয়া নিয়োগে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব কি ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না?

বাঙলা সরকার ব্যয় সঙ্কোচের উপায় অবলম্বন না করিলে উপায় কোথায়? অথচ তাঁহারা যে তাহা করিয়াছেন বা করিতেছেন, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন যে বাঙলার রাজস্ব হইতে বাঙলার আর্থিক উন্নতিকর কোন ব্যাপক ব্যবস্থা হইতে পারিবে, এমন মনে করা দুষ্কর। বাঙলার লোকের আর্থিক অবস্থার স্থায়ী উন্নতি সাধিত না হইলে তাহারা অধিক রাজস্ব প্রদান করিতেও পারিবে না।

বাঙলা সরকার যে সময়ে বলিয়াছেন, তাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন না, সে সময় সে কথা বলিবার পক্ষে অসময়। তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ, গত যুদ্ধের সময় কয় বৎসর সামরিক কার্যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির অনেক রাস্তা সামরিক যানের ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং সংস্কারের উপকরণের অভাবে সংস্কারাভাবে জীর্ণও হইয়াছে। অথচ সচিব সে কথা না বলিলেও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বলিয়াছেন—কেন্দ্রী সরকার বলিয়াছেন ক্ষতির জন্য সামরিক বিভাগ ক্ষতিপূরণ করিবেন না— মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ যেন প্রাদেশিক সরকারকে "ডেভেলপমেণ্ট" তহবিল হইতে সেজন্য টাকা দিতে বলেন। কিন্তু সেই অতিরিক্ত টাকা দেওয়া ত পরের কথা বাঙলা সরকার মিউনিসিপ্যালিটিগুলির প্রাপ্য ও প্রতিশ্রুত টাকা দিতেছেন না। তাঁহারা যানের কর হইতে যে টাকা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে দিয়া থাকেন তাহাও যুদ্ধের সময় দেন নাই; বলিয়াছিলেন যখন উপকরণ সুলভ হইবে তখন দিবেন, ততদিন টাকা সরকারের কাছে মজুত থাকিবে। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, উপকরণও পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সরকারের তহবিলে যে টাকা জমা আছে, তাহা এখনও পাওয়া যায় নাই। এদিকে অন্য যে আয় আছে, তাহা হইতেই মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে রাস্তার অনিবার্য সংস্কারও করিতে হইয়াছে; মিউনিসিপ্যালিটির হাত শূন্য। এমন যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির পক্ষে আগামী বৎসরের জন্য রাস্তা রচনার ও সংস্কারের বাজেট প্রস্তুত করাও অসম্ভব হইতেছে।

সচিব যে এ বিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই তাহাতে মনে হয়, তাঁহার বলিবার কিছু নাই। কাজেই যে স্থানে কথা বলা রৌপ্যের মত, সে স্থানে নির্বাক থাকা স্বর্ণের মত মনে করিয়া তিনি নির্বাক ছিলেন।

বাঙলা সরকার যে এতদিনে গ্রামের দিকে দৃষ্টি দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাহা সুখের বিষয় হইলেও বিস্ময়ের বিষয়, সন্দেহ নাই। কারণ, গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ঔদাসীন্য অসাধারণ। গ্রামের স্বাস্থ্য, শিল্প, পানীয় জল, চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা সকলেরই অভাব। সে আজ অনেক দিনের কথা, কংগ্রেসকে নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে বড়লাট লর্ড ডাফরিন বলিয়াছিলেন—যে দেশে লোক যে পুষ্করিণীতে স্নান করে, তাহারই জল পান করে, সে দেশে সংস্কারের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক—তবে সে সংস্কার রাজনৈতিক নহে। কিন্তু এ পর্যন্ত সরকার গ্রামে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থাই যে করেন নাই তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রতি থানায় একটি করিয়া ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হয় নাই। নদী

পুষ্করিণী কচুরী পানায় পূর্ণ। অথচ গ্রামেই অধিক লোক বাস করে। কাজেই পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধন চেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষে গ্রাম জনশূন্য হইয়াছিল, তখন গ্রাম গঠনের দিকে সরকার মনোযোগ দেন নাই। কাজেই মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, গ্রামের উন্নতি সাধন করিতে হইলে শহরকে গ্রামে পরিণত করা বুঝায় না। শহরেরও প্রয়োজন আছে এবং শহরেরও উন্নতি সাধন প্রয়োজন। সে উন্নতি ব্যয়সাপেক্ষ।

মিউনিসিপ্যালিটি স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান। আমরা আশা করি সচিব মিস্টার মহম্মদ আলী সরলভাবেই একথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির সচিব-চেয়ারম্যানের সম্বন্ধে অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার আয়োজন হইলে যে হাওড়ার পক্ষ হইতে হাই কোর্টে নালিশ করিয়া সচিবকে রক্ষা করিবার জন্য প্রচারিত গভর্নরের মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা হরণের আদেশ বাতিল করা হয়, সে বিষয়ের কোন ইঙ্গিত ই উক্তিতে নাই। কিন্তু প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্তশাসনশীল হইলেও তাহার কর্তব্য পালন জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় এবং স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব থাকে। সে সকল দায়িত্ব অর্থাভাব ঘটিলে মিউনিসিপ্যালিটি কিরূপে পালন করিবেন? সেইজন্য মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বলিয়াছেন, আমোদ-কর প্রভৃতি যে সকল করের আয় শহর হইতেই অধিক পাওয়া যায়, সে সকল করের অধিক অংশ মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রদান করা সঙ্গত।

কিন্তু বাঙলা সরকারের অর্থাভাব। কাজেই সচিব সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার কোন উপায়ও সরকার অবলম্বন করেন নাই। সচিবের সংখ্যা বর্ধিত হইতেছে—সঙ্গে সংগে কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি অনিবার্য। সচিবদিগের বেতনও অল্প নহে। কাজেই যখন শহরের বা মফঃস্বলের জনকল্যাণকর কার্যের জন্য অর্থ দিতে বলা হয়, তখনই শুনিতে হয়—

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী—
তোমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।"

দেশের উন্নতি কিরূপে হইবে, তাহা বলা যায় না—আপাতত লোকের পেটে ভাত ও পরণে কাপড় নাই। বাঙলা সরকারের সুব্যবস্থায় মাথার তেলও দুষ্প্রাপ্য হইল।

তবে গত ২৭শে ডিসেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে, দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য বাঙলার সরকার ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। এই অর্থ জাতিধর্মনির্বিশেষে দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদিগের জন্য নহে—কেবল মুসলমান দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদিগের জন্য।

বাঙলা সরকার ছোট ছোট মিউনিসিপ্যালিটির সচিবদল ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কর্মচারীর নিয়োগ সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ করিতে চাহিতেছেন। একদিকে মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বায়ত্তশাসনশীল বলিয়া অর্থ সাহায্য প্রদানে অসম্মতি—অর এক দিকে তাহাদিগের প্রধান কর্মচারীর নিয়োগও সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ করা কিরূপ অসংগতির পরিচায়ক, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু বাঙলা সরকারের সচিবদিগের সে বিষয় বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কর্মচারীর নিয়োগ সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ করা কেবল মিউনিসিপ্যালিটির স্বাধীনতা নষ্ট করা। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মচারীর নিয়োগ সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ। আমাদিগের মনে আছে, যখন কর্পোরেশন সুভাষচন্দ্র বসুকে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব সরকারের অনুমোদন জন্য প্রেরিত হয়, তখন য়ুরোপীয় রাজকর্মচারীরা তাহাতে আপত্তি করিলে লর্ড লিটন সে বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন এবং ভূপেন্দ্রবাবু পরামর্শ দেন স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানে বহুমতে গৃহীত প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করা সরকারের অকর্তব্য। লর্ড লিটন সেই মতানুসারেই কাজ করিয়াছিলেন।

প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির সমস্যা স্বতন্ত্র। কাজেই জলের কল হইতে জল সরবরাহ প্রভৃতি ব্যাপারে কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটিকে সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে গিয়া তাঁহাদিগের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করাই সঙ্গত। আয়ার্লণ্ড যখন "হোম রুল" চাহিয়াছিল, তখন বিলাতের একদল লোক বলিয়াছিলেন, যে দেশপ্রেম দরিদ্র জাতিকে সুষ্ঠুভাবে না হইলেও স্বায়ত্তশাসনে আগ্রহান্বিত করে, অথচ বৃহৎ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে দিতে চাহে না, আইরিশরা সেই দেশপ্রেমের দ্বারাই প্রণোদিত। কিন্তু সেই দেশপ্রেমই আইরিশদিগকে স্বাধীন করিয়াছে। তেমনই প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির অধিবাসীরা যদি স্বায়ত্তশাসনের আগ্রহে কাজ করেন, তবে তাহা প্রশংসনীয়ই বলিতে হয়। প্রতিবেশী মিউনিসিপ্যালিটিরা পরস্পরের সহিত সহযোগ করিতে পারেন—সেজন্য স্বাতন্ত্র্য বর্জনের প্রয়োজন হয় না। কাজেই সরকারের প্রস্তাব আপত্তিজনক।

আর সরকার যে মিউনিসিপ্যালিটিতেও সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন, তাহা তাঁহাদিগের অনুসৃত ভেদনীতিরই পরিচায়ক। লর্ড মিণ্টো যখন ঐ নীতির প্রবর্তন করেন, তখন তিনি মুসলমানদিগকে বলিয়াছিলেন, সকল প্রতিষ্ঠানেই যে তাঁহারা স্বতন্ত্র নির্বাচন চাহেন, সে সম্বন্ধে তিনি তাঁহাদিগের সহিত একমত। এখন সেই নীতিরই প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। অথচ মিউনিসিপ্যালিটিতে যখন কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া লোকক্ষয় করে, তখন তাহারা সেজন্য কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে বাছিয়া লয় না। কিন্তু যদি মিউনিসিপ্যালিটির মত প্রতিষ্ঠানেও সদস্য নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার লাভ ঘটে, তবে তাহার ফলে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে দায়িত্ব লঘু মনে করিতে থাকেন। কাজেই যাহাকে যৌথ দায়িত্ব বলা যায়, তাহা যে প্রথায় ক্ষুণ্ণ হয়, সে প্রথা পরিত্যাজ্য। অথচ বাঙলা সরকার আজ সাম্প্রদায়িকতার মোহে যৌথ দায়িত্ব ক্ষুণ্ণ করিবার উপায়ই অবলম্বন করিতেছেন।

সচিব মিস্টার মহম্মদ আলী সরকারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে সকল অবগত হইয়া বাঙলার লোকের পক্ষে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

মিউনিসিপ্যালিটিগুলি দেশে স্বায়ত্তশাসনের অনুশীলনে সহায় হইবে, ইহাই লোকের অভিপ্রেত। কিন্তু সচিব মিস্টার মহম্মদ আলীর উক্তিতে মনে হয়, তাহা বাঙলা সরকারের অভিপ্রেত নহে।

বাঙলায় মিউনিসিপ্যালিটিগুলির যে ত্রুটি নাই, এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি লোকমতের দ্বারাই সংশোধিত হয়; সেজন্য বাহিরের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা ভারত সরকার স্বীকার করিয়াছেন—বলিয়াছেন, স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান ভুল করিয়া ভুলের ফলভোগ করিয়া উপকৃত হইবে, তাহাও বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বিশেষ দোষ ব্যতীত তাহার কার্যে বাহিরের অর্থাৎ সরকারের হস্তক্ষেপ সমর্থনীয় নহে।

আজ যে বাঙলা সরকার মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কর্মচারীর নিয়োগ তাঁহাদিগের অনুমোদন-সাপেক্ষ করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে কেন্দ্রী সরকারের স্বীকৃত সেই নীতিই পদদলিত করা হইতেছে।

স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করিয়া যদি আপনারা—সচিবাদির বিশেষ যে স্থানে সচিবসংঘ সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট সেই স্থানে সচিবাদির সহযোগ নিরপেক্ষ হইয়া আপনাদিগের অভাব-অভিযোগের আলোচন করেন এবং সরকারের নিকট কোন বিষয় জানাইতে হইবে একযোগে তাহা করেন, তবে যে তাঁহাদিগের শক্তিবৃদ্ধি, আত্মসম্মানজ্ঞানের অনুশীলন ও কর্মদক্ষতা প্রতিপন্ন হয়, তাহা অনায়াসে বলা যায়। আমরা সেইজন্য আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহারা সংঘশক্তির বৃদ্ধির চেষ্টাই করিবেন।

পাকিস্তান সমস্যা

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলিম—এই দুইভাগে বিভক্ত করিবার দাবী করে। লীগ চায় যে, এই দুইটি অঞ্চলই স্বাধীন রাষ্ট্র হইবে এবং স্ব স্ব রাষ্ট্র-রক্ষার ব্যবস্থা ও পররাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবে। তাঁহাদের দাবীর সমর্থনে তাঁহারা বলেন যে মুসলমানেরা হিন্দু ও ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ নেশন। এই মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে লীগ নিম্নলিখিত প্রদেশগুলি অন্তর্ভুক্ত করিতে চায়—উত্তর-পশ্চিমে বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পূর্বে বাঙলা ও আসাম। তাঁহারা বলেন যে এই দাবী মানিয়া লইলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার স্থায়ী ও সন্তোষজনক সমাধান হইবে। তাঁহাদের পরিকল্পনাতে মুসলিম রাষ্ট্রে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠদের এবং হিন্দু রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের একই প্রকারের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে।

হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক্ নেশন কি না এ-প্রশ্ন বিবেচনা করিবার পূর্বে নেশন বলিতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। নেশন এই শব্দটি দুইটি বিশিষ্ট, বস্তুতঃ দুইটি স্বতন্ত্র মৌলিক মনোভাব প্রকাশ করে। পৃথক্ পৃথক্ কারণ হইতে এই মনোভাবের উদ্ভব হইয়াছে—পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐ মনোভাব প্রযুক্ত হইতে পারে। কাজেই ঐ শব্দটি সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। ঐ দুইটি মনোভাবের একটিকে বলা যাইতে পারে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জাতিত্ব (nationality) বোধ। এই জাতিত্ববোধের ভিত্তি হইল ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য প্রায়ই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ও সাধারণত বস্তুগত। বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘের (League of Nations) চুক্তিপত্রে যাহাকে সংখ্যালঘিষ্ঠদের ত্রিগুণ অর্থাৎ বংশ, ভাষা ও ধর্ম বলা হইয়াছে, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি তাহারই অন্তর্ভুক্ত। সি এ ম্যাকার্টনী বলেন, এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে শুধু বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের কোনই রাজনীতিক সার্থকতা নাই। অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, জেনিভা অথবা হল্যাণ্ডের একজন জার্মান—সন্দেহ নাই দিয়াই জার্মানও বটে, বার্লিনের নাগরিকও বটে। নেশনের রাষ্ট্ররূপ পরিকল্পনা ইহা হইতে সম্পূর্ণ অন্য রকমের।

রাষ্ট্র (State) কি?

বহু লোকের সাধারণ কাজগুলি যে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহাকে বলা হয় রাষ্ট্র। তাহাদের কাজের কোন কোন বিষয় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে, তাহা লইয়া যুগে যুগে ও দেশে দেশে প্রচুর পার্থক্য দেখা গিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল দেশরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া আর বেশি কিছু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, আবার কোথাও-বা এক ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপার ছাড়া জীবনের আর সব ব্যাপারই রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যে সমস্ত বিষয় লইয়া ব্যক্তিগত জাতিত্বের সৃষ্টি সেগুলি সম্বন্ধেই রাষ্ট্র সর্বশেষে দৃষ্টি দিয়া থাকে। আজকালও অনেকেই মনে করেন যে, ঐগুলি রাষ্ট্রের এলাকার বাহিরে। রাষ্ট্রকে যেসব কর্তব্য পালন করিতে হয়, তাহার অধিকাংশের সঙ্গেই ব্যক্তিগত জাতিত্বের কোন সম্পর্ক নাই। আজিকার দিনেও উহাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের এলাকার বাহিরে থাকিয়া প্রধানত মনে করা হয়। কারণ রাষ্ট্রকে যে সমস্ত কাজ করিতে হয়, তাহার সঙ্গে ব্যক্তিগত জাতিত্বের কোনই সম্পর্ক নাই। বংশ (race), ভাষা ও ধর্ম প্রভৃতি যেগুলি ব্যক্তিগত জাতিত্বের বৈশিষ্ট্য, সেগুলি কদাচিৎ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কাজ হইল দেশরক্ষার ব্যবস্থা, জনসাধারণের মধ্যে শান্তিরক্ষা, অপরাধ অনুষ্ঠান নিবারণ করা ও অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া, রাস্তা-ঘাটাদি নির্মাণ করিয়া সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা, কর ধার্য করা ও তাহা আদায় করা।

এক জাতি, এক ভাষা

এই সকল দিক দিয়া যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানেরা রাজনীতিক অর্থে দুই নেশন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমানের ব্যক্তিগত জাতিত্বের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে পৃথক্ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইতে পারে না। তাহাড়া তাহারা এক নেশন বা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহাই আছে, বিশেষ করিয়া ইংরেজ শাসনকালে তাহারা সেইরূপ আ[...]

আমরা যদি বংশ, ভাষা ও ধর্মের মান[...] দিয়া বিচার করি এবং উহাদের [...] প্রতিক্রিয়ার যে সমন্বিত ফল, যাহাকে বলা [...] সংস্কৃতি, সেদিক দিয়া যদি দেখি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দু ও মুসলমান যে ভাষায়ই কথা বলুক না কেন, তাহারা এক[...] বংশের অন্তর্গত। ভাষার বিভিন্নতা প্রদেশে প্রদেশেই হয়, বক্তার ধর্ম অনুসারে হয় না। পাঞ্জাবের হিন্দু, মুসলমান ও শিখেরা পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলে, সিন্ধুতে তাহারা কথা বলে সিন্ধী ভাষায়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পুস্তো ভাষায়, আর বেলুচিস্তান বালুচি [...] পুস্তো ভাষায়। তেমনই বাঙলা এবং আসামের কতকাংশের (যেখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ) হিন্দু ও মুসলমানেরা একই ভাষা অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় কথা বলে। এই সমু[...] ভাষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ভারতে মুসলমানদের ভাষা থাকিয়া যেমন [...] সাধারণ পৃথক ভাষা নাই, তেমনি পৃথক [...] বংশও নাই। বরং হিন্দুদের আর তাহাদের বংশ, ভাষা ও সংস্কৃতি একই। তাহাদের [...] শুধু পৃথক।

কাজেই আমরা দেখিতে পাইতেছি [...] প্রতি প্রদেশে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের ব্যক্তিগত জাতিত্ব একই। প্রদেশভেদে [...] জাতিত্ব পার্থক্য আছে, কিন্তু ধর্মভেদে [...] পার্থক্য নাই। মুসলিম শাসনকালে তাহাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও একই ছিল, সে কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্যেই হউক বা দিল্লীর সম্রাটের সার্বভৌমত্বের অধীনেই হউক। ব্রিটিশ শাসনকালে এই সাধারণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অস্তিত্ব আরও স্পষ্ট ও নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক ব্যক্তিগত জাতিত্ব থাকা সত্ত্বেও তাহা[...] যে দুইটি পৃথক্ নেশন এবং তাহাদের দু[...] স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রয়োজন, রাজনীতিক অ[...] একথা কিছুতেই বলা চলে না।

বিবর্তন

হিন্দু ও মুসলমানের আট শতাব্দী অধিককালব্যাপী সম্বন্ধের ফলে যে সাধা[...] সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ঠিক হি[...] সংস্কৃতিও নহে, মুসলিম সংস্কৃতিও নহে, উহা এক সম্মিলিত হিন্দুস্থানী সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিই ভারতীয়দের—হিন্দুই [...] আর মুসলমানই হউক—ইউরোপীয়, আমেরি[...] চীনা বা জাপানীদের হইতে পৃথক চিনাইয়া দেয়। হিন্দু-মুসলমানের এই [...] ও সংস্কৃতির ইতিহাস একটি প্রবন্ধের [...] আলোচনা করা সম্ভব নহে। সংগীতে ও [...]

ত্র ও ভাস্কর্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত ন. উভয়ের জন্য এক ভাষার সৃষ্টি ও রিপুষ্টি. একের অন্যের নিকট হইতে ন্দে ও উদারভাবে ভাব গ্রহণ; জন্ম, বিবাহ মৃত্যুর ব্যাপারে একই প্রকারের অনুষ্ঠান ও য়া, এক ধর্মের সাধুসন্ত ও মরমীদের অপর র্মের লোকেদের উপর প্রভাব; সাধুসন্ত ও মীদের উভয় ধর্মের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ রিয়া তাহাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা—এই লগুলিই এক সাধারণ সংস্কৃতির বিবর্তন হিন্দু, মুসলমান, ভারতের অন্যান্য বাসীদের লইয়া এক ভারতীয় জাতি গঠন ম করিয়া তুলিয়াছে। বৈদেশিক শাসন কে আরও দৃঢ়ই করিয়াছে। জুলিয়ান লীর ভাষায় ভারতের "জাতীয় বিবর্তনের বাহিরের এই চাপ সর্বাপেক্ষা বেশি কর হইয়াছে।"

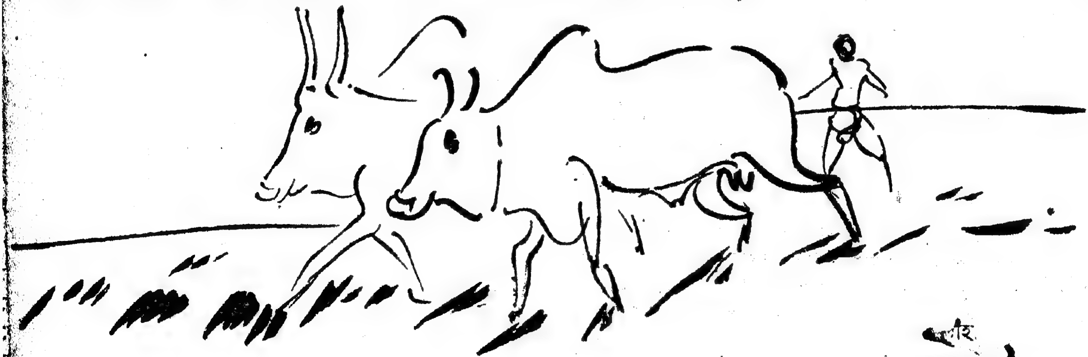
তাৎপর্য বিশ্লেষণ

তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যাক যে, নীতিক অর্থেই হিন্দু ও মুসলমান দুইটি ক জাতি (nation)। এই দুই পৃথক্ ত্ত্বের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যাক। দুই ক্ জাতির অর্থ তাহা হইলে এই দাঁড়ায় বাসস্থাননির্বিশেষে সমস্ত ভারতের লমানেরাই এক জাতির অন্তর্গত এবং এই ত হিন্দু জাতি (nation) হইতে পৃথক্। হিন্দু অঞ্চল হইতে মুসলিম অঞ্চল ক্ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই ক রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাহা হইলেও তাহারা লিম জাতিরই (nation) অন্তর্ভুক্ত বে। তাহা হইলে হিন্দু রাষ্ট্রে যেসব মান থাকিয়া যাইবে, তাহাদের অবস্থা হইবে? তাহারা একটি স্বাধীন পৃথক র—মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক বা লোক া হিন্দু রাষ্ট্রের একজন নাগরিক বা লোকের মর্যাদার দাবী করিতে পারে না। তাহারা লিম রাষ্ট্রের লোক; কাজেই তাহারা হিন্দু র লোকেদের মর্যাদা দাবী করিতে পারে তাহারা হিন্দু রাষ্ট্রে বিদেশী বলিয়া গণ্য । কাজেই তাহারা বিদেশীদের প্রাপ্য অধিকার ও সুবিধাই (সে আধকার ও সুবিধা যাহাই হউক না কেন) সে পাইবে হিন্দু রাষ্ট্রের অধিবাসীদের অধিকার ও সুবিধা নহে। দেশের শাসনকার্যে বিদেশীদের স্থান থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রে কোন চাকুরীই সে দাবী করিতে পারে না। আইনত তাহাকে রাষ্ট্রের যে কোন অঞ্চল হইতে বহিষ্কৃত করা যাইতে পারিবে। যে রাষ্ট্রের সে লোক এবং যে রাষ্ট্রে সে প্রবাসী—এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধিসর্ত অনুসারে যে সকল অধিকার ও সুবিধা এক রাষ্ট্রের লোক অপর রাষ্ট্রে পাইবে বলিয়া স্থির হইবে, সেই সকল অধিকার ও সুবিধাই কেবল সে দাবী করিতে পারিবে; এইরূপ সন্ধিপত্রে সাধারণত সেই সকল ব্যক্তির নিরাপত্তা এবং কখনও কখনও বাণিজ্যের সুবিধার ব্যবস্থা থাকে। উহাতে রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী বা শাসনকার্য পরিচালনার কোন অংশ গ্রহণের অধিকার কখনই থাকে না। এই যে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও বাণিজ্যিক সুবিধার চুক্তি তাহাও পারস্পরিক সুবিধার সম্ভাবনা থাকিলেই সাধারণত করা হয়।

হিন্দু ও মুসলমান পৃথক্ জাতি, ইহা যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দু রাষ্ট্রে মুসলমানেরা এবং মুসলিম রাষ্ট্রে হিন্দুরা যদি মুসলিম বা হিন্দু জাতীয়তাকে পরিত্যাগ করিয়া যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান রাষ্ট্রের জাতীয়তা গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার ও সুবিধাও দাবী করিতে পারিবে না। এখন মুসলমানদের যেসব সুবিধা ও স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ তখন আর তাহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে না তাহারা হইবে অন্য রাষ্ট্রের লোক। অনুরূপভাবে হিন্দুদের যদি বর্তমানে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসাবে কোথাও কোন সুবিধা ও স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকিয়া থাকে, মুসলিম রাষ্ট্রে তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে।

তর্কের খাতিরে যদি আরও ধরিয়া লওয়া যায় যে, হিন্দু ও মুসলমান রাষ্ট্রের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সন্ধিতে এইরূপ স্থির হইল যে, হিন্দু ও মুসলমানেরা একে অপরের রাষ্ট্রে বিদেশী বলিয়া পরিগণিত হইলেও চাকুরী পাইবে বা আইনসভায় যাইতে পারিবে (যদিও বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও এইরূপ ব্যবস্থা নাই), তথাপি হিন্দুদিগকে যদি অনুরূপ সুবিধা ও অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ মুসলিম রাষ্ট্রে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে হিন্দু রাষ্ট্রে মুসলমানেরা সুবিধা ও অতিরিক্ত আসনের দাবী করিতে পারিবে না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু ব্যতীত মুসলিম রাষ্ট্রের অন্যত্র হিন্দু মুসলমানের সংখ্যার যে হার তাহাতে মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে হিন্দুদের বিশেষ সুবিধা বা আইন সভায় বেশী আসন দেওয়া সম্ভব নহে। কাজেই মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে ঐরূপ সুবিধা দেওয়া না হইলে হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষেও তাহা দেওয়া সম্ভব হইবে না। বস্তুতঃ মুসলমানেরা এখন পৃথক নির্বাচনের সুবিধা পায়, তাহা ছাড়া আইনসভাসমূহে তাহারা অতিরিক্ত আসন পায় এবং সরকারী চাকুরীতে যে সংখ্যায় নিযুক্ত হয় তাহা সমগ্র জনসংখ্যায় তাহাদের অনুপাত অপেক্ষা অনেক বেশী। হিন্দুরা কোথাও পৃথক নির্বাচনের সুবিধা পায় নাই এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু ব্যতীত অন্য কোথাও অতিরিক্ত আসনও পায় নাই। পৃথক রাষ্ট্র হইলে ঐ দুইটি প্রদেশের ১৪ লক্ষের মত হিন্দু (সিন্ধুতে ১২·২৯ লক্ষ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১·৮০ লক্ষ) আইনসভাগুলিতে তাহাদের অতিরিক্ত আসন এবং সরকারী চাকুরী হারাইতে পারে, কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্রে যে ২ হইতে ৩ কোটি মুসলমান থাকিবে তাহারাও হিন্দু রাষ্ট্রের লোক না হওয়ার দরুণ ঐ সকল সুবিধা পাইবে না। অপরপক্ষে বাঙলা দেশের হিন্দুরা তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় যত আসন পাওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা কম আসন পাইতেছে। যদি লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় তাহা হইলে তাহারা লাভবান হইতে পারে।

(ক্রমশ)

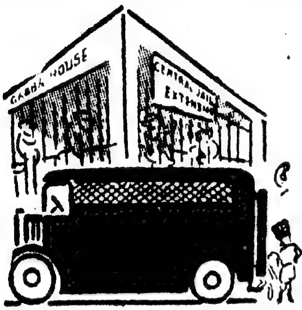




পাঠক যখন ট্রামে-বাসের এই সংখ্যাটি পাঠ করিবেন তখন ইংরেজী নববর্ষের উৎসব শেষ হইয়া যাইবে সুতরাং এখানে নববর্ষে Happy হওয়ার প্রার্থনা জ্ঞাপনের কোন অর্থ হয় না। কিন্তু ট্রামে-বাসে আমাদের সীটের সমস্যা চিরন্তন; বৎসরের যে-কোন সময় সীটের সৌভাগ্য কামনা নিরর্থক নয়, তাই আমরা পাঠক ও পাঠিকার সেই সৌভাগ্য কামনা করিয়াই নূতন বছরে যাত্রা করিলাম।

* * *

ষ্টেটসম্যানের রবিবাসরীয় রিপোর্টার জানাইতেছেন—"বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে, আলীপুরের চিড়িয়াখানার জন্তু জানোয়ারগুলিকে আবার চিড়িয়াখানায়



ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।" আমরা সত্যই জানিতাম না। যাহা হউক জানিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আশা করি, অতঃপর কলিকাতার রাজপথে জন্তুজানোয়ারের উপদ্রব থামিয়া যাইবে।

* * *

অতলান্তিক এবং কৃষ্ণসাগরের সীমা পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপকে একটি যুক্তরাষ্ট্রে সম্মিলিত হইবার জন্য মিঃ চার্চিল আবেদন জানাইয়াছেন এবং সংগে সংগে বলিয়াছেন—ইহাতে এশিয়া এবং রাশিয়ার ভয়ের কোন কারণ নাই—"অর্থাৎ ঠাকুর ঘরে থাকিয়াও তিনি যে কলা খাইতেছেন না এই কথাটা তিনি আগে-ভাগেই এশিয়া ও রাশিয়াকে জানাইয়া দিলেন"—এই কথাটাও যে খুড়োর তা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না।

* * *

নূতন বৎসরে কপালে কি যে লেখা আছে বলা শক্ত। ঘুম হইতে উঠিয়া খবরের কাগজখানাতে চোখ বুলাইতেই মস্ত বড় একটি দুঃসংবাদ চোখে পড়িল—নববর্ষে বৃটিশ ভারতে ভারতীয়দের খেতাব প্রদানের ব্যবস্থা নাকি বাতিল হইয়া গেল। এই প্রচেষ্টার মূলে নাকি আছেন অন্তর্বর্তী সরকার। "লীগের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা ছাড়া এই দূরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টার" আর কোন মানে হয় কি? কথাটি বলেন আমাদের বিশুখুড়ো।

* * *

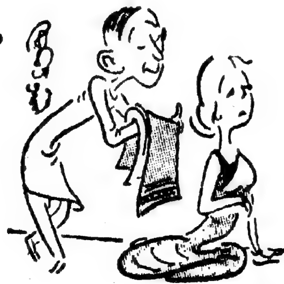
প্রতি হাজার ইষ্টকখণ্ডের সর্বোচ্চ মূল্য পঁয়ষট্টি টাকা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। চৌমুহনীতে পণ্ডিত নেহরুর কপালে যে ইষ্টক খণ্ডটি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তার দাম নিরূপণ করা বোধ হয় দুঃসাধ্য, কেন না এই ইটখানা নিশ্চয়ই সরবরাহ করিয়াছে চোরা কারবারীরা!

* * *

ডিসেম্বরের ত্রিশ তারিখ হইতে নাগরিকদের মাথা পিছু এক পোয়া সরিষার তেলের বরাদ্দ হইয়াছে। এই নিয়া অনেকেই দুঃখ করিয়া বলিতেছেন এবং লিখিতেছেন—এক পোয়া মাত্র তেল, খাইবই বা কি, আর মাখিবই বা কি। কিন্তু আমাদের বিশুখুড়ো বলেন—"নাকে দিয়া ঘুমাইবার পক্ষে এক পোয়া তেলই যথেষ্ট নয় কি?" আমরা খুড়োর কথাটির প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না, ঘুমের আশাতেই বুঝি দুই চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিল!

* * *

একটি সংবাদে দেখিলাম কোন কোন চোরা-কারবারী নাকি বোম্বাই হইতে কলিকাতায় ঔষধের নাম করিয়া মিলের শাড়ী পাঠাইয়াছে।



আমরা চোরাকারবারীদের এই অভিনব ফন্দীর কথাটা ভাবিয়াই হাসাহাসি করিতেছিলাম। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এর মধ্যে হাসাহাসির কিছু নাই, ক্ষেত্র বিশেষে মিলের মিহি শাড়ীও ঔষধের মতই কাজ করে, কলিকাতায় এ ঔষধ না মিলিলে উন্মাদ রোগ যে অনিবার্য এ খবর বোধ হয় তারা সংগ্রহ করিয়াছিল!"

* * *

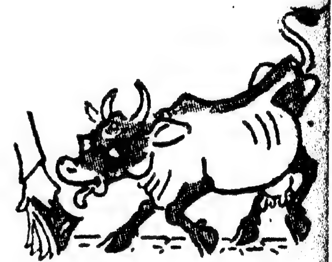
প্রসংগত গুড়ের কথাও আসিয়া পড়ে। শুনিলাম দিল্লীতে গুড়েরও সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। শাস্ত্রে মধুর অভাবে গুড়ে পূরণ করার একটি নির্দেশ ছিল—এইবারে সেই গুড়েও বালি পড়িল।

* * *

বর্মার Aung San তথাকার গভর্নর বাহাদুরকে নাকি Burmese Style একটি নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছেন। After dinner আলাপ-আলোচনা কি রকম হইয়াছিল খবরে তা বলা হয় নাই এবং গভর্নর বাহাদুরের বর্মার "ন্যাপ্পি" মুখরোচক হইয়াছিল কিনা সেই সম্বন্ধেও সংবাদদাতা নীরব।

* * *

নিউইয়র্কের একটি সংবাদে দেখিলাম ভুল ফুটপাথ ধরিয়া চলার জন্য একটি গাভীর নাকি পাঁচ গ্যালন দুগ্ধ-দণ্ড হইয়াছে। "দুগ্ধ



দুগ্ধ আহরণের জন্যই আমাদের দেশের অ-নৈতিক পথে অনেক গাভীকেই ভুল ফুটপথে চরানো হইতেছে"—বিশুখুড়ো ছাড়া এই কথা আর কে বলিবে?

* * *

ইংরেজী নববর্ষে স্টেটসম্যান আমাদিগকে একটি বিদেশী প্রবাদ উপহার দিয়াছেন, "Praise a horse after a month and a woman after a year."—বিশুখুড়ো বলিলেন—"খুব সত্য কথা এবং সুন্দর কথা। কিন্তু যাঁরা Slow horse এবং fast woman back করিতে অভ্যস্ত তাঁরা নিশ্চয়ই এই প্রবাদের সময়ের অনুশাসন মানিবেন না।"

বৈদেশিকা

বৈদেশিক ভারত

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে ...তের জাতীয় রাষ্ট্রনীতিতে বৈদেশিক ...ত বোধ ক্রমে বেশী করে জাগ্রত হচ্ছে: ... প্রতিনিধি দলের নেত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী ...ণ্ডত জাতিসঙ্ঘে তাঁহাদের কাজের একটা ...পোর্ট দাখিল করেছেন। সেই রিপোর্টে ...নি জানিয়েছেন যে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে, ...েষ করে প্রধান প্রধান জাতিগুলির সঙ্গে ... বিনিময় করা খুব তাড়াতাড়ি দরকার। এ ...য়ে মার্কিন রাষ্ট্র রাজী হয়েছে এবং আশা ... যায় অন্যান্য দেশও রাজী হবে। বিলেতে, ...সে ও মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ...াগের চেষ্টা হচ্ছে। খুব সম্ভব, বিলাতে ...তীয় হাই কমিশনারের পদ তুলে দিয়ে ...াম্বের রাষ্ট্রদূতের পদ সৃষ্টি করা হবে, ... এ বিষয়ে ভারতের প্রথম বিলাতী ...ত হিসেবে স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ...নিয়ে কানাঘুষো চলেছে।

...স্মরণ থাকতে পারে, ভারত সরকার কর্তৃক ...নের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কংগ্রেসী নেতা ...আসফ আলীর ও কানাডার হাই কমিশনার ...বে জাতীয়তাবাদী মুসলমান স্যার ... আহমদ খাঁর নিয়োগ মঞ্জুর হয়েছে। ...া আগেও বলেছি, 'ওয়েস্টার্ন ব্লকের' ...মার্কিন সমর্থক জাতিপুঞ্জ ছাড়াও অন্যের ...ন্য জাতিপুঞ্জের সঙ্গে (যেমন রাশিয়া, ...ন্ড প্রভৃতি) স্বাধীন দৌত্য-সম্বন্ধ ...খু আগে প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, যদি ...তীয় রাষ্ট্রনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিনের ...টিরা প্রভাবকে কিছু পরিমাণেও খর্ব ... হয়।

...রাতে যে বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক ...জাগছে, তার আর একটি পরিচয় পাওয়া ...ত ২৮শে থেকে ৩০শে ডিসেম্বর দিল্লীতে ... 'নিখিল এশিয়া ও ঔপনিবেশিক ছাত্র ...ন' থেকে। 'ঔপনিবেশিকের' মধ্যে অবশ্য ...াও পড়া উচিত। এই ধরনের সম্মেলনের ...একদিকে যেমন এশিয়া ও আফ্রিকার ... পরাধীন ও পরানত অশ্বেত জাতি-...মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐক্যবোধ ... তেমনি, ঠিকভাবে, পরস্পরের মধ্যে ...নিক সংযোগ স্থাপন করতে পারলে ... দেশেরই জাতীয় সংগ্রামের শক্তি বৃদ্ধি ...া ছাড়া, আর একটি উপকার হওয়ার ...া আছে। চীনা, মিশরী প্রভৃতি প্রকৃত ...শীল ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ... এসে ভারতীয় ছাত্রদল বুঝতে ... যে, শুধু শ্লোগানের দ্বারা দেশ ... হয় না, এবং সেইভাবে তাঁরা নিজেদের সংগঠনের ও সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি শুধরে নিতে পারবেন।

এবারকার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসেও একটি আন্তর্জাতিক বোধ দেখা দিয়েছে। এদেশের প্রতিনিধি ছাড়াও ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়া থেকে প্রতিনিধিরা এসে যোগ দিয়েছিলেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের জুবিলি অধিবেশন ছাড়া এরকম আন্তর্জাতিক মিলন ভারতের বিজ্ঞান ক্ষেত্রে বড় একটা হয় নি। বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভাবধারাতেও এবার একটু নূতনত্ব দেখা দিয়েছে।

লাহোরে সর্দার জে জে সিং একটি বক্তৃতায় বলেছেন যে আমেরিকা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল। বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশারও গত সপ্তাহে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে ভারতবর্ষের মত ও আচরণই ঠিক ও নির্ভুল। বিলাতে কয়েকজন কংগ্রেসী ও অন্যান্য বক্তা বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কংগ্রেসের তরফ থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচারকার্যে খুব জোর দেওয়া উচিত।

এই সম্পর্কে উল্লেখ করা দরকার, শ্রীযুক্তা হাতী সিং ও তাঁর স্বামীকে বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী সরকার আমেরিকায় পাঠাচ্ছেন আদায় সুমারি সম্বন্ধে টেনেসি ভ্যালির কর্তৃপক্ষের অনুসৃত প্রণালী অধ্যয়ন করবার জন্য। এই সুযোগে তাঁরা ভারতবর্ষ বিষয়ে সেখানে বক্তৃতা করবেন। আশা করি, তাঁরা শ্রীযুক্ত পণ্ডিতের মতো আমেরিকায় ভারতের ও কংগ্রেসের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিয়ে আসতে পারবেন। ৯ই জানুয়ারী তাঁদের রওনা হওয়ার কথা।

আণবিক গবেষণা

গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিটিতে আণবিক অস্ত্র ও গবেষণা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মার্কিনী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ও নিরাপত্তা পরিষদকে ঐ প্রস্তাবের দ্বারা কিছু কিছু নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবিষয়ে কোন আলোচনা করবার আগে বুঝে নেওয়া দরকার, আণবিক বোমার সঙ্গে বর্তমান আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির সম্বন্ধ কি, এবং গত এক বৎসরে আণবিক নীতিতে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে, আমেরিকারই বা এখন এত তাড়া কেন নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য।

এটম বোমার দ্বারা হিরোশিমা ধ্বংসের পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার মেজাজ গরম হয়ে উঠেছিল। মার্কিন জাতি ভেবেছিল যে তারা হাতে স্বর্গ পেয়েছে। আমেরিকার লোকে বলতে আরম্ভ করল যে, বিংশ শতাব্দীটাই হল আণবিক যুগ, এর যে নূতন সংস্কৃতি ও সভ্যতা আসছে তার ভিত্তি হবে আণবিক শক্তি, এবং এই নূতন সভ্যতার প্রবর্তক হল আমেরিকা। এমন কি, অত্যুৎসাহীর দল হিরোশিমার সভ্যতাধ্বংসী তারিখ থেকে এই নূতন মার্কিনী 'সভ্যতা'র বর্ষগণনা Atomiec Era সুরু করলেন। যেমন শকাব্দ, খৃষ্টাব্দ আছে, তেমনি একে বলা যায় অণবব্দ। খৃষ্টপূর্ব ১০৬ সালকে বলতে হবে অণুপূর্ব ২০৫১ সাল (১৯৪৫+১০৬), এবং আমরা এখন বাস করছি আণবিক দ্বিতীয় বৎসরে। হিটলারও যেমন তাঁর 'গোপন যন্ত্রশস্ত্রের' ভরসায় বিশ্ব-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমেরিকাও 'এটম বোমার' গরমে সম্ভবত ঐরূপ দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন। অবশ্য, রাশিয়া বার বার বলতে লাগল, কোনো অস্ত্র-বিশেষের দ্বারাই যুদ্ধ জেতা যায় না, যুদ্ধ করেই যুদ্ধ জিততে হয় এবং সে কাজের জন্য আরও অনেক কিছু লাগে,—কিন্তু কে কার কথা শোনে?

ঠিক হল এটম বোমার গোপন প্রস্তুত প্রণালী আমেরিকা কাউকে জানাবে না। এই হুমকিতেও এটম বোমার মারাত্মক ভয়ে ধীরে ধীরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, কানাডা প্রভৃতি ছোট বড় অনেকগুলি জাতির উপর আমেরিকার রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত হল, এমন কি বার্ট্রাণ্ড রাসেল এবং আরো অনেকে খোলাখুলি ভাবে বলতে লাগলেন যে, আমেরিকার নেতৃত্বে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির অবিলম্বে সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার, যারা রাশিয়া ও তার 'Satellite' বা উপগ্রহ জাতিগুলির তোয়াক্কা রাখবে না। এই রাশিয়ার ভয় ও এটম বোমার সাহসকে ভিত্তি করে আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি বেনামী 'ওয়েস্টার্ন ব্লক' তৈরী হয়েছে মার্কিনী নেতৃত্বে এবং ইংরেজ যার তাম্বুলবাহক বা হুঁকোবরদার মাত্র। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিতে এই আণবিক কূটনীতির নাম দিল রাশিয়া,— "এটোমিক ডিপ্লোমেসী" এবং বল্লে, এর দ্বারা কোনো কাজ হবে না, অথবা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না।

যাই হোক, গত এক বৎসরে আমেরিকার আণবিক কূটনীতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটেছে, আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিটির মার্কিনী প্রস্তাবে যার আভাস পাওয়া যায়। পাঁচ দফার এই প্রস্তাব ১০—২ ভোটে পাশ হয়েছে, রাশিয়া ও পোলাণ্ড ভোট দেয়

নি এবং রাশিয়া এর বিরুদ্ধতা করেছিল। স্মরণ থাকতে পারে, এ বিষয়ে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ মজলিশে পূর্বেই প্রস্তাব পাশ হয়ে আছে। মার্কিনী আণবিক কূটনীতিতে গত এক বৎসরের পরিবর্তন ও সেই পটভূমিকায় প্রস্তাবটির আলোচনা আগামী বারে করব।

ইন্দোচীন : ভিয়েৎনাম

গেল বারেই বলে রেখেছি, এবারে বর্মা ও ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে আলোচনা করব। গত এক সপ্তাহের মধ্যে ভিয়েৎনামের ঘটনাবলী খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখের এক রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, ফরাসী গভর্নমেণ্টের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট মঃ লিও' ব্লুম, ফরাসী ব্যবস্থাপক সভা 'ন্যাশন্যাল এসেম্ব্লি'তে ইন্দোচীন সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। তার পরই সংবাদ পাওয়া গেল ভিয়েৎনাম রিপাবলিকের সংগে সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী গভর্নমেণ্টের খুব জোর সশস্ত্র সংঘর্ষ বেধে গিয়েছে, ফরাসীরা পেরে উঠছে না, সেখানকার ৮৯,০০০ সৈন্যেও কুলোচ্ছে না, ফ্রান্স থেকে আরো সৈন্য ও সরঞ্জাম পাঠানো হল, এমন কি খোদ জেনারেল লেক্লার্ক, যিনি হিটলারের দাসত্ব থেকে এই কিছুকাল আগে ফ্রান্সকে স্বাধীন করেছিলেন ফ্রান্সের ভেতর থেকে প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠন করে, তাঁকে পাঠানো হল ইন্দোচীনে, ভিয়েৎনামীদের স্বাধীনতা অপহরণ করবার জন্য। ভিয়েৎনামের সাতটি শ্রমিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান মিলে একটি যুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করল সংগ্রাম-বিরতির অনুরোধ জানিয়ে এবং সেই সংগে (১) ফরাসী ও ভিয়েৎনাম গভর্নমেণ্টের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সুরু, (২) পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ফরাসী ও ভিয়েৎনামী মিশ্র কমিশন নিয়োগ এবং (৩) ইন্দোচীনের ফরাসী হাই কমিশনার এডমিরাল তোরী দাগের্লো-কে প্রত্যাহার, এই তিনটি দাবী জানিয়ে। এই প্রস্তাব ফ্রান্সে ঔপনিবেশিক মন্ত্রী মঃ মারিয়াস মুতের কাছে পাঠানো হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ফরাসী জাতি উঠে পড়ে লেগেছে ভিয়েৎনামকে নিষ্পেষিত করতে। তার সমস্ত সামরিক শক্তি তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবার আয়োজন করছে।

ভিয়েৎনাম রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হো চি মিন আবেদন জানিয়েছেন সকলের কাছে স্বাধীনতার নামে। তিনি বলছেন এর জন্যে দায়ী ফরাসী, আর ফরাসী গভর্নমেণ্ট দোষ চাপাচ্ছে ভিয়েৎনামীদের উপর। সুতরাং ব্যাপারটা বুঝতে গেলে গোড়াকার ইতিহাসের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় আবশ্যক।

জাপান এশিয়াতে স[illegible] বিস্তারের জন্য যে যুদ্ধ সুরু করে ১৯৪১ সালে, তাতে আর কারো না হোক, এশিয়াবাসী কতকগুলি অশ্বেত জাতির অনেক উপকার হয়েছে, যেমন ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, বর্মায়, ও কিছু পরিমাণে ভারতে ও মালয়ে। প্রধানত তিনটি সাম্রাজ্যবাদী শ্বেত জাতি—ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ (ডাচ)—এই সব দেশ শাসন করছিল। এসব দেশের অধিকাংশ জায়গায়, স্বাধীনতা দূরের কথা, আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক আয়োজনও ছিল না। তার ওপরে শ্বেত জাতিগুলি তাদের জাতিগত ও শক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের একটি আরব্যোপন্যাস রচনা করে মুষ্টিমেয় লোকে বিরাট সংখ্যক অশ্বেত জাতিদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছিল।

জাপানের আক্রমণে অশ্বেত জাতিগুলির কয়েকটি উপকার হয়। তার মধ্যে সর্বপ্রথম হল, সাম্রাজ্যবাদী শ্বেত জাতিগুলি যে শক্তিমত্তার দিক থেকে কত দূর অপদার্থ, তা এই অশ্বেত জাতিগুলির কাছে চট করে ধরা পড়ে যায়। জাপানের আক্রমণের সামনে যখন এইসব শ্বেত জাতিরা কশাহত কুক্কুরের মতো পেটের মধ্যে ল্যাজ ঢুকিয়ে তল্পিতল্পা ফেলে দৌড় দিল অশ্বেত জাতিগুলিকে জাপানের হাতে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে, তখন তাদের বহু যুগের যত্নে গড়া শ্রেষ্ঠত্বের রঙচঙে সৌধ নিমেষে ধূলিসাৎ হল। অশ্বেত জাতিগুলি অবাক হয়ে ভাবল, আমরা সংখ্যায় এত বেশি, আর এই মুষ্টিমেয় বীরপুংগবেরাই স্রেফ হুমকির জোরে আমাদের এতকাল দাবিয়ে রেখেছিল? ভিয়েৎনাম রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হো চি মিন স্পষ্টই বলেছেন, 'মা ভৈঃ, আমরা দুকোটি ভিয়েৎনামী শেষ পর্যন্ত এক লক্ষকে শায়েস্তা করতে পারবো।' চল্লিশ কোটির ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাংগসন্তান কয়টি আছেন?

যাই হোক, এই গেল জাপানের একটি উপকার। কিন্তু আর একটি এর চেয়েও বড় উপকার জাপানী অভিযান করেছে, যদিও করবার মতলব তাদের ছিল না। সেটি হল, এই সব পরাধীন দেশে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগানো ও তার জন্য প্রবল সংগ্রাম-শক্তিকে সংঘবদ্ধ করা।

তারা নিজেদের সাম্রাজ্যলিপ্সা বা 'হাক্কো ইচিউ' নীতিকে ঢাকবার জন্যে অবশ্য এশিয়ার পরাধীন জাতিগুলির অনেক পিঠ চাপড়ায় স্বাধীনতা দেবে বলে, এবং কোথাও কোথাও দলে ভেড়ার জন্যে কিছু কিছু Puppet king বা পুতুল-রাজাও করে দিয়েছিলেন, যেমন ইংরেজের অধীনে ভারতবর্ষের দেশীয় ও কোথাও কোথাও "স্বাধীন" (যেমন নেপাল) রাজ্যগুলিতে আছে। কিন্তু জাপানের শাসন ও শোষণের বহর দেখে লোকদের ভুল ভাঙতেও দেরী হয় নি। শোষণের পরিমাণ একটি ব্যাপার থেকেই বোঝা যাবে, সেটি হল ফি বছরে সমস্ত জাপ-অধিকৃত এশিয়া দেশ থেকে রাজস্ব আদায়ের হিসাব থেকে। ১৯৪৩—৪৪ সালে জাপানের এই বাবদে বাজেটের হিসাব ছিল ৭২০ কোটি ইয়েন, ১৯৪৪—৪৫ সালে এই হিসাব দাঁড়ায় ২৫২০ কোটি ইয়েনে। এই অতি দ্রুত বর্ধমান বিরাট শোষণের কথা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, এর দ্বারা বোঝা যাবে, কেন অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে প্রথমে জাপ প্রচারের ফলে জাপ-প্রীতি দেখা দিয়েছিল ও পরে তার বিরুদ্ধে তারাই সংগ্রাম সুরু করে। 'নেতাজী' সুভাষচন্দ্রের সংগেও পরে জাপ সরকারের খটাখটি বাধে।

যাই হোক, গোড়ায় জাপানের 'স্বাধীনতা' প্রচারের ফলে জাপ-প্রীতি ও পরে তার শোষক-মূর্তি দেখে তারই বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ এই উভয় বস্তুর যোগাযোগেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায় এবং বর্মায় স্বাধীনতা আন্দোলন জন্ম নিয়েছে।

ভিয়েৎনামের জন্ম ১৯৪১ সালে। এর গোড়ার নাম হল 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' কতকটা ভারতীয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের মতো। 'ন্যাশন্যাল পার্টী' (ভূতপূর্ব আনাম কুয়োমিনটাং), 'নিউ আনাম পার্টী', 'কম্যুনিস্ট পার্টী', 'ইয়ুথ লীগ', 'পেজাণ্টস এসোসিয়েশন ফর ন্যাশন্যাল লিবারেশন' এবং 'ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন', এই কয়টি স্থানীয় রাষ্ট্রিক দলের সমবায়ে ইন্দোচীনের 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' গঠিত হয়। পরে এই লীগ আনামী নাম গ্রহণ করে,—'ভিয়েৎনাম' 'ভিয়েৎমিন'। সম্ভবত প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হো মিন-এর নাম থেকেই দ্বিতীয় নাম-করণ।

১৯৪৪, ১লা জানুয়ারী, জাপানের পরাজয়ের অনেক পূর্বেই ভিয়েৎনাম কর্তৃ আনামী, চীনা ও ফরাসী সমবায়ে জাপানের বিরুদ্ধে একটা আন্তর্জাতিক 'ফ্রণ্ট' ঘোষিত হয়। তখন ইন্দোচীনে ফরাসী গভর্নর এডমিরাল দেকো'র অধীনে ফরাসী 'বি গভর্নমেণ্ট চলছে। শেষের দিকে জাপ যখন দেখলে যে এবার পাততাড়ি গুটোতে হবে, তখন যাবার আগে ১৯৪৫, ৯ই ম তারিখে সমস্ত উচ্চতন ফরাসী কর্মচারী গ্রেপ্তার করলে, ফরাসী সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র করলে এবং 'ইন্দোচীনের' স্বাধী ঘোষণা করলে। জাপান নিজের পতন আ জেনে ইন্দোচীনের জাপানী কাগজ 'নিপ সাংগিও'র মারফৎ লিখলে যে, 'জাপ গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য হল পূর্ব এশিয়ার স জাতিকে মুক্ত করা। ইন্দোচীনে তার সূচনা হল।' এর পরই ইন্দোচীনে জাপ পরাজয় হল।

ভিয়েৎনাম অবশ্য আগেই জাপানকে এবং তার বিরুদ্ধে গেরিলা সংগ্রাম

রেছে। এবারে ১৯৪৫, ২৮শে আগস্ট মিবেশে, জাপানী পর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিয়েৎনাম কর্তৃক ইন্দোচীনের অস্থায়ী বা প্রভিশনাল গভর্নমেণ্ট' গঠিত হল। এবং নামের ফরাসী-আশ্রয়ী সম্রাটকে সিংহাসন ত্যাগ করতে অনুরোধ করা হল। স্বদেশপ্রেমিক সম্রাট বাওদাই তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ত্যাগ করলেন এবং ভিয়েৎনাম কর্তৃক ইন্দোচীনের "স্বাধীন রিপাবলিক" ঘোষিত হল, ভূতপূর্ব সম্রাট তার পরামর্শদাতার পদ গ্রহণ করলেন। উত্তরে চীন থেকে দক্ষিণে সাইগঁ পর্যন্ত সমগ্র আনাম দেশই এই ভিয়েৎনামী স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষিত হল। রাজধানী হল হ্যানয়।

এক মাসের মধ্যেই, ১৮ই সেপ্টেম্বরে, নামের সংবাদ পরিবেষক এজেন্সী থেকে টি ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হল, প্রথমটি ৭৭৬ সালের মার্কিনী স্বাধীনতার বাণী তে করে ইন্দোচীনের ভিয়েৎনামী স্বাধীন ট্রের সরকারী ইস্তাহার এবং দ্বিতীয়টি পূর্ব সম্রাট বাওদের আবেদন। এই আবেদনে ছ "গোড়াতেই আমি ফরাসী গভর্নমেণ্টের আবেদন জানাচ্ছি।...আমি আজ ইন্দো-নের গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের জন্ম ঘোষণা ছি (Solemnly announce)। সিংহাসনের র অনেক উচ্চে আমার মাতৃভূমির স্বার্থকে ন করতে পেরে আজ আমি অনুভব করছি, ীন দেশের রাজা হওয়ার চেয়েও একটা ীন দেশের সামান্য নাগরিক হওয়াও অনেক গৌরবের জিনিস।" য়ুরোপের ইতিহাসে প মহৎ দৃষ্টান্ত কটি আছে জানি না, ভারতের ইংরেজ-আশ্রিত, নানা টাইটেল-ভূত গোলাম-শ্রেষ্ঠ দেশীয় রাজন্যবর্গ ৎনামী ভূতপূর্ব সম্রাটের তেজস্বিতাপূর্ণ বাণীটি স্মরণ রাখলে হয়তো কোনো না কোনো কারো না কারো চৈতন্যের উদয় হতে ।

ই হোক, জাপানী যুদ্ধ জেতবার পরে ক্ত শক্তি যখন ইন্দোচীনে এসে নামলেন, দেখলেন যে, সেখানে এরই মধ্যে জনগণের র সমর্থন নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বসে ছ 'স্বাধীন ভিয়েৎনাম রিপাবলিক'। এই লিক ইন্দোচীনের পূর্ণ স্বাধীনতা করেছে এবং প্রকাশ্যভাবে ফ্রান্সের সঙ্গে-র গোলাম-ইন্দোচীনের সমস্ত সন্ধি ত্র বাতিল করে দিয়েছে। দেখল এরা ৎ এদের পিছনে দুকোটি জনগণের

ন গোড়াতে বেশি ঘাঁটায় নি। কারণ, র নিজেরই কোমরের জোর কম। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শক্তি দুর্বল, বার বার গভর্নমেণ্ট বদলাতে

এইবার সংঘর্ষ জোর বেধেছে এবং আরো বাড়বে বলেই মনে হয়। ইংরেজ কবে হাত দেবে তারই অপেক্ষা আমরা করছি। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এমন পরিবর্তন কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে এই এক বৎসরে যার জন্য তার হুমকি এত বেড়েছে। এবারে সে আলোচনা করা সম্ভব হল না।

বর্মা

বর্মার আর ভিয়েৎনামের ব্যাপারে সাদৃশ্যও আছে, পার্থক্যও আছে। জাপানী আক্রমণের আগে বর্মার জাতীয়তা বোধ বিশেষ ছিল না, পরে হয়েছে। বর্মা ছেড়ে ইংরেজের পলায়নে ও যাবার সময়কার অত্যাচারে ইংরেজ-বিদ্বেষ বর্মায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। জাপানের প্রতি ইন্দোচীনের মত বর্মারও একটা প্রীতি গোড়াতে ছিল, পরে তাদের অত্যাচারের ও শোষণের ফলে জাপানের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের মতো বর্মাতেও একটা প্রতিরোধ, আন্দোলন Resistance movement দেখা দেয়, সশস্ত্র গেরিলাবাহিনীরূপে। এদেরই নায়ক ও সবচেয়ে বড় দল এণ্টি-ফ্যাসিস্ট পিপলস ফ্রীডম লীগের নেতা জেনারেল আউংগ সান আজ অন্যান্য সহযোগীদের সঙ্গে বিলাতী গভর্নমেণ্টের নিমন্ত্রণে বিলাতে রওয়ানা হয়েছেন।

যুদ্ধের শেষে ইংরেজ যখন বর্মা ফিরে দখল করলে, আউংগ সান প্রভৃতির নেতৃত্বে চালিত সশস্ত্র বাহিনীর গেরিলা যুদ্ধের সাহায্যে, তখন জাতীয়তা ও স্বাধীনতার আন্দোলন সেখানে খুব প্রবল হয়ে উঠেছে। ইংরেজের মোটা বুদ্ধির পক্ষে নূতন অবস্থাকে স্বীকার করতে অনেক দেরী হল। তাই ১৯৪৫ সালের সরকারী শ্বেতপত্রী বা হোয়াইট পেপার দ্বার ধরে ব্রহ্মীদের ঠাণ্ডা করে দেওয়া হল, তোমরা তিন বছর পরে স্বায়ত্ত-শাসন পাবে, আপাতত ইংরেজ গভর্নরই সর্বেসর্বা, তাঁর ওপরে কথা চলবে না, ১৯৩৫ সালের বর্মা আইনে তোমাদের যেসব অধিকার ছিল, তাও আপাতত খর্ব করা হল। চিরকালের বড়লাটি মেজাজের ইংরেজ ভেবে-ছিলেন, ব্রহ্মীরা অমনি সেলাম ঠুকে বলবে 'যো হুকুম'। তাঁরা ধরতে পারেন নি যে, ব্রহ্মীরা সত্য সত্যই স্বাধীনতা চায় এবং তার জন্যে দরকার হলে লাখে লাখে হাতিয়ার হাতে মরতে প্রস্তুত। তা ছাড়া এই ক'বছরে যে তারা ইংরেজকে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর শক্তি হিসেবে চিনে ফেলেছে, একথাও তাঁরা গোড়াতে খেয়াল করেন নি। পরে দেশ জোড়া অশান্তি আন্দোলনে কিছু চৈতন্য হয়। তাড়াতাড়ি গভর্নর পাল্টে জনপ্রিয় জাতীয় নেতাদের নিয়ে ভারতের মতো একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু নূতন দল গভর্নমেণ্টে ঢুকেই পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন, ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে বর্মার স্বাধীনতার কথা ইংরেজকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে হবে, এবং ৫০ বছরের মধ্যে সেই ঘোষণাকে কার্যকরী করতে হবে। অবিলম্বে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বৈদেশিক ব্যাপারে তার স্বাধীনতা এখনই স্বীকার করতে হবে। ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে যদি ইংরেজ এসবে রাজী না হন তবে ব্রহ্মদেশ আবার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করবে।

এই হুমকির জন্য এটলী সাহেব তাড়া-তাড়ি জেনারেল আউংগ সান প্রমুখ কয়েকজন ব্রহ্মী নেতাকে ডেকে পাঠিয়েছেন পরামর্শের জন্য।

কারণ এবার সমস্যা সত্যই গুরুতর। আউংগ সান প্রমুখ ব্রহ্মী নেতারা অহিংস নন। কিছুকাল আগেই তাঁরা জাপানের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে হাত পাকিয়েছেন। প্রয়োজন হলে স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধেও হাত পাকাতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। বর্মা পাহাড় ও জঙ্গলের দেশ। পাহাড়-জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধ বহু বৎসর ধরে অতি প্রবল শক্তির বিরুদ্ধেও চালিয়ে রাখা যায়। বিশেষত, জেনারেল আউংগ সানের গেরিলাবাহিনী এখন জাতীয় সেনা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, সুতরাং সশস্ত্র। অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রনৈতিক পার্টিও এখন সশস্ত্র। মোট কথা সমগ্র বর্মাই ভারত-বর্ষের মতো নিরস্ত্র, অহিংসার দেশ নয়। তা ছাড়া বর্মা হল তৈলখনির দেশ যার রাষ্ট্র-নৈতিক মূল্য অনেক। সুতরাং যদি সত্যই বর্মায় সংগ্রাম আরম্ভ হয় তবে তাকে ইংরেজের সমস্ত শক্তি (এবং সেটা আজকের দিনে খুব বেশি নয়) নিয়োগেও থামানো দুষ্কর হবে।

এসব ছাড়া আর একটি বিপদ আছে। ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণার ফলে আসাম প্রায় বারুদখানা হয়ে আছে। প্রয়োজন হলে আসাম বর্মার সাহায্য পাবে সে-কথা ব্রহ্মী নেতারা খোলা-খুলিই বলছেন। আসামও বর্মার মতো তৈল-প্রদেশ (ডিগবয়), এবং আসামে ও বর্মায় এক জায়গায় যুক্ত সীমান্ত (Common frontier)। সুতরাং বর্মার হাঙ্গামা আসামে আমদানী হওয়া খুব বিচিত্র নয়। ওদিকে আবার আর এক জায়গায় প্রায় একশো মাইল ব্যাপী বর্মার সঙ্গে ইন্দোচীনের সীমান্ত যুক্ত (Common frontier)। সুতরাং বর্মায় যদি সত্যই সংগ্রাম সুরু হয় তবে বহুদূর তার জের গড়াবে।

আজ তাই বিলাতে ব্রহ্মী সমস্যার সমাধানের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনও ঐ সঙ্গে জড়িত।

প্যালেস্তাইনে ১০০ মাইল ব্যাপী ইহুদী-দের ইংরেজ-বিরোধী লড়াই সুরু হয়েছে। আগামী বারে, এবিষয়ে আলোচনা করব।

টেলিফোনে বিয়ে—

যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন বর—ইংলণ্ডে কনের ঘর!

সম্প্রতি বিদেশ থেকে এক অদ্ভুত বিয়ের খবর সংগ্রহ করেছি। বিয়ে তো অনেক রকমই দেখেছেন আর অনেক রকম বিয়ের কথা শুনেওছেন, কিন্তু হলফ্ করে বলতে পারি—টেলিফোনে বিয়ের মন্ত্র পড়ে বরকনের বিয়ে হলো এমন সংবাদ বড় কেউ শোনেননি। তাও আবার বর রইলেন সাত-সমুদ্দুর তের নদীর পারে আমেরিকায় আর কনে রইলেন ইংলণ্ডে—অথচ বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। এই বিয়ের বৃত্তান্তটুকু এবার শুনুন।

টেলিফোনে বিয়ে যাদের হলো, তাদের পরিচয়টা গোড়াতেই দেওয়া দরকার। কনের নাম হলো ডোরিস্ প্রেস, ইনি ব্রিস্টলের ওয়েস্টেণ্ড সিনেমার দর্শকদের পথ-প্রদর্শনকারিণীর চাকরী করেন—আর বর হলেন আমেরিকান বিমান বাহিনীর অন্যতম বিমানচালক লেফ্টেনাণ্ট মার্ভিন এস্



টেলিফোনে বিয়ের কনে—মিস্ ডোরিস প্রেস।

কাইট। বিয়ের পূর্বাভাষে জানা যায় যে, বিয়ের তারিখ থেকে গোণা দুটি বছর আগের ঐ তারিখটিতে লেফ্টেনাণ্ট কাইটের সঙ্গে মিস্ প্রেসের প্রথম পরিচয় ঘটে এবং ক্রমে সেটা প্রণয়ে পরিণত হয় এবং প্রেস-পরিবারের সঙ্গেও লেফ্টেনাণ্ট কাইটের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। মিস্ ডোরিসের বাবা-মাও তাদের মেয়ের সঙ্গে লেফ্টেনাণ্ট কাইটের বিয়ে হোক এ ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক্, এমন সময় হঠাৎ লেফ্টেনাণ্ট কাইটকে তাঁর নিজের দেশে আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। বেচারা তাড়াহুড়ো করে দেশে ফিরে গেল, বিয়েটা



ঘটে উঠলো না। মিস্ ডোরিস্ প্রেস রয়ে গেলেন ইংলণ্ডে—লেফ্টেনাণ্ট রইলেন আমেরিকায়। এত দূরে থেকেও দুজনে কিন্তু অবিচ্ছিন্ন রইলেন মনের জগতে। টেলিফোনে দু'দেশ থেকে দু'জনে কথা বলে—দু'জনের চিঠি চলে। বিয়ের জন্য দু'জনেই ব্যাকুল, কিন্তু বিয়ের সুযোগ মেলে না, কারণ বর-কনের কেউই নিজের দেশ ছেড়ে যাবার অনুমতি পায় না। শেষ পর্যন্ত তারা দু'জনে স্থিরকরলে—টেলিফোনে তাদের বিয়ে হবে। সেই মতলব মতই সম্প্রতি তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের দিন কনে এবং তার মা-বাবা ও পরিবারের সকলে মিলিত হয়েছিলেন ব্রিস্টলের পাব্লিক হাউসে। আর প্রায় ৩ হাজার মাইল দূরে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া প্রদেশের আটলাণ্টা সহরের ফাস্ট ব্যাপ্টিস্ট গীর্জায় অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছিলেন বর। ব্রিস্টলের ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা ছটা—আর আটলাণ্টায় তখন বেলা ১টা।

হঠাৎ দু'দেশের বিবাহ-বাসরে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। বর-কনে দু'জনেই ছুটে গিয়ে ফোন-রিসিভার তুলে ধরলেন দু'জনেই



টেলিফোনে বিয়ে শেষ হবার পর—কাইট যা করলেন।

শুনতে পেলেন—টেলিফোন অপারেটর বললে,—"You are Connected". আমেরিকায় বরের সামনে ছিল কনের ছবি—আর ইংলণ্ডে কনের সামনে ছিল বরের ছবি। তারপর যথারীতি অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। বরের পক্ষের পাদরী রেভারেণ্ড জেমস এল বাগেট বর কনেকে আমেরিকার রীতি অনুযায়ী বিয়ের শপথ ও মন্ত্র পড়ালেন। যথারীতি ৯ মিনিটের মধ্যে এই সব অনুষ্ঠান শেষ করা হোল। তখন লেফ্টেনাণ্ট কাইটের মা বলে উঠলেন,—"Let me speak to my dauhgter-in-law". (আমাকে আমার বৌমার সঙ্গে কথা বলতে দাও) বর তাঁর মায়ের হাতে রিসিভারটি তুলে দিলেন। লেফ্টেনাণ্ট কাইটের মা তাঁর জীবনে এই সব প্রথম সুদূর-প্রসারী আতলান্তিক-তলবাহী টেলিফোনে [illegible] কথা বল্লেন—কাজেই অতদূরে থেকে তিনি [illegible] বৌমার সব কথা বেশ তেমন বুঝতে পারলেন না; তবে এটুকু বুঝলেন যে, তাঁর নতুন বৌমাটি [illegible] দেশ ছেড়ে শাশুড়ীর কাছে আসবার জন্য [illegible] ব্যাকুল। এতে তিনি খুশি হলেন।

এদিকে টেলিফোনে কথা শেষ করার সময় হয়ে এলো দেখে লেফটেনাণ্ট কাইট [illegible] রিসিভারটা হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন



লেফটেন্যাণ্ট কাইট—ফোনে বিয়ের শপথ নিচ্ছেন

"Don't worry, when you come [illegible] the States we'll have anoth[er] wedding." অর্থাৎ "ভেবোনা, যখন তুমি [illegible] (ইউনাইটেড স্টেট) এসে পৌঁছবে, তখন [illegible] নতুন করে আমাদের বিবাহ-উৎসব হবে।" [illegible] কাণে ভেসে এল কোমল করুণ স্বরে—I lo[ve] you. Good-bye Darling. তার[পর] টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো—[illegible] মিনিট সময় হয়ে গেলো শেষ। লেফটেনাণ্ট কাই[ট] মনে হল, বিয়ের পর বরের কর্তব্যটির [illegible] তিনি ছুটে গিয়ে মিস্ প্রেসের ছবিটা [illegible] নিলেন—তারপর কি হোল? ছবিতে দেখুন।

রঙ্গজগৎ

...খীর ইমান—নাট্যকার : তুলসী লাহিড়ী,
প্রযোজনা : শিশিরকুমার ভাদুড়ী,
ভূমিকায় : মনোরঞ্জন, কালিপদ সরকার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতীশ মুখোপাধ্যায়, প্রভা, লীলাবতী, লাবণ্য প্রভৃতি।

গত ৬ই ডিসেম্বর শ্রীরঙ্গমে প্রথম মঞ্চস্থ ...য়েছে।

গত ক'বছরের যুদ্ধের দরুণ বাঙলা মঞ্চের ...বস্থা একদিকে যেমন সচ্ছল হয়ে উঠেছিলো ...তমনি লোকের পয়সা খরচের ঝোঁকটার সুযোগ ...নয়ে প্রকৃত কোন নাটক মঞ্চস্থ করা বিষয়েও ...ধ্যক্ষরা একেবারেই উদাসীন হয়ে ওঠে। ...লে নতুন নাটকের সংখ্যা বহুতে দাঁড়িয়ে ...লেও স্মরণীয় হয়ে ওঠার মত অবদান ...কখানিও পাওয়া যায়নি। গত পাঁচ বছরে ...ঞ্চস্থ কোন একখানি নাটকও আজ আর ...দের মনে নেই; সৌখীন সম্প্রদায় কর্তৃক ...ভিনীত 'নবান্ন' ও 'অভ্যুদয়'-এর কথা বাদ ...লে মনে রাখবার মত একটিও মঞ্চাবদান ...খেও পড়েনি এক বছরে। এই অভাবটি ...নি ক্রমিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে যে বাঙলা ... ও নাটক ভারতে আদর্শস্থান অধিকার ...ছিল চিরকালধরেই সেই বাঙলাদেশে নাটক ...নাট্যকলা অবলুপ্তির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে ...ন ধারণা করে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। ...খীর ইমান-ই এই ধারণার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ...ছে। যে যে সূত্রের পরিপূরণ হলে একটি ...কে নাটক বলে গণ্য করা যায় 'দুঃখীর ...ন' সে সমস্ত সূত্রকেই মেনে চলেছে এবং ...লিকতার দিক থেকে প্রচলিত ধারার মোড় ...রিয়ে নতুন একটা ধারা প্রবর্তন করবার মত ...তাও দেখিয়েছে। বস্তুত 'দুঃখীর ...ন'-কে এযুগের একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক বলে ...ভহীত করতে মোটেই দ্বিধা আসে না।

'দুঃখীর ইমান'-এর কাহিনী ধনী ও ...র, কৃষক ও জমিদার, শাসক ও প্রজা; ...র সরলতা ও শিক্ষিতের কৌটিল্য, দুর্বল ...বল প্রভৃতির শাশ্বত সংঘর্ষের কথাই ব্যক্ত ...ছে এবং সময়ানুগামী চরিত্র, ঘটনা ও ...হাওয়ার মধ্যে দিয়েই। দেশে দুর্ভিক্ষ ...চ্ছে; অশিক্ষিত চাষা ধর্মদাস সপরিবারে ...ষ করেই কাটাচ্ছে এমন সময় গ্রামে এলো ...স পত্নী বিলাতীর বহুদিন পূর্বে হারাণো ...া বোন নানো—নানো কিন্তু এখন সম্পদ- ...নী এবং নাচ, গান, ও দেহের ব্যবসায়েই ...পয়সা, দারিদ্র্যের জ্বালা সইতে না পেরেই ...পথ বেছে নেয়। শহরে দীর্ঘ প্রবাসী ...রও এই সময়ে গ্রামে ফিরে আসে এবং ...র প্রতি আসক্ত হয়; নানো কিন্তু সেই ... গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে ...সের নামে এক চুরির অভিযোগ আনে ...বড় ভাই বর্তমান প্রধান বুদ্ধিমান, চুরি ...ছে বন্দুক। দারোগা তদন্তে এলেন, ...মান সাক্ষী হাজির করলে। মাস্টার মশাই *এবং গ্রামের রক্ষী স্বেচ্ছাসেবক দল বলেন যে, তাঁরা ধর্মদাসকে রাত্তিরে হাঁক দিয়ে সাড়া পেয়েছেন অথচ ক্ষীরোদ বৈষ্ণবী ও তার ছেলে বললে যে তারা ধর্মদাসকে রাত্তিরে দেখেছে.* জমিদারও ঘটনাচক্রে সেখানে পৌঁছে ধর্মদাসকেই দোষী করলে। সেই সময়ে বন্দুকটা বুদ্ধিমানের গোলা থেকে পাওয়া গেল কিন্তু সেইসঙ্গে আর এক ঝামেলা উপস্থিত হলো। জামালের ঘরে দু বস্তা চাল পাওয়া গেছে যা ছক্রোশ দূরে অশ্বিনী দাসের আড়ৎ থেকে সেই রাত্রে চুরি গিয়েছে, অথচ জামাল বলতে পারে না কে চাল দিয়েছে। ব্যাপার অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়ালো এবং শেষে জামালই দোষী সাব্যস্ত হয় দেখে সকলকে চমকে দিয়ে ধর্মদাস স্বীকার করলে যে সে-ই আসল চোর। ধর্মদাসের মহত্ব সকলকে যেন যাদু করে দিলে এবং যারা একটু আগে ধর্মদাসের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলো তারা সকলেই ঘটনা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগলো, ফলে ধর্মদাস মুক্তি পেলো।

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনাজাল এমনি নিপুণতার সঙ্গে বুনে যাওয়া হয়েছে যার জন্যে তুলসী লাহিড়ীকে একজন কীর্তিমান নাট্যকার বলে অভিনন্দিত করা যায়। আত্মার আত্মীয়তা যে সর্বজনীন—নাটকে তিনি সেই কথাটাই প্রমাণ করেছেন। চরিত্রগুলির মুখে আগাগোড়া দেহাতী ভাষার সংলাপ একটা অভিনব প্রচেষ্টা এবং তার অনেক কথা আমরা বুঝতে না পারলেও চরিত্রগুলিতে প্রাণসঞ্চারে সহায়তা করেছে তাই সবায়ের অভিনয় হয়েছে অত্যন্ত প্রাণবন্ত।

...বস্তুত মন প্রাণকে সম্পূর্ণরূপে এমনভাবে ডুবিয়ে দেওয়া গিয়েছে তেমন নাটক বা অভিনয় আজ দশবারো বছরের মধ্যে আমরা পাইনি। অভিনয়ে সবচেয়ে প্রশংসা পাবেন জামালের ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায়—হাস্যরসা-ভিনেতারূপেই আমরা তাকে এতকাল দেখে *এসেছি কিন্তু সীরিয়স ভূমিকা অভিনয়ে যে*

বিপদে যারা পিছিয়ে পড়ে না, দুঃখে যারা ভয় পায় না, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার মত আত্মবিশ্বাস যাদের অবিচল

প্রতিমা

তাদেরই পথ এগিয়ে দিতে আজ আশার প্রদীপ হাতে অগ্রসর!!

মুভি টেকনিক সোসাইটীর নিবেদন!!

প্রতিমা

কাহিনী : শৈলজানন্দ
পরিচালনা : খগেন রায়
সঙ্গীত : সমরেশ চৌধুরী
ভূমিকায় : শিপ্রাদেবী, অজিত, প্রমীলা, পূর্ণেন্দু, ফণী রায়, হরিধন প্রভৃতি

== একযোগে চলিতেছে ==

মিনার * বিজলী * ছবিঘরে

অগ্রিম সিট রিজার্ভ করুন।

এ, ডি, রিলিজ

শুভমুক্তি ❋ শুক্রবার
১০ই জানুয়ারী

আরব্য উপন্যাসের এক রসঘন কাহিনী

কানন দেবী
অভিনীত
পি, আর, প্রোডাকসনের

অ্যারেবিয়ান নাইটস

ভূমিকায় : নবাব, মলিনা, রবিন দেবী
পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী
সঙ্গীত : কমল দাশগুপ্ত

—: একযোগে :—

বীণা - পূর্ণ - খান্না
ক্রাউন - সিটি - কামা
(মেটিয়াবুরুজ)

আলোছায়া — শ্যামাশ্রী
(বেলেঘাটা) (হাওড়া)

উদয়ন — নিউ এম্পায়ার
(শ্যাওড়াফুলী) (আসানসোল)

রংমহল — সিনেমা প্যালেস
(সিলেট) (চট্টগ্রাম)

আগমনী পিকচার্সের গৌরবময় পরিবেশনা

নি কতবড় শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দিতে রেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না; কি পসজ্জা, কি অভিব্যক্তি ও হাবভাবে এবং কি ানে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, বাঙলা গমঞ্চের সমগ্র ইতিহাসে তার তুলনা খুব কমই পাওয়া যাবে। বছর দশেকের মধ্যে কি মঞ্চে আর কি পর্দায় চিরকাল স্মরণ করে রাখবার মত অভিনয় এই যা দেখলাম। ধর্মদাসের ভূমিকায় কালি সরকারও বড় কম কৃতিত্ব দেখাননি। বহুদিন মঞ্চে অভিনয় করলেও এই প্রথম তিনি মৌলিক ক্ষমতার পরিচয় দিলেন—চরিত্রটিকে তিনি স্মরণীয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন—নূতনরূপে পাওয়া এই নুই পুরাতন শিল্পীকে আমরা সহস্র অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাস্টারের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁর প্রাক্তন গৌরবোজ্জ্বল দিনের কথা মনে করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। অপেক্ষাকৃত নবাগতা লীলাবতীর বিলাতী সংযত ও হৃদয়গ্রাহী অভিনয়ে মনে বেশ ছাপ দেয়। অন্যান্য ভূমিকাগুলি কজনের ভাল অভিনয়ের মাঝে পড়ে বেশ উতরে গেছে।

সজ্জাদি বিষয়ে কৃপণতা লক্ষ্য করার বিষয়; ভাবানুগামী আলোকসম্পাত ও আবহসংগীত নাটকখানিকে আরো যে অনেকগুণ জমকালো এবং জীবন্ত করে তুলতে পারতো পরিচালকের বোধ হয় তা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। যাই হোক, আমরা শহরে এসে আমাদের রূপ প্রকৃতি ও ভাষা যতই মার্জিত করে নিই না কেন, আমাদের আদি যা তার প্রভাবকে কিছুতেই কাটাতে পারি না; তাই 'দুঃখীর ইমান'-এর ভাষা ও চরিত্রগুলি শহুরেদের কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য লাগলেও তাদের আবেগ ও আবেদনকে কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না—'দুঃখীর ইমান' নাটকের গতির সংগে সকলকেই কাঁদাবে, হাসাবে আর ভাবিয়ে তুলবে।

* * *

বিগত ১৬ই আগস্টে মুক্তি পাবে ব'লে বিঘোষিত পি আর প্রডাকসন্সের 'আরেবিয়ান নাইটস' আসছে সপ্তাহে শহর ও শহরতলীর প্রায় ৯টি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ ক'রবে। ছবিখানি পরিচালনা ক'রেছেন নীরেন লাহিড়ী এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন—কানন, মলিনা, নবাব, রবীন মজুমদার প্রভৃতি।

বিবিধ

গত রবিবার কলকাতায় তিনখানি নতুন ছবির মহরৎ সুসম্পন্ন হয়েছে—একখানি বাঙলা, বোসার্ট প্রডাকসন্সের 'প্রিয়তমা', পরিচালক ও কাহিনীকার পশুপতি চট্টোপাধ্যায়; তোলা হবে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে; সৈদা আর্ট প্রডাকসন্সের 'ভগবৎ' তোলা হবে নবগঠিত ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওতে এবং রামকৃষ্ণ স্টুডিওর একখানি অজ্ঞাতনামা হিন্দী ছবি, যার কাহিনী নেওয়া হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের ডাক' থেকে—এ ছবিখানির মহরৎ বেংগল ন্যাশনাল স্টুডিওতে সম্পন্ন হলেও ছবিখানি তোলা হবে ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওতে।

সতীশ কবিরাজের
শ্বাসারি
হাপানি ও ব্রঙ্কাইটীসে
মূল্য—প্রতি শিশি ১৸০
সর্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।
কবিরাজ
এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড সন্স
সাহাপুর বেহালা দক্ষিণ কলিকাতা

"দীর্ঘশ্বাসের মত এরা আসে,
চোখের জলের মত এরা মুছে যায়,
তবু এরা আসে
এগার শো ছিয়াত্তরে, তেরশো পঞ্চাশে"
ছায়ানট্ পিকচার্সের নিবেদন।
"দুঃখে যাদের জীবন গড়া"
পরিচালনা: হিমাদ্রী চৌধুরী
ভূমিকায়: রেণুকা, অহীন্দ্র, জহর, লীলা, সন্তোষ, কানু প্রভৃতি
একযোগে চলার ১২শ সপ্তাহে!!
শ্রী * রূপম্ * রূপালী
অগ্রিম সিট রিজার্ভ করুন
পরিবেশক: ক্যালকাটা পিকচার্স লিঃ

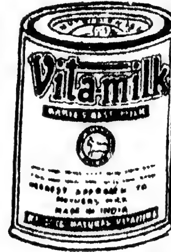
সুলভ মূল্যে গরম সোয়েটার

আমাদের সোয়েটার যেমন নরম, তেমন গরম ও তেমনি খাপি, দারুণ শীতে গায়ে থাকিলে আলোয়ানের দরকার হয় না। নানা রকম ডিজাইনের পাইবেন। বুকের মাপ পাঠাইবেন। প্রমাণ সাইজ ফুল হাতা—২নং ৭৲, উৎকৃষ্ট ৮৲, হাত কাটা—২নং ৪৷৷০, উৎকৃষ্ট ৫৷৷০। ছোট সাইজ ফুল হাতা—২নং ৪৷০, উৎকৃষ্ট ৫৷০; হাত কাটা—২নং ৩৸০, উৎকৃষ্ট ৪৷৷০। মাঃ ও প্যাকিং ১৷০। ২টী লইলে মাশুল ফ্রী। ঠিকানাঃ—দি ফ্রেণ্ড কমার্শিয়াল ষ্টোর। (এ) পোঃ বক্স নং ১২২১৬, কলিকাতা। (সি ১০৯৪)

নববর্ষ উপলক্ষে
অর্দ্ধ মূল্যে কনসেসন
এ্যাসিড প্রুভড 22Kt মেট্রো রোল্ডগোল্ড গহনা
—গ্যারাণ্টি ২০ বৎসর—
চুড়ি বড় ৮ গাছা ৩০ স্থলে ১৬৲, ছোট—২৫৲ স্থলে ১৩৲, নেকলেস অথবা মফচেইন—২৫ স্থলে ১৩৲, নেকচেইন ১৮" একছড়া—১০৲ স্থলে ৬৲, আংটী ১টি ৮ স্থলে ৪৲, বোতাম এক সেট ৪ স্থলে ২৲, কানপাশা, কানবালা ও ইয়াররিং প্রতি জোড়া ৯ স্থলে ৬। আর্মলেট অথবা অনন্ত এক জোড়া ২৮ স্থলে ১৪। ডাক মাশুল ৸০, একত্রে ৫০৲ অলঙ্কার লইলে মাশুল লাগিবে না।
নিউ ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড কোং
১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



শিশুদের হজমের পক্ষে ভিটা-মিল্ক সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ দুগ্ধ। ইহাতে শিশুদের তড়কা, নানাবিধ বাল-রোগ ও পেটে যন্ত্রণা হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। যখন স্তন্য-দুগ্ধ কমিয়া যায় কিংবা পাওয়ার সুবিধা থাকে না, তখন ভিটামিল্ক নির্ব্বিঘ্নে বাড়ন্ত শিশুর দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। ইহা সেবনে শিশুদের দাঁত শক্ত, দেহ মাংসল ও স্বাস্থ্য সুঠাম হইয়া উঠে। দুর্ব্বল, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষেও ইহা সুপথ্য।



ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ
কলিকাতা

INL

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ঃঃ কলিকাতা।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

	বৎসর	আদায়ী মূলধন		ডিপোজিট	
এপ্রিল (উদ্বোধন মাস)	১৯৪০	৩,০৯,০০০,	উর্দ্ধে	১,০৫০,	উর্দ্ধে
ডিসেম্বর —	১৯৪০	৫,৭২,০০০,	„	৩,১৯,০০০,	„
ডিসেম্বর —	১৯৪১	৮,১৮,০০০,	„	২৪,৮২,০০০,	„
ডিসেম্বর —	১৯৪২	৯,৪৭,০০০,	„	৪০,০০,০০০,	„
ডিসেম্বর —	১৯৪৩	১০,০০,০০০,	„	১,১০,০০,০০০,	„
ডিসেম্বর —	১৯৪৪	১০,২০,১৭৫,	„	২,১৪,৬৯,২২৭,	„
ডিসেম্বর —	১৯৪৫	১০,৫৭,৬৫০,	„	৩,০৭,১১,৬৪০,	„

জাতীয় শিল্প ও ব্যবসার সমৃদ্ধিকল্পে প্রকৃত ব্যবসায়ীকে সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা দেওয়া হয়।

আলামোহন দাশ
চেয়ারম্যান

নির্ভীক জাতীয় সাপ্তাহিক
"দেশ"
প্রতি সংখ্যা চারি আনা
বার্ষিক মূল্য—১৩ ষাণ্মাসিক—৬॥০
"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—
সাময়িক বিজ্ঞাপন
৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার
বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।
ঠিকানাঃ- আনন্দবাজার পত্রিকা
১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

আপনার
কম খরচার খাজাঞ্চী

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং করপোরেশন

লিমিটেড

হেড অফিস—
২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১
ফোন—কলিকাতা ১৭৪৪
টেলিগ্রাম—ষ্টারডম।

শাখাসমূহ

ঢাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, ক্যানিং, সোনারপুর, কোন্নগর, রামপুরহাট বারহারওয়া, সাহিবগঞ্জ (এস, পি) রঘুনাথগঞ্জ, আওরংগাবাদ (মুর্শিদাবাদ)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরঃ—
ডি. এন. চ্যাটার্জ্জি,
এফ আর, ই, এস (লণ্ডন)

পাকা চুল কাঁচা হয়

কলপে সারে না। আমাদের রেইনিয়া সুগন্ধি আয়ুর্ব্বেদীয় তৈলে চুল চিরতরে স্বাভাবিক কাল হইবে আর পাকিবেই না। মূল্য ২৷৷০ অল্প পাকায় ৩৷৷০ কিছু বেশী পাকায় এবং ৫, প্রায় সব পাকায়। এই তৈল মাথা ও চক্ষুরও খুব উপকারী।

এস, এস, গুপ্ত কার্য্যালয়,
ন[illegible] পোঃ কাত্রীসরাই (গয়া)।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

ইংলণ্ড প্রত্যাগত ভারতীয় ক্রিকেট দল তৃতীয় প্রদর্শনী খেলায় কলিকাতায় এক ইনিংসে ও ১৪৭ রাণে বিজয়ী হইয়াছে। প্রথম খেলায় দিল্লীতে ৬ উইকেটে ও দ্বিতীয় খেলায় বোম্বাইতে ১৩ রাণে অবশিষ্ট দলের নিকট পরাজিত হইয়া যে অখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল তাহা কতকাংশে বিদূরিত করিতে সক্ষম হইল। লাহোর ও মাদ্রাজে যে দুইটি খেলা হইবার কথা আছে তাহা যদি অনুষ্ঠিত হয়, আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে, ইংলণ্ড প্রত্যাগত ভারতীয় দল আর পরাজিত হইবে না। খেলার জয় বা পরাজয়ের বিষয় লইয়া বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই, যে উদ্দেশ্যে এই সকল খেলার আয়োজন হইয়াছে তাহাই চিন্তা করা উচিত। অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় দল বিশেষ শক্তিশালীভাবে গঠিত হউক ইহা সকলেরই কাম্য। ইংলণ্ড প্রত্যাগত ভারতীয় দলের কয়েকজন পুনরায় অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী দলের জন্য মনোনীত হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ করিয়া অমরনাথ, আর এস মোদী, গুলমহম্মদ, সোহনী, বিনু মানকড় ও এস ব্যানার্জি দলে স্থান পাইবেন। সারভাতে, হিন্দেলকার, মুস্তাক আলী প্রভৃতি এই পর্যন্ত কোন খেলায় সেইরূপ উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে নাই। সিন্ধে বোলিংয়ের জন্য দলে পুনরায় স্থান পাইতে পারেন। সি এস নাইডু কোন খেলায় যোগদান করেন নাই। ইংলণ্ডেও সুবিধা করিতে পারেন নাই। এইজন্য আশংকা হয়, অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী দলে মনোনীত হইবেন না। অবশিষ্ট দলের মধ্যে রংগনেকার বোম্বাই ও কলিকাতা দুই স্থানে ইংলণ্ড প্রত্যাগত দলের বিরুদ্ধে শতাধিক রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে নির্বাচকমণ্ডলী ইহাকে দল হইতে বাদ দিতে পারিবেন না। বোম্বাইর তরুণ খেলোয়াড় ফাদকার ব্যাটিংয়ে সুবিধা করিতে না পারিলেও বিভিন্ন খেলায় বোলিংয়ে সাফল্য অর্জন করায় নির্বাচকমণ্ডলী ইহাকে বোধ হয় দলভুক্ত করিবেন। সর্বাপেক্ষা চিন্তার কারণ হইয়াছে উইকেটরক্ষক হিসাবে কাহাকে লওয়া হইবে। হিন্দেলকার অথবা আর বি নিম্বলকার ইহাদের দুইজনকে বাদ দিয়া নূতন কাহাকেও লওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। শোনা যায়, তরুণ খেলোয়াড় উইরকে দলে লইবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার খেলা দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। সুতরাং কোন মন্তব্য করা সম্ভব নহে। মার্চ মাসের পূর্বে চূড়ান্ত নির্বাচন হইবে না। দেখা যাক, নির্বাচকমণ্ডলী কোন্ কোন্ খেলোয়াড় লইয়া দল গঠন করেন।

ইংলণ্ড প্রত্যাগত বনাম অবশিষ্ট দল

ইংলণ্ড প্রত্যাগত ভারতীয় দল বনাম অবশিষ্ট দলের তৃতীয় খেলা কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ড প্রত্যাগত দল এই খেলায় কেবল যে ইনিংসে বিজয়ী হইয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে, দুইটি বিষয়ে নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে ইহাদের মোট রাণসংখ্যা। ইহারা ৬ উইকেটে ৬১২ রাণ সংগ্রহ করেন। কলিকাতার মাঠে এই [illegible] কোন খেলায় কোন দলের পক্ষেই এত অধিক রাণ করা ইতিপূর্বে সম্ভব হয় নাই। সেই হিসাবে ইহা কলিকাতার ক্রিকেট ইতিহাসের নূতন রেকর্ড। অমরনাথ ও আর এস মোদী তৃতীয় উইকেটে একত্রে ৪০৪ রাণ করিয়া আর একটি নূতন রেকর্ড করিয়াছেন।

খেলার বিবরণ

প্রথমে ইংলণ্ড প্রত্যাগত দল ব্যাটিং করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রথম দিনের শেষে ২ উইকেটে ৪৩৯ রাণ করেন। অমরনাথ ২৪৩ রাণ ও আর এস মোদী ১৫৬ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিনে আর এস মোদী অসুস্থ হইয়া খেলায় যোগদান করেন। অমরনাথ ২৬২ রাণ করিয়া আউট হন। ইতিপূর্বে উজীর আলী কলিকাতার মাঠে একা ২৬৮ রাণ করিয়া ব্যক্তিগত রাণের যে রেকর্ড করিয়াছিলেন অমরনাথ মাত্র ৭ রাণের জন্য তাহা অতিক্রম করিতে পারেন না। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ইংলণ্ড প্রত্যাগত দলের ৬ উইকেটে ৬১২ রাণ হইলে অধিনায়ক বিজয় মার্চেণ্ট ডিক্লেয়ার্ড করেন। অবশিষ্ট দল খেলা আরম্ভ করেন ও দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১৭০ রাণ করেন। রংগনেকার ৬৩ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনে রংগনেকার দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া শতাধিক রাণ করেন, কিন্তু দলের অপর খেলোয়াড়গণ তাঁহাকে পূর্ণ সমর্থন করিতে পারেন না। ফলে অবশিষ্ট দলের প্রথম ইনিংস ৩২১ রাণে শেষ হয়। ইংলণ্ড প্রত্যাগত দল ২৯১ রাণে অগ্রগামী থাকিয়া অবশিষ্ট দলকে 'ফলো অন' করিতে বাধ্য করেন। তৃতীয় দিনের শেষে অবশিষ্ট দল ৩ উইকেটে ৮৪ রাণ করেন। চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বেই অবশিষ্ট দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৪৪ রাণে শেষ হয়। সোহনী ও সারভাতের বোলিং এই শোচনীয় পরিণাম সম্ভব করে। ইংলণ্ড প্রত্যাগত দল এক ইনিংস ও ১৪৭ রাণে খেলায় জয়লাভ করেন। খেলার ফলাফল:—

ইংলণ্ড প্রত্যাগত ভারতীয় দল:—৬ উইঃ ৬১২ রাণ (অমরনাথ ২৬২, আর এস মোদী ১৫৬, গুলমহম্মদ ৫২, সোহনী ৫৮, ফাদকার ৮২ রাণে ২টি ও গিরিধারী ১২২ রাণে ২টি উইকেট পান।)

অবশিষ্ট দলের প্রথম ইনিংস:—৩২১ রাণ (রংগনেকার ১৭১, কিষেণচাঁদ ৩৯, ফাদকার ৩২, এস ব্যানার্জি ৭৫ রাণে ৩টি, অমরনাথ ৬৯ রাণে ৩টি ও মানকড় ৫২ রাণে ২টি উইকেট পান।)

অবশিষ্ট দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—১৪৪ রাণ (রণবীর সিংহজী ৪৬, ফাদকার ২৩, এন চ্যাটার্জি ২১, সোহনী ৪৯ রাণে ৫টি ও সারভাতে ২৬ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড ভারতীয় দলের সহিত ছয়দিনব্যাপী পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা খুবই সুখের বিষয়। আমরা আশা করি, ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিবেন।

ফুটবল

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন পরিচালিত আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। গত বৎসরের বিজয়ী বাঙলা দল ফাইনালে মহীশূর দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। এই খেলাটি দুই দিন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে মহীশূর দল ২—১ গোলে জয়লাভ করে। বাঙলা দলের এই পরাজয় খুবই পরিতাপের বিষয়। পরবর্তী বৎসরে অর্জিত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বাঙলা দলকে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে দেখিলে আনন্দিত হইব।

প্রতিযোগিতা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, "খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুব নিম্নস্তরের হইয়াছে।" এই উক্তি শুনিয়া আমরা কোনরূপ আশ্চর্য হই নাই। অসময়ে খেলার অনুষ্ঠানে কখনই সময়োপযোগী ক্রীড়ানৈপুণ্য আশা করা যায় না। কি উদ্দেশ্যে যে অসময়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইল তাহা সঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে আমরা মনে করি, যাঁহারা ইহার উদ্যোক্তা তাঁহারা খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের অস্তিত্বও বজায় থাকিয়াছে, উপরন্তু কিছু অর্থ সমাগমও হইয়াছে।

বিনামূল্যে বেস্টোজেম বিনামূল্যে

শ্রেষ্ঠ ভাইটামিন টনিক

স্বাস্থ্য, শক্তি ও জীবনীশক্তির আদর্শ বলবর্ধক সামগ্রী এই বেস্টোজেম। শক্তিশালী ও ফলপ্রদ এই অত্যাশ্চর্য ঔষধ এক মাত্রা সেবনেই মানবদেহে তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় ক্রিয়া করে। প্রকৃত বয়স অপেক্ষা পুরুষ ও নারীকে বেস্টোজেম্ সেবনে ২০ হইতে ২৫ বৎসর কম বয়স্কের ন্যায় দেখায়। ইহাতে আহারে রুচি হয়, এবং এক সপ্তাহ মধ্যেই ৩ হইতে ৫ পাউণ্ড ওজন বৃদ্ধি হয়। বেস্টোজেম ব্যবহারে আপনার চেহারা ভাল হয়, চোখে আপনার দীপ্তি খেলে। আপনার ওষ্ঠ এবং গণ্ডদেশে গোলাপী আভা ফুটে উঠে। ইহা চিরতরে পাকা চুল কাঁচা করে। আপনার মুখমণ্ডল যুবজনোচিত ঔজ্জ্বল্য লাভ করিবে। ভারতের সর্বত্র বেস্টোজেমের বহুল প্রচারার্থ প্রত্যেক সহরের প্রথম কতিপয় ক্রেতাকে একটি কৃষ্ণা ফাউণ্টেন পেন (ইংলিশ মেক) বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। বেস্টোজমকে জনপ্রিয় করণার্থ ঔষধের সহিত আমাদের প্রদত্ত উপদেশাবলী মতে ক্রেতাকে হাণ্ডবিল প্রভৃতি বিলি করিতে হইবে। প্রতি পাত্রের মূল্য ৫ টাকা প্রথম ক্রেতা হইতে হইলে আজই লিখুন।

দ্রষ্টব্য:—ঔষধটি ডেলিভারী লইবার পূর্বে টিপ পার্শ্বেলের উপর "প্রথম ক্রেতা" কথা দুইটি লেখা আছে কিনা দেখিয়া লউন। উহা থাকিলে আপনি স্থির নিশ্চয় হইবেন যে, উপরে বর্ণিত বিনামূল্যের পুরস্কার আপনি নিশ্চয়ই পাইবেন।

ইংরাজীতে লিখুন:—

বেস্টোজেম লেবরেটরিজ

পোষ্ট বক্স নং ৮, দিল্লী।

দেশী সংবাদ

৩০শে ডিসেম্বর—নোয়াখালিতে শ্রীরামপুরে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ গ্রহণ করার পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, রাষ্ট্রপতি কৃপালনী এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত শংকররাও দেও বিশেষ বিমানযোগে দিল্লী যাইবার পথে অদ্য কলিকাতা পৌঁছেন।

৩১শে ডিসেম্বর:—বোম্বাই গভর্নমেণ্টের আবগারী বিভাগের মন্ত্রী মাদকদ্রব্য নিবারণের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আজ বোম্বাই গভর্নমেণ্ট সেই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। ঐ পরিকল্পনানুযায়ী ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ-ভাবে মাদকদ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করা হইবে।

নয়াদিল্লীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, সরকারী সম্মান ও খেতাবের প্রতি ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে যে মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বড়লাট অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের সহিত ঘরোয়া-ভাবে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত বৃটিশ ভারতে সম্মান ও খেতাব বিতরণের প্রথা রদ করা হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম পূর্বের ন্যায়ই তীব্রভাবে চলিতেছে। ছাত্রদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব দেখিয়া পণ্ডিত নেহরু দুঃখ প্রকাশ করেন।

কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশনে শ্রীযুত সুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ ও শ্রীযুত কালীপদ মুখার্জি যথাক্রমে উক্ত সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকরূপে পুনরায় নির্বাচিত হন।

২রা জানুয়ারী—ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে আমন্ত্রিত বিদেশী প্রতিনিধিরা অদ্য বিমানযোগে নয়াদিল্লী পৌঁছেন। স্যার চার্লস ডারউইনের নেতৃত্বে আগত এই দলটিতে প্রফেসার ব্ল্যাকেট, বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার হ্যারল্ড স্পেন্সার জোন্স, বিশ্ববিখ্যাত ভূগোলবেত্তা ডাঃ ডাডলী ষ্ট্যাম্প রহিয়াছেন।

ঢাকা শহর অঞ্চলে সাম্প্রতিক হাঙ্গামার দরুণ ধার্য সমস্ত পাইকারী জরিমানা আদায় স্থগিত রাখার জন্য ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গত ২৩শে ডিসেম্বর ঢাকার দশজন নাগরিক পাইকারী জরিমানা ধার্য সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্সের বৈধতা সম্পর্কে দায়রা জজের আদালতে এক আবেদন পেশ করেন। বিচারসাপেক্ষে জজ আবেদন-কারীদের উপর ধার্য জরিমানা আদায় স্থগিতের নির্দেশ দান করেন।

ব্রহ্মের অন্তর্বর্তীকালীন গভর্নমেণ্টের ডেপুটি চেয়ারম্যান জেনারেল আউং সান অদ্য রেঙ্গুণ হইতে রওনা হইয়া লণ্ডন যাইবার পথে দমদম পৌঁছেন। আগামী লণ্ডন বৈঠকে ব্রহ্ম দেশের প্রতিনিধি-মণ্ডলী কি কি দাবী উত্থাপন করিবেন, তৎসম্পর্কে জেনারেল আউং সান এক বিবৃতিতে বলেন: প্রথমত আমরা অবিলম্বে গভর্নরের শাসন পরিষদকে পূর্ণক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় গভর্নমেণ্টে পরিণত করিতে চাই। দ্বিতীয়ত আগামী এপ্রিল মাসে ব্রহ্ম দেশে যে সাধারণ নির্বাচন হইবে তাহাকে বিজাতীয় প্রভাব বর্জিত গণ-পরিষদের নির্বাচনে পরিণত করিতে চাই।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৩রা জানুয়ারী—চণ্ডীপুরে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন, "এতাবৎ যে অহিংসা-নীতি অনুসরণ করা হইতেছিল, উহা ছিল দুর্বলের অহিংসা, কিন্তু বর্তমানে আমি যে অহিংসা প্রচারে রতী হইয়াছি, উহা সবলের অহিংসা।" বহু মুসল-মান সভায় যোগদান করিয়াছিল। মহাত্মাজী বলেন, "নোয়াখালিতে আমার ব্রত হইল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা। হিন্দু ও মুসলমানগণ অন্তরের ভীতি ও সংশয় বর্জন করিতে পারিলেই প্রকৃত মৈত্রী প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এক বিবৃতিতে বলেন যে, ইন্দোচীনের সংগ্রাম শুধু ইন্দোচীনের অধি-বাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম নহে; ইহা নিখিল এশিয়ার বৃহত্তর স্বাধীনতা সংগ্রামেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ যাত্রার জন্য দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ভুক্ত হইবার জন্য শ্রীযুত বসু উক্ত বিবৃতিতে দেশের যুবকবৃন্দের নিকট আবেদন জানান।

ঝাঁসীর সংবাদে প্রকাশ যে, রেল ইনষ্টিটিউটে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ যখন বড়দিন উপলক্ষে উৎসবাদি করিতেছিলেন, তখন প্রায় দুই শতজন সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্য রেল ইনষ্টিটিউটের উপর হানা দিয়া কয়েকজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে আক্রমণ করে এবং নৃত্যশালায় আগুন লাগাইয়া দেয়। প্রকাশ যে, তাহারা কয়েকজন মেয়ের উপর অত্যাচার করে।

নয়াদিল্লীতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চতুস্ত্রিংশ অধিবেশন আরম্ভ হয়।

৪ঠা জানুয়ারী—বিহারে আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি মহাত্মা গান্ধীর নিকট কয়েকটি অভিযোগ করিয়া-ছিলেন। বিহার সরকারের উত্তরের একাংশ হিসাবে বিহার গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি দল মহাত্মা গান্ধীর নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করিয়া-ছিলেন। স্মারকলিপিতে পাটনা, মুঙ্গের, গয়া, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, সাহারশা এবং ছাপরার উপদ্রুত অঞ্চলের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, সরকারী হিসাবে আশ্রয়-প্রার্থীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা এক লক্ষ ১২ হাজার ৯ শত ৫০ জন, উপদ্রুত পল্লীর সংখ্যা ৭৪৮। যে সকল গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ৩৭৪৬।

সিরাজগঞ্জে এক জনসভায় বাঙলা সরকারের রাজস্ব সচিব মিঃ ফজলুর রহমান ঘোষণা করেন যে, বাঙলা সরকার আসাম ও বিহার হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী পতিত জমি দখল করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। উক্ত জমি আশ্রয়-প্রার্থীদিগকে ও স্থানীয় দুঃস্থ লোকদিগকে দেওয়া হইবে। তিনি বলেন যে, বিহার ও আসাম হইতে প্রায় ৫০,০০০ আশ্রয়প্রার্থী বাঙলায় আসিয়াছে। তাহাদের সাহায্য দানের সমস্ত প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

চণ্ডীপুরের সংবাদে প্রকাশ, গত বুধবার চাঁদপুর থানা এলাকা হইতে দুই স্থানে অগ্নি-সংযোগের খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত পাঁচ দিন যাবৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দুইজন লোক নিখোঁজ হইয়াছে। অধিকন্তু বৃহস্পতিবার এক গ্রামে ২ শত লোকের এক জনতা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মারমুখী হইয়া উঠে।

বাঙলা গভর্নমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী সাধারণ নির্বাচন এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখার আদেশ দিয়াছেন।

৫ই জানুয়ারী—অদ্য নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বৃটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি গ্রহণের সুপারিশ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব সম্পর্কে ছয় ঘণ্টা-ব্যাপী বিতর্ক চলিবার পর আগামীকল্য পর্যন্ত সভার অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়। একুশ জন বক্তা অদ্যকার বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন; তন্মধ্যে ১৬ জন বক্তা প্রস্তাবের বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। ১৫টি সংশোধন প্রস্তাব পেশ করা হয়; অধিকাংশ সংশোধন প্রস্তাবে বৃটিশ সরকারের বিবৃতি নাকচ করিতে বলা হইয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গতকল্য দুইবার ও অদ্য সকালে আর একবার বৈঠকের পর বৃটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি সম্পর্কে একটি প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন করেন। উক্ত প্রস্তাবে বিভাগগুলির (সেক্সন) কার্য পরিচালনা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের ব্যাখ্যা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৩১শে ডিসেম্বর—জেনারেল চিয়াং কাইশেক অদ্য চীনের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিয়া গজদন্তনির্মিত তুলিকা দ্বারা এক আদেশপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই শাসনতন্ত্র ৬ দিন পূর্বে গণ-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

ফরাসী সংবাদপত্র 'লা অরারে' এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৫ই মার্চ বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। পরস্পরকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়াই এই চুক্তির উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মের "মহাবমা দল" ব্রহ্ম সম্পর্কে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সাম্প্রতিক প্রস্তাব বর্জন করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে। ডাঃ বা ম এই দলের নেতা।

১লা জানুয়ারী—ইন্দোচীন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, হানয়ের উত্তর-পূর্বে ফরাসী সৈন্যরা একটি নদীর পরপারে হটিয়া যায় এবং অন্যান্য সৈন্যদল পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী পথ ধরিয়া পশ্চাদপসরণ করে। হানয় নগরীর উপর অনামীদের প্রচণ্ড আক্রমণ হটাইয়া দেওয়া হয়।

২রা জানুয়ারী—ইন্দোচীনের হানয় এলাকায় ভিয়েৎনাম বাহিনীর চাপ বৃদ্ধি পায়। ভিয়েৎনাম জাতীয়তাবাদীরা আনাম এবং টঙ্কিং ছাড়া কোচিন-চীন প্রদেশও তাহাদের স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করিতেছে। পটামবং হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, শান্তিপূর্ণ কাম্বোডিয়া প্রদেশেও বিদ্রোহের বিস্তার হইয়াছে। ভিয়েৎনাম সৈন্যদলের আক্রমণ টঙ্কিং এবং আনামের উত্তরাঞ্চলে বিস্তৃত হইয়াছে।

৩রা জানুয়ারী—জেরুজালেমের সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে প্যালেস্টাইনে ইহুদী সন্ত্রাসবাদী দল ১০০ মাইল জুড়িয়া বৃটিশ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে আঘাত হা[illegible] তাহারা এই সময় অগ্নিশিখা-নিক্ষেপক যন্ত্র, বোমা, মাইন এবং অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে।



সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ৪ঠা মাঘ, ১৩৫৩ সাল Saturday, 18th January, 1947 [১১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

দায়িত্ব কাহার

নগ্নপদে নোয়াখালির কর্দমাক্তপথে মহামানব গান্ধীজীর ভ্রমণকার্য দিনের পর দিন অক্লান্ত উদ্যমে চলিতেছে। আন্তরিকতা অপরের অন্তরকেও আকর্ষণ করে। লীগ-ওয়ালারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব গান্ধীজীর বিরুদ্ধে ভ্রান্তিপূর্ণ প্রচারকার্য চালান সত্ত্বেও তাঁহারা গান্ধীজীর প্রাণপূর্ণ সাধনার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ইঁহাদের অনিষ্টকর প্রচারকার্যের ফলে দুই একটি ক্ষেত্রে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটিয়াছে এমন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে মাসিমপুরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় রামধুন গীত হইবার সময় উপস্থিত জনগণের মধ্যে একদল মুসলমান সভা হইতে চলিয়া যায়। অপর একটি স্থানে একজন মুসলমান ভদ্রলোক গান্ধীজীকে অতিথিস্বরূপে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া পরে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। কিন্তু এসব অপেক্ষাকৃত সামান্য অসুবিধা সত্ত্বেও গান্ধীজীর অভিযান মোটামুটি সাফল্যের পথেই অগ্রসর হইতেছে। আমরা জানি, সত্য এইভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে এবং পরম প্রয়াসের ভিতর দিয়াই সকল মহৎ সিদ্ধি আত্মাবদানে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু লীগওয়ালার দল স্বার্থ সংকীর্ণতার বেসাতিতে অবতীর্ণ হইয়া এইভাবে বাঙলা দেশের যে সর্বনাশ সাধন করিতেছেন, ইহা আর কতদিন চলিবে? নিতান্ত সাধারণ মানুষের মনেও এই প্রশ্ন দেখা দেয়। সেদিন গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় নোয়াখালির অশীতিপর বৃদ্ধ মৌলবী মহম্মদ ইব্রাহিম গান্ধীজীর নিকটও এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আমরা রাজনীতি বুঝি না। গ্রামে বাস করি এবং শান্তি[…]থাকিতে চাহে। […]ভাইয়ে ভাইয়ে এই দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত সম্প্রীতির […]সম্পর্ককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। গান্ধীজী এবং জিন্না সাহেব একত্র হইয়া একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিলেই তো হয়। মৌলবী ইব্রাহিম যদি ভিতরের কথা জানিতেন, তবে তিনি সহজেই বুঝিতেন যে, গান্ধীজী কিংবা কংগ্রেস মিঃ জিন্নার সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নাই। কিন্তু লীগের দল দেশের স্বার্থ কিংবা জাতির স্বার্থ কিছুই চাহেন না। তাঁহারা নিজেদের দলীয় হীন স্বার্থ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভেদ-বিদ্বেষের পথকেই একমাত্র সম্বলস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ প্রচার করিয়া এদেশের বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করিয়া ফেলিতেছেন। ইঁহাদের কেহ কেহ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বড় বড় কথা কেবল মুখেই বলিয়া থাকেন। সেদিন বাঙলার মুসলিম লীগের সম্পাদক মিঃ আবুল হাসেমের মুখেও আমরা সেই ধরণের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু কার্যত লীগনেতাদের কর্ম-নীতির বাস্তব পরিণতিতে ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষের বিন্দুমাত্র স্থান নাই; বস্তুত প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশীকে হিংসার বশে উত্তেজিত করিয়া তোলাই ইহাদের পরম ব্রতে পরিণত হইয়াছে। একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যাইবে, লীগ-শাসিত এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙলা দেশে পাকিস্থানী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' অবতারণা করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু গোটা ভারতের পটভূমিকায় পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের আবহাওয়া সৃষ্টির একান্ত উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা অনর্থক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দামামা ধ্বনিসহকারে বাঙলা দেশে ভ্রাতৃঘাতী বর্বরতাকে প্ররোচিত করেন। কলিকাতার নিধন-যজ্ঞ তাহারই পরিণতি এবং নোয়াখালিতে দৌরাত্ম্যের তাণ্ডব তাহারই বিস্তৃতি। এই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, বিহারের অরাজকতা লীগওয়ালাদের কার্যেরই একরূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এইভাবে একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যায় যে, লীগওয়ালারা বাহিরের শুধু ভদ্র-সমাজে নিজেদের মুখ রাখিবার দায়েই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সংগ্রামের কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু কাজে বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য স্থির আছে। নোয়াখালির দৌরাত্ম্য যে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা এবং প্ররোচনাতেই সংসাধিত হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বলা বাহুল্য, বাহির হইতে লোক আসিয়া নোয়াখালিতে অনর্থ ঘটাইয়া গিয়াছে, একথা সম্পূর্ণই ভুল। বস্তুত লীগ-নেতাদের পরিকল্পনাক্রমেই এমন ব্যাপক দৌরাত্ম্য সম্ভব হয়। স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অনেকে হয়ত সে পরিকল্পনার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না; কিন্তু লীগের পরিকল্পনার সঙ্গে হয় তাঁহাদের সহানুভূতি ছিল, নতুবা লীগের বিরুদ্ধতা করিলে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অপ্রিয় হইতে হয়, এই ভয়ে তাঁহারা চিরদিনের প্রতিবেশীর প্রতি বর্বর অত্যাচারে বাধা দিতে অগ্রসর হন নাই। এইভাবে স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মৌন সম্মতির ফলে বাঙলার ব্যাপক অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পশুবৃত্তিতে প্ররোচিত দৌরাত্ম্যের প্রতি মৌন সম্মতিগত এইরূপ দুর্বলতা মনুষ্যোচিত নহে। লীগের নীতি বাঙলার সমাজ-বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়া এমন অমানুষ হিংস্রতাকেই প্রশ্রয় দিয়াছে। গান্ধীজী মনুষ্যত্বের এই

অবমাননা হইতে বাঙলার সমাজকে উদ্ধার করিতে চাহেন। তিনি নিজের জীবন দিয়াও এদেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে রক্ষা করিতে ব্রতী হইয়াছেন। জাতির সভ্যতা এবং সংস্কৃতিই যদি ধ্বংস হয়, তবে তাহার পক্ষে স্বাধীনতা লাভের কোন মূল্যই থাকে না। কারণ, মানুষের স্বাধীনতা বন্য বর্বরের স্বাধীনতা নয়। গান্ধীজী নোয়াখালিতে যে পবিত্র ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সম্প্রতি সীমান্ত-নেতা খান আবদুল গফুর খান বিহারে গিয়া সেই ব্রতেই নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু জিন্না সাহেবকে আমরা দুর্গত এবং বিপন্নের সেবাক্ষেত্রে কোথায়ও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দেখিতে পাই না। নোয়াখালির জন্য তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইবে না, ইহা আমরা বুঝি; কিন্তু বিহারের দাঙ্গাবিধ্বস্ত ভূমিতেও তিনি কৃপাপরবশ হইয়া একদিনের জন্যও পদার্পণ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে স্বার্থ-সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে মনুষ্যত্বের উদার কোন আদর্শই মিঃ জিন্নার দৃঢ় যুক্তিবাদকে বিচলিত করে না এবং তাঁহার লীগ-নীতিতে মনুষ্যত্বের সম্বন্ধে বিবেচনার প্রশ্ন একান্তই অবান্তর। মনুষ্যত্বের এমন অবমাননা জাতি দীর্ঘদিন মানিয়া লইতে পারে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না; এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, নিতান্ত বাঁচিবার দায়েই তাহাকে এই পথ ছাড়িতে হইবে।

লীগের ফন্দী

আগামী ২০শে জানুয়ারী গণ-পরিষদের পুনরধিবেশন আরম্ভ হইবে; কিন্তু লীগ এই অধিবেশনেও পরিষদে যোগ দিবে বলিয়া মনে হয় না। কংগ্রেস অবশ্য ৬ই ডিসেম্বরের বৃটিশ বিবৃতি মানিয়া লইয়াছে। মিঃ জিন্না ইহা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন কি না, আমরা বলিতে পারি না, তবে কংগ্রেস তাঁহাকে ফ্যাসাদে ফেলিবার জন্যই এই চাতুরী অবলম্বন করিয়াছে, এজাতীয় মনোভাব মিঃ জিন্নার পক্ষে অসম্ভব নয়। আমরা দেখিতেছি, জিন্না সাহেব বর্তমানে কালহরণের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং গণ-পরিষদ সম্বন্ধে লীগ কমিটির নির্দেশ যাহাতে বিলম্বিত হয়, এই জন্যই তাঁহার চেষ্টা চলিতেছে। মিঃ জিন্না এইভাবে কাল-হরণের দ্বারা কোন কৌশল খুঁজিতেছেন, এখনও বোঝা যাইতেছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী, বিশেষভাবে তাঁহার পরম অন্তরঙ্গ মিঃ চার্চিলের নিকট হইতে নূতন কোন নির্দেশের তিনি অপেক্ষা করিতেছেন কি না, বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনে হয়, মিঃ জিন্না নিজে কিছু না করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারাই তাঁহার কাজটা করাইয়া লইতে চাহেন; শুধু ভারতের অভ্যন্তরে ভীতি প্রদর্শন বা হুমকির আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া সাম্রাজ্যবাদীদিগকে আকৃষ্ট করিবার ভারই আপাতত তাঁহার লীগের হাতে থাকে, ইহাই বোধহয়, তাঁহার অভিপ্রায়। আমরা দেখিতেছি, বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী পূর্ব হইতেই ভীতি প্রদর্শনের এই সুরটা ভাঁজিয়া লইতেছেন। নয়াদিল্লীতে গিয়া তিনি সেদিন বলিয়াছেন, লীগ যদি গণ-পরিষদে যোগ দেয় এবং সেখানে গিয়া কংগ্রেস কর্তৃক ক্রমাগত পরাজিত হয়, ফলে যদি ইহাই দেখা যায় যে, লীগের সমস্ত প্রস্তাব চাপা দিবার কিংবা বাতিল করিবার জন্য কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রযুক্ত হইতেছে, তাহা হইলে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অপরিহার্যভাবে গুরুতর আকার ধারণ করিবে এবং তাহার প্রতিক্রিয়া ভারতের বাহিরে পর্যন্ত দেখা দিবে। লীগের হিটলার মিঃ জিন্নার মর্জি যতই অসঙ্গত হউক, মাথা পাতিয়া তাহা মানিয়া না লইলে ভারতের অভ্যন্তরে কিরূপ গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, লীগ-ওয়ালাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিকল্পনার কল্যাণে আমরা তাহার পরিচয় যথেষ্ট রকমেই পাইয়াছি। কিন্তু বাহিরের প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধে এখনও কোন ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কারণ মুসলিম লীগ মধ্যযুগীয় বর্বর ধর্মান্ধতাকে সম্বল করিয়া চলিয়াছে, ভারতের বাহিরে সব দেশ, বিশেষভাবে নবজাগ্রত মোস্লেম জগৎ বহুদিন হইতেই তেমন সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, লীগ-নেতৃবৃন্দ ভীতি প্রদর্শনের এইরূপ নীতি দ্বারা এক পক্ষে কংগ্রেসকে তাঁহাদের অসঙ্গত দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য করিতে চাহেন, অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উৎসাহিত করিয়া সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথ সুগম করিতেই তাঁহারা উৎসুক। কিন্তু লীগের দলকে তুষ্ট করিবার জন্য কংগ্রেস যতদূর তাহার পক্ষে যাওয়া সম্ভব গিয়াছে, এমন কি, সম্ভবের মাত্রা অতিক্রম করিয়াও কংগ্রেস এক্ষেত্রে অনেক ঝুঁকি লইয়াছে। ইহার পরেও যদি লীগ গণ-পরিষদে যোগদান না করে, তবে লীগকে বাদ দিয়াই গণ-পরিষদ সমগ্র ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কার্যে অগ্রসর হইবে। লীগওয়ালারা যদি সেক্ষেত্রে অনর্থ সৃষ্টি করেন, তবে গৃহযুদ্ধের ভয়েও স্বাধীনতাকামী ভারত বিচলিত হইবে না। বাঙলার বিগত দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ নরনারী পোকা-মাকড়ের মত মরিয়াছে। ফলত, সাম্রাজ্যবাদীদের সুদীর্ঘ শোষণে সমগ্র ভারত উত্তরোত্তর মৃত্যুর পথেই অগ্রসর হইতেছে। এই মহামৃত্যুর কবল হইতে উত্তীর্ণ হইতে গেলে যদি আমাদিগকে শোণিতাক্ত পথেই অগ্রসর হইতে হয়, সেজন্য ভয় করিলে চলিবে না।

ঘৃণিত ষড়যন্ত্র

নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার ব্যাপক অঞ্চলে গুণ্ডারা এখনও দমিত হয় নাই, আমরা একথা আগাগোড়াই বলিয়া আসিতেছি। মোজাহে[দ] দল নামে একটি গুপ্ত সমিতি এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে যেরূপ প্রচারকার্য চালাইতেছে, তাহাতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙলার লীগ-মন্ত্রিমণ্ডল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণে[র] জন্য খড়্গহস্ত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার অভ্যন্তরভাগে রক্তাক্ষরে মুদ্রিত ইস্তাহার প্রভৃতির সাহায্যে লুণ্ঠন এবং নরহত্যা প্ররোচিত করিয়া মোজাহে[দ] দল ক্রমাগত প্রচারকার্য চালাইতেছে। জেহাদ[ী] কারী এই দলের কার্যের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত সরকার কিংবা সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে[র] কোন তৎপরতারই আমরা পরিচয় পাই নাই। পক্ষান্তরে দুষ্কৃতকারীদের দমন করিব[ার] কোন কথা উঠিলেই নিরীহ সংখ্যাগরি[ষ্ঠ] সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হইতেছে, এ[ই] আর্তনাদ উত্থাপিত হয় এবং সেই আর্তনা[দে] অধীর হইয়া বাঙলার লীগ-নীতিনি[ষ্ঠ] মন্ত্রীদের ন্যায়পরায়ণ চিত্ত আর্দ্র হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, সরকারের এমন দুর্বল ও পক্ষপাতপূর্ণ নীতিতে দেশে আইন ও শা[ন্তি] প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না এবং সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা আসে না। পরন্তু গুণ্ডা[দের] স্পর্ধাই বাড়িয়া চলে এবং তাহারা গুরুতর [অপরাধ] অবলম্বনে সাহসী হয়। নোয়াখালি অঞ্চ[লে] এই শ্রেণীর গুণ্ডাদের সাহসের মাত্রা কতদ[ূর] গিয়া উঠিয়াছে, সম্প্রতি আমরা তাহার পরি[চয়] পাইয়াছি। কংগ্রেস-সভাপতি আচার্য কৃপাল[নী] গত ১০ই জানুয়ারী এলাহাবাদে সাংবাদিকে[র] এক সভায় বলেন যে, দত্তপাড়ার নিকটব[র্তী] একটি গ্রামে অবস্থানকালে কয়েকজন গু[ণ্ডা] শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীর কুটীরে হানা দি[বার] ষড়যন্ত্র করে। শ্রীযুক্তা সুচেতা দেবী সময়[মত] সতর্কতা অবলম্বন করায় দুর্বৃত্তদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে স[ঙ্গে] পুলিশ এবং সেনাদল আসিয়া উপস্থি[ত] হওয়াতে দুর্বৃত্তেরা তাহাদের দুরভিসন্ধি কা[র্যে] পরিণত করিতে পারে নাই। চাঁদপ[ুর] ফরিদগঞ্জ এবং হাজীগঞ্জ থানা হই[তে] দুর্বৃত্তদের উপদ্রবের সংবাদ পাওয়া গিয়া[ছে]। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী সুস্পষ্ট ভা[ষায়] বলিয়াছেন যে, নিজের নিরাপত্তার জন্য পু[লিশ] কিংবা সেনাদলের সাহায্য তিনি পছন্দ ক[রেন] না। স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় স্বতঃপ্র[বৃত্ত] হইয়া তাঁহার নিরাপত্তার ভার লইবেন, [তিনি] ইহাই চাহেন। কিন্তু নোয়াখালির সংখ্যাগ[রিষ্ঠ] সম্প্রদায় আগাইয়া আসিয়া ... ন্যায় একজন মহাম[ানবকে] ... প্রতিশ্রুতি প্রদান করি...

সম্বন্ধে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী সেদিন বলিয়াছেন যে, গান্ধীজী যাহাই বলুন, তিনি গান্ধীজীর নিকট হইতে রক্ষিদল সরাইয়া লইবার ঝুঁকি গ্রহণ করিতে পারেন না। নোয়াখালির অবস্থা স্বাভাবিক হইয়াছে; অতএব সেখান হইতে সেনা ও পুলিসের দলবল সরাইয়া আনা হউক বলিয়া চীৎকার করিয়া যাঁহারা অবিরত আমাদের কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করিতেছেন, ইহা হইতেই তাঁহাদের উক্তির যুক্তিবত্তা বোঝা যাইবে। পূর্ব-বঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতেও আমরা দৌরাত্ম্যের সংবাদ এখনও পাইতেছি। সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কোন লোক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধ্যুষিত অঞ্চলে গেলে তাহার জীবন বিপন্ন হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না. এইরূপ ঘটনার সংবাদও বিরল নহে। বাঙলার লীগ-সরকার এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, আমরা তাহাই জানিতে চাই। বাঙলার সমাজ-জীবনে সভ্য-নীতির ধারা যদি তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ না হন এবং সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিই তাঁহাদের শাসন-নীতিকে কলুষিত করে, তবে সকল সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পথই উন্মুক্ত হইবে।

উৎকট নীতি

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রনীতিক সংকট-সন্ধিক্ষণে মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক ভেদবাদের আগুন প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য চতুর্দিকে উৎকট আগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বাঙলার উপরই লীগওয়ালাদের বিশেষ লক্ষ্য। একদিকে আসাম, অন্যদিকে বিহার—এই দুই দিক হইতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ধারাকে সম্প্রসারিত করিয়া বাঙলার বুকে পাকিস্থানী প্লাবন বহাইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। বাঙলার সুরাবর্দী মন্ত্রিমণ্ডল দুই বাহু বাড়াইয়া আসাম ও বিহারের দুই পাকি-স্থানী আন্দোলনকে আগুলাইয়া রাখিতেছেন এবং প্রতীয়মান উদারতার কূটকৌশলে এই হীন ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যোগাইতেছেন। সম্প্রতি বিহারের মুসলিম লীগ তথাকার কংগ্রেসী গভর্নমেণ্টের নিকট চৌদ্দ দফা সর্ত দাবী করিয়া এক চরমপত্র দাখিল করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান দাবী এই যে, বিহার প্রদেশে যত মুসলমান আছে, তাহাদিগকে উক্ত প্রদেশের কয়েকটি কেন্দ্রে পৃথকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বসবাস করিতে দিতে হইবে। বলা বাহুল্য, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদ এবং বিদ্বেষ স্থায়ী করিয়া ভারতের জাতীয়তাবাদের মূলে আঘাত করাই এই দাবীর মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু এবং মুসলমান এতদিন এই দেশে পরস্পর পাশাপাশি বাস করিয়া আসিয়াছে এবং সেই-ভাবে তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সামাজিক সমৃদ্ধির পথে সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছে। লীগওয়ালারা এই সমাজবৃদ্ধির মূলে স্থায়ী-ভাবে আঘাত করিয়া ভারতবর্ষকে দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বভূমিতে পরিণত করিতে চাহেন এবং এইভাবে এদেশের হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সমন্বয়কে ধ্বংস করিয়া মধ্যযুগীয় বর্বর সাম্প্রদায়িকতাকে দেশময় ছড়াইয়া দেওয়াই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। বস্তুত ভারতবর্ষের পরাধীনতা চিরন্তন করিবার গূঢ় অভিসন্ধিই এই নীতির মূলে কাজ করিতেছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই এই নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। বিহার গভর্নমেণ্ট তথাকার উপদ্রুত অঞ্চলে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ও কঠোর হস্তে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; এবং বাঙলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের ন্যায় এই ক্ষেত্রে যে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক কূটনীতিক খেলা খেলিতে শাসকদিগকে সম্মতি-লেক-সূত্রে কোন সুযোগ দান করেন নাই একথা সকলেই জানেন। এ সত্য কাহারও অবিদিত নহে যে, বিহার গভর্নমেণ্ট বিপন্নদের পুনর্বসতির জন্য সর্ববিধ সুযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং মুক্ত-হস্তে তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু মুসলিম লীগওয়ালারা এইসব জ্বলন্ত সত্যকে কোন ক্রমেই স্বীকার করিবেন না; কারণ তাহা করিতে গেলে তাঁহাদের গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় না। তাঁহারা বিহারের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে ভিটামাটি ছাড়া করিয়া তবে নিরস্ত হইবেন। বস্তুত তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির ফলে দরিদ্র জনসমাজের দুঃখ-দুর্দশাও বৃদ্ধি পাইবে; কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থের জন্য লীগ-ওয়ালাদের কোনদিনই ভাবনা নাই। জন-সাধারণকে বিড়ম্বিত এবং ক্লিষ্ট করিয়াই তাঁহারা উপদলীয় স্বার্থের ভেদ-বিদ্বেষময় প্রতিবেশের মধ্যে নিজেদের নেতৃত্ব-গৌরবে পুষ্ট হইতে চাহেন। দেশের এবং জাতির সর্ব-নাশ করিয়াই তাঁহারা জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্তানগণ এতদ্দ্বারা বিভ্রান্ত হইবেন না। তাঁহারা লীগের চক্রান্তজাল-সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিদ্বেষের এই জটিল গ্রন্থিকে আত্মত্যাগের প্রভাবে ছিন্ন করিয়াই স্বাধীনতার পথে সমগ্র ভারতের শুভ শক্তিকে সংহত করিয়া তুলিবেন।

সমস্যা ও প্রতিকার

নিখিল ভারত যুব সম্মেলনের অধিবেশনের সভাপতিস্বরূপে আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের জনবল-সচিব কর্নেল এশান কাদির যে সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করিয়া-ছেন, তাহা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য। আমরা তাঁহার কয়েকটি মন্তব্যের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি বলেন, 'নোয়াখালিতে গান্ধীজী এবং বিহারে খান আবদুল গফুর খানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে, এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত। কারণ অশান্তির মূল কারণ দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি সন্দেহের ভাব থাকিবেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতে বৃটিশের অস্তিত্বই এই সমস্ত গোলযোগের মূলে রহিয়াছে।' কর্নেল কাদির তাঁহার অভিভাষণের অন্য একটি স্থলে বলিয়া-ছেন,—বিহারে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা মর্মান্তিক, কিন্তু এজন্য জনসাধারণ দায়ী নয়। মানুষ স্বভাবতঃই প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে চায়। কোন একটি রাজনীতিক দল যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে, বিহারের ঘটনা তাহারই পরিণতি। এই দলকে বৃটিশের অনুগৃহীত দল বলা ভুল। প্রকৃতপক্ষে এই দল বৃটিশ গভর্নমেণ্টের শক্তি জানে বলিয়াই এই দলের নেতৃবৃন্দ বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছে। ভারতের যুবসম্প্রদায় যখন শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে, তখন এই দল লোপ পাইবে কিংবা তাহাদের কাছে আত্মসমর্পণ করিবে।' যাঁহাদের অন্তরে মানবপ্রেম আছে, মানুষের দুঃখকষ্টে তাঁহাদের প্রাণ স্বভাবতঃই সাড়া দেয় এবং সেক্ষেত্রে সাময়িক ঘটনা-বিচারে সাফল্যের কিংবা অসাফল্যের দিকে সাধকের দৃষ্টি মুখ্যভাবে নিবদ্ধ থাকে না। সেবাতেই তাঁহাদের সার্থকতা; সুতরাং বিহারে আবদুল গফুর খান কিংবা নোয়াখালিতে গান্ধীজীর ব্রতের সাফল্যের বা অসাফল্যের বিচার সাধারণভাবে করা চলে না। বস্তুত মানব-সংস্কৃতির স্থায়ী সমন্বয়ের ক্ষেত্রে মানবতায় এইরূপ ব্রত প্রতীয়মান অসাফল্যের মধ্যেও কার্যত সাফল্য লাভ করিয়া থাকে। পরন্তু তাহা সমধিক ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়। ইহা ছাড়া, মুসলিম লীগের অবলম্বিত নীতি এবং সেই নীতির প্রভাবে জাতি যে দুর্গতির পথে চলিয়াছে, তাহা প্রতিরুদ্ধ করিবার পক্ষে কর্নেল কাদিরের যুক্তির যাথার্থ্য সকলেই স্বীকার করিবেন।

বৃটিশের আন্তরিকতা

গত ১২ই জানুয়ারী সর্দার শার্দুল সিংহ কবিশেরের সভাপতিত্বে আরা শহরে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ভারতের বর্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেশবাসীকে বৃটিশের সদিচ্ছার উপর কোন ভরসা না রাখিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইতে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায় আত্মোৎসর্গের প্রেরণা জাগ্রত করিয়া তোলাই বর্তমানে প্রধান প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট পরনির্ভরতার জটিল এবং অনর্থকর প্রবৃত্তিকেও উৎখাত করা প্রয়োজন।



শিল্পী: শ্রীরামকিংকর বেইজ

শীতের রোদে

ভক্তসাধকের বিশ্বযোগ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

যখন "নাম রূপের" সৃষ্টি হয় নাই, যখন পরব্রহ্ম আপনাতে শুধু আপনিই াজমান ছিলেন, তখন না ছিল কোন কর্ম বা ষ্টা, না ছিল কোন আনন্দ বা উৎসাহ। রসের ভাবে রসস্বরূপ তিনি উঠিলেন হাঁপাইয়া, হার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। "স বৈ ব রেমে" (বৃহদারণ্যক, ১, ৪, ৩)। রসের ও নন্দের খেলায় "দোসর" আর কাহাকেও ই; তাই তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন দ্বিতীয়মৈচ্ছত" (ঐ)। অগত্যা তিনি াপনাকেই পুরুষ প্রকৃতিরূপে দুইভাবে বিভক্ত রিলেন, "স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ" ।। এই জন্যই বৈচিত্র্যহীন রসহীন আনন্দ-ান আদিম সেই একককে নানা নাম-রূপের দ্বারা চিত্র করা হইল (ঐ, ১,৪,৭)।

কাজেই দেখা গেল, এই যে সংসারে নানা দ-বিভেদ, তাহা এক আদিম অভেদ হইতেই নাবিচিত্রতায় রূপান্তরিত (বৃহ, আ, ১,৪,৭)। চিত্রতা ও বিভেদের একমাত্র সার্থকতা হইল হাদের মিলনোৎসবে। স্ত্রী-পুরুষের ভিন্নতার সার্থকতাই হইল তাহাদের প্রেম-াগে। কারণ পরব্রহ্ম একাকী কোন আনন্দ ান নাই বলিয়াই (একাকী ন রমতে, বৃহ, আ, ,৪,৩) তিনি আপনাকে প্রেমযোগেবদ্ধ ী-পুরুষরূপে (স্ত্রী পুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ, হ, আ, ১ ৪ ৩) বিভিন্নতা দান করিলেন।

তিনি "এক" হইতে প্রেম ও আনন্দের না "অনেক" করিলেন, কাজেই সাধকের কাজ ইল "অনেক"কে প্রেমযোগে যুক্ত করিয়া সকল ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সার্থক করা। যোগ-ধনাই হইল সাধনার প্রধান কথা। জ্ঞানে, র্মে, প্রেমে সর্বভাবে সাধক যোগের দ্বারা ভিন্নতাকে এক করিবেন, সার্থক করিবেন। বশ্য এই যোগ-সাধন চিন্ময়বস্তু। ভৌতিক ক্ষেত্রে ইহাই হইয়া দাঁড়াইতে পারে অতি কুৎসিত মলিন ব্যাপার। কেবল সাধনার ক্ষেত্রে নহে সারেও যত ভেদ-বিভেদ তাহাদের একমা র্থকতাই তাহাদের যোগে। এই যে জগতে ত ধর্মভেদ, সংঘভেদ, দেশভেদ ষাভেদ প্রভৃতি অনন্ত ভেদ, সর্বত্রই চাই াগ-সাধনা। সর্বত্রই সাধককে প্রতিষ্ঠা করিতে হবে একটি সাধনোচিত ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব।

আত্ম-পরের ভেদের মূলেও এই থা। সংসারে যত অনর্থ এই আত্মপর ভেদ লইয়া, অথচ এই ভেদকে দূর করার মধ্যেই সাধকের সকল মহত্ত্ব। সংসারের সুখ-শান্তি নষ্ট হয় স্বার্থপরতায়, আর ধর্মেরও মহত্ত্ব নষ্ট হয় স্বার্থপর আদর্শের সাধনে। আদর্শ যেখানে সংকীর্ণ ও হীন সেখানে দিনে-দিনে সাধকও ক্ষুদ্র ও হীন হইতে থাকে।

ভক্ত সাধক যদি শুধু আপন কল্যাণের সাধনা করিতে যান তবে কখনও যথার্থ কল্যাণ হয় না। নিজেকে ও সকলকে যদি একই কল্যাণের মধ্যে যুক্ত না করা যায় তবে আর যথার্থ কল্যাণ কোথায়? স্বার্থ ও পরার্থের এই দ্বন্দ্ববশতই তো আজ য়ুরোপের এইরূপ দুর্গতি। ধর্মসাধনাতেও যে স্বার্থ-সাধনাই ক্রমে প্রধান কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার কারণ আমাদের হীন দৃষ্টি ও ভ্রান্তি। এই জন্যই আজ ধর্মের ক্ষেত্রেও মানুষের এত দুর্গতি।

ভারতবর্ষে ভেদ-বিভেদের তো অন্তই নাই, তবু যুগে যুগে এই দেশে মহাসাধকের দল নানাভাবে স্বার্থ পরার্থের এই যোগের সাধনাই করিয়া আসিয়াছেন। যে প্রেমের বলে ভক্ত সাধক আত্ম-পরের ভেদকে জয় করেন তাহা সাধারণ সমাজসেবকের সেবা অপেক্ষা অনেক গভীর ও মহৎ বস্তু।

বৌদ্ধযুগে ভারতীয় ভক্তসাধক বলিয়াছেন, "যাহা কিছু পুণ্য আমি লাভ করিয়াছি, তাহার দ্বারা আমি যেন সকল জীবের সর্ব দুঃখ দূর করিতে পারি।"

এবং সর্বমিদং কৃত্বা যন্ময়াসাদিতং শুভম্
তেন স্যাং সর্বসত্ত্বানাং সর্বদুঃখপ্রশান্তিকৃৎ॥
(প্রজ্ঞাকরমতিকৃত বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা ৩, ৬)

পীড়িতদের জন্য আমি হইব ঔষধ, হইব বৈদ্য; সেবার জন্য হইব সেবক, যাবৎ না তাহাদের রোগ সম্পূর্ণ দূর হয়।

গ্লানানামস্মি ভৈষজ্যং ভবেয়ং বৈদ্য এব চ।
তদুপস্থায়কশ্চৈব যাবদ্রোগাপুনর্ভবঃ॥
(ঐ, ৩, ৭)

সর্বজীবের কল্যাণের জন্য যেন নিষ্কাম-ভাবে আমরা সর্বস্ব দান করিতে পারি।

নিরপেক্ষস্ত্যজাম্যেব সর্বসত্ত্বার্থসিদ্ধয়ে॥
(ঐ, ৩, ১০)

অনাথদের যেন আমি নাথ হই, পথচারীদের যেন আমি পথপ্রদর্শক হই, পার হইতে ইচ্ছুকদের জন্য আমি যেন নৌকা হই, সবার চলিবার পথে যেন আমি পায়ের তলায় সেতু ও সংক্রম হই।

অনাথানামহং নাথঃ সার্থবাহশ্চ যায়িনাম্।
পারেপ্সূনাংচ নৌভূতঃ সেতুঃ সংক্রম এব চ॥
(ঐ, ৩, ১৭)

দীপার্থীদের জন্য যেন আমি হই দীপ, শয্যার্থীদের জন্য যেন হই শয্যা, দাসার্থীর জন্য যেন হই দাস, এইভাবেই যেন সর্বজীবের সেবা করিতে পারি।

দীপার্থিনামহং দীপঃ শয্যা শয্যার্থিনামহম্।
দাসার্থিনামহং দাসো ভবেয়ং সর্বদেহিনাম্॥
(ঐ, ৩, ১৮)

সর্বজীবের কল্যাণসাধনের জন্য বোধি-সত্ত্বগণ এইরূপ প্রার্থনা করিয়া আপন বুদ্ধত্ব-লাভ পর্যন্ত অস্বীকার করেন।

মহাভারতে দেখা যায় মহর্ষি চ্যবন সর্ব-জীবকে ত্যাগ করিয়া শুধু নিজের মুক্তি স্বীকার করিলেন না। তিনি কহিলেন,—"এই সব দুঃখিত জীবদের দেখিয়া যে দুঃখ না পায়, যে কেবল নিজ হিতই খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহার অপেক্ষা নৃশংস আর কে আছে?

দুঃখিতানীহ ভূতানি দৃষ্ট্বা স্যাদ্ যো ন দুঃখিতঃ।
কেবলাত্মহিতার্থী যঃ কো নৃশংসতরস্ততঃ॥
(অনুশাসন পর্ব, ৫০ অধ্যায়)

মনে, বাক্যে, কথায়, কর্মে যে কিছু সুকৃতি আমি অর্জন করিয়াছি, তাহাতে যেন দুঃখার্ত সকল প্রাণী দুঃখের অতীত হইয়া সুখী হয়।

যন্ময়া সুকৃতং কিঞ্চিৎ মনোবাক্কায়কর্মভিঃ।
দুঃখার্তা জন্তবস্তেন সর্বে সন্তু সুখাবহাঃ॥ (ঐ)

জ্ঞানীরাও যদি স্বার্থপর হইয়া আপন আপন ধ্যান-ধারণা লইয়া থাকেন, তবে সংসার-দুঃখার্ত প্রাণীরা কাহার শরণ লইবে?

জ্ঞানিনোঽপি যদা স্বার্থং নিশ্চিতা ধ্যানমাস্থিতাঃ।
সত্ত্বাঃ সংসারদুঃখার্তাঃ কং যান্তি শরণং তদা॥ (ঐ)

এমন কি উপায় আছে, যাহাতে আমি সকল দুঃখিত জীবের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দুঃখ নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সর্ব দুঃখ হইতে মুক্ত করি।

কোঽন্বত্র স স্যাদুপায়োঽত্র যেনাহং দুঃখিতাত্মনাম্।
অন্তঃপ্রবিশ্য ভূতানাং ভবেয়ং দুঃখভাক্ সদা॥ (ঐ)

দুঃখার্তদের দুঃখ দূর করিয়া অন্তরে যে আনন্দ জন্মে, স্বর্গে বা মুক্তিতে কি তাহার এক আনা আনন্দও আছে?

অপহৃত্যার্তিমার্তানাং সুখং যদুপজায়তে।
তস্য স্বর্গাপবর্গৌ বা কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
(ঐ)

রন্তিদেব শিবিও পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে গিয়া কহিয়াছেন, "জন্মে জন্মে আমার যদি কিছুমাত্র সুকৃতসঞ্চয় হইয়া থাকে, তবে তাহাতে যেন আমি দুঃখার্ত জীবগণের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হই।

যন্মমাস্তি শুভং কিঞ্চিৎ মম জন্মনি জন্মনি।
ভবেয়মহমার্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশকঃ॥
(মহাভারত, বনপর্ব)

ভাগবতে দেখি ভক্তশ্রেষ্ঠ রন্তিদেব

বলিতেছেন, "ঈশ্বরের কাছে অষ্টসিদ্ধিযুক্ত পরা গতি বা অপুনর্ভব মুক্তিও চাহি না। আমি চাই যেন সকল দুঃখার্ত জীবের অন্তরে প্রবেশ করিয়া সবাকার সকল দুঃখ-দাহ আমিই গ্রহণ করি, আর সকলে যেন সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হয়।

ন কাময়েঽহং গতিরীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাম্
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥
(ভাগবত, ৯, ২১, ১২)

ভগবান যখন প্রহ্লাদকে বর দিতে চাহিলেন তখন ভক্তশিরোমণি প্রহ্লাদ বলিতেছেন "হে দেব, মুনিরাও দেখা যায় নিজ নিজ মুক্তির জন্যই নির্জনে তপস্যায় রত, অন্যের কল্যাণে তাঁহাদের কোন আগ্রহ নাই। হে প্রভু, তুমি ছাড়া এই সব ভ্রান্ত জীবদের আর তো কোন উপায় নাই। এই সব কৃপাপাত্র দুঃখার্তদের ছাড়িয়া আমি তো একা মুক্তি চাহি না।

প্রায়েণ দেবমুনয়ো স্ববিমুক্তিকামা।
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ ন বিমুমুক্ষে একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥
(ভাগবত, ৭, ৯, ৪৪)

যুগে যুগে ভক্তগণ নিজ কল্যাণের অপেক্ষা জগতের সর্বজীবেরই কল্যাণ বেশি করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। বাঙলা দেশ যখন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলায় ভরপুর, তখন বাসুদেব দত্ত নামে এমন একজন আপন-ভোলা ভক্ত ছিলেন। একবার রথযাত্রার পূর্বে গৌড়ের ভক্তগণ মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্য পুরীধামে আসিয়া মিলিয়াছিলেন। রথযাত্রা হইয়া গেল। ক্রমে বিজয়া দশমী রাসযাত্রা দীপাবলী এবং উত্থানদ্বাদশীও গত হইল। শ্রীমান্ নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু গোপনে বসিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন। তাহার পর গৌড়ের ভক্তগণকে নিজ নিজ স্থানে ফিরিতে আজ্ঞা করিলেন। বলিলেন, "প্রতি বৎসর আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের গুণ্ডিচা যাত্রা দেখিবে এবং আমাকে দেখা দিয়া যাইবে।" বিদায়কালে মহাপ্রভু বৈষ্ণব ও আচার্যগণকে জনে জনে যথাযোগ্য কার্যের ভার দিয়া দিলেন। শ্রীমদ্ আচার্য অদ্বৈতকে ভার দিলেন, আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি দান করিতে, প্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন গৌড়দেশে অনর্গল প্রেম ভক্তি প্রকাশ করিতে। ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন, "তোমার গৃহে কীর্তনের মধ্যে নিত্য আমিও যোগ দিব।" ভক্ত রাঘব পণ্ডিতের কৃষ্ণ সেবার মহত্ত্ব সকলের কাছে মহাপ্রভু প্রকাশ করিয়া কহিলেন। ভক্ত শিবানন্দকে বলিলেন, "তুমি এই বাসুদেব দত্তের একটা সমাধান করিও। ইনি গৃহস্থ, তবু ইনি হিসাব করিয়া চলিতে জানেন না। প্রতিদিন যাহা আসে তাহাই ব্যয় করিয়া বসেন। একটু বুঝিয়া সুঝিয়া না চলিলে কুটুম্বভরণ হয় কেমন করিয়া? কাজেই ইঁহার ঘরের আয়-ব্যয় সব তুমি নিজেই দেখাশুনা করিও, (চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)। এইরূপ ভাবে জনে জনে বিদায় দিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, গৌড়ীয় ভক্তগণকে যখন মহাপ্রভু বিদায় দেন তখন উত্থান দ্বাদশীও বিগত, অর্থাৎ কার্তিক মাস সমাপ্ত হইয়াছে। ভক্তেরা পুরীতে আসিয়াছিলেন আষাঢ় মাসের পূর্বভাগে স্নানযাত্রার অনবসর সময়ে (চৈ চ, অ, মধ্য, ১১শ পরিচ্ছেদ)। স্নানযাত্রার পর কিছুদিন জগন্নাথের অনবসর অর্থাৎ দর্শনবন্ধ থাকে। তখন মহাপ্রভু মনের দুঃখে আলালনাথে চলিয়া গেলে মহাপ্রভুর পার্শ্ববর্তী ভক্তেরা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, গৌড়ের ভক্তগণ আসিয়াছেন। তখন মহাপ্রভু আপন মনের দুঃখ দূর করিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রতি জনে-জনে যথাযোগ্যভাবে মিলনানন্দ দান করিলেন। তখনও বাসুদেবকে দেখিয়া প্রভু আনন্দিত হইয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া কিছু প্রেমবাণী কহিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে প্রায় পাঁচ মাস পরে মহাপ্রভু গৌড়ে ফিরিবার জন্য সকলকে বিদায় দিতে বসিলেন।

ভক্ত মুরারি গুপ্তকে বিদায়বাণী কহিয়া মহাপ্রভু ভক্ত বাসুদেবকে বিদায়কালীন আলিঙ্গন দিলেন। মহাপ্রভু সহস্র মুখে বাসুদেবের গুণকীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলে বাসুদেব লজ্জিত হইয়া মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন, "হে প্রভু, জগৎ তরাইতে তোমার এই অবতার। আমার একটি নিবেদন আছে, তুমি ইচ্ছা করিলেই তাহা পূরণ করিতে পার! জীবের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় পীড়িত, সর্বজীবের পাপ আমাকে দিয়া তুমি সর্বজীবের ভবরোগ দূর কর, আমি সকলের পাপ লইয়া একাই নরক ভোগ করি।"

জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ তুমি হও দয়াময়।
তুমি মনে কর যদি অনায়াসে হয়॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্বজীবের পাপ তুমি দেহ মম শিরে॥
সর্বজীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৫শ পরিচ্ছেদ)

বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর চিত্ত প্রেমে বিগলিত হইল। তিনি সাশ্রুনয়নে কম্প-স্বরভঙ্গ-সহকারে বলিলেন, "তোমার পক্ষে এইরূপ প্রার্থনা বিচিত্র নহে। তুমি যে সাক্ষাৎ প্রহ্লাদেরই অবতার। তোমার উপর কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ। ভক্তসেবক যাহা প্রার্থনা করেন, কৃষ্ণ তাহাই পূরণ করেন। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া তাঁহার আর অন্য কোন কাজ তো নাই। তুমি তো ব্রহ্মাণ্ডজীবের উদ্ধার চাহিয়াছ। সেইজন্য কাহাকেও পাপভোগ করিতে হইবে না। বিনা পাপভোগেই সকলের উদ্ধার হইবে। তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁহার কি সামর্থ্যের অভাব? জগতের উদ্ধারের জন্য তোমাকে বিশ্বজনের পাপফল ভুঞ্জাইবার কি প্রয়োজন আছে? তুমি যাহাদের কল্যাণ কামনা করিতেছ, তোমার কল্যাণ কামনার বলেই তাহারা বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবের সব পাপ কৃষ্ণই দূর করেন।

শুধু তোমার ইচ্ছামাত্রেই ব্রহ্মাণ্ডের মুক্তি হইবে। বিশ্বমুক্তির জন্য কৃষ্ণের কোন আয়াস মাত্র করিতে হয় না।

এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রুকম্পস্বরভঙ্গে কহিতে লাগিলা॥
"তোমার বিচিত্র নহে তুমি যে প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যাহা মাগে ভৃত্য।
ভৃত্য বাঞ্ছা পূর্ণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য॥
ব্রহ্মাণ্ডজীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপভোগে হবে সবার উদ্ধার॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ববল।
তোমারে বা কেন ভুঞ্জাইব পাপ ফল॥
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥
তোমার ইচ্ছা মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
সর্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহে কোনো শ্রম॥"
(চৈ, চৈ, মধ্য খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ)

কাজেই দেখা যাইতেছে, যুগে যুগে ভক্তর পক্ষে সর্বজনকল্যাণই প্রার্থনীয়। আপন দুঃখনিবৃত্তি তাহার পক্ষে অতি সামান্য কথা। অত জগৎ জুড়িয়া এই যে দুর্গতি, তাহার মূলে আমাদের নিজ নিজ স্বার্থপরতা। ধর্মই যদি আমাদের চিত্তকে এই স্বার্থপরতার সংকীর্ণ বন্ধন হইতে মুক্ত না করিতে পারে, তবে এই জগতের বহু দুঃখের সমাধান হয় কেমন করিয়া?

এখন আমাদের ভ্রান্ত ধর্মবুদ্ধি নিজ নিজ সিদ্ধি ও মুক্তি লইয়াই ব্যাকুল। এইজন্য লোকেরাও দিনে দিনে ধর্মসাধনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন। সকলেই বলেন, "ধর্ম তো আমাদিগকে আরও সংকীর্ণ ও স্বার্থপর করে।" কিন্তু ধর্মের যথার্থ স্বরূপ তো তাহা নহে। আমরা যদি শুধু ধর্মের নামে দোহাই দিয়া অন্যায় আচরণ করিয়া নিজ নিজ অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া লইতে চাই, তবে ধর্মের তাহাতে অপরাধ কি? কাজেই আজ যদি ধর্মকে নিজ মহত্ত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে হয়, তবে তাহার সাধনার প্রধান কথা হওয়া চাই বিশ্বকল্যাণ, আত্মকল্যাণ নহে। তবেই জগতের দুঃখ দূর হয় এবং লোকে ধর্মের মহত্ত্বের কাছে আপনি মাথা নত করে।

পাকিস্তান সমস্যা

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় ছোট ছোট রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা ...ভব না হইলেও কঠিন। গত দুই বিশ্ব-...ধ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ... রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব বড় রাষ্ট্রসমূহের ...গ্রহের উপর নির্ভর করে। তাহাদের ...ত্র ও স্বাধীন সত্তা সম্বন্ধে কোনই ...য়তা থাকিতে পারে না। তাহাদের ...নিতা, রাজ্যের অখণ্ডতা, এমন কি, যুদ্ধের ... নিরপেক্ষতার মর্যাদা রক্ষা করা হয় না। ...তবর্ষের জনসংখ্যা ৪০ কোটি, আয়তন ও ...তিক সম্পদও বিপুল, (অবশ্য প্রতীচ্যের ...ান মানানুযায়ী ঐসব সম্পদের উৎকর্ষ ...ত হয় নাই)। কাজেই পৃথিবীর জাতি-...র মধ্যে মর্যাদা ও ক্ষমতার আসনলাভের ... সে করিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ ...স্বতন্ত্র হিন্দু ও মুসলিম রাষ্ট্রে বিভক্ত ...তাহা হইলে সে স্থান অধিকার করিবার ... তাহারা করিতে পারে না। এইরূপ ...ত স্বাধীন রাষ্ট্র—সে রাষ্ট্র হিন্দু রাষ্ট্রই ... বা মুসলিম রাষ্ট্রই হউক বাধ্য হইয়াই ...াপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্তরে ...ীত হইবে। হিন্দু রাষ্ট্র অপেক্ষা উত্তর-... ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মুসলিম ...ক অঞ্চলগুলিই আরও বেশী করিয়া ...। কারণ ভারতের সমগ্র উপদ্বীপ ভাগ ... বাঙলা ও পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী সমগ্র অংশ ...রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। ভারতবর্ষ ...ত হওয়ার ফল এই হইবে যে, একটি বৃহৎ ...শালী রাষ্ট্রের পরিবর্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ...র্বল রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। একটি ঐক্য-... ভারতীয় রাষ্ট্র বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের নিকট ...ত যে অধিকার, সুযোগ ও সুবিধা আদায় ...তে পারিত, এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি তাহা ...বে না।

...বর্তমান রাষ্ট্রিক চিন্তাধারা বৃহত্তর রাষ্ট্র ...ঠনের দিকেই চলিয়াছে। সম্মিলিত ... বা রাষ্ট্রচক্র গঠনের কথা হামেশাই আলোচিত ...চ্ছে, সে সম্বন্ধে চিন্তাও করা হইয়াছে। ...রূপে জাতিত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের ...ক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, এরূপ রাজ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যার কোনই সমাধান হয় না। কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, রোগের চেয়ে ঔষধই মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর কোথাও লঘিষ্ঠ কোন সম্প্রদায়শূন্য একজাতিক রাষ্ট্র গঠন যদি অসম্ভব না-ও হয়, তথাপি অত্যন্ত কঠিন। ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু বা মুসলিম রাষ্ট্রগঠন করা অসম্ভব যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম বা হিন্দু বহু সংখ্যায় থাকিবে না।

যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত বিভাগের প্রস্তাব করা হইয়াছে, বিভক্ত রাষ্ট্রগুলিতেও সেই সমস্যাই দেখা দিবে। সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেমন বলা হয়, তেমনই সেই সব রাষ্ট্র সম্বন্ধেও বলা হইবে যে, সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের উপর অত্যাচার করা হইতেছে এবং ভারতবর্ষ বিভাগের যে সব কারণ ও যুক্তি দেখানো হয়, ভারতবর্ষকে আরও বিভক্ত করিবারও সেই সব কারণ ও যুক্তিই দেখা দিবে। সমজাতির অধিবাসীগণগুলির এক রাষ্ট্রভুক্ত করিবার সমস্যা আরও তীব্র আকারে দেখা দিবে।

অ-মুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত বিভক্ত হওয়াতে, বিভক্ত ইউরোপের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরা যেমন শান্তভাবে বিভাগ মানিয়া লয় নাই, তেমনি অ-মুসলমানেরা তাহা মানিয়া লইবে না। ফলে হিন্দু ও মুসলমান রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরুদের নিকট সংখ্যালঘু হিন্দু ও মুসলমানেরা ক্রমাগত সাহায্যের জন্য আবেদন করিবে। ফলে যে মনান্তর দূর করিবার জন্য বিভাগ করা সেই মনান্তর আরও বৃদ্ধি পাইবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য প্রচুর ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই হউক বা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েরই হউক,—কেহই নিজেদের নিরাপদ মনে করিবে না। ভারতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মোটেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে না। অধিকন্তু হিন্দু ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলি বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের চক্রান্তের কেন্দ্র হইয়া উঠিবে এবং তাহারা হিন্দু ও মুসলিম রাষ্ট্রের বিরোধের সুযোগও গ্রহণ করিতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে বহুসংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক বরাবর অশান্তি সৃষ্টি করিয়া চলিবে এবং ফলে যাহারা অপরের অশান্তির সুযোগে নিজেদের সুবিধা করিয়া লওয়ার সুযোগে থাকে, তাহাদের পক্ষে ঐ সব রাষ্ট্র লোভনীয় স্থান হইয়া উঠিবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা

মুসলিম ও হিন্দু উভয় রাষ্ট্রেরই মুসলমানেরা একথা ভুলিতে পারিবে না যে, মুসলমান এলাকায় হিন্দু অথবা অ-মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যার হার খুব বেশী—সমগ্র ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানের চেয়ে তো বেশীই. বিভাগের ফলে যে হিন্দু-রাষ্ট্র গঠিত হইবে, তাহার সংখ্যালঘু মুসলমানের চেয়ে আরও অনেক বেশী। যেসব জেলাতে অ-মুসলমানের সংখ্যায় বেশী, সেই জেলাগুলি যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে উত্তর-পশ্চিম মুসলিম এলাকায় সংখ্যালঘু অ-মুসলমান হইবে শতকরা ২৩ জন এবং পূর্ব এলাকায় অ-মুসলমানের সংখ্যা হইবে শতকরা ৩১ জন। আর লীগ প্রেসিডেন্টের বর্তমান দাবী অনুসারে যদি সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ উত্তর-পশ্চিম এলাকায় এবং সমগ্র বাঙলা ও আসাম পূর্ব এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে উত্তর-পশ্চিম এলাকায় অ-মুসলমানের সংখ্যা হইবে শতকরা ৩৮ জন এবং পূর্ব এলাকায় হইবে শতকরা ৪৮ জনেরও বেশী। তাহা ছাড়া, অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের আরও এই সুবিধা হইবে যে, গোটা প্রদেশই মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে আসামে ও বাংলা দেশের পশ্চিম অংশে এবং পাঞ্জাবের পূর্বাংশে অ-মুসলমানেরাই সংখ্যাধিক হইবে। অপরপক্ষে হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং বাঙলা হইতে পাঞ্জাব —এই বিরাট ভূভাগের মধ্যে মুসলমানেরা ইতস্তত ছড়াইয়া থাকিবে এবং তাহাদের সংখ্যা শতকরা ১১ জনেরও কম। কাজেই হিন্দু-রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু মুসলমানেরা মুসলিম এলাকাগুলির সংখ্যালঘু হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক দুর্বলতর হইবে। এখন যেমন বলা হইতেছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠেরা সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচার করিবে, এইরূপ বিভাগের ফলে সেরূপ অত্যাচারের কারণ ও সুযোগ তো আরও বাড়িয়াই যাইবে। সংহতিবদ্ধ অবস্থায় থাকিলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধের মীমাংসা করা কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের পক্ষে সহজতর হয়। কিন্তু একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে অন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কার্যে হস্তক্ষেপ করা (একটি রাষ্ট্র যদি সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচারও করে এবং সেই সংখ্যালঘুদের প্রতি যদি অপর রাষ্ট্রের সহানুভূতি থাকে), অসম্ভব না হইলেও খুব কঠিন। কারণ তাহাতে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা থাকে। কোন দেশই সহজে অথবা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া আর একটি দেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না। তাহা ছাড়া বর্তমান

অবস্থায় দুইটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ হইলে অন্যান্য রাষ্ট্রও তাহাতে জড়াইয়া পড়ে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা খুব কঠিন; কাজেই সেরূপ হস্তক্ষেপ তাহারা কদাচিৎ করিবে; কাজেই সংখ্যালঘুদের রক্ষাকার্যে তাহা মোটেই সহায়ক হইবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বিভক্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ দেওয়া সত্ত্বেও তাহা কার্যকর হয় নাই এবং ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পাপচক্র

ইউরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাস হইতে যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি, তাহা হইলে জাতিত্বের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য জেদ করা আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। ভারত বিভাগ করিয়া এবং জাতিত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা সঙ্গত হইবে না। কারণ এরূপ রাষ্ট্র জাতিত্বের নামে উন্মত্ত হইয়া উঠিতে বাধ্য। তাহা ছাড়া এই সব রাষ্ট্রের মনোভাবই এরূপ হইবে যে, ইউরোপে যেরূপ সংখ্যালঘুদের ধ্বংস করিয়া একজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছিল, সেরূপ না করিলেও সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমাইয়া একজাতীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা না করা মনোভাবের দিক দিয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। ফলে খুব খারাপ ব্যাপার যদি না-ও ঘটে, তবু নিত্য সংঘর্ষের সৃষ্টি হইবেই এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিপীড়িত হইবে। আর এরূপ নিপীড়নের সংগত কারণও থাকিবে; কারণ রাষ্ট্রের প্রতি যে আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহা দেখাইবে না। এই বেড়াপাক হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন হইবে, কারণ তাহার জন্য কোন গরজ থাকিবে না, বরং ঐ বেড়াপাক যাহাতে না ভাঙে, তাহার স্বপক্ষেই বহু কারণের সৃষ্টি হইবে। কাজেই ভারতবর্ষে জাতিত্বের ভিত্তিতে ছোট ছোট রাষ্ট্র গঠন করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা সঙ্গত হইবে না। তাহার সমাধান করিতে হইবে সমগ্র দেশব্যাপী একটি বৃহৎ বহুজাতিক রাষ্ট্র গঠন করিয়া; যাহাতে সমস্ত অংশগুলিরই আত্মকর্তৃত্ব থাকিবে এবং সমগ্র দেশই ধর্মের, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সুবিধা ও অধিকার ভোগের প্রতিশ্রুতি পাইবে এবং সকলেরই আত্মোন্নয়নের সমান অধিকার থাকিবে।

অযৌক্তিক

এখানে লোকসংখ্যাদির সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াই দেখানো দরকার যে, সমগ্র পাঞ্জাব এবং সমগ্র বাঙলা ও আসাম প্রদেশ যথাক্রমে উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব মুসলিম এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইবে বলিয়া মুসলিম লীগ যে দাবী করে, তাহা বিচারসহ নহে। এরূপ দাবী লীগের লাহোর প্রস্তাবের নীতির বিরোধী এবং এক অযুক্তি ও জবরদস্তি ছাড়া কোন যুক্তিই উহার সমর্থনে নাই। ভারত বিভাগের অনুকূলে এই যুক্তি দেখানো হয় যে, ভারতের কোন কোন অংশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার তাহাদের আছে। বস্তুতঃ পাঞ্জাবের ২৯টি জেলার মধ্যে ১২টিতেই তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ নহে। ঐগুলিতে তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৩৩ জন মাত্র। বাঙলার ২৮টি জেলার মধ্যে ১২টিতে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ নহে। ঐগুলিতে উহাদের সংখ্যা শতকরা ২২ মাত্র। সমগ্র আসাম প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৩৩। আসামের ১২টি জেলার ১১টিতেই তাহারা সংখ্যালঘু, একটিতে মাত্র তাহারা সংখ্যাগুরু।

ভারত বিভাগের দাবী যদি স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত জেলাগুলিতে যাহারা সংখ্যাগুরু, তাহারা যে কোন বিভাগ মানিয়া লইবে, তাহার অনুকূলে কোন যুক্তিই নাই। ভারত বিভাগের পক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো হয়, সেই সব যুক্তিতেই এইগুলিকে মুসলিম এলাকার বাহিরে রাখিতে হয়। বস্তুত সমগ্র আসাম প্রদেশকেই পূর্ব মুসলিম এলাকা হইতে বাদ দিতে হয়। কলিকাতায় মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ২৪ জন, বর্ধমান জেলায় শতকরা ১৮ জনেরও কম। কাজেই কলিকাতা ও কয়লার খনিগুলিসহ বর্ধমান জেলাকে পূর্ব মুসলিম এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার দাবী মুসলিম লীগ করিতে পারে না।

মুসলিম এলাকাগুলির সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়া বিচার করিলে মুসলিম এলাকাগুলির অবস্থা কিরূপ হইবে, এখন আমরা তাহাই আলোচনা করিব। উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব দুইটি এলাকাই একেবারে কৃষিপ্রধান। পূর্ব এলাকায় জন বসতি খুব ঘন। বাঙলা দেশে প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে ৮১৯ জন লোক বাস করে, ঢাকা এবং ত্রিপুরা জেলায় আবার জন-বসতি প্রতি বর্গ মাইলে ১৫০০-এর উপরে উঠিয়াছে। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরে বাঙলা দেশের জনসংখ্যা ৩ কোটি ৯০ লক্ষ হইতে ৬ কোটি হইয়াছে; অর্থাৎ শতকরা ৫৪ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষিকার্যের জন্য যে জমি প্রকৃতি দিয়াছে, তাহা আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এই প্রদেশের সমগ্র জনসংখ্যার উপযোগী চাউল সেখানে উৎপন্ন হয় না। স্যার আজিজুল হক ১৯৩১ সালের আদম-সুমারি অনুসারে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৯২৭-২৮ হইতে ১৯৩৬-৩৭—এই দশ বৎসরে যে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হিসাব করিলে দেখা যায় যে, জনপ্রতি দৈনিক ১৪ ছটাক চাউল লাগে ধরিয়া ধরিলে বৎসরে ষোল কোটি মণ কম ধান উৎপন্ন হইয়াছে। আর জনগণকেও যে বার ছটাক হিসাবে চাউল দেওয়া হয়, সেই হিসাবে ধরিলে ধান কম হইয়াছে নয় কোটি মণ। শিশু ও অন্যান্য যাহারা পূর্ণ বয়স্কের সমান আহার করে না, তাহাদের কথা বিবেচনা করিয়াই এ হিসাব করা হইয়াছে। চিনি তৈল-বীজ, আর ডাল ঘাটতি হয় আরও বেশী। স্যার আজিজুল দেখাইয়াছেন যে, ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙলা দেশে সাদা চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল ৬। লক্ষ মণ, আর আমদানী করিতে হইয়াছিল ৩৫½ লক্ষ মণেরও বেশী। বাঙলা দেশে যত তৈল বীজের প্রয়োজন, তাহার এক দশমাংশ এবং যত ডালের প্রয়োজন হয় তাহার এক-পঞ্চমাংশ মাত্র বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়। এইসব কারণেই ১৯৪৩ সালে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। পাঞ্জাব ও সিন্ধুর অবস্থা এদিক দিয়া অনেকটা ভাল। পাঞ্জাবের যে গমের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা বেশী গম পাঞ্জাবে উৎপন্ন হয়, আর পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে উন্নত ধরণের যে কার্পাস তুলা উৎপন্ন হয়, তাহা সাধারণতঃ এই প্রদেশ দুইটির বাহিরেরই চাহিদা মিটায়। এই প্রদেশ দুইটিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। কাজেই সেখানে কৃষির প্রসারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ঐ দুইটি প্রদেশের পক্ষে বাংলাদেশের বিরাট ঘাটতি পূরণ করা সম্ভবপর নহে।

যুক্ত ভারতে প্রয়োজনের সময় দ্রুত সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, যেমন ১৯৪৩-৪৪ সালে করা হইয়াছিল। কিন্তু বিভক্ত ভারতে যদি ঐরূপ করা সম্ভবও হয়, তথাপি তাহা সহজে করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। মুসলিমপ্রধান বাংলার একটা সুবিধা আছে। ওখানে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। ঐ পাটের প্রায় অর্ধেক ভারতের অমুসলমান এলাকায় অবস্থিত মিলগুলির জনাই প্রয়োজন হয়, আর বাকী অর্ধেক বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পাট অর্থকর শস্য। ইহার দামের জন্য ভারতীয় ও বিদেশী ক্রেতাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। স্যার আজিজুল দেখাইয়াছেন যে, পাটের উৎপাদন ইত্যাদিতে যে ব্যয় হয়, তাহাতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পাট বিক্রয় করিয়া মোটেই লাভ হয় না।

শিল্প সম্পর্কে অধ্যাপক রেজিনাল্ড কুপল্যান্ড বলিয়াছেন যে, শ্রমশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায় ভারতের মোট শিল্পের শতকরা ৩৩ ভাগ বাংলাদেশেই রহিয়াছে। কিন্তু কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী স্থানগুলিকে যদি পূর্ব মুসলিম এলাকা হইতে বাদ দেওয়া যায়, (বস্তুতঃ ঐ স্থানগুলি ও

তাহাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি হিন্দু-অধ্যুষিত বলিয়া বাদ পড়িবেই), তাহা হইলে মুসলিম এলাকায় শতকরা ৩ ভাগেরও কম শ্রমশিল্প-ব্যবস্থা থাকিবে। বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে উল্লেখযোগ্য কোন শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠান নাই। সিন্ধুর অবস্থা সামান্য একটু ভাল। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পাঞ্জাবের অবস্থা কিছুই নয়। পূর্ব দিকের জেলাগুলি যদি ঐ প্রদেশের মুসলিম এলাকা হইতে বাদ পড়ে (এবং উল্লিখিত কারণে ঐগুলি বাদ পড়িবেই) তাহা হইলে ঐগুলির অবস্থা আরও খারাপ হইবে। কিন্তু দুইটি মুসলিম এলাকারই সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা এই যে, উহার কোনটিতেই খনিজ সম্পদ নাই। প্রায় সব কয়লা ও লোহার খনিই এই এলাকাগুলির বাহিরে। অভ্র, তামা ও অন্যান্য ধাতু সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা চলে। একথা সকলেই জানে যে, কয়লা, লোহা এবং অন্যান্য সহযোগী ধাতু ছাড়া বর্তমানে কোন রাষ্ট্র চলিতে পারে না। আসামে পেট্রোলিয়াম আছে, কিন্তু তাহা তো মুসলিম এলাকার বাহিরে। উত্তর-পশ্চিম এলাকায় পেট্রোলিয়াম যে যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া যাইবে, তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

আর্থিক অসুবিধা

যে প্রদেশগুলি লইয়া মুসলিম এলাকা গঠিত হইবে, সেগুলির আর্থিক অবস্থা বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান অসামরিক শাসনকার্য পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না, কেন্দ্রীয় ভারত গভর্নমেন্টের প্রায় দুই কোটি টাকা সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত সিন্ধু প্রদেশেও ঘাটতি হইত। পাঞ্জাব এবং বাঙলা নিজেদের ব্যয় নিজেরাই সংকুলান করিতে পারে, কিন্তু আসামকে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের বার্ষিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। বিভক্ত হইলে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব মুসলিম এলাকার সঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। কাজেই উহাদের প্রদেশ-গুলির ঘাটতি পাঞ্জাব ও বাঙলার রাজস্ব হইতে মিটাইতে হইবে অথবা নূতন কর ধার্য করিয়া ঐ প্রদেশগুলি হইতেই টাকা উঠাইতে হইবে। ফলে জাতি গঠন বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধির ভার অথবা অন্যভাবে জাতির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা বহন করা ঘাটতি প্রদেশগুলির সাধ্যের অতীত হইবে এবং ঘাটতি প্রদেশগুলির ঘাটতি পূরণ [illegible] হয় বলিয়া আত্মনির্ভরপরায়ণ প্রদেশগুলির পক্ষেও অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্রোচিত কর্ম-বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও ব্যয়নির্বাহ এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা তাহাদের করিতে হইবে। ঐ সকল প্রদেশ হইতে বর্তমান ভারত গভর্নমেণ্ট যে রাজস্ব আদায় করেন, বিভাগের পরে তাহা তাহাদের (মুসলিম এলাকাগুলির) কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট পাইবে। তাহাদের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট পরিচালনার ব্যয় তাহাতে হয় তো নির্বাহ হইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা যুদ্ধপূর্ব সামরিক ব্যবস্থার মতও দেশরক্ষার ব্যবস্থা রাখার ব্যয় নির্বাহ করা অসম্ভব হইবে। বর্তমানের মান অনুযায়ী কার্যকরী দেশরক্ষার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য যদি সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে সে ব্যয় নির্বাহ করা তো অসম্ভবই হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের হারে রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করিলে, বিভক্ত মুসলিম রাষ্ট্রের জনপ্রতি হারে ধরিয়াও যদি দেশরক্ষার ব্যয়াদি মিটাইতে হয়, তাহা হইলে ৫।৬ কোটি টাকার মত ঘাটতি পড়িবে।

বলা বাহুল্য, পূর্ব-এলাকা ও উত্তর-পশ্চিম এলাকা ভারতের সীমান্ত বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ দুই অঞ্চলে যে ব্যয় করেন তাহা জনপ্রতি হারে ধরিলে যাহা হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। কাজেই ঘাটতি আরও অনেক বেশী পড়িবে। অধ্যাপক কুপল্যাণ্ডের ভাষায় "এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে, পাকিস্তান ভারতের অন্তর্গত থাকিলে তাহার রক্ষার জন্য যে সামরিক ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হইত পাকিস্তানের পক্ষে তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে। দেশরক্ষার যে ব্যবস্থা একেবারে না রাখিলেই নয়, তাহার ব্যয় নির্বাহ করিতেও উহার উপর চরম চাপ পড়িবে এবং তাহাতে জনসাধারণের সামাজিক উন্নতির অগ্রগতি ব্যাহত হইবে।"

সরকারী ঋণ সমস্যা

স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কে আরও একটা বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। গত যুদ্ধের সময় ভারতের সরকারী ঋণ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন উহার পরিমাণ প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। বিভক্ত রাষ্ট্রগুলিকেও উহার কতকাংশ লইতে হইবে। দুই এলাকার মসলমানপ্রধান জেলাগুলির জনসংখ্যা অনুসারে হারাহারি করিয়া তাহাদের ভাগে ঋণের যে অংশ পড়িবে তাহার পরিমাণ হইবে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। শতকরা ৩ টাকা হার সুদে উহার বার্ষিক সুদের পরিমাণ হইবে ১৫ কোটি টাকা। দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্য যে ৫ অথবা ৬ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে তাহার সঙ্গে যুক্ত হইলে দুইটি মুসলিম এলাকাকে যুদ্ধপূর্ব ব্যয়ের হার বজায় রাখিলেও তাহাদের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের জন্য ২০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বের ব্যয়ের ঐ পরিমাণ বজায় রাখা অসম্ভব, কাজেই উহার ঐ পরিমাণও যথেষ্ট বাড়াইতে হইবে। যেখানে মোট রাজস্বের পরিমাণ ২৬ অথবা ২৭ কোটি সেখানে ২১ কোটি টাকার ঘাটতি পূরণ করিতে গেলে আর্থিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ওলট-পালট করিতে হইবে এবং যে সমস্ত সূত্রে ঐ সমস্ত আয় আসিবে সেই সূত্রগুলিও ছিন্ন হইয়া যাইবার উপক্রম হইবে।

কাজেই আমরা দেখিতেছি যে, বিভাগের প্রস্তাব বিচারসহ নহে। যে সমস্যা সমাধানের জন্য বিভাগ করা সেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। কারণ, হিন্দু ও মুসলমান উভয় এলাকায়ই প্রচুর সংখ্যালঘিষ্ঠ থাকিয়া যাইবে। যুক্তভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-গুলির যে অবস্থা হইবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হিন্দু ও মুসলমান রাষ্ট্রে তাহাদের অবস্থা তাহা অপেক্ষা অনেক খারাপ হইবে।

মুসলিম এলাকায় সংখ্যালঘু অমুসলমানরা, তাহাদের সংখ্যাবহুলতা, ও বাসসান্নিধ্যের জন্য, মুসলমানেরা হিন্দু এলাকায় যেভাবে নিজেদের আত্মরক্ষা করিবে তাহা অপেক্ষা অনেক ভালভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। মুসলিম এলাকায় হিন্দুদের সমপরিমাণ সুযোগ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকাতে হিন্দু এলাকা সংখ্যালঘু মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা দিতে কোন প্রেরণা পাইবে না। পূর্ব-মুসলিম এলাকার কৃষি ও শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইবে। উত্তর-পশ্চিম এলাকায় কৃষি-অবস্থা ভাল হইলেও শিল্পের দিক দিয়া উহার অবস্থা পূর্ব-এলাকা হইতে বিশেষ ভাল হইবে না। উত্তর-পশ্চিম এলাকার কোন কোন প্রদেশের ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব পড়িবে পাঞ্জাবের উপর।

বিভিন্ন প্রদেশে যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহা হইতে সেই প্রদেশের ব্যয় কোনরূপে চলিতে পারে বটে, কিন্তু কেন্দ্রীয় রাজস্বের যে অংশ তাহাদের ভাগে পড়িবে তাহা দ্বারা কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে যে ব্যয় বহন করিতে হয়, তাহা বহন করা সম্ভবপর হইবে না। তাহারা দেশরক্ষা-ব্যবস্থা যুদ্ধপূর্ব কালের মতও রাখিতে পারিবে না, বর্তমানের বর্ধিত ব্যয়ভার বহন তো দূরের কথা। সরকারী ঋণের যে অংশ তাহাদের উপর পড়িবে তাহার সহিত দেশরক্ষার ব্যয় যুক্ত হইয়া তাহাদের অবস্থা সম্পূর্ণ অচল করিয়া তুলিবে এবং ঐ রাষ্ট্রের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সমস্ত আশা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সমস্ত প্রস্তাবটিই রোষ ও সাময়িক উত্তেজনার ফল। উহাকে যদি কার্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে সমগ্র দেশের এবং বিভক্ত এলাকাগুলির হিন্দু ও মুসলমানের ক্ষতি অবধারিত, বিশেষতঃ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদেরই বেশী ক্ষতি হইতে বাধ্য।

পুস্তক পরিচয়

তীর ও তরঙ্গ—শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রাপ্তিস্থান—পুস্তকালয়, ২৯, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের তীর ও তরঙ্গ উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বইটি যে পাঠকদের নিকট সমাদৃত হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। কাজেই বইটির সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন দেখি না। বাংগলার পল্লীজীবনের সমস্যা, পল্লী ত্যাগ করার দরুণ উহার সকরুণ অসহায়তা শ্রীযুত ভট্টাচার্যের লেখনীমুখে উজ্জ্বল রূপ পাইয়াছে।

ছেলেদের গান—স্বামী চণ্ডিকানন্দ প্রণীত। উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য পাঁচ সিকা।

ছেলেদের গান ভক্তিভাবোদ্দীপক কতকগুলি সংগীতের সমষ্টি। গানগুলিকে এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে, যথা,—মাতৃসংগীত, শিব সংগীত, বিবিধ সংগীত, মহামানব সংগীত। ভগবানে মাতৃভাব আরোপিত করিয়া রচিত গানগুলি ভক্তি ও আবেগপূর্ণ, উহাদের সহজ, সরল প্রসাদগুণ পাঠকের মনে প্রশান্তি আনিয়া দেয়। অন্যান্য সংগীতের মধ্যে জাতীয়ভাবোদ্দীপক সংগীতগুলিও সহজেই মন আকৃষ্ট করে। বইটি সংগীতানুরাগীদের নিকট আদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

জীবনের ভুল—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার পুরকায়স্থ প্রণীত। লেখক কর্তৃক শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

একখানি উপন্যাস। লেখকের এ নূতন প্রচেষ্টা, কাজেই একেত্রে যাহা হওয়া সম্ভব, বলিবার বিষয় যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও আখ্যানভাগ দানা বাঁধিতে পারে নাই। তবে লেখকের ভাষা বেশ জোরালো।

বন-জ্যোৎস্না—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক : পুস্তকালয়, ২৯, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বার আনা।

বস্তুবাদী লেখক হিসাবে শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রত্যেক পাঠকের নিকটই পরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি নারায়ণবাবুর আধুনিকতম গল্প-সঞ্চয়ন। সত্য ও সুন্দরের অপরূপ সমন্বয় সাধনই লেখকের বৈশিষ্ট্য। তিনি রাজনীতি-সচেতন, কিন্তু তাঁর লেখায় রাজনীতির ছাপ এত প্রচ্ছন্নভাবে থাকে যে, তাহাতে কোন অংশে সাহিত্য রস ক্ষুণ্ণ হয় না। এই দিক দিয়া 'বার রিকের বিল' গল্পটি অপূর্ব সৃষ্টি। 'বন-জ্যোৎস্না' পড়িলে লেখকের সৌন্দর্যপিপাসু হৃদয়ের সন্ধানও পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি বাংগলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা প্রকাশকের সুরুচির পরিচয় দেয়।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত—পদ্য ভাগ, দশম খণ্ড। কবি কিংশুক ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু প্রণীত এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। মূল্য সাধারণপক্ষে ১৷০ এবং স্থায়ী গ্রাহক পক্ষে ১, টাকা। প্রাপ্তিস্থান—লীলামৃত কার্যালয়, ৪১সি, শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাসের লিখিত ক্রমপ্রকাশিত শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিলীলামৃতের দশম খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। ব্রহ্মচারীজী তাঁহার স্বভাবসুলভ বিচিত্র ছন্দে প্রভু জগদ্বন্ধুর প্রেমময় লীলা প্রাণপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে উদার প্রেমের আদর্শে চিত্ত অনুপ্রাণিত হয় এবং বাঙলার সংস্কৃতির সমৃদ্ধি উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়া থাকে; অধিকন্তু তৎকালীন বাঙলার সমাজজীবনের সমগ্র ভাবাদর্শের স্বরূপও আমাদের মনে ফুটিয়া উঠে। দেশের বর্তমান অবস্থায় এমন গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শুশ্রূষা বিদ্যা (শুশ্রূষা বিদ্যা সংক্রান্ত সমুদয় পুস্তক একত্রে বাঁধান) ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস প্রণীত। শুশ্রূষা বিদ্যা ১—৫ম পাঠ, যুদ্ধাস্ত্র-আহতদের চিকিৎসা, সরল ধাত্রী-শিক্ষা, কুমারতন্ত্র ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা (দ্বাদশ সংস্করণ। মূল্য আপাততঃ পূর্ববৎ ৭৷৷০ মাত্র। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তকের মোট মূল্য ৯৸৶০। প্রাপ্তিস্থান ৫৭।১।১এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট।

ইতিপূর্বে শুশ্রূষা ব্যবসা ছিল বৈদেশিক মহিলাদের একচেটিয়া। গ্রন্থকর্তা তদানীন্তন কর্পোরেশন স্বাস্থ্য কমিটির সভাপতি, দেশীয় মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন কর্পোরেশনের অনুমতিক্রমে বৈদেশিক মহিলাদের শিক্ষা সংক্রান্ত কর্পোরেশনের টাকা হইতে কিছু টাকা কাটিয়া নিয়া। নানাবিধ কুসংস্কার বশত প্রথমত শিক্ষার্থিনীদের নিকট হইতে বেশী আবেদন আসে নাই। পরে যখন তাঁহারা স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া উপার্জনক্ষম হন এবং সুখ্যাতি লাভ করেন হাসপাতালে তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হয়। তাঁহাদের অর্থ গ্রহণ করিতেন কিন্তু সমা দিগকে গ্রহণ করেন নাই, প্রবেশ করিতে রন্ধনশালায়। চিত্তরঞ্জন হাসপাতালই প্রথ কেন্দ্র খুলিতে স্বীকৃত হন। এখন শিক্ষ শিক্ষিত এবং কাউন্সিল রেজিস্টারীভুক্ত কোন সাধারণের দানপ্রাপ্ত কোন তাঁহাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ। আইন নিয়ন্তারা দণ্ডনীয়।

মাংগলিক—মাসিক পত্র। সম্পাদক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ৫ ও ৬ গভর্নমে নর্থ, কলিকাতায় অবস্থিত ভারতীয় সোসাইটির বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার পক্ষ প্রকাশিত। মূল্য বার্ষিক সডাক সাড়ে তি প্রতি সংখ্যা চার আনা।

পত্রিকাখানি সুমুদ্রিত এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রবন্ধাদিতে সমৃদ্ধ।

ইঙ্গিত—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা। দেড় টাকা।

ইঙ্গিত গল্পের বই। তবে গল্প না গল্পিকা বলিলেই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত অল্প কথায় একটি বিশেষ রস, আর একটি চরিত্র অথবা একটু মনস্তত্ত্ব তুলিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছেন। মাত্র লাইনের মধ্যে এক একটি পরিপূর্ণ ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সুনিপুণ শিল্পী তুলির কয়েকটি আঁচড়ে এক একটি পরিপূ ফুটাইয়া তোলেন, এও তেমনি। ক ভাষায়, "ইহার ইঙ্গিতগুলি বিচিত্র পূর্ণ।" (২১৩)

মৃত্যুর গুহায়—কৃত্তিবাস ওঝা প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। করোটি ক্লাব সি ১নং গ্রন্থ। প্রাপ্তিস্থান—সংকেত ভবন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট ও বেঙ্গল পাব ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা চারি আনা।

আজকাল নানাবিধ রোমাঞ্চকর সিরিজে বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। খাঁটি স যদিও এ সকল বইয়ের তেমন মূল্য নাই এক শ্রেণীর পাঠক এই সকল বই রুদ্ধ নি পাঠ করে এবং আনন্দ উপভোগ করে সন্দেহ নাই। আলোচ্য বইটিও এই ধরণের। ইহার আখ্যান ভাগে নূতনত্ব আছে এবং ভাষ জোরালো।

নীরবতা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

তোমার জীবনপাত্রে আনন্দের ডালিখানি মোর
উৎসর্গ করেছি নিত্য মুগ্ধ চিত্তে তোমাতে বিভোর
স্বরূপ কল্পনময়ী মাধুরীর অমৃত মূরতি
সাজিয়া হেরেছি তাহে তব শুভ্র অতুলন জ্যোতি
দিয়েছে আপন ছায়া; সেই স্নিগ্ধ ছায়ার বিস্তার
কম্পমান দীব হিয়ে করে আজো চাঞ্চল্য সঞ্চার
বসন্তের কোকিল কূজনে; স্তব্ধ সুপ্ত রাত্রিখানি
বিস্মৃত সে স্বপনটারে জাগাইয়া বিশ্বে আনে টানি'
জীবনযাত্রায় তব সেদিনের আনন্দ আভাস
প্রভাত দীপ্তির মত থাক জাগি'; তাহারি বিকাশ
হোক পূর্ণ দিনে দিনে। আমি যদি স্মৃতিমগ্ন হিয়া
বহু দূরে স্তব্ধ থাকি যেথা কক্ষে অগ্নি উদ্ভাসিয়া
যায় সন্ধ্যা অন্ধকার—এইটুকু নিয়ো তুমি মানি'
এই দীন নীরবতা মোর প্রেমে করে নাই জানি।

হাতুড়ি

প্র .... না .... বি

...নগর স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছি। বেলা পাঁচটার ট্রেনে আমার এক বন্ধু আসিবে ...ই জন্য এই প্রতীক্ষা। এখন কেবল বেলা ...টা। সমস্তটা দুপুর এবং বিকালের ...টা এখনো সম্মুখে পড়িয়া—আর সম্মুখে ...া দক্ষিণ বাঙলার একটি ক্ষুদ্র রেল-...নের অসহনীয় পারিস্থিতি। ইতিমধ্যে ...নটিতে যাহা দেখিবার সমস্তই একাধিক-...দেখিয়া লইয়াছি। দুইটি চায়ের স্টল ..., দুইটিতেই একাধিকবার চা-পান ...য়াছি। প্রত্যেক পানওয়ালার নিকট হইতে এক খিলি পান খাইয়াছি। যাত্রীদের সুখ-...র বিশ্রম্ভালাপ উপচাইয়া আসিয়া কানে ...া করিয়াছে—তাহাতে বুঝিয়াছি তেল, ...গুড়, চাউল আটা সমস্তই দুষ্প্রাপ্য। ...কজন বলিল—এই দেখো না কেন, বেগুন। ...থেকেই চালান যায়, অথচ কলকাতায় ...কেনো তিন আনা সের, এখানে পাঁচ ...র কমে পাও তো কি বলেছি! ...হার শ্রোতা বলিল—কলকাতার সুখ-...ই আলদা! ...ই কি! তবে আমি কলিকাতার লোক ...এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া আছি

...ছেলেদের তিন-চারটি ক্ষুদ্র দল খাতা-...লে লইয়া আসন্ন সরস্বতী পূজার চাঁদা ...করিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে আসিয়া ...। এখানকার লোক নই বলিয়া এড়াইয়া ...। একটি বালক বলিল তাতে ক্ষতি ...স্যার? সরস্বতী তো সব জায়গারই। ...ীর এমন বরপুত্রকে নিরাশ করা চলে ...কছু দিতে হইল। তবে বন্দোবস্ত করিয়া ...যে, অন্য দলের হাত হইতে আমাকে ...করিতে হইবে। তাহারা রাজি হইল। ...পর দল আসিয়া আমাকে আক্রমণ করে। ... আমার সংগে Body-guard রূপে ...গেল। ছেলেটি বীরপুরুষ, কাহাকেও ...কাছে ঘেঁষিতে দিল না। সাধে কি ...কে সরস্বতীর ভ্রাতা বলা হইয়া থাকে!

উজান-ভাটির গাড়ি যাতায়াত করিতেছে। ধোঁয়া, শব্দ, গাড়ি, যাত্রীর ভিড় এবং কোলাহল, কুলি, টিকিট চেকার, নীল নিশান আর ধোঁয়া ও শব্দ। গাড়ি চলিয়া যাওয়ার শূন্যতা। এই ছবির পর্যায় কিছুক্ষণ পরে পরেই।

চারিদিকের মাঠে শীতের ...হের প্রকৃতির সৌন্দর্য অবশ্যই আছে—কিন্তু কয়েক পেয়ালা গৌড়ী চা মাত্র পান করিয়া এবং সারা-দিনের অনাহার ও বিশ্রামাভাব সম্মুখে করিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিবার মতো মানসিক অবস্থা কাহার থাকে—অন্তত আমার তো নাই। তাহার চেয়ে স্টেশনের দেয়ালে ...লেপন মুদ্রিত ও হস্তলিখিত কাগজের ... বিজ্ঞাপনখণ্ডগুলি পড়িতেছি—আর অবাধ চক্ষু দুইটা ঘুরিয়া ফিরিয়া স্টেশনের কর্মবাসিনী, মন্দভাষিণী সেই তাহার দিকে গিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক বার ভাবিয়াছি ...আর তাকাইব না, লভ্য কেবল মনঃকষ্ট ছাড়া আর কিছুই তো নয়—কিন্তু অবোধ মন বোঝে না, অবাধ্য চক্ষু কথা শোনে না, ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই মুখ-চন্দ্রমার প্রতি ধাবিত হয়। ...যে মুখ-চন্দ্রমা বলিয়াছেন, তাহা একেবারেই অতিশয়োক্তি নয়। চন্দ্রের 'গোলিমা', চন্দ্রের শুভ্রতা, চন্দ্রের সকলঙ্ক লাবণ্য সবই আছে—তবে মুখ চন্দ্রমা নয় কেন? আবার লজ্জারও অভাব নাই, মৃদু-ভাষিণী, মৃদুগামিনী! মনে করের দেয়াল সংলগ্নিকা ঘটিকাটি! পাঠককে বোধ করি নিরাশ এবং পাঠিকাকে বোধ করি বিস্মিত করিলাম। কিন্তু আমিও কম নিরাশ হই নাই—এবং বিস্ময়ের অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করিতে বসিয়াছি।

একজনের ফাউন্টেন পেন হারাইয়াছে। কেহ সেই কলমটা পাইয়া থাকিলে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া মালিক নিজের নাম ও ঠিকানা বিজ্ঞাপিত করিয়াছে। লোকটা এখনো যুদ্ধপূর্ব জগতে বাস করতেছে। কলম হারাইলে তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করাও পণ্ডশ্রম। তাহা ছাড়া সবই বুঝিলাম লোকটার কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। বেচারা নিজের হাতে নিজের বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছে। অতঃপর তাহার ঘরবাড়ি, জমি-জমা বেহাত হইলে বিস্মিত হইব না।

এটা আবার কি? খবরের কাগজের জমিতে লালে-কালোতে ডোরা-কাটা মস্ত বিজ্ঞাপন! অন্যান্য ছোট-খাটো বিজ্ঞাপনের মধ্যে এ যেন একেবারে ডোরা-কাটা 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'। "আজ পোস্টাফিসের নিকটবর্তী মাঠে বেলা দুই ঘটিকায় সহস্র সহস্র শ্রমিকের বজ্রমুষ্ট হাতুড়ির আঘাতে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করা হইবে। কলিকাতা হইতে বিখ্যাত শ্রমিক-শিল্পী, ধনিক-বিভীষণ বি-রহু নেতা.....আসিবেন। আসুন সকলে সমবেত হইয়া সাম্রাজ্যবাদের শেষকৃত্য দেখিয়া নয়ন সার্থক করুন।" বাপরে! এই বিজ্ঞাপনের পরেও কি আর সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়া থাকিতে পারে? কখনো তাহাকে চোখে দেখি নাই। আজ তাহাকে দেখিবার প্রথম ও শেষ সুযোগ। এমন সুযোগ ছাড়া চলে না। যাইব পোস্টাফিসের ময়দানে। বেলা দুইটা। আমার গাড়ির সময় পাঁচটা। তিন ঘণ্টার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের প্রাণ কি বহির্গত হইবে না—এত কি শক্ত তাহার প্রাণ, বিশেষ হাতুড়িটা যখন রুট!

[২]

এমন সময়ে স্টেশনে চাঞ্চল্য দেখা দিল। কলিকাতার ট্রেন আসিতেছে। কোথা হইতে পাঁচ সাত বছরের একদল ছেলে, ছোটখাটো একটি লজঞ্চুষ ব্যাটেলিয়ান প্ল্যাটফর্মে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে তাহাদের নিশান; সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম মুহূর্ত ঘোষণা-কারী শ্লোগান-লিখিত প্ল্যাকার্ড এবং একখানি লাল কাপড়ের উপরে অঙ্কিত এক জোড়া কাস্তে হাতুড়ি রাধাকৃষ্ণের ভঙ্গীতে পরস্পরকে জড়াইয়া বিরাজমান। তাহারা তারস্বরে ধনিক সভ্যতার ধ্বংস ঘোষণা করিতে লাগিল। সামান্য কয়েকজন ছোট ছেলে কি এত চীৎকার করিতে পারে? বাঙালীর ছেলে বটে! তাহাদের পিছনে জন দুই বয়স্ক ছোকরা। একজনের হাতে একটি ফুলের মালা। বুঝিলাম ইহারা শ্রমিক-শিল্পী নেতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ট্রেন আসিয়া থামিল। গাড়ি হইতে কয়েকজন যাত্রী গুড়ের হাঁড়ি, ফুলকপি প্রভৃতি লইয়া নামিল। কিন্তু শ্রমিক-শিল্পী কোথায়? সকলে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িল। ট্রেন চলিয়া গেল। লজঞ্চুষ ব্যাটালিয়ান পূর্বশিক্ষা মতো 'নেতার জয়' হাঁকিয়া চলিল। নেতা আসে নাই—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? বয়স্ক ছেলে কর্মীটি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া রহিল—এবং অবশেষে একান্তে সমবেত হইয়া ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি চিন্তা করিতে লাগিল।

মি দূরে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শোভা ও ২ঘন্টার ঘড়িটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে বয়স্ক ছেলে কয়টি আমার গতে আসিয়া দাঁড়াইল—এবং একটা নমস্কারের মপ্রশ্নের মতো করিয়া বলিল—স্যার একটা থা আছে। আমি মুখ তুলিয়া তাকাইলাম।

একজন বলিল—স্যার, আপনি তো এখান-ার লোক নন।

আমি বলিলাম—না।

অপর একজন বলিল—আপনাকে খানে কেউ চেনে না।

আমি পুনরপি বলিলাম—না।

তখন সাহস পাইয়া পূর্বোক্ত বক্তা বলিল—র, আমাদের ঠেকা কাজটা যদি চালিয়ে দেন।

—কি কাজ?

—কাজ এমন কিছু না। আমাদের সভায় র একটা বক্তৃতা করবেন।

আমি বলিলাম—কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে স করতে হয় তা তো আমার জানা নেই।

তখন তাহারা সমস্বরে বলিল—কারই-বা া আছে? ওটা একটা সিম্বল ছাড়া নয়।

—কিন্তু আপনাদের লীডার এলেন না ?

একজন সলজ্জভাবে বলিল—আসবেন শ্রুতি দিয়ে আসলে আর লীডার হবেন ?

—তিনি বোধ হয় অন্য কোন সভায় ছেন।

—কিম্বা খুব সম্ভবত কোথাও পিকনিক ে গিয়ে থাকবেন।

আমি বলিলাম—আমি তো লীডার নই।

দপ্রতিভভাবে একজন বলিল—সেইজন্যই আপনার কাছে এসেছি। লীডার হলে কি াকে এত সহজে পেতাম।

—কিন্তু পুলিশ টুলিশ?

সকলে সমস্বরে বলিল—আজ্ঞে, না। জ্যবাদ ধ্বংসের অনুমতি আগে থেকেই ছি।

অপর একটি ছেলে চোখে কৌতুক কণিকা করিয়া বলিল—জানেন তো স্যার—s is Politics.

ঠিক জানিতাম না। যাই হোক আমার র এখনো অনেক দেরী। ছেলেদের হতাশ তে পারিলাম না। রাজি হইলাম। বিশেষ, পাছে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয় তাহা বার কৌতূহলও মনে ছিল।

আমি রাজি হইবা মাত্র, সেই গাঁদা ফুলের াটি একজন আমার গলায় পরাইয়া দিল, ও্য ব্যাটালিয়ান—স্লোগান হাঁকিয়া উঠিল। াব, অপ্রত্যাশিতভাবে নেতৃত্বের পথে প্রথম বিক্ষেপ করিলাম। লজঞ্চুষ ব্যাটালিয়ন স্লোগান হাঁকিতে হাঁকিতে চলিল। একটি ছেলের গলা চিরিয়া খানিকটা শ্লেষ্মার মতো পড়িল। আমি বলিলাম—তোমার কাসি হয়েছে, তুমি থামো। অপর একটি ছেলে বলিল—ওটা কাশি নয় স্যার। ও এখনি দুধ খেয়ে এসেছে—তাই উঠলো। দুধই বটে! তবে তাহার বয়স বিবেচনা করিলে মাতৃদুগ্ধ হওয়াও বিচিত্র নয়। আমি লীডার নই, কিন্তু তাহাদের অনেকবার দূরে হইতে দেখিয়াছি, সেইভাবে, সেই চালে চলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজ্ঞাপনে ঘোষিত সেই পোস্টাফিসের মাঠে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই সেই জনস্থান, এই সেই নূতন পাণিপথের মাঠ, সেখানে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বসিয়া পড়িবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের উপকরণের অল্পতা দেখিয়া মনটা বড়ই দমিয়া গেল। খানকতক টুল ও চেয়ার, গোটা দুই নিশান, আর পঁচিশ ত্রিশ জন মিশ্র বয়সের ও অমিশ্র শ্রেণীর লোক! কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! হৃদয়ে আশা অপরিমিত থাকিলে উপকরণের অল্পতা চোখেই পড়ে না। গ্যালিলিও মাত্র দুইখণ্ড চশমার কাঁচের সাহায্যে নূতন জ্যোতিষ্ক জগৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন!

আমি একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট হইলে একটি বয়স্ক ছেলে আরম্ভ করিল—কমরেডগণ—[বাকি অংশের উল্লেখ অপ্রয়োজন। পত্রান্তরে নিত্য প্রকাশিত হইতেছে।] বক্তৃতা করিতে করিতে হঠাৎ সে স্বর নত করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, স্যার, আপনার নামটা?

নামটা বলিলাম।

তখনই আবার সে আরম্ভ করিল,—বিখ্যাত শ্রমিক-শিল্পী, প্রখ্যাত নেতা.........আজ এসেছেন। ইনি প্রায় সাতাশ বৎসর ধরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। ধনতন্ত্রের হাতে তিনি কত অত্যাচার সহ্য করেছেন—তা আপনারা সবাই জেনেন। তারপরে সে আমার যে-সব গুণাবলী বলিয়া গেল তাহা এতাবৎ আমারও অজ্ঞাত ছিল।

অতঃপর আমার বক্তৃতার পালা। কিছুক্ষণ আগেও জানিতাম না সাম্রাজ্যবাদ কেমনভাবে ধ্বংস করিতে হয়। কিন্তু এখন দেখিলাম এমন সহজ কাজ আর নাই। সাবেগে বক্তৃতা করিয়া চলিলাম। যেখানে গভর্নমেণ্ট ও পুলিশের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলাম, দেখিলাম ঠিক সেইখানেই জনতার [কতজন মিলিত হইলে হয়?] মধ্যে উপস্থিত একজন পুলিশ হাততালি দিয়া উঠিল। সাহস বাড়িয়া গেল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বহু প্রকার কটূকাটব্য করিলাম। লোকটা ভালো করিয়া হাততালি দিবার উদ্দেশ্যে হাতের খৈনি মুখে ফেলিয়া দিয়া দুই হাত খোলসা করিয়া লইল। আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। এমন সময়ে একটি বয়স্ক ছে আমার কানের কাছে সভয়ে বলিল—ও কথাগুলোর Sanction নেওয়া হয়নি, ন.ই বললেন।

ইস্, এখনি থামিব? সাম্রাজ্যবাদ অর্ধভগ্ন হইয়াছে—আর ঘা দুয়েক দি হয়। কিন্তু উদ্যোক্তাদের নির্বন্ধাতি সাম্রাজ্যবাদের সৌধকে পীসার 'ল টাওয়ারের' মতো শূন্যে কাৎ করিয়া রা বসিতে বাধ্য হইলাম। লজঞ্চুষ ব্যাটালি সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস ও আমার জয় হাঁ উঠিল।

সভা ভাঙিল। আমি বিদায় লইয়া স্টেশ আসিলাম। প্রত্যাশিত ট্রেনে চড়িয়া কলিকাত ফিরিলাম। আমার বক্তৃতার পূর্ণ রিপে দেওয়া বাহুল্য—কারণ পত্রান্তরের ঔদা তাহা মোটা অক্ষরের হেড লাইনে এ সর্বজনবিদিত।

এখন আমি একজন যোগ্যকলায় বিকশি লীডার। বাম হাত তির্যকভাবে কোমরে রাখি রক্তশোষণকারী ধনিক সম্প্রদায়ের অদ নাসিকার অভিমুখে দক্ষিণ হস্তের উদ্য মূর্তিটি আমার ছবি কে না দেখিয়াছে? দূর নিকট বহুস্থান হইতে বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্র আমার আসে। কোথাও যাইতে অস্বীক করিলে পরিচিতেরা অনুযোগ করিয়া বল কোন্ বনগাঁর সভায় যেতে পারো—আর এখা পারো না? এখানে যে 'শ্রমিকের র হোলিখেলা চলছে'। যাইতেই হয়—কার হোলিখেলার অলংকারটা আমার কারখানাতে প্রস্তুত। এক একদিন গভীর রাত্রে নি ভাঙিয়া গিয়া ভাবি এই স্বরচিত ফাঁদ হইতে কি উপায়ে মুক্তি পাইব? হায় কি কুক্ষণে বনগাঁয়ে গিয়াছিলাম। কিন্তু উপায় নাই কর্মজাল হইতে এত সহজে নিষ্কৃতি কোথায় মুড়ি ও নারিকেল খাইবার উপদেশ দিবার ফলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আর যেমন প্রকাশ্যে সন্দে খাইবার উপায় ছিল না—আমারও অনেক তেমনি ঘটিয়াছে।

এমন সময়ে 'নোয়াখালি' ঘটিল। ভাবিলা বুঝি সেখানে যাইতে হয়। কিন্তু দেখিলাম ভ অকারণ। আগে ঝামেলা কাটিয়া যা ব্যাপারটা যে সংখ্যালঘিষ্ঠের ষড়যন্ত্র ছাড়া অ কিছুই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠকে অপদস্থ ও বির করিবার জন্যই তাহারা নিজেদের ঘর-বা পোড়াইয়া এই কাণ্ডটি করিয়াছে—এমন এক 'থিওরি' খাড়া করিতে পারিলেই আবার আ বক্তৃতা আরম্ভ করিব—আবার আমার ছ প্রকাশিত হইবে—আবার হাততালি পাইব, ত প্রভেদের মধ্যে এই যে, এবার আর সাম পুলিশ নয়—অনেক উচ্চ হইতে হাততা আসিবে। আমার হাতও শূন্য থাকিবে না।



গত ১২ই জানুয়ারী জগৎপুর হইতে লামচর-পথে মহাত্মা গান্ধী একটি ধান-ক্ষেতের ভিতর দিয়া যাইতেছেন।



আমিশাপাড়ার মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভা ; বহু সংখ্যক মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা জীবনে এই প্রথম মহাত্মাজীকে দর্শনের এবং তাঁহার বাণী শ্রবণের সুযোগ পাইলেন



মাসিমপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসিগণ বিপুল সংখ্যায় মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা-সভায় যোগদান করিয়াছেন

চণ্ডীপুর হইতে মহাত্মা গান্ধীর বিদায় গ্রহণের দৃশ্য : শ্রীযুত অবনী মজুমদারের বাড়ীর মহিলাগণ মহাত্মাজীর ললাটে সিন্দুর তিলকে চর্চিত করিয়া বিদায়সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছেন

অনুবাদ সাহিত্য

পতি-পত্নী

ফ্রাঞ্জ মল্‌নার

(হাঙ্গেরীয় একাঙ্কিকা)

[ফ্রাঞ্জ মল্‌নার (Franz Molnar) আধুনিক হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বুডাপেষ্টে একটি ধনী ইহুদী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তিনি সাংবাদিক রূপে জীবন আরম্ভ করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি সাংবাদিকরূপে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক প্রকাশিত হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে। তারপর তিনি বহু নাটক লিখেছেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সংগে সেগুলি বুডাপেষ্ট, ভিয়েনা প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীর রংগমঞ্চে রাতের পর রাত অভিনীত হয়েছে তা ছাড়া তিনি বহু উপন্যাস, ছোট গল্প ও একাংক নাটিকা রচনা করেছেন এবং হাঙ্গেরীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সেগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়। মল্‌নার প্রচারবাদী সাহিত্যিক নন। জীবনকে তিনি যেভাবে অনুভব করেছেন, তার চিত্র এঁকেছেন তাঁর সাহিত্যে। নীচে তাঁর একটি বিখ্যাত একাংকিকার অনুবাদ দেওয়া হল।—অনুবাদক]

একজন যশস্বিনী অভিনেত্রীর ড্রয়িং রুমে নিকোল পার্টোর এই দৃশ্যের অবতারণা। বহুক্ষণ ধরে নির্দিষ্ট করা একটা চেয়ারের উপর উদ্বিগ্ন চিত্তে জড়ো সড়ো হয়ে একজন যুবতী বসে আছেন। যশস্বিনী অভিনেত্রী তাঁর নিজের ঘর থেকে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করলেন।

অভিনেত্রী : আপনি আমার সংগে দেখা করতে চেয়েছিলেন?

যুবতী : (আবেগে ঢোঁক গিলে) হাঁ।

অভিনেত্রী : কি দরকার বলুন।

যুবতী : (অনুনয়ে দুইটি বাহু মেলে দিয়ে) আপনি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন!

অভিনেত্রী : আপনার স্বামীকে ফিরিয়ে দেব—সে কি কথা!

যুবতী : হাঁ, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন।

[অভিনেত্রী শুধু নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।]

যুবতী : আপনি বিস্মিত হয়ে ভাবছেন আমার স্বামী কোন লোকটি......তিনি সুন্দর দেখতে, খুব বেশী লম্বা নন চশমা পরেন। তিনি উকিল—আপনার ম্যানেজারের উকিল। তাঁর নাম আলফ্রেড।

অভিনেত্রী : হাঁ, আমার সংগে তাঁর পরিচয় হয়েছিল বটে।

যুবতী : আমি জানি আপনার সংগে...... আমি মিনতি করে বলছি, তাঁকে ফিরিয়ে দিন।

[দুজনের মধ্যে একটা দীর্ঘ নীরবতা]

অভিনেত্রী : আমি কথা বলছিনে দেখে ভাববেন না যে, আমি বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছি। আমি কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে প'ড়েছি এই কারণে......আপনার স্বামী যখন আমার হাতে নেই, তখন তাঁকে আমি কিভাবে আপনার হাতে ফিরিয়ে দেব তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

যুবতী : কিন্তু আপনি তো এই মাত্র স্বীকার করলেন যে তাঁকে আপনি চিনতেন।

অভিনেত্রী : কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁকে আমি আপনার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছি। অবশ্যই আমি তাঁকে জানি। আমার গত চুক্তিপত্রটা তো তিনিই তৈরী করেছিলেন। আর আমার মনে হয় যে তারপর তাঁকে আমি একবার কি দু'বার দেখেছি ......মঞ্চের বাইরে। বেশ মিষ্ট-ভাষী সুন্দর কেশ ভদ্রলোক...... আপনি কি বললেন যে তিনি চশমা পরেন?

যুবতী : হাঁ।

অভিনেত্রী : আমি তো তাঁকে চশমা পরতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

যুবতী : তিনি তাঁর চশমা খুলে ফেলেছিলেন। আপনাকে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁর সর্বোত্তম রূপ। তিনি আপনাকে ভালবাসেন। আমি আশে-পাশে থাকলে তিনি কখনও চশমা খোলেন না। আমার কাছে তাঁকে কেমন দেখায় না দেখায় সে বিষয়ে তিনি উদাসীন। তিনি আমাকে ভাল-বাসেন না......অনুনয় করে বলছি তাঁকে ফিরিয়ে দিন!

অভিনেত্রী : আপনি যদি এমন বোকা মেয়ে না হতেন, তবে আমি আপনার উপর ভয়ানক রাগ করতাম। আপনার স্বামীকে আমি কেড়ে নিয়েছি এ ধারণা আপনার মাথায় এল কোথা থেকে?

যুবতী : তিনি আপনাকে সব সময়ই ফুল উপহার পাঠান।

অভিনেত্রী : সে কথা সত্য নয়।

যুবতী : এটা খাঁটি সত্য।

অভিনেত্রী : একেবারে সত্য নয়। এ জীবনে তিনি আমাকে কোনদিন একটা ফুলও পাঠান নি। আমাকে তিনি ফুল পাঠিয়েছেন একথা কি তিনি আপনাকে বলেছেন?

যুবতী : না। আমি ফুলের দোকান থেকে এটা বের করেছি। আপনার ড্রেসিং রুমে সপ্তাহে তিনবার করে ফুল পাঠানো হয়—আর তার দাম দেন তিনি।

অভিনেত্রী : একথা মিথ্যা।

যুবতী : আপনি কি বলতে চান আমি মিথ্যা কথা বলছি?

অভিনেত্রী : আমি বলতে চাই—অন্য কেউ আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছে।

যুবতী : [নিজের ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে একটা চিঠি খুঁজতে খুঁজতে] তবে এই চিঠিখানা কিসের?

অভিনেত্রী : চিঠি?

যুবতী : তিনি আপনাকে এ চিঠি লিখেছিলেন। এর মধ্যে আছে—

অভিনেত্রী : তিনি আমাকে এ চিঠি লিখে-ছিলেন......

যুবতী : না। আপনাকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি। [চিঠিটা খুলে বিষণ্ণভাবে পড়তে লাগলেন।] "প্রিয়তমে, আজ রাত্রে থিয়েটারে তোমার সংগে দেখা করতে যেতে পারব না। জরুরী কাজ পড়েছে। তার জন্যে হাজার বার ক্ষমা চাই—দশ হাজার চুমো নিও। আলফ্রেড।"

অভিনেত্রী : ওঃ!

যুবতী : আজ সকালে ও'র ডেস্কে এ চিঠিটা আমি পেয়েছি। হয়ত তিনি লোক দিয়ে চিঠিটা থিয়েটারে পাঠিয়ে দেবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সে কথা ভুলে গেছিলেন। -আমি পেয়ে চিঠিটা খুলে ফেলেছিলাম। [ক্রন্দন]

অভিনেত্রী : আপনার কাঁদা উচিত নয়।

যুবতী : [সক্রন্দনে]—কেন কাঁদব না? আপনি আমার স্বামীকে চুরি করে নেবেন—আর আমি কাঁদব না? আমি জানি আপনার কাছে এটা মূল্যহীন—আপনার কাছে এটা অতি সহজ! এক রাতে আপনি রাজকন্যার মত সাজ করেন—আর পরের রাতে গ্রীক দেবীর মত আপনার দেহে কোন পোষাকই থাকে না। আপনি ভুরুতে কলপ মাখেন, ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করেন, চোখের পাতায় মোম লাগান—মুখ চিত্রিত করেন......প্রসাধনের প্রাচুর্যে উজ্জ্বল আলোকে আপনাকে সুন্দর দেখায়......নাট্যকারের রচিত বাণীতে

—সে কি অস্বাভাবিক? তখন তো জানতাম —তিনি অনুকম্পা করছেন আমাকে, বুভুক্ষু ভিখিরীকে লোকে যে অনুকম্পা করে। খাওয়ার ধরণটা পর্যন্ত নাকি তাঁর বিশ্রী লেগেছিল। কিন্তু আমি যদি রোজ পেট ভরে পারতাম, তবে কি আমার খাওয়ার ধরণ বিশ্রী থাকত? —থাকত না। তবু এইটুকুর আমাকে এত ঘৃণ্য ভাবলেন উনি।

শেষ পর্যন্ত গোয়াবাগানে একটা বোর্ডিংয়ে পেলাম। চলে গেল সে ভদ্রলোক, কিন্তু পারলাম না তাকে। আমার জীবনে যে প্রথম পুরুষ, যে দিয়েছিল আমাকে হাত বাড়িয়ে। আমার সমস্ত দৈন্য, কুশ্রীতা অতিক্রম করে আমাকে তাঁর লেগেছে, এ কথা ভেবে মনে গতো আনন্দ, ততোই এ দৈন্য, এ কুশ্রীতা আমায় দিচ্ছিল, ঠিক করলাম—এবার থেকে জন্যে কিছু কিছু জমাতে হবে, উন্নত হবে জীবনযাত্রা। পাঁচ টাকা বেশি একটা চাকরিও পেয়ে গেলাম ধানবাদে। এক বছরের ইতিহাস আর না-ই। বাড়ীর খরচ আর নিজের খরচ প্রাণ- কমিয়ে হাতে যখন কিছু টাকা জমল, আবার ফিরে এলাম পুরোনো চাকরিতে। বড়ো হোটেলের সবচেয়ে ভালো রুম। ডিনারে, লাঞ্চে, টিপসে অপর্যাপ্ত করতে শুরু করলাম। মীরাদের বাড়িতেও মীরা অবাক হল আমার চালচলনের দেখে। হাসল-ও বোধ হয় মনে মনে। ওর দেখলাম না। ভারি দুঃখ হ'ল তাকে পারলাম না বলে।

সুযোগ মিলে গেল। তাঁরি এক বন্ধু, সেই হোটেলেই এসে উঠলো, দেখা এলো সে-ও। খুব সাজসজ্জা করে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম অবাক তাকিয়ে আছে সে। ইচ্ছে করেই তাকালাম দিকে। আশা ছিল সে-ই এগিয়ে এসে বলবে, কিন্তু কোনো কথাই সে বললে না। হল, দুঃখ হল। সত্যিই তো কী আমি! ঐশ্বর্যের সমারোহ দেখিয়ে অন্তর এমন অসম্ভব স্পর্ধা আমার কী ? সেদিন যখন আমি দীন ছিলাম, ছিলাম তখন তো সে আমাকে সাহায্য ভালোবেসেছিল। ভাবলাম পুরোনো আবার ফিরে যাই। এদিকে টাও এসেছিল ফুরিয়ে। ম ভাই কষ্ট দিয়ে জমানো টাকা সমস্তই তবে আমার শিক্ষা হ'ল। কয়েকদিন অভিমানে দগ্ধ হয়ে অবশেষে একদিন ডেকে হোটেল থেকে চলে করলাম। কোথায় যাব তারও ঠিক ছিল না। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম।

"হঠাৎ দেখি রাস্তায় সে দাঁড়িয়ে আছে। দৈব যোগাযোগ বুঝি একেই বলে। আমার মন মুহূর্তে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। ওর কাছে গিয়ে বললাম,—"একটু আসুন। আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে।"

"নিঃশব্দে আমার পেছন পেছন ও এসে উঠল গাড়ীতে। বললাম,—"আমি আবার নিরাশ্রয়। আপনাকে একটা জায়গা খুঁজে দিতে হবেই আমার জন্যে—" ওর হাতের ওপর হাত রেখে সমর্পণ করতে চাইলাম ওকে আমার সমস্ত ভার।

"ওর কোন্ বন্ধুর বাড়ীতে আমাকে জায়গা করে দেবার কথা আগের বারে ও বলেছিল। সেই কথাটা ওকে মনে করিয়ে দিলাম। বললে,—"আচ্ছা, চলুন দেখি।" একটা গলির মোড়ে ট্যাক্সি থামিয়ে ও নেমে বাড়ী খুঁজতে গেল, আর এল না। ঘড়ির কাঁটা গড়িয়ে চলল।

"রাত বারোটার কাছাকাছি সময়ে মীরার ওখানে গেলাম। বললাম, "আবার অভাবে পড়েছি। রাতটা এখানে কাটিয়ে ভোরে উঠেই চলে যাব।" মীরা খুব বকতে লাগল, বললে,—'সেই সময়েই জানি। তোর কোনো কিছুতে ব্যালেন্স নেই। খরচ কি মানুষ এমন করেই করে? হিসেবী-ও ছিলি চরম! বে-হিসেবীও হয়ে উঠলি চূড়ান্ত রকমের।' সত্যি বলছি, বে-হিসেবী আমি কোনোদিন ছিলাম না। ওকে ভালোবেসেই আমার হিসেবী স্বভাবের গোড়ায় ধরেছিল ভাঙন। কিন্তু এ কথা মীরাকে বলতে পারতাম। তাই চুপ করেই রইলাম। রাতের আশ্রয় মিলল সিঁড়ির ঘরটাতে। ঘুম এল না, ভাবলাম শুধু ওর এ ব্যবহারের অর্থ কী।"

হাসল সুধা সেন। বললে,—"এতদিন পরে ওর গল্পটা পড়ে বুঝেছি আগাগোড়া ও আমাকে ঘৃণা করেছে এড়িয়ে চলতে চেয়েছে আর আমি—উঃ এমন ভুলও মানুষের হয়।"

থেমে গিয়ে সুধ সেন আমার হাত চেপে ধরল। বললে,—"আমার কি ভালবাসা পাবার একটু যোগ্যতাও ছিল না রে?"

হায় সুধা সেন। তোমার উপবাসী দেহে যে যৌবন আসেনি তোমার মনকে কে দেখতে পাচ্ছে আর কে-ই বা ভালোবাসছে বলো? শুধু ভালবাসা দিলেই কি আর ভালোবাসা পাওয়া যায়?

অনেকক্ষণ দুজনেই নীরবে বসে রইলাম। ওঠার আগে সুধা সেন বললে—"সবচেয়ে দুঃখ এই—এই সময়েই আশি টাকা মাইনের চাকরিটা গেলো। এখন পাই মাত্র চল্লিশ টাকা। মাকে দিয়ে মোটে বাঁচে না। তা নইলে একটা টনিক খেয়ে দেখতাম, গালে মাংস ভরে কি-না, দেহ পুষ্ট হয় কি-না, চোখে ঝলসায় কি-না যৌবনের দীপ্তি।"

একযোগে চলার

৭ম সপ্তাহ!



পরিচালনা নীরেন লাহিড়ী
সংগীত কমল দাশগুপ্ত

তৎসহ: নবাব - মলিনা - দেবী - সুন্দর

— চলিতেছে —

পূর্ণ - বীণা - খান্না

ক্রাউন - সিটি - কামাল

শ্যামাশ্রী - আলোছায়া

বিরাট উদ্বোধন

১৭ই জানুয়ারী শুক্রবার

স্বর্গের নর্তকী ও মর্তের নৃপতির অপূর্ব প্রণয়গাথা

জয়ন্ত ফিল্মসের উর্বশী

ভূমিকায়:
শোভনা সমর্থ - প্রেম আদীব - সুরাইয়া

একযোগে:—
জ্যোতি — প্রভাত — ইন্টালী টকীজ
মায়াপুরী — মীণাক্ষী
২৪'শ [illegible]কী শো হাউস

আগমনী পিকচার্সের অভিনব পরিবেশনা

রঙ্গজগৎ

দিন যতো যায় যে কোন জিনিসেরই ততো উন্নতিই হতে থাকে: কিন্তু চলচ্চিত্র ব্যাপারে দেখছি ঠিক তার উল্টোটাই। যে কোন লোকই বুঝতে পারছে যে, এখন যেসব ছবি দেখানো হচ্ছে, সেগুলি ঠিক এর আগের ছবির চেয়ে কয়েক ধাপ নিম্নস্তরের এবং ঐ আগের ছবিগুলিও ছিল তারও আগের ছবির চেয়ে নিম্নস্তরের—এইভাবেই দিন চলেছে। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় যে, এ নিয়ে এক দর্শকরা ছাড়া ছবির ব্যবসাদার বা ছবির নির্মাণকর্তা ও কর্মীদের তরফ একেবারেই স্পীকটিনট। তার কারণ অবশ্য এই যে, এদের মধ্যে যে যে-কাজ হাতে নেন, তিনি সে-কাজ জানেন না এবং তিনি যে জানেন না, সেটাও তার অজানা নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে কুলো ও তুলোর আকাল না ঘটলে এদের নির্বিকারত্ব ঘুচিয়ে চেতন জগতে টেনে আনা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

বস্তুত বিজ্ঞাতঙ্ক (talentphobia) এবং অজ্ঞ-প্রীতিই হচ্ছে ছবি খারাপ হওয়ার মূল কারণ; ছবির আদিকাল থেকে বিচার করে দেখলে কথাটা স্পষ্ট হয়ে পড়বে। গোড়া থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, লোককে কৃতিত্বসম্পন্ন করে তোলার দিকে চেষ্টাকৃত নিশ্চেষ্টতা যেমন ছিল তেমনি ছিল কৃতী লোককে পরিহার করার দূরপনেয় রীতি। ফল হলো এই—আদিকালে যাঁরা প্রধান হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের সহকারিরূপে নিয়েছিলেন তাঁদের চেয়ে কয়েক ডিগ্রী নীচু স্তরের বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের, যাতে তার সব কথাই হুবহু খাটতে পারে এবং সহকারীদের কেউ তাদের ডিঙিয়ে না যেতে পারে কোনদিন, তাছাড়া কর্তাদের দৃষ্টি তাদের ওপর থেকে কৃতী লোকেদের ওপরে গিয়ে যাতে না পড়ে, সে বিষয়েও তারা সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। আদিকালের সেই নিতান্ত অযোগ্য সহকারীরা গুরুর কাছ থেকে আর কিছু না হোক গুরু হয়ে ওঠার সহজ কৌশলটা ভালভাবেই আয়ত্ত করে নিলে। সময়ের চাহিদায় এরা একদিন আবার যখন প্রধান হয়ে উঠলো, তখন তারাও ঠিক গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের চেয়ে কয়েক ডিগ্রী নীচুস্তরের বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের সহকারী করে নিলে; এই শেষোক্তরাও তাদের গুরুকে অনুসরণ করে চলা ছাড়া পথ দেখলে না এবং তাদের সহকারীরাও ঠিক তাই করে যাচ্ছে। তাহলে অবস্থা কি দাঁড়ায় সহজেই অনুমেয়; বাঙলা ছবি এখন সেই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ সোজা কথায় এটা প্রাক্তন সহকারীদের যুগ চলেছে। ধরুন দেবকী বসু বা প্রমথেশ বড়ুয়ার কথা—এঁরা নিজেরা গুণী ছিলেন এবং অসাধারণ কৃতিত্বেরও পরিচয় দিয়েছেন এককালে; এ পর্যন্ত এঁরা নিজেদের অধীনে খুব কম করে জন পঞ্চাশেক লোককে সহকারীরূপে কাজ করবার সৌভাগ্যে আপ্যায়িত করেছেন এবং সেই সহকারীদের মধ্যে কয়েকজন স্বাধীনভাবে পরিচালনাও করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে একজনও গুরুকে ডিঙিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, গুরুর কৃতিত্বের কাছেও কি ঘেঁষতে পেরেছে? ঐ সহকারীদের সহকারীরাও ঠিক তেমনি ধারাই তাদের ডিঙিয়ে যাবার মত বা তাদের সমকক্ষ হবার মতও লোক একজনও গড়ে তুলতে পারেনি। ছবি তৈরির সব বিভাগেই ঐ একই ব্যাপার ঘটে আসছে, তাই আমাদের অগ্রগতি নীচাভিমুখী। এখন বিদ্যেবুদ্ধি বা আইডিয়া থাকাটাই হচ্ছে চিত্রনির্মাণের যে কোন বিভাগে যোগদানের প্রবলতম প্রতিবন্ধক।

ছবির ব্যবসার দিকেও ঠিক ঐ মনোবৃত্তিই কাজ ক'রে আসছে। আপনি কিছু জানেন এবং বোঝেন ব্যবসাদারদের কাছে তা ফাঁস হয়ে গেলে নির্ঘাত আপনি বাতিল হ'য়ে যাবেন। কারণ আপনাকে গ্রহণ ক'রলে ব্যবসাদারদের নিরুদ্ব ধ্যান ধারণা পাছে আপনি বদলে দেন সেটা বড় কম ভয়ের কথা নয়; তাছাড়া ওরা টেরাবাঁকা উপায়ে গোঁজামিল দিয়ে যে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে তাকে সোজা পথে আনতে আপনি যে ওদের ময়দান থেকে সাফ ক'রে দেবার চেষ্টা করবেন না তারই বা ঠিক কি! সুতরাং ব্যবসার ক্ষেত্র প্রসার হোক না হোক তাদের ভারী বয়েই গেল।

সকলেই বিষয়টাকে নিতান্তই ব্যক্তিগত ক'রে নিয়েছে। আসলে যে জনসাধারণের জন্যই তাদের অস্তিত্ব সেটা মনে না ক'রে এরা কাজেকর্মে দেখিয়ে দিতে চান যে, তাদের জন্যই জনসাধারণ। নয়তো ধরুন না, আপনি হয়তো গান লেখেন; একদিন কোন পরিচালকের কাছে গেলেন উমেদার হয়ে তা'হলেই দেখবেন, আপনি ভাল লেখেন না বাজে লেখেন সে প্রশ্ন চাপাই থাকবে, পরিচালক সটান জানিয়ে দেবেন যে, তার পেটোয়া লোক ছাড়া আর কারুর গান তিনি নেবেন না। অন্য সব ব্যাপারেও সমান রীতি। আবার অনেকে আছেন যারা চেনা নামের পক্ষপাতী, কিন্তু চেনা নাম হ'লেও সেটা সুনাম কি কুনাম তার বিচার কেউ করে না। বর্তমান পত্র-পত্রিকা-প্লাবিত যুগে একটা নাম বহুস্থানে বহুভাবে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হওয়া অসাধারণ কিছু নয়, তাইতেই সেই নামের অধিকারী ব্যক্তিটি গুণী প্রতিপন্ন হ'য়ে যায় না; কিন্তু ছবির বেলা তাদেরই হবে কদর। তারপর একবার যদি কেউ কোন ছবিতে একটা কাজ বাগাতে পারে, যতো অকর্মণ্যই সে হোক না কেন তার কাজ বাঁধা হ'য়ে যাবেই এবং দেখা যায় যে, জনসাধারণে যাকে যতো অপছন্দ করতে থাকে তার তত বেশী কাজ জোটে সেই সংগে অর্থও। আপনার কোন নির্গুণ প্রিয়জন যদি চলচ্চিত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট থাকেন এবং আপনি যদি তাকে প্রভাব ও বিত্তশালী দেখতে চান তা'হলে জনসাধারণের কাছে তাকে অপ্রিয় ক'রে তোলার চেষ্টা করুন, দেখবেন ছবির মালিক ও পরিচালকদের কাছে তিনি ততই প্রিয় হয়ে উঠবেন; আর একবার যদি একটু সুনাম তিনি করতে পারেন তা'হলে আর কথা কি!—সেই একবার খাওয়া ক্ষীরের গন্ধ গোঁফের ডগায় চিরকাল অনুভব করে ভারতের সব প্রযোজক বিচক্ষণ-মূঢ়তার বিচিত্র সব অভিব্যক্তি দেখাতে মোটেই লজ্জিত হবেন না।

সবকিছু চক্র অতিক্রম করে যদি কোন কৃতী ব্যক্তির হাতে কাজ গিয়ে পড়ে তো প্রযোজক থেকে ষ্টুডিওর দারোয়ানটির পর্যন্ত নানাভাবে তাকে অযোগ্য প্রমাণ করিয়ে নিজেদের স্তরে টেনে নামাবার অদ্ভুত অদম্য উৎসাহের অন্ত এদের থাকে না। প্রযোজক প্রথমেই তাকে নানা বাধা-নিষেধ আবদার-অনুরোধে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তার স্বাধীন চিন্তা ও কার্যের পথ সংকুচিত ক'রে দেবে, সেই সংগে থাকে অন্যান্য বিভাগীয় সহযোগীদের প্রত্যক্ষ অসহযোগিতা। হয় তাকে চলচ্চিত্র জগৎ থেকে তাড়াবে নয়তো আর পাঁচজনের স্তরে নেমে নিজের জ্ঞানবুদ্ধির ফটক চিরতরে রুদ্ধ ক'রে রাখতে হবে। নতুন কিছু ক'রতে যাবার উপায়ও থাকে না কারণ—চিরাচরিত ধারায় কাজ করার ব্যতিক্রম অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার—যে যা জানে সেইটেই তার সম্পূর্ণ জ্ঞান ব'লে ধরে নেয়। গুণী লোক নেই ব'লে গুণী তৈরী হ'চ্ছে না, আর একদিকে গুণী লোককে আনবার সবাই বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ায় যেহেতু গুণী এলে বর্তমান যারা আছেন তাঁরা ফাঁপড়ে পড়ে যান। এমন সৃষ্টিছাড়া অবস্থায় ভাল ছবি আশা করা বৃথা।

স্বাধীনতা দিবসে 'অভ্যুদয়' অভিনয়

আগামী ২৬শে জানুয়ারী সকালে শ্রীরঙ্গমে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের বহুপ্রশংসিত গীতিনাট্য 'অভ্যুদয়' অভিনীত হবে। এই নৃত্যনাট্যটির প্রযোজনার ভার নিয়েছেন জাতীয়তাবাদী শিল্পীদের দ্বারা গড়ে ওঠা "জাতীয় শিল্পী পরিষদ" নামে প্রতিষ্ঠানটি। 'অভ্যুদয়' অভিনয় সব দিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে বহু গুণী নৃত্যশিল্পীর সমাবেশ ঘটেছে। তার মধ্যে তরুণ নৃত্যশিল্পী অমরেন্দ্রকুমার নৃত্য-নির্দেশ দিচ্ছেন এবং ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছেন শ্রীধীরেন ঘোষ। নূতন নৃত্য-পরিকল্পনায় এবারের 'অভ্যুদয়' অভিনয় যে অধিকতর আকর্ষণীয় হবে, একথা নিঃসংশয়েই বলা যেতে পারে।

মাণিক্য কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

হেডঅফিস ঃ ১৫নং নূরমল লোহিয়া লেন, (বড়বাজার) কলিকাতা।

শাখা ঃ আগরতলা ও পাটনা।

বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ, উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার, ব্যবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পবিদ্‌গণ দ্বারা পরিচালিত—ফার্মাসিউটিক্যাল, রাসায়নিক দ্রব্য, পেটেণ্ট ঔষধ, পারফিউমারী ও আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকারক,—সুপ্রতিষ্ঠিত ও উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত এই প্রতিষ্ঠানের তৈরী সমস্ত জিনিষগুলিই ভারতের সর্বত্র উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

এজেণ্ট ও ষ্টকিষ্ট চাই।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের
চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক উপন্যাস

তরুণের স্বপ্ন

১ম পর্ব ৩৷৷৹ ২য় পর্ব ২৸৹

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সুখ ও দুঃখের সমুজ্জ্বল সজীব আলেখ্য।

তাসের ঘর—২৷৷৹

কণ্ট্রোলের শাড়ী—২৲

চল্‌তি নাটক-নভেল এজেন্সী

১৪৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কোরে

সত্বর ব্যথা বেদনা নিরাময় করে

কোরে ইংলণ্ডে প্রস্তুত বেদনানাশক একটি মহৌষধ। এই জাতীয় অন্যান্য ঔষধের চেয়ে ইহা শতকরা ৫০ ভাগ বেশী ফলপ্রদ। সুতরাং ব্যাথা-বেদনায় আক্রান্ত হইলেই সত্বর ফলপ্রদ কোরে ট্যাবলেট ব্যবহার করিয়া শীঘ্র নিরাময় হউন। মাথাধরা, স্নায়ুপ্রদাহ, বাত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কটিবাত প্রভৃতির ব্যথা বেদনা ঈষৎ লাল বর্ণের একটি ট্যাবলেট ব্যবহারের কয়েক মিনিট পরই উপশম হয়। ৬টি ট্যাবলেটের একটি প্যাকেটের মূল্য দুই আনা। ৩০ ট্যাবলেটের একটি প্যাকেটের মূল্য দশ আনা। সমস্ত সম্ভ্রান্ত ডীলারের নিকট পাওয়া যায়।



ইহার বদলে অন্য কিছু লইবেন না। চিত্রে প্রদর্শিতানুরূপ প্যাকেটে কোরে বিক্রীত হয়। অন্য কোন জিনিষ ইহার মত ফলপ্রদ নহে।

কোরে লিমিটেড

২৫, হ্যানোভার স্কোয়ার, লণ্ডন, ডব্লিউ ১

ভারতবর্ষস্থিত প্রতিনিধি ঃ
জি এথারটন এণ্ড কোং লিঃ,
কলিকাতা ও বোম্বাই।

সতীশ কবিরাজের

শ্বাসারি

হাপানি ও ব্রঙ্কাইটীসে

কবিরাজ

এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড সন্স

সাহাপুর ৷ বেহালা ৷ দক্ষিণ কলিকাতা

নির্ভীক জাতীয় সাপ্তাহিক

"দেশ"

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

বার্ষিক মূল্য—১৩ ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ ঃ—

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চ প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা
১নং বর্ম্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া দলের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। পর পর দুইটি টেস্ট খেলায় পরাজিত হওয়ায় ইংলণ্ড ক্রিকেট দল যে অখ্যাতির কারণ হইয়াছিল, তাহা কতকাংশে বিদূরিত হইল। তবে খেলা অমীমাংসিত হওয়ায় ইহাই হইল যে, 'এসেজ' কাপটি ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়া হইতে এইবার লইতে পারিবে না। পরবর্তী দুইটি খেলায় ইংলণ্ড যদি বিজয়ীও হয়, তাহা হইলেও ইহা সম্ভব হইবে না। ১৯৩৬-৩৭ সালের টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দল বিজয়ী হয় ও 'এসেজ' লাভ করে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। শেষ টেস্ট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এই অবস্থা দাঁড়ায়। ফলে ১৯৩৬ সাল হইতেই অস্ট্রেলিয়া 'এসেজ' পাইয়াছে। এইবারও তাহারাই রাখিতে সক্ষম হইল। তবে ইংলণ্ড দল তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ যে অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়াছে, তাহা অনেকটা ভাগ্য বলেই হইয়াছে। শেষ দিনে ৪৬ মিনিট সময় বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ না থাকিলে ইংলণ্ড পরাজয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইত কি না, সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাহা হউক পরবর্তী দুইটি খেলায় ইংলণ্ড দল পরাজিত না হইলে সম্মান অনেকখানি রক্ষা পাইবে।

খেলার বিবরণ

অস্ট্রেলিয়া দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং লাভ করে। প্রথম দিনের শেষে মাত্র ৬ উইকেটে ২৫৫ রাণ করে। ব্রাডম্যান পতন মুখে রাণ তুলিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। তবে শেষ সময় ম্যাককুল ও ট্যালন দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের পর অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংস ৩৬৫ রাণে শেষ করে। ম্যাককুল শেষ পর্যন্ত খেলিয়া ১০৪ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। ইংলণ্ড দল পরে খেলা আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় দিনের শেষে এক উইকেটে ১৪৭ রাণ করে। ওয়াসব্রুক ৫৪ রাণ ও এড্রিচ ৮৫ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনের চা পানের পরে ইংলণ্ড দলের প্রথম ইনিংস ৩৫১ রাণে শেষ হয়। ডুল্যাণ্ডের বোলিং বিশেষ প্রশংসনীয় হয়। অস্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ও তৃতীয় দিনের শেষে ৩৩ রাণ করে। চতুর্থ দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ২৯৩ রাণ করে। মোরিস ১৩২ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। পঞ্চম দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের পর অস্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৫৩৬ রাণে শেষ হয়। শেষ সময় লিণ্ডওয়াল ১০০ ও ট্যালন ৯২ রাণ করেন। মোরিস ১৫৫ রাণ করিয়া আউট হন। লিণ্ডওয়াল ও ট্যালন বেপরোয়া মারের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। ইংলণ্ড দল ৫৫০ রাণ পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। পঞ্চম দিনের শেষে কেহ আউট না হইয়া ৯৬ রাণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। শেষ দিনের সূচনায় ইংলণ্ড দলের দ্রুত উইকেট পতন আরম্ভ হয়। ২৪৯ রাণে ৬টি উইকেট পড়িয়া যায়। পরাজয় একরূপ অবশ্যম্ভাবী ঠিক এইরূপ সময় বৃষ্টি আরম্ভ হয়। খেলা মাঝে মাঝে বন্ধ করিতে হয়। ৪৬ মিনিট সময় বৃথা নষ্ট হয়। ফলে দিনের শেষে ইংলণ্ড দল ৭ উইকেটে ৩১০ রাণ করিয়া পরাজয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পায়। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ওয়াসব্রুক ১১২ রাণ করিয়া আউট হন। ইয়ার্ডলী শেষ সময়ে ৫৩ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন।

খেলার ফলাফল:—

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস—৩৬৫ রাণ (ম্যাককুল নট আউট ১০৪, বার্নেস ৪৫, ব্রাডম্যান ৭৯, ট্যালন ৩৫, বেডসার ৯৯ রাণে ৩টি, এড্রিচ ৫০ রাণে ৩টি, ইয়ার্ডলী ৫০ রাণে ২টি ও রাইট ১২৪ রাণে ২টি উইকেট পান।)

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস:—৩৫১ রাণ (ওয়াসব্রুক ৬২, এড্রিচ ৮৯, হিকিন ৪৪, ইয়ার্ডলী ৬১, ডুল্যাণ্ড ৬৯ রাণে ৪টি, লিণ্ডওয়াল ৬৪ রাণে ২টি, উইকেট পান।)

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস:—৫৩৬ রাণ (মোরিস ১৫৫, লিণ্ডওয়াল ১০০, ট্যালন ৯২, ম্যাককুল ৪৩, ব্রাডম্যান ৪৯, বার্নেস ৩২, মিলার ৩৪, বেডসার ১৭৬ রাণে ৩টি, রাইট ১৩১ রাণে ৩টি, ইয়ার্ডলী ৬৭ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস:—৭ উইঃ ৩১০ রাণ (ওয়াসব্রুক ১১২, ইয়ার্ডলী নট আউট ৫৩, হাটন ৪০, মিলার ৪১ রাণে ২টি, ডুল্যাণ্ড ৮৪ রাণে ১টি, লিণ্ডওয়াল ৫৯ রাণে ১টি উইকেট পান।)

দাঙ্গা-দুর্গতদের সাহায্যকল্পে ক্রিকেট খেলা

মোহনবাগান ক্লাবের কতিপয় উৎসাহী ক্রিকেট খেলোয়াড়ের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্মিলিত মাঠে দাঙ্গা-দুর্গতদের সাহায্যকল্পে তিনদিন ব্যাপী এক প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা হয়। এই খেলায় ভারতের অনেক খ্যাতনামা খেলোয়াড় যোগদান করেন। খেলাটি দর্শনযোগ্য হয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই খেলা তাহার কিছুই হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রতি দিন মাঠ ফাঁকা পড়িয়া ছিল। প্রবেশমূল্য হইতে যাহা সংগৃহীত হইয়াছে আশঙ্কা হয়, তাহা খেলার অনুষ্ঠানের খরচ পূরণ করিতে পারে নাই। চারি দিন ব্যাপী একটি বিশিষ্ট প্রদর্শনী খেলার পর এরূপ অনুষ্ঠান করা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। সেইজন্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। ভবিষ্যতে এইরূপ কোন অনুষ্ঠান না হইলে আমরা সুখী হইব।

জাতীয় খেলাধূলা

জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘ ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই প্রতিষ্ঠান গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া বাঙলার বিভিন্ন জেলায় কিরূপভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী হইতেই জানিতে পারা গেল। সামান্য পাঁচ বৎসরের মধ্যে সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের সাহায্য ও সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়াও কিরূপে যে ইঁহারা এতগুলি স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। স্বার্থবুদ্ধিশূন্য একনিষ্ঠ কর্মী দলের দ্বারাই যে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শীঘ্রই ইঁহারা সকলের সমর্থন ও সাহায্য লাভ করিবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে।

ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভায় সঙ্ঘের নাম পরিবর্তন করিয়া 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘ' করা হইয়াছে। নামের সহিত শক্তি সঙ্ঘ যোগ দিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। 'প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘ' নামকরণ করিলেই চলিত। ক্রীড়া সকল সময় যে খেলা বুঝায় তাহা নহে, ইহার মধ্যে শক্তি অর্জনও অন্তর্নিহিত আছে। পরিচালকগণ নিশ্চয়ই বিশেষ কোন প্রয়োজনেই এইরূপ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা শক্তি কথাটি এখনই তুলিয়া দিতে বলি না।

নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসবের সময় জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘ এক শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ শিক্ষা শিবির প্রকৃতই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সম্প্রতি বর্ধমানের রসুলপুরে আর একটি শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। এই শিবিরের কার্যাবলী বর্ধমানে বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করিয়াছে। যে উদ্দেশ্যে এই সকল শিবির স্থাপন তাহা যখন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তখন প্রতি জেলায় শিবির স্থাপন করিলে ভাল করিবেন।

পি, সি, দাস এণ্ড সন্স
সুবাসিত
তরল আলতা
শত বৎসরের সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রসাধন
এ, পি, দাস এণ্ড কোং ৭, অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা · কলিকাতা।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৬ই জানুয়ারী—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি গ্রহণের সুপারিশ করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা অদ্য নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে গৃহীত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৯৯ এবং বিপক্ষে ৫২ ভোট হইয়াছিল। মিঃ পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি অগ্রাহ্য করিবার জন্য যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, উহা ৫৪-১০২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

৬ই ডিসেম্বরের বৃটিশ সরকারের বিবৃতি গ্রহণের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিকে সুপারিশ করায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু উহার প্রতিবাদ স্বরূপ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

৭ই জানুয়ারী—নোয়াখালির পল্লী অঞ্চলে পদব্রজে মহাত্মা গান্ধীর পরিভ্রমণ আজ প্রাতে পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। প্রাতে ৭-২৫ মিনিটের সময় মহাত্মা চণ্ডীপুর হইতে রওনা হন এবং বেলা ৯ ঘটিকায় মাসিমপুর গ্রামে পৌঁছেন। তিনি নগ্নপদে মাঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া যান। পথে পথে পল্লীবাসিগণ তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, ইন্দোচীনের স্বাধীনতা শৃংখলকে চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের প্রয়াস দেখিয়া ভারতের জনসমাজ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈ বলেন যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবের ফলে আসামকে এখন একাকী কাজ করিতে হইবে। নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসামকে যদি কোন শাসনতন্ত্র মানিয়া লইতে বাধ্য করা হয় বা বাঙলার সহিত বিভাগে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে আসামকে একাকী নিজ কর্তব্য ঠিক করিতে হইবে।

এইরূপ প্রকাশ যে, বাঙলা গভর্নমেণ্ট কলিকাতায় ইসলামিয়া কলেজের সম্প্রসারণের জন্য এক কোটি ১৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কোন কোন মহলের মতে ইহাই বাঙলার প্রস্তাবিত মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের সূচনা স্বরূপ হইতে পারে।

শান্তিপুরের সংবাদে প্রকাশ, গত রবিবার ৫ই জানুয়ারী শান্তিপুরে এক সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তি নিখোঁজ হওয়ার পর সোমবার হইতে পুলিশ শহরের বিভিন্ন স্থানে তল্লাসী চালাইতেছে। অদ্য প্রাতে পুলিশ ১৫।১৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

৮ই জানুয়ারী—মাসিমপুরে এক রাত্রি অবস্থানের পর নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে মহাত্মা গান্ধী আজ প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকায় মাসিমপুরের দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত ফতেপুর গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন এবং এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় ভ্রমণ করিয়া ফতেপুর পৌঁছেন। ফতেপুর মাদ্রাসা গৃহে গান্ধীজী অবস্থান করিতেছেন।

মাসিমপুরের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য মাসিমপুরে স্থানীয় আশ্রয় শিবিরের সন্নিকটবর্তী ময়দানে মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় রামধুন সংগীত [illegible] কীর্তন [illegible] মুসলমান সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

ব্যারাকপুর থানা হইতে মিলিটারী রিভলবার চুরি করিবার দায়ে কলিকাতার "মর্ণিং নিউজ" পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ও বিশিষ্ট লীগ সদস্য সৈয়দ জিলানীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভারত-আর্জেণ্টিনা চুক্তি অনুসারে আর্জেণ্টিনার ভুট্টা ও বাজরার পরিবর্তে চট পাঠাইবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট অবিলম্বে বাঙলা দেশের চট হস্তগত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ৭ই জানুয়ারীর এক অর্ডিন্যান্স বলে উহা করা হইবে। অদ্য প্রাতে উক্ত অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে।

গত সাতদিনে নোয়াখালি ও চাঁদপুর হইতে তিনশত আশ্রয়প্রার্থী কলিকাতায় আসিয়াছে।

বাঙলা সরকারের এক বিবৃতিতে প্রকাশ, বরিশাল জেলায় সুরাপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিয়া গভর্নমেণ্ট এক আদেশ জারী করিয়াছেন। বাঙলা সরকার পরিকল্পিত প্রদেশব্যাপী সুরাবর্জন সংক্রান্ত নীতি কার্যে পরিণত করার ইহাই প্রারম্ভিক ব্যবস্থা।

৯ই জানুয়ারী—মহাত্মা গান্ধী অদ্য নোয়াখালির ফতেপুর গ্রাম হইতে দাশপাড়া গ্রামে গমন করেন। ফতেপুর হইতে যাত্রার প্রাক্কালে স্থানীয় মাদ্রাসার মৌলবী ইব্রাহিম ও স্থানীয় অপরাপর মুসলমান নেতাদের সহিত মহাত্মার হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়।

পেশোয়ারের সংবাদে প্রকাশ, সীমান্তের হাজারা জেলায় কয়েকটি স্থানে বলপূর্বক ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে এবং কয়েকটি উপাসনা-স্থল ভস্মীভূত করা হইয়াছে।

গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিকল্পনানুযায়ী সীমান্ত গান্ধী খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ বিহার প্রদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অপর একটি অভিনব ধরণের পরীক্ষা আরম্ভ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সরকারী আদেশ অমান্যের দায়ে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স অনুসারে এক মামলা আনা হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরু সীমান্ত সফরে গমন করিলে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গিগণের উপর আক্রমণের ব্যাপারে জড়িত থাকায় মালাকন্দ এজেন্সীর পলিটিক্যাল এজেণ্ট ও ডেপুটি কমিশনারকে সসপেণ্ড করা হইয়াছে।

১০ই জানুয়ারী—কেন্দ্রীয় সরকারের কলিকাতাস্থিত ডিরেক্টর অব সাপ্লাইজের ধর্মঘটী কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য কলিকাতায় উক্ত সরকারের ত্রিশটি অফিসের অনুমান ১৫ হাজার কর্মচারী অদ্য একদিন স্থায়ী সাধারণ ধর্মঘট করেন। পুলিশ এতৎসম্পর্কে ২৫ জন মহিলা সহ অনুমান ১৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে। পরে সকলকেই জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

মহাত্মা গান্ধী অদ্য প্রাতে দাশপাড়া হইতে জগৎপুর গ্রামে গমন করেন। গতকল্য দাশপাড়ায় প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন, "নোয়াখালি জেলার মুসলমানদের বাঙলা গবর্ণমেণ্টকে বলা উচিত যে, তাঁহার জন্য পুলিশ বা মিলিটারী প্রহরীর কোন প্রয়োজন নাই; নোয়াখালি জেলায় ভ্রমণকালে তাঁহারাই গান্ধীজীকে রক্ষা করিবেন।"

সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর সীমান্ত প্রদেশে ১৯৪৭ সালের জনরক্ষা অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমের মুসলমান মহিলা কর্মী মিস আমতুস সালাম বর্তমানে নোয়াখালি শিরোণ্ডি গ্রামে অনশন করিতেছেন। অদ্য তাঁহার অনশনের পঞ্চদশ দিবস পূর্ণ হইল।

১১ই জানুয়ারী—জগৎপুর ত্যাগ করিয়া ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট ভ্রমণের পর মহাত্মা গান্ধী তাঁহার পল্লী-পরিক্রমা তালিকায় ষষ্ঠ গ্রাম লামচরে পৌঁছেন।

কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী এলাহাবাদে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী দত্তপাড়ার (নোয়াখালি) নিকটবর্তী এক গ্রামে অবস্থান করিবার সময় কয়েকজন গুণ্ডা তাঁহার কুটীরে হানা দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। কিন্তু সময়মত সতর্কতা অবলম্বন করায় তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

বর্ধমানের জেলা ও দায়রা জজ রাণীগঞ্জ মুসলিম লীগের সভাপতি গুমা খাঁয়ের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। গত ১৯শে আগষ্ট রাণীগঞ্জে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় একটি বালককে হত্যা করা সম্পর্কে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল।

ঢাকায় বঙ্গীয় বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে অন্তর্বর্তী সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ জন মাথাইয়ের সভাপতিত্বে গতকল্য প্রাদেশিক সচিব ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে সূতী বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চালু রাখিতে সম্মত হন। মনে হয়, ১৯৪৭ সালের জন্য মাথা পিছু ১১ গজ কাপড় বরাদ্দ হইতে পারে।

১২ই জানুয়ারী—অদ্য আরায় নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয়। সর্দার শার্দুল সিং কবিশের তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ প্রদান প্রসঙ্গে দল দফা কার্যসূচী উপস্থিত করেন। তিনি নেতাজী সুভাষবাবুর ধ্বনির—"বৃটিশের সহিত কোনরূপ আপোষ করা হইবে না এবং ভারতীয়দের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হইবে"—উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। আপোষ-বিরোধী সংগ্রামের দ্বারা নিপীড়িত জনগণই ক্ষমতা হস্তগত করিবে বলিয়া বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভায় প্রধান রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিদেশী সংবাদ

৬ই জানুয়ারী—ইন্দোচীনে হ্যানয়ের উপর ভিয়েৎনাম বাহিনী অবিরাম আক্রমণ চালায়। ফরাসী সামরিক মহল হইতে এইরূপ বলা হয় যে, প্রায় দুই সহস্র জাপানী সমর শিক্ষক ও অফিসার ভিয়েৎনামদের পক্ষে লড়াই করিতেছে এবং ভিয়েৎনামরা জাপানী সমর কৌশল আয়ত্ত করিতেছে।

৭ই জানুয়ারী—মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান রাষ্ট্রসচিব মিঃ বার্নেসের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। জেনারেল জর্জ মার্শাল তাঁহার পরিবর্তে রাষ্ট্রসচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮ই জানুয়ারী—প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বিশেষ দূত জেনারেল জর্জ মার্শাল চীনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এক রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, চীনের কম্যুনিষ্ট ও কুওমিণ্টাং দল পরস্পরের প্রতি যেরূপ অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব পোষণ করে চীনে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে উহাই প্রধান বাধা। তিনি আরও বলেন যে, যতবারই মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে, ততবারই উভয় পক্ষের চরমপন্থীরা তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

কথা-শিল্প

বাংলার কথা-শিল্প সাহিত্যে নূতন অভিযান

শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেবের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীগণের মধ্যে চৌদ্দজন শিল্পীর শ্রেষ্ঠ রচনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের .... ইতিহাস
আশাপূর্ণা দেবীর .... বাজে খরচ
সুবোধ বসুর .... আজাদী
'বনফুলে'র .... অর্জুন মণ্ডল
বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের .... বুড়ো হাজরা কথা কয়
অচিন্ত্য সেনগুপ্তের .... শিখণ্ড
বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের ... ... ফুলেশ্বরী
সরোজ রায়চৌধুরীর .... অকাল বসন্ত
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের .... প্রেরণা
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের .... চক্রান্ত
অন্নদাশঙ্কর রায়ের .... রূপ দর্শন
প্রবোধকুমার সান্যালের .... প্রশ্ন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের .... কামধেনু
বাণী রায়ের .... ডাঃ দীপান্বিতা চৌধুরী

প্রত্যেক রচনাটি সম্পূর্ণ নূতন এবং শিল্পীর বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচায়ক। এগুলিকে ঠিক ছোট গল্প না বলে 'নভেলেট' বা 'ক্ষুদ্র উপন্যাস' বলা চলে। ভবিষ্যৎ কালের ইতিহাসে এগুলি লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে গণ্য হবার সম্ভাবনা রাখে। প্রত্যেক গল্পের সঙ্গে শিল্পীর প্রতিকৃতি হস্তাক্ষরে নাম স্বাক্ষর ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সংলগ্ন হয়েছে।

মূল্য মাত্র সাড়ে তিন টাকা

হাজার টাকা পুরস্কার !

যে-গল্পটি অধিকাংশ পাঠকের মতে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে, সেই গল্পের লেখককে ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আশা করি, পাঠকপাঠিকারা এই সুযোগ গ্রহণ করে প্রত্যেকেই ভোট পাঠিয়ে তাঁদের রসবোধের পরিচয় দেবেন।

ভোটের কার্ড বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড

১৪, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটি নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাংক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, জি, বি, ই, কে, সি, এস, আই।
চীফ অফিস—আগরতলা ত্রিপুরা ষ্টেট।

ম্যাঃ ডিরেক্টর :
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ
রেজিষ্টার্ড অফিস গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, ভানুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মানু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, শ্রীহট্ট, ভৈরববাজার।

বাতে তাঁর হাঁটুদ্বয় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল

১০ বছর তাঁকে যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছে

তারপর ক্রুশেন ব্যবহারে তিনি নিরাময় হ'লেন

একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোক লিখছেন :—"১০ বছর আমি বাতে ভয়ানক কষ্ট পেয়েছি; ঔষধপত্রে আমি বহু টাকা ব্যয় করেছি। আমি প্রায়ই ক্রুশেন সল্টস্-এর উপকারিতার কথা শুনতে পেতাম; শেষে একদিন তাই ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত করলাম। এই সময় আমার হাঁটুদ্বয় সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হ'য়ে পড়েছিল—যেন সিমেণ্ট দিয়ে আড়ষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে।

"শেষে আমি এক শিশি ক্রুশেন ক্রয় করলাম এবং প্রত্যহ সকালে চা-চামচের এক চামচ সেবন করতে আরম্ভ করলাম। শিশিটি শেষ হ'ল—কোন ফলই পেলাম না; মনে হ'ল অন্যান্য ঔষধের ন্যায় এটিও বুঝি বৃথা হ'ল। কিন্তু আমার স্বামী ধৈর্য ধারণ ক'রে আর এক শিশি ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন এবং বললেন যে, আর এক শিশি ব্যবহার করা হ'লে রক্তের উপর উহার ক্রিয়া হবে; ফলে উপকার বোঝা যাবে। কাজেই আমি আরও এক শিশি ক্রুশেন ক্রয় করলাম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শিশিটি শেষ হবার পূর্বেই আমার হাঁটুদ্বয়ের আড়ষ্ট ভাব দূর হ'ল। আমি নুয়ে পড়তে পারতাম এবং টান হ'য়ে দাঁড়াতে পারতাম। কোন সাহায্যই এর জন্য আমার আবশ্যক হ'ত না। অবিশ্বাস্য এই ব্যাপারে আমার আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। তারপর আমি আরও এক শিশি খেলাম; আমার অবস্থা আর পূর্বের মতন নয়। সেদিন আমি চার মাইল বেড়িয়ে এলাম—একটুও অসুবিধা বোধ করলাম না; বরং ভালই বোধ করি।"

—(মিসেস্) ই এ।

অন্যান্য রোগভোগীগণকে বোঝাবার জন্য অধিক আর কি বলবার আছে। যেভাবেই হোক, তাঁদেরও একবার ক্রুশেন ব্যবহার ক'রে দেখা কর্তব্য মনে হয়। সব কিছুর আগে প্রত্যহ সকালে চা-চামচের আধ চামচ থেকে এক চামচ ক্রুশেন গরম জলে মিশিয়ে সেবন করা বিধেয়।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয় ও ষ্টোরে ক্রুশেন সল্টস্ পাওয়া যায়। (১১)

পাকা চুল কাঁচা হয়

কলপে সারে না। আমাদের স্রেইমিয়া সুগন্ধি আয়ুর্বেদীয় তৈলে চুল চিরতরে স্বাভাবিক কাল হইবে আর পাকিবেই না। মূল্য ২।০ অল্প পাকায়, ৩।০ কিছু বেশী পাকায় এবং ৫, প্রায় সব পাকায়। এই তৈল মাখা ও চক্ষুরও খুব উপকারী।

এস, এম, গুপ্ত ফার্মেসী,
নং ৩ পোঃ কাত্রীসরাই (গয়া)।

স্নায়বিক বৈকল্য হেতু অনিদ্রা।



বিনিদ্র রজনী অতি সত্বর স্বাস্থ্য নষ্ট করে। প্রত্যহ সকালে সতেজ, সচকিত এবং নূতন দিনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইলে আপনাকে প্রতিদিন রাত্রিতে পূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ আপনার সমস্ত স্নায়ুগুলিকে সুশৃঙ্খল অবস্থায় রাখিতে হইবে।

শরীর এবং মস্তিষ্কের ন্যায় স্নায়ুরও পুষ্টির প্রয়োজন। সে জন্য আপনাকে যথোপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও সুস্বাদু খাদ্য 'ওভালটিন'ই ইহা আপনাকে দিতে সমর্থ। নিদ্রা যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একপাত্র 'ওভালটিন' পান করুন। স্নায়ুকে স্নিগ্ধ রাখা এবং স্বাভাবিক নিদ্রা আনয়নের জন্য ইহার সমকক্ষ আর কিছুই নাই। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিতে পাইবেন আপনি বেশ সুস্থ, সবল ও সচকিত।

সুপক বার্লির মণ্ড, টাট্কা ও পনির সংযুক্ত গোদুগ্ধ এবং অতি প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক ভাইটামিন ও অন্যান্য উপাদানের সমন্বয়ে ইহা তৈয়ারী।





...সমস্ত ডাক্তারখানা ও বড় বড় দোকানে বিক্রয় হয়।

ডিস্ট্রিবিউটার্স — গ্রেহাম্স ট্রেডিং কোং (ভারতবর্ষ) লি, ৬, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা এবং বোম্বাই করাচি, মান্দ্রাজ।

ওভালটীন

'OVALTINE বলকারক পানীয় (খাদ্য)।'

'ওভালটিন' গাঢ় ও শান্তিপূর্ণ নিদ্রা আনে।



OV/106

কিছু সময় অন্তর অন্তর ওভালটিনের টাটকা মাল নিয়মিতভাবে আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যায়। সর্ব্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য গবর্ণমেণ্ট ধার্য করিয়া দিয়াছেন। ইহার বেশী দিবেন না।

প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

তৃতীয় সংস্করণ বর্ধিত আকারে বাহির হইল।
বাংগালী হিন্দুর এই চরম দুর্দিনে
প্রফুল্লকুমারের পথনির্দেশ
প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য।
মূল্য—৩.
—প্রকাশক—
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।
—প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা।
ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

বিনা অস্ত্রে

চক্ষুছানি

ডিজন্স "আই-কিওর" (রেজিঃ) চক্ষুছানি এবং সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়। নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩ টাকা মাশুল দ৹ আনা।

কমলা ওয়ার্কস (দ) পাঁচপোতা, বেঙ্গল।

পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের আয়ুর্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করুন এবং ৬০ বৎসর পর্যন্ত আপনার পাকা চুল কালো রাখুন। আপনার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হইবে এবং মাথাধরা সারিয়া যাইবে। অল্প সংখ্যক চুল পাকিলে ২৷৷৹ টাকা মূল্যের এক শিশি, বেশী পাকিয়া থাকিলে ৩৷৷৹ মূল্যের এক শিশি, যদি সবগুলিই পাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ৫. টাকা মূল্যের এক শিশি তৈল ক্রয় করেন। ব্যর্থ হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে।

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবলে কয়েক দিন এই ঔষধ প্রয়োগের পর আশ্চর্যজনক ফল দেখা যায়। এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই ভয়াবহ ব্যাধির হাত হইতে মুক্তিলাভ করুন। সহস্র সহস্র হাকিম ডাক্তার, কবিরাজ বা বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক ব্যর্থ হইয়া থাকিলেও ইহা নিশ্চয়ই কার্যকরী হইবে। ১৫ দিনের ঔষধের মূল্য ২৷৷৹ আনা।

বৈদ্যরাজ অখিলকিশোর রায়

নং ১০৪, কাছারীসরাই, গয়া।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে ম[illegible] ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।



ম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ৬ই আষাঢ়, ১৩৫৪ সাল। Saturday, 21st June, [৩৩শ সংখ্যা

শবন্ধু স্মরণে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ২২তম মৃত্যু-র্ষিকী। সমগ্র দেশবাসীর সহিত মরা এই মহাপ্রাণ; ত্যাগীশ্রেষ্ঠ দেশবন্ধুর ৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। শবন্ধুর প্রাণদান—সমগ্রদেশের প্রাণশক্তিরই ন্ত জীবনদান। ইহার মৃত্যু নাই। দেশের পামর সাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্তহীন ালা দেশবন্ধুকে যেভাবে অতিষ্ঠ করিয়া য়াছিল—এমন আর কাহাকেও দেয় নাই। তির দুঃখ অমর্যাদা—পরাধীনতা এই রুষ সিংহের অন্তস্তলে যে জ্বালা ধরাইয়া াছিল তাহাই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ফকির রয়াছে, সর্বস্ব বিলাইয়াও এই ফকির শিষ্ট দেহও উহারই জন্য বিসর্জন দিলেন। শের পরাধীনতার অমর্যাদা দেশবন্ধুকে রহ পীড়ন করিয়াছে, জীবন বিস্বাদ রয়া দিয়াছে, তাই দেশের স্বাধীনতার জন্য াতরে সর্বস্ব বিলাইয়া দেওয়াও তিনি ষ্ট মনে করেন নাই। বাঙলার চিরন্তন মূর্তি দেশবন্ধুর ছিল সাধ্য ও সাধনার । দেশকে ভালবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়—শের সকল শ্রেণীর নর-নারীকে সর্ব অন্তর ভালবাসা, তাহাদের সঙ্গে পরম একাত্মতা । দেশবন্ধুর পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে দেশ-ীর সঙ্গে এই একাত্মতাবোধই যেন আমরা র সঙ্গে অর্জন করিতে পারি—ইহাই ব তাঁহার যোগ্য তর্পণ।

ার্য প্রফুল্লচন্দ্র

ত্যাগী সন্ন্যাসী প্রফুল্লচন্দ্রের তৃতীয় মৃত্যু-কীতে সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে আমরা ঞ্জলী নিবেদন করিতেছি। বাঙালীকে করিবার—বড় করিয়া দেখিবার এমন সযত্ন কনিষ্ঠ সাধনা কে করিয়াছে? দেশের ও শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান অনুশীলনে ল্প-বাণিজ্যে দেশের যুবকগণকে একনিষ্ঠ ায় ব্রতী হইবার জন্য এই

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিজ্ঞানাচার্য আমরণ যে সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন দেশের কোন তাপসের পক্ষেই সহজসাধ্য নহে। কি অনাড়ম্বরে এই মহাকর্মী, আজন্ম ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী প্রফুল্লচন্দ্র তিলে তিলে আত্মনিবেদন করিয়া দেশবাসীর সেবা করিয়া গিয়াছেন—তাহা ভাবিলে শুধু বিস্ময়-বিমুগ্ধ হই না, গর্বে বুক ভরিয়া উঠে—প্রফুল্লচন্দ্রেরই আমরা দেশবাসী, তাঁহাকে দেখিবার সান্নিধ্য লাভ করিবার সুযোগ-সৌভাগ্য আমাদেরও হইয়াছে। দেশকে কার্যতঃ সর্বতোভাবে বড় করিবার যে একনিষ্ঠ ত্যাগ-তপস্যার প্রয়োজন—যে নিরলস কর্মিষ্ঠতার প্রয়োজন—আজিকার স্মৃতি তর্পণ দিবসে তাহাই যেন আমাদের প্রেরণা হয়।

৩রা জুনের পরিকল্পনা গ্রহণ

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণা বিপুল ভোটাধিক্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ইতিপূর্বেই ৩রা জুনের ঘোষণা গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধীও অবস্থা বিবেচনায় এই ঘোষণা গ্রহণের স্বপক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করেন। সুতরাং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিও যে ঘোষণা গ্রহণ করিবেন ইহাই আশা করা গিয়াছিল। ঘোষণার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিয়াছিল। ইহাও অপ্রত্যাশিত কিছু নহে। বৃটিশ ঘোষণায় কোন দোষত্রুটি নাই—ইহার অবাঞ্ছিত অংশ একেবারেই তুচ্ছ ইহাও নহে। সুতরাং কংগ্রেসের ন্যায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের এতগুলি সদস্যের মধ্যে ঘোষণা গ্রহণ সম্পর্কে কোন মতভেদ দেখা দিবে না—কেহই কোন আপত্তি তুলিবে না, ইহাও আমরা প্রত্যাশা করি না। তবে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে, ঘোষণার যাহা প্রধান অবাঞ্ছিত অংশ—তা মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের নিকটও অবাঞ্ছিতই। কিন্তু কেন তাঁহারা ৩রা জুনের ঘোষণা গ্রহণ করিয়া বাধ্য হইলেন—তাহাই নেতৃবর্গের মুখে পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল, আচা কৃপালনী এবং স্বয়ং মহাত্মার মুখে পরিষ্ক হইবার পর কাহারো এই সত্য উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইবে না, যে, ভার রাজনীতি ক্ষেত্রে বর্তমানে যে সঙ্কট সম্মুখীন হইয়াছে—তাহাতে অবাঞ্ছিত বিভ সম্বলিত ৩রা জুনের পরিকল্পনা গ্রহণ ক ভিন্ন দ্বিতীয় কার্যকারী পথ ছিল না।

মুসলিম লীগ কোন মতেই ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিবে না, এদিকে সাম্প্রদায়ি তাণ্ডব ভারতের কল্যাণময় সকল সম্ভাবনাকে ধ্বংস করিতে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে থাকিলেও, যে-হে প্রকৃত ক্ষমতা তাহার নাই, এবং অন্তর্বর্ত গবর্ণমেণ্টের মুসলিম লীগের সদস্যগণ কেব বাধা সৃষ্টি করিয়াই চলিতেছেন,—সেই হে ভারতে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব, নৃশংস অমানুষি নর-হত্যা রোধ করা কংগ্রেসের সদস্যগণে পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ভারতের এ সাম্প্রদায়িক হত্যা লীলায় বৃটিশ আমলাগ উদাসীন। যে-হেতু তাহারা ভারত হই চলিয়া যাইবেন, সেই হেতু ভারত শাসনে সত্যকার কোন দায়-দায়িত্বই তাহারা বহ করিতেছেন না—অথচ অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতাহীন, ফলে ভারতের অবস্থা দিন দি মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে।

মুসলিম লীগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যো দিবে না, গণপরিষদ বর্জন করিয়াছে, যদি লর্ড ওয়াভেলের অনুগ্রহে বা ভুল সিদ্ধান্তে ফলে পশ্চাদদ্বার দিয়া তাহারা অন্তর্বর্ত গবর্ণমেণ্টে প্রবেশ করিয়াছে। প্রবেশ করিয়া—তাহাদের অভীষ্ট অনৈক্যমূলক কর্মনী

অনুসরণের জন্য। কংগ্রেস ভারতের ঐক্যই কামনা করিয়াছে, শক্তিশালী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু কংগ্রেস ইহাও ঘোষণা করিয়াছে, যে, ভারতের কোন অংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহাদের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ধরিয়া রাখা কংগ্রেসের নীতি নহে। এই নীতি অনুযায়ী কোন অংশ যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে যাইতে চাহে—তাহা কংগ্রেস দুঃখের সঙ্গে হইলেও মানিয়া লইবে, কেবল কংগ্রেস দেখিবে, এই সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট জনগণের অভিমতের মর্যাদা রক্ষা হইল কি না। ৩রা জুনের সিদ্ধান্ত যেমন মুসলিম লীগের দাবীর মূল্য দিতে গিয়া ভারত বিভাগের কথা বলিতেছে, তেমনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে ইচ্ছুক বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগের নীতি গ্রাহ্য হইয়াছে। ইহার অর্থ, মুসলিম লীগ যতটা অন্যায় ও অহিত সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল—তাহা সম্যক সাধিত হয় নাই। তাহাদের অনিচ্ছায় যেমন তাহাদের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া সম্ভব হয় নাই, তেমনি বাঙলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু এবং হিন্দু-শিখপ্রধান অংশকেও তাহাদের কুক্ষিগত করা সম্ভব হয় নাই। মুসলিম লীগ সমগ্র ভারতেই অশান্তি, অনিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি করিতেছিল,—প্রতিপক্ষ হিসাবে সাম্প্রদায়িক লড়াই চালাইলে—ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সর্বনাশের পথই মুক্ত হইত, কিন্তু ভারতের কল্যাণ সাধিত হইত না। কংগ্রেসের সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা ও কল্যাণ সাধনের সাধনা করিবার বাসনা যদিও সফল হইল না, কিন্তু ভারতের বৃহত্তর অংশের স্বাধীনতা এবং সমুন্নতি সাধনের সুযোগ এই ব্যবস্থায় লাভ হইয়াছে। মুসলিম লীগ তাহার অংশ লইয়া ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের বাহিরে থাকিয়া স্বীয় কর্তব্য করুক, কিন্তু কংগ্রেস এবারে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তি কায়েম করিয়া ভারতের বৃহত্তর অংশের কল্যাণসাধনে সক্ষম হইবে। কংগ্রেস এই বিশ্বাসও অন্তরে পোষণ করে, যে, তাহাদের অনুসৃত কর্মনীতির প্রভাবে কেবল মাত্র পরিকল্পিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশগুলিরই কল্যাণ সাধিত হইবে না, পরন্তু সমগ্র ভারতের ঐক্যের ভিত্তিতেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা মূর্ত হইয়া উঠিবে। কোন অংশ যদিও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে আজ যাইতেছে—কিন্তু কংগ্রেস ভারতের যে মানচিত্র অনুধ্যান করিতে অভ্যস্ত সেই অখণ্ড ভারতের মানচিত্রকেই তাহারা মানসলোকে চির উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। যে বাঞ্ছিত ঐক্য আজ সম্ভব হইল না, কংগ্রেসের আদর্শগত সাধনায় তাহাই সম্ভব হইবে। তখন এক দেশে দুই জাতির ভুয়া তত্ত্ব মুসলিম লীগের দ্বারাই বর্জিত হইবে।

ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্য — ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান—ভারতের পর্বতমালা—ভারতের সমুদ্র ভারতকে যে অখণ্ড রূপ দান করিয়াছে—তাহা কি কোন মানুষের পক্ষে রদবদল করিয়া দেওয়া সম্ভব? কংগ্রেস মর্মবেদনার সঙ্গেই কোন কোন অংশের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে যাওয়ার সম্ভাবনাকে মানিয়া লইয়াছে—কিন্তু ভারত ও ভারতবাসীর ঐক্যই যে নিয়তি, ইহাই যে অপরিহার্য সত্য ইহাই কংগ্রেস বিশ্বাস করে; এই বিশ্বাস লইয়াই—বর্তমানের ৩রা জুনের পরিকল্পনা কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছে।

১৬ই মে বনাম ৩রা জুন

কংগ্রেস নেতৃবর্গের কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে, ১৬ই মের মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা অপেক্ষা ৩রা জুনের পরিকল্পনা ভালো। অবশ্য মৌলানা আজাদ তাহা মনে করেন না; মহাত্মাজীও ১৬ই মের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যই বৃটিশকেও অনুরোধ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, ১৬ই মের পরিকল্পনা কংগ্রেস গ্রহণই করিয়াছিল—এমন কি ৬ই ডিসেম্বরের বৃটিশ ভাষ্য সমেতই গ্রহণ করিয়াছিল। তাহা গ্রহণ করে নাই মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগকে গ্রহণ করাইবার জন্য বৃটিশ পক্ষ হইতে চাপ দেওয়াও হয় নাই, বরং মিঃ জিন্নাকেই যথাসম্ভব তোষণ করিতে পরবর্তী পরিকল্পনা হইয়াছে। তবে ইহাও সত্য যে, ১৬ই মের পরিকল্পনা গৃহীত হইলে—ভারতের অখণ্ডতা নামে মাত্র থাকিত, কিন্তু কেন্দ্র নিতান্ত দুর্বল হইত বলিয়া, মুসলিম লীগের পদে পদে বাধা সৃষ্টির দরুণ—কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অগ্রসর হইতে পারিত না। সেই হিসাবে তুলনা করিলে—১৬ই মের পরিকল্পনা হইতে ৩রা জুন-এর পরিকল্পনা—আমরাও ভালো মনে করি।

শক্তিশালী কেন্দ্র

আজিকার দিনে পৃথিবীতে যে কয়টি যুক্তরাষ্ট্র বিদ্যমান, সেইগুলির কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট প্রভুত শক্তিশালী। তাহারা যে কেবল বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা বিষয়েই ক্ষমতাবান তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে শিল্প-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক বিলি-ব্যবস্থা এবং সংগঠনমূলক বহু বিষয়ে তাহারাই করেন কর্তৃত্ব, তাহাদের পরিকল্পনাই—বিভিন্ন ইউনিয়ন কর্তৃক অনুসৃত হইয়া থাকে। সমগ্র দেশের শিল্প-বাণিজ্য, যানবাহন, নদ-নদী, রাস্তাঘাট সম্পর্কিত "প্ল্যান" কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টই করিয়া থাকেন। ফলে একই বৃহত্তর প্রেরণা সমগ্র দেশের প্রতিটি প্রদেশ বা রাষ্ট্রেই কার্যকরী হইতে থাকে। কোন কোন সম্মিলিত বা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট সমগ্র দেশের বা রাষ্ট্রের সামগ্রিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিয়া শিল্পের উৎপাদনই শুধু নহে, কৃষি-উৎপাদন পর্যন্ত
নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। স্পষ্টতঃই (
যায়—ইউনিট বা প্রাদেশিক রাষ্ট্রগু
অটনমীর ব্যবস্থা যাহাই থাকুক না (
শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টই সমগ্র দে
সর্বাঙ্গীন উন্নতি, সুখ-শান্তি বিধানে স
সেই হিসাবে বর্তমান ভারতীয় গণপ
ভারতের বৃহৎ অংশের জন্য এক শক্তিশ
আদর্শনিষ্ঠ কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট গঠনের আ
সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবেন। মুস
লীগের বাধাদানের প্রশ্ন না থাকায়
কার্যকরী হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় ন
কংগ্রেস নেতৃবর্গ তাই কেন্দ্রে শক্তিশ
গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের ব
অংশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনের আ
পোষণ করিতেছেন। এই আশা ফলপ্রসূ হ
—ইহাতে সন্দেহ নাই।

দেশীয় রাজ্য

দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে নিঃ ভাঃ রাঃ স
যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই স
কংগ্রেস নেতৃবর্গ যে সুস্পষ্ট অভিমত
করিয়াছেন, তাহা ভারতের স্বাধীনতা
মাত্রই যে সমর্থন করিবে, ইহাতে সন্দেহ
ভারতের দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদ
ত্রিবাঙ্কুর ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৃটিশ ক্ষ
হস্তান্তর করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তা
স্বাধীন হইবেন। তাহাদের এই স্বাধ
হায়দরাবাদ এবং ত্রিবাঙ্কুরের তথা হায়দ
ও ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসী প্রজা সাধা
স্বাধীনতা নহে, ইহা ঐ রাজ্যের রাজা, মন্ত্র
দেওয়ানদের মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী শাস
পরিচালনার স্বাধীনতা। এই 'স্বাধীন
তাঁহারা চাহিতেছেন। তাই মহাত্মাজী ব
দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবর্গের স্বাধ
ঘোষণার অর্থই রাজ্যের প্রজা সাধারণের বি
যুদ্ধ ঘোষণা। যে আইন ও অধিকারের
তাহারা বলিতেছেন, তাহাও নিতান্ত
তাঁহারা বৃটিশ রাজের অধীন ছিলেন,
বৃটিশরাজ থাকিতেছে না, সুতরাং
স্বাধীন—ইহাই তাঁহাদের বক্তব্য
ইহাও আইন সম্মত নহে।
কার্যতঃ ভারত গভর্নমেণ্টেরই অধীন। ব
ভারত গভর্নমেণ্টের সাহায্যেই তাহাদের
'কর্তৃত্ব' করিয়াছেন। আজ যে
হস্তান্তরিত হইল, তাহা নিঃসংশয়ে ব
ভারতীয় গভর্নমেণ্টের উপরই
হইতেছে। বড় কথা তাঁহারা ভা
যুক্তরাষ্ট্রে যোগ না দিয়া যে স্বাধীনতা ল
কথা বলিতেছেন, সেই সম্পর্কে রাজ্যের
সাধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।
রাজ্যের প্রজা সাধারণের গণভোটে
"স্বাধীনতা" সমর্থিত হইত, তাহা হইলে
বিবেচনার বিষয় হইত। কিন্তু সেই পথে
ল দেশীয় রাজ্য পদক্ষেপ করা বিপদ

াসকবর্গের পক্ষে) মনে করিয়াছেন এবং জাগণের অভিপ্রায় ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তথা-থিত স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছেন। শীয় রাজ্যগুলির কেহ মোগল ও মারাঠা জের অধীন ছিল, কেহ বৃটিশ সৃষ্ট। তাহারা াপি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পায় নাই। ন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহাদের কোন স্বতন্ত্র স্তিত্বই স্বীকার করা হয় নাই। বৃটিশরাজের থবা বৃটিশ অধিরাজের অধীনও তাঁহারা হন। ভারত সম্রাটের প্রতিভূরূপে বড়লাটের ীন বলিয়া যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাও ল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বড়লাট কার্যতঃ রত গভর্নমেণ্টের সাহায্যেই তাঁহাদের উপর র্তৃত্ব করিয়াছেন। ভারত সম্রাট তাঁহার যে মতা ত্যাগ করিতেছেন, তাহা নীতির দিক তে প্রস্তাবিত ভারত গভর্নমেণ্টেরই হস্তে। গ্রেস তাই সুস্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, শীয় কোন রাজ্যের 'স্বাধীন' হইবার কোন ধিকার নাই। প্রজাগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই াধীনতা ঘোষণা হইয়াছে বলিয়া ইহা ধিকতর বিপজ্জনক। পণ্ডিত জওহরলাল ং সঙ্গত সতর্কবাণীই উচ্চারণ করিয়াছেন যে, রত গভর্নমেণ্ট, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এই তথা-থিত স্বাধীনতা তো স্বীকার করিবেনই যদি কোন বৈদেশিক শক্তি কোন দেশীয় জ্যের এই স্বাধীনতা স্বীকার করেন, তাহা লে সেই কার্য ভারতের বিরুদ্ধতা বলিয়াই ্য হইবে। ভারতের কতগুলি দেশীয় জ্য ইতিমধ্যেই ভারতীয় গণপরিষদে যোগদান রিয়াছেন। আরো কতক রাজ্য শীঘ্রই যোগ বেন। সুতরাং যে কয়টি রাজ্য যোগ না দিয়া তন্ত্র থাকিতে চাহিতেছেন, তাহা যে ভারতের াধীনতাকে বিঘ্নিত করারই জন্য এবং ্যযুগীয় শাসন কায়েম রাখার দুর্বুদ্ধিতে হা বুঝিতে কাহারো কষ্ট হয় নাই। কংগ্রেস ্রসিডেণ্ট আচার্য কৃপালনী বলেন—ভারতের ণপরিষদে যোগ দিবার অধিকার দেশীয় জ্যের প্রজাদের আছে। তাহাদের প্রতিনিধি হারা অবশ্যই প্রেরণ করিতে পারিবে। তিনিধিমূলক কোন প্রতিষ্ঠান যেখানে দ্যমান সেখানকার তো সমস্যাই নাই, যে জ্য তাহা নাই, সেই রাজ্যের প্রজাগণ তিনিধি প্রেরণের গণতান্ত্রিক কোন ব্যবস্থা রয়া লইবে। সুতরাং ইহাই স্পষ্ট তেছে যে, যদিও কোন রাজ্যের নৃপতি এবং হার মন্ত্রী ও দেওয়ান গণপরিষদের বাহিরে াকিতে বদ্ধপরিকর থাকেন—তথাপি ঐ সকল জ্যের প্রজাগণ ভারতীয় গণপরিষদে যোগ বেন। সেই গণপরিষদ যে শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন, প্রজাগণ তাহাই গ্রহণ করিবে, তাহারই আনুগত্য স্বীকার করিবে, ইহার বাহিরে কোন স্বেচ্ছাচারী রাজার আনুগত্য স্বীকার করিবে না। দেশীয় রাজ্যের এই ভাবী অবশ্যম্ভাবী সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে, দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে তথা উহার নৃপতি-গণের পক্ষে আত্মরক্ষা করিবার জন্যও ভারতীয় গণপরিষদে যোগদান করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইহাও প্রকাশ কোন কোন দেশীয়রাজ্য ইতিমধ্যেই অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা যে রাজ্যের প্রজাগণকে সায়েস্তা করার জন্য মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারত গভর্নমেণ্ট অবিলম্বে এই সকল অশুভ প্রয়াস বন্ধ করিবেন, ইহাই কংগ্রেস আশা করে।

বঙ্গ বিভাগ

৩রা জুনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গ বিভাগ হইবে কি না বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের ভোটে তাহা স্থির হইবে। এই মন্তব্য লেখার সময়ে পরিষদের সদস্যগণের এই সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত জানা সম্ভব নহে। ২০শে জুনের অধিবেশনে তাহা স্থিরীকৃত হইবে। বলা বাহুল্য, হিন্দু-প্রধান জেলাগুলির অ-মুসলমান সদস্যগণ বঙ্গ বিভাগের পক্ষে ভোট দিবেন, এবং তদনুযায়ী বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাব গৃহীত হইবে, ইহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। বর্তমান সংখ্যা 'দেশ' প্রকাশিত হইবার পূর্বেই বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে।

অতঃপর সমস্যা সীমা নির্ধারণ। আমাদের সমবেতভাবে এই সীমা নির্ধারণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং হিন্দুর ন্যায়সঙ্গত দাবী যাহাতে সীমা নির্ধারণ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত হয় তজ্জন্য এখন হইতেই সচেষ্ট হইতে হইবে। বাঙলার জাতীয়তাবাদীদের এই উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হইতে হইবে, সকল-গুলি প্রতিষ্ঠান যাহাতে একযোগে সীমা নির্ধারণ ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করে তন্নিমিত্ত একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। যে সকল জেলা এবং জেলার অংশ সঙ্গতভাবে নূতন গঠিত পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে, যুক্ত হওয়া উচিত সেই সকল জেলা ও জেলার অংশের তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে এবং আমাদের দাবীর সমর্থনকল্পে সংগৃহীত উপকরণগুলি একটি নির্দিষ্ট প্রধান কেন্দ্রে সরবরাহ করিতে হইবে। সীমা নির্ধারণ কমিশনের সম্মুখে আমাদের দাবী যাহাতে নির্দিষ্ট, যুক্তিযুক্ত ও তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয় তাহা করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন-ভাবে সংগৃহীত ও উপস্থাপিত হইলে দাবী লক্ষ্যহীন ও দুর্বল হইবার আশঙ্কা আছে। ৩রা জুনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙলার অ-মুসলমান প্রধান অংশ বলিয়া যে কয়টি জেলা সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সীমা নির্ধারণের পরে তাহাই মাত্র জাতীয়তাবাদী বাঙলার ভাগে পড়িবে না, তাহা নিতান্তই সাময়িক ব্যবস্থা। আরো কয়টি জেলা ও জেলার অংশ নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হইবে। কিন্তু তাহা নির্ভর করে জাতীয়তাবাদী বাঙলা সীমা নির্ধারণ কমিশনের সম্মুখে নিজেদের সঙ্গত দাবী কিভাবে উপস্থিত করিবে তাহার উপর। বাঙলার যতটা বেশী অংশ সঙ্গতভাবে পশ্চিম বঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়া ভারতীয় ইউনিয়নে মিলিত হইতে পারে সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। সেই কারণেই সীমা নির্ধারণ বিষয়টি আমরা জাতীয়তাবাদী বাঙলার পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে করি।

শ্রীহট্ট

শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে কি পূর্ব বাঙলার সহিত সংযুক্ত হইবে, তাহা শ্রীহট্ট জেলাবাসীর গণভোটে নির্ধারিত হইবে। শ্রীহট্ট জেলার হিন্দু অধিবাসী এবং মুসলিম লীগের সমর্থক নহে যে সকল মুসলমান, তাহারা সকলেই, আসামের সঙ্গেই থাকিতে চাহিবে। আজ প্রশ্ন আসাম ও শ্রীহট্ট লইয়া নহে। আজ প্রশ্ন শ্রীহট্টবাসী পূর্ব বাঙলার পাকিস্থানে যুক্ত হইবে, অথবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হইবে। আসাম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত থাকিবে বলিয়া শ্রীহট্টবাসী আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেই পাকিস্থানের বাহিরে পড়িবে এবং বাঞ্ছিত ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারিবে। শ্রীহট্টের হিন্দু সাধারণ এবং পাকিস্থান বিরোধী শ্রীহট্ট জেলার মুসলমানগণ যে পূর্ব বাঙলার পাকিস্থানের কুক্ষিগত হইতে চাহিবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল কোন বস্তু চাহিলেই তাহা পাওয়া যায় না। যখন ভোটের দ্বারা তাহা স্থির হইবে তখন ভোট দানে অধিকারী প্রত্যেক শ্রীহট্টবাসী যাহাতে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া ভোটদান করেন এবং ভোটদান করিতে পারেন তাহার সুব্যবস্থা হওয়া চাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস নিরপেক্ষ ভোট গণনা হইলে এবং লীগপন্থীদের ভীতি প্রদর্শন ও জোর জবরদস্তী বন্ধ থাকিলে শ্রীহট্টবাসীর গণভোট আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার পক্ষেই প্রযুক্ত হইবে। শ্রীহট্টবাসীর উৎসাহ, উদ্যম, কর্মকুশলতার উপরই সব নির্ভর করিতেছে।

মাতৃবন্দনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-জননী সারদাদেবী প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার লিখিয়াছেন, "দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় মহাপুরুষের পত্নী এবং দ্বিজেন্দ্রন প্রমুখ সন্তানের জননী হইলেও সাহিত্যে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কোনো অমর সৌধ নির্মিত হয় নাই। তাঁহার কৃতকর্মা পুত্র অথ বিদুষী কন্যাগণের মধ্যে কেহই তাঁহার মাতৃদেবী সম্বন্ধে তেমন-কিছু লিখেন নাই, কেহ কোনো গ্রন্থ মাতৃনামে উৎসর্গও করেন নাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিরাট সাহিত্যে জননী সম্বন্ধে কয়েকটি স্থানে মাত্র সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন......।" এই প্রসঙ্গে, সুরেশচন্ সমাজপতি সম্পাদিত 'আগমনী' (মহালয়া ১৩২৬) হইতে রবীন্দ্রনাথের 'মাতৃবন্দনা' কবিতাবলী পুনর্মুদ্রিত করিতেছি। এ কবিতাগুলিও অবশ্য 'সামান্য উল্লেখ' বলিয়া বিবেচ্য; তবু এগুলির অধিকাংশ কোনো গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয় নাই বলিয়া—কেবল 'জননি তোমার করুণ চরণখানি' গীতাঞ্জলীতে মুদ্রিত হইয়াছিল—সাধারণের নিকট অপরিচিত, এইজন্য এগুলি পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে।

—শ্রীহলধর হালদার

হে জননি, ফুরাবে না তোমার যে দান,
শিরার শোণিতে তাহা চির বহমান।
তুমি দিয়ে গেছ মোরে সূর্য তারা চাঁদ,
আমার জীবন সে তো তব আশীর্বাদ।

—

মাতঃ, পুণ্যময়ী মাতৃভূমি
চিনায়ে দিয়েছ তুমি
তোমা হতে জানিয়াছি নিখিল-মাতারে।
সে দোঁহার শ্রীচরণে
নত হয়ে কায়মনে
পারি যেন তব পূজা পূর্ণ করিবারে।

—

জননি, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণরূপে।
জননি, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।
তোমারে নমি হে সকল ভুবন মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে,
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি—
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে,
জননি, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণকিরণরূপে।

—

জননি,
তোমার মঙ্গল-মূর্তি অমৃতে লভিছে স্ফূর্তি
অমর্ত্য জগতে।
তোমার আশিষদৃষ্টি করিছে আলোকবৃষ্টি
সংসারের পথে।
তোমার স্মরণপুণ্য করিতেছে গ্লানিশূন্য
সন্তানের মন।
যেন গো মোদের চিত্ত চরণে যোগায় নিত্য
কুসুমচন্দন।

—

হে জননি, বসিয়াছ মরণের মহা-সিংহাসনে,
তোমার ভবন আজি বাধাহীন বিপুল ভুবনে।
দিনের আলোক হতে চাও তুমি আমাদের মুখে,
রজনীর অন্ধকারে আমাদের লও টানি বুকে।
মোদের উৎসব মাঝে তোমার আনন্দ করে বাস,
মোদের দুঃখের দিনে শুনি যে তোমার দীর্ঘশ্বাস!
মোদের ললাটে আছে তোমার আশিষ-করতল
এ কথা নিয়ত স্মরি দেহমন রাখিব নির্মল।

—

ওগো মা, তোমারি মাঝে, বিশ্বের মা যিনি
ছিলেন প্রত্যক্ষ বেশে জননীরূপিণী।
সেদিন যা কিছু পূজা দিয়েছি তোমায়,
সে পূজা পড়েছে বিশ্বজননীর পায়।
আজি সে মায়ের মাঝে গিয়েছ মা চলি,
তাঁহারি পূজায় দিনু তব পুষ্পাঞ্জলি।

—

কা সুরে কথা বলে বলে আমার স্বভাব কেমন হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। গোড়ায় যখন শুরু করেছিলাম ভেবেছিলাম হাল্কা ভীর কথা বলব, কেননা গভীর কথা সুরে বললে কেউ শুনতেই চায় না। প্রলেপ না দিলে ছেলেপিলেদের যেমন ইন গেলানো যায় না, এও তেমনি। যাও-বা ার একটু গম্ভীর কথা বলতে গিয়ে- াম, তাতেই কোনো কোনো পাঠক মনঃক্ষুণ্ণ ছেন। কিন্তু আপনারা রাগই করুন আর াই দিন গম্ভীর কথা না বললে আর ছে না।

দেশের আবহাওয়াটা এমন গম্ভীর থম্ হয়ে উঠেছে যে হাল্কা কথা ব'লতে নিতেই লজ্জা করে। দেশময় ছোট বড় গারি যত রকম নেতারা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ৃতি কিম্বা বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন। ক আর শ্রোতাদের এখন মাথা ঠিক রাখা হয়েছে। নিতান্ত অকিঞ্চন ব্যক্তি হলেও মি আর কিছুতেই লোভ সামলাতে রছিনে। মাইক্রোফোনের সুমুখে দাঁড়িয়ে ান্ত গম্ভীর মুখে বলতে ইচ্ছে করছে— ভো অমৃতস্য পুত্রাঃ ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক ভেবে দেখলুম সংসারে একটি গম্ভীর বিষয় আছে, সেটি রাজনীতি। রণ ওটা মানুষের জীবনমরণের সমস্যা। মার বন্ধুদেরও তাই মত, এতদিন যা বলেছে ই নাকি বাজে কথা। তাঁরা বলেন, এহ য়, আগে কহ আর। আমি বলি, শোন তবে সাধ্য সার। অতএব আজ অনেক সব রুতর কথা বলব স্থির করেছি। সাহিত্য ুন, শিল্প বলুন সব হাল্কা জিনিস অর্থাৎ থেকে ভাবনা চিন্তার ভার নাবিয়ে মনকে ল্কা করতে পারলে তবেই শিল্প সাহিত্যের ি সম্ভব। ওগুলো হচ্ছে arts of peace. র রাজনীতি হল art of warfare যদিচ art অধিকাংশ ক্ষেত্রেই fair হয় না।

• প্রথমেই আমার একটি প্রস্তাব আছে। টি হচ্ছে, আমাদের ভাষা থেকে 'রাজনীতি' াটা উচ্ছেদ করতে হবে। রাজার সঙ্গে যখন পর্ক চুকতে বসেছে তখন আবার রাজনীতি ? এখন থেকে হবে রাজ্য নীতি বা রাষ্ট্র তি। পাকিস্থানে জিন্না সাহেব বাদশা হোন্ হেনশাহ্ হোন আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি



নেই; কিন্তু ভারত রাষ্ট্রে (হিন্দুস্থান কথাটা এ মুহূর্তেই পরিত্যাজ্য) 'রামরাজ্য' যদি বা হয় রাম রাজা চলবে না, এমন কি গান্ধী মহারাজাও নয়।

সেদিন 'দেশ' পত্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্যে সুন্দর একটি কথা বলেছেন—ইংরেজ যাচ্ছে বটে কিন্তু দেশকে আস্ত রেখে যাচ্ছে না। আমি বলি, শুধু দেশ নয়, আমাদেরও যে আস্ত রেখে যাবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ইংরেজ তার কূট কৌশলে দেশে এমন আগুন জ্বালিয়েছে এখন তা নেবাবার ক্ষমতা তার নিজেরও নেই, বলা বাহুল্য ইচ্ছেও নেই। মুসলিম লীগের হাতে মশালটি তুলে দিয়ে ইংরেজ তার ইন্ধন জুগিয়েছে। এখন যে দাবানল জ্বলেছে তা নেবানো জিন্না সাহেবের ক্ষমতার বাইরে। জিন্নার নেতৃত্ব কত বড় মিথ্যা তা তাঁর appeal-এর ব্যর্থতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। আগুন একবার জ্বললে জ্বলে জ্বলে আপনি নিঃশেষ না হতে শান্তি নেই। তার এখনও ঢের বাকি। অন্তত আগামী পাঁচ বৎসর কাল দেশে কোথাও শান্তি থাকবে না।

দৈবজ্ঞবৃত্তি সকল ক্ষেত্রেই হাস্যকর, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও। আমি দৈবজ্ঞের মতো কথা বলছি দেখে আপনারা মনে মনে হাসছেন। এইচ জি ওয়েলস যখন রাজনৈতিক দৈবজ্ঞবৃত্তি শুরু করেছিলেন তখন লোকে হাসতে কসুর করেনি, যদিচ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনেক ক্ষেত্রে যথার্থ প্রমাণিত হয়েছিল। আমি এইচ জি ওয়েলস-এর মতো মানবসমাজের কুষ্ঠি বিচার করতে জানিনে। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থাটা এতই সুস্পষ্ট যে এর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে দৈবজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে স্বাধীনতা হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছিল হিন্দুস্থান পাকিস্থানের গোলমালে সে স্বাধীনতা দশ বছর পিছিয়ে গেল। ১৯৫৭র আগে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হবে না। দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে আরো বহু বৎসরকাল ইংরেজের কর্তৃত্ব পরোক্ষভাবে এদেশে থেকে যাবে।

Transition period সকল দেশের পক্ষেই সংকটকাল। জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েও রাশিয়া গৃহযুদ্ধ থেকে মুক্তি পায়নি। সেই নরমেধ যজ্ঞে রাশিয়ার সাড়ে তেরো লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হয়েছিল। ভারতবর্ষেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটা অসম্ভব নয়। বহু রক্ত মোক্ষণের পরে দেশ শান্ত হবে। তখন পাকিস্থান থাকবে না, হিন্দুস্থান থাকবে না, রাজস্থান থাকবে না। ভারতময় এক বিরাট রাষ্ট্র গঠিত হবে। সেই শুভদিনের প্রত্যাশায় আমরা বেঁচে থাকবার চেষ্টা করব, যদিচ পারব কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

কিন্তু এই কুরুক্ষেত্রের কোনোই প্রয়োজন ছিল না। মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন তা ব্রহ্মাস্ত্রের চাইতেও শক্তিশালী। মাত্র পঁচিশ বৎসরের চেষ্টায় যৎসামান্য রক্তপাতে চল্লিশ কোটি মানবের মুক্তি তিনি করায়ত্ত করে-ছিলেন। জগতের ইতিহাসে এই ঘটনা অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব। হায়রে, সেই স্বাধীনতা যখন হাতের মুঠোর মধ্যে তখন সমস্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করেছে তাঁরই স্বদেশবাসী এবং সেই সব স্বদেশ-বাসী যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্লজ্জভাবে নিশ্চেষ্ট ছিল। যে যত বেশি নিশ্চেষ্ট সে তত বেশি ভাগ আদায়ের চেষ্টা করেছে। যে স্বাধীনতার উদ্দীপনায় দেশবাসী হাসি মুখে সকল দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনাকে বরণ করেছিল সেই স্বাধীনতার নামে মানুষের মনে আজ ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। আজ এমন মানুষের অভাব নেই দেশে, যারা মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে ভাবছে—দরকার নেই স্বাধীনতায়—এর চেয়ে ইংরেজ রাজত্ব শ্রেয়। এই কলঙ্ককর অবস্থার সৃষ্টি যারা করেছে তাদের ক্ষমা করবে কে? এ দুঃখ রাখবার স্থান কোথায়? সেদিন বেতার বার্তায় জওহরলালের আর্তকণ্ঠে ভারতবর্ষের এই অন্তর্বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সমস্ত স্বপ্নসাধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেলে যে হতাশা সেই হতাশার আভাস ছিল তাঁর কণ্ঠে। সেদিন ইংরেজ কবি ওয়েন-এর একটি লাইন বারম্বার আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল—

was it for this the day grew tall ?



সাহিত্য প্রসঙ্গ

ঋষি রবীন্দ্রনাথ

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

প্রথমেই একটা কথা বলা আবশ্যক যে, সৃষ্টিকে দিয়া স্রষ্টাকে বুঝা কোনোদিন যায় না। সৃষ্টি বড়জোর একটি চিহ্ন, যাহা স্রষ্টাকে চিনাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু তার স্বরূপ ও শক্তির প্রকৃত পরিচয় কখনও উদ্ঘাটন করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, এ বিষয়ে কোন মত-বিরোধ নাই। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক, এ বিষয়েও কোন মতবিরোধ নাই। কিন্তু এইখানেই আমার একটু বক্তব্য আছে, রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক নহেন, তিনি দ্রষ্টা। লক্ষ্য করিবার বিষয় উপনিষদে কবি ও ঋষি একই অর্থে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। আর ঋষি মানেই সত্যদ্রষ্টা, ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু দার্শনিক সত্যদ্রষ্টা নহেন, সৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ একটি মতবাদের কর্তা বড়জোর তিনি। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিকদের মত কোন মতবাদের স্রষ্টা নহেন। আচার্য রাধাকৃষ্ণ "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" এই মূলসূত্রটির উপর রবীন্দ্র দর্শনকে গ্রথিত করিবার চেষ্টা অবশ্য করিয়াছেন। তবু বলিতে হইবে যে, উহাতে আচার্য রাধাকৃষ্ণের দৃষ্টে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মূর্তি চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু ঋষি রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ চিত্র অংকিত হয় নাই। হওয়া সম্ভব নহে বলিয়াই হয় নাই। এই জন্যই প্রারম্ভে বলিতে হইয়াছে যে, সৃষ্টি বড়জোর একটি চিহ্ন তাহা দ্বারা স্রষ্টাকে কখনও চেনা বা জানা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টারূপ যখন দেখি, তখন তিনি কবি। যখন তাঁহার দ্রষ্টা-রূপ দেখি, তখন তিনি ঋষি। সম্রাট জনক যে অর্থে রাজর্ষি, রবীন্দ্রনাথও ঠিক সেই অর্থেই কবি-ঋষি। রাজা ঋষি হইয়াছেন, বা কবি ঋষি হইয়াছেন, এই অর্থে নহে; ঋষিই রাজা বা কবি হইয়াছেন, এই অর্থেই সম্রাট জনক রাজর্ষি এবং রবীন্দ্রনাথ কবি-ঋষি।

সম্রাট জনকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার বিদেহ সাম্রাজ্য প্রজামণ্ডল পাত্রমিত্র অমাত্য রাজসভা ইত্যাদিতে। কিন্তু রাজর্ষি জনকের পরিচয় কোথায়? বিদেহ সাম্রাজ্য বা কোন কার্য দ্বারাই সে পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে, তাহারা বড়জোর কখনও কখনও একটু চিহ্ন একটু আভাস দিতে পারে মাত্র। কিন্তু রাজর্ষি জনকেরও পরিচয় আছে, সে পরিচয় মহর্ষি যজ্ঞবল্ক। তিনি বলিয়াছেন "হে সম্রাট, তুমি ব্রহ্মবিদ, তুমি ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ।" এই কারণেই মহর্ষি বশিষ্ঠের মুখে নিজের ব্রাহ্মণ পরিচয়-স্বীকৃতির জন্য তপস্বী বিশ্বামিত্রের এত কঠোর সাধনা ও চেষ্টার সত্য প্রয়োজন ছিল।

কবি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার কবিতা, গান, কাব্য ইত্যাদিতে। কিন্তু ঋষি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কোথায়? কোন কাব্য বা কার্য দ্বারাই এ পরিচয় সম্ভব নহে, এসব হইতে বড়জোর একটু ইঙ্গিত মিলিতে পারে মাত্র। ঋষি রবীন্দ্রনাথকে চিনিবার জন্য ঋষির আবশ্যক। কিন্তু সে ঋষি কোথায় যিনি রবীন্দ্রনাথের ঋষিরূপকে স্বীকৃতি দিতে পারেন? সে ঋষি আছেন, কিন্তু সমাজের প্রকাশ্য লোকালয়ে বা জনতার মধ্যে নহে। ভারতবর্ষের বিরাট জীবনক্ষেত্রের আড়ালে যে ব্রহ্মজ্ঞ সমাজ রহিয়াছে সেখানে রবীন্দ্রনাথের ঋষিরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। ত্রৈলঙ্গ স্বামী ভোলানন্দ গিরি শ্রেণীর মুক্ত পুরুষদেরও নমস্য ও গুরুস্থানীয়দের কথাই আমি বলিতেছি। ইহার অধিক বর্তমান আলোচনার পক্ষে আবশ্যক করে না।

রবীন্দ্রনাথ ঋষি অর্থাৎ তিনি যে ব্রহ্মজ্ঞ, একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহাদের নিকট হইতে শেষ বয়সে শুনিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজের যে গূঢ় গোপন পরিচয় জানিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞ সমাজ কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। কারও কাছে রবীন্দ্রনাথ একথা বলিয়া গিয়াছেন কিনা আমি জানি না হয়তো একথা তিনি গোপনই রাখিয়া গিয়া থাকিবেন। অলৌকিক ব্যাপার ইহার সঙ্গে জড়িত বলিয়াই এ বিষয়ে অন্যের নিকট উদ্ঘাটন না করা মোটেই বিস্ময়ের কিছু নহে বরং তাহাই স্বাভাবিক।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুইটি খবর শুনিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ সমাধিবান পুরুষ, ঋষির সমাধির কথাই বলিতেছি। শুনিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের এই সমাধিবান অবস্থা দেখিবার সুযোগ একবার মাত্র এক জনের হইয়াছিল—রাণী দেবীর। রাণী চন্দনার রাণী মহলানবিশ তা আমি ঠিক বলিতে পারি না। যতদূর মনে আছে, তাতে মনে হয় রাণী চন্দই হইবেন। রাণী চন্দ ইহা জানেন কিনা কিংবা তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা, ইহাও আমি ঠিক বলিতে পারি না। যাঁদের কাছে এ খবর শুনিয়াছিলাম, তাঁহারা আমার নাগালের বাহিরে। যে-সূত্রে তাঁহাদের খবর শুনিয়াছিলাম সে সূত্রটি আজ দুষ্প্রাপ্য।

এখন দ্বিতীয় খবরটির উল্লেখ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের অভ্যাস ছিল ভোরের ফুল বাগানে যাওয়া, ফুল দেখা ও ঘ্রাণ লওয়া। শেষ বয়সে কথা, কঠিন রোগ হইতে সারিয়া উঠিয়াছে কিন্তু স্বাস্থ্য শক্তি তখনও ফিরিয়া পান নাই চাকরের সাহায্যেই বাগানে তাঁহাকে যাইতে হইত। সেদিন সময় পার হইয়া গেলেও চাকর না আসায় তিনি অস্থির হইয়া উঠেন। ভোরের ফুলের সঙ্গে আজ আর সাক্ষাৎ হইবে না তাদের গন্ধ আঘ্রাণ মিলিবে না—এই ব্যাকুলতা কবি অজ্ঞাতসারে বিশ্বকেন্দ্রেরই অমো ইচ্ছাটিকে স্পর্শ করিয়া বসেন। ফলে কবি দেখিতে পান যে, সম্মুখের দেয়ালের বাধা সরিয়া গিয়াছে, চোখের সম্মুখে ফুলের বাগানটিকে তিনি নিজস্থান হইতেই দেখিতে পাইলেন। এমনকি ফুলের শিশিরসিক্ত গন্ধ ঘ্রাণে তাঁহার মনোবাসী পুরুষ পরম পরিতৃপ্তি পর্যন্ত বোধ করিলেন। এক সময়ে দেয়ালের বাধা পূর্ববৎ যথাযথ স্থান গ্রহণ করিল। চাকরটি আসিয়া উপস্থিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, দেরী হয়ে গেল বাগানে চলুন।

কবি বলিলেন, যাবি? আচ্ছা চল।

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা বিশ্বাস করিতে কঠিন হইবে জানি। তবু বলি ইহা আজগুবী ব্যাপার নয়, সত্য ঘটনা। বিশ্বাস করিবার শক্তি ও সৌভাগ্য যাঁদের আছে, তাঁদের জন্যই একথা আজ লিখিলাম।

উপসংহারে তিনটি কবিতা ছন্দ উদ্ধৃত করিতেছি, উদ্দেশ্য ইহাকে একটি সূত্রে গ্রথিত করিয়া ঋষি রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের একটি ইঙ্গিত হৃদয়বান ব্যক্তিরা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

—"তোমায় চিনি না জানি না
একথা বলতো কেমনে বলি?"

তারপরে সেই 'তুমিটির' পরিচয় পাই—

"মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোকে ঢাকা সে।"

অবশেষে চেনা-জানার দল—

"দিকে দিকে টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ।"

এত কথার আবশ্যক নাই, রবীন্দ্রনাথের মুখ হইতেই তাঁহার আত্মপরিচয় শোনা যাক—

"ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হইতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা॥"

চতুরা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

প্রথম দিন এবাড়িতে পা দিয়েই আমি টের পেয়েছিলাম বড়র চেয়ে ছোটর বুদ্ধি বেশি। তবে বড়র চেহারা নাকি ছোটর চেয়ে ভাল, বলতে ওদের মা, কিন্তু আমার চোখে বলতে কি, ছোটকেই বেশি সুন্দর লাগত, লেগেছিল। বড়র গোলগাল কেমন যেন একটু ভার ভার চেহারা, চিবুক গোল কপাল গোল, আর যে দুটো জিনিস নিয়ে বাবুলির মাকে অনেকদিন প্রশংসা করতে শুনেছি সেটা বাবুলির বড় বড় চোখ। পদ্মের মত নাকি দেখতে। অথচ এই চোখ দেখেই আমার মনে হয়েছে এত বেশি সাদাসিধে গোলগাল ঢলঢলে চোখে আর যা-ই থাক বুদ্ধির ঢেউ খেলবে না কোনদিন। তা-ই হয়েছিল।

অবিশ্যি প্রথম দিনই আর ভাল ক'রে মেয়েদের মুখের দিকে তাকানো যায় না। তা আমি করিওনি। বিকেলে কলতলায় বসে বাসন মাজছিলাম। তখন এসেছিল ও, বাচ্চী, অর্থাৎ ছোটদিদিমণি। এক হাতে চায়ের কাপ, অন্য হাতে বাঁ পায়ের কাপড় একটুখানি তুলে পা'টা কলের নিচে বাড়িয়ে দিয়েছিল। যেন চা খেতে খেতে হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেছে পা ধোওয়া হয়নি না কি, পা ধুয়ে পরে চা খাবে এই ...হল মনে বুঝিনি তখন। জল ছিটকে এসে পড়ছিল আমার গায়ে, কিন্তু সেদিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই, তখনকার মত আমারও কি সেই খেয়াল ছিল। চোখ ছিল নিটোল ফর্সা সুশ্রী ...কো লম্বা টাইপের ঐ পায়ের দিকে। পায়ের ... দেখেই বয়সের একটা অনুমান তিরতিরিয়ে উঠেছে আমার বুকের ভিতর। আর মনে মনে বলছি যত লম্বাই তুমি হও বয়সকে ঢাকতে পারবে না। পরে একদিন কি কথা প্রসঙ্গে গিন্নিমার মুখেও শুনেছিলাম ছোট এই ঊনিশে পা দিয়েছে বড়র বাইশ। হিসাব ক'রে দেখলাম বাচ্চী আমার এক বছরের ছোট। সেইজন্যেই সেদিন যদি বা দু'-একবার বাবুলির মুখের দিকে চেয়ে একটা দু'টো কথা বলতে পেরেছি ছোটর দিকে চোখ তুলতেই সাহস হয়নি। দেখেছিলাম সেই দুপুরের পর। গিন্নিমা ঘুমোচ্ছিলেন বড়ঘরে। বাবুলি আমায় বরফ আনতে পাঠিয়েছিল দোকানে। ফাল্গুনের দুপুর। একটু গরম পড়েছে কি ঈষৎ মোটা ব'লে বাবুলি যেন তখনই ছটফট করতে আরম্ভ করেছে। লাল ভিজে গামছা গলায় জড়ান ছিল ওর। বরফ এনে দিয়ে আমি বাবুর বসবার ঘরে গেছি কাচের গ্লাসটা আনতে। বাবু তখন আফিসে। দেখি একলা ঘরে পাখা খুলে দিয়ে ইজি চেয়ারে আরো লম্বা ক'রে দু'পা ছড়িয়ে বাচ্চী ঘুমোচ্ছে। পাখীর ঠোঁটের মত উঁচু শির তোলা বাঁকানো নাক। হাল্কা চিবুক চিলতে কপাল। এবং অই চেহারায় চোখ ছোট হবে তখনি আন্দাজ ক'রে ফেললাম। পরে তো কতবার দেখেছি সেই চোখ। অনেকটা জাফরানি রঙের টুকটুকে ছোট ছোট চোখ। বুদ্ধির দু'টো মার্বেল হ'য়ে সারাক্ষণই ঝকমক করত।

পা টিপে আস্তে আস্তে টেবিলের দিকে গেছি। গ্লাস হাতে নিয়ে ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছি দেখবার জন্যে। পাক খেয়ে বেণীটা একটা সরু সাপের মত এলিয়ে আছে ইজিচেয়ারের বনাতের গায়ে। বড় বড় কান; বাবুলির যেমন শঙ্খের পেটের মত ধীরে বাঁক খাওয়া ছোট্ট কান ওর তা নয়। কেমন যেন খাড়া খাড়া। হরিণের কানের মত। যেন বেশি শব্দ শুনতে পায়। বেজায় হুঁসিয়ার ওরা।

ঘর থেকে চলে আসার সময় আবার চোখ বুলিয়ে দেখলাম বাচ্চীর বয়সের তুলনায় একটু বেশি লম্বা দুই পা। কচি শালের গুঁড়ির মত সুগোল সটান হয়ে নিচের থেকে নেমে গেছে।

আর বাবুলির পা দেখে আমার কেন জানি বড় চিনেমাটির পুতুলের পায়ের কথা মনে হয়েছিল। আগাগোড়া সবটাই একরকম। আকারের বেশকম নেই। সোজা। আর, যা ওর শরীরের ধাচ। একটু ভার। মাংসের কি স্বভাবের ঠিক বুঝতে পারিনি। হাঁটতও ধীরে ধীরে। ছোটর মত ছুটত না।

তারপর ভাল ক'রে দেখলাম সেদিন বিকেলে।

কেবল শরীর নয় দুই বোনের মনেরও পরিচয় পেয়েছি আমি।

বাবু তখন আপিস থেকে ফিরেছেন। গিন্নিমা ব্যস্ত, আমি ব্যস্ত। চা কর, জলখাবার কর। জল গামছা এগিয়ে দাও। তবে হ্যাঁ, দেখলাম সবাই নরম, ঠাণ্ডা মেজাজের। খুব যে হাঁকডাক হৈ-চৈ তা নেই এবাড়িতে। আর মানুষ বা ক'জন ঠাকরুণ, বাবু, আর ঐ ত দুই মেয়ে। চা জলখাবার খেয়ে বাবু বেরিয়ে যান। গিন্নিমা যান রান্নাঘরে বামুনের কাজ দেখতে। আমি সেই দুপুরের মত আবার এখন হাল্কা। এদিক ওদিক যেতে পারি। তাই গেলাম ছাদে।

দেখি বাবুলি উত্তরের কার্নিস ঘেঁষে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। আর বাচ্চী বসেছে দুই ঠ্যাং তুলে দিয়ে পশ্চিমের কার্নিসের ওপর। চেয়ে আছে নিচে রাস্তার দিকে। কেননা বাড়ির পশ্চিম দিকে সদর। চোখের ওপর ছাদের ছবিটা আজও ভাসছে।

লক্ষ্য করলাম একলা ছাদে এসেও দুই বোন দুরকম। আলাদা প্রকৃতির। যেন এক-জনের ভাবনার সঙ্গে আর একজনের মিল কম।

হাতে বিড়ি ছিল আমার। বিড়ি খেতে খেতেই ছাদে উঠেছিলাম।

প্রথম দেখল বড়। বাবুলি। মুখে কাপড় দিয়ে হাসল।

'এই বয়সেই শুরু করলি।'

বাবুলির গলা শুনে ছোট ঘাড় ফিরিয়েছে।

বিড়িটা হাত থেকে ফেলে দেবার পরও ছোট দু'মিনিট ভুরু কুঁচকে ছিল।

'তোর দেশ কোথায়?' এই প্রথম ছোট আমার সঙ্গে কথা কয়।

'রংপুর।' দিদিমণিকে এবার সামনাসামনি দেখলাম, মুখোমুখি। চোখের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে টিপ পরেছে জাফরানি। যেন কপালে আর একটা চোখ। আর ছোটর চোখে সুর্মার টান চাউনিকে বেশি ধারালো করে ফেলেছে। না, দেখলাম ছোট অনেক বেশি সেয়ানাই। ঊনিশ বছরের চোখে ঊনত্রিশ বছরের শাসন যত বেমানানই হোক দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। আমার হাসিও পাচ্ছিল।

'কত বয়স হয়েছে তোর?'

'একুশ।' ব'লে সোজা ওর মুখের দিকে তাকালাম।

'সাবধান আমাদের সামনে আর বিড়িটিড়ি খাসনে।' ব'লে বাতাসের ওপর যেন মহা তিক্তবিরক্ত হ'য়ে বাচ্চী কাপড়ের আঁচল ঠিক করল দু'বার। বেণী খসা সাপের ছানার মত লিকলিকে দু'টো চুল মুখের ওপর নেমে পড়তে হাত দিয়ে সরিয়ে দিলে দু'বার।

আমি হা ক'রে চেয়েছিলাম। বললে ও মুখ ফিরিয়ে 'চেহারা এই বয়সেই পাকিয়ে ফেলেছিস।'

আমি লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম।

শুধু কি চেহারা, হাফ্‌-পেন্টুলনের ঠিক নিচে আমার রোগা শুকনো হাঁটু দুটোও যে এরি মধ্যে পেকে উঠেছে সেইজন্যে দুঃখ হ'ল। আর এত পাকা পাকা কথা বলেও বাচ্চী বসন্তের নতুন ফুল হয়ে আছে।

হবে না কেন, ভাবলাম তখন, ভাল খায় ভাল পরে ওরা, আছে সুখে। চাকরবাকর মানুষ আমরা, খেটেখুটে খাই। তাই দিদিমণিদের বয়সের কাছাকাছি থেকেও বুড়িয়ে যাই সকাল সকাল তা তো হবেই।

বরং এই ভেবে তখন আমি সন্তুষ্ট রইলাম য, বাড়িতে আরো তিনটি প্রাণী থাকতে ছোটই আমার সঙ্গে প্রথম দিন এতগুলি কথা বললে।

'সন্ধ্যা হ'তে আমার পড়ার ঘরে আলো জ্বেলে রাখবি।'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'রাখব।'

'কাচের গ্লাসে ক'রে আমার পড়ার টেবিলে জল রাখবি রোজ।'

'রাখব।'

'কাল আমার জুতো বুরুশ ক'রে দিবি।'

ঘাড় নাড়লাম।

'ইস্‌, কাল আবার কলেজ। নাঃ, ঐ ...ছের সিভিকস্‌ই আমার প্রাণ শেষ ক'রে দেবে।' আকাশের দিকে মুখ ক'রে ছোট হঠাৎ হায়-হুতাশ ক'রে উঠল আর লম্বা বেণীটা গলায় জড়িয়ে, আমার মনে হ'ল মনের দুঃখে ফাঁস পরার চেষ্টা করল দু'তিনবার।

কে 'সিবিক্‌', কেনই বা দিদিমণির এত দুঃখ ইচ্ছে থাকলেও জিজ্ঞেস করার উপায় ছিল না। সবে এই প্রথম আলাপ। আর, হয়ত ওসব একদম আমার এলাকার বাইরে। তাই ...প থেকে ওর গলায় জড়ানো বেণী থেকে উঠে আসা মিঠে ঝির্‌ঝিরে গন্ধটা প্রাণভরে টানতে লাগলাম।

আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলাম মোটা খোঁপার গায়ে ভারি হাত দুটো ঠেকিয়ে তেমনি আনমনে বাবুলি সন্ধ্যাকাশের তারা দেখছে। এত যে কথা হ'ল আমায় আর ছোটতে যেন দশাই নেই। আমার বিড়ি খাওয়া নিয়ে সেই য একবার একটু ঝুঁকেছিল এদিকে তারপর তখন সরে গেছে। যেন কোন ব্যাপার তলিয়ে দেখা, বেশিক্ষণ মাথা খাটানো ওর ধাতে নেই। কেমন ভাসা ভাসা ঢিলেঢালা। তাই বলছিলাম চিনেমাটির পুতুলের মত—

'ভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলি?'

বেণীর ফাঁস খুলে ফেলে ছোট ফের সোজা হয়ে গেছে।

'এই যে যাচ্ছি এখুনি।' ধমক খেয়ে নিচে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াব এমন সময় বাবুলি ডাকল। যেন এতক্ষণ পর ওর খেয়াল হয়েছে ...দে আরো মানুষ ছিল।

'শোন্‌ বনমালী।'

'কী।'

কিন্তু তখনি কি আর ও বলতে পেরেছিল পদ্মের মত ড্যাবড্যাবে গোল চোখ আমার মুখের ওপর ধ'রে রেখে আবার কি ভাবছে। না কি যা বলতে চেয়েছিল মনে নেই। বললাম, 'বলে ফেল।'

'তখন যে তোকে বরফ আনতে পাঠালুম তোর হাতে সিকি দিয়েছিলুম কি দোআনি?'

কেবল হাসি নয়, রাগও হয়েছিল আমার। *এতবড় হয়েছে মেয়েটা কিসের জোরে কী খেয়ে!* দুপুরের কথা এখনি মনে নেই। তা ছাড়া প্রথম দিন এসেই যদি হিসেবের গণ্ডগোলে পড়ি চাকরির আমার বিশ্বাস কি।

বেশ শক্ত করে উত্তর দিলাম, 'চার পয়সার বরফ এনে চার পয়সা যখন তোমার হাতে দিয়েছি তখন ওটা দোআনিই ছিল।'

'ও, দ্যাখ্‌! আমারই খেয়াল নেই।' পেট-মোটা আঙুলগুলো খোঁপার গায়ে ঠেকিয়ে হৃষ্টমনে বড় আবার আকাশ দেখতে লাগল।

তবে এটা ঠিক হয়ে গেল, বাবুলি সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব। ভয় ছোটকে বেশি, ভাবনা ওর জন্যে।

আর এ-বাড়িতে ওর দাপটই বেশি দেখলাম। বাচ্চী কলেজে পড়ে। বাবুলি শুনলাম তিন তিনবার ম্যাট্রিক ফেল মেরেছে। এখন আছে ঘরে, মা'র কাছে, মায়ের পিছু পিছু। কেন না গিন্নিমায় মন যুগিয়ে চলাই ওর একমাত্র কাজ। মা'র মন রাখলে বাবুর মনও ঠিক থাকে। যা ধরনধারণ এসব ঘরের।

বিয়ে হয়নি অথচ পড়া বন্ধ। কাজেই—

কাজেই বাবুলি চুপচাপ। বাবুলি খতম। মা কেবল, ওই রূপটুকুরই মাঝে মাঝে যা প্রশংসা করেন। করেন আর সময় সময় এ-ও যেন ভাবেন না কি তার নিজের পছন্দ আর দশ-জনের পছন্দের সঙ্গে মেলে না। যাক সেসব কথা। এ বাড়িতে ছোটরই কাজ বেশি ওর হুকুম লম্বা। দাবী জোর।

বিছানা ক'রে দাও জল দাও আলো নিবিয়ে দাও।

সপ্তাহে দুইবার ডাইক্লিনিং সহস্রবার দোকান।

আমিও এই চেয়েছিলাম এই পেয়েছি। ছোটর কাজে আমি বিরক্ত হই না। আশ্বিনের রোদ ও। তাই মনে হ'ত ওর ছুট্‌ফটানি দেখে শিস শুনে।

বলতে কি বাবুলিদি'কে আমার ভালই লাগত না। ওর সামনে গেলে গুমোট লাগত। ভাদ্রের গুমোটের মত অই এক চেহারা।

আর কাজেই বা ওর তেমন বিশেষ কি। গরম বেশি তাই দুপুরে একবার বরফ আনতে যেতে হয়, আর খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে দু'পয়সার মিঠে পান। যেন দাঁত সাফ রাখবার মর্ম ও ভুলে গেছে। কী বিশ্রী অভ্যাস এই বয়সের বি হওয়া মেয়ের। আমিই হাসি। পান?

ছোটর দাঁতে দাগ লাগতে পারবে ঠোঁট লাল করবে তো লিপস্টিক কেন। এই পাড়ার মেয়ে, বাবুলি ঘরের, এই মনে হয়েছে।

কেন হবে না বলুন। জাফ্‌রানি সুর্মা টেনে পাতলা ঠোঁটে লিপস্টিক শাড়ী জুতো পরে হাফ্‌-বেণী বাগিয়ে ব্যাগ্‌ হাতে ও যখন কলেজ যেতো স সেণ্টজেমস স্কোয়ার চেয়ে থাকত। ঘরের আমার তো গর্ব হবেই।

আর আল্‌তা পেড়ে এক কাপড় গোল গলার ব্লাউজ গায়ে বাবুলিদিকে দেখেছি ওর সবুজ ডিম সাবান আর আধ কিছুবা ছেঁড়া তোয়ালে হাতে নিয়ে অ আস্তে স্নানের ঘরের দিকে যেতে। এখন খালি সকলের কাজ ফুরিয়েছে এই বেলা যেতে পার।

তারপর ভাত খেয়েছে—ঘুমিয়েছে। ত ত মনে হয় ঘুমিয়েই ও আরো মোটা চলল। যাক্‌, সেসব আমার এলাকার বাই ঘুমিয়ে ঘেমে উঠেছে যেন বরফ। আমার হয় ও যত না বরফ খেয়েছে গালে গলায় ক মেখেছে, বুঝি মাখত, তার চেয়ে বেশি, মজাবার জন্যে। অবশ্য দেখিনি কোনি কপাল ও গাল ওর বেশি পালিশ বলে ক ভাবতাম। এলুমিনিয়ামের ডেক্‌চির পেটের অনেকটা। ওটা শক্ত এটা নরম এই তফাৎ এত বেশি পালিশ মুখ কার ভাল লাগে! অ বেশি চিনেমাটি মনে হ'ত।

চেয়ে থাকতাম ছোটর কপালের দি ভুরুর শেষ দুটো দাগ মিলিয়ে গিয়ে একটু নতুন ফুস্‌কুড়ি উঠেছে। বুদ্ধিম বয়স-ব্রণ হয়েছে। রসিক জন বলবে মহুয়া ক অর্থাৎ বয়স যে ওর হয়েছে এই তার প্রমাণ

তবে কি বাবুলির বয়স হয়নি? বাইশ হয়ে যে তেইশে চলল।

হয়েছে কি না হয়েছে আপনারাই ঠি করবেন। আমি শুধু ঘটনা বলে যাব। এ বাড়িতে থাকলে কত কি ঘটে কত রকম ক শোনা যায়।

গিন্নিমা বেলুড় যাবেন। কে তাঁর গুরু এসেছেন, নিমন্ত্রণ। অর্থাৎ দুপুরে সেখা প্রসাদ নেবেন। বাবু নিজেই যাবেন মাকে নি কথাবার্তা হচ্ছিল রাত্রে খাবার টেবিলে বা গিন্নিমার ধর্মকর্মে বাবুর আপিস কামাই ক হবে। ছোটর কলেজ এমনি ছুটি। ছোট য না। তার চেয়ে এক্‌জামিনের পড়া পড় ঢের কাজ দেবে বাড়িতে থেকে। 'তুমি কি মা?' গোড়াতেই ও প্রস্তাব করল।

'বেশতো।' মা মুখ তুলে বাবুর মু

দিকে চাইলেন। 'তবে তো বাব্‌লিকেও আর সঙ্গে নিতে পাচ্ছ না।'

'না ওরও যেয়ে কাজ নেই।' বাবু একবারই কথা বললেন। ঠাণ্ডা মেজাজের লোক কি না, তাই সব গিন্নিমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজে চুপ থাকেন।

আর কোন কথা হ'ল না। বাবুর মনে বাবু খেয়ে সকলের আগে উঠে গেলেন। তারপর উঠলেন গিন্নিমা। তারপর ওরা।

আমাকে যেতে হয়েছিল বাইরে দোকানে বাব্‌লির মিঠে পান আনতে। ফিরে এসে দেখি বাব্‌লি ছোটর পড়ার ঘরে। কোনোদিন যা হয় না। পড়াশোনা ছেড়েছে ব'লে বাব্‌লি এই ঘরে আসাই ছেড়ে দিয়েছিল। যেন বাচ্চী কি বোঝাচ্ছে বড়বোনকে। বাব্‌লির চেহারা বেশ হাসি হাসি। হিমকুণ্ডের মতো থমথমে ঠাণ্ডা মুখে হাসির রোদ উঠেছে—মন্দ লাগছে না। ভারি কৌতূহল হল আমার, ব্যাপার কি!

আস্তে আস্তে কথা দুই বোনের, দরজাটা অল্প ভেজানো।

সেই ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়েই দেখলাম, শুনলাম টুকরো টুকরো কথা।

'কায়দা করে দু'জন রয়ে গেলুম বাড়ি, বুঝেছ?' বলছে ছোট ভুরু বাঁকিয়ে।

বাব্‌লি মাথা নাড়ছে আরো খুশি হয়ে।

'কাল খবর দাও।' বাচ্চী পরামর্শ দেয়।

'কি করে দেব খবর?' বাব্‌লি যেন সমস্যায় পড়ল একটু।

'একেবারে খুকী তুমি।' ধমক দেয় ছোট। ভাজার মাছ উল্টে খেতে জান না, না? বাড়িতে টেলিফোন রয়েছে কেন শুনি?'

যেন অনেক ভাজার মাছ খেয়েছে ছোট, বড়র সামনে টেবিলের কোণায় পা ঝুলিয়ে বসে মুখের সেরকম ভাবই করল। হাসি পাচ্ছিল আমার।

আর গোল পদ্মের মতো চোখ মেলে বাব্‌লি চেয়ে আছে ছোটবোনের দিকে মুগ্ধ হয়ে।

'টেলিফোনের কথা আমার মনেই ছিল না।' বলে শেষে ও হাসল। ডেকচির পেটের মতো পালিশ গালে ওর টোল পড়ে দেখলাম এ বয়সেও। বাচ্চী গম্ভীর হয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে ভুরুর পাশের বয়স-ব্রণ খুঁটছিল আঙুল দিয়ে।

অবশ্য মা'র গলার শব্দে সেখানে আর দাঁড়ানো গেল না। দেখলাম বাব্‌লিও তখন বেরিয়ে এসেছে পরামর্শ নিয়ে। ছোট পড়ছে খুব মন দিয়ে।

সারা রাত শুয়ে শুয়ে চিন্তা করলাম বাব্‌লি কাকে ডাকতে চাইছে। এ বাড়িতে এসে অবধি বাইরের কোনো লোক আসতে আমি দেখিনি।

পরদিন দেখলাম সব।

ট্যাক্সী ডেকে নিয়ে এসেছিলাম আমিই। সকাল সাতটা বাজতে বাবু আর গিন্নিমা বেরিয়ে পড়েছিলেন। গাড়ীতে উঠে গিন্নিমা বলে গেলেন, 'সদর বন্ধ করে রাখবি বনমালী, দুপুরে কোথাও বেরোসনি, মেয়েরা একলা আছে বাড়িতে।' ঘাড় নেড়ে সদর বন্ধ করে দিয়ে আমি চলে আসি ভিতরে।

বামুন ঠাকুর নটা বাজতে রান্না নামিয়ে দিয়ে এক সময়ে বেরিয়ে যায় সুযোগ বুঝে।

আর কি, এখন আমি আর ওরা দুই বোন শুধু।

বাচ্চী অনর্গল শিস দিচ্ছে বাব্‌লির পাশে দাঁড়িয়ে। বাব্‌লি সাবান গরম জল দিয়ে ঘটা করে মুখ ঘষছে।

বাচ্চী তোয়ালে বাড়িয়ে দেয়, এনে দেয় নিজের ক্রীম পাউডার, বড়র ত আর এ সব ছিল না।

বাব্‌লি আলতা পরল খোঁপা খুলে বেণী বাঁধল।

বাচ্চী ওর ঢিলেঢালা কাপড় খুলে ফেলে দিয়ে পরিয়ে দিলে নিজের খয়েরি ছোপ দেওয়া শাড়ী। এখানে গুঁজে দিলে ওখানটায় আটকে দিলে একটা সেফটি পিন। দেখলাম বাচ্চী কত ওস্তাদ কত বেশি জানে এসব।

চুপ করে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থেকে বাব্‌লি ছোটবোনের হাতে সাজল।

'ফোন নাম্বার মনে আছে তো?' জিজ্ঞেস করে বাচ্চী।

বাব্‌লি আবার যেন থতমত খেয়ে গেল।

'এই জন্যেই তোমার কিছু হয় না।' বিরক্ত হয়েছে ছোট। 'অফিসের নাম জানো তো?'

এবার বাব্‌লি মাথা নাড়ল।

'জে বি থাম্পর এণ্ড কোং সতেরো বি—'

'থাক্, ঠিকানায় কাজ নেই, চিঠি তো দিচ্ছনা।' হাত বাড়িয়ে বাচ্চী টেলিফোনের লম্বা বই তুলে নেয়। নম্বর খোঁজে।

'এই নাও এখুনি ফোন করে দাও।'

যেন আবার কি ভাবছে বাব্‌লি বাচ্চীর দিকে চেয়ে।

'ধর যদি বাবা মা হঠাৎ এসে যায়?'

'আ-রে তোমার বুদ্ধি!' বাচ্চী বিরক্ত হয়ে বড়র দিকে আর তাকাতেই পারছে না। 'আর যদি ফেরেই তো হয়েছে কি! তা বাপু এত করে দেওয়ার পরও যদি সাহস না পাও আমি কি করব! রাতদিন তো হা হুতাশ করছ।'

টেলিফোন হাতে করে বড় ভাবল।

'ওদের ফিরতে রাত হবে।' ছোট আবার বোঝাল,, 'স্বচ্ছন্দে অবিনাশবাবু এসে দেখা ক'রে যেতে পারেন।' তারপর ও উঠে দাঁড়াল, যেন হয়রান হয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে গেল, এত ভয় যার তার কিছুই হয় না।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছি কথাটা। আর দেখলাম অই কথাই ভাবতে ভাবতে বাব্‌লিরও ভয়টা চলে গেছে। টেলিফোনে দিব্যি কথা বলল। হাসল। আবার কথা বলে হেসে যন্ত্রটা আস্তে নামিয়ে রেখে চলে গেল ছোটবোনের কাছে। এর পর কি করতে হবে বুদ্ধি নিতে।

চৈত্রের ঝিরঝিরে দুপুর। কেমন নতুন ঠেকছিল বাগানের ছায়া আর রোদ। তিনটে বিড়ি শেষ করলাম বসে বসে।

বেলা তখন একটা কি দেড়টা। সদরের কড়া নড়ল। খুলে দিলাম দরজা। এবং আমি না খুললেও ওরা খুলত, বাচ্চী দিত খুলে বাব্‌লি খুলত।

কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ওরাই ছুটে বেরিয়েছিল ঘর থেকে আগে।

আমি তো যন্ত্র, চাকর, যা করাবে তাই করব। বিশেষ ছোটদিদিমণি যখন এ ব্যাপারে আছে হুকুম অমান্য করি সাধ্য কি। দেখলাম ভদ্রলোককে। বেঁটে, সাদাসিধে গোছের, না চেহারার না সাজপোষাকের তেমন পরিপাটি। আর তাকিয়ে দেখছিলাম বাব্‌লিদিকে। অনেকদিন পরে সাজপোষাক করেছে বলে রসে পুষ্ট সুন্দর ডুমুরের ফুলের মতই লাগছিল আজ। আমার দিকে তাকাবার অবসর সময়ই নেই তখন। লজ্জায় কি অহঙ্কারে জানি না। জন্ম-ক্ষিধে নিয়ে ও ওর অবিনাশবাবুকেই দেখছিল লিচু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। নস্যি নিয়ে ময়লা একটা রুমাল পকেট থেকে বার করে নাক মুছছিল ভদ্রলোক বাব্‌লির পাশে দাঁড়িয়ে মনে আছে পরিষ্কার।

আমি ভাল করে কিছু দেখবার আগেই বাচ্চীর হুকুম হয়ে গেছে।

'এক বাক্স সিগারেট নিয়ে আয়। গোল্ড ফ্ল্যাক। হলদে বাক্স। মনে থাকবে তো?'

ব'লে ছোট আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসেছিল ঠোঁট বুজে। আমিও মুচকি একটু হাসলাম। আমায় যে ও একটু সরে যেতে বলছে সেই জন্যেও, আর কেন সরে যেতে বলছে বুঝতে পেরেছি ব'লে আমি, এক সঙ্গেই চোরা হাসি হাসলাম। বাস্তবিক এতও জানে, এমন বুদ্ধির ধার রাখে এই মেয়ে!

মনে মনে নমস্কার জানিয়ে আমি সিগারেট আনতে গেছি।

ফিরে এসে দেখি বাচ্চীর পড়ার ঘরে ওরা দু'জন, আর অন্য ঘরে স্টোভ ধরিয়ে ছোট ঘেমে লাল। লুচি ভাজছে, চা করছে। ওর হাতেই সিগারেট দিয়ে আমি, বেরিয়ে বাগানে গিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছি। সন্ধ্যা হয়ে রাত হ'ল। ফিরে এলেন কর্তা গিন্নি বেলুড় থেকে। আমি আমার মনে কাজ করছি চৌবাচ্চার ধারে বসে, অপেক্ষা করছি তখন সাড়ে ন'টার জল আসবে। ঠিক তখন শুনলাম গিন্নিমা জোরে জোরে ডাকছেন

বাবুলকে, বড় মেয়েকে। বাচ্চী পড়ার ঘরে মা। শুনেছি জিগ্‌গেস করছেন, কর্তার সিগারেট খাবার 'ছাই-দানি' এখানে কেন।' অথচ সব জিনিসই ওরা যেমনটি ছিল গুছিয়ে রেখেছিল। স্টোভের জায়গায় স্টোভ, পিরিচ-পেয়ালার তাকে পিরিচ-পেয়ালা, জলখাবার রেকাবী। আমিই মেজে ধুয়ে তুলে রেখেছিলাম সব। তবে কি ওটা ওখান থেকে সরিয়ে রাখেনি বাবুলি। বাচ্চী আর কত দিক দেখবে!

বাবুলির ওপরই আমার রাগ হ'ল

তুমিই কান্ড বাধালে, তুমিই গন্ডগোল ডাকলে। আসলে যদি চলতে না জান তো এসব কেন।

পড়ল আমার ডাক। আস্তে আস্তে ঢুকলাম ঘরে।

বাবুলি ঘেমে চুপসে একাকার। দেখি গাল ড্যাব্ ড্যাব্ চোখ দু'টো মার মুখের দিকে তুলে ধরে মূর্ছা যাবার উপক্রম। চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছে ও। আমি ঘরে ঢুকতে মা আমায় জিগ্‌গেস করলেন।

আমার কি, আমি কেন দোষ ঘাড়ে নিতে যাব। তা ছাড়া বাবুলির গোল থ মারা খাতা মার্কা চেহারা দেখে আমার যেন তখন আরো রাগ হল। যা হয় একটা বলে দিলেই রত বাপু। আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন। বশ্য বললাম একটু বুদ্ধি ক'রেই, 'অবিনাশ দা না কে বাবুর সঙ্গে দেখা করতে সেছিলেন।'

'বাচ্চী—' মা ছোটকে ডাকলেন গলা বা ক'রে।

ছোট এল। যেন কিছু ওর কানে যায়নি ক্ষণ এমন মুখের ভাব। অথচ দেখে ছিলাম আমি পুব বারান্দায় রেলিংএ ক অন্ধকারে সব কথাই ও শুনেছিল।

'অবিনাশ মাস্টার এসেছিল?' মা প্রথমেই গ্‌গেস করেন।

বাচ্চী আমার মুখের দিকে তাকালো। রানি চোখের মিঠে ঝাঁজ। অর্থাৎ কায়দা যে কথাটা আমি ঘুরিয়ে বলতে পেরেছি ওর একরকম মন্দ মনঃপূত হয়নি লাম।

আরো সুন্দরভাবে মাকে ও বুঝিয়ে দিলে টা।

'সেই অবিনাশ মাস্টার অনেকদিন পরে ছিল। বাবুলিকে যে পড়াতো। চাকরি নেই । বাবার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল।

বসে ছিল অনেকক্ষণ। বাবুলি তো খানার ঘরে পাখার তলায় দিব্যি পড়ে াচ্ছিল। আমি আর করি কি। ভদ্রলোক কাই যখন করতে চান অগত্যা তোমার ঘরে আমি আমার পড়ার ঘর ছেড়ে দিলাম। ড় গেছে বাজা কিনবার বনমালীকে দিয়ে বলেও পাঠালুম। উঠতে কি আর চায়, বসে বসে ঐ কর্মটি করে গেছে।' আঙুল দিয়ে বাচ্চী 'ছাইদানি' দেখাল। আমি আমার কাজে চলে গেলাম।

রাত্রে শুনলাম বাবুর সঙ্গে মার আস্তে আস্তে কথা। দুই মেয়ে আজ আগেই খেয়ে চলে গেছে লক্ষ্য করলাম।

'চাকরি নেই বাবু সিগারেট শেষ করেছেন বসে বসে দুই বাক্স।' মা মাছ উল্টোতে গিয়ে বাবুর দিকে তাকালেন।

বাবু গোল আলু উল্টোন আর মার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন চুপ করে।

'অর্থাৎ পাকেপ্রকারে এবাড়ি ওর আসা চাইই। বাবুর সঙ্গে দেখা করবে!' মা আর আস্তে বলতে পাচ্ছেন না, কথাগুলি এখন জোরে জোরেই হচ্ছে, 'ও কি বুঝতে পাচ্ছে না বাবুলির আশা করা মিছে। কেরানির কাছে আমি মেয়ে বিয়ে দেব না। ক'পয়সা ও রোজগার করে শুনি?'

বাবু মার মুখের ওপরে দেয়ালে চোখ রেখে ভাবেন। কি কাজে ভিতরে গেছি, দেখি, অন্ধকার দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে বাবুলি কাঁদছে, চুপ করে আছে।

বড়র ঝিম্ মেরে থাকার অর্থ এখন বুঝলাম, বুঝলাম কেন ওর সব কথা মনে থাকে না, গরম লাগলে বরফের জন্যে ছটফট করে। কষ্ট হল হাসিও পেল। হাসি পায় বাচ্চীর কথায়: 'তুমি ভাজার মাছ উল্টে খেতে জাননা।' যেমন মেয়ের ধার তেমনি সিধে চোখা। 'এত যার ভয় তার কিছুই হয় না।'

কথাগুলি আমার মুখস্থ হয়ে গেল।

কিছু যে হচ্ছে না, বাবুলির যে ফুল ফুটছে না এতদিনে কারণ বুঝলাম। বাইশ বছর ঝুলে আছে এই সংসারে মোমের পুতুল হয়ে। সাবানের ফেনার বুদবুদ হয়ে যদি বা চেষ্টা-চরিত্র করে বেচারা উড়তে চেয়েছে ফুটুস হয়ে গেছে মার চাউনির ধমকে।

না, মা মুখেই বলতেন বাবুলি বেশি সুন্দর। পরে বুঝেছি এটা। কেননা এ ছাড়া বিয়ে না হওয়া বাড়িতে বসে থাকা মেয়েকে আর কী বলে তুষ্ট রাখা যায়!

না হলে বাচ্চী যখন সেজেগুজে কলেজে যাবার জন্যে রাস্তায় নেমেছে মা শ্বাস বন্ধ করে দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছেন মেয়েকে। চিবুকের তলায় ভাঁজ পড়েছে চাপা গর্বে চোখ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে গিন্নিমার। কেননা মেয়েকে তিনি একলা দেখছেন না, দেখছে গোটা সেণ্টজেমস স্কোয়ার। ছেলেরা তো তাকাবেই বুড়ো সারদা এটর্নিও হুঁকো হাতে ওর দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে এই মেয়ের দিকে যখন দেখেন মা আরো বেশি তৃপ্ত হন। তাঁর মেয়ে নিঃসংশয়ে সুন্দরী এই প্রমাণ। আর তখন আমি ভেবেছি বাবুলি সম্পর্কে। অবিনাশের মতো লোককে বা করে দিয়ে মা যদি আরো উঁচুর দিকে তা তো বাচ্চীর বেলায় করবেন কি, কত উ দিকে তাকাবেন আমি দিশা করতে পার না। পাড়ার ছেলেবুড়োর চোখে রাতদিন রূপের আরতি!

না কি ওর জন্যে কোনোদিকে তাকা এখনো সময় আসেনি। ভালো। বসন্তের বেলফুলের কুঁড়িরা ফুল হয়ে গেছে। দু কৃষ্ণচূড়ার মাথায় খুনি রং। এখন এই উঁচ বছরের সোনার সিঁড়িতে পা রেখে বাচ দিদির ভাবনায় চুপ করে আছে এ একটা কথ নয়।

চালাক মেয়ে। বোকা বাবুলির ম বেভুল হাত বাড়িয়ে পরে পস্তাবে এমন কা ও করবে না আমার গোড়া থেকেই জানা ছিল

সকালে বাবু বসে কফি খাচ্ছেন গিন্নিমা পাশে বসে খবরের কাগজ খু দেখছেন পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন। রাত্রে তি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারেননি বাবুলি ভাবনায় কাগজে পাত্র খোঁজার রকম দেখে এই কথাটাই আমার মনে হল।

এমন সময় মুখ শুকনো করে বেণী মোচড়াতে মোচড়াতে ছোট এসে দাঁড়ালো দুজনের সামনে। একটু দূরে বসে আমি গড়গড়ার নল সাফ করছিলাম, শুনলাম কথাগুলি। অভিযোগ কলেজের গাড়ী নিয়ে। নতুন নিয়ম হয়েছে ঐ গাড়ী করে কলেজে যেতে হবে বাড়ি ফিরতে হবে।

'গাড়ীর কি সময় অসময় জ্ঞান আছে, বাবা' বলছে ছোট ঠোঁট ফুলিয়ে, 'আজ খেয়ে কাপড় পরে বসে থাক, কাল না কি খাবারই সময় পেলুম না গাড়ী এসে গেছে।'

'তবে?' মেয়ের মুখের দিকে বাবু চেয়ে থাকেন, চট করে কথা খুঁজে পান না।

'তুমি চিঠি লিখে দিলেই হবে প্রিন্সিপালের কাছে।'

'কী লিখতে হবে।' বাবু পরামর্শ নেন মেয়ের কাছে।

'যে, আমার মেয়ে ট্রামে করেই কলেজ যাবে আমার অনুমতি আছে।'

'বেশ তো!' যেন কলেজের গাড়ীর ওপর মা-ও বেশি সন্তুষ্ট নন। কয়েদীর মতো মস্ত এক ঢাকা গাড়ীতে মেয়ে যাবে আর আসবে কারোর চোখেই পড়বে না এই জন্যে কি? বলেছেন, 'বেশ তো, তুমি চিঠি লিখে দাও, আর একলা যখন যেতে নিষেধ সঙ্গে বনমালী যাবে।' বাবুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মা আমার দিকে ঘাড় ফেরান। 'কেমন পারবি তো, বনমালী?'

আমি তখনি ঘাড় কাত্ করলাম আর আড়চোখে চেয়ে দেখলাম বাচ্চীর মুখে হাসি ফুটেছে।

তাই বলি, এবয়সে চুপ করে কেউ থাকে না। মাঝ রাস্তায় ও ট্রাম থেকে নেমে পড়েছে।
'এখানে!' অবাক না হয়েও আমি একটু অবাক হওয়ার ভাণ করলাম।
'এখানে।' ছোট্ট রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বাচ্চী ব্যাগ খুলে একটা আধুলি আমার হাতে গুঁজে দিয়েছে। 'নে চা খাস।'
চায়ের দোকানেই গিয়ে ঢুকেছি। কেন তখনি বাড়ি ফেরা সময়ের দিক থেকে মানানি হ'ত। উঁচু লম্বা ফর্সা চেহারার সুন্দর রাজপুত্রের মতো ছেলে। হাত ধরাধরি করে দু'জন দেবদারু ঘেরা পার্কের ছায়ায় নরম ঘাসের বিছানায় গিয়ে ঢুকেছে। সিল্কের জামা গায়ে, পায়ে দামী জুতো। চায়ে চুমুক দিয়ে আশ্বস্ত হলুম অনেকটা।
কেরানী নয়। উঁচু নাকের মতোই ছোটর পছন্দ। দিদির অবস্থা দেখছে যে।
'কলকাতার বাড়ি ছাড়াও ঘাটশিলায় ওদের নতুন বাড়ি হয়েছে এই সেদিন।' বললে বাচ্চী। তখন বিকেল। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছি আমরা। 'বাপ মস্তবড় ইঞ্জিনীয়ার। এক ছেলে। দু'টো বাড়িই লিখে দেবে ওর নামে, বুঝলি।'
খুশিতে ওর বেণী দুলছে, চোখ কাঁপছে।
বললাম, 'তবে তো ভালই।'
'এতবড় একটা পিয়ানো আছে বাড়িতে। রেডিও, গ্রামোফোন,—কী নেই! আর ওর নিজের আছে সুন্দর একটা ক্যামেরা, সঙ্গে থাকবে একদিন, আমার ফটো তুলবে দেখিস।'
বই ব্যাগ হাতে তন্ময় হয়ে শুনছিলাম।
বললাম, 'বাবলাদির বিয়েটা যদি'—
'আঃ, লাফ দিয়ে চলে গেলি বাবলিদির বিয়েতে।' বিরক্ত হয়েছে ছোট। কী ভেবেছে। হয়েছে তখন, সেদিন বড়র ব্যাপারে ওর হ, চেষ্টা-যত্ন কম ছিল কি। বেশিই ছিল। ও চেয়েছিল, ও চাইছে সকাল সকাল—কিন্তু চট্ করে বাচ্চী, দেখলাম, চেহারার পাল্টিয়েছে। অনেক বুদ্ধি কি না। বিয়ে মন খারাপ, আমার কাছে বোকার মতো রা দেবে কেন! সুন্দর ঝক্‌ঝকে দাঁতে লা। বসন্তের বাতাসের মতো নিঃশ্বাস ল একটা।
কাল আমরা ইডেন গার্ডেনে যাচ্ছি। সেখানেই ফটো তোলা হবে। লেকের কি প্যাগোডার নিচে। কাল শেষ বেলার আর করা হ'ল না।'
কলেজ ধুয়ে জল খাবে, মনে মনে। রাগ হয়েছে বাপ মার ওপর। কলেজে মানে শীগ্‌গির তোমার বিয়ে হচ্ছে আগে তো বাবলি তারপর তুমি। অর্থাৎ ও হতে পারে বাহান্নও পেতে পার। মনে বলেছি এসব কথা আর ওর সোনার মোড়া ঝকঝকে শরীর সন্ধ্যাতারার মতো অদ্ভুত স্তব্ধ জাফরানি চোখের দিকে চেয়ে বুকের ভিতর আমার হু হু করে উঠেছে।

কেন না চুপ করে থেকে আবার ও কী ভাবছিল।

সমস্ত রাগ গিয়ে আমার জমা হয়েছে তখন বাবলির ওপর।

কেনই বা হবে না। রাত্রে খাবার টেবিলে চারজনই উপস্থিত থাকে। জলের জগ্ হাতে আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে। কি নিয়ে ছোটদি-মণি হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠেছে। আর অমনি ধমক দিয়েছেন মা। তারপর শুকনো শক্ত উপদেশ। তারপর বাবলিকে একবার আড় চোখে দেখে গম্ভীর হয়ে ভাতের গ্রাস মুখে তুলেছেন। এই করেন মা মাঝে মাঝে এখন, এই করছেন আজকাল। যেন বাবলির বয়েস দেখে আঁৎকে উঠে সেই ভয়ভাবনা ঢাকবার জন্যে ধমক দেন ছোট মেয়েকে। কারণের দরকার নেই।

আর বাচ্চী চালাক মেয়ে, মা'র অকারণ ধমকের অর্থ বুঝতে পারে তখনি। তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে চলে যায় নিজের ঘরে। মাথা গুঁজে মুখ ভোঁতা করে বাবলি মোটা মোটা আঙুল দিয়ে মাছের কাঁটা খুঁটছে। বাবু চোখ বড় করে চেয়ে দেখছেন সাদা দেয়াল।

জলের জগ্ হাতে চুপ ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে ভেবেছি তখন, এই মুহূর্তে সারা ঘরে খুশির দখ্‌নে হাওয়া ছড়িয়ে দিতে পারত বাচ্চী। হাওয়ার মতো নেচে উঠতেন মা নিজে। বাবুর চোখ এমন ফ্যাকাসে না থেকে অন্য রকম হ'ত।

কিন্তু ঐ-যে, পারেনি ধুমসী দিদির জন্যে।

ছেলের নামে বাপের দু দুটো বাড়ি, অতবড় সম্পত্তি।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করেছি বোনের জন্যে বোন এদিনে অপেক্ষা করে নাকি।

বাচ্চী দিদিমণির ফটো এসে গেল। গোপনে তোলা ছবি। বইয়ের ভাঁজে লুকিয়ে এনেছে দেখাতে। চোখ ফেরাতে পারলাম না! প্রথম আমার বিশ্বাসই হ'ল না এই ছোট। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে। আঁচল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠ বেয়ে। আধ-বোজা চোখ, ঠোঁট দুটি অল্প ফাঁক। দেখতে দেখতে নিশ্বাস আমার বন্ধ হয়ে এল। ফিতে বাঁধা লিক্‌লিকে বেণীর চিহ্ন নেই, এখানে। সুন্দর জমানো মধুর চাকের মতো খোঁপা আর খোঁপার টানে বড় হয়েছে চাঁদের ফালি সেই চিলতে কপাল। রুপোর থালার মতো ছড়ানো। যেন টিপ ফেলে দিয়ে পরবে এখন কুঙ্কুমের ফোঁটা। সূর্যমুখীর মতো সবদিক পূর্ণ ফুটন্ত রূপ।

ছবি থেকে মুখ তুলে দিদিমণির মুখের দিকে তাকাই। আবার সেই বেণী, জন্তুর মতো খাড়া খাড়া কান। হাসছে আমার মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি। ছবির ওপর আঙুল রেখে হেসে বললাম, 'এই বুঝি লেকের জল তোমার পায়ের তলায়?'

'তোর মাথা।' দেয়ালের সঙ্গে আমার মাথা ঠুকতে গিয়ে ও হাত নামায়। দরজায় চোখ রেখে আস্তে আস্তে বললে, 'ফটো তোলা হয়েছে ইঞ্জিনীয়ারের বাড়ির পিছনের বাগানে। এলগিন রোডের ওপর কতো বড় বাড়ি তুই দেখিসনি!'

চুপ করলে ও একটু। তারপর বললে, 'ইঞ্জিনীয়ার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমার ফটো তোলা দেখেছে।'

ফটোর ওপর আবার আমি চোখ রাখলাম।

'ইঞ্জিনীয়ার নিজের ছোট গাড়িখানা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে বিকেলে আমরা বেড়াব বলে।'

এতখানি। এতদূর! চুপ করে ওর ফটো ফিরিয়ে দিয়েছি। আর ভেবেছি।

না, রাস্তায় বেরিয়েই ও আমার হাতে টাকা আধুলি গুঁজে দিচ্ছে রোজ আর মাঝ রাস্তায় বনের হরিণীর মতো নেমে গেছে যেদিকে খুশি, সেজন্যে অন্যরকম আমি কিছু ভাবিনি। বাড়ির চাকরকে হাত করে দরজার বাইরে পা বাড়াচ্ছে ঊনিশ বছরের মেয়ে উচ্ছন্ন যেতে সেরকম ভাবনার ধার দিয়েই আমি ঘেঁষিনি। মাথা ঠিক রেখে কাজ করবে বাচ্চী, ওর অদ্ভুত চোখ দেখে আমি ভাবতাম।

হ্যাঁ, পয়সার কথায় সেদিনের একটা কথা মনে হল। বাবলি বুঝি এর মধ্যে কবে ওর অবিনাশবাবুকে চিঠি লিখেছিল। সবুজ খাম। কিন্তু চিঠি লিখলেই তো হল না, ডাকে ফেলতে হয়। ছোটবোনকে বলতে পারে না সেদিন নিজের বুদ্ধির দোষে ধাক্কা খেয়ে। তাই এল আমার কাছে। 'না' করতে পারিনি মুখের ওপর। কিন্তু এর জন্যে কতো ও আমায় দিয়েছে জানেন? দুটি আনার পয়সা। ফেলে দিইনি অবিশ্যি, পয়সা হাতে এসেছে কেউ ফেলে দেয় না। ওর পয়সায় সাবান কিনে এনে রুমাল পাঞ্জাবী কেচেছি তারপর ছোটদিমণির পয়সায় সিনেমা দেখেছি, রেস্টুরেন্টে খেয়েছি।

খুশি চাপতে পারিনি বলে একদিন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। 'তুমি না বলো আমি বলব। গিন্নিমাকে আমি বোঝাব এমন ছেলে হাতছাড়া করে না। বোনের জন্যে বোন বসে থাকে না আজকাল।' বাচ্চী গম্ভীর হতে গিয়েও হাসল। তাকালো দরজার দিকে। 'মা তোকে জুতোপেটা করে তাড়িয়ে দেবে বাড়ি থেকে।'

তখন চুপ করে গেছি। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসেছি পড়ার ঘর থেকে। কেন না বাড়ির কথা মনে পড়ে আমারও মন তখন খারাপ হয়ে গেছে। বাবলি মার পাশে এসে বসেছে দেখলাম। জামরুলের মোরব্বা তৈরী করা শিখছে। অর্থাৎ মা মেয়ের আরো একটা গুণ বাড়িয়ে দেখছেন ভাল পাত্র আসে কি না। মন

খারাপ হয়েছে আর মনে মনে হেসেছি। চলে গেছি অন্য কাজে।

তারপর একদিন বাচ্চী দেখাল আঙটি। হীরের আঙটি। ওর নাম লেখা।

ফটো দেখার মতো এটাও আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে হাতের তেলোয় নিয়ে দেখেছি। দেখেছি আর অবাক চোখে ছোটর মুখের দিকে তাকিয়েছি। ও দেখছে জানালার বাইরে রক্তকরবী রোদে টকটক করছে। ঘাড় ফিরিয়ে বললে পরে, 'এক কথায় এই আঙটির জন্যে ইঞ্জিনীয়ার তিন শ' টাকার চেক কেটে দেয়।'

'ইঞ্জিনীয়ার তোমায় পুত্রবধূ করতে চায়।' বলতে চেয়েছি, পারিনি। কেবল চোখ বড়ো করে ওর মাথা থেকে পা, পা থেকে মাথা দুবার নজর করে আফসোসের নিঃশ্বাস ফেলেছি। তারপর আঙটি ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়েছি। রেখেছে ও ওটা ওর ছোট সুটকেশে। গোপনে দেয়া উপহার লুকিয়ে রাখার রত্ন।

কিন্তু কতোদিন মানুষ বসে থাকে! কতোদিন মনে রাখে তুলে রাখা গহনা আঙুলে যার গলল না!

বই গুছিয়ে রাখছি ওর টেবিলের। কাল থেকে গ্রীষ্মের ছুটি কলেজের। অর্থাৎ কাল থেকে ছোটর বাইরে যাওয়া বন্ধ। আরম্ভ হয়েছে লম্বা দুপুর। গাছের মাথায় লিচুগুলো এখন কুঙ্কুমের মতো লাল।

হালকা চাপা রঙের শাড়ি পরে ছোট ঘুরেছিল বাগানে বারান্ডায় রৌদ্রে ছায়ায়। মা ঘুমে, বাবলি ঘুমে। ঘুম নেই ওর চোখে। রক্তগোলাপের দিকে চেয়ে থেকে থেকে কি যেন ভেবেছে। না কি আমার মতো ওর ওই একই ভাবনা! দেড় মাসের অদেখা ভুলে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ওরা বড়লোক। গাড়ি বাড়ি ছেলেকে দিয়ে দিয়েছে। সৌখীন দিলখোলা বাপ। চাইছে এখনি আজই ছেলের—আর, শহরে সুন্দরী মেয়ের অভাব আছে কিছু?

বাচ্চীর চোখের দিকে চেয়ে আমারও চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। এমন চালাক বুদ্ধিমতী মেয়েকে আজ অসহায় ঠেকছে।

তবু বাচ্চী ফিক্ করে হাসল। যেন আমার ভাবনার সঙ্গে ওর ভাবনার কোন মিলই নেই। ও একদম ভাবছেই না আর। দেখছে চেয়ে মাথার ওপর গুণগুণ করছে একটা মধুপোকা। পাকা লিচুর কি আগুন-ধরা রক্তকরবীর লোভে উড়ে এসেছে ওই জানে। এখনি তো ফের অলক্ষ্মী পোকা উড়ে গিয়ে রাস্তার ট্রাম দেখবে। রসিক বটে! বাচ্চীর হাসি দেখে আমিও হাসলাম। না, এতটুকু মনের জোর আছে ছোটদি'মণির। জমির জোর আছে দেখেই পা বাড়িয়েছে ও। ওরা তো জানে বড়োমেয়ের বিয়ে না হয়ে ছোটমেয়ের বিয়ে হবে না।

ভগবানের ইচ্ছা। এই ছুটির মধ্যেই একদিন গিন্নিমার গুরুভাই আবার বেলুড় এসেছে খবর এল। ছোটর একজামিনের পড়া, বাড়িতে থাকবে, বাবলিও রইল। যেন আমরা এই সুযোগই খুঁজছিলাম এমন একটা দিন।

কর্তা গিন্নি সকাল আটটায় বেরিয়ে গেলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। ছেলে তো আপিসের কেরানী নয় যে আপিসের সময় হওয়া তক্ টেলিফোন করার জন্যে বসে থাকতে হবে। বাবু মা বেরিয়ে যেতে ছোট খপ্ করে হাতে তুলে নিলে যন্ত্র। ডাকল, কথা বলল হাসল। পাঁচদিন নয় যেন পাঁচ বছর দেখা নেই দুজনের। দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখলাম কথা কওয়া-কওয়ি। তারপর বাঁকাঠোঁটে হেসে ছোট টেলিফোন নামিয়ে রাখলে। আসছে একটু পর। ওর মতো আমারও বুকের ভিতর ঘণ্টা বেজে উঠল। এতবড় লোক আসবে এ বাড়ি।

আমি সারাক্ষণ কাছে থেকে বাচ্চীর হাতে তুলে দিয়েছি সাবানের বাক্স গরম জল তোয়ালে। আয়না চিরুণী চুলের কাঁটা ফিতা। তারপর ক্রিম পাউডার, লিপস্টীক, নোখ রাঙাবার টুকটুকে শিশিটাও। বেণী গুটিয়ে ও আজ আবার খোঁপা করল, টিপ ফেলে দিয়ে পরল কুংকুম। লম্বাশরীর পেঁচিয়ে উঠল রোদের রঙের ঝলমলে সিল্ক। সূর্যমুখীর দিকে তাকানো যায় না।

হাসি পেল আমার ভেবে যে, বড় বোন সেদিন ছোট বোনের বুদ্ধি পরামর্শ নিয়েছিল, ছোট তা আজ দরকারই মনে করলে না। আর এ-ও ঠিক, সেদিনের সঙ্গে আজ অনেক তফাৎ। গিন্নিমা কর্তা যদি এর মধ্যে এসেও যান ভাবব মন্দের ভালো শাপে বর হল। ছোটদি'মণির মুখ দিয়ে যে কথা ফোটেনি নিয়তি তা ফুটিয়ে দিল। নিজের চোখে ছেলে দেখলে মা শাঁখে ফুঁ দিতে দেরি করবে না, বাবুলির জন্যে তো তিনি বাচ্চীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারেন না!

সেজেগুজে চুপ ক'রে ও দাঁড়িয়ে রইল কান রাখল সদরে। আর ওর পাশে আমি। বাবুলি বুঝি ঘুমোচ্ছে তখন এই অসময়ে।

বেলা দশটা বেজে গেছে। বৈশাখের অলস তপ্ত মধুর প্রহর। চাঁপার গন্ধ, বেলফুলের গন্ধ। দক্ষিণের বাতাস বইছে ঠোঁট-চেরা নতুন পাতার মতন। অর্থাৎ ফাল্গুন মাস আবার নতুন ক'রে এই বাগানে ঢুকেছে একটুখনের জন্যে, আর গুণগুণিয়ে এসেছে সেই মধুপোকা।

এমন সময় সদরের কড়া নড়ে উঠল।

আমার আগে ছুটে গেছে বাচ্চী। খুলে দিয়েছে দরজা।

অবাক হয়ে গেলাম দেখে।

ভদ্রলোক বুড়ো হয়েছেন কিন্তু ছেলেদের চেয়েও সৌখীন তার সাজ পোষাক, পাতলা ক্ষয় হয়ে আসা চুলের অসম্ভব পরিপাটি! এমন সুন্দর চটি আমি এ অঞ্চলে কারোর পায়ে দেখিনি।

কিন্তু অবাক হয়েও পরে সামলে গেছি কেননা বাচ্চী সেদিন ট্রাম থেকে নেমে সে ছেলের দিকে চেয়ে যেমনভাবে হেসেছি আজও তেমনভাবে হাসল। একটু অন্যরকম ন 'রাণীর মতো সুন্দর লাগছে!' পাথরে বাঁধানো দাঁতে তিনি হাসলেন ছোটর নরম হা নিজের শুকনো হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে।

'আর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে কেন।' ছোট বলে লাল হয়ে।

মুখ ঘুরিয়ে আমি অন্যদিকে চেয়েছি হাত ধরাধরি ক'রে ওরা উঠে গেছে ঘরে, ছোট পড়ার ঘরে, পর্দা দিয়েছে টেনে। আশ্চ একটু বেমানান ঠেকল না মেয়েকে বু ভদ্রলোকের পাশে। তার কারণ বাচ্চীর ল পা, কি জন্তুর কানের মতো খাড়া দুই কান মধুচাকের মতো সুন্দর বিশাল নতুন খোঁ ঠিক বুঝলাম না।

একটু পরে পর্দা ঠেলে ও বাইরে এল।

আমি অবাক হইনি প্রমাণ করবার জ একটু হাসলাম।

'সিগারেট আনতে হবে?'

'তোর বুদ্ধি আর হ'ল না।' খুশি না হ ও ধমক দিল ফিস্‌ফিসিয়ে। 'এই গরমে ত সিগারেট না।' পাঁচ টাকার একটা নোট আম হাতে দিয়ে বলল, 'পাকা পেপে আন তরমুজ আর আইসক্রিম।'

'আর?'

'আর কিছু না।' আমার চেহারা স্বাভা দেখে ছোট খুশি হয়েছে। চকচক্ ক জাফ্‌রানি চোখ। 'এই ইঞ্জিনীয়ার। বলি তোকে সেদিন? এক কথায় আঙটির জ তিনশ টাকার চেক্ কেটে দিয়েছে। ডিহ অন্-সোনে আবার নতুন বাড়ি উঠ কোলকাতার বাড়িই কেবল ছেলে পাবে। ব দু'টো——'

'তুমি পাবে?' আমার দুই চোখ বড় গেছে।

'আমার কী দোষ বল্ তোরা, আমি করি? আমি তো সবরকমে রাজী ছিল এখন বাপ যদি অবুঝের মতো কাজ ক চায়,—ছেলের ইচ্ছা না বোঝে—' বাচ্চী থা তাকিয়ে দেখল বাগানের একটা কাঠগোল

তারপর এক পা এগিয়ে এসে অ মুখের কাছে মুখ এনে আরো আস্তে ব 'বাবাকে রাজী করানো যাবে, মা রাজী তোর মনে হয়?'

যেন ভয় ওর কাটেনি তখনো। রৌদ্রের দিকে চেয়ে রয়েছি। ভাবছি এত না ঘুমোলে বাবলি আরো কম মোটা পারত ও এইবেলা ব'সে অবিনাশের একখানা চিঠি লিখতে।



জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর আশা ব্যর্থ করিয়া—কংগ্রেসের সাধনা ক্ষুণ্ণ করিয়া ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান দুইভাগে বিভাগ হইল। বাঙলাও দ্বিধাবিভক্ত হইল। গান্ধীজী একদিন বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ বিভক্ত করিতে হইলে তাঁহাকেও বিভক্ত করিতে হইবে; পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছিলেন—কংগ্রেস কখনই ভারত বিভাগ স্বীকার করিবে না। কিন্তু কংগ্রেস তাহাই স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করিয়াছে। হয়ত গান্ধীজী নোয়াখালী অঞ্চলে তাঁহার অসহযোগ নীতির চরম পরীক্ষার চেষ্টার ব্যর্থতায় বুঝিয়াছেন—বাঙলায় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য "নিশার স্বপন সম"—আর পাঞ্জাবের বিবরণে তাঁহার এবং তাঁহার অনুবর্তীদিগের তাহাই মনে হইয়াছে।

মুসলিম লীগ যাহা পাইতেছেন, তাহা যে তাঁহারা একদিন লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। বিলাতের মন্ত্রী মিশনের বিবৃতির ৭ম ধারায় বলা হয়—

"মুসলিম লীগ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্থান এবং বাঙলার, পাঞ্জাবের ও আসামের মুসলমানপ্রধান অংশ—এইগুলি লইয়া সার্বভৌম পাকিস্তান গঠনে সম্মত কি না তাহা বিবেচনা করিয়াছি। এইরূপে গঠিত পাকিস্তান মুসলিম লীগ গ্রহণ করিতে অসম্মত; কারণ, তাহা লইলে (ক) পাঞ্জাবের জলন্ধর ও আম্বালা জিলা দুইটি, (খ) শ্রীহট্ট ব্যতীত সমগ্র আসাম ও (গ) যে কলিকাতায় মুসলমান অধিবাসী শতকরা ২৬·৩ সেই কলিকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ পাকিস্তানভুক্ত হয় না।"

সে দাবী পূর্ণ হইবার নহে বুঝিয়া মুসলিম লীগ এখন কেবল যে সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছেন, তাহা নহে—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও শ্রীহট্টেও লীগ বঞ্চিত হইতে পারেন। সুতরাং অবস্থা হইয়াছে—

"যাহা পাই তাই ঘরে লয়ে যাই,
আপনার মন ভুলাতে।"

হয়ত অভিজ্ঞতায় তাঁহারা বুঝিবেন—
সবই বৃথা—"ধূলা মিশে যায় ধূলাতে।"

বাংলার কথা এই যে, সমগ্র ভারতবর্ষ যখন পাকিস্তান গঠন রোধ করিতে পারে নাই, তখন মুসলমানপ্রধান বাঙলার একাংশ ত্যাগে লজ্জার কথা কি? বিশেষ এরূপ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হয় না—ভবিষ্যতে কি হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া বর্তমানে লব্ধ স্বস্তিই সম্ভোগ করা সুবুদ্ধির কার্য; কারণ, অনেক ক্ষেত্রে "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।" এই বিভাগে যদি বাঙলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হত্যা, নারীহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ—এই সকল হইতে অব্যাহতি লাভ করে, তবে তাহা অল্প লাভ নহে।

যে মিস্টার আক্রাম খাঁ—নিজ গৃহের সম্মুখে হিন্দু গৃহে প্রতিবেশীর হত্যায় বাধা দেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন—বাঙলার হিন্দু যদি বঙ্গবিভাগ চাহে, তবে তাহাকে মুসলমানের শব দলিত করিয়া তাহা লাভ করিতে হইবে—তিনিও আর সে কথা বলিতেছেন না—শবেরই মত নির্বাক হইয়াছেন। যে মিস্টার সুরাবর্দী অবস্থা ভয়াবহ বুঝিয়া ছলে বঙ্গবিভাগ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—তিনি হয়ত নূতন কোন পরিকল্পনা রচনায় নিযুক্ত আছেন। বাঙলায় লীগের দল বলিতেছেন—যাহা পাইয়াছেন, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহাদিগের কথায় একটি পুরাতন ব্যাপার আমাদিগের মনে পড়িতেছে—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর রাজধানীতে য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধিদিগের এক সম্মিলন হয়। য়ুরোপ তুর্কীর ও সুলতানের খৃস্টান প্রজাদিগের ভাগ্যনির্ণয় করাই সেই সম্মিলনের উদ্দেশ্য ছিল। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলী লর্ড সলসবেরীকে সহকারী লইয়া বিলাতের পক্ষে সেই সম্মিলনে গিয়াছিলেন। বিসমার্ক সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিকরা পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না (এখনও পারেন না) সেইজন্য ১৩ই জুন সম্মিলন আরম্ভ হইলে প্রস্তাব করা হয়—প্রত্যেক প্রতিনিধিকে স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার দেশ আলোচ্য বিষয়ে কোন গুপ্ত সন্ধি করেন নাই। সম্মিলনের মাত্র একমাস পূর্বে ইংলণ্ড এশিয়ায় তুর্কীর উপর প্রভুত্ব বা প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে সুলতানের সহিত সাইপ্রেস চুক্তি করিয়াছিলেন। বার্লিনে ডিসরেলী ও সলসবেরী অনন্যোপায় হইয়া বলেন, ইংলণ্ড কোন গুপ্ত চুক্তিতে বদ্ধ নহে। কিন্তু কয়দিন পরে বিলাতেই 'গ্লোব' পত্রে ঐ চুক্তির নকল প্রকাশিত হয়। মার্ভিন নামক যে ব্যক্তি তুর্ক ভাষায় লিখিত চুক্তির ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন, তিনিই 'গ্লোবকে' উহা দেন। ডিসরেলী মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইবার পরে বিসমার্ক মধ্যস্থ হইয়া ব্যাপারটা এইভাবে মিটাইয়া দেন যে—ইংলণ্ড সাইপ্রেস লওয়ায়—ফ্রান্স টিউনিস অধিকার করিতে পারিবে। এই ঘটনার পরে ডিসরেলী স্বদেশে প্রত্যাবৃত হইয়া অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে গর্ব করিয়া বলেন—তিনি "সম্মানের সহিত সংযুক্ত শান্তি" আনিয়াছেন—তাহাই Peace with honour উক্তির মূল। বাঙলার লীগপন্থী মুসলমানরা সেইরূপভাবে এখন বলিতেছেন—সমগ্র বাঙলা পাই নাই বটে, কিন্তু পাকিস্তান আজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তাহাই যথেষ্ট লাভ।

লাভ লোকসান পরে বুঝা যাইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, "মরিয়া না মরে রাম"—লীগপন্থীরা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও কলিকাতা লাভের লোভ গোপন করিতে পারিতেছেন না। যে কলিকাতায় মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ২৫।২৬ জন তথায়ও তাঁহারা পাকিস্তান পল্লী দেখিতেছেন! আর—"আপনার নাক-কান কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ" হিসাবে বলিতেছেন—কলিকাতা কোন পক্ষেরও না থাকিয়া স্বতন্ত্র থাকুক!

যে সকল জিলায় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনা অনুসারে অ-মুসলমানের সংখ্যা অধিক, প্রথমে সেইগুলিকে "হিন্দুস্থান" স্থির করিয়া বৃটিশ সরকার কাজ আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন ঘটনার গতি অতি দ্রুত—আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যভাগেই বিভাগ হইয়া শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন হইবে। বিভাগ স্থির করিবার জন্য—আয়ার্লণ্ডে যেমন হইয়াছিল, বাঙলায়ও তেমনই দুই অংশের সীমা নির্ধারণ জন্য কমিশন নিযুক্ত করা হইবে। কমিশন কিভাবে গঠিত হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। প্রাথমিক ব্যবস্থারূপে বলা হইয়াছে—কমিশন লোকসংখ্যা ও স্থান সান্নিধ্য লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহাদিগকে অন্যান্য বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, সমগ্র বর্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সী বিভাগের ২৪ পরগণা ও খুলনা দুইটি জিলা হিন্দুপ্রধান; আর জলপাইগুড়ী ও দার্জিলিং দুইটি জিলা এবং চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল হিন্দুপ্রধান। বর্ধমান বিভাগ-সংলগ্ন নদীয়ার রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগর (সদর) মহকুমার পরে মুর্শিদাবাদের কাঁদী অতিক্রম করিয়া নবদ্বীপ পর্যন্ত অংশের পরে মালদহ জিলার ও দিনাজপুর জিলার হিন্দুপ্রধান অংশের সহিত যুক্ত হইলে—জলপাইগুড়ী ও দার্জিলিং পর্যন্ত "হিন্দুস্থান" হয়। মালদহের সহিত মুর্শিদাবাদের সংযোগস্থলে যদি দুই একটি ইউনিয়ন সামান্য মুসলমানপ্রধান হয়, তবে তাহা উপেক্ষা করিতেই হইবে।

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বসু

দেখাইয়াছেন—নদীয়ার পাঁচটি মহকুমার মধ্যে ২৪ পরগণার বারাকপুর মহকুমাসংলগ্ন রাণাঘাট মহকুমা হিন্দুপ্রধান (মুসলমান—১১১৯৫৬; মুসলমানাতিরিক্ত—১৪৬০৮২) তাহার পরে সদর মহকুমা (মুসলমান—১৬৩২০৪, মুসলমানাতিরিক্ত—১৮৩১৪৩) সদরের মধ্যেই নবদ্বীপ। ইহা ব্যতীত রাণাঘাট সংলগ্ন কৃষ্ণগঞ্জ থানা চুয়াডাঙ্গা মহকুমাযুক্ত হইলেও হিন্দুপ্রধান। নদীয়ায় শান্তিপুর, নবদ্বীপেরই মত বঙ্গীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্র এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের লোকের তীর্থক্ষেত্র। আমরা একাধিক কারণে নবদ্বীপের ও শান্তিপুরের পাকিস্তানভুক্ত হওয়ায় আপত্তি করি।

বিশেষ—মুসলমানগণ যখন আপনাদিগকে ভিন্ন জাতি বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিতেছেন এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান যখন ভিন্ন ভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্র হইবে তখন এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রে গমনের জন্য "ছাড়" প্রয়োজন হইবে কি না, তাহাও বিবেচ্য। এক রাষ্ট্র বিনা ছাড়ে অন্য রাষ্ট্রের লোককে প্রবেশাধিকার প্রদানে আপত্তি করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। শুল্ক প্রভৃতির সমস্যাও থাকিবেই। এক রাষ্ট্র অবশ্যই অন্য রাষ্ট্রকে বৈদ্যুতিক শক্তি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

কাজেই যত অধিক সংলগ্ন স্থান লাভ করা সম্ভব তাহা লাভের চেষ্টা করা একান্তই সঙ্গত।

সেই হিসাবে যশোহরের নড়াইল মহকুমার অধিকাংশ ও সংলগ্ন (ফরিদপুরের) গোপালগঞ্জ থানার এলাকা হিন্দুস্থানভুক্ত করিবার দাবী হইবে।

মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমা পাকিস্থানের জন্য দাবী করাও যে হইতেছে না, তাহা নহে। সে দাবী খণ্ডনের সর্বপ্রধান যুক্তি—বর্তমান অবস্থায় পাকিস্তানের সীমা (কেল্লাও হইতে পারে) কলিকাতা হইতে ৬।৭ মাইলের মধ্যে থাকিলে অশান্তির সম্ভাবনা যেরূপ হইতে পারে, তাহাতে নির্বিঘ্নতার দিক হইতে বিবেচনা করিলেও সে দাবী অসঙ্গত বলা যায়।

নদীয়ার হিন্দুপ্রধান অংশ ও (যশোহর) নড়াইলের মধ্যবর্তী যশোহরের সমগ্রভাগ যাহাকে মুসলমান "পকেট" বলে তাহাই হয়। সেই কারণেও সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগ হিন্দুস্থান-ভুক্ত করিবার প্রস্তাব হইতে পারে।

আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বলিয়াছি—বাঙলার লোকসংখ্যার অনুপাতে জমি দাবী করিলে হিন্দুস্থান সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগ পাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা আমরা প্রয়োজন মনে করি। মুসলিম লীগের একেশ্বর মিস্টার জিন্না বহুবার লোক বিনিময়ের কথায় বলিয়াছেন, তাহা সম্ভব। যদি মুসলিম লীগের হিন্দু বিদ্বেষদুষ্ট মনোভাবের ও অনাচার-প্রবণতার অবসান না হয়, তবে অল্প দিনের মধ্যেই অধিবাসী-বিনিময়ের প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে যাহাতে পাকিস্তানের হিন্দুরা হিন্দু বঙ্গে আসিলে স্থানাভাব না ঘটে, সে দিকেও দৃষ্টি রাখিয়া প্রদেশ বিভাগ করা প্রয়োজন। ম্যালেরিয়ার জন্য ও সেচের অসুবিধায় যশোহরে ও নদীয়ায় অনেক জমী "পতিত" আছে। সুব্যবস্থায় সে সকল জমী বাসের ও কর্ষণের উপযুক্ত হইতে পারে—হইবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যে পরিমাণ জমী ত্যাগ করিয়া আসিবেন, পশ্চিম বঙ্গে তাঁহাদিগকে স্থান দিতে হইলে সেই পরিমাণ জমী প্রয়োজন হইবে।

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপ। পশ্চিম বঙ্গ হইতে তথায় গমনের পথ—পাকিস্তানের মধ্য দিয়া না হইলে—পাওয়া যায় না। সেজন্য—সান্নিধ্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে তাহা যদি হিন্দুস্থান অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে যুক্ত করা অসম্ভব হয়, তবে তাহা আসামভুক্ত হইতে পারে। সেই হিন্দুপ্রধান অঞ্চল পাকিস্তানভুক্ত করিতে অধিবাসীদিগের যেমন—পশ্চিমবঙ্গেরও তেমনই আপত্তি অনিবার্য। কারণ সেই ভূভাগ দিয়া পাকিস্তানের শক্তি ও সমৃদ্ধি বর্ধিত করা কখনই পশ্চিম বঙ্গের অভিপ্রেত হইতে পারে না। কেবল তাহাই নহে—সেই ভূভাগের হিন্দু অধিবাসিগণকে—নোয়াখালী-ত্রিপুরার অভিজ্ঞতার পর হিন্দুরা ও সকল জাতীয়তাবাদীর কেহই মুসলীম লীগ শাসনের কবলে ফেলিতে পারেন না। কংগ্রেসেরই কেবল তাহাতে আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না—আপত্তি সকলের।

আমরা বিভাগ সম্পর্কে কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিলাম।

আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, যথাসম্ভব শীঘ্র বাঙলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আপাতত দুই ভাগের জন্য দুইটি সচিবসঙ্ঘ সংগঠন করা হইবে। মিস্টার সুরাবর্দীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেহ কেহ আলোচনা করিতেছেন। আমরা মনে করি, আমাদিগের পক্ষে এই আলোচনায় সময় নষ্ট করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমাদিগকে প্রথমে সীমা নির্ধারণ কমিশনের নিকট আমাদিগের দাবী জানাইয়া সেই দাবী পূর্ণ করিবার জন্য আবশ্যক উপকরণ দিতে হইবে। তাহার পরে আমাদিগের কর্তব্য আরও জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। মুসলীম লীগ সচিবসঙ্ঘ বাঙলাকে অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, খাদ্য, পরিধেয়—সকল বিষয়েই অভাবগ্রস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অমিতব্যয়ে ও অপব্যয়ে বাঙলা সরকারের তহবিল শূন্য—অর্থাভাবে বহু আবশ্যক কাজ বন্ধ আ... সাম্প্রদায়িকতায় যোগ্যতার ক্ষতি হইয়া... সরকারী চাকুরীতেও দুর্নীতি প্রবল হইয়া...

এই শোচনীয় অবস্থার অবসান ঘটাই... বাঙলাকে উন্নতিশীল, স্বাবলম্বী করিয়া তাহ... প্রাপ্য স্থান গ্রহণের উপযোগী করিতে হই...

সে কাজ বাঙালীর। এতদিন পরে য... জাতীয়তাবাদী বাঙালী সে কাজের ভার ... তাহা সম্পন্ন করিবার অধিকার লাভ করিতে... তখন সে যে তাহার কর্তব্যনিষ্ঠার ও একাগ্রত... দ্বারা সে কাজ সুসম্পন্ন করিবে, তাহাতে আ... দিগের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পশ্চিম বাঙ... যে সে বিষয়ে সমগ্র ভারতে আদর্শ প্রতি... করিতে পারিবে, সে আশাও আমাদিগের আ...

সে জন্য বাঙলাকে শান্তিস্নিগ্ধ ও নিরা... করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে দ... বঙ্গের সীমা নির্ধারণ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযো... হইতে হইবে।

আমরা আশা করি, বাঙলার জাতীয়তাবাদ... দিগের সকল প্রতিষ্ঠান একযোগে সী... নির্ধারণ কার্যে অবহিত হইবেন। বাঙলার লে... যাহাতে একস্থানে উপকরণ প্রদান করিতে পারে... সেজন্য আমাদের একটি সমিতি গঠিত করি... কলিকাতায় তাহার কার্যালয় প্রতিষ্ঠা অবিল... প্রয়োজন।

সাহিত্য সংবাদ

প্রবন্ধ, জীবনী ও চিত্র প্রতিযোগিতা

ঝোড়হাট তরুণ সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালি... উপরোক্ত প্রতিযোগিতা আষাঢ়ের শে... অনুষ্ঠিত হইবে। যোগদানেচ্ছু প্রতিযোগী... বিষয়, নাম, ঠিকানা, আগামী ১৫ই আষাঢ় ৩০শে জুনের মধ্যে সম্পাদক, শ্রীহরিসা... বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝোড়হাট, আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া ... ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিষয়গুলি সম্প... মৌলিক হওয়া চাই। প্রবন্ধ ও জীবনী ফুলস্ক্যা... কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। ... পৃষ্ঠার বেশী নহে। বিষয়গুলি নিজস্ব এই মা... প্রধান শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এবং অধ্যাপকের স... করাইয়া লইতে হইবে। ছবি ড্রইং কাগ... পেন্সিলে আঁকা চাই. (১২"×৮")

বিষয়ঃ—১। ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীনত... রূপ?

প্রবন্ধঃ—(১০ম শ্রেণী, ১ম ও ২য় বার্ষিক ছা... ও ছাত্রীদের জন্য)

২। রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসি কেন?

(৭ম হইতে নবম শ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রীদের জ...

জীবনীঃ—নেতাজী সুভাষ

(৭ম শ্রেণী ও তাহার নিম্নশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদে...

চিত্রঃ—রবীন্দ্রনাথ (বাস্ট) অথবা নারিকে... গাছ।

(ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য)

আলোক চিত্রঃ—যে কোন বিষয়।

(ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য)

যাত্রিদল

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রের দিন সকালবেলা ঘুম হইতে জাগিয়া অসিত নিজের বিছানায় চুপ করিয়া য়াছিল—রাত্রে অক্ষয় তাহার সঙ্গে শুইয়া—সে সকালে উঠিয়া কখন বাড়ি চলিয়া ছে। কল্যাণী কাল হইতে লুকাইয়া ইয়া ফিরিয়াছে—একবারও অসিতের খে আসে নাই। হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া তেই দেখিতে পাইল কল্যাণী আসিয়া ঘরের রে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া ত বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা ন—কি কল্যাণী? অসিতের দিকে চোখ তেই কল্যাণী ঘাড় নীচু করিয়া চুপ করিয়া া—একটা কথারও জবাব দিল না, কিন্তু ভাল করিয়া তাকাইতেই অসিত দেখিতে ন তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু য়া পড়িতেছে। অসিত কিছুক্ষণ চুপ া থাকিয়া বলিল—কেঁদ না কল্যাণী—র দুঃখ আমি বুঝি। মা তো তোমাকে র চেয়ে কম ভালবাসতেন না—তাঁর বাসা যে পেয়েছে সে কি তাঁকে কখনো ত পারে? সারারাত ধরে কেঁদেছি আর ছি। ভেবে দেখলাম আমাদের এই কাঁদার কু মূল্য নেই। —তবু কল্যাণী একটা ও জবাব দিল না দেখিয়া অসিত উঠিয়া নিজের কোঁচার খুঁট দিয়া তাহার চোখের মুছাইয়া দিয়া বলিল—দেখ তো এই একটা ই আমি কেমন ঠিক হয়ে গেছি। এই যে মাস ধরে দিনে দিনে তিলে তিলে মাকে এমনি করে মেরে ফেল্লাম—কই তবুও একটুকুও কাঁদি নে। কিন্তু সহসা তাহার চোখের জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঝরিয়া য়া—তাহার সকল কথা একেবারে মিথ্যা ণত করিয়া দিল। অসিত কল্যাণীর নিকট ত জানালার ধারে সরিয়া আসিয়া দূর শের দিকে দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া য়া রহিল।

কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে অমিয় লেন। ইচ্ছা ছিল অসিতকে সঙ্গে করিয়া কাতায় লইয়া যাইবেন; কিন্তু সে মায়ের সাজান এই ঘর—মায়ের স্মৃতিতে ভরা বাড়ি ছাড়িয়া কিছুতেই কলিকাতা যাইতে হইল না—অগত্যা অমিয় ক্ষুন্ন মনে কাতায় ফিরিয়া গেলেন।

পনর কুড়ি দিন পরে সেদিন সকাল বেলা কাত্যায়নী দেবী কল্যাণীকে বলিলেন—অসিকে আজ তার মায়ের চিঠিখানা তুই হাতে করে দিস্ মা! দুপুর বেলা যখন খাওয়া দাওয়া করে সে ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করবে তখন যাস্! কল্যাণীর লজ্জায় চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিল—সে বলিল —আমি পারবো না মা!

—পারবিনে কেন শুনি?

—না পারবো না!

কিন্তু আহারাদির পর কাত্যায়নী দেবী বলিলেন—আমি বড় বাড়ি চল্লাম কল্যাণী—ফিরতে সন্ধ্যে হবে—চিঠিখানা এই বাক্সের ভিতরে রেখে দিয়েছি—যদি আজ না দিস্ তো আমার মরা মুখ দেখবি তা বলে দিচ্ছি—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী অনেকক্ষণ নিজের ঘরের ভিতর বসিয়া বারেবারে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল। বিকাল বেলা যখন অসিতের ঘরে গিয়া ঢুকিল—অসিত তখন শয্যায় শুইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল। কল্যাণী ঘরে ঢুকিতেই বই বন্ধ করিয়া বলিল—এস কল্যাণী। কল্যাণী কথাটি না কহিয়া এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—কিছু বলবে কল্যাণী?

কল্যাণী কাপড়ের ভিতর হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া অসিতের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—আপনার চিঠি আছে।

—চিঠি? কই দেখি?

অসিত হাত বাড়াইয়া পত্রখানা গ্রহণ করিল। কল্যাণী বলিল—কাকীমার অসুখ যখন খুব বেশী হয়ে উঠলো তখন লিখে রেখে দিয়েছিলেন।

—মার? মার চিঠি? বলিয়াই অসিত তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। মাত্র কয়েক ছত্র লেখা ছিল:—

—অসি, ফিরে এসে হয় তো আর আমাকে দেখতে পাবিনে বাবা—আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, দুঃখ করিস নে—অসি! যেখানেই থাকি তোদের কথা আমি একটি দিনও ভুলে থাকবো না। কল্যাণী রইল—তাকে তোর জন্যেই নিজের হাতে শিক্ষা দিয়েছি, সাধ ছিল তোদের দুটিকে নিজ হাতে এক করে দিয়ে যাব—সে সাধ আমার পূর্ণ হলো না। তুই তাকে গ্রহণ করিস—বাবা! শালগ্রামশিলা সম্মুখে রেখে বিবাহ করিস্। আমি যেখানেই থাকি সেখান থেকেই সুখী হব—এই আমার একমাত্র সাধ—এই আমার তোর উপরে অন্তিমকালের শেষ আদেশ।

চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া অসিত যখন কল্যাণীর দিকে তাকাইল তখন তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে চোখ মুছিয়া বলিল—চিঠি তুমি পড়েছো—কল্যাণী?

কল্যাণী মাথা নাড়িয়া জানাইল—সে পড়ে নাই!

—কিন্তু কি লেখা আছে জানো?

কল্যাণী মৃদু হাসিয়া বলিল—জানি।

—কেমন করে জানলে?

—মা শেষ সময়ে আমাকে সব বলেছিলেন যে।

অসিত উঠিয়া আসিয়া কল্যাণীর সম্মুখে চিঠিখানা খুলিয়া ধরিয়া বলিল—পড়।

কল্যাণী চিঠিখানার উপরে বার দুই চোখ বুলাইয়া লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অসিত ধীরে ধীরে তাহার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল—মার কথার অবাধ্য আমি কোনদিন হই নি কল্যাণী, —আজও হবো না। যে মা আমার কাছে মন্ত্রের চেয়ে—শালগ্রামশিলার চেয়েও বড়—তাকেই উদ্দেশ্য করে আজ আমি তোমাকে আমার সমস্ত সুখ দুঃখের ভাগী করলাম। বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া কল্যাণীকে নিজের কাছে টানিয়া লইল। কল্যাণী হঠাৎ একেবারে অসিতের দুই পায়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া পালাইতেছিল; কিন্তু অসিত তাহার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিল—যেয়ো না কল্যাণী—এসো মাকে উদ্দেশ্য করে দুইজনে প্রণাম জানাই। ঘরের এক পাশে অন্নপূর্ণা দেবীর প্রথম জীবনের একখানা ফটো ছিল—সেখানা নামাইয়া তাহারই গোড়ায় দুইজন মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহারই কয়েকদিন পরে একদিন শুভ দিনে অসিতের সহিত কল্যাণীর বিবাহ হইয়া গেল। তার পরের দিনগুলো ইহাদের এক মধুর আবেশের ভিতর দিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল।

অসিত রাধানগরের হাইস্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া ত্রিশ টাকা বেতনে চাকুরী করিতেছে। সংসার একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিয়া যাইতেছিল।

এমনি করিয়া বৎসর দেড়েক কাটিবার পর সেদিন রাত্রে অসিতের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কল্যাণী কি যেন বলিল—শুনিয়াই সে আনন্দে দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—সত্যি বলছো কল্যাণী? কল্যাণী তেমনি মুখ লুকাইয়া বলিল—একথা বুঝি কেউ মিথ্যে করে বলে? ইহারই কিছুদিন পরে একেবারে জানাজানি হইয়া গেল—

কল্যাণীর সন্তান হইবে। অসিত আজকাল সর্বদা সতর্ক থাকে—কখন কল্যাণীর কি হয় —কিসে তাহার শরীর ভাল থাকে। দিন যত যাইতে লাগিল ততই প্রত্যেকদিন সে তাহাকে নানা উপদেশ দিয়া—নানা প্রকারে সতর্ক করিয়া তুলিত। কল্যাণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত —তুমি দেখছি একেবারে মেয়ে মানুষকেও হার মানালে—পুরুষ মানুষের ওসব কথায় মাথা ঘামানোর দরকার কি শুনি? অসিত হাসিয়া জবাব দেয়—মেয়ে মানুষ সাধারণত অত্যাচারী কি না—তাই পুরুষ মানুষদের মাথা ঘামান দরকার হ'য়ে পড়ে। এমনি যতই প্রসবের দিন অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল—অসিত ততই উঠিতেছিল মনে মনে ব্যস্ত হইয়া। সেদিন স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল—বাড়ির কাছে আসিতেই মনে হইল বাড়িতে যেন আরও দুই-চারিজন লোকের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। বাড়ির আম বাগানের নিকটে আসিতেই বাড়ির ভিতর হইতে একটি কচি শিশু বারে বারে ককাইয়া ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। অসিতের বুকের ভেতরটা উঠিল উল্লাসে নৃত্য করিয়া—ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। তাহাকে দেখিবা-মাত্র পাশের বাড়ির একটি মেয়ে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল অসিদা, সন্দেশ খাওয়াতে হ'বে কিন্তু—দেখ আমি যে বলেছিলাম ছেলে হ'বে —কেমন ঠিক হ'য়েছে আমার কথা! কাত্যায়নী দেবী সূতিকাঘর হইতে উঁকি মারিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিলেন—খুব সুন্দর ছেলে হ'বে অসি—ইস্ দাদু আমার কেমন করে তাকাচ্ছে দেখ। অসিত হাসিমুখে সব শুনিতে-ছিল—এবার এদিকে আসিতেই সেই মেয়েটি পুনরায় চেঁচাইয়া উঠিল—সর সর এদিকে এসো না কিন্তু অসিদা, সন্দেশ না হ'লে ছেলে আমরা দেখতে দেব না। আরও দুই তিনজন ছোট বড় মেয়েছেলে দাঁড়াইয়াছিল তাহারাও সমস্বরে সন্দেশের দাবী জানাইল। অসিত হাসিয়া মেয়েটিকে বলিল—চুপ কর পাগলী—আমি দেখতেই যাচ্ছি আর কি?

চতুর্দশ—অধ্যায়

মাসখানেক কাটিয়া গিয়াছে। কল্যাণী সূতিকা ঘর হইতে বাহির হইয়াছে। শরীর তাহার অনেকখানি রোগা ও খানিকটা বিবর্ণ দেখাইতেছে কিন্তু তবু তাহার দুই চক্ষু উঠিয়াছে উজ্জ্বল হইয়া। দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু যেন কোন অভাবনীয় বস্তুর সংস্পর্শে অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। কল্যাণীর আজকাল আর কোন কাজ নাই—সংসারের সমস্ত কাজ যেন তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত মন তাহার সারাটা দিনরাত্রি ধরিয়া এই এতটুকু একটু জীবকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। এই মাস-খানেকের মধ্যে যেন তার বয়স বছর দশেক আগাইয়া গিয়াছে। তেমনি করিয়া আগের মত আর লজ্জা করে না—সংকোচ করে না। এই এতটুকু মাত্র ছেলেটি তাহার কোলে আসিয়া যেন তাহার সমস্ত লজ্জা সমস্ত সঙ্কোচকে এমনি করিয়া দূর করিয়া দিয়াছে। প্রসবের পূর্বে ভাবিত সন্তান হইলে কেমন করিয়া সবার সামনে তাহাকে কোলে করিয়া স্তন্য দিবে, কেমন করিয়া আদর করিবে—অত্যন্ত লজ্জা করিবে তাহার। কিন্তু সে কল্পনা যে তাহার কত ভুল তাহা সে তখন কিছুমাত্র বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ছেলে কোলে লইলে সমস্ত লজ্জা সংকোচ তাহার মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া যায়। সে সকালবেলা ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া শয্যায় শুইয়া থাকে। সন্ধ্যার পূর্বে যা হোক দুটি মুখে দিয়া ঘরে গিয়া ঢুকে আর কিছুতেই বাহির হয় না। নিজের আহারে বিহারে এমনি সংযত হইয়া উঠিয়াছে যে এ যেন কোন এক ব্রত পালন করিতেছে সে—সমস্ত রকমের অশুচি, অপবিত্রকে অতি যত্নে পাশ কাটাইয়া চলে। এমনি নিশিদিন নিজের আচার-ব্যবহারের প্রতি খর দৃষ্টি রাখিয়া তাহার দিন কাটে। অসিত চুপ করিয়া দেখে—মুখ বুজিয়া হাসে।—এমন কি আজকাল তাহাকেও কল্যাণী সহজে রেহাই দেয় না—বাহির হইতে ঘরে ঢুকিতে হইলে দরজার বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া পা ধুইয়া পরে ঘরে ঢুকিতে দেয়—কাপড় না বদলাইয়া খোকার শয্যা স্পর্শ পর্যন্তও করিবার হুকুম নাই। সেদিন কল্যাণী তাহাকে বলিয়াছিল—জান ওরা সব স্বর্গের জিনিস—কোনপ্রকার অশুচি—কোনপ্রকার অত্যাচার একটুও সহ্য হয় না। অসিত অবিশ্বাসের হাসি হাসে—কল্যাণী তর্ক করিয়া বলে, কি বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি! অসিত হাসিয়া বলে—না মোটেই না।

—তোমরা সব ইংরেজী শিখে দিন দিন খৃস্টান হ'য়ে যাচ্ছ কিনা তাই বিশ্বেস কর না। আচ্ছা আজ তোমাকে দেখিয়ে দেবো!

—কি দেখাবে শুনি?

—খোকা শুয়ে শুয়ে একা একা কেমন হাসে—স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে কথা বলে।

শুনিয়া অসিত পুনরায় হাসিতে থাকে।

কল্যাণী আঙ্গুল তুলিয়া শাসাইবার ভঙ্গিতে বলে—তবু হাসছো যে বড়? অসিত বলে—আমি যদি বলি ও দেবতাদের পরিবর্তে তোমার সঙ্গেই কথা বলতে চায়—তোমাকে দেখেই হাসে!

—ইস্, তাই কখনো হয় না কি?

—জান, ছয় মাস পর্যন্ত—যতদিন না মুখে ভাত হয়, ততদিন ওরা অমনি স্বর্গের দেবতা-দের সঙ্গে কথা বলতে পারে—এসব শাস্ত্রে কথা যে তুমি বিশ্বেস না করলেই হ'লো ব...

—কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে শুনি?

—জানি নে! তোমার সঙ্গে পারবে যে... আজ পর্যন্ত এ ভূ-ভারতে জন্মে নি—বলি... রাগ করিয়া কল্যাণী উঠিয়া যায়।

অসিত তেমনি চুপ করিয়া মনে ম... হাসিতে থাকে। হঠাৎ খোকা হয়তো কাঁদি... উঠে—কল্যাণী তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে ছুটি... আসিয়া দুই হাত বাড়াইয়া অতি সন্তর্প... ন্যাকড়াসমেত স্বচ্ছন্দে তাহাকে নিজের কোলে... মধ্যে তুলিয়া লইয়া দুধ দিতে দিতে ঘ... মধ্যে পায়চারী করিতে থাকে। অসিত সেইদি... নির্নিমেষে চাহিয়া দেখে। কল্যাণীকে ... ভারী রহস্যময়ী বলিয়া বোধ হয়—অজক... যেন এক অভিনব রূপ তাহার সারা ... খেলিয়া বেড়ায়—এ রূপকে শুধু চোখ দিয়া ... যায় না, মনকে চোখের সঙ্গে করিয়া লইতে হ... কল্যাণী তাহার দিকে চোখ ফিরাইয়া বলে... অমনি করে একদৃষ্টে হা করে তাকি... দেখ্‌ছো কি শুনি?

তোমাকেই দেখ্‌ছি!

কল্যাণী হাসিয়া বলে—ইস্ মিথ্যেবা... কোথাকার—আসল বস্তু ফেলে বুঝি ... খোসাকে আদর করে?

অসিত প্রশ্ন করে—তার মানে?

—কিছু বোঝেন না যেন,? ছেলে, তোম... ছেলের কথা হ'চ্ছে মশাই—বাপ মা সব খো... সন্তান হ'চ্ছে আসল বস্তু—বুঝলে তো?

কথা বলিতে বলিতে সে তাহার কা... আগাইয়া আসিয়া বলে—কেমন নিতে চাও ... খোকাকে কোলে—নেবে? নাও দেখি, বলিয়া... দুই হাতে খোকাকে অসিতের কোলের দি... আগাইয়া দেয়। অসিত একেবারে ভয়ে জড়... হইয়া উঠে।

আরে—করে কি দেখ—ও ব্যথা পাবে যে... আমি নিতে পারবো কেন? না আমার ভা... ভয় করে কিন্তু—শুধু হাতে ধরলে যদি ব্য... পেয়ে কেঁদে ওঠে?

কল্যাণী কোন কথা না শুনিয়া অ... সন্তর্পণে ঝপ্ করিয়া খোকাকে অসিতে... কোলের মধ্যে নামাইয়া দেয়।

অসিত নিরুপায় হইয়া আনাড়ির ম... দুই হাত, দুই হাঁটু কোনমতে একসা... করিয়া খোকাকে ধরিয়া থাকে। কল্যা... এতক্ষণে বিপন্ন অসিতের দিকে তাকাই... খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া প... আর কি—কেমন জব্দ—নিজের ছেলে না... একটুও কোলে করবে না শুনি? রাতদিন ত... আমি কোলে করে নিয়ে ফিরবো না কিন্তু... এখন থেকে ভাগাভাগি করে কোলে নি... হ'বে। অসিত দুষ্টামী করিয়া ইহার কি এব...

লাগসই জবাব দিতে যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ খোকা একেবারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই আর সেকথা বলা হইল না।

কল্যাণী বলিল—কাঁদে যে থামাও না!

অসিত বার দুই হাঁটু ও দুই বাহু দিয়া খোকাকে দোলা দিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তখনই ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। এম্‌নি করিয়া হঠাৎ পড়িয়া যায় যদি!

সে নিরুপায়ের মত বলিয়া উঠিল—শীগগির নাও কল্যাণী—আমি আর পারবো না—ব্যথা দেব—ফেলে দেব শেষে!

কল্যাণী ছুটিয়া আসিয়া ছোঁ মারিয়া তাহার কোল হইতে খোকাকে তুলিয়া লইয়া নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে। কোন যাদু-মন্ত্রের বলে যেন এক নিমিষে খোকা একেবারে চুপ করিয়া যায়—কয়েক মিনিটের মধ্যেই মায়ের কোলে দিব্যি হাত পা নাড়িয়া খোকা, খেলা করিতে থাকে।

কল্যাণী হাসিয়া বলে—দেখ্‌লে তোমরা কেমন অকর্মা!

অসিত বলে—তা বল্‌তে পার বটে।

আজ রবিবার। অসিতের ইস্কুল নাই। দ্বিপ্রহরে আহারান্তে সে ঘরে ঢুকিয়া দেখে, খোকা নিজের বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছে। কল্যাণী হয়তো রান্নাঘরে এতক্ষণ আহারে বসিয়াছে। অসিত ধীরে ধীরে খোকার পাশে গিয়া বসিয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে খোকার জন্য ছোট্ট একটি তোষক, দুইটি পাশ বালিশ, শিয়রে দিবার জন্য একটি ছোট্ট আকন্দ তুলার বালিশ তৈরী হইয়াছে। ছোট্ট ছোট্ট কাঁথার তো কথাই নাই। ঠিক মাথার উপরে হাত দুই উঁচুতে একটি সোনার রংকরা খাঁচা ঝুলিতেছে। অসিত একদৃষ্টে খোকার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল—কি সুন্দর মুখের গড়ন—দিব্যি বড় বড় চোখ টানা টানা ভ্রু—টিকালো নাক—চিবুকের দিকে তাকাইলে তাহার পিতার কথা মনে পড়িয়া যায়। কপালটিও হয়তো তাঁহারই মত প্রশস্ত হইবে। হাত পাগুলো কি চমৎকার—দিব্যি সরু সরু—দিব্যি নিটোল। ঘুমের ভিতরে হাত দুইখানা একবার মুঠা করিতেছে একবার খুলিতেছে। মুখের দিকে পুনরায় তাকাইয়া দেখে সত্যই তো খোকা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাসিতেছে। কল্যাণী দেখিলে মনে ভাবিত—সে স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে কথা কহিতেছে। সৃষ্টিরহস্য কি অদ্ভুত—কেমন নিখুঁত—ভাবিয়া অসিত অবাক হইয়া যায়। কল্যাণী তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলে—কি দেখছো এমন এক দৃষ্টে তাকিয়ে?

—খোকাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু।

কল্যাণী খুশিতে মুখ চোখ ভরিয়া তুলিয়া বলিল—কার মত হয়েছে, বল তো?

অসিত হাসিয়া বলিল—তোমার মতো।

কল্যাণী মাথা নাড়িয়া বলে—উঁহু—হলো না!

—কেন?

—তোমার মত হয়েছে যে!

অসিত বলিল—মিথ্যে কথা!

—মিথ্যে বই কি, সবাই বলে যে—একেবারে তোমার মত দেখতে হয়েছে!

—তাই নাকি? তুমি বল নাকি?

—তা বুঝি আর জানেন না!

ও সব থাক্—খোকার কি নাম রাখবে, ভেবেছো কিছু?

—কই না ভাবিনি তো!

—খুব বড় একটা নাম রাখতে হবে কিন্তু!

—খুব বড় নাম? আচ্ছা সমসের জঙ্গ বাহাদুর রাখলে কেমন হয়!

—যাও তোমার কেবল ঠাট্টা—অমনি নাম বাঙালীর হয় বুঝি?

—আচ্ছা বেশ—না হয়—সুবোধ, গোপাল, সুশীল এমনি একটা ভেবে চিন্তে রাখা যাবে।

—যাও তোমাকে রাখতে হবে না নাম—কেবল দিন রাত কুড়েমি করবে আর তো কোন কাজ নেই!

অসিত নিজের বালিশটা টানিয়া লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল—বেশ সেই ভাল—কাজ নেই আমার, তোমার ছেলের নাম রাখতে যেয়ে—মাথা ঘামিয়ে এতগুলো যে ভাল ভাল নাম করে গেলাম সেজন্য কোথায় দুটো ধন্যবাদ দেবে—তা নয় আমি হলেম কুড়ে—বেশ! বলিয়া সে হাসিমুখে দুই চোখ বুজিয়া কৃত্রিম ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকে। এমনি করিয়া ছয়টি মাস কাটিয়া গেল। খোকার নাম রাখা হইল—অজয়। কল্যাণী আদর করিয়া ডাকিত—অঞ্জুমণি। এখন আর সে পূর্বের মত ভয় ভয় করিয়া চলে না—অঞ্জুকে কোলে করিয়া লইয়া ঘরের বারান্দায় উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায়—সুর করিয়া করিয়া ছড়া কাটিতে থাকে—

"মণি আমার সোনা, চাঁদপুকুরের কোণা
মোহর কেটে স্যাকরা ডেকে গড়িয়ে দেব দানা।"

অঞ্জু এখন মাঝে মাঝে অসিতের মুখের দিকে তাকাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। অসিত দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লয়। আদর করে—অনেকক্ষণ ধরিয়া কোলে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। খোকা এরই মধ্যে বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে।

আরও সাত আটটি মাস কাটিয়া গেলে অঞ্জু একা একা দাঁড়াইতে শিখিয়া ঘরের দেয়াল ধরিয়া দিব্যি হাঁটিয়া যাইত। মুখে হিস্ হিস্ করিয়া এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ করিত। অসিতের বাহির হইতে বাড়ি ঢুকিবার সময় জুতার শব্দ শুনিতে পাইলেই একেবারে খানিকটা হাঁটিয়া খানিকটা হামাগুড়ি দিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার পা বাহিয়া কোলে উঠিতে চাহিত। অসিত ধুলো কাদা সমেত তাহাকে কোলের মধ্যে তুলিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিত। কল্যাণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত—তবে যে বল্‌তে ছেলে কোলে নেবে না—এখন না নিয়ে দেখ দেখি কেমন পার! অসিত কল্যাণীর কথার কোন জবাব না দিয়া অঞ্জুর মুখে বার বার চুমু খাইতে খাইতে বলিতে থাকে—অঞ্জু আমার লক্ষ্মী ছেলে—মাণিক ছেলে। অঞ্জু বা—বা—বা—শব্দ করিতে করিতে দুই হাত দিয়া অসিতের গলা জড়াইয়া ধরে। কল্যাণী হাসিয়া বলে—ইস্, ভারী যে ছেলেকে আদর হচ্ছে। অসিত কৃত্রিম রোষে চোখ পাকাইয়া বলে—তুমি আমাদের ভিতরে কথা বল্‌তে আসো কেন বলতো? আমি আর অঞ্জু—অঞ্জু আর আমি; তোমার সঙ্গে আমরা কেউ কথা কচ্ছিনে!

কল্যাণী মুখ বাঁকাইয়া বলে—ইস্,—আচ্ছা ক্ষিধে পাক্ আগে—কার সঙ্গে কথা বলতে হয় না হয় তখন দেখা যাবে।

হঠাৎ অঞ্জু মায়ের দিকে ফিরিয়া দুই হাত বাড়াইয়া ডাকিতে থাকে—মা—মা—মা—!

কল্যাণী হাত বাড়াইতেই অঞ্জু একেবারে ঝাঁপাইয়া তাহার কোলের ভিতর গিয়া বুকের ভিতর মুখ লুকায়।

কল্যাণী হাসিয়া বলে—কেমন হলো তো! অঞ্জু আর তুমি—তুমি আর অঞ্জু—আমি কেউ নই না?

পঞ্চদশ অধ্যায়

কিছুদিন পরে একদিন বিকাল বেলা ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া অসিত একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। মধুকর আসিয়া তাহাদের ঘরের বারান্দায়—অঞ্জুকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। তিন বৎসর পরে দেখা কিন্তু প্রথম দর্শনেই অসিত তাঁহাকে চিনিতে পারিল, সেই উন্নত বলিষ্ঠ দেহ—মাথায় লম্বা লম্বা চুল—সব ঠিক আগের মতই আছে। অসিত কলরব করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল—একি দাদা, আপনি এমনি হঠাৎ কোত্থেকে এলেন? কখন এলেন? মধুকর এক হাতে কোলের উপর অঞ্জুকে চাপিয়া ধরিয়া অন্যহাতে অসিতকে নিজের পাশে টানিয়া লইলেন। হাসিয়া বলিলেন—অনেক যায়গা ঘুরে তবে তোমার এখানে এসেছি ভাই!

—কিন্তু কখন এলেন—খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি আপনার!

মধুকর পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—কষ্ট আমার এত সহজে হয় না ভাই—স্নানাহার সেরে একটা ঘুম দিয়ে এখন অঞ্জুর সঙ্গে একটু ভাব করছি। তুমি যাও—হাত মুখ ধুয়ে
যাও। বলিয়া তিনি পুনরায় অঞ্জুর দিকে

মনোযোগ দিলেন। অসিত আশ্চর্য হইয়া গেল —এতটুকু সময়ের মধ্যে অঞ্জু তাহার বেশ বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে তো! সে অঞ্জুর দিকে হাত বাড়াইল। অঞ্জু তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। মধুকর কৃত্রিম রোষে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কি দুষ্টু ছেলে এতক্ষণের সমস্ত ভাব বাবাকে দেখেই শেষ হয়ে গেল। এসো! বলিয়া হাত বাড়াইলেন—অঞ্জু পুনরায় হাসিতে হাসিতে পিতার কোল হইতে তাঁহার দুই হাতের ভিতরে ঝুকিয়া পড়িল। মধুকর, অঞ্জুকে নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুমায় চুমায় তাহার দুই গাল ভরিয়া দিতে লাগিলেন। পরে অসিতের দিকে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন—দেখছো কি অসি—বন্ধুরা বলে—আমি মানুষ বশ করতে জানি। কেমন তাই না অঞ্জু—বলিয়া অঞ্জুকে দুই হাতের ভিতর লইয়া তালে তালে দোল দিতে লাগিলেন।

শেষ বেলায় দুইজনে আসিয়া চন্দনার তীরে এক নির্জন স্থানে বসিলেন। মধুকর অসিতের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন—সেই যে একদিন বলেছিলে যদি পথ খুঁজে পান আমাকে ডেকে তুলবেন দাদা, সে কথা এখনও ভুলিনি ভাই—তাই আজ এসেছিলাম—কিন্তু বড় অসময়ে এসেছি অসি!

অসিত বলিল—অসময় কেন দাদা?

—আমার ভুল হয়েছিল ভাই—মনে করেছিলাম—সেই যে তিন বছর আগে জেলখানায় যে অসিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম—সেই খাপখোলা তলোয়ারের মতো অসিকে আজও দেখতে পাব। আমি তো জানিনে ভাই যে, তুমি আজ এমনি করে আর দশজন সংসারী মানুষের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছ। তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্র—পরিপূর্ণ সংসার তোমার—আমি যে এখানে মূর্তিমান অকল্যাণের মত এসে উপস্থিত হয়েছি। সেদিন জেলে বসে, যে মায়ের কথা শুনে, মনে ভেবেছিলাম, আজিকার দিনে এমন মা যার, তার প্রাণের আগুন কোনদিন নিভবে না—কিন্তু আজ সে মা-ও নেই—সে অসিতও নেই ভাই। উভয়ে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অসিত যখন মুখ তুলিয়া কথা কহিল—তখন তাহার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া যাইতেছে।

কিন্তু মার কথা তো আমি অমান্য করিনি দাদা! যে মায়ের প্রেরণায় জেলে গিয়েছিলাম—সেই মায়ের আদেশেই বিয়ে করেছি। সংসারী হয়েছি বটে কিন্তু মায়ের সে প্রেরণা আজও নিভে যায়নি। দরকার হলে সব ছেড়ে—আজও আবার জেলে যেতে পিছু পা হবো না। মধুকর মৃদু হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু জেলে গেলেই যদি সব হতো ভাই তাহলে তো কথা ছিল না।

—আর কি চাই তবে?

—কি চাই? দরকার হলে সব কিছুই চাই অসি—নিজের প্রাণকে হাসতে হাসতে বলি দিতে পারা চাই—চাই প্রাণপণ!

—তা হলে কি স্বাধীনতা আসবে—দেশ উদ্ধার হ'বে দাদা?

—জানি নে ভাই, কাজ আমরা করে যাব, ফলের আকাঙ্ক্ষা করবো না হয়তো ফল্‌বে—হয়তো ফল্‌বে না!

—কিন্তু এই কি সত্যিকারের পথ!

—তাও জানি নে ভাই! একে আমরা বলি জান? এ হ'লো আত্মসমর্পণ যে



দেশের পায়ে নিজেকে বলি দেওয়া। হিসেব-নিকেশ এখানে তুচ্ছ। সত্যিকারের প্রাণ যেখানে—সেখানে হিসেব-নিকেশের স্থান নেই অসি! রাণা প্রতাপ পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়িয়েছে—তবু আকবরের কাছে মাথা নত করেনি। বাঙলার প্রতাপ নিশ্চিত শান্তির পরিবর্তে, নিজের পরিবারের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল—আমরা আর কিছু না পারি—মরতে তো পারবো অসি!

বহুক্ষণ উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন। বেলা তখন একেবারে শেষ হইয়া আসিয়াছে—সূর্যের শেষ রশ্মি পশ্চিম দিকের খণ্ড খণ্ড মেঘের মধ্যে লুকাইয়া নানা বিচিত্র বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছে—সম্মুখে অতি ক্ষীণস্রোতা চন্দনা ধীর মন্থরগতিতে বহিয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অসিত বলিল—কিন্তু মরতে যে আমি পারবো না তা আপনি কেমন করে জানলেন দাদা!—"—"তা সত্যি জানিনে কিন্তু ওকথা আজ আর আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না ভাই! তোমার অঞ্জুমণি, তোমার স্ত্রী—এদের পথে বসিয়ে তো আর তোমাকে টানতে পারিনে?"—"বিয়ে করা কি এমন অন্যায়?"— "ন্যায় অন্যায়ের কথা নয়—এ যে জীবন-মরণের কথা। যাকে নিজের চিরজীবনের সঙ্গী করে নিয়েছ—যে ক্ষুদ্র শিশুকে তুমিই এই পৃথিবীতে টেনে এনেছো—তাদের সমস্ত দায়িত্ব তো আজ ঝেড়ে ফেলে দিতে পার না! আনন্দমঠের সন্তানরা যে পর্যন্ত না তাদের পণ সিদ্ধ হয় সে পর্যন্ত স্ত্রীপুত্রের মুখ দর্শন করবে না প্রতিজ্ঞা ক'রে কর্মে নেমেছিল কিন্তু আমরা যারা যাব তারা তো ফিরে আসবার আশা করে যাব না ভাই!"—"আর যদি এদের সমস্ত ভার কারু উপরে সমর্পণ করে দিতে পারি?"—"তখন আমার খোঁজ করো ভাই—ঠিকানা তোমায় আমি দিয়ে যাবো।"

পরের দিন সকালবেলায় মধুকর অসিতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেলেন। কিন্তু ইহার পর হইতে অসিতের আর সংসারের কোন কাজেই—কোনপ্রকার উৎসাহ রহিল না। কতদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল স্বদেশ-সেবা তাহার জীবনের ব্রত করিবে—আজ এতদিনের সংকল্প যে তাহার এমনি করিয়া পাকে পাকে সংসারের বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে—এ খেয়াল তাহার ছিল না। যে মধুকরের পাশে বসিয়া দিনের পর দিন এমনি কত মিথ্যার বুলি আওড়াইয়া অযথা নিজেকে বড় করিয়া জাহির করিয়াছিল আজ সেই মধুকর আসিয়া একমুহূর্তে তাহার এই শোচনীয় পরিণতি দুই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া গেলেন। স্ত্রী তাহার নিজের প্রাণতুল্য; অঞ্জুমণি—তাহার প্রাণের প্রাণ—এই প্রেম ও স্নেহ যে তাহাকে শতবাহু মেলিয়া কোথায় টানিয়া নামাইয়াছে—এ হিসাব সে কোন দিন করে নাই। হয়তো মধুকর এমনি করিয়া ধূমকেতুর ন্যায় আসিয়া উপস্থিত না হইলে জীবনে এ হিসাব তাহার কোন দিন করিয়া উঠিবার অবসর হইত না।

অসিতের এই ভাবান্তর কল্যাণীর চোখ এড়াইল না। কি যে তাহার হইয়াছে নিজের বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া প্রশ্ন করিয়া ইহার কোন সূত্রই সে আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিল না। এমনি ভারাক্রান্ত মন লইয়া অসিতের দিন কাটিতে লাগিল। সেদিন মায়ের বইয়ের আলমারির সামনে দাঁড়াইয়া অসিত একমনে কত কি ভাবিয়া চলিতেছিল আলমারিতে স্তরে স্তরে মায়ের বইগুলি সাজান ছিল। এই বইগুলি তাঁহার আদরের ধন—তিনি নিজের পিতৃভবন হইতে এগুলি যখন যেখানে গিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়াছেন। অসিত সেইদিন পর্যন্ত মায়ের মুখে এই সমস্ত বইয়ের কত কথাই না শুনিয়াছে! মায়ের উৎসাহে সেও তো কত বইয়ের পাতার উপর পাতা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। হাত বাড়াইয়া বইগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে বাহির হইল রাজস্থান—অমনি অসিতের মনে পড়িয়া গেল মহারাণা প্রতাপ সিংহের কথা—মনে পড়িল মহারাণার জীবনের শেষ সময়ে......সরোবর তীরে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে শেষশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন—পাশে দাঁড়াইয়া আছেন সুখ-দুঃখের চিরসহচর পরম বিশ্বস্ত সর্দারগণ। সহসা প্রতাপের বক্ষ ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল; ঝাল্লাপতি প্রতাপের বেদনার কারণ কি জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন—"কেন; কেন মহরাণা, কি এমন দারুণ দুঃখ আপনার পবিত্র আত্মাকে ব্যথিত করিল—এ অন্তিম শয়নে কিসে আপনার শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইল?"

ক্ষণকাল পরে প্রতাপ কহিলেন—"সর্দার-শিরোমণি, প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না; কেবল একটি মাত্র আশ্বাস বাক্য পাইলেই উহা এখনই বাহির হইয়া যাইবে—সে আশ্বাসবাণী আপনাদেরই নিকট—আপনারা আমার সম্মুখে শপথ করিয়া বলুন যে, জীবিত থাকিতে কখনও তুর্কীর হাতে মাতৃভূমি অর্পণ করিবেন না—বলুন তাহা হইলেই আমি সুখী হইয়া সুখে নয়ন মুদ্রিত করিতে পারি।" প্রতাপের বেদনায় অসিতের দুই চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। রাজস্থান তুলিয়া লইতেই বাহির হইল রঙ্গলালের গ্রন্থ—অমনি তাহার মনে পড়িল—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে,
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বল্ কে পরিবে পায়
রে কে পরিবে পায়।
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়,
—দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।"

তারপর বাহির হইল—হেমচন্দ্রের—"ভারত সঙ্গীত"—অসিত মনে মনে আবৃত্তি করিয়া গেল—

"বাজ্‌রে সিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রবে।"

সহসা পুনরায় পলাশী যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই—অসিতের মনে যেন মোহনলাল মূর্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিল—মনে পড়িয়া গেল—

"সামান্য বণিক এই—শত্রুগণ নয়
দেখিবে তাদের হায়
রাজা রাজ্য ব্যবসায়
বিপণি সমরক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়।"

আবার মনে পড়িল—

"নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার
ডুবাইয়া বঙ্গ আজ, শোক সিন্ধু জলে?
যাও তবে, যাও দেব! কি বলিব আর
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ উদয় অচলে।"

অদ্ভুতভাবে অসিতের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সহসা সে এক অদ্ভুতভাবে যেন নিজের ভিতরে নিজে জাগ্রত হইয়া উঠিল। এক অভুতপূর্ব উন্মাদনায় সমস্ত দেহ ভরিয়া গেল। তাহার মনে হইল তাহার সম্মুখ হইতে একখানি কাল যবনিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইতেছে—আর তাহারই পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—রাণা প্রতাপ, মোহনলাল, তাহার দাদু শঙ্কর, বিদ্রোহী সিপাইগণ আর পরম মঙ্গলময় মূর্তি লইয়া তাহার মা! সম্মুখে তাহার প্রসারিত রহিয়াছে শৃঙ্খলিত এই মহাদেশ—আর তাহার অগণিত নিপীড়িত নরনারী। নিজের স্ত্রী-পুত্রের কথা—সংসারের কথা মন হইতে এক নিমিষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল। (ক্রমশ)

ছায়াপাত

শ্রীঅমর সান্যাল

কমলনগরের রাজকুমারীর জন্মদিন। বারো পেরিয়ে তেরোয় পা দিয়েছেন সবে। রাজ্যের আর সব ছেলেমেয়েদের মত বৎসরে একটি দিন মাত্র তাঁর জন্মতিথি প্রতিপালিত হয়, রাজার মেয়ে বলে বৎসরে একদিনের বেশী তিনি দাবী করতে পারেন না। অবশ্য তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে রাজ্যের চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়, একটি দিনের জন্য কমলনগরের সকল মলিনতা হয় নিঃশেষে অবলুপ্ত।

সেদিন রাজার প্রাসাদে অপূর্ব শ্রী। ফুলের বাগানে লুটিয়ে পড়েছে প্রভাতের সোণালী আলো। নীল ওড়নাঘেরা আকাশ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ধরণীর শ্যামল বক্ষের দিকে। কাননের ফুলদল বাতাসের আলিঙ্গনে সোহাগে গড়িয়ে পড়ছে ঘাসের বুকে। ফুলের রেণু জড়িয়ে গেছে প্রজাপতির পাখায়, কাঠ-বিড়ালীর চঞ্চল নৃত্যে কাননভূমি মুখরিত। ম্যাগনোলিয়ার শাখায় শাখায় দুধের মত সাদা ফুলের সমারোহ, প্রাসাদের ঘরে ঘরে তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে।

বাগানের পথে রাজকুমারী ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সঙ্গীদের নিয়ে। মাঝে মাঝে খেলা চলছিল লুকোচুরি। বাগানে ছড়ান রয়েছে শেওলাঘেরা পাথরের মূর্তি, তারই অন্তরালে ছেলেমেয়েদের কচিমুখ ঢাকা পড়ছিল। আজ রাজকুমারীর সঙ্গীদের মধ্যে দেশের সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই আছে। এই একটি দিনের জন্য রাজাপ্রজার বিভেদ চলে যায়, সকাল না হতেই প্রাসাদের আঙিনায় সমবেত হয় কুটীরবাসী ছেলেমেয়েরা। বৎসরের অন্যান্য দিন রাজকুমারীর খেলার সঙ্গী থাকে রাজ্যের বড়লোকের ছেলেমেয়েরা, তাই এই একটা দিন তাঁর কাছে রঙীন এক স্বপ্নময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। ছেলেমেয়েরা সকলেই এসেছে সাধ্যমত মূল্যবান পোষাক পরে, তাদের মধ্যে রাজকুমারী সুজাতাকে দেখাচ্ছে অপরূপ। রূপোর মত ঝকঝক করছে তাঁর পোষাক, গলায় জড়ানো মুক্তার মালা, বাঁশীর সুরের চেয়েও মিষ্টি তাঁর নূপুরের বাজনা। ছোট মুখ-খানি ঘিরে জড়িয়ে আছে কুঞ্চিত কেশদাম, খোঁপায় জড়ান অপরূপ এক সাদা গোলাপ।

প্রাসাদের সুদৃশ্য গবাক্ষপথে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের খেলা দেখছিলেন কমলনগরের রাজা স্বয়ং। গোধূলির মত বিষাদভরা তাঁর মুখশ্রী। রাজার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর ছোট ভাই আর দীক্ষা গুরু। তাঁর স্নেহসিক্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ সুজাতার দিকে, কিন্তু অন্তরের অন্তরে তিনি ভাবছিলেন সুজাতার মায়ের কথা। এই তো সেদিন শ্রীপুরের রাজকুমারী সুপ্রিয়া এসেছিলেন কমলনগরের রাজরাণীরূপে, সুজাতার জন্মের ছ মাস পরেই তাঁর পার্থিব জীবনের চরম অবসান হল। দুঃসহ শোকে মুহ্যমান হলেন রাজা, তাঁর সারা বুকখানা খালি করে গেছে রাণী সুপ্রিয়া। দেশের ভাস্করদের ডাক পড়ল রাজ দরবারে। রাজার হুকুমে তারা এক মাসের মধ্যে রচনা করল রাণীর মর্মর মূর্তি, শিল্পীর নির্মাণ কৌশলে মূর্তি জীবন্ত মনে হতে লাগল। মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল প্রাসাদের সন্নিকটে মনোরম এক মন্দিরে। প্রতি মাসে একদিন রাজা সেখানে যান নিশীথ রাত্রে। পরিধানে থাকে বিবাহ দিবসের মূল্যবান পোষাকটি, হাতে একটি অনুজ্জ্বল বর্তিকা। মর্মর মূর্তির পাশে বসে রাণীকে ডাকেন তিনি পুরাতন আদরের ডাক, তাঁর উদ্গত অশ্রু ঝরে পড়ে মূর্তির কপোল ও চিবুকে।

রাণীকে ভালবেসেছিলেন তিনি আত্মহারা হয়ে। একটি দিনের জন্যও চোখের আড়াল করেন নি তাঁকে, এমন কি প্রেমের জন্য রাজ-কার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করতেও কুণ্ঠিত হননি। রাণীর আকস্মিক মৃত্যু তাঁকে প্রলুব্ধ করল সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য, কিন্তু সুজাতার দিকে চেয়ে তিনি আত্মসংবরণ করলেন। তারপর এল দেশ-বিদেশ থেকে নূতন সম্বন্ধের ধারা, কিন্তু ঘটকের দল বিদায় নিল আশাহত হয়ে।

আজ তিনি সুজাতার মধ্যে দেখছেন সুপ্রিয়াকে, বারো বছরের সুপ্রিয়া বধূরূপে প্রবেশ করেছিল তাঁর জীবনে। বিবাহিত জীবনের স্মৃতির ভাণ্ডার খুলে গেছে আজ তাঁর মনের মধ্যে,—অনুরাগপূর্ণ প্রদীপ বন্ধনের কী শোকাবহ পরিণতি! রাজ সুজাতাকে লক্ষ্য করছেন, মায়ের সকল ধর পেয়েছে মেয়ে। সেই রকম চলার ভঙ্গী, মাথ দুলিয়ে কথা বলা, দর্পিত মুখমণ্ডলে সেই রকম হাসির ঝিলিক। হাসিভরা মুখ তুলে সুজাতা মাঝে মাঝে চাইছেন জানালার দিকে মেয়ের ইসারায় হাত তুলে সাড়া দিচ্ছেন রাজা কিন্তু কি একটা বেদনাদায়ক স্মৃতি রাজাকে বিচলিত করে তুলল। শিশুদের কল কোলাহল তাঁর মনে হল বেসুরো, উজ্জ্বল সূর্যালোক যেন তাঁর দুর্বহ শোকভারকে বিদ্রূপ করছে। দু হাতে মুখ ঢেকে রাজ বসে পড়লেন জানালার নীচে। রাজকুমারী সুজাতা এক সময় মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন গবাক্ষ শূন্য।

একটু ক্ষুণ্ণ হলেন রাজকুমারী। আজকের দিনে এভাবে চলে যাওয়া রাজার উচিত হয়নি রাজকার্য কি তাঁর জন্মতিথির চেয়ে বড়? কিম্বা রাজা গেছেন পুকুর পাড়ে সেই মন্দিরে যার অন্দরে দিবারাত্র জ্বলছে একশ বাতি এমন দিনে এই সুন্দর আলোর ঝিলিমিলি উপেক্ষা করে রাজা কোথায় গেলেন! উৎসবের অন্যান্য অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সময় এসেছে। ছোট্ট মাথাটি দুলিয়ে রাজকুমারী ছেলেমেয়ে-দের আনন্দে যোগ দিলেন।

বাগানের এক প্রান্তে রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপের নীচে সপরিষদ রাজকুমারী উপবিষ্ট। উৎসবের আঙ্গিক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে।

যাযাবরের বেশে-সজ্জিত একদল সুদর্শন বালক এসে অভিনন্দন জানাল রাজকুমারীকে। এরা সকলেই অভিজাত বংশের সন্তান, রাজ-কুমারীকে ঘিরে আরম্ভ করে দিল পথ চলার এক গান। কিশোর কণ্ঠের সুমিষ্ট সঙ্গীত ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, ছোট্ট মাথাটি লীলা ভরে দুলিয়ে রাজকুমারী তাদের বিদায় দিলেন। এবার দেখা গেল রাজকুমারীর দিকে ছুটে আসছে আরোহীশূন্য এক কাঠের ঘোড়া। তার লৌহক্ষুরের শব্দে সভাতল প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সকলে শিউরে উঠল। কিন্তু কি আশ্চর্য! চকিত রাজকুমারীর সামনে ঘোড়াটা গেল থমকে, তার পিঠের ঢাকনা খুলে বেরিয়ে এল সূর্যনগরের কিশোর রাজকুমারের হাসি ভরা মুখ। হাততালির শব্দে সভাস্থল হল মুখরিত।

তারপর রঙ্গমঞ্চে একে একে আবির্ভূত হল এক যাদুকর সাপুড়ে আর একদল নর্তকী। রাজকুমারীর হাসি মুখ একটি বারের জন্য ম্লান হল,—সাপুড়ে যখন তার ঝুড়ির ঢাকনা

খুলে দিল। তিনি ভয়ে জড়িয়ে ধরলেন সূর্যনগরের রাজকুমারকে। আর সাপুড়ে যখন গলায় সাপ জড়িয়ে ভিক্ষা চাইল ছেলেমেয়েদের কাছে, তারা ভয়ে কেঁদে ফেলল।

উৎসবের তালিকা প্রায় সাঙ্গ হয়ে এল। সকলের শেষে আরম্ভ হল এক বামনের নাচ। বামন কোথা থেকে এসেছে কে জানে। দেড় হাত লম্বা তার দেহ, মুখখানি অর্ধেক ঢেকে ফেলেছে লম্বা চুল ও দাড়ি গোঁফে। বাঁকা পা ফেলে হেলে দুলে বামন এসে দাঁড়াল ছেলেমেয়েদের সামনে। হাসির ধুম পড়ে গেল সভায়। রাজকুমারী হেসে গড়িয়ে পড়ছিলেন, থেমে গেলেন ধাত্রীর ধমকে,—সাধারণের মাঝখানে রাজকুমারীর অত জোরে হাসা উচিত নয়!

বামনের পরিচয় পাওয়া গেল অবশেষে। শহরের শেষ প্রান্তে বাস করে এক কয়লাওয়ালা। তারই ছেলে এই বামন। শহরের বাইরে শিকারে গিয়েছিলেন মন্ত্রী ও সেনাপতির ছেলে। রাজকুমারীর জন্মদিনে তাঁকে আনন্দ দেওয়ার জন্য তারা ধরে এনেছে এই বামনকে। এই কদাকার ও অকেজো ছেলের বিনিময়ে কিছু টাকা পেয়ে কয়লাওয়ালাও হয়েছে খুশী।

বামন কিন্তু নিজের কুৎসিত আকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। উৎসব উপলক্ষে তার অঙ্গে উঠেছে লাল রঙের একটা পোষাক, গলায় ঘাসের বীজের মালা। সে যেন চাইছে নূতন আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মানিয়ে নিতে। ছেলেমেয়েদের হাসির সঙ্গে সেও শুরু করে দিল অট্টহাসি, নাচের শেষে ডিগবাজি খেয়ে সে দাঁড়াল মস্ত এক সেলাম ঠুকে। সে যেন তাদেরই একজন, সুন্দর সুকুমার দেহ, প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল নয়! বামন সবচেয়ে মুগ্ধ হল রাজকুমারীকে দেখে। নৃত্যগীতের অবসরে একটিবারও সে চোখ ফেরায়নি রাজকুমারীর মুখের উপর থেকে, তার সমস্ত সত্তা যেন চাইছে ঐ কিশোরীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে। রাজকুমারী খোঁপা থেকে গোলাপটা তুলে ছুড়ে দিলেন বামনের গায়ে। ফুলটি মাথায় ঠেকিয়ে বুকে গুঁজে বামন নতজানু হয়ে বসল রাজকুমারীর সামনে। তার আকর্ণবিস্তৃত মুখে হাসি ফুটে উঠল, ক্ষুদ্র চোখে উজ্জ্বল আনন্দের আভাস দেখা দিল।

রাজকুমারীর সকল গাম্ভীর্য ভেসে গেল হাসির এক প্রবল বন্যায়। ধাত্রীকে বললেন—বামনকে আর একবার নাচতে বল ধাইমা।

সস্নেহে ধমকে উঠল ধাত্রী—দেখছ না বেলা হয়েছে কত! রোদে বেশীক্ষণ থাকলে রঙ তোমার কাল হয়ে যাবে। মহারাজ বলে পাঠিয়েছেন, খাবার ঘরে তিনি অপেক্ষা করছেন তোমাদের জন্য।

ঠিক হল মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের পর বামন আর একবার নাচের কসরৎ দেখাবে রাজকুমারীর সম্মুখে। মিষ্টি গলায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজকুমারী সঙ্গীসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

রাজকুমারীর উপহার সাদা গোলাপটি বুকে চেপে বামন বসেছিল চন্দ্রাতপের নীচে। মন্ত্রিপুত্র এসে বললেন—রাজকুমারী খুশী হয়েছে রে, আর একবার তোকে নাচতে হবে তাঁর সামনে। মুচকি হেসে মন্ত্রিপুত্র প্রস্থান করলেন।

দুঃসহ আনন্দে বামন যেন ভেঙে পড়ল। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে সারা বাগানময় সে বেড়াতে লাগল ছুটোছুটি করে। প্রচণ্ড সূর্যকিরণে পুষ্পোদ্যান মলিন হয়েছে। রজনীগন্ধার ঝাড়ে একটা বিবর্ণ অসহায় ভাব। কী একটা উন্মত্ত ব্যাকুলতা গোলাপের কোমল পাপড়ির বুকে। গর্বোন্নত মস্তকে বামন পাদচালনা করছে ফুলের বাসরে। অবশেষে সে এল সাদা গোলাপ গাছের কাছে। দুহাত ভরে সে সাদা গোলাপ তুলল। রাজকুমারী ভালবাসে। নাচের শেষে সে স্বহস্তে রাজকুমারীকে উপহার দেবে এই ফুলের ডালা।

বামন কিন্তু বুঝতে পারল না, কত অসুন্দর দেখাচ্ছে তাকে সৌন্দর্যের এই পশরার মাঝখানে। গোলাপের মুখে ভাষা থাকলে তার ভাগ্যে সেদিন তিরস্কার জুটত নিশ্চয়ই। মূক প্রকৃতি মুখর হয়ে উঠত—ওহে বাপু কয়লাওয়ালার কদাকার ছেলে, তুমি ফিরে যাও তোমার সেই কয়লার আস্তানায় রাজপ্রাসাদে তোমার স্থান নেই। দোয়েল পাপিয়া তাকে দেখে ভয়ে উড়ে গেল গাছের উপরের শাখায়, কাঠবিড়ালী সঙ্কুচিত হয়ে লুকোল গাছের কোটরে।

পৃথিবীর এই রূপের সঙ্গে বামন অপরিচিত। সে জানত না, জগতে এত রূপ-রস-গন্ধ আছে। ফুল দেখতে দেখতে তার মনে হল রাজকুমারীর কথা। এর চেয়ে সুন্দর সে আর কিছু দেখেনি, ফুলের চেয়েও সুন্দর। প্রবল একটা ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসল, রাজকুমারীর কাছে যেতে হবে এখনি। কিশোরীর সামনে নতজানু হয়ে আর একবার সে দেখবে তাঁকে প্রাণভরে। মৃদু হেসে রাজকুমারী হয়ত চিরকালের জন্য তাকে গ্রহণ করবেন তাঁর ক্রীড়াসঙ্গীরূপে। প্রতিদানে সে উজাড় করে দেবে নৃত্যগীতের পূর্ণ ভাণ্ডার। বিদ্যা ত তার কম জানা নেই! পশুপক্ষীর ডাক অবিকল নকল করবার ক্ষমতা তার আছে। সে জানে, বনের মধ্যে খরগোশ লুকিয়ে থাকে কোথায়, টিয়া আর ময়না নীড় বাঁধে কোন্ গাছের আড়ালে। রাতের বেলা নিঝুম রাজপুরীতে রাজকুমারীকে গল্প শোনাবার ভার থাকবে হয়ত তার উপর। ঘুমভরা অলস চোখে রাজকুমারী শুনে যাবে বনের বিচিত্র কাহিনী।

সুমিষ্ট কল্পনা কী একটা অপূর্ব চাঞ্চল্যে বামনকে বিভোর করে তুলল। দিনের শেষে একদিন রাজকুমারীকে নিয়ে বনে বেড়াতে যাবে সে। খেলবে তারা চাঁদের আলোয় লুকোচুরি খেলা। তারপর শেওলাভরা দীঘির ঘাটে তারা বসবে, শ্রান্ত দেহ এলিয়ে দেবে নরম ঘাসের গায়ে।

কিন্তু রাজকুমারী কোথায়? চারিদিকে ভরা দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্র, রাজপ্রাসাদের কক্ষে কক্ষে বিরাজ করছে রজনীর নিস্তব্ধতা। প্রতিটি দুয়ার হয়েছে রুদ্ধ, জানালায় ঝুলছে ভারী পরদা। অনেক অনুসন্ধানের পর বামন প্রাসাদে প্রবেশ করল ছোট একটি গুপ্ত দরজা দিয়ে।

ভিতরের সৌন্দর্যে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল সে। কী সুন্দর! এর ঔজ্জ্বল্যতায় বনের শোভাও যেন ম্লান হয়ে যায়। সম্মুখেই একটা হল, পালিশ-করা দেওয়াল দিয়ে মোড়া। রঙ-বেরঙের প্রস্তরখণ্ডে ঘরের মেঝে ধারণ করেছে অপূর্ব শ্রী। সুন্দরের এই সমারোহে নেই শুধু সুন্দরী রাজকুমারী। চার কোণ থেকে চারটে শ্বেত প্রস্তরের পরীমূর্তি বামনকে যেন বিদ্রূপ করতে লাগল।

ঘরের একদিকে ঝুলছে একটি তারকা-খচিত ভেলভেটের পর্দা। অন্তরালে রাজকুমারী লুকিয়ে আছে হয়ত। চুপি চুপি পর্দা সরিয়ে বামন হতাশবাস হল। কোথায় রাজকুমারী! ওপারে আর একটি ঘরের লোভনীয় দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দেওয়ালের গায়ে মনোরম চিত্রসম্ভার, দেশবিখ্যাত শিল্পীদের বর্ষব্যাপী সাধনার ধন। এই ঘরে রাজা তাঁর মন্ত্রণা-পরিষদ আহ্বান করেন। মন্ত্রীদের পদমর্যাদা অনুযায়ী সারি সারি চেয়ার সাজান; মাঝখানে কারুকার্যখচিত রাজ-সিংহাসন।

বামন দেখছে দিশেহারা হয়ে; চোখে তার পলক পড়ছে না। দুর্নিবার কৌতূহল উৎখাত হয়ে নিরর্থক একটা ভয়ের ভাব এসে অধিকার করছে তার মনকে, পা যেন হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছে চলার ক্ষমতা। তার সম্মুখে একখানি শিকারের ছবি, শিকার অনুসরণ করে অশ্বারোহণে ছুটে চলেছে উন্মত্ত শিকারীর দল—বামন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ক্ষুর-ঘর্ষণের ছন্দময় ধ্বনি! কি একটা অজানা আশঙ্কায় সে শিউরে উঠল।

কিন্তু সাহস তার ফিরে এল রাজকুমারীর কথা মনে হতেই। তাঁকে সে পেতে চায় নিভৃত গৃহকোণে, একবার শুধু চুপি চুপি বলবে—আমি তোমাকে ভালবাসি। রাজকুমারীর সন্ধানে নরম কার্পেটের উপর দিয়ে বামন ছুটে গেল আর একটা ঘরে, কিন্তু এ-ঘরও শূন্য।

সকলের সেরা হল এই ঘরটি। মাথার

উপরে সুবর্ণখচিত চন্দ্রাতপ, জানালার গায়ে গায়ে গাঢ় রক্তবর্ণ পরদার সমারোহ। দেওয়ালে রাজবংশের প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন, তলোয়ার ও বর্মের ঔজ্জ্বল্যে চোখে ধাঁধা লাগে। এই গুরুগম্ভীর সৌন্দর্য বামনকে একটুও বিচলিত করল না। রাজকুমারীর দেওয়া গোলাপ ফুলটি আর একবার বুকে চেপে ধরল সে। প্রাসাদের মণি-মুক্তার ভাণ্ডারও এর প্রতিটি পাপড়ির তুলনায় নগণ্য।

মধ্যাহ্ন-সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। অলিন্দে অলিন্দে নেমে এসেছে বিকালের ছায়া। প্রতি মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠছে বামন। রাজকুমারীর দেখা পেলে এখনি সে তাঁকে নিয়ে যাবে পরিচিত বনের ধারে। প্রাসাদের আবদ্ধ হাওয়া হাঁপিয়ে তোলে সারা প্রাণকে, আর বনের হাওয়া—কী সরস! প্রাণ যেন উধাও হয়ে যায় মুক্তির আনন্দে! চারিদিকে রোদের ঝিলিমিলি, আর পাতায় পাতায় বাতাসের শিহরণ! আর আছে সেখানে বনকুসুমের বাহার, বনদেবীর অঙ্গে চিরবসন্তের সুবাস। সার্থক হত বনানীর মহিমা, শুধু একবার কমলনগরের রাজকুমারী যদি সেখানে পদার্পণ করতেন। চিন্তায় বিভোর বামনের মুখে দেখা দিল মৃদু হাসি, চঞ্চল চরণে সে পাশের ঘরে প্রবেশ করল।

এ-ঘরটি আসবাবপত্রে বোঝাই। চার কোণে চারটি রুপোর গাছ, শাখে শাখে রুপোর পাখী ও ফুল। কিন্তু এ-ঘরে বামন একা নয়। সে লক্ষ্য করল, শেষপ্রান্তে ক্ষুদ্র একটি মূর্তি তাকিয়ে আছে তারই দিকে। রাজকুমারী নিশ্চয়! বুক কাঁপতে লাগল বামনের, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অস্ফুট হর্ষধ্বনি। কোনরকমে আত্মসম্বরণ করে সে এগিয়ে গেল।

কিন্তু দেখার ভুল হয়েছে তার। এ ত রাজকুমারী নয়, বিকটাকার এক মানবমূর্তি। এরূপ কুৎসিত আকার জীবনে এই প্রথম দেখল। সাধারণ মানুষের চেহারার সঙ্গে কোন মিল নেই এর, সরু বাঁকা দুখানি পায়ের উপরে কদাকার একটি মুখের ছাঁচ বসানো। বামনের সঘৃণ ভ্রূকুটির প্রত্যুত্তরে মূর্তিও ভ্রূভঙ্গি করল। হেসে গড়িয়ে পড়ল বামন; কিন্তু কি আশ্চর্য, মূর্তির মুখেও হাসি! ভারী মজার ব্যাপার মনে হল বামনের। দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করল সে মূর্তির দিকে। তুষারশীতল মূর্তির হাত, স্পর্শে সে চমকে উঠল। সে চেষ্টা করল মূর্তিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করতে; কিন্তু কি একটা মসৃণ কঠিন পদার্থের ব্যবধান তার সকল উদ্যম বিফল করে দিল। মূর্তির কদাকার মুখ এগিয়ে এসেছে বামনের আরও কাছে, কী একটা আতঙ্কের ছাপ তার মুখে! মুখভঙ্গি করল মূর্তিকে, বারংবার মুষ্ট্যাঘাতে হাতের চামড়া ছিঁড়ে রক্ত পড়তে লাগল; আর মূর্তি তাকে সকল লাঞ্ছনা ফিরিয়ে দিল যেন ব্যঙ্গ করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্থির হয়ে দাঁড়াল বামন।

কে এই কদাকার মূর্তি? এক মুহূর্ত চিন্তা করে ঘরের চারিদিকে তাকাল সে। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস দেখা যাচ্ছে এই মসৃণ কঠিন পদার্থের ভিতরে। এরই মধ্যে ফুটে রয়েছে রুপোর গাছে রুপোর ফুল। ঘরের মধ্যে রভসে আকুলা নারীমূর্তি দ্বিতীয় কলেবর পরিগ্রহ করেছে এই পদার্থের ভিতরে।

চিন্তিত মনে বামন রাজকুমারীর উপহার শ্বেত গোলাপটি বুক থেকে তুলে চুম্বন করল। কদাকার মূর্তির হাতেও অবিকল সেই রকম একটি গোলাপ, তারই মত মূর্তি কোমল পাপড়ি চেপে ধরেছে মুখে বুকে। কী বীভৎস দেখাচ্ছে মূর্তিকে!

এতক্ষণে প্রকটিত হল এই ভীষণ সত্য। সকরুণ আর্তস্বরে মাটিতে লুটিয়ে বামন কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। এই কদাকার মূর্তি তারই। এই বিকটদর্শন মুখমণ্ডল, বক্র পদযুগল—এ সবের মালিক সে স্বয়ং, আর কেহ নয়। তাই না সকাল বেলার অনুষ্ঠানে তার নৃত্যগীত ছেলেমেয়েদের সভায় হাসির ঝড় তুলেছিল। সবচেয়ে বেশী হেসেছিলেন রাজকুমারী সুজাতা। সাদা গোলাপটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল বামন। ক্ষণিকের জন্য শুধু তার মনে হল কয়লাওয়ালার ধূলিধূসরিত কুটীরপ্রাঙ্গণ আর শেওলাভরা দীঘির ধার—বিকালের ছায়া বনভূমির সকরুণ শ্রী!

পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমা
আয়ুর্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করুন এবং
বৎসর পর্যন্ত আপনার পাকা চুল কালো রাখ
আপনার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হইবে এবং মাথা
সারিয়া যাইবে। অল্প সংখ্যক চুল পাকিলে
টাকা মূল্যের এক শিশি বেশী পাকিয়া থাকি
৩৷৷০ মূল্যের এক শিশি, যদি সবগুলিই পাকি
থাকে, তাহা হইলে ৫, টাকা মূল্যের এক শি
তৈল ক্রয় করেন। ব্যর্থ হইলে দ্বিগুণ মূ
ফেরত দেওয়া হইবে।

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবলে কয়েক দিন এই ঔ
প্রয়োগের পর আশ্চর্যজনক ফল দেখা যায়।
ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই ভয়াবহ ব্যাধির হ
হইতে মুক্তিলাভ করুন। সহস্র সহস্র হা
ডাক্তার, কবিরাজ বা বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক ব
হইয়া থাকিলেও ইহা নিশ্চয়ই কার্যকরী হইবে
১৫ দিনের ঔষধের মূল্য ২৷৷০ আনা।

বৈদ্যরাজ অখিলকিশোর রায়
নং ১০৪, কাতরাসরাই, গয়া।

শক্তির
মৃতসঞ্জীবনী
অধ্যক্ষ মথুর বাবুর
শক্তি ঔষধালয় · ঢাকা
ভারতের শ্রেষ্ঠতম আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান · প্রতিষ্ঠিত: ১৯০১



অশ্বত্থের অভিশাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ষষ্ঠ খণ্ড

১

বাঙলা দেশের গ্রামগুলির কি যেন এক মোহিনী শক্তি আছে। মানুষকে যে এই গ্রামগুলি আকর্ষণ করিতে শুরু কেহ বলিতে পারে না, হঠাৎ এক সময়ে আবিষ্কার করিয়া বসে যে, সে বন্দী। লি যে অবিমিশ্র ভালো এমন বলিতেছি লোর কি মোহিনী শক্তি থাকে? নর মোহিনী শক্তি কি দেবদূতে আছে? যাদু কি খাদ্যে সম্ভব? স্বর্গের ল পৃথিবী কোথায় পাইবে? বাঙলার ল শয়তানের উচ্ছিষ্টীকৃত স্বর্গ। স্বর্গই, হাতে শয়তানের হাত পড়িয়াছে, অমৃতই, হা উচ্ছিষ্ট।

ুষকে মহৎ সংকল্পচ্যুত করিতে এমন টি আর নাই। উদ্যম হইতে আলস্যে, হইতে শৈথিল্যে, জাগরণ হইতে স্বপ্নে, হইতে বায়বীয়ে, প্রচেষ্টা হইতে নৈষ্কর্মে রিতে সত্যই এমন দ্বিতীয়টি আর কিন্তু তাই বলিয়া কি গ্রামগুলির দোষ স্বর্গে যে শয়তান প্রবেশ করিয়াছিল, স্বর্গের দোষে নহে। বাঙলা পল্লী- মজা পুষ্করিণীগুলি এখন ম্যালেরিয়ার কন্তু তাই বলিয়া যে সব পরোপকারী ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কি দোষ য়? দোষ যারই হোক, দোষ যতই ন মোহকর বস্তু জগতে বুঝি আর

াম-কাঁঠালের বাগানে ঘেরা, শটি-ভাটির পূর্ণ, মজ্জিতপ্রায় নদী সরোবরের প্রকৃতি যেখানে প্রবল, মানুষ র্বল, দিবাভাগ যেখানে রাত্রির চেয়ে র রাত্রি যেখানে চন্দ্রালোকের ঐশ্বর্যে চেয়েও প্রোজ্জ্বল, বন যেখানে গৃহ- গৃহস্থ যেখানে পোষমানা, গবাদি দাম, শ্বাপদ যেখানে স্বাধীন, ঙা-কাক, চোখ গেল ও বউ কথা , কোকিল, ঘুঘু, হুতুম ও বাদুড়; পিয়া, শিয়াল, সজারু, নেউল, নেকড়ে াপদ—সকলেই এই মোহিনী মায়ার সঞ্চারী ভাব—ইহাকে সঞ্চারিত করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া মানুষের মনের দিকে বিতানিত করিয়া দিতেছে।

শহরের লোকে গ্রামের এই রহস্যের কথা অবগত নয়। যারা অতিথির মতো এখানে আসে, দু'রাত্রির জন্য আসে, কেবল দেখিবার জন্য আসে, তাহারা এ রহস্যের কথা জানিতে পায় না। কিন্তু দু'রাত্রির স্থলে তিন রাত্রি হইলেই মোহিনী তাহার ক্রিয়া শুরু করিয়া দেয়। মানুষে যখন সচেতন হইয়া ওঠে, তাহার অনেক আগেই সে বন্দী।

এই যেমন নবীননারায়ণ দুদিনের জন্য জোড়াদীঘিতে আসিয়াছিল; কিন্তু আর কি সে ফিরিতে পারিবে? এখন কি সে সম্পূর্ণ-ভাবে পরায়ত্ত নহে? কোন কোন বন্যবৃক্ষ আছে নিকটস্থ প্রাণীকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করে। ক্ষুধিত পাষাণের দোসর, ক্ষুধিত প্রকৃতি এই গ্রামগুলি। সেই ক্ষুধিত প্রকৃতির বন্দী নবীননারায়ণ।

তাহার কলিকাতা বাসের মহৎ সংকল্প এখানে আসিয়া কক্ষচ্যুত, এমন কি সদরে গিয়া স্থির করিরা ফেলিয়াছিল, গ্রামে ফিরিয়াই অতীতের সমস্ত জের চুকাইয়া দিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে—সেই শুভ সংকল্পও টিকিল না, কেমন বানচাল হইয়া গেল।

প্রাচীন প্রাসাদের মতো প্রাচীন পল্লী-গুলিরও একটি ব্যক্তিত্ব আছে, সে ব্যক্তিত্ব সর্বনাশকর, সে ব্যক্তিত্ব মায়ামোহকর, সে ব্যক্তিত্বের প্রভাব মানুষকে অতলগর্ভ অতীতের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। গীতায় প্রোক্ত সৈন্যশ্রেণী যেমন প্রাণহীন, গ্রামগুলিও তেমনি অতীতজীবী। বাঙলা দেশের আকাশেই পাশাপাশি দুই কাল বিরাজমান, গ্রামের অতীতাকাশ, শহরের বর্তমানাকাশ, যে কোন লোক ইচ্ছা করিবামাত্র গ্রাম হইতে শহরে গিয়া পাঁচশ' বৎসর অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে, যে কোন লোক ইচ্ছা করিলে শহর হইতে গ্রামে গিয়া পাঁচশত বৎসর পিছাইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত পরীক্ষা বিপজ্জনক। নদী-স্রোতের অন্তর্গত 'দহে' পড়িলে যেমন উদ্ধার পাওয়া কঠিন, কালস্রোতের এই অতীতগর্ভ 'দহ'গুলিও তেমনি বিপদে পূর্ণ। পড়িলে ওঠা কঠিন। কতজনে পড়িয়াছে আর উঠিতে পারে নাই। নবীননারায়ণ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পারিল না। পুঞ্জীভূত অতীতের স্মৃতি পাষাণের ভারের মতো তাহাকে তলাইয়া লইয়াই চলিল।

২

সদরের মামলা মিটিয়া গেলে নবীননারায়ণ ও মুক্তামালা জোড়াদীঘিতে ফিরিল। নবীন স্থির করিয়াছিল যে, যেমন করিয়াই হোক, ক্ষতি স্বীকার করিয়াই হোক, আর অপমান সহিয়াই হোক, অতীতের ভুলভ্রান্তির জের চুকাইয়া দিয়া তাহারা কলিকাতা ফিরিয়া যাইবে। প্রথমেই যে কাজটি সে করিয়া বসিল, জোড়াদীঘির শাসন-নীতিতে তাহা অভাবিত। নবীন সরাসরি কীর্তিনারায়ণের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইল। কীর্তি তখন প্রশস্ত ফরাসের উপরে তাকিয়া আশ্রয় করিয়া গড়াইতেছিল। পদশব্দ শুনিয়া বলিল—কে, দুর্গাদাস নাকি?

কেহ উত্তর দিল না। তখন সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—নবীন যে! সে শুনিয়াছিল যে, নবীনরা গ্রামে ফিরিয়াছে; কিন্তু সে যে তাহার বাড়িতে আসিবে, কিছুতেই কল্পনা করিতে পারে নাই। সে উঠিয়া বসিল—কিন্তু কি কথা বলিবে ভাবিয়া পাইল না। নবীন ফরাসের উপরে বসিল। কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। নবীন ভাবিল, কি করিয়া আরম্ভ করিবে। কীর্তি ভাবিল, নবীনের মতলব কি, কিভাবে তাহাকে সম্ভাষণ করিবে। দুজনেই নীরব। নবীন বুঝিল, আর অধিকক্ষণ কথা না বলিলে নীরবতা দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিবে—তখন আর কথা বলা সম্ভব হইবে না, হয়তো নীরবেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাই সে মনে মনে প্রবল একটা ধাক্কা দিয়া নীরবতা ভংগ করিয়া দ্রুত বলিয়া গেল—আমি আর মামলা মোকদ্দমা চালাবো না। যত ক্ষতি স্বীকার করতে হয় আমি রাজী আছি, আপনার কি কি চাই বলুন।

কীর্তি এমনতরো প্রস্তাব জীবনে শোনে নাই। সে ভাবিয়া পাইল না, ইহা বিদ্রূপ না সত্য? সে চুপ করিয়া রহিল।

নবীন দ্রুত বলিয়া চলিল। ওই দ্রুতির দ্বারা ক্ষতস্থানকে যত শীঘ্র সম্ভব সে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে চায়। যাহা বলিতে কষ্টকর, অথচ না বলিলেই নয়, কোনওরূপে তাহা বলিয়া ফেলিবার এই প্রচেষ্টা। সে বলিতে লাগিল—জমিদারী করা, মামলা মোকদ্দমা করা আমার স্বভাবসংগত নয়। পরের উপকার হবে ভেবেছিলাম অশথ গাছটা কাটলে—কিন্তু ফলে দেখছি পরের উপকার দূরে থাক্—নিজের

অপকারের অন্ত নেই। একটা মামলা থেকে আর একটা মামলার সৃষ্টি হচ্ছে, অর্থব্যয় আর মানসিক অশান্তির অবধি নেই। এ রকম ক'রে দীর্ঘকাল চালানো......না, এ আমার দ্বারা হবে না। যেমন করেই হো'ক, সব মিটিয়ে দিয়ে আমি পালাতে চাই। আপনার কি কি দাবী আছে বলুন, আমি সব স্বীকার করে নিয়ে দলিল করে দিচ্ছি।

নবীনের কণ্ঠস্বরে ও মুখের ভাবে সে যে সত্য কথাই বলিতেছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মাত্র করিতেছে না, কীর্তি বেশ বুঝিতে পারিল। আর সে যে অবনতি স্বীকার করিয়া অযাচিত-ভাবে তাহার বাড়িতে আসিয়াছে—তাহার আন্তরিকতার ইহাই তো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কীর্তি সমস্তই বিশ্বাস করিল—কিন্তু কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

নবীন অনেকক্ষণ ঝোঁকের মাথায় বকিয়া থামিল। এসব ব্যাপারে মুস্কিল এই যে, একবার থামিলে পুনরায় আরম্ভ করা কঠিন—সূত্রপাতের চেয়ে অনেক বেশী কঠিন। বিশেষ সে তো অনেক কিছু বলিয়া ফেলিয়াছে—এখন উত্তরের আশা সে করিতে পারে।

কিন্তু কীর্তিনারায়ণ পূর্ববৎ নীরব। তাহার ইচ্ছা কিছু বলে এবং দু'চারটা সময়োপযোগী ভালো কথাই বলে। তাহার ইচ্ছা বলে যে, ভায়া আমিও আর গোলযোগ করিতে চাই না, আমারও ক্ষতি বড় কম হয় নাই, অনেকদিন হইতেই সব মিটাইয়া ফেলিবার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু পাকচক্রে পারিয়া উঠিতেছি না। এখন তুমি আসিয়াছ, ভালোই হইয়াছে, কাহারো যাহাতে আর অধিক ক্ষতি না হয়, এসো এমন একটা আপোষ করিয়া লই। কিন্তু কথাগুলি সে মুখে বলিতে পারিল না, ভাষার উপরে তেমন দখল নাই বলিয়া, তাহা ছাড়া তাহার অভ্যাসও একটা অন্তরায়। কীর্তি-নারায়ণ সাধু প্রকৃতির লোক নহে; কিন্তু কোন অসাধুই ষোল আনা অসাধু নহে। তাহার প্রকৃতির মধ্যে এখনো সাধুতার দু'চারিটি সূতা আছে; কিন্তু অভ্যাসে সে অবিমিশ্র অসৎ। সেই অভ্যাস এখন তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাহার অভ্যাস নাই কাহাকেও মুখে মধুর কথা বলিবার—প্রকৃতির মধ্যে সাধুতার আবেদন থাকিলেও অভ্যাস তাহার পথ করিয়া দেয় না।

কিন্তু অনেকক্ষণ হইল নবীননারায়ণ নীরব, কিছু না বলিলে সে হতাশ হইয়া চলিয়া যাইতে পারে, আপোষের এমন অযাচিত সুযোগ নষ্ট হইবে। কাজেই কীর্তি একবার নড়িয়া বসিল; গোটা দুই পান মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল। এইভাবে ভাষার পথকে আরও বিঘ্নিত করিয়া বলিল—আপত্তি কি! আপোষ......... আচ্ছা। বেশ তো ভালই।

নবীন বলিল—তাহলে আপনার সম্মতি আছে বলে ধরে নিলাম।

কীর্তি বলিল—তা এক রকম বই কি।

নবীন তাহাকে আর আয়াস স্বীকার করিতে বাধ্য করিল না। যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়াছিল, তেমনি অতর্কিতে প্রস্থান করিল, যাইবার সময়ে বলিয়া গেল—তাহলে আপনি একটু ত্বরা করবেন।

নবীন প্রস্থান করিলে কীর্তি আবার শুইয়া পড়িল। এইটুকু মানসিক পরিশ্রমেই সে ঘামিয়া উঠিয়াছিল, হাঁকিল—বাতাস।

পাংখাওয়ালা দূরে সরিয়া গিয়াছিল স্বস্থানে আসিয়া জোরে পাখা টানিতে লাগিল।

* * *

অল্পক্ষণের মধ্যেই কথাটা উভয় শরিকের কর্মচারী মহলে প্রচারিত হইয়া গেল এবং তাহারা সমূহ বিপদের আশঙ্কায় হতাশ হইয়া পড়িল। বাবুদের মধ্যে 'কাজিয়া' লাগিয়া উঠিলে তাহার প্রত্যক্ষ সুফল ভোগ যাহারা করে, কর্মচারিগণ তাহাদের অন্যতম ও প্রধান। তাহাদের বিশ্বাস ছয় টাকা বেতনে মুহুরিগিরি ও পঁচিশ টাকা বেতনে নায়েবী করিবার জন্য তাহারা দুর্লভ মানব-জন্ম গ্রহণ করে নাই। তবু যে এমন কাজ করিতে হয়, তাহা কেবল মামলা মোকদ্দমা বাধিবে এই আশায়। তখন বাবুদের টাকার থলি শরৎ-প্রভাতের পূর্ণ বিকশিত পদ্মের মতো আপনি উন্মোচিত হইয়া গিয়া স্বর্ণরেণু উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, সুধা-গন্ধের আমন্ত্রণে দিগ্বিদিকের ভ্রমর দল লুব্ধ হইয়া ছুটিয়া আসে। সেই শুভ প্রভাতের আশ্বাসেই বাবুদের কর্মচারীর দল এত কষ্ট স্বীকার করে। সাধারণ সময়ে যে বাবু মাছের দাম চার আনা বেশী লাগিলে তর্জন-গর্জনের অবধি রাখেন না, মামলা বাধিয়া উঠিলে তিনিই একখানা জাবেদা নকলের জন্য ষোল টাকা এবং চোরাই নকলের জন্য ততোধিক ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। লড়াইয়ের আসল অস্ত্র সোনার গুলী, নিতান্ত প্রাকৃত জনেই মাত্র লাঠি বন্দুকের উপরে ভরসা রাখে।

হজাড়াদীঘির বাজারে জগু সরকারের দোকান-ঘরে সন্ধ্যাবেলা উভয় শরিকের কর্মচারী ও তদ্বিরকারকদের একটি জয়েণ্ট মিটিং বসিয়াছে। মিটিংয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য কি করিয়া বাবুদের আপোষের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দেওয়া যায়। এই গতকল্যও যাহারা বাবুদের বিবাদের সূত্রে শত্রু ছিল, আজ তাহারা পরম মিত্রভাবে পরামর্শে নিযুক্ত। ইহাতে এইটুকু মাত্র প্রমাণ হয় যে, কেহ কাহারও শত্রু হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, সবই অবস্থাচক্রের ফের।

নীলাম্বর ঘোষ দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তামাকু সেবন করিতেছে—বাকী সকলে নীরব। নীরবতার কারণ আর কিছুই নহে, এই মাত্র তিনি একটি গীতার শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সবই মায়া। শ্লোক মাহাত্ম্যে সকলে নীরব, কিন্তু উক্ত শ্লোক 'ছ আনির নায়েব যোগেশের পক্ষে 'টিয় এর কাজ করিয়াছে। সমস্তই মায়া হই গৃহিণীও মায়া—ইহাই স্মরণ ক নীরবে অশ্রু ফেলিতেছে।

এমন সময়ে নীলাম্বর ঘোষ এক খুলিল। সকলে বুঝিল, খুড়ো কিছু উদ্যত হইয়াছেন।

নীলাম্বর ঘোষ আরম্ভ করিল—হুঁ, কিছুতেই হতে দেবো না। দেখো তোম কিছুতেই হতে দেবো না।

তারপরে সরোষে সবিস্ময়ে বলিল- আপোষ। এমন অধর্ম ভগবৎ-গীতার কখনো হতে পারে না। স্বয়ং ভগবান ছিলেন? অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর লড়া দিয়ে একটা সৈন্য জীবিত থাকতেও থামতে দেন নি। এমন কি ইচ্ছা ভীষ্মদেব তাঁকেও তো মৃত্যু স্বীকার হয়েছিল। আর সেই দেশে কিনা- মাঝপথে দুইপক্ষে আপোষ হয়ে যায়।

বদ্যিনাথ অল্পবয়স্ক, কিন্তু বেশি ব সে বলিল; কিন্তু খুড়ো, বাবুদের এই সঙ্গে গীতার সম্বন্ধ স্থাপন করা কি উ

খুড়ো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—কেন কি শিকেয় তুলে রাখবার জন্যে? হুঁ আমার কাজে, যদি না লাগলো, তব অর্থ কি? হুঁ, আমার ক্ষেতে এবার ফলন হবে, তা ওই মহাভারতে লিখ নতুবা অতবড় মহাভারত মানুষে সহ্য কেন? হুঁ।

যোগেশ বলিল—যা নেই এ ভার নেই এ ভারতে।

নীলাম্বর নিজের সমর্থন পাইয়া বলিল—হুঁ। কিন্তু হুঁকায় টান দি কেবল জল মাত্র উদ্গত হইলে বুঝিতে ধর্ম ব্যাখ্যার সুযোগে ঘাড়টান পঞ্চানন তুলিয়া লইয়াছে। কাজেই খুড়ো উদারভাবে হুঁকাটা অন্য একজনের দিকে করিয়া দিয়া বলিল—নাও, তবুও পঞ্চাননকে দিল না। নারায়ণ ও সেনার মতো হুঁকা ও কল্কে দুইপক্ষে পৃথকভাবে বণ্টিত হইল। নীলাম্বর যে মহাভারত পড়ে নাই।

এবারে নীলাম্বর ঘোষ এক চোখ চিন্তা করিতে করিতে অপর চোখ শ্রোতাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিল—হুঁ, দেখো না কি গ্রহ! আমি পীতু আর দিগুকে দুইজনকে দ জুটিয়ে দিলাম যে দু'জনের চেষ্টায় তাড়াতাড়ি এগোবে—কিন্তু......হুঁ! কাজ জানই তো! ওই যে পূব দিকের তিন খানা ফেলে দিয়ে দালান গাঁথতে করেছিলাম। তা অনেকটা এগিয়েছে, দিকের দেয়াল গাঁথা শেষ, এখন কেবল

ই হয়। হুঁ! আমার পীতু আর দিগম্ নেই বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। পেতোও আবার তেমনি সমস্তই বুড়ো বাপের দিত। যেদিন শুনলাম যে, পীতুর সাক্ষ্যে পক্ষের উকিল একটাও সূচ ফেটাতে নি, সেদিন কি আমার আনন্দ! আদালত- সেদিন ওই একমাত্র বলা-কওয়া! হাঁ, ী দিচ্ছে বটে নীলাম্বর ঘোষের বেটা! কারো তো সাহস হল না যে বলে মিথ্যা ই।

জগৎ সরকার এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়াছিল, খরচ ও বাজে কথার লোক সে নয়। র সে বলিল—সে কথা ঠিক ঘোষ মশাই, না সত্যি আসল সত্যির চেয়ে অনেক জৌলুষদার।

নীলাম্বর বলিল—তাহোক! কিন্তু কেউ পরলো কি মিথ্যা বলে? তাহলেই হল! তাছাড়া সত্যি কথা আজকালকার দিনে কে বলছে? আমরা গরীব মানুষ, আমাদের ময়ে সত্যি বলতে গেলে চলবে কেন? ও বিলাসিতা বড়মানুষেরা করতে পারে! বলে আমি যে গুরু-পুরুতের কাছে বলি, এমন কোন্ শালা বলতে পারে।

পুরোহিতের উল্লেখে কেহ কেহ শুধাইল ী ঠাকুরের অনুপস্থিতির কারণ কি? সরকার বুঝাইয়া বলিল—ভট্টাচার্যের র বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি ও কালিশপুরে শার্দুল-স্বস্ত্যয়ন করতে েন। বোধ করি, আমাদের মিটিং র আগেই ফিরতে পারেন।

ীলাম্বর ঘোষ দুই হাত নাড়িয়া এবং খ খুলিয়া বলিল—দেখ তো কি গেরো। দি বাবুদের মধ্যে আপোষ হয়ে যায়, তাব আয়ের পথ বন্ধ। যে চারটা দেয়াল সমুখের বর্ষাতেই তা পড়ে যাবে। আমি ক করি?

নাথ বলিল—আপনি তো পণ্ডিত। যখন উপস্থিত, অর্ধ পরিত্যাগ করুন। র উপরে টিন বসিয়ে নিন! পুরো পাকা —অর্ধেকই বা ক'জনের হয়।

ব অর্বাচীন উক্তির কি উত্তর নীলাম্বর সে অপ্রসন্ন হইয়া চুপ করিয়া থাকিল। ণ্ডিত্যের জন্যই হোক আর উদারতার হোক নীলাম্বর তাহার মনের কথা বলিয়াছে। কিন্তু এই অভিযোগ তাহ াত্র নহে। উপস্থিত সকলেরই এই । প্রত্যেকেরই সাংসারিক উন্নতির না অর্ধপথে আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে। মুখে কেহ কিছু না বলিলেও সকলেই রর প্রতি—অর্থাৎ নিজের প্রতি তশীল। কেবল জগৎ সরকারের কোন াভের কারণ ছিল না। তৎসত্ত্বেও সে চাহে না—কারণ লোকটা বিনা কারণে তি চায় এবং পরের ক্ষতিতে আনন্দ পায়। পরের ক্ষতির প্রতি তাহার শিল্পীসুলভ কর্মফলহীন বিবিক্ত মনোভাব। এই জাতীয় লোকেরাই সংসারে সবচেয়ে মারাত্মক।

এবারে জগৎ সরকার মুখ খুলিল—বলিল —আপোষ হলে সকলেরই ক্ষতি, গ্রামের ছোট-বড় প্রধান পরামানিক কেউই আপোষ চায় না। কিন্তু আপোষ যাতে না হতে পারে, তার উপায় কি?

সকলে তাহার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিল—তার উপায় কি?

নীলাম্বর বলিল— এখন তোমরা সকলে আছ, একটা উপায় স্থির করে দাও, যাতে আমার দেয়াল চারটে—সামনের বর্ষায় না পড়ে যায়! বাবা, আমি নিতান্ত ছা-পোষা গরীব মানুষ, তাহলে মারা পড়বো।

জগৎ সরকার আবার বলিতে শুরু করিল —বাবুরা আপোষ করবেন করুন। কিন্তু তাদের হাত-পা তো আমরা—আমরা রাজি না হলে দেখি কেমন তাঁরা আপোষ করেন। তাঁরা আপোষ করবেন, আমরা আপোষ ভাঙবো।

এতক্ষণে আশার একটি রন্ধ্র দেখিতে পাইয়া নীলাম্বরের মুখের অপ্রসন্নতায় রজত-রেখা দেখা দিল। তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন—অর্ধসমাপ্ত ইষ্টকালয় সমাপ্ত হইয়াছে, আর তিনি সেই সুদৃঢ় কক্ষের বারান্দায় বসিয়া ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া গীতা পাঠ করিতেছেন।

জগৎ বলিয়া চলিল—এখানে দুই শরিকেরই নায়েব উপস্থিত। আপনারা নিজ নিজ লেঠেলদের হুকুম দিন, যাতে অপরের প্রজাদের উপরে লাঠিবাজি শুরু করে। আর ছোটবাবুর দরদ ওই ইস্কুলটার উপরে—তার উপরেও হামলা শুরু হোক। দেখবেন তখন আপোষ থাকে কোথায়? বড়বাবু ভাববেন ছোটবাবুর কাজ, ছোটবাবু ভাববেন বড়বাবুর! আবার শুরু হয়ে যাবে। আর অমনি খুড়োর ছাদটারও একটা সুরাহা হবে।

খুড়ো আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, লাফাইয়া উঠিয়া জগুর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন—বাবা জগন্নাথ, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, তোমার সোনার বাটখারা হোক বাবা। দেখো আমি যেন মারা না পড়ি।

সকলে জগন্নাথের বুদ্ধির সূক্ষ্মতায় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, কাজেই কিছুক্ষণ কাহারো মুখে বাক্‌স্ফূর্তি হইল না। প্রথমে কথা বলিল ঘাড়টান পঞ্চানন; সে বলিল—সরকার আজ তুমি আমাদের পাঁচ-পয়জার মারলে। আমি চল্লিশ বৎসর জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করছি —কই এসব বুদ্ধি তো আমার মাথায় আসেনি!

বলা বাহুল্য, জগুর কথায় এতগুলি হতাশ লোক নূতন আশার দিগন্ত দেখিতে পাইল। কলম্বসের নাবিক দলের যেন আমেরিকার তীরভূমি দর্শন ঘটিল। সকলেই তাহার ভূয়সী প্রশংসা আরম্ভ করিল।

জগৎ সেসব প্রশংসা গুরুর পদে সমর্পণ করিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিল—সকলই গুরুর কৃপা!

এমন সময়ে কেশরী ও শশাঙ্ক গৃহে প্রবেশ করিল। শশাঙ্ক বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল—তুমি ওইখানে মাথার বোঝাটা নামিয়ে একটু অপেক্ষা করো।

সকলে উঁকি মারিয়া দেখিল, একটি লোক মাথা হইতে সুবৃহৎ একটি বোঝা নামাইবার চেষ্টা করিতেছে।

নীলাম্বর ঘোষ শুধাইলেন—ঠাকুর এসব কি?

কেশরী বলিলেন—আর বলো কেন ভায়া! এসব আমার শশাঙ্কের কীর্তি। হাঁ, শাস্ত্র-অধ্যয়ন তার সার্থক হয়েছে বটে!

তারপরে নিজেকেই অভিনন্দিত করিয়া যেন বলিলেন—এমন ছাত্র কয়জনে পায়?

নীলাম্বর বলিল—কি তোমাকেও হার মানিয়েছে নাকি?

কেশরী বলিল—তাতে অগৌরবের কিছু নেই—কারণ শাস্ত্রেই কথিত আছে যে,—"সর্বত্র জয়মিচ্ছেৎ ছাত্রাৎ পুত্রাৎ পরাজয়ম্।" তা আমার শশাঙ্ক ছাত্রের মতো ছাত্র বটে!

বলা বাহুল্য, এত বড় সার্টিফিকেট পাইয়া শশাঙ্ক পুলকিত হইয়াছিল। সে সশব্দে মাটিতে মাথা ঠেকিয়া অধ্যাপককে একবার প্রণাম করিয়া লইল।

নীলাম্বর বলিল—বুঝলাম তোমরা দুই-জনেই পরম পণ্ডিত—কিন্তু ব্যাপারটা কি খুলেই বলো—আমরা পণ্ডিতও নই, অন্তর্যামীও নই।

কেশরী তখন শশাঙ্কের দিকে তাকাইয়া বলিল—শশাঙ্ক তুমিই বলো, আমি বড় পরিশ্রান্ত।

শশাঙ্ক তখন সবিনয়ে আরম্ভ করিল। সে বলিতে লাগিল, মোকদ্দমা-লক্ষ্মীর কৃপায় মহাশয়দের কিঞ্চিৎ অর্থাগম হচ্ছে, কিন্তু আমার শাস্ত্র-পিতার—এই বলিয়া সে ভট্টাচার্যের দিকে তাকাইল, তারপরে আবার—আমার শাস্ত্র-পিতার কথা কি আপনারা চিন্তা করেছেন? তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ওদিক দিয়ে অর্থাগম হবার আশা তাঁর নেই। অবশ্য গুরুর কৃপায় আমি দু-চার পয়সা পেয়েছি বটে—কিন্তু ছাত্রের অর্থ গুরু নেবেন কেন? তাই আমি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে গুরুর অর্থাগমের পথ চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম।

শশাঙ্কের গুরুভক্তিতে উপস্থিত সকলেরই মনে প্রাচীন কালের উতঙ্ক, আরুণি প্রভৃতি আদর্শ ছাত্রদের চরিত্র মনে পড়িয়া গেল, কলি-কালেও যে এমন সম্ভব ভাবিয়া তাহারা বিস্ময়ে নীরব হইয়া রহিল। কেবল ভট্টাচার্য মাথা নাড়িয়া যুগপৎ সম্মতি ও আশীর্বাদ প্রকাশ করিতে লাগিল।

শশাঙ্ক বলিতেছে—ক'দিন আগে আমি

কালিশপুরের হাটে গিয়েছিলাম একটা তাগিদে। সেখানে কালিশপুরের বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি বড় মহাশয় ব্যক্তি। অনেক গল্প হল; বললেন যে, তাঁর ছেলে সম্প্রতি বি-এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছে। সেই প্রসঙ্গে কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়লো যে, তাঁর ছেলে যখন পাল্কী করে গ্রামে প্রায় ঢুকেছে, তখন একটি বাঘ দেখতে পেয়েছিল।

আমি অমনি শুধোলাম যে, উত্তরে না দক্ষিণে? তিনি বললেন—উত্তরে। অমনি আমার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বাবু শুধোলেন হঠাৎ গাম্ভীর্য কেন? আমি বললাম—খবরটি বড় সুখবর নয়? কেন, কেন, বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি বললাম, বাঘটি যদি দক্ষিণে দেখা যেতো, তবে তত ভয়ের ছিল না। কিন্তু উত্তরভাগে দুষ্ট-বাঘ বড় চিন্তার বিষয়। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কেন? আমি গলার স্বর নামিয়ে বললাম, ওতো সামান্য বাঘ নয়,—ও যে জটা বাঘ! অবশ্য জটা বাঘের নাম বাবু কখনো শোনেন নি—

শ্রোতাদের মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল, তাহারাও কখনো শোনে নাই—

তিনি বললেন, জটা বাঘ আবার কি? আমি তখন তাঁকে নিয়ে একটি নিভৃত স্থানে বসে বললাম—দশভুজার পায়ের তলে যে-জানোয়ারটি থাকে, তাকেই বলে জটা বাঘ! বাবু বললেন,—সে কি মহাশয়, সে তো সিংহ। আমি হেসে বললাম—ওই আপনাদের এক ভ্রম। সিংহ কোথায়? সিংহের মতো তার মাথায় জটা আছে বটে—কিন্তু ওর আসল নাম জটা বাঘ। সব শুনে বাবুর বিস্ময়ে আর মুখ দিয়ে রা সরল না। কেবলি বলতে লাগলেন—জটা বাঘ! জটা বাঘ! আমরা তো কিছুই জানতাম না। তারপরে বললেন—কিন্তু এখানে হঠাৎ কেন? আমি বললাম—হঠাৎ নয়, কামরূপ-কামিখ্যেয় ওঁর বাস, আহারান্বেষণে বেরিয়েছেন।

বাবু বললেন যে, আহার জুটেছে বলে তো মনে হল না। আমি বললাম—সব রহস্য তো আপনারা অবগত নন, ও'রা দৃষ্টিভোগ করেন। বাবু শুধোলেন, অর্থাৎ......অর্থাৎ আবার কি, ও'র নজরে যাকে পড়ে সে এক মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে শুকিয়ে মারা যায়। আর উনি কামিখ্যেয় বসে তৃপ্তির উদ্গার তোলেন।

সমস্ত শুনিয়া দুর্গাদাস কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিয়া উঠিল—আমিও যেন সেদিন একটা বাঘ দেখেছিলাম।

বদ্যিনাথ বলিল—সেটা বাঘ নয়, বন-বেড়াল।

দুর্গাদাস বলিল—ঠিক তো!

বদ্যিনাথ বলিল—ঠিক বইকি! বাঘ হলে এতক্ষণ থাকতে কোথায়? আরে বাপু, বড়-লোকের ছেলে ছাড়া কেউ জটা বাঘ দেখতে পায় না।

দুর্গাদাস শুধাইল—বুঝলে কেমন করে?

বদ্যিনাথ বলিল—এখনি শুনতে পাবে।

ভট্টাচার্য বলিয়া উঠিলেন—আহা থামো না! শশাঙ্কর কাহিনী অবধান করো।

অনেকেই বলিয়া উঠিল—তারপর? তারপর?

শশাঙ্ক বলিল—বাবুর তো মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি শুধোলেন—তাহলে কি আমার—

আমি বললাম—শাস্ত্র সত্য হলে নিশ্চিত।

তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমার দুই হাত জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, ঠাকুর আমার একমাত্র সন্তান, বাঁচাও। আমি বললাম —ভয় করবেন না। শাস্ত্রে উপায় এবং অপায় দুই-ই আছে। জটা বাঘ দেখলে যে শার্দুল-স্বস্ত্যয়ন করতে হয়, সে কথা শাস্ত্রে বিস্তারিতভাবেই লিখিত রয়েছে। অতএব ভয় কি?

তখনি বাবু আমাকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন, সেখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসে শার্দুল-স্বস্ত্যয়নের ফর্দ প্রস্তুত করলাম। আজ গুরু-শিষ্যে মিলে গিয়েছিলাম স্বস্ত্যয়ন সমাধা করতে।

ঘাড়টান পঞ্চানন শুধাইল—তা কিরকম হল?

শশাঙ্ক সবিনয়ে বলিল—তা ছ' মাস, বছরের আবশ্যক দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়েছে। বস্ত্র, তৈজস, ভোজ্য, তাম্র, কাঞ্চন, রজত কিছুই বাদ পড়েনি।

ভট্টাচার্য বলিলেন—অনেক খরচ করো

বদ্যিনাথ বলিল—তা আর করবে ন

একে জটা বাঘ তার উপরে শশাঙ্ক ঠাকুর।

যোগেশ বলিল—জটা বাঘ একবার এ-গ আসে না!

বদ্যিনাথ বলিল—জটা বাঘ হিসেব আসা-যাওয়া করে। বাবুদের যে পরীক্ষা-দেওয়া পুত্র-সন্তান নেই।

শশাঙ্কর কাহিনী শুনিয়া নীলাম মনে হইল, গীতার চেয়ে অন্য শাস্ত্র পা অধিকতর ফলপ্রদ হইত। সে স্থির ক একবার শাস্ত্রগুলো ঘাঁটিয়া দেখিবে। আর সরকার ভাবিল—বাবা, এরা যে আমাদের ে পাকা ঠগ! আমাদের তবু কিছু মূল প্রয়োজন হয়, এরা খান দুই তালপাতার লইয়া বেশ ব্যবসা চালাইতেছে। সে মনে গুরু-শিষ্যকে গড় করিল এবং নিজের সন্তান নাই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইল।

শশাঙ্কর কাহিনী শেষ হইলে ভট্ বলিলেন—এদিকের পরামর্শ কি হল?

তখন সকলে মিলিয়া কখনো বা এ কখনো যুগ্মকে, কখনো যৌথভাবে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া জানাইল যে, পক্ষের প্রজাদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ ক দিতে হইবে আর ইস্কুল ঘরের উপর হ চালাইতে হইবে। শশাঙ্ক অগ্রণী হইয়া ব —ইস্কুল ঘরের ভার আমি নিলাম। আপ অন্য বিষয়ে চিন্তা করুন।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া সভা হইল। গুরু-শিষ্য মুটের মাথায় গুরুতর বো চাপাইয়া দিয়া টোলের দিকে যাত্রা করিল। দুই ভালো শাড়ি ও গোটা দুই তৈজস একটি সোনার নথ শশাঙ্ক গোপনে লুকো রাখিয়াছিল—সেগুলির লক্ষ্য ভট্টাচার্য গৃহি পদপ্রান্ত নয়, স্থানান্তর। শশাঙ্ক ভাবিল, আত্মসাতে দোষ নাই, কারণ এই উপার্জ কৃতিত্ব ষোল আনাই তো তাহার। তাহা ছ শার্দুল-স্বস্ত্যয়ন ব্যাপারটাই যদি দূষনীয় হয়, তবে সামান্য কয়েকটা দ্রব্য সরাইলে এ কি আর দোষ?

(ক্র

রজনীগন্ধা

শ্রীসুনন্দা সেনগুপ্তা

শতাব্দী আগে নিথর গগনে নেমেছিলো যবে সন্ধ্যা,
গোধূলি লগনে স্বপনমোহেতে ছিলে কি রজনীগন্ধা?
নবপত্রের অন্তরালেতে তব ভীরু হিয়া জাগে,
দখিনা পবন গুঞ্জরি যায়, শিহরিলে অনুরাগে!
জাগিয়া কাটালে তিমির রজনী লয়ে নব নব আশা—

রহস্যময় শর্বরীমাঝে খুঁজিয়া পেলে কি ভাষা?
তবে কেন তুমি নীরব আজিকে, থেমেছে কি তবে বাঁশী?
বেদনারে ভুলি পৃথ্বীরে তুমি স্বপনে ভরগো আসি।
না বলা ব্যথায় ভরেছে পরাণ, নামিছে এখন সন্ধ্যা,
আজি রজনীরে ভরে দাও সুরে—হে মোর রজনীগন্ধা!

অপরাহ্ন

শ্রীঅপূর্বকুমার মৈত্র

(বড় গল্প)

তিন

কলকাতা সহরে এক সন্ধ্যায় বৃষ্টির জল এত দাঁড়িয়েছে, দেখে মনে হয়, বর্ষাকালের পূর্ববঙ্গ। চারিধার জলে থৈ থৈ করিতেছে। মোটরবাসগুলো জলের উপর ষ্টীমারের মত ঢেউ তুলে স্রোত জাগিয়ে চলেছে। কিন্তু ট্রামগুলো একটার পর একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ট্রামের টিকিট কেটে দুটি পয়সা নখের ভাঁজে কতক্ষণ থেকে ধরে হাতটা ঘেমে গিয়েছে। ধৈর্য ধরে আশায় বসে আছে মৌমাছি। জল নিশ্চয়ই একসময় শুকিয়ে যাবে। ট্রামের বিদ্যুৎযন্ত্র একসময় নিশ্চয়ই আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। আবার গাড়ি চলবে। উপায় যার একান্ত নেই সে-ই বসে উস্‌খুস্‌ করে। মৌমাছি যে ট্রামে উঠেছিল এক এক করে অনেকেই নেমে যেতে লাগলো। নিরুপায় হয়ে সে বই-এর পাতায় মন দিল। আগের দিনে পাদনের দেওয়া নিমন্ত্রণের চিঠিটা এতক্ষণে তার চোখে পড়লো বই-এর ভিতর......"সন্ধ্যা সাত টিকার সময় সাহিত্য সভা, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট; অগ্রগামী তরুণদলের বিশেষ বক্তা শ্রী.........সভা-পতিত্ব করবেন। জনৈক মার্কিণ মহিলা বর্মা জঙ্গলে মার্কিণ সৈন্যদের নাচের আসর এদেশে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি ভারতবর্ষকে ভালবাসেন এবং এদেশের সাহিত্য ও কলা সম্বন্ধে তিনি একটি বিবৃতি দেবেন।"

মিনতির কৌতূহল হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো—এইতো বেণীনন্দনের মোড়! কিন্তু উপায় কি হবে? পা বাড়ালেই এক হাঁটু জল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি চলেছে সমানে। তবু সে উঠে দাঁড়ালো, ট্রামের হাতল ধরলো, কিন্তু সত্যি সত্যি ভিজে স্যাণ্ডাল হাতে করতে খুব লজ্জাবোধ হলো বাঙালী কণ্ডাক্টর বাঙালী মেয়ের মনের ভাব একটা আন্দাজ করে সিটের তলা থেকে দুটুকরা কাসের হ্যাণ্ডবিল কুড়িয়ে হাতে দিয়ে মৌমাছিকে বল্ল, "নিন, জড়িয়ে নিন।"

ধন্যবাদ কথাটি যে মেয়ে উচ্চারণ করতে জানে না, হেসে গ্রীবা বেঁকিয়ে যে তাকাতে শিখেনি, নতাই তার কৃতজ্ঞতার চরম আন্তরিক অভিব্যক্তি।

যে-কোন আইবুড়ো মেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মান বাঁচাতে আঁচলটা মাথার উপর টেনে দিলে বিশেষ দৃষ্টিকটু হয় না। হাঁটু জল ভেঙে হাতে বই নিয়ে ফুটপাত পার হয়ে বেণীনন্দন ষ্ট্রীটের ভিতর মৌমাছি প্রবেশ করলো। ডান হাতে কাগজে স্যাণ্ডাল ভাল করে কাগজে মুড়িয়ে নিয়েছিল। এই রাস্তায় জল জমেনি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল, কাগজের মোড়ক খুলে আবার স্যাণ্ডাল জোড়া পায়ে দিয়ে নেবে কিনা। সাহিত্য সভায় খালি পায়ে ঢুকলে কেউ যদি দেখে, কি মনে করবে। যদি খুব সামনের চেয়ারে বসতে দেয় মহিলা বলে, সবাই তার খালি পা দেখবে...... যদি কোন মহিলা চুপি চুপি পিঠটা বেঁকিয়ে তার কাণের কাছে এসে বলে—"ভাই, তুমি কিছু উঠে বল মেয়েদের হয়ে",—সে কি পারে না—এই যেমন পাঁচ মিনিটের জন্য বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে। তখন মৌমাছির মনে পড়লো হয়তো টেবিলের সামনে একটা লাউড স্পীকারের "মাইক" থাকবে, তার কাছে মুখ নিয়ে বলতে হবে যাতে দূরের সবাই শুনতে পাবে......তার ইচ্ছা হয় নিজের গলাটা লাউড স্পীকারে কেমন শোনায় .একবারটি ভিড়ের মধ্যে শ্রোতাদের পাশে বসে শুনতে।......মৌমাছি চলেছে এইভাবে আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে। ঠিকানার দরকার ছিল না কারণ, অত বড় সাহিত্য-সভা যেখানে সেখানে নিশ্চয় দেবদারু পাতার তোরণ, লাল সালুর উপর তুলোর কাজে "স্বাগতম" রঙ বেরঙের আলো, সারি বাঁধা মোটর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় সমস্ত বেণীনন্দন রাস্তাটা পার হয়ে এল মৌমাছি, কোথাও সাহিত্য-সভার চিহ্নমাত্র চোখে পড়লো না। তবু মাথার উপর থেকে আঁচলটা সরিয়ে এদিকটা দেখতে লাগলো—

"কাণে কি কম শোনেন? এক পার্শ্বে যেতে পারেন না?"

"ওঃ", বলেই মৌমাছি এক পাশে সরে দাঁড়ালো লজ্জিত হয়ে। তবু সে মুখরা, মোটরটাকে ধমক দিলে—"বাঁদিকে জায়গা চোখে দেখ না? হর্ণ বাজিয়ে চলে গেলেই পারো।"

মোটরখানা ব্রেক্ করেই ভিতর থেকে জবাব এল—

" 'পারো' না, 'পারেন' বলুন।"

"হ'লো, তাই হ'লো—যান্ চলে—"

"কাদাজলের ছিটা শাড়ীতে লাগলে দরিদ্রের যত আক্রোশ এই ধনিকের উপরই আসতো। কিন্তু জানবেন, এ মোটরও আমার নয়, আর আপনিও হেঁটে পথ চলবার পক্ষে অনুপযুক্ত। পাল্‌কী কিনুন, নয়তো শহর থেকে পালিয়ে যান।"

মৌমাছি চেঁচিয়ে উঠলো—"কি বল্‌তে চান আপনি?"

"বল্‌তে চাই—আপনি কি বহুরূপী! অভ্যাস নেই তবু ঘোমটা টানছেন মাথায় বিশ বার করে রাখতে পারছেন না! সন্ধ্যার অন্ধকারে গলির ভিতর কি খুঁজছেন বলুন দেখি?"

"ভদ্রমহিলাকে বহুরূপী বলতে লজ্জা করল না?"

"নিশ্চয়ই বহুরূপী। আপনাদের সবার যেদিন এক রূপ হবে সেদিন যে উপন্যাস লেখা বন্ধ হয়ে যাবে। চণ্ডী শিকেয় উঠবে। সর্বভূতেই কি একরূপে বিরাজ করতে পারবেন? আপনার বর্তমান রূপটা সত্যি সত্যি জানতে পারলেই গাড়ি ছেড়ে দেবো।"

"আমার রূপও নেই, আপনার জানবার দরকারও নেই।"

"রূপ নে-ই বলেই সাহায্যের লোক বেশী পাবেন না রাতে। কোথায় যাবেন বলুন?"

"থাক, ঢের হয়েছে, আমি আপনার মোটরে উঠতে চাই না, আমার পা আছে হাঁটতে পারবো।"

"আগেই বলেছি এ মোটর আমার নয় আর তা'ছাড়া আপনার ঐ কাদা-মাখা পা নতুন কার্পেটে গাড়ির ভিতর বিদ্রোহ করে উঠবে।"

"তবে বলতে এসেছেন কেন? চালান গাড়ি।"

"যাই। কত নম্বর খুঁজছেন বলুন না?"

"নম্বর নেই। এখানে কোথায় একটা সাহিত্য-বাসর......"

"ওঃ এতক্ষণে বুঝলাম, কি বুদ্ধি আপনার! শুনুন এ বাসরশয্যা নয় যে, এই দারুণ বর্ষায়ও জমবে। আপনার সেই সাহিত্য-বাসরের সামিয়ানা বিকেলেই ভিজে জলভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, অমর কবি, সাহিত্য সম্রাট, শালুর গেট, তুলোর হরফ ভিজে চপ্‌চপে হয়ে গিয়েছে আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না—বাড়ি যান।"

"সভা হবে না তা হলে? আমি এসেছিলাম সেই জন্যেই।"

"তাই নাকি? তা স্বীকারোক্তি বেশ শোনাচ্ছে! —আচ্ছা আসছে শনিবার আসবেন ঐখানে—ঐযে!"

"কেন বারে বারে ঐভাবে কথা বলছেন বলুন তো? আপনারা তো আমাদের সভায় কাজের সাহায্য করতে আসেন না, ভুল ধরে অপদস্থ করতে চান, নিজের দলে ফিরে গিয়ে কাগজ মারফৎ আক্রোশ জানান, তাই বলতে বাধ্য হয়েছি আপনিও কি তবে এই সভার—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রধান বক্তা—"

"তাপস!"

" 'বাবু' যোগ দিন।"

"নমস্কার!"

"যুগধারায় পিছিয়ে পড়েছেন। সামনে এসে হাত তুলে বলুন—জয় হিন্দ্!"

"আমি যাই আজ। পারিতো আসছে শনি-বার আসবো আপনাদের সভায়। আলাপ হ'লো ভালই। আপনার বক্তৃতা শুনবো সেদিন।"

"আজকেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেক শুনলেন। এবার আপনি কিছু বলুন আমি শুনি।"

"ঠাট্টা করছেন? আমরা কি বা সাহিত্যের গবেষণা করেছি আর কি বা বলতে পারি। এত বড় মহাযুদ্ধের পরে সব দেশের সাহিত্যে প্রলয় ঘটে গিয়েছে সব চিন্তাধারায় যুগান্তর এসে গিয়েছে।"

"ভয় নেই, আপনার দেশের সাহিত্যে কিছুই হয়নি। দুই একটা সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের মেয়ের অফিস যাতায়াতের কাহিনী, নয়তো রাজপথে ভিখারীর মৃত্যু, তাও ভীরু হাতে আইন বাঁচিয়ে

লেখা। বাদ দিন্! যদি নতুন ধারার কিছু শুনতে চান আসবেন শনিবার শত্রুপক্ষের শিবিরে।"

তাপস একখানা ময়লা ন্যাকড়া মোটরের ভিতর থেকে বের করে মৌমাছির প্রায় গায়ে ছুড়ে দিয়ে বল্লে,—"নিন্।"

"এ কি!"

"পা দুটো মুছে উঠে পড়ুন। তা না হোলে, নেমে গেলেও আপনার পদচিহ্ন আমার কাছে রয়ে যাবে মোটরে।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থাক্ আমি ট্রামে যাবো।"

"সব ট্রাম জলে বন্ধ, জানেন?"

"বাসে যাবো।"

তাপস বল্লে, "বেশ তাই যান। তবে গাড়ী গ্যারাজে বন্ধ করে আমিও যাই চলুন। খুচরো পয়সা আছে?"

"কি হবে?"

"দরকার আছে। নইলে কি আর বলছি।"

মৌমাছির তৎক্ষণাৎ মনে পড়লো দু'টি পয়সা মাত্র তার আঙুলের মধ্যে এক ঘণ্টা ধরে ঘামছে। লজ্জায় সে অধোবদন হয়ে ভাবতে লাগলো, কি বলবে। নিজে না হয় টালিগঞ্জ পর্যন্ত হেঁটে যাবে কিন্তু এই ভদ্রলোকটিকে কি বলে এড়িয়ে যাবে। খুচরো পয়সা কাছে নেই বলতে লজ্জাও বোধ হয়, আবার নেই বল্লেই মোটরে না উঠবার কোন আপত্তি শুনবে না। তখন কি হবে! হায় হায়! আজ সকালে কার মুখ দেখে সে উঠেছে!

তবু সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি পয়সা কি করবেন?"

"সকাল থেকে জলে ভিজেছি, এক দাগ হোমিওপ্যাথি 'ব্রায়োনিয়া থারটি' খেয়ে বাড়ী ফিরবো নইলে কাল জ্বর অবধারিত।"

মৌমাছির নিজের শরীর সম্বন্ধে এত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে তারও মনে পড়লো সারাদিন যা জলে ভিজেছে তাতে 'ব্রায়োনিয়া' খেলেও তাকে শুতে হবে, রক্ষা এই যা কাল রবিবার, অফিস নেই। অন্যমনস্ক হয়ে চলে যাবার একটা পথ খুঁজছিল, সেই অবসরে তাপস হাত বাড়িয়ে মিনতির শিথিল হাত থেকে কাগজের মোড়কটা তুলে নিয়ে বল্লে,—"চলে আসুন। দাঁড়িয়ে ভিজে লাভ কি?" মোড়কটা দু'হাতে চেপে পুনঃ প্রশ্ন করলে—"এটা কি আমসত্ত্ব না পাঁপড়? কিনলেন বুঝি? খুলবো?"

"ছিঃ ছিঃ কি করছেন বলুন তো? দিন্ দিন্ ফিরিয়ে দিন্।" মৌমাছি কাছে আসতেই গাড়ীর দরজা খুলে দিল। ভিজে স্যাণ্ডাল জোড়া একজন সম্মানিত ব্যক্তির কোলের উপর খুলে পড়বে এই ভয়ে বিচলিত হয়ে কেড়ে নেবার জন্য মৌমাছি পাদানিতে পা দিতেই গাড়ীখানা সজীব হয়ে উঠলো।

"ওটা শিগ্গিরি আমায় ফিরিয়ে দিন" বলেই মৌমাছি পিছনের সিট্ থেকে হাত বাড়িয়ে প্রায় একরকম তাপসের কোল থেকে ছিনিয়ে নিল, তারপর স্বল্পান্ধকারে মোড়কটা গাড়ীর বাইরে নিক্ষেপ করলে।

"ওটা কি ফেলে দিলেন?"

"অস্ত্র।"

"কিসের অস্ত্র?"

"আমাদের অহিংসামূলক আত্মরক্ষার অস্ত্র!"

"বাঁচা গেল!"

তাপসের গাড়ী তখন হাঁটুজলে সাগরমন্থন করে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানার উদ্দেশ্যে ছুটেছে মৌমাছিকে পিছনের সিটে নিয়ে। একটি হোমিও-প্যাথি দোকানের সামনে এসে গাড়ীর দরজা খুলেই তাপস বৃষ্টি বাঁচিয়ে দোকানের ভিতর ছুট্ দিল, তারপর মুখ ঘুরিয়ে ডাকলে—"চলে আসুন শীগ্গির।"

ইত্যবসরে মৌমাছির খুচরো পয়সার উপর নির্ভর করে সে দু'দাগ ব্রায়োনিয়ার অর্ডার দিয়েছে। আলমারীর পিছনে কম্পাউণ্ডার তার প্রস্তুতপ্রণালী নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় তাপস খুব হেসে উঠলো।

"হাসছেন যে?"

"হোমিওপ্যাথি দোকানে ঢুকলেই আমার একটা কথা মনে করে হাসি পায়।"

"কি কথা?"

"এদের আলমারীর ভিতরটা আমাদের রাজ-নৈতিক দলের মতন লেবেল আছে তাই কোনমতে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে নইলে রঙ আর আস্বাদ সব একই। চোখ বুজে একটা ধরে নিলেই হোল।"

"বিশ্বাস করেন না তবে এলেন কেন ওষুধ খেতে?"

"সামান্য সর্দি বলেই এসেছি, টাইফয়েড, টি-বি হলে কি আর আসতাম। অন্যত্র চেষ্টা দেখতাম......নিন্ হা করুন।"

"না না, আমার হাতে দিন, আমি খাচ্ছি।"

"না, আপনি খাবেন না, ফেলে দেবেন।"

"এ কি কুইনাইন্ যে ফেলে দেবো? নিরীহ হোমিওপ্যাথি ঠিক খাবো, দিন আমাকে।"

হাত বাড়িয়েছিল মৌমাছি মুখটা উঁচু করে। ইত্যবসরে তাপস বাঁ হাতে তার কপালটা ধরে, ডান হাতের গ্লাসটা এত দ্রুত তার মুখের উপর উল্টিয়ে দিল যে, অপচয় বাঁচাতে মৌমাছি হা করে চাতকের মত যতটা পারলো মুখের ভিতর নিল, বাকীটা শ্বাসরন্ধ্রে গিয়ে সর্দি, কাশি, বিষম, হাঁচি, বিবিধ অস্বাভাবিক ব্যাধির সৃষ্টি করলো।

"আপনি যেন একটা কি! নিজেই বেশ পারতাম। বড্ড বাড়াবাড়ি।"......

"পেটে গেছে তো? নিন্, এবার ছয়টা পয়সা বের করুন।"

"পয়সা আমি কোত্থেকে দেবো? আমি তো ওষুধ খেতে চাইনি। জোর করে খাইয়ে দিলেন কেন?"

"সর্বনাশ করেছেন দেখছি। কিছু তো আছে খুচরো বের করুন।"

"এই নিন্।"

"দু' পয়সা মাত্র! এই হাতে করে সাহিত্য-সভায়"......

"আপনি তবে একেবারে খালি হাতেই সভাপতি।"

"তবে উপায়?"

"ভাবুন আপনি। আমি চল্লাম। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, সেই টালিগঞ্জ পর্যন্ত।"

কম্পাউণ্ডার এবার একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করলে। কারণ এদের কথাবার্তা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি ছয়টা পয়সা ওষুধ খেয়ে না দিতে পারা তেমনি হাস্যকর মনে হ'লো।

কম্পাউণ্ডারের কুটিল চাউনির অর্থ-ই হোল "না।"

নিরুপায় ও লজ্জিত হয়ে তাপস নিজের সোনার আংটিটি খুলে মৌমাছির হাতে দিয়ে বেরিয়ে এল। বল্লে, "দিন ওকে, বসুন কাল সকালে ছয়টা পয়সা দিয়ে আংটি ফিরিয়ে নোবো, লোকটা কি চামার, শনিবারের বারবেলায় আংটিটা হাত থেকে খুলতে ইচ্ছে ছিল না।"

মিনতি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে, পাতলা একটা সোনার আংটি, মিনার কাজে তার উপর একটা অদ্ভুত কথা লেখা আছে—"একলা"।

মৌমাছি কম্পাউণ্ডারের কাছে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবলে কম্যুনিস্ট মেয়েদের ধর্ম, শাস্ত্র, বারব্রত, দিকশূল নেই। চুপ করে আংটিটা আঙুলের ভাঁজে রেখে নিজের বাঁ হাতের চুড়ি একগাছি ক্যাশমেমোর উপর রেখে বল্লে, "রাখুন এটা বন্ধক। কাল সকাল পর্যন্ত।"

মোটরে উঠেই মৌমাছি বল্লে, "এই শুনছেন?"

"কী"

"পুলের কাছেই গাড়ীটা রাখবেন কেমন তো?'

"কেন?"

"হ্যাঁ, যা বলছি তাই করুন।"

"সে সব আমায় দিয়ে হবে না, যাদের মেয়ে তাদের বাড়ীর দরজা পর্যন্ত গাড়ী যাবে, ও সব লুকোচুরি আমি পারবো না।"

"লুকোচুরি করতে বলেছি আপনাকে?"

"মতলব তো তাই মনে হয়, উঁহু সে হচ্ছে না।"

"এই শুনছেন্?"

"কী?"

"এই নিন্ আপনার আংটি।"

"সে কি! ওবেটা পয়সা না নিয়েই ছাড়লে আপনাকে? আমি বল্লাম শুনলে না কিন্তু।"

"হ্যাঁ, আমাকে বিশ্বাস করেছে।"

"আচ্ছা আমার চেহারাটা কি বিশ্বাসঘাতকের মতন?"

"বাজে কথা বাদ দিন্"

"কাজের কথাটা কি?"

"'একলা' মানে কি?"

"খুব কঠিন কথা, বাঙলা অভিধানে পাবেন না।"

"সে কথা জিজ্ঞেস করছি না—বলছি আংটিতে—'একলা' লিখেছেন কেন?"

"অতি প্রাঞ্জল। হাতে রাখী বাঁধিনি, ঘরে বউ নেই, ব্রহ্মচারীর জীবনটা আর কি করে সহজে জানাবো বলুন?"

"দরকার আছে?"

"যদি নাই মনে করেন তবে দেখুন তো দুদিকের ফুটপাতে ঐ সাইন বোর্ডের কি দরকার?—একরাশ জুতো কাচের আলমারীতে তবু দেখুন ঐ যে 'পাদুকাভবন', ভাঙ্গা রেডিও মেরামত হচ্ছে, ভিতরে গ্রামোফোন বাজছে, তবু সবাইকে বড় হরফে জানাচ্ছে—'সকল রকম বাদ্যযন্ত্র সরবরাহ করিয়া থাকি।' ভাল কথা, আপনারাও কম নন, এক চিমটি সিন্দুর চুলের ফাঁকে ছড়িয়ে কতখানি ঘরের খবর জানিয়ে দেন ভেবে দেখেছেন?"

"যান্ কি যে বলচেন যা তা,......বাঁ দিকের রাস্তা, আস্তে চালান—এই খানেই থামুন না কেন, আমি নেমে যাই।"

"কক্ষনো নয়, মার কাছে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিয়ে রসিদ নিয়ে বাড়ী ফিরবো।"

"আমি কি ইট্ বালি না চুন সুরকী যে, বাড়ীর সামনে ঢেলে দিয়ে রসিদ নিয়ে যাবেন?"

"যৌবনটাই যে বৃহৎ অট্টালিকা। একটা দারোয়ান-থাকা ভাল বড় হোটেলে সবাই যেতে পারে, বেরিয়ে আসতে পারে, তবু একটা গেটে পাহারা থাকে। রাত হয়েছে, ভয় করে না আপনার? বলুন কোথায় আপনাদের বাড়ী? আরো একটু আগে?"

সত্যি সত্যি গাড়ীটা মৌমাছিদের বাড়ীর সামনে এসে ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল। উৎসুক ভাই বোনেরা দরজার সামনে ছুটে এসেই থমকে দাঁড়ালো। তাপস সবাইকে সেখানে ফেলে রেখে সোজা অচেনা বাড়ীর ভিতর অগ্রসর হয়ে প্রথম যে প্রৌঢ়া মহিলাকে

দেখলে, তাঁকেই গড়গড় করে বলে গেল—"নিন্ আপনার মেয়ে। বেণীনন্দন স্ট্রীট থেকে নিয়ে এসেছি।"

মাহলাটি পাশের বাড়ীর, মৌমাছির মা নয়, সুতরাং হাসির রোল চারিদিকে উঠলো, ঘরের ভিতর কন্যার মাতা কোন দুর্ঘটনার আশঙ্কায় দ্রুত বেরিয়ে এলেন ঈষৎ ঘোমটা টেনে।

"এই যে ইনিই তো মা, এবার আর না হয়ে যায় না, এই যে নাক্ মুখ ছোট কপাল অবিকল—শুধু মেয়ের থেকে বয়েসে বড়—তাই না, ঠিক বলেছি কিন্তু।" সবাই আবার হাসলো।

নিন্ বুঝে নিন আপনার মেয়ে, এই জল ঝড় বৃষ্টিতে আজ আর বাড়ী পৌঁছাতে হোতো না রাত বারোটার আগে—একেবারে সোজা নিয়ে এসেছি—ইচ্ছে করলে দু'টো রাস্তা বেশী ঘুরাতে পারতাম, অর্ধেক রাস্তায় এসে নামিয়ে দিয়ে চলে যেতেও পারতাম—"

ঘরের ভিতর মৌমাছির পিতা কথাবার্তা শুনছিলেন, কিন্তু বক্তাটিকে দূর থেকেই একেবারে ছেলেমানুষ বাচাল মনে করে বাইরে বেরিয়ে সম্বর্ধনা করবার ব্যস্ততা দেখালেন না।"

তাপস নিজেই বল্লে, "এক কাপ চা হবে, বেশ গরম আদা দিয়ে?

মৌমাছি জবাব দেবার আগেই তার মা বল্লেন, "নিশ্চয়ই, বোস বাবা একটু ঘরের ভিতর এসে বস—বা মিনু, ঘরে নিয়ে ওঁর কাছে বসতে দে।"

তাপস প্রাণীটি সত্যিই অদ্ভুত। একদণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না, বসতে পারে না, অতিমাত্রায় চঞ্চল। ঘরে প্রবেশ করেই সম্মুখস্থ বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বল্লে, "আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?"

"তাতে কি, বস বাবা, আর সবার সংগে পরিচিত হয়েছ তো?"

"একরকম হয়েছি—আপনার নিজের পরিচয়ে বাধা আছে কিছু?"

"কিছুমাত্র না, আমিই গৃহস্বামী।"

"সন্তুষ্ট হলাম আপনাকে দেখে।"

"বাবাজীবনের নামটা জানতে পারি?"

"নিশ্চয়ই—তাপস।"

"বেশ নামটি। কি করা হয়?"

"তপস্যা।"

"কার?"

"দেশমাতৃকার?"

"কংগ্রেসপন্থী না কম্যুনিস্ট? পোষাক-পরিচ্ছদে কিছুমাত্র আন্দাজ করিতে পারছি না কিনা", বলেই তিনি তামাকের গড়গড়ায় টান দিলেন।

"আজ্ঞে গায়ে এখনও লেবেল মারিনি, ইচ্ছাও নাই, কারণ গান্ধীজী নিজেই লেবেল ছেড়ে চার আনা পয়সা চাঁদা বন্ধ করেছেন, বক্তৃতা ছেড়ে হাততালি দিয়ে ভজন গান ধরেছেন। বুঝলেন কি না চারশো লক্ষ লোকের এত মত, এত পথ যে আর পার্টির রাজনীতিতে চলে না। শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী শেষকালে যা ঠেকে শিখেছেন, তাপস মজুমদার শুরুতেই তাই ধরেছে।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাস্যসম্বরণ করে তাপসকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি রকম প্রণালীতে সাধনা চলছে জানতে ইচ্ছা করে, আমার মিনুও তো রাতদিন ঐ নিয়েই থাকে।"

"আর একদিন এসে আপনাকে সব বলবো, আজ থাক, যাই এখন—ন্রায়োনিয়ায় সর্দি সেরে ক্ষিদে পর্যন্ত পেয়ে গিয়েছে"। এই কথা বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গমনোদ্যত তাপসকে মৌমাছি ডাকলে—"এই শুনছেন?"

"কেন?"

মৌমাছি তার হাতে নিজের জলখাবার থেকে একখানা পরোটা ও একটু ওলের ডালনা পাটিসাপটার মতন জড়িয়ে দিয়ে বল্লে—"নিন্ খেয়ে ফেলুন।"

তাপস খেতে খেতে মোটরে উঠবার উদ্‌যোগ করলে। রান্নাঘর থেকে আদা দেওয়া চা নিয়ে বারান্দায় মিনুর মা ছুটে এলেন তাড়াতাড়ি।

"এই শুনুন্—মা চা নিয়ে এসেছেন।"

গাড়ীখানা কাঁচা হাতে তিন ঝাঁকুনি খেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, তবু চেঁচিয়ে তাপস বল্লে—"চা আমি খাই না মা!"

মৌমাছি সিঁড়ির নিচের সেই গ্যাসপোস্টের থাম ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে—হঠাৎ মিষ্টি গান থেমে গেলে যেমন হয়; এমন সময় ভিতরে বৃদ্ধ পিতা ডাকলেন—"মিনু!"

"কি বাবা, ডাকচো আমায়?"

"ছেলেটির মাথায় একটু ছিট্ আছে নাকিরে?" মৌমাছি গম্ভীর হবার চেষ্টা করেও হেসে ফেল্লে। বল্লে—"সবকটা ইস্কুরূপ্ ঢিলে বাবা!"

"কদ্দিনের আলাপ তোর সংগে?"

"ঘণ্টা দুই আগের।"

"দু'ঘণ্টার!"

মৌমাছি অতি নীরবে উত্তর দিলে—"হাঁ!"

চার

জয় হিন্দ্
বাঁকুড়া
লালপাড়া, ২৭শে ভাদ্র

ভাই মৌমাছি,

হঠাৎ চিঠিখানি পেয়ে অবাক হয়ে যাসনি। জীবনে আমার অনেক সমস্যার মীমাংসা করে এসেছিস্, আবার এক নতুন ভূত ঘাড়ে এসে পড়েছে, সমস্যা এখন সংশয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের বুদ্ধিতে আর কুলাতে পারছি না। একটা আস্ত পাগলকে ভাল বেসেছি। নাম জানি না তার, বাড়ীঘর কোথায় তার পরিচয় পাইনি। একটাও সত্যি কথা বলেনি। তিনদিন ছিল আমাদের বাড়ীতে। ঝাটশীলা যাবার হাঁটা পথে, তবু মিথ্যা কথা যে এত মিষ্টি হয় চব্বিশ বছরে এই প্রথম তার আস্বাদ পেলাম। যেদিন জানতে পারলে আমি ইস্কুলে মাস্টারী করি—কি বল্লে জানিস্? বল্লে আপনি হরিজনেরও অধম, শুধু কংগ্রেস কেন আপনি মুসলিম লীগের কৃপার পাত্রী। অপমান করতে একটুও বাধলো না, পরক্ষণেই বলেছিল শুধু বিদ্যা দান করলেই চলবে না, একদিন কিন্তু বেশ নিজে হাতে আলুর দম করে খাওয়াতে হবে, তিনদিন ধরে কলকাতা ছেড়ে কেবল নেড়ে বিস্কুট, চা আর চানাচুর খেয়ে পেট্‌টা একেবারে বালুচর হয়ে গিয়েছে।

বল্লাম—তথাস্তু। তবু সত্যি সত্যি যেদিন আলুর দম করে রান্নাঘরে ঠাঁই পেতে খেতে ডাকলাম, ঘরে ঢুকলেই না, বাড়ীর দরজায় সাইকেল রিক্সা ডেকে আনলে। জিজ্ঞেস করেছিলাম—খেলেন না কেন?

জবাব দিলে—মেয়েরা যে পুরুষদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ায় ওটা ওদের দুর্বলতা, ঐ পথ ধরেই মনের জাল বিস্তার করে।

জিজ্ঞেস করলাম—বিয়ে-থা করেন নি এত জানলেন কি করে। নির্লজ্জের মত জবাব দিলে—কিরণময়ী যখন উপিনদাকে লুচি ভেজে খাওয়াতো দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখেছে সে উনুনের আঁচে চরিত্রহীনের রাঙা মুখ। তুই হলে এত অপমান সইতে পারতিস মৌমাছি?

শেষ দিন যখন একটু খুশীর ভাব দেখলাম, জিজ্ঞেস করেছিলাম, কতদূর যাবেন, আপনি কোথায় চলেছেন?

জবাব এল বাঙলা ছাড়িয়ে খুঁজতে চলেছি একটা চাবী-কাঠির সন্ধানে—

কিসের চাবী-কাঠি? খাটের না দেশলাই কলের?

বললে, আরও একটু আলো, আরো একটু বাতাস এই পরাধীন দেশটার উপর এনে দেওয়া যায় যে ভাণ্ডার থেকে তারই চাবী খুঁজতে চলেছি। অন্ধ, মুর্খ সংশয়পূর্ণ যে সব দুর্বল মানুষগুলোর আজও জাতীয়তাবোধ এল না তাদের তোমরা অগ্রাহ্যই করে এসেছো, আমি পথ খুঁজে বার করতে চাই কেমন করে তাদের সাধক করে তোলা যায়। এতদিন যাদের ঠাট্টা ক'রে, উপহাস ক'রে ঘৃণায় দূরে রেখেছে, তাদের আমি সম্বর্ধনা করে সংগ্রামে নিয়ে আসতে চাই।

বললুম, তার জন্য বাঙলা ছাড়বার কি দরকার? গান্ধীপন্থী হয়ে এদেশেই কাজ করে যান তবে।

বললে, পরে আসবো এখন সুবিধা হবে না, এদেশটা এখন অতিমাত্রায় বিপ্লবী হয়ে উঠেছে, কাজ বল্লেই এরা চমকপ্রদ কাজ খুঁজে বেড়ায়।

যাক অনেক কথা বলে ফেলেছি। তোমাদের ভাল না লাগবারই কথা। আমি একটা অনুরোধ করতে পারি?

বললুম, নিশ্চয়ই পারেন।

অনুরোধটা বলবার পূর্বেই সে গলায় হাত দিয়ে সোনার সেই হারটি আস্তে আস্তে খুলে নিল। এ যেন অহিংসায় ডাকাতি। তবু বল্লাম—এতে কি আপনার কোন উপকার হবে।

বললে, একটা শুধু পরীক্ষা। দেখছি পাশ করতে পারবো কিনা। যদি কোন দিন নিজে একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়ি।

বললুম, রাখুন তবে আপনার কাছে।

তার সেই প্রলাপোক্তির ভিতর কোথায় কোন সত্য লুকিয়েছিল জানি না, সেই সময় এমনি বিহ্বল করে দিয়েছিল যে, হাতখানা ধরে বলতে পারিনি গলার হার তুমি কি করবে, কেন খুলে নিয়ে যাচ্ছ, তোমার কি পথ খরচ নেই—তুমি কি লক্ষ্মীছাড়া, সোনার হরিণের মত ভবঘুরে? ভাবলাম এরাও এক রকমের প্রিয়দর্শন পাগল, একটা খেয়ালে ঘুরেছে। ভাই মৌমাছি, একনিষ্ঠ দেশসেবকের মধ্যেও কত পাগল দেখেছি যাদের ভালবাসতে ইচ্ছে করে, ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসে শুধু তাদের গভীর বিশ্বাস দেখে।

কাজের কথা এবার বলি যার জন্যে তোকে চিঠি লিখতে বসেছি। আজ হাজারীবাগ থেকে একটা ইনসিওর এসেছে দু'শোটাকার, এত অবাক হয়ে গিয়েছি যে কি বলবো। কে এক তাপস মজুমদার লিখেছে—"সৎ চরিত্রের জামিন হিসাবে টাকাটা বাক্সের কোণে তুলে রাখবেন যদি আর কোন দিনও দেখা না হয়।" ডিটেকটিভ রহস্য নয় ভাই মনে হয় কাছে-কিনারার কোন পাণিপ্রার্থী দূরের থেকে এই বেনামী খেলা খেলছে। এখন টাকাটা নিয়ে কি করি, কোথায় রাখি! এর থেকে রুমাল সাবান এসেন্স ভাল ছিল ভাই। ব্যবহারেই শেষ হয়ে যেতো।

এতদিন চিঠিতে তোকে আমার ভালবাসা দিয়ে এসেছি, আজ আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? তোর ভালবাসাটুকুও সেই অচেনা লোকটাকে দিয়ে ফেলেছি—আজ অমি বড় একলা বোধ করছি ভাই।

মনে হয় এ জীবনের সহায় সম্বল ও সঞ্চয় যা কিছু তা কেবলমাত্র —ইস্কুলের হিসাবের খাতায় —আমার তিন বছরের প্রভিডেন্ট ফন্ড। আর সব নীহারিকা।

ইতি

কেয়া।

পাঁচ

পূজার ছুটি এসে গিয়েছে। এ ক'দিন অফিসের কাজ খুব বেশী। তবু সকলেই আজ বেশ আনন্দিত। মাসের শেষে এবার পূজো। বুড়ো একজন একাউন্ট্যান্ট বুক-পকেটে সেফটি পিন এঁটে এক মাসের মাহিনা বোনাস খুব সন্তর্পণে রাখলে। তারপর প্রকাণ্ড লাইন টানা খাতার উপর দেখতে লাগলো সারি সারি একআনা টিকিট আর সই। অফিসের সমস্ত কেরানীবাবুদের হয়েছে তবু কিছু টাকা বাঁচছে। বেশী হলো কেন বুড়ো ভাবতে লাগলো। পেনসিল দিয়ে প্রত্যেকখানি টিকিট দেখে যেতে লাগলো—"হরেন্দ্র পাল, শিশির ভৌমিক, জ্যোতিশঙ্কর ভট্টাচার্জি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এ্যাঁ, হেঃ হেঃ মিনতি মিত্র—এতক্ষণে! লক্ষ্মীছাড়ি! তাই বলি টাকা বেশী হচ্ছে কেন! কইগো দিদিমণি! এই জগু, ঘোষ সাহেবের টাইপিস্টটাকে ডাক্।"

অফিস তখন জনশূন্য। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে প্রায় সাতটা বাজে। পাখাগুলো সব বন্ধ, বিজলী বাতি লোক অভাবে শূন্য চেয়ার, খাতাপত্রের উপর কমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে জ্বলছিল। এক পাশ থেকে অফিসের ঝাড়ুদার ঝাঁট দিতে আরম্ভ করেছে তাতে বড় অফিস ঘরটার ভিতর পাড়াগাঁয়ের গোধূলি লগ্ন এসে প্রবেশ করেছে। জগু তখন মৌমাছিকে পূজার বোনাস নিতে খুঁজতে গিয়েছে অন্য ঘরে।

পূজার এই ছুটিতে চারদিন অফিস আসতে হবে না, নোটিশ পড়ে মৌমাছি হাতের অনেক কাজ সারলে, একটা পেন্‌সিল দিয়ে আঁকলে, ব্লটিং-এর উপর রেলের লাইন, শালবন, পাহাড়ী নদী, আর একদিকে তার চিন্তা হালছাড়া, পাল ছাড়া নৌকার মতন ভাসতে লাগলো, ইত্যবসরে ব্লটিং-এর উপর লেখে ফেলেছে অর্থহীন কত কথা, যেমন কলিকাতা, স্বাধীনতা, কেয়া, তাপস, একলা, আরো কত কী কিম্ভূত লাইন। কিছুদিন পূর্বে মদনের বাড়ী সে গিয়েছিল সাহিত্য সভার নতুন খোঁজ খবর নিতে। মদন খবর কিছু দিতে পারেনি। এইটুকু সে জানে যে, পূর্বে যারা বেণীনন্দন স্ট্রীটের সাহিত্য বাসরে যেত তারা বৈঠক বসায় গুলু ওস্তাগরের লেনে। সভাপতি এখন তাপস বাবু নয়, মদনেরই এক অধ্যাপক সে কার্য গ্রহণ করেছেন।

এমনি সময় জগু ঘরে এসে বল্লে—"যান বোনাস নিয়ে আসুন, ডাকচে আপনাকে।"

"কিসের বোনাস জগু?"

কেন দিদিমণি, জানেন না এবার পূজোয় এক মাসের মাহিনা বেশী পাচ্ছেন।"

মৌমাছি মুখে অস্ফুট একটা শব্দ করলে। অপ্রত্যাশিত একটু আনন্দে, চাবী দিয়ে টেবিলের ড্রয়ারটা বন্ধ করে আঁচলে মুখটা কপালটা একটু মুছলো, তাতে তেল-ঘামের ক্লান্তি বিষাদ ছায়া মুছে গেল অনেকটা এবং মুখটি একটুখানি শুকনো-সুন্দর হলো। ধীর পদে যখন উঠে সে বড় ঘরটার দরজার কাছে পৌঁছেছে, তখন শুনতে পেল বুড়ো একাউন্ট্যান্ট একটা টেবিলের সামনে ঝুঁকে টেলিফোন যোগে তুমুল ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। উপভোগ্য বলে সেও দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো—

একাউন্ট্যান্ট বলছে—"আপনার কাকে চাই বলুন না? অত বাজে কি বলছেন? নাম জানেন না?"

"হ্যাঁ, বেশ বুঝতে পেরেছি—এ অফিসে এগার-জন মহিলা কাজ করেন, সবারই চোখ ঘুমন্ত, কপাল ছোট, আপনার কাকে দরকার বলুন না?

"টালিগঞ্জে? ঠিকানা কি বলতে পারেন?

"তবে আর কি করে হবে! এই যে দিদিমণি! দেখগে কি বলছেন এই ভদ্রলোক টেলিফোনে, আমি তো কোন হদিস করতে পারলাম না।"

মৌমাছি টেলিফোন হাতে নিলে—"হ্যালো!"

"নমস্কার!"

"যুগধারায় পিছিয়ে যাচ্ছেন, টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে হাত তুলে বলুন—জয় হিন্দ্।"

"দেখুন বড় বিপদে পড়েছি, এ সময় পিছিয়ে কেন, যুগধারা উল্টে দিতেও দ্বিধা হয় না।"

"বলুন কি চাই আপনার?"

"ঐ অফিসে আমার পরিচিত একজন মহিলা।"

"কি হন্ আপনার?"

"কেউ নয়।"

"কত দিনের পরিচয়?"

"দু ঘণ্টার—তবে—"

"থাক, কি চাই বলুন তো?"

"ঐতো বল্লাম টালিগঞ্জের দিকে ছোট একটা রাস্তার মধ্যে তার বাড়ী।"

"তার নয়, বলুন তাঁর বাড়ী—"



কুমারেশ

আপনার দেহরক্ষা করে আপনার লিভার—তার রক্তকণিকা গঠন, পিত্তনিঃসারণ, দূষিত পদার্থ শোধন প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা। আপনার লিভারকে রক্ষা করে ও শক্তিশালী করে কুমারেশ। তাই কুমারেশ যে শুধু লিভার ও পেটের যে কোন পীড়া নিশ্চিতরূপে আরোগ্য করে তাই নয়—যে কোন রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে আপনার দেহকে রক্ষা করে।

ও, আর, সি, এল, লিঃ।

সালকিয়া :: হাওড়া

অনুবাদ সাহিত্য

নগ্ন-সত্য

নরম্যান এডওয়ার্ডস্

জর্জ সেণ্ট জর্জ তার গৃহস্বামীর '৯৮ সালের ককবার্নে একটিমাত্র চুমুকে দিয়েই সমজদারের মতো মাথা নাড়লো।

—কি জর্জ, পোর্ট কেমন লাগছে? গৃহস্বামী, রানটিংটনের ডিউক জিগ্যেস করলেন। পূর্বেকার মতো মাথা হেলিয়ে জর্জ মতামত জানালো, তারপর একটা বড়গোছের দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

—কি হোল এতো বড়ো নিঃশ্বাস পড়ে কেন?

—আর কেন?. জানোই তো ভাই, আমার নতুন চাকরীর কথা—কি যে দায়িত্ব ঘাড়ে চাপলো।

—সত্যি। দেখো যখন তুমি নিজেই কথাটা তুললে তখন আমার বলতে সংকোচ নেই যে, তোমার পক্ষে ওটা উপযুক্ত কাজ নয়। ডিউক চুপ করলেন। হাত বাড়িয়ে ডিস থেকে একটা বাদাম তুলে নিয়ে ভাঙতে ভাঙতে বন্ধুর মুখের ওপর একটা চকিত চাহনি ছুড়ে দিয়ে আবার আরম্ভ করলেন, "কেন বাপু, ফ্লিট স্ট্রীটে এমন একটা কাজ নিতে গেলে যা তোমাকে শেষবোধি হার্লে স্ট্রীটে টেনে নিয়ে যাবে?

—হার্লে স্ট্রীটে কেন ?

—ডাক্তারগুলো তো ঝাঁক বেঁধে ওইখানেই থাকে।

—তা আমার জানা আছে। কিন্তু আমার চাকরীর সঙ্গে ওদের থাকাথাকির সম্বন্ধ কি?

—সোজা কথাটা বুঝতে পারলে না? ডিউক জর্জের কথার ওপর থাবা দিলেন, "সত্যাশ্রয়-উৎসাহপ্রদায়িনী সভার" সম্পাদকের গুরুভার দায়িত্ব তুমি বড়ো জোর মাসখানেক বইতে পারবে। তারপর তোমার স্নায়ুবিকার ঘটবে এবং সম্ভবত তোমাকে কর্নেল হ্যাচের শরণাপন্ন হোতে হবে।

—নির্বোধের মতো যা তা বলো না হ্যারি।

—ভুল করছো জর্জ। আমি বোকার মতো কিছু বলি নি। নির্বোধের কাজ তুমিই করবে যদি ওই নতুন চাকরী নাও। সর্বনাশের কথাটা একবার ভেবে দেখো দেখি। তুমি লোকটা বিশ বছর ধরে গল্প লিখলে, নাম কিনলে। তোমার কাগজের সম্পাদক তোমাকে যা মাইনে দেন, তা যে প্রচুর, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তো জানি খরচটিও তোমার প্রচুর। যখন যা ইচ্ছে তোমার তুমি তাই করে বেড়াও। এখন ভাবো দেখি সব ছেড়ে-ছুড়ে এমন একটা সমিতিতে গিয়ে তুমি যোগ দিলে, যার কাজ হোচ্ছে সেই অসম্ভবকে সম্ভবপর করে তোলা, হাস্যকরকে গাম্ভীর্যে গতিশূন্য করা অর্থাৎ লোককে সত্যপথে চলবার উৎসাহ দেওয়া—সত্য কথা বলানো। বলি বাপু তা কি হয়? সাদা কালো হয়, তা বলে কালোকে সাদা করা—ওটা যে প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তোমার পক্ষে স্বভাববিরুদ্ধ। স্রেফ পাগলামি।

—বোতলটা দেখি।

—দেখো না ভালো করে দেখো। আর একটা কথা গতবারে আমার এখানে যখন এসেছিলে, আমার ছাতাটি নিয়ে গেছলে, মনে আছে তো? সেটা যদি ফেরত দাও তো বড়ো উপকার হয়।

—সেণ্ট জর্জ সেণ্ট একবার ঘাড় নাড়লো। ঘরে মোমবাতি জ্বলছিল। সেই আলোয় মনে হোল তার সেই প্রকাণ্ড রক্তমুখ যেন অধিকতর রক্তিম হোয়ে উঠলো। আস্তে আস্তে সে বললো, তোমার ছাতা? হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে। আচ্ছা, তোমার ছাতা ফিরিয়ে দেবো।

আর একটা বাদাম ভাঙলেন ডিউক, বললেন, বাঁচলুম। ছাতাটা একটু নড়বড়ে হোয়ে গেছে—তা হোক ও জিনিস আজকাল পাওয়া যায় না। একটা বাদাম খাও না।

—ধন্যবাদ। বাদাম আমি খাই না।

—বটে; আমি বলছি এবার খাবে।

—কেন?

ডিউকের স্মিতমুখ গম্ভীর হোয়ে উঠলো। পুরানো বন্ধুর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তিনি একবার চাইলেন। মনে পড়লো পুরানো দিনের কথা। মনে এলো ইটন স্কুলের কথা। সেখানে তিনি ওকে বার বার চাকরের কাজ করার শাস্তি থেকে বাঁচিয়েছেন। কেন যে বাঁচিয়েছেন, নিজেই তা জানেন না—বোধ হয় মনে মনে তিনি ওকে ভালোবাসেন বলে। শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, পাগলামি করে পাগলে। তাই তো বলছি কিছুদিনের মধ্যে বাদামই তোমার খাদ্য হবে, আর তা না হোলে বাদামের খোসার মতো তোমার ওপর একটি কঠিন নিরস আবরণ পড়বে। আমার মতে ও দুটো অবস্থারই গুরুত্ব এক।

জর্জের গলার স্বর হঠাৎ পরিবর্তিত হোল। বেশ সরস কণ্ঠে সে বললো, আচ্ছা হ্যারি, হাজার হোলেও তুমি একজন ডিউক এখন। তোমার কি সস্তা রসিকতা করা এখন শোভা পায়?

মাননীয় ডিউক হাসলেন, বললেন, বন্ধু, যদি তুমি জানতে আজকাল ডিউক হোতে হলে আর ডিউকের চালচলন বজায় রাখতে হোলে কি ভীষণ মূল্য দিতে হয়, তা হোলে বুঝতে আমার যে এখনো রসিকতা করার কোন মাত্রা বোধ আছে, সেইটেই পরমতম আশ্চর্য।

—ভালো, ভালো। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি। তবে এও বলি, আমার নতুন চাকুরী নিয়ে হাসাহাসি করার কোন মানে হয় না।

—সত্যি কথা বলছো?

—একবার ছেড়ে একশোবার।

ডিউক মাথা নাড়লেন, বললেন, চরম কথা বলেছো; বেশ আমার আর—আমার আর বলবার কিছু নেই। তবে, বড়ো দুঃখ হয়। বহুদিনের বন্ধু আমরা।

—কেন হ্যারি—একথা তুমি বলছো কেন? আমরা তো আজো বন্ধু।

—হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত বন্ধু আছি। তবে তোমার নতুন চাকরীতে তুমি যোগদান করলে তুমিই বলো না আমাদের বন্ধুত্ব কেমন করে থাকবে।

—কেন থাকবে না?

—বন্ধু, ডিউকের কণ্ঠে অভিযোগ ঝন ঝন করে বেজে উঠলো, বন্ধুত্ব আর কেমন করে থাকবে? এই যে তোমাকে আমাদের ভালো লাগে, তার কারণ কি জানো? কারণ হোচ্ছে তুমি একটি মিথ্যেবাদী। সাধারণ মানুষের মতো মিথ্যে কথা বলো না, আর বোকা তো কখনো না। বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে বুদ্ধির ঝাঁজ মিশিয়ে অলিগলি ঢেকে দিয়ে তুমি মিথ্যে কথা বলো। এখন হবে তার বিপরীত; তুমি বলবে সত্যিকথা; কেমন করে বলবে, না বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে বুদ্ধির ঝাঁজ মিশিয়ে অলিগলি ঢেকে তুমি সত্য কথনে লাগবে। আমার কিন্তু সকল সময় মনে হবে সত্যি নয়, তুমি মিথ্যেই বলছো। কাজেই সত্যি-মিথ্যে ঠিক করতে পারবো না। পদে পদে আমার গোলমাল হবে, তোমাকে আমার বিশ্রী লাগবে, আমি তোমাকে সহ্য করতে পারবো না।

—দয়া করে বোতলটা এপাশে দাও তো।

হাসিতে ডিউকের মুখ উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো, বললেন, এই যে। গলাটা বেশ করে ভিজিয়ে ফেলো—তারপর.........

—তারপর?

—তারপর সত্যকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করো।

স্থির প্রশান্ত হোয়ে গেল জর্জ, নির্লিপ্ত ভাবে বললো, বন্ধু, সেদিন আমার ভাগ্যে য

ঘটেছিল, তা শুনলে তুমিও আমার জন্যে সহানুভূতি প্রকাশ করবে।

—সহানুভূতি দিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তবে তার আগে আমাদের জানতে দাও এমন কি ঘটলো যার জন্যে অকস্মাৎ তুমি 'সত্যাশ্রয়-উৎসাহ-প্রদায়িনী সভা'র উৎকট কাজে মেতে গেলে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো জর্জ, করুণ কণ্ঠে বললো, ঘটবে আর কি, একটি মেয়ে— আঃ এমন অদ্ভুত, এমন সুন্দর, এমন অপূর্ব মেয়ে আমি আর আগে দেখি নি......

—থামো, থামো—জর্জের বন্ধু বাঁধা দিলেন, তুমি যে একেবারে তলিয়ে গেছো, কিন্তু বলো তো সে মেয়েটির সম্বন্ধে বেশ আন্তরিক-ভাবে কথা বলছো।

—বন্ধু, মৃত্যু এসে যেদিন আমার এই কণ্ঠরোধ করে দেবে, তার পূর্বে আর যাই করো মেয়েটির সম্বন্ধে আমি যা বলবো, সে কথায় কোন সন্দেহারোপ করো না।

বিস্ময়ে ডিউক এক মুহূর্তের জন্যে নির্বাক হোয়ে গেলেন। বন্ধুর মুখের প্রতি স্তব্ধ হোয়ে তাকিয়ে এক সময় হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, হা ঈশ্বর, তুমি, তুমি কি বিয়ে করার কথা ভেবেছো?

জর্জ উত্তর দিলো, আত্মার সংযোগ আমাদের ঘটে গেছে। মিলন আমাদের আজ না, হোয়েছে সেই অনাদিকালের প্রথম প্রভাতে। আজ ও সম্বন্ধে কোন কথা তোলা নিরর্থক।

জর্জ, বোতলের মদটার নাম হোচ্ছে পোর্ট অথবা পোতাশ্রয়। তুমি যদি ওর সাহায্য নিয়ে থাকো, আমার আনন্দ তাহোলে বাড়বে। ডিউকের বাচনভঙ্গীতে রহস্যের একটা বেশ কেমন যেন রণরণিয়ে উঠলো।

ধন্যবাদ। তেমন যদি কিছু করে থাকি দয়া করে কিছু মনে করো না।

সেই প্রশস্ত খাবার ঘরে নীরবতা নেমে এলো। চারপাশ নিস্তব্ধ। কেবলমাত্র চুক ক করে একটা আওয়াজ উঠতে লাগলো; সেন্ট র্জ সেন্ট মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। জর্জের খ একটা প্রদীপ্তি যেন ধীরে ধীরে উজ্জ্বল ক উজ্জ্বলতর হোয়ে উঠলো। কিন্তু সে কথা বললো না। ডিউক আর থাকতে পরে প্রশান্তি ভেঙ্গে বললেন, মেয়েটির ধ আমাকে সব কিছু বলতে হবে, তার য় কি, কোথায়, কেমন করে তোমার সঙ্গে আলাপ হোল।

-প্রায় তিন সপ্তাহ আগে পল্লীগ্রামে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যাই। সেইখানে......

-হাওয়াটা চমৎকার লেগেছিল—পরি- ও ভালো।

হ্যাঁ। আরো জনকয়েক বন্ধু এসেছিলেন। ভূরিভোজও হোয়েছিল। আমার পৌঁছাতে হোয়ে গেছল। যাহোক, খাওয়াদাওয়া শেষ হোলে, ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমি মুরিয়েলের সঙ্গে বাগানে একটু বেড়িয়ে আসতে গেলুম।

—ও বুঝেছি—নামটি হোল মুরিয়েল।

—আরে না, না। মুরিয়েল হোচ্ছে আমার গৃহস্বামিনী যার বাড়িতে—

—তাই নাকি! আচ্ছা ওকথা থাক। বেড়াতে গেলে যখন, তখন চাঁদ উঠেছিল নিশ্চয়—না, বলো তাও ছিল না—ডিউকের কথায় বিদ্রূপের অনুরণন উঠলো।

—সত্যি ভাই একটুও চাঁদের আলো ছিল না। বরং মেঘে সারা আকাশ একেবারে থমথম্ করছিল, মনে হোচ্ছিল বৃষ্টি এলো বলে।

—বেশ। তারপর?

—আমরা তো বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটা কুয়োর ধারে এসে পড়লুম। মুরিয়েল বললোঃ একটু পরে এইখানে নাইটিংগেল ডাকতে আরম্ভ করবে। সুতরাং আমরা অপেক্ষা করতে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ সে ব্যস্ত হোয়ে উঠলো, বললোঃ আমার ভয়ানক ঘুম পেয়েছে, শুতে চললুম। তুমি অপেক্ষা করো, হাতের সিগারটা টানতে থাকো—ওটা শেষ হবার আগেই নাইটিংগেল বোধ হয় ডাকতে শুরু করবে। বিস্মিত হোলেও আমি রাজি হোয়ে গেলুম, বললুম, বেশ।

মুরিয়েল চলে গেল, তবে যাবার আগে সাবধান করে দিয়ে গেল কুয়োটার সম্বন্ধে, বললোঃ সতর্ক থাকতে, কেননা কুয়োটা মাঝে মাঝে জল ভর্তি হোয়ে ভেসে যায়।

—তোমার কথা বুঝতে পারছি না জর্জ!

—আহা এটা তো খুব সোজা কথাঃ মুরিয়েল আমাকে বলে গেল কুয়োটা মাঝে মাঝে উপপ্লাবিত হোয়ে যায়।

—তা কি করে হবে? কুয়ো কি কখনো উপপ্লাবিত হয়?

—হয় হয়। এ কুয়োটা হয়। এর তলায় একটা ঝর্ণা অথবা ঐ জাতীয় কিছু প্রস্রবণ আছে সেই জন্যে হয়। শোনো তারপর। মুরিয়েল তো চলে গেল। হায় হায়, এ পাশে সেই কুয়ো দেখি জল-ভর্তি হোয়ে গেছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড—তারপর কুয়োর জল ভেসে গেল।

—তুমিও ভিজে গেলে তো?

—না তেমন ছেলে আমি নই! একটি লাফে নিরাপদ জায়গায় আমি ইতিমধ্যে সরে এসেছি। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে কুয়োর দিকে আবার যেই চেয়েছি, দেখি আর জল উপচে পড়ছে না। তবে— তবে আমার জীবনের চরমতম সর্বনাশ ওইখানে ঘটে গেছে।

আগ্রহে ডিউকের দুচোখ জ্বলতে লাগলো। মদের পাত্রটা বন্ধুর দিকে তিনি এগিয়ে দিলেন। জর্জ পাত্রটা ভর্তি করে একটা চুমুক দিলো। কোমলকণ্ঠে ডিউক বললেন, তোমার চরমতম সর্বনাশের রূপটা আমাকে একটু বলো।

উদাসভাবে জর্জ বললো, বলতে আর কি একটি মেয়ে, হ্যাঁ, অপূর্ব সুন্দর একটি মে সেই কুয়োর পাড়ে বসেছিল।

জর্জ গ্লাসে আর একটা চুমুক দিলে ডিউক লক্ষ্য করলেনঃ স্মিতহাস্যে তাঁর বন্ধ ঠোঁট দুটি যেন ঝলমল করছে।

জর্জ ইতিমধ্যে বলতে আরম্ভ করে দেখো, যখন কোন সুন্দর মেয়ের সঙ্গে আ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে, আমি কখনো সুযোগকে নিষ্ফল যেতে দিই না। আর এ তো কিছুতেই যেতে দিতে পারি না। মে শুধু সুন্দর ছিল না, ছিল অপূর্ব সুন্দ দুই চোখে হাসি ভরে আমার পরিচয় মেয়েটিকে বললুম, আমাদের গৃহস্বামি মুরিয়েল শুতে গেছে, তবে সে যদি চায় অ চট্ করে ভেতর থেকে একটা কোট এনে দি পারি।

—আচ্ছা আমি যে অবস্থায় আছি ত তোমার ভালো লাগছে না? আমি কি তোম কুণ্ঠিত করছি?

—শোনো বন্ধু, তুমি তো জানো কিংবা সংকোচের বালাই আমার বড়ো এ নেই। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, সেই আমি যথেষ্ট পরিমাণে কুণ্ঠিত পড়েছিলুম।

ডিউক জিগ্যেস করলেন, কেন? জর্জ চোখ নামিয়ে নিলো। পরিষ্কার দেখা গে জর্জের সেই রক্তিম গালেও যেন অ গোলাপের আভা একবার ঝলক মারলো।

দেখো হ্যারি, সেই মেয়েটি, মানে মেয়েটি, মানে একেবারে নিরাবরণ ছিল।

—কি বললে?

—যা বলবার আমি বলেছি। তুমি বিশ করো আর নাই করো আমি দ্বিতীয়বার সেব বলতে পারবো না। তবে মিথ্যেও বলি শুধু কি তাই সে যখন আমাকে জিগ্যেস করে তাকে এই অবস্থায় দেখে আমি মর্মা হোয়েছি কি না, তখন যে আমি কি উত্তর দে ভেবেই পেলুম না। কোন রকমে 'তোমা ঠাণ্ডা লাগবে নাকি' একথাটা বললুম। আমার কথায় সে হেসে উঠলো, বললোঃ সৌন্দর্য বুঝি আপনাকে সংকুচিত করে? উত্তরে আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করলুম। তারপর মুখে বললুম, তোমার শীত করছে না?

সে মাথা নাড়লো। কি তার চুল, অজস্র যেন রাত্রির অন্ধকারের ঢেউ। মাথা নেড়ে সে বললো, চিরকাল সে নিরাবরণ। মনে হোল ওটা তার কথা নয় যেন চাবুকের ঘা। আমার মনের অবস্থা বোধ হয় সে অনুভব করলো, খিল খিল করে সে হেসে উঠলো, বললোঃ আমি যেন বিয়ের কনে—ঠিক সেই রকম লাজুক। প্রবল প্রতিবাদ জানালুম। আমার সে প্রতিবাদ রুজু হোল না, সে বলে চললোঃ বিয়ের কনের মতো

ামি দেখতে সুন্দর—ভারি সুন্দর। ছেড়ে লুম, বললুমঃ তুমিই বা কি কম সুন্দর। ামার কথা সে মেনে নিলো, বললোঃ এতো ুন্দর বলেই লোকে তাকে দেখতে পারে না।

—কথাটা শোনো হ্যারি। আমারো দেখতে ালো লাগছিল না, কেমন একটা অস্বস্তি মাকে চঞ্চল করে তুলছিল। কিন্তু সে কথা বলে আমি বললুমঃ তোমার মতো লাবণ্য- ীকে লোকে ভালোবাসে না একথা কল্পনা াও কঠিন। উত্তর দিলো সেঃ না, না। েশর ভাগ লোকই মনে করে আমি কুৎসিত। ই তারা আমার সম্মুখে দাঁড়ায় না। লাপের ধারা যেন একটু গতিপথ বদল লো, আমি বললুমঃ এ সংসারে যে প্রচুর রিমাণে নির্বোধ আছে তার প্রমাণ হোচ্ছে া। তা না হোলে এমন সুন্দর মুখের এমন ূর্ব দেহের জয়গান তো জগতজুড়েই হওয়া ভাবিক।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করলো সে, ার মনে হোল এবার সে কেঁদে ফেলবে। তু কাঁদলো না, রুদ্ধকণ্ঠে বললো, এক সময় মি আদর পেয়েছি, তবে সে বহু, বহুকাল র্বের কথা। আজ আর কোথাও আমার স্থান । তার সেই কণ্ঠস্বরে বেদনা যেন ঝরঝর ঝরে পড়লো, একটা অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস সেই অনিন্দিত তনুদেহকে থর্ থর্ করে ালো। সেইদিকে চেয়ে আমিও কেমন াদাচ্ছন্ন হোয়ে গেলুম, আস্তে আস্তে ুম, শোনো, এমন খালি গায়ে থেকো না— একটা কিছু অন্তত তুমি গায়ে দাও। খিল করে সে হেসে উঠলোঃ কেন, কেন আমার দেহ আচ্ছাদিত করবো? আমি কি দেখতে? সে বলে চললো, তুমিই তো লে কি সুন্দর দেখতে আমি! তাড়াতাড়ি ক থামিয়ে বললুমঃ না, না। তুমি সুন্দর, অপরূপ। সে বললো, তবে, তবে কেন ওকথা বলছো? আমি যদি একরাশ কাপড়- া জড়িয়ে বসে থাকি, তাহোলেই কি তোমার লো লাগবে?

•—বিস্ময়ে আমি নির্বাক। কোন মে সামলে নিয়ে বললুম, দেখো মার কথা ঠিক, আমি স্বীকার করি কোনো ুরে কুয়োর ধারে এসে কখনো আশা করতে র না যে বনদেবীর মতো একটি মেয়ে াতিথির সাজে সেজে বসে থাকবে।

আমার কথা শেষ হোতে না হোতে ন হাসিতে তার মুখ ভরে উঠলো, ধীরে র সে বললো, আমি এবার চলি—মনে হোচ্ছে কে আর কোনো প্রয়োজন নেই। চিরদিন ঘটলো। ওর কথায় আমার মনে কেমন া খটকা লাগলো ঃ এমন সুন্দরী তরুণী এরকম কথা বলে। সত্যি বলতে কি সে আমার সঙ্গে আগুন নিয়ে খেলা করছিল—জীবনে আমি কোনোদিন এমন সংকটে পড়ি নি। হঠাৎ আমি বলে বসলুম, শোনো, যেও না—তোমার নাম কি? কোথায় তুমি থাকো? ফোন আছে? ফোন নম্বরটা আমাকে বলো। একদিন চলো আমরা দুজনে কোথাও দুপুর-বেলা খেতে যাই।

আমার কথায় তার উৎসাহ যেন ফিরে এলো, আমার চোখের দিকে চেয়ে বললো ঃ বুঝতে পারছি তুমি চাও আমি থাকি, কিন্তু সে চাওয়া কতোটুকুনের জন্যে। তার মনের কথা আমি যেন বুঝতে পারলুম। সে খালি ভাবছে একটু পরেই আমি আর তাকে সহ্য করতে পারবো না। এমন একটি অপরূপ মেয়েকে আমি সহ্য করতে পারবো না! আমার যেন কথাটা ভেবে কান্না পেতে লাগলো। সে কিন্তু তখনো বলে চলেছে, আমি জানি আমাকে তুমি পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারছো না। আমি বুঝতে পারছি ঃ আমি কে তুমি জানতে চাও। কিন্তু আমি তো জানি, আমার পরিচয় জানতে পারলে তুমি এক্ষুণি চাইবে আমি বিদায় হই। আমি তো জানি জর্জ সেণ্ট জর্জ, আমার তুমি প্রিয় হোলেও, তুমি আমাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করো।

কি যে উত্তর দেবো ভেবে পেলুম না। সে কিন্তু তখনো বলে চলেছে, তোমার সঙ্গে আমার জানাশোনা হোয়েছিল বহুদিন আগে। তুমি ভুলে গেছো—আমার সঙ্গে কিন্তু কারোর আলাপ হোলে আমি কখনো ভুলি না। সেবার আমাদের বনাবনি হয় নি—তুমি আমাকে ত্যাগ করেছিলে।

—হ্যারি, আমার মনে হোল সেই মুহূর্তে আমি পাগল হোয়ে যাবো। আমার মনে হোচ্ছিল ও আমার পরিচিত। কিন্তু কুয়াশার মতো ঝাপসা স্মৃতিতে ওর নাম পরিচয় সবই যেন আবরিত হোয়ে গেছে। প্রাণপণ চেষ্টাতেও আমার কথন শক্তি সেই অতীতের ভাষা ফিরে পেলো না। আমি শুধু বললুম, চিনি, আমি তোমাকে চিনি কিন্তু তোমার নাম, নামতো আমি মনে করতে পারছি না। সুমধুর হাসি সে হাসলো। বাতাস যেন তার সেই হাসিতে মূর্চ্ছিত হোয়ে গেল। আমার কিন্তু মনে হোল হাসি নয়, আনন্দ নয়, বিষাদ যেন ওই হাসিতে ঝরঝর করে ঝরে পড়লো।

একবার থামলো জর্জ। কি যেন ভাবলো। তারপর মুখ তুলে বললো, এমন সময় বৃষ্টি নামলো। সে উঠে দাঁড়ালো, আকাশের প্রতি তার সেই গভীর চোখ মেলে মেঘের বিস্তৃতি দেখে নিলো। এক মুহূর্ত চোখ সে নামিয়ে আমার দিকে চাইলো, বললে, আমার নাম মনে করতে পারলে না? আমার নাম হোচ্ছে সত্য—একটি কূপের তলায় আমার অবস্থান—চিরকাল আমি নগ্ন।

জর্জের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডিউক টেবিলের ওপর দুহাতের করতল চেপে ধরে তীব্র গলায় বললেন, জর্জ, জর্জ, শোনো!

—বলো।

—দেখো গ্লাস একেবারে শূন্য!

পানপাত্রের দিকে চেয়ে জর্জ হাসে তাইতো!

গলার স্বর বদলে গেলো—কৌতুকাচ্ছ গলায় ডিউক বললেন, আমার জীবনে এর চাইে আজগুবি গল্প শুনেছি বলে মনে পড়ে জর্জ!

গম্ভীর গলায় উত্তর এলো, আমি জা আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না। অ সত্যের স্বরূপ আমি জেনেছি—এ জীবনে তা কি কম।

স্পষ্ট কথায় ডিউক বললেন, দেখো বন্ধ ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। একথ অবিশ্বাস্য যে মেয়েটা কোনো বসনত্যাগীদে উপনিবেশ থেকে পালিয়ে এসে একটা কুয়ো মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। আর সেই মেয়েটা তোমার গল্প লেখা বন্ধ করবে তা বিশ্বাস করা মতো মাথা আমার আজো খারাপ হয় নি।

—তা আমি জানি। আরো জানি ভালে পোর্ট মদ অথবা আশ্রয় কিছুই যে তোমা কাছে পাওয়া যায় না তাও ঠিক।

—যাতা বলো না, মাথাটা একটু ঠান্ড রাখো।

—এ পোর্টে তা হয় না।

—আঃ, পোর্ট কথাটা বাদ দাও জর্জ!

—হ্যারি, সত্যকে কেমন করে অস্বীকার করি।

—জর্জ, কখনো কিপলিংয়ের লেখা পড়েছো?

—কিপলিংয়ের লেখা? বহুকাল আগে পড়েছি।

—কিপলিংয়ের কিছু কথা আমার মনে পড়ছে। বলবো কথাগুলো?

—বেশ তো। বলো না।

—শোনো তা হোলে ঃ কথাটা আজকাল মিথ্যায় পর্যবসিত হোয়ে গেছে। কারণ সত্য মেয়েটি নিরাবরণ—যদি তাকে ঘটনাস্রোত কখনো বা সমুদ্রের নিতল থেকে পৃথিবীর কঠিন মাটিতে তুলে আনে, তাহলে ভদ্রলোক তাকে কারুকার্যখচিত একটি অঙ্গাবরণ দান করে কিম্বা তার চক্ষু দেয়ালে সম্বন্ধ রেখে তারস্বরে ঘোষণা করে ঃ আমি ওকে দেখতে পাই-নি।

একটা হাই উঠছিল। জর্জ সেটা চাপলো, বললো, ঠিক কথা।

—তার মানে তুমি বলতে চাও উচিত কথা! —ডিউক যেন গর্জে উঠলেন, তাই যদি বলতে চাও তবে কি জন্যে তোমার চোখ দেয়ালে রেখে চীৎকার করো নি, বলোনি ঃ আমি দেখতে পাই-নি?

ক্ষীণ গলায় জর্জ বললো, আমি চেষ্টা

করেছিলুম জর্জ, কিন্তু কি যে হোয়ে গেল— সেই প্রথমবার দেখলুম সত্যের সম্মুখীন হোয়েও শান্তি পাওয়া যায়......

—কি বললে? আর একবার বলো! —ডিউক অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, তুমি না ভদ্রলোক! যে কোনো ভদ্রলোক মেয়েটিকে ওই অবস্থায় দেখলে হয় তার গায়ে একটি অঙ্গাবরণ ছুঁড়ে দিতো, না হোলে নিজের মুখ দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে নিতো।

সেণ্টজর্জ সেণ্ট আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। তার দুচোখে যেন বিষণ্ণতার কালো ছায়া—দাঁড়ানোর ভঙ্গীতেও যেন কিছুমাত্র দৃঢ়তা অথবা ঋজুতা নেই। সে টেবিলের ওপর ঈষৎ নুয়ে পড়ে শান্তকণ্ঠে বললো, বন্ধু, আমিও সেই প্রচেষ্টা করেছি—আমার সঙ্গে দেওয়ার মতো কোনো অঙ্গাবরণ ছিল না—সামনে কোনো দেয়ালও ছিল না। ভেবেচিন্তে সেক্ষেত্রে যা প্রশস্ত বলে মনে হোয়েছে তাই করে এসেছি। তোমার ছাতার কথা জিগ্যেস করছিলে আমি সেটা তাকে দিয়েছি।

অনুবাদক—সমীর ঘোষ

মুসলিম লীগ কাউন্সিল ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন—Compromise হিসাবে। খবরটা অপ্রত্যাশিত না হইলেও খানিকটা নূতন কেননা লীগাররা Compromise করিতে জানেন এই খবরটা আমাদের জানা ছিল না। প্রসঙ্গত বিশু খুড়ো পরমহংসদেব কথিত চিল আর সাপের গল্পটি পাড়িলেন। চিলের অনুরোধ-উপরোধেও সাপ কিছুতেই সোজা হইয়া চলিত না। একদিন সাপটা মরিল। তাহাকে সোজা হইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া চিলটা সখেদে বলিল—"বন্ধু, সেই সোজা হলে কিন্তু বেঁচে থাক্‌তে হ'লে না"; আমরাও সখেদেই বলি সেই Compromise হইল কিন্তু......

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, মিঃ ফিরোজ খাঁ নূন শিখদিগকে পাকিস্তান এলাকায় টানিয়া আনার চেষ্টা করিতেছেন। "নূন-টান শিখকাবাব (কাবার) শিখদের রুচিকর হইতেছে না"—বলেন খুড়ো।

* * *

সিলেট আসামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকিলে লীগাররা আর আপত্তি করিবে না বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। "পাকিস্তানে সিলেট-খাতা-পেন্সিলের প্রয়োজন নাই বলিয়াই হয়ত"—বলিল আমাদের শ্যামলাল।



"Morning News" জানাইতেছেন—Calcutta built by Muslim Jute growers"—"ঝুট্‌ খবর বলিয়া আমরা এই খবরে কোনই গুরুত্ব আরোপ করিতেছি না"—ভাষ্য বিশুখুড়োর।

* * *

কলিকাতায় এক সপ্তাহের জন্য চিনির বরাদ্দ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "মোকামা স্টেশন হইতে উধাও চিনির গাড়ী কলিকাতা আসিয়া হয়ত আবার মোকাম খুঁজিতেছে"—তিক্তকণ্ঠে বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

বাংলা বিভক্ত হইয়া গেলে সেক্রেটেরিয়েটে জমা ফাইলগুলির কি ব্যবস্থা হইবে সেই প্রশ্ন করা হইলে জনৈক বৃটিশ আই সি এস অফিসার নাকি রসিকতা করিয়া বলিয়াছেন—"White ants should be allowed to dispose of the files"—খুড়ো বলিলেন—বৃটিশ অফিসারটি White ants বলিতে "উই", না "We" বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তা বোঝা গেল না।

* * *

লঙ্কায় এখনও পুরাদমে শ্রমিক ধর্মঘট চলিতেছে। লঙ্কাকাণ্ডের আগেই একটি রফা হইয়া যায় এই আমাদের প্রার্থনা।

* * *

হাঙ্গারী লইয়া ত্রিশক্তির মধ্যে নাকি বিরোধ চলিতেছে। "সকলেই Hungry কিনা, সুতরাং"......বলেন খুড়ো।

* * *

Plans to develop Musol oil-fields—একটি সংবাদ। "শেষ পর্যন্ত একদিন মুষল প্রসব না হয়, যাদুরা যেন সেই কথা মনে রাখেন"—এই সতর্কবাণীটিও খুড়োই উচ্চারণ করিলেন।

* * *

একটি সংবাদে দেখিলাম বৃটেনের গৃহিণীরা নাকি খাদ্য ও কয়লা বরাদ্দ হ্রাসের প্রতিবাদে House of Commons invade করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে গৃহিণীরাও House of Commons-এর



সভ্যদের কাছেই প্রতিবাদ জানান তবে এই সভ্যদের অন্য নাম স্বামী অর্থাৎ যিনি নিতান্তই Common মানুষ।

ধবল ও কুষ্ঠ

গাত্রে বিবিধ বর্ণের দাগ, স্পর্শশক্তিহীনতা, অঙ্গাদি স্ফীত, অঙ্গুলাদির বক্রতা, বাতরক্ত, একজিমা সোরায়েসিস্ ও অন্যান্য চর্মরোগাদি নির্দোষ আরোগ্যের জন্য ৫০ বর্ষোর্দ্ধকালের চিকিৎসালয়

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আপনি আপনার রোগলক্ষণ সহ পত্র লিখিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপুস্তক লউন।

—প্রতিষ্ঠাতা—

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া।

ফোন নং ৩৫৯ হাওড়া।

শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

(পূরবী সিনেমার নিকটে)

ভারতের আদিবাসী

শ্রীসুবোধ ঘোষ

(৮)

লেখাপড়া শিখে হাজার হাজার বাঙালী ভদ্রলোকের মত দশটা-পাঁচটা অফিসে কেরাণী-গিরি করছেন, এমন আদিবাসীও অনেক রয়েছেন। আর আছে—সাধারণ পুলিস, তশীলদার, মোটর ড্রাইভার, মিস্ত্রি, পিয়ন, দোকান কর্মচারী ইত্যাদি। ছোটনাগপুরের খৃষ্টান আদিবাসী মেয়েরা দলে দলে নার্সের কাজ শিখে জীবিকা নির্বাহ করছে। পরধান গোষ্ঠীর আদিবাসী স্টেশন মাস্টারের কাজ করছেন দেখা যায়। কলকাতার ময়দানে হকি টুর্নামেণ্টে ভারতের বিখাত টীমগুলি প্রতি-যোগী আদিবাসী টীমের শক্তি ও দক্ষতার আস্বাদ অনেকবার পেয়েছে। রাঁচী-হাজারিবাগের হকি ভারতবিখ্যাত এবং এই খেলা আদি-বাসীদের কাছে একপ্রকার জাতীয় খেলা (National Game) হয়ে উঠেছে। ঠিক আধু-নিক হিন্দুসমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরকম তিনটি অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়, আদিবাসী সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ভোগসুখের সুবিধায় উন্নত হয়ে সেইরকম তিন ভাগে ভাগ হয়েছে—অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণী এবং এ'রা সকলেই 'ভদ্রলোক'।

বর্তমান ভারতের বৃহত্তর সংস্কৃতির সম্পর্কে (Culture-Contact) পড়েই আদিবাসী সমাজের মধ্যে এইসব নূতন ভদ্রলোক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে সন্দেহ নেই। এ'দের সমস্যাকে 'আদিবাসী সমস্যা' বললে ভুল হবে, এ'রা ভারতের বিরাট ভদ্রলোক শ্রেণীরই (Middle Class) একটা অংশ বিশেষ। এবং এ'দের অভাব অভিযোগ ও দাবী বস্তুত ভারতের সাধারণ মধ্যশ্রেণী ভদ্রলোকের অভাব অভিযোগ ও দাবীর মতই, গুণে ধর্মে একই।

এরপর বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রোপেত ভারত-বর্ষের খনি কারখানার দিকে লক্ষ্য করা যাক। সেখানেও ভারতের আদিবাসীকে দেখতে পাই, আধুনিক মজুরের রূপে। টাটানগরের কার-খানায় যারা কলকব্জার সঙ্গে কাজ করে, ময়ূরভঞ্জের প্রান্তরে লৌহপ্রস্তর কুড়োয়, ঝরিয়া, ধানবাদ, গিরিডির কয়লা খনির অভ্যন্তরে যারা মাল কাটে আর টব বোঝাই করে, তাদের মধ্যে হাজার হাজার আদিবাসীর স্বেদোক্ত মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। পারি ওয়ার্কসের নতুন সড়কে যারা খোয়া ভাঙছে, ছোটনাগপুরের ছোট ছোট রেলস্টেশনে যারা বাবুসাহেবদের বোঝা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে আর আনছে, মাটি খুঁড়ছে আর গাছ কাটছে —সেই নিছক গতর-খাটা দিনমজুর (Un-skilled labour), হাজার হাজার কুলি ও কামিনের মধ্যে শত শত আদিবাসী নারী ও পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আরও আছেঃ—

"নদীয়ামে আইল বান
পার কর ভগবান
স্বামীর সাথে আসাম চলি যাব"

নৃত্যপরা সাঁওতালী মেয়ের গলায় এই বাঙলা ভাষার ঝুমুর গান আধুনিক সাঁওতাল সংসারের আর একটা ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্যি সত্যি হাজার হাজার সাঁওতাল মেয়ে স্বামীর সঙ্গে জলপাইগুড়ি ও আসামের চা-বাগানে মজুরের কাজ করতে চলে গেছে।

সুতরাং, আদিবাসী সমাজ ভারতের বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সংঘাতে পড়ে শুধু যে একটি ক্ষুদ্র ভদ্রলোক শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে তা নয়, এদের মধ্যে একটি আধুনিক মজুর শ্রেণীরও উদ্ভব হয়েছে—খনি ও কারখানার কর্মকুশল শ্রমিক (skilled labour), গতর-খাটা শ্রমিক (Unskilled labour) এবং খামার শ্রমিক (Plantation labour)। এবিষয়ে আদিবাসী শ্রমিকের সমস্যাও ভারতের অন্যান্য সাধারণ শ্রমিকের সমস্যার মতই। সাধারণ ভারতীয় শ্রমিককে যে ব্যবস্থায় জীবিকা অর্জন করতে হয়, তাতে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক হানি হয়েছে। আদিবাসী শ্রমিকের সম্বন্ধেও একথা খাটে। আধুনিক মজুর জীবনে আদিবাসী তার গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারছে না।

ভারতের দরিদ্র হিন্দু শ্রমজীবীর সঙ্গে আদিবাসী শ্রমজীবীর একটা মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু শ্রমজীবী পেটের দায়ে ভারত ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে কুণ্ঠিত নয়, মালয়ের রবার বাগান, মরিসাসের আকের ক্ষেত ও চিনির কল, ফিজি, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপিন, ত্রিনিদাদ—কোথায় না গরীব হিন্দু সস্তা মজুর (Cheap labour) হিসাবে রপ্তানী হয়েছে? কুখ্যাত গিরমিটিয়া প্রথায় (Indentured Labour) ভারতের বাইরে যেসব দরিদ্র ভারতীয় মজুরী করতে গিয়েছিল, তারাও হিন্দু, আদিবাসী নয়।

এই ব্যাপার থেকে একটা ধারণা করা যায় যে, ভারতের প্রাচীনতম সন্তান এই আদিবাসী সমাজের অন্তশ্চেতনায় একটা যেন শিশুসুলভ মায়ের-আঁচলধরা মনোভাব লুকিয়ে আছে, যার জন্যে তারা ভারতের মাটি ছেড়ে দেশান্তরের নতুন মাটির দিকে চলে যেতে প্রলুব্ধ হয় না। হয়তা এটা ধারণা মাত্র এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। হয়তো এটা একটা গোষ্ঠীগত প্রকৃতি মাত্র। কিন্তু যাই হোক, আদিবাসীরা যে অপরিচিত বিদেশে জীবিকার জন্য চলে যেতে উৎসাহী নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং এই মনস্তত্ত্বের মধ্যে তাদের দেশবোধ বলে যে একটা সত্য সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, সেটাই বড় কথা। বড়জোর বলা যায়, এই দেশবোধ একটা সজ্ঞান সংস্কার নয়। অন্তত এইটুকু স্বীকার করে নিতে হবে যে, সাধারণ দরিদ্র হিন্দু জনসাধারণের মনে দেশবোধ যতটা সত্য হয়ে উঠেছে, আদিবাসী সমাজের দেশবোধ, অজ্ঞাতসারে হলেও তার চেয়ে কম সত্য নয়।

আদিবাসী সমাজের মধ্যে যে ভদ্রলোক শ্রেণীর উদ্ভবের কথা বলা হলো, সেই শ্রেণীর মধ্যে একটা অংশের মনস্তত্ত্বের যে পরিচয় পাওয়া গেছে, সেটা প্রীতিকর নয়। বৃহত্তর ভারতের প্রতি একটা বৈরীভাব এ'দের মনো-ভাব আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ব্যক্তিগত জীবনে এ'রা আদিবাসী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, কারণ এ'রা মনে প্রাণে ও আচরণে 'ভারতীয় ভদ্রলোক' ছাড়া আর কিছু নন। শিক্ষায় ও সম্পদে উন্নত। স্বসমাজের প্রতি কোন সেবা বা গঠনমূলক কাজের আদর্শ এ'দের নেই। স্বসমাজের দরিদ্র জনসাধারণ এ'দের কাছে একটা 'ভোটে'র ভাণ্ডার মাত্র। আদিবাসী সমাজের এই অংশ, যদিও সংখ্যায় এরা নগণ্য, রাজনীতির ক্ষেত্রে ভেদবুদ্ধি ছাড়া আর কিছু প্রচার করতে পারেননি। এই ভেদবুদ্ধি শেষ পর্যন্ত 'পৃথক ঝাড়খণ্ডের' দাবীতে এসে পেঁাছেছে।

এই মনোবৃত্তি শুধু যে কয়েকজন শিক্ষিত আদিবাসী নেতার মধ্যে আমরা দেখতে পাই তা নয়, এটা বর্তমান সমস্যাগ্রস্ত ও পরশাসন পীড়িত ভারতেরই একটা রাজনৈতিক কম্প্লেক্স, যা কয়েকজন অত্যন্ত ধনী হরিজন অর্থাৎ অ-বর্ণহিন্দু নেতার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে, যা অনেক মুসলমান নেতার মধ্যে অধঃপতনশীল জেদ রূপে দেখা দিয়ে পাকিস্থান সম্ভব করে তুলেছে।

আদিবাসী সমাজের যে অল্প সংখ্যক কয়েকজন শিক্ষিত নেতা নিখিল ভারতীয় জাতীয়তাকে শ্রদ্ধা করতে পারছেন না, তাদের মনোভাব আমরা বুঝতে পারি। এটা ব্যক্তিগত অভিমানের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। ব্রিটিশ শাসনের সূচনায় কিয়ৎকালের মধ্যেই হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা শিক্ষিত ও সম্পন্ন

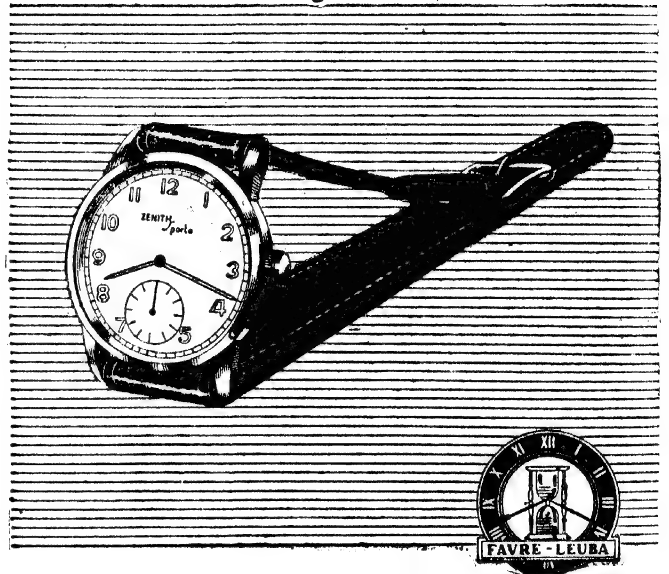
ভদ্রশ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং তাঁরা তাঁদেরই স্ব-সমাজের ওপর মোড়লী করে একসঙ্গে ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও স্বার্থোন্নতির দ্বারা আত্মপুষ্টি করেছিলেন। সেই সুখের শ্রেণীশাসনের অধ্যায় ও আভিজাতিক প্রতিপত্তি ঐতিহাসিক কারণেই ভেঙ্গে পরিবর্তিত হতে চলেছে। ইংরাজাধীন ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজই এই প্রতিপত্তিশালী মধ্যশ্রেণী সব চেয়ে আগে সৃষ্টি করেছিল এবং হিন্দুসমাজই সব চেয়ে আগে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এ অবস্থা চলতে পারে না। এই উপলব্ধিই হিন্দুকে বৃহত্তর জাতীয়তা বা ভারতীয়তার আদর্শে চালিত করেছে। কয়েক-জন সম্পন্ন ও শিক্ষিত আদিবাসী একটা ক্ষুদ্র আভিজাতিক শ্রেণী হয়ে দেখা দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু, বড় দেরীতে দেখা দিয়েছেন। কারণ ইতিমধ্যেই শ্রেণী প্রতিপত্তির অপ্রিয় অধ্যায়কে পেছনে ফেলে গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ভারতবর্ষে শুরু হয়ে গেছে। নতুন আদিবাসী, অ-বর্ণহিন্দু বা মুসলমান অভিজাত এবং মধ্য শ্রেণী (Middle Class) সেইভাবে এগিয়ে যেতে চান না। হিন্দু অভিজাত ও মধ্যশ্রেণী অনেকদিন আগে থেকেই যে অপকর্মটি করে আসছিলেন (অর্থাৎ সমাজের ওপর তাঁদের শ্রেণীগত প্রতিপত্তি), এই সব পাকিস্থান ও ঝাড়খণ্ডের দাবীদার সাম্প্রদায়িক নেতারা সেই অপকর্মটি করবার সুযোগ চাইছেন। এবং এটাকেই তাঁরা গণতান্ত্রিক দাবী বলে মনে করছেন। একটা সম্পন্ন শ্রেণী হয়ে স্ব-সমাজের ঘাড়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের কাঁঠাল ভাঙ্গবার সুযোগ পাওয়া চাই। তাঁদের এ সুযোগ না দিয়ে ভারত-বর্ষ যদি জাতীয় সাধারণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তবে সেই ইতিহাসকে তাঁরা খুসী মনে গ্রহণ করতে পারেন না। পৃথক্ ঝাড়খণ্ড হলে আদিবাসী সমাজের এই নবোদ্ভূত ক্ষুদ্র মধ্যশ্রেণীটি শাসক শ্রেণীতে (Ruling Class) উন্নীত হতে পারবে, এই সাধের স্বপন কয়েক-জন শিক্ষিত আদিবাসীকে ব্যাকুল করে তুলেছে। বৃহত্তর ভারতের গণতান্ত্রিক জাতীয়তার মধ্যে থাকলে, এ স্বপ্ন সফল হবার আশা নেই। মিঃ জিন্না ডাঃ আম্বেদকরের আর মিঃ জয়পাল সিং এ তিন নেতার মনোবৃত্তি একই প্রতিক্রিয়াপ্রবণ মধ্যশ্রেণীর আধিপত্য বিলাসের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা গঠিত।

সাম্প্রতিক কালে, অর্থাৎ বস্তুত গণ-পরিষদে যোগদান করার পর ডাঃ আম্বেদকার ও মিঃ জয়পাল সিংয়ের মনোবৃত্তির মধ্যে একটু পরিবর্তনের হাওয়া যেন লেগেছে মনে হয়। ভারতের প্রতি মিঃ জিন্না যেরকম বহিরাগত অভিযানকারীর (Invader) মত মনোভাব দেখিয়েছেন, ডাঃ আম্বেদকর ও অন্যতম আদি-বাসী নেতা মিঃ জয়পাল সিং সেরকম 'বৈদেশিকতা' দেখাতে পারেননি। অন্তত এই দুই নেতা কংগ্রেসবিরোধী হয়েও রাগের মাথায় তাঁদের জাতীয়তাবোধ বিসর্জন দেননি। আশা করা যায় আদিবাসী সমাজের ক্ষুদ্র শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে অল্পসংখ্যক যাঁদের মন এখনো সংশয়াতুর হয়ে আছে, তাঁরা অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের ভুল বুঝতে পারবেন। আদিবাসী জনগণের মনোভাব মোটামুটি অনাবিল আছে, গত নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে প্রায় শতকরা নব্বইটি ভোট দিয়ে আদিবাসী সমাজের জন-সাধারণ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, অন্য বিষয়ে অনগ্রসর হলেও জাতীয়তাবোধ অথবা ভারতীয়তাবোধ তাঁদের চেতনা স্পর্শ করেছে

(ক্রমশঃ)

জেনিথ স্পোর্টো

ঘড়িগুলি ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে



চিত্রে জেনিথ স্পোর্টো ওয়াচের হুবহু আকার প্রদর্শিত হইয়াছে। ষ্টেনলেশ ষ্টীল ব্যাক ডিজাইন। ধূলিবালি ও আঘাতাদিতে আদৌ ক্ষতি হয় না। ১৩৬৪নং মূল্য ১৪৭৲ টাকা। উপরোক্ত আকারের অনুরূপ ১০½‴—আগাগোড়া ইস্পাত নির্মিত ওয়াটার প্রুফ—মূল্য ১৮৫৲ এবং ২০০৲ টাকা।

বহু বছর প্রতীক্ষার পর জেনিথের ঘড়িগুলি এই প্রথম ভারতে পৌঁছিয়াছে। প্রত্যেকটি জেনিথ ঘড়ি কারিগরির দিক হইতে নিখুঁত এবং সৌন্দর্যের দিক হইতেও অনবদ্য। ছবিতে প্রদর্শিত ডিজাইন মাফিক মডেলই শুধু এখন পাওয়া যাইবে। কিন্তু পরে অন্যান্য সোনার জেনিথ ঘড়িগুলিও পাইবেন—তখন আপনি আপনার মনোমত জিনিষটি পছন্দ করিয়া লইতে পারিবেন।

FAVRE-LEUBA

ফেবর্-লিউবা এণ্ড কোং, লিঃ : : বোম্বাই ও কলিকাতা

হিমালয়ে নূতন অভিযান

অনেক দিন পরে আবার হিমালয় অভিযান শুরু হবে বলে জানা গেছে। সম্প্রতি আঁদ্রে রোক্-এর নেতৃত্বে এক সুইস অভিযাত্রী দল এই উদ্দেশ্যে করাচী এসে পৌঁছেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এই অভিযাত্রী দলে চারজন পুরুষ ও একটি মহিলা আছেন।





এবারকার হিমালয় অভিযাত্রী দল

এঁরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে অভিযান শুরু করবেন। একদল এই মাসেই কারাকোরাম পর্বতের পাদদেশ থেকে অভিযান শুরু করবেন—অন্য দল 'গঙ্গোত্রী' থেকে পাহাড়ে চড়া আরম্ভ করবেন।

বিবাহের উপযুক্ত বয়স

সম্প্রতি আমেরিকার একটি খবরে জানা গেছে যে, সেখানে সাউথ বেন্ড বলে যায়গাটির অধিবাসী চিরকুমার ড্যান ইয়ং সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন—এতদিনে তিনি বিয়ে করবেন বলে মনস্থ করেছেন—তবে তিনি যে কোন তরুণী মেয়েকে বিয়ে না করে বিয়ে করবেন তাঁরই সমান-বয়সী কোন কুমারীকে। ড্যান ইয়ংয়ের বয়স বর্তমানে অবিশ্যি খুব বেশী নয়—মোটে একশো তিন বছর! বিবাহের উপযুক্ত বয়সই বটে, কি বলেন?

মারাত্মক মাতৃস্নেহ

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন শহর থেকে মাতৃস্নেহের একটি অদ্ভুত খবর সংগ্রহ করেছি। সেটি হচ্ছে চার্টরিনা কোফবার্গ বলে একটি মা—অপর একটি কাফ্রি মহিলার সঙ্গে ঝগড়া করবার সময় এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, তিনি বিপক্ষকে আঘাত করবার জন্য তাঁর কোলের শিশু-সন্তানকে ছুঁড়ে দেন। শক্ত কনক্রীটের মেঝেতে শিশুটি গড়িয়ে পড়ে। তবে ভাগ্যক্রমে তার কোনও আঘাত লাগেনি। এমন সময় পুলিশ এসে পড়ে এবং চার্টরিনাকে গ্রেপ্তার করে। গারদে নিয়ে যাবার সময় চার্টরিনা মেঝে থেকে তাঁর শিশু-সন্তানটিকে কোলে তুলে নেয়। চার্টরিনা এখন জেলেই আছেন। বিচারে তাঁর ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে।

সৃষ্টিছাড়া লাল বৃষ্টি

সম্প্রতি জানা গেছে—ক্যালে থেকে কোপেনহ্যাগেন পর্যন্ত এলাকা জুড়ে—ইউরোপের নানা জায়গায় নাকি লাল রঙের বা রক্তবরণ বৃষ্টি পড়তে দেখা গেছে। সুইজারল্যাণ্ডে রক্তবরণ তুষারপাত হয়েছে বলেও জানা গেছে। কাজেই এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বৈজ্ঞানিকরা সবাই মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন। কোপেনহ্যাগেনের এক বৈজ্ঞানিক ঐ লাল বৃষ্টির জল ধরে নিয়ে পরীক্ষা করে বলেছেন—এই রকম লাল রঙয়ের বৃষ্টি হওয়ার কারণ হচ্ছে—সেখান থেকে ১২০০ মাইল দূরে হেক্‌না আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা বলছেন—লালবৃষ্টি পড়ার কারণ হচ্ছে—সাহারার মরুভূমি থেকে—প্রবল বায়ুর বেগে—লাল বালুকণা মেঘের সঙ্গে মিশেছিল—তাই তখন লাল বৃষ্টি পড়েছে। আমাদের ভজহরি খুড়ো বলেছেন—"ইউরোপ সারা পৃথিবীতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে—ওদের দেশে দেবতা রক্তবৃষ্টি দেবেন না তো কোথায় দেবেন?" আপনারাও কি খুড়োর কথায় সায় দেবেন না বৈজ্ঞানিকদের যুক্তি মেনে নেবেন? যা ভাল মনে হয় করুন।

শাইকা

খোস, একজিমা, হাজা, কাটা, ঘা, পোড়া ঘা, নালীঘা, ফুস্কুড়ি, চুলকানি, ও চুলকানিযুক্ত সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগে অব্যর্থ

এরিয়ান রিসার্চ ওয়ার্কস
পি১৩ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ (নর্থ)
কলিকাতা ফোন-বি.বি. ২৬৩৩

অপস্মার ও হিষ্টিরিয়া

চিরদিনের মত নিরাময়

এই আশ্চর্য ফলপ্রদ ওষধির আঘ্রাণে মূর্চ্ছাক্রান্ত রোগীর হাঁচি হইবে এবং সেই সঙ্গে ১' ১।৪" পরিমাণ একটি কালো রঙের পোকা বাহির হইয়া আসিবে। রোগী চিরদিনের মত আশ্চর্যজনকভাবে আরোগ্য লাভ করিবে।

ইংরাজীতে আবেদন করুন:—

শ্রী১০৮ মহাত্মা সিদ্ধবাবা
পোষ্ট নাগোদ (জব্বলপুর)

(এম ৮—১১।৬)

খেলাধূলা

ক্রিকেট

ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রথম টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের দুর্ভাগ্য যে, ইংলণ্ডকে "ফলো অন" করিয়াও জয়লাভে সমর্থ হইল না। ইংলণ্ড দলের পরাজয় ছিল একরূপ নিশ্চিত; কেবল কম্পটন ও ইয়ার্ডলী দ্বিতীয় ইনিংসে দৃঢ়তার সহিত খেলায় ইংলণ্ড পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। খেলায় জয়লাভ করিতে না পারিলেও দক্ষিণ আফ্রিকা দল এই খেলায় প্রমাণিত করিয়াছে যে, তাহাদের যতখানি শক্তিহীন বলিয়া ধারণা করা হয় ততখানি নহে। যুদ্ধের সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রিকেট খেলার "রেওয়াজ" একেবারেই ছিল না কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্যই পূর্ব খ্যাতি অনুযায়ী খেলিতে পারিতেছে।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ আগামী ২১শে জুন হইতে আরম্ভ হইবে। ইংলণ্ড দলের পরিচালকগণ প্রথম টেস্ট খেলার শোচনীয় ফলাফল লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের জন্য দলের পরিবর্তন করিয়াছেন। দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা দল পুনরায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রথম টেস্ট খেলার বিবরণ

দক্ষিণ আফ্রিকা দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করে। প্রথম দিনের শেষে ৩ উইকেটে ৩৭৬ রাণ করে। মেলভিল ১৮৩ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। নর্স ১৪৯ রাণ করিয়া আউট হন। ইহারা দুইজনে একত্রে তৃতীয় উইকেটে ৩১৯ রাণ সংগ্রহ করিয়া নূতন রেকর্ড করেন। দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রথম ইনিংস ৫৩৩ রাণে শেষ হয়। ইংলণ্ড দলের হোলিসের বোলিং কার্যকরী হয়। ইংলণ্ড দল দ্বিতীয় দিনের শেষে ২ উইকেটে ১৫৪ রাণ করে। এডরিচ ৪৪ রাণ ও কম্পটন ৬৫ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে টাকেট ও স্মিথের বোলিং ইংলণ্ড দলের বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ইংলণ্ড দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ২০৮ রাণে শেষ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা দল ৩২৫ রাণে অগ্রগামী থাকিয়া ইংলণ্ড দলকে "ফলো অন" করিতে বাধ্য করে। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ২৭৮ রাণ করে। কম্পটন ৮৩ রাণ ও ইয়ার্ডলী ৪৫ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। চতুর্থ দিনে বা শেষ দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বোলারদের ব্যর্থ করিয়া ইয়ার্ডলী ও কম্পটন দলের রাণ তুলেন। খেলা শেষ হইবার আড়াই ঘণ্টা পূর্বে ইংলণ্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৫৫১ রাণে শেষ হয়। ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটে ২২৭ রাণ করিলে জয়ী হইতে পারিবে এইরূপ অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকা দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ হয়। মেলভিল ও ভিনজোয়েল প্রয়োজনীয় রাণ তুলিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সফলতা লাভ করিতে পারেন না। দিনের শেষে এক উইকেটে ১৬৬ রাণ হয়। মেলভিল ১০৪ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন।

এই খেলায় মোট ছয়টি নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ছয়টি নূতন রেকর্ড

(১) মেলভিলের ব্যক্তিগত ১৮৯ রাণ। ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড় হিসাবে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক রাণ। ইতিপূর্বে ১৯২২ সালে জোহানিজবার্গে হার্বি টেলার ১৭৬ রাণ করিয়া রেকর্ড করেন। মেলভিল সেই ব্যক্তিগত রেকর্ড ভঙ্গ করিলেন।

(২) মেলভিল ও নর্স একত্রে তৃতীয় উইকেটে প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩১৯ রাণ সংগ্রহ করেন। ইহা তৃতীয় উইকেটের টেস্ট খেলার নূতন রেকর্ড। ইতিপূর্বে ১৯৩৮-৩৯ সালে পি এ গিব ও ডবলিউ এডরিচ ডার্বানে খেলিয়া তৃতীয় উইকেটে ২৮০ রাণ করেন। মেলভিল ও নর্স সেই রেকর্ড ভঙ্গ করিলেন।

(৩) দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রথম ইনিংসে ৫৩৩ রাণ হয়। ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার মোট রাণের নূতন রেকর্ড। আট বৎসর পূর্বে ডার্বানে টেস্ট খেলার সময় দক্ষিণ আফ্রিকা দল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ৫৩০ রাণ করিয়া নূতন রেকর্ড করেন।

(৪) ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৫১ রাণ হয়। ইহা ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট খেলার মোট রাণের নূতন রেকর্ড।

(৫) দ্বিতীয় ইনিংসে কম্পটন ও ইয়ার্ডলী পঞ্চম উইকেটে ২৩৭ রাণ করিয়া পঞ্চম উইকেটের নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ১৯৩৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওভালে খেলিয়া পঞ্চম উইকেটে লেল্যাণ্ড ও লেস্‌লী জেমস ১৭৯ রাণ করিয়া রেকর্ড করেন।

(৬) মেলভিল প্রথম দ্বিতীয় উভয় ইনিংসেই শতাধিক রাণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কোন দক্ষিণ আফ্রিকান খেলোয়াড়দের পক্ষে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় পর পর দুই ইনিংসে শতাধিক রাণ করা সম্ভব হয় নাই।

খেলার ফলাফলঃ—

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসঃ—৫৩৩ রাণ (মেলভিল ১৮৯, নর্স ১৪৯, হ্যারিস ৬০, হোলিস ১২৩ রাণে ৫টি ও বেডসার ১০৬ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসঃ—২০৮ রাণ (কম্পটন ৬৫, এডরিচ ৫৭, টাকেট ৬৮ রাণে ৫টি, স্মিথ ৪৬ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৫৫১ রাণ (কম্পটন ১৬৩, ইয়ার্ডলী ৯৯, ওয়াসব্রুক ৫৯, এডরিচ ৫০, ইভান্স ৭৪, স্মিথ ১৪৩ রাণে ৪টি, ডসন ৫৭ রাণে ২টি, ও রোয়ান ১০০ রাণে ২টি উইকেট পান।)

দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১ উইঃ ১৬৬ রাণ (মেলভিল নট আউট ১০৪ রাণ।)

অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল

অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর কলম্বো হইতে এস এস ওরিয়েল জাহাজযোগে অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে যাত্রা করিবে বলিয়া কন্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক প্রচার করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বিমানে যাইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা বাতিল করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে—খরচ অনেক কম হইবে।

টেনিস

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডেন শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন। ইহাদের মধ্যে কেহ হয়তো কোন বিভাগের চ্যাম্পিয়ান হইবেন না, তবে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ন্যায় শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শন করিবেন না ইহা বর্তমানে জোর করিয়াই বলা যায়। ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সুমন্ত মিশ্র দক্ষিণ ইংলণ্ড টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস ও ডাবলসে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। ডাবলসে মেটা মিশ্রের সহযোগিতা করেন। অপর দিকে কাউণ্টী টেনিস প্রতিযোগিতায় ইফ্তিকার ... মিক্সড ডাবলসে বিজয়ী হইয়াছেন। পর ... ডাবলস ফাইনালে উন্নীত হইয়াছিলেন। ... সহযোগী ছিলেন গাউস মহম্মদ। ফা... অস্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যাণ্ড দলের নিকট ... বরণ করিয়াছেন। মানমোহন ভারতীয় ডেভিস ... দলে মনোনীত হন নাই। কিন্তু তিনি ইংলণ্ড টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস ফা... উঠিতে সক্ষম হন। এই ফাইনালে সুমন্ত ... সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজয় ... করিয়াছেন। উক্ত দুইটি প্রতিযোগিতায় পো... নিউজিল্যাণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের ... খেলোয়াড়গণ যোগদান করিয়াছিলেন। তা... সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও ভারতীয় খেলো... গণ সাফল্যলাভ করিয়াছেন ইহা খুবই ... বিষয়।

"শ্রীচিত্রকূট দমনাশক পার্বত্য ওষধি"

হাঁপানি রোগীর নিরাশ হইবার কারণ না... উপরোক্ত ওষধি শুধু একমাত্রা সেবনে হাঁপ... চিরতরে সারিয়া যায়। বেশী বলা বাহুল্য ম... জনৈক পরলোকগত মহাত্মা কর্তৃক প্রদত্ত ... মহৌষধি সেবনে বহু রোগী উপকৃত হইয়াছে... পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ৩।৭।৪৭ পূর্ণিমা রা... এই ওষধি সেবন বিধেয়। হিন্দী অং... ইংরাজিতে পত্রালাপ করার জন্য অনুরোধ ক... যাইতেছে।

ম্যানেজার

শ্রীচিত্রকূট দমনাশক আয়ুর্বেদ সেবা আ...

পোঃ চিত্রকূট, জেলা বান্দা

(এস ৮—১১...

দীপায়ন

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ ও যুগোপযোগী সাহিত্যের বাণীবাহক; বাঙলার জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে ১৩৫৩ আষাঢ় থেকে নিয়মিত বেরুচ্ছে। দ্বিতীয় বর্ষ চলছে।

আষাঢ় সংখ্যায় লিখেছেনঃ

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবন্ধ)
জসীম উদ্দীন (নাটক)
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)
এ, এফ, এম, আব্দুল জলীল (প্রবন্ধ)
যোগেশচন্দ্র বাগল (প্রবন্ধ)
কাজী নজরুল ইসলাম (কবিতা)

ষাণ্মাষিক চাঁদা সডাক ২৲ ও বার্ষিক ৪৷৷৹

(মফঃস্বলে সর্বত্র এজেণ্ট চাই)

গ্রাহক হইবার জন্য বিনামূল্যে নমুনা কপি দেওয়া হয় না।

পরিচালকঃ দীপায়ন

৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা—১।

(সি ১০৪৮)

দেশী সংবাদ

৯ই জুন—নয়াদিল্লীতে নিঃ ভাঃ মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ৩রা জুনের পরিকল্পনা আপোষ হিসাবে মানিয়া লইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। লীগ কাউন্সিল মিঃ জিন্নাকে সেনাবাহিনী এবং দেশ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিভক্তকরণ সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার অধিকার দান করিয়াছেন।

ছত্রীর নবাব আজ হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেন। ইহার পর প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিজাম কাউন্সিলের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নিজাম রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে।

জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী স্যার ভি টি কৃষ্ণমাচারী এবং বিকানীরের প্রধান মন্ত্রী সর্দার কে এম পানিক্কর এক যুক্ত বিবৃতিতে সমস্ত দেশীয় রাজ্যকে যথাশীঘ্র গণ-পরিষদে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বিহার গভর্নমেণ্ট বিহারের ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের পুনর্বসতির জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ৬ মাসে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

১০ই জুন—বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ৩রা জুন তারিখের বিবৃতির ৫ম হইতে ৮ম অনুচ্ছেদকে কিভাবে কার্যে রূপ দিতে হইবে, অদ্য গভর্নর-জেনারেল এক ঘোষণায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত ৪টি অনুচ্ছেদে বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগের নীতি ঘোষণা করা হইয়াছিল। গভর্নর জেনারেলের ঘোষণার পরিশিষ্টে মুসলমান ও অ-মুসলমান কেন্দ্র ও প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিনিধি সংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে।

গতকল্য লাহোরে এক আলোচনা বৈঠকে শিখ নেতৃবৃন্দ বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সীমা নির্ধারণ কমিশনের বিচার সাপেক্ষে এই পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

যোধপুরের মহারাজা স্যার উমিদ সিংহজী সাহেব বাহাদুর পরলোকগমন করিয়াছেন।

১১ই জুন—বাঙলা দেশ বিভক্ত হইবে কি না তাহা স্থির করার জন্য বাঙলার গভর্নর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদিগকে (ইউরোপীয় সদস্যগণ বাদে) আহ্বান করিয়াছেন। আগামী ২০শে জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ভবনে সদস্যদের অধিবেশন হইবে। হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলির সদস্যদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য গভর্নর বর্ধমানের মহারাজা বাহাদুর স্যার উদয়চাঁদ মহতাবকে নিয়োগ করিয়াছেন। আর মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলির সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার মিঃ নুরুল আমিনকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক জনসভায় এইরূপ দাবী করা হয় যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দু ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ যেন পরিষদের উভয় অংশের আসন্ন অধিবেশনে একযোগে বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলে নূতন জাতীয় বঙ্গ গঠনের পক্ষে ভোট দেন। সভা উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সমুদয় হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিকে প্রস্তাবিত নববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবীও দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করে।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, ঢাকেশ্বরী কটন মিলে এক হাঙ্গামার ফলে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আগামী ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, জনরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান আইন অনুযায়ী গঠিত বিশেষ আদালত বৃহত্তর বোম্বাইয়ে ৩১শে মে পর্যন্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে ছয় ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আলিপুরের প্রথম স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল খান বাহাদুর ফরিদ আমেদ চৌধুরীকে (এম এল এ) ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি ভারত গভর্নমেণ্টকে প্রতারণার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

নয়াদিল্লীতে ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের কার্যনির্বাহক পরিষদের গতকল্যকার বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে এই অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বৃটিশ পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য নহে।

১২ই জুন—নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির অধিবেশন হয়। উহাতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিবৃতি সম্পর্কে এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, দেশীয় রাজ্যে বৃটিশ সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটিলে জনগণের উপরই সার্বভৌম ক্ষমতা বর্তাইবে এবং নৃপতিগণ জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে থাকিবেন। উক্ত প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, কোন শাসক তাঁহার রাজ্যকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে তিনি যে শুধু ভারতীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবেন তাহা নহে, নিজ প্রজাদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিবেন। এইরূপ কার্যের প্রতিরোধ করিতে হইবে।

১৩ই জুন—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব পাশ করিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণা গ্রহণ করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটি নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য যে প্রস্তাবের খসড়া করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ৩রা জুনের পরিকল্পনা অনুসারে দেশের কয়েকটি অংশের বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এই সম্ভাবনা যতই পরিতাপের বিষয় হউক, দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি ইহা গ্রহণ করিতেছেন। প্রস্তাবে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের আগামী আগস্ট মাসের মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ভাষণে নৃপতিদিগকে গণ-পরিষদে যোগদান করিতে আবেদন জানান। মহাত্মা গান্ধী বলেন, সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। নৃপতিগণ যদি সময়োচিত কাজ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আর অস্তিত্ব থাকিবে না।

১৪ই জুন—নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন শুরু হয়। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে প্রায় সাত ঘণ্টা বিতর্কের পর আগামীকল্য পর্যন্ত নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। অদ্যকার অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৃটিশ সরকারের ৩রা জুন তারিখের ঘোষণা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক বিরাট জনসভায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে বঙ্গ বিভাগের পক্ষে ভোট দানের জন্য অনুরোধ করা হয়। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বাঙলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে বঙ্গ ভঙ্গ ছাড়া গত্যন্তর নাই।

কলিকাতা গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় এই মর্মে এক ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে যে, ঢাকায় পূর্ববঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই রমনার গভর্নমেণ্ট হাউসকে কেন্দ্র করিয়া ২০ মাইল ব্যাসার্ধ দ্বারা পরিব্যাপ্ত অঞ্চলের সমস্ত জমি গভর্নমেণ্ট খাস করিতে পারেন।

১৫ই জুন—নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ৩রা জুনের পরিকল্পনা ১৫৭—২৯ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা ও ভারতের অবশিষ্টাংশ হইতে উহাদের বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার অধিকার অস্বীকার করিয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি সর্বসম্মতভাবে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু বলেন, আমরা কোন রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিব না।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া সর্দার প্যাটেল বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ৩রা জুনের পরিকল্পনার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় দুঃখ করিবার কিছুই নাই। তাঁহারা যদি ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, তবে সমগ্র ভারতবর্ষই পাকিস্থানের ...

প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

তৃতীয় সংস্করণ বর্ধিত আকারে বাহির হইল
বাঙ্গালী হিন্দুর এই চরম দুর্দিনে
প্রফুল্লকুমারের পথনির্দেশ
প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য।
মূল্য—৩,
—প্রকাশক—
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।
—প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা।
ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

যাইত। সর্দার প্যাটেল বলেন যে, ভারতকে শক্তিশালী করিবার জন্য একটি সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্য এবং ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য এখন প্রত্যেক কংগ্রেস-সেবীর মিলিতভাবে কাজ করা কর্তব্য।

নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভাগ সম্পর্কে বলেন যে, নিরপরাধ নাগরিকের প্রাণনাশ অপেক্ষা বিভক্ত হইয়া যাওরাই শ্রেয়ঃ।

বিদেশী সংবাদ

৯ই জুন—লণ্ডনস্থ ওয়াকিবহাল মহল হইতে এইরূপ জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান এই দুইটি ডোমিনিয়নে পরিণত করার জন্য আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পার্লামেণ্টে যে বিল পেশ করা হইবে, তাহাতে ইংলণ্ডের রাজার ভারত সম্রাট উপাধি পরিবর্তনের কথা উল্লিখিত হইবে।

সিঙ্গাপুরের সংবাদে প্রকাশ, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের নেতাজী শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতি রক্ষাকল্পে মালয় প্রবাসী ভারতীয়গণ ৫ লক্ষ ষ্ট্রেটস ডলার ব্যয়ে সিঙ্গাপুরে একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

১১ই জুন—চাইনীজ সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গত বৃহস্পতিবার সোভিয়েট জঙ্গী বিমানবহরের সাহায্যপুষ্ট বহির্মঙ্গোলীয় সৈন্য বাহিনী সিনকিয়াং প্রদেশ আক্রমণ করে। মঙ্গোলীয়েরা সিনকিয়াং প্রদেশের অভ্যন্তর ভাগে দুইশত মাইল জুড়িয়া আক্রমণ চালায় এবং এক্ষণে তিহুয়ার দুইশত মাইল উত্তর-পূর্বে তাহারা চীনা রক্ষিবাহিনীর সহিত যুদ্ধরত আছে। চীনা গবর্ণমেণ্ট সিনকিয়াং অভিযানের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া ও বহির্মঙ্গোলিয়া রিপাব্লিকের নিকট প্রতিবাদ জানাইবার জন্য মস্কোস্থিত চীনা রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দিয়াছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে বুদাপেস্তে মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট এক প্রতিবাদলিপি পাঠান হইয়াছে। উহাতে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ইয়ালতা চুক্তি ভঙ্গ করার এবং হাঙ্গারীর রাজনীতিক ব্যাপারে গুরুতর হস্তক্ষেপের অভিযোগ করা হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান অদ্য কানাডার সিনেট ও কমন্স সভার এক যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিশ্বপুনর্গঠনকল্পে ছয় দফা নীতি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং স্বাধীন জগৎই আমাদের কাম্য।

১২ই জুন—নানকিংয়ের সংবাদে প্রকাশ, সিনকিয়াং-এর পেটোসান এলাকায় যুদ্ধ চলিতেছে এবং সোভিয়েটের প্রতীক সম্বলিত বিমানবহর সরকারী ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালাইতেছে ও বোমা বর্ষণ করিতেছে। পেটোসানে বহির্মঙ্গোলীয় বাহিনী ট্যাঙ্কের সাহায্যে তড়িৎ আক্রমণ শুরু করিয়াছে। অদ্য জেনারেলিসিমো চিয়াংকাইসেক দেশরক্ষা সচিব পাইচুংসি'কে বহির্মঙ্গোলীয় বাহিনীর আক্রমণে ছত্রভঙ্গ চীনা সরকারী বাহিনীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টায় সিনকিয়াং যাত্রার আদেশ দিয়াছেন।

১৫ই জুন—রুশ পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, মস্কোর বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার মরিস পেটারসন হাঙ্গারীর রাজনীতিক সংকট সম্পর্কে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নিকট এক প্রতিবাদলিপি পেশ করিয়াছেন। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট উহাতে আপত্তি জানাইয়াছেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা তাঁহারা হাঙ্গারীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের নূতন প্রচেষ্টা বলিয়া মনে করেন।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার গণতান্ত্রিক চীনা মহল এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সিংকিয়াং-এ গোলযোগের অজুহাতে বৃটিশ সম্ভবতঃ কাশ্মীরে থাকিয়া যাইতে পারে।

এদের

ভবিষ্যৎ নষ্ট করে



সন্তানই পরিবারের আশা এবং জাতির মেরুদণ্ড। তাহাদের সকল রকম অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা পিতামাতার অবশ্য কর্তব্য। যৌনব্যাধিগ্রস্ত পিতামাতার দ্বারা সন্তানের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে, কারণ যৌনব্যাধি পিতামাতার শরীর থেকে সন্তানে সংক্রামিত হতে পারে এবং তাদের জীবন দুঃসহ করে তোলে।

সিফিলিস—গর্ভাবস্থায় সিফিলিস কর্তৃক আক্রান্তা মাতার ব্যাধি সন্তানে সংক্রামিত হতে পারে। গর্ভাবস্থায় মাতা যদি উপযুক্ত চিকিৎসা না করান তাহলে বিপজ্জনক গর্ভপাত হতে পারে। এমনকি পূর্ণ গর্ভাবস্থার পরও প্রসবের সময় মৃত, ক্ষীণজীবী, ব্যাধিগ্রস্ত অথবা বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মাতে পারে। কখনও কখনও সিফিলিস-আক্রান্ত সন্তানকে ভূমিষ্ট হবার সময়ে এবং পরেও বহুদিন স্বাস্থ্যবান বলে মনে হয়, কিন্তু তার রক্তে ঐ ব্যাধি থাকায় যে কোনও সময় রোগ দেখা দিতে পারে। পিতামাতা কর্তৃক সংক্রামিত সিফিলিস সন্তানের বহু শারীরিক ও মানসিক রোগের কারণ।

গণোরিয়া—গণোরিয়া পুরুষ ও নারী উভয়েরই বন্ধ্যাত্বের কারণ হয়ে থাকে। গণোরিয়া-আক্রান্তা নারী যদি গর্ভবতী হন, তবে প্রসবকালে সন্তানের চোখে এই রোগ সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। এর থেকে জটিল চোখের দোষ দেখা দেয়, এমনকি সন্তান অন্ধ হয়ে যেতে পারে। মাতা কর্তৃক সংক্রামিত গণোরিয়া রোগই বহু শিশুর দৃষ্টিহীনতার কারণ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা দ্বারা যৌনব্যাধি থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ **আরোগ্য লাভ করা যায়।** সিফিলিস বা গণোরিয়া দ্বারা আক্রান্ত নরনারীর পক্ষে এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হয়ে বিবাহ করা বা সন্তান জন্ম দেওয়া পাপ।

যৌনব্যাধি থেকে দূরে থাকুন

কলিকাতার সমস্ত বিশিষ্ট হাসপাতালে এবং কুমিল্লা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, দার্জিলিং, শ্রীরামপুর (হুগলী) ও কাঁকিনাড়া (২৪ পরগণা)। গবর্ণমেণ্ট হাসপাতালে বিনামূল্যে ও গোপন ব্যবস্থাধীনে যৌনব্যাধির চিকিৎসা করা হয়।

আই, এন, দাস
(আর্টিষ্ট)

ফটো এন্‌লার্জমেন্ট, ওয়াটার কলার ও অয়েল পেণ্টিং কার্যে সুদক্ষ, চার্জ সুলভ, অদ্যাই সাক্ষাৎ করুন বা পত্র লিখুন। ৩৫নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কেশ বিন্যাসে
মোহিনী
কেশতৈল
ওরিয়েন্টাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কলিকাতা

চক্ষুছানি

ডিজন্স "আই-কিওর" (রেজিঃ) চক্ষুছানি এবং সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়। নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩৲ টাকা, মাশুল ৷৵০ আনা।

কমলা ওয়ার্কস (দ) পাঁচপোতা, বেঙ্গল।

চুল পাকা বন্ধ করুন

তবে কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের আয়ুর্বেদোক্ত **বিশ্বমোহিনী কেশ তৈল** ব্যবহারে পাকাচুল চিরতরে স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে এবং চুল আর পাকিতে দিবে না। অল্প চুল পাকিয়া থাকিলে ২৷৷০ টাকা, তদপেক্ষা বেশী চুল পাকিলে ৩৷৷০ টাকা এবং প্রায় সব চুল পাকিয়া থাকিলে ৫৲ টাকা মূল্যের শিশি ব্যবহার করুন। ইহা মস্তিষ্ক ও চক্ষুর টনিক বিশেষ। বিফল প্রমাণিত হইলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

পারাশ মেডিক্যাল হল, লালবিঘা
পোঃ কাতরীসরাই, গয়া (ভি সি)



পৃথিবীর সর্বত্র কোটী কোটী গৃহে কি কারণে 'ওভালটিন' নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হইতেছে? ইহা অতি সহজ কথা। 'ওভালটিন' সকলেরই উপভোগ্য এবং শিশুদেরই বিশেষ প্রিয়বস্তু নহে,—ইহা অতীব পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যোন্নতিকর।

'ওভালটিনে' এই প্রকার যে সুস্বাদু ও পূর্ণাঙ্গ প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান তাহা সুপক্ক বার্লির মণ্ড, পনির সংযুক্ত টাট্‌কা গোদুগ্ধ, অত্যাবশ্যকীয় প্রাকৃতিক ভাইটামিন এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপাদানের সমন্বয়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদানের জন্যই ইহা পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। 'ওভালটিন' আপনার গৃহে রীতিমত পরিবেশন করুন এবং নিশ্চয় করিয়া জানিয়া রাখুন যে আপনার সমস্ত পরিবার শক্তি, স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি গঠন ও সংরক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত সুনির্দ্ধারিত পুষ্টিকর খাদ্য পাইতেছে। সর্ব্বপ্রকারে ইহার বদলে অন্য জিনিষ ব্যবহার বর্জ্জন করুন।

পরিবেশক—গ্রেহাম ট্রেডিং কোং (ভারতবর্ষ) লিঃ,
৬নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা
এবং মাদ্রাজ বোম্বাই করাচী।

ওভালটীন
'OVALTINE' বলকারক পানীয় (খাদ্য)।

OV/111

স্বাস্থ্য ভাল রাখার পক্ষে প্রথম আবশ্যক



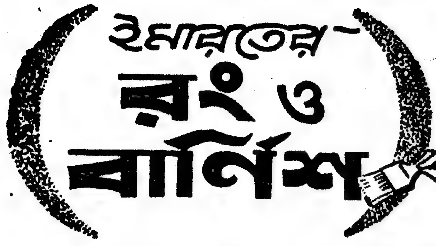
রক্তই জীবন-নদীর স্রোতস্বরূপ; ভাল স্বাস্থ্যের ইহাই গোড়ার কথা; রক্ত হইতে দূষিত পদার্থসমূহ নিঃসারিত করিয়া রক্ত পরিষ্কার রাখা সকলকারই প্রয়োজন।



ক্লার্কের ব্লাড মিকশ্চার রক্ত পরিষ্কার করার ব্যাপারে পৃথিবী খ্যাত এক অপূর্ব সামগ্রী। বাত, বিখাউজ, ফোড়া, ঘা ও রক্ত দুষ্টির অনুরূপ সমস্ত ক্ষেত্রে ইহা অনায়াসেই ব্যবহৃত করা যাইতে পারে।

CLARKE'S
BLOOD PURIFYING MEDICINE
BLOOD MIXTURE
REGD TRADE MARK

সমস্ত ষ্টোরে তরল বা বাটকাকারে পাওয়া যায়।





মার্কেন্টাইল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মিসেলেনী
৫৭, ব্লগহুড স্ট্রীট, কলিকাতা

পাকা চুল কাঁচা হয়

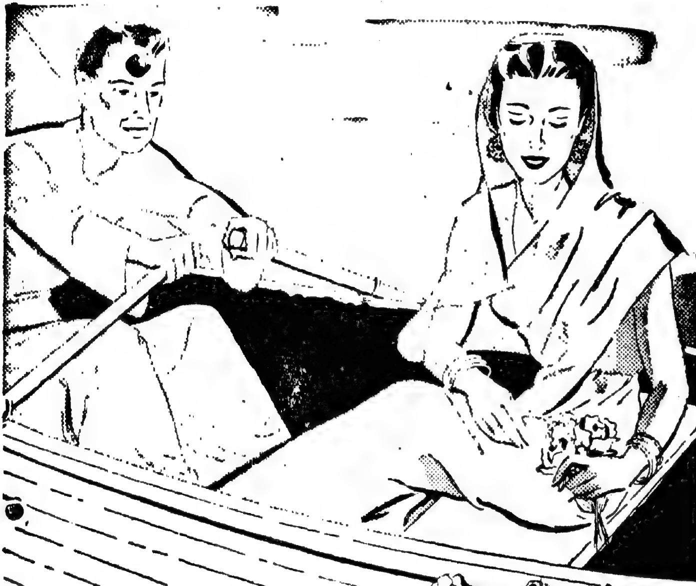
কলপে সারে না। আমাদের ৱেইনিয়া সুগন্ধি আয়ুর্বেদীয় তৈলে চুল চিরতরে স্বাভাবিক কাল হইবে আর পাকিবেই না। মূল্য ২৷৷০ অল্প পাকায়, ৩৷৷০ কিছু বেশী পাকায় এবং ৫৲ প্রায় সব পাকায়। এই তৈল মাথা ও চক্ষুরও খুব উপকারী।

K. P. SEIN
General Ayurvedic Store
No. 49 B. C. P.O. Katrisarai

এম্ব্রয়ডারী মেসিন

নূতন আবিষ্কৃত। কাপড়ের উপর সূতা দিয়া অতি সহজেই নানা-প্রকার মনোরম ডিজাইনের ফুল ও দৃশ্যাদি তোলা যায়। মহিলা ও বালিকাদের খুব উপযোগী। চারিটি সূঁচ সহ পূর্ণাঙ্গ মেশিন—মূল্য ৩৲, ডাক খরচা ৷৷৵০।

ডীন ব্রাদার্স; আলীগড়, নং ২২।





প্রদোষের অস্পষ্টালোকে যখন টাট্কা সুন্দর ভারতীয় গোলাপ দোলায়মান দেখিবেন, তখন মনে রাখিবেন যে ভিনোলিয়া হোয়াইট রোজ, আপনার প্রিয় সাবান। আপনার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের পক্ষে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সুগন্ধি সাবান আর হইতে পারে না। কোমল, ফেনময় ভিনোলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নরম ত্বক্‌ও মোলায়েম ভাবে পরিষ্কার করে … উপরন্তু তাহার মিষ্ট সৌরভে আপনাকে মণ্ডিত করিয়া রাখে।

ভিনোলিয়া হোয়াইট রোজ সাবান

VWR 20-111 BG VINOLIA COMPANY LIMITED, LONDON, ENGLAND

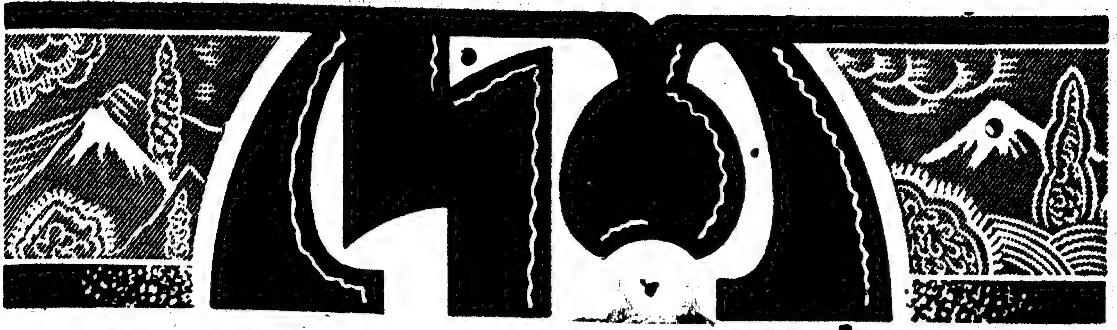
সতীশ কবিরাজের

শ্বাসারি

হাপানি ও ব্রঙ্কাইটীসে

কবিরাজ
এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড সন্স

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।



সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ]   শনিবার, ১৩ই আষাঢ়, ১৩৫৪ সাল।   Saturday, 28th June, 1947.   [৩৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বঙ্গ-বিভাগের সিদ্ধান্ত

বাঙলা বিভক্ত হইল। পশ্চিমবঙ্গের অ-মুসলমান জেলাগুলির পরিষদ সদস্যের ভোটাধিক্যে (৫৮—২১) পশ্চিমবঙ্গে নূতন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব এবং এই নূতন প্রদেশের বর্তমান ভারতীয় গণ-পরিষদে যোগদানের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। অবশিষ্ট মুসলিমপ্রধান জেলাগুলির পরিষদ সদস্যদের ভোটাধিক্যে পূর্ব বাঙলা পরিকল্পিত পাকিস্থান গণ-পরিষদে যোগদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

যুক্ত অধিবেশনে অখণ্ড বাঙলার এবং উহার বর্তমান ভারতীয় গণ-পরিষদে যোগদানের প্রস্তাব মুসলমান সদস্যদের বিরোধিতায় অগ্রাহ্য হয়। উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন অ-মুসলমান সদস্যগণ।

এইভাবের সিদ্ধান্তই যে পরিষদে গৃহীত হইত—ইহাতে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের অধিবেশনের সভাপতি বর্ধমানের মহারাজ ভোটাভুটির পর্ব শেষ হইবার পর এই মর্মে উক্তি করেনঃ—ভোটাভুটি ব্যাপারে অর্থের খেলা হইবার কথাও কোন কোন মহলের আলোচনার বস্তু হইয়াছিল। ইহাই বলিবার যে পরিষদের সকল সদস্যই নিজ নিজ আদর্শ এবং নীতি অনুযায়ীই ভোটদান করিয়াছেন। বর্ধমানের মহারাজ তাঁহার উপসংহার বক্তৃতায় এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন, বোধ হয় এই জন্য যে এই ধরণের অর্থহীন ও কাল্পনিক গুজব তোলা যে অবাঞ্ছিত তাহাই দেশবাসীকে ইঙ্গিতে বলা।

বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। মুসলিম লীগ চাহিয়াছিল, গোটা বাঙলাকে পাকিস্থানের অন্তর্গত করিতে। জাতীয়তাবাদী বাঙালী বঙ্গ-বিভাগও যেমন চাহে নাই, তেমনি ভারত বিভাগ চাহে নাই। ভারত বিভাগ যখন প্রতিরোধ করা গেলো না তখনই বঙ্গভঙ্গের প্রশ্ন একান্ত হইয়া উঠিল। বাঙালী জাতীয় বঙ্গ রাষ্ট্র গঠন করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হইতে বদ্ধপরিকর হইল। বাঙলার একটা অংশ (পূর্ব বাঙলা) পাকিস্থানের অন্তর্গত হইল। ইহা দুঃখের হইলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিকারের উপায় ছিল না।

দেশ বিভাগ

বঙ্গ বিভাগ হইয়াছে। ভারতও বিভক্ত। কংগ্রেস যাহা চাহিয়াছিল—যে জন্য সুদীর্ঘকাল সাধনা করিয়াছে, সেই অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা কংগ্রেস পায় নাই। তাই স্বাধীনতার সম্মুখীন হইয়াও কংগ্রেসের তথা দেশবাসীর আনন্দ উল্লাস নাই। মুসলিম লীগ পাকিস্থান পাইয়াছে বটে—কিন্তু এই কবন্ধ পাকিস্থান তাহারা চাহে নাই। বাঞ্ছিত বস্তু পাইয়াছি—এমন আত্মবঞ্চনা করিয়া উল্লসিত হইবার তাহাদেরও উপায় নাই।

আজ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সকলের সম্মুখেই একটি বড় প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়াছেঃ—বৃটিশ তো চলিয়া যাইতেছে, ভারতও বিভক্ত হইল—প্রদেশও বিভক্ত হইল—অতঃপর কি হইবে? বিভক্ত হইবার পর যে দায়িত্ব ও সুযোগ দেখা দিয়াছে, তাহা লইয়া আমরা জনগণের অন্ন বস্ত্রের অভাব মিটাইব—দুঃখ দারিদ্র্য, দূর করিতে কর্মশক্তি নিয়োগ করিব· শিল্প বাণিজ্য প্রসারে কৃতিত্ব দেখাইব—শান্তি শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়া দেশবাসীর মনে নিরাপত্তার ভাব জাগাইয়া তুলিব—না, ক্ষুদ্র দলাদলি ও আত্মকলহে শক্তি নষ্ট করিব?

কংগ্রেস নেতৃবর্গ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবাঞ্ছিত বিভাগকেও মানিয়া লইয়াছেন। মুসলিম লীগ পাকিস্থান না পাইলে শান্ত হইবে না। যে আকারেরই হউক—পাকিস্থান তাহারা পাইয়াছে, সুতরাং তাহাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহাদের পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্গত মাইনরিটির ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাষ্ট্রের উন্নতি সাধনে তৎপর হউন। কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন রাষ্ট্রেই মাইনরিটির অধিকার ক্ষুন্ন হইবে না। হিন্দু মেজরিটি পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম মাইনরিটির কোন অধিকারই ক্ষুন্ন হইবে না· ভারতের কোন রাষ্ট্রেই তাহা হইবার নহে। মুসলিম লীগ নায়ক মিঃ জিন্না পাকিস্থানে মাইনরিটির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মগত অধিকার সম্মানিত হইবে—কোন অবিচার তাহাদের উপর হইবে না, বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সদিচ্ছা কার্যে পরিণত হইলে সমগ্র বাঙলার হিন্দু-মুসলমান উভয় বাঙলায়ই শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে। পূর্ব-বাঙলার হিন্দুর পক্ষে অতীতের কথা স্মরণ করিয়া মেজরিটি সম্প্রদায়ের অসাম্প্রদায়িক ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের প্রতি আস্থা রক্ষা করা খুব সহজ নহে। কিন্তু অতীত ভুলিতেও মানুষের বেশী সময় লাগে না· যদি সত্যই কার্যের দ্বারা মেজরিটি সম্প্রদায় বর্তমানে মাইনরিটির মনে আস্থার ভাব আনিতে পারেন। যাহা হইবার হইয়াছে,

আজ প্রসন্নচিত্তে উভয় বাঙলাকেই শুভেচ্ছার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে বড় করিয়া তোলার দিন নিঃশেষিত হইয়া যাক। দেশের জনসাধারণ চায় অন্ন, চায় বস্ত্র চায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, চায় শান্তি ও নিরাপত্তা। দেশবাসীর এই সকল দাবী পূরণের কৃতিত্ব দেখাইবার প্রতিযোগিতা উভয়ত দেখা দিক—বিধ্বস্ত বাঙলার শ্মশানে দাঁড়াইয়া সেই শিব-সুন্দরের জন্যই আমরা কামনা করিতেছি।

মন্ত্রিমণ্ডল

বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর আর মুহূর্তকালও বর্তমান লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের টিকিয়া থাকা সঙ্গত নহে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী তাঁহাদের অপসারণের কথায় বলেন' উহার কোন প্রয়োজন নাই. কারণ তাঁহারা বর্তমানে care-taker, ঠিকাদারী মন্ত্রিমণ্ডল রূপেই কার্য করিতেছেন। আঞ্চলিক মন্ত্রিমণ্ডল গঠন অথবা ৯৩ ধারা প্রবর্তন কোনটারই প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আমরা শুধু বিস্মিত হইয়া ভাবি যে, নূতন পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরেও তাহাদের মন্ত্রীর গদী আঁকড়াইয়া থাকিবার বাসনা কেন? বলিতেছেন, তাহারা তো আর সেই আগেকার মন্ত্রিমণ্ডল নহে ঠিকাদার মন্ত্রিমণ্ডল। কিন্তু এই ঠিকাদারী কাজে যদি কোন লাভই না থাকে তাহা হইলে তাহাতেই লোভ কেন? বিশেষতঃ তাঁহারা যখন দেখিতে পাইতেছেন, যে তাঁহাদের শাসনাধীনে মুহূর্তকাল থাকার বাসনা হিন্দুদের নাই, এবং আগস্ট মাসেই তাহাদের চিরবিদায় লইতে হইবে। এই অবস্থায় 'ভদ্রতা' জ্ঞানেও কি বাধে না? সীমান্তের গভর্নর তথাকার গণভোটের প্রাক্কালে বিদায় লইলেন। লোকে তাঁহার পক্ষপাতের অভিযোগ করে এই জন্য। কিন্তু বঙ্গ-বিভাগের পরে বাঙলার সীমা নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। বাঙলা বিশ্বাস করে যে, তাঁহারা ঠিকাদার মন্ত্রী হিসাবেই হউক, আর যে ভাবেই হউক মন্ত্রীরূপে থাকিলেই হিন্দুর স্বার্থহানি ঘটিবে। সীমা নির্ধারণ ব্যাপারে, দেনাপাওনা নির্ধারণ ব্যাপারে তাহাদের অবস্থানের প্রভাব অশুভ হইবে' ইহাই হিন্দুর আশঙ্কা। ইহা জানিয়াও মিঃ সুরাবর্দী যখন এই কয়টা দিন গদী আঁকড়াইয়া থাকিতে অশোভন আগ্রহ দেখাইতেছেন, তখন তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ বৃদ্ধি পাইবেই। বাঙলার গভর্নরের কর্তব্য তিনি পালন করিতেছেন না কেন? বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্তের পরে অবশিষ্ট করণীয় কার্য যাহাতে নিরপেক্ষ আবহাওয়ায় পরিচালিত হইতে পারে—তজ্জন্য আঞ্চলিক মন্ত্রিমণ্ডল স্থাপনে উদ্যোগী হওয়াই তাঁহার অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি—এখনো বলিতেছি, বাঙলার গভর্নর যদি সেই কর্তব্য পালনে উৎসাহ বোধ না করেন, তাহা হইলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনেরই কর্তব্য বাঙলার গভর্নরকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করা।

নববঙ্গ রাষ্ট্রের নেতা

নববঙ্গ রাষ্ট্রের জন্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং নূতন জাতীয় বঙ্গ রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষই হইবেন। নেতৃপদে প্রফুল্লচন্দ্রের নির্বাচনে আমরা সুখী হইয়াছি। প্রফুল্লচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্যই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁহার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও ত্যাগ সুবিদিত। কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যে বিশেষত মহাত্মাজীর নির্দেশিত কর্মনীতিতে তাঁহার বিশ্বাসও আগ্রহ বিদ্যমান। বলা বাহুল্য, প্রধান মন্ত্রী হইবার পক্ষে পার্লামেণ্টারী অভিজ্ঞতা এবং দপ্তর পরিচালনার অভ্যাস তাঁহার না থাকিবারই কথা। কিন্তু এই তথাকথিত অভিজ্ঞতা খুব বড় কথা নহে, তাহা অর্জন করাও কিছু শক্ত নহে। পরন্তু আজিকার সমস্যা সমাধানের জন্য যে বস্তু বিশেষ প্রয়োজন তাহা তাঁহার আছে। তাহা নিষ্ঠা, সততা ও জনসেবার ঐকান্তিক আগ্রহ। ইহারই শক্তিতে তিনি সাফল্য অর্জনে সক্ষম হইবেন—ইহাই আমরা আশা করি। পরিষদ দলের নেতারূপে নির্বাচিত হইয়া প্রফুল্লচন্দ্র বলেনঃ—"বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙলার পুনর্গঠনের কথাই আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য আমার যথাসাধ্য আমি করিব। আশা করি, এক্ষণে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অবসান হইবে। বাঙলার উভয় অংশ সুখী ও সমৃদ্ধশালী হইবে- ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং উহার জন্য উভয় অংশকেই চেষ্টা করিতে হইবে। পুনর্বার উভয় অংশকে সম্মিলিত করার উহাই অভ্রান্ত পন্থা। এইখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারই পূর্ব বাঙলার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও তাহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের অভ্রান্ত প্রতিভূস্বরূপ হইবে এবং আমার আশা ইহাই যে, উভয় অংশের গবর্ণমেণ্টদ্বয় এইরূপ ব্যবহারই করিবেন।" ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রের উপর গুরুভার ন্যস্ত হইল। সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় সেই গুরুভার বহনে তিনি সমর্থ হউন, ইহাই কামনা করি। মনে রাখিতে হইবে, জাতীয় বঙ্গ রাষ্ট্রকে আদর্শ গভর্নমেণ্টরূপে পরিণত করিতে হইবে। এইজন্য শক্তিশালী মন্ত্রিমণ্ডলের প্রয়োজন। ব্যক্তি বা দলের প্রশ্ন ভুলিতে হইবে। যথাসম্ভব যোগ্য লোক লইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে হইবে। একটা আদর্শ-সম্মত পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার কর্মকুশলতা মনীষা ও পরিচালনার দক্ষতা বাঙলাকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করুক।

অশান্তির দায়িত্ব

কিছুদিন যাবত কলিকাতার অবস্থা অবনতির দিকে যাইতেছে। গত বৎসর ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস হইতে অশান্তি চলিতেছে, আজ পর্যন্তও উহা শান্ত হইল না। মধ্যে মধ্যে অবস্থা কতকটা ভালর দিকে যায়, কিন্তু আবার অশান্তি-উপদ্রব স্বমূর্তি ধারণ করে। কেন এমন হয়? শহরে সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী শান্তিরক্ষার জন্য বিরাজ করিতেছে, মোড়ে মোড়ে বসিয়াও থাকে—রাস্তায় টহলও দেয়, কিন্তু তথাপি গুণ্ডারা যখন দুষ্কার্য করিতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন তাহারা প্রায়শঃ সাফল্যের সঙ্গেই নিরীহ পথচারীদের হতাহত করে। পুলিশ ঘটনার পরে আসিয়া বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে, হয়রাণও করে। কিন্তু প্রকৃত দোষী ও গুণ্ডা ধৃত হয় কয়জন? আর চলিতেছে সান্ধ্য আইনের শাস্তি। এই শাস্তিও লাভ করিতেছে শান্তিকামী নাগরিকগণই। পাইকারী জরিমানাও চলিতেছে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি—এখনও দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতেছি, শান্তিরক্ষার জন্য যাহারা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, সেই কর্তৃপক্ষ যতক্ষণ অত্যন্ত দৃঢ়তা ও কঠোরতার সহিত এবং সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতার সহিত কর্তব্য পালন না করিতেছেন, ততক্ষণ শান্তির আশা কোথায়? কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ—এই ধারণা গুণ্ডামহলে যতই বদ্ধমূল হইবে, ততই তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করা বিপজ্জনক মনে করিয়া নিরস্ত হইবে। সম্প্রতি কলিকাতার কোন একটি এলাকায় দুইজন পুলিশ নিহত হয়। পুলিশ দুইজন যে সম্প্রদায়ের লোক, সেই সম্প্রদায়ের লোকেরাই ঐ দুইটি মৃতদেহ ৫০খানা ট্রাকে করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যায়।— আমরা ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি, পুলিশ কর্তৃপক্ষ কেমন করিয়া এইরূপ শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার অনুমতি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে দিলেন! এই ধরণের শোভাযাত্রায় কি প্রকার উত্তেজনা ও বিদ্বেষপূর্ণ ধ্বনি উচ্চারিত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। হত্যামাত্রেই নিন্দনীয়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধি না হয় এইজন্য হতাহত ব্যক্তিগণ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তাহার উল্লেখ নিষিদ্ধ, থানা ব্যতীত ঘটনাস্থলের উল্লেখও নিষিদ্ধ হইয়া আছে। এতটা সতর্ক হইতে হয় যেখানে সেখানে হত ব্যক্তিদের শবদেহ লইয়া শোভাযাত্রার অনুমতিদানের উদ্দেশ্য কি? এই দুই ব্যক্তিই প্রথম

কলিকাতায় আক্রান্ত ও নিহত হয় নাই, এমনই আরো অনেকে আক্রান্ত ও নিহত হইয়াছে; অন্য কোন ক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায়কে শোভাযাত্রা বাহির করিতে দেওয়া হয় নাই। বর্তমান অবস্থায় তেমন অনুমতি চাহিতেও কেহ সাহসী হইত না;. তেমন আবদার নিশ্চয় প্রত্যাখ্যাত হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়াই কেহ অনুমতি চাহিত না। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা জানে, আবদার তাহাদের যতই অসংগত হউক, তাহাও রক্ষিত হইবে, অনুমতি পাওয়া যাইবে, এই আশা তাহাদের ছিল, আশা যে অমূলক নহে তাহাই প্রমাণ হইয়া গেল। পুলিশ কর্তৃপক্ষের এই আচরণ শুধু নিন্দনীয় তাহা নহে, শহরের বর্তমান অশান্তিকর অবস্থায় মধ্যে এইরূপ অনুমতি দান যে অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরই উৎসাহিত করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই অনুমতির পর অশান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাও লক্ষ্য করিবার।

পাঞ্জাবে অশান্তি ও শিক্ষা

পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক তান্ডব ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়াছে। খুন, জখম, অগ্নিদাহ, সম্পত্তি নাশ—নিত্যকার ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। লাহোরে যে ব্যাপক অগ্নিকান্ড চলিতেছে—গৃহস্থের গৃহ, ব্যবসায়ীদের দোকান-পসার, গুদাম যেভাবে ভস্মীভূত করা হইতেছে, তাহা শুধু অমানুষিক বর্বরতারই পরিচয়। সাম্প্রদায়িক নারকীয় হত্যালীলা, অগ্নিকান্ড, লুঠতরাজের অশান্তি হইতে জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভারত-ব্যবচ্ছেদ ও প্রদেশ বিভাগে কংগ্রেস রাজী হইল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করিবার আর কোন পথ না দেখিয়া অসহায় কংগ্রেস নেতৃবর্গ মুসলিম লীগের পাকিস্থান দাবী স্বীকার করিয়া ভারত-খন্ডনে সম্মত হইল; কিন্তু অভীষ্ট ফললাভ হইল কোথায়? মহাত্মা গান্ধী অবশ্য বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস গুন্ডাদলের নিকট নতি স্বীকার করিয়া ব্যবচ্ছেদ মানে নাই—বর্তমান ঘটনাবলীর অপ্রতিহত ভাবকেই মানিতে বাধ্য হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ঐ ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যাইবে তাক্ষ সংগ্রামের সাম্প্রদায়িক তান্ডব—খুন, জখম, লুঠতরাজ জোর-জুলুম। সুতরাং যতই কংগ্রেস স্বদেশের এক শ্রেণীর পশুদলের নিকটই নতিস্বীকার করিয়াছে, ইহাই অন্তত সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও গুন্ডার দল মনে করিবে। তাহারা দেখিয়াছে, হত্যা ও খুন-জখম চালাইয়া দাবী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়; সুতরাং আরও তান্ডব চালাইতে পারিলে আরও দাবী সিদ্ধ হইতে পারে।

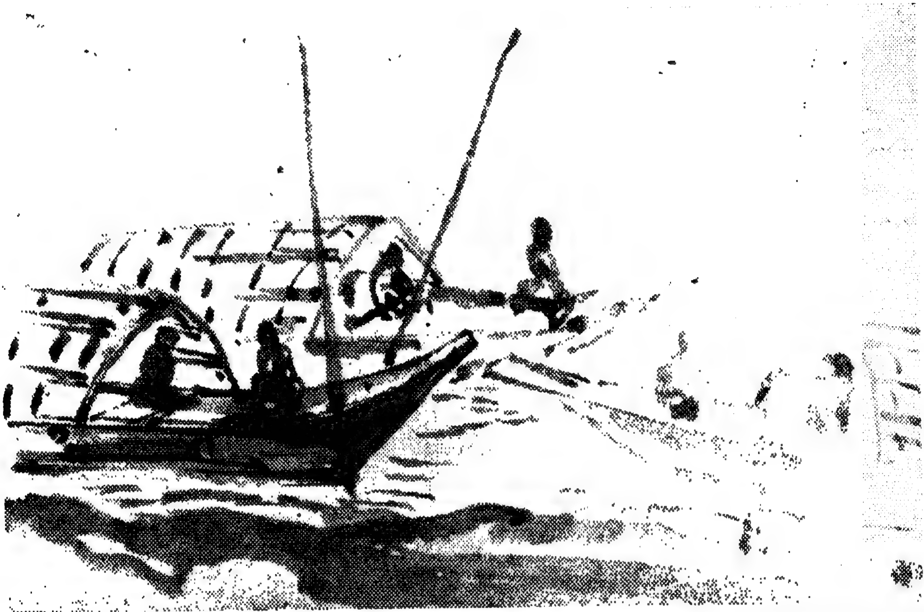
দুঃখ ও বেদনার কথা এই, যে ব্যাধি উপশমের জন্য দেহে অস্ত্রোপচার করিতে নেতৃবর্গ রাজী হইলেন, তাহা কার্যকরী হইতেছে না; পাঞ্জাবে সেই ব্যাধিই উৎকট আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। মুসলিম লীগের ধ্বনি ছিল—"লড়কে লেঙ্গে, মারকে লেঙ্গে পাকিস্থান।" আজ যে আকারেরই হউক, পাকিস্থান মিঃ জিন্না পাইয়াছেন এবং উহাই মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের ঘোষণা করা প্রয়োজন যে, যে পাকিস্থান পাইয়াছি—তাহাই চরম বলিয়া মানিয়া লও—আর "লড়কে লেঙ্গে" ধ্বনি চালাইও না।

পাঞ্জাবের লীগ-নেতা এবং শিখ ও হিন্দু নেতৃবর্গ সম্মিলিত আবেদন করিয়া দাঙ্গাকারীদের শান্ত হইতে বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, বিভাগ হইয়াছে, আর কেন; এবার এই বিভাগই চরম বলিয়া মানিয়া লও এবং শান্তিতে বসবাস কর। মুসলিম অঞ্চলে হিন্দু-শিখের স্বার্থরক্ষার জন্য মুসলমান মাত্রকেই দায়ী থাকিতে হইবে, তেমনি হিন্দু-শিখ অঞ্চলের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করিবে—হিন্দু-শিখ। ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সকলেরই রক্ষা পাইবে। আর অশান্তি নহে।

দাঙ্গা বন্ধ হউক, শান্তি ফিরিয়া আসুক—লীগদলপতিদের এবং হিন্দু-শিখ নেতাদের এই আন্তরিক যুক্ত-আবেদন সময়োপযোগী। শান্তিকামী নরনারীর নিকট ইহা আশার বাণী বহন করিতেছে। তথাপি সন্দেহ জাগে—এইরূপ আবেদনই আজ যথেষ্ট কিনা? বল-প্রয়োগে রাজনৈতিক দাবী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস যখন আরম্ভ হয়, তখনই অনুমান করা উচিত ছিল—এই সূত্রে হিংস্র, লুঠতরাজপ্রবণ, শান্তি-শৃংখলার ও সমাজের শত্রু গুন্ডা শ্রেণী যে প্রাধান্য লাভ করিবে, তাহার বিষময় ফল সমাজকে বহুদিন ভোগ করিতে হইবে। আজ এই আবেদনেও প্রকারান্তরে বলা হইতেছে, খুন, জখম, লুঠতরাজ যাহা হইয়াছে, তাহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনেরই জন্য। অর্থাৎ নিছক নারকীয় সাম্প্রদায়িক বর্বরতা যাহা তাহাও এইভাবে রাজনৈতিক কৌলিন্য লাভ করিতেছে। নির্দোষী নারী, শিশু হত্যাকারী, গৃহে অগ্নিদানকারী, লুঠেরো দলও দুষ্কার্য যে রাজনৈতিক কারণেই তাহা শুনিয়া কৌলিন্য গর্বলাভ করিবে। এই আবেদনে বলা প্রয়োজন গুন্ডাদের হত্যা, লুঠতরাজ ও অগ্নিদান রাজনৈতিক কোন দাবীই প্রতিষ্ঠা করে নাই, বরং রাজনৈতিক দাবী প্রতিষ্ঠার বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের বুঝিতে দিতে হইবে যে, নেতৃবর্গ অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন, তাহারা মানুষের শত্রু, সমাজের শত্রু—স্বীয় ধর্ম ও সম্প্রদায়ের শত্রু। এই শত্রুদলকে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় দান তো দূরের কথা আজ সকল দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সকল প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কার্য হইবে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে দুষ্কার্যকারীদের আইন ও শৃংখলার দরবারে হাজির করা ও সমুচিত দন্ডবিধান করা। গুন্ডাদল প্রতিষ্ঠানের শক্তি, এই বিশ্বাস ভারতের কোন কোন রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতার আছে, অন্তত ছিল যে তাহাতে সন্দেহ নাই, এই বিশ্বাসের অবসান হওয়া আবশ্যক; আজ সেই স্থলে কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিতে হইবে, গুন্ডাদল কেবল অপর সমাজের শত্রু নহে, স্ব-সমাজেরও বড় শত্রু। এই বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইলে অভীষ্ট ফললাভ হইবে। অন্য পথ তো দেখি না।

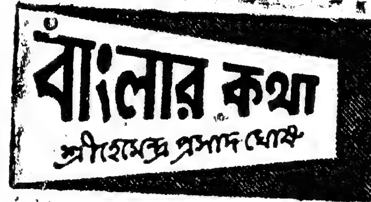
সীমান্ত প্রদেশ

সীমান্তের গণভোট আসন্নপ্রায়। সীমান্তের কংগ্রেস অনুরাগী পাঠান স্বাধীনতাকামী। তাহারা পাঠানদের জন্য স্বাধীন 'পাঠানস্থান' দাবী করিতেছে। মুসলিম লীগ গণভোটের বিষয়বস্তু বিকৃত করিয়া পাঠানদের বিভ্রান্ত করিবার জন্যই সচেষ্ট। বলা হইতেছে, পাকিস্থান হইবে ইসলাম রাষ্ট্র। পাকিস্থানের অন্তর্গত হওয়ার অর্থ পাঠানদের স্বাধীন হওয়া। আর হিন্দুস্থানের অন্তর্গত হওয়ার অর্থ হিন্দুর দাসত্ব করা এইভাবে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের জিগির তুলিয়া মুসলিম লীগ পাঠানদের বিভ্রান্ত করিয়া গণভোটে জয়ী হইতে চাহিতেছে। সীমান্তের কংগ্রেসনিষ্ঠ পাঠান খোদাই-খিদমৎগার লীগদলের এই মিথ্যাচারকে প্রতিহত করিবার জন্যই গণভোটের বিষয়রূপে 'পাঠানস্থান' ধার্য করিয়াছে। তাহাদের কথা—পাঠান স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র চাহে। বাহিরের কোন দল, প্রতিষ্ঠান বা গভর্নমেণ্টেরই তাহারা অধীন হইবে না। তাহারা না 'পাকিস্থান' না 'হিন্দুস্থান', কোন স্থানেরই অধীন হইবে না। পাঠানদের স্থির করিতে হইবে তাহারা মিঃ জিন্নার তথা মুসলিম লীগের পাকিস্থানের কুক্ষিগত হইবে, কি 'পাঠানস্থান' গঠন করিয়া ভারতের কোন অংশের সঙ্গে কিভাবে সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন করিবে। গণভোটের বিষয়টা মুসলিম লীগ যেভাবে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে পাঠানগণের অন্তরের দাবী যথার্থভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে না। তাহারা পাকিস্থানও চাহে না' হিন্দুস্থানও (হিন্দুস্থান বলিতে হিন্দুপ্রধান বলিয়া বুঝানো হইতেছে) চাহে না। এই অবস্থায় গণভোটের বিষয় হওয়া উচিত, পাকিস্থান অথবা পাঠানস্থান। পাঠানগণ যদি পাকিস্থানে যোগ দিতে নারাজ হইয়া পাঠানস্থানের দাবী করে, তাহা হইলে তাহাদের সেই দাবীকে সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা করাই এক্ষেত্রে সমীচীন। গণভোটের বিষয় এই দিক হইতেই সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এই ব্যবস্থা না করিলে সীমান্তের সমস্যা অমীমাংসিতই থাকিবে এবং গণভোট প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র-সম্মতভাবে অনুষ্ঠিত হইল না—ইহাই প্রমাণিত হইবে।



"খাড়ি"

শিল্পী: শ্রীশৈলেশ দেববর্ম্মণ।



যাহা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই হইয়াছে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ৩রা জুনের ঘোষণার পরে ঘটনার গতি দ্রুত হইয়াছে এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অমুসলমান-প্রধান অঞ্চলের প্রতিনিধিদিগের ভোটে বাঙলাকে মুসলমান-প্রধান ও অমুসলমান-প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করিবার সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছে। ভোটের বিবরণ এইরূপে প্রদত্ত হইতে পারে—

অমুসলমান-প্রধান অংশের মত

বঙ্গ বিভাগের পক্ষে—৫৮ (কংগ্রেসী—৪৯; অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ৪; ভারতীয় খৃষ্টান ১; কম্যুনিস্ট ২; স্বতন্ত্র ১)।

বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে—২১ (সকলেই মুসলিম লীগের লোক)।

গণপরিষদে যোগদান সম্পর্কে—বর্তমান গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে—৫৮; পাকিস্থানের গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে—২১।

মুসলমান-প্রধান অংশের মত

বঙ্গ বিভাগের পক্ষে—৩৫ (কংগ্রেসী ৩৪; কম্যুনিস্ট ১)।

বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে—১০৬ (মুসলিম লীগ—১০০; তপশীলী ৫; ভারতীয় খৃষ্টান ১)।

গণপরিষদে যোগদান সম্পর্কে—

বর্তমান গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে—৩৪ (কংগ্রেসী)।

পাকিস্থানী গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে—১০৭ (মুসলিম লীগ ১০০; তপশীলী ৫; ভারতীয় খৃষ্টান ১; কম্যুনিস্ট ১)।

যৌথ সম্মিলন

বর্তমান (অর্থাৎ নিখিল ভারত) গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে—৯০।

পাকিস্থানী গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে—১২৬।

যে ৫ জন তপশীলী মুসলিম লীগের দলে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম—

দ্বারকানাথ বারোরী
নগেন্দ্রনাথ রায়
ভোলানাথ বিশ্বাস
হারাণচন্দ্র বর্মণ
গয়ানাথ বিশ্বাস

প্রথমোক্ত ২ জন মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের সচিব; পরবর্তী ২ জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী।

বাঙলাকে বিভক্ত করা যে মুসলিম লীগের অভিপ্রেত ছিল না, তাহা যেমন স্বীকার্য, জাতীয় দল যে অনিচ্ছায়—অনন্যোপায় হইয়া বিভাগে মত দিয়াছেন তাহাও তেমনই স্বীকার্য।

মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিল—সমগ্র বাঙলা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে অধীন রাখিয়া লড়কে ও মারকে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা—সকল ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার দুষ্ট নীতি পরিচালিত করা। আর জাতীয়তাবাদীদিগের উদ্দেশ্য—সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করিয়া ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শাসন পরিচালন।

যে মিস্টার সুরাবর্দী বলিয়াছিলেন—বাঙলা বিভক্ত হইলে তাহা দুই অংশের লোকের পক্ষেই অনিষ্টকর এবং হিন্দুদিগের পক্ষে আত্মহত্যার পথই হইবে, তিনি এখন বলিতেছেন, বিভাগে বাঙলার মুসলমানদিগের কোন লাভই হইবে না।

কেবল তিনি যদি ঢাকায় যাইয়া সায়েস্তা খাঁর প্রাসাদের সন্ধান করেন, তবে খাজা নাজিমুদ্দীন ও তস্য ভ্রাতা সাহেবুদ্দীন কি বলিবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

বঙ্গ বিভাগ হইবে—স্থির হইবার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বর্তমান সচিব সঙ্ঘের অবসান দাবী করিয়াছেন। আর মিস্টার সুরাবর্দী বলিয়াছেন, (তাঁহাদিগের আর সচিব থাকিবার অধিকার না থাকিলেও) তাঁহারা হেপাজৎকারী হিসাবে থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ লোকের অনাস্থা উপেক্ষা করিয়াও তাঁহারা সচিব থাকিতে চাহিতেছেন। কেন?

এই সচিব সঙ্ঘের দুর্ব্যবহারেই যে জাতীয়তাবাদীরাও বঙ্গ বিভাগ চাহিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘ, কোথাও বা গভর্নরের সক্রিয় সহায়তায়, কোথাও বা গভর্নরের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে—

(১) বাঙলায় নিবার্য দুর্ভিক্ষ অনিবার্য করিয়া প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটাইয়াছেন।

(২) রৌলণ্ডস কমিটির স্বীকৃতি অনুসারে তাঁহাদিগের নীতির ফলে সরকারী কর্মচারীরা ও জনগণ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছে।

(৩) তাঁহারা বিচার ব্যাপারেও সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন—

(ক) রাজাবাজারে তাজিয়া শোভাযাত্রায়,

(খ) মুড়াপাড়ার ব্যাপারে,

(গ) কুলটীর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায়

যেমন তাহার পরিচয় প্রকট হইয়াছে, তেমনই নরহত্যাকারী গুমা খাঁর মৃত্যুদণ্ড বাতিল করায় তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

মিস্টার সুরাবর্দীও স্বীকার করিয়াছেন—ঠিকাদারী প্রভৃতিতে সচিবসঙ্ঘ মুসলমানদিগের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। কয়দিন মাত্র পূর্বে খাঁন বাহাদুর ফরিদ আমেদ চৌধুরী সরকারকে প্রতারিত করিবার অপরাধে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে ও লক্ষ টাকা জরিমানায় দণ্ডিত হইয়াছেন। আর বাঙলায় নৌকা নির্মাণের ব্যাপারে যে ২ কোটি টাকা নষ্ট করিয়া সরকারকে প্রতারিত করা হইয়াছে—মিস্টার মহম্মদ আলীর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তাহার সম্বন্ধে আবশ্যক অনুসন্ধান হয় নাই।

সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট সচিবসঙ্ঘ সরকারী চাকরীতে যোগ্যতার স্থানে সাম্প্রদায়িকতাই নিয়োগের কারণ করিয়াছেন।

আরও বিপদের কথা—

আমরা দেখিতেছি, গত ৩রা জুন হইতে বর্তমান সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট সচিবসঙ্ঘ হেপাজৎকারী সচিবসঙ্ঘে পরিণত হইলেও—

(ক) শ্রমসচিব মিস্টার সামসুদ্দীন সফরে গিয়াছেন। সে জন্য কি তিনি সফরের ব্যয় 'বিল' করেন নাই।

(খ) প্রধান সচিব ও তাঁহার একাধিক সহসচিব মিস্টার জিন্নার সহিত পরামর্শ করিতে দিল্লীতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই গতায়াতের ব্যয় কি বাঙলা সরকারের তহবিল হইতেই আদায় করা হয় নাই?

শুনা যাইতেছে, ইঁহাদিগের আদেশে বা নির্দেশে নানাস্থান হইতে চাউল ও কাপড় স্থানান্তরিত করা হইতেছে; এমন কি সরকারী গুদামে মজুদ নারিকেল তৈলও নাকি সরান হইয়াছে। এসকল কখনই সাধারণ সরকারী কাজের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

যতদিন এই সচিবসঙ্ঘ বিতাড়িত না হইবেন, ততদিন বাঙলা সরকারের অর্থে বিহার হইতে আমদানী মুসলমান নরনারীকে রাজভোগ দেওয়া চলিবে। তাহা নিবারিত হইবে না।

যদি ৩রা জুনের পূর্ববর্তী কোন তারিখের লক্ষ লক্ষ টাকার 'বিল' সচিবের স্বাক্ষরে মঞ্জুর বলিয়া বিবেচিত হইয়া এখন আদায় জন্য দাখিল করা হয়, তবে কি গভর্নরের ব্যবস্থায় সে সকলের টাকা প্রদান বন্ধ থাকিবে? না—টাকা দেওয়া হইবে?

এই সচিবসঙ্ঘ কি বহাল থাকিতে থাকিতে পুলিশে আরও পাঞ্জাবী মুসলমান নিযুক্ত করিবেন না এবং নানা সরকারী চাকরীতে মুসলমান নিয়োগ করা হইবে না?

এই সকল বিবেচনা করিয়াই বলা হইয়াছে যদি অবিলম্বে বর্তমান সচিবসঙ্ঘের স্থানে নূতন সচিবসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় কোন বাধা থাকে, তবে গভর্নর ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করুন। নহিলে ফল আরও বিষময় হইতে পারে সন্দেহ নাই।

মিস্টার সুরাবর্দী বলিয়াছেন—যদিও বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তথাপি এখনও যখন তাহা কার্যে পরিণত করা হয়

নাই, তখন বর্তমান সচিবসঙ্ঘ হেপাজৎকারী থাকিয়াও বেতন ও ভাতা সম্ভোগ করিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি তাঁহাদিগের নাই বরং লাভ আছে। কিন্তু দেশের অত্যাচারে জর্জরিত লোকের ক্ষতি যথেষ্টই আছে।

কাজেই বর্তমান সচিবসঙ্ঘের অবসান ঘটান অবিলম্বে প্রয়োজন।

আর যত শীঘ্র আঞ্চলিক সচিবসঙ্ঘ গঠিত হয় ততই মঙ্গল। কারণ, দীর্ঘকাল ইংরেজ শাসনের ও শোষণের পরে গত দশ বৎসর সাম্প্রদায়িক সচিবসঙ্ঘের অত্যাচারে ও অনাচারে বাঙলার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে বাঙলার পুনর্গঠনকার্য যদি আজ আরম্ভ করা যায়, তবে তাহার জন্য আগামীকল্য পর্যন্ত অপেক্ষা করা অনভিপ্রেত।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেচ, শিল্প, শান্তি—বাঙলায় এ সকল যেভাবে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ চেষ্টা ব্যতীত বাঙলার অধিবাসীদিগকে সুস্থ, শিক্ষিত, শিল্পসম্পন্ন করা সম্ভব হইবে না। অতঃপর বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলের সরকারকে এই কার্যে বিশেষভাবেই অবহিত হইতে হইবে এবং সে কাজ যত শীঘ্র আরম্ভ হয়, ততই ভাল।

বাঙলা ও ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তাহার শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন হইবে। বাঙলাকে সেজন্য প্রস্তুত হইয়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করিত হইবে।

এবার সমগ্র ভারতবর্ষে খাদ্যসংকট সম্ভাবনা। কাজেই বাঙলায় যদি সে বিষয়ে কোনরূপ অনাচার ঘটে, তবে অবস্থা ভয়াবহ হইবার সম্ভাবনা। দুর্ভিক্ষের পর বৎসর বাঙলায় সুজন্মা হইয়াছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘের "সুব্যবস্থায়" বাঙলা অন্নকষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছে। সেই অবস্থায় এবার যাহাতে লীগ সচিবসঙ্ঘ কোনরূপ অনাচার ঘটাইতে না পারেন, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন।

বর্তমান সচিবসঙ্ঘ যে কেবল হেপাজৎকারীর কাজ করিয়া নিশ্চিন্ত নহে, তাহার প্রমাণও আমরা পাইতেছি। গত রবিবারে প্রেসিডেন্সী বিভাগের মুসলমানপ্রধান বলিয়া বিবেচিত যশোহর, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ ৩টি জিলার প্রতিনিধিরা রাণাঘাটে সমবেত হইয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সংযুক্ত হইবার দাবী জানাইবেন—স্থির করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসুর সভাপতিত্বে স্থানীয় ভূস্বামীদিগের গৃহ প্রাঙ্গণে সম্মেলন হইবে—ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সরকারের কর্মচারীর নির্দেশে সম্মেলন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এইরূপে গণমতের অভিব্যক্তি রুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা এখনও চলিতেছে।

এই সকল কারণে অবিলম্বে বর্তমান সচিবসঙ্ঘের অবসান ঘটান প্রয়োজন।

বাঙলার জাতীয়তাবাদীদিগের এখন প্রদেশদ্বয়ের সীমা নির্ধারণ কমিশনকে মত জানান বিশেষ প্রয়োজন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলিয়াছেন, যে ব্যবস্থা করিয়া বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে লোকমত গৃহীত হইয়াছে, তাহা চূড়ান্ত নহে। চূড়ান্ত ব্যবস্থা সীমানির্ধারণ কমিশন করিবেন।

মিস্টার জিন্না বলিয়াছেন—অধিবাসীবিনিময় অতি সহজ ব্যাপার। আমরা দেখিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি আচার্য কৃপালনী নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিয়া আসিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে বিবৃতিও প্রদান করিয়াছেন, তাহার পরেও পাকিস্থানভুক্ত বাঙলার হিন্দুদিগকে আপনাদিগের ভূমি ও গৃহ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বাঙলার কোন অংশে পাকিস্থান কায়েম হইবার পূর্বেই সেই সকল স্থানে হিন্দুকে "মারকে" পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে এখন তথায় কি ব্যবহার হইবে এবং কিরূপ লোককে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। সেইজন্যই বিশেষভাবে মনে করিবার কারণ আছে—পাকিস্থান হইতে হিন্দুদিগকে স্থানান্তরিত হইয়া ধন প্রাণ মান ধর্ম রক্ষার উপায় করিতে যাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। সেইজন্যও পশ্চমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের বাসের ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য আবশ্যক ভূমির প্রয়োজন। সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগ—যদি পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করা হয়, তথাপি সেই পরিমাণ ভূমি পাওয়া যায় না। তবে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানপ্রধান বলিয়া বিবেচিত যশোহর, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জিলাত্রয়ে অনেক "পতিত" জমি আছে। খান বাহাদুর আবদুল মোমিনের জরিপ রিপোর্টে নদীয়া-যশোহরে সীমায় "পতিত" জমির উল্লেখ আছে এবং এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, কৃষক (সম্ভবত ম্যালেরিয়ায় ও সেচের অসুবিধায়) এত অল্প হইয়া পড়িয়াছে যে, ভূমিকর্ষণ করিতে অনিচ্ছুক। ঐ সকল স্থান পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হইলে সরকার আবশ্যক চেষ্টায় উহা বাসের ও আবাদের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন। সেরূপ চেষ্টায় কিরূপ সাফল্যলাভ সম্ভব তাহা যেমন ডেনমার্কে দেখা গিয়াছে, তেমন ফ্রান্সের কথায়ও ইয়ং দেখাইয়াছেন।

এ সকল বিষয় সীমা নির্ধারণ কমিশনকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শিব চট্টোপাধ্যায় —ভূগোলের দিক হইতে বাঙলার বিভাগ বিচার করিয়া যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন (The Partition of Bengal), তাহা পাঠ করিলে এ বিষয়ে আমরা কর্তব্যের সন্ধান পাইতে পারি। শুনিয়াছি, শিববাবু ঐ পুস্তকের বাঙলা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। অবিলম্বে তাহা প্রচার করা প্রয়োজন। তিনি বাঙলার প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া হরিণঘাটা হইতে মধুমতী নদী ধরিয়া গরাই হইয়া আত্রাই জলপথ দুই বঙ্গের সীমা নির্ধারণ করিবার এক পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে বাঙলার দুইভাগের সীমা স্বভাবজ বলা যায়।

ঐ সীমা ধরিলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর বাসভূমির জন্য আবশ্যক স্থান পাওয়া যায়।

সীমা নির্ধারণ যাহাতে অনাচারশূন্য হয়, সেজন্যও বর্তমান সচিবসঙ্ঘের অপসারণ একান্ত প্রয়োজন। কারণ যতদিন বাঙলা সরকারের দপ্তরখানা তাঁহাদিগের কর্তৃত্বাধীন থাকিবে, ততদিন কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের লোকসংখ্যার সাম্প্রদায়িক বিভাগের হিসাব তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবর্তিত হওয়া অসম্ভব নহে। কলিকাতা লইয়া যে সীমা নির্ধারণ কমিশনের নিকট দুই পক্ষের অনেক দাবী উপস্থাপিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

যে দিক হইতেই কেন লক্ষ্য করা যাউক না —বর্তমান সচিবসঙ্ঘের আর একদিনও বাঙলা সরকারের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকা সঙ্গত নহে।

তবু বাকী থাকে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

ফলে ভরা ফালগুনের দিন
অশ্রুভরা শ্রাবণের স্মৃতি
ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
নতুন বৈশাখে

আশ্বিনে শিশির ধোয়া যূঁই
মৃদুগন্ধী সাদা শেফালিকা
হেমন্তে দিগন্ত ছোঁয়া রোদ
তবু বাকি থাকে।



অহমিকা

আমি যে একজন অহংকারী ব্যক্তি সেকথা আমার বন্ধু মহলে সুবিদিত। শুধু বন্ধুবান্ধব কেন মাত্র তিন দিনের জন্যও যদি কারো সংগে পরিচয় হয়, তবেই তিনি আমার এই মহৎ গুণটি অনায়াসে টের পেয়ে যান। অহংকার নামক রিপুটি মানুষ কিছুতেই গোপন রাখতে পারে না। ওটি আপন স্বভাব-গুণেই প্রকাশ পেয়ে যায়। আমার মতে অহংকার মানুষের সব চাইতে বড় রিপু। তার কারণ অন্য কোনও কোনও রিপু থেকে মুক্ত মানুষ আমি দেখেছি, কিন্তু অহমিকা শূন্য মানুষ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। অতিশয় অমায়িক প্রকৃতির মানুষ দেখেছি, মৌখিক বিনয় প্রকাশ তো অহরহই শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু অহমিকার প্রচ্ছন্ন মূর্তিটি এর মধ্যেও নিরন্তর উঁকি মারতে থাকে।

'রিপু' কথাটা আমাদের দেশে তাৎপর্য-দোষ-দুষ্ট। আপনাদের মত কি জানি না, আমি কিন্তু মানুষের ছ'টি রিপুর একটি রিপুকেও ঘৃণা করি না। আমার মতে এই ছ'টি রিপু মানুষের সব চেয়ে বড় মিত্র। এরা না থাকলে মানুষ হত কতগুলি নিষ্প্রাণ নির্জীব কাদা মাটির তাল। রিপুহীন মানুষ অমানুষ হ'ত, এমন কি পশুও হতে পারত না, কারণ পশুদেরও রিপু আছে। বোধ করি তারা দেবতা হত। কিন্তু দেবতা হবার জন্য যদি অমানুষ হতে হয়, তবে বোধ করি আমার মতে আপনারাও তাতে রাজি হবেন না। সাধুসন্তরা মিলে রিপু সংহারের চক্রান্ত করতে হয় করুন কিন্তু আমরা সে চক্রান্তে যোগ দেব না।

যাক্, কথাটা কেন উঠল সেকথাই আগে বলি। সেদিন এক ভদ্রলোক আমাকে অহংকারী বলে লজ্জা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি তাতে কিছুমাত্র লজ্জিত কিংবা অপ্রতিভ হই নি। আমি তৎক্ষণাৎ বললুম, দেখুন, আমার অনেক রকম দোষ আছে, কিন্তু বিনয় নামক দোষটি আমার নেই। আমি বিনয় করে কখনও কথা বলি না। কথা বলতে হলে অহংকারের সংগেই বলি। শুনে ভদ্রলোক অবশ্যই মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং এতাদৃশ অহংকারী ব্যক্তির পতন যে অবশ্যম্ভাবী সেকথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু মনে মনে খুশি হয়েছিলাম এই ভেবে যে পতন যার অবশ্যম্ভাবী তার উত্থানও অবশ্যম্ভাবী, কারণ উত্থান না হলে পতন হতে পারে না। আমার মধ্যে অহং ভাব এতই মজ্জাগত যে, উত্থানের আশায় আমি পতনকেও সানন্দে মেনে নিতে রাজি আছি। লোকে বলে, পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে। তা মরুক না তবু তার জীবন সার্থক। স্বল্পকালের জন্য হলেও সে যে আকাশবিহারী হয়েছে সে সার্থকতা যাবে কোথায়? পক্ষবিহীন পিপীলিকার কখনও সে গৌরব হবে না।

কিছু দিন আগে আমি যে মুসলমান পাঠকটির উল্লেখ করেছিলাম তাঁর একটি কথা আমার বড় ভাল লেগেছে। বলেছেন, আপনার আত্মগর্বী ভাব দেখে মনে মনে হিংসা হয়। অহংকার জিনিসটা যে মূলত খুব ভাল জিনিস এটি তার আরেকটি প্রমাণ কারণ, ভাল জিনিস না হলে লোকে তাই নিয়ে হিংসে করবে কেন?

আমাদের শাস্ত্রে বলেছে বিদ্যা বিনয়ং দদাতি। আমার মধ্যে যে বিনয়ের অভাব আছে সেটা বোধ করি বিদ্যার অভাবেই হয়েছে। শুনেছি বৈদিক ভাষায় বিনয় কথাটার মানেই নাকি শিক্ষা। পাছে অতিরিক্ত বিনয় নম্র হয়ে পড়ি এই ভয়েই আমি বরাবর বিদ্যাকে পাশ কাটিয়ে চলেছি। শাস্ত্রে তৃণাদপি সুনীচ হওয়ারও উপদেশ আছে। এর চাইতে মারাত্মক উপদেশ আর কিছু হতে পারে না। একবার ভেবে দেখুন তো তৃণকে কে না পায়ে মাড়িয়ে চলে! অতখানি বৈষ্ণব বিনয় আমার অসহ্য।

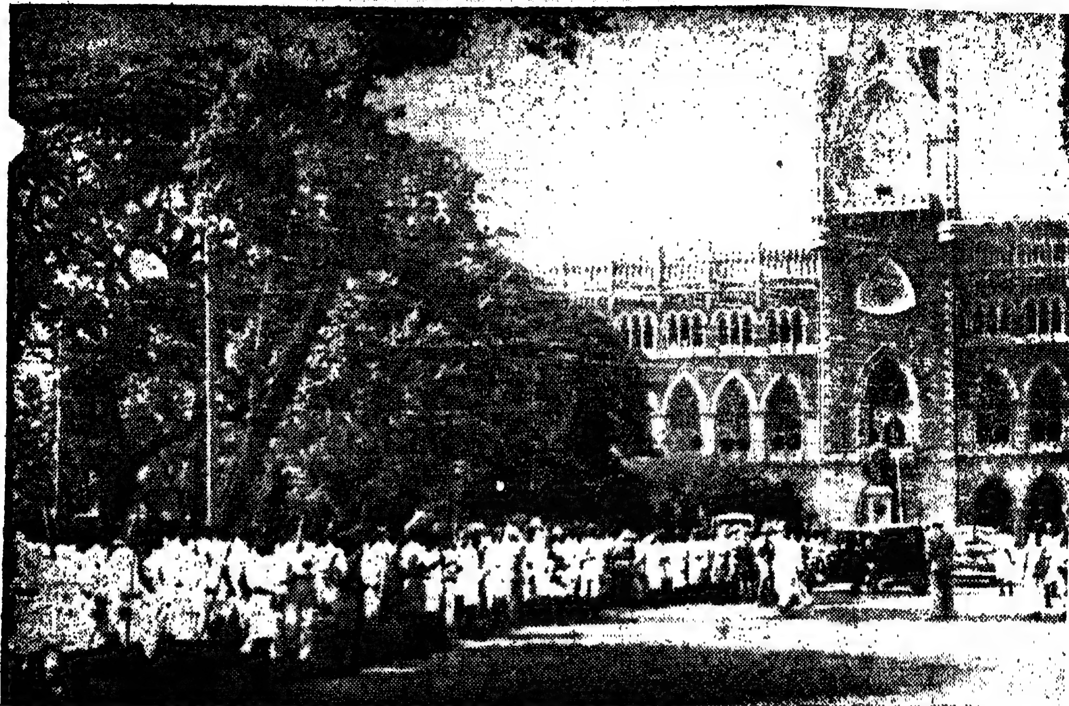
বিনয় করে কথা বলবার সব চেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে লোকে তৎক্ষণাৎ তা বিশ্বাস করে বসে। যেই না বিনয় করে বললুম, আমার বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই, আমি মূর্খ, আমি অধম, ব্যস আর রক্ষে নেই লোকে অমনি বিশ্বাস করে বসল। যদিচ বক্তা ঠিক এর উল্টোটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। বিনয় জিনিসটা যদি ভাল investment হ'ত তবে সংসারী লোক হিসেবে আমি এই মুহূর্তে বিনয়ী সেজে বসতুম।

লজ্জা যেমন স্ত্রীলোকের ভূষণ বিনয় তেমনি তেমন তেমন মহাপুরুষের ভূষণ। আমাকে আপনাকে তা মানায় না। এমন কি তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের হর্তা কর্তা বিধাতা। সুতরাং তিনিই বলতে পারেন—আমি বলবার কে? আমি তো চার আনার সদস্যও নই। ষোলো আনা ক্ষমতা হাতে আছে বলেই সিকি পরিমাণ বিনয় তাঁকে সাজে। এ জাতীয় বিনয় যে অহংকারেরই নামান্তর তা নিতান্ত মূর্খরাও বুঝতে পারে। গান্ধীজি বিনয় করে বলে থাকেন যে, তিনি infallible নন, ভুল ভ্রান্তি তাঁরও হয়ে থাকে। কিন্তু সে সব ভুলকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন Himalayan blunders, বুঝেনে একবার' তাঁর ভুল ভ্রান্তিও হিমালয়ের সমতুল্য। একে বিনয় বলবেন না অহংকার বলবেন? কেন, ভুলভ্রান্তি কি আমরা করি না? কই, উঁই-এর ঢিবির সংগেও তো কেউ তার তুলনা করে না।

থাক্ মহাত্মার কথা বলে আর কি হবে, নিজের কথাই বলি। নইলে অহমিকা বজায় থাকে না। আমি জীবনে একটি মাত্র কবিতা লিখেছিলাম। আপনারা শুনে কৌতুক বোধ করবেন সে কবিতাটির নাম 'অহংকারী'। বলা বাহুল্য যে ব্যক্তি জীবনে একটি মাত্র কবিতা লিখেছে সে ব্যক্তি কবি পদবাচ্য নয়। বাস্তবিক পক্ষে কবিতা আমার আসে না' কারণ আমি ছন্দ মিলাতে জানিনে। গদ্য কবিতার রেওয়াজ হয়েছে বলেই সাহস করে উক্ত কবিতাটি লিখে-ছিলাম। ছন্দ জিনিসটা আসলে এক ধরনের ডিসিপ্লিন। আমার মনের মধ্যে কোনো রকম ডিসিপ্লিন নেই, কাজেই ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। যাক, সেই কবিতার প্রথম দুটি লাইন আমার মনে আছে—

"আমার একটি মাত্র গুণ, সে আমার অহংকার
তোমরা বিনয়কে বল ভূষণ' আমি অহংকারকে'
বলি অহংকার—"

তারপরে যে সব উপমার দ্বারা অহংকারের গৌরচন্দ্রিকা করেছিলাম, একমাত্র মহাকবি কালিদাসের পক্ষেই তা সম্ভব হত। বলেছিলাম হিমালয় যে উন্নত-শির আকাশে তুলেছে, সে কি তার অহংকার নয়? আর অহংকার যদি নিন্দনীয় হবে, তবে সকলের মুখে কেন হিমালয়ের স্তুতি গান? তাকে কেন বল দেবতাত্মা নগাধিরাজ? মূর্খ আমাদের বিন্ধ্যপর্বত—মাথা নত করে অগস্ত্যকে দিয়েছিল পথ, অগস্ত্য আর কি ফিরেছে? বিন্ধ্য আর কি মাথা তুলেছে? তাহলেই দেখুন আমি যদি আজ মাথা নত করি, তবে আমার মনুষ্যত্ব ডিঙিয়ে যাবে আমাকে, সে হবে আমার মনুষ্যত্বের অগস্ত্য যাত্রা। অতএব বিনয় কদাপি নয়। অহংকার আত্মপ্রত্যয়ের লক্ষণ। আপন শক্তির পরে শ্রদ্ধার অভাব আত্মহত্যার মতোই পাপ।



গত ২০শে জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে পরিষদের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের সদস্যগণ কর্তৃক ৫৮—২১ ভোটে নব বঙ্গ প্রদেশ গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছবিতে—পুলিশ কর্মচারীরা পরিষদ ভবনের প্রবেশ পথ পাহারা দিতেছে।



মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের কংগ্রেস সদস্যগণ বঙ্গ বিভাগের অনুকূলে ভোট দেওয়ার পর পুনরায় পরিষদ কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন।

পরিষদের মুসলিম লীগ দলের সদস্যগণ পরিষদের এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে যোগদান করিতে যাইতেছেন।



পরিষদের কংগ্রেসী ও হিন্দু সদস্যগণ। পরিষদের এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে তাঁহারা জাতীয় বঙ্গ গঠনের অনুকূলে ভোট দেন।

অপরাহ্ন

শ্রীঅপূর্বকুমার মৈত্র

(বড় গল্প)

ছয়

স্বর্ণময়ী ওয়ার্ড—হাসপাতাল

ওরে আমার মৌমাছি!

তোর বাড়ির ঠিকানা জানিনা বলে অফিসের ঠিকানায় চিঠি দিলাম। বিয়ের পর এই প্রথম চিঠি তাও ঠেকায় পড়ে লিখছি—তাই শুরুতেই ক্ষমা চেয়ে নিলাম ভাই, রাগ করিস না। আমাদের বন্ধুমহলে সকল সমস্যার সমাধান তুই-ই করতে পারতিস। কাজেই দীর্ঘ এই চিঠি তোকেই কষ্ট করে পড়তে হবে, তারপর উত্তর দয়া করে মুখে মুখেই হাসপাতালে আইডোফর্মের গন্ধ সহ্য করে দিয়ে যেতে পারলে খুশী হব, নইলে চিঠিতেই দিস।

বিয়ের পরেই উনি বর্মায় ইলেক্‌ট্রিকাল ইন্সপেক্টর হয়ে যান। আমরা ছিলাম ইয়ামাকন্‌ জেলার সদরে, ঠিক যুদ্ধের আগে। দিন এক রকম কেটে যাচ্ছিল, যেমন ইঞ্জিনিয়ারদের বউদের যায়। লুচি আর কফি খেয়ে ভোরে বেরিয়ে যেতেন, আসতেন বেলা দুটোয় জামার পিছনটা ঘামে ভিজে নুন ভেসে উঠতো, সেই অবস্থায় জুতোর ফিতেটা না খুলেই চেয়ারে বসে দুটো ভাত মুখে পুরে আবার ছুটতেন। রাতে ফিরে এলে তখন একখানা ধুতি পরতেন। ঐ একটি বাঙ্গালীই আমাদের ও অঞ্চলে ছিল। স্বামী বলে নয়, সত্যিই ভালবাসতাম, আজো বাসি খুব-উব। এত সরল যে কি বলবো। দুনিয়ার কোন কিছুর মধ্যেই থাকতেন না। একদিন বেড়াতে যাবো বলে জ্যোছনা রাতে অনেক কষ্টে ঘরের বা'র করেছিলাম, আজো মনে আছে। দূরে পাহাড়ের উপর ছোট্ট একটা প্যাগোডার চূড়ার খুব সুখ্যাতি করতে লাগলেন। কি খেয়ালের বশে বল্লেন গান গাইতে। আমি করলাম খানিকটা আবৃত্তি :—

"এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহীন
সেই বার্তা নিয়া
ভুলি নাই, ভুলি নাই,
ভুলি নাই প্রিয়া"

অন্যমনস্ক দেখে বল্লাম, "বলতো কে লিখেছেন?"

বল্লে—"জানি চালাকি করতে হবে না, অত বোকা পেয়েছো আমাকে।"

তবু সন্দেহ ভাঙ্গতে বল্লাম—"বলই-না দেখি।"

বল্লে—"জানি, বঙ্কিমবাবু।"

হো হো করে হেসে ফেলেছি দেখে তাড়াতাড়ি ভুল সেরে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—"শরৎ চাটুয্যে বুঝি?"

বোকা তাকে ভাবিনি। পুরুষের এই অজ্ঞতাটুকু আর এক রকমের সরলতা। যদি সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেদিন আমার আবৃত্তির পরে নিজে আবৃত্তি করতে পারতো লাবণ্যের শেষের কবিতা, তবে কি আমি সত্যিই নিজকে খুব ভাগ্যবতী মনে করতাম? যাক্‌ সে সব কথা। রেঙ্গুনে জাপানীদের বোমা পড়ার পর কতটাকা খরচ করে টিকিট কিনলে সেই জানে। শীতের শেষে রেঙ্গুনের ডকের শেষ জাহাজে তুলে, নোটের তাড়া হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লে "সতী, হাজারীবাগ, সোজা বাবার কাছে যাও। কলকাতায় নেমেই একটা টেলিগ্রাম কোরো যদি টেলিগ্রাম তখন পর্যন্ত পোস্ট অফিস নেয়।" চোখের জল মুছলাম জাহাজটা ঘাট ছাড়িয়ে দূরে যখন গেল, চোখটা ঝাপ্‌সা হয়ে গেল; জিজ্ঞেস করতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম, খাকী পোষাক কেন পরেছো। আশা দিলে, দুই এক মাসের মধ্যেই হয়তো এরোপ্লেনে না হয় হাঁটা পথে আসাম দিয়ে পৌঁছে যাবে। কোন ভয় নেই।

তারপরের দিনগুলো, আমার, বাবার, মার একটা দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে কেটে যেতে লাগল। রেডিও ও খবরের কাগজ হয়েছিল আমার আর বাবার একটা সাধনার জিনিস লুকিয়ে লুকিয়ে সাইগন্‌, আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশনের খবর সন্ধ্যার পর চুপ করে শুনতাম। কত বাঙালী সৈনিক, ডাক্তার, কর্মচারীর খবর পেতাম আর তন্ময় হয়ে শুনতাম আমি আর বাবা দুজনে। তুই তো জানিস্‌ ভাই বাবা আমার কি রকম আধুনিক বুড়ো, আমার মনের গোপন কণ্টটা যতই তাঁর কাছে লুকোতে চেষ্টা করতাম ততই যেন তিনি ধরে ফেলতেন। দুবছর পার হয়ে গেল, কত দলে দলে ভারতবাসী বর্মার সাদা পথে কালো পথে হেঁটে এল আসাম পর্যন্ত, কত রেলগাড়ী দিমাপুর থেকে কাতারে কাতারে বাঙালী, মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী কলকাতায় নিয়ে এল, কত টেলিগ্রাফ্‌ পিওন হাজারীবাগ রোডের উপর দিয়ে সাইকেল চড়ে চলে গেল কিন্তু একটিবারও কেউ ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের ছোট কাঠের গেটটা খুললে না। বাঙালীপাড়ার মেয়েমহলে আমি হয়ে উঠলাম একটা আলোচ্য বিষয়। তাদের সহানুভূতি আমায় সুখের থেকে যন্ত্রণা দিত বেশি। একদিন ফুটফুটে চাঁদের আলোয় বাড়ির সামনের ফাঁকা রাস্তাটায় পায়চারী করছিলাম মার সঙ্গে, এমন সময় বাবা চেঁচিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগান দিয়ে ছুটতে ছুটতে গেটের উপর এসে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন—তারপরই অজ্ঞান। রক্তের চাপে ইদানীং ভুগছিলেন। আমরা সবাই কেঁদে উঠলাম, ঘটি থেকে জল ছিটিয়ে বাবার মুখে চোখে দিতে লাগলাম। মা কেবলই কাঁদেন আর জাগাতে চেষ্টা করেন—ওগো কি হয়েছে? শুনছো? ওগো উঠে বস কি হয়েছে?

জ্ঞান ফিরতেই বাবা কেমন উদাস চাউনি আমাকে খুঁজতে লাগলেন, তারপর আমার হা খানা ধরে বুকের উপর টেনে নিয়ে ধরা গলায় ব উঠলেন—"সতী! তোর কপালে এই ছিল?"

মা আর আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—"কি হয়েছে কি হোলো?"

"এইমাত্র শুনলাম সাইগন্‌ রেডিওতে আমাশায়, জাপানীদের বন্দী-ক্যাম্পে। ওরে স তোর কপালে এই ছিল!"

"ওগো কি বলছো গো!" বলে মা কে উঠলেন আমাকে জড়িয়ে ধরে—তারপর সব ব আজ আর নাই শুনলি। সদ্য-বিধবার বিষাদচ্ছ সারাটা বাড়ি ছড়িয়ে গেল। বাবা সকালে রেডক্রস সিমলা অফিসে টেলিগ্রাম পাঠালেন। পাড়ার অনে ছেলে-বুড়ো বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে—ঠি শুনেছেন তো?" তিনি তাতে আরো চটে যেতেন "নিজের জামাইয়ের নাম ভুল করে সেকালে কুলীনরা, আমি না। ঠিক শুনেছি—বিশ্বন মজুমদার। কুসংবাদ কখনও ভুল হয় না!"

কিছুদিন গেল। শোকের ছায়া কাটতে কাটতেই বাবা ক্ষেপে উঠলেন—মেয়ের আবার বি দেবো, ছেলেপুলে নেই, বংশে বাতি দেখার কে রইল না। হাতের চুড়ি, খুলতে দিলেন না, রঙি কাপড়গুলো একে একে বাক্সে তুলে ফেল্‌লা কালো পাড়ের সাদামাটা কাপড়গুলো তখ পরতাম, সিন্দুর সরিয়ে দিলাম, তবু আয়না দাঁড়ালে যুবতী-বিধবার অভিশাপগুলো এলো মেলোভাবে সারা শরীরটাতে ধরা পড়তো।

নির্জলা একাদশী মা করতে দিতেন না।

সারাদিন উপোসের পর বারান্দায় বেতে টেবিলের উপর আমাদের ঝি একটা রেকাবিতে খানকতক পাকা পেঁপের টুকরো আর এক গেলা মিছরির সরবৎ রেখে গেল। সবেমাত্র একটুকরো পেঁপে দাঁত দিয়ে কেটে মুখে দিয়েছি এমন সম খালি পায়ে, গা আলগা করে, একরাশ উস্কো খুস্কো চুলে একটা ছেলে সামনে এসেই বল্লে- "সতী! জ্যাঠাবাবু কোথায় বলতে পারো ও জ্যাঠাবাবু!"

আমি তো একেবারেই অবাক। জানা নেই শোনা নেই, একেবারে নাম ধরে ডেকে বসলে। উ দাঁড়ালাম। বেতের টেবিলের কাছে এসে বল্লে- "হাজারীবাগের পেঁপেগুলো কিন্তু বড় গ্রা তাই না? ল্যাংরা আমকে হার মানিয়ে দে তাই না!"

কি জবাব আর দেবো সে কথার! বল্লাম- "হ্যাঁ", মুখটা নীচু করে হাতটা বাড়িয়ে বল্লে- "দিনতো একটা টুকরো মেরে দিই।"

সমস্ত রেকাবিটাই সামনে এগিয়ে দিলাম সৌজন্য আছে। বল্লে—"ছিঃ ছিঃ, সবগুলো? না ন আপনি হয়তো খাবেন বলে বসেছিলেন।"

বল্লাম, "আপনি খান্‌, আমি আনচি আরো।" তারপরই দেখলাম ছেলেটার সমানে মুখ নড়ছে সরবৎটা দিয়ে কুলকুচি করে হাত ধুয়ে বল্লে- "ধন্যবাদ! আঃ বেশ পেঁপেগুলো কিন্তু।"

তারপর বাবা বারান্দায় এসে জিজ্ঞেস করলেন- "তুমি এত দেরি করলে যে?"

"টাউন হলের মিটিং-এ গিয়েছিলাম।"

"কিছু বল্লে সেখানে? মামুলি দুই একটা কথা, অন্তত আমাদের বাঙালীদের তরফ থেকে?"

"মামুলি কথা নয় জ্যাঠাবাবু, ওদের বলে এলাম বাঙলার মতন উদার হতে শেখো, ভারত যদি স্বাধীন হয় তোমাদের বর্তমানের মনোভাব নিয়ে

তবে ভবিষ্যত বড় অন্ধকার। এক একটা প্রদেশ তখন কূপমণ্ডূক হয়ে থাকবে এমনভাবে যে, শতকরা নব্বইজন বেহারী, পাঞ্জাবী বা গুজরাটি জীবনে একটা বাঙালীর মুখ দেখতে পাবে না। ভারতের সমস্ত সংস্কৃতি নিয়ে আজ যে আমরা বড় গর্ব করি, সেটা কোন একটা প্রদেশের দান বা সৃষ্টি নয়। উপনিষদ বেদ যদি উত্তর ভারত থেকে এসে থাকে, মনোরম মন্দির দেবালয় এসেছে দক্ষিণ ভারত থেকে; পাটলিপুত্রের স্থাপত্য আর অজন্তার শিল্প বিভিন্ন প্রদেশের—"

বাবা একখানা চেয়ার টেনে হাসতে হাসতে বল্লেন—"বেশ! বেশ! সতী, একে চিনিস"

ঘাড় নাড়লাম। খালি পা, উড়ন চণ্ডী—ছেলেটার দিকে তাকাতে এবার বিবেক বারণ করলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নখ খুটতে লাগলাম। ও নিজেই বারান্দার আর এক কোণ থেকে ক্যারাম বোর্ড টেনে নিয়ে এসে বল্লে—"খেলবে সতী?" ভাবলাম পাগলামী না আস্পর্ধা? বাবা হুকুম করলেন—"খেল না এক দান।" তারপর চল্লো খুট, খুট, খাট, খুট, ফাইন, জাম্প, ডবল মাইন। ওর খেলায় একাগ্রতা ছিল কিন্তু আমার ছিল কেমন ভয় আর দ্বিধা। এমন সময় বাবাই ওকে জিজ্ঞেস করলেন—"ভেবে কিছু ঠিক করলে?"

ছেলেটা জবাব দিল—"না জ্যাঠাবাবু, সেকালের প্রথাই ভাল। বার বছর অপেক্ষা করুক।"

ভাবলাম, কার কথা হচ্ছে?

আবার বাবা বল্লেন—"নিজের কানকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না। ছেলে মানুষ আর কতকাল রাখবো বল, দুই তিন বছর তো হয়ে গেল, বেঁচে থাকলে এতদিনে কি রেডক্রশ একটা খবর এনে দিতে পারতো না?"

উঠি উঠি করতে লাগলাম। ও বল্লে—"তবু বলা যায় না জ্যাঠাবাবু! ধরুন যদি চার বছর পরে হঠাৎ ইন্দোনেশিয়ার এক জঙ্গল থেকে নয়তো চীন কিম্বা মাঞ্চুরিয়ার কোন রেলের কুলীবস্তি থেকে বিশ্বনাথ এঞ্জিনিয়ারের আবির্ভাব হয় তখন সতীর আর আমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখুন তো?"

কাঠের গুটিগুলো হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে উঠে পড়লাম। লজ্জায় তখন মুখখানা শুধু রাঙা নয়, কানের ভিতর রক্ত ছুটতে লাগলো। পালিয়ে ঘরের ভিতর যাবার সময় ওকে বলতে শুনলাম—"আচ্ছা, সতীর সঙ্গে এক সময় পরামর্শ করে জবাব দেবো।"

সন্ধ্যাকাশে একটা তারা থাকে বলেই তাকে এড়িয়ে আকাশের দিকে চাওয়া যায় না। হাজারীবাগ রোড স্টেশনে মাত্র কয়েক ঘর বাঙালীর মধ্যে লুকাবো কোথায়? এদিকে বাবা যেন দিন দিন মরিয়া হয়ে উঠতে লাগলেন, যত আক্রোশ সব আমার উপর, যেন ইংরাজের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধটা আমিই বাধিয়ে দিয়ে তাঁকে বংশহীন করে ফেলেছি। এক এক সময় ইচ্ছা করতো রাগ করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাই—কলকাতায় নয়তো পাটনায় গিয়ে একটা চাকরীতে লেগে যাই তোর মতন। একদিন সেই রকম একটা কিছু করবো বলেই তোকে চিঠি লিখতে বসেছিলাম ভোরের বেলা এমনি সময় দেখলাম একটা বাঁশের আঁকশি দিয়ে গন্ধরাজ বোঁটা শুদ্ধ মুচড়ে মুচড়ে পাড়ছে। কৌতূহল হোলো, চিঠির কাগজের থেকে মুখ তুলে দেখলাম—আমার সেই নূতন উল্কাটি। চোখো-চোখি হতেই কোন রকম গৌরচন্দ্রিকা না করে বল্লে—"সতী, শোন তো!"

বিছানার উপর উপুড় হয়েই বল্লাম—"বলুন না ওখান থেকেই।"

"তোমার বাবা বড় উৎপাত আরম্ভ করেছেন, কাল কলকাতায় পালাচ্ছি, তোমার হাত থেকে নিস্তার পেতে।"

উঠে বসে বল্লাম—"বেশ তো আমাকেও নিয়ে চলুন না?"

"তুমি সেখানে কি করবে? থাকবে কোথায়, তোমার বাবা ছেড়েই বা দেবেন কেন? অতটা স্বাধীন ত তোমরা নও।"

আমি বল্লাম—"দাঁড়ান, আমি আসছি এক্ষুনি, অনেক কথা আছে।" সত্যি ভাবলাম এই সুযোগে আমিও পালাই, কলকাতায় তুই আছিস যখন, একটা কিছু নিশ্চয়ই যোগাড় হবে।

মনের সব কথা খুলে যখন ওকে বল্লাম, তখন খুব গম্ভীর হয়ে বল্লে—"চল তোমার বাবাকে গিয়ে বলি বিয়ে আমরা করবো।"

চেঁচিয়ে উঠলাম—"সে কি!"

"কিছু ভয় নেই, বুড়ো বাবাকে ছেলে ভোলানোর মতন একটু সান্ত্বনা দাও, কারো কোন ক্ষতি নেই তাতে। শালগ্রামের সামনে সাত পাক ঘুরিয়ে বিয়ে নয়, কোর্টে গিয়ে হাকিমের সামনে স্ট্যাম্প কাগজের উপর আমাদের মিলন হবে। আমি উইল করে রাখবো যদি কোনদিন বিশ্বনাথ আবার ফিরে আসে স্বীয় পত্নী, ধন, সম্পত্তি, সব ফিরে পাবে, আমি শুধু যক্ষের ধন যতদিন তুমি চাও আগলাবো বসে।" শরৎ কালের সেই ভোরে আমার মনের মধ্যে যে মুখর শালিক ছিল, কিচির মিচির করে ঝগড়া করে উঠলো—"যক্ষ যদি নিজেই ভোগ করতে চায় কোনোদিন?"

সে জবাব দিল—"কোনোদিনও না।"

"নিজের উপর আপনার এতটা বিশ্বাস আছে?"

বল্লে—"নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু আমি কে, আমার জন্য এতটা আপনি করতে যাবেন কেন। যদি কোনদিন সত্যিই ভাল-বেসে ফেলেন—আপনাদের পুরুষদের যে স্বভাব—সেদিন যে সমস্ত বিন্ধ্যাচলের পাথর দিয়েও আপনার রক্তস্রোত আটকে রাখতে পারবো না।"

"সে ভয় করবেন না, ভাল আমি ইতিমধ্যেই একজনকে হঠাৎ বেসে ফেলেছি।"

"ছোঃ আপনাদের আবার ভালবাসা! শেয়ার মার্কেটের হাক ডাকের মতন! কিছুই ঠিক নেই। কাকে ভালবেসেছেন?"

বল্লে—"কলকাতায়; নাম জানি না।"

নিশ্চিন্ত হলাম তাই সাহসও পেলাম। বল্লাম, "বিয়ের পরে আমায় কিন্তু একটা কিছু করে দিতে হবে, কলকাতায় হোক, পাটনায় হোক, যেখানে হোক আমাকে তো একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে ত্রিকাল ভুলে। আমি আপনার মতন ভীষ্মদেব নই। বুঝবেন না হয় তো আমার মনের অবস্থা। জানেন একটা নিঃসন্তান মেয়ের আজীবন বৈধব্য জীবন পালন করতে যে সংগ্রাম করতে হয়, তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের থেকেও বড় কারণ তার যুদ্ধে পার্থসারথি নেই, ধর্মরাজ নেই, আছে মদমত্ত নর-পিশাচের অগণিত সেনানীর দল।"

তারপর ভাই মৌমাছি! ভোর বেলা জানালার নীচে আমাদের দুজনকে বাবা দেখে আনন্দে কাছে এগিয়ে এলেন। লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা হোলো।

ওই বল্লে—"জ্যাঠাবাবু, কাল আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।"

"সে কি? সতী এখানে একা পড়ে থাকবে?"

"না, সতীও যাবে। একে কলকাতায় একটা চাকরী জোগাড় করে দিতে হবে।"

"চাকরী! বিশ্বপতি রায়ের মেয়ে কলকাতায় ফিরিঙ্গি মেয়েদের মত চাকরী করবে? তার কি এতই টাকার অভাব?"

"তা ঠিক নয়, তবে আমার নিজেরও তাই ইচ্ছা।"

বাবা বল্লেন—"তা হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। তোমার নিজের বুদ্ধির উপর এখন থেকে সবই নির্ভর করবে। এখন গিয়ে কোথায় উঠবি সতী?"

"দিন কয়েকের জন্য মৌমাছিদের বাড়িতেই উঠবো।"

"মৌমাছি কে?"

"আমার এক বন্ধু।"

সন্ধ্যার পর ট্রেন যখন হাজারীবাগ রোড স্টেশন ছাড়লো, তখন বিশ্বাস করতে পারলাম সত্যি এ কি অভিনয় করতে চলেছি। আমার এ সব ভাল লাগে না। সবটাই যেন একটা কিছু কৃত্রিম, ছলনা, ফাঁকি, মনকে মিথ্যা বোঝান। গাড়ি ছাড়ল। জানালা দিয়ে রোদে পোড়া জ্যোছনায় ভরা মাঠগুলো চোখ ভরে দেখতে লাগলাম। ফাঁকা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে বসে বসে চুল-গুলো চোখের কাছ থেকে বারে বারে সরিয়ে দিতে লাগলাম। রাতের গাড়িতে ওর উপস্থিতি মুখ না ঘুরিয়েই আমি অনুভব করে ভাবলাম, এমন কিছু হয় না যাতে ওর সব ভুল ভেঙ্গে দিয়ে হাওড়া স্টেশনে দিনের আলোতে বলতে পারি—'দেখলেন তো, হয় না, অভিনয় করতে করতে কখন আমাদের মুখোস খুলে পড়ে গিয়েছে, আপনার যা মনের মধ্যে—বলে প্রকাশ করতে পারেন না, আমারও তাই, শুধু শুধু জেদের বশে দেখাতে চাই হারিনি, তবু জানি হেরেছি। এ সব সমাজে চলে না। এমনি-ই আমাকে একটা চাকরী করে দিন বাবার হাত থেকে বাঁচি।' অকারণে ওর উপর খুব রাগ হোলো। ভাবলাম,' দাঁড়াও না, সারারাত পড়ে আছে তোমার বিবেকের সঙ্গে দুটি একটি কথা আজ বলে দেখবো তোমার সঙ্কল্প কত শক্ত ভিত্তির উপর খাড়া হয়ে আছে। ঝিরঝিরে বাতাসে জানালার উপর মাথাটা রেখে একটু ঘুমের আবেশ এসেছিল, সেই অবসরে অনেকগুলো ছোট ছোট চুল টানা খোঁপার থেকে মুক্তি পেয়ে কপালের সামনে সমানে উড়তে লাগলো, এমন সময় কানে এল—"থেতে দেবে না, রাত হয়েছে।"

আমিও ইচ্ছা করেই ডাকলাম ওকে—"তুমি" বলে। বল্লাম—"তুমি বেতের ঝুড়িটা নামাও আমি সাজিয়ে দিচ্ছি।"

ও বল্লে—"কেন তুমি খাবে না?"

বল্লাম—"না, বিধবা মানুষের পথে ঘাটে খেতে নেই।" ওর সঙ্গে পারা কঠিন, বল্লে—"থাক আমিও কলকাতায় গিয়ে গঙ্গাস্নান করে একটু ডাবের জল পাথরের বাটিতে করে খাবো। এখন বড্ড গা বমি বমি করছে।"

আমিও বল্লাম—"আমার বড্ড মাথা ধরেছে, শীত শীত করছে," তারপর বল্লাম—"হাজারীবাগ স্টেশনে বিছানাটা ফেলে এলে, এখন একটু গড়াবার জায়গা নেই—এই তো তুমি আমার গার্জেন!"

হেসে জবাব দিলে—"কেন এমন সুন্দর গদী আঁটা বেঞ্চি, পা ছড়িয়ে শোও না।"

লজ্জার মাথা খেয়ে, ওকে পরীক্ষা করতেই বল্লাম—"মাথা রাখবো কোথায়?"

বল্লে—"ওঃ এই কথা! নাও শোও।"

"এ রকম করে আর কতক্ষণ পারবে? তোমার পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে যাবে যে?"

"পারবো, খুব পারবো।"

শুয়েছিলাম, পা ছড়িয়ে গাড়ীর কামরায়, দু' দুটো ইলেকট্রিক ফ্যান আমার শাড়ীর উপর ঝড়ের বাতাস সমানে ঢালতে লাগলো। যতক্ষণ জেগেছিলাম মাঝে মাঝে টেনে টেনে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে রেখেছিলাম, তারপর ঘুমিয়েছি, জেগেছি, ভেবেছি, ঘুমিয়েছি কোলের উপর মুখ ঘুরিয়েছি, কাত হয়েছি, হাত দিয়ে বুমন্ত অবস্থায় পকেট ধরে রয়েছি, আমিও ভদ্রতা দেখিয়েছি, বলেছি—"কই তুমি ঘুমালে না সারারাতের মধ্যে একটুও?"

,এক সময় ঘুম ভেঙে দেখলাম, মৌমাছি, সত্য যুগে, দ্বাপর কি ত্রেতায় মুনি-ঋষিদেরও ধ্যান ভেঙে যেতো, এ রকম শোয়া দেখলে। কিন্তু ধন্য ছেলের উদাসীনতা, চরণে প্রণাম করি। মনে হোলো সারারাত গোলদীঘির ধারে যে বিদ্যাসাগরের পাথরের মূর্তি আছে, তারই কোলে যেন মাথা রেখে ঘুমিয়েছি। আমি হেরেছি মৌমাছি। তবু ভাবি ওকে কেন ওর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবো, সত্যিই যদি শুধু আমার উপকারের জন্যই ও আমাকে বিয়ে করে।

ভাবছিস কলকাতায় এসে হাসপাতালে কেন উঠেছি, তাই না? সে এক দীর্ঘ কাহিনী। মোট কথা ওর কে এক বান্ধবী আছে, সে যখন হাওড়া স্টেশন থেকে টেলিফোন করা সত্ত্বেও আমাকে নিতে রাজী হোলো না, তখন আমি এক ঢিলে দুই পাখী মারলাম, মেয়ে হাসপাতালে রোগের ভাণ করে এসেছি, সাময়িক আশ্রয়ও হোলো। তুই যতক্ষণ না আমাকে একটা জায়গা ঠিক করে দিস।

ভাল কথা হাসপাতালে যদি দেখতে আসিস, তবে সতী বলে এখানে কাউকে পাবি না। চাইবি মিসেস তাপস মজুমদার ব'লে। ইতি

সতী

সাত

সারাদিন অফিসের কাজে মৌমাছি কেবল ভুলই করে চলেছে। রামের টেলিফোন শ্যামকে দিয়েছে। শ্যামের টেলিফোন রামকে দিয়েছে। ঘোষ সাহেব মৌমাছির চিঠি মুখের সামনে দুখানা করে ছিঁড়ে ফেলে বল্লেন—"মিস মিটার! মন অসুস্থ হলেও এ অফিসে ছুটির ব্যবস্থা আছে—খুব জরুরী চিঠি, আবার টাইপ করে আনুন।"

"ভুল হয়েছে স্যার?

"অনেক।"

"ক্ষমা করবেন।"

"আমি না হয় করলাম, কিন্তু যে পড়বে সে বিলাত থেকে আপনার মনের আবহাওয়া টের পাবে না, অফিসকেই দোষ দেবে। টাইপ করুন আবার।"

টাইপ করে নির্ভুল চিঠি আবার মৌমাছি আনলে, ঘোষ সাহেব পড়তে লাগলেন, এমনি সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। মৌমাছি একতরফা টেলিফোনের কথা অবাক হয়ে শুনতে লাগলো—

"ইয়েস্, হ্যাঁ আমিই।"

"হঠাৎ কি মনে করে?"

বাবা কোথায়?"

"হাজারীবাগে, বেশ বেশ তারপর?"

"চাকরী! তুই চাকরী করবি হঠাৎ এ খেয়াল?"

"তবে? কার জন্যে? তোর কে হয়?"

"হুঁ, কোথায়? হাসপাতালে?"

"সে কি?"

"আচ্ছা সেরে উঠুক, পাঠিয়ে দিস্ দেখবো। উপস্থিত কিন্তু কোন চাকরী খালি নেই।"

"আসিস্ একদিন! ঠিকানা? না এটা বাড়ী নয়, অফিস। বাড়ীতে আসিস্, ওয়ান আলিপুর পার্ক।"

মিস্টার ঘোষ যে মুহূর্তে টেলিফোন রেখে দিল সেই মুহূর্তে মৌমাছি অতর্কিতভাবে চীৎকার করে উঠলো—"স্যার!"

ঘোষ সাহেব মুখ তুলে চাইলেন—"কিছু বলচেন?"

"কে কথা কইলো আপনার সঙ্গে এইমাত্র?"

"অবাক করলেন মিস্ মিটার! এক এক সময় মনে হয়, আপনি যেন লাভ্‌লি খুকী, সরলা বালিকা যাকে বলে—"

"থাক ক্ষমা করবেন, আমি জানতে চাই না।"

"না, সে হয় না, মেয়েদের কৌতূহল আমি রাখি না, যে ফোন করছিল সে বেটাছেলে, ওর দাদার সঙ্গে আমি বিলেতে পড়তাম—ছেলেটা খুব ভাল; কিন্তু এত আইডিয়ালিস্ট যে, ইজি-চেয়ারে বসে বসে পৃথিবীতে তিনটে মহাযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করে দাবা খেলার মতন, তারই মধ্যে ভারত স্বাধীন করে, দেশে দেশে যুগান্তর আনে, সভ্যতা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার সব বিষয়ে অদ্ভুত মতামত এমনি করে বলে যে, বিশ্বেস না হলেও শুনতে ইচ্ছা করে। এইচ জি ওয়েলসের স্বপ্ন আর বার্নার্ড শ'র পাগলামী এক করলে যা হয়—তুলনা নাই। বাহারে পাতার মতন, ফুল ফোটে না অথচ রঙের প্রাচুর্য। অদ্ভুত ছেলেটা!"

"নাম কি স্যার?"

"অবাক করলেন মিস্ মিটার, মনস্তত্ত্বে বলে এর পরেই আপনার প্রশ্ন হবে—তার বয়েস কত এবং বিবাহিত কিনা?"

মৌমাছি ঘর থেকে রাগ করে বেরিয়ে গেল। পূজার সময় কাজের চাপ খুব বেশি, সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে, সবাই কাজ করছে তখন। মৌমাছির চোখ দুটো ফোলা ফোলা, সেই অবস্থায় ঘোষ সাহেবের ঘরে আবার সে ঢুকলো। সুন্দর একখানা সুবৃহৎ কাগজে নিখুঁৎ টাইপ করা দরখাস্ত—তলায় নাম লেখা,—"মিনতি মিত্র"। টেবিলের উপর রাখলো।

ঘোষ সাহেব চমকে উঠলেন—"সে কি চাকরী ছেড়ে দিচ্ছেন?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"আপনার বদলে আপনার এই দূর সম্পর্কীয়া বোনকে এই অফিসে দিতে চান?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তিনি পারবেন তো? অভিজ্ঞতা আছে?"

"পারবে স্যার।"

"কি নাম?"

"সতী।"

"অবাক করলেন—সত্যিই আপনি অদ্ভুত।"

মৌমাছি ধীর পদক্ষেপে ঘোষ সাহেবের বাদামী রঙের জুতোর উপর হাত ঠেকিয়ে, মাথায় ছুঁয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। সেই সন্ধ্যার থেকে পুজোর ছুটি আরম্ভ হোলো। অফিসের সব বাবুরা সিঁড়ি দিয়ে একে একে নামতে শুরু করেছে, আজ আর লিফট্ ব্যবহার হচ্ছে না। তেওয়ারী একটু আগে মিলিটারী লরীতে চাপা পড়ে মরে রক্ত-মাংসের কর্দম হয়ে অফিসের সামনের রাস্তার উপর পড়ে আছে। লোকে লোকারণ্য। এমনি সময় তাপস সন্ধ্যার অন্ধকারে মৌমাছিকে ডাকলে ট্রাম লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে—"এই শুনচেন?"

মৌমাছির বিবর্ণ মুখে কোন কথা নেই। শুধু তাপসের হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করলে—"আপনি এখানে কেন?"

"আশ্চর্য হলেন? অপ্রত্যাশিত, তাই না?"

"হ্যাঁ এ সময় স্বাভাবিক হোত হাসপাতালের কেবিনে আপনার রুগীর পাশে।"

"সে কর্তব্য সেরেই এখানে—"

"নূতন কর্তব্যের কথা মনে পড়লো, তাই না?"

"তা নয়, সেই কর্তব্যের জের এখনও চলেছে।"

"তবে এখানে কেন?"

"আপনারই কাছে।"

"কি সাহায্য চাই বলুন?"

"—আশ্রয়।"

"কার জন্য?"

"আমার সেই রুগী।"

"হাসপাতালে অসুবিধা হচ্ছে?"

"তা নয়, তবে তার কে এক আত্মীয়া হাসপাতালে টেলিফোন করে মিথ্যা পরিচয়ের ছলনা ভেঙে দিয়েছে এবং তাকে এক নতুন চাকুরীতে আহ্বান করেছে, কালকেই তাকে হাস-পাতাল থেকে স্থানান্তরিত করতে হবে।"

"খুব ভাবনার কথা না?"

"—হ্যাঁ।"

"এতই যখন তার উপকার করলেন, মিথ্যা গার্ডেনের দিকে অগ্রসর হলো ট্রামের লাইনের তখন আপনার হরিশ মুখার্জির স্ত্রী-টির অভি-ভাবকহীন বাড়ীতে আপনার তদারকে রাখতে ভয় পান কেন?"

"আপনি তা বুঝবেন না—ভয় আমি পাইনি, ভয় করি আমার সেই রুগীকে। তার দুর্বলতা বড় বেশী। তার পরিচয় আমি পেয়েছি, প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ট তাকে আমি করতে চাই না, তাই দূরে রেখে তাকে যতটা পারি দুর্বলতার হাত থেকে বাঁচাতে চাই।"

"সত্যি এ-সব আপনার মনের কথা?"

"রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ ব্যাপার, শাসন ও শোষণে মিথ্যার একান্ত দরকার, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে মিথ্যায় হাঙ্গামা বাড়ে; সত্যি কথা বললে তাড়া-তাড়ি কাজ সফল হয়, খাটুনি কমে, মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব অল্পেতেই অবসান হয়, যেমন আজ হবে আমার নিজের—"

"কি রকম?"

"সঙ্গে আসুন আমার।"

তাপস আর মৌমাছি একসঙ্গে চলতে লাগলো গঙ্গার ধার দিয়ে। তারপর একসময় উভয়ে শরৎকালের জ্যোৎস্নালোকিত ইডেন গার্ডেনের দিকে অগ্রসর হোলো ট্রামের লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে—যখনই একটা ট্রাম পাশ দিয়ে চলে যায়, ভিতরকার লোকগুলো তাদের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে।

"ওরা অমন করে তাকায় কেন, আমাদের দিকে তাপসবাবু?"

"এ দৃশ্যটা মধুর বলে, সিনেমায় ঠিক এই জিনিসটি দেখতে হোলে টিকিটের প্রয়োজন, অথচ এখানে পাঁচ পয়সার টিকিটে নিমতলাও যাওয়া হোলো, আবার বেঞ্চে বসে বসেই ঘাড় ঘুরিয়ে এক জোড়া তরুণ-তরুণীকে দেখে অফিস-ফেরৎ পিত্তাধিক্য মনকে একটু শীতলও করা হোলো। আপনি তাতে রাগ করলেন ওদের উপর?"

"সত্যি আমার বড় রাগ হয়। এর কোন উপায় নেই?"

"আছে। ওদের কৌতূহল একটুখানি কমিয়ে দিতে পারেন। আপনি গণেশের কলাবউর মতন

ঘোমটা টেনে দিন, আমিও জনুতো জোড়া খনুলে হাতে নিয়ে, দেখবেন দর্শক কমে গিয়েছে। যাক একটা কথা আমি প্রত্যেকবার জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাই। আজ ছাড়ছি না;—আপনার পোষাকী নামটা কি বলনুন তো, আজ আপনার অফিসে ফোন করতে গিয়ে থেমে গেলাম নাম জানিনা বলে।"

"মিনতি।"

"বেশ নাম, মিনতি করি তা হোলে চলনুন ঐখানে।"

"এত রাতে ইডেন গার্ডেনে! আমাদের দেখলে লোকে বলবে কি? কি বিসদৃশ হবে ভাবনুন তো?"

"বিবাহ বাসরের পনুর্বের সব দৃশ্যই বিসদৃশ। আমাকে সেই ভয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। স্বাভাবিক যা তা ভুলতে হবে।"

"আপনি কি চান আমি বনুঝতে পারছি না।"

"বলছি স্বাভাবিক যা তা ভুলতে এই ইডেন গার্ডেনের মতন স্থান বনুটিশ সাম্রাজ্যে নেই।"

"কিসে এটা অস্বাভাবিক?"

"শহর ছাড়িয়ে উদ্যান, অলকনন্দার গঙ্গা পাশ দিয়ে বয়ে যায় তবনু কৃত্রিম হ্রদ কেটে রেখেছে, এতবড় হাওড়ার পনুলেও মন উঠলো না, ছোট ছোট পনুল তৈরী হয়েছে হ্রদের উপর। প্যাগোডা তুলে বাগানের ভিতর লোককে দিগ্‌ভ্রান্ত করে মন পাঠিয়ে দেয় বর্মার দিকে। আকাশ ভরা জ্যোৎস্না তবনু বিজলীবাতি ইতস্তত জনুলে, শ্যামল ঘাসগনুলো দেখলেই গা এলিয়ে দিতে ইচ্ছা করে তবনু স্থানে স্থানে কাঠের বেঞ্চি। তলে চিনাবাদামের খোসা নিষ্কর্মা ভ্রমণকারীর অসময়ের উদরবাহিার স্মৃতি-চিহ্ন বহন করে বেড়ায়।"

"তবনু এখানে আসা চাই।"

"অস্বাভাবিক কথাটা স্বাভাবিকভাবে বলতে উল্টোডিঙ্গি থেকে টালিগঞ্জের মধ্যে একটনু নিভৃত স্থান খনুজে পেলাম না—তাই এখানে আনলাম আপনাকে।"

"বেশ, অভিনয় শনুরনু করনুন এবার।"

তাপস মৌমাছির হাতটা ধরে হিড় হিড় করে টেনে বসালে একটা নৌকোর উল্টোদিকে, পাশেই প্যাগোডা, নিচে কৃত্রিম হ্রদ। এক থোকা লাল ফনুল সন্নিকটের একটা গাছ থেকে ছিঁড়ে, জিজ্ঞেস করলে—"মিনতি এ ফনুলের নাম জান?"

"না।"

"অশোক ফনুল!"

ভাঙ্গা, ঝনুলেপড়া, গোল হয়ে পিঠের উপর আশ্রিত আট ঘণ্টা অফিস খাটনুনির—বিপর্যস্ত খোঁপার ভিতর গম্ভীরভাবে ফনুলের গনুচ্ছ বসিয়ে দিয়ে তাপস জিজ্ঞেস করলে—"মিনতি আজকের চাঁদের নাম কি?"

"জানি না।"

"শারদীয়া ষষ্ঠী।"

হাসি সম্বরণ করতে হয়তো মৌমাছি একখানা মাসিক পত্রিকা দিয়ে নাক [illegible]র মনুখ ঢেকেছিল। তাপস টান দিয়ে হ্রদের জলে ফেলে দিল মাসিক পত্রিকাখানা।

"ওকি করলেন—এই মাসের বসনুমতী!"

"এই মাসের কেন চিরকাল বসনুমতী তোমার জলে ডুবে থাকুক আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম বনুঝতে পারছো?"

"হাঁ, খনুব পারছি।"

"কি বলতো?"

"চোখে আপনার মহনুয়ার নেশা এসেছে, জীবনে অনেকবার যে ভনিতা করে অনেকের কাছে হা হনুতাশ করেছেন, ভাষার একটনু পরিবর্তন করে আজ আমাকে সেই পনুরাতন কথাটি শোনাবেন—'ভালবাসি'। তাই না? এত কষ্ট করে এখানে এনে এতরাতে বসে নতুনত্ব কি কিছনু বাড়লো?—টেলিফোনে বললেই তো পারতেন তাপসবাবনু, জীবনে অনেক মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, কথা গনুছিয়ে বলতে পারদর্শিতা যথেষ্ট আছে, ঘরের জন্য ক্ষণিকের চমক সবখানেই আপনি সনুন্দর দিতে পারবেন। রনুপ আছে আপনার, গনুণের অহংকার নেই, পৈতৃক ভিটা, বাড়ি, গাড়ি, পয়সা-কড়ি আছে, বসে খাওয়ার অমর্যাদা বনুঝতে পারেন বলেই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘনুরে বেড়ান। আপনার মনটা হচ্ছে দনুষ্টনু ছেলেদের চোখের মতন—আপনাকে ধরে রাখবার ক্ষমতা কোন মেয়ের নেই—কথার ধনুমকেতু এতবড় যে আপনার উপযনুক্ত আকাশ দেশে নেই। বাল্যবিবাহ শাস্ত্রে ছিল আপনাদের মতন ছেলেদের জন্য রনুচি ও মন যাতে চাপা পড়ে যায়—পাঠশালাতেই পেয়ারা, কুল আর পাঁচ বছরের কোন এক পনুঁটিরাণীর পাতলা চাপে। তা যখন করেন নি তখন চোখ আপনার বড্ড ফনুটে গিয়েছে, আপনার সঙ্গে উড়ে বেড়াবার শক্তি আমাদের নেই।"

"কেন বলচো একথা?"

"আপনার কাছে রাজা জমিদারের মেয়ে দেড় মণ মাখনের তালের মতন, ক্ষণিক উত্তাপে গলিয়ে তরল করে, নিঃশেষ করে অবজ্ঞায় ফেলে যাবেন। আপনার মনকে আকৃষ্ট করে সেই সব মেয়েরা যারা নিজের রনুপ সম্বন্ধে ভীরনু সচেতন, সংসারে অভাবের সঙ্গে যনুদ্ধ করছে, যারা পালিয়ে পালিয়ে দশের কাছ থেকে এড়িয়ে চলেছে নিজেদের দৈন্যের জন্য, নিঃসহায় বলে। যে মেয়েটা বাঁচতে চায় তাকে মরবার পথটা আপনি পাঁচ আঙ্গনুলে দিয়ে দেখিয়ে দেন, যে মরতেই চায় তাকে বেঁচে থাকবার জন্য কত রঙিন স্বপ্ন দেখান। আপনারা এই যনুগের রোমান 'নেরো', অন্যের বনুকে আগনুন জ্বালিয়ে দিয়ে, সনুউচ্চ কল্পনার প্রাসাদে বসে কোন একটা সেবা সাধনার ভান ধরে উল্টো দিকে মনুখ ঘনুরিয়ে বসে থাকেন—সবটাই ছলনা, জগৎকে দেখিয়ে বেড়ান—কি ব্যস্ত! মরবার সময় নেই, কাজ, কাজ, অফনুরন্ত কাজ। ঘর সংসারের বিলাসিতা ভাববার অবকাশ নেই, নিজের ঘর উচ্ছৃঙ্খল রেখে সমাজ গড়তে বেরিয়ে পড়েন, জীবনে সঙ্গী পাবার আকর্ষণশক্তি ক্ষয় করে, দেশে দেশে ঘনুরে বেড়ান সহকর্মীর জন্য। তাপসবাবনু, আপনাকে পাবার আগেই হারাবার সংশয় জাগে। আমার ব্রত ছাড়িয়ে গিয়েছে আমার রনুচিকে। মালা পরাবার প্রিয়জন আমি আর খনুঁজে বেড়াই না জনতার ভিতর। যদি কোন দিন দিন পাই, দেখা হবে কোন আদর্শবাদীর সঙ্গে হঠাৎ। আমি এখন নিজেই ক্লান্ত, জেনেশনুনে আর সোনার হরিণের পিছনু ছনুটতে চাই না।"

"কিন্তু আমার যে রনুচি আর আদর্শ দনুই তোমাতে পাই।"

"রনুচি বদলান, আদর্শ চলে যাবে আপনার। আপনি একজন সনুগায়িকাকে বিয়ে করলে, গানের সাধনায় মেতে যাবেন, নার্সকে পেলে ডাক্তার হতে ইচ্ছা করবে। দনুঃখ হয় আপনার নেতা নেই, আদর্শ নেই, সেইজন্যই ভবঘনুরে হয়ে ঘনুরে বেড়াচ্ছেন। উপস্থিত নেশা লেগেছে আপনার দেশের কাজ, দেখনুন এ নেশাটা মদের থেকেও রঙিন, নতুন জগতে চলে আসা যায়, উন্মত্ত হওয়া যায়, প্রথম স্রোতে পিকেটিংএর আনন্দে, হাজার হাজার পায়ের তালে তালে হেঁটে যেতে কি আনন্দ লাগে, হাজার কণ্ঠে একই বাণী উচ্চারণ করতে কি পনুলক জাগে, রক্তের ভিতর প্রত্যাশা জাগে বারনুদের গন্ধের, গনুলীর আওয়াজের, অকম্পিত নিদারনুণ আঘাত দেহের শিরায় শিরায় অননুভব করে ভয়হীন মৃত্যুহীন উল্লাসে অন্যায়ের বিরনুদ্ধে দাঁড়াতে একটনু দ্বিধা হয় না কিন্তু তারপর দাবা খেলার মতন তন্ময় হয়ে যেতে হয়, খবরের কাগজ, বই আর আলোচনা করতে করতে আহার নিদ্রা ভুলে থাকা যায়—অনেক শিক্ষার পর নিভুল হিসাব হয়, অনেক পড়াশোনার পর রাজনীতির মর্মান্ত বোঝা যায়। অনেক কষ্টে প্রস্তুত হতে হয়—আমার এইটনুকু জীবনেই দেখে এলাম কত সময় নষ্ট করে, কত শিক্ষা নিয়ে সত্যিকার কাজে নামতে হয় কিন্তু সেখানে তার সামান্যই দরকার হয় কেমিস্ট্রির স্কলারের, হাকিম মনুনসেফ হবার মতন একজামিনে পাশ দিয়ে। দেখে এসেছি কত মেয়ে কত কষ্ট করে মার্কসিজম্‌ শিখলো, আসল কাজে নেমে দেখা গিয়েছে মিটিংএর হ্যাণ্ডবিল শনুধনু মিলের দেয়ালে দেয়ালে সাঁটতে হয়েছে নয়তো ছাপাখানায় বসে পোস্টারের প্রনুফ দেখতে হয়েছে শনুধনু। জনশক্তির এমনি অপচয় দেখেছি এ দেশে যে, ফলে লাভ হয়েছে এই বয়সেই আমি ক্লান্ত—আজ তাই সত্যি সত্যিই একেবারে অবসর নিয়ে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা করে। ঠিক এমনি সময়েই, তাপসবাবনু, আপনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়—আপনি হচ্ছেন উপস্থিত বানের নতুন জল, জোয়ার [illegible] সাধ আমারও হয় ভাবতে আপ[illegible] ভিতর স্থান দেওয়া যায় কিনা। [illegible] প্রেম ও দেশপ্রেম এক নয়, [illegible] মানুষ করে নেওয়া যায় বটে দেশের জন্য, কিন্তু প্রেমের পাত্র আপনি নন্‌।"

"কেন আমার বনুকে কি শেওলা জমতে পারে না?"

"না তাপসবাবনু, কঠিন চলন্ত পাথর আপনি, শেওলা ধরবার দনুর্বলতা আপনার নেই। অনেকে হেরেছে, অনেকে ঠকেছে, মিনতির গর্ব ভাঙ্গতে নিরালা এই কিরিঙ্গী বাগানে আমাকে কেন নিয়ে এলেন বলনুন তো?"

"সনুদীর্ঘ হেঁয়ালী শনুনলাম, কিন্তু তাপসের তপস্যার ত্রনুটি কোথায় জানতে পারলাম না, কিন্তু।"

"একনিষ্ঠ নয়।"

"প্রমাণ?"

"কতটনুকুই বা আপনার জানি! বলতে পারেন জীবনে কারো সঙ্গে ইতিপনুর্বে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন নি?"

"মিশেছি।"

"আদর, আহ্লাদ, বন্ধ, দেশে বিদেশে কুড়িয়ে বেড়ান নি?"

"কুড়িয়েছি।"

"বিধবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করেছেন?"

"করেছি।"

"তাকে নিজের দেহের উপর আশ্রয় দিয়ে উপবাসীকে প্রলনুব্ধ করে সারা রাত হিংস্র আনন্দ ব্রহ্মচারী সেজে ভোগ করেছেন?"

"পরীক্ষা করেছি আমি দায়িত্বের উপযনুক্ত কিনা।"

"কে পরীক্ষায় জয়ী হোল?"

"তাপস।"

এই জ্ঞানটা থাকাই যে পাপ—মনের সঙ্গে যুদ্ধ করাটাই অসচ্চরিত্রের লক্ষণ।"

"মিনতি!"

"আমায় ক্ষমা করবেন......রাজনীতি কালের ধর্মে পরিবর্তন হয় কিন্তু নীতিবোধ চিরন্তন, সেই আদর্শের থেকে আপনি যখন নীচে নেমে এসেছেন তখন আপনার পায়ে আমি কোনদিনও মাথা নীচু করতে পারবো না।"

"মিনতি!"

"বলুন।"

"তুমি এমন একটা যুগে জন্মালে না কেন যখন দেশের সমস্ত নারী কপালকুণ্ডলা, শকুন্তলা, মিরাণ্ডার মতন ন্যাকা বোকা ছিল—প্রথম সম্ভাষণেই কেঁদে কেটে ফুলশয্যা ত্যাগ করে চলে যেত—লজ্জায় রাঙা হয়ে মুখ মুছে ফেলে বলতো—এঃ রামোঃ এরই নাম প্রেম!"

মৌমাছি জীবনে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে—"না আর শুনতে চাই না আমি, আপনি ফিরে যান্। আমি উপবাসী পারি তবু উচ্ছিষ্ট নেবো না। তাপসবাবু, ত চরিত্রহীন! উঠুন উঠুন আর নয় রাত হয়েছে! বাড়ি পৌঁছে দেবেন চলুন!"

"আমার সঙ্গে যেতে ভয় করবে না?"

"না, মাছরাঙা নন্ আপনি, ঝুপ করে পড়বেন না তা জানি। জেলের মতন আস্তে ত জাল গুটোবেন—......না উঠুন্ শিগ্ উঠুন্।"

(ক্র

মেঘদূত

শ্রীবটকৃষ্ণ দাস

এখানে অনেকপ্রাণে দিয়ে যায় ঢেউ
আষাঢ়ের পরিচিত গান ঃ
ঝড়ের গোঙানি শুনে হেথা কেউ কেউ
মেঘের পায়ের শব্দে পেতে রাখে কান।

থম্‌থমে মাঝরাতে, ঝম্‌ঝমে ঝরা বরষায়,
হু-হু হাওয়া কেঁদে কেঁদে তাদেরো কাঁদায়।
আকাশে নয়ন রেখে
মেঘের মিছিল দেখে,
তারা আজো জাগে খোলা জানলায়।
বৃষ্টির ধারা লেগে তাদেরো হৃদয়,
পড়ন্ত রোদের মতো ধীরে ধীরে ক্ষয়।
মেঘে মেঘে জাল বুনে,
পাতার নূপুর শুনে।
বহু কথা তাহাদেরো মনে পড়ে যায়।
আষাঢ়েতে চিরদিন,
তাহাদেরো ভাঙা বীণ্,
ভাঙা বুকে চুপিসাড়ে বেজে বেজে যায়,
আঁখিজলে মেঘদূত তারাও পাঠায়।

সেই সব যক্ষের কোনো কথা কেউ তো শোনেনি!
তাদের চোখের জল কেউ তো দেখেনি!
আকাশেতে মেঘ হ'লে
আরো কেউ যায় গ'লে
সে কথা হৃদয় দিয়ে কেউ তো বোঝেনি!
দুরন্ত ঝড়ের রাতে,—মেঘের বন্যায়,
যাদের বুকের নীড় ভেঙে ভেঙে যায়,
সেই সব বিরহীর হাতে,
আমার এ মেঘদূত দিনু তাই আষাঢ়ের রাতে।

ঘরভোলা

বিভা সরকার

ছন্নছাড়া মন
        এই বনানীর কান্ত গেহে
                পায় কি কোনও ধন?
এই যে রাঙামাটি
        দূরের স্বপন জাগিয়ে
                ঘরের দেয় যে বাঁধন কাটি।
এ ধন ফিরতে নাহি চায়
        কেমন করে ফেরাই
                সে যে ঘর বিরাগী হায়!

এই গেরুয়া ধূলি
        মুক্ত হতে দিল মনের
                সকল দুয়ার খুলি।
এ মন হাওয়ায় উড়ে যায়
        লক্ষ্যহারা পাগল পারা
                উধাও পানে ধায়।
অচিন সাগরকূলে
        নতুন সুরে আবার সেঁকি
                বাঁধবে বাসা ভুলে।

কে জানে কোন সুরে
        মত্ত পাখায় উড়িয়ে নে' যায়
                দূর হতে কোন দূর।
জ্বালিয়ে আপন আলো
        কোন্ আঁধারে চল্লো আজি
                বাসতে কারে ভালো।
কোন্ অচিনের মায়া
        এমন ক'রে সব ভোলালো
                ছড়িয়ে অরূপ-ছায়া।
কোন্ অজানার লাগি
        আপনভোলা চল্লো পথিক
                কাহার অভয় মাগি'।



যাত্রিদল

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

ষোড়শ অধ্যায়

হঠাৎ অমিয়র নিকট হইতে একটি জরুরী তার আসিল—"শীঘ্র এস বিশেষ দরকার।" অসিত খবর পাইবামাত্র নানাপ্রকারের বিপদের কল্পনা করিতে করিতে কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল। বাসায় পেঁছিয়া দেখে—বাসা একেবারে জনমানবশূন্য—কোথাও কাহারও সাড়া নাই। এই শূন্য পুরীতে হঠাৎ কি অমঙ্গলের সংবাদ শুনিবে ভাবিয়া—সে মনে মনে ভীত হইয়া উঠিল। অমিয় একা একা চুপ করিয়া নিজের ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন—অসিত সেখানে গিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কি হয়েছে দাদা!

অমিয় কোন জবাব না দিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে বসিতে বলিলেন। অসিত অমিয়র পাশে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অমিয়র চেহারার এক অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে—দুই চোখ বসিয়া গিয়াছে—মুখ শুকাইয়াছে—মাথার চুলগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অসিত ধৈর্য হারাইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে দাদা—বৌদি কোথায়—শশাঙ্ক কোথায়? অমিয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তোর বৌদি নাই—সে মারা গেছে—অসি!

—মারা গেছেন?

—হাঁ।

—শশাঙ্ক কোথায়—শশাঙ্ক?

—তার দিদিমা তাকে নিয়ে গেছেন।

—কিন্তু কি হয়েছিল দাদা—এমন হঠাৎ—।

—হাঁ ভাই হঠাৎই—। কিন্তু অসি সে যে আমার উপরে রাগ করে আফিং খেয়ে এমনি করে মারা গেল—সে দুঃখ আমি কেমন করে ভুলবো!

—আফিং খেয়ে?

—হাঁ সামান্য ঝগড়া হয়েছিল—এমনি তো প্রায়ই হতো, কিন্তু তারই ফলে সে নিজে মরে আমাকে এমনি শাস্তি দিয়ে গেল অসি!

অমিয়র দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। অসিতের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। কিছুক্ষণ পরে অমিয় পুনরায় বলিলেন—কাল রাত্রে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে দেহ তার শ্মশানে পুড়িয়ে শেষ করে রেখে এসেছি। অসিত সান্ত্বনার কোন ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া তেমনি চুপ করিয়া উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ভ্রাতার ও ভ্রাতৃবধূর ভিতরে সদ্ভাব ছিল না—তাহা সে জানিত, কিন্তু ইহার পরিণতি যে এমনি করিয়া হইবে তাহা তো সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। পরের দিন সকাল বেলা অমিয় বলিলেন—যা হবার সে তো হয়ে গেল অসি—কিন্তু আমার একটা কথা শুনবি?

অসিত বলিল, কি কথা দাদা?

—তোরা সব কল্‌কাতায় চলে আয় অসি, আমি একা একা তো আর থাক্‌তে পারবো না ভাই! মন যে আমার সব সময় হাহাকার করে ওঠে রে। একবার মনে কচ্ছিলাম চাকুরী ছেড়ে দিই—কিন্তু এখন ভেবে দেখি চাকুরী ছাড়লে আমি বাঁচবো না—তবু তো নানা কাজে মনটাকে খানিকক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে পারবো। তুই বউমাকে, অঞ্জুকে নিয়ে আয় অসি, অঞ্জুকে কোলে নিয়ে হয়তো খানিকটা শান্তি পাব—আর হয়তো বৌমা এলে শশাঙ্ককে মাঝে মাঝে এখানে এনে রাখা সম্ভব হবে। আমার যে আজ কোন দিকেই কোন পথ নাই রে। চিরকাল ছেলের কাছেও অপরাধী হয়ে রইলাম। অসিত সম্মত হইয়া পরের দিন বাড়ি রওনা হইল—বলিয়া গেল যত সত্বর সম্ভব সকলকে লইয়া বাড়ি তালাবন্ধ করিয়া এখানে চলিয়া আসিবে। পথে আসিতে আসিতে অসিত মনে নূতন আলোক দেখিতে পাইল—দাদা তাহার মোটা মাহিনায় চাকুরী করেন। তাঁর স্নেহপ্রবণ মন একবার অঞ্জুকে পাইলে তাহাকে একেবারে আপনার করিয়া লইবেন। তাঁহার সরল উদার ভ্রাতার সহিত কল্যাণীরও কখনও বিরোধ হইবে এ সম্ভাবনা নাই। অসিত ভাবিল এমনি করিয়া দাদার উপর নিজের সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ফেলিয়া দিয়া সে একান্ত হইয়া দেশের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিবে। ভাবিতেই সমস্ত মন তাহার যেন নূতন করিয়া মুক্তির সন্ধান পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। ইহারই দিন সাতেক পরে বাড়ির একটা বিলি ব্যবস্থা করিয়া কাত্যায়নী দেবী, কল্যাণী ও অঞ্জুকে লইয়া অসিত কলিকাতায় চলিয়া আসিল। অমিয় অঞ্জুকে লইয়া একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। প্রতিদিন অফিসে যাইবার আগে—অফিস হইতে ফিরিবার পর প্রায় সর্বক্ষণ অঞ্জুকে কোলে কোলে রাখিতেন। অঞ্জুও মাত্র কয়েকটা দিনে তাহার জ্যাঠামণির একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িল। সেদিন অমিয়র অফিস ছিল না—কথা ছিল আজ সকালের দিকে গিয়া শশাঙ্ককে তাহার দিদিমার নিকট হইতে লইয়া আসিবেন। অসিত কোন কোথায় গিয়াছিল—বেলা গোটা বারর সময় বাসায় ফিরিয়া দেখে—অমিয় শুইবার ঘরের বাহিরের বারান্দায় অঞ্জুকে কোলে লইয়া রাস্তার দিক তাকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অসিত আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—কই শশাঙ্ককে আন্‌লেন না দাদা! অমিয় ফিরিয়া তাকাইলে অসিত দেখিতে পাইল তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। মুখ তুলিয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন—না অসিত তার দিদিমা তাকে ছেড়ে দিলেন না। অসিত খানিকটা অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—কিন্তু আমাদের ছেলেকে তিনি জোর করে আটকে রাখবেন না কি? দুই একটা দিনের জন্যও কি তাকে এখানে পাঠাবেন না?

—না, হয়তো আর কোন দিনই তিনি তাকে এখানে পাঠাবেন না। কিন্তু আমারও তো সব জোর শেষ হয়ে গিয়েছে ভাই! অর্থের তাদের অভাব নাই—বাড়ীতে একমাত্র বড় চাকুরে মামা—অথচ তারও কোন সন্তানাদি নাই—শশাঙ্ক তাদের ভাবী উত্তরাধিকারী। আমি তাকে কি দিয়ে আর টানবো অসি! যাক, শশাঙ্ক আমার যেখানেই থাক্—ভাল থাক্, এর বেশী আর আমি কি বলবো ভাই। বলিতে বলিতে অমিয়র কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল। অঞ্জুমণিকে নিজের বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় তিনি দূর আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করিয়া অবশেষে অসিত শেষ বেলায় পনর নম্বরের বাড়িটি বাহির করিল। বাড়িটি—বাগান-বাড়ী। একেবারে শহরের উত্তর সীমানার শেষ প্রান্তে অবস্থিত—তাহার পরেই টালার খাল। বাগান বাড়ীর দক্ষিণে ও পশ্চিমে কুলী বস্তি—সকলেই কোন না কোন কলে কাজ করে। আরো খানিকটা পশ্চিমে কুলীবস্তি-গুলির পরে একটি অপেক্ষাকৃত বড় রাস্তা এবং তাহারই ঠিক নিচে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। অসিত প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করিল, তারপরে ফটকের কাঠের দরজা ঠেলিয়া

ভিতরে ঢ়ুকিয়া পড়িল। ভিতরে ঢুকিতেই একজন যুবক কয়েকটি ফুলগাছের ঝোপের ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া প্রশ্ন করিল —কাকে চাই?

—মধুকর বাবু আছেন—মধুকর গুপ্ত?

—আপনার নাম কি?

অসিত নাম বলিলে যুবকটি একখানি বেঞ্চ দেখাইয়া দিয়া বলিল—ওখানে বসুন—আসছি বলিয়া যুবকটি অদৃশ্য হইল।

বাগান বাড়ীটি বেশী বড় নয়। চারিপাশে নারিকেল গাছ—ভিতরে কয়েকটি আম ও পেয়ারা গাছ—একপাশে গুটী কয়েক দেশী কুলের গাছ এলোমেলো ভাবে যদৃচ্ছা বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভিতরে ঢুকিবার যে রাস্তা তাহারই খানিকটা দূরে একখানি মাঝারি গোছের একতালা দালান। দালানটির হয়তো বহুদিন চুনকাম করা হয় নাই। বাহিরে ধূলা বৃষ্টির প্রলেপে কাল কাল বিশ্রী দাগ ধরিয়াছে —বড়লোকের বাগান বাড়ী বলিতে যাহা বুঝায় তাহার কোন চিহ্ন ইহার কোনখানে নাই। অসিত চাহিয়া চাহিয়া এসব দেখিতেছিল—ইতিমধ্যে সেই যুবকটি ফিরিয়া আসিয়া বলিল —আমার সঙ্গে আসুন।

অসিত তাহার পিছনে পিছনে গিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরের একপাশে বিছানায় ছিলেন মধুকর বসিয়া—দুই চোখ তাঁহার তখনও ঘুমে ঢুলু ঢুলু করিতেছিল। এতক্ষণ সম্ভবত তিনি ঘুমাইতেই ছিলেন। যুবকটি হয়তো এইমাত্র তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিয়াছে। অসিত ঘরে ঢুকিতেই তিনি তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—এসো ভাই—বসো। অসিত তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—একি আপনি এই অবেলায় ঘুমুচ্ছিলেন না কি?

মধুকর হাসিয়া বলিলেন—হাঁ ভাই, কয়েকটা দিন খুব খাটুনি গেছে—ভাল করে আহার জোটেনি কিনা—তাই আজ দিন দুই ধরে সুদে আসলে পুষিয়ে নিচ্ছি। তুমি একটু বসো আমি একটু মুখে হাতে জল দিয়ে আসছি।

পরে সেই যুবকটির দিকে চাহিয়া বলিল —তুমি ভাই স্টোভটা ধরিয়ে একটু জল চড়াও না—অসিকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে দিই। আর এই সঙ্গে আমারও একটু—কি বল? বলিয়া মধুকর বাহিরে গেলেন। যুবকটি স্টোভ ধরাইতে বসিল। ঘরটির আর একপাশে আর একখানি বিছানা গুটান রহিয়াছে—তাছাড়া কিছু সামান্য রান্নাবান্নার সরঞ্জাম—একপাশে ছোট একটি টীনের তোরঙ্গ—তাহা ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু কোথায়ও চোখে পড়ে না।

অসিত যুবকটিকে প্রশ্ন করিল—আপনিও এখানে থাকেন বুঝি? যুবকটি কোন কথা না বলিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া খানিকটা ঘাড় দোলাইল।

হাঁ, কি না, কি ইহার অর্থ অসিত বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

—আপনার নাম?

যুবকটি এবারে হাসিয়া বলিল—চা টা খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হোন্, নাম শুনতে পাবেন বৈকি?

অসিত এবারে খানিকটা অপ্রতিভ হইয়া গেল—হয়তো নাম ইনি বলিতে চাহেন না—তাহার এমনি করিয়া জিজ্ঞাসা করাও হয়তো উচিত হয় নাই। ইতিমধ্যে বাহির হইতে হাত মুখ ধুইয়া মধুকর ঘরে আসিয়া বসিলেন। চা পরিবেশন ও পান করিয়া যুবকটি যেন কোথায় বাহির হইয়া গেল। মধুকর অসিতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তারপর—অসি?

অসিত হাসিয়া বলিল—আজ এলাম দাদা।

মধুকর অসিতের মুখের উপরে দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন—অর্থাৎ। অসিত তারপর একে একে তার দাদার কথা—তাহাদের সকলের কলিকাতায় চলিয়া আসিবার কথা বিবৃত করিয়া পুনরায় বলিল—আজ আমার সংসারের সমস্ত ভার দাদার উপর তুলে দিয়েছি—দাদা আমার অঞ্জুমণিকে একেবারে বুকে তুলে নিয়েছেন—স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার নিয়েছেন। সত্যিই আজ আর আমার ভাবনা নাই দাদা? মধুকর উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—সংক্রামক ব্যাধির রোগী যেমন বাকী সকলকে রোগের বীজ ছড়িয়ে মৃত্যুপথের সহযাত্রী করে নেয়—আমি আজ তোমাকে তেমনি করে আহ্বান করছি ভাই!

—আমি তো প্রস্তুত দাদা!

—কিন্তু তার আগে তো সব কথা শুনতে হবে ভাই—কিসের জন্যে এতখানি ত্যাগ করতে হবে তাতো জানা চাই!

—বেশ বলুন।

—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশবাসীর কি লাভ হলো দেখেছো তো ভাই। দলে দলে লোক এই যে দুঃখ বরণ করলে—তার ফলে আজ দেশের চতুর্দিকে চলছে শুধু শাসকের অত্যাচার। এমনি কোন আন্দোলনেই যে কোন ফল হবে অসি,—এ বিশ্বাস আমরা রাখি না। আর মনে কর যদি বঙ্গভঙ্গ রহিত হয় কি ফল হবে তাতে? যাঁরা এই আন্দোলনের মূলে ছিলেন—তাঁদের সঙ্গে আমাদের মতের কোন মিল নাই ভাই। এরা বিষ বৃক্ষের গোড়ায় অশ্রু বর্ষণ করে—তা থেকে অমৃত ফল আশা করেন, কিন্তু আমরা একেবারে শিকড় সমেত সমস্ত গাছটাকে উপড়ে ফেলতে চাই অসি! অসিত উৎসাহিত হইয়া বলিল—তাই তো চাই দাদা!

মধুকর বলিলেন—হাঁ, তাই চাই—আবেদন নিবেদন এখানে ব্যর্থ।।

দেশের তথাকথিত গণ্যমান্য যাঁরা বিষ-বৃক্ষের আশ্রয়ে ধনে জনে নিশ্চিত বিক জীবন কাটাচ্ছে—দেশের অগণিত দরিদ্র নিপী জনগণের দিকে তারা ফিরেও তাকায় না—ি তাকাবার সাহস তাদের নাই। সে সাহস বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এই নেতাদের, ন্যাশনাল কংগ্রেসের কর্তাদের। দে সত্যিকারের দুঃখ যদি কেউ অনুভব কর্তে প অসি—সে নিশ্চিত পাগল হয়ে যাবে। অত্যাচারী নিজের ভাই বন্ধুর মুখের অন্ন কে নিলে—তার কাছে কি কখন যুক্তকরে দাঁড় মন চায়, ভাই। দুই হাত আপনা-আ মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে যে! তাই আমরা পথটাই বেছে নিচ্ছি—অসিত। সমস্ত ভারত ময় শক্তি ও সাহসের উদ্বোধন করতে হ দরকার হলে নিজের প্রাণ দিতে—শত্রুর নিতে এতটুকু দ্বিধা আমরা করবো না। স পাপপুণ্যের ভার সমস্ত কর্মের যিনি নিয় তাঁকেই সমর্পণ করে দেব। সম্পূর্ণ বি তাঁর উপরে রেখে—মনে রেখে অদম্য সাহ তবেই না এ আত্মত্যাগের পথে নামতে হ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে। এমন যাদের জন্য এই আত্মত্যাগ তাদের কাছ থেকে ঘৃণা ও একটা বীভৎস আতঙ্ক চিরজী কুড়িয়ে বেড়াতে হবে। এমনি হবে আমা জীবন। কিন্তু এত যে দুঃখ এত যে কষ্ট, ব তো ঘরে বসে নিশ্চিন্ত বিলাসে চুপ করে ব থাকতে পারবে না ভাই, যার প্রাণে সত্যিকা ডাক এসেছে, যে সত্যি সত্যি দেশকে ভালবেসে তাকে তো সাড়া না দিয়ে থাকবার উপায় নেই

"শুধু জানি যে শুনেছে কানে—

তাহার আহবান গীতি ছুটেছে, সে নির্ভীক
পর
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়াছে সে বিশ্ব বিস
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি—মৃত্যুর গ
শুনেছে সে সঙ্গীতের ম

এই আমাদের পথ—এমনি করেই আমা চলতে হবে ভাই। মধুকর চুপ করিলেন গৃহের প্রতিটি বায়ুস্তরে যেন তাহার ধ তখনও বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল। কি ক্ষণ উভয়ে নীরবে কাটাইবার পর তিনি পুন বলিতে লাগিলেন—সারা ভারতবর্ষময় শহ শহরে গ্রামে গ্রামে এমনি বিপ্লবী দল সৃ করতে হবে—মানুষকে মরতে শিখতে হ গুপ্ত কারখানায় অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে হবে সম্ভব হলে বিদেশ থেকেও আনতে হবে। ব আমাদের আরম্ভ হয়ে গেছে—অসি। ভারতে প্রত্যেক প্রদেশে এক একজনকে ভার দি পাঠান হয়েছে। বাঙ্গালী বিহারী মারাঠী পাঞ্জা সকল জাতিকেই দলে টেনে আনা হচ্ছে। তাছা এই উদ্দেশ্য নিয়েই কয়েক বৎসর আগে আম ৪।৫ জন সারা ইউরোপ ও জাপান ঘুরে এসো ভারতবর্ষের বাইরে বর্মায়, সিঙ্গাপুরে, হংকংও

আমাদের শাখা ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়ে গেছে। আমাদের অন্য উদ্দেশ্য হবে সৈন্যবিভাগে ঢুকে বা অন্য যে কোন প্রকারে হোক ভারতীয় সৈন্যদের সংস্পর্শে আসা; তারপর দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে তাদের এই গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা। এমনি করে যখন আমরা শক্তি সঞ্চয় করতে পারবো, তখন যুগপৎ সমস্ত ভারতবর্ষময় গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে সৈন্যবিভাগে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে। সে বিদ্রোহের আগুনে এই শাসকজাতি একেবারে নিশ্চিত ভস্ম হয়ে যাবে। তবে একদিনে হবে না—দীর্ঘ সময় লাগবে—হয়তো পাঁচ, দশ কি বিশ বৎসর এমনি করে শক্তি সঞ্চয়েই কেটে যেতে পারে ভাই। তবু তো থামলে চলবে না—এ ছাড়া যে অন্য কোন পথ নাই! এমনি করে দুঃখ সহ্য কর্তে, এমনি করে পলে পলে আত্মাকে বলি দিতে পারবে তো অসি। কেউ হয়তো একটু সমবেদনা জানাবে না—তোমার আদর্শ অন্য কেউ বুঝবে না, বরং দস্যু বলে, খুনে বলে মানুষ ঘৃণায় মুখ ফেরাবে। প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আসবে মৃত্যুদণ্ড কিংবা হয়তো নিজের হাতে নিজের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে—অবলীলায় কালকূট ভক্ষণ করে নিজের জীবনের অবসান কর্তে হবে—পারবে অসি?

পারবো দাদা—

বেশ কাল সন্ধ্যায় এসো—তোমাকে প্রতিজ্ঞা পাঠ কর্তে হবে। আদ্য প্রতিজ্ঞা, মধ্য প্রতিজ্ঞা অন্ত-প্রতিজ্ঞা—এই তিন প্রকার প্রতিজ্ঞা ক্রমে ক্রমে আমরা কর্মীদের পাঠ করাই। তোমাকে আদ্য, মধ্য প্রতিজ্ঞা পাঠ কর্তে হবে না অসি। প্রথমেই তুমি অন্তপ্রতিজ্ঞা পাঠ করে একেবারে সমিতির ভিতরে ঢুকে যাবে।" অসিত যখন সেখান হইতে বাহির হইল, তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাসায় আসিয়া আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িল বটে, কিন্তু নিদ্রা তাহার চোখের ত্রিসীমানার কাছেও আসিতে পারিল না। সারারাত্রি নানা চিন্তায় তাহাকে একেবারে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। পরের দিন সকালে অঞ্জুকে কোলে লইয়া অমিয় বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। অসিত ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিল। অমিয় তাহার দিকে তাকাইয়া শুধাইলেন—কি অসি?

অসিত বলিল—এমনি এলাম দাদা।

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বলিল—একটা কথা বলবো দাদা!

—কি কথা অসি—অত ইতস্তত কচ্ছিস কেন রে?

অসিত তথাপি খানিকটা যেন কি ভাবিয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা দাদা অমনি অমনি একটা কথা মনে হলো, মনে করো হঠাৎ যদি আমি একেবারে অকর্মণ্য হয়ে যাই—সংসারের যদি কোন কাজেই আর না লাগি কিংবা যদি মনে করো এমনি করে কোথাও উধাও হয়ে যাই যে সেখান থেকে চিরজীবনে আর ফিরে না আসতে পারি—তখন কি আজকের মত এমনি করে অঞ্জুকে কোলে করেই রাখবে না? আমার সকল ভার তুমি বইবে না? কথা শুনিয়া অমিয় একেবারে আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; এ অসি কি বলিতেছে—দুই চোখ তাঁহার ছল ছল করিয়া উঠিল। "এমন সর্বনেশে কথা তুই কেন বলছিস অসি? কেন এমন চিন্তা তোর মাথায় এলো ভাই! বলিয়া অঞ্জুকে নিজের বুকের উপরে টানিয়া লইয়া তিনি একেবারে দুই চোখের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। অসিত এবার জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ছিঃ দাদা, তুমি কাঁদছো? শুধু তোমাকে দুঃখ দিলাম। সত্যিই তো আর অমন কিছু হচ্ছে না। অমিয় চোখ মুছিয়া অঞ্জুকে আরও নিবিড়ভাবে নিজের বুকের ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিলেন—অঞ্জুমণিকে তো আমি কোলে তুলেই নিয়েছি ভাই —ও আমার দেবে বুকে বল—দুবেলা তোর মুখ দেখে আমি পাব কাজের উৎসাহ—আর বউমা, আমার লক্ষ্মীর মতো সমস্ত সংসার ধারণ করে রাখবেন অসি। তোদের কাউকে না হলে যে আমি বাঁচবো না ভাই। আমার আর কে আছে—বলিতে বলিতে পুনরায় তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কথার ছলনায় অমিয়কে কাঁদাইয়া যে কথা অসিত শুনিতে চাহিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইল। ভ্রাতৃপ্রেমের আনন্দে ও গর্বে তাহার সারা অন্তর ভরিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা আজ আবার অসিত সেই বাগানবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গেটের পাশেই গতকল্যকার যুবকটির সাথে দেখা হইল।

তিনি হাসিমুখে বলিলেন—আসুন।

অসিত ঘরে ঢুকিয়া দেখে অন্য ঘরে আরও দুই জন অপরিচিত লোক বসিয়া আছেন। অসিত ঘরে ঢুকিতেই মধুকর তাহাকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল—ঘরের ভিতরে একটি উজ্জ্বল কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছিল। অসিতের মনে হইতে লাগিল অন্য দুই ব্যক্তি যেন তাহার প্রতি বিশেষ উৎসুক হইয়া চাহিয়া আছেন, সে তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে অনেকখানি যেন সংকুচিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে মধুকর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—অসিত এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই—ইনি নলিনাক্ষ সেন, ইনি অতীন্দ্র ব্যানার্জি, এ'রা দুইজন এবং আমি—আমাদের এই তিনজনের উপরে বাঙলা দেশের সকল কর্মের ভার। আমাদের উপরে যিনি আছেন—তাঁর কথা তোমাকে পরে জানাবো অসি। আজ আমাদের সম্মুখেই তোমাকে প্রতিজ্ঞা পাঠ করে সমিতির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। অসিত অন্য দুইজনকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল মধুকর এক খণ্ড কাগজ তাহার হাতে তুলিয়া দিল—তাহাতে প্রতিজ্ঞা-পাঠ লেখা ছিল—অসিত পড়িয়া যাইতে লাগিলঃ—

"আমি শপথ করিতেছি যে—আজ হইতে দেশসেবাই আমার ধর্ম, দেশসেবাই আমার কর্ম, দেশসেবাই আমার জাগ্রতে ও স্বপ্নে একমাত্র চিন্তা হইবে। আমার অন্য ধর্ম, অন্য কর্ম, অন্য চিন্তা থাকিবে না। স্বদেশকে বিদেশী-কবলমুক্ত করিতে দরকার হইলে যে কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে দ্বিধা করিব না—নিজের জীবন প্রয়োজন বোধে অবহেলায় তুচ্ছ বস্তুর মত পরিত্যাগ করিব। সংসারের কোন বন্ধন রাখিব না। স্ত্রী পুত্রের মায়া পরিত্যাগ করিব। নেতার আদেশ অম্লান বদনে পালন করিব। চরিত্র নির্মল রাখিব। যদি কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করি যে কোন শাস্তি মাথা পাতিয়া লইব। বন্দেমাতরম্!" রাত্রি তখন ১২টা বাজিয়া গিয়াছে—অসিত আজও ঘুমায় নাই, ঘরের একপাশে টেবিলের উপরে একটি আলো মৃদু করিয়া রাখা হইয়াছিল—অসিত শয্যা হইতে উঠিয়া সেটিকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। খাটের উপরে কল্যাণী ও অঞ্জুমণি অসাড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আজ পূর্ণিমার কাছাকাছি কি একটা তিথি—সামনের খোলা জানালা দিয়া একফালি চন্দ্রালোক ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। ঘরের আলোকে ও বাহিরের আলোতে মিশামিশি হইয়া অঞ্জুর ও কল্যাণীর মূর্তি একেবারে স্পষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। কতক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া অসিতের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল —সমস্ত অন্তর ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস। তাহার অঞ্জুমণি আজ আর তাহার নয়—কল্যাণীও তাহার নয়। এমন কি আজ সে নিজের জীবন—নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা—সমস্ত দেশমাতৃকার চরণে নিবেদন করিয়া দিয়াছে। দিন যাইবে সুখ দুঃখে, অঞ্জুমণি তাহার বড় হইয়া উঠিবে—কল্যাণী সন্তানের মুখ চাহিয়া তাহার বিরহ ভুলিতে চেষ্টা করিবে।

তখন কোথায় থাকিবে সে? কোন্ বন্দিশালায়—কোন্ বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া কিংবা হয়তো সমস্ত অতৃপ্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে অকালে বিসর্জন দিয়া—হয় নিজের হাতে না হয়—ফাঁসির মঞ্চে এ জীবনকে শেষ করিয়া দিবে। সহসা সে দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া দুই হস্ত জোড় করিয়া মনে মনে শুধু প্রার্থনা করিতে লাগিল—হে ভগবান—অঞ্জুমণিকে, কল্যাণীকে আজ হতে তোমার পায়ে সমর্পণ করে দিলাম—আমার সমস্ত অভাব তুমি পূরণ করে দিও প্রভু। তারপর উঠিয়া আলোটি পুনরায় কমাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে সমস্ত কলিকাতা শহর

আসিয়া উঠিয়াছে—উপরে গাঢ় নীল আকাশের উপরে চন্দ্রালোক যেন পাতলা সাদা কুয়াশার আবরণ টানিয়া দিয়া সাদায় নীলে মিশাইয়া দিয়াছে। সেই আকাশের দিকে একদৃষ্টে অসিত তাকাইয়া তাকাইয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"ধরার মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক
নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ
তোর তরে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা—
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ় ফণা
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ—
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

অসিত জানালায় ঠেস দিয়া বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। দুই চক্ষু তাহার অশ্রুজলে ভরিয়া দুই গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া বক্ষদেশ ভিজাইয়া দিতে লাগিল। খাটের উপরে অঞ্জুমণি ও কল্যাণী তখনও তেমনি অসাড়ে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সমিতির নানাপ্রকার কর্মের ভিতর দিয়া অসিতের বৎসরখানেক কাটিয়া গেল, এই এক বৎসরের মধ্যে কখনও কখনও সে সমিতির খবরের কাগজ "যুগবাণী"র সম্পাদকের কাজ করিয়াছে, সমিতির হেড অফিসের কাজ করিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে কোন কোন সময়ে মধুকরের সহিত বাঙলা দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। এমনি করিয়া সে এই অল্পসময়ের ভিতরেই সমিতির একজন নামকরা কর্মী বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িল। এদিকে অমিয় মাঝে মাঝে অসিতকে কিছু একটা কাজকর্ম করিবার জন্য বলিয়াছেন এবং নিজে দুই একটা চাকুরীর জোগাড়ও করিয়াছেন বটে; কিন্তু অসিত নানা অজুহাত দিয়া প্রত্যেক বারেই এড়াইয়া গিয়াছে। তাই ইদানীং অমিয় আর তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেন না। অজয় এই দুই বৎসর ছাড়াইয়া তিন বৎসরে পড়িয়াছে। হাসিয়া খেলিয়া ছুটাছুটি করিয়া সে সারা বাড়ি মাতাইয়া রাখে। অমিয় তাহাকে দিন দিন আরও বেশী ভালবাসিতেছিল—অঞ্জুও আজকাল আর তাহার জ্যোঠামণির কোল হইতে আর কাহারও কোলে যাইতে চাহে না। কল্যাণী নির্বিবাদে মুখ বুজিয়া মনের আনন্দে স্বামী ভাসুরের সেবা করিয়া যাইতেছে—কাজেই সংসারের কোন অশান্তিই অসিতকে তাহার সমিতির কাজে বাধার সৃষ্টি করে নাই।

সেদিন শেষবেলার ট্রেনে মধুকরের সহিত অসিতের কলিকাতার নিকটবর্তী একটি শহরে কোন কাজের জন্য যাইবার কথা ছিল। অসিত আর মধুকর যখন আসিয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিল তাহার বহুক্ষণ পূর্ব হইতেই বেশ বৃষ্টি হইতেছিল। আষাঢ় মাস—তাই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা যে কখন শেষ হইবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই। ট্রেন হইতে যখন তাহারা নামিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে বৃষ্টিধারা থামে তো নাই-ই বরং পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী জোরে চলিয়াছে। ছাতা মাথায় দিয়া সিক্ত বসনে দুইজনে স্টেশন হইতে পথে নামিয়া পড়িল। এদিকটায় বৃষ্টি হয়তো আরও জোর হইয়া গিয়াছে। রাস্তার উপরে স্থানে স্থানে বেশ খানিকটা করিয়া জল জমিয়াছে। দূরে দূরে রাস্তার আলোগুলো টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে—সেই অন্ধকারে জনশূন্য রাস্তার উপর দিয়া মধুকর আগে আগে এবং অসিত তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছিল। অনেকখানি পথ আসিয়া অনেক মোড় ও বাঁক ঘুরিয়া তাহারা একটি সরু রাস্তার উপর আসিয়া থামিল। অন্ধকারে আশেপাশের কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় স্থানটির অবস্থাও অসিত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। একখানি টীনের ভাঙ্গা দরজা ঠেলিয়া মধুকর একটি বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন—এসো অসিত। অসিত অতি কষ্টে অন্ধকারে কয়েকবার ধাক্কা খাইয়া ছাতা সামলাইতে সামলাইতে বলিল—মহাভুল হয়েছে দাদা—একটা টর্চ সঙ্গে করে আনা উচিত ছিল। মধুকর হাসিয়া বলিলেন—ভয় কি অসিত—পথ ঘাট আমার সব চেনা যে। সম্মুখে একখানি টিনের চালাঘর—মধুকর তাহারই বারান্দায় উঠিয়া ছাতা ভাঙ্গিয়া অসিতের হাত ধরিয়া সেখানে টানিয়া তুলিলেন। অসিত অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ঘরের ভিতরে একটি ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছিল—তাহাদের সাড়া পাইয়া হঠাৎ সেখান হইতে কে প্রশ্ন করিল—কে—কে কথা বলে? মধুকর হাতের ছাতাটি এক পাশে রাখিয়া দিয়া আগাইয়া গিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল—আমি গাঙ্গুলী মশাই—মধুকর। —আরে মধুকর এসো এসো বাবা! মধুকর ঘরে ঢুকিয়া অসিতকে বলিল—এসো অসিত! ঘরে ঢুকিয়া পুনরায় প্রশ্ন হইল—ইনি কে?

—আমাদের লোক।

—বেশ বেশ বসো বাবাজী—এই—এই বিছানার উপরেই বসো। বলিয়া লোকটি বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া—সেইদিকে হাত বাড়াইয়া ইঙ্গিত করিলেন। পরে পাশের কুঠুরিটার দিকে মুখ করিয়া ডাকিলেন—ও মৃণাল, এই দেখ মা, মধুকর এসেছে—মধুকর। মধুকর ততক্ষণ আলোটি খানিকটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। অসিত এতক্ষণে দেখিতে পাইল যিনি কথা কহিতেছিলেন তিনি একজন প্রবীণলোক। দীর্ঘদেহ, মুখখানি যেন সদা হাস্যময়। তিনি আগাইয়া আসিয়া অসিতের কাঁধের উপরে একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন—বৃষ্টিতে খুব কষ্ট পেয়েছো বাবা। অসিত কি যেন এক জবাব দিতে যাইতেছিল ইতিমধ্যে পাশের হইতে যিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন তি একজন স্ত্রীলোক—অসিত ভাবিল ইনিই মৃণ হইবেন। তিনি ঘরে ঢুকিয়াই একেবা আলোটি পিছনে করিয়া দাঁড়াইলেন কাে তাহার চেহারাখানি সম্পূর্ণভাবে অসিে চোখে ধরা পড়িল না।—

একি, এই বৃষ্টির ভিতরে এমন কি কাজ

মধুকর হাসিয়া বলিলেন—বৃষ্টিটা কি এ ভয়ঙ্কর যে একেবারে ঘরের মধ্যে বন্ধ না হ থাকলে চলবে না। কিন্তু অসুখ বিসুখে কাছে কোন বীরত্ব খাটে না, কিনা সেই যা কথ পরে অসিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কি তোমার পরিচয় তো এখনও লওয়া হলো ভাই?

ইনি কে, মৌমাছি।

মধুকর হাসিয়া বলিলেন—ভয় না মৃণাল—কোন বাজে লোককে আমি সঙ্গে ক আনিনি নিশ্চয়।

—সে তো জানি।

—মধুকর পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—কিন্ লোকটি কে বলো দেখি, মৃণাল?

মৃণাল কিছুক্ষণ অসিতের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া হাসিয়া মধুকরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—আমি ঠিক চিনেছি, মৌমাছি—বল্‌বো?

—বল দেখি?

মৃণালিনী খপ্‌ করিয়া অসিতের একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন—তুমি ভাই অসিত, না?

অসিত একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, একটু পরে বিহ্বলতা কাটাইয়া উঠিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মৃণালিনী হাসিয়া ফিরিয়া, মধুকরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—দেখেছো কেমন ধ ফেলেছি। একি জামা কাপড় যে একেবারে ভিজে একাকার হয়ে গিয়েছে অসি!

অসিত এবার হাসিয়া বলিল—শুধু অসিত নয়, একেবারে অসিও জেনে ফেলেছেন!

মৃণালিনী মাথা হেলাইয়া বলিলেন—হুঁ তাই তো আমি সব জানি ভাই। বৃদ্ধ লোকটি এতক্ষণে কথা কহিলেন—হাঁ, হাঁ তাইতো মা কাপড় জামা যে ভিজে গেছে। একটা ব্যবস্থা তো করতে হয়।

—আমি সব করছি বাবা, তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নাই। বলিয়া মৃণালিনী নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—দেখেছে মধুকর আমি এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি—অথচ মৃণাল এক মুহূর্তেই ধরে ফেলেছে—কাপড় জামা তোমাদের ভিজে গেছে বি আশ্চর্য।

মৃণালিনী দুইখানা কাপড় আনিয়া একখানা মধুকর ও একখানা অসিতের হাতে দিয়া বলিলেন—নাও ততক্ষণ কাপড় জামা ছাড়, আমি গায়ে দেবার দেখি কিছু যোগাড় করে আনতে পারি কিনা। বলিয়া পুনরায় বাহির হইয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বে দুইখানা মোটা চাদর আনিয়া তাহারই একখানা অসিতের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন—এখানা বিছানার চাদর ভাই—এই কোনরকমে গায়ে জড়িয়ে নাও—গরীব বোনের যে এ ছাড়া আর কিছু নেই অসি! জামা কাপড় বদলাইয়া তাহারা বিছানার এক পাশে বসিয়া ততক্ষণ বৃদ্ধ লোকটির সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। মৃণালিনী তাহাদের পরিত্যক্ত জামা কাপড়গুলো তুলিয়া লইয়া বলিলেন—তোমরা বসে বসে গল্প কর অসি—আমি ততক্ষণ একটু আহারের যোগাড় দেখি।

অসিত হাসিয়া বলিল—সেই ভাল দিদি! একটু তাড়াতাড়ি দেখুন!

মৃণালিনী হাসিয়া মধুকরকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—দাদারই তো ভাই, হ'বে না কেন, দুইজনেই পেট-পাগল।

মধুকর কৃত্রিম তিরস্কারের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—মৃণাল—তুমি শেষে অতিথির নিন্দা করে বসলে—জান —'অন্তে তব অনন্ত নিরয়।'

মৃণাল বাহির হইতে হইতে বলিলেন—বাপ্‌রে! এ যে দেখ্‌ছি যে সে অতিথি নয়—একেবারে দুর্বাশা মুনি!

বৃদ্ধ, মধুকর ও অসিত তিনজনে এক সঙ্গেই হাসিয়া উঠিলেন। এ ঘরে যখন নানা বিষয়ে গল্প জমিয়া উঠিল—তখন পাশের ঘর হইতে স্টোভের শব্দ ও স্পিরিটের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। আরও কিছুক্ষণ এমনি কাটিবার পর সেখান হইতে মৃণাল ডাকিয়া বলিলেন—অসি ভাই তুমি এই ঘরে এসো না—রান্না করতে করতে ততক্ষণ তোমার সঙ্গে দুটো গল্প করি—মৌমাছি আর বাবা ওঁরা দুইজনেই গল্পে ওস্তাদ, ওঁদের সঙ্গে তোমার মিল্‌বে না।

মধুকর হাসিয়া জবাব দিলেন—অর্থাৎ তোমার নিজের মুখটাও চুল্‌ বুল্‌ করছে—একজন শ্রোতা চাই এইতো! তা অসি বেশ ভাল শ্রোতা, মুখ বুজে নীরবে—যাই কেন বল না—শুনে যাবে। ওঘর হইতে জবাব আসিল—মার ও বেচারীর দুঃখটা তোমরা কেউ বুঝ্‌লে না, নিজেরা রইলে নিজেদের কথা নিয়ে মেতে—একে এই বৃষ্টি বাদ্‌লার দিন—ও হয়তো ভাবছে—এ কোন্‌ নিরাশ্রয়ে এসে পড়্‌লো হঠাৎ। অসিত তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিল—কিন্তু নিরাশ্রয়ে যে পড়িনি—সে তো এখানে প্রথম পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি দিদি।

মৃণালিনী হাসিমুখে বলিলেন—এসো ভাই ঐ বিছানাটার উপরে বসো। অসিত বসিয়া পড়িলে পুনরায় বলিলেন—কিন্তু ভাই, মৌমাছি তো একথাটা এতদিনেও বুঝ্‌লে না! নিজের প্রসঙ্গ উঠিতেই—মধুকর ওঘর হইতে বলিয়া উঠিলেন—ফের ওসব কি নিন্দে হ'চ্ছে, শুনি। মৃণালিনী বলিলেন—এ তোমার অন্যায় মৌমাছিদা—আমাদের কথার মধ্যে বাধা দিচ্ছ কোন্‌ অধিকারে শুনি?

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন—ওর সঙ্গে কথায় আঁট্‌তে পারবে না মধুকর বরং চুপ করে যাও!

মৃণালিনী হাসিয়া অসিতকে বলিলেন—দেখ্‌ছো অসি—বাবাই কি আমার দিকে?

বৃদ্ধ পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—না হতভাগী, আমরা সবাই তোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছি।

—না তো কি?—বলিয়া মৃণালিনী হাসিমুখে রান্নায় মন দিলেন। অসিত এতক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। তাকাইয়া তাকাইয়া তাহার আরও অদ্ভুত মনে হইতেছিল ইঁহাকে। বয়স বোধকরি কোনক্রমেই ত্রিশের কম হইবে না, কিন্তু মুখের দিকে তাকাইলে হয়তো পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী কিছুতেই বোধ হয় না। চক্ষু দুইটি যেন ক্ষণে ক্ষণে নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতে থাকে। একখানা সরু পাড় ধুতিতে সারা দেহ তাঁর আবৃত, তবু তাহারই ভিতর হইতে মুখের কমনীয় রূপলাবণ্য যেন ঝিলিক মারিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু এই রূপের দিকে চাহিলে আপনা হইতেই ইহার একটা স্বাভাবিক জ্যোতিতে যেন মাথা নত হইয়া আসে—অসিত দুই চোখ ভরিয়া এই রূপের দিকে তাকাইয়া ছিল—নিজের বয়সের সহিত ইঁহার বয়সের যে বড় একটা তফাৎ নাই—মনে করিয়া স্বাভাবিক যে সঙ্কোচ তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসরও সে পায় নাই। সে বসিয়া বসিয়া বুঝিতে পারিল—শুধু এই কারণেই হয়ত তিনি এমনি অসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিতে পারেন। মধুকরের সহিত আলাপ পরিচয়ের কোন খবরই সে রাখে নাই—কিন্তু সে তো ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত—তাহাকে তো আপনার করিয়া লইতে তাঁহার একমুহূর্তও লাগিল না। মৃণালিনী মুখ তুলিয়া অসিতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কিন্তু তুমি যে কথা বলছ না ভাই। অসিত বলিল—কিন্তু আমার তো শুধু শুনবার কথা—বল্‌বার যা তা তো আপনিই বল্‌বেন।

—মৌমাছি দাদা তাহ'লে মিথ্যে বলেনি দেখ্‌ছি একেবারেই নীরব শ্রোতা। পরে পুনরায় তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন খিচুড়ী তুলে দিলাম অসি!

অসিত উৎসাহের সঙ্গে বলিল—বেশ হ'বে দিদি, এই বাদ্‌লার দিনে, একটু আদা বাটা দিবেন।

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন—ও বিদ্যেটাও জান নাকি ভাই। বউয়ের কাছে শিখে নিয়েছ বুঝি!

অসিত বলিল—আমার সব কথাই মধুদা দেখ্‌ছি আপনার কাছে বলেছেন দিদি—কিছুই বাদ রাখেন নি।—"না ভাই কিছু না—মাকে বউকে, অঞ্জুকে তুমি কত ভালবাস তাও বলেছেন", অসিত ইহার কোন জবাবই না দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কিন্তু ভাল যে আমাদের বাসতে নেই দিদি।

মৃণালিনী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—ছিঃ অসি এ তুমি কোন্‌ বুদ্ধির কথা বল্লে ভাই? ভালবাস্‌বে না? নিজের স্ত্রীপুত্রকে ভালবাস্‌বে— প্রতিবেশীকে ভালবাস্‌বে— সমগ্র দেশকে ভালবাস্‌বে—বুকভরা ভালবাসা না থাক্‌লে কি সত্যিকারের বিপ্লবী হওয়া যায় ভাই? ভালবাস্‌তে পারার চেয়ে যে আর বড় কাজ নাই—অসি।

অসিত আশ্চর্য হইয়া গেল। এম্‌নি করিয়া সাজাইয়া কথা বলা তো সামান্য কথা নয়। তাছাড়া বিপ্লবী নাম ইনি পাইলেন কোথা হইতে। মধুকর হয়তো কোন কথাই ইঁহার নিকট গোপন রাখেন নাই—ইহা কি ভাল হইয়াছে। যত বুদ্ধিমতীই তিনি হউন তবু কি সমিতির সব কথা এম্‌নি করিয়া বলা উচিত। এই সংশয় মাঝে মাঝে তার মনকে থাকিয়া থাকিয়া দোলা দিতে লাগিল।

মৃণালিনী পুনরায় মুখ তুলিয়া বলিলেন—বউ তোমাকে খুব ভালবাসে বুঝি অসি?

অসিত হাসিয়া বলিল—সে তো জানি না দিদি!

—জান না? সে কেমন করে হয়। ও জিনিসটা তো কেউ কখনও গোপন করে রাখতে পারে না ভাই? সে যে নানা মূর্তি ধরে প্রকাশ হয়ে পড়েই। অসিত কথার কোন জবাব না দিয়া শুধু মুখ বুজিয়া হাসিতে লাগিল।

—আমি মুখ দেখেই ধরতে পারি ভাই—ভালবাসা তুমি পেয়েছ।

—আপনি দেখ্‌ছি একেবারে সবজান্তা দিদি—কিছু জান্‌তে আর বাকী নাই। বলিতে বলিতে হাসিয়া অসিত বিছানার উপর দেহখানি এলাইয়া দিল।

মৃণালিনী বলিলেন—বালিশটি টেনে নাও অসি—গরীব দিদির বিছানা বলে যেন ঘৃণা কোরো না ভাই!

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ কাটিল—পরে আবার প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা ভাই, বউ খুব কান্নাকাটি করেনি তো—তোমাকে ছেড়ে দিতে? তোমার আদর্শের কথা সব তাকে বলেছ তো?

অসিত বলিল—না কিছুই বলি নি তো দিদি—সব কি তাকে বলা যায়?

—তাকে বলা যায় না? এ তুমি কি বলছো অসি?

—কিন্তু দিদি সে যদি বুঝতে না পারে—তা ছাড়া সমিতির কথা তো কারু কাছেই বলা চলে না।—

—কারু কাছে বলা চলে না—ও কথা ভুল অসি—যাকে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি তাকে বলা চলে। তোমাদের সমিতির সব কথা নাই বা বল্লে ভাই—কিন্তু তোমার আদর্শের কথাটাতো মোটামুটি তাকে জানাতেই হবে—নইলে যে অধর্ম হবে অসি।

—"অধর্ম হবে?"

—হ্যাঁ ভাই বিয়ের সময় কি বলে মন্ত্র পড়েছিলে মনে নাই? সেদিন মন্ত্র পড়ে যে তাকে সকল কর্মের সাথী করে নিয়েছ—সকল সুখ দুঃখের ভাগী করেছো? আর বুঝতেই বা পারবে না কেন সে? তুমি বুঝিয়ে দেবে, তবু যদি না বোঝে তবে বুঝবো সে তোমার দোষ ভাই—তুমি বুঝিয়ে বল্‌তে জান না।

অসিত অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল—আপনার কথাই ঠিক দিদি—এ কথাটি আমি অনেকবার ভেবেছি কিন্তু কোন কূল কিনারাই পাইনি। —এবার তাকে বলবো—সব জানাবো।

—হ্যাঁ জানিও সব—সবার কাছেই কি সব জিনিস গোপন কর্তে হয় ভাই। পুনরায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কাটিবার পর মৃণালিনী বলিলেন—ঘুমুলে ভাই?

—না ঘুমুইনি তো।

অমনি চুপ করে গেলে যে?

—আমি শুধু ভাবছি দিদি—ভাবছি আমি তো বাইরের লোক কতটুকুই বা আপনাকে জানি—কিন্তু এই সময়টুকুর ভিতরে যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতেই যে আমার বিস্ময়ের সীমা নাই। মধুকর দাদা হয়তো সব জানেন—আপনাদের সঙ্গে কি তার সম্পর্ক আমি জানিনে, কিন্তু এটা আমি নিশ্চয় করে জেনে ফেলেছি দিদি তিনি তো যার তার সঙ্গ পছন্দ করেন না—পাকা জহুরীর মত খাটী মানুষটি বেছে বেছে বের করতে পারেন।

মৃণালিনী হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন—দাদার গুণ-গান করতে গিয়ে যে আত্মপ্রশংসা হ'য়ে গেল অসি।

অসিত বলিল—হোক গিয়ে আত্মপ্রশংসা—তবুও আমি বল্‌বো দিদি। আর শুধুই কি তাই—এই যে একটু আগে বল্লেন যে—ভাল না বাস্‌লে বিপ্লবী হওয়া যায় না—সে কথা যে মধুকর দাদাকে না জেনেছে সে তো বুঝবে না দিদি। মানুষকে এমন প্রাণভরে ভালবেসে আপনার করে নেবার ক্ষমতা কয়জনের আছে?

মৃণালিনী এতক্ষণ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিলেন—এবার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—দাদার যে ভারী ভক্ত হয়ে উঠেছ অসি।

—ভক্ত কি আর অমনি হয় দিদি—মন যে আপনিই ভক্তিতে নুয়ে পড়ে।

মৃণালিনী একেবারে তরল হাসিতে কণ্ঠ ভরিয়া বলিলেন—সত্যি নাকি? দাদাটি দেখছি ভাইয়ের মাথাটি একেবারে বিগড়ে দিয়েছেন।

এমন সময় দরজার ভিতর দিয়া গলা বাড়াইয়া মধুকর বলিয়া উঠিলেন—এ কি গল্পে যে দুইজন একেবারে মেতে উঠেছো। খাবার কিছু রাতের মধ্যে জুটবে, না একেবারে হরি-বাসর।

—এই যে হয়েছে বসে পড়ো—অসিও ওঠো ভাই।

পরের দিন সকাল বেলা মৃণালের ডাকে অসিতের ঘুম ভাঙিল—উঠে হাতে মুখে জল দিয়ে নাও অসি, সকালের ট্রেনে কল্‌কাতায় ফিরে যাবে যে! ইহারই মধ্যে লুচি, হালুয়া আরও কি সব খাবার তৈরী হইয়া গিয়াছে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া অসিত বলিল—আপনি কি সারা রাত ঘুমোন নি দিদি।

মৃণালিনী বলিলেন—কেন বলতো?

তা নইলে এই এত সব করলেন কখন?

মধুকর হাসিয়া বলিলেন—তোমার অত প্রশ্নের দরকার কি অসি! এখন হাত চালিয়ে নিজের কাজটি করে যাও দেখি—ওসব বাজে ভদ্রতা করবার সময় আছে নাকি এখন। বলিয়া তিনি খান দুই লুচির সঙ্গে হালুয়া মাখিয়া মুখের ভিতরে পুরিয়া দিলেন।

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন—কেমন অসি—কালরাত্রে যে দয়ামায়া না কি সব ভাল ভাল বিশেষণ দিয়ে দাদার গুণ ব্যাখ্যা করছিলে, তেম্‌নি আরো দুই চারিটি বুলি এখনও বল শুনি? দাদাটির কথাবার্তায়ও ঠিকঠিকই মিলে যাচ্ছে বোধ হয়। মৃণালের পিতা এতক্ষণ কথা বলেন নাই—এবার বলিয়া উঠিলেন—সত্যি মধুকর অসিতের কথা মিথ্যে নয়—যেদিন তুমি আস সেদিন যেন মৃণাল আমার নতুন মানুষ হয়ে ওঠে—কেমন করে তোমাকে খাওয়াবে—যত্ন করবে শুধু এই চেষ্টা। আমাকে বলে মৌমাছি দাদা কলকাতায় কিছু খায় না বাবা, পাছে সমিতির টাকা কিছু বেশী খরচ হয় এই তার সব সময় ভয়।

মধুকর হাসিয়া মৃণালের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। দৃশ্যটি কিন্তু অসিতের দৃষ্টি এড়াইল না। অহার মন এই দিদিটিকে ঘিরিয়া কত কি কল্পনা করিয়া ফিরিতে লাগিল। জলযোগ শেষ হইলে মধুকর নিজের সুটকেস হইতে কাগজে মোড়া কি একটা দ্রব্য অসিতের হাতে দিয়া বলিলেন—দেখতো অসিত জিনিসটা একবার। অসিত কাগজের আবরণ সরাইয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া বলিল—রিভলবার এলো কোথা থেকে দাদা।

মধুকর হাসিয়া বলিলেন—গাঙ্গুলী মশাই তৈরী করেছেন—জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে, বলিয়া পুনরায় সেটি সুটকেসের ভিতরে লুকাইয়া রাখিলেন। পরে মৃণালের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—এবার ভোজন-দক্ষিণা চাই মৃণাল। মৃণালিনী বলিলেন—কত চাই?

আপাতত শ পাঁচেক।

ঘরের এক কোণে রক্ষিত লেপ কাঁথার ভিতর হইতে পাঁচটি নোটের তাড়া আনিয়া সে মধুকরের হাতে তুলিয়া দিল।

মধুকর সেগুলিকে ভাল করিয়া কোটের ভিতরের পকেটে ভরিয়া লইয়া বলিল—এবার তা হ'লে আসি মৃণাল।

মৃণাল কিন্তু কথাটি কহিল না। অসিত মৃণালের পদধূলি মাথায় লইয়া বলিল, চল্লাম দিদি।

মৃণালিনী বলিল—চল্লাম বল্‌তে নেই ভাই—আবার এসো, দিদিকে ভুলো না। অসিত মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

কিন্তু পথে আসিয়া সে ইহাদের কোন আচরণেরই কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইল না। মনে তাহার নানা প্রশ্ন বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল।

দুইজনে আসিয়া গাড়ীর এক নিরাল কোণে চাপিয়া বসিলেন। দূরে দূরে দুই একজন কলের কুলী মজুর ভিন্ন আর অন্য যাত্রী কেহ কামরায় ছিল না। মধুকর ধীরে ধীরে কথা আরম্ভ করিলেন—খুব আশ্চর্য হয়েছ বুঝি অসি!

অসিত বলিল—সত্যি দাদা এদের সব কথা শুনে অধৈর্য হয়ে উঠেছি।

—সময় হলে সব কথাই জানাব অসি। কিন্তু আজ শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে, গাঙ্গুলী মশাই এবং তাঁর মেয়ে মৃণালিনী এ'রা দুইজনেই আমাদের লোক। সমিতির কোন লোকের চেয়েই এ'রা কম বিশ্বাসী নয়—এমন কি আমার চেয়েও নয়। আর এত বিশ্বাস তাদের উপরে রাখি বলেই সমিতির সকল অর্থ মৃণালিনীর কাছেই গচ্ছিত রাখি। অনেকদিন তুমি জান্‌তে চেয়েছ অসি, যে অর্থ আমি কোথায় রাখি—আজ দেখ্‌তে পেলে এর চেয়ে নিরাপদ স্থান আর আমি একটিও খুঁজে পাইনি ভাই। এর বেশী আজ আর কিছু জানতে চেয়ো না। অসিত আর একটি কথা না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—তাহার সমস্ত অন্তর এই অপরিচিত অদ্ভুত দিদিটির উপরে শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্যিকের ভূমিকায় সুস্নিগ

শ্রীমণি বাগচী

নেপোলিঁও থেকে শুরু ক'রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত পৃথিবীর একাধিক রাষ্ট্রনায়ককে আমরা সাহিত্যিকের ভূমিকায় দেখ্‌তে পেয়েছি। লেনিনের রচনাবলী আজ বিশ্ব-সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। সেণ্ট হেলেনায় নেপোলিঁও যখন বন্দী-জীবন যাপন করছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁর 'জীবন-স্মৃতি' রচনা করেন। ফরাসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে এই বইখানি, পৃথিবীর বহু ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে এবং সাহিত্য হিসেবে বইখানি যে সার্থক তা আজ স্বীকৃত। তেমনি পণ্ডিত নেহরুর "আত্মজীবনী," 'ডিস্‌কভারী অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি পুস্তক আজ বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। মহাত্মাজীর 'মাই এক্সপেরিমেণ্ট উইথ ট্রুথ্' এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্' ও তাঁর প্রথম বয়সের লেখা 'তরুণের স্বপ্ন' সাহিত্য হিসেবেই বেশী সমাদৃত। রাষ্ট্রনেতার জীবন, বিশেষ ক'রে সেই শ্রেণীর রাষ্ট্রনেতা, যিনি একটা জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রক, সহজ মানুষের জীবন নয়। তাঁদের চিন্তা, চরিত্র এবং কাজের মধ্য দিয়ে বিরচিত হয় আগামী দিনের ইতিহাস, বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে চলমান বর্তমান। কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে এঁরা যেটুকু অবসর পান সেই সময়টুকু এঁরা অধ্যয়ন অথবা রচনায় অতিবাহিত করেন। তবে এঁদের যা কিছু শ্রেষ্ঠ রচনা তা সম্ভব হয়েছে কারাগারের কর্মবিরল অবসরের মধ্যে বসেই। বর্তমান যুগে এমনি একজন খ্যাতনামা রাষ্ট্র-নায়ককে আমরা সাহিত্যিকের ভূমিকায় দেখ্‌তে পাই। তিনি অস্ট্রিয়ার ভূতপূর্ব চ্যান্সেলার কার্ট ভন্ সুস্নিগ। পৃথিবীর লোক আজও এই মানুষটিকে মনে রেখেছে। ইউরোপের রাষ্ট্রমঞ্চে যখন বিশ্ব-ত্রাস নাৎসী-নায়ক হিট্‌লারের আবির্ভাব হোলো, সেই সময় সুস্নিগ ছিলেন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার। নতমস্তকে নাৎসীবাদ তিনি সমর্থন করেন নি ব'লে হিটলারের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সুস্নিগের ওপর। তাকে তিনি পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে ফেল্‌তে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে হিটলারের মত পরিবর্তন হয় এবং সুস্নিগকে তিনি আমরণ বন্দী করে রাখবার আদেশ দেন। ১৯৩৮ সাল থেকে পুরো সাত বছর তিনি হিটলারের বন্দী হয়ে বিভিন্ন বন্দীশালায় বহুবিধ অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ভোগ করেন সপরিবারে। এই বন্দীদশায় সুস্নিগ "Austrian Requiem" ব'লে যে পুস্তকখানি রচনা করেছেন, ইউরোপ ও আমেরিকার বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচকদের মতে, সেটি একালের একখানি উল্লেখযোগ্য বই এবং সাহিত্য হিসেবেই এ বই সকলের কাছে আজ সমাদৃত ও স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম প্রকাশিত হবার পর এ পর্যন্ত তিনটি সংস্করণে বইখানি বিক্রী হয়েছে দশ লক্ষ কপি, আর ইউরোপের তিনটি প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে এই বহু-খ্যাত বইখানি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা গেলো। এর রাজনৈতিক গুরুত্ব যাই থাক না কেন, বিদগ্ধ পাঠকের কাছে এর



গ্রন্থরচনারত ডাঃ সুস্নিগ

সাহিত্যিক মূল্যটাই আগে চোখে পড়বে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের যা সার্বজনীন প্রকৃতি, সুস্নিগের বইখানিতে, দেশকালপাত্রের গণ্ডী অতিক্রম করে সেই জিনিষই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। নাটক, উপন্যাস ও ইতিহাসের সমন্বয়ে বইখানি যেমন উপভোগ্য, তেমনি অনেক চিন্তার খোরাকও এর মধ্যে পাওয়া যায়। আমেরিকার সমালোচনা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'দি স্যাটার্ডে রিভিউ' সুস্নিগের এই বইখানি সম্বন্ধে সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"Drama and tragedy deserving of the pen of the greatest novelists and playwrights of our times fill the pages of this book ('Austrian Requiem') by Kurt Von Schuschnigg..."

এর থেকেই বইখানির যে একটা সাহিত্য-মূল্য আছে তা বেশ বোঝা যায়। যদি বইখানি সুস্নিগের বন্দীজীবনের রোজনামচা হোতো তা হলে সুধী সমাজ হয়তো এ নিয়ে এতখানি আগ্রহ প্রকাশ করতো না, কিম্বা সমসাময়িক সাহিত্যে বইখানি উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হোতো না। বিশ্ব-শান্তির স্বপ্ন দেখে এসেছেন আজীবন সুস্নিগ, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষের বিস্ফোরণে সেই শান্তি আজ সুদূরপরাহত। তবুও পৃথিবীর মানুষ এই অব্যাহত শান্তিরই কামনা করছে মনে প্রাণে। আজকের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছেও এই প্রশ্নই আজ বড়ো হোয়ে উঠেছে—স্থায়ী শান্তি কি সম্ভব? আশাবাদী মানুষ সুস্নিগ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে তিনি যে কথা বলেছিলেন, ১৯৪৭ সালেও তাঁর মুখে সেই একই কথা—"Why not?"—কেন নয়? এই আত্মজীবনীর প্রতিটি পৃষ্ঠায় সেই বিশ্বাসই প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এই গেল বইটির একটি দিক।

যেখানে বইখানি সাহিত্য হয়ে উঠেছে, সেই সব বর্ণনা ও বিশ্লেষণ ভাবে ও ভাষায় অনবদ্য। একটু দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। ২২শে নভেম্বর, ১৯৩৪ সাল—এই তারিখটি অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরদিন উল্লিখিত থাকবে। কেন? তারই বিশ্লেষণ শুনুন সুস্নিগের মুখে: 'ইউরোপের বিলাসকেন্দ্র ও অস্ট্রিয়ার আলোকোজ্জ্বল রাজধানী, ভিয়েনা। কিছুদিন

আগেও মধুর সংগীত, সুন্দরী নারী ও স্বচ্ছন্দ আয়াস ভিয়েনাবাসীর জীবনে প্রাচুর্য এনে দিয়েছিল। সেই ভিয়েনা আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন—পরিত্যক্ত। কদাচিৎ মানুষের পায়ের শব্দ শোনা যায়। কিছুদিন আগেও কার্টনার স্ট্রেসি ও স্টেফান্সডোমের চারদিক হাস্যে লাস্যে গানে মূর্ছনায় বিভ্রান্ত হয়ে থাকতো। আজ তা নীরব ও অন্ধকার। কেবল টহলদারী সৈনিক ও অস্ট্রিয়ার ঝটিকাবাহিনী ঘোরাফেরা করছে। ভিয়েনার মরণদশা উপস্থিত হয়েছে। যা কিছু হয়েছে তার জন্যে একা ডলফাসকে আমি দায়ী করিনে। ডলফাস তো শিখণ্ডী মাত্র—আসল অধিনায়ক হোলো প্রিন্স ভন্ স্টারহেমবার্গ। ইউরোপের প্রাচীনতম অভিজাত বংশোদ্ভূত ধনকুবের স্টারহেমবার্গ। একদিকে অন্ধকার পরিত্যক্ত জনপদ, ক্ষুধার্ত দরিদ্র ভিয়েনাবাসী—অন্যদিকে স্টারহেমবার্গের গগনচুম্বী প্রাসাদে অপরিমিত ঐশ্বর্য, উন্মত্ত সংগীত আর অসামান্যা সুন্দরী যুবতী নারীর দেহবিলাস। এই ক্ষমতালোভী স্টারহেমবার্গের প্রাসাদেই ১৯৩৪ সালের ২২শে নভেম্বর রাত্রে অস্ট্রিয়ার নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক অস্ত্রব্যবসায়ী ও ধনকুবের ফ্রিজ মেণ্ডলের সংগে, রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের জন্যে, স্টারহেমবার্গ এই রাত্রে, এক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। চ্যান্সেলার ডলফাসকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা প্রভৃতির পর পর যেসব ভয়ঙ্কর ঘটনা অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে অস্ট্রিয়াকে জার্মান ডিক্টেটারের হাতে তুলে দিয়েছিল, স্টারহেমবার্গ প্রাসাদেই ঐ রাত্রে তার সূচনা।"

এমনি বিভিন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সুনিপুণ বিশ্লেষণে বইখানির প্রতিটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল ও আবেগময়। সহজ সরল ভাষায় এমনি মনোজ্ঞ বর্ণনা অনেক কৃতী সাহিত্যিকের রচনাতেও দুর্লভ। যে সাত বছর তিনি বন্দী জীবন যাপন করেছিলেন, তার প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে সুস্নিগ অনুভব করতেন সমগ্র ইউরোপের হৃৎস্পন্দন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়ে যা তিনি দেখতেন তাকেই সংবেদনশীল সাহিত্যিকের হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন, আর সমর্থ শিল্পীর মত রূপ দিতেন ভাষায়। সমগ্র কাহিনীর নায়ক তিনি; কিন্তু লেখার মধ্যে এমন সংযম যে, নায়ক সেখানে গৌণ, মুখ্য হয়ে উঠেছে শুধু চারিদিকর চরিত্র আর ঘটনাবলী। ১৯৩৮ সালে ১২ই ফেব্রুয়ারী, ক্ষুদ্র অস্ট্রিয়ার শান্তশিষ্ট চ্যান্সেলার সুস্নিগের সংগে জার্মানীর দুর্ধর্ষ অধিনায়কের প্রথম সাক্ষাৎ। এই প্রসিদ্ধ সাক্ষাতের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবার মতো। বার্গহফের বিরাট দুর্গ-প্রাসাদে এই সাক্ষাৎ হয়। সুস্নিগ লিখছেন : "প্রাসাদে উপনীত হবার কিছুক্ষণ বাদে ফ্যুরার এলেন। পূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত, কটিতে বিলম্বিত হিণ্ডেনবার্গের দেওয়া তরবারী, বেল্টের আর এক পাশে চর্মপেটিকায় মধ্যে নিবদ্ধ রিভলবার, পায়ে নাল-লাগানো পালিশ-করা ভারী বুট—এই হিটলার। মনে হলো, এ যেন আসল সৈনিক নয়, আসল ডিক্টেটর নয়—থিয়েটারের একজন অভিনেতা যার রূপসজ্জা নিখুঁত কিন্তু ভূমিকাটি নকল। সংগে রয়েছেন জেনারেল কাইটেল, আর ভন প্যাপেন্। আমি চেয়েছিলাম একটা বোঝাপড়া করতে, কিন্তু হিটলার চাইলেন—অস্ট্রিয়ার বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ। যুক্তির বালাই নেই, বিচারের দায় নেই—তাঁর শুধু একটি কথা—"accept my orders blindly or you face death"। তাই হোলো। নির্বিচারে হিটলারের আদেশ মেনে নিতে পারলাম না বলে আমাকে সেইখানেই বন্দী করা হলো।"

"বন্দী হলাম। চললো আমার উপর অকথ্য উৎপীড়ন আর অকল্পিত অত্যাচার। সে সব নিষ্ঠুর নির্যাতনের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবার জন্যে। কিন্তু আমি আত্মহত্যা করিনি, হিটলারকেই আত্মহত্যা করতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত; ইতিহাসের যে এই বিধান হবে, তা আমি জানতাম।" এই বন্দী-জীবনের অধ্যায়টি সমগ্র পুস্তকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। সুস্নিগের বিশ্বাস টলাবার জন্যে তাঁর ওপর যে কতরকমের অত্যাচার হয়েছে, তিনি সেগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন চমৎকারভাবে। সেই সংগে রোম্যান্সের যেটুকু অবতারণা করেছেন তাও সমগ্র কাহিনী পাঠকের মনে গভীর সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে। হিটলারের হাতে বন্দী হবার পর অস্ট্রিয়ার এক সুন্দরী ও তরুণী কাউণ্টেস্ তাঁকে বাঁচাবার জন্যে কিভাবে প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে সংগ্রাম করে বিপদের মধ্যে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে—সেই কাহিনী আধুনিক কালের একটি মর্ম-স্পর্শী 'প্রেমের গল্প' হিসেবে বিখ্যাত হ'য়ে থাকবে। গ্রন্থকারের চরিত্র চিত্রণের আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় আছে এই অধ্যায়টিতে।

তারপর ১৯৪৪ সাল এলো। হিটলারের বন্দীশালায় তাঁর বিশিষ্ট বন্দীদের মনে একটু একটু আশার সঞ্চার হলো। আশার সঞ্চার হোলো এই কারণে যে, তখন তাঁরা খবর পেতে লাগলেন—পাশায় এবার উল্টাদান পড়তে শুরু হয়েছে অর্থাৎ জার্মানীর পরাজয় ও হিটলারের পতন আসন্ন। যতই এক একটা ফ্রণ্টে জার্মানীর পরাজয় ঘটে, ততই কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে বন্দীদের মৃত্যুসংখ্যা বাড়তে থাকে। সুস্নি[গ] তখন ছিলেন ফ্লোজেনবার্গের ক্যাম্পে। এ সময়কার ঘটনা উল্লেখ করে সুস্নি[গ] লিখছেন : "আমরা জানি বাইরে কি ঘট[ে] বন্দীশিবিরের মৃত্যু-শীতল নিস্তব্ধতা মা[ঝে] মাঝে ভেঙে যাচ্ছে এক একজন বন্দীর চীৎকারে—সে কী মর্মন্তুদ আর্তধ্বনি! অ[...] ঘাতকদের সে কী নির্মম ও নির্লজ্জ উল্লা[স] সে আর্ত চীৎকার কখনো শুনেছি নারী ক[ণ্ঠে] আবার কখনো বা পুরুষের। প্রত্যে[ক] চীৎকারের শুধু একটি অর্থই আছে—এর আর একজন......। আমরা নিজেদের ম[...] স্নায়ুর উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠি আসন্ন মৃত্যু আর মৃত্যুময় এই পারিপার্শ্বিককে ভুলে থাক[বার] জন্যে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রশ্ন ক[রে] আমরা অন্য কথা বলে তাদের ভুলিয়ে রাখ[তে] চেষ্টা করি।" তারপর সর্বশেষ যে বন্দীশি[বিরে] সুস্নিগকে স্থানান্তরিত করা হয় সেটির ডাসাউ কনসেনট্রেসন্ ক্যাম্প। এখানকার নি[র্যা]তনের পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র রকমের। এই ব[ন্দী]শিবিরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সুস্[নিগ] লিখছেন :

"I say without the memory [of] Dachau there cannot be politi[cal,] social, or cultural reconstruction, w[ith]out these memories Austria will n[ot] be able to rise again, without [this] warning Germany will not awa[ke] from her stuper."

কিন্তু কেবলমাত্র বন্দীশিবিরের অভিজ্ঞ[তার] কাহিনীর জন্যেই "অস্ট্রিয়ান রিকোয়ে[ম"] প্রসিদ্ধি অর্জন করেনি। যুদ্ধের পূর্বে বি[...] বার্লিন, প্যারিস, লণ্ডন, জেনিভা ও [...] অভ্যন্তরে যে সমস্ত গূঢ় ও নিগূঢ় রাজনৈ[তিক] ঘটনার ফলে ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আস[ন্ন ও] অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, সেইসব ঘটনা-পর[ম্পরার] বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণের নিপুণতায় ব[ই]খানি একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্যের মর্যাদা পে[য়েছে।] বইখানির আসল আবেদন তাই এ[...] ইনটেলেকচুয়ালদের কাছে, যারা কামনা [করেন] পৃথিবীতে বিরোধের অবসান আর চির[স্থায়ী] শান্তি। তাই সুস্নিগ ইউরোপকে সাবধা[ন করে] দিয়ে বলেছেন :

"If Europe is going to be once [more] the sum of spheres of interests, the tragedy will be played over [again] with the same actors in the [same] roles...what we need to establish in order to save humanity is [...] national law and order."

একদিকে এ্যাটম-সুরামত্ত, ডলার[...] মার্কিন, অন্যদিকে রাশিয়া—আর এদের [মাঝ]খানে শক্তিহীন বৃটেন—এদের প্রতিই সুস্[নিগের] এই ভবিষ্যদ্বাণী কিনা কে বলতে পারে

ভারতের আদিবাসী

শ্রীসুবোধ ঘোষ

(৯)

মিঃ এল্‌ইনের 'ন্যাশনাল পার্ক' থিওরী

সাম্প্রতিক কালে নৃতাত্ত্বিকদের ওপর একটা থিওরীর বড়ই প্রকোপ হয়েছে। রিভার্স (Rivers) নামক বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মেলানেসিয়ার আদিম অধিবাসীদের বংশাবনতির কারণ সম্বন্ধে তাঁর লেখার মধ্যে এই মতবাদ প্রচার করেন যে—উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে মেলানেসিয়ার আদিম অধিবাসীদের জনসংখ্যা বিরল থেকে বিরলতর হয়ে লুপ্ত হতে চলেছে। তারপর থেকেই নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে এই মতবাদের ধূয়া প্রবল হয়ে ওঠে—সভ্যতার সংস্পর্শ (culture contact) আদিম জাতির পক্ষে একটা অকল্যাণের ব্যাপার।

ভারতের আদিবাসীদের শুভাশুভ নিয়ে যেসব ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় নৃতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, তাঁদের অনেককে এই সভ্যতা-সংস্পর্শ থিওরীটা খুব জোরে স্পর্শ করেছে। ভারতের আদিবাসীদের সম্বন্ধে এঁরা বলেন, উন্নত সভ্যতার দ্বারা 'আক্রান্ত' হওয়ার ফলেই আদিবাসীরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে, মনোবল হারিয়েছে ও জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলছে। এঁদের প্রস্তাব, ভারতের আদিবাসীর গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিকে একেবারে অসূর্যম্পশ্যা করে রাখা উচিত, যাতে কোন বাইরের বিজাতীয় 'উন্নত' সংস্কৃতির প্রভাব আদিবাসীর সংসারে প্রবেশ না করে। য়ুরোপীয় নৃতাত্ত্বিকদের অধিকাংশই এই প্রসঙ্গে হিন্দু-সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই এক হাত নিয়েছেন। দু'এক জন দুঃসাহস করে খৃষ্টান 'মিশনারীদের বিরুদ্ধেও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

বর্তমানে ভারতবর্ষে মিঃ ভেরিয়ের এল্‌ইন (Mr. Verrier Elwin) নামক নৃতাত্ত্বিক ভদ্রলোক এই থিয়োরী নিয়ে বড় বেশী মুখর হয়ে উঠেছেন। তাঁর গর্ব, তিনি দশ বৎসর ধরে গন্দ সমাজে বাস করছেন, সেজন্য তাঁর মতন অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি ক'জনেরই বা আছে? তিনি এরই মধ্যে 'ভারতের আদিবাসীদের সম্বন্ধে অনেকগুলি ছোট বড় গ্রন্থ লিখে ফেলেছেন। প্রত্যেক গ্রন্থেই তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, ভারতের আদিবাসী সমাজ সভ্যতার সংস্পর্শে এসেই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। আদিবাসী সমাজকে তাদের গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠ করে রাখবার জন্য তিনি এক পরিকল্পনাও বিবৃত করেছেন— ন্যাশনাল পার্ক (National Park) পরিকল্পনা। যেসব আদিবাসী উন্নত সভ্যতাকে পরিহার করে দূরে সরে থাকতে পেরেছে তাদের সম্বন্ধে মিঃ এল্‌ইন একটা বর্ণনা দিয়েছেন।

"খাঁটি আদিবাসীরা (true aboriginals') অর্থাৎ যেসব আদিবাসী সভ্যতার দূষিত সংস্পর্শে আসেনি, তারা নিরীহ ও সুখী মানুষ। স্বাভাবিক আনন্দের ঐশ্বর্যে ভরপুর ......তাদের জীবন স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন (Free and happy). মাথার ওপর বোঝা নিয়ে আদিবাসী নারী হয়তো ক্ষণিকের জন্য পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে নীচের শোভাময় দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে থাকে......পুরুষেরা কাঠ কাটে, মেয়েরা পাতা কুড়োয়, বৃদ্ধেরা মাদুর ও ডালা তৈরী করে, ছেলেরা মাঠে মাঠে পাখী আর ইঁদুর তাড়া করে বেড়ায়।......হঠাৎ বাঁশীর রবে সুর উথলে ওঠে, কুঞ্জতরুর আড়ালে আড়ালে প্রেমিকার গান প্রেমিককে আহবান করতে থাকে। ......সন্ধ্যে হয়ে আসে। ঘরে ফিরে সকলে মহুয়ার চাট্‌নি আর পেটভরে টাট্‌কা তালের রস খেয়ে শরীর জুড়িয়ে নেয়। তারপর নৈশ ভোজন। গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে আসে, শুধু মাঝে মাঝে গ্রামের ঘুমঘরে (Dormitory) কিশোর-কণ্ঠের কলরব এবং আগুনের চারিদিকে বসে বৃদ্ধদের বিশ্রম্ভালাপের চাপা ধ্বনি শোনা যায়। এই প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যেও এক একটা উত্তেজনার অধ্যায় আসে, হাতি ও বাঘের সঙ্গে সংঘর্ষ। বৎসরের জীবন উৎসবে বিবাহে ও নৃত্যে মাতোয়ারা।......ছেলেমেয়েরা অলঙ্কারে সুসজ্জিত হ'য়ে, চুলে ফুল গুঁজে দলবেঁধে নাচে, প্রবীণেরা দেবতার তুষ্টি বিধান করে"— (The aboriginals P. 19)।

খাঁটি পাহাড়ী আদিবাসীর সংসারের যে রূপ মিঃ এল্‌ইন বর্ণনা করেছেন, সেটা কোন আধুনিক মেঘদূতের কাব্যময় বিবরণের অংশ ব'লে মনে হবে। বর্ণনাটির প্রতি ছত্রে মধু ক্ষরাণিত, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এমন মধুময় আদিবাসী গ্রামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এভাবে বর্ণনা করা নৃতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সাজে না, এটা সখের টুরিস্টের মত অতিরঞ্জিত অলঙ্কারবহুল বর্ণনা। যেসব আদিবাসী পাহাড় ও অরণ্যের দুর্গম নিভৃতে বিশুদ্ধ গোষ্ঠীগত জীবন যাপন করছে, তাদের জীবনে কোন সমস্যাই নেই—এমন অভিমত মিঃ এল্‌ইনের আত্মপ্রসন্নতা মাত্র।

স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ জীবন (Free Life) বল্‌তে তিনি কি বোঝেন? গোষ্ঠীগত সর্দারের শাসন কি নিতান্তই অটোক্রেসি বর্জিত? গোষ্ঠী পঞ্চায়েতের রীতিনীতি কি সত্যই বিশুদ্ধ সাম্যবাদ অথবা গণতন্ত্র? আর শুধু হাসি কলরবই কি কোন সমাজের সুখ নির্ণয়ের একটা বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি? মাঠে মাঠে ইঁদুর তাড়া করে বেড়াবার অবাধ অধিকারই কি ব্যক্তি-স্বাধীনতার (Civil Liberty) চরম উদাহরণ?

আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে যেসব আদিবাসী দূরে সরে রয়েছে, তাদের সমাজে কতগুলি বিশিষ্ট গুণ অবশ্যই আছে যা ভারত-সভ্যতা প্রভাবিত আদিবাসীদের মধ্যে নেই। কিন্তু আবার এর উল্টোটাও সত্য। ভারত-সভ্যতার সংস্পর্শে যেসব আদিবাসী এসেছে তারাও এমন কতগুলি বিশিষ্ট গুণ অর্জন করেছে যা মিঃ এল্‌ইনের আন্‌কোরা আদিবাসীদের মধ্যে নেই।

তবুও যেসব আদিবাসী ভারত-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হয়েছে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভেবেই মিঃ এল্‌ইন শঙ্কাকুল হয়েছেন। তাঁর মতে এই শ্রেণীর আদিবাসী সমাজেরই মনোবল ভেঙ্গে গেছে ও ব্যক্তিত্ব দুর্বল হয়েছে। মিঃ এল্‌ইন আদিবাসীর এই বিনষ্ট মনোবলের, একটা নামও দিয়েছেন—স্নায়বিক হানি (Loss of Nerve)। জীবন সম্বন্ধে একটা ঔদাসীন্য। আত্মমর্যাদাবোধের অভাব। বেঁচে থাকার যে একটা অর্থ আছে, সে সম্বন্ধে চিন্তার অভাব। মিঃ এল্‌ইনের মতে, উন্নত বিজাতীয় সংস্কৃতির সংঘাতে পড়ে গোষ্ঠীগত সংস্কৃতি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় এদের জীবন যেন ভূমিকাভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তার ফলেই মনের এই শোচনীয় দশান্তর ঘটেছে।

সুতরাং মিঃ এল্‌ইন বিশুদ্ধ গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা দাবী করছেন। এই দাবীর বিষয়গুলিই হলো এল্‌ইন ভাষ্যের এক একটি সূক্ত এবং ন্যাশনাল পার্ক থিওরীর ভিত্তি। মিঃ এল্‌ইন চাইছেনঃ

(১) আদিবাসীর 'ঝুম' চাষের অধিকার।

আদিবাসীদের এমন অনেক গোষ্ঠী আছে যারা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করার পদ্ধতি এখনো

গ্রহণ করেনি। জঙ্গলের একটা অংশ আগুনে লাগিয়ে ভস্মীভূত করে, তারপর সেই ভস্মাচ্ছাদিত জমির ওপর আলগোছে শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই হলো ঝুম চাষ। আশ্চর্যের বিষয়, এই অতি ক্ষতিকর এবং স্থুল কৃষিপদ্ধতিকেই মিঃ এলুইন আদিবাসীর সকল উন্নতির মূলাধার ব'লে মনে করেন। তিনি বলেন, ঝুম চাষ হলো আদিবাসীদের একটা ধর্মগত সংস্কার। আদিবাসীরা ধরিত্রী মাতার বুক লাঙ্গল দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে চায় না। লাঙ্গল-প্রথা তাদের কাছে ভয়ানক একটা নিষ্ঠুর প্রথা।

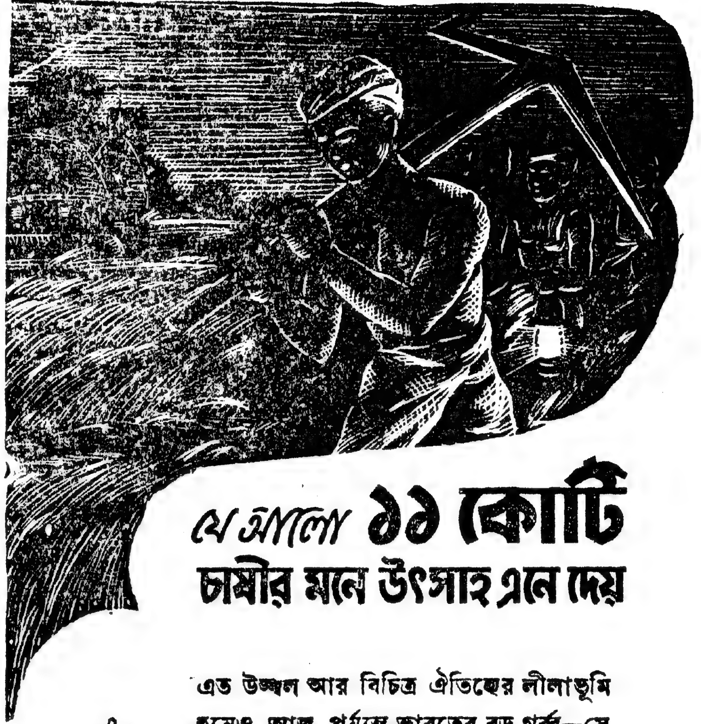
জঙ্গল হলো একটি রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় সম্পদ এবং এই জঙ্গলও একটা অনন্তরাজ্য নয়, নষ্ট করলে একদিন ফুরিয়ে যাবে নিশ্চয়। কয়েক মণ জওয়ার, ভুট্টা বা ধান উৎপন্নের জন্য এক একটা শাল-সেগুনের জঙ্গলকে ছাই করে ফেলতে হবে, এই প্রথা বর্তমান জগতে চলতে পারে না। ঝুমচাষী আদিবাসীর পক্ষেও এভাবে জঙ্গল লোপ করা মঙ্গলকর নয়। কিন্তু মিঃ এলুইন আদিবাসীর প্রাচীন মনের একটা সংস্কারের মর্যাদা রাখতে গিয়ে, এক একটা খাণ্ডবদাহন ক'রেই কয়েক মণ জওয়ার পেতে চান। আদিবাসীদের ঝুম চাষ প্রথার ফলে ভারতের জঙ্গলের কি ক্ষতি হয়েছে, তা ভারত গভর্নমেণ্টের সরকারী রিপোর্টে এবং বহু বিশিষ্ট য়ুরোপীয় নৃতাত্ত্বিকের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।

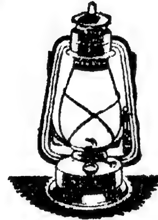
ফরসাইথ (Forsythe) বলেন—"যত পাহাড়ী উপজাতি আছে তার মধ্যে বৈগারা হলো জঙ্গলের সব চেয়ে ভয়ানক শত্রু। হাজার হাজার বর্গমাইল শালের বনকে তারা ঝুম চাষের জন্য নিঃশেষে ধ্বংস করেছে।......আঠা (Gum) নেবার জন্য তারা সর্বত্র বড় বড় গাছগুলি ক্ষত বিক্ষত ক'রে দেয়।......লাক্ষার গুটি সংগ্রহের জন্য তারা একটু কষ্ট করে গাছের ওপর চড়তেও চায় না, গাছগুলিকেই কেটে মাটিতে নামিয়ে ফেলে।"

অথচ মিঃ এলুইন এই বৈগাদেরই ধর্মগত সংস্কারের চ্যাম্পিয়ন। বহু আদিবাসী গোষ্ঠী আছে যারা পূর্বে ঝুম প্রথায় অভ্যস্ত ছিল পরে লাঙ্গল-প্রথা গ্রহণ করেছে। কিন্তু উন্নত কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে তারা অবনত হয়েছে, মিঃ এলুইন কোনভাবেই তা প্রমাণ করতে পারেন না। চট্টগ্রামের চাকমারা পূর্বে ঝুমচাষী ছিল, বর্তমানে তারা লাঙ্গল গ্রহণ করেছে, উড়িষ্যার শবর ঝুম চাষ ছেড়ে দিয়ে উন্নত কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এর ফলে তাদের কোনই অবনতি হয়নি। এ বিষয়ে মিঃ এলুইন দুর্বল যুক্তি নিয়ে প্রবল তর্ক করেছেন। আবার একথাও স্বীকার করছেন যে, সব আদিবাসী গোষ্ঠীর পক্ষে নয়, কোন কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর পক্ষে (দৃষ্টান্ত—বৈগা) ঝুম চাষ তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি। তাঁর বক্তব্য—

"To many of the tribesman this is more than a form of agriculture, it is a way of life."

অর্থাৎ অনেক আদিবাসীর কাছে ঝুম চাষ নিছক একটা চাষের পদ্ধতি নয়, এটা তাদের জীবন-চর্যার পদ্ধতি। মন্তব্যটি বিচিত্র। অর্থনৈতিক উন্নতি যে সামাজিক মনেরও উন্নতি সম্ভব করে, মিঃ এলুইন বোধ হয় এই সরল বৈজ্ঞানিক সত্য স্বীকার করেন না। ঝুম চাষ না করে লাঙ্গল প্রথা গ্রহণ করলে তাঁর প্রিয় বৈগাদের ভাণ্ডারে একটু বেশী পরিমাণ ফসল





এত উজ্জ্বল আর বিচিত্র ঐতিহ্যের লীলাভূমি হয়েও আজ পর্য্যন্ত ভারতের বড় গর্ব্ব—সে কৃষিপ্রধান দেশ। কোটি কোটি কৃষিজীবীই এ জাতির শক্তিকেন্দ্র। ভারতের এই কৃষকগোষ্ঠির মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতি আপন বৈশিষ্ট্য আজও বজায় রেখেছে। 'দীপ্তি' কৃষকদের মনে জাগায় নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনা।

দীপ্তি হ্যারিকেন লেণ্ঠন

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা

B DL12/847

আসবে। কিন্তু এরই ফলে বৈগাদের জীবন-চর্যার পদ্ধতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, এরকম বিচিত্র ধারণা বোধ হয় মিঃ এল্‌উইন একাই পোষণ করেন। ঝুম চাষ হলো—কুসংস্কার অজ্ঞতা আলস্য ও অপরিণামদর্শিতার পদ্ধতি। এ পদ্ধতি কোন আদিবাসীর জীবনচর্যার পদ্ধতি (way of life) হতে পারে না।

মিঃ এল্‌উইন যতই বলুন, ঝুম চাষ আদিবাসীদের জীবনচর্যার পদ্ধতি নয়। এ পদ্ধতি তারা সুযোগ পেলে সহজেই ছেড়ে দেয় ও নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে। বলাঘাট জেলায় যেসব খালসা গ্রাম ও জমিদারী অঞ্চল আছে, সেখানে ঝুম চাষ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু জিলার অন্যান্য স্থান থেকে বৈগারা এই বন্য অঞ্চলে বসতি করার জন্য ছুটে আসে না। (১)

মহীশুরের কতগুলি আদিবাসী গোষ্ঠী; গুজরাটের কোলি গোষ্ঠী, থানা জিলার ঠাকুর গোষ্ঠী, খান্দেশের ভীলেরা—এর সকলেই আগে ঝুম চাষী ছিল, কিন্তু বর্তমানে লাঙ্গল-চাষী হয়ে গেছে।

মিঃ এল্‌উইনের মত মিঃ গ্রীগসন ঝুম চাষকে আদিবাসীর জীবনেরই একটা পদ্ধতি (Way of Life) বলে যদিও মনে করেননি, কিন্তু তিনিও ঝুম চাষকে ক্ষতিকর পদ্ধতি নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ঝুম চাষ ক্ষতিকর কি না, এসম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক বা ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর বিজ্ঞতাকে আমল না দিয়ে, সত্যিকারের উদ্ভিদবিজ্ঞানীর অভিমতকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

(ক) উড়িষ্যার কনজারভেটর অফ ফরেস্ট মিঃ নিকলসনের অভিমত : "ঝুম চাষের ফলে জঙ্গলের নিদারুণ ক্ষতি হয়।" (২)

(খ) ডাঃ এন এল বোর (N. L. Bore), দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বোটানিস্ট : "মানুষের যত রকম প্রথা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে কদর্য হলো ঝুম চাষ প্রথা। ......এর ফলে শুধু বনের উদ্ভিজ্জ সম্পদ নষ্ট হয় তা নয়, মাটির উর্বরাংশও ক্ষয় হতে থাকে (erosion of soil)"। (৩)

(গ) ডাঃ হাটন : সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে বেওয়ার প্রথা (ঝুমচাষ—shifting cultivation) আর্থিক উন্নতির বিরোধী এবং সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। অবশ্য অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণে অতি সংক্ষিপ্ত সীমাবদ্ধ অঞ্চলে ঝুম চাষের সুযোগ দেওয়া হোতে পারে। (৪)

(1) The Aboriginal Problem in the Balaghat District—Grigson.
(2) Report of the Partially Excluded Areas Committee, Orissa.
(৩) ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৯তম অধিবেশনে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ।
(4) Modern India & the West—O'Malley.

শরৎচন্দ্র রায় ছোটনাগপুরের বিরহোর এবং কোরোয়াদের বিষয়ে অবশ্য এই মন্তব্য করেছেন যে, তারা পূর্বে ঝুম চাষে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু সরকারী জঙ্গল বিভাগের আইন অনুসারে জঙ্গল পুড়িয়ে ঝুম চাষ নিষিদ্ধ হওয়ায় তারা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে এবং মনোবল নিতান্ত অবনত হয়ে গেছে। তারা যেন জীবন সম্বন্ধে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে ('Loss of interest in life')। মিঃ এল্‌উইন বারংবার শরৎচন্দ্র রায়ের এই মন্তব্য উদ্ধৃত করে তাঁর 'স্নায়বিক হানি' (Loss of nerve) থিওরীকে সমর্থনের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু বিরহোর ও কোরোয়াদের মধ্যে জীবন সম্বন্ধে যে উৎসাহহীনতা দেখা যাচ্ছে, সেটা ঝুম চাষ বর্জনের জন্য হয়নি। তারা একেবারেই চাষ বর্জন করে প্রায় প্রস্তরযুগের অধম মানুষের মত ক্ষুধার্ত যাযাবরে পরিণত হয়েছে। চাষ বর্জন করাটাই হলো এই অধোগতির প্রধান কারণ, চাষের ঝুমত্ব বর্জন করাটা প্রধান কারণ নয়। বিরহোর ও কোরোয়ারা ঝুম প্রথা বর্জন করে লাঙ্গল প্রথা গ্রহণ করলে নিশ্চয় 'জীবন সম্বন্ধে উৎসাহহীনতা' দেখা দিত না। গভর্নমেন্টের ব্যবস্থাটাও একপেশে হয়েছে। বিরহোরের ঝুম যেমন বন্ধ করা হয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যদি তাদের লাঙ্গল পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করিয়ে নেবার কোন সরকারী ব্যবস্থা হতো, তবে এই দুটী গোষ্ঠীকে হতভাগ্য হতে হতো না। সরকারী ব্যবস্থায় শুধু দমনের কাজটুকুই পালিত হয়, গঠনের দিকে কিছুই করা হয় না। কাজেই পরিবর্তনের ব্যাপারটাও অর্ধপথে থেমে থাকে।

সভ্য-সংস্পর্শের (culture contact) ফলে আদিম উপজাতির বংশ বিনাশ হয়, ভারতবর্ষের আদিবাসীর অতীত ও বর্তমানের দিকে তাকিয়ে রিভার্স সাহেবের এই থিয়োরী সমর্থন করা যায় না। আসামের খাসি সমাজ প্রভৃতি যেসব আদিবাসী উপজাতি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে, তাদের জনসংখ্যার হ্রাস হয়নি। হিন্দুভাবাপন্ন আদিবাসী সমাজেরও বংশ বিনাশ হয়নি। এ প্রসঙ্গে ডাঃ ডি এন মজুমদারের একটা মন্তব্য বিশেষভাবে মনে পড়ে। তিনি সিংভূমের কোলহান অঞ্চলের হো সমাজ সম্বন্ধে বলেছেন—"আগের তুলনায় হো সমাজ বর্তমানে বেশী অল্পায়ু ও দুর্বলদেহ হয়েছে, কিন্তু পূর্বপুরুষের তুলনায় বর্তমানে বংশবৃদ্ধির হার বেশী (multiplying faster than their ancestors).' (5).

কোন শ্রেণী বা উপজাতির বিনাশ অথবা জনসংখ্যার হ্রাস যে ভারতবর্ষে আদৌ হয়নি, তা নয়। হিন্দুসমাজের অনেক অধঃ[illegible] জাতের (caste) মধ্যে বংশাবনতি দেখা যা[illegible] সেটা অর্থনৈতিক কারণেই হয়েছে। ভারতে কোন আদিবাসী গোষ্ঠীরও যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে, তবে সেটা মূলতঃ অর্থনৈতি[illegible] কারণেই হয়েছে।

(5) A Tribe in Transition—D. N. Majumdar.

(২) গভর্নমেন্টের আবগারী নীতি ও সমাজ সংস্কারকের মাদকবর্জন আন্দোলন

মিঃ এল্‌উইন উল্লিখিত দুইটি ব্যাপারের বিরোধী। তিনি গভর্নমেন্টের আবগারী নীতি পছন্দ করেন না কারণ তার দ্বারা গভর্নমে[illegible] আদিবাসীদের একটা জাতীয় অধিকারের ওপ[illegible] হস্তক্ষেপ করেছে। আদিবাসীরা চিরকাল নিজে[illegible] ঘরের তৈরী মদ্য পান করে এসেছে। গভর্ন[illegible]মেন্টের আবগারী নীতি বস্তুতঃ মদ্য উৎপাদনে ব্যবস্থাকে একচেটিয়া (State Monopoly ক'রে নিয়েছেন।

আদিবাসীদের মদ্য পানের অভ্যাস সংয[illegible] হোক, মিঃ এল্‌উইন তা কখনো কামনা করেন না আদিবাসীদের পানোন্মত্ততার এব[illegible] ফলে তাদের যে সব নৈতিক শারীরিক হা[illegible] হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধে মিঃ এল্‌উইন নীরব তিনি আদিবাসীদের মদ্যাসক্তিকে ভাল ব্যাপা[illegible] ব'লেই মনে করেন। তাঁর দুঃখ আবগার[illegible] বিভাগ আদিবাসীর মদ্যপানের স্বাধীনতা বাধা দিচ্ছে।

ভারতীয় সমাজ সংস্কারকেরা মদ্যপা[illegible] বর্জন সম্পর্কে যে আন্দোলন করেন, মি[illegible] এল্‌উইন সেটা একটা অত্যাচার ব'লেই ম[illegible] করেন। বাদলশা ভাই নামে জনৈক ভী[illegible] সমাজ সংস্কারক তাঁর স্বসমাজ থেকে মদ্যাসক্তি পাপ বর্জন করার জন্য প্রচারকার্য করেছিলেন মিঃ এল্‌উইন তাঁর ওপর খুবই খাপ্পা হয়েছে[illegible] কংগ্রেস ও জাতীয় নেতারা মাদক বর্জনের জ[illegible] যে প্রচারকার্য করেন, মিঃ এল্‌উইন তাতে বিরক্ত।

আদিবাসীদের উৎসবে পানোন্মত্ততা ব[illegible] বেশী দেখা যায়। এদের উৎসবের দিনগুলি হিন্দুর উৎসবের মত পঞ্জিকাবিহিত তি[illegible] নক্ষত্র বা তারিখের মত নির্দিষ্ট ন[illegible] অধিকাংশই ঋতু-উৎসব (season festival), একবার আরম্ভ হলো তো চলতে থাকলো। যাতে এই ধরণের উৎসবে আতিশয্যে আদিবাসীরা মাত্রাহীন পানোন্ম[illegible] তার গ্রাসে না পড়ে, তার জন্যে বে-সরকা[illegible] সমাজসংস্কারক এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ সাধারণত দুটী উপায় প্রস্তাব করে থাকে হয় উৎসবের দিনগুলি সুনির্দিষ্ট করা হোক, [illegible] উৎসবের সময় মদের দোকানগুলি বন্ধ ক[illegible] হোক। একদিন বা দুদিনের মধ্যেই য[illegible] উৎসব সমাপ্ত হয়, তবে পানোন্মত্ততাও এক দুদিনের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে যায়। মিঃ এল্‌উ[illegible] আদিবাসীদের পানোন্মত্ততা সংযত করার [illegible]

দুটো পন্থার কোন পন্থাই গ্রাহ্য করতে রাজী নন। তাঁর বক্তব্য হলো, আদিবাসীদের 'প্রাণের উৎসাহ' যতদিন পর্যন্ত সজীব থাকে ('as long as the spirit moves him) ততদিনই সে তার দশেরা আর ফাগ উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে থাকুক। তিনি উৎসবের দিন সীমাবদ্ধ করতে চান না, কারণ তাতে আদিবাসীদের প্রাণের উৎসাহ সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। মিঃ এলুইনের প্রস্তাবে বস্তুত এই দাবীই করা হচ্ছে যে, উৎসবপরায়ণ আদিবাসী দিনরাত্রি মদ্যপান করে চলুক, যতক্ষণ পর্যন্ত মদের হাঁড়িতে তার চুমুক দেবার শক্তি আছে। আদিবাসী-দরদী মিঃ এলুইন যে আদিবাসীর জন্যে এই ধরণের প্রগল্‌ভতার সুপারিশ করতে পারেন, এটাই আশ্চর্য। পানোন্মত্ততা শেষ পর্যন্ত উৎসবপরায়ণ আদিবাসী নরনারীর যৌনশুচিতাকে কিভাবে নষ্ট করে থাকে, দশ বৎসরের আদিবাসী তত্ত্ববিশারদ মিঃ এলুইনের পক্ষে সেই তথ্য না জানার কথা নয়। কিন্তু তিনি এবিষয়ে নীরব।

পূর্বে সাঁওতালদের 'সোরাই' উৎসবও কোন দিন তারিখের মধ্যে বাঁধা ছিল না। কিন্তু সাঁওতাল সমাজ বর্তমানে সোরাই উৎসবের সময় সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। এর ফলে সাঁওতাল সমাজের প্রাণের উৎসাহ যে আদৌ সংক্ষিপ্ত হয়নি, সেকথা মিঃ এলুইনের জানা উচিত।

(৩) শিক্ষার প্রসার

আদিবাসীদের মধ্যে বর্তমানে যে রীতিতে শিক্ষার প্রচার হচ্ছে, মিঃ এলুইন সেটা পছন্দ করেন না। বর্তমান শিক্ষা আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি, গোষ্ঠীগত ঐক্য, ঐতিহ্য ও রুচি বিনষ্ট করছে ব'লেই তিনি মনে করেন। আধুনিক স্কুলে শিক্ষালাভ ক'রে আদিবাসীরা বিজাতীয় (হিন্দু) সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে অপদার্থ হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান ভারতে সাধারণ ভারতবাসীর জন্যই যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত, সেটা যে ত্রুটিপূর্ণ সে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। বর্তমান স্কুল আদিবাসীর ছেলেকে যেমন অপদার্থে পরিণত করে থাকে, ভারতীয় কৃষকের ছেলেকেও তাই করেছে। সমস্যাটা সমগ্র ভারতের জাতীয় সমস্যা। কিন্তু এর জন্য মিঃ এলুইনের কল্পনা অনুসারে আদিবাসীর শিক্ষাপদ্ধতিকে সমগ্র ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে তৈরী করতে হবে, এমন কোন্ যুক্তি আছে? আদিবাসীর গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির সৌন্দর্যগুলি যাতে নষ্ট না হয়, অবশ্যই তাদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সেদিক দিয়ে বিশেষ রীতি কিছু কিছু থাকবে। কিন্তু মিঃ এলুইনের মত আদিবাসীর প্রত্যেকটি প্রাচীন [illegible]কে চিরস্থায়ী করার জন্য নিশ্চয় কোন শিক্ষাপদ্ধতি গৃহীত হতে পারে না। পৃথিবীর আকার গোলকের মত, কোন্ শক্তির আকর্ষণে পাকা আপেল গাছ থেকে মাটিতে পড়ে, গৌতম বুদ্ধ কে ছিলেন এবং হিমালয় পর্বত নামে যে একটা পর্বত আছে—আদিবাসী ছেলেকে এই তথ্য জানালে তার গোষ্ঠীগত সংহতি (Tribal solidarity) নষ্ট হয় না, স্নায়বিক হানিও (Loss of nerve) হয় না।

মিঃ এলুইন অভিযোগ করেছেন—আধুনিক স্কুলগুলিতে আদিবাসী ছেলেরা প'ড়তে এসে শহুরে শিক্ষিত অ-আদিবাসী শিক্ষকের হাতে পড়ে। এই শিক্ষকেরা আদিবাসী ছেলেকে 'অসভ্য' ব'লেই মনে করেন। আদিবাসী ছেলেরা স্কুলের অন্যান্য ছেলের সংগে নাকিসুরে বিজাতীয় দেবতার স্তোত্র পাঠ করতে শেখে। তাদের নিজ দেবতার কথা ভুলে যায়। স্কুলে হিন্দু খৃষ্টান ও মুসলমান পরবের ছুটি আছে, কিন্তু আদিবাসী পরবের জন্য ছুটি দেওয়া হয় না। আদিবাসী ছেলেরা ভারতীয় লিবারাল নেতা ও ইংরাজ বড়লাটের জীবনী পাঠ করে, কিন্তু গন্দ রাজাদের ইতিহাস পড়ে না। বিদেশী (হিন্দী) ভাষা শিক্ষালাভ করতে হয়।

মিঃ এলুইনের বক্তব্যের অনেকখানি সত্য। কিন্তু তার জন্যে আদিবাসীকে শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখা অথবা হিন্দু ইত্যাদি উন্নত জাতির সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়োজন প্রমাণিত হয় না। প্রয়োজন শিক্ষার সংস্কার। গোন্দ রাজাদের ইতিহাস না পড়লে আদিবাসী ছেলের শিক্ষা যেমন অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি ভারতীয় লিবরাল নেতাদের জীবনী পাঠ না করলেও তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকবে। দুটোরই প্রয়োজন আছে। মিঃ এলুইন গোন্দ রাজাদের ইতিহাসকেই আদিবাসী ছেলের কাছে একমাত্র ইতিহাসরূপে উপস্থিত করতে চান। এটাই তাঁর বক্তব্যের মূলগত ভ্রান্তি, এবং এখানেই আমাদের আপত্তি।

(ক্রমশ)

যে বই প্রতি গৃহে রাখা উচিত!

শিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী সম্পাদিত **"বাঙলা বর্ষলিপি—১৩৫৪"**
বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল—**মূল্য দুই টাকা, ভি, পি ২৸৵**

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, সাধারণ গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে এই পুস্তকখানির অশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন। ১৩৫৩ সালে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে অবহিত থাকা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর অবশ্য কর্তব্য। সাধারণ পাঠকবর্গ, বিশেষ করিয়া পাঠিকারা যাহাতে সমস্ত তথ্য অনায়াসে বুঝিতে পারেন, সেজন্য গ্রন্থখানি খুব সহজ ভাষায় লেখা হইয়াছে। ১৩৫৪ সালের সংক্ষিপ্ত দিনপঞ্জী সম্বলিত।

পুস্তকখানি যে খুবই মূল্যবান হইয়াছে ও প্রতি ঘরে ঘরে থাকা উচিত এ বিষয়ে

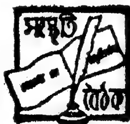
বাঙলার সমস্ত সংবাদপত্র একমত :

দেশ : এমন একখানি পুস্তক বাংলার ঘরে ঘরে থাকা উচিত

ভারত : ছাত্র, শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক, গৃহস্থ সকলেই গ্রন্থখানি হাতের কাছে রাখিলে সময়ে অসময়ে উপকৃত হইবেন।

Amrita Bazar Patrika: This valuable book of reference which has beer enriched by the incorporation of many new materials will have warm reception from those who do not want to be out-of-date........

অন্যান্য গ্রন্থ : **ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়**—নির্জ্ঞান মন—২॥০
অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—চারশ বছরের পাশ্চাত্ত্য দর্শন—২॥০
কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী—ইঙ্গিত—১॥০
সুনীল বিশী ও অসিত রায়—ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ (২য় সং যন্ত্রস্থ)



সংস্কৃতি বৈঠক

১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা ২৯



অশ্বত্থের অভিশাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(৩)

বস্তুত বাবুদের পক্ষে আপোষ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। বর্তমান কিস্তির মলা মোকদ্দমা প্রায় তিন বৎসর হইল ধিয়াছে। এই তিন বৎসরে তাহাদের অবস্থা বনতির ঢালু পথেই চলিয়াছে। আয় কমিয়াছে য় বাড়িয়াছে, অনেক খাজনা বাকি পড়িয়াছে বং মহাজনের দেনা বেশ ভারি রকম জমিয়া ঠিয়াছে। তাহাদের অবস্থার অবনতির সঙ্গে মের অবস্থাও জড়িত। বাবুরা গ্রামের কুল, পথঘাট, জলাশয় প্রভৃতির জন্য যে টাকা চ করিত তাহা বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে, ল গ্রামের আগাছা বাড়িয়াছে, পুকুর পঙ্কিল য়াছে এবং ইস্কুলের মাস্টারদের অনেক বেতন বাকি পড়িয়াছে। গ্রামের মধ্যে যাহারা সাধু প্রকৃতির লোক, সংখ্যা খুব বেশি নয়, তাহারা এই অকারণ অপব্যয়ে ও বিবাদে দুঃখিত, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ সাধু প্রকৃতির লোকের কথা কে নে তোলে? এইসব অপব্যয়ে যাহাদের ভাগে মায় হিস্যাবে উদিত হয় তাহাদের আহ্লাদের সীমা নাই। তাহারাই বাবুদের কর্ণেন্দ্রিয় খল করিয়া বিরাজমান। সাধু ব্যক্তির মৃদু মনতির প্রবেশের অনেক বাধা।

নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন বাবুরাও লক্ষ্য রিয়াছে। কিন্তু ফিরিবার পথ কই? ফিরিতে হায্য করে এমন লোক কই? কীর্তিনারায়ণের তো দুর্ধর্ষ মামলাপ্রিয় ব্যক্তিরও অনেক সময়ে ন হইয়াছে এইসব হাঙ্গামা চুকাইয়া দিতে রিলে বাঁচা যায়। নবীননারায়ণের তো কথাই ই, সে ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া-ল। এমন সময়ে নবীনের তরফ হইতে পোষের প্রস্তাব আসিল।

নবীন ও কীর্তি দুজনেই সম্মত হইয়া নিজ জ কর্মচারীদের আপোষের সর্তাদি অবধারণ রতে ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈয়ারি করিতে দেশ দিল। এই অর্থক্ষয়কর বিপদ হইতে মানজনকভাবে মুক্তি পাওয়া যাইবে ভাবিয়া নেই আনন্দিত হইল।

মুক্তামালা ও নবীন [illegible] আনন্দ কলিকাতাবাসের কথা লইয়া জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিল।

মুক্তামালা শুধাইল—আবার কবে জোড়া-দীঘি আসবে?

নবীন বলিল—আর শীগগীর আসছি না। এবারে যা বিপদে পড়েছি। তিন দিনের জন্য এসে তিন বৎসর গেল!

তারপরে সে উৎসাহিত হইয়া বলিল—কলকাতাতেও বেশি দিন থাকবো না। ছোটনাগপুরের কোন গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বছর-খানেক থাকবো। সেখানে খরচ অনেক কম। তাহলে মামলার দেনা শোধ করবার একটা উপায় হবে।

প্রস্তাবটা মুক্তামালারও লোভনীয় মনে হইল। তখন দুইজনে বি এন আর ও ই আই আর-এর টাইমটেবল লইয়া বাসযোগ্য স্থান নির্বাচনে লাগিয়া গেল। তাহাদের সব জায়গাই পছন্দ হয় আবার পরেরটা আগেরটার চেয়ে বেশি পছন্দ হয়। ফল কথা, দুইজনেই অনেক দিন পরে খুশীর হাল্কা হাওয়ায় দুলিতে লাগিল।

বাদলী ধরিয়া বসিল, বৌঠাকরুণ আমাকে যদি না নিয়ে যাও, তবে এর পরে এসে আর আমাকে দেখতে পাবে না।

মুক্তামালা শুধাইল—কেন রে?

বাদলি বলিল—শশাঙ্ক ঠাকুর আবার উৎপাত শুরু করেছে। যেদিকে দু'চোখ যায় আমি চলে যাবো।

মুক্তামালা বলিল—কিন্তু তোকে সঙ্গে নিলে যে শশাঙ্ক ঠাকুরও সঙ্গ নেবে।

বাদলি হাসিয়া বলিল—তা নিয়ো না। তোমার তো রাঁধুনী বামুনের দরকার। ঠাকুর রাঁধে ভালো।

—কেন খেয়ে দেখেছিস নাকি—দুইজনে হাসিয়া উঠিল।

দুই পক্ষে আপোষ হইতে চলিয়াছে, তাই স্বামীর অনুমতি লইয়া রুক্মিণী ও লক্ষ্মী মুক্তামালার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। রুক্মিণীর আগমনে মুক্তামালা অপ্রত্যাশিত আনন্দ পাইয়া বলিল—দিদি, একি স্বপ্ন নাকি!

নবীন বলিল বৌঠান, সেদিনের প্রতিশোধ নিতে পারলে মন্দ হত না। এ বাড়িতেই দুজনের বাসর-ঘর করতাম।

রুক্মিণী হাসিয়া বলিল—আমরা ভাই পুরানো হয়ে গিয়েছি। এখন কি আর বাসর-ঘর সাজে?

লক্ষ্মীর এইসব অবান্তর আলাপ ভালো লাগিতেছিল না, সে বলিল—বলো তো কাকীমা, এটা কিসের বাচ্চা?

তাহার হাতে অনুদ্গত পালক একটি চড়াইয়ের বাচ্চা! মুক্তামালা বলিল—বা, বা, এ যে চড়াইয়ের বাচ্চা! কি সুন্দর!

লক্ষ্মী রাগিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি কিচ্ছু জানো না! ঈগল পাখীর বাচ্চা এটা! চড়াই'! তোমার মাথা! ঈগল পাখী দেখেছো কখনো?

নবীন বলিল—ঠিক মা, ঈগল পাখীই বটে!

নবীনের বুদ্ধির প্রতি তাহার বিশ্বাস অনেক বাড়িয়া গেল, সে নবীনের গা-ঘেঁষিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল—কাকাবাবু, ঈগল পাখীটা বড় হলে এর পিঠে চড়ে কাশীতে যাওয়া যাবে?

রুক্মিণী মুক্তামালাকে বলিল—তোমার ভাসুর মাকে ফিরে আসবার জন্যে চিঠি লিখেছেন।

নবীন বলিল—বৌঠাকরুন' একবার কলকাতায় চলো।

রুক্মিণী হাসিয়া বলিল—আমার অসাধ! যে নিয়ে যাবার তাকে রাজি করো ভাই।

নবীন বলিল—কে আর নিয়ে যাবে? আমিই নিয়ে যাবো! পুরানো রাখাল কি আর ভালো লাগে? একবার রাখাল বদলে দেখো না।

মুক্তামালা বলিল—দিদি একদিন তো বিনা-নিমন্ত্রণে তোমাদের বাড়িতে খেয়েছি। যদি ভরসা দাও, তোমাদের নিমন্ত্রণ করি—কাল এখানে তোমরা দু'জনে খাবে, সঙ্গে লক্ষ্মী মাকেও এনো।

লক্ষ্মী বলিল—আমার ঈগল ছানাও আসবে কিন্তু—

নবীন বলিল—নিশ্চয় তার জন্যে চার ডজন ইঁদুর ছানার ব্যবস্থা করে রাখবো।

নবীন মুক্তামালাকে বলিল—তাহলে তুমি ও-বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসো।

মুক্তামালা তখনি রুক্মিণীর সঙ্গে দশানির বাড়ি গেল এবং কীর্তিনারায়ণ ও রুক্মিণীকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরিয়া আসিল। অনেকদিনের চাপাপড়া আত্মীয়ত্ব নূতন করিয়া অনুভব করিয়া সকলেই বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

বাবুগণ যখন আশার অঙ্কুর রোপণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল তাহাদের কর্মচারিগণ যে তখন বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। [illegible]

উঠিতে সময় নেয়, বিষবৃক্ষ রাতারাতি ফলদান করে।

বিকালবেলা দশানির প্রজারা কীর্তি-নারায়ণের সম্মুখে আসিয়া বুক চাপড়াইয়া বলিল—হুজুর, আর কেনো? এবারে আমাদের বিদায় দাও, আমরা অন্য জমিদারের মাটিতে উঠে যাই।

কীর্তিবাবু তখন কাগজপত্র লইয়া আপোষের সর্ত স্থির করিতেছিল, বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া বলিল—কি হয়েছে?

প্রজারা বলিল—হুজুর, কালরাত্রে ছ'আনির লেঠেলে এসে আমাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে, সব বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

বিস্মিত কীর্তি বলিল—ছ'আনির লেঠেল?

প্রজারা বলিল—হুজুর, সব চেনা লোক, মিথ্যা বলতে যাবো কেন?

কীর্তি কাগজপত্র রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—এখন তোমরা যাও, আমি ব্যবস্থা করছি।

প্রজারা চলিয়া গেলে কীর্তি নিজের মনে বলিতে লাগিল—তবে রে শয়তান। ছিঁচকে চোর। এদিকে ভালো মানুষের মতো এসে আপোষের প্রস্তাব করা হচ্ছে তলে তলে এই মতলব! আমি ভাবলাম ছেলেটার মতি পরিবর্তন হয়েছে। দাঁড়াও শয়তান, এবারে দেখাচ্ছি।

তখনি কীর্তির আদেশে দশানির খিড়কি দ্বার সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

খিড়কি দ্বার বন্ধ হইতেই রুক্মিণী বুঝিতে পারিল আবার লাঠি শড়কি বাহির হইবে। কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল বাধিল লক্ষ্মীকে লইয়া। সে সারাদিন তাহার ঈগল পাখীর বাচ্ছাটিকে আশ্বাস দিয়াছে যে, আর ভয় নাই' তাহার জন্য চার ডজন (ডজন শব্দটির অর্থ বোঝে না, তবে বুঝিতে পারিয়াছে যে অনেক) ইঁদুরের বাচ্চা প্রস্তুত। পরদিন সে বলিল—চলো মা, ও বাড়ি যাই' আমার ঈগলের ক্ষিদে পেয়েছে।

সে কেবলি বলিতে লাগিল—চলো মা, কখন যাবে?

রুক্মিণী তাহার হাতে সন্দেশ দিয়া বুঝাইয়া বলিল—এখন খাও' ঈগলের জন্য ইঁদুর আমিই ধরে দেবো।।

লক্ষ্মী থামিল, তবে মাতার সান্ত্বনা ও সন্দেশের মধ্যে কোন্‌টা যে তাহার জন্য দায়ী, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বলা বাহুল্য' জ্ঞাতি-প্রণয়ের আসন্ন নিমন্ত্রণের সম্ভাবনা অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

যেদিন সন্ধ্যায় দশানির বাড়িতে প্রজার দল আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল, ছ'আনির প্রজারাও নবীনের পায়ে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল—তাহাদেরও অভিযোগ দশানির প্রজাদের অনুরূপ।

নবীন ভাবিল—কোথাও একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। দশানির বাবু যে আপোষের কথা তুলিয়া পুনরায় বিবাদে নামিবেন—সহসা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। প্রজার দল চলিয়া গেলে সে বিস্মিত হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ইস্কুলের মাস্টারগণ আসিয়া যে ঘটনার বর্ণনা করিল, তাহাতে তাহা বিশ্বাস না করিয়া আর উপায় রহিল না যে, বড়বাবু আপোষ চান না, বিবাদ চান।

মাস্টারের দল যে ঘটনা বলিল, তাহা যেমন গ্লানিকর তেমনি হাস্যকর।

জোড়াদীঘির ইস্কুলের জমিটা দুই শরিকের মিলিত দান। এক সময়ে দুই শরিকে সমান অংশে খরচ দিয়া ইস্কুল ঘর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিল। তারপরে একবার কীর্তি-নারায়ণ ইস্কুলটা পোড়াইয়া দেয়। তখন নবীন নিজ খরচে দালান তুলিয়া দিয়াছে। ইস্কুলের দালানে চারটি কোঠা।

সেদিন সকালবেলা ছাত্র ও মাস্টার ইস্কুলে গিয়া দেখে যে' দুইটি কোঠা দখল করিয়া এক পাল গরু বিরাজ করিতেছে। প্রথমে সকলে ভাবিল রাত্রে কোন কারণে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। একজন মাস্টার বলিল—কিন্তু দরজা খুলবে কেমন করে?

সেকেণ্ড পণ্ডিত রসিক। সে বলিল—আমিও তাই ভাবি। 'ওরা যদি পরের বাড়ির দরজাই খুলতে পারবে, তবে আবার গরু কেন?

তখন সাব্যস্ত হইল যে, গরুগুলো যেমন করিয়াই ঢুকিয়া থাকুক না কেন, এখন তাড়াইয়া দিলেই হইল। কিন্তু তাড়াইতে গিয়া দেখা গেল, যত সহজে প্রবেশ করিয়াছে, তত সহজে বাহিরে যাইতে রাজী নয়। তাহারা শিং নাড়িয়া তাড়িয়া আসে। কে বলিতে পারে যে, ইহারা পূর্বজন্মে এই ইস্কুলেরই ছাত্র ছিল না। নতুবা কোন্‌ মাস্টারের কি স্বভাব কেমন করিয়া জানিবে? নতুবা আর সকলকে ছাড়িয়া বিশেষ-ভাবে হেডমাস্টারের দিকেই তাহাদের এত লক্ষ্য কেন? নতুবা গ্রামে এত স্থান থাকিতে এই ইস্কুল ঘরে আসিয়াই বা তাহারা আশ্রয় লইতে যাইবে কেন? ক্রমবিকাশের নিয়মে সামান্য ছাত্র জন্ম হইতে সাধনোচিত প্রয়াসে এখন তাহারা গো-জন্ম লাভ করিয়াছে। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে আশা করা যায় যে, এ জন্মে যাহারা ছাত্র আছে পরজন্মে তাহারা গো-ত্ব লাভ করিবে।

এই তত্ত্ব আমাদের উদ্ভাবিত নয়, সেকেণ্ড পণ্ডিত সকলকে এই তত্ত্ব বুঝাইয়া বলিল। বাস্তবিক শিক্ষক নইলে গোরুর মনস্তত্ত্ব এমন করিয়া আর কে বুঝিতে পারে? সেকেণ্ড পণ্ডিত নিজের সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বরূপ সকলকে বলিল, ওই কালো বাছুরটার মুখ অনেকটা নশুর মতো নয়? নশু ইস্কুলের একজন বিখ্যাত ছাত্র। পরবর্তীকালে সে হাকিম হইয়াছিল' বজ্রর খানেক হইল তাহার মৃত্যু সংবাদ পাও গিয়াছে।

গোরুগুলো যখন কিছুতেই বাহির হই সম্মত হইল না, হেডপণ্ডিত বলিল—ওরা থা বাকি দুই ঘরে আমরা কাজ চালিয়ে নি হবে

তারপরে সতীর্থদের একান্তে ডাকিয়া ব এর মধ্যে 'কিন্তু' আছে। দেখুন না চারটা ঘর থাকতে ওরা ঠিক দুটো ঘর করেছে কেন? আর ওই দিকের গোরুটা দশানির গোরুর মতো।

তারপরে স্বর আরও নীচু করিয়া বলি এর মধ্যে বাবুদের বিবাদের ব্যাপার আছে হচ্ছে। ওদের ঘাঁটিয়ে বাবুদের রাগিয়ে নেই।

তখন স্থির হইল গোরুগুলো যেমন তেমনি থাক। অন্য দুই ঘরে কাজ চা গোরুদেরই জয় হইল, সংসারে সর্বত্রই গে জয়।

সিদ্ধান্ত শুনিয়া সেকেণ্ড পণ্ডিত বলি আহা ইস্কুলের কি সৌভাগ্য, গোপাল প্রত্যক্ষ হয়ে ইস্কুলে এসেছে।

একজন শুধাইল—গোপাল আবার কে

সেকেণ্ড পণ্ডিত বলিল—গোপাল আদর্শ ছাত্র, সে যাহা পায় তাহাই খায়, কথা যে অমান্য করে না, দ্বিতীয় ভাগের গোপাল।

চার কোঠার ছাত্র দুই কোঠায় উপবিষ্ট পাঠ আরম্ভ হইল। ছাত্রদের আজ কি আ এমন সতীর্থ লাভের কল্পনা অবধি ত করিতে পারে নাই। দুই ঘরের ছাত্রগণ উচ্চস্বরে কড়াকিয়া হাঁকিতে লাগিল, বাকি ঘর হইতে গাভীদল তালে তালে ড থাকিল। তাহারা হাম্বারবে ছাত্রদের ব পাঠের সমর্থন জানাইল। কিন্তু বিপদ ছাত্রদের ইংরেজি বি-এল-এ-ব্লে, সি ও ক্লে পাঠের তারস্বরে। এতক্ষণ গোরুগুলো ধরিয়া ঘরের মধ্যেই ছিল—কিন্তু ইংরেজি ভাষা শুনিবামাত্র উচ্চপুচ্ছে অ করিয়া তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া মারিল।

একজন বলিল—এমন হ'ল কেন?

সেকেণ্ড পণ্ডিত বলিল—হবে না? গো-খাদকের ভাষা শুনলে ভয় পাবে না সাহসী গোরু কোথায়?

গৃহত্যাগের পূর্বে গোরুর দল হেডমা ঢু' মারিল, সেকেণ্ড মাস্টারকে তাড়িয় বেচারী কোনওক্রমে জানলা গলিয়া প পড়িয়া প্রাণ বাঁচাইল। হেডপণ্ডি সেকেণ্ড পণ্ডিতকে স্পর্শও করিল না। ভূতপূর্ব ছাত্রবৃন্দ পূর্বজন্মের ঋণ শোধ করিয়া পুচ্ছ তুলিয়া ছুটিয়া প আর ছেলের দল তাহাদের পিছনে

ছুটিল। মাস্টারদের দুর্দশা দেখিয়া আজ তাহাদের আনন্দ ধরে না; তাহাদের নিষ্ফল সংকল্প কেমন অনায়াসে এই গোপাল কর্তৃক সাধিত হইল দেখিয়া ছেলের দল বুঝিতে পারিল মানব-জন্ম হইতে গো-জন্ম অনেক শ্রেয়ঃ। সে জন্মে মনের বাঞ্ছা মনে চাপিয়া রাখিতে হয় না।

গোপাল ও ছাত্রগণ চলিয়া গেলে মাস্টারগণ উঠিয়া জামা-চাদর সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্তী সরকারী ডাক্তারখানা হইতে প্রয়োজনীয় ঔষধাদি গ্রহণ করিল। তারপরে তাহারা সদলে ছ'আনির বাড়ির দিকে রওনা হইল।

সেকেণ্ড পণ্ডিত বলিল—বুঝলে তো এবার গরুর দল হেড পণ্ডিত ও আমাকে স্পর্শ করলো না কেন? আমরা যে দেবভাষা পড়াই আর তোমরা পড়াও গো-খাদকের ভাষা।

মাস্টারেরা সকলেই বুঝিতে পারিল, ইহার মূলে আছেন দশানীর বাবু। কাজেই এখন প্রতিকারের একমাত্র স্থান নবীননারায়ণ।

নবীননারায়ণ সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ক্ষোভের সহিত বলিয়া উঠিল—শরিকানি বিবাদের মধ্যে এদের টেনে আনা কেন? আমিই কি যথেষ্ট নই। নাঃ, বড়বাবু কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবেন না দেখছি।

লোকে রাজা জমিদারকে পরপীড়ক বলে। কিন্তু ইহাদের উপরেও একটা চক্রান্ত ও চাপ বর্তমান, তাহারই গুরুতর ভার পড়িতেছে নিম্নবর্তীদের উপরে। সংসারে সকলেই পীড়িত, প্রধানতমও পীড়িত দীনতমও পীড়িত। পীড়নচক্র সংসারে নিরন্তর আবর্তিত হইতেছে, মাঝখানের একটা গ্রন্থিকে অকারণ দোষ দিয়া কি লাভ?

৪

বিকালবেলা ছাদের উপরে মুক্তামালা পায়রাগুলিকে চাল ছড়াইয়া দিতেছিল, আর এক ঝাঁক পায়রা গদ্‌গদ্‌ ধ্বনি করিতে করিতে এ ওকে ঠেলা দিয়া তণ্ডুলকণা খুঁটিয়া খাইতে-ছিল। আগে তাহার সঙ্গী থাকিত বাদ্‌লি, সদর হইতে ফিরিবার পরে বাদ্‌লি তাহার স্বগৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। মুক্তামালা বলিয়া-ছিল—বাদ্‌লি এখানেই থাক।

বাদ্‌লি উত্তর দিয়াছিল—বৌঠান, দাঁড়াও তোমার কাছেই থাকবো। কিন্তু একবার ক'দিনের জন্য নিজের ঘরটায় থেকে আসি, নইলে আমাদের পাড়ায় যে মতির মা আছে, বৌঠান, তাকে তো জানো না, সে আমার ঘরদোর দখল ক'রে বসবে, হয়তো চালের খড়গুলো নিয়ে খেতে দেবে গরুকে, আর খুঁটিগুলো খুলে নিয়ে উনুন ধরাবে।

মুক্তামালা বলিল—তোর কেউ নেই, এত ঘরের মায়া কিসের?

বাদ্‌লি বলিল—কেউ নেই বলেই ঘরের উপরে আরো বেশি টান।

মুক্তা বলিল—আচ্ছা, যা ক'দিন থেকে আয়, কিন্তু রোজ একবার ক'রে আসিস্‌। তুই এসে আমাকে গাঁয়ের খবর শুনিয়ে যাবি। এখানে তো খবরের কাগজ নেই।

বাদ্‌লি প্রতিদিন বিকালবেলা একবার করিয়া আসে, যত রাজ্যের সত্যি মিথ্যা খবর বলিয়া যায়। খবরগুলো দৈনিক সংবাদপত্রের ভাষাতে 'Scoop News' শ্রেণীর। কোন দিন বা সে বলে—বৌঠান আজকে যে কাণ্ড হ'ল। এই বলিয়া সে আরম্ভ করে—কাল রাতে পরাণ সরকারের হলুদের ভুঁয়ে চুরি হ'য়ে গিয়েছে।

মুক্তামালা বলে—হলুদের ভুঁই আবার চুরি হবে কি ক'রে? পুকুর চুরির কথাই শুনেছি, ভুঁই চুরি—

বাদ্‌লি হাসিয়া উঠিয়া বলে—ভুঁই চুরি নয়, ভুঁইয়ে চুরি। তারপরে বলে—

এবার হলুদের খুব দর। রাতের বেলায় কারা যেন এসে ভুঁই থেকে হলুদ তুলে নিয়ে গিয়েছে।

মুক্তামালা শুধায়—চোর ধরা পড়েনি।

বাদ্‌লি বলে, চোর ধরা পড়েনি বটে, কিন্তু তাদের একজনের গায়ের কাপড়খানা ধরা পড়েছে।

মুক্তামালা কৌতূহলী হইয়া শুধায়—সে আবার কি রকম?

—এ তো সহজ কথা। রাতের বেলা পরাণ সরকার একবার বাইরে বেরিয়েছিল তখন দেখতে পেলো ভুঁইয়ের মধ্যে যেন লোক। তাড়া করতেই গায়ের চাদর ফেলে তারা পালালো।

মুক্তামালা বলে—চাদর দেখেই তো বুঝতে পারা উচিত চোর কে?

বাদ্‌লি বলে—বুঝতে পারা তো গিয়েছে, কিন্তু স্পষ্ট ক'রে বলে কে?

—কেন?

—কেন নয় বৌঠান? তারা যে গাঁয়ের স্যাঁকরা, বড়লোক!

মুক্তামালা শুধায়—বড়লোক, তবে আবার চুরি করবে কেন?

—কী যে বলো! বলিয়া বাদ্‌লি হাসিয়া ওঠে, বলে—বড়লোক বলেই তো চুরি করে, ছোটলোক হ'লে তো ভিক্ষে করতো।

বাদ্‌লির এই মন্তব্যে দুইজনে একসঙ্গে হাসিয়া ওঠে।

সেদিন বাদ্‌লি আসিয়া উপস্থিত হইলে মুক্তামালা শুধাইল— হাঁরে বাদ্‌লি, তোদের পাড়ায় আজ গোলমাল হচ্ছিল কিসের রে?

বাদ্‌লি বলিল—একটা ঘরে চোর ঢুকেছিল।

মুক্তামালা বলিল—তোদের গাঁয়ে কি চোর ছাড়া আর কিছু নেই।

বাদ্‌লি বলিল—বৌঠান তুমি বুঝতে পারো নি, এ চোর আর এক রকম। সাধারণ চোর ঢোকে জিনিসপত্র নিয়ে পালাতে, আর এ চোর ঢুকেছিল শাড়ী আর পানের বাটা রেখে আসবার জন্যে।

মুক্তামালা বলিল—তুই তখন কি করলি?

বাদ্‌লি চমকিয়া উঠিয়া বলিল—আমি? আমি আবার কেন?

মুক্তামালা বলিল—তোর ঘর ছাড়া আর কোথাও যে এমন চোর ঢুকবে তা তো মনে হয় না। তা ছাড়া চোরটা কে তাও বুঝেছি।

বাদ্‌লি বলিল—তুমি অন্তর্যামী নাকি?

—অন্তর্যামীর দরকার হয় না বাদ্‌লি—সবাই জানে।

—তাই যদি হয় তবে শোনো। তখন আমি ছিলাম না। ওরা সবাই মিলে শশাঙ্ক ঠাকুরকে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছিল। আমি আসতেই সকলে বললো—এবারে কি করবি? আমি বললাম, কি আবার করবো? এই ব'লে দরজা খুলে ঠাকুরকে বললাম, শিগ্‌গীর পালাও। ঠাকুর লজ্জায় পানের বাটা নিয়েই পালাচ্ছিল, আমি বললাম, ওটা রেখে দাও, কষ্ট ক'রে এনেছ! তবে চোরাই মাল নয়তো? এদিকে ঠাকুর তো পালালো, সবাই আমার উপরে এসে পড়লো। বোধ করি, সুন্দর বাটাটা দেখে সবার হিংসে হয়েছিল। মতির মা বললো—ওকে ছেড়ে দিলি কেন? আমি বললাম—ইচ্ছা। সবাই হাসলো। মতির মা বললো—গলায় দড়ি, গলায় দড়ি! আমি বলবাম—তোমার। তবে রে ছুঁড়ি ব'লে সে তেড়ে আসতেই আমি পালিয়ে এসেছি।

মুক্তামালা গম্ভীর হইয়া বলিল—তুই ওকে ছেড়ে দিতে গেলি কেন?

—আটক রেখে কি লাভ হবে বৌঠান! ঠাকুরের ও-রোগ তো সারবার নয়।

—ঠাকুর ভাববে, তোর বোধ হয় আপত্তি নেই।

বাদ্‌লি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—আপত্তি থাকুক আর নাই থাকুক—সে আমার পিছন ছাড়বে না, যতদিন আমি এ গাঁয়ে আছি।

মুক্তামালা বলিল—তবে আমাদের সঙ্গে কেন চলনা। আমরা তো শিগ্‌গীরই কলকাতা চলে যাচ্ছি।

মুক্তামালা তখনও জানিত না যে, তাহাদের শীঘ্র যাইবার সম্ভাবনা হাওয়ায় মিলাইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে নবীননারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

মুক্তামালা বলিল—এবারে কলকাতা যাবার সময়ে বাদ্‌লিকে নিয়ে চলো।

নবীন বলিল—চলো। কিন্তু কলকাতায় যাবার শীঘ্র যে আশা আছে, তা মনে হয় না।

উদ্বিগ্ন হইয়া মুক্তামালা বলিল—কেন?

তখন নবীননারায়ণ বাদ্‌লিকে বলিল—বাদ্‌লি তুই যা। বাদ্‌লি নামিয়া গেলে নবীন মুক্তামালাকে ঘটনার অতর্কিত মোড় ফিরিবার সংবাদ জানাইল। বলিল—এ রকম ক্ষেত্রে আর যাওয়া সম্ভব নয়। একেবারে সমস্ত চুকিয়ে দিয়ে তবে যাওয়ার কথা ভাববো।

মুক্তামালা আর কথা বলিল না, নবীনও চুপ করিয়া রহিল।

সেই ছাদের উপরে দাঁড়াইলে গ্রামের সমস্ত বৃক্ষরাজির মাথা দেখা যায়—তার উপরেই নীল আকাশ যেন শ্যামল তটরেখার দ্বারা পরিবেষ্টিত সুনীল হ্রদ। পূর্বদিক হইতে সারিবন্ধ বেলে হাঁস সেই নীল সরোবর অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকের দিগন্তে দলে দলে চলিয়া যাইতেছে, কাক শালিখ বৃক্ষ শাখায় আশ্রয় লইয়া সম্মিলিত কাকলি তুলিয়াছে, আকাশে একটার পরে একটা সূক্ষ্ম ছায়ার পর্দা খুলিয়া পড়িতেছে। প্রতি দিন যেমন এইসব পটপরিবর্তন মুক্তামালা দেখে—আজিও তেমনি দেখিতে লাগিল।

দুইজনে অভিভূতের মতো কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল জানি না, যখন তাহাদের সম্বিৎ ফিরিল, তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে তারা ফুটিয়াছে। গাছের চূড়ায় আলো, গাছের ছায়ায় অন্ধকার, আলো অন্ধকার দুই সতীনের ঘরকন্নার মতো নীচের মাটীতে বিচিত্র রেখা চিত্রিত করিয়া দিয়াছে, পুকুরের কিনারে রূপোর তুলি টানা, জলের কালো জমিনে তারার ফুল-কাটা, জোনাকীর দল চোখ মিট মিট করিয়া কেবলি বলিয়া চলিয়াছে—চাঁদটা আবার উঠিতে গেল কেন? অদূরে একজন প্রাণ খুলিয়া গানে তাল লাগাইয়াছে—আর সব নিস্তব্ধ। ওই একটা শব্দ শিকল ফেলিয়া নিস্তব্ধতার পরিমাণ করিতে দিয়া যেন ব্যর্থতা জানাইতেছে।

প্রথমে মুক্তামালা কথা বলিল, সে বলিল—প্রকৃতি এমন সুন্দর, মানুষ এমন হিংস্র কেন? কি সুন্দর এই আকাশ, আর তার তলাকার গ্রামখানিতে এত হিংসা।

নবীন বলিল, সুন্দরী পার্বতীর পায়ের তলায় যেমন সিংহটা হিংস্র।

তারপরে আবার সে বলিতে লাগিল—মুক্তি, এ গ্রাম থেকে আমার মুক্তি নেই, হয়তো এখানেই আমার বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে হবে। আমার অত্যাচারিত প্রজাদের নিদারুণ হিংস্রতার মুখে ছেড়ে আমি পালাই কেমন করে? সে যে ভীরুতা হবে। এই প্রজারা আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। আমার ভরসাতেই তারা এই গ্রামে আছে, আমার আদেশেই তারা আমাদের পারিবারিক বিবাদের আবর্তের মধ্যে এসে পড়ে অসহায়ভাবে আবর্তিত হচ্ছে। এই মূঢ় নিঃসহায় প্রভুনির্ভর জনতাকে ত্যাগ করা! না, সে আমার দ্বারা হবে না।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে আবার নীরব হইল। তারপরে ছাদের উপরে দ্রুত পায়চারি করিতে করিতে মাথার চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাইয়া অবিন্যস্ত করিতে করিতে সে বলিতে লাগিল—দেখো মুক্তি, এখানে এসে আমি এক অদ্ভুত রহস্য আবিষ্কার করেছি, যা পূর্বে আমার চিন্তার অতীত ছিল। আমি পৌরাণিক জরাসন্ধের মতো দুইটি বিভিন্ন মানুষের সমাবেশ। আমার মধ্যেকার একজন মানুষ নিতান্ত আধুনিক, সে শহরাশ্রয়ী, পাঁচ মাইল বেগে সে ভ্রমণ করতে অভ্যস্ত, কারখানার ধোঁয়া তার প্রাণের নিঃশ্বাস,



াত্মমুখী, নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করতে ার দিন যায়, এই হচ্ছে কলকাতার আমি! আমার মধ্যেকার আর একটা মানুষ প্রাচীন-লের, সে গ্রামাশ্রয়ী, কর্ষণজাত সভ্যতা তার আশ্রয়, সে নদীর ধারে, ধানের ক্ষেতে আম ঠালের বাগানে নিশ্চেষ্ট সরলতার মধ্যে মধ্য-যুগের আসন পেতে বসে আছে, সে হচ্ছে জোড়াদীঘির আমি! আধুনিক কালের আমির সঙ্গে মানুষে মানুষে ব্যবসায়ের সমানে সমানে সম্বন্ধ, প্রাচীন আমির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ রাজা-প্রজার, স্নেহ প্রতিস্নেহের, আমার আধুনিক আমি বহু বিভক্ত সমাজের অন্যতম একটি চৌকা মাত্র, আর প্রাচীন আমি অবিভক্ত সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী বন্ধনে যুক্ত। এখানে এসে অবধি সেই যোগ প্রবলভাবে, অচ্ছেদ্যভাবে অনুভব করছি, উদ্ধার নেই। পরিত্রাণ নেই, মুক্তি।

তারপরে সে আবার বলিতে লাগিল—আমার পূর্বপুরুষের বহু কুসংস্কারাপন্ন রক্তধারা যে এতদিন ধমনীতে সুপ্ত ছিল, সুযোগ বুঝে আজ তা জাগ্রত হয়ে উঠেছে তারা আমাকে নাগপাশে বেষ্টন করেছে—তারা আমাকে ছাড়বে কেন?

কিন্তু বিপদ কি জানো? এই দুই আমিতে নিরন্তর আমার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে, সেই সংকটের তুলনায় দশানি ছআনি বিবাদ তুচ্ছ! সে হিসাবে সুখী কীর্তিনারায়ণ। তার মধ্যে দুই আমির দ্বন্দ্ব নেই. সে হচ্ছে এক আমির নিঃসপত্ন রাজত্ব।

এখানে এসে অবধি, এই জোড়াদীঘিতে এই বহু পূর্বপুরুষের সুখদুঃখ চিন্তাকর্মের লীলাস্থলীতে এসে অবধি আমার পূর্বতন আমি প্রবলতর হয়ে উঠেছে। সে আমাকে হৃৎপিণ্ডের শিরায় শিরায় দশ আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছে, সাধ্য কি আমি পালাই, জোড়াদীঘির আমিই এখন আমার কর্ণধার। সে আমাকে তার অভীপ্সিত পথে চালনা করবে, শরিকের সঙ্গে বিবাদ করতে বাধ্য করবে, মামলা থেকে অন্য মামলায় নিয়ে সবেগে আছাড় মেরে ফেলবে। এখানে সবাই যে তার সমর্থক, এই গ্রামের দীনতম প্রজাটি থেকে গ্রামের শীর্ণতম বৃক্ষটি অবধি সবাই। এখানকার আকাশ বাতাস মধ্যযুগের বাষ্পে পূর্ণ হয়ে আছে। র্মীন করতে করতে তবে একদিন মুক্তি—যখন জোড়াদীঘির জমিদারীর এক বিঘা জমিও আর থাকবে না। যে পথে এই জমিদারী অর্জিত সেই পথ ধরেই তার বিসর্জন হবে। আমি যখন একাকী নিস্তব্ধ হয়ে থাকি, তখন সেই আসন্ন বিসর্জনের বাজনা শুনতে পাই। লোকে ভাবে জমিদারের জমিদারী আর পাঁচটা ব্যবসায়ের মতো একটা ব্যবসায় মাত্র, জীবিকার উপায় মাত্র আর কিছু নয়। ভুল, ভুল, নিতান্ত ভুল। জমিদারী বিষবাষ্প প্রশ্বাসী কলকারখানা নয়—একটা সজীব, সক্রিয়, সচল বস্তু, প্রায় রক্তমাংসের পদার্থ। প্রত্যেক খণ্ড জমি, প্রত্যেকটি প্রজার সঙ্গে অনেকদিন ধরে একটা রক্তের সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অনেক দিন—কিন্তু আর অনেক দিন নয়। দেশময় এই প্রথার বিসর্জনের বাজনা ধ্বনিত হচ্ছে। শীঘ্রই একদিন বাঙলার জমিদারী প্রথা অতলে তলিয়ে দিয়ে ভূতপূর্ব জমিদারগণ বিসর্জিতপ্রতিমা শূন্য মণ্ডপে এসে বসবে। বাঙলা দেশের জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হতে চলেছে। সেই বিসর্জনের নিয়তিই আমার চুলে এসে ধরেছে। নিজের যাবার পথ সে নিজে করে নেবে। যে দ্বন্দ্ব আর রক্তপাতের প্রবেশ পিচ্ছিল পথ দিয়ে সে প্রবেশ করেছিল, সেই পুরাতন পথকেই আবার সে প্রস্তুত করছে—তারই ভূমিকা আমাদের শরিকানি বিবাদ। নতুবা কোথায় ছিলাম আমি, কে আমাকে এখানে টেনে আনলো, কেন আমাকে এখানে টেনে আনলো? তুচ্ছ একটা অশথ গাছের উপলক্ষ্য নিয়ে কে আমাকে গ্রাম্য রাজনীতির আবর্তে ফেলে দিল। এখন আমি অসহায়, কীর্তিনারায়ণ অসহায়, সকলেই অসহায়—কেবল একমাত্র প্রবল হচ্ছে বিসর্জনের সেই নিয়তি। সাধ্য কি আমি মধ্যপথে আপোষ করে তার বহির্গমনের পথ প্রস্তুত না করে দিয়ে পালাই। সেই দারুণ নিয়তিই আমাদের দুইজনকে পরম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করছে, নির্বাপিত অনলে নিষ্ঠুর কৌতুকে নূতন ইন্ধন নিক্ষেপ করছে, চরম চিতানলের সুবর্ণ চাবিতে স্বহস্তে আমরা তার মুক্তির সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দেবো—তাই এত আড়ম্বর, তাই এত সমারোহ।

নবীনকে এত বিচলিত হইতে মুক্তামালা কখনো দেখে নাই, তাহার মনে হইল নবীনের অন্তর্লীন ভাবাবেগে নৈশ আকাশ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, তাহার মনে হইল অস্তমিত চন্দ্রমা সেই অন্ধকার প্রকৃতি যেন তাহার মনের ইচ্ছা কান পাতিয়া শুনিতেছে, মৌন যদি অনুমোদনের লক্ষণ হয়, তবে মৌন জোড়াদীঘি নবীনের প্রত্যেকটি কথাকে যেন অনুমোদন করিতেছে! এমন সময়ে একটা উল্কা আকাশের পটে সুদীর্ঘ নীলাভ আঁচড় টানিয়া স্খলিত হইতে থাকিল। নবীন ও মুক্তামালা দুজনেই তাহার সপ্রতিভ গতি লক্ষ্য করিল, কিয়দ্দূর নামিয়া পড়িয়া উল্কাটা মিলাইল, আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

নবীন বলিয়া উঠিল—ওই পড়ন্ত উল্কার মতো জোড়াদীঘির জমিদার আপন ধ্বংসের আগুনে আপনার ইতিহাস রচনা করতে করতে চলেছে—আর কিছুদিনের মধ্যেই কোন দিগন্তেই তার চিহ্নটুকু অবধি থাকবে না।

সে আরও বলিতে যাইতেছিল কিন্তু মুক্তামালা বুঝিল এখন তাহাকে নিরস্ত করা আবশ্যক। সে স্বামীকে এক প্রকার জোর করিয়াই নীচে নামাইয়া লইয়া গেল।

ক্রমশ

'অ্যাসপ্রো'
পাওয়া যাচ্ছে!



জাল জিনিস নিয়ে প্রতারিত হবেন না। প্রত্যেকটি বড়ির উপরে 'অ্যাসপ্রোর' নাম লেখা আছে কিনা দেখে নেবেন। 'অ্যাসপ্রো' দশ মিনিটের মধ্যেই ব্যথা বেদনা ও জ্বর বন্ধ করে। বুকের বা পেটের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

'অ্যাসপ্রোর'
নিয়ন্ত্রিত মূল্য
এক আনায় ৩টি বড়ি
দশ আনায় ৩০টি বড়ি

পরিবেশক:
জে. এল্. মরিসন, সন অ্যাণ্ড জোন্স
(ইণ্ডিয়া) লিঃ : পোষ্টবক্স ... কলিকাতা,
টেলিফোন Calcutta 79..



'অ্যাসপ্রো'
সব দোকানেই পাওয়া যায়

পুলিশে নালিশ করার বিপদ!

সম্প্রতি আফ্রিকার টাঙ্গানাইকা প্রদেশের সিঙ্গিডা জেলা থেকে পাওনা আদায়ের নালিশের একটা ভারী মজার খবর পাওয়া গেছে। সিঙ্গিডা হচ্ছে আফ্রিকার তেমন একটি যায়গা যেখানে মানুষ-খেকো সিংহেরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় এবং একদল জংগলী ভুতুড়ে বদ্যি এই সব সিংহদের বশ করে পোষা কুকুরের মত কাজ করিয়ে নেয়। খবরটা হচ্ছে তেমনই একটি ভুতুড়ে বদ্যি—জেলার থানায় এসে তার এক মক্কেলের নামে নালিশ জানিয়ে বল্লে—"তোমরা কি আমায় এক মক্কেলের কাছ থেকে আমার পাওনা ফি বা পারিশ্রমিকটা আদায় করে দেবে? আমার ঐ মক্কেল তার এক শত্রুকে মেরে ফেলার জন্য আমাকে একদিন গোটাকতক সিংহ ডেকে দিতে বলে। আমি তার কথা মত সিংহ ডেকে দিই এবং তারা ঐ মক্কেলের শত্রুটিকে শেষ করেও দেয়। কিন্তু এখন ও কিছুতেই আমার ফি দিতে চাচ্ছে না। ঐ ফিটা তোমরা আদায় করে দাও।" থানার দারোগাবাবুরা তার নালিশ শুনেই তাকে বেঁধে থানায় আটক করে ফেলে।' আফ্রিকা যেমন ভয়ংকর দেশ তেমনি ভয়ংকর নালিশও যে এটা তাতে আর সন্দেহ নেই!

সখের রাজা সাইমন!

আপনারা অনেক রকম সখওয়ালা সৌখিন মানুষের খবরই হয়তো রাখেন—কিন্তু আমি আজ যাঁর খবর দেব তাঁর সখের কথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি হচ্ছেন সুবিখ্যাত ফরাসী ফিল্ম অভিনেতা মিচেল সাইমন। প্যারীর প্রান্তে 'নয়জী-লা-গ্রাঁদ' বলে যায়গাটিতে তাঁর নিজের ভিলাতে বাস করেন। তাঁর বাড়িতে যদি যান, মনে হবে সেটি আসলে একটি পশুশালা। আসবাব পত্রের বালাই নেই—তার ঘর দুয়ারের নানা অংশ বিভিন্ন পশু-পাখী জন্তু-জানোয়ার রাখবার মতো করে তৈরী—কারণ তাঁর পোষা জন্তু জানোয়ার ও পাখীদের কোনও অসুবিধা হয় এটা তিনি চান না। যেমন ধরুন তার পোষা বাঁদররা যাতে গাছের ডাল বেয়ে ওঠার ভংগীতে তাঁর বাড়ির সর্বত্র ঘোরাফেরা করতে পারে, ঠিক তেমন করেই বাঁদরদের থাকার যায়গা ছাড়াও তাদের জন্য আলাদা সিঁড়ি পর্যন্ত করে দিয়েছেন। কুকুর, বেড়াল, হাঁস, মুর্গী, পাখী, সবাইকার জন্য খাওয়া-দাওয়া থাকারও আলাদা আলাদা সুন্দর বন্দোবস্ত। তিনি নিজে আর তাঁর চাকররা কজনে মিলেই তাঁর পোষা ও পালিত বন্ধুদের তদবীর তদারক করেন।



এ ছাড়া তিনি তাঁর নিজের শোবার ঘরটিকে ও সেখানে যাওয়ার সিঁড়িটিকে সাজিয়েছেন—বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা, সুন্দর ছবি দিয়ে। নিজে থাকেন অত্যন্ত সাধারণভাবে—খুব আমুদে লোক, বন্ধু বান্ধব নিয়ে খুব গল্প করেন। তবে সৌখিন লোক হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যেটি সেটি হচ্ছে অন্যান্য সৌখিন ও সখদারদের মত তাঁর ম নারীর প্রতি আসক্তি এতটুকু । বাড়িতে তাঁর নারী বলতে আছে তাঁর আদরের একটি বাঁদরী—নাম ক্যাথারিন, বয়স ২৭ বছর। ক্যাথারিনই তার সংগিনী—ক্যাথারিন তাঁকে আদর কর দাড়ি বেছে দেয়, কাঁধে চেপে ঘুরে বে স্টুডিওর কাজ শেষ করে 'সাইমন সাহেব ফিরলেই ক্যাথারিন তার কাঁধে চে সাইমনের কানে একটা চুমু খায়। 'কে বলে কাকাতুয়াটা উড়ে এসে কাঁধে বসে ঠুকরে দেয়—কুকুর বেড়াল, খরগোসরা তার পাগুলো চেটে দেয়। সাইমন সাহেব এদের আদরের কাছে মেয়েদের আদর নয়!



সাইমন ও ক্যাথারিন।

নূতন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা

শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায়

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা অর্পণের যে পরিকল্পনা সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে প্রধানত দুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। (১) বৃটিশ গভর্নমেণ্ট জানাইতেছেন যে, অনতিবিলম্বেই তাঁহারা ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক মর্যাদা (Dominion Status) দিয়া ভারত ত্যাগ করিবেন। তারপর ভারতবাসীরা যখন ইচ্ছা বৃটিশ 'কমনওয়েলথের' সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। (২) বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মুসলীম লীগের ভারত খণ্ডনের দাবীও এই সঙ্গে মানিয়া লইয়াছেন। পরিকল্পনায় তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ভারতের যে সকল অংশ নিখিল ভারত গণ-পরিষদে যোগদানে অনিচ্ছুক, তাহাদের উপর এই গণ-পরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ অনিচ্ছুক অংশসমূহ যদি ভারতের বাহিরে থাকিতে চায় তবে তাহাদের সেই অধিকার স্বীকৃত হইবে।

পরিকল্পনা গ্রহণের কারণ

কংগ্রেস, শিখ এবং লীগ দল তিন পক্ষই বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকল্পনায় ভারত বিভাগের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তৎসম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া পণ্ডিতজী তাঁহার বেতার ভাষণে বলিয়াছেন—"যুগ যুগ ধরিয়া আমরা ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্নই দেখিয়াছি। কাজেই ভারতবর্ষকে খণ্ডিত হইতে দেওয়া স্বভাবতঃই আমাদের পক্ষে বেদনাদায়ক। তথাপি বৃহত্তর কল্যাণের দিক চিন্তা করিয়া আমরা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছি।" পণ্ডিতজী আরও বলেন—"আমরা যে ঐক্যবদ্ধ ভারতের কল্পনা করিয়াছি তাহাতে বলপ্রয়োগের অবকাশ নাই। স্বাধীন জনসমূহের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার ভিত্তিতেই আমাদের সেই অখণ্ড রাষ্ট্রের কল্পনা প্রতিষ্ঠিত।" পণ্ডিতজীর এই কয়টি কথাতেই বুঝা যায় যে, জোর করিয়া কাহারও উপর কিছু চাপাইয়া দেওয়া কংগ্রেসের নীতিবিরুদ্ধ বলিয়াই ভারতখণ্ডনের প্রস্তাবে মুসলিম লীগের দাবী তাহাকে মানিয়া লইতে হইল। সর্দার বলদেব সিং-এর বক্তৃতা হইতেও এই আভাসই পাওয়া যায় যে, ভারতখণ্ডন শিখ সমাজের মনঃপূত না হইলেও ভারতের বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহারা এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

মিঃ জিন্নার সম্মতি

কিন্তু মিঃ জিন্না কি কারণে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন? কেবল মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি লইয়া পাকিস্তান গঠনের কল্পনা ইতিপূর্বে কোনদিনই তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। "খণ্ডিত" (truncated) ও "কীটদষ্ট" (moth-eaten) পাকিস্থানের কল্পনা বরাবর তাঁহার নিকট অসহনীয় মনে হইয়াছে। এমন কি মন্ত্রী মিশন এই দেশে আসিয়া মিঃ জিন্নাকে যখন মুসলিম প্রধান অঞ্চলসমূহ লইয়া পাকিস্থান দিবার প্রস্তাব করেন তখনও মিঃ জিন্না সরাসরি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবটি লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া মন্ত্রী মিশন বলিয়াছেন—

"We considered whether a smaller Pakistan confined to the Muslim majority areas alone might be a possible basis of compromise. Such a Pakistan is regarded by the Muslim League as quite impracticable: because it would entail the exclusion from Pakistan of (a) the whole of the Ambala and Jullunder Divisions in the Punjab (b) whole of Assam except the district of Sylhet and (c) large part of Western Bengal, including Calcutta in which city the Muslims form 23.6% of the population." (Para 7)

১৯৪৭ সালের ৬ই জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহাতে অনিচ্ছা সত্ত্বে হইলেও তাঁহারা "অনিচ্ছুক অংশসমূহকে বর্তমান গণপরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্রের বাহিরে রাখিতে" সম্মত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিকে মিঃ জিন্নার হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি করাচী অধিবেশনে নিখিল ভারত গণপরিষদ ভাঙিয়া দিবার ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবী জানায়। ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকেও মিঃ জিন্নার নিকট যাহা অগ্রহণীয় ছিল, জুন মাসে ঠিক তাহাই তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য হইল কিরূপে তাহা অনেকের নিকটই বিস্ময়কর মনে হইবে।

বৃটিশ গভর্নমেণ্টের দৃঢ়তা

এই সম্পর্কে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে মিঃ জিন্নার মত পরিবর্তনের কারণ পাওয়া যাইবে। প্রথমত সকলেই জানে, মিঃ চার্চিলের নিকট হইতে অভয় বাণী পাইয়াই কায়েদে আজম মহাশয় দিনের পর দিন তাঁহার রকমারী কায়দা দেখাইতেছিলেন। মিঃ চার্চিল শ্রমিক গভর্নমেণ্টের ভারতীয় নীতি সমর্থন করিবেন বলিয়া সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মুরুব্বীর এই মত পরিবর্তনের খবর মিঃ জিন্নার নিকট আগেই পৌঁছিয়াছিল। মিঃ জিন্নার সুবুদ্ধি উদয়ের দ্বিতীয় কারণ—শ্রমিক গভর্নমেণ্ট এবং বড়লাটের এইবারকার দৃঢ়তা। পরিকল্পনাতেও দেখা যায় উহার সাফল্য কোন দলের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখা হয় নাই। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতীয় জনগণের (দলের নয়) অভিপ্রায় অনুসারেই ক্ষমতা অর্পণ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন এবং জনগণের অভিমত অবগত হইবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির মুখাপেক্ষী না হইয়া এইবার একেবারে সরাসরি আইন সভার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হইয়াছে—

"It has always been the desire of His Majesty's Government that power should be transferred in accordance with the wishes of the Indian people themselves. This task would have been greatly facilitated if there had been an agreement among the Indian political parties. In the absence of such an agreement, the task of devising a method by which the wishes of the Indian people can be ascertained has developed on His Majesty's Government. After full consultation with the political leaders of India H.M.G. have decided to adopt for this purpose the plan set below" (Para 3).

মিঃ চার্চিলের শক্তিশালী সমর্থন যেই মুহূর্তে অপসারিত হইয়াছে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যেই মুহূর্তে অচল অবস্থার অবসান ঘটাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন তখনই মিঃ জিন্নার বাস্তববোধ জাগ্রত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য কি? মিঃ জিন্নার এই বাস্তবোপলব্ধি যেভাবেই হইয়া থাকুক, উহা অভিনন্দনের যোগ্য। তথাপি এই সঙ্গে না বলিয়া পারিতেছি না যে, সাম্রাজ্যবাদীর ক্রীড়নক না হইয়া মিঃ জিন্না যদি আগে হইতেই সুবুদ্ধি দ্বারা

সমিতির অধিবেশনে সর্দার প্যাটেল স্বয়ং এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য এমন সব রক্ষা কবচের (safeguard) ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, ঐ পরিকল্পনা গৃহীত হইলে ভারতের নামমাত্র ঐক্যই শুধু রক্ষিত হইত। তাহা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পাওয়া যাইত না। আভ্যন্তরীণ বিভেদের ফলে শাসন ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িত। গত নয়মাস অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে লীগ দলের সহিত কাজ করিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে বর্তমান পরিকল্পনায় যদিও কতকগুলি অংশকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে তথাপি যে শতকরা ৮০ ভাগ পাওয়া গিয়াছে তাহাকেই অভিপ্রায় অনুসারে সংগঠিত করিয়া তোলা যাইবে। হিন্দুস্থানের মাইনরিটি সম্প্রদায় তথা লীগদল আর মেজরিটীর কাজে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। ফলে একই আদর্শের অনুরাগী সমগ্র হিন্দুস্থানে এক শক্তিশালী সুসংগঠিত রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারিবে। এইবার কেন্দ্রে উপযুক্ত ক্ষমতাবান গবর্ণমেণ্ট গঠনও সহজসাধ্য হইবে। প্রদেশের সহিত কেন্দ্রের অনৈক্যের ফলে গত দুর্ভিক্ষের সময় হইতে এই পর্যন্ত স্থানে স্থানে যে ব্যাপক বিপত্তি ঘটিয়াছে, আশা করা যায়, তাহারও অবসান সূচিত হইবে। ইহারই মধ্যে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, এতদিন লীগকে তোষণ করিবার জন্য স্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রের প্রাপ্য 'অবশিষ্ট ক্ষমতা"সমূহ (Residuary powers) প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের হাতে দিবার যে প্রস্তাব হইতেছিল ভারত খন্ডনের পরিকল্পনা গৃহীত হইবার সংগে সংগেই সেই সকল ক্ষমতা যথারীতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ভারতের সৈন্যবাহিনী এবং সরকারী অফিসগুলিও সাম্প্রদায়িকতার অত্যাচার হইতে বহুলাংশে উদ্ধার পাইবে। এই সব ব্যাপারে বর্তমান পরিকল্পনা নিশ্চিতরূপেই ১৬ই মে'র পরিকল্পনা হইতে উন্নত।

বাঙলার পক্ষেও শুভ

বর্তমান পরিকল্পনায় বাঙলা বিভাগ অনিবার্য হইয়া পড়িল সত্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, ১৬ই মে'র পরিকল্পনায় তথাকথিত অখন্ডতার খাতিরে সমগ্র বাঙলার হিন্দু সমাজকে বলি দিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, বর্তমান পরিকল্পনায় সেই আশঙ্কা দূর হইয়াছে। মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনায় মন্ডলী গঠনের অংশটি লইয়াই বিরোধের সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ যদি কংগ্রেসের ব্যাখ্যা মানিয়া লইয়াই গণপরিষদে যোগ দিত তবুও বাঙালী হিন্দুর উদ্ধারের পথ থাকিত না। কংগ্রেসের ব্যাখ্যা গৃহীত হইলেও প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র প্রদেশের প্রতিনিধিরাই রচনা করিতেন। গণপরিষদে বাঙলার সদস্যগণের মধ্যে মুসলিম লীগের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা বর্তমান ছিল। কাজেই সমগ্র প্রদেশের শাসনতন্ত্র মুসলিম লীগের অভিপ্রায় মতই রচিত হইত। মাইনরিটীর স্বার্থরক্ষাবিষয়ক কমিটি বড়জোর হিন্দুদের অধিকারসমূহের একটা তালিকা রচনা করিয়া শাসনতন্ত্রে উহা লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিতে পারিতেন। কিন্তু মেজরিটী যেখানে মাইনরিটীর প্রতি বিদ্বিষ্ট, সেইখানে এই সকল অধিকার বহুলাংশেই নিরর্থক হইয়া পড়িত। বর্তমান পরিকল্পনায় বাঙলার পূর্বাংশের সংখ্যালঘু সমাজের সমস্যা অমীমাংসিত রহিল বটে, কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং বাঙলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র কলিকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চিতরূপেই মুসলিম লীগের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে মুক্তি পাইল। বাঙলার পক্ষে এই লাভ সামান্য নহে।

নকল হইতে সাবধান

পাকা চুল কাঁচা হয়

(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)

কলপে সারে না। আমাদের নির্দোষ কেশরঞ্জন সুগন্ধি আয়ুর্বেদীয় তৈলে চুল চিরতরে স্বাভাবিক কাল হইবে, আর পাকিবেই না। এই তৈল মাথা ও চক্ষুরও খুব উপকারী, বিশ্বাস না হইলে, মূল্য ফেরতের গ্যারাণ্টি লউন। মূল্য ২৷৷০, অল্প পাকায়, ৩৷৷০ তাহার বেশী পাকায় ও ৫, সব পাকায়।

HIND KALYAN AUSHADHALAYA
No. 19 P.O. Katri Sarai (Gaya)

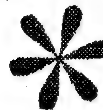


প্রকাশ ও অপ্রকাশের আলোছায়ায়
পাওয়া ও না-পাওয়ার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে
কামনা ও কবিতার টানা-পোড়েনে
যে রহস্যজাল রচিত হয়েছে তা দুর্লভ কারুশিল্প



শচীন্দ্র মজুমদার

উপন্যাসের আঙ্গিকে কাব্যের রস পরিবেশন করলে তার আস্বাদ কত মধুর হতে পারে এ-বইয়ে তার নিঃসংশয় পরিচয় মিলবে। সংস্কৃত কাব্যের গাম্ভীর্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর লালিত্য এর প্রতি ছত্রে উৎসারিত। আধুনিক সমাজ ও আধুনিক নর-নারী এ-উপন্যাসের উপজীব্য, কিন্তু বিষয় সেই চিরন্তন — সেই পরকীয়া-প্রেম। ইন্দ্রিয়াতীত হয়েও যা ইন্দ্রজালের অতীত নয়। আধুনিক কালের প্রসঙ্গে পরকীয়া-প্রেমের এমন সম্মোহনী কাহিনী বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হয়নি। দাম তিন টাকা।



সিগনেট প্রেসের বই

১০/২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২০

সিগনেট প্রেসের বই * সিগনেট প্রেসের বই * সিগনেট প্রেসের বই * সিগনেট প্রেসের বই * সিগনেট প্রেসের বই * সিগনেট প্রেসের বই

অনুবাদ সাহিত্য

এই ভালবাসা

যশ পাল

[আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে যশ পাল সত্যিই শিল্পী। ছোটগল্প প্রবন্ধ উপন্যাস—সব কিছুতেই তাঁর হাত সমান পাকা। সাম্যবাদী, বর্তমান বাস—লখনৌ। তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'দাদা কমরেড' লেখা হয় শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র জবাবে। বস্তু-নিষ্ঠ সমাজসচেতন লেখক হ'লেও তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে রোমান্টিকতার আভাস পাওয়া যায়। নীচের গল্পটি তাঁর 'প্রেম কী সার' গল্পের তর্জমা।]

পেশোয়ার থেকে গোপনে চরস আমদানি তখন এত ভয়ানকভাবে চলছিল যে আবকারিওলাদের সঙ্গে পুলিশেরও হয়রাণ হতে হত। দিনে না ছিল বিশ্রাম, না রাতে স্বস্তি। নেশার জিনিসের গোপন ব্যবসায়ীকে চোর মধ্যে বুদ্ধির মৌলিকতার জন্য যত প্রশংসা পাওয়া যায়, তা আর কোন বিভাগে নেই। কিভাবে কোন জিনিসের মধ্যে যে চরস নেই, তা বলতে পারা যায় না।

লাহোরের মেন স্টেশনের সামনে বেড়াতে বেড়াতে আমি প্রখর দৃষ্টি দিয়ে পেশোয়ার এক্সপ্রেসের যাত্রীদের তাড়না করছিলুম। লম্বা চাদরে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে পথের মাঝ দিয়ে এক বুড়ী কিছু দ্বিধাজড়িতভাবে আমার সামনেই বেরিয়ে গেল। ঐ স্ত্রীলোকটিকে দেখে আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল।

এতদিন পুলিশে কাজ ক'রে এটুকু শিখেছি, যেখানে সন্দেহ করার প্রত্যক্ষ কারণ নেই, সেখানেও সন্দেহ করা উচিত। বহুবার ত না বোরখা পরা ভদ্রঘরের মহিলাদের মাল-পত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে সেরে সেরে চরস। কান ঘাঘী ঐ বুড়ীকে জাপিয়ে হয়ত' চারসের চরস বের ক'রে আনার মতলব করেছে, আশ্চর্য কি?

"এই! ও বুড়ী। এদিকে আয়।"—আমি তাকে ডাকলুম। এক হাতে সে নিজের ছোট-মতো গাঠরী বুকের উপর চেপে, অন্য হাত দিয়ে চাদর সামলাতে সামলাতে একবার আমার দিকে দেখল। আমার ডাক যেন শুনতে পায়নি এমনিভাবে সে নিজের পথ চলতে লাগলো।

সন্দেহ দৃঢ় হবার কারণ ছিল। একটু ভয় দেখিয়ে বললুম—"এদিকে আয়।" মনে হলো, সে যেন কিছুই শোনেনি, বোঝেনি। আর একবার আমার দিকে দেখে সে চলে যেতে লাগলো। সঙ্গের সেপাই এগিয়ে গিয়ে তাকে থামিয়ে দিল।

তার ছোটখাটো পুটলিটার দিকে দেখিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, "এতে কি আছে?" হাতের আঙুল নাচিয়ে ব্যাকুলভাবে অস্পষ্টস্বরে সে যা আবোল-তাবোল বললে, তা কিছুই আমি বুঝলুম না। তার চালাকী অনুমান ক'রে পশ্‌তো ভাষায় আবার তাকে প্রশ্ন করলুম। ব্যাকুলভাবে বিড় বিড় ক'রে সে যা উত্তর দিল, তা আমি বুঝতে পারলুম না।

হয়রাণ হ'য়ে ভাবলুম, স্ত্রীলোকটি হয় পাগল সেজে বসেছে, নতুবা পশ্‌তো অথবা পাঞ্জাবী সত্যিই সে বোঝে না, হয়তো আর কোন তৃতীয় ভাষা সে বলে এবং বোঝে। সঙ্গের সেপাইটা জবরদস্তি করে বুঝিয়ে দেবার মতলবে খুব জোর গলায় ভয় দেখিয়ে প্রশ্ন ক'রলো, "এতে কি আছে?" তবু ফল কিছুই হ'লো না।

শেষ পর্যন্ত, ঐ স্ত্রীলোক যদি এতই বোকা হয় তবে লাহোরের মতো জায়গায়, পেশোয়ার এক্সপ্রেসে, রাতের বেলা একলা এল কেমন ক'রে? সেখানে ওর কি দরকার? সেই সময়ে কাশিম সঙ্গের সেপাইকে ইশারা করে ব'ললে—"হ'তে পারে কাশ্মিরী স্ত্রীলোক।"

স্ত্রীলোকটি একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিল। না হয় ধরা গেল, স্ত্রীলোকটি কাশ্মিরী। তাহ'লে, এর গাঠরিতে চরস ত' থাকতে পারে, অথবা এর পিছনে অন্য কিছু রহস্য হয়তো আছে। এরই বা কি প্রমাণ, চুরি ক'রে মেয়ে-বেচা ব্যবসায় হামেশা লাহোর আসা-যাওয়া-করা কাশ্মিরী দলের একজন এ নয়? নিজের গাঠরিটা যেভাবে সে আঁকড়ে ছিল, ছুঁতে দিচ্ছিল না, তা'তে সন্দেহ না ক'রে উপায় ছিল না। কাশ্মিরী ভাষার লিঙ্গভেদ সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভাণ ক'রে কাশিম বললো, "কিথে জান্দা?" (চলেছ কোথায়?) তবু জবাব পাওয়া গেল না।

কাশিম ব'ললো, "হুজুর, এ স্ত্রীলোক বদমায়েশ, চালাকী খেলচে।"

একটু ভেবে আমি হুকুম দিলাম, "একটা টাঙ্গায় বসিয়ে একে বড় কোতোয়ালী নিয়ে চলো।" অনেক ঝামেলার পর সে টাঙ্গায় বসলো।

কনস্টেবল পীর হোসেন কাশ্মিরী। সৈয়দ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্য তার আধ্যাত্মিক প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাকে ডেকে আমি সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে বললাম। কাছে গিয়ে তার নিজের দুর্বোধ্য ভাষায় আশ্বাসের ভঙ্গীতে পীর হোসেন দুটো কথা বলতেই তার সমস্ত ভয় উবে গেল। স্ত্রীলোকটি পীর হোসেনের কাছে ঘেঁষে এলো। তারপর চোখে তার ময়লা চাদরের খুঁট রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে অনেক কিছু বকে গেল।

পীর হোসেন ব'ললো, সে তার মরদের খবর জিজ্ঞাসা করছে। তাকে খুঁজতেই সে লাহোরে এসেছে। অনেক বছর হ'লো, লাহোরে রোজগার করতে আসে, আর সে ফেরে নি। কতবার চিঠি লেখা সত্ত্বেও সে আর ফিরে যায়নি। তাকে নিয়ে যাবার জন্যেই সে এসেছে, আর নিয়েও যাবেই।

আমি বললুম, "এর স্বামীর ব্যাপার পরে দেখা যাবে। আগে এর গাঠরী কাউকে দিয়ে তো খোলাও।" পীর হোসেনের কথায় সংকুচিত হ'য়ে সে গাঠরী খুলে ফেললু। ছেঁড়াখোঁড়া চাদরের এক কোণায় গোটা দুই ময়লা কাপড়ের টুকরোতে ছিল কতদিনের যেন বাসি ভুট্টার রুটির গুঁড়ো। কাশ্মিরী ঢঙের পুরালো মর্দানা ওয়েস্টকোটও একটা ছিল। জায়গায় জায়গায় তার বিশ্রী ধাঁচের ফুল ও পাতা, কাশ্মিরী কলাকে অপমান করার জন্যই যেন সে সূচীশিল্পের সৃষ্টি। আর তাতে আঁটা ছিল, গোল গোল কাঁচের টুকরো। এই ওয়েস্টকোটের ভাঁজ সে খুললো বড়ো অনিচ্ছায়, যেন সে কাউকে দেখতে দিতে চায় না। এছাড়া একটি ছোরাও ছিল। পীর হোসেন অনেক আশ্বাস দেওয়ার পর নিজের কাপড়ের ভিতর থেকে সেটিকে সে বের ক'রলো। ছোরা কেন সে রেখেছিল—অনেক প্রশ্ন করা সত্ত্বেও তার কোন জবাব দিল না। মুখ ফিরিয়ে ব'ললো, "এম্‌নিই।"

এক কাশ্মিরী স্ত্রীলোক, যে কখনো নিজের গাঁয়ের বাইরে পা দেয়নি, এসেছে লাহোরে। বলছে যে নিজের স্বামীকে সে খুঁজতে এসেছে, কিন্তু কোন লোক ও জায়গার ঠিকানা সে জানে না। তার কাছে আছে পুরুষের এক ওয়েস্টকোট, যা সে লুকোতে চায়, আর আছে এক ছোরা। ব্যাপারটা জটিল, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলুম।

পীর হোসেনকে বললুম, "এ স্ত্রীলোক চালাক ব'লেই মনে হয়। এ যদি কোন ভয়ানক ফেরারী মামলার আসামী হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এর হুলিয়া নেওয়া হোক্।"

স্ত্রীলোকটিকে পীর হোসেনের জিম্মায়

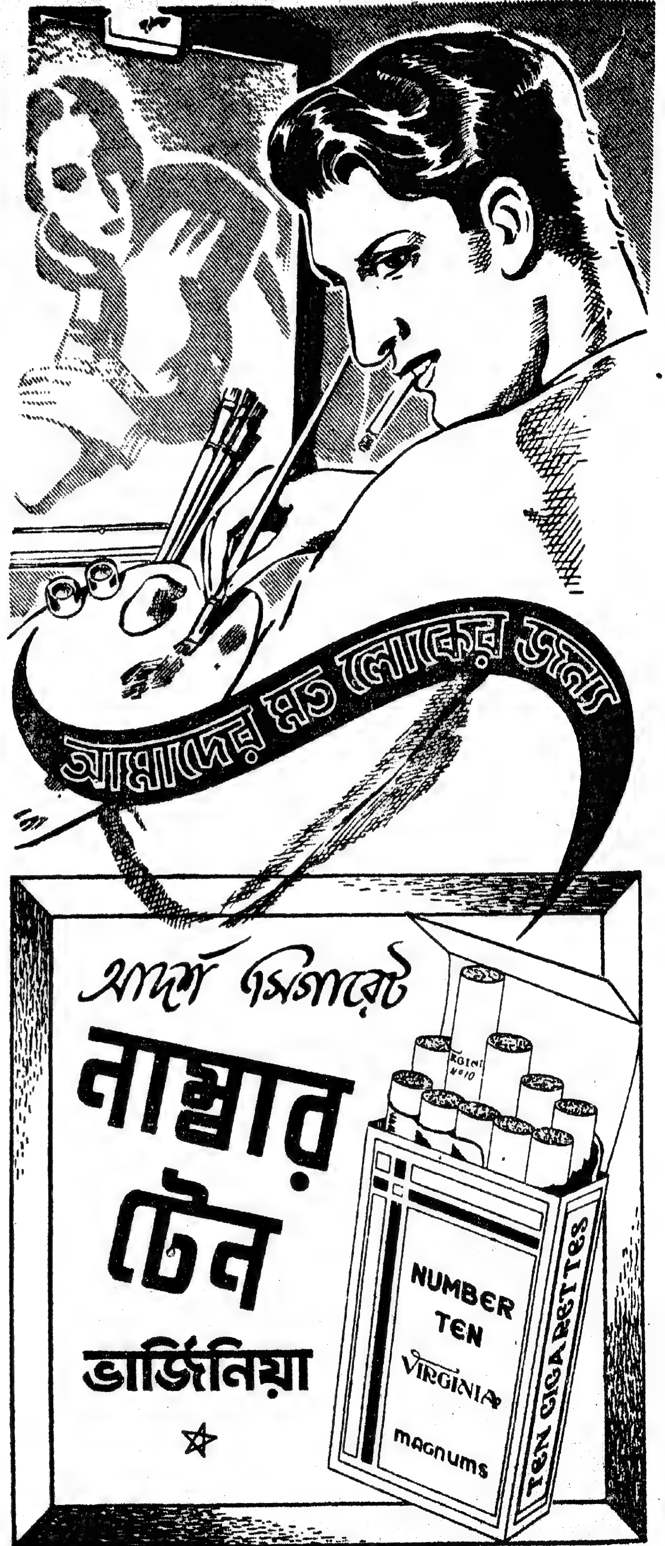
ছেড়ে দিয়ে আমি অন্যান্য কাগজপত্র দেখতে লাগলুম। মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলুম। পীর হোসেন বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে বোঝানোর পর স্ত্রীলোকটি চোখের জল মুছতে মুছতে আস্তে আস্তে নিজের কাহিনী শুরু ক'রলো। খানিকক্ষণ বাদে সে খুব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। পীর হোসেন যখন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, সেই অবস্থায় বাধা দেওয়া আমার উচিত ব'লে মনে হ'লো না। সবশেষে পীর হোসেন ব্যাপারটা বোঝালো ঃ—

"শ্রীনগর থেকে ত্রিশ-প'য়ত্রিশ মাইল হবে, বৈরীনাগের কাছাকাছি হ'লো এই স্ত্রীলোকের বাড়ি। সেখান থেকে সওয়া দু'শ' মাইল পায়ে হেঁটে সে জম্মুতে আসে। তারপর নানা স্টেশন ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে স্বামীর সন্ধানে পেশোয়ার এক্সপ্রেসে লাহোরে এসে পোঁছেচে। স্বামীর ঠিকানা জিজ্ঞেস করায় বলছে যে সে লাহোরেই আছে, কিন্তু তার ঠিকানা জানা নেই।"

"ঠিকানা জানিস্ না, নিজের মিন্‌সেকে কি তবে মাথার মধ্যে খুঁজবি?" আমি বললুম, "হয় ও স্বামীর ঠিকানা জানে, নয় তাকে ও খুঁজতে আসেনি। নিজের সহানুভূতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর, দেড়ঘণ্টা পর্যন্ত প্রশ্ন-বাদের শেষে পীর হোসেনের মারফৎ আমি যা বুঝেছিলুম তার সারাংশ হ'লো এই ঃ—

"ত্রিশ বছর হ'য়ে গেল আমার স্বামী ফজ্জা গাঁয়ের অন্য জোয়ান পুরুষের সঙ্গে মজুরি-গিরি ক'রে টাকা রোজগারের জন্যে লাহোরে যায়। তখন আমি বলি,—আমার ওখানে যা কিছু আছে পীর-ফকিরকে দিয়েও তা অনেক। গোটা আট দশ মোষ, দশ-বারো 'ধুমা' জমি, ন্যাশপাতি, আখরোট আর তুঁতের গাছঃ পরিশ্রম করলেই এর থেকে সব কিছু হ'তে পারে। আমার শাশুড়ী, তার মা—সেও তাকে বুঝালো। আমি সে সময় ছেলেমানুষ ছিলুম, বয়স ছিল কুড়ি বছরের চেয়েও কম। আমাকে ধমকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললে—সাত মাসের মধ্যে ন্যাশপাতি গাছে ফুল ফুটতে ফুটতেই সে ফিরে আসবে। লাহোরে চাঁদির টাকা পায়ের নীচে গড়াগড়ি যায়। সবাই যায়, আমিই বা যাব না কেন? আমি কাঁদতে লাগলুম। সে চলে গেল। শাশুড়ী আর আমি কাজ করতুম। ক্ষেতে লাঙলও আমাদের দিতে হ'তো। শাশুড়ী অপ্রসন্ন হতেন, বলতেন, যদি কাজেই না লাগল, অমন ছেলের চেয়ে ছেলে না হওয়াই ছিল ভাল।

"বছর গেল, দু'বছর গেল, তিন বছর গেল—আমি রোজই কাঁদতুম। বরফ গলার পর, পরদেশ থেকে লোক বাড়ি ফেরে, আমার পুরুষ ফিরল না। কেটে গেল আরও দু'বছর। হাবলার



স্বামী রহ্‌মান লাহোর থেকে ফিরল। সে নিয়ে এল ফজ্জার এক চিঠি। ফজ্জা লিখেছিল :

'আমাকে পুলিশ মিথ্যে-মিথ্যে ধরেছে। কিছু টাকা পাঠিয়ে দিস্ তো আমি ফিরে যাই।'

"শাশুড়ী আর আমি অনেক কাঁদলুম। দুটো মোষ বেচে আমরা চল্লিশ টাকা পাঠিয়ে দিলুম। শাশুড়ীকে লুকিয়ে ডাকঘরের মুন্সীকে দিয়ে আমি এক চিঠি লেখালুম : পত্রপাঠ চলে আয়—তোর মা ভয়ানক চটেছেন আর তাঁর শক্ত অসুখ। আমি কেবল কাঁদি। আমার বড়ো ভয় করে, তুই তাড়াতাড়ি চলে আয়। শাশুড়ী আমাকে বকে যে আমি তোকে তাড়িয়ে দিয়েছি, কিম্বা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে তুই চলে গেছিস। তা'ছাড়া এখন একলা কাজ হয় না। তোর মা পরিশ্রান্ত' আর তোকে ছাড়া বড়ই কষ্ট হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"টাকার রসিদ আর চিঠির জবাব এসেছিল?"

সে বললে, "টাকার রসিদ এসেছিল, চিঠির জবাব আসেনি।"

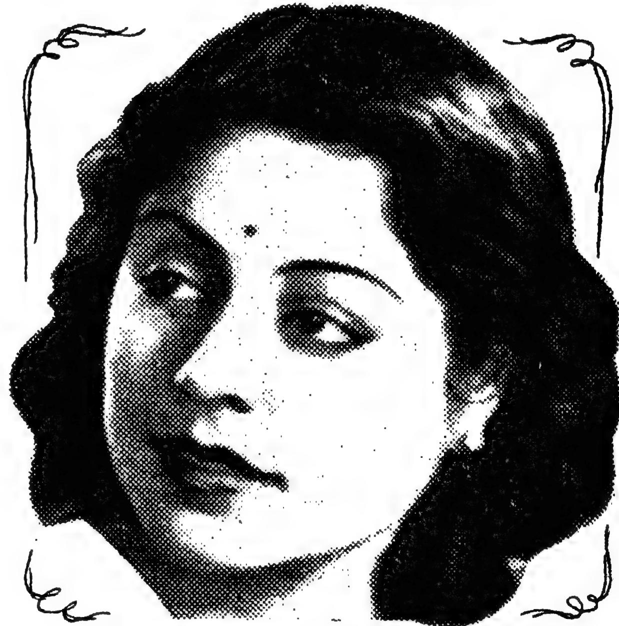
আমাকে বিশ্বাস করে সে সেই পুরুষের ওয়েস্টকোট থেকে তিনটি রসিদ বের করলো।

"বছরের পর বছর কাটতে লাগল। ফজ্জা ফিরল না। যারা লাহোর অমৃতসরে রোজগার করতে যেত, তাদের কাছ থেকে ফজ্জার খবর কখনো কখনো পেতুম। কখনো শুনতুম' পুলিসে ধরেছে। কখনো শুনতুম, সে চাকরি পেয়েছে। আবার কখনো শুনতুম, দোকান দিয়ে বড়লোক হয়েছে। শাশুড়ী অসুখে মারা গেলেন। আমি রইলুম একা। ফারুর বিয়ে হয়েছিল আমার পরে। হাবলার দুই মেয়ের ছেলে হলো। মামচুর বউ মারা গেল; তারও ছেলে আর মেয়ে আজ ডাগড়া জোয়ান।

"ন'বছর পরে লাহোর থেকে একজন চিঠি নিয়ে এল। সে লিখেছিল—'আমার অসুখ করেছে। হাতে পয়সা কড়ি নেই। বড়ো কষ্ট হচ্ছে। কোন রকমে টাকা পাঠা, আমি বাড়ি ফিরে যাব।' আবার এক মোষ বেচে' পাগসুকে দুটো আখরোটের গাছ অর্ধেক দামে বেচে দিয়ে, চল্লিশ টাকা ফের পাঠিয়ে দিলুম ডাকমুন্সীকে দিয়ে। আর চিঠিও লিখিয়ে দিলুম যে, আমি এখন একলা আছি। তোর মাও মারা গেছে। সারা গাঁয়ে আমার দুশমন। যার মরদ নেই, তার ঠাঁই কোথায়? কেউ ক্ষেতের ফসল কেটে নিয়ে যায়' কেউ নিয়ে যায় আখরোট পেড়ে। হাবলা চুরি করে নিয়ে যায় তুঁতফলের সব গুটি পোকা। আর দেখ্, সকলের দুটো তিনটে করে ছেলে। ঘরে আসে যায় কাজ করে। আমার কেউ নেই। এখন ভয় হয়, আমি অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়বো। রোজগারে আর তোর দরকার নেই। ব্যাস্ তুই চলে আয়, অবিশ্যি চলে আয়।"

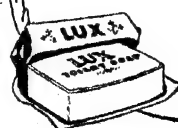


কানন দেবী তাঁর ত্বক্ নির্ম্মল ও কমনীয় রাখেন
লাক্স্ টয়লেট্ সাবান মেখে ...



এই জনপ্রিয় গায়িকা-তারকা তাঁর মসৃণ, নির্ম্মল ত্বকের কদর বোঝেন, এবং সর্ব্বদা তার বিশেষ যত্ন নেন, — তিনি জানেন যে স্থায়ী ত্বক্‌সৌন্দর্য্য নিয়মিত সৌন্দর্য্য চর্চ্চা দ্বারাই অর্জ্জন করা যায়। সেইজন্যই কানন দেবী সর্ব্বদা লাক্স্ টয়লেট্ সাবান ব্যবহার করেন। আপনারও উচিত এই বিশুদ্ধ শুভ্র সাবান ব্যবহার করা। আপনি দেখবেন ইহার সুবাসিত সক্রিয় ফেনা আপনার ত্বক্‌কে কোমল, উজ্জ্বল ও নিখুঁত রাখবে।

পায়ওনিয়ার প্রোডাক্‌শনের "চন্দ্রশেখর" চিত্রে কানন দেবীর সাম্প্রতিক অভিনয় তাঁর পুরাতন ভক্তদের আনন্দদান করবে ও অনেক নূতন ভক্তের দলও সৃষ্টি করবে।



লাক্স্ টয়লেট্ সাবান
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান!

LTS. 164-50-40 BG

LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED

"এবারে চিঠি এল—'ভাবিস না, আমি নিশ্চয়ই আসব, আর লাহোরে ব্যবসা করবো। লাহোরে তোকেও নিয়ে আসব। এ জায়গা বড়ো আরামের। তুই ভাবিস্ না, তোকে আমি গয়নাও গড়িয়ে দেব।' আমি আবার লেখালুম, 'তুই চলে আয়। বাড়িতে বসবাস করাই ঠিক। ক্ষেতের আর জানোয়ারের ক্ষতি হয়েছে অনেক। কিন্তু তুই শুধু চলে আয়। সব আবার ঠিক হয়ে যাবে।' কেউ এল না' এমন কি চিঠিও না।

"আমি বার কয়েক অসুখে পড়ে অকর্মণ্য হয়ে রইলুম। ঘরে কেউ ছিল না। তখন মামচু জল ভরে দিয়ে যেত, আর দিয়ে যেত মোষের দুধ। আরও ছ'বছর কেটে গেলে পর, মামচু বললে ঃ 'তুই তো বুড়ি হয়ে গেছিস্। সোমত্ত বয়সে হাত পা চলতো' কাজকর্ম করতিস্। আর পাঁচ সাত বছরের মধ্যে তোর হাড় যাবে বসে। তখন কি করবি? আমাকে নিকে কর। আমার ছেলে আছে, দু'জনকে রোজগার করে খাওয়াবে। তোর যদি ছেলে পিলে হয়, ভালোই। নয়তো কী করবি?" আমি কাঁদতে লাগলুম। সেও কাঁদছিল।

"আমি বললুম—'না, ফজ্জা আমার স্বামী। ও আসবে, তখন আমি ঘর করবো। এবারে ও আসবেই।'

তিন বছর পরে ফের ফজ্জার চিঠি পেলুম। কোন মহাজনের দেনা শোধ না করতে পারায় তার জেল হয়েছে। লিখেছিল—'ত্রিশ টাকা পাঠিয়ে দে, শীঘ্রই চলে আসব।' এবার আমি এক 'ঘুমা' জমি বন্ধক রেখে ডাকঘর থেকে টাকা পাঠালুম, আর চিঠিও লেখালুম' 'তোর ঘরদোর তুই বিনা সবই নষ্ট হচ্ছে। তুই সারা জীবন পরদেশে কাটালি। এবার ঘরে এসে বোস্। আর সকলের যোয়ান ছেলে বাড়িতে বসেই কেমন রোজগার করে। আমিই শুধু মরলুম বুড়ি হয়ে।

কেউ এল না। চিঠিও এল না। শুনলুম সে আর একটা বিয়ে করেছে। ওকে চিঠি লিখলুম,—'ভালো করিসনি। যাহোক্, একরকম ভালোই। তুই চলে আয়' আর ওকেও সঙ্গে নিয়ে আয়। আমি দু'জনের দাসীগিরি করবো। দুবেলা আমায় দু'টো রুটির টুক্‌রো দিস। তুই অবিশ্যি চলে আয়।'

কেউ এল না। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। ক্ষেত আর রান্না ঘরের কাজ আমার দ্বারা আর হতো না। আমার কি আছে? আমি তো শেষ হয়ে গেছি' যার জন্যে এতো সয়েছি, তাকেই আজ নিতে এসেছি। ওকে খুঁজে জিজ্ঞাসা করবো, বল্, তুই বাড়ি কেন এলি না? ঘরদোর নষ্ট করলি। এখনও তুই চল্। আমার ছেলেপিলে নেই, নাই বা হলো। আমি তোর সঙ্গেই না হয় শেষের কদিন রইবো যে আগে যাবে' পরের জন যেন তার কবরে মাটি দেয়।"

সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি তার জীবনের উপর ভাগ্যের পরিহাসের কথা ভাবতে লাগলুম।

আমি প্রশ্ন করলুম, "ও ছোরা কার?" চোখ মুছে সে বললে, "আমার।"

আরও প্রশ্ন করলুম—'ও ছোরা দিয়ে কি হবে?" সে চুপ ক'রে গেল।

অল্পক্ষণ অপেক্ষা করার পর পীর হোসেন সহানুভূতির স্বরে সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে।

সে চটে জবাব দিল,—"সে আমার সারা জীবন নষ্ট করেছে। আমি তার জন্যে সবই করেছি। তার জন্যে আমি বাঁজা হয়েছি। এখন যদি সে আমার সঙ্গে না যায়, ওকে আমি মেরে ফেলব।"

শুনে আমি কেঁপে উঠলুম। কিন্তু রাগ বা ঘৃণা তার উপর আমার হলো না। পুলিস স্টেশনে বসে যে লোক খুন করার অভিপ্রায় প্রকট করে......।

পীর হোসেন সে ছোরা নিয়ে সিন্ধুকে বন্ধ করে রাখল।

ফজ্জার খোঁজ শুরু হলো। শহরের দশ-নম্বরী বদ্‌মাশদের হাজিরা-কিতাব দেখলুম। সেখানে অনেক ফজ্জা অনেক রূপে উপস্থিত। ফজ্জা, ফৈজু, ফজলু, ফজলে খাঁ। এর মধ্যে রফিয়ার ফজ্জা কে? তাই জানবার জন্যে ওর কাছে তার স্বামীর হুলিয়া জিজ্ঞাসা করলুম। সে বললে, "দেখতে খুব সুন্দর। জোয়ান, হৃষ্টপুষ্ট। মুখে দাড়ি গোঁফ। ডান নাকের উপর এক জখমের চিহ্ন।" রেজিস্টারে পাওয়া গেল, ডান নাকের উপর আঘাত চিহ্ন—সে ছিল হীরামণ্ডীর ফজ্জা। খোঁজ নিয়ে আরও জানা গেল, সে জামিন না দিতে পারার জন্য ১০৫ দফায় লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে সাজা ভোগ করছে। সে কথা রফিয়াকে বলার মতো নয়। শাহু-সাহেবের সঙ্গে দেখা করে' তাঁকে দিয়ে সুপারিশ করে, মিঞা ইয়াকুব হোসেনের কাছ থেকে ফজ্জার মুচলেকা দাখিল করিয়ে দিলুম। ফজ্জাকে আলাদা ডেকে নিয়ে শাসিয়ে ভয় দেখিয়ে বললুম, সে যেন সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরে গিয়ে থাকে। যখন ওকে এনে রফিয়ার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলুম' ওরা দু'জনে দু'জনকে চিনতে পারল না।

সম্ভবতঃ রফিয়া ভাবছিল তেইশ-চব্বিশ বছরের মোটাসোটা জোয়ান ফজ্জার কথা। পীর হোসেন যখন দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিল, কতক্ষণ পর্যন্ত রফিয়া বজ্রাহতের মতো দাঁত দিয়ে আঙুল কামড়ে ফজ্জার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল—মুখ দিয়ে তার কথা বের হলো না।

ফজ্জার শাদা চুল, বলিরেখায় ভরা স্তিমিত চোখ আর ফোগ্‌লা মুখ দেখে সে মেনে নিতে পারল না যে ওই ওর ফজ্জা যার জন্যে সে সারাজীবন তপস্যা করেছে।

গাঢ় নিশ্বাস ফেলে, একটি কথাও না বলে মাথা নেড়ে সে একপাশে সরে গেল। তারপর চাদরে মুখ ঢেকে, অনেকক্ষণ ধরে সে কাঁদল।

কারুর ওকে কিছু বলবার সাহস হলো না। সন্ধ্যের সময় পীর হোসেন ওকে বোঝালে, ফজ্জাকে নিয়ে সে যেন দেশে ফিরে যায়।

ওর চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসছিল। সে চেঁচিয়ে বললে,—"এই ধোঁকা-বাজ, দাগাবাজ, বদমাশ আমাকে মাটি করে দিয়েছে। আমি ওর মুখ দেখব না।"

তারপর ওয়েস্টকোট্‌টা সেখানে ফেলে রেখে নিজের চাদর তুলে নিয়ে স্টেশনের দিকে সে চলে গেল।

কিছু করার অবকাশ তখন ছিল না। শুধু মনে হয়েছিল—এ হ'লো তিরিশ বছরের ভালবাসার সাধনার ফল।

অনুবাদক ঃ শক্তি দাশগুপ্ত



খেলাধূলা

ফুটবল

কলিকাতার মাঠে নিয়মিতভাবে ফুটবল খেলাইবার মত সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয় নাই সত্য, তবে পূর্বাপেক্ষা অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। দাঙ্গা হাঙ্গামা, খুন, জখম প্রভৃতি জঘন্য অপ্রীতিকর ঘটনাবলীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় খুবই কম। এই সকল ঘটনা আর যে বৃদ্ধি পাইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। যে রাজনৈতিক কারণের জন্য এই সকল ঘটনার উৎপত্তি তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণ সাহস করিয়া যদি নিয়মিত খেলাইবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে কোন নূতন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা নাই। বরঞ্চ দেখা যাইবে খেলাধূলা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইলে সাধারণের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। গুপ্তঘাতক কোথায় লুকাইয়া আছে, কখন যে সে আবির্ভূত হইবে এই অহেতুক ভীতি সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণেরও মন হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত হইবে।

বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণ শীঘ্রই নিয়মিতভাবে ফুটবল খেলার প্রচলনের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে মিলিত হইবেন বলিয়া শোনা গেল। আমরা আশা করি এই সভার অনুষ্ঠানের পক্ষে সকলেই ভোট দিবেন।

অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল দলের ভ্রমণ

অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল দলের ভারত ভ্রমণ ব্যবস্থা বাতিল করা হইয়াছে শুনিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। অস্ট্রেলিয়ার ফুটবল স্ট্যাণ্ডার্ড খুব উন্নত স্তরের নহে। সুতরাং সেই দেশের একটি দলকে ভারতে আনিয়া লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করা খুবই অন্যায় হইত। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সুবুদ্ধি হইয়াছে বলিতে হইবে।

চৈনিক ফুটবল দলের ভ্রমণ

হংকংয়ের সিংটাও ফুটবল দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী খেলায় যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের নিকট আবেদন করেন। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন বিভিন্ন প্রাদেশিক এসোসিয়েশনকে তাঁহাদের মতামত জানাইবার জন্য অনুরোধ করেন। আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যগণ ইহার উত্তরে কলিকাতায় জুলাই মাসের শেষে তিনটি খেলার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। সুতরাং জুলাই মাসে চৈনিক ফুটবল দল আসিতেছেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৯৩৬ সালে এইরূপ এক চৈনিক দলের সহিত কলিকাতার বিশিষ্ট দলসমূহ খেলিয়া বাঙলার সম্মান অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইবারেও বাঙলা সেইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবে বলিয়া ভরসা হয় না। ইহা সম্ভব হইতে পারে যদি বাঙলার পরিচালকগণ বিনা দ্বিধায় এখনই নিয়মিতভাবে কলিকাতার মাঠে যাহাতে ফুটবল খেলা হয় তাহার ব্যবস্থা করেন। ইহা তাঁহারা করিবেন?

মুষ্টিযুদ্ধ

বাঙলার মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালনার অধিকার লইয়া গত দীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন ও বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তীব্রভাবে দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। শোনা গেল সম্প্রতি নাকি উহার অবসান হইয়াছে। বাঙলার প্রথম মুষ্টিযুদ্ধ প্রবর্তক শ্রীযুত পি এন রায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ইহা সম্ভব করিয়াছেন। দুইটি প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সভ্যদের একত্র করিয়া বেঙ্গল এমেচার বক্সিং এসোসিয়েশন নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি শীঘ্রই বৃটিশ বক্সিং ফেডারেশন ও আন্তর্জাতিক বক্সিং এসোসিয়েশনের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবে। এমন কি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য হইতেই কয়েকজন লইয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের সহিত একত্র করিয়া নিখিল ভারত বক্সিং ফেডারেশন গঠন করা হইবে। এই ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় অফিসও কলিকাতায় স্থাপন করা হইবে। বাঙলা বর্তমানে মুষ্টিযুদ্ধ বিষয়ে ভারতের যে কোন প্রদেশ অপেক্ষা ভাল। সুতরাং ভারতীয় মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালনার বাঙলার আধিপত্য করিবার অধিকার আছে। এই অধিকার দিবার যে ব্যবস্থা হইতেছে ইহা খুবই আনন্দের বিষয়।

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় মুষ্টিযুদ্ধ দল প্রেরণ উপলক্ষে যে ট্রায়াল মুষ্টিযুদ্ধ হইবে তাহা বোম্বাইতে হইবে বলিয়াই স্থির হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে বাঙলা ও পাঞ্জাবের দল যোগদান করিবে। বাঙলা হইতে শক্তিশালী দল প্রেরণের প্রচেষ্টা হইতেছে। ২৯শে জুন ও ১লা জুলাই এই দুই দিন ট্রায়াল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ ট্রায়াল অনুষ্ঠানে বাঙলার যে সকল মুষ্টিযোদ্ধা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন তাঁহাদিগকেই বাঙলার প্রতিনিধি মনোনীত করা হইবে। উৎসাহী বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণ যাহাতে অধিকাংশ বিভাগে স্থান দখল করিতে পারেন তাহার জন্য নিয়মিতভাবে অনুশীলন করিতেছেন। বাঙলার দল অধিকাংশ বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধার দ্বারা গঠিত হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

সন্তরণ

বাঙলার সন্তরণ মরসুম শেষ হইতে চলিয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় বাঙলার সন্তরণ বিভাগের পরিচালকগণ এখনও পর্যন্ত নীরব। নিখিল ভারত সন্তরণ অনুষ্ঠানের কথা প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও পরিচালকগণের মধ্যে কোনরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় নাই। ইহারা সত্যই অদ্ভুত। ইহাদের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বাঙলার সাঁতারুগণও পর্যন্ত কোন আন্দোলন কেন যে আরম্ভ করিতেছেন না বুঝা ভার। সাঁতারুগণও কি বাঙলার সম্মান অক্ষুন্ন রাখিতে চাহেন না?

জাতীয় খেলাধূলা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘ শীঘ্রই বাঙলার গৌরব বৃদ্ধিকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কি জাতীয় খেলাধূলায় কি সমাজ সেবায়, কি স্বেচ্ছাসেবক গঠনে, কি গ্রাম সংগঠনে ইহাদের কর্মব্যবস্থা অভিনব ও কার্যকরী। জাতীয় জীবনকে সুপরিচালিত করিতে হইলে জাতির প্রত্যেককে যে যে বিষয় ও যে যে গুণের অধিকারী হওয়া অবশ্য কর্তব্য জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের পরিচালকগণ সেই সেই বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়া কর্মতালিকা প্রস্তুত করেন তাহা তাঁহাদের কার্যকলাপ যাঁহাদের দেখিবার একবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারাই অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিবেন। আশ্চর্য হইতে হয় যে, এই প্রতিষ্ঠান কোন রাজনৈতিক দল বা সরকারের সাহায্যের প্রত্যাশা করে না। নিঃস্বার্থভাবে মন প্রাণ দিয়া কার্য করিলে কোন কিছুরই অভাব হয় না ইহাই এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দৃঢ় বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস আছে বলিয়াই জাতীয় উন্নতি সহায়ক সকল কার্যে ইঁহারা আগাইয়া চলিয়াছেন।

১৯৪০ সালে কয়েকটি একনিষ্ঠ কর্মী উপেক্ষিত জাতীয় খেলাধূলার প্রচার ও প্রসারের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া 'জাতীয় ক্রীড়া সঙ্ঘ' নাম দিয়া প্রথম প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। প্রথমে শহরে জাতীয় খেলাধূলার ব্যবস্থা করেন। সাড়া বিশেষ পান না। তখন গ্রামের দিকে ছুটেন। এই গ্রামের আয়োজন প্রচেষ্টাকে ফলবতী করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু গ্রামে বহু প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন গ্রাম ভ্রমণের ফলে গ্রামের অভাব অভিযোগ ইহাদের দৃষ্টিপথে পড়ে। তখন স্বেচ্ছাসেবক গঠন ও গ্রাম সংগঠনের দিকে দৃষ্টি দেন। চরম নিয়মানুবর্তী একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন। সামরিক আইন কানুনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্যে কোনরূপ আপত্তি করিতে দেখা যায় না। ইহার পরই নূতন ভাবে ব্যায়াম শিক্ষা শিবির প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণ ব্যায়াম, খেলাধূলা, ড্রিল, কুচকাওয়াজ; সামরিক আদব কায়দা, সংগঠন, ব্রতচারী; প্রাথমিক প্রতিবিধান, আত্মরক্ষার কৌশল প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। দলে দলে যুবক দল এই সকল শিক্ষা শিবিরে যোগদান করে। এক স্থানে সকলকে জমায়েৎ করা সম্ভব নহে দেখিয়া এক এক জেলার জন্য এক একটি শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করেন। সকল জেলা হইতে আহ্বান আসিতে থাকে। কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া; হুগলী; বর্ধমান; বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ইঁহারা শিক্ষা শিবির প্রতিষ্ঠা করিয়া অভাবনীয় সাড়া পান। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত কয়েক সহস্র ক্লাব ও সঙ্ঘ যোগদান করিয়াছে। ইতিপূর্বে বাঙলার কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত এতগুলি গ্রাম বা শহরের বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপন করিতে দেখা যায় নাই। ইহাদের কর্মক্ষেত্র যেরূপ বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে সর্বসাধারণের সর্বপ্রকার সাহায্য ব্যতিরেকে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। বাঙলার অধিবাসিগণ এই বিষয়ে কার্পণ্য প্রদর্শন করিবেন বলিয়া মনে হয় না।

দেশী সংবাদ

১৬ই জুন—মহাত্মা গান্ধী নয়াদিল্লীতে তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলেন যে, পাকিস্থান প্রদেশগুলিতে যাহাই ঘটুক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের পরিচয় দিতে হইবে।

পাঞ্জাবের গুরগাঁও জেলার এক গ্রামে পুনরায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়ায় তিনজন মহিলাসহ ৩০ জন নিহত, দুইশতাধিক আহত এবং প্রায় দেড়শত গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে।

বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণার ফলে যদি প্রদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে শাসনপরিচালন ব্যাপারে যে সকল প্রশ্নের উদ্ভব হইতে পারে, তৎসম্পর্কে আলোচনা চালাইবার জন্য অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের দুইজন কংগ্রেসী ও দুইজন লীগ সদস্য লইয়া একটি স্পেশ্যাল কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

১৭ই জুন—জলপাইগুড়ি—শিলিগুড়ি সাধারণ পল্লী নির্বাচন কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর রায় (কংগ্রেস) বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হইয়াছেন। বঙ্গ বিভাগের প্রশ্নে কংগ্রেস এই নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন।

বড়লাটের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য ও শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞ ডাঃ বি আর আম্বেদকর কতিপয় দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণার বিরোধিতা করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। ডাঃ আম্বেদকর বলিয়াছেন যে, সার্বভৌমত্বের হাত হইতে দেশীয় রাজ্যগুলির মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হইল, সমস্ত সার্বভৌম ক্ষমতাকে একত্রিত করা এবং এক একটি ইউনিট হিসাবে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হইবে।

নয়াদিল্লীতে মহাত্মা গান্ধী, মিঃ জিন্না ও বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন প্রায় এক ঘণ্টাকাল একত্রে আলোচনা করেন। সীমান্ত প্রদেশে গণভোট গ্রহণ সম্পর্কে এই আলোচনা চলে।

মহীশূরের দেওয়ান স্যার রামস্বামী মুদালিয়র ঘোষণা করেন যে, মহীশূর রাজ্য গণপরিষদে যোগদান করিবে।

বঙ্গীয় সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মাথা পিছু ২ সের ১০ ছটাক সাপ্তাহিক রেশন হইতে দৈনিক ১ ছটাক হিসাবে ৭ ছটাক রেশন কমাইয়া আগামী ৩০শে জুন হইতে মাথাপিছু ২ সের ৩ ছটাক রেশন দেওয়া হইবে।

হায়দরাবাদে হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্টকে ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্ত হইবার জন্য আবেদন জানান হইয়াছে।

১৮ই জুন—বর্ধমানের এক সংবাদে প্রকাশ, বাঙলা গভর্নমেণ্টের শস্য সংগ্রহ বিভাগ বর্ধমান হইতে চাউল সংগ্রহ করিয়া পূর্ব বাঙলায় প্রেরণ করিতেছেন। গত ১৪ই জুন পর্যন্ত বর্ধমান জেলা হইতে ২৪,৭৫,৫৫২ মণ ধান সংগ্রহ করা হইয়াছে। উহা জেলার মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী।

সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর স্যার ওলাফ ক্যারো দুই মাসের ছুটি, (ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত) লইয়াছেন। এই ছুটির জন্য তিনি নিজেই অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। লেঃ জেনারেল স্যার রব লকহার্ট এ সময় গভর্নরের কাজ চালাইবেন।

কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে

সাপ্তাহিক সংবাদ

ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং যশোহরের অধিবাসিবৃন্দের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয় এবং উহাতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া এইরূপ দাবী করা হয় যে, গোপালগঞ্জ মহকুমা এবং উপরোক্ত জেলাগুলির অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংযুক্ত এলাকাগুলি পশ্চিম বঙ্গের নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হউক।

কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের জনৈক সরকারী মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা বর্তমানে যে খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হইতেছি গত তিন বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে এত বড় সংকট আর দেখা দেয় নাই। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই সংকট চলিবে বলিয়া আশংকা করা যাইতেছে। সেই সময়ের মধ্যে সাগরপারের কোনও দেশে গম মাড়া শেষ হইবে এবং বিদেশ হইতে খাদ্যশস্যপূর্ণ

[illegible] আগ করিবে।

সীমান্ত প্রদেশের সমস্যা সম্পর্কে আলো-চনার জন্য মহাত্মা গান্ধী, মিঃ জিন্না এবং খা আবদুল গফুর খান নয়াদিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হন।

বি এ রেলওয়ের লোকো শ্রমিকদের অকস্মা ধর্মঘটের ফলে শিয়ালদহ হইতে ও শিয়ালদহগাম ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ে। ড্রাইভার ফায়ারম্যানসহ প্রায় ৫শত শ্রমিক ধর্মঘট করে।

১৯শে জুন—বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রী সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত কালীপদ মুখার্জি পূ কলিকাতা সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয় ঘোষিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ১৬ জন সদস্য লইয় কেন্দ্রীয় সীমা নির্ধারণ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিয়াছেন। শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঐ কমিটির সভাপতি।

নয়াদিল্লীতে প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ভাষণে বলেন যে, পাঠানীস্থান নামে

শ্বেত-গোলাপের
চেয়েও শুভ্র
বাথগেটের
টুথ-পেষ্ট
আপনার দাঁত মজবুত ও ধবধবে শাদা রাখতে হলে বাথগেটের টুথপেষ্ট ব্যবহার করুন। এর নিয়মিত ব্যবহার মাড়ী শক্ত করবে এবং দাঁত অক্ষত রাখবে। খুব অল্পতেই কাজ চলে।
আজ থেকেই এই মাজন ব্যবহার করুন।
BATHGATE'S TOOTH PASTE
Bathgate & Co. Ltd.
CALCUTTA BOMBAY LONDON

স্বাধীন সীমান্ত রাষ্ট্র গঠনের জোরালো আন্দোলন চলিতেছে। পাঠানদের জীবন ও সংস্কৃতি রক্ষাই যদি আন্দোলনের অর্থ হয় (তিনিও তাহা মনে করেন), তাহা হইলে এই আন্দোলনে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

২০শে জন—বংগীয় ব্যবস্থা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অধিবেশনে পরিষদের হিন্দু প্রধান অঞ্চলের সদস্যগণ কর্তৃক ৫৮—২১ ভোটে নব বংগ প্রদেশ গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ৩রা জুনের পরিকল্পনা অনুযায়ী এইদিন পরিষদের মুসলমান প্রধান অঞ্চলসমূহ এবং অ-মুসলমান প্রধান অঞ্চল-সমূহের সদস্যগণ দুই অংশে সভানুষ্ঠান করেন এবং উহারই একটি সভায় নব জাতীয় বংগ গঠনের সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত করা হয়। প্রথম দিকে কংগ্রেস পক্ষের দাবীতে উভয় অংশের সদস্যগণের এক যুক্ত অধিবেশন হয় এবং উহাতে মুসলিম লীগ দল ভোটাধিক্যের জোরে বাঙলা অবিভক্ত থাকিলে উহা সমগ্রভাবে প্রস্তাবিত পাকিস্থান গণপরিষদে যোগদান করিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করাইয়া লয়। উহার পর হিন্দু প্রধান অঞ্চলের সদস্যগণের সভা বংগ বিভাগের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় আরও সিদ্ধান্ত করা হয় যে, এই অংশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নিমিত্ত তাঁহারা সকলে ভারতীয় গণপরিষদে যোগদান করিবেন। মুসলমান প্রধান অঞ্চলের সদস্যগণের সভায় অপর পক্ষে ১০৬—৩৫ ভোটে বংগ ভংগের প্রস্তাব বাতিল করা হয়। তৎপর উক্ত সভা ১০৭—৩৪ ভোটে পূর্ব বংগ প্রদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত পাকিস্থান গণপরিষদে যোগদান করিবার সিদ্ধান্ত করেন।

২১শে জন—সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, বংগীয় ব্যবস্থা পরিষদ হইতে যাঁহারা গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন, আজ হইতে তাঁহারা আর গণপরিষদের সদস্য থাকিতে পারিবেন না। বর্তমান ও প্রস্তাবিত গণপরিষদের জন্য নূতন করিয়া বাঙলায় সদস্য নির্বাচন হইবে।

হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলির সদস্যগণ আগামী ৪ঠা জুলাই একত্র সম্মিলিত হইয়া বর্তমান ভারতীয় ইউনিয়নের গণপরিষদে তাঁহাদের প্রতিনিধি (মোট ১৯ জন; তন্মধ্যে অ-মুসলমান ১৫ জন, মুসলমান ৪ জন) নির্বাচন করিবেন। আর মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলির সদস্যগণ আগামী ৫ই জুলাই প্রস্তাবিত পাকিস্থান গণপরিষদে তাঁহাদের প্রতিনিধি (মোট ৪১ জন, তন্মধ্যে মুসলমান ২৯ জন, অ-মুসলমান ১২ জন) নির্বাচন করিবেন।

২২শে জন—কলিকাতায় কুমার সিং হলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের বংগীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণের এক সভায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নব-বঙ্গ প্রদেশের কংগ্রেস এসেম্বলী পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে হইয়াছে। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট আচার্য কৃপালনী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

লাহোরের সাম্প্রদায়িক দাংগাহাংগামার অবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। গতকল্য সারারাত্রি সমগ্র সহরের চতুর্দিকে ভয়াবহ অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে দেখা যায়। সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর লোকেরা সান্ধ্য আইন ভঙ্গকারীদের প্রতি একশত রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে।

কলিকাতায় দাংগাহাংগামা জনিত বিভিন্ন ঘটনায় ৪ জন নিহত ও ১৩ জন আহত হয়। এই হিসাব সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই জুন—ব্রহ্ম গণপরিষদ উ আউং সান কর্তৃক উত্থাপিত স্বাধীনতার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯শে জুন—সিরিয়ায় প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজের ইকলিয়াস নামক বিমানপোত এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে। ফলে ১৪ জন লোক নিহত ও ১০ জন আহত হইয়াছে।

২১শে জুন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাণের জন্য আড়াই কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। এই ঋণ সম্পর্কে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।



এদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে

সন্তানই পরিবারের আশা এবং জাতির মেরুদণ্ড। তাহাদের সকল রকম অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা পিতামাতার অবশ্য কর্তব্য। যৌনব্যাধিগ্রস্ত পিতামাতার দ্বারা সন্তানের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে, কারণ যৌনব্যাধি পিতামাতার শরীর থেকে সন্তানে সংক্রামিত হতে পারে এবং তাদের জীবন দুঃসহ করে তোলে।

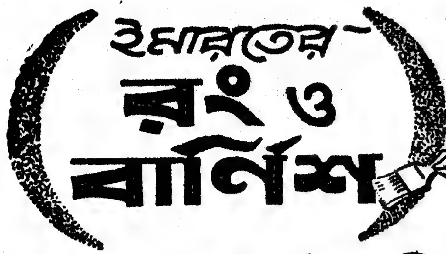
সিফিলিস—গর্ভাবস্থায় সিফিলিস কর্তৃক আক্রান্তা মাতার ব্যাধি সন্তানে সংক্রামিত হতে পারে। গর্ভাবস্থায় মাতা যদি উপযুক্ত চিকিৎসা না করান তাহলে বিপজ্জনক গর্ভপাত হতে পারে। এমনকি পূর্ণ গর্ভাবস্থার পরও প্রসবের সময় মৃত, ক্ষীণজীবী, ব্যাধিগ্রস্ত অথবা বিকলাংগ সন্তান জন্মাতে পারে। কখনও কখনও সিফিলিস-আক্রান্ত সন্তানকে ভূমিষ্ট হবার সময়ে এবং পরেও বহুদিন স্বাস্থ্যবান বলে মনে হয়, কিন্তু তার রক্তে ঐ ব্যাধি থাকায় যে কোনও সময় রোগ দেখা দিতে পারে। পিতামাতা কর্তৃক সংক্রামিত সিফিলিস সন্তানের বহু শারীরিক ও মানসিক রোগের কারণ।

গণোরিয়া—গণোরিয়া পুরুষ ও নারী উভয়েরই বন্ধ্যাত্বের কারণ হয়ে থাকে। গণোরিয়া-আক্রান্তা নারী যদি গর্ভবতী হন, তবে প্রসবকালে সন্তানের চোখে এই রোগ সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। এর থেকে জটিল চোখের দোষ দেখা দেয়, এমনকি সন্তান অন্ধ হয়ে যেতে পারে। মাতা কর্তৃক সংক্রামিত গণোরিয়া রোগই বহু শিশুর দৃষ্টিহীনতার কারণ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা দ্বারা যৌনব্যাধি থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ আরোগ্য লাভ করা যায়। সিফিলিস বা গণোরিয়া দ্বারা আক্রান্ত নরনারীর পক্ষে এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হয়ে বিবাহ করা বা সন্তান জন্ম দেওয়া পাপ।

যৌনব্যাধি থেকে দূরে থাকুন

কলিকাতার সমস্ত বিশিষ্ট হাসপাতালে এবং কুমিল্লা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, দার্জিলিং, শ্রীরামপুর (হুগলী) ও কাঁকিনাড়া (২৪ পরগণা)। গবর্ণমেণ্ট হাসপাতালে বিনামূল্যে ও গোপন ব্যবস্থাধীনে যৌনব্যাধির চিকিৎসা করা হয়।





মার্কেন্টাইল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মিসেলেনী
৫৭, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা



আপনার
স্বাস্থ্য-
সংবাদ

রক্ত দূষিত হইলে, দু'দিন আগেই হউক বা পাছেই হউক আপনার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবেই, ফলে আপনার চেহারা বিশ্রী হ'য়ে উঠবে, মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে, জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন না।



যখনই রক্ত দূষিত হওয়ার এই সমস্ত রোগ যথা—বাত, আড়ষ্ট ও বেদনাযুক্ত গ্রন্থি, বিখাউজ, ফোঁড়া, ঘা ইত্যাদি জাতীয় রোগ দেখা দিবে, তখনই এই বিখ্যাত মহৌষধটির একটি পুরা কোর্স সেবন করতে ভুলবেন না।



সমস্ত ঔষধালয়েই ট্যাবলেট বা তরল আকারে পাওয়া যায়।



সিরোলিন
'রচি'
সর্দ্দি এবং কাসির জন্য



প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত
কয়েকখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাস

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

ভ্রষ্টলগ্ন অনাগত

বিদ্যুৎলেখা লোকারণ্য

শ্রীগৌরাঙ্গ (জীবনী)

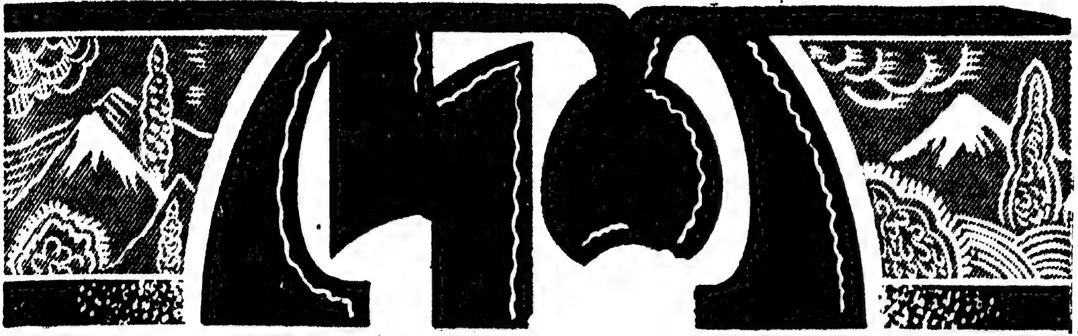
কলিকাতার সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

চক্ষুছানি

"আই-কিওর" (রেজিঃ) চক্ষুছানি এবং সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়। নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩, টাকা, মাশুল ৸৹ আনা।

কমলা ওয়ার্কস (দ) পাঁচপোতা, বেঙ্গল।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।



সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ]   শনিবার, ১১ই মাঘ, ১৩৫৩ সাল   Saturday, 25th January, 1947.   [১২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

লীগ রাজনীতির স্বরূপ

নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চলের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গান্ধীজীর পরিভ্রমণ নিরূপিতভাবে চলিতেছে। গান্ধীজীর এই ভ্রমনের ফলে ঐ অঞ্চলের হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির ভাব উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু লীগ রাজনীতির প্রভাবে সংস্কারান্ধচিত্তে এখনও নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। বলা বাহুল্য সাম্প্রদায়িক মনোভাবই ইহার মূল কারণ। মহাত্মাজী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য লীগ নেতা মিঃ জিন্নার নিকট না গিয়া কি জন্য নোয়াখালির সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারস্থ হইয়াছেন, এমন প্রশ্ন পূর্বেও শুনিয়াছি এবং এখনও শোনা যাইতেছে। গত ১৯শে জানুয়ারী বদলকোটে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, অনুগামীরাই নেতাকে গড়িয়া তোলে; ফলত নেতৃগণ জনগণের মূক আশা আকাঙ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়াই সহানুভূতির সূত্রে তাহাদিগকে পরিচালনা করিয়া থাকেন। মহাত্মাজীর এই উক্তির সহজ তাৎপর্য এই যে, নিজেদের পারস্পরিক স্বার্থ সম্বন্ধে গান্ধীজী যদি মুসলমান জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে মিঃ জিন্নার সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষ নিষ্পত্তির পথ সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত হইবে। এই সত্যটি শ্রোতৃবৃন্দকে গভীরভাবে উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্যেই গান্ধীজী বলেন, "তিনি এই কথাই বলিতে চাহেন যে, দৈনন্দিন জীবনধারণ সমস্যার সমাধানকল্পে তাহারা যেন মুসলিম যদি এরূপ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা নেতাদের চিত্তেও প্রতিভাত হইবে। বিশেষ করিয়া রাজনীতিক সমস্যাগুলির সমাধানের কাজই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সম্বন্ধে এগুলির সম্পর্ক অতি সামান্য। যদি প্রতিবেশী পীড়িত হইয়া পড়ে, তবে কি ইতিকর্তব্য নির্ধারণের জন্য কংগ্রেস অথবা লীগের নিকট দৌড়াইতে হইবে?" বলা বাহুল্য মহাত্মাজী যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন রাজনীতি যেখানে সমষ্টি জীবনের স্বার্থকে দলিত করিয়া চলিতে উদ্যত হয়, তথায়ই এই প্রশ্ন বিশেষভাবে দেখা দেয়। লীগের সাম্প্রদায়িক স্বার্থমূলক নীতি এই অনিষ্টকর পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছে এবং তাহার ফলে সমাজ-জীবনে নানারূপ অনর্থ এবং অসঙ্গতি দেখা দিয়াছে। এ দেশের সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগের নেতারা মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার নামে যে পথ ধরিয়া চলিতেছেন, তাহার মূলীভূত বিদ্বেষের ফলে শুধু অপর সম্প্রদায়েরই অনিষ্ট ঘটিতেছে না, মুসলমান সম্প্রদায়ও চারিদিক হইতে বিপন্ন হইতে বসিয়াছে। তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক বনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মুসলিম লীগের নেতারা দরদ সে খেলার ফলভোগ করিতেছে দরিদ্রেরা। গান্ধীজী প্রেম এবং সেবার পথে গণ-দেবতাকে জাগ্রত করিয়া লীগনেতাদিগকে এই নিষ্ঠুর খেলা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহেন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর এই সাধনা লীগনেতাদের মনঃপূত হইবে না; কিন্তু সেজন্য লীগ-নীতিই দায়ী। গান্ধীজী সেজন্য দায়ী নহেন; কারণ মানব-কল্যাণই তাঁহার লক্ষ্য। সকল মানুষের প্রতি সমান সেবা এবং প্রেমের ভাব লইয়া নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সাধনা চলিতেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে গান্ধীজীর এই সাধনার কোন অসঙ্গতি ঘটিতেছে না, অথচ লীগওয়ালারা কেহ কেহ লীগ-নীতির সহিত ইহার অসঙ্গতির পরিচয়ে আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। ইহার সহজ অর্থ এই যে, লীগ জাতির স্বার্থ বোঝে না এবং সমষ্টির বেদনাকেও বড় বলিয়া স্বীকার করে না। মুসলিম জনসাধারণের নিকট লীগ-নীতির এই অনিষ্টকারিতা যতদিন পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উন্মুক্ত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত এ সমস্যার স্থায়ীভাবে সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত, দৈনন্দিন জীবনে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সহিত সদ্ভাব ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা মুসলমান জনসাধারণের মনে প্রণোদিত করাই বর্তমানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। গান্ধীজী অবশ্য সাক্ষাৎ সম্পর্কে লীগ-নীতির সংশোধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতেছেন না, লীগের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকুক তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই, শুধু পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতির ভাবটি নিজেদের নীতির অঙ্গীভূত করিয়া

শান্তির সর্ত—

সম্প্রতি নোয়াখালির প্রভাবসম্পন্ন মুসলমান নেতাদের কেহ কেহ গান্ধীজীকে জানাইয়াছেন যে, গোলাম সারোয়ারকে মুক্তি দিলেই কেবল তাঁহার শান্তি প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে। গোলাম সারোয়ারকে মুক্তি না দিলে নোয়াখালিতে কিছুতেই শান্তি ফিরিয়া আসিবে না, ইহাই সেখানকার বিশিষ্ট লীগ নেতাদের সোজা কথা। সাহাপুরের এই পীরের পরিচয় আজ অনাবশ্যক। নোয়াখালির ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ডের সঙ্গে গোলাম সারোয়ারের নাম জড়িত হইয়া রহিয়াছে। নোয়াখালির লীগওয়ালাদের উক্ত দাবী হইতে দেখা যাইতেছে; অভিযোগ যতই গুরুতর হউক না কেন, ঐ অঞ্চলের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচারের ন্যায়-বিচার তাঁহারা চাহেন না; প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের গুণে অত্যাচারীদের যত দোষ, লীগওয়ালাদের কাছে গুণস্বরূপে পরিণত হইয়াছে। বস্তুত এই মনোভাবকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা নোয়াখালিতে পুলিশ ও মিলিটারীর অত্যাচারের আর্তনাদ উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু শুধু নোয়াখালিতেই এই আন্দোলন আবদ্ধ রাখা হয় নাই; সম্প্রতি কলিকাতাতেও ইহাকে সম্প্রসারিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং মুসলিম ছাত্রসমাজকে উত্তেজিত করিয়া ইহাকে ব্যাপক আকার দান করিবার আয়োজন হইতেছে। স্বয়ং মৌলানা আক্রাম খাঁ এই আর্তনাদে যোগ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সব প্রচারকার্যের মূলে কোন সত্য নাই। নোয়াখালিতে কিংবা ত্রিপুরার কোন স্থানে মুসলমানদের উপর কোনরূপ অত্যাচার তো হয়ই নাই; অধিকন্তু হইতেও পারে না; পক্ষান্তরে যাহারা অপরাধী, তাহারা সকলে এখন পর্যন্ত ধৃত হয় নাই। অপহৃতা নারীদের উদ্ধার সাধন এখনও সম্ভব হয় নাই এবং যেসব নারী নিগৃহীতা হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি অত্যাচারকারী নরপশুরা এখনও সমুচিত দণ্ড লাভ করে নাই। ইহা ছাড়া, লুণ্ঠিত এবং অপহৃত দ্রব্যাদি নিজেদের গৃহে লুক্কায়িত রাখিতে এখনও দুর্বৃত্তেরা সাহসী হইতেছে। মহাত্মা গান্ধীর মুসলমান শিষ্যা শ্রীযুক্তা আমতুস সালামের সুদীর্ঘ অনশনব্রত দৌরাত্ম্যের এই অধ্যায়কে মর্মান্তিকভাবে উন্মুক্ত করিয়াছে। গান্ধীজী সম্প্রতি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, "যদি কোন লোক তাহার প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তাহা হইলে সেজন্য তাহার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। সন্দেহ আছে। প্রকৃতপক্ষে নোয়াখালির দৌরাত্ম্যের জন্য অনুতপ্ত হওয়া তাঁহারা আদৌ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন বলিয়া মনে হয় না। কৃত অপরাধের জন্য দণ্ডভোগ করিলে মানুষ আরও উন্নত হয়, ইহা তো অনেকটা আধ্যাত্মিক চেতনার উঁচু স্তরের কথা। ন্যায় এবং বিচারকে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত না করিলে নিজেদের সম্প্রদায়ের উপরও যে তাহার প্রতিক্রিয়া আসে এবং দুই দিন পরে নিজে-দিগকেই সেজন্যে দুর্ভোগে পড়িতে হয়,—দেখিতেছি, সমাজ-বিজ্ঞানের এই সাধারণ কথাটা পর্যন্ত লীগওয়ালারা অস্বীকার করিতেছেন এবং শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক কর্তব্য প্রতিপালনে গভর্ন-মেণ্টকে পরাঙ্মুখ করিবার জন্য ইঁহারা আবদার ধরিয়াছেন। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল যখন লীগ-নিষ্ঠ এবং পাকিস্থানপরায়ণ, তখন এমন সব আবদার নিতান্ত অসঙ্গত হইলেও প্রতিপালিত হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়; কিন্তু গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিক্রমার সাফল্য এই সব সাময়িক প্রতিবন্ধকতায় বা হুমকিতে ব্যাহত হইবে না; কারণ মানুষের মনস্তত্ত্বের মূল নীতি ধরিয়া তিনি অগ্রসর হইতেছেন এবং মানুষে ঘটনার আবর্তগতিতে পড়িয়া যতই বিভ্রান্ত হউক, একান্তভাবে সে যে পশু নহে, এ সত্য অস্বীকার করা চলে না।

স্বৈরাচারের নূতন অস্ত্র

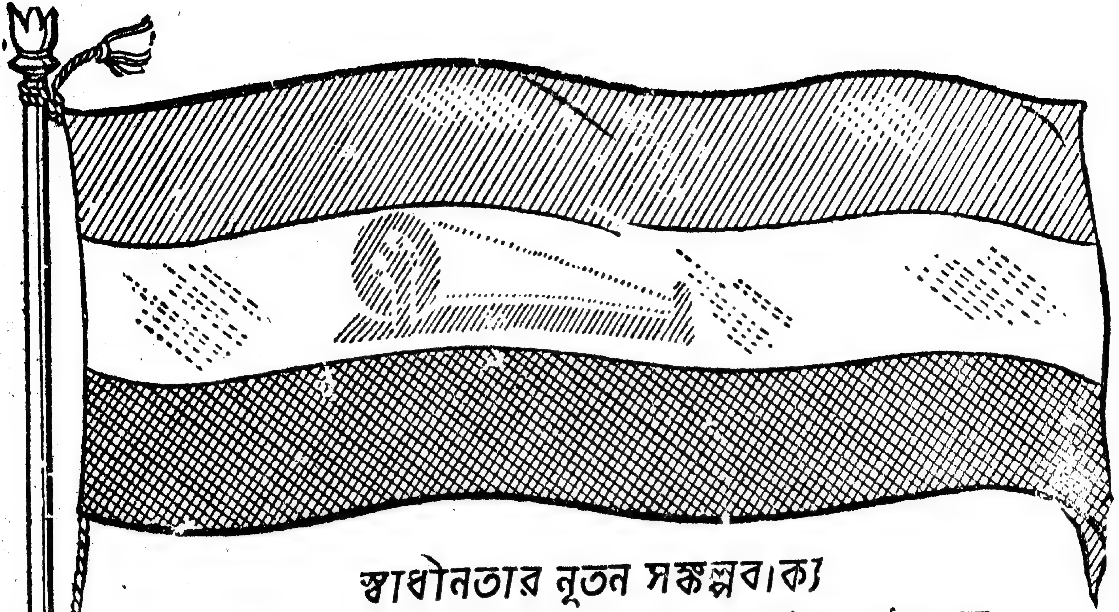
গত ১৮ই জানুয়ারী কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় বাঙলা দেশে দুইটি নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে। একটি অর্ডিন্যান্সে বিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে কলিকাতা, হাওড়া এবং ২৪ পরগণায় যেসব অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলির বিচার ত্বরান্বিত করিবার জন্য স্পেশাল বেঞ্চ গঠনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। অপর একটি অর্ডিন্যান্সে শাসকদিগকে লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ করিবার অবাধ অধিকার অর্পণ করা হইয়াছে। এই শেষোক্ত অর্ডিন্যান্স বলে বাঙলা সরকার যে কোন ব্যক্তিকে জনগণের নিরাপত্তা ও শান্তির বিঘ্ন উৎপাদনকারী বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহাকেই আটক করিতে, বাঙলার বাহির করিতে, অন্তরীণ রাখিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া প্রাদেশিক সরকার রাস্তায়, পার্কে অথবা অপর কোন খোলা জায়গায় এম্প্লিফায়ার প্রভৃতির ব্যবহার এবং আমরা উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি এবং এগুলির অপপ্রয়োগ ঘটিবে, এই সন্দেহই আমাদিগের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছে। এই সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রথমোক্ত অর্ডিন্যান্সটি শুধু কলিকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইবে; কিন্তু নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং দৌরাত্ম্য সংসাধিত হইলেও তৎসংশ্লিষ্ট অভিযোগসমূহের বিচার ত্বরান্বিত করিবার জন্য কর্তারা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। প্রধানত সম্প্রদায় বিশেষই ঐ অঞ্চলের অপরাধে সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়াই কি কর্তৃপক্ষ নোয়াখালির অশান্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট অপরাধের বিচার পৃথকভাবে দেখিয়াছেন? নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার বিচারের ভার সাধারণ আদালতের হাতেই রাখা হইয়াছে। শেষোক্ত অর্ডিন্যান্সটি আরও ভয়াবহ। সাম্প্রদায়িক অশান্তি হইতে নিরাপত্তার অজুহাতে এই অস্ত্র বাঙলার জাতীয়তাবাদকে দমন করিবার জন্য যে নিযুক্ত হইবে না, এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কিছুই নাই। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের মনে সেই আশঙ্কাই দৃঢ় হইতেছে। বলা বাহুল্য এই অর্ডিন্যান্সের বলে বাঙলা মুলুকে স্যার জন এণ্ডারসনের আমলের পুরা-দস্তুর পুলিশ রাজত্বই পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হইতেছে। অধ্যাপক অতুল সেন মহাশয় সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন জরুরী আইনের বলে ঢাকা হইতে দেড়শত জন কংগ্রেসকর্মীকে অন্যত্র অপসারিত করিবার চক্রান্ত চলিতেছে। ঢাকার কংগ্রেসকর্মী যুবকবৃন্দ সেখানকার শাসকদের চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছেন; ইহা আমরা জানি। কলিকাতার দাঙ্গার অভিজ্ঞতা হইতেও আমাদের জানা আছে যে, বিপন্ন রক্ষায় ব্রতী এই সব যুবকই পুলিশ প্রভুদের বিশেষ নজরে পড়িয়াছে এবং নিগৃহীত হইয়াছে। নূতন অর্ডিন্যান্স ক্ষমতার অপপ্রয়োগে এ দেশের স্বেচ্ছাচারী পুলিশকে সর্বাধিক শক্তি দিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বস্তুত দেশে শান্তি ও আইন রক্ষার প্রয়োজনে প্রচলিত সাধারণ আইনই যথেষ্ট এবং ইহা সুনিশ্চিত যে, গভর্নমেণ্টের হাতে আইনসঙ্গত অধিকার না থাকার জন্য সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে নাই; পক্ষান্তরে আইনসঙ্গত অধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগ না করার জন্যই যত অনর্থ ঘটিয়াছে। যাঁহাদের দ্বারা ক্ষমতা হাতে

লীগের ভবিষ্যৎ নীতি

গত ২০শে জানুয়ারী হইতে গণ-পরিষদের পুনরধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। লীগ এখনও যোগ দেয় নাই; পক্ষান্তরে লীগ নেতাগণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণে তাঁহাদের চিরন্তন নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি সম্প্রতি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা গণ-পরিষদে যাইবেন; কিন্তু মণ্ডলী গঠন সম্পর্কিত বিভাগে যোগদান করিবেন না। বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা আসাম কংগ্রেস কমিটি আসাম ব্যবস্থা-পরিষদে গৃহীত পূর্ব সিদ্ধান্তকেই দৃঢ় করিয়াছেন। লীগ নেতাগণ আসামের এই সিদ্ধান্তে একান্ত উত্তেজিত হইয়াছেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তের জন্য কংগ্রেসকে তো আক্রমণ করিতেছেনই, বিশেষভাবে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিও তাঁহাদের তীব্র আক্রমণ চলিতেছে। মহাত্মাজী আসামকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে পরামর্শ প্রদান করেন নাই, ইহাই তাঁহার গুরুতর অপরাধ। কংগ্রেসের অপরাধ এই যে, আসামকে সে কেন জোর করিয়া সেক্শনে বসাইতে বাধ্য করিতেছে না। কিন্তু একটু বিচার করিলেই লীগ-নেতাদের এই উত্তেজনার মূলীভূত অনর্থমূলক অভিসন্ধি ধরা পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস ৬ই ডিসেম্বরের বৃটিশ ভাষ্য সোজা-সুজি গ্রহণ করুক, ইহাই ছিল লীগের দাবী। কংগ্রেস তাহা করিয়াছে। কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি শাখা-প্রতিষ্ঠানকে বা ব্যক্তিকে ঐ ভাষ্য মানিয়া লইতে কংগ্রেসকে বাধ্য করিতে হইবে, এইরূপ কোন সর্ত লীগের দাবীতে ছিল না; বস্তুত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, লীগ বর্তমানে সংকটে পতিত হইয়াছে। তাহার প্রধান সংকট এই যে, কংগ্রেস ৬ই ডিসেম্বরের বৃটিশ ভাষ্য মানিয়া লইবার পরও লীগ যদি গণ-পরিষদে যোগদান না করে, তবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষেও লীগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়; দ্বিতীয় সংকট কংগ্রেস বৃটিশ ভাষ্য গ্রহণ করিবার পরও মণ্ডলীর কোন একটি প্রদেশ যদি লীগের সঙ্গে যোগ দিতে সম্মত না হয়, তবে পাকিস্থানী সমগ্র পরিকল্পনাই পণ্ড হয়। এই অবস্থায় লীগ যদি আসাম এবং অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপোষের মনোভাব লইয়া কাজ করিতে অগ্রসর হয়, তবেই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং লীগ গণ-পরিষদে যোগদান করে নাই; কিন্তু তাহার ফলে গণ-পরিষদ যে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, নয়, এমন কথা বলা চলে না। মুসলিম লীগের উপদেষ্টা স্বরূপে মিঃ চার্চিল এবং ভাইকাউণ্ট সাইমন পার্লামেণ্টে গণ-পরিষদকে একজন সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিষ্ঠান, অপর প্রভু হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন। গণ-পরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেদিন ইহাদের সে দুরভি-সন্ধিপূর্ণ উক্তির সমুচিত উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বস্তুত ইহা সুস্পষ্ট যে, ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সংকল্প যদি বৃটিশ গভর্নমেণ্টের আন্তরিক হয়, তবে তাঁহারা গণ-পরিষদের কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্তই সমর্থন করিবেন। পক্ষান্তরে গূঢ়ভাবে যদি তাঁহাদের অনারূপ অভিপ্রায়ই থাকে এবং এই অবস্থাতেও তাঁহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হন, তবে ভারতের সংগ্রামশীল সংহতি শক্তির সহিত তাঁহাদিগকে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি শুধু যে কংগ্রেসের অনুকূল হইবে, তাহাই নহে; পরন্তু মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া এশিয়ার সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত হইবে।

নৌ-বিদ্রোহ ও রাজনীতি

বিগত ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। সম্প্রতি অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে ভারতের বর্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "রাজনীতি এবং রাজনীতিক দলের প্রভাব এই বিদ্রোহের উপযুক্ত প্রতিবেশ সৃষ্টি করিতে এবং বিদ্রোহের বিস্তৃতিতে বিশেষভাবে কার্য করিয়াছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদিগকে যেভাবে গৌরবান্বিত করা হয়, তাহা ভারতীয় নৌ-সেনাদের মনে বিদ্রোহের ভাব যে প্ররোচিত করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" কমিশনের এই রিপোর্টে ভারত গভর্নমেণ্ট এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশের কল্যাণ সাধনে সেনাবিভাগের আগ্রহকে তাঁহারা উৎসাহিত করিবেন; কিন্তু নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিবার জন্য রাজনীতিক পন্থা অবলম্বন করাকে তাঁহারা সেনাবিভাগের স্বার্থের জন্য কোনক্রমেই প্রশ্রয় কারণ থাকিতে পারে না; কিন্তু সেনাদলে কোন ব্যক্তি যাহাতে উপদলীয় রাজনীতি যোগদান না করিতে পারেন, সেজন্য সেনানীদে উপর আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা দেখি সুখী হইলাম, ভারত গভর্নমেণ্ট নৌ-সেন বিভাগকে সম্পূর্ণ জাতীয় অর্থাৎ বিদেশ সেনাধ্যক্ষদের প্রভাব বিনির্মুক্ত করিয়া ক্রমে ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ এবং সেনানীদের দ্বার পরিচালিত হইবার পর্যায়ে আনিবার জ চেষ্টা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, কম্যাণ্ডা কিংয়ের মত উদ্ধত এবং হঠকারী ইংরে সেনানী এবং সেনাধ্যক্ষদের বৈষম্যমূল আচরণই বিগত বিদ্রোহের মূলে প্রধান কার্য করিয়াছিল এবং ঐসব শ্বেতাঙ্গ সেনান ও সেনাধ্যক্ষদের বেতন, ভাতা ও পদমর্যাদা তারতম্যই সেনাদের মনে অসন্তোষের কার সৃষ্টি করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদিগকে গৌরবান্বিত করার ফলে ভারতীয় নৌ-সেনাদে মনে জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগ্রত হ ইহা সত্য; কিন্তু ইহাকে নিন্দনী বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মর্যাদাবো না জাগ্রত হইলে কোন সেনাবিভাগ যোগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ হয় না। বস্তু জাগ্রত জাতীয় মর্যাদাবোধ সব দেশের সেনা দলেরই প্রধানতম গুণ বলিয়া বিবেচিত হই থাকে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাধনা ভারতে সেনাবাহিনীর মনে এই মর্যাদাবোধ জাগ্র করিয়া ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাসে সত্য যুগান্তর ঘটাইয়াছে এবং ভারতীয় সেনা বাহিনীকে প্রকৃতপক্ষে বিদেশীর ইঙ্গিতমাত্রে অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশীর স্বার্থে পরিচালিত বেতনভুক সৈনিকের অবস্থা হইতে উন্নীত করিয়া ভারতের রক্ষায় প্রবৃত্ত ভারতী বাহিনীতে পরিণত করিবার প্রেরণা দিয়াছে অন্তর্বর্তী সরকার তাঁহাদের মন্ত্র সেনাধ্যক্ষদের প্রতি এই নির্দে প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহারা যে নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা এব নিরাপত্তাকে বড় করিয়া না দেখিয়া সেনাদে কল্যাণের প্রতিই সর্বাগ্রে লক্ষ্য রাখেন এব কথার চালে সেনাদের … অভিযোগগুলি উড়াইয়া না দিয়া কার্যত সেগুলির প্রতিকা সাধন করেন। অতঃপর ভারতীয় নৌ-বিভাগে শ্বেতাঙ্গ সেনাধ্যক্ষ এবং সেনানীগণের সম্যক দৃষ্টি অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের এই নির্দে উন্মুক্ত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি ভারতীয় সেনাবাহিনী যে আর শ্বেতাঙ্গদে পদানত নয় এবং ভারতীয় জাতীয় মর্যাদা



স্বাধীনতার নূতন সঙ্কল্পবাক্য

"অন্যান্য জাতির ন্যায় ভারতীয় জনসাধারণেরও স্বাধীনতা অর্জনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস পোষণ করি; আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁহাদের নিজেদের শ্রমলব্ধ বিত্তের ফল-ভোগের এবং আত্মবিকাশের উপযোগী পূর্ণ সুযোগ লাভের জন্য জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহারেরও অধিকার আছে। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, যদি কোন গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাদের উপর উৎপীড়ন চালায় তাহা হইলে তাহাদের সেই গবর্ণমেণ্টের পরিবর্তন কিম্বা বিলোপসাধনের অধিকারও আছে। ভারতবর্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শুধু যে ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে তাহাই নয়, তাহারা জনসাধারণের শোষণের ভিত্তির উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক হইতে ধ্বংস করিয়াছে। অতএব আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষকে অবশ্যই ইংরাজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে।

আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে হিংস উপায়ই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ উপায় নহে। শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়াছে এবং স্বরাজ লাভের পথে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে এবং এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াই আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবে।

"আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি এবং পূর্ণ স্বরাজ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য আমরা যথারীতি সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছি।

"আমরা বিশ্বাস করি যে, সাধারণভাবে অহিংস কর্মতৎপরতা এবং বিশেষভাবে অহিংস উপায়ে সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলে দেশের সমক্ষে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক উত্থাপিত এবং কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত গঠনমূলক কর্মপন্থা—বিশেষ করিয়া খাদি, সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সংক্রান্ত গঠনমূলক কর্মসূচী সাফল্যের সহিত অনুসরণ করা প্রয়োজন। আমরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আমাদের দেশবাসিগণের মধ্যে শুভেচ্ছা প্রসারের জন্য প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ করিব। আমরা অবজ্ঞাত ব্যক্তিদের অজ্ঞতা এবং দারিদ্র্যমোচনের জন্য সচেষ্ট হইব এবং যাহারা অনগ্রসর এবং নির্যাতিত বলিয়া পরিগণিত, সর্বোপায়ে তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিব।

"আমরা জানি, যদিও আমরা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর, তথাপি সরকারী কিম্বা বে-সরকারী কোন ইংরাজের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। আমরা জানি যে, বর্ণহিন্দু এবং হরিজনদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, অবশ্যই তাহার বিলোপসাধন করিতে হইবে এবং প্রাত্যহিক আচরণে হিন্দুগণকে এই সমস্ত প্রভেদের কথা বিস্মৃত হইতে হইবে। এ জাতীয় পার্থক্যবোধ অহিংস আচরণের বিরোধী। আমাদের ধর্মীয় আচারবিধি একরূপ না হইতে পারে; কিন্তু পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা এক জাতীয়তাবোধ এবং এক রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ ভারতমাতার সন্তান হিসাবে এক-যোগে কাজ করিব।

"ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের পুনরুজ্জীবনের এবং জনসাধারণের চরম দারিদ্র্যমোচনের জন্য যে

ছাড়া গঠনমূলক কর্মপন্থার কোন কোন কর্মসূচী পালনের জন্যও আমরা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।

"বিগত সংগ্রামে আমাদের যে সহস্র সহস্র সহকর্মী কঠোর দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন এবং নিজেদের যথাসর্বস্ব ও জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি আমরা সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। লক্ষ্যস্থলে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করিব না—তাঁহাদের ত্যাগস্বীকার আমাদিগকে সর্বদাই এই কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।

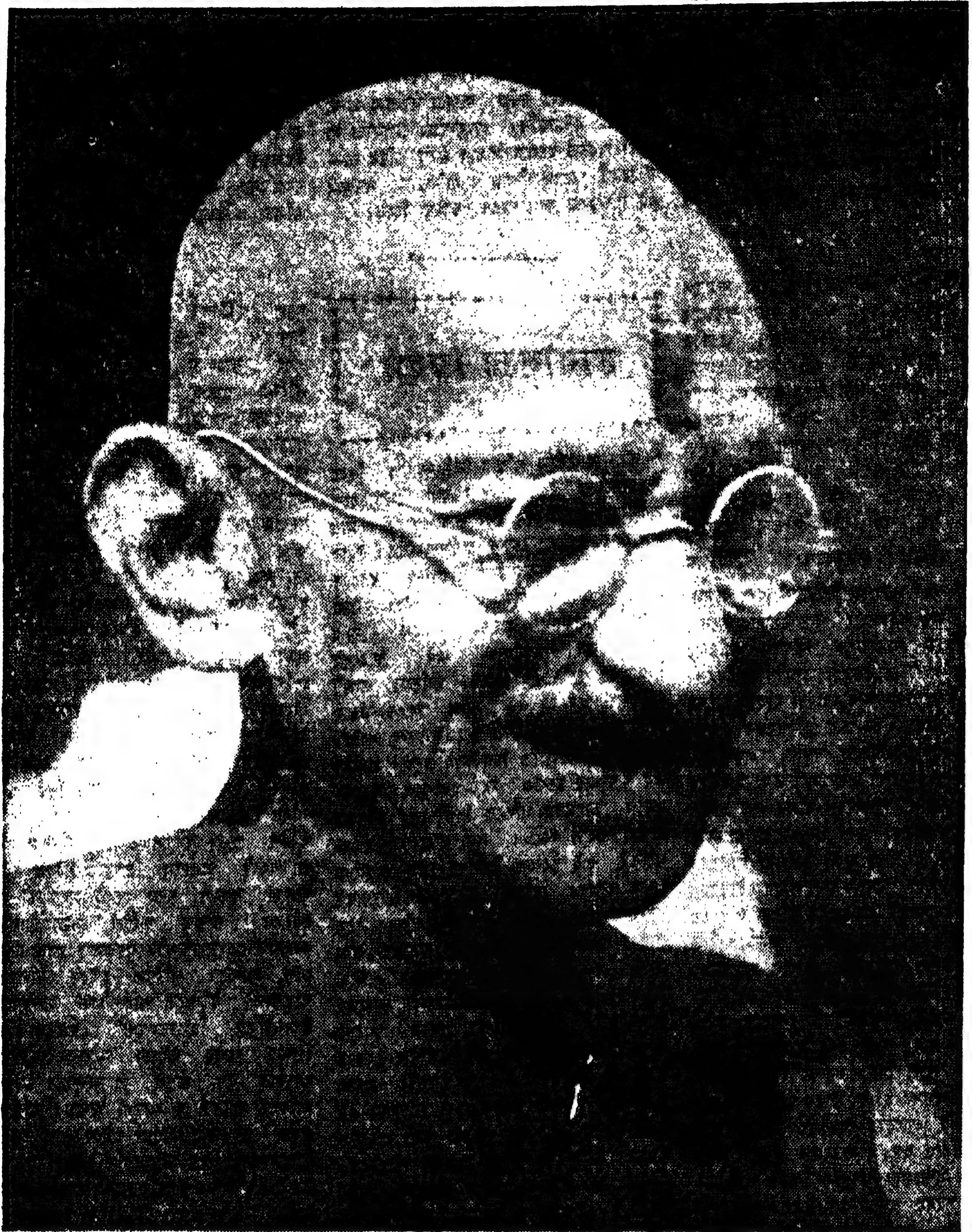
"এই দিবসে আমরা পুনরায় কংগ্রেসের মূলনীতি ও কার্যক্রম শৃঙ্খলা সহকারে পালনের এবং ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে কোন সময় আহ্বান আসামাত্র কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত থাকিব বলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইতেছি।"

স্বাধীনতা দিবস

আবার ২৬শে জানুয়ারী জাতির সম্মুখে সমাগত হইয়াছে। বিগত ১৯২৯ সালে লাহোরে রাভী নদীর তীরে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার মূলে জাতি এই দিবস প্রথমে স্বাধীনতার সংকল্প-বাক্য গ্রহণ করে। ইহার পর সপ্তদশ বৎসর অতীত হইয়াছে; স্বাধীনতার জন্য বিগত সপ্তদশ বর্ষ জাতি কংগ্রেসের পরিচালনায় সমগ্র প্রাণ দিয়া সংগ্রাম করিয়াছে এবং সেই সংগ্রামে ভারতের শত শত বীর সন্তান মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের শোণিতোৎসর্গে ভারতের গিরিদরী এবং কানন-প্রান্তর রঞ্জিত হইয়াছে। কত সোনার সংসার প্রবল শত্রুর অত্যাচারে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে; গুলী ছুটিয়াছে, সঙ্গীণ চলিয়াছে; ভারতের দিকচক্রবালে ধূমায়মান বহ্নি ধ্বংসের লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়াছে। বৃদ্ধ মরিয়াছে, যুবক মরিয়াছে, বালক, এমন কি, শিশু পর্যন্ত বিদেশী অত্যাচারী এবং তাহাদের ক্রীতদাস নরপশু শাসকদের বলির খড়্গ হইতে রেহাই পায় নাই। কত সন্তানহারা জননীর চোখের জলে এদেশের মাটী ভিজিয়া গিয়াছে। আজ আমাদের সেসব কথা স্মরণ হইতেছে। আমাদের মানসপটে এক-সর্কটি করিয়া ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মাহুতির অনলোদ্দীপ্ত জ্বালাময় সেই অধ্যায়গুলি উন্মুক্ত হইতেছে। কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামে মৃত্যুবরণকারী বীরদের জন্য আমরা শোক করিব না। আমরা জানি, স্বাধীনতার পথ কোনদিনই কুসুমে আস্তৃত থাকে না, শুধু বিঘ্ন-বিপদের ভিতর দিয়াই সে পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব এবং মরণকে জয় করিয়াই অমরত্বের বেদীমূলে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ভারতের শত শত আত্মদাতা সন্তানের স্মৃতি আজ আমাদের সংকল্পকে যেন সুদৃঢ় করে এবং তাঁহাদের অনুদ্‌যাপিত ব্রত প্রতিপালনের সাহসে আমরা উদ্দীপ্ত হই। আমাদের স্বাধীনতা অদূরে, ইহা আমরা সকলেই উপলব্ধি করিতেছি; কিন্তু সেই সঙ্গে এই সত্যও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা এখনও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি নাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের [illegible] আমরা

[illegible] স্বার্থরক্ষায় যেসব শক্তি ভিত্তিস্বরূপ ছিল, সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক প্রেরণা সেগুলিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় এবং ভারতের সেনাদলের মধ্যেও দেশপ্রেমের চেতনা জাগিয়া উঠে। ইহার ফলে বৃটিশ সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় যে, জনমতের বিরুদ্ধতা করিয়া এদেশে থাকা তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। মুখ্যত এই কারণেই ইংরেজ এতদিনে ভারত ছাড়িতে রাজী হইয়াছে; অবশ্য এই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অন্য কতকগুলি কারণও আছে। কিন্তু স্বার্থ-সাধনে বৃটিশ জাতি চিরকালই চতুর। তাহারা এই অবস্থার মধ্যেও কূট কৌশলে ভারত-ত্যাগে তাহাদের গতিকে বিলম্বিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে। বলা বাহুল্য, ভেদ-নীতিই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে তাহাদের প্রধান সম্বল। বিভিন্ন প্রদেশের ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বে আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সে শেষাস্ত্র প্রয়োগের হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা এবং তাহার পরিণতির বীভৎসতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। আমরা বাঙালী, ভারতের স্বাধীনতার আজ চূড়ান্ত পর্যায় আরম্ভ হইয়াছে। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। কারণ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্বোধন এই বাঙলা দেশেই ঘটে এবং বাঙলা সমগ্র সংস্কৃতি ভারতের সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে জাতির স্বাধীনতা-লাভে সংহত করিয়া তোলে। ইংরেজ এজন্য চিরদিনই বাঙলার জাগ্রত জাতীয়তাবাদকে ভয় করিয়াছে এবং জাতীয়তার সেই শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কূটকৌশলে ভেদনীতির সব অস্ত্র এইখানে প্রয়োগ করিয়াছে। আজও সেই সে খেলার নিবৃত্তি ঘটে নাই; পরন্তু বাঙলা দেশে ভেদ-নীতি প্রয়োগে বৃটিশের সমধিক [illegible]

আজ বৃটিশের স্বার্থ-পিপাসার অতি ঘৃণ্য নিদারুণ নিষ্ঠুর খেলা চলিতেছে এবং বাঙলার ঘাঁটি হইতে লীগ-নীতির পাকে পাকে ভেদনীতির বিষ ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাধীনতা-লাভের পথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠ-পোষিত লীগ-নীতিই বর্তমানে প্রধান অন্তরায়স্বরূপে দেখা দিয়াছে। এই সত্য আজ সর্বাংশেই প্রকট হইয়া পড়িয়াছে যে, যতদিন পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত হইতে উৎখাত না হইবে, ততদিন ভেদ-নীতির এই খেলা চলিবেই। জগতের অন্যত্রও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই একই খেলা খেলিতেছে। অধীনস্থ জাতির সংহতি-শক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেদের শোষণ-স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করিবার এই কৌশল তাহাদের প্রকৃতিগত বস্তু; সুতরাং কালবিলম্ব করিবার অবসর নাই। স্বাধীনতা-দিবসের এই পবিত্র তিথিতে আমাদিগকে ভারত হইতে বৃটিশ প্রভুত্ব সমূলে উৎখাত করিবার জন্য প্রাণপাতী সংগ্রামে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা সকলে আজ সেই সংকল্পই গ্রহণ করিব। বস্তুত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কারসাজীতে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় আজ সোনার দেশ শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তাহাদেরই ইঙ্গিতে পরিচালিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হিংস্রতাপূর্ণ প্রয়োগ-চাতুর্যে পিশাচ দলের তাণ্ডব আরম্ভ হইয়াছে। প্রাণবান কে আছে, এ অবস্থায় উদাসীন থাকিতে পারে? এ অবস্থা অসহ্য। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার করিতে হইবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত করাই এই অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায়। জাতির ত্রিবর্ণরঞ্জিত সমুন্নত পতাকামূলে সমবেত হইয়া আমরা এই দিবসে সংকল্প গ্রহণ করিব যে, বৃটিশ প্রভুত্বের শেষ ঘাঁটি আমরা বিচূর্ণ করিব। নেতাজীর নির্দেশ আমরা ভুলিব না। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, নিজেদের প্রাণ দান করিয়া আজ আমরা তাঁহাদের মর্যাদা রাখিব। স্বাধীনতা আমাদের আজ চাই-ই। [illegible]



"ভারতবর্ষের যখন কোনই আশা ছিল না, ভারতবাসীরা যখন জাতীয় সংগ্রামে নূতন পন্থাতি ও নূতন অস্ত্রের জন্য অন্ধকারে হাতড়াইতেছিল, ঠিক সেই শুভমুহূর্তে গান্ধীজী তাঁহার অভিনব অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। তিনি যেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথ দেখাইবার জন্য বিধাতা কর্তৃক প্রেরিত হইলেন। অচিরাৎ সমস্ত ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইল। ভারতবর্ষ



নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারতমাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করিব এবং আত্যন্তিক উৎসর্গের ভিতর দিয়া পূর্ণতর জীবন লাভ করিব—এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। স্বদেশসেবা বা রাজনীতির পর্যালোচনা আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করি নাই। এইজন্য পরাধীন দেশে স্বদেশসেবকের জীবনে যে বিপদ ও পরীক্ষা, দুঃখ ও বেদনা অবশ্যম্ভাবী—তাহার জন্য কায়মনে প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি কি না, অথবা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহার বিচার করিবেন আমার দেশবাসিগণ। আমার এই ক্ষুদ্র অথচ ঘটনাবহুল জীবনে যে সব ঝড় আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিঘ্ন-বিপদের সেই কষ্টিপাথর দ্বারা আমি নিজকে সূক্ষ্মভাবে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই নিবিড় পরিচয়ের ফলে আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, যৌবনের প্রভাতে যে কণ্টকময় পথে আমি জীবনের যাত্রা সুরু করিয়াছি, সেই পথের শেষ পর্যন্ত চলিতে পারিব; অজানা ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া যে ব্রত একদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা উদ্‌যাপন না করিয়া বিরত হইব না। আমার সমস্ত প্রাণ ও সারাজীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া আমি এই সত্য পাইয়াছি—পরাধীন জাতির সব ব্যর্থ—শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ম—সকলই ব্যর্থ যদি তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে — 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?' আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি—আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন, স্বরাজ লাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, আমার সাধনপদ্ধতি ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিরত থাকিতে পারি।"

* * *

"সকল ভারতবাসীর ইহা স্পষ্ট জানা উচিত যে, এই বিপুল পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একটিমাত্র শত্রু আছে, যে শত্রু শতাধিক বর্ষকাল তাহাকে শোষণ করিয়াছে, যে শত্রু ভারতমাতার জীবনশোণিত চুষিয়া লইতেছে—সে শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেদিন পরাভূত হইবে, সেইদিনই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন আপোষহীন সংগ্রামেই আমার সমস্ত জীবন কাটিয়াছে।

আমি আজীবন ভারতবর্ষের সেবক, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাহাই থাকিব। পৃথিবীর যে অংশেই আমি থাকি না কেন, একমাত্র ভারতের প্রতিই আমার আনুগত্য ও ভক্তি আজিকার মত চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। স্বদেশীয় বন্ধুগণ! ভাতবর্ষের আসন্ন মুক্তির মুখে আমি তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ১৯৪২ সালে শেষ স্বাধীনতা-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।"

—সুভাষচন্দ্র





জংগী লাটের গড়ে'
কত কূটনীতি ফন্দী রচিল "দেশদ্রোহীর" তরে।
বন্দী করিবে শৃংখলগত লালকেল্লায় ধ'রে,
দিল্লী নগর-'পরে।
কত কূটনীতি ফন্দী রচিল জংগী লাটের গড়ে।

সম্মুখে চলে আজাদ বাহিনী উড়ায়ে পথের ধূলি
মুক্তি পথের ঝাণ্ডা লইয়া বর্ষাফলকে তুলি।
বীর গরজয় "নেতাজীর জয়" পরাণের ভয় ভুলি,
কদম কদম চলিছে, উড়াবে দিল্লী-পথের ধূলি।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
নিশীথে ও প্রাতে শত্রুর হাতে, সন্ত্রাস অপসারি';
"জয় নেতাজীর" কহি কত বীর কত প্রাণ দেয় ডারি।

সেনাদের মুখ চাহি,
"হবে হবে জয়" ডাকি নেতা কয়, "ওরে বীর ভয় নাহি।"
শতেক বদনে অভয় কিরণ জ্বলি উঠে উৎসাহি,
হুংকার নাদে কাঁপে বনতল, বীরেরা উঠিল গাহি
"হিন্দের জয়, কিছু নাহি ভয়" নেতাজীর মুখ চাহি'॥



---

* রবীন্দ্রনাথের "বন্দীবীর" কবিতার অনুসরণে। ২৮।২৯ পংক্তি "কদম কদম বাড়ায়ে যা" সংগীতের পদ হইতে গৃহীত। ৩২ পংক্তি "মত্ত মোগল রক্ত পাগল দীন্‌দীন্‌ গরজনে" এই পদের অনুরূপ, সঞ্চায়িতার পুরাতন সংস্করণে এই পংক্তি বর্জিত হইয়াছিল। আজাদ বাহিনী প্রথম গঠিত হয় রেংগুণে; সুতরাং প্রথম পংক্তি "ইরাবতী নদী তীরে" লিখিত হইল। কোহিমা ব্রহ্মপুত্র তীরে নয় কিন্তু তাহার নিকটে, ভারতবর্ষের মধ্যে। সুতরাং ২১ পংক্তিতে "বন্দীবীরে"র "হইল"র পরিবর্তে "হইবে" লেখা হইল।



নেতাজী সুভাষচন্দ্র ঃ প্রারম্ভিক সাধনা

গোপাল ভৌমিক

ইংরাজীতে একটা কথা আছে ঃ "Morning shows the day" বাঙলায় র প্রতিরূপ ঃ "উঠন্ত মূলো পত্তনেই চেনা য।" এই কথাটার ভাবার্থ সর্বক্ষেত্রে এবং বিষয়ে সমান প্রযোজ্য না হলেও, নেতাজী ভাষচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে পুরোপুরি কথাটা খাটে। পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী তাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ষ্টির অমর কাহিনী আজ যাঁদের বিস্ময়ে বাক করে দিয়েছে, তাঁরা একটু চেষ্টা র যদি তাঁর সমগ্র জীবনের গতি ও প্রকৃতি ধাবন করে দেখেন, তবে তাঁরা অতি জেই বুঝতে পারবেন যে মৃত্যুজয়ী আজাদ ন্দ্ ফৌজের নেতাজী ঘটনা-প্রবাহের কোন কস্মিক সৃষ্টি নন। তাঁর সমগ্র জীবনের বচ্ছিন্ন সাধনাই তাঁকে এই নেতাজী পদের কে এগিয়ে দিয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কঠিন নাগপাশে আবদ্ধ ভারতে আমরা তাঁর আপোষ-বিরোধী সতত সংগ্রামশীল রূপ খেছি, পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক ও অবস্থায় তাজী তারই রূপান্তর মাত্র। বৃটিশ াজ্যবাদীরা যদি কঠোরহস্তে ভারতকে ব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিষ্পিষ্ট, নির্বীর্য নিরস্ত্র করে না রাখত, তবে এই ভারতের সীমার মধ্যেই আমরা তাঁর সশস্ত্র সংগ্রামী দেখতে পেতাম এবং তিনি আজ দেশ ও তের মুক্তিদাতারূপে ডি, ভ্যালেরা কিংবা শিংটনের মত ভারতের রাষ্ট্রাধিনায়ক হয়ে তেন।

সুভাষচন্দ্র কোন সাময়িক উত্তেজনা বা হের বশে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সৃষ্টি রন নি। এর পিছনে ছিল তাঁর সুদীর্ঘ-লের সচেতন সাধনা ও মনন। অনেক নেতার ত্রে এরূপ দেখা যায় যে, তাঁরা নেহাৎ ঘটনা-র চাপে পড়ে নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ষচন্দ্র এ ধরণের আকস্মিক ভূঁইফোড় নেতা । তাঁর নেতৃত্বের পিছনে ছিল সদাজাগ্রত জবোধ এবং দেশের দাবী মেটানোর াগ সাধনা। তা নইলে যে অভিজাত র বিরুদ্ধ-পারিপার্শ্বিককে তিনি জন্ম-করেছিলেন তার সর্বগ্রাসী অক্টোপাস-ও বাহু বিস্তারকে ফাঁকি দিয়ে তিনি দেশ াতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারতেন বাল্য, কৈশোর ও যৌবনারম্ভে আত্মসচেতন



১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র

শুভবুদ্ধির সাহায্যে যে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম চালিয়ে তিনি দেশ-জননীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে পেরেছিলেন, এই প্রবন্ধে আমি তারই আলোচনা করব।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক শহরে সুভাষচন্দ্রের জন্ম। তাঁর পিতা রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু তখন ছিলেন কটক বারের শ্রেষ্ঠ উকীল মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ কোন দিকেই তাঁর কোন অভাব ছিল না। তিনি একাধারে সরকারী উকীল, কটক মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সরকারী খেতাবধারী উকীল হলেও জানকীনাথের চরিত্রে তেজস্বিতা, স্বাতন্ত্র্য ও দেশপ্রেমের অভাব ছিল না। তবু তৎকালীন অভিজাত ধনী পরিবারের প্রথা অনুযায়ী তিনি ছেলেদের গোড়া থেকেই ইউরোপীয় স্কুল-কলেজে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে ছিলেন। তদনুযায়ী সুভাষচন্দ্র পাঁচ বৎসর বয়সে ভর্তি হয়েছিলেন ইউরোপীয় প্রোটেস্টাণ্ট স্কুলে এবং এখানে তিনি বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত পড়াশুনো করেছিলেন। কিন্তু অভিজাত ধনী পরিবারের সন্তান হলেও জীবনের প্রথম থেকেই সুভাষচন্দ্রের বিলাস-ব্যসনের প্রতি ছিল তীব্র বিদ্বেষ। তা না থাকলে, আজকের নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আমরা পেতাম না—পেতাম বড়জোর কোন আই-সি-এস্ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সুভাষচন্দ্র বসুকে।

সুভাষচন্দ্রের বাল্যজীবনে যাঁদের প্রভাব তাঁর উপরে গভীর ও ব্যাপক ছিল তাঁদের একজন হলেন তাঁর মা ধর্মপরায়ণা ও স্নেহশীলা প্রভাবতী দেবী এবং অপর জন তাঁর স্নেহশীলা দাই-মা—সারদা নাম্নী পরিচারিকা। মাতার সহজাত ধর্মভাব ও পরদুঃখকাতরতা প্রথম থেকেই পুত্রের চরিত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তারই ফলে সুভাষচন্দ্র বরাবর নিজেকে ঐশ্বর্যের মোহমাদকতার বহু ঊর্ধ্বে রাখতে পেরেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের বাল্যজীবনে আর যিনি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ও তাঁর চরিত্রকে দৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে তোলায় সাহায্য করেছিলেন তিনি হলেন র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক, দেশপ্রেমিক ও ধর্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস। এই বেণীমাধববাবুই খ্যাতনাম্নী দেশনেত্রী শ্রীযুক্তা বীণা দাসের পিতা। ১২ বৎসর বয়সে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হবার পরই তিনি বেণীমাধববাবুর নিবিড় সংস্পর্শে আসেন এবং ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই পরস্পরকে চিনে ফেলেন। বেণীবাবু সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ভাবী মহত্ত্বের বীজ দেখতে পেয়েছিলেন বলেই তাঁকে তিনি নানা বিষয়ে উৎসাহিত করতেন ও তাঁকে ধর্ম ও সমাজসেবাবিষয়ক নানাবিধ পুস্তক দিয়ে তাঁর নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা

করতেন। তিনিই তাঁকে রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের কথামৃত ও স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদ্দীপক কর্মের বাণী-মুখর গ্রন্থাবলী পাঠে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করার পূর্ব পর্যন্ত ধর্মের প্রভাবই ছিল তাঁর জীবনের মুখ্য নিয়ামক। ১৯২১ সালে স্বদেশ সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ার পর ধর্মসাধনা তাঁর জীবনের পটভূমিকায় পড়ে গিয়েছিল বটে—কিন্তু সহজাত ধর্মবোধের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে তিনি কোন দিনই পারেন নি।

মাতার কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র আর একটি বড় গুণ পেয়েছিলেন সেটি পরদুঃখকাতরতা। অভিজাত ধনী পরিবারের সন্তানেরা সাধারণত আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসন্তুষ্ট ও আত্মসুখপরায়ণ হয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ছিলেন এর জ্বলন্ত ব্যতিক্রম। কেমন করে জানি না—তাঁর চরিত্রে দরিদ্রদের প্রতি একটা সহজাত মমত্ববোধ ছিল বরাবর। রোগ শোক দুঃখ যন্ত্রণা দেখলেই তিনি তা মোচনের জন্যে দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠতেন। এজন্য তিনি বহু দুঃখ কষ্ট স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে তুলে নিতেন। পরজীবনে দেশজননীর মুক্তির জন্যে সুভাষ-চন্দ্রকে যে সুকঠোর রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের কারাগারে বহু দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল, রণাঙ্গনে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিন রাত সৈন্য পরিচালনায় মনোনিবেশ করতে হয়েছিল, তার প্রস্তুতি হয়েছিল বাল্য ও কৈশোরের স্বেচ্ছাবৃত দুঃখ ভোগের বিদ্যালয়ে। তাঁর যখন সবে পনের বৎসর বয়েস তখন ধনীর দুলাল সুভাষচন্দ্র আত্মত্যাগী কর্মীদের দল গঠন করে কটক শহর থেকে বহু দূরে গ্রামবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা নিবারণের জন্যে যেতেন এবং কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে তাদের শুশ্রূষায় রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতেন। এ সংবাদ আমরা পেয়েছি তাঁরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুর বিবরণ থেকে। এই বিবরণ থেকে যেমন সুভাষচন্দ্রের পরদুঃখকাতরতার পরিচয় পাওয়া যায়—তেমনই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সহজাত নেতৃত্বের।

তাঁর অন্যতম বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত হেমন্ত-কুমার সরকারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৯১২ সালেই তাঁদের উভয়ের মধ্যে পরিচয় হয় এবং তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সুভাষচন্দ্র আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের সংকল্প করেন। এর পিছনেও একটু ইতিহাস আছে। বর্তমানের শ্রমিকনেতা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অপর কয়েকজন বন্ধুর চেষ্টায় সেই সময় কলকাতায় আজীবন ব্রহ্মচারী থাকবার ব্রতগ্রহণকারী একটি যুবে সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তাঁদেরই বাণী বহণ করে নিয়ে হেমন্তবাবু গিয়েছিলেন কটকে সুভাষচন্দ্রের কাছে। সুভাষচন্দ্রের ভাবপ্রবণ মন সহজেই এতে সাড়া দিয়েছিল। শুধু তাই নয়—তিনি সঙ্গে সঙ্গে কটকে কলকাতার অনুরূপ একটি দল গড়ে তুলেছিলেন। বালক সুভাষের সংগঠন-নৈপুণ্যও যে কত বেশী ছিল এটা তারই প্রমাণ।

১৯১৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় আসেন কলেজে পড়তে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। সুভাষ-চন্দ্রের কলেজ-জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাত্ররাজনীতিতে নেতৃত্ব, ধর্মসাধনার জন্যে



১৯১৯ সালে ইংলণ্ডে সুভাষচন্দ্র

নিরুদ্দেশ যাত্রা ও ওটেন সাহেবকে মারার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর সাময়িক-ভাবে বিদায় গ্রহণ। কলেজ-জীবনে প্রবেশ করার পরই সুভাষচন্দ্র রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠেছিলেন—এমন কথা তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছেও শোনা যায় না। ধর্মভাবে উদ্দীপ্ত সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় চরিত্রকে সহপাঠীরা শ্রদ্ধার চোখে দেখত এবং তাঁর চারদিকে এসে তারা ভীড় জমাত—একথা শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি সহপাঠীদের রচনা থেকে জানা যায়। তিনিও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদের নেতৃত্ব করতেন। তবে তখন পর্যন্ত তাঁর মনে কোন সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বোধ জাগ্রত হয় নি। একটা ব্যাপারে তিনি অবশ্য বরাবরই অত্যন্ত আত্মসচেতন ছিলেন। সে হল তাঁর স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে সচেতনতা। তিনি জানতেন যে, পৃথিবীতে তিনি দশজনের একজন হয়ে সাধারণ জীবন যাপন করতে আসেন নি—তাঁর জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবশ্য তখনও তাঁর কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

সুভাষচন্দ্র যে সময়টা কটকে কাটিয়ে-ছিলেন, সেই সময়টা যদি তিনি কলকাতায় কাটাতেন, তবে তাঁর মধ্যে সচেতন জাতীয়তা-বোধ ও তীব্র স্বাদেশিকতা বহু পূর্বেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে যে জাগরণের অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গিয়েছিল, পশ্চাদ্‌বর্তী উড়িষ্যার সমাজ-জীবনে সেটা খুব নাড়া দিতে পারে নি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কলকাতায় থাকলে—এর প্রভাব তিনি কিছুতেই আটকাতে পারতেন না। কলকাতায় তাঁর যখন কলেজ-জীবনের আরম্ভ, তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে—উদার-পন্থী কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনও তখন প্রাণহীন স্তিমিত। মাঝে মাঝে স্বদেশী ডাকাতি বা সশস্ত্র খণ্ডবিপ্লবের প্রয়াসই তখন যা কিছু সাড়া এনে দিত। এর পরই মহাত্মা গান্ধীর সুনিপুণ নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসে নতুন প্রাণস্পন্দন জাগল—দেখা দিল ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র তখন পরিপূর্ণ সজাগ দেশপ্রেমিক এবং জননীর সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। ১৯১৩ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত—সময় খুব কম নয়—দীর্ঘ আটটি বৎসর। এটাকে বলা চলে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উদ্যোগপর্ব। সুভাষ-চন্দ্রের মত মেধাবী, তীক্ষ্ণধী ছাত্র খুব কম দেখা যায়। তিনি যদি তথাকথিত ভাল ছেলেদের মত বই নিয়ে পড়ে থাকতেন, তবে তিনি অনায়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক রেকর্ড ভাঙতে পারতেন। কিন্তু এটা তাঁর জীবনের ব্রত ছিল না বলেই তিনি পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বেশী সময় না কাটিয়ে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত অনেক বই পড়তেন, দুঃখী দরিদ্রের দুঃখমোচনে সময় ব্যয় করতেন, শরীর ও মনকে সুস্থ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন, ধর্মসাধনা করতেন ও ছাত্র-নেতৃত্ব করতেন। তাঁর জীবনযাত্রায় সাধারণ খেলাধুলো আমোদ-প্রমোদ, সিনেমা-থিয়েটার দেখার কোন স্থান ছিল না। তাঁর বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বলেছেন যে, সুভাষের চরিত্রে রস-বোধের কোন স্থান ছিল না। এ-কথাটা বহুলাংশে সত্য। তিনি গোড়া থেকেই জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন গভীরভাবে এবং তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই তাঁর মন ছিল একমুখী, সংকল্প ছিল অটুট এবং মনোভাবে ছিল সত্যান্বেষীর দৃঢ়তা ও অকৃত্রিম বিশ্বাস। জীবন সম্বন্ধে তাঁর এমন গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলেই তিনি

১৯১৪ সালে সহসা গুরুর সন্ধানে গৃহত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন হিমালয়ে। ছয়মাস ব্যর্থসন্ধানের পর ভগ্ন স্বাস্থ্যে তিনি বাড়ি ফিরে এসেছিলেন বটে—কিন্তু তাতে তাঁর মনোবল একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি। ব্যর্থতায় ভেঙে পড়বার মত লোক সুভাষচন্দ্র ছিলেন না—বরং ব্যর্থতাই যেন তাঁকে নতুন উৎসাহে ও কর্মোদ্যমে উদ্দীপিত করে তুলত।

সুভাষচন্দ্রের কলেজ জীবনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওটেন সাহেবকে প্রহারদান। এটি ১৯১৬ সালের ঘটনা। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়েন। শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক ওটেন সাহেবের দুর্ব্যবহারে সমগ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র সমাজ উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। এর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ধর্মঘট করে সাময়িকভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় করাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকের ঔদ্ধত্যের সীমা ছিল না। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের মানুষ বলেই বিবেচনা করতেন না। স্বাভাবিক শ্বেত ঔদ্ধত্যের বশে তিনি একদিন বি-এ শ্রেণীর একটি ছাত্রের গালে চপেটাঘাত করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। ছাত্ররা এতে ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিল এবং তারা বুঝেছিল যে এ নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলে কোন লাভই হবে না—বরং এই শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকের হীন দুর্ব্যবহার আরও মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। তাই তারা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ওটেন সাহেবকে বেদম প্রহার দিল। সুভাষচন্দ্র এর মধ্যে সরাসরি জড়িত ছিলেন কিনা—জানা যায় না। তবে ধর্মঘটের নেতৃত্বের পর থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষের সদাজাগ্রত সুনজর তার উপর ছিল বলে তিনি অন্য কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হলেন। এর ফলে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনের প্রায় দুটি মূল্যবান বৎসর নষ্ট হয়ে যায়। পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তিনি পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় অধ্যয়নের অনুমতি পান ও স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে তিনি ১৯১৯ সালে বি-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ওটেন সাহেবের ব্যাপারটা সুভাষচন্দ্রের জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ও গভীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে একটি তুচ্ছ ও আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হয়—কিন্তু আদৌ তা নয়। আমার মনে হয় এইখানেই সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম সচেতন হাতে খড়ি। আমাদের দেশকে যে রেখেছে ওটেন সাহেব তার প্রতীক মাত্র। উদ্ধত ওটেন সাহেবের মারফৎই সুভাষচন্দ্র সর্বপ্রথম এই শ্বেতাঙ্গ শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের প্রকৃত রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাদীদের ভারত থেকে দূর করে দিতে না পারলে, ভারতের স্বাধীনতাও আসবে না—আর অগণিত জনসমাজের দুঃখ দুর্দশাও ঘুচবে না। ভারতের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের মত



১৯৩৫ সালে পিতৃশ্রাদ্ধের পর সুভাষচন্দ্র

শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষী আর কোন নেতা আজ পর্যন্ত জন্মেছে কিনা সন্দেহের বিষয়। এই শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষ কতদূর যেতে পারে, নীচের একটি চিঠির অংশ বিশেষ থেকেই তার প্রমাণ মেলে। সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস্ পরীক্ষা দেবার জন্যে বিলেত যাবার পর—এই চিঠিটি লিখেছিলেন তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকারকে। এই চিঠিতে আছেঃ "আমার সবচেয়ে বেশী সুখ হয় যখন দেখি যে সাদা পরিষ্কার করিতেছে।" শ্বেতাঙ্গ-বিদ্বেষ তাঁর মর্মস্থলে কিরূপ দৃঢ় হয়ে বসেছিল, এর চেয়ে তার বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ওটেন সাহেবের ব্যাপারেই যদি সুভাষচন্দ্রের মনে রাজনীতি-সচেতনতা এসে ছিল, তবে তিনি আই-সি-এস্ পরীক্ষা দেবার জন্যে বিলাতে গেলেন কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, বিলাতে যাবার তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না—তিনি গেছিলেন শুধু আত্মীয়বন্ধুদের নির্বন্ধাতিশয্যে। ১৯১৯ সালে সুভাষচন্দ্র যখন বি-এ পাশ করে ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছেন, তখন ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে এক নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যচক্র তখন যুগান্তকারী আবর্তনের সম্মুখীন এবং দৃঢ় হস্তে ভারতের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ-রশ্মি ধরে মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের জাতীয় জীবনের পুরোভাগে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় স্বায়ত্তশাসনকামী ভারতবাসীদের ঐকান্তিক সমর্থন ও সাহায্যকামী সুকৌশলী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতের সকল দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে দেখা গেল যে, ইংরেজ তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমাদের দিয়েছে মণ্টেগু চেমস্ ফোর্ডের (Montageu Chems Ford) এক দফা শাসন-সংস্কার ও কুখ্যাত রাউলাট বিল। ভারতের জাগ্রত রাজনৈতিক সত্তা নীরবে এই অপমান মেনে নিল না—তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল তীব্র প্রতিবাদ। জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র অহিংস নরনারীর উপর সাম্রাজ্যবাদের চর ও'ডায়ার যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করলেন, তাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস স্বরূপ দেশবাসীদের চোখে আরও বেশী করে ধরা পড়ল। এই অত্যাচারে ভয় পাওয়া ত দূরের কথা—সমগ্র জাতি আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল যে কোন ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার মেনে নেওয়া হবে না। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত মিলিত কণ্ঠে ঘোষিত হল এই বজ্রশপথ।

সারা দেশ যখন এমনই জাগরণ-মুখর—তখন সুভাষচন্দ্র গেলেন বিলেতে—নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আই-সি-এস্ পড়তে। তাঁর মন তখন পরিপূর্ণরূপে রাজনীতি-সচেতন— ২২ বৎসরের যুবক সুভাষচন্দ্র তখন বুঝেছেন যে, ধর্ম-সাধনা যেমন জীবনের লক্ষ্য নয়, আই-সি-এস্ হয়ে মোটা মাইনের সরকারী চাকরী করে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের সেবা করাও তেমন

তখন মোটামুটি স্থির হয়ে গেছে—সে হল দেশজননীর সেবা করা। তবু তিনি মাতাপিতা ও আত্মীয়স্বজনের মনরক্ষা করতে ইংল্যাণ্ডে গেলেন আই-সি-এস্ পড়তে। সুভাষচন্দ্র যেরূপ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তাতে তাঁর মাতা-পিতা ও আত্মীয়স্বজনরে মনে গভীর আগ্রহ ছিল যে তিনি আই-সি-এস্ হন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের জীবনের গতিপথ তখন নির্ধারিত হয়ে গেছে। তা নইলে তিনি বিলাতে গিয়ে আই-সি-এস্ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Moral Science Tripos-এ বি-এ ডিগ্রী নেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন কেন? এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আই-সি-এস হওয়া তাঁর মনঃপূত ছিল না। বিলেত থেকে বন্ধুবান্ধবদের বিশেষ করে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকারকে তিনি যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তার থেকে দেখা যায় যে আই-সি-এস পড়ার সিদ্ধান্ত করা নিয়ে তাঁর মনে বহুদিন পর্যন্ত একটা গভীর সংশয় ছিল। আই-সি-এস্ পদ ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাঁর মনের এ সংশয় নিদূরিত হয় নি।

ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি আদৌ সাহেবী ভাবাপন্ন হন নি। নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলেই এভাবে বিলাতী জীবনের লোভ ও মোহকে দূরে সরিয়ে রেখে আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন। বরং বিলাতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও বেশী করে স্বদেশের মুক্তি-কামনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। পরাধীন ভারতবর্ষের দরিদ্র অজ্ঞ জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশাপূর্ণ জীবনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। আর বিলাতে গিয়ে তিনি দেখলেন সে দেশ স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মন্ত্রে মুখর। দরিদ্র ভারতবাসীদের রক্তমোক্ষণ করেই যে এ স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির সৌধ গড়ে উঠেছে তা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হল না। তাই তিনি স্বদেশের মুক্তি-কামনায় আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলেন। আর এদিকে গান্ধীজীর বিরাট নেতৃত্বে সারা ভারতও তখন প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠেছে—ভারতের উপর ভারতবাসীরা চাইছে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। সুভাষচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে বসে যতটা সম্ভব ভারতের সমসাময়িক রাজনীতির খবর রাখতেন। সুভাষচন্দ্রের ইংল্যাণ্ড প্রবাস তাঁকে দাস-মনোভাবাপন্ন করে তোলা ত দূরের কথা তাঁকে আরও বেশী বৃটিশ-বিরোধী করে তুলেছিল।

১৯২১ সালের মে মাসে ইংল্যাণ্ডে থাকতেই সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস্ পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রারম্ভিক জীবনে এ ঘটনা একটা যুগান্তের পরিসূচক। তিনি ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে আই-সি-এস্ পদে ইস্তফা দেন নি। সকল দিক ভেবে চিন্তেই তিনি এ সিদ্ধান্ত করেছিলেন এবং তাঁর প্রারম্ভিক জীবনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি এইরূপ একটা বিরাট ত্যাগের জন্যেই নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিলেন। সেই অসহযোগ আন্দোলনের যুগে সমগ্র দেশ এই অসম সাহসী বাঙালী যুবকের সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হয়ে গেছল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র নিজেও স্তম্ভিত হন নি—তেমনই তাঁর চরিত্রের সঙ্গে যাঁরা আন্তরিকভাবে পরিচিত ছিলেন তাঁরাও স্তম্ভিত হন নি। এর পরেই শুরু হল সুভাষচন্দ্রের কর্মমুখর রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস। তাঁর অপূর্ব আত্মত্যাগ ইতিমধ্যেই স্বাধীনতাকামী ভারতীয় জনমানসে তাঁর জন্যে একটা নির্দিষ্ট আসন করে রেখেছিল। জীবনের প্রারম্ভিক সাধনা শেষে ভারতে ফিরে তিনি দেশমাতার সেবায় সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে দিলেন। তাঁর জীবন-ইতিহাসের পরবর্তী গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়গুলোর সঙ্গে দেশবাসীরা সকলেই পরিচিত।



নেতা সুভাষচন্দ্র

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ইংরেজ কবি বায়রন বলিয়াছিলেন—একদিন প্রভাতে সুপ্তোত্থিত হইয়া তিনি দেখিয়াছিলেন—তিনি যশস্বী। সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপ হইয়াছে। তিনি যখন বিদেশী শাসকদিগের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তখনও দেশে তাঁহার নেতৃত্বের সম্বন্ধে সকলে একমত ছিলেন না; বিদেশে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে মতভেদ ছিল, কিন্তু তাহার পরে দেশ সুভাষচন্দ্রের গৌরবে আপনাকে উজ্জ্বল মনে করিয়াছে—যাঁহারা তাঁহার বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

"হে জয়ন্ত, তব যশোমুকুটময়ূখে
জটিল কর্তব্য আজ সরল—উজ্জ্বল।"

বর্তমান যুগে সুভাষচন্দ্রের কার্য যে সুদূর অতীতে বাঙালীর শৌর্য-বীর্য-গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, যাহা অসম্ভব বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল তাহা সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহার কারণ—তাঁহার নেতৃত্ব-সাধনা।

সেই সাধনায় তাঁহাকে যৌবনকাল হইতেই বাধা সহ্য করিতে ও বিপদ বরণ করিতে হইয়াছে। বাঙালীর ভাবপ্রবণতা ও কল্পনা যখন সংকল্প-দৃঢ়তার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, তখনই সুভাষচন্দ্র গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সম্মেলনের মত প্রতীয়মান হইয়াছেন।

সে সাধনার—নেতৃত্ব সাধনার আরম্ভ কবে ও কোথায় তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। সাধারণভাবে তাহার প্রথম বিকাশ লক্ষ্য করা যায়—তাঁহার পঠদ্দশায়। তখনই তিনি সতীর্থ সমাজে নেতা। সেই নেতৃত্ব দুর্বিনীত অধ্যাপককে "শিক্ষাদানে" প্রকাশ পাইয়াছিল।

তাহার পরে তিনি বিদেশে গমন করেন—উদ্দেশ্য, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া বিদেশী আমলাতন্ত্রে চাকরী করিবেন। সেই কার্য তখন অনেকের নিকট কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু তাহা সুভাষচন্দ্রের ধাতসহ হইল না। তিনি যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন ভারতে অবস্থার বিশেষ পবিবর্তন হইয়াছে—জাতীয়তার প্রভাবে জাতীয় জীবন নবভাবে গঠিত হইতেছে। সুভাষচন্দ্রের মনে হইলঃ—

"মন্দিরে সম্পূর্ণ যবে পূজা আয়োজন,
পূজারী বাহিরে কেন ঘুমায় তখন?"

তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু চাকরী গ্রহণ করিলেন না। তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন।

তখনই তাঁহার নেতৃত্ব পরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

যখন বিলাতের যুবরাজ এদেশে আসিবেন, জানা গেল, তখন তাঁহার আগমন বর্জনের যে আন্দোলন হইল, বাঙলায়—বিশেষ কলিকাতায় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে তাহা সফল হইল। সেরূপ সম্পূর্ণ বর্জন পূর্বে কখন হয় নাই—একথা তখন য়ুরোপীয় পরিচালিত পত্রগুলিকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

উত্তরবঙ্গ যখন প্লাবন পীড়িত হয়, তখন সুভাষচন্দ্র সেবাব্রতীদিগের নেতা হইয়া তথায়





জার্ম্মাণী হইতে টোকিও আগমনের পর নেতাজী

গমন করেন। তিনি যে কাজের ভার গ্রহণ করিতেন তাহাতেই তাঁহার নেতৃত্ব সাফল্যের পথ প্রস্তুত করিত। সকল বাধা তিনি অনায়াসে দলিত করিতেন।

তিনি অল্পদিনের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্যভার—চিত্তরঞ্জনের নির্দেশে—গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় পুঞ্জীভূত অনাচারের আবর্জনা দূর করিবার কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিবার সময় লাভ করিতে পারেন নাই।

কলিকাতায় মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত করিয়া তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। সমগ্র কার্য যেন সামরিক প্রথায় নির্বাহিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার নেতৃত্ব ক্ষমতা অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল বটে, কিন্তু কেহ কেহ তাঁহার সামরিক ব্যবস্থার অনুকরণে ব্যংগও করিয়াছিলেন। যে বীজ সুযোগের অভাবে অঙ্কুরিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা সেই সময়েই উপ্ত হইয়াছিল।

কারাগারেও তাঁহার নেতৃত্বের পরিচয় বার বার প্রকট হইয়াছিল।

তিনি যে মহাজাতি সদনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহা জাতির কর্মকেন্দ্রে পরিণত করিবার আগ্রহই ছিল।

বার বার কারাগারে থাকিয়া তাঁহার কার্যের জন্য ব্যাকুল মন পীড়িত হইয়াছিল, তাঁহার স্বাস্থ্যও ক্ষুন্ন হইয়াছিল।

সুভাষচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই নেতৃত্বগুণে তরুণ ভারতের প্রকৃত নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বিপুল বহুমতে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি হইলেন এবং রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি কংগ্রেসকে যে নূতন—শক্তিশালী গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আজও কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়া মনে করিলে, অসঙ্গত হইবে না।

হরিপুরার কংগ্রেসের পরে ত্রিপুরাতেও তাঁহার স্বাস্থ্যভংগ হইয়াছে। দুর্বলদেহে ও অবসন্ন মনে জীবনে সেই একবার তাঁহার নেতৃত্বে দৌর্বল্য প্রকাশ পাইয়াছিল; প্রবীণ ও পুরাতন কর্মীদিগের সহযোগে বঞ্চিত হইয়া তিনি কার্যকরী সমিতি গঠন করিতে পারেন নাই।

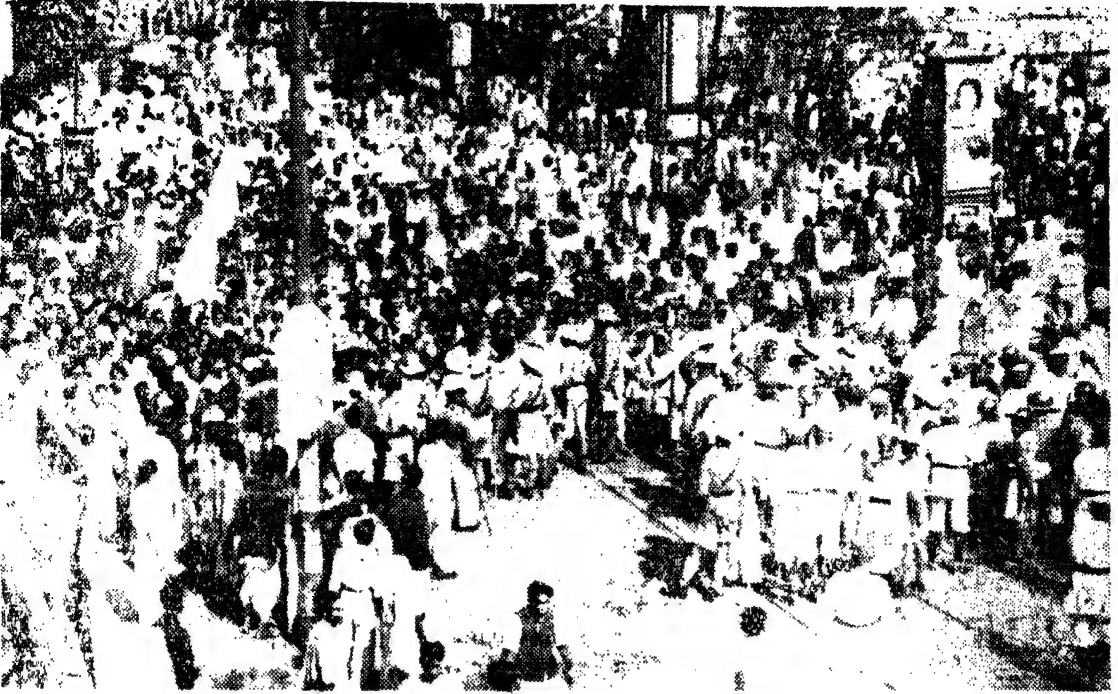


পোর্টব্লেয়ারে (আন্দামান) নেতাজী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতেছেন (ডিসেম্বর ১৯৪৩)

বার বার বাধা পাইয়া সুভাষচন্দ্রের যে নেতৃত্ব ক্ষমতা আপনার মধ্যে আপনি বলসঞ্চয় করিয়াছিল—দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠনেই তাহার পূর্ণ পরিচয় প্রকট হইয়াছিল।

তিনি নেতার প্রেরণায় জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতীয়মাত্রকেই দেশপ্রেমের যে আগ্রহ দিয়াছিলেন—তাহাই আজ বিশ্বের বিস্ময় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিরূপে লোকের দৌর্বল্য দেশাত্মবোধের ইন্ধনে দগ্ধ করিয়া দেশাত্মবোধকে শ্যামিকাশূন্য করিতে হয়, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন—সেইজনাই জাতীয় বাহিনী নেতাজীর নেতৃত্ব অবিচারিতচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিল।

কলিকাতায় ভিয়েৎনাম দিবস



কলিকাতায় ভিয়েৎনাম দিবস উদ্‌যাপন সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের এক শোভাযাত্রা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে কলেজ স্ট্রীটে সিনেট হলের সম্মুখে পুলিশ উহাদের গতিরোধ করে।



কর্ণেল ইয়ান নাম্বিং (দক্ষিণ হইতে তৃতীয়), ডাঃ বা ম'র জামাতা এবং কর্ণেল কোকো (সকলের বামে)। ইঁহারা নেতাজী জন্মদিবস উপলক্ষে কলিকাতা আসিয়াছেন।



ভিয়েৎনাম দিবস উদ্‌যাপন সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশের লাঠি চালনার ফলে আহত জনৈকা ছাত্রী



নীলকুঠি

সেদিন বেড়াতে বেড়াতে যে যায়গাটায় গিয়েছিলাম সেটা এক কালে নীলকুঠি ছিল। প্রকাণ্ড কুঠি বাড়িটা ভেঙে পড়েছে, দেয়ালের ফাটল থেকে অশথ গাছ গজিয়েছে। ধ্বংসলীলার ধ্বজা উড়িয়েছে অশথ গাছ; ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো বাতাসে ফর্‌ ফর্‌ করে উড়ছে অশথ গাছের পাতা। অনেকটা যায়গা জুড়ে এই কুঠি, এখন জঙ্গলে আচ্ছন্ন। ভেতরে প্রবেশ করে সমস্তটা দেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ঝোপঝাড় কাঁটাবন ভেদ করে বেশি দূরে অগ্রসর হতে পারলুম না। সঙ্গী বন্ধুটি আবার সাপখোপের ভয় দেখাতে লাগলেন। দু একটা বড় বড় চৌবাচ্চা মতন দেখলুম, ওগুলোতে নাকি নীল সাজানো হোতো। কুঠিবাড়ির চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখে এক যায়গায় এসে চুপ ক'রে বসে রইলুম। অস্তগামী সূর্যের রক্তাভা মাঠে প্রান্তরে মুঠো মুঠো ছড়িয়ে পড়েছে। এর মাঝখানে এই ভাঙা কুঠিবাড়িটাকে অত্যন্ত কুৎসিত লাগছিল। প্রাচীন ভগ্নাবশেষের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক মমতা থাকে। কিন্তু এই বাড়ির ইতিহাস এতই কলঙ্কিত মনে হচ্ছিল—ওখানটায় থেকে ও যেন এই অপূর্ব ল্যান্ডস্কেপটিকে পর্যন্ত কলুষিত করে দিয়েছে। আজকে আমার চোখে এই ভগ্নস্তূপ ব্রিটিশ বর্বরতার একটা গলিত শবদেহ বই আর কি?

প্রায় এক শতাব্দি পূর্বের একটি বিস্মৃত-প্রায় ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই কুঠিবাড়ি একদিন লোকজনে সরগরম ছিল, কুঠিয়াল সাহেবের বিক্রম যে কোনো লাট সাহেবের বিক্রমকে লজ্জা দিতে পারত। শাসন এবং শোষণের এমন নগ্ন, এমন নির্লজ্জ প্রকাশ এসব কুঠিতে যেমন হয়েছে এমন আর কোথাও নয়। আজ কোথায় গেল সে বৈভব, সে বিক্রম। ঝড়ের মুখে সব গেছে উড়ে—gone with the wind. আজ কোথায় সেই লাঠিয়ালের দল প্রজাকে মারধর করে, প্রাণের ভয় দেখিয়ে নীল চাষে যারা বাধ্য করত? সঙ্গী বন্ধুটি আমার আনমনা ভাবটা লক্ষ্য করেছিলেন, জিগগেস করলেন, কি ভাবছেন? বল্লুম, ভাবছি শ্যামচাঁদের কথা। বন্ধু অবাক্ হয়ে বল্লেন, শ্যামচাঁদ? সে আবার কে? তাইতো, শ্যামচাঁদ আবার কে? আপনারাও ভুলে গিয়েছেন কিনা কে জানে। বাংলা দেশের লোক—কানু ছাড়া কেত্তন নেই—শ্যাম বললেই শ্যামের বাঁশির কথা মনে পড়ে। বললুম, শ্যামচাঁদকে জানেন না? এই গাঁয়ের চাষীরা নিশ্চয় জানে। এদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে শ্যামচাঁদের সবিশেষ পরিচয় ছিল, সে পরিচয় বড় মর্মান্তিক। শ্যামচাঁদ ছিল এক রকমের বেত চামড়া দিয়ে মোড়া, তাই দিয়ে নীলকুঠির সাহেবরা প্রজাদের সায়েস্তা করত। ঐ যে কুঠিটা দেখছেন ওরই ভেতরে ছিল ওদের নিজেদের কয়েদখানা। যাকে ইচ্ছে ধরে এনে আটক করে রাখত, নির্মমভাবে প্রহার করত, মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করত। নীলের অত্যাচারে সমস্ত সমাজদেহ বিষে নীল হয়ে গিয়েছিল। যে নীল তৈরির জন্য ইংরেজরা এমন পশুর মতো ব্যবহার করেছে সেই নীল জার্মেনরা তৈরি করেছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। একজন করেছে মস্তিষ্কের ক্ষমতায় আর একজন করেছে পাশবিক বল প্রয়োগে। অথচ ইংরেজের বিচারে জার্মেনরা হল বর্বর আর ইংরেজ হলেন সুসভ্য। নীলকুঠিগুলি বোধ করি পৃথিবীর সর্বপ্রথম কনসেনট্রেশন ক্যাম্প।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে বসে রইলুম। আমাদের দুজনের চিন্তা যে একই খাতে বইছে তা কোনো কথা না বলেও বেশ বুঝতে পারছিলুম। খানিক পরে শুনলুম আমার বন্ধুটি গুন গুন করে গান ধরেছেন—ময়রাণী লো সই, নীল গেজেছে কই? একদিন এই গান বাংলা দেশের ঘরে ঘরে উত্তেজনার বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। সমাজ-চেতনা জাগাবার দিক থেকে নীলদর্পণ নিঃসন্দেহে বাংলা দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রন্থ। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন, "কোন গ্রন্থবিশেষ যে সমাজকে এতখানি কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না।" এদিক থেকে নীলদর্পণ Uncle Tom's Cabinএর সমজাতীয়। দীনবন্ধু মিত্র আমাদের গণজাগরণের প্রথম পুরোহিত। প্রকৃতপক্ষে নীল আন্দোলনই ভারতবর্ষের প্রথম গণ-আন্দোলন।

সেই আমাদের প্রথম রাষ্ট্রীয় (একে রাষ্ট্রীয় বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই) অভিযানের যাঁরা ছিলেন পুরোভাগে তাঁদের কথা আজকের মানুষ ভুলে যাচ্ছে। নদীয়া জেলার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাসের কথা আজ ক'জনের মনে আছে? কুঠিয়ালদের অত্যাচার থেকে দরিদ্র প্রজাদের বাঁচাবার জন্য এই দুই ভ্রাতা সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। নীল বিদ্রোহের লাল ঝাণ্ডা এঁরাই প্রথম উত্তোলন করেছিলেন। উৎপীড়কের বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের এই প্রথম বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে মস্কো থেকে ধার করা বুলি কপচাতে হয় নি। হ্যাঁ, আর ছিলেন মালদহের রফিক মণ্ডল, কিষাণ বন্ধু হিসেবে এঁর সমতুল্য ব্যক্তি সেকালে দেশে খুব কমই ছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও এঁর শৌর্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। পাদ্রী লং-এর কথাও ভুলব না। ইনি নিজে উদ্যোগী হয়ে নীল-দর্পণের ইংরেজি অনুবাদ (অনুবাদক ছিলেন মাইকেল মধুসূদন) প্রকাশ করেছিলেন। সে অপরাধে তাঁর এক মাস জেল এবং হাজার টাকা জরিমানা হয়েছিল।

সে যুগের যোদ্ধাদের মধ্যে আর ছিলেন হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ মুখার্জি। নীলকর সাহেবরা তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিল। মামলা দায়ের হতে না হতেই হরিশ মুখার্জির মৃত্যু হয়; কিন্তু সুসভ্য ইংরেজের কাছে অত সহজে কেউ কখনো নিষ্কৃতি পায় না। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীর নামে মামলা রুজু হল। তুমি না করেছ তো তোমার স্বামী করেছে—এটা হল বিশপের নীতিকথা (ঈশপের নয়)। হরিশ মুখার্জির স্ত্রীকে হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে মামলা আপোষ করতে হয়েছিল।

হায়রে, ছেলেবেলায় England's Work in India পড়ে আমরা পরীক্ষা পাশ করেছি। ইংরেজ সুশাসনের গুণগান না করে কিনা আজ ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধার করতে বসেছি। কি করব, যে কবি আমার ন্যায় ভদ্রোচিত শিক্ষা পেয়ে আমার মতো অন্ধ কিম্বা খঞ্জ হন নি তিনি কিনা বলছেন—

> নীল বাঁদরে সোনার বাংলা কর্লে এবার ছারখার
> অসময়ে হরিশ মোল, লংএর হল কারাগার
> প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।

ইংরেজ সুশাসনের সুবিস্তৃত বর্ণনা পড়েও আমি যদি কবির কথাই বিশ্বাস করি তবে সে অপরাধ কার,আমার না কবির, না ইংরেজের? ইংরেজই সে কথার জবাব দিক।

যে মহাত্মা গান্ধী আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনার গুরু, ভারতবর্ষে তাঁর সত্যাগ্রহের প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল এই নীল আন্দোলন নিয়েই। বিহারের চম্পারণ সত্যাগ্রহ নীলকরদের বিরুদ্ধে। ১৯১৭ সনে তাঁর আন্দোলনের ফলেই বিহার থেকে নীল চাষের উচ্ছেদ হয়। সেই আন্দোলনেই রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রথম আবির্ভাব।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কুঠিবাড়িটা ধীরে ধীরে অন্ধকারে আত্মগোপন করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, পুরোনো ইতিহাসের বিষ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমার মর্মজ্বালা কিঞ্চিৎ উপশম হয়েছে। একালের সব পাঠকদের কাছে ইতিহাস ছিল অস্পষ্ট তাঁদের জন্যে ইচ্ছে করেই এই বিষটুকু পরিবেশন করলুম। কিন্তু তাই বলে নির্জলা বিষ নয়। ইতিহাসকে মন্থন করলে একদিকে যেমন বিষ ওঠে অপর দিকে তেমনি অমৃতও ওঠে। যে পুণ্যস্মৃতি বিদ্রোহীদের নাম করেছি (এ ছাড়াও আরও অনেকে আছেন) তাঁরা স্বয়ং অমৃতস্য পুত্রাঃ। নীলের বিষ পান করে তাঁরা হয়েছেন নীলকণ্ঠ।



শ্রীবিমল মিত্র

[ছাব্বিশ]

চেতলার কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। সুরুচি জাতে উঠলো বলেই যে নিমন্ত্রণ হয়নি তা নয়—বিলাস চৌধুরী জাত মানেন না বলেই হয়নি। শুধু দত্তমশাই একলা এসেছিলেন, সেই অত দূরের চেতলা থেকে। ব্যাপার দেখে তিনি হতবাক্ হয়ে গেছেন। উৎসবের ঐশ্বর্যের আড়ম্বর, আয়োজন আর ঘটা দেখে লজ্জিত হলেন। একদিন সামান্য পঁচিশ টাকা বাড়ি ভাড়ার জন্যে তাগাদা দিয়েছেন বলে আজ এই মুহূর্তে তার কুণ্ঠা হলো।

দুটো রুপোর টাকা দিয়ে দত্তমশাই সুরুচিকে আশীর্বাদ করলেন।

দু'হাত যুক্ত করে প্রণাম করলে সুরুচি। বললে—মাঝে মাঝে দেখা করতে আসবেন দত্ত-মশাই—

দত্তমশাই জিভ কাটলেন। বললেন—সে কি কথা! আমি কি শুধু ভাড়ার তাগাদা করতেই আসতাম নাকি! মাস্টার মশাইকে আমি যে কী চোখে দেখতাম......

মাস্টারমশাই-এর স্মৃতি হঠাৎ যেন দত্ত-মশাইকে শোকার্ত করে তুলেছে এইভাবে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

সেই উৎসব-মুখর পরিবেষ্টনীতে হঠাৎ আবার যেন নতুন করে সুরুচির বাবার কথা মনে পড়লো। এমন করে এত শীঘ্র চলে যাবেন, ভাবা যায়নি। শেষকালে কোন কথাও বলে যেতে পারেন নি। বাবা তাকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। মানুষ হওয়া দূরের কথা, বাবার মাথা হেঁট হয়নি, এই-ই তো যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে মা'র কথাও তার মনে পড়লো। আজ মা উপস্থিত নেই এখানে—হয়ত ভালই হয়েছে।

আইনানুযায়ী পঞ্চাশজনের বেশী নিমন্ত্রিতের সংখ্যা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বিলাস চৌধুরীর বাড়িতে সকাল থেকে শুরু হয়েছে উৎসব—এখন রাত হয়ে এল, তবু অভ্যাগতের কামাই নেই। চারিদিকের আবহাওয়া ঘি আর গরমমশলার উগ্র গন্ধে জমাট। ওদিকের ঘরটা উপহারের সামগ্রীতে ভরে গেছে। খোকা এতক্ষণ জেগে থেকে এবার নতুন বিছানার ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। নতুন জামা কাপড় পেয়ে ওর আজ আনন্দের সীমা নেই।

বিলাস চৌধুরী আজ পাঞ্জাবী আর কোঁচানো ধুতি প'রেছেন। এক একবার এক একজন বিশিষ্ট অতিথিকে নিয়ে ঘরে এসে ঢোকেন। বলেন—সুরুচি ইনি আমার বন্ধু আমাদের ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর মিঃ অমুক ইত্যাদি।

সুরুচি হাত দুটো যুক্ত করে নমস্কার করে মুখে একটু সস্মিত ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে।

তারপর আর একজন আসেন। বিলাস চৌধুরীর বোধ হয় বন্ধুর শেষ নেই। নানা জাতের নানা পোষাকের লোক।

নানান্ উপহার দেন তাঁরা। কেউ কেউ করমর্দন করেন—কেউবা শুধু নমস্কার। বিলাস চৌধুরীর নতুন কেনা ফার্নিচার চারিদিকে সাজানো। সুরুচি নতুন বেনারসী পরেছে। অনেক অলংকার, অনেক পোষাক, অনেক ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। নিউ মার্কেট থেকে ফুলের ঝুড়ি এসেছে। সারা বাড়িময় রান্নার গন্ধে ফুলের গন্ধ চাপা পড়েছে। বিলাস চৌধুরীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়রাও এসেছেন কম নয়।

একজন মহিলা এসে বলেন—এ'কে তুমি চিনবে না বৌদি, এ'র সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই......

কত রকম সম্পর্কের উল্লেখ করেন মহিলাটি, কত নাম বলেন, সব কি সুরুচি মনে করে' রাখতে পারে?

—আমি তোমার পিসশাশুড়ী হই বৌমা, আমাকে চিনতে পারবে না......বিলাস আমার কোলে মানুষ হয়েছিল......

আগে এই ঘরেই বিলাস চৌধুরীর আগের পক্ষের স্ত্রীর একটা অয়েল পেণ্টিং ছিল। আজ সেটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুরুচি হাসলো। হাসলো এই ভেবে যে, অয়েল পেণ্টিংখানা ওখানে থাকলে যেন সে খুব দুঃখ পেত। দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে যেন জোর করে কেউ তাকে দিচ্ছে। যেন সে জেনেশুনেই বিয়ে করছে না। সকলের মুখ-চোখের ভাব দেখে এই কথাই তার মনে হয়েছে, সবাই যেন তাকে প্রচ্ছন্ন করুণা করছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের ঈর্ষার শেষ নেই, তা-ও সুরুচি বুঝতে পারে। এতবড় সম্পত্তির মালিক বিলাস চৌধুরীর স্ত্রী সে—সুরুচির নিজের সন্তানই সমস্ত ভোগ করবে, ভাগীদার হবার দুর্ভোগ তাকে বইতে হবে না, এইটেই তাদের ঈর্ষার কারণ। অথচ কেউই আসল তথ্যটুকু জানে না। কতখানি নিরর্থক এই বিয়ে সুরুচির কাছে, একথা সুরুচি নিজে ছাড়া আর কা'রই বা জানবার কথা। একমাত্র যে জানে, সেই পিসীমা তার বিয়ের খবর পেয়ে কাশী থেকে চলে আসা দূরের কথা, একটা চিঠি লিখেও আশীর্বাদ করা প্রয়োজন বোধ করেন নি। সুরুচির কাছে কত অসার তার এই বিয়ে, এই উৎসব, এই ঐশ্বর্য, এই বেনারসী শাড়ী, গয়না আর সকলের ওপর এই সিঁথের সিঁদুর।

—বাঃ, বেশ বউ হ'য়েছে—

—অনেক তপস্যা করলে বিলাসের মত অমন স্বামী পাওয়া যায়—

কে একজন চুপি চুপি বললে—মিস্টার চৌধুরীর স্ত্রী-ভাগ্যটা বরাবরই ভালো—

আজ রাত্রে সুরুচি বিয়ের ক'নে। সমস্ত চুপ করে শুনে যাবার পালা। আজ তর্ক করতে নেই, প্রতিবাদ করতে নেই। তা'ছাড়া সে তর্ক কোনওদিনই করবে না। বিয়ে তার প্রয়োজন, কারণ সে ক্লান্ত। একা সে খোকাকে কেমন করে মানুষ করবে! কোথায় তার সামর্থ্য! সে মানুষ হবে—আরো দশজনের মত সে সবার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তা'র যাবার পথে কোনও বাধা সুরুচি রাখবে না— নিজেকে না হয় সে আহুতিই দিল, কিন্তু খোকা, তার খোকা মানুষ হয়ে তার মুখ উজ্জ্বল করবে।

অনেক রাত্রে সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে এল।

সুরুচি যা' ভেবেছিল তাই। বিলাস চৌধুরী একলা ঘরে ঢুকলেন। সারা দিনের পরিশ্রমে বড়ই শ্রান্ত। ঘরে ঢুকে নিজের মনেই যেন বললেন—উঃ এতক্ষণে [illegible] মিটলো—

সুরুচির দিক থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে বিলাস চৌধুরী বিছানায় বসতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বিছানার এক কোণে খোকাকে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন—খোকা খেয়েছে তো?

সুরুচি বললে—হ্যাঁ, গোপাল ওকে খাইয়ে এনেছে—

সুরুচি হাসলো আবার। যেন খোকা অন্য ঘরে থাকলে বিলাস চৌধুরী স্বস্তি পেতেন না

যখন খোকা খেলে কি না খেলে, সে খবর রাখা বিলাস চৌধুরী নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন।

বিলাস চৌধুরী খানিক থেমে বললেন—ওকে বিছানা পেতে শোয়ান হয়নি কেন? গোপালকে ডাকবো?

সুরুচি এগিয়ে গেল। বললে—গোপালকে ডাকতে হবে না, আমিই শোয়াচ্ছি—

বিলাস চৌধুরী আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সুরুচি তার আগেই খোকাকে কোলে নিয়ে পাশের ঘরে গেল। সে-ঘরে অনেক উপহার সামগ্রীর ভীড়। খোকা বরাবর সুরুচির পাশে শুয়ে এসেছে। আজ প্রথম সে একলা আলাদা শোবে।

বিলাস চৌধুরী একলা বসেছিলেন। অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল, সুরুচির দেখা নেই। বিছানা থেকে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন বিছানার ওপর খোকার পাশে সুরুচিও শুয়ে পড়েছে। বিলাস চৌধুরীর কেমন সন্দেহ হলো, শরীর খারাপ হলো নাকি! কপালে হাত দিতেই সুরুচি চোখ তুলে চাইলে।

একটু লজ্জিত হয়ে সুরুচি বালিশের ওপর মুখ ঢেকে বললে—ভয়ানক মাথা ধরেছে আমার......

—মাথা ধরেছে!

বিলাস চৌধুরীর ভাবনা হলো। মাথা ধরার ওষুধ অবশ্য ঘরেই আছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর মাথা ধরা বিচিত্রও নয়। ডাক্তার সেনকে এখন ডাকলে হয়। সন্ধ্যের আগে একবার এসে উৎসবে যোগ দিয়ে গেছেন। কিন্তু এমন দিনে সুরুচির অসুখ হওয়াটাই কি উচিত ছিল!

হঠাৎ সুরুচির কি যে হলো! সমস্ত ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল সুরুচি। এক নিমেষে যেন সে সুস্থ হ'য়ে পড়ল। বিলাস চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে মাথা নীচু করে বললে—এখন আমি বেশ সুস্থ বোধ করছি, আজকের দিনে শরীর খারাপ হ'তে নেই—

কথাটা বলে' সুরুচি চোখের জল আড়াল করে নিলে। বিলাস চৌধুরী হয়ত এ চোখের জলের ভুল অর্থ করবে। সত্যিই তো, সুরুচির তো তাঁর ওপর কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। সুরুচির পায়ের তলায় মাটির আশ্রয় দিয়েছে যে, তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, এমন ব্যবহার করতে নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল এই সেদিন।

এখন প্রবাসী সৈনিকরা বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ইরান, ইরাক, টোকিও থেকে ফিরে এসে দেখলে যুদ্ধে তারা জাপানীদের আর জার্মানদের হারিয়েছে বটে, কিন্তু নিজের ঘরেই তারা হেরে বসে আছে। এখানে এটম্ বোমা ফেলেনি কেউ, তবু লক্ষ লক্ষ লোক মরে ভূত হয়ে গেছে। মিলিটারী লরীর চাকার তলায় হাজার হাজার লোক প্রাণ দিয়েছে। দেশে ফিরে এসে তারা আর একটা নতুন শব্দ শুনলে—'জয় হিন্দ'। যাদের তারা যুদ্ধে জিতিয়ে দিলে, তারা এখানে



আপনাদিগকে প্রতীক্ষায় রাখার জন্য আমরা মাফ চাহিতেছি

'নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল' এবং অপরিহার্য উপাদানাদি পাওয়ার প্রশ্ন বাদ দিলেও ফেবর-লিউবার একটি ওয়াচ তৈরী করিতে বহু সময় লাগে; কারণ কারিগরী বিদ্যার চরম নিদর্শনরূপেই প্রত্যেকটি ওয়াচ তৈরী করা হয়। কাজেই আপনাদিগকে প্রতীক্ষায় রাখার জন্য আমরা দুঃখিত; কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া থাকুন, একদিন আপনারা ফেবর-লিউবার ঘড়ি পাইয়া গৌরব বোধ করিবেন।

FAVRE-LEUBA

ফেবর-লিউবা এণ্ড কোম্পানী, লিমিটেড * বোম্বাই * কলিকাতা।

সত্যি কথা বললে এখনও বন্দুক উঁচিয়ে ধরে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে মৃত্যু বুঝি বড় সুলভ হয়ে গেছে। একটা ছোট ছেলেকে চাপা দেওয়ার অপরাধে সারাদিন ধরে পঞ্চাশখানা মিলিটারী লরীতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। এরা সাদা চামড়ার সৈন্যকে ধরে 'জয় হিন্দ' বলিয়ে ছাড়ে।

যুদ্ধ যেন ছিল ভাল। কিন্তু এখন পেট-ভরে খেতে পায় না কেউ। কারাপ্রাচীরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন মহাত্মা গান্ধী তিনি আনলেন শান্তি আর শৃঙ্খলার বাণী। যারা এতদিন জেলের ভিতর পোরা ছিল, তারাও বেরুল। তবু শহরের চারিদিকে কেবল হরতাল।

বিলাস চৌধুরীর অফিসে সেদিন যাওয়া হ'লো না। বাস, ট্রাম, গাড়ি ঘোড়া সমস্ত বন্ধ। গাড়ি রাস্তায় বার করাও বিপজ্জনক। জামা-কাপড় প'রে তৈরী হয়েও বেরুনো হলো না। সামনের বাগানের মধ্যে খানিকটা দাঁড়িয়ে ভেতরে আসছিলেন। পেছন থেকে দারোয়ান একটা চিঠি দিয়ে গেল হাতে।

খামের চিঠিটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন। সুরুচি বাড়ির পশ্চিমের অংশে তার সংসার পেতেছে। বিলাস চৌধুরী দক্ষিণ দিকের অফিস ঘরে বসে' টেলিফোন তুলে নিলেন।

নতুন করে বিয়ে করেছেন বিলাস চৌধুরী আজ কয়েক মাস, সুরুচি এখন আর অফিসে যায় না। অফিসে যা'রা কাজ করে, তা'রা হয়ত তেমন মনোযোগ দেয় না। অফিসের কাজে আজকাল অনেক ফাঁকি ধরা পড়েছে। নিজেকে এখন বেশী পরিশ্রম করতে হয় অফিসের জন্যে। একটা সুবিধেমত লোক দরকার। সুরুচির এখন অফিসে যাওয়াও ভাল দেখায় না। তা' ছাড়া সংসার তো এতদিন চাকর-বাকরদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া ছিল—সেখেনেও চুরি কম ছিল না। সুরুচি নিজে রাঁধে কিংবা রান্নার তদারক করে। সুরুচি রান্নাঘরের দিকে নজর দেবার পর থেকেই খেয়ে আজকাল তৃপ্তি পাচ্ছেন বিলাস চৌধুরী।

এই ঘরে বসেই শুনতে পা'ওয়া যায় অন্দর মহলের ঘর থেকে রেডিওর গানের সুর আসছে। সুরুচি বোধ হয় জানেও না যে, বিলাস চৌধুরীর আজ অফিসে যাওয়া হয়নি। এক একদিন সুরুচিকে গান গাইতে শুনেছেন বিলাস চৌধুরী। তাঁর সামনে কোনওদিন গায় না। চমৎকার গলা সুরুচির। এক এক সময় মনে হয়—হয়ত এতদিন পরে বিয়ে করা তাঁর উচিত হয়নি। আয়নার সামনে দাড়ি কামাবার সময়ে মুখে সাবান ঘষতে ঘষতে কপালের রেখা-গুলোর দিকে নজর পড়ে। ঘাড়ের কাছে মাথার দু'একটা সাদা চুল চোখে ধরা পড়েছে। গরদের শাড়ী প'রে গলায় আঁচল দিয়ে সুরুচি সূর্য প্রণাম করছে। কা'কে দিয়ে একটা তুলসী গাছ নিয়ে এসে টবে পুঁতেছে। একটা ঘরকে ঠাকুর ঘরে পরিণত করেছে। সেখানে জুতো প'রে কারো প্রবেশ করবার অধিকার নেই। তবু বাইরে থেকে বিলাস চৌধুরী দেখেছেন, ভেতরের দেয়ালে অসংখ্য দেব-দেবীর ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে। রোজ মালি এসে পুজোর ফুল দিয়ে যায়। সন্ধ্যেবেলা পুজোর কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ কানে আসে। এমন ছিল না সুরুচি বিয়ের আগে। রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে এবং আরো কতগুলো নির্দিষ্ট সময় আছে সুরুচির ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করে নমস্কার করবার।

বিলাস চৌধুরী কোনওদিন ও-সব সম্বন্ধে মন্তব্য করেন নি, বাধাও দেন নি। অবশ্য তিনি বরাবরই ওসব পছন্দ করেন; কিন্তু বাড়া-বাড়িটাও তাঁর ভাল লাগে না। তা' সুরুচি যে বাড়াবাড়ি করে না, সেইটুকু ভাল। তিনি লক্ষ্য করেছেন—সুরুচি যত্ন করে' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজে, চুল বাঁধে। রান্নার তদারক করে। বাজার আনার পর চাকরের কাছে হিসেব করে' বাকি পয়সা ফেরৎ নেয়। খোকাকে সাজিয়ে জামা-কাপড় পরিয়ে চাকরকে সঙ্গে দিয়ে পার্কে বেড়াতে পাঠায়। তাঁর পাশে বসে খাওয়ার তদ্বির করে।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলেন বিলাস চৌধুরী।

ওই অনন্ত আকাশের মত রহস্যময় মনে হয় সুরুচিকে। কল্পনা করা যায় না, ওই সুরুচিই একদিন বাসে চড়ে' আফিসে গিয়ে চিঠি টাইপ করেছে।

অন্যমনস্কভাবে নড়ে' বসবার সময় হাত থেকে চিঠিটা পড়ে' গেল। এতক্ষণ চিঠিটার কথা মনেই ছিল না। খামটা নীচু হয়ে হাত দিয়ে তুলে নিলেন তিনি। চিঠিখানা হাজারী-বাগের বাড়ির ঠিকানায় ঘুরে রি-ডাইরেক্ট হয়ে কলকাতার নতুন বাড়ির ঠিকানায় এসেছে। এমন আজকাল সাধারণত হয় না।

ক্ষিপ্রহস্তে খামটা ছিঁড়ে ফেললেন। ভেতরের চিঠির নীচের নামটা দেখেই কিন্তু চমকে উঠেছেন সামনের আকাশটার সমস্তখানি চোখের সামনে মাটিতে ভেঙে পড়তে দেখলেও এতখানি চমকে ওঠবার কথা নয়। আজ এতকাল পরে আনন্দ তাঁকে চিঠি লিখবে, এ যেন স্বপ্নেও ভাবা যায় না। বহুদিন পরে আনন্দর মুখখানা মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সে তো আজ অনেকদিন আগেকার কথা।

লম্বা চিঠি লিখেছে আনন্দ। এক নিশ্বাসে সমস্ত চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর নিশ্বাস দ্রুত পড়তে লাগল। আনন্দ অনুমতি চেয়ে লিখেছে, সে আবার এ-বাড়িতে চৌধুরী তাকে ফেরবার অনুমতি দেন, তবেই সে এ-বাড়ির ছেলের মতন এখানেই ফিরে আসবে, আর তা' না হ'লে তা'র পথ সে নিজেই বেছে নেবে। ভারতবর্ষের সব দেশেই সে প্রকাশ্য-ভাবে বাস করতে পারে—কারণ এবারকার পথ তা'র আত্মগোপনের পথ নয়, হিংসার পথ নয়।

পড়তে পড়তে দুই চোখ বন্ধ করে বিলাস চৌধুরী ভাবতে লাগলেন। সুরুচিকে একবার জিগ্যেস করলে ভাল পরামর্শ পাওয়া যেত। কী যে করবেন তিনি, বুঝতে পারলেন না। সুরুচি আনন্দকে কেমনভাবে যে গ্রহণ করবে, সে-ও একটা সমস্যা।

চিঠিখানা নিয়ে বিলাস চৌধুরী আবার পড়তে লাগলেনঃ

"......সেদিন আমি ভুল করেছিলাম। শুধু আমি নয় বাবা, আমাদের সকলের ভুল হয়েছিল। জাতির স্বাধীনতার ইতিহাসে এ বড় মারাত্মক ভুল। আমাদের দলে যারা ছিল, তারা খুব মুষ্টিমেয়; কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে এমন কোন ত্যাগ নেই, যা তারা করতে পারতো না বা করে নি,—প্রাণ দেওয়া তো তুচ্ছ কথা। আজ আমরা বুঝতে পেরেছি, আমাদের অনেককে সেদিন অকারণে প্রাণ দিতে হয়েছে। সে প্রাণবলি দিয়ে দেশের স্বাধীনতার কাজ এতটুকু এগোয় নি। সেদিন আমরা ভাবতাম, আমরা এক একজন এক একটা ইংরেজ খুন করে বা একটা কেল্লা দখল করে সরকারকে ভয় পাইয়ে দেশে স্বরাজ আনবো। ভাবতাম আমাদের মত কয়েকটা ছেলে সারা ভারতবর্ষময় একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করতে পারলে ওরা একদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবে। এ পথে যাওয়ার ফলে কয়েকজনের ফাঁসিও হয়েছিল। আমরা তা' বলে' দমি নি। কিন্তু দেখলাম, ওদের শিকড় এখানকার মাটিতে এমনভাবে ছড়ানো, ওদের কামড় এখানে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে দাঁত বসিয়েছে যে, এ তুলনায় একজন বীর বা কয়েকজন বীর বা কয়েকশ' বীরও পারবে না। ইতিহাস বদলানো একজন বীরের কাজ নয়, বা একশ' বীরেরও কাজ নয়। জনসাধারণ মানে চাষী, মজুর, কুলি, কামীন বলতে যা বুঝি, সকলে এক সঙ্গে হাত মেলাতে পারলেই ইতিহাস বদলায়। তাদের বরাবর আমরা দূরে সরিয়ে রেখে এসেছি। আমাদের দলের কাজে তা'দের আমরা ডাকি নি। আজ ক'বছর জেলের মধ্যে কাটিয়ে অনেক কথা ভাবলাম, অনেক বই পড়লাম, বহু ইতিহাস ঘাঁটলাম। আমরা যে পথ বেছে নিয়েছিলাম, তাতে জনসাধারণের কোনও অংশ ছিল না। এখন বুঝতে পারছি, আমাদের কত বড় ভুল হয়েছিল। আমাদের কাজ ছিল ব্যষ্টির কাজ—সমষ্টির নয়। কিন্তু ইতিহাস ব্যষ্টিকে স্বীকার

চিঠিখানা আবার বন্ধ করলেন বিলাস চৌধুরী।

তাঁর কপাল ঘেমে উঠলো। উঠে গিয়ে পাখাটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। এতদিন পরে আনন্দ তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। অবশ্য মায়া বেঁচে থাকলে আনন্দ অমন হ'ত না। তিনি থাকতেন তাঁর কাজ নিয়ে, আর আনন্দ একা তার নিজের জগতে বিচরণ করতো। সেখানে তাকে চালনা করবার কেউ ছিল না।

আবার চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন বিলাস চৌধুরী। লম্বা চিঠি। শেষের দিকে এক জায়গায় আনন্দ লিখেছে:

"......আমাদের দেশের বর্তমান জনসাধারণ যন্ত্রযুগের মধ্যে বড় হয়েছে। তারা বিপ্লবের জন্যে তৈরী হয়েছিল, অথচ তাদের বাদ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি টলান বাতুলতা ছাড়া আর কী। নির্জন কারাকক্ষে ব'সে আমি আমার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। এখনি বুঝেছি, ইতিহাসই নেপোলিয়ানকে সৃষ্টি করেছে—নেপোলিয়ন ইতিহাস সৃষ্টি করেন নি। সামন্ততান্ত্রিক যুগে যদিও বা ব্যক্তিত্বের কিছু মূল্য ছিল,—আজ তা' নেই। আজ সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে। গ্রাম, সহর, মুটে, মজুর, কেরাণী সবাইকে চাই। গান্ধীজীর পরিকল্পনায় তাই সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের সংস্কারের কথাই মুখ্য। বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে আমাদের বর্তমান সভ্যতাকে। গ্রাম থেকে আমাদের সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছে—সেই গ্রাম বাঁচলেই আমাদের দেশ বাঁচবে। তবেই নতুন করে' আমাদের ইতিহাস গড়ে' উঠবে। তবেই ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি অক্ষুণ্ণ থাকবে......"

চিঠিখানা আবার বন্ধ করলেন বিলাস চৌধুরী।

বহুদিন পরে আনন্দ তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, এ তো আনন্দের কথা। সে কতদিন আগে আনন্দ চলে' গেছে। ভুলেই গিয়েছিলেন তাকে। নিজের মনের সঙ্গে বহু যুদ্ধ করেই ভুলে ছিলেন এতদিন। বিলাস চৌধুরীর মনে পড়ল, সে দিনের আত্ম বিস্মৃতির সেই দুঃসহ তপশ্চরণ। তিনি নিজের হৃদয়কে কঠোর করে তুললেন,—মনকে প্রবোধ দিলেন,—যে বাতিল হয়ে গেছে, তার কথা মনে করে' রেখে কোনও লাভই নেই। বহুদিনের অদর্শনে, বহুদিনের চেষ্টায়, বহু রকম কাজের ঘূর্ণিপাকে তাঁর স্মৃতির অবচেতন স্তরে যে আনন্দ একদিন তলিয়ে গিয়েছিল, সে যে ফিরে আসবে, এ-কথা কে-ই বা ভাবতে পেরেছিল!

আবার চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন। শেষের দিকে লিখেছে আনন্দ:

"......আশা করি, আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন। আমি আবার বাড়ী ফিরে যাবো, এ-কথা নিজেই আগে কোনও দিন ভাবিনি। কিন্তু আজ আমি আমার মত বদলিয়েছি। আমি বাড়ীতে থেকেই আবার দেশের কাজ করবো। আমি জেল থেকে আসছে চব্বিশ তারিখে ছাড়া পাবো। আপনি যদি আবার আমাকে বাড়ী ফিরে যেতে অনুমতি দেন, তবে জেল থেকে বেরিয়ে সোজা হাজারিবাগের বাড়ীতে চলে' যাবো। আর যদি আপনার অনুমতি না-ই পাই, ভাববো......"

আনন্দ জানে না যে, বিলাস চৌধুরী কলকাতায় বাড়ী কিনেছেন। যদি আনন্দকে বাড়ীতে আসবার অনুমতি দিতে হয় তো আজই টেলিগ্রাম করে' দিতে হবে। কিন্তু......

বিলাস চৌধুরী উঠলেন। চিঠিটা হাতে নিয়ে পশ্চিম দিকের অংশে গেলেন। সুরুচি এখন খাওয়া-দাওয়া সেরে খোকাকে নিয়ে হয়ত ঘুম পাড়াচ্ছে, নয়ত সেলাই-এর কল নিয়ে বসেছে। সকালবেলা উঠেই সুরুচি পূজোর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারপর রান্নার তদারক করতে করতে বেলা হ'য়ে যায়। তারপর খোকাকে নিয়ে তার কাজের শেষ থাকে না। তাকে স্নান করানো—খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো। তারপর দুপুরবেলায় সুরুচির সেলাই, পড়া, আর বিশ্রাম যা' কিছু সব।

বিলাস চৌধুরী চিঠিখানা হাতে নিয়ে সুরুচির ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন।

গাড়ী আসবে হাওড়া স্টেশনে বিকেল পাঁচটায়। তবু খুব সকাল থেকেই সুরুচির কাজের আর অন্ত নেই। বহুদিন পরে ছেলে আসছে, জেল থেকে বেরিয়ে সোজা আসছে এ-বাড়ীতে। সুরুচির তো আনন্দ হওয়াই উচিত! বিলাস চৌধুরী প্রথমটায় যেন সসংকোচে তার কাছে কথা পেড়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, সুরুচি আপত্তি করবে। হাসি এসেছিল সুরুচির। যেন আপত্তি করবার অধিকারই তার আছে।

ঘরগুলো পরিষ্কার করিয়ে, বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় সব আজ বদলাতে হয়েছে। বিলাস চৌধুরীকে ক'দিন থেকেই যেন বেশ খুসী দেখা যাচ্ছে। বাগানটা তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরিষ্কার করিয়েছেন। বিকেল পাঁচটায় ট্রেণ।

বাড়ীর চাকর, ঝি, ঠাকুর সবাই যেন সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছে। আজ কাজের এতটুকু ত্রুটি হ'লে কী যেন অনর্থ ঘটে যাবে! ব্যস্ত হ'য়ে সবাই নিজের কাজ করছে।

—মা—

ঠাকুর এসে ডাকলে।

সুরুচি খোকাকে জামা কাপড় পরাচ্ছিল। মুখ ফিরিয়ে বললে—কী?

—মাংস রান্না হবে, কিন্তু আদা নেই ঘরে।

আদা নেই তা-ও কি সুরুচিকে দেখতে হবে নাকি।

গোপালকে বল। যা' নেই বল—একসঙ্গে সব আনুক। বার বার বাজারে যাবে নাকি ওরা।—

সাজতে চায় না খোকা। নতুন জামা পরিয়ে, পাউডার মাখিয়ে খোকার গালে চুমু খেয়ে সুরুচি বললে—বাঃ, এবার তোমায় দেখে মামাবাবু বলবে নিশ্চয়ই—

খোকা বলে—কে বলবে?

—কে আসবে দেখবে'খন। আজকে আসবে এখুনি, তোমাকে মামা বলে ডাকবে—

সমস্ত বাড়িটাই নতুন করে পরিষ্কার করান হয়েছে। বাগানের বাজে ঘাসগুলো কেটে সাফ করা হয়েছে। সুরুচি আজ নতুন কেনা একটা সাড়ি পরেছে—বেশি জমকালো না দেখায়, অথচ আনন্দের অভিব্যক্তিটাও প্রকাশ পায় এমনি। ঠিক কেমন করে অভ্যর্থনা করতে হবে আনন্দকে, ভাবতে লাগলো সুরুচি। বিলাস চৌধুরী নিজেও আজকে ধুতি পাঞ্জাবী পরে স্টেশনে গেছেন। নাগেশ্বর শেষ মুহূর্তে বললে নতুন গাড়িটায় ইঞ্জিনের একটু দোষ হয়েছে। অগত্যা পুরোণ হুডখোলা গাড়িটাই নিয়ে গেছেন। নাগেশ্বর কিছু বকুনিও খেলে বিলাস চৌধুরীর কাছে। গাড়ির তদারকের জন্যেই যখন তাকে রাখা হয়েছে, তখন এই গাফিলতি অসহ্য।

ইমারতের রং ও বার্ণিশ
মার্কেন্টাইল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মিসেলেনী
৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তবু এতদিন পরে আনন্দ ফিরছে, নতুন গাড়িটা গেলেই তো ভালো হ'ত!

দক্ষিণের বারান্দার ওপর খোকাকে কোলে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সুরুচি।

পেছন ফিরে দেয়ালের ঘড়িটা দেখলে। সাড়ে চারটে বেজে গেছে। আর আধঘণ্টা মাত্র বাকি! তারপর স্টেশন থেকে এইটুকু আসতে কতটুকু সময়ই বা লাগবে! বিলাস চৌধুরী অবশ্য সুরুচিকে স্টেশনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন প্রথমে। সুরুচিও আপত্তি করেনি। আপত্তি করবেই বা কেন! শেষে তিনিই বললেন, —না থাক্ তুমি এদিকটা বরং দেখো—চায়ের ব্যবস্থাটা তুমি করে রাখ—

চায়ের ব্যবস্থা সমস্ত ঠিক করেই রেখেছে সে। আনন্দর শোবার ঘরটাও সাজান হয়েছে। দক্ষিণ দিকের একটা বড় ঘরই তার জন্যে ঠিক করেছেন বিলাস চৌধুরী। আনন্দ পড়তে ভালবাসে বলে' বিলাস চৌধুরী কাল কয়েকখানা বইও কিনে এনে সাজিয়ে রেখেছেন বিছানার পাশের শেলফে। ফুল আনিয়ে টেবলের ওপর 'ভাসে' বসিয়ে দিয়েছেন! বহুদিন পরে ফিরে আসছে—নতুন করে ভাল রান্নার ব্যবস্থাও করেছে সুরুচি। সুরুচির দিক থেকে কোথাও কোনও ত্রুটি নেই।

বাগানের ওপর বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে সুরুচির যেন কেমন ভাবান্তর হলো। যেদিন বাবাকে এই ঘর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেদিন এখানেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল সুরুচি। সেদিনের কথা মনে পড়লে এখনও চোখে জল এসে পড়ে। পিসীমা কাশী থেকে আর কোনও খবরও নেন না। খোকা যদি না থাকতো, কেমন করে কাটতো তার এই জীবন! খোকাকে কোলের মধ্যে আরো জড়িয়ে ধরলে সে। খোকা আছে বেশ! আলোছায়ার খেলা ওর জীবনে কোনও রেখাপাত করে না।

গোপাল এসে বললে—দিদিমণি ভাঁড়ারের চাবিটা দিন—পায়েসের জন্যে চিনি বার করতে হবে—

খানিক পরে আবার এসে বলে—পয়সা দিন দিদিমণি, পান কিনে আনতে হবে—

গোপালের কাজের শেষ নেই। কতদিন থেকেই তার খাটুনি অনেক বেড়েছে। তবু গোপাল আছে বলেই সুরুচির কিছুটা পরিশ্রম লাঘব হয়। সুরুচির ঠাকুর ঘরের সব কাজ গোপাল না হলে কে করতো!

এক একটা মটরের শব্দ হয় আর সুরুচি সচকিত হয়ে ওঠে। ট্রেন বোধহয় লেট।

কিন্তু হঠাৎ একসময় পরিচিত মটরের শব্দে চমকে ওঠে সুরুচি। আসছে। সুরুচি যা ভেবেছে, ঠিক। নাগেশ্বর পুরোগ মটরটা রাস্তার মোড় ঘুরিয়ে আনছে বাড়ির দিকে। গাড়ির ভিতরে দুজন বসে আছেন। অল্প অন্ধকারে [illegible] রাস্তা থেকে বাগানের গেটের সামনে আসতেই দারোয়ান গেট খুলে দিয়ে সেলাম করে' দাঁড়াল। হঠাৎ যেন সুরুচির চোখ দুটোর দৃষ্টি তীক্ষ্ন হয়ে এল। কিন্তু অল্প অন্ধকার হয়ে এসেছে চারিদিকে, সুরুচি ভাল করে দেখতে পেলে না। গাড়িটা নিচে এসে গাড়িবারান্দায় দাঁড়াল। নিচে থেকে গাড়ির দরজা বন্ধ করবার শব্দ এল। সুরুচি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। কেমন যেন অস্বস্তি লাগলো তার! কেমন করে অভ্যর্থনা করতে হবে, তাই যেন সে ভাবতে লাগলো।

নিচে বিলাস চৌধুরীর গলা শোনা গেল। তিনি এসেছেন—এবং একটার পর একটা ঘর পার হয়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে তাঁকে। সুরুচি তখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল খোকাকে কোলে নিয়ে।

হাঁক, ডাক, ত্রস্ত পায়ে চাকর বাকরদের যাতায়াতের শব্দ এখান থেকে কাণে আসছে।

বিলাস চৌধুরী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন। পেছনে আনন্দ আসছে—তাদের দুজনের পায়ের শব্দ শোনা গেল।

সুরুচি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এখনি ওরা এদিকে আসবেন। সুরুচি ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিলে। প্রথমে কী কথা বলবে সে, কে জানে!

দূর থেকে বিলাস চৌধুরীর গলা শোনা গেল।

বিলাস চৌধুরী বলছেন—বাড়িখানা এখনও শেষ হয়নি, পূর্বদিকটাতে একখানা ঘর বাড়িয়ে দিতে হবে—

তারপর আবার বললেন—সিমেণ্টের দরও খুব চড়া ওই দক্ষিণ দিকের ঘরে তোমার শোবার ব্যবস্থা করেছি—

তারপর সত্যি সত্যিই তারা দুজন ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সুরুচি বারান্দা পেরিয়ে ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই বিলাস চৌধুরী ঘরের আলোর সুইচটা টিপে দিলেন। সুরুচিকে হঠাৎ সামনে দেখে কেমন যেন চমকে উঠ্‌ল আনন্দ। এক মুহূর্ত সুরুচির মুখের দিকে নিশ্চল, নিস্তব্ধভাবে তাকিয়ে থেকেই, তার কোলে খোকার উপর দৃষ্টি পড়তেই আনন্দের মুখখানা সাদা—ফ্যাকাসে হেয় গেল। সারা-মুখের রক্ত শুষে গিয়ে কান দুটোতে জমাট বেঁধে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল! সঙ্গে সঙ্গে সুরুচির হৃৎপিণ্ডটাও যেন ভারী একখানা পাথরের চাপে পিষে থেঁতলে নির্জীব অসাড় হয়ে এল। সুরুচির মনে হলো, সে যেন সামনে ভূত দেখছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক অননুভূত আতঙ্কে থর থর করে কাঁপতে লাগলো তার।

আনন্দ! আনন্দই তা হ'লে শেখরদা! জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে শেখরদার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে ছুটোছুটি করে' বেড়িয়েছিল সুরুচি। কিন্তু তার সাক্ষাৎ যে অকস্মাৎ এমন মর্মান্তিকভাবে মিলবে, তা কে জানত!

বিলাস চৌধুরী কী বললেন, কিছুই কানে গেল না সুরুচির। শুধু শেখর'দার চোখের ওপর কঠিন পাথরের চোখ দুটো নিবিষ্ট করে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। খোকাকে আরো জোরে কোলের ওপর চেপে ধরে সে যেন তার ওপর নির্ভর করতে চায়। বাইরের আলো-বাতাস সমস্ত যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে—আর সে যেন আত্মহত্যার পণ করে সেখানে দাঁড়িয়ে উত্তাল অন্তিম মুহূর্তগুলোর সামনে মাথা পেতে দিচ্ছে। জীবনও নয়—মৃত্যুও নয়—এক অস্বাভাবিক অসহনীয় অনুভূতি তার সর্বাঙ্গ গ্রাস করছে!

বিলাস চৌধুরী সকাল বেলাই ডাকাডাকি সুরু করেছেন।

—আনন্দ কোথায়—আনন্দ কোথায় গেল—দেখেছিস কেউ?—

চাকর-বাকর, দারোয়ান কেউ উত্তর দিতে পারে না। সুরুচি নিজের ঘরের মেঝের ওপর বসে চুপ করে সব শুনতে লাগলো। সে জানে! শুধু সুরুচি জানে! শেখরদা' কোথায় গেছে, আর কেউ না জানুক সুরুচি জানে! অনেক—অনেক দূরে এতক্ষণ শেখরদা' এই বাড়ি ছেড়ে দ্রুত পায়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছে। এ-সংসার তাকে প্রবঞ্চিত করেছে। আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে সুরুচি চোখ বুজলো। নিজেকে আর কখনও সে চিনতে পারবে না। ও সুরুচির মূর্তি নয়, ও তার প্রেতাত্মা। তার জ্বলন্ত আত্মার ধূমায়মান ভস্মাবশেষ।

(সমাপ্ত)

শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে

শ্রীবিমল মিত্রের

উপন্যাস

ছাই

প্রকাশক

কমল পাব্লিশিং হাউস

৮/১এ, হরিপাল লেন, কলিকাতা। (৬)

ভাল জিনিষের আদর সর্বত্রই!

অনেক ভাল জিনিষের মত দুলালের তালমিছরীরও চাহিদা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, চাহিদার অনুপাতে আমরা মাল সরবরাহ করিতে সমর্থ হইতেছি না। এজন্য আমাদের প্রিয় গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সেজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আশা করিতেছি, খুব শীঘ্রই আমরা পূর্বের ন্যায় প্রচুর মাল সরবরাহের দ্বারা আবার আমাদের প্রিয় খরিদ্দারগণের তুষ্টিসাধনে সমর্থ হইব।

বিনীতঃ—

দুলালচন্দ্র ভড়

দুলালের তালমিছরি

—প্রস্তুতকারক—

হেড অফিসঃ—৩নং বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন—বি, বি ৫৮৯৬

আপনার
কম খরচার খাজাঞ্চী

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস—
২১এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১
ফোন—কলিকাতা ১৫৪৪
টেলিগ্রাম—ষ্টংরুম।

শাখাসমূহ

ঢাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, ক্যানিং, সোনারপুর, কোন্নগর, রামপুরহাট বারহারওয়া সাহিবগঞ্জ (এস্, পি) রঘুনাথগঞ্জ, আওরংগাবাদ (মুর্শিদাবাদ)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—

ডি. এন. চ্যাটার্জি,
এফ আর ই. এস. (লণ্ডন)

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট :: কলিকাতা।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

	বৎসর	আদায়ী মূলধন		ডিপোজিট	
এপ্রিল (উদ্বোধন মাস)	১৯৪০	৩,০৯,০০০,	উর্ধ্বে	১,০৫০,	উর্ধ্বে
ডিসেম্বর —	১৯৪০	৫,৭২,০০০,	"	৩,১৯,০০০,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪১	৮,১৮,০০০,	"	২৪,৮২,০০০,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪২	৯,৪৭,০০০,	"	৪০,০০,০০০,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪৩	১০,০০,০০০,	"	১,১০,০০,০০০,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪৪	১০,২০,১৭৫,	"	২,১৪,৬৯,২২৭,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪৫	১০,৫৭,৬৫০,	"	৩,০৭,১১,৬৪০,	"

জাতীয় শিল্প ও ব্যবসার সমৃদ্ধিকল্পে প্রকৃত ব্যবসায়ীকে সুবিধাজনক সর্তে টাকা দেওয়া হয়।

আলামোহন দাশ
চেয়ারম্যান

পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের আয়ুর্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করুন এবং ৬০ বৎসর পর্যন্ত আপনার পাকা চুল কালো রাখুন। আপনার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হইবে এবং মাথাধরা সারিয়া যাইবে। অল্প সংখ্যক চুল পাকিলে ২॥০ টাকা মূল্যের এক শিশি বেশী পাকিয়া থাকিলে ৩॥০ মূল্যের এক শিশি, যদি সবগুলিই পাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ৫ টাকা মূল্যের এক শিশি তৈল ক্রয় করেন। ব্যর্থ হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে।

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবলে কয়েক দিন এই ঔষধ প্রয়োগের পর আশ্চর্যজনক ফল দেখা যায়। এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই ভয়াবহ ব্যাধির হাত হইতে মুক্তিলাভ করুন। সহস্র সহস্র হাকিম ডাক্তার, কবিরাজ বা বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক ব্যর্থ হইয়া থাকিলেও ইহা নিশ্চয়ই কার্যকরী হইবে। ১৫ দিনের ঔষধের মূল্য ২॥০ আনা।

বৈদ্যরাজ অখিলকিশোর রায়

অবেলার অতিথি

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

কুমার বাহাদুর আজ মস্ত সমস্যায় পড়ে গেছেন। জীবনে তাঁর এমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যার অত্যন্ত ন্যায়সংগত প্রতিবিধান তিনি না করতে পেরেছেন। উদ্যোগী পূর্ব-পুরুষেরা অভিযানকারী ইংরেজদের সাম্রাজ্য গঠনে সাহায্য করে খেতাবী রাজা হয়েছিলেন। সাম্রাজ্য ভাঙাগড়ার দিনে তাঁরা বাহাদুরী দেখিয়ে নিজেদের বংশধরদের জন্যে যে নিরুত্তাপ অর্থনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, কুমার যতীশনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর জীবনের বাহাত্তরটা বছর তাকে সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন।

আদিম সামন্ত সংস্থা দুশো বছর ধরে ভাঙতে ভাঙতে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশে পরিণত হলেও সৌভাগ্যক্রমে যতীশনারায়ণের পূর্ব-পুরুষদের বিশেষ ধারাটি অত্যন্ত সুবিবেচক ছিলেন এবং তারই ফলে কুমার বাহাদুর তাঁর উপাধির সংগে সংগে একটি নিরঙ্কুশ উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন।

জীবনে এতটুকু সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়নি। এত বছর বয়সেও খুব সামান্য শোক পেয়েছেন। নিরবচ্ছিন্ন শান্তির তুলনায় সাময়িক কোন আলোড়ন গণনার মধ্যেই আনা যায় না। দীর্ঘ বাহাত্তরটা বছর প্রায় একই ধরণের নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে আটকানো ছিল। প্রথম যৌবনে দু-একটা রাজসিক ব্যতিক্রম যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সেগুলো আভিজাত্যের পরিপন্থী বলে সময়মত পরিত্যাগ করেছিলেন। আত্মমর্যাদার সুদৃঢ় সুস্থতাকে কোনদিন পতনের রসায়নে এতটুকু টলতে দেন নি। প্রত্যহ তিনি ধন্যবাদ দিয়েছেন নিজের অদৃষ্ট-বিধাতাকে, প্রতিনিয়ত স্মরণ করেছেন বংশ-সংস্থাপক পূর্বপুরুষকে, কিন্তু হঠাৎ আজ ভয়ানক সমস্যার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন।

তিনি যে অবিবেচক, সেকথা কেউ প্রমাণ দিয়ে বলতে পারবে না। দুটি মেয়ে ও দুটি ছেলে তাঁর। সর্বপ্রথম কন্যা মাধবীলতা সতেরো বছর বয়সে বিধবা হয়। সমগ্র পরিবার যখন শোকের প্রতিযোগিতায়, একটা সুশোভন উপসংহারের অপেক্ষায় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে, কুমার বাহাদুর কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলেন না। সুবিশাল প্রাসাদের একটি নির্জন অংশে মাধবীলতার বাকী জীবনটা কাটাবার মত অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি ভর্তি করে দিলেন। মাধবীলতার সামনে এমন সুযোগ ধরে দিলেন, যাতে সে ইচ্ছে করলে সারা জীবন, দিন পনেরোর পরিচিত স্বামীর চরণযুগল ধ্যান করে বৈধব্যকে সহনীয় করতে পারে এবং ঠিক একই জায়গায় আরও অনেক সুযোগ বর্তমান রইলো, যাতে সে ইচ্ছে করলে সারাটা জীবন তাস খেলেও কাটাতে পারে। ভবিষ্যতে পাওয়া যায় কি না যায়, এই ভেবে কুমার বাহাদুর সদ্যবিধবা মেয়ের জন্যে দুশো জোড়া রেলীর বাড়ির বাইশ শো বাইশ নম্বর থান কিনে দিয়েছিলেন। পাছে তার কোন সম্মান হানি হয়, সেজন্যে তার আলাদা টাকা এবং সম্পত্তির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। চিরদিন তিনি মাধবীলতার মহলের খুশির উচ্ছ্বাস হাসি এবং হঠাৎ গেয়ে-ওঠা গান শুনে তবে রাত্রে বিশ্রাম করতে গেছেন। প্রতিদিন সকালে মাধবীলতার গরদ-পরা মূর্তিকে গৃহ-দেবতার মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতে দেখলে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। সে-ও আজ প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছেছে। কোন নিরপেক্ষ প্রশ্নকারী নিজেই মাধবী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁর অকুণ্ঠ জবাব পাবে যে, বৈধব্য তাঁর জীবনে তাঁর পিতার সুবন্দোবস্তে এমন কিছু কষ্টকর হয়নি। অবশ্য তাঁর বলা উচিত যে, 'রমণীয়' হয়েছে; কিন্তু বলা আর না বলা বাক্যের মধ্যে অর্থের তফাৎ নেই।

ছেলে দুটি তাঁকে কোনদিন এমন কিছু ভাবায় নি। বড়ছেলের সম্পর্কে তিনি সামান্য একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে আছেন। ছেলেটির নিজের ঘরে সব কিছু থাকা সত্ত্বেও বাইরের আকর্ষণটা যেন একটু বেশী। তাতেও কিছু এসে যেতো না, যদি না তার আভিজাত্য জ্ঞানটা কম থাকতো। নিজের সুন্দরী স্ত্রীর একটানা নৈতিক ভোজের আসর থেকে মাঝে মাঝে অন্যত্র মুখ বদলাতে যায়। কুমার বাহাদুর এতেও এমন কিছু অন্যায় খুঁজে পান না। তাঁর আপত্তি শুধু এই যে, ছেলেটি তার সুনামকে বড় কৃপণের মত রক্ষা করে চলে। চরিত্রের রাহাজানিকে সমারোহের রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা বা সৎসাহস তার একেবারেই নেই, সেজন্যে চুরিকে প্রশ্রয় দিতে হয়। ফলে গোপনতার কানাকানি একদিন কেলেঙ্কারীর মত ছড়িয়ে যায়।

এদিক দিয়ে তাঁর মতে ছোটছেলে খুব খুঁজে পায়নি। বিবাহের প্রথম কয়েকটা মাস স্ত্রীকে নিয়ে খুব বেশী রকমের ভালবাসার বাড়াবাড়ি করেছিল। উন্মাদনা ফুরিয়ে যেতে একের পর এক বিষয় নিয়ে মাতামাতি করেছে। যখনই যা করেছে তাঁর ছেলে, সবগুলোই উৎসবের রূপ নিয়েছে। দিনকতক সাহিত্য-চর্চা করেছিল। তখনকার দিনে তার নিজের মহলে অষ্টপ্রহর সাহিত্য আর সাহিত্যিক গুঞ্জনে ভরে থাকতো।

তারপর কিছুদিন সে কাটালো ঘোড়দৌড়ের মাঠে। দিনকতক ধরে ঘোটক বংশের যে যেখানে সম্ভ্রান্ত, তাদের বংশাবলী টেনে বার করলো। দিবারাত্র মুখরিত হতে থাকলো ঘোটককুলের পিতৃপুরুষ গৌরবগাথায়। কণ্ঠাগত আশা নিয়ে দিনকতক তার ছোটছেলে ঘোড়দৌড়ের ময়দানে ধাবমান অশ্বিনীদের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিলো। এক-একবার তিনি ভেবেছিলেন ছেলেকে বারণ করবেন এই সর্বনাশা নেশা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্যে। কিন্তু কিছুই তাঁকে করতে হয়নি। ঠিক সময়মতই সে নিজেই রাশ টেনে ধরলো। সবই যে লোকসান হয়েছিল, তা নয়, ময়দানের আদান-প্রদানের লাভ লোকসানের খেলায় একটি বাজী সে জিতেছিলো। সেটি হচ্ছে একটি ছায়াচিত্রের অভিনেত্রী। অনেক প্রতিযোগীর হাত থেকে তাকে সে ছিনিয়ে নিয়ে মতিমহলের বাগান বাড়িতে এনে রেখেছিলো। এক মাস সতেরো দিন সে মোটে বাড়িতেই আসেনি। বাগান বাড়ির নিত্য নূতন সমারোহের কথা তাঁর কানে আসতো। সে মোহও আজ তার নেই। কুমার বাহাদুর শুনতে পেয়েছেন এবং খবর রাখছেন যে, তাঁর ছোট-ছেলে এবারে রাজনীতি নিয়ে মেতেছে।

কিন্তু এগুলো তাঁর চিন্তার কারণ নয়। ভালোমন্দ মিশিয়ে বাঁচতে হবে। একজনের ভালো, আর একজনের ভালো নাও করতে পারে। তাঁর ছেলেদের পক্ষে কি সমুচিত হবে না হবে তা নিয়ে তিনি কখনো মাথা ঘামাননি। তিনি চিরকালই এই মত পোষণ করেছেন যে, একজনের ভালো আর একজনের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা উচিত নাও হতে পারে। এদের যাওয়া আসার ধরণ কুমার বাহাদুরের মুখস্থ, এদের দৃষ্টির, দুঃসাহসের সীমা তাঁর কাছে অজানা নেই। এরা সমস্যা নয়।

বাহাত্তর বছর বয়সে আজ তিনি প্রথম বিষণ্ণ মনে চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর চিন্তার বিষয়বস্তু কুমারী অপরাজিতার সমস্যা। অপরাজিতা তাঁর সর্বকনিষ্ঠা সন্তান। প্রৌঢ় বয়সে এই মেয়ে জন্মগ্রহণ করে তাঁকে লজ্জায় ফেলেছিলো। তাঁর স্ত্রীর শেষ সন্তান তাঁর ছোট ছেলে হ'বার অন্ততঃ আট বছর পরে অপরাজিতা জন্মায়। ভিতর বাহির সব মহলেরই লোকে আন্দাজ করেছিলো, যে তাঁদের

হয়ে গেছে। তারপর একদিন যখন স্ত্রীর মারফৎ তাঁর আশঙ্কার কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। চিরকাল ধরে যে শান্ত সৌম্য গম্ভীর আবহাওয়া নিজের চারপাশে সৃষ্টি করে রেখে ছিলেন, এই ঘটনার পরে সমস্ত নিশ্ছিদ্র আটসাট সংগঠনে সাময়িক ফাটল ধরেছিলো এবং কিছুদিনের মত আজন্ম আন্তরিকতার অভিনয়, অত্যন্ত সস্তা প্রহসনে পরিণত হয়েছিলো। আজ থেকে আঠারো বছর আগে অপরাজিতা তাঁর ব্যক্তিগত সম্ভ্রমকে বিপদগ্রস্ত করেছিলো। তিনি বহুদিন নবজাত শিশুকে কোলে পর্যন্ত করেননি, কিন্তু সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে উঠে যেদিন তিনি তাকে কোলে নিলেন, তারপর থেকে কদাচিৎ তাকে কোল ছাড়া করেছেন। প্রথম প্রথম মেয়েকে তিনি সকলের সামনে কোলে করতে পারতেন না। পুত্র-পুত্রবধূ, আত্মীয়স্বজনদের চোখ এড়িয়ে নিভৃতে এক বছরের শিশু অপরাজিতাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে অনুযোগের সুরে তাকে প্রশ্ন করেছেন, কেন সে তাঁকে এমন লজ্জা দিলো! কেন সে এমন সময়ে তাঁর ঘরে এলো যখন উৎসবের আলো নিভে গেছে, উৎসব সহচরেরা বিদায় নিয়েছে! কেন সে এমন দিনে এলো যখন তিনি বিগত জীবনের ওপরে যবনিকা টেনে, ধূপ-দীপ শয্যা গুটিয়ে সন্তর্পণে সরিয়ে রাখছিলেন, আগামী দিনের অনাগত জীবদের সমাদর করবার জন্যে! তারজন্যে আবার তাঁকে নতুন করে আয়োজন করতে হয়েছে। অত্যন্ত সংগোপনে তিনি তাঁর লজ্জা ঢাকবার বন্দোবস্ত করেছেন।

আঠারো বছর আগে অপরাজিতা তাঁকে একবার নিদারুণ লজ্জা দিয়েছিলো; আঠারো বছর পরে সে আবার তাঁকে অত্যন্ত গুরুতর সমস্যার মাঝে ফেলে দিয়েছে।

আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের অবিবাহিত রাখা এ বংশের রীতি নয়। তবুও তিনি তাকে এতদিন বিয়ে দেননি, অনেক দিক চিন্তা করে। বহুদিন অনুসন্ধান করে একটি মনের মত পাত্র পেয়েছেন। আজ বছর দুই ধরে তাকে নিজের পছন্দমত পড়াশোনার সুযোগ দিয়েছেন। রূপের খ্যাতিতে অপরাজিতা তাঁর নির্বাচিত পাত্রের পাশাপাশি দাঁড়ালে অপরাজিতারই রূপের প্রতিফলন হ'বার সম্ভাবনা বেশী। অপরাজিতা তাঁর নির্বাচিত পাত্রকে দেখেছে, তার সংগে কথা বলেছে। কলঙ্কহীন ভিন্ন অন্য কারোর অমন ছেলেকে পছন্দ না হয়ে যায় না। কত সন্তর্পণে ছেলেটিকে সাধারণের উদ্যান থেকে সরিয়ে এনে, সব রকম ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে নিভৃতে বসে সাহস এবং অর্থের শিরস্ত্রাণ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। সে তো কেবল অপরাজিতারই

কত বড় বংশের ছেলে বিমান! বংশের সৌন্দর্যের খ্যাতির জোরেই ওদের অভিজাত সমাজে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। স্বপ্নালস দীর্ঘায়ত চোখ বিমানের—একটি সম্পূর্ণ মারবেল পাথর থেকে কোঁদা চেহারা। হাসলে মুখের রঙ অরুণাভ হয়ে যায়। এ সব তো তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং সংগোপনে দেখেছেন অপরাজিতাও মাঝে মাঝে তার বাঁশীর মত গলার আওয়াজ শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যায়।

প্রায় সমান বয়সী নাতি-নাতনিদের সামনে তিনি মেয়েকে আজও আদর করতে পারেন না। অপরাজিতারও লজ্জা করে। নিভৃতে তাই তিনি মেয়েকে কোলের ওপোরে বসিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অন্ততঃ একশোবার অমত জানবার পর। কুশলী ভাটের মত বিমানের রূপ বর্ণনা করেছিলেন মেয়ের সামনে। মেয়ের কিন্তু ওই একই জবাব—আমার ভালো লাগে না বাবা। এবং জবাব ওই পর্যন্তই। কেন ভাল লাগে না, কি জন্যে ভাল লাগে না, কি হ'লে ভাল লাগে এরকম হাজার রকমের প্রশ্নের কোন জবাব আর অপরাজিতার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। বেশী অনুরোধ করলে সে যাদুকরীর মত আবহাওয়া বদলে দেবে। পিতার দুধের মত সাদা চুলে আঙ্গুল চালিয়ে অত্যন্ত ছেলেমানুষের ধরণে একটা নগণ্য আবদার করে বসবে এবং সে আবদার তখুনি রক্ষা করা চাই!

সমস্ত সময় তাঁকে বাইরের লোকজন, আত্মীয়স্বজন, নাতি-নাতনিরা ঘিরে রাখে। কিন্তু যখনই তিনি একলা থাকবেন, তখনই কোথা থেকে অপরাজিতা দৌড়ে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে আবদার করবে—আজ বিকেলে ছোট তরফে বেড়াতে যাবো, বাবা! তুমি যেন 'না' বলে বোসো না?

কিন্তু তিনি করবেন কি! কেমন করে এ সমস্যার সমাধান করবেন! বিমানের বাপ-মাকেই বা কি কৈফিয়ৎ দেবেন! বিমানই বা কি মনে করবে! বিমানের যদি মন পড়ে থাকে অপরাজিতার ওপোরে! সে যাই হোক, যা হয় বন্দোবস্ত করবেন এখন তিনি অপর লোকদের জন্যে। তাদের জন্যে বেশী মাথা ঘামাতে তিনি রাজী নন। কিন্তু নিজের মেয়েকে নিয়ে তিনি কি করবেন!

সবাই তাঁকে নিশ্চিন্ত করে রেখেছে সারা-জীবন ভরে, কিন্তু এ মেয়েকে নিয়ে তিনি কি করবেন! অন্য কোথাও কি তার মন বাঁধা পড়লো! ভাবতে ভাবতে এইখানে পেঁছে তিনি একটু চমকে উঠলেন। তাইতো, এদিকটা তো মোটেই ভাবেননি কোনো দিন! আশে-

লাগলেন। সিদ্ধান্ত করা যায়, এমন কোন লোককে তো তিনি খুঁজে পেলেন না!

এত বড় সম্পত্তি তিনি নির্বিবাদে চালিয়ে আসছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে নিজে মাথা ঘামাতে হয় না। আজ বারো বছর তিনি সুশীলকে ম্যানেজার ক'রে, সে ভাবনাও নির্ভাবনায় তার মাথায় তুলে দিয়েছেন। অভিজাত গোষ্ঠীর বাইরে তাঁর একমাত্র বন্ধু ছিলো সুশীলের বাবা। এক জাতি হলেও অর্থের ব্যবধানে অনেক সময় বন্ধুর সংগে ভালোভাবে মেলামেশা করতে পারেননি। পাশ করে সুশীল কিছুদিন ওকালতি করেছিলো। তারপর তিনিই তাঁকে নিজের জমিদারীতে ম্যানেজার করেছেন। সেই সুশীলই আজ প্রৌঢ় হতে চললো। বারো বছর আগে তার স্ত্রী মারা যায়, একটি বছর পাঁচেকের সন্তান রেখে। তারপর থেকে সুশীল কাজ নিয়েই মেতে আছে।

তাঁর সমস্ত চিন্তাকে ওলট পালট করে ঝড়ের মত অপরাজিতা ঘরে ঢুকলো। হাতে দু'খানা লম্বা লম্বা খাম।

"আমি বলেছিলাম বাবা, সুজাতার পাকা দেখা খুব শীগ্‌গির হবে! তখন বিশ্বাস করোনি তো, এই দেখো! [প্রথম খামখানার শিরোনামা পড়তে পড়তে] কুমার যতীশ নারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর, [দ্বিতীয় খানায় চোখ বুলিয়ে] শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার রায়, ম্যানেজার বেলপুর চৌধুরী স্টেট্! দেখলে? দাদাদের এমনি হাতে লিখে আসতে বলেছেন সুজাতার বাবা। এই দেখ, তোমার চিঠির পিছন দিকে লিখেছেন কুমার বাহাদুর, অপরাজিতাকে সংগে করে আনতে ভুলবেন না।

কুমার বাহাদুর নিয়ম রক্ষার জন্যে আপত্তি করলেন—বারাকপুর পর্যন্ত যাওয়া আসা! তোমার শেষকালে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ বিসুখ কিছু করুক!

ততক্ষণে অপরাজিতার হাত তাঁর গলার চারপাশে পেঁছে গেছে।

"আচ্ছা, আচ্ছা, সেতো কাল রাত্তির বেলায়! দেখা যাবে এখন।"

মেয়ের হাত তবু শিথিল হ'লো না, হবেও না যতক্ষণ না উনি ওকে প্রতিশ্রুতি দেবেন। তিনি তাকে নিশ্চিত কিছু বলবার জন্যে উদ্যোগ করছেন এমন সময়, একতাড়া কাগজপত্র হাতে করে সুশীলবাবু প্রবেশ করলেন। অপরাজিতা ধড়মড় করে হাত সরিয়ে নিয়ে পাশের চেয়ারে বসে পড়লো।

"খুকীর আবার সকাল বেলাতেই কি আরম্ভ হ'ল!"

কুমার বাহাদুর একটু নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসে, সপ্রতিভ হাসি হেসে জবাব দিলেন—

ধরেছেন, কাল সন্ধেয় সুজাতাদের ওখানে নেমতন্নে যাবেন। আমি বলছিলাম......।

কাগজপত্রের ওপোরে চোখ রেখেই সুশীলবাবু জবাব দিলেন—"নেমন্তন্ন খাবার সখ তো খুব দেখতে পাই! ডাক্তার যে অসুধ দিয়েছে, সেটা খাওয়া হয়েছে?"

কুমার বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠলেন—ঠিক বলেছে সুশীল। কাল রাত্তিরেও ভয়ানক কাশি ছিলো। "ও আমাদের কোন কথা শুনবে না অথচ ওঁর সব কথাই আমাদের শুনতে হ'বে! এমন কি হওয়া উচিত? তুমি কি বল, সুশীল?"

সুশীল কাগজপত্র থেকে চোখ না সরিয়েই জবাব দিলো—"ডাক্তার বলেছিলো, সব সময় গলায় একটা কছু জড়িয়ে রাখতে, সেটাও তো মনে নেই দেখছি?"

অপরাজিতা সেই যে গোঁজ হয়ে বসেছিলো, এতো কথার পরেও সে মাথা তুললো না।

কুমার বাহাদুর বোধ হয় অনেকগুলো শক্ত কথা বলে ফেলবার পর সুরে পরিবর্তনের চেষ্টা করছিলেন, কারণ অনেকক্ষণ ধরে মেয়ের গম্ভীর মুখ দেখা তাঁর অভ্যাস নেই, যদিও এভাবে তিরস্কার না করলে অপরাজিতার গলার নিসিল্ ক্রমশঃ বেড়ে যাবে এবং খানিকটা বিপদের আশঙ্কাও তাতে আছে। সুশীলবাবু কতু একটা একটা করে কাগজ কুমার বাহাদুরের সামনে দস্তখত করবার জন্যে গুছিয়ে দিতে দিতে বললেন—"কথার জবাব দিচ্ছো না কেন? আল ক'দাগ ওষুধ খেয়েছো?"

অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে অপরাজিতা জবাব দিলো—"এক দাগ।"

সুশীলবাবু কুমার বাহাদুরের সামনে কাগজপত্রগুলো ধরে দিয়ে বললেন—"রাণীগঞ্জের জমিটার কথাবার্তা শেষ হয়েছে। দলিলটা একবার ভাল করে দেখে সই করুন।" তারপর, অপরাজিতাকে উদ্দেশ করে—"একদাগ ওষুধ খেলে তো অসুখ সারবার কথা নয়। আজ ঠিক নিয়মমত খাবে। আর এক্ষুনি একটা কিছু গলায় জড়িয়ে এসো।"

অপরাজিতা নীরবে উঠে গেলো। এরপরে কুমার বাহাদুর সুশীলবাবুর সঙ্গে বৈষয়িক আলোচনায় ব্যস্ত রইলেন। কতক্ষণ যে কেটে গেছে তা নিজেদের খেয়াল নেই। অপরাজিতা এসে বসেছে, সুশীলবাবুর উপদেশ পালন করে। বিষয় সংক্রান্ত কথাবার্তা শেষ হ'তে কুমার সাহেব সুশীলকে ইঙ্গিত করে অপরাজিতার দিকে দেখালেন এবং দুজনেই একটু স্মিত হাসি হাসলেন।

"বিমলের চিঠিপত্র পেয়েছো সুশীল?" কুমার সাহেব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রথম প্রথম কলেজে ঢুকে একটা অসুবিধেয় পড়েছে তার ওপোরে বিদেশ তো?" সুশীলবাবু কাগজপত্র গোটাতে গোটাতে জবাব দিলেন।

"তোমারই বা কি খেয়াল সুশীল? একমাত্র ছেলে, তাকে কিনা পাঠালে কলকাতা ছেড়ে পাটনায়! হ'লই বা মামার বাড়ি, তাহলেও নিজের কাছে রাখা এক আর, বিদেশে বিভুঁয়ে পাঠানো অন্য ব্যাপার।"

সুশীলবাবু জবাব দিলেন—"কলকাতায় থাকলে ছেলেগুলো বড় মিনমিনে হয়ে যায়। এই বয়স থেকে একটু কষ্ট করতে শেখা ভালো।"

"তা শেখা ভালো এবং সবই সয়ে যবে, কিন্তু তুমি কেমন করে থাকো বলতো সুশীল? ছেলেমেয় বড়সড় হয়ে যায়, বিয়ে থা' দিয়ে দেওয়া যায়, সে একরকম নিশ্চিন্দির ব্যাপার! এই দেখ না খুকিকে নিয়ে কি যে সমস্যায় পড়েছি......।

অবশ্য আলোচনার মধ্যে খুকি অর্থাৎ অপরাজিতার নামের উল্লেখ অথবা তার সমস্যার উত্থাপন অত্যন্ত অবান্তর, কিন্তু কুমার সাহেবের মনে ঐ একটা কথাই দিনরাত ধ্বনিত হচ্ছে, তাই সব কিছুর মাঝে তিনি তার কথা এনে ফেলেন।

অপরাজিতা বুঝতে পারলো আলোচনার গতি কোন দিকে। সে আস্তে আস্তে উঠে গেলো।

"এতদিন ধরে যা ঠিক করে রাখলাম, মেয়ে তো সব ওলট পালট করে দিলে। এখন কি করি বলো তো সুশীল? তোমার এ ব্যাপারটা কি বলে মনে হয়।" —কুমার বাহাদুর ক্রমশ নিরাশ হয়ে পড়ছেন।

"আমি আর কি বলবো বলুন। আপনার নিজের অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে ঢের বেশী। সেই আপনিই যখন নিজে কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছেন না, তখন আমার কিছু বলবার চেষ্টা করাই ভুল।

সুশীলবাবুর মতামত খুবই সুস্পষ্ট।

"আরে তুমিও তো প্রায় মাঝবয়সী হ'তে চললে। চল্লিশ ছাড়িয়েছে, রগের দুপাশের দু'একটা চুলও পাকতে আরম্ভ করেছে, মাথা তো পেকেই গেছে বলতে হবে।" —কুমার বাহাদুর সময় সময় এরকম ইঙ্গিত মেপে রসিকতা করে থাকেন।

রগের দুপাশে হাত বুলিয়ে সুশীলবাবু বললেন—"চুল পাকতে আরম্ভ করেছে নাকি! কই তাতো শুনি নি?"

কুমার বাহাদুরের রসিকতা এবারে সম্পর্ক ছাড়িয়ে গেলো।

"মনে মনে আর কিছু আন্দাজ করেছিলে নাকি সুশীল! নাঃ, সময়ে লোকে সাধাসাধি করলো, আর এখন ভেবে কি হ'বে বলো! তোমার যে বয়সে বৌমা মারা গেলেন, সে বয়সে তো মানুষের প্রথম বিয়েই হয় না।

"এখন আর পাকা চুলে টোপর পরলে লোকে নিন্দে করবে।"

কুমার বাহাদুরের প্রচুর হাসির জবাবে সুশীলবাবুর ঠোঁট দু'খানা সামান্য একটু বিস্ফারিত হ'লো মাত্র। আলোচনার প্রসঙ্গ আবার বদলে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরাজিতা আবার ঘরের ভেতরে এসে বসলো।

সুশীলবাবুর পিছন দিকে উপবিষ্টা অপরাজিতার দিকে নির্দেশ করে কুমার বাহাদুর বললেন—কেমন শান্ত মেয়ের মত বসে আছে দেখেছো সুশীল! আর কেমন বাধ্য দেখেছো। তোমার কথামত গলায় মাফলার জড়িয়ে এসেছে।

সুশীলবাবু এক নজর সেদিকে দেখে বললেন—আমার কথামত নয়, ডাক্তারের কথামত। ওষুধ খেয়েছো?

অত্যন্ত অনুগত ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে অপরাজিতা বললো—হ্যাঁ।

অপরাজিতার জবাবের সঙ্গে সঙ্গেই খাতাপত্র গুছিয়ে সুশীলবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

অপরাজিতা অত্যন্ত মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলো—কাল সুজাতাদের বাড়িতে নেমন্তন্নে যাবার কি হ'ল?

সুশীলবাবু জবাব দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন—যাওয়া হবে নিশ্চয়ই, তবে কালকের তো এখনও দেরী আছে!

সেইদিন অপরাহ্নে কুমার বাহাদুর দিবানিদ্রা থেকে উঠতে না উঠতে ঘরের বাইরে একটা সোরগোল শুনলেন। কতকগুলি অসংলগ্ন বিস্ময়সূচক ধ্বনি, একটানা ফিসফিসানির সংমিশ্রণে বারান্দাটা ভরে গেছে। তাঁর জাগবার সাড়া পেয়ে তাঁর স্ত্রীকে আগে নিয়ে দুই পুত্রবধূ এবং আরও দু'একজন নিকট আত্মীয়া এসে ঘরে ঢুকলেন। কুমার বাহাদুর হঠাৎ এদের সমাগমে মনে মনে বিচলিত হলেও বাইরে কোনো ভাব প্রকাশ করলেন না। ধীরে সুস্থে মুখহাত ধুয়ে তারপর স্ত্রীকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—কী ব্যাপার! হঠাৎ তোমরা যে?

তাঁর স্ত্রী ইতস্ততঃ করছেন কিভাবে কথাটা পাড়বেন, এমন সময় তাঁর ছোট পুত্রবধূ চাপা-গলায় হেসে উঠলেন। কুমার বাহাদুর কতকটা নিশ্চিন্ত হ'লেন। যাই-ই হোক ব্যাপারটা কৌতুকের।

"এই বলছিলাম তোমার মেয়ের কাণ্ড-কারখানার কথা! দিনে দিনে কি যে হ'চ্ছে সব, তার আর বলবার নয়।" স্ত্রীর দীর্ঘ ভূমিকা শেষ করবার জন্যে কুমার বাহাদুর তাঁকে আসল ঘটনাটা বলবার জন্যে আবার প্রশ্ন করলেন—"কি করেছে খুকি! খুলেই বলনা তোমরা কেউ!"

"কি আর বলবো আমার মাথামুণ্ডু। বলনা বড়বৌমা! আমার বাপু অমন ক'রে বাহার দিয়ে বলা অভ্যেস নেই।"

স্ত্রীর আবছা কথাবার্তায় কুমার বাহাদুরের উৎকণ্ঠা আরও বাড়তে থাকলো। অবশেষে তাঁর বড়বৌমার কাছ থেকে আসল কথাটা বেরিয়ে এলো।

"আজ দুপুরে বেলায় ঠাকুরঝি আমার ঘরে বসে গল্প করছিলো"—বড়বৌমা তাঁর উপাখ্যান আরম্ভ করলেন এবং খানিকক্ষণের মধ্যে শেষ করলেন। বড়বৌমার বিবৃতি থেকে যেটুকু বোঝা গেল সেটুকু মোটামুটি হ'চ্ছে এই যে, বড়বৌমার সংগে কথাবার্তা বলবার সময় অপরাজিতা তার মনের গোপনতম রহস্য প্রকাশ করেছে। ভ্রাতৃবধূর সংগে কুমারী ননদদের আলাপ-আলোচনার ধারা বয়স মেনে চলে না এবং আলোচনাগুলো প্রায়শঃই শ্লীলতার গণ্ডি অতিক্রম করে। বড়বৌমা কথায় কথায় অপরাজিতাকে তার বিবাহ-বিমুখতার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং জবাব পেয়েছিলেন যে, সে বিবাহ-বিমুখ মোটেই নয়, বরঞ্চ মনের মত মানুষকে তার সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে না বলেই সে সম্মতি দান করতে পারছে না।

বড়বৌ, অপরাজিতার এই জবাবের পরে, বিস্মিত হ'য়ে বিমানের কথা উত্থাপন করেছিলো, তাতে অপরাজিতা জবাব দেয় যে, বিমান একটি বালক মাত্র। তাকে সে বিবাহ করতে চায় না এবং এ সম্পর্কে কোন আলোচনা করতেই সে রাজী নয়। বড়বৌ সে নির্দেশ না মেনে বিমানের কথা আবার উঠিয়েছিলো এবং পুরুষের যে ক'টি বরণীয় গুণ থাকলে তাকে বর ব'লে বরণ করা যায় তার প্রত্যেকটি গুণই যে বিমানের দেহে বর্তমান, সে কথাও বলতে ছাড়েনি। এর পরের খানিকটা কথোপকথন বড়বৌ শ্বশুরের সামনে অপ্রকাশ্য ব'লেই বাদ দিয়ে গেলো। সেটা হ'চ্ছে অনেকটা এইরকম:

"বিমানের এত গুণ, তা তুমি কোথা থেকে জানতে পারলে বৌদি! আমার চেয়ে বেশী তুমি জানো না নিশ্চয়ই!"

"বেশী জানতে হয় না ঠাকুরঝি! অমন ঠাকুর দেবতার মত চেহারা..."

"ওই শিমুলফুল দেখেই তো তোমাদের মাথা ঘুরে যায়। খাঁটি মানুষ তোমরা চিনতে পারো না। একটা কথা বলতে পারে না, কাছে বসে থাকলে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে—ওরকম কচি খোকাকে মোটে বিয়েই দেওয়া উচিত নয়!"

এর পরেও গোটাকতক উপরোক্ত ধরণের কথাবার্তার বিনিময় হয়। অবশেষে বড়বৌ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কেমন মানুষ তার পছন্দ। বলতে কি সহজে চায়! একথা সেকথা বলতে বলতে শেষকালে সে আসল কথা পাড়লো, অর্থাৎ কেমন ধারা মানুষ তার পছন্দ এবং ব্যাপক আলোচনা করতে করতে উপসংহারে বড়বৌ সেই বিশেষ মানুষটির নাম শোনবার সংগে সংগেই নাকি গালে হাত দিয়ে ব'সে পড়েছিলেন!

কথাটা প্রচার না করবার জন্যে অপরাজিতা সনির্বন্ধ অনুরোধ করা সত্ত্বেও, কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর সর্বত্র বিস্ময়ের কলগুঞ্জনে ভ'রে গিয়েছিলো।

অপরাজিতার বড় বোন মাধবীলতা কথাটা শোনবামাত্র বিশেষ কোন মন্তব্য করেনি। কিছুক্ষণ পরে তার মা তাকে অসময়ে স্নান করবার জন্যে তার মহলের দিকে তাকিয়ে তিরস্কার করেছিলেন।

অপরাজিতার মা প্রথমটা একটু ধাঁধা খেলেও পরে ঠিকমত বিশ্লেষণ করলেন—"বুড়ো বয়সের মেয়ে, তার ওপোর বুড়ো মানুষের কোলে মানুষ হয়েছে। ও কি আর বুড়ো ছাড়া অন্য কাউকে ভালো দেখবে!"

সেইদিন সন্ধ্যার পর কুমার বাহাদুর মেয়েকে নিজের কাছে ডেকে নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অপরাজিতা আজ আর সোজা-সুজি তাঁর চোখের দিকে চাইছে না। অন্যদিন প্রথমেই সে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে, কানের কাছে ফিস্ ফিস্ ক'রে কোনও না কোন অনুরোধ জানিয়ে রাখে। আজ সে চুপচাপ ব'সে আছে। কুমার বাহাদুর একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকেও কোনমতেই তার মনের ভাব ধরতে পারছেন না। মাংস-পিণ্ডের সমষ্টি একটা শিশু তাঁর চোখের সামনে বড় হ'য়ে উঠলো। তার মুখে কথা ফুটলো, মনে ভাব এলো; ভাবপ্রকাশের ভাষা এলো। চিরকালই তার চাওয়ার কথা আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারতেন। কিন্তু আজ তার মনের তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ার মাঝখানে একটার পর একটা গ্রন্থি পড়ছে। ভাবতে ভাবতে কুমার বাহাদুর হঠাৎ নড়েচড়ে বসলেন। এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত তাঁকে করতেই হ'বে।

"আমার দিকে একবার তাকাতো খুকি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।" কুমার বাহাদুরের কথা শেষ হ'তে না হ'তে অপরা-জিতার মুখ দিয়ে, বাঁশীর ফুটো ছিদ্রের ভেতর দিয়ে বুকের সমস্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে যাওয়ার মত আওয়াজ হোলো: "আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না বাবা! কি করেছি আমি তোমাদের কাছে, যে সবাই মিলে আমায় এমন করবে!"

কুমার বাহাদুরের বুকের ভেতর হাহাকার ক'রে উঠলো, তাঁর মেয়ের চোখ ছলছলিয়ে উঠতে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অপরাজিতা আবার বললো: "কোন সময়ে কি একটা কথা বলেছি তার ঠিক নেই, আর তাই নিয়ে সবাই আমার জীবন শেষ ক'রে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কুমার বাহাদুর সংগে সংগে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"আমি কিছুই তো বলিনি খুকি! তুই অমন করছিস্ কেন? তোর যেমন পছন্দ তেমনি বলবি। এতে লজ্জার কি আছে!"

এর পরে অপরাজিতা চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে কুমার বাহাদুর হঠাৎ একটা কথা মনে করেই স্ত্রীকে এবং পুত্রবধূদের ডাক দিলেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, অপরাজিতার এই ব্যাপারটি একতরফা কিনা অথবা ওদের দু'জনের মধ্যে কোন বোঝাপড়া হয়েছে কিনা। বড়বৌ সেকথা সঠিক বলতে পারলো না, তবে আবার কৌশল ক'রে কথাটা বের ক'রে নেবার চেষ্টা করতে গেলো।

সেইদিন মধ্যরাত্রে স্ত্রীর মারফত কুমার বাহাদুর জানতে পারলেন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ একতরফা। অন্যপক্ষ বোধহয় কিছুই জানে না। অধিক রাত্রি পর্যন্ত ঘুমন্ত মেয়ের শয্যাপার্শ্বে ব'সে স্বামী স্ত্রীতে মিলে অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্তা বললেন।

পরদিন অপরাহ্নে পূর্ব ব্যবস্থামত সুশীল-বাবু গাড়ি নিয়ে এলেন নিমন্ত্রণে যাবার জন্য। গাড়ি চলতে দেখা গেলো অপরাজিতা কুমার সাহেব ও সুশীলবাবুর মাঝখানে বসেছে। গাড়ি চলেছে বড় রাস্তা ধ'রে এবং চলবার সংগে সংগেই সুশীলবাবু একখানা মোটা বইয়ের মাঝামাঝি খুলে পড়তে আরম্ভ করলেন।

কেউ কোন কথাবার্তা বলছে না। কুমার সাহেব যেন অগাধ জলে পড়ে গেছেন। ভেবেই পাচ্ছেন না যে, এ সমস্যার সমাধান কি করে হবে। অপরাজিতা যে কোনদিন তার সংকোচ কাটিয়ে উঠে নিজের সমাধান নিজে করতে পারবে, তা তো মনে হয় না।

রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে বিমানকে তুলে নেওয়া হলো তার বাড়ি থেকে। এই বিমান আর একটি সমস্যা। কিছুদিন হ'ল সর্বত্রই তিনি অপরাজিতাকে যেমন নিয়ে যান, তেমনি তাঁর সংগে বিমানও থাকে। প্রকাশ করে কিছু বলা না হয়ে থাকলেও সকলেই জানে যে, একদিন বিমানের সংগেই অপরাজিতার বিবাহ হবে। এ নিয়ে বান্ধবীরা অপরাজিতাকে ঠাট্টা করলেও সে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হতো বলে মনে হয়নি।

কুমার বাহাদুর যতই নিমন্ত্রণ বাড়ির কাছাকাছি চলেছেন, ততই ভাবনার ওপরে ভাবনা এসে জড়ো হচ্ছে। সারা জীবন ধরে কুশলী নাবিকের মতো সংসার ও আভিজাত্যের জলযান চালিয়ে এসে শেষে কি ভ্রমণের সীমায় পেঁৗছে ভরাডুবি করবেন।

সুজাতাদের বাড়ি পেঁৗছে গেলো। কলকাতার উপকণ্ঠে বাড়ি। বিরাট সাজানো বাগান সামনে। বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফুল ও ফলের খণ্ড খণ্ড বাগিচা গঙ্গার ধার পর্যন্ত চলে গেছে। গঙ্গার ধার দিয়ে কয়েকটা প্রমোদ-

বাবা অভ্যর্থনা করে সকলকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

এ'দের এই চারজনের দলটিকে ঘিরে সকলেই সম্ভাষণ জানাচ্ছে। কুমার বাহাদুর লক্ষ্য করলেন আগেকার মতই দু-একটি মন্তব্য শুনে বিমানের মুখ লাল টুকটুকে হয়ে উঠছে, অপরাজিতা মুখ নামিয়ে নিচ্ছে।

কুমার সাহেব নিস্পৃহ সুশীলবাবুকে ডেকে বললেন—"চলো সুশীল, আমরা বাগানে একটু পায়চারি করিগে। কলকাতায় থেকে থেকে মাঝে মাঝে যেন দম আটকে আসে।"

সুশীলবাবু নীরবে তাঁকে অনুসরণ করলেন। কুমার সাহেব চলতে চলতে একেবারে গংগার ধারের ছায়ায় ঢাকা একখানা বেঞ্চির ওপরে গিয়ে বসলেন। সুশীলবাবুও তাঁর পাশে বসে হাতের বইখানা খুলে পড়বার উপক্রম করলেন।

"বই পড়া এখন বন্ধ রাখো সুশীল। তোমার সংগে আমার গোটাকতক জরুরী কথা আছে।"

সুশীলবাবু সংগে সংগে বই বন্ধ করে কুমার সাহেবের মুখের দিকে চাইলেন।

"বিমানের সংগে খুকির বিয়ের সম্বন্ধ প্রায় ঠিকঠাক করেছিলাম, এখন সে বলে বিমানকে বিয়ে করবে না। আমি এখানে বসেই একটা বোঝাপড়া করতে চাই, তুমি খুকিকে ডেকে নিয়ে এসো তো?" কুমার সাহেবের কথায় সুশীলবাবু আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। হাজার হলেও সুশীলবাবু পরিবারভুক্ত লোক নন। তাঁর সামনে এরকম ঘরোয়া ব্যক্তিগত আলোচনা হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

"কিন্তু আমার সামনে এ সমস্ত আলোচনা হওয়া কি উচিত। আমার মনে হয়, আপনি অন্য সময় এ নিয়ে আলোচনা করবেন।"

"তর্ক করো না সুশীল! আমি যা বলছি, তাই করো। ওকে ডেকে নিয়ে এসো। তোমার থাকাও অত্যন্ত দরকার, নাহলে আমি এসব বিষয়ে এখানে আলোচনা করতাম না।"

সুশীলবাবু তখন উঠে বাড়ির দিকে গেলেন। মস্ত বড় বাড়ির দিকে দিকে সমারোহের আয়োজন হয়েছে। অসংখ্য দল বিভক্ত অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় আসর জমিয়ে বসেছে। এর মধ্যে অপরাজিতাকে খোঁজা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। সুশীলবাবু এক-একবার এক-এক জায়গায় উঁকি দিতে লাগলেন। এক জায়গায় হাইকোর্টের জজ প্রশান্ত সেনের বাড়ির মেয়েরা রয়েছে। সুন্দরী তরুণী, সুগঠিতা যুবতীর কণ্ঠস্বরে হলঘরের সুরভিত পরিবেশ কেঁপে কেঁপে উঠছে। দীর্ঘায়ত দৃষ্টি নিয়ে একটি মেয়ে সুশীলবাবুর দিকে তাকালো। সুশীলবাবু চোখ [illegible]

এখানে নেই। সন্ধ্যার অনেক আগেই আলো জেবলে দেওয়া হয়েছে। পড়ন্ত দিনের আলো আর বৈদ্যুতিক উজ্জ্বল্যের সংমিশ্রণে সমস্ত হলঘরটা প্রেক্ষাগৃহের মত দেখাচ্ছে। বিখ্যাত শিল্পী সুনীল রায় একটি মাঝারি সমাবেশের অধিনায়কত্ব করছে। তার বক্তৃতার বিষয় বোধ হয়, চিত্র-শিল্পের সংগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কোনখানে যোগাযোগ, সেইটার বিশদ আলোচনা। সুশীলবাবু উঁকি দিয়ে দেখলেন, অপরাজিতা এখানেও নেই। অভিজাত পরিবারের বহু উৎসবে তিনি নিমন্ত্রিত হয়েছেন এবং অতীতে নিজের খুশীমত মেলামেশা করেছেন। আজ অপরাজিতাকে খুঁজতে এসে সমারোহ ঐক্যতানের প্রতি যন্ত্রের প্রতিটি আলাদা আলাদা সুর তাঁর অনুভূতি-ক্ষেত্রে বাজতে শুরু করেছে। অপরাজিতা কোথাও নেই। সুখাদ্য ও পুষ্টির ছড়াছড়ি চারিদিকে। নিজস্ব স্টাইলের নেশা আর পুরুষের চোখে ভালো লাগবার অবচেতন প্রতিযোগিতায় মেয়েদের আকর্ষণের সীমা নেই। বহু দিনের ভুলে-যাওয়া, ঈশ্বরকে প্রতিনিয়ত ধন্যবাদ দেওয়া দিনগুলো একে একে সুশীলবাবুর মনে শিশিরান্তের অনুপস্থিত পাখীদের মত ফিরে আসছে। কে যেন পিছন থেকে তাঁর চোখ টিপে ধরলো। কে! সুশীলবাবু চমকে উঠলেন। ঘুমন্ত মন রাত্রের শেষ প্রহরে কোন উষ্ণ সান্নিধ্যের দিকে পাশ ফিরলো।

"মাপ করবেন! আমি ভেবেছিলাম আমার ছোট দাদু।" অপ্রতিভ তরুণীর হৃদয়ের সমস্ত রক্ত ঠোঁটে এসে জমা হয়েছিলো, সুশীলবাবু তার দিকে ফিরতে। কিন্তু অপরাজিতা কই। ঘরের শেষ প্রান্তে বিমানকে ঘিরে সুজাতা, অর্থাৎ যাকে উপলক্ষ্য করে এখানকার এই সমাবেশ এবং তার বান্ধবীরা অবিশ্রান্ত গল্প করছে।

সুজাতাকে ডেকে সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—অপরাজিতাকে দেখেছো।

"আছে কোথাও! কেন?"

"এমনিই।" কুমার বাহাদুর খুঁজছেন কিনা?"

অবশেষে অপরাজিতাকে তিনি পেলেন। নিরাশ হয়ে বারান্দায় চলে এসে দেখলেন তারই এক কোণে নিরিবিলি একখানা বেতের সিংহাসন-ধরণের চেয়ারে অপরাজিতা বসে আছে। নানা রঙের টালি দেওয়া মোজেইকের বারান্দা পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঐকরঙা হয়ে গেছে।

অপরাজিতার ডান দিকে অস্তমান সূর্য, সে চেয়ে আছে অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে। রেশমী শাড়ির আঁচল কোলের ওপরে জড়ো করা। নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তে সে বসে আছে, জানে যে এখানে কেউ তাকে খুঁজতে [illegible] সুশীলবাবুর কাছে গিয়ে অসম্ভবতা

অপরাজিতাকে দেখে ভাবলেন, কাছ থেকে ডাকবেন কি দূরে গিয়ে সাড়া দিবেন। মেয়েটা লোককে এতো লজ্জা দেয়।

"অপরাজিতা, কুমার বাহাদুর ডাকছেন তোমায়।"

"কোথায়, বাবা!"

"গংগার ধারের দিকে বসেছেন। এসো আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

অপরাজিতা নীরবে সুশীলবাবুকে অনুসরণ করলো।

কিন্তু যেখানে কুমার সাহেবের অপেক্ষা করবার কথা, সেখানে অথবা চারিদিকে অনেক-দূর পর্যন্ত অনুসন্ধান করেও সুশীলবাবু তাঁর কোন খোঁজ পেলেন না।

বেলা শেষ হয়ে গেছে। গোধূলি বেলায় গংগার ধারে অপরাজিতা আর সুশীলবাবু নির্দিষ্ট বেঞ্চির ওপরে বসে অপেক্ষা করতে করতে ক্রমশ একেবারে অন্ধকার হয়ে গেলো।

"বাবা তো কই এখনো এলেন না!" নিরুদ্বেগ সুরে অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করলো।

"কি জানি আমায় তো বললেন যে, তোমাকে সংগে করে এখানে আনতে। কি মুস্কিল হ'ল বলতো। আরও বসবে না চলে যাবে?" সুশীলবাবুর কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ছাড়া আরও অনেক কিছুর আভাস পাওয়া যায়।

"বাবা আমাকে কেন ডাকছিলেন? আপনি জানেন?"

"জানি। তোমার বাবাকে তুমি বুড়ো বয়সে অত্যন্ত কষ্ট দিচ্ছো অপরাজিতা। বিমানের সংগে তোমার বিয়ে দেবেন বলে কতদিন থেকে মনে-মনে ঠিক করে রেখেছেন, আর তুমি তাঁর কথা শুনছো না।" এ-কথার কোন জবাব অপরাজিতার কাছ থেকে এলো না।

"আমি অবশ্য বলেছিলাম যে, এ সমস্ত আলোচনা আমার সামনে না হওয়াই ভালো, কিন্তু তিনি কেন যে আমায় থাকতে বললেন, তা তো বুঝে উঠতে পারছি না!

উৎসব বাড়ির ভেতরে-বাইরে সমস্ত জায়গায় আলো জেবলে দেওয়া হয়েছে। অবিশ্রান্ত হাসি আর গান ভেসে আসছে। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সুশীলবাবু বললেন, "রাত হোলো, এবারে যাওয়া যাক।" অপরাজিতা কোন সাড়া দিলো না। সুশীলবাবু আবার তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে এখন উঠবে কিনা। অপরাজিতা সাড়া দিলো না। শেষকালে সুশীলবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "ছেলেমানুষী করো না, চলো যাই।"

সুশীলবাবু আগে চলতে চলতে দেখলেন অপরাজিতা তাঁর পিছনেই আসছে। দু-চার পা গিয়েই হঠাৎ হোঁচট খাবার মত শব্দ শুনে পিছন দিকে চেয়ে দেখলেন, অপরাজিতা প্রায় পড়ে যাবার মত হয়েছে। সুশীলবাবু তাড়াতাড়ি করে তাকে ধরে ফেললেন। সুশীলবাবু

অবাক হয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ। এই যে অপরাজিতাকে পতন থেকে বাঁচাবার জন্যে ধরে রয়েছেন, তারসামা ফিরে আসবার পরেও সে তাকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে না। কি হয়েছে তার। কথা বললে জবাব দেয় না। যাই হোক, সুশীলবাবু আর তাকে নিয়ে মাথা ঘামালেন না। সে রাত্রে তিনি বিমান আর অপরাজিতাকে নিয়ে ফিরলেন। কুমার সাহেব কোন এক পরিচিত লোকের গাড়িতে সন্ধ্যার আগেই ফিরে গেছেন। যথাস্থানে বিমানকে নামিয়ে দিয়ে অপরাজিতাকেও পৌঁছে দিলেন। রাত হয়ে গেছে বলে কুমার সাহেবের সংগে দেখা করলেন না।

পরদিন সকালে সুশীলবাবু কুমার বাহাদুরের বসবার ঘরে গিয়ে দেখলেন, ঘরের ভেতরে অনেক লোক বসে উত্তেজিত স্বরে জটলা করছে। তিনি ঘরে ঢুকতেই এক কুমার বাহাদুর ছাড়া আর সকলেই অন্দরে চলে গেলেন।

প্রতিদিনের মত সুশীলবাবু কাগজপত্রের মর্মার্থ গ্রহণ এবং কুমার বাহাদুরের সেই সমস্ত কাগজে সই করার কার্যে সহায়তা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন কুমার বাহাদুরের গলায়। তাঁর এই অস্বাভাবিক গলাটা মাঝে মাঝে সুশীলবাবু শুনেছেন। একবার বোধ হয়—শেষবারের মত শুনেছিলেন বছর দশেক আগে, যখন তাঁরই অসাবধানতায় একজন কর্মচারী সরকারী তহশিল করতে গিয়ে খুন হয়।

"তোমার খাতাপত্র রাখো সুশীল। আগে আমার কথার জবাব দাও।" সুশীলবাবু খাতাপত্র একদম সরিয়ে ফেললেন।

"অপরাজিতা কাল নিমন্ত্রণ সেরে ফিরে এসে সারারাত ধরে কেঁদেছে কেন? কি হয়েছে তুমি কিছু জানো?"

"আজ্ঞে না। আপনি আমাকে বললেন, ওকে ডেকে নিয়ে আসতে; কিন্তু ফিরে এসে আর আপনাকে খুঁজে পেলাম না। অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর আমরা চলে এলাম।"

কুমার বাহাদুর অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন —"কৈফিয়ৎ তোমার কাছে কেউ চাইছে না। আমি ইচ্ছে করেই চলে এসেছিলাম। আমি চলে আসবার পর সে তোমারই কাছে ছিলো। তার কি হয়েছে—তুমি ছাড়া আর কে জানবে?"

"তা বলতে পারি না, তবে আমি জানিনা এটা ঠিক।"

"নিশ্চয়ই জানো। নিশ্চয়ই ও তোমার কাছে কিছু বলেছিলো, যার জবাবে তুমি ওকে শক্ত শক্ত কথা শুনিয়েছো। ঠিক কিনা।"

"কোন কথাই হয়নি তার সংগে। কি বিপদেই পড়লাম। আমি কেবলমাত্র বলেছিলাম অন্যায় এবং এতে আপনার মনে কষ্ট দেওয়া হবে।"

কুমার বাহাদুর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ক্রমে তাঁর মুখের কুঞ্চিত রেখাগুলো সরল হয়ে এলো।

"তোমাদের এ-যুগের ছেলেদের অভিজ্ঞতা যে কত কম, তা তোমরা জান না। শুধু শুধু ওর মনে তুমি কষ্ট দিলে সুশীল। ও বিমানকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি, কারণ তোমাকে বিয়ে করতে চায় বলে। শেষ পর্যন্ত আমাকে দিয়েই কথাটা বলালে।"

সুশীলবাবু স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন। কি এর জবাব দেবেন, তাই ভেবে পেলেন না। সামনে কুমার বাহাদুর জবাবের প্রত্যাশায় বসে রয়েছেন, অন্তরালে রয়েছেন মেয়েরা। কি এর জবাব দেবেন তিনি। একদিকে শান্তি ও সৌভাগ্যের ইংগিত, আর একদিকে সম্মান ও গর্বহানির সম্ভাবনা। সবকিছু বাদ দিয়ে সুশীলবাবুর মনে জাগলো একটা দুর্বার কৌতূহল। অপরাজিতার এ মনস্তত্ত্বাবিরোধী ইচ্ছার কারণ কি। চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে তাঁর, পনেরো-ষোল বছরের ছেলে আছে একটি। জিজ্ঞাসা করতে হবে অপরাজিতাকে।

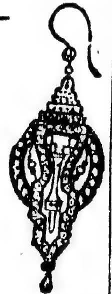
"কাল আমাকে অপরাজিতা এ সম্পর্কে কোন কথাই বলেনি। আর বললেও এর মধ্যে আমার বিবেচনা করবার কোন কথাই নেই।"

সুশীলবাবুর উকিলিধরণের জবাবকে কুমার বাহাদুর এক ধমকে থামিয়ে দিলেন। "বলবার যা বাকী আছে, সেসব তোমরা পরে বোঝাপড়া করো; এখন কাজের কথা হোক।" এই বলে কুমার বাহাদুর সমস্যার ওপরে সময়োপযোগী যবনিকা টেনে স্ত্রী ও পুত্রবধূদের ডাক দিলেন।

স্বর্ণ সমস্যা সমাধানে—

সুশিক্ষিত ও সুনিপুণ শিল্পিগণের দ্বারা প্রস্তুত বহুবিধ হাল্কা ওজনের গহণার বিপুল সমাবেশ।





কতিপয় অলঙ্কারের নিম্নতর মূল্য তালিকা—

	বিষয়	ওজন	মোট মূল্য
১।	আংটী ...	৵৹	... ২০,
২।	ঐ মিনাকরা ...	৵১০	... ২৫,
৩।	নোয়া প্রতি গাছা ...	৶৹	... ২৪,
৪।	হাতির দাঁতের শাঁখা প্রতি জোড়া	৶৹	... ৩২,
৫।	চুড়ি প্রতি জোড়া ...	১ ভরি	... ১০৪
৬।	আর্মলেট প্রতি জোড়া ..	১॥ "	... ১৬৪
৭।	সূর্যোদয়, প্রেমফাঁস ও বরফিফাঁস নেকলেস প্রতি ছড়া ..	১ "	... ১১৬,
৮।	ইয়ারিং, কানপাশা অথবা টিকলি	।৹	... ৩২,
৯।	পেনডেন্ট চেইন ...	॥৶৹	... ৮৪,
১০।	কঙ্কন প্রতি জোড়া	১॥ ভরি	... ১৬৯,

১১। বিলাতী ব্রোঞ্জের উপর মাউণ্ট করা চুড়ি প্রতি জোড়ার ওজন ৵৹ আনা হইতে উর্ধ্বে—মূল্য ১৯, প্রতি জোড়া।

বিঃ দ্রঃ (১) অর্ডার দিবার সময় চুড়ি ও আংটীর মাপ পাঠাইতে হয় এবং সিকি মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে কোন মাল ভি, পি করা হয় না।

(২) আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট বিক্রয় করিলে মজুরী বাদে গিনি সোনার বাজার দরে খরিদ করিয়া থাকি। বাজার দর উঠানামা করিলে অথবা ওজনে বেশী বা কম হইলে উক্ত মূল্যে পার্থক্য হইতে পারে। চার আনার ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার শিল্পে—

আইডিয়াল জুয়েলারী কোং

সীমান্ত-নেতা বলিয়াছেন—"Those who are responsible for gruesome murder, loot and arson are the worst sinners in the eyes of God".
কিন্তু "কেহ কেহ" বলেন,—ভগবান অনেক দূর হইতে দেখিয়াছেন—সুতরাং তাঁর দৃষ্টির বিচার নিশ্চয়ই আদালতের বিচারে গ্রাহ্য নয়!

* * *

একটি সংবাদে দেখিলাম—"Bihar Muslim League Seeks to Create Muslim Pocket".—বিশুখুড়ো



বলিলেন—"নিজের পকেট নিজে নিজে কাটিবেন ইহাতে আর আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে, তাঁরাতো আর অন্যের পকেট কাটিতে যাইতেছেন না।"

* * *

বর্মার প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল জনৈক ব্যক্তি নাকি বলিয়াছেন—There are many tricks in Burman bag' খুড়ো বলিলেন—"এর মধ্যে ভারতের Rope Trickও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বিলাতবাসী এই Trick উপভোগ করিবেন কি? শুনিয়াছি—এই দড়ির খেলা দেখিয়া অনেকেরই নাকি মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে থাকে।"

* * *

হার্ভার্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ্‌ ডাঃ হার্লো নাকি বলিয়াছেন যে—বিশ্বসংকট নিবারণ করিয়া মানবজাতিকে বাঁচাইতে হইলে—প্রতিভাবান যুবকদিগকে হত্যা করিয়া ফেলা উচিত। আমরা ঘোষণাটা শুনিয়া বিমূঢ়ের মত তাকাইয়া থাকিলে খুড়ো বুঝাইয়া বলিলেন—"অর্থাৎ ডাঃ হার্লো পৃথিবীতে



হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে যে এ্যাটম বোমা ফেলা হইয়াছিল—তাহা অপেক্ষা ছয়শত গুণ বেশী মারাত্মক এ্যাটম বোমাও নাকি সম্প্রতি প্রস্তুত করা হইয়াছে। অর্থাৎ অতঃপর পৃথিবী ধ্বংস করিয়া স্বর্গরাজ্যটাও বিনা বাধায় ধ্বংস করিবার পথ সুগম হইল!

* * *

অতিথি নিমন্ত্রণ আইনের কড়াকড়ি খানিকটা শিথিল করিয়া দেওয়া হইল বলিয়া সম্প্রতি একটি সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু শুধু বিবৃতি দিয়া গৃহস্থকে অতিথিপরায়ণতার সুমহান ব্রতে উদ্বুদ্ধ করিতে পারা যাইবে কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং সরকার বাহাদুর যদি "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়" নীতি অনুসরণ করিয়া প্রজাপুঞ্জকে সেক্রেটারিয়েটে (আলিপুরে নয়) ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন, তাহা হইলে বহুদিন-বিস্মৃত এই ভোজনানন্দ লাভ করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইতে পারে। বাড়িতে শুধু জল-আছড়ার অর্থাৎ বিনা তেলের রান্না খাইয়া খাইয়া রসনায় আর রসের লেশমাত্র নাই!

* * *

নূতন পরিকল্পনার ভিত্তিতে অচিরেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের সংবাদ



পুরাতন পরিকল্পনা চিরদিনের জন্যই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

* * *

জেনারেল আউংগ সান্‌ লণ্ডনে গিয়া বলিয়াছেন—I have Come to Sell the Friendship of Burma"—



কথাটা অনেকের কানেই নূতন ঠেকিয়াছে! তাঁরা মনে করিয়াছিলেন—আউংগ সান্‌ হয়ত বর্মা চুরুট বিক্রয় করিতেই লণ্ডনে গিয়াছেন!

* * * *

একটি বিষাক্ত মাকড়সায় কামড়াইবার ফলে কোন এক ব্যক্তির সর্বাংগ ফুলিয়া যায়। ডাক্তারকে সংবাদ দিলে তিনি নাকি বলিয়া পাঠান—"Give the Patient a stiff dose of neat whisky every two hours"—রোগীকে তাহাই দেওয়া হইল এবং দিনান্তে দেখা গেল রোগ সারিয়া গিয়াছে! শ্যাম বলিল—"অতঃপর মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই হইতে হয়ত সংবাদ আসিবে যে—সেখানে বিষাক্ত মাকড়সার কামড়ে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতেছে!"

* * * *

ক্রিকেট খেলায় উপযুক্ত দৈহিক শক্তি অর্জনের জন্য নাকি প্রবীণ ক্রিকেটার প্রফেসার দেওধর যোগসাধনার নির্দেশ দিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"খেলোয়াড়রা যোগ মার্গে চলিতে রাজী হইবেন কিনা সন্দেহ আছে, কেননা আমরা যতদূর জানি তাঁহাদের আদর্শ হইল ভক্তি মার্গ অর্থাৎ শুধু হে মা কালী আর মানৎ"!

* * * *

"আয় বুঝে ব্যয় করুন"—একটি বিজ্ঞাপনের নির্দেশ। খুড়ো বলিলেন—"নির্দেশটায় একটু ভুল আছে, বলা উচিত ছিল আয় বুঝে ব্যয় করান। কেননা ব্যয় আমরা আয় বুঝিয়াই করিতে চাই, কিন্তু আমরা ত যন্ত্র মাত্র, যাঁরা যন্ত্রী অর্থাৎ অন্দরের ওঁরা,—



"দেহাভ্যন্তরের শুচিতাই স্বাস্থ্য রক্ষার গোড়ার কথা"



কাগজের বাক্সের মধ্যে টিনে প্যাক করা থাকে। সর্বত্র নূতন মাল পাওয়া যায়।

ক্রমশ:ই বহু লোক বুঝতে পারছে যে এণ্ড্রুজের সাহায্যে দেহাভ্যন্তর পরিষ্কার করা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম নিয়ম। দেহের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন স্বাভাবিক এবং এণ্ড্রুজের সাহায্যে ভাল-ভাবে আভ্যন্তরীণ শুচিতা সম্পাদন করা সহজ। আদর্শ বিরেচক এক গ্লাস এণ্ড্রুজ সমস্ত দেহযন্ত্র পরিষ্কার ও সংশোধন করে। নিয়মিত এণ্ড্রুজ খেয়ে উপভোগ করুন এবং নিজেকে সজীব, সতেজ, ও স্নিগ্ধ রাখুন। এণ্ড্রুজ এই ভাবে বহু উপায়ে পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা দান করে:—

এণ্ড্রুজ জিহ্বা ও মুখ পরিষ্কার ও শীতল করে।

এণ্ড্রুজ অম্লশূল করে পাকস্থলীকে স্বাভাবিক রাখে।

এণ্ড্রুজ লিভারকে সতেজ করে ও পিত্ত-বিকার দমন করে।

এণ্ড্রুজ ধীরে ধীরে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে দেহাভ্যন্তর সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন রাখে। ইহা যন্ত্রণা দায়ক বিষবস্তু দূর করে, কোষ্ঠকাঠিন্য ভাল করে এবং রক্ত বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ রাখে।

ANDREWS

নির্ভীক জাতীয় সাপ্তাহিক

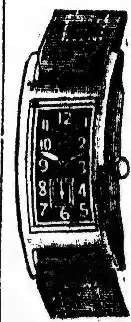
"দেশ"

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

বার্ষিক মূল্য—১৩ ষাণ্মাসিক—৬॥০

ঠিকানা:—আনন্দবাজার পত্রিকা
১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

যুদ্ধের পূর্ব মূল্যে জুয়েলযুক্ত



লীভার ওয়াচ

সুইস মেড, লীভার মেশিন, নির্ভুল সময়রক্ষক, ৫ বছরের জন্য গ্যারাণ্টী দত্ত। ক্রোমিয়াম কেস, গোলাকার ২৫,, চতুষ্কোণ ৩০, উৎকৃষ্ট ৩৩,, রেক্টাংগুলার বা টোনো শেপ ৪৫,, রোল্ড গোল্ড ১০ বছরের গ্যারাণ্টীযুক্ত ৬০। ১৫টি জুয়েল খচিত রোল্ড গোল্ড ৭৫,, কার্ভ শেপ রোল্ড-গোল্ড ৮০,, উপরোক্ত ঘড়ি-গুলির মধ্যে মহিলাদের সাইজ লইতে হইলে শতকরা ১২॥০ করিয়া অতিরিক্ত লাগিবে। ডাকব্যয় অতিরিক্ত ৸০ আনা; একত্রে দুইটি ঘড়ি লইলে ডাক-ব্য লাগে না। ক্যাটালগ স্টকে নাই।

ফাউণ্টেন পেন (আমেরিকান বা ইংলিশ) রোল্ডগোল্ড অথবা প্ল্যাটিনাম নিব সমন্বিত। বিভিন্ন ডিজাইনের পাওয়া যায়। মূল্য—১০, সুপিরিয়র ১২, উৎকৃষ্ট ১৫ টাকা। ডাকব্যয় অতিরিক্ত।

প্যারাগন ওয়াচ কোং

পোস্ট বক্স নং ১১৪১৯, কলিকাতা (ডি)

বিনা অস্ত্রে

চক্ষুছানি

বিজ্ঞান "আই-কিওর" (রেজিঃ) চক্ষুছানি এবং সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়। নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩, টাকা মাশুল ৸০ আনা।

কমলা ওয়ার্কস (দ) পাঁচপোতা, বেঙ্গল।

রেজিষ্টার্ড "এইচ এইচ"

১০০ বছর যাবৎ খ্যাত চিত্রকূটের পার্বত্য মহৌষধ মাত্র ১ মাত্রা ব্যবহারেই হাঁপানি আরোগ্য হয়। ৫-২-৪৭ তারিখে পূর্ণিমা রজনীতে ইহা সেবন করিতে হইবে। বৃন্দাবন গুরুকুল বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের



গত ১৫ই জানুয়ারী দিল্লীতে খাদ্যোৎপাদন সম্মেলনে বড়লাটের শাসন পরিষদের খাদ্য-সদস্য ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা বাঙলায় বর্তমানে খাদ্যদ্রব্যের অবস্থার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া গঠিত করা আমরা প্রয়োজন মনে করি। বাঙলার অবস্থা ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে অন্তত ২০ লক্ষ লোকের মৃত্যুতে যেমন বুঝিতে পারা গিয়াছে, আজ চাউলের দুর্মূল্যতায়, সর্ষপ তৈলের অভাবে ও চিনির স্বল্পতায় তেমনই অনুভূত হইতেছে।

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, আগামী ৫ বৎসরে ভারতবর্ষকে খাদ্য-বিষয়ে স্বাবলম্বী করিতে হইবে। সেজন্য ভারত সরকার ৫০ হইতে ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন। ব্যয়—উহার চতুর্গুণ হইবে। আর এক-চতুর্থাংশ প্রদেশকে দিতে হইবে। তাহা হইলেই কৃষকের ভার অর্ধেক হইয়া যাইবে। প্রতি একর জমিতে বর্তমানে গড়ে ১০ মণ শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার স্থানে সাড়ে ১১ মণ উৎপন্ন করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

প্রধানত সেচের সুবিধা বৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট বীজব্যবহার, অধিক সার প্রয়োগ ও কৃষিকার্যের পদ্ধতির উন্নতি—এই সকলের দ্বারাই অভিপ্রেত কাজ হইবে।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সরকারের হিসাব বিভাগের সম্পূর্ণ সংশোধন করিতে অনুরোধ করিতেছি। সেই সংশোধন ব্যতীত হিসাবেই ভুল থাকিয়া যাইবে। কেন আমরা একথা বলিতেছি, তাহা বুঝাইবার জন্য বাঙলার দুর্ভিক্ষের সময় যে সকল হিসাব সরকারী দপ্তর হইতে পাওয়া গিয়াছিল, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের মনোযোগ সেই সকলের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি। ঐ বৎসর জুন মাসে তৎকালীন খাদ্যসদস্য নলিনীরঞ্জন সরকার আশ্বাস দিয়া দিল্লী হইতে বলিয়াছিলেন:—

"আমাদিগের কাহারও কাহারও মনে যেন এইরূপ আশঙ্কার উদ্ভব হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে তীব্র খাদ্যাভাব আসিতেছে—যে অবস্থা হইবে, তাহা দুর্ভিক্ষেরই পর্যায়ভুক্ত। সেরূপ আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। আমরা সকলেই জানেন যে, আমাদিগের দেশ কৃষি সম্পদে অসাধারণ—এমন কি অসীম সুবিধাসম্পন্ন; এবং সাধারণত আমাদিগের যে খাদ্য প্রয়োজন তাহা আমরা দেশেই উৎপন্ন করি। আমাদিগের বার্ষিক প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের শতকরা ৩ ভাগেরও অল্প। গম যাহা এদেশে উৎপন্ন হয়, তাহাতে দেশের লোকের প্রয়োজন মিটিয়া যায়; এমন কি যেবার ফসল ভাল হয়, সেবার আমরা গম রপ্তানীও করিতে পারি। মওয়ার, বাজরা, ছোলা, দাইল প্রভৃতি দেশের প্রয়োজনের উপযুক্ত হয়। * * * যানবাহনের অসুবিধাহেতু বা অজন্মায় কোন কোন স্থানে অল্পকালের জন্য অভাব হইতে পারে বটে, কিন্তু আমি আবার বলি—সমগ্র ভারতে খাদ্যের অভাব হয় না।"

খাদ্যসচিবের এই উক্তির সহিত যে প্রকৃত অবস্থার সামঞ্জস্য নাই, তাহা আমরা প্রতিদিন অনুভব করি এবং ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

বাঙলা সম্বন্ধে আমরা উক্ত খাদ্য-সদস্যের উক্তির উল্লেখ করিব। ঐ বৎসর ১৫ই মে কলিকাতায় তিনি বলিয়াছিলেন:—

"বাঙলার প্রধান খাদ্য অর্থাৎ চাউল বাঙলায় যে পরিমাণ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ব্রহ্ম হইতে বৎসরে সাড়ে ১৭ লক্ষ মণ চাউল আমদানী করিতে হয়। কিন্তু বাঙলায় বৎসরে যে চাউল উৎপন্ন হয়, বাজার তুলনায় উহা নগণ্য। * * * চাউল সম্বন্ধে বাঙলার অবস্থা এখন আরও ভাল হইয়াছে। সাধারণত বাঙলায় ২কোটি ১০লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হয়, কিন্তু ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ একরে ধানের চাষ হইয়াছে। × × ফলে ঐ বৎসর সাড়ে তের লক্ষ টন অধিক শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। × × যদি এইরূপ চলে এবং সুবর্ষণ হয়, তবে বাঙলা যে কেবল চাউল সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইবে তাহাই নহে, পরন্তু যে সকল প্রদেশে ব্রহ্ম হইতে আমদানী বন্ধ হওয়ায় অভাব ঘটিবে, সে সকলকে সাহায্য করিতেও পারিবে।"

আমরা যে সকল উক্তির উল্লেখ করিলাম, সে সকল যে বক্তার জন্য সরকারী হিসাব হইতে

বাঙলার অবস্থা দেখাইয়া আমরা আর একটি কথা বলিব—

অর্থব্যয় ও তাহার ফল পরিদর্শন করা কেন্দ্রী সরকারের পক্ষে প্রয়োজন হইবে।

আমরা বাঙলায় খাদ্য সম্বন্ধে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যিনি খাদ্য-সদস্য ছিলেন; তাঁহারা যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা তিনি বাঙলায় খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা প্রবর্তন-প্রসঙ্গে করিয়াছিলেন। তাহার পর

সেই কার্যে কত টাকা ব্যয়িত হইয়াছে;
সেই অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হইয়াছে;
অর্থব্যয়ের ফল কি হইয়াছে।

তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি?

নোয়াখালির ব্যাপারে দেখা গিয়াছে—কেন্দ্রী সরকার স্বায়ত্তশাসনশীল কোন প্রদেশের সরকারের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। যদি তাহাই হয়, তবে কেন্দ্রী সরকার খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে অর্থ দিবেন, তাহা যে স্বায়ত্তশাসনশীল প্রদেশের সরকারের দ্বারা অপব্যয়িত হইবে না, তাহার ব্যবস্থা কি করা যাইবে?

বাঙলায় খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কেন হয় নাই বা আশানুরূপ হয় নাই, তাহা কে বলিবে?

বিশেষ বাঙলায় দুর্ভিক্ষের সময় যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব অনিষ্টকর হইয়াছে:—

(১) যখন সরকারের রেশন সরবরাহ ব্যবস্থা করা অনিবার্য হইয়া উঠে, তখনও লোক নিয়োগে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা রক্ষার জন্য সরবরাহ করিতে বিলম্ব ঘটে এবং ফলে হয়ত বহু লোকের মৃত্যু হয়।

(২) যখন লোকের মনে আস্থা উদ্ভব করিবার জন্য সম্মিলিত সচিবসঙ্ঘ গঠন একান্ত প্রয়োজন হয়, তখনও যে তাহা হয় নাই তাহার কারণ মুসলিম লীগ লীগের অনুগত নহেন এমন কোন মুসলমানের সহিত সচিবসঙ্ঘে একযোগে কাজ করিতে অসম্মত ছিলেন।

বাঙলায় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে বারবার যে নারকীয় কাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও যেমন লক্ষ্য করিবার বিষয়, তেমনই বাঙলায় সরকারের নিযুক্ত কমিটির মন্তব্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন—সরকারী কর্মচারীদিগের মধ্যেও যেরূপ দুর্নীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে কিরূপে তাহা দূর করা যাইবে তাহা কঠিন সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।

প্রাপ্যে বঞ্চিত করা হইতেছে। অথচ বাঙলায় বাঙালীর জন্যও খাদ্যশস্যের অভাব এত অধিক যে, চাউল দুর্মূল্য, আটায় অর্ধেক মাত্র গম ইত্যাদি।

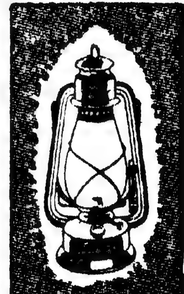
ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙলার সহিত অপরিচিত নহেন, কাজেই তিনি বাঙলায় দুগ্ধের অভাব কিরূপ শোচনীয় তাহাও অবগত আছেন, মনে করিলে তাহা অসংগত হইবে না। কিন্তু সেই অভাব দূর করিবার জন্য বাঙলা সরকার আজ পর্যন্ত কি করিয়াছেন?

যে সময় বার্ণিয়ার এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন বাঙলা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, লোক বলে বটে, সমগ্র পৃথিবীতে মিশরই প্রাচুর্যে প্রথম স্থান অধিকার করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বলেন, সে গৌরব বাঙলার প্রাপ্য। তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙলায় যে চাউল উৎপন্ন হয়, তাহাতে বাঙলার লোকের অন্নের প্রয়োজন মিটাইয়া তাহা রপ্তানী করা হয়; বাঙলার শর্করা আরবের মিষ্টান্নেও মিষ্টত্ব সঞ্চার করে; বাঙলায় যত কার্পাস ও রেশমী কাপড় প্রস্তুত হয়, তত আর কোথাও হয় না ইত্যাদি। তিনি বলিয়াছিলেন, রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বহু খালে গঙ্গার জল প্রবাহিত, সেই জল কেবল যে লোকের স্নান পানের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাই নহে, পরন্তু তাহাতেই নৌকায় যাত্রী ও পণ্য বাহিত হয়। বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার স্যার উইলিয়ম উইলকক্স বলিয়াছিলেন, নিম্ন বঙ্গের বহু নদীই বাঙালীদিগের খনিত খাল ছিল। সে সকল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বাঙলার উর্বরতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তিনি পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের দুর্দশা সেই কারণে সঞ্জাত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া তাহার যে প্রতীকারোপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাও গৃহীত হয় নাই।

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন, কৃষককে সারের প্রয়োজন বুঝাইয়া দিলে সে তাহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিবে। কিন্তু কৃষককে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই; প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে বড়লাটের ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য সিয়ানী মহাশয় বলিয়াছিলেন, কৃষক যে সারের উন্নত পদ্ধতিতে চাষের যন্ত্রাদির প্রয়োজন বুঝে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু অর্থাভাবে সে সকল ব্যবহার করিতে পারে না। কৃত্রিম সার সম্প্রতি উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন ও করিতেছেন বটে, ব্যবস্থায় এক বা দুই বৎসরে ফল পাওয়া যায়, তিনি সেই সকলের কথাই বলিয়াছেন। আমরা, মনে করি, তাঁহাকে বলা বাহুল্য, বাঙলায় পুষ্করিণী ও বাঁধের সাহায্যে সেচের যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, সেরূপ অন্তত দুর্লভ। সেচ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন, সেইরূপ সেচ ব্যবস্থা শিক্ষা করিতে হইলে পৃথিবীর লোককে বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুরে যাইতে



কোটি কোটি মানুষের হৃৎস্পন্দন বুকে ক'রে ভারত যদি কোথাও জেগে থাকে ত সে তাঁর সাতলক্ষ গ্রামের নিভৃত অনাড়ম্বর পরিবেশে, বড় বড় শহরের জাঁকালো প্রাচুর্য্যের মধ্যে নয়। সূর্য্যাস্তের পর থেকে গ্রামগুলি আলোর অভাবে ম্রিয়মাণ হ'তে হ'তে ক্রমে ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়—মনে হয়, এ-যেন কোন্ অন্ধকারের রাজ্য! এই লক্ষ লক্ষ গ্রাম আলোকিত করবার মহান্ উদ্দেশ্যই রয়েছে 'দীপ্তি' লণ্ঠন প্রস্তুতকারীদের প্রচেষ্টার মূলে।



দীপ্তি
হ্যারিকেন লণ্ঠন

হয়। এককালে বর্ধমান অঞ্চলের অর্থাৎ রাঢ়ের লোক পুষ্করিণী খননে ও বাঁধ বাঁধার কাজে এত অভিজ্ঞ ছিল যে, মাদ্রাজ হইতেও তাহাদিগকে ঐজন্য লইয়া যাওয়া হইত। বাঙলার—বিশেষ মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থানেই সেচের বাঁধের ও পুষ্করিণীর চিহ্ন দেখা যায়। যদি নূতন খাল খনন না করিয়া প্রথমে সেই সকলের সংস্কার সাধন করা হয়, তবে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে এবং অল্প দিনের মধ্যেই উপকার লাভ করা যায়।

বাঙলায় কিছুদিন হইতে যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নানা অনর্থের সৃষ্টি করিয়া বাঙলার অনিষ্টসাধন করিতেছে, তাহা যাহাতে প্রদত্ত অর্থের উপযুক্ত ব্যয়ের পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইতে না পারে, সে বিষয়ে নির্দেশ দানের অধিকার রক্ষা করা কেন্দ্রী সরকারের পক্ষে প্রয়োজন। সেই সর্তে কেন্দ্রী সরকার অর্থ দিলে আর তাঁহাদিগকে অর্থের অপব্যয়ের আশঙ্কা করিতে হইবে না। কার্যে যেন যোগ্যতার স্থান সাম্প্রদায়িকতা অধিকার করিতে না পারে।

বাঙলায় মুসলিম লীগের মুখপত্রগুলি অনায়াসে বলিতেছেন:—

(১) বাঙলায় মুসলিম লীগ সচিব সংঘ প্রতিষ্ঠিত থাকায় মুসলমানদিগের সম্বন্ধে সরকারের বিশেষ কর্তব্য আছে।

(২) সেই কারণে বিহারী মুসলমানদিগকে বাঙলায় আনিয়া বসতি করান সমর্থনযোগ্য ও প্রয়োজন।

মুসলমানদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কর্তব্য যে অর্থের অপব্যয়ের কারণ হইতে পারে, তাহাও বলা প্রয়োজন।

বাঙলায় যে "পতিত" জমি আছে, তাহাতে বাঙলার লোকের অধিকার সর্বাগ্রে বিবেচ্য। কোথাও বা সেচ ব্যবস্থার অভাবে, কোথাও বা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে গ্রাম উজাড় হইয়া গিয়াছে। সে সকল স্থানে সেচের ব্যবস্থা করিয়া স্থানগুলি ম্যালেরিয়াশূন্য করিয়া বাঙালীকে সেই সকল স্থানে বাস ও চাষ করিতে আকৃষ্ট করা কর্তব্য। যে বাঙলার লোক জমির অভাবে আসামে যাইতেছে এবং তাহাতে জটিল অবস্থার উদ্ভব হইতেছে, সেই বাঙলায় জমি পতিত আছে। ইহা প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর সংগে সংগে একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, সেই জমিতে অধিকার বাঙালীর—বিহারীর নহে।

আর্থিক ব্যাপারের সহিত রাজনীতিক

হইবার সম্ভাবনা আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং বাঙলাতেই তাহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। কেন্দ্রী সরকার যেন তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও, পরোক্ষভাবে দোষী না হয়েন।

গত দুর্ভিক্ষের সময়েও দেখা গিয়াছে, বাঙলা সরকার ধান্যের চাষের জন্য যে বীজ সরবরাহ করিয়াছিলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা অঙ্কুরিতও হয় নাই। অথচ সে জন্য যাহারা দায়ী, তাহারা কোনরূপে দণ্ড যে পাইয়াছে, এমন কথাও জানা যায় নাই। ইহা যে অযোগ্যতার পরিচায়ক বা দুর্নীতিদ্যোতক তাহা বলা অবশ্য বাহুল্য।

বাঙলা কি কারণে বা কি কি কারণে গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে খাদ্যাভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করা প্রয়োজন এবং তাহার পরে সেই সকল কারণ দূর করিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সেজন্য যে পরিকল্পনা প্রদেশিক সরকার প্রস্তুত করিবেন, তাহা বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য নির্দেশদানের অধিকার রাখিয়া যদি কেন্দ্রী সরকার সমগ্র ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহাই কি সংগত হইবে, তাহা আমরা বাঙলার তিক্ত অভিজ্ঞতায় বলিব।

বাঙলার প্রয়োজন যেন সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা নির্ধারিত ও সেজন্য রচিত পরিকল্পনা রাজনীতিক প্রভাবদুষ্ট না হয়।



খুলনার জননায়ক নগেন্দ্রনাথ সেন

খুলনার অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননায়ক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি এল গত ৬ই পৌষ (ইং ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬) রবিবার ৭৪ বৎসর বয়সে রাত্রি ১২॥টায় অমাবস্যা তিথিতে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করেন। খুলনা জেলার যাহা কিছু মঙ্গল সেজন্য তিনি সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন। কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি সামাজিক বা ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে যাহা কিছু জনহিতকর তাহার প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সর্বদাই অর্থ সামর্থ্য বা পরামর্শ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাঙলাদেশে তিনি প্রাচীনতম এবং অনাড়ম্বর কংগ্রেসসেবী রূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার আতিথেয়তা ও অতিথি-বাৎসল্য সর্বজনবিদিত ছিল এবং তাঁহার গৃহকে অনেকেই পরিহাসচ্ছলে "নগেন সেনের হোটেল খানা" বলিত।

১৮৮৬ সালে Tivoli gardensএ কলিকাতায় যখন সবেমাত্র কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় তখন নগেন্দ্রনাথ মাত্র স্কুলের ছাত্র হইলেও ইহার স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী যুগের বহু পূর্বে তাঁহার ছাত্রজীবনে যশোহর ও খুলনা জেলার সিদ্ধিপাশা ও বাকসার মোটা তাঁতের কাপড় ও খদ্দর পরিতে আরম্ভ করেন। মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পূর্ব হইতে স্বাস্থ্যভঙ্গজনিত দুর্বলতা হেতু খদ্দর ব্যতীত ছোট বহরের মিলের কাপড় পরিতে বাধ্য হন। তখন তিনি মাত্র ৮।৯ হাত ছোট কাপড় পরিতেন এবং ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য হিসাবে সেখানেও সেই বেশে যাইতেন। তাঁহার ওকালতী ব্যবসায়ও তিনি খদ্দরের পোষাকে চালাইয়াছেন।

সংবাদপত্রসেবীরূপে তিনি ভারতবর্ষে প্রথম "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র প্রচার করেন। ১৮৯৯ সালে খুলনার প্রথম সাপ্তাহিক পত্র "খুলনা"র সম্পাদক হিসাবে সম্পাদকীয় স্তম্ভের শীর্ষের Motto রূপে তিনি "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র প্রচারের প্রথম গৌরব অর্জন করিয়াছেন। বুয়র যুদ্ধের সময় তাঁহার সম্পাদকতায় মফঃস্বলের সংবাদপত্রের মধ্যে "খুলনা"ই প্রথম ও একমাত্র দৈনিক পত্র হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, ইদানীং মফঃস্বলের সংবাদপত্রসমূহে যে মফঃস্বল দেওয়ানী আদালতের নিলামী ইস্তাহার প্রকাশিত হয় এবং যে নিলামী ইস্তাহার প্রকাশ মফঃস্বলের বহু সংবাদপত্রের একমাত্র বা প্রধান উপজীবিকা তাহার প্রথম প্রবর্তন হয় "খুলনা" পত্রিকার নগেন্দ্রনাথের উদ্যমে। "খুলনার" সম্পাদকরূপে কিংবা 'Peoples Association-এর সম্পাদক এবং সভাপতিরূপে তিনি খুলনার জনহিতকর যে সমস্ত আন্দোলন চালাইয়াছিলেন খুলনার দায়রায় জুরির প্রথা প্রবর্তন তাহার অন্যতম ফল।

১৮৯৪ সালে খুলনা বারের কনিষ্ঠতম উকীল হিসাবে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার হইয়াছিল। তিনি কোনওদিন দরিদ্র মক্কেল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি ব্যবসায় আরম্ভের কিছুদিন মধ্যে বার এসোসিয়েশনের সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং পরে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইহার সভাপতি ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ প্রাক্ সংস্কার যুগে কংগ্রেসসেবীরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৭ সালে পুনরায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য হন।

পণ্ডিত-পরিবারে জন্ম হেতুই হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি কোনদিন নিত্যকর্ম, সন্ধ্যা-তর্পণ বাদ দেন নাই। খুলনা আর্য-ধর্ম সভার সম্পাদক হিসাবে তিনি যুগের প্রধান পণ্ডিত ও বক্তা পণ্ডিত-প্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি হিন্দুধর্মের প্রসিদ্ধ স্তম্ভগণের ব্যাখ্যা শুনাইতেন। বাহিরে তিনি সর্বদা স্বপাক আহার করিতেন। তাঁহার আচার নিষ্ঠা ও আস্তিক্য বুদ্ধি অনেকের মধ্যে বিরল হইলেও অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মত বিশেষ উদার ছিল। জেলে থাকিবার কালেও তিনি স্বহস্তে রান্না করিয়া খাইতেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নগেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতামহ ও মাতামহের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বার

সকলের জন্য

কুমারেশ

শিশু যকৃত, দন্তোদ্গমকালীন
পেটের পীড়া, ক্রিমি, রিকেটস

অ্যানিমা ঘটিত আমাশয়
অজীর্ণ, গ্রীষ্মকালীন উদরাময়

গর্ভাবস্থায় অজীর্ণ ও পেটের
পীড়া এবং সূতিকা

পুরাতন ও জটিল কোষ্ঠবদ্ধতা

সকল বয়সেই লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষায় কুমারেশ অপরিহার্য, তাই সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ লিভার ও পেটের যে কোন পীড়ায় কুমারেশ ব্যবস্থা ক'রে থাকেন।

QUMARESH

পড়িয়াছে বলিয়া বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। অমাবস্যা তিথিতে মৃত্যু হওয়ায় পঞ্চপাত্র শ্রাদ্ধে ভগবান্ তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ পূরণ হইবার সুযোগ দিয়াছেন।

১৯২৯ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়ার পরে তিনি কংগ্রেসের নির্দেশ মত সভ্যপদ ও ওকালতী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অনন্যকর্মা হইয়া তাঁহার অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত খুলনা ও উত্তর বঙ্গে দুর্ভিক্ষে ও বন্যায় আর্ত-ত্রাণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

বিগত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি খুলনা জিলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি সপরিবারে ও সদলবলে আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের জন্মভূমি রাড়ুলি গ্রামে আইন অমান্যের জন্য অভিযান করেন। প্রায় ৫৮ বৎসরের বৃদ্ধ বয়সে তিনি সরকার কর্তৃক ধৃত হন। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও চেষ্টা না করিয়া একটি বিবৃতিতে জানান যে, ইহা সত্য যে তিনি ২৬শে জানুয়ারীর স্বাধীনতার সংকল্পবাণী পাঠ করিয়া-ছিলেন এবং জনসাধারণকে লবণ আইন ভঙ্গ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি কোন অন্যায়, নীতিবিরুদ্ধ অথবা অসমীচীন অথবা তাঁহার লজ্জিত হইবার মত কোনও কার্য করেন নাই। কিন্তু যদি বিচারক মনে করেন যে, তিনি আইনবিরুদ্ধ কার্য করিয়াছেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার নিজের কর্তব্য অনুযায়ী তাঁহাকে শাস্তি দিবেন।

এই সময়ে তাঁহার পরিবারস্থ প্রায় সকলেই উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহাদের খুলনার বাড়ি যাহা রাজনৈতিক তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা সরকার বাজেয়াপ্ত করিবার মনস্থ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা শৈবলিনী দেবী রাজপথে শোভাযাত্রায় নেতৃকালীন পুলিশের লাঠির ঘায়ে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হন ও সংজ্ঞাহীনা হন। তাঁহার ভ্রাতাগণের উপর নোটিশ জারী হয়। ক্রমে তাঁহার পুত্র ডাক্তার শ্রীমান্ সুধীররঞ্জন সেন, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বরঞ্জন সেন, বি এ (বর্তমানে নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধীর সহচর ও সেবক), শ্রীমান্ জনরঞ্জন সেন, কন্যা জামাতা বগুড়ার শ্রীযুত সুরেশ দাশগুপ্ত, বি এল (বর্তমানে এম, এল্ এ) প্রভৃতি কারারুদ্ধ হন।

বারংবার কারারুদ্ধ হওয়ায় ও বৃদ্ধ বয়সে কংগ্রেস ও দেশসেবা সম্পর্কে অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং গত বৎসর ব্যবস্থা পরিষদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর হইতে স্মৃতিশাস্ত্র ও গীতাদি গ্রন্থ পাঠে সময়ক্ষেপ করিলেও তিনি খুলনার প্রত্যেক কার্যে, আলোচনা পরামর্শ সভায় যোগ দিয়াছেন।

বংশ পরিচয়

নগেন্দ্রনাথের পিতা গঙ্গাচরণ সেন সিপাহী বিদ্রোহের কিছুকাল পরে তাঁহাদের বাসভূমি ফরিদপুর জেলার খান্দারপাড়া হইতে খুলনা আসিয়া ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ অভিরাম কবীন্দ্র, পণ্ডিত [illegible] কবিরাজ দুর্গাদাস [illegible]-প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁহার তিন ভ্রাতা,—হরিদ্বার ঋষিকুল আয়ুর্বেদিক কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কবিরাজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, কবিরত্ন, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য ও সিটি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ সেন সকলেই সমাজে বিশেষ সুপরিচিত।

নগেন্দ্রনাথ মৃত্যুকালে ছয় পুত্র, চারি কন্যা ও চারি জামাতা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই কৃতী ও সুপ্রতিষ্ঠ। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তিনি কোনও আত্মীয় বিয়োগের জন্য কষ্ট পান নাই।



শ্রীযুত মহাদেব দেশাই বলেন ঃ—

আমি ও আচার্য কৃপালনী অদ্য শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা পরিদর্শন করিয়া দেখিলাম যে ইহা একটি বৃহৎ আয়ুর্বেদীয় কারখানা। এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সুপরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় বাস্তবিকই প্রশংসার পাত্র। এখানকার সুবিশুদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীতে আমি আশ্চর্য হইয়াছি।

স্বাঃ মহাদেব দেশাই।

তাং ১৯।৫।২৫



অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

খেলাধূলা

ক্রিকেট

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের প্রথম খেলায় বাঙলা দল ১৪৫ রাণে যুক্তপ্রদেশ দলকে পরাজিত করিয়াছে। ইহার ফলে বাঙলা দল পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে হোলকার দলের সহিত খেলিবার সুযোগলাভ করিল। বাঙলা দলের এই সাফল্য আনন্দদায়ক সন্দেহ নাই, তবে খেলার ফলাফল ইহা অপেক্ষাও ভাল হইত যদি যুক্তপ্রদেশ দলকে "ফলো অন" করিতে বাধ্য করা হইত। প্রথম ইনিংসে ২০০ রাণে অগ্রগামী হইয়াও বাঙলা দলের অধিনায়ক "ফলো অন" না করিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। অধিনায়কের এই আচরণ স্থানীয় ক্রীড়ামোদিগণকে বিশেষ উত্তেজিত করে। বাঙলা দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিলে এইজন্যই দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে বিরক্তিব্যঞ্জক বহু প্রকার ধ্বনি করিতে শোনা যায়। চা-পানের সময় যখন খেলা স্থগিত থাকে, তখন দর্শকের মধ্যে কয়েকজন ভীষণ উত্তেজিত হইয়া প্যাভেলিয়নের নিকট চীৎকার করিয়া অধিনায়ককে ভৎর্সনা করিতে থাকেন। দর্শকগণের এই আচরণ আমরা সমর্থন করি না। তবে ইহার ফলে নাকি অধিনায়ক বাহিরে আসিয়া সকলকে জানান যে, তিনি নিজ ইচ্ছায় এইরূপ করেন নাই। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষস্থানীয় লোকের অনুরোধেই করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সকল উক্তি আমরা স্বকর্ণে শুনি নাই, কিন্তু এইরূপ কোন নির্দেশ যে অধিনায়ক পাইয়াছিলেন, এই বিষয় আমাদের সন্দেহ নাই। খেলাটি যদি প্রদর্শনী অথবা মহৎ উদ্দেশ্যের অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। এই খেলাটি প্রতিযোগিতামূলক খেলা। এই খেলার হার-জিতের প্রশ্নই সবচেয়ে বড়। সুতরাং খেলাটি দুই দিনে শেষ হইবার যখন সম্ভাবনা ছিল, তখন জোর করিয়া বাড়ান কোনরূপেই সমীচীন নাই। যুক্তপ্রদেশ দলের খেলোয়াড়গণও যে এই সিদ্ধান্তে খুব খুশী হইয়াছেন বলা যায় না। অধিনায়কের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া পরিচালকগণ ইচ্ছামত খেলাটিকে চারিদিনব্যাপী করিলেন। ইহাতে সুনাম কিছুই বৃদ্ধি পাইল না। অধিকাংশ ক্রীড়ামোদীই বিনাদ্বিধায় অজস্র কটূক্তি করিলেন। ইহা কি খুবই সুখের হইল? এই সংবাদ সারা ভারতে যখন ছড়াইয়া পড়িবে, সারা ভারতের ক্রীড়ামোদী তখন কত উক্তিই করিবেন তাহার সীমা নির্ধারণ করা কঠিন। দায়িত্বজ্ঞানহীন, অদূরদর্শী, নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক—এই সিদ্ধান্ত বাঙলার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সম্মান ক্ষুন্ন করিল, ভাবিতেও চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। কত কিছুই বলিতে ইচ্ছা হয়, কেবল মনে হইতেছে বাঙলার ক্রীড়াজগতের অর্বাচীনের দল কতদিনে অপসারিত হইবে। ইহাদের কার্যকলাপ যে সহ্যের অতীত হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙলার দুইটি তরুণ খেলোয়াড়ের কৃতিত্ব

বাঙলা দলের দুইজন তরুণ খেলোয়াড় পি রায় ও পি চ্যাটার্জি, ব্যাটিং ও বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্ব

সন্তুষ্টই হইয়াছেন। বাঙলার সুনাম বৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়াই আমরা সকল সময়ে আমাদের মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি, সুতরাং অনুসরণ করিলে ফল ভাল হইবারই সম্ভাবনা থাকে বেশী। পরিচালকগণ বোধ হয় ইহা বর্তমানে উপলব্ধি করিলেন।

খেলার বিবরণ

বাঙলা দল টসে জয়ী হইয়া ব্যাটিং গ্রহণ করে। খেলার সূচনা ভাল হয় না। ৫টি উইকেটে ৮৫ রাণে পড়িয়া যায়। ইহার পর পি রায় ও গার্বিসের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের জন্য খেলার গতি পরিবর্তিত হয়। দিনের শেষে বাঙলা দল ৯ উইকেটে ২৮৯ রাণ করে। পি রায় ১০৭ রাণ করিয়া নট আউট থাকে। দ্বিতীয় দিনের সূচনায় বাঙলা দলের ইনিংস ২৯৫ রাণে শেষ হয়। পি রায় ১১২ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। পরে যুক্তপ্রদেশ দল খেলিয়া মধ্যাহ্ন ভোজের অল্প পরেই ৯৫ রাণে ইনিংস শেষ করে। পি চ্যাটার্জি ৩১ রাণে ৭টি উইকেট পান। বাঙলা দল ২০০ রাণে অগ্রগামী হয়। যুক্তপ্রদেশ দলকে "ফলো অন" না করিয়া নিজেরাই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। বাঙলা দলের দিনের শেষে ৫ উইকেটে ৯২ রাণ হয়।

তৃতীয় দিনে বাঙলা দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৮ রাণে শেষ হয়। যুক্তপ্রদেশ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ও দিনের শেষে ৭ উইকেটে ১২৫ রাণ করিতে সমর্থ হয়। এস খাজা ৬৩ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্ব পর্যন্ত খেলিয়া যুক্তপ্রদেশ দল দ্বিতীয় ইনিংসে ২১৩ রাণ করে। এস খাজা ১১১ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বাঙলা দল খেলায় ১৪৫ রাণে জয়লাভ করে।

খেলার ফলাফলঃ—

বাঙলা দলের প্রথম ইনিংস— ২৯৫ রাণ
(পি রায় নট আউট ১১২, ধ্রুব দাস ৬৭, নরেন্দ্র সিং ৫৪ রাণে ৪টি ও আসুদ্দি ৪০ রাণে ২টি উইকেট পান।)

যুক্তপ্রদেশ দলের প্রথম ইনিংস— ৯৫ রাণ
(জসিম খাঁ ২৯, ফানসালকার ২২, পি চ্যাটার্জি ৩১ রাণে ৭টি ও এন চৌধুরী ৩১ রাণে ২টি উইকেট পান।)

বাঙলা দলের, দ্বিতীয় ইনিংস— ১৫৮ রাণ
(পি সেন ৪৫, পি রায় ২৮, বসির আমেদ ৫৩ রাণে ৪টি ও ওয়াগ ২১ রাণে ৩টি উইকেট পান।)

যুক্তপ্রদেশ দলের দ্বিতীয় ইনিংস— ২১৩ রাণ
(খাজা ১১১, এন চৌধুরী ৭৭ রাণে ৪টি, পি চ্যাটার্জি ৪৯ রাণে ২টি ও এস ব্যানার্জি ২৪ রাণে ২টি উইকেট পান।)

ফুটবল

হইতেই দল গঠন ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করা উচিত। ভারতীয় হকি দল পর পর ১৯২৮, ১৯৩২ ও ১৯৩৬ সালের বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানে বিজয়ীর সম্মানলাভ করিয়া যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার সমতুল্য নৈপুণ্য যাহাতে ভারতীয় ফুটবল দল অর্জন করিতে পারে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই দল গঠন করা উচিত নয় কি।

বাঙলার কতিপয় ফুটবল পরিচালক একত্র মিলিত হইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন—"এ বৎসর কোন প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা হইবে না।" এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত যদি বজায় থাকে, তাহা হইলে যে দল ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবে তাহাতে বাঙলার কোন খেলোয়াড় স্থান পাইবে না। বাঙলা দল আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়াই এই আশঙ্কা বিশেষ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে এটা ঠিক যে, আমরা উপরোক্ত দুই প্রস্তাবের মধ্যে একটিও কার্যকর হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না।

ব্যাডমিণ্টন

নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন মনোনীত সকল খেলোয়াড় সিংহল অভিমুখে যাত্রা করিতে পারেন নাই। যে কয়েকজন গিয়াছেন, আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে, তাঁহারা প্রত্যেক খেলায় ভারতের সুনাম রক্ষা করিতে পারিবেন। সিংহলের ব্যাডমিণ্টন খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুব উন্নততর বলিয়া আমরা জানি না। সেইজন্যই আমরা আশা করিতেছি, ভারতীয় খেলোয়াড়গণ সাফল্য মণ্ডিত হইয়াই দেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

১৪শ সপ্তাহ!
মুভিটেকনিক সোসাইটির নিবেদন
প্রতিমা
পরিচালনা—খগেন রায়
= চলিতেছে =
মিনার - বিজলী - ছবিঘর

মুক্তি পথে!!
এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্সের
মন্দির
ভূমিকায়
চন্দ্রাবতী, ছবি
এ, জি, রিলিজ

হাসি-কান্নার হীরা-পান্নায় গাঁথা মানুষের
জীবনের এই চিরন্তন সংগ্রামের কাহিনী!!
জায়ানট পিকচার্সের নিবেদন
"দুঃখে যাদের
জীবন গড়া"

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৩ই জানুয়ারী—মহাত্মা গান্ধী অদ্য নোয়াখালি জেলার করপাড়া হইতে সাহাপুর গ্রামে গমন করেন। গতকল্য করপাড়ায় এক বক্তৃতায় গান্ধীজী মাতৃভূমির মুক্তির জন্য ভারতের বাহিরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কার্যকলাপের প্রশংসা করেন।

সীমান্ত নেতা খাঁ আবদুল গফুর খাঁ পাটনা জিলার কয়েকটি উপদ্রুত গ্রাম পরিদর্শনের জন্য অদ্য সফরে বাহির হন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর পন্থা অনুসরণ করিবেন.

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু আজ দিল্লীতে ভিয়েৎনাম প্রতিনিধিকে তারযোগে জানান যে, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ছাড়াও তিনি ইন্দোচীনে একটি মেডিক্যাল মিশন পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

অদ্য আরায় ফরোয়ার্ড ব্লকের অধিবেশনে মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব লইয়া প্রবল বিতর্ক হয়।

১৪ই জানুয়ারী—আরায় ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রকাশ্য অধিবেশনে মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবের সংশোধন হয়। এই সংশোধন প্রস্তাবে ফরোয়ার্ড ব্লকের উভয় দলের গ্রহণযোগ্য মধ্যবর্তী একটি পন্থা অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে। প্রস্তাবে গণ-পরিষদ ও আইন সভাসমূহের ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্যগণকে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিয়া আসিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতির সহিত কিভাবে উহা কার্যে পরিণত করা হইবে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের কাউন্সিল তাহা স্থির করিবেন।

ভাটিয়ালপুরের (নোয়াখালি) সংবাদে প্রকাশ, নোয়াখালি জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি এমন কি নরহত্যার সংবাদ পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, গতকল্য লামচরে আরও তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী অদ্য প্রাতে নোয়াখালি জেলার সাহাপুর গ্রাম হইতে ভাটিয়ালপুর গ্রামে গিয়া পৌঁছেন। পথে গান্ধীজী চারিটি মুসলমানের বাড়ীতে গমন করেন। মুসলমান মহিলারা মহাত্মাজীকে মাল্যভূষিত করেন। ভাটিয়ালপুর গ্রামে গান্ধীজী নাথভৌমিক ব্রাদার্সের দেবমন্দিরে তাহাদের গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণ মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

পাটনার সংবাদে প্রকাশ, আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যার্থ বিহার সরকার এ পর্যন্ত ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। আরও জানা যায়, বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী বিহার সরকার প্রত্যেক আশ্রয়-প্রার্থীকে ৪৫০, টাকা করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ইউনাইটেড প্রেস বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, বাঙলা গভর্নমেণ্ট জমিদারী দখল করিয়া জমিদারদিগকে ক্রমিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গীয় [illegible]

সচিব মিঃ সামসুদ্দিন আমেদ অদ্য নয়াদিল্লীতে ইউনাইটেড প্রেসের বিশেষ প্রতিনিধির নিকট এই কথা বলেন।

লেডোর নিকটবর্তী তিরাপ সীমান্ত অঞ্চলে পাতকই উপত্যকায় ও বালিপাড়া পার্বত্য অঞ্চলে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত মুসলমান-দিগকে জমি বিলি করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৫ই জানুয়ারী—গত রাত্রিতে প্রায় ১২টি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আরায় নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের তৃতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হয়। একটি প্রস্তাবে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মহাত্মা গান্ধী অদ্য প্রাতে ভাটিয়ালপুর হইতে নারায়ণপুর (নোয়াখালি) গ্রামে গিয়া পৌঁছেন। নারায়ণপুরে তিনি মিঞা আমীনের গৃহে অবস্থান করেন।

মিঃ কে বি এস মেনন চীনে ভারত সরকারের দূত নিযুক্ত হইয়াছেন।

অদ্য ভরতপুর রাজ্যে পুলিশ ও সৈন্য-বাহিনীর আক্রমণের ফলে ৭০ জন লোক আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে মহিলাও আছেন।

১৬ই জানুয়ারী—অদ্য মহাত্মা গান্ধী এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ে দীর্ঘ তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নারায়ণপুর হইতে রামদেবপুরে (নোয়াখালি) গিয়া পৌঁছেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও সহকারী ভারত সচিব মিঃ আর্থার হেণ্ডার্সনের মধ্যে ভারত সচিবের অধীন আই সি এস, আই পি এস প্রভৃতি চাকরীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। প্রকাশ যে, অন্তর্বর্তী সরকারের অভিমত এই যে আই সি এস, আই পি এস প্রভৃতি চাকরী সম্পর্কে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আর হোয়াইট হলের উপর থাকিবে না, উহা ভারত সরকারের হাতে হস্তান্তরিত করিতে হইবে। ভারতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য ঐ সকল চাকরী হইতে যাঁহারা অবসর গ্রহণ করিতে চাহেন ভারত সরকার তাঁহাদের কোনরূপ ক্ষতি-পূরণ দিবেন না।

গতকল্য রাত্রে কলিকাতায় পার্ক ষ্ট্রীট সংলগ্ন রবিনসন ষ্ট্রীটের বাসভবনে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ও অধ্যক্ষ ডাঃ বি সি ঘোষের পত্নী এডিথ ঘোষ অজ্ঞাত আততায়ীর আঘাতে গুরুতর আহত হন। তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৭ই জানুয়ারী—গতকল্য রামদেবপুরে [illegible]

উপদেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনরূপ স্ববিরোধিতা নাই। গান্ধীজী আরও বলেন যে, কয়েকটি প্রদেশ বিভাগে যোগদানে ইচ্ছুক না হইলেও অন্যান্য বিষয়ে সুফল লাভের আশা থাকিলে গণ-পরিষদের কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া উচিত নহে। গান্ধীজী অদ্য রামদেবপুর হইতে পরকোটে গিয়া পৌঁছেন।

গৌহাটিতে আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী বৈঠকে মণ্ডলী গঠন ও বিভাগ সম্পর্কে তাঁহাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়।

১৮ই জানুয়ারী—কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংস্করণে ঘোষিত হইয়াছে যে, গত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় কলিকাতায় এবং ২৪ পরগণা ও হাওড়া জেলায় অনুষ্ঠিত অপরাধ-সমূহের বিচার দ্রুত সম্পন্ন করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিবার জন্য গভর্নর ১৯৪৭ সালের বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন সংশোধন অর্ডিন্যান্স নামে এক অর্ডিন্যান্স (১৯৪৭ সালের ১নং অর্ডিন্যান্স) জারী করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী পরকোট গ্রাম হইতে বাদল-কোটে (নোয়াখালি) গিয়া পৌঁছেন।

অদ্য রাত্রে কলিকাতায়, কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে ছয়জন লোকের সমগ্র একটি পরিবারকে ঘুমন্ত অবস্থায় অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডে আততায়ীর কবল হইতে ছয় মাসের একটি শিশুও রেহাই পায় নাই।

কলিকাতায় বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র কংগ্রেসের বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে প্রধান অতিথিরূপে শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ভাষণ প্রসঙ্গে এইরূপ আশা ব্যক্ত করেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলে উচ্চতর ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার জন্য সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাইবে এবং ভারতবর্ষে ইঞ্জিনীয়ারিং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন সব খ্যাতনামা ব্যক্তির উদ্ভব হইবে, যাঁহারা এই দেশকে তাহার সন্তানসন্ততিদের যোগ্য বাসভূমে পরিণত করিতে সমর্থ হইবেন।

১৯শে জানুয়ারী—মহাত্মা গান্ধী অদ্য বাদল-কোট হইতে রওনা হইয়া তাঁহার পল্লী পরিক্রমায় চতুর্দশ গ্রাম আতাখোরায় (নোয়াখালি) গিয়া পৌঁছেন। মহাত্মা গান্ধী আগামীকল্য শিরণ্ডী গ্রামে পৌঁছিবেন। এই গ্রামে গত ২২ দিন যাবৎ মিস আমতুস সালাম অনশন করিতেছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৪ই জানুয়ারী—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, ভারতবর্ষের জন্য ১৯৪৭ সালের প্রথম ছয় মাসে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল, আন্তর্জাতিক জরুরী খাদ্য পরিষদ উহা শতকরা পঁচিশ ভাগ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১৫ই জানুয়ারী—অদ্য লণ্ডনে ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ও তাঁহার সহকর্মী-দের সহিত ব্রহ্মের প্রতিনিধি দলের প্রায় দেড় ঘণ্টা আলাপ আলোচনা চলে। ব্রহ্মবাসীদের রাজনৈতিক [illegible] প্রতিনিধিমণ্ডলী কর্তৃক

১৭ই জানুয়ারী—ভিয়েৎনাম বেতারে বলা হইয়াছে যে, হানয়ের কেন্দ্রস্থলে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। ফরাসী ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ এবং সাঁজোয়া বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে ভিয়েৎনাম বাহিনী জেনারেল মর্লিয়ের হেড কোয়ার্টারের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

১৮ই জানুয়ারী—ফ্রান্সের নবনির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট মঃ আরিয়ল সমাজতন্ত্রী নেতা মঃ পল রামদিয়েকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

হানয়ের সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী স্পিটফায়ার বিমানবহর হানয়ের দক্ষিণে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জাতীয়তাবাদী সৈন্যদের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে এবং মেশিনগান চালাইয়াছে।

১৯শে জানুয়ারী—ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্ট হো চি মিন এক বিবৃতিতে এশিয়ার সমস্ত জাতিকে ভিয়েৎনামের পার্শ্বে সমবেত হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, মরক্কো মাদাগাস্কার এবং অন্যান্য ফরাসী উপনিবেশে গণ-অভ্যুত্থান হইবে।

বিবাহ ও যৌনব্যাধি

প্রায় সর্বত্রই বিবাহ মানব সমাজের অস্তিত্ব ও কল্যাণের পক্ষে একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব'লে গণ্য হয়েছে। ধর্ম ও আইনসভা বহুকাল থেকেই জাতি ও পরিবারের মঙ্গলের জন্য বিবাহিত জীবনের নানা সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যনীতির দিক থেকে বিবাহ ও বিবাহিত জীবন সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রতি মোটেই দৃকপাত করা হয়নি। প্রজননের প্রশ্ন বাদ দিলেও মনের ও দেহের স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্যের বহু প্রশ্নও এর মধ্যে রয়েছে। যৌন যোগাযোগের সূত্রে বিবাহ একের ব্যাধি অন্যে সংক্রামিত হবার কারণ হ'তে পারে এবং এ শুধু বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, তাদের সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে এমন অনেক রোগ আছে, যা স্বামী থেকে স্ত্রীর অথবা স্ত্রীর থেকে স্বামীর দেহে এবং পিতামাতা থেকে সন্তানে সংক্রামিত হয়ে থাকে। এই সব সংক্রমণকারী ব্যাধিগুলির মধ্যে যৌনব্যাধি একটি প্রধান স্থান দখল ক'রে আছে। যৌনব্যাধি থেকে এত বহু রকমের ও অনেক ক্ষেত্রে এত মারাত্মক ভোগ হ'তে পারে যে, তার পরিণামে শুধু কতকগুলি ব্যক্তির জীবনই নষ্ট হ'য়ে যায় না, সমাজের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বিপর্যয় ঘটতে পারে।

যৌনব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক হচ্ছে গণোরিয়া ও সিফিলিস এবং এই রোগগুলি ভয়ানক ছোঁয়াচে—প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন-সংযোগের সূত্রে এই রোগগুলি এক দেহ থেকে অন্য দেহে প্রবেশ করে। গণোরিয়া, বিশেষ করে প্রজনন-সম্পর্কিত অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গকেই বিধ্বস্ত করে। এইভাবে সন্তান জন্মদান বা ধারণের ক্ষমতা হরণ ক'রে নিয়ে বা নানারকম যৌনবিকলতার সৃষ্টি করে এ রোগ দাম্পত্য জীবনের সমস্ত শান্তি ও সম্প্রীতির সমাধি রচনা করতে পারে। মেয়েদের পক্ষে গণোরিয়ার বিশেষ বিপদ হচ্ছে এই যে, এ-রোগ অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মারাত্মক আক্রমণ চালিয়ে বেশ বড় রকমের অপারেশনের প্রয়োজন ঘটাতে পারে। পুরুষের পক্ষে এ-রোগের প্রধান ভীতির কারণ হচ্ছে, যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এর ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটাবার ক্ষমতা। এ ছাড়া, সন্তানের প্রশ্নও রয়েছে। শিশুর জন্মকালে মাতার রোগের স্পর্শ প্রায়ই তার চোখে লেগে যায়, ফলে শিশুটি হয়ে যায় দৃষ্টিহীন বা চক্ষুরোগগ্রস্ত।

পরিণতির দিক বিবেচনা করলে এ-কথা বলা যায় যে, বিবাহিত জীবনের পক্ষে গণোরিয়ার চেয়ে সিফিলিস বেশী বিপজ্জনক। কেন না প্রত্যক্ষ বা স্পর্শ দ্বারা সংক্রমণ ত' সিফিলিসে ঘটেই, তা ছাড়া গর্ভস্থ শিশুর দেহেও এ-রোগ সংক্রমিত হ'য়ে থাকে। সিফিলিস-গ্রস্ত সন্তানের জন্ম দম্পতির পক্ষে যে কী ভীষণ অভিশাপ, তা বলাই বাহুল্য। অথচ সক্রিয় অবস্থায় রোগটি ভেতরে আছে জেনেও অনেকে বিবাহ করে এবং তার ফলে বহু রোগগ্রস্ত সন্তানও ভূমিষ্ঠ হয়।

বিবাহের উদ্দেশ্য বিচার করলে দেখা যাবে যে, বিবাহিত জীবন জনস্বাস্থ্যের একটি বিশেষ কর্মক্ষেত্র। ভাবলে শিউরে উঠতে হয়, কিভাবে বরকন্যার স্বাস্থ্য অথবা তাদের পৈত্রিক বা পুরুষানুক্রমিক রোগপ্রবণতার কথা বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করে অসংখ্য নরনারীকে বিবাহ বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। যারা সিফিলিস বা গণোরিয়ায় ভুগেছে বা ভুগছে, চিকিৎসক যতদিন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পরীক্ষা দ্বারা সন্তুষ্ট না হবেন, ততদিন পর্যন্ত তাদের কোনমতেই বিবাহ করা বা যৌনসঙ্গম করা উচিত হবে না। বিবাহের স্বাস্থ্যনৈতিক সতর্কতা ও



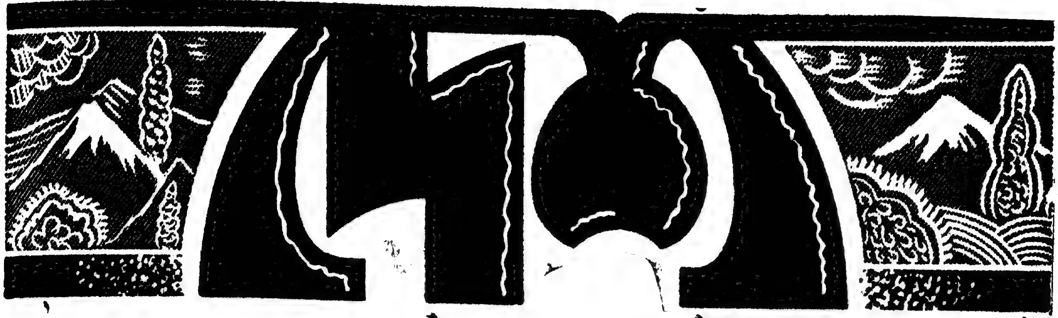


শতাধিক বৎসরাবধি সুপরিচিত



পাকা চুল কাঁচা হয়

কলপে সারে না। আমাদের ষ্রেইনিয়া সুগন্ধি



সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ১৮ই মাঘ, ১৩৫৩ সাল Saturday, Ist. February, 1947. [১৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নব ভারতের আদর্শ—

ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ঘোষণা সম্পর্কিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রস্তাব গণ-পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, পরিষদে উপস্থিত সকল দলের প্রতিনিধিই এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। গত ২২শে জানুয়ারী ভারতের সকল দলের প্রতিনিধি গণ-পরিষদে সমবেত হইয়া দৃঢ়তার সঙ্গে এই বাণী ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র। মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে যোগদান করে নাই; কিন্তু সেজন্য প্রশ্ন উত্থাপন করা আমরা অনাবশ্যক মনে করি; কারণ মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতাই চাহে না; সুতরাং স্বাধীনতাকামী ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত করিবার পক্ষে তাহার মতামতের বিশেষ কোন মূল্য নাই এবং ইহা সত্য যে, মুসলিম লীগের এই মতবিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে। মুসলিম লীগের সহায়তা পাইলে ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইত সত্য এবং তাহার সহযোগিতা লাভ করিবার জন্য কংগ্রেস নেতারা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ইহা সত্ত্বেও লীগ যদি ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী-মনোবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই চলে, তবে দুর্গম পথেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতার পথে কাহারা অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে এবং কাহারা মুসলিম লীগকে প্রশ্রয় দিতেছে তাহা আমাদের অবিদিত নাই। বলা বাহুল্য পণ্ডিত জওহরলালের প্রস্তাব গণ-পরিষদে উত্থাপিত হইবার পর হইতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মাথার টনক নড়িয়া উঠিয়াছে। লর্ড রোজবেরী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দলের একজন প্রধান নেতা। সম্প্রতি তিনি বিলাতের কনস্টিটিউসনাল ক্লাবে বক্তৃতা কালে ভারতের রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা আলোচনা করিয়া বলেন, ভারতবর্ষ সম্পর্কে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস, এতদুভয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব বৃদ্ধিতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসী দলের হাতে ভারত শাসনের সমগ্র ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়া ভারতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর হইয়াছেন।" বলা বাহুল্য ভেদ-বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা ভারতের সংহতি শক্তি বিচ্ছিন্ন করিবার লক্ষ্যেই ব্রিটিশ নীতি নিরন্তর প্রযুক্ত হইতেছে। লর্ড রোজবেরী সাম্রাজ্যবাদীদের সেই ভেদ নীতির সাফল্যের আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহার উক্তির ভঙ্গীতে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছেন। লর্ড মহোদয় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে লীগের দ্বারা প্ররোচিত সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিদ্বেষমূলক আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করিয়া মনে প্রাণে উল্লসিত হইয়াছেন এবং মনের সেই হর্ষাবেগকে তিনি চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার বক্তব্যের উপসংহারকালে বলিয়াছেন, "সম্প্রতি কয়েক মাসে ভারতে যে সব ব্যাপার ঘটিয়া গেল, তাহা হইতেই এ সত্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবে যে, আমরা যদি সে দেশের শাসনগত দায়িত্ব ভয়ে পড়িয়া পরিত্যাগ করিয়া আসি, তবে শান্তিপূর্ণ পথে ভারতের জটিল সমস্যার সমাধান হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। লর্ড মহোদয় ব্রিটিশ নীতির মর্ম কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের কোন দলেরই নাই এবং ইহাও একান্তই সত্য যে, মিঃ জিন্না তাঁহাদের দিকেই তাকাইয়া আছেন এবং তাঁহাদেরই ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছেন, নতুবা কংগ্রেস ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা মানিয়া লইবার পরও মুসলিম লীগের পক্ষে গণ-পরিষদে যোগদান না করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। গণ-পরিষদের অধিবেশন আপাতত এপ্রিল মাস পর্যন্ত স্থগিত আছে। ইহার মধ্যে লীগ দল কি সিদ্ধান্ত করিবেন সুনিশ্চিতভাবে এখনও বোঝা যাইতেছে না। তবে লীগপন্থীদের মনোবৃত্তি দেখিয়া উহাই মনে হইতেছে যে, গণতান্ত্রিক শাসনের মূল নীতিকে ধ্বংস না করিয়া তাঁহারা গণ-পরিষদে যোগ দিবেন না। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভারতের সর্বাঙ্গীণ রাষ্ট্র-নৈতিক জাগরণের গতিকে দলগত স্বার্থান্ধতার জোরে প্রতিরুদ্ধ করিতেই চাহেন; কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে সুস্পষ্ট ভাষাতেই এই কথা জানাইয়া দিতেছি যে, ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মধ্যযুগীয় মতবাদ দ্বারা ব্যাহত করিবার শক্তি কাহারও নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আনুকূল্য সত্ত্বেও লীগওয়ালারা যদি ভারতের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতার আবেগকে রুদ্ধ করিতে উদ্যত হন, তবে তাঁহাদের তেমন চেষ্টা অপরিহার্যভাবেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

ভারতের রাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা সর্বত্র জনগণের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে সত্য সত্যই আমাদের মনে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে। নেতাজী ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে বলিষ্ঠ শক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার জীবনাদর্শে ইহাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। তাঁহার তেজোপূর্ণ আত্মাবদানের গরিমা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শের ক্ষেত্রে ভারতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বর্তমানে যে সংগ্রাম চলিতেছে নেতাজীর সাধনার ফলে ভারতবর্ষ সেই সব দেশে স্বাধীনতাকামীদের সঙ্গে আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংযুক্ত হইয়াছে। দীর্ঘ পরাধীনতায় বিচ্ছিন্ন এবং এশিয়ায় অসহায় অবস্থায় থাকিবার পর ভারত আধুনিক আদর্শোপযোগী তাহার পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পাইতে বসিয়াছে। এশিয়ার এই সংহতি শক্তি জগৎকে নূতন করিয়া গড়িবে এবং নব জাগ্রত এশিয়ার অবদানে মানব-সংস্কৃতির অভিনব অধ্যায় উন্মুক্ত হইবে। আজ আমাদের অন্তরে এই আশার উদ্রেক হইতেছে। নেতাজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে আজাদ হিন্দ দলের সেনানীদিগকে সংবর্ধনা করিতে গিয়া সেদিন শরৎচন্দ্রও এই আশাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি এখনও এই বিশ্বাস করি যে, আমরা যদি এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির একটি বিরাট সঙ্ঘ সৃষ্টি করিতে পারি, তবে কেবল সেই পথেই ভারতের মুক্তি এবং সেই সঙ্গে সমগ্র এশিয়ার মুক্তি সংসাধিত হইতে পারে। এই সঙ্ঘ এমন হইবে যে, রাশিয়া, চীন, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং জাপানও তাহাতে যোগদান করিবে। যতদিন পর্যন্ত আমরা তেমন সঙ্ঘ গঠন করিতে না পারিব, ততদিন কিছুতেই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য-বাদের গতিকে প্রতিহত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।" বলা বাহুল্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ হিন্দু-মুসলমানের ভেদ-বিভেদকে বিলোপ করিয়া দিয়াছিল এবং সমগ্র এশিয়ার জাগ্রত জনশক্তির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধতার জন্য প্রবল প্রেরণা সঞ্চার করিয়া-ছিল। নেতাজীর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা প্রকাশের ভিতর দিয়া জাতি তাঁহার উক্ত আদর্শের অনুধ্যানকে যে সমগ্র অন্তর দিয়া গ্রহণ করিয়াছে, ইহাই স্বীকৃত হয়। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক ভেদবাদ এবং ব্রিটিশ প্রভুদের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদের মোহময় আবর্ত হইতে জাতীয় সাধনার গতি অভ্রান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে জনগণের অন্তরে এই প্রেরণা বিশেষভাবেই সাহায্য করিবে।

লীগের সত্যাগ্রহ—

পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট সম্প্রতি মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক সঙ্ঘ নামক দুইটি প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর সে আদেশ প্রত্যাহৃত হইয়াছে। কিন্তু তৎপূর্বে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের অফিসে পুলিশ হানা দেয়। লীগের কয়েকজন নেতা এই খানাতল্লাসীতে বাধা দিবার ফলে গ্রেপ্তার হন। লীগ নেতারা পরে মুক্তিলাভ করিয়া পরে আবার গ্রেপ্তার হন। পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের প্রতীয়মান অব্যবস্থিত নীতির গতি কি উদ্দেশ্যে এমন আকস্মিক উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া চলিতেছে, আমরা জানি না। পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের কার্যের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই বলিবার নাই; মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডদের সম্বন্ধেই এই প্রসঙ্গে আমরা দুই একটি কথা বলিতে চাই। দেখিতেছি, লীগের নেতারা এই প্রতিষ্ঠানকে নিতান্ত শান্তিপূর্ণ এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া জাহীর করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; লীগ নেতা মিঃ জিন্না সেদিন হুমকি দেখাইয়া বলিয়াছেন, ইহারা আদৌ সেনাদল নয়। কিন্তু লীগের অন্যতম নেতা খাজা নাজিমউদ্দীন কিছুদিন পূর্বেও এই দলকে মুসলিম লীগের সেনা-বাহিনী বলিয়া উল্লেখ করেন। কলিকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রতিবেশের মধ্যে এই দল জেহাদী জিগীর তুলিয়া কিরূপভাবে রণরঙ্গ-রস বিস্তার করিয়াছিল আমরা এখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারি নাই। বস্তুত সেবা ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বিহারে গিয়া এই দলের নায়কগণ সেবার অপেক্ষা বিদ্বেষ প্রচারেই সমধিক ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সংবাদেও প্রকাশ যে, পাঞ্জাবের পুলিশ গার্ডদের অফিসে খানাতল্লাসী করিয়া প্রচুর লৌহ শিরস্ত্রাণ এবং ছোরা, তরবারী ও পিস্তল চিহ্নিত ব্যাজ হস্তগত করে। এই উপকরণ এবং প্রতীক সেবার ভাব চিত্তে উদ্রেক করিবার পক্ষে নিশ্চয়ই সহায়ক নহে। বলা বাহুল্য মুসলিম লীগের কর্মনীতি উদ্‌যাপনে মুসলমান সমাজকে সক্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই গার্ড দল গঠিত হইয়াছে। এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান লীগের কার্যনীতির সেই সক্রিয় গতি যে অহিংসাকে স্বীকার করে না, লীগ নেতারাই বহুবার সে কথা ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং সামরিক কেতায় পরিচালিত মুসলিম গার্ডের কার্যতৎপরতা ভেদ-বিদ্বেষকে উদ্দীপ্ত করিবার পথেই প্রযুক্ত হইতেছে। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ম-তৎপরতা শুধু তত্ত্বকথায় নিবদ্ধ থাকে না এবং আবেগ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতে উন্মুখ থাকে। মুসলিম লীগের মূল নীতি সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত; এপর্যন্ত তদপেক্ষা বৃহত্তর আদর্শে লীগ তাহার কর্মপ্রেরণাকে কেন্দ্রীভূত করে নাই। তাহারা শুধু দেশের অপর এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধতার ভাবই জাগাইয়া তুলিয়াছে। সুতরাং মুসলিম লীগের এই বাহিনী সাম্প্রদায়িকতার পথেই প্রেরণা জাগাইতেছে। পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট সাম্প্রদায়িক অশান্তি হইতে নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য যদি একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন, তবে দেশের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া তেমন কার্যের জন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া চলে না। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ধারাকে উস্কাইয়া তোলাই লীগ নেতাদের কার্যের মূলে রহিয়াছে। লীগের অনর্থকর নীতির ফলে এদেশের জন-সাধারণ যথেষ্ট দুর্গতি ভোগ করিয়াছে; তাহারা এখন যে এতদ্দ্বারা বিভ্রান্ত হইবে, আমাদের ইহা মনে হয় না।

মহাত্মার পল্লী পরিক্রমা

নোয়াখালির পল্লী - অঞ্চলের শিশিরসি পথে গান্ধীজীর অভিযান অক্লান্ত গতিতে চলিতেছে। তাঁহার চরিত্রের মহনীয় প্রভা উপদ্রুত অঞ্চলের নরনারীর মধ্যে ক্রমে যত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, সাম্প্রদায়িকতা লীগের নেতাদের চিত্তের বিক্ষোভ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু লক্ষ্য করিবা বিষয় এই যে, কতিপয় লীগ নেতার এই বিক্ষো জনমনের উপর ক্রিয়াশীলতার দিকে লঘুত লাভ করিতেছে। গান্ধীজী শান্তি, সৌহার্দ্য এব মানবতার বার্তাই প্রচার করিতেছেন; কিন্ লীগ নেতাদের কেহ কেহ তাঁহার সেই সর্ব জনীন মঙ্গল বার্তার দুরভিসন্ধিপূর্ণভাবে কূট ব্যাখ্যা করিয়া গান্ধীজীর সেবাব্রতে বিঘ্ন উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন গান্ধীজী নোয়াখালিতে অভয়ত্বের বাণ প্রচার করিতেছেন। যাহারা দেশে একটি সম্প্রদায়কে নিজেদের পশু শক্তি বলে দাবাইয়া অভিভূত রাখিতে চা তাহাদের পক্ষে তাহা সহ্য করা কঠি হইবে, ইহা বোঝা যায়। পানিয়ালা গ্রামে সভায় গান্ধীজী বলেন, "আমরা এক দেশে সন্তান। এ অবস্থায় আমার কোন ভাই যা আমাকে কুকার্যে প্ররোচনা দেয়, তবে কে আমি তাহা মানিয়া লইব? যদি কেহ আমাকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করিতে চেষ্টা করে অথবা যদি কেহ নারী নির্যাতনের জন্য চেষ্ করে, তবে নারীই হউন বা পুরুষই হউন, কে তিনি এই পশু বলের নিকট আত্মসমর্প করিবেন? এইরূপ বলপ্রয়োগ প্রতিরোধ করিতে গিয়া অহিংসভাবে মৃত্যুবরণ করাই বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে হিংসা বা অহিংসার কা লীগওয়ালাদের এক দলের পক্ষে পরোক্ষ হই

ড়তেছে। বস্তুত গান্ধীজী কতকগুলি কার্যের দর্শ স্বরূপ যেভাবে উন্মুক্ত করিতেছেন, হাতেই তাঁহারা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চলে লীগের দাবিদ্বেষমূলক প্রচারের ফলে যে সব কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলির নিন্দনীয় স্বরূপ দ উন্মুক্ত হয় এবং তাহার মূলীভূত বিদ্বেষের গোড়ায় আঘাত পড়ে, তবে ই'হাদের ভবিষ্যতের ভয় থাকে না। সুতরাং গান্ধীজী নোয়াখালির মুসলমানদিগকে আদর্শচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা এই ধূয়া তুলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ই'হারা এতদ্দ্বারা নিজেদের স্বরূপেরই পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ই'হাদের এই সব হীন প্রচারকার্য গান্ধীজীকে স্পর্শ করিবে না; অধিকন্তু তাঁহার চরিত্রের মহনীয় প্রভাবকেও ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইবে না। অন্তর্জ্যোতি এবং অন্তরের আলোকেই যিনি পথ চলেন, তাঁহার সঙ্কল্প কেহ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় না এবং তেমন প্রতিকূলতায় সত্যের মহিমা অধিকতর উজ্জ্বলতা লাভ করিয়া থাকে। গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিভ্রমণ এই সত্যকেই অপূর্বরূপে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে। গান্ধীজীর এই ভ্রমণ বাঙলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হইয়া থাকিবে এবং মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে অভিনব আলোকসম্পাত করিবে, সন্দেহ নাই।

গুরুতর অভিযোগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের বার্ষিক সভায় ভাইস-চ্যান্সেলার ভিয়েৎনাম দিবসে কলিকাতায় পুলিশের গুলী চালনা রূপ বীরত্বপূর্ণ কার্য সম্বন্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ দিবস বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে পুলিশের গুলীবর্ষণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভাইস চ্যান্সেলার এই সম্পর্কে পুলিশের গুলীতে নিহত মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ধীররঞ্জন সেনের মৃত্যুর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ধীররঞ্জনের শরীরের পশ্চাদ্ভাগে গুলীবিদ্ধ হয় এবং সেই গুলী ঊর্ধ্বমুখী হইয়া শরীরের সম্মুখভাগে পট ছিদ্র করিয়া নির্গত হয়। ইহাতে বোঝা যায় ধীররঞ্জন সম্ভবতঃ মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ভূমি শয্যা হইতে উঠিবার পূর্বেই তাহাকে গুলী করা হয় এবং নিতান্ত নিকটে থাকিয়াই তাহা করা হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হয়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গুলী চালনার মামুলী অজুহাত এদেশের পুলিশের মুখে সদাসর্বদাই আমরা শুনিতে পাই। কিরূপ বিনা প্রয়োজনেই ধীররঞ্জনের ক্ষেত্রে পুলিশের আত্মরক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল, এই চিন্তা আমাদিগকে পীড়িত করিতেছে। আমরা আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপর পুলিশের এইরূপ নিদারুণ এবং নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিচারের জন্য বাঙলা সরকারকে বাধ্য করিবেন। কলিকাতার রাজপথ যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রুধির-কর্দমাক্ত হয়, তখন পুলিশের বাহুবল যাদুমন্ত্রযোগে আশ্চর্যভাবে বিলুপ্ত হয়; প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উপলক্ষে শহরের ঐতিহাসিক নরনিধনোৎসবে আমরা মর্মান্তিক-ভাবে সে নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি। কিন্তু স্বাধীনতার উদার আদর্শে নিতান্ত সদুদ্দেশ্যে সংহতিবদ্ধ নির্দোষ ছাত্রদের উপর গুলী চালাইবার বেলায় সেই প্রভুদেরই বলবীর্য উদ্দৃপ্ত হইয়া উঠে। শহরের রাজপথ নির্দোষ ছাত্রদের রক্তলেখায় বারংবার সিক্ত হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি পুলিশের এবম্বিধ অত্যাচারের প্রতীকার হইল না। এই অবস্থা আর কিছুতেই সহ্য করা উচিত নয়।

আসামে ভারতীয় গভর্নর

আগামী ৩রা মে আসামের বর্তমান গভর্নর স্যার এণ্ড্রু ক্লোর কার্যকাল শেষ হইলে তাঁহার স্থলে আসামের গভর্নর পদে স্যার মহম্মদ সালে আকবর হায়দরী নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ গভর্নর নিয়োগের মামুলী নীতি ছাড়িয়া এক্ষেত্রে এদেশের লোকের দাবী মানিয়া লওয়া হইয়াছে, নীতির দিক হইতে ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি; কিন্তু আসামের বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া আমরা এই নিয়োগ অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। ব্যক্তিগত-ভাবে স্যার আকবর হায়দারীর নিয়োগে আমাদের আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কিন্তু আসামের পরিস্থিতি বর্তমানে ভারতের রাজনীতিক সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। লীগ-ওয়ালারা এই প্রদেশে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক ভেদ বিদ্বেষমূলক কর্মপ্রচেষ্টা সর্বপ্রকারে সম্প্রসারিত করিবার জন্য তৎপর হইয়াছেন এবং যত ক্রমে সম্ভব, সেখানে একটা সাম্প্রদায়িক সংকট সৃষ্টি করিতে চাহেন, ব্যাপার দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছে। এই অবস্থায় স্যার আকবর হায়দারীর নিয়োগ আসামের সমস্যা সমাধানে কতটা সহায়ক হইবে, ইহা সম্পূর্ণ সন্দেহের বিষয়।

রাজাজীর ভাষ্য—

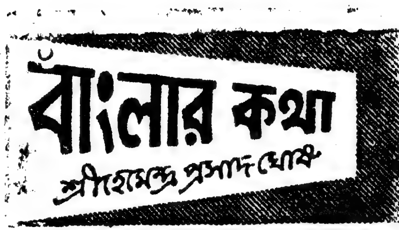
শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী মহাশয় একজন কূটনৈতিক পুরুষ। কোন বিষয়ের চুলচেরা ব্যাখ্যা করিয়া সমস্যা জটিল করিয়া তুলিবার পাণ্ডিত্য গরিমা তাঁহার আছে। বিশেষত মুসলিম লীগের রাজনীতিক আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বহুবার তাঁহার এই কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। সেদিন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিষয় নির্ধারণ কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া রাজাজী যে সব কূটনৈতিক মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য। গণপরিষদে মুসলিম লীগের সদস্যদের যোগদান না করিবার গূঢ় কারণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া রাজাজী বলেন, "লীগ যদি গণপরিষদে যোগ দেয়, তাহা হইলে তাহাকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে হইবে যে, মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতে একটিমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই রাজাজীর মতে লীগের গণপরিষদে যোগ দিতে দ্বিধা করিবার কারণ। কিন্তু রাজাজীর এই অভিমত যদি সত্য হয়, তবে লীগের এতৎসম্পর্কিত দ্বিধা কিভাবে দূর করা যাইতে পারে রাজাজী সে বিষয়ে আমাদের কাছে তাঁহার বিশ্বজনসম্মত কোন পরামর্শ উপস্থিত করেন নাই; শুধু লীগের প্রতি একটু আনুকূল্যমূলক ইঙ্গিতই তিনি করিয়াছেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ড স্বরূপই স্বাধীনতাকামী সমগ্র ভারতের আদর্শ। এই অখণ্ড সত্তার ভিত্তির উপরই ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব এবং মন্ত্রী মিশনের কল্পনা কংগ্রেস এই দিক হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। মুসলিম লীগ অখণ্ড ভারত চাহে না; ভারতের অখণ্ড সত্তাকে সাম্প্রদায়িক ভেদবিদ্বেষের বলে খণ্ডিত করিয়া পাকিস্থানী তাণ্ডবনৃত্য চালানোই লীগের অভিপ্রায়। এই তাণ্ডবতাকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে তাহারা লাভ করিবে বলিয়া আশা করিতেছে। লীগের সমস্ত সিদ্ধান্ত সেই কূটচক্রকে কেন্দ্র করিয়াই এখনও ঘুরিতেছে। গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চলিবে। অখণ্ড ভারতের সার্বভৌম সত্তাকে খণ্ডিত করিবার কোন দুরভিসন্ধিকে পরিষদ প্রশ্রয়দান করিতে পারে না; সুতরাং এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া কাল হরণ করা এখন আমরা একান্তই অনাবশ্যক এবং অনর্থকর মনে করি।

বাঙলায় সুভাষচন্দ্রের জন্ম-দিবস সাগ্রহে পালিত হইয়াছে। সেই উপলক্ষে কলিকাতায় বিদেশে তাঁহার সৃষ্ট ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর বহু কর্মচারী উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে কলিকাতার উপকণ্ঠে "বেলগেছিয়া ভিলায়" সম্বর্ধিত করা হয়। সেই সম্বর্ধনায় ২৫।৩০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সেই সম্বর্ধনায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সম্বর্ধনার স্থান নির্ণয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন সিপাহী যুদ্ধ হয়, তখন বাঙলায় কেবল কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথে রেল চলাচল হইতে পারে। বিমানের কল্পনা তখনও হয় নাই। সিমলা ও দার্জিলিং তখনও ইংরেজ রাজকর্মচারীদিগের গ্রীষ্মকালে শৈত্য-সম্ভোগের জন্য ব্যবহৃত হইত না। সেই সময় কলিকাতায় উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীরা যেমন—ধনী য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরাও তেমনই কলিকাতার উপকণ্ঠে বাগানবাড়িতে অবসর যাপন করিবার ব্যবস্থা করিতেন। লর্ড অকল্যান্ড যখন বড়লাট, তখন তিনি এই "বেলগেছিয়া ভিলা" রচনা করান। তখনই ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি হয়। তিনি এ দেশ ত্যাগ করিলে দ্বারকানাথ ঠাকুর উহা ক্রয় করিবার পর সেই প্রসিদ্ধি আরও ব্যাপ্তি লাভ করে। তখন এই "ভিলা" ভারতীয় ও য়ুরোপীয়দিগের মিলনক্ষেত্র হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহার রচিত দ্বারকানাথের চরিত-কথায় তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের ব্যবসা—কার ঠাকুর কোম্পানীর পতনে যে ক্ষতি হয়, তাহা পিতৃ-ঋণ হিসাবে পরিশোধ করিবার সংকল্প করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বহু সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এই গৃহ সে সকলের অন্যতম। তখন কান্দীর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র "লালাবাবুর" পৌত্ররা ইহা ক্রয় করেন। এখন ইহা "লালবাবুর" পৌত্র—রাজা প্রতাপচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্রের পৌত্র কুমার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্রের। তিনি এই অভিনন্দনে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। এই গৃহে পূর্বে—

(১) যুবরাজরূপে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড কলিকাতায় আসিলে ভারতীয় সম্প্রদায় তাঁহাকে সম্বর্ধিত করেন।

(২) লর্ড রিপন যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন ভারতীয়গণ তাঁহাকে সম্বর্ধিত করেন।

এবার তথায় সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সামরিক কর্মচারীদিগের সম্বর্ধনা হইয়াছে। ইহাই কালোপযোগী পরিবর্তন।



যে সময়ে দিল্লীতে গণ-পরিষদে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পাকিস্থানকামী মুসলিম লীগের সহিত মীমাংসার অভিপ্রায়ে বৃটিশ সরকারের ১৬ই মে তারিখের ব্যবস্থার ৬ই ডিসেম্বর তারিখের ব্যাখ্যা পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া তাহার সমর্থনে নানা যুক্তির অবতারণা করিতেছেন, সেই সময়ে কলিকাতায় সুভাষ-চন্দ্রের জন্মদিনে—তাঁহার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে যে আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা অসাধারণ।

সুভাষচন্দ্রের কৃতকর্মের প্রশংসা আজ গান্ধীজীও কীর্তন করিতেছেন। উপদ্রুত পূর্ববঙ্গে যাইয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা কিরূপ দুঃসাধ্য, তাহা স্বীয় অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন—বিদেশে—নিঃসম্বল অবস্থায় সুভাষচন্দ্র সত্য-সত্যই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের সাফল্যের কারণ অনুসন্ধান করা আজ আমাদিগের কর্তব্য।

আমরা যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করি, তাহা অষ্ট-ধাতুতে নির্মিত—

"সুবর্ণং রজতং তাম্রং সীসকং কান্তিকং তথা।
রঙ্গং লৌহং তীক্ষ্ণলৌহমিত্যষ্টৌ ধাতবঃ স্মৃতাঃ॥

এই অষ্টধাতু যখন সম্মিলিত হয়, তখনই তাহা বিগ্রহ নির্মাণের উপযুক্ত উপকরণে পরিণত হয়। কিন্তু সেই অষ্ট ধাতুকে সম্মিলিত করিবার জন্য যে প্রচণ্ড তাপের প্রয়োজন, তাহার অভাব ঘটিলে সে সম্মেলন সম্ভব হয় না। তেমনই দেশপ্রেমের ও মুক্তিকামনার উগ্র-উত্তাপে সুভাষচন্দ্র কেবল যে আমাদিগের সংকীর্ণতার ও সাম্প্রদায়িকতার শ্যামিকা ভস্মে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহাই নহে—পরন্তু এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া—ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠিত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সে কার্যের তুলনা পাওয়া যায় না।

কংগ্রেস সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারে নাই। তাহার কারণ, কংগ্রেসে যখনই অগ্রগামী দলের প্রাধান্যলাভ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তখনই—ধীরগামীর দল তাহাতে বাধা দিয়াছেন।

হিউম যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য তিনি গোপন করেন নাই—তাহাতে এদেশে বৃটিশ শাসন স্থায়ী হই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ প ২০ বৎসর ভারতীয়গণের দৃষ্টি ইংলণ্ডে নিবদ্ধ ছিল। আমরা "নিবেদন আর আবেদ থালা বহে রহে নতশির" ছিলাম। আ বৃটিশ জাতির ন্যায়নিষ্ঠায় ও স্বাধীন প্রিয়তায় বিশ্বাস হেতু ভুলিয়া গিয়াছিলাম লর্ড কার্জন সত্যই বলিয়াছেন, ভারতে বৃটি শাসন দুই অংশে বিভক্ত।—শাসন ও শোষ শোষণের জন্যও শাসনের প্রয়োজন। ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ইংরেজের বৈশিষ্ট্য তাহ আপনারা যাহার বিশেষ আদর করে—তা দিগের অধীন জাতির পক্ষে তাহা পাই চেষ্টা রাজদ্রোহদ্যোতক মনে করে। ১৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ করিয়া বাঙ যে আন্দোলন উদ্ভূত হইয়া জাতীয় আন্দো পরিণতি লাভ করে—সেই আন্দোলনকা প্রথম ভারতের কাম্য কি, তাহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত করা হয়—বিদেশীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত সম স্বাধীনতা। দীর্ঘকাল পরে যখন কং সুভাষচন্দ্র সেই কামনার উল্লেখ করিয়া প্র উপস্থাপিত করেন, তখন তাঁহার প্র কংগ্রেসে গৃহীত হয় নাই। অর্থাৎ তাঁহার যে সকল লোক তাঁহার যশের কিরণে আপ উজ্জ্বল হইতে চাহিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে "উৎকট অগ্রগামী" বলিয়া করিয়াছিলেন।

তখন কংগ্রেসের মধ্যেই অগ্রগা (তৎকালে "চরমপন্থী" বলিয়া অভি কংগ্রেসে নূতন জীবন সঞ্চারের চেষ্টা ক ছিলেন—সেজন্য শ্মশানে শব-সাধনায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় (১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহাদিগের চেষ্টায় বৃটিশ বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় স তাঁহাদিগের প্রভাব নষ্ট করিবার চেষ্টা সেই চেষ্টায় কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। ক জীবিত কিন্তু জীবন্মৃত অবস্থায় কয় থাকিয়া আপনার ব্যর্থতাই বুঝিতে তখন আবার উভয় দলে মিলন হয়। তখনই ধীরপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

তাহার পরে কলিকাতাতেই কং অধিবেশনে যখন অসহযোগ নীতি অব হয়, তখন ব্যবস্থা-পরিষদ বর্জনের বি অগ্রগামীদল বিদ্রোহ ঘোষণা করেন বিদ্রোহে নেতা—চিত্তরঞ্জন দাশ। মতিলাল নেহরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁহার পতাকাতলে সমাগত।

আবার কিছুকাল অতীত হয়। কংগ্রেসে আবার জীবনীশক্তির অভাব পরি হইলে—সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব।

ধীজীর প্রতিবাদ পদ্মাভূত করিয়া কংগ্রেসে াপতি হন। আর বিদেশে যাইয়া— প্রেমের শক্তিতে অসাধ্য সাধন করেন।

আজ তাঁহার দেশবাসীরা আবার কংগ্রেসের ত্বে কেবল স্থবিরত্বই নহে—পরন্তু ত্বেও লক্ষ্য করিতেছেন। মুখে অখণ্ড রতের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা দেখাইয়া র্যতঃ—বৃটিশ সরকারের ভারতবর্ষ ন্দুস্থানে ও পাকিস্থানে বিভক্ত করিবার তাব গ্রহণ; মুখে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী নাইয়া কার্যতঃ পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ন্ন করা—এ সকল হইতে মুক্ত হইবার জন্য গ্রেসে নেতৃত্বের পরিবর্তন প্রয়োজন।

গতি জীবনের লক্ষণ—গতির অভাব ত্যুর দ্যোতক। সুভাষচন্দ্র গতির প্রতীক লেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার তির লক্ষ্য—মুক্তি, তাহার নিয়ন্ত্রণের যদি ান উপায় থাকিয়া থাকে, তবে তাহা— শপ্রেম।

আজ যে দেশ সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা কাশ করিতেছে—সে তাঁহার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। সেই আদর্শের প্রেরণা তাঁহাকে চল করিয়া রাখিয়াছিল—

"আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে
বেঁচে মরে' কি-বা ফল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।"

প্রথম অগ্রগামী দলের কর্মী—লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি। তাঁহারা আমাদিগের রাজনীতিক প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানে যখনই ক্লৈব্য-সমাগম সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তখনই প্রতীকার চেষ্টায় চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নির্ভর-শীলতা হেতু তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন—তাঁহারা মডারেট বলিয়া অভিহিত হইতেন। তখন অগ্রগামীদিগকে—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় মডারেট অপবাদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

আয়ার্লণ্ডের ইতিহাসেও যেমন স্বাভাবিক নিয়মে পার্নেলের পরে ডি ভ্যালেরার আবির্ভাব; এদেশেও তেমনই বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির পরে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব।

প্রথম বিদ্রোহের সময় যেমন বলা হইয়াছিল—ভারতবাসীর কাম্য—বিদেশীর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, তেমনই গান গীত হইয়াছিল ঃ—

"নিজ দেহ প্রাণ করিয়া অর্পণ,
যে করিবে মা'র শৃঙ্খল-মোচন;
জেন তা'রই হ'বে সার্থক জীবন—
হ'বে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।"

তেমনই এখন সুভাষচন্দ্রের আদর্শ—শৃঙ্খল মোচন। প্রথম বিদ্রোহের সময় কলিকাতায় অগ্রগামী দলের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপর্দে বলিয়াছিলেন,—"আজ তোমরা স্বেচ্ছাসেবক—একদিন তোমরা স্বেচ্ছাসৈনিক হইবে।" সুভাষচন্দ্র তেমনই স্বেচ্ছাসেবকদিগকে স্বেচ্ছাসৈনিকে পরিণত করিয়াছিলেন। শিখগুরু গোবিন্দ দুর্বলকে তাঁহার দীক্ষায় সবল করিয়াছিলেন, শিবাজী তাঁহার দীক্ষায় ছিন্নভিন্নদিগকে একতাবদ্ধ করিয়াছিলেন। শিখগণ মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাধীন হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগল সাম্রাজ্য নষ্ট করিয়াছিল। কাজেই দুর্বলের সবল হওয়া কেবল সময়সাপেক্ষ— কেবল নেতৃত্বসাপেক্ষ।

যে নেতৃত্ব তাহা করে—সুভাষচন্দ্র সেই নেতৃত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বৃটিশের অনুগ্রহে ক্ষমতালাভ করেন নাই—দেশবাসীর নিকট হইতে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। গান্ধীজী আজ বলিতেছেন—সুভাষচন্দ্র বিদেশে যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ।

গত ২৬শে জানুয়ারী রবিবার—স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে যে "বন্দেমাতরম", "জয় হিন্দ"—ধ্বনির সঙ্গে "নেতাজী জিন্দাবাদ" ধ্বনি গগন-পবন মুখরিত করিয়াছিল, তাহার কারণ, আজ ভারতবাসী জাতীয়তাবাদীর নিকট সুভাষচন্দ্রই মুক্তি-কামনার প্রতীক—তাঁহার আদর্শই আকর্ষক।

মনে রাখিতে হইবে—বিদেশে ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া—বাঙলার দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়া তিনি প্রচুর পরিমাণ চাউল দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে— তিনিই জাপানকে অনর্থক বোমাবর্ষণে ভারত-বর্ষের ক্ষতি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে, তিনি তাঁহার বাহিনীকে বলিয়াছিলেন—যদি সেই বাহিনী ভারতবর্ষে উপনীত হইতে না পারে, তবে তাহারা মৃত্যুপণে যুঝিয়া যে পথের ধূলিতে লুণ্ঠিত হইবে—সেই পথে পরবর্তীরা অগ্রসর হইবে।

রাণাপ্রতাপ ও ছত্রপতি শিবাজী যে আদর্শে লোককে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন— সুভাষচন্দ্রের আদর্শ তাহা হইতে ভিন্ন নহে।

লালা লাজপৎ রায় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বাঙলাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—বাঙলাই ভারতবর্ষে জাতীয়তার নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন—সে কাজ করিবার সৌভাগ্য বাঙলার জন্যই ছিল—সে কাজের গৌরব বাঙলার।

সুভাষচন্দ্র সেই বাঙলার সন্তান। তাঁহার ত্যাগে বাঙলা ধন্য।

এই বাঙলায় বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র দান করিয়াছিলেন—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

এই বাঙলায় স্বামী বিবেকানন্দ সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

এই বাঙলায় সুভাষচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছেন।

আজ তাঁহার মত সমগ্র দেশে জাতীয়তাবাদী-দিগের প্রেরণার কারণ হইয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের আদর্শ শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করাই সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন পালনের উদ্দেশ্য।

সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।



পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন—"A new era in Indian life is about to



dawn."—কিন্তু দিল্লীর "Dawn" বলেন—"রজনী এখনো বাকী"!

* * *

League should co-operate with the Congress"—বলিয়াছেন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মণ্ডল। "কিন্তু লীগ গাঁ-এই মোড়াল মানিবেন কিনা সন্দেহ আছে"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন যে, তিনি হিন্দু-মুসলমানের সমবেত প্রচেষ্টায় বাঙলাকে সমৃদ্ধ করিবেন।" শুধু ভারতকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে তিনি হিন্দু-মুসলমানের সমবেত প্রচেষ্টাকে বাধা দিবেন"—এই অসমর্থিত সংবাদটি সংগ্রহ করিয়াছেন বিশুখুড়ো।

* * *

ভিয়েৎনাম দিবসে ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলের উপর গুলী চালাইয়া পুলিশ বদনাম কিনিলেন। আমরাও বাদ পড়ি নাই, পরের দিন রাস হইতে আমাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে—নামৈব কেবলম্!

* * *

চুরির দায়ে পাঁচজন মহিলাকে দিল্লীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। "তাঁরা নিশ্চয়ই ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, চুরিটা আইনের চক্ষে অপরাধ নয় সেটা মন, জিনিস নয়। নজীর দেখুন—আগে মন করলে চুরি মর্মে শেষে হানলে ছুরি—চুরির পর ছুরিতেও পুলিস হস্তক্ষেপ করিল না। নিজের অধিকারের গণ্ডী ছাড়াইয়া যাওয়াতেইতো এই বিপদ হইল"—বলিলেন বিশুখুড়ো!

* * *

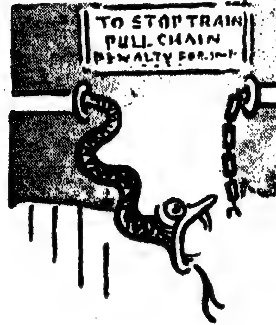
আমরা মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি পড়িতেছিলাম—"I maintain no illusions



—কিন্তু বিবৃতিটি শেষ করিবার আগেই আমাদের বেঁসুরে সহযাত্রীটি যেন একেবারে শ্যাম নামে প্রাণ পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—"নিশ্চয়, নিশ্চয়, Illusion গান্ধীজীর charge-এ থাকিলে কি আর Indian Championship Cup-এ মার খায়? ওটা এডওয়ার্ডের হাতে থাকাতেই তো আমরা মার খাইয়া মরিলাম!"

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ বি, এ্যাণ্ড এ রেলওয়ের গাড়ী হইতে বিপদ সঙ্কেত শিকল (Alarm cord) সাময়িকভাবে উঠাইয়া নেওয়া



হইল। "বিপদ তাহা হইলে এতদিনে শৃঙ্খল-মুক্ত হইল"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

মিঃ ইস্পাহানী নাকি বলিয়াছেন যে, হিন্দু কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্যই মিঃ আসফ আলীকে বৈদেশিক দূত নির্বাচন করা হইয়াছে। লীগের হইয়া কথা বলিবার জন্য বিলাত হইতে একজন পারদর্শী নিযুক্ত করিলেই তো ল্যাঠা চুকিয়া যায়!

* * *

ঢাকা জিলার এক সংবাদে প্রকাশ যে, কোন এক গ্রামের কুম্ভকারদিগকে নাকি অর্থনৈতিক বয়কট করা হইয়াছে। বয়কটের উদ্যোক্তারা প্রয়োজন হইলে যখন ডুবিয়া মরার একটি কলসীও সংগ্রহ করিতে পারিবেন না তখনই বুঝিবেন—কুম্ভকারদিগকে ডুবাইয়া মারার কোন মজা নাই।

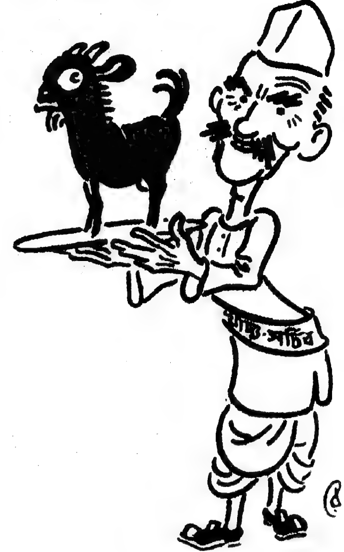
* * *

মিঃ হেনরি ওয়ালেস বৃটিশের পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"The flute is in the hands of the British Socialists but it is the Tories who are playing upon it."—খুড়ো কথাটার

Free translation করিয়া শুনাইলেন—"ভাঙ্ খায় ভবানন্দ কড়ি গুণে নিধি।"

* * *

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দিল্লীতে নাকি একটি Test tube ছাগল ছানা উপহার দেওয়া হইয়াছে। "কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের



খাদ্য বরাদ্দে কিছু দিতে হইলে—একটি নির্ভেজাল পুরুষ্টু পাঁঠাই যেন তিনি আমাদিগকে দেন"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

একটি বিবৃতিতে প্রকাশ—ষোল হাজার মণের বেশী সরিষা নাকি কলিকাতায় আমদানী করা হইয়াছে, সুতরাং তৈল সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু এই সরিষার আশ্রয় লইয়া ভূত কি পরিমাণ আমদানী করা হইয়াছে সেই খবর না জানা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।

* * *

সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ—শীঘ্রই নাকি একটি "অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ বিল"এর খসড়া প্রস্তুত করা হইবে। কোন কোন্ বিজ্ঞাপন এই আইনের আওতায় পড়িবে জানি না, তবু আমাদের বিনীত নিবেদন আগে হইতেই জানাইয়া রাখিতেছি—"শিক্ষিতা সুন্দরী, গৃহকর্মনিপুণা, নৃত্যগীত পটীয়সী ধরণের বিজ্ঞাপনের কথাও যেন বিবেচনা করা হয়। এইসব বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রিত হইলে উন্মাদ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকটা কমিয়া যাইবে।

* * *

বাঙলা সরকার ১৯৫০ সালে ইলিকট্রিক স্যাপ্লাই কর্পোরেশনটি ক্রয় করিবেন বলিয়া নাকি সংকল্প করিয়াছেন। সুতরাং—"আশু গৃহে তার, দেখিবে না আর, নিশীথে প্রদীপ জ্বালি!"



মানুষের স্মৃতি বড় খামখেয়ালী। দিন থেকে দিন তার সেভিংস্‌ বাক্‌সে জীবন বহু যত্নে কত অল্পমূল্যে, বহুমূল্যে এবং অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ফেলে রেখে যায়। স্মৃতি দুষ্টোমি করে মানুষের অগোচরে তার বাক্‌সের অদৃশ্য ফুটো দিয়ে হয়তো অমূল্য এবং বহুমূল্যকে তুচ্ছবোধে পরিত্যাগ করে, কিন্তু অল্পমূল্যে অথবা বিলকুল মূল্যহীন অভিজ্ঞতার মুদ্রাগুলিকে আগাগোড়া একেবারে অক্ষতভাবে বজায় রাখে। বিশ বৎসর পরে স্মৃতির বাক্‌স খুলে মানুষ তাজ্জব বনে যায়। হয়তো দেখে, তার আপন স্বর্গতা জননীর মুখ মনে নেই, কিন্তু বিশ বৎসর পূর্বে কবে একদিন একটি বৃদ্ধা তার নিকট ভিক্ষা চেয়েছিল, তার কাতর মুখখানি হুবহু মনে আছে; আপনার প্রথম প্রণয়ের কিছুমাত্র খুঁটিনাটি হয়তো মনে পড়ে না, কিন্তু সমসাময়িক একটি নাটকে নায়ক কেমন করে নায়িকাকে প্রথম প্রণয় নিবেদন করেছিল, টাট্‌কা পড়া পাঠের মত স্মৃতি তা অবিকল ধরে রেখেছে।

বহু পূর্বে সেই দিনকয়েকের পরিচিত বিলাসী বৃদ্ধের কথা যে আমার আজও মনে আছে, তার জন্য স্মৃতির এই খেয়ালপনাই দায়ী। তখন আমি হাসপাতালে। একটি বাস-দুর্ঘটনায় পড়ে সেখানে দিনকয়েকের জন্য অতিথি হতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার ডান পা'য়ে পলেস্তারা করে খাটের উপরকার কাঠে বেঁধে সার্জনরা ঝুলিয়ে রেখেছিল। দড়ির এক প্রান্তে একটা মস্ত ভারী ওজন পায়ের সেই উঁচু-করা অবস্থাটাকে ধরে রাখত।

এই বাঁধা অবস্থায় তিন চারিটা বালিসের ওপর মাথা রেখে আমি চারিদিকে চেয়ে যে সব রোগীদের দেখতাম, তার মধ্যে পাশের বেডের সেই ষাট্‌-পেরুনো বৃদ্ধকেই আমার সকলের চেয়ে ভাল লাগত।

বৃদ্ধ একজন সিন্ধী হিন্দু। ফর্সা, শীর্ণ চেহারা। চেহারার তুলনায় মুখখানা মস্ত। দাড়ি কামানো, কিন্তু শুভ্র গোঁফজোড়া অতিশয় লম্বা। বৃদ্ধ প্রতিদিন কি যেন লাগিয়ে গোঁফের মসৃণতা বজায় রাখত। সদ্য চুণকাম করা দেয়ালের মত গোঁফজোড়া সর্বক্ষণ ঝক্‌ঝক্‌ তক তক করত।

বৃদ্ধ ভুগছিল বহুদিন ধরে। তার দু'পায়ের হাড়ে নাকি ঘুণ ধরেছিল। ডাক্তাররা মাঝে মধ্যে কাটা-ছেঁড়া করত, নাহলে একটি ওজন দিয়ে পা দুটোকে আমার মত উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখত। পিঠের সঙ্গে শয্যার সার্বক্ষণিক মিলনটা পিঠ বরদাস্ত করত না। তাই মস্ত বড় একটি বেড-সোর সৃষ্টি করে সে আপনার মূক প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তার যন্ত্রণায় বৃদ্ধ মাঝে মাঝে আর্তনাদ করত।

কিন্তু তার রোগ যতদূর দুরারোগ্য, বৃদ্ধকে দেখে ততদূর বিষণ্ন মনে হত না। এমনকি, যন্ত্রণা কম থাকলে প্রায়ই সে সিন্ধী ভাষার একটি গানের দু'এক কলি গুঞ্জন-স্বরে গাইত। আশপাশ থেকে কোন ছোকরা রোগী হয়তো কৃত্রিম ভয়ের স্বরে চীৎকার করে উঠতো, মরেছে রে, বুড়ো গান ধরেছে। কিন্তু বৃদ্ধ নির্বিকার-চিত্তে গান গেয়ে ওয়ার্ডময় আপনার প্রফুল্লতার বিজ্ঞাপন দিত। বৃদ্ধের একটি পরামাণিক বাঁধা ছিল। প্রতিদিন এসে বৃদ্ধকে কামিয়ে যেত, গোঁফের ছাঁদ ঠিক করে দিত। কামাবার পর খানিকটা ক্রিম নিয়ে বৃদ্ধের মুখে ঘষে ঘষে মাখিয়ে দিত। শেষ হলে বৃদ্ধ পরামাণিকের আয়না নিয়ে মুখের সামনে ধরে দক্ষিণে বামে নানা-ভাবে মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিত। সমস্ত প্রক্রিয়াটির মধ্যে কোথাও কিছুমাত্র ত্রুটি থাকলে পরামাণিককে ধমকানির আর অন্ত রাখত না।

ভিজিটিং আওয়ারে বৃদ্ধের বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র-কন্যা, ভাইপো-ভাইঝিরা এবং পরিবার আসত। তাদের পরিধানে সিল্ক এবং স্যাটিনের অনাবশ্যক প্রাচুর্য দেখে অনুমান করতাম, বৃদ্ধের ধনের অভাব নেই। তারা বিষণ্ন মুখে আসত, বিষণ্ন মুখে চলে যেত। বৃদ্ধের মুখরতার অভাব ছিল না। কিন্তু ডাক্তারদের নিকট তারা শুনেছিল, এর আয়ু নেই। এক একদিন স্ত্রী চোখের জল ফেলত। দেখতাম বৃদ্ধ স্পষ্টই বিরক্ত হত।

তারা সার্জনদের অনুমতি নিয়ে একজন পণ্ডিতের ব্যবস্থা করেছিল। পণ্ডিতজী রোজ বিকালে বৃদ্ধকে এক অধ্যায় করে গীতা শুনিয়ে যেত। মুড়ানো মাথার স্থূল শিখাটিকে দুলিয়ে দুলিয়ে পণ্ডিতজী ছন্দ, মাত্রা এবং সংস্কৃত উচ্চারণ অটুট রেখে শ্লোকগুলি আবৃত্তি করতেন। কিন্তু গীতা শুনে বৃদ্ধ যে ভগবদ্দর্শন সন্নিকট হয়ে উঠল বলে উৎসাহিত হয়ে উঠত, এমন দেখতাম না। বরং তার মুখে ব্যাজারের ভঙ্গী ফুটে উঠত। বাধা দিত না, কিন্তু তার বেড-সোরের যন্ত্রণাটা যেন হঠাৎ বেড়ে উঠত। মাঝে মধ্যে আঃ উঃ প্রভৃতি শব্দ করে কাতরোক্তি করত এবং পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করত, শেষ হল? পণ্ডিতজী হয়তো ক্ষমাপ্রার্থনার স্বরে বলত, আর থোড়া বাকী আছে, এবং সেই থোড়াটুকু শেষ করে যখন উঠত, বৃদ্ধ আমার দিকে চেয়ে চোখটা ঈষৎ টিপে মুখটা অল্প বেঁকিয়ে হাতটা সামান্য নেড়ে খোসমেজাজে ইঙ্গিত করত, আপদ গেল; বাঁচা গেল।

ষাট্‌-পেরুনো বৃদ্ধের মরণকালেও ধর্ম-কথায় ব্যাজার লাগে, এমন বড় দেখা যায় না। আমি তার এই নির্লজ্জ ঐহিকতায় প্রথম প্রথম কৌতুক বোধ করতাম। কিন্তু মৃত্যুকাল আসন্ন হয়ে এলেও যখন বৃদ্ধের আচরণের কোন পরিবর্তন হল না, তখন একদিন অতিশয় বিরক্ত স্বরে আমি বললাম, আচ্ছা আপনি যৌবনকালে বহু ভোগ করেছেন, আজ বার্ধক্যে আপনার এত কষ্ট বোধকরি সেইজন্যই। তবু এই শেষ সময়েও একটু পবিত্রচিত্তে আপনি ভগবানের কথা ভাবতে বা শুনতে পারেন না?

আমার রূঢ় প্রশ্নে চমকিত হয়ে বৃদ্ধ তার জ্যোতিহীন চোখ দুটো আমার দিকে ফিরিয়ে ক্ষণকাল নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর বেশ শান্তস্বরে বলল, বাবুজী, আপনি বুঝি ভগবদ্ভক্ত লোক, তা হবে। কিন্তু আমি তো ভগবান্‌ নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাইনি। আমি সারা জীবন শুধু ভোগ করেছি। ঐ বস্তুকেই চিনেছি। কিন্তু শুধু আমার কষ্ট দেখে আপনার কোন মন্তব্য করা উচিত হয়নি, আমি জীবনে যে সুখ পেয়েছি, তার সাক্ষী তো আপনি ছিলেন না।

আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে বৃদ্ধ বলে চলল, আমি জানি আপনি কি বলবেন। আপনি বলবেন, সে সুখ দেহজ, ক্ষণিক নশ্বর। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, বাবুজী, নশ্বর বস্তু যদি একেবারেই মূল্যহীন, তা হলে অনিবশ্বর ঈশ্বরের পূজা আপনারা ফুলের মত নশ্বর বস্তু দিয়ে করেন কি করে? তা হলে বলুন, আমাদের চোখ ও নাক এই দুটি ইন্দ্রিয়ের দয়ার ওপর যে ফুলের মর্যাদা একান্ত নির্ভর করে, তার সুবাস আর রূপে

একদিন গৃহে ফিরছি, শয়নঘরের নিকট এসে জানালা দিয়ে দেখি, লছ্‌মী এলায়িত কেশে একটি সোফার ওপর শুয়ে আছে এবং ব্রহ্মচারী ভূমিতে বসে তার পা ধরে কি বলছে। হতভাগ্যের পরিধানে তখনও গৈরিক।

আমি ক্ষণকাল সেইখানে দাঁড়ালাম। শুনলাম, ব্রহ্মচারী আকুলস্বরে বলছে, তোমার রূপের মধ্যে কি আছে সমস্ত দেহ দিয়ে আমাকে একবার তা জানতে দাও। নাহলে আমি আমার সাধনায় ফিরে যেতে পারব না। তোমার এতটুকু কৃপাকণার ওপর আমার সমস্ত জীবনের সার্থকতা নির্ভর করছে। আমাকে তুমি এমন করে প্রত্যাখ্যান কোর না।

লছ্‌মী কি জবাব দিল বুঝতে পারলাম না। বোধ করি কোন জবাবই দিল না।

ব্রহ্মচারী আবার বললে, জানি, মাছ আজ ডাঙায় উঠেছে, তাই আমাকে নিয়ে খেলানোর সখও তোমার মিটে গেছে। মিটুক। কিন্তু তোমার কি একটু করুণাও হয় না লছ্‌মী? আমি তো তোমার কাছে যেচে আসিনি। দিনের পর দিন আপনার চারিদিকে শিখা বিকিরণ করে তুমি পতঙ্গকে নিমন্ত্রণ করেছ। তাই পতঙ্গ আজ তোমার বুকে পুড়ে মরতে এসেছে! তুমি সেটুকুও দেবে না? কেন? তুমি তো সতী নও, লছ্‌মী, তুমি তো বাইজী!

লছ্‌মী শয্যা ছেড়ে ত্বরিতগতিতে উঠে দাঁড়ালো। চোখে বিদ্যুৎ হেনে বললে, না, আমি সতী নই। কিন্তু তুমিও তো ব্রহ্মচারী নও, সাধুজী। আমি ভেবেছিলাম তুমি সোনা। তাই ইচ্ছা হয়েছিল, তোমাকে পুড়িয়ে তোমার মধ্যে যদি খাদ থাকে তা ঘুচিয়ে তোমাকে খাঁটি করে রেখে যাব। কিন্তু পোড়াতে গিয়ে দেখলাম, সমস্তই ভস্মসাৎ হয়ে গেল, এক পাই সোনাও অবশিষ্ট রইল না। ব্রহ্মচারী, তোমার মত মানুষকে খুসি করবার জন্য আমার অনেকগুলো দাসী আছে, তাদের মধ্যে যাকে হোক তুমি বেছে নিতে পার। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে পাবার আশা তোমার দুরাশা।

কথা শেষ করে লছমী দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আমি সরে গেলাম। ক্ষণকাল পরে নৈরাশ্য পীড়িত ব্রহ্মচারী শুষ্কমুখে মাথা নীচু করে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

আজ অবধি আর কোনদিন সেই ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, তার জীবনে সেদিন যে সর্বনাশ এসেছিল, তার শিকড় ওপড়াতে সে আর কোনদিন পারবে না।

এখন আপনিই বলুন তো, আমার মত ওই দুর্ভাগা সাধকের মুক্তিও কি ভোগের পথেই ছিল না?

জবাব দেবেন না। সংস্কারের ঠুলি বাঁধা মন নিয়ে এত সহজে এ প্রশ্নের জবাব দিলে সেও ভুলই হবে। আমার শুধু অনুরোধ বাবুজী একটু ভেবে দেখবেন।

বৃদ্ধের বক্তব্য শেষ হয়েছিল। কিন্তু কথার ফেণা তখনও মরেনি। হয়তো আরও কিছু বলত। কিন্তু দুর্বল রোগীর এত কথা বলায় নার্সেরা অত্যন্ত ঘন ঘন আপত্তি জানাচ্ছিল। অবশেষে বড় মেম সাহেব সামনে এসে দাঁড়াতে বৃদ্ধ নির্বাক হল।

এর দিন কয়েক পরে আমার চোখের সামনেই বৃদ্ধের শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। সে আজ অনেক দিনের কথা। কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে যখন হাত কর্মহীন এবং মন শূন্য থাকে, হাসপাতালের সেই ভোগতান্ত্রিক বৃদ্ধের কথা আমার মনে পড়ে আর মনে পড়ে তার সেই ক্ষীণ স্বরের অনুরোধ, বাবুজী, একটু ভেবে দেখবেন।

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটি নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক:
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, জি বি. ই. কে. সি. এস. আই।

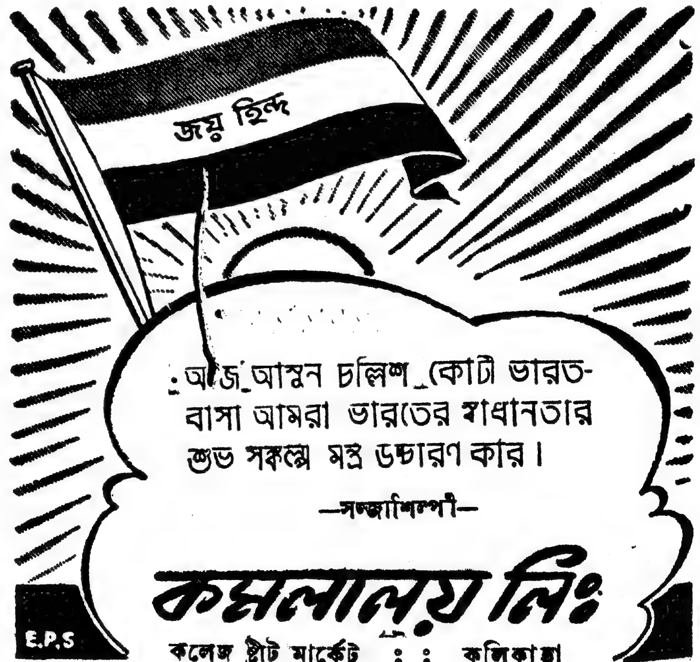
ম্যাঃ ডিরেক্টর:
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ

চীফ অফিস—আগরতলা ত্রিপুরা ষ্টেট। রেজিষ্টার্ড অফিস গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।

টেলিফোন: ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম: "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ:
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর চান্দুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মানু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।



হিল স্টেশন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

দেশ ভ্রমণটা পেশা না হলেও আমার জীবনের মস্তবড় এক নেশা। আর সে 'ভ্রমণ' যেখানেই হোক্ না কেন, চলন্ত ট্রেণের গতির মাঝে জীবনের স্পন্দনকে আমি খুঁজে পাই।

অগ্রহায়ণের এক শীতের সন্ধ্যায় অকস্মাৎ ধূলি-মলিন শহরের রাজপথ ছেড়ে আমরা যখন দার্জিলিং মেলে চেপে বসলাম মন তখন আনন্দে মেতে উঠলো। শিয়ালদহ ছেড়ে মেল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো। পিছনে পড়ে রইলো দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক হিসেব নিকেশ। মেল ছুটে চলেছে। জ্যোৎস্নাময়ী শীতের রাত্রি। যাত্রীদের কল-কোলাহলকে উপেক্ষা করে দুচোখ মেলে দেখতে লাগলুম নিশীথ জ্যোৎস্নার রূপ।

এদিকে ট্রেণের কামরায় জায়গা নিয়ে হাতাহাতি শুরু হয়েছে। আমাদের সঙ্গী ধীরেনবাবু বিশ্বভ্রাতৃত্বের সাম্যবাণী প্রচারে ব্যস্ত—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নিয়ে ঝগড়া করা মানে দেশের সার্বজনীনত্বকে অস্বীকার করা।

আমি হিসেবী লোক, শাস্ত্রকারের অনভিজ্ঞ বাণীকে অগ্রাহ্য করে পথে নারীদের সম্মান কত তারই জেহাদ ঘোষণা করছি। ফলে বেশ একটি রমণীয় স্থান ট্রেনে অধিকার করা গেছে। রাত্রির গভীরতায় জ্যোৎস্নার প্রসার বেড়ে চলতে লাগলো। হুহু করে সেই জ্যোৎস্না রাত্রির অভিসারের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে দার্জিলিং মেল ছুটে চলেছে। মন কবিতার আমেজে ভরে উঠলো—

গাও বিশ্ব গাও তুমি
সুদূর অদৃশ্য হতে
গাও তব নাবিকের গান—
শত লক্ষ যাত্রী লয়ে
কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান।

চলেছি ডুয়ার্সের এক হিল স্টেশনে। পুণ্যলোভী তীর্থযাত্রায় নয়—নয় কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে দেহের ওজন বৃদ্ধির সম্ভাবনায়। সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর জনবিরল এক পল্লী—যে পল্লী দেশ-ভ্রমণকারী বিলাসী মনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। জলপাইগুড়ি জেলার মাল জংশন—কুখ্যাত ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত হিল স্টেশন। বন্ধুবর সেখান থেকে আহ্বান জানিয়েছেন—শীতের প্রসন্ন প্রভাতে ঝলকিত রৌদ্রালোকে বিছানায় শুয়ে দেখা যায় হিমালয় গিরিশ্রেণী আর কাঞ্চন-জঙ্ঘার অপূর্ব দৃশ্য। চারিধারে পাহাড় আর পাহাড়—চায়ের ক্ষেত আর পাহাড়ী নদী। কোম্পানীর খরচায় মেপাক্রিন ম্যালেরিয়ার আক্রমণকে রোধ করবে।

আমরা সদল বলে চলেছি সেই দেশে। বাঙলার সীমান্তে বাঙলা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এই দেশ। সমতল ভূমিকে নীচে ফেলে রেখে পাহাড়ের অসমতল বন্ধুর ক্ষেত্রে পাহাড়ী গ্রাম—দেশ-ভ্রমণের যথেষ্ট রসদ খুঁজে পাওয়া যায়।



একটি পাহাড়ে নদীর ব্রিজ

গভীর রাত্রে পদ্মাকে দেখা গেল। জ্যোৎস্নার রজতধারায় রূপালী রেখায় পদ্মা মোহিনী রূপিণী। আমরা যখন পদ্মাকে দেখছিলুম রসিক-প্রবর ধীরেনবাবু তখন তাঁর সাম্যবাণীকে স্বার্থক্লিষ্ট মানুষের মধ্যে ফলপ্রসূত দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। ট্রেনে স্থান সংগ্রহের বাসনায় যে দুজন লোকের ভেতর হাতাহাতি শুরু হয়েছিল, পাশাপাশি জায়গায় বসে রাত্রির গভীরতায় দুজনেই পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তাদের নাসিকা গর্জন-ধ্বনি শুনে কে বলবে বাঙালী কলহপ্রিয় জাতি। ধীরেনবাবুর মহা আপসোস চলন্ত ট্রেনে তাঁর ক্যামেরা রাত্রির স্বপ্নালোকে অকেজো হয়ে গেছে না হলে এ ভাব-সম্মিলনের ছবিখানি ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করতো নিশ্চয়ই।

প্রভাতের প্রথম রৌদ্রালোকে জলপাইগুড়ি পার হবার সময় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা গেল। তুষার-শুভ্র হীরকোজ্জ্বল কাঞ্চনজঙ্ঘা শিল্পীর চেতনায় তখন জাগ্রত।

শিলিগুড়ি এসে পৌঁছাতে বাস পাওয়া গেল। ছত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করে যেতে হবে মালজংশনে। মাথায় পালকের টুপি, হাতে স্টিয়ারিং পাহাড়ী বাস ড্রাইভার আহ্বান জানালে। সদলবলে আমরা সব চেপে বসলাম।

ওদিকে ছোট্ট রেললাইন বয়ে দেশলাইয়ের বাক্সের মতন ছোট ছোট ট্রেন কালিম্পঙের পথে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে।

বাস ছুটতে লাগলো। প্রথমে সাত মাইল-ব্যাপী গভীর অরণ্য পথ। শালের ছায়ায় ছায়াছন্ন দুপাশের অরণ্যশ্রেণী, ঘন হতে ঘনতররূপে অন্ধকার দিগন্তে মিশে গেছে। মাঝখানের প্রশস্ত পথটিও ক্রমশঃ রৌদ্রবিলুপ্ত হয়ে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। অরণ্যকে এখানে নিবিড়ভাবে অনুভব করা যায়। জীবনরহস্য এই সহজ অরণ্যে কিছুক্ষণের জন্যে আমার মনকে ভাবরসে ভরিয়ে তুললে।

অন্ধকারের মাঝখান থেকে আবার ঝলকিত সূর্যকিরণ চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো, অরণ্য পার হয়ে আমরা তখন পাহাড়ের পথে পৌঁচেছি।

বাস থেমে গেল। সেবক ব্রীজে আমরা সব



দু'দিকে ধূসর পাথুরে বেলাভূমি—মাঝখানে পরিষ্কার বিশীর্ণ জলস্রোত

মনকে স্পর্শ করে গেল। বাঙলার কোন সমতল ভূমির অধিবাসী এরা, জীবিকার্জনের বাধ্যকতায় এই নির্জন আত্মীয়বর্জিত দেশে নির্বাসিত। আমরা বুঝি তাদের গ্রামের প্রতিবেশী। অনেকদিন পরে আত্মীয় দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করেছে এরা।

ডুয়ার্সের ছোট ছোট হিল্ স্টেশন পার হয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। পাহাড়ী অধিবাসীরা স্ত্রী-পুরুষে চায়ের ক্ষেতে কর্মনিরত। অনতিদূরের বাংলোয় সাহেব ম্যানেজার পরিবারের তখন হয়ত লাঞ্চের সময় হয়েছে।

যাত্রাপথে অনেকগুলি পাহাড়ী নদীর ব্রিজ পার হলুম। দুপাশের বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে পাথরের ধূলি ধূসর হয়ে উঠেছে—মাঝখানে কাকচক্ষুর মতন পরিষ্কার বিশীর্ণ জলস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বর্ষায় কিন্তু এই বিশীর্ণ জলধারাই আবার সগর্জনে বাঁধ ভেঙে রুদ্র ভৈরব লীলায় ভয়ংকররূপ ধারণ করে। মাথায় ফুলগোঁজা রঙীন ঘাগ্‌রায় পাহাড়ী মেয়েরা নদীর এই বিশীর্ণ ধারা অতিক্রম করে চলেছে।

জংশনে। বন্ধুপ্রবর স্মিতহাস্যে আমাদে অভ্যর্থনা জানালেন। চা এবং মেপাক্কিন রেডি

রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের তরুণ ডাক্তার এ হাজির হলেন। পান্ডববর্জিত দেশে এ কোন্ ভিন্ন জগতের অধিবাসী! একমা শ্বেতাঙ্গ চা-বাগানের প্রভুরা ছাড়া রক্তমাংসে সুস্থ শরীরের লোকজন এখানে দেখা যায় ন এমনি ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। তবুও সে দেশে আমরা এসেছি—এসেছি কোন বাধ্যত মূলক কর্মজীবনের তাগিদে নয়, দেশ ভ্রমণে বাসনায়।

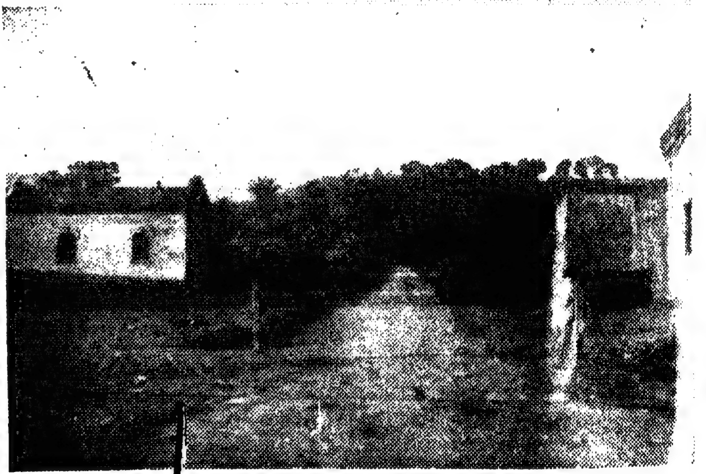
এখানকার লোকেরা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নি রূপের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। মস প্রশস্ত পথে জীবন-মাধুর্যের সন্ধান খুঁ পায় না। পাহাড়ের ধূসর রেখায় জীবন এ কল্পনার রঙে মেতে ওঠে না। চায়ের শিকা জীবনের ক্ষুধাকে মিটিয়ে এরা বেঁচে আ মৃত্যুকে অবলম্বন করে।

এখানে এসে শহরকে মনে পড়লো। শহরকে অনেক নীচে আর অনেক পিছ ফেলে রেখে এসেছি। সে শহরের চারিধ

নেমে পড়লাম। কী চমৎকার দৃশ্য এখানকার! নীচে ঘন নীল স্বচ্ছ ধারায় তিস্তা প্রবাহিতা হয়ে চলেছে। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা আঁকা বাঁকা রাস্তাগুলি শিল্প-রেখায় রেখায়িত। কমলালেবু, সন্দেশ আর চা পরিবেষণ করলেন আমাদের সঙ্গিনী আমার ভগিনী শ্রীমতী শান্তি দেবী। ধীরেনবাবুরই ক্ষুধার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। তিস্তাকে ছেড়ে তখন তিনি কণ্ঠের তৃষ্ণা-নিবারণে মেতে উঠলেন। তাঁর কথাটিতে ভোজন পর্ব শেষ হলে আমরা সবাই অবিশ্যি সায় দিলুম—রসনাকে রসিয়ে না নিলে কোন রসই জমে না।

বাস ছাড়লে তিস্তা কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গী হয়ে আমাদের দৃষ্টি পথে জাগরিত রইলো। আঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথে বাস অতি সন্তর্পণে ঘুরে ঘুরে চলেছে। ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বলোকে পথ আরও ঊর্ধ্বলীন—নিম্নে গভীর খাদ—জীবন এবং মৃত্যুকে প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঊর্ধ্বাকাশে কালোমেঘের ন্যায় চারিধারে শুধু পাহাড় আর ঘন অরণ্য—তারই ফাঁকে ফাঁকে শীতের রৌদ্র স্নিগ্ধ প্রখরতায় সমুজ্জ্বল।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর দুপাশে প্রান্তর ভূমি দেখা গেল। শুধু চায়ের ক্ষেত আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। এ এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পৃথিবী। আশেপাশে লোকালয়ের বিশেষ কোন চিহ্ন নেই। দু'একটা বাড়ি থেকে উৎসুক কয়েকটি দৃষ্টি আমাদের



প্রশস্ত রেখা[য়] পাথরের পথ রোমাঞ্চকর অনুভূতির মাঝে রেখায়িত

পথ আর পথ। প্রশস্ত রেখায় পাথরের পথ রোমাঞ্চকর অনুভূতির মাঝে রেখায়িত। এ পথ চির অনন্তকালের অজানা তথ্যে রহস্য-লীন, মানুষের কবিমন এ পথকেই বুঝি আশ্রয় করে রসলোকে পরিপ্লুত হ'য়ে ওঠে। তাই আমার সঙ্গী এবং সঙ্গিনী,—যাঁদের কণ্ঠে সাধারণভাবে কোনদিন গানের সুর শোনা যায় নি—তাঁরাও গুন গুন ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলেন,—এ পথ গেছে অনেকদূরে বেঁকে—

তিন ঘণ্টা যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটলো আমাদের। পৌঁছালাম হিল্ স্টেশনে, মাল-

প্রকৃতির এ শোভা, বিন্যাস নেই—কিন্তু স্বাস্থ্যহীন এই দারিদ্র্য এখানকার প্রাকৃতিক বৈভবকে যেন ব্যঙ্গ করছে।

আহারাদি সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভের পর আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম—মাল-জংশন থেকে মেটেলির পাহাড়ী পথে। মন্থর-গতিতে ট্রেন এঁকে বেঁকে সর্পিল রেখায় ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর পথে অগ্রসর হতে লাগলো। একদিকে পাহাড়ের ধূসর শ্রেণী অপরদিকে উঁচু নীচু দিগন্তের দৃশ্য। শিল্পীর পটে আঁকা ছবির মতন ল্যান্ডস্কেপগুলি



লেখক ও তাঁর সহযাত্রিবর্গ

পরাহ্নের রৌদ্র-ছায়ার বর্ণবৈচিত্র্যে ুজ্জ্বল। একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্ট-েটে হিল্ স্টেশন পরিভ্রমণ করা যাচ্ছিল। ধুপ্রবর চা-বাগানের গল্প করছিলেন। দরিদ্র রতবাসীর পরিশ্রমে লাভবান বণিক সম্প্রদায় থানকার জগতের একেশ্বর সম্রাট। দুরন্ত লেরিয়া তাদের গ্রাস করতে পারে না। তাদের সভূমি, আহার-বিহার এদেশের মাটিতেই থেকে। বড় বড় কম্পাউণ্ড ঘেরা বাংলো—োচিত সম্ভ্রমে সম্ভ্রান্ত। পোলো খেলার ঠে তাদের সবল দেহগুলি এদেশের অধি-সীদের স্বাস্থ্যকে বঞ্চিত করেছে। কালা কুলি র কালাবাবুর দল শুধু নিজের দেশে র্ভাগ্যকেই বহন করে।

মনে পড়ে গেল ছেলেবেলাকার কথা। েলে ধরারা ছোট ছেলেদের নিয়ে গিয়ে চা-াগানে বিক্রী করে। শহরের রাস্তায় এই ছেলে রাদের আর চা-বাগানের নরককুণ্ডের ভয়ে তই না ভীত হয়েছি!

মাঝপথে একজন রেলেরবাবু উঠেছিলেন আমাদের কামরায়। পেটমোটা ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অস্থি কঙ্কালসার চেহারা। হিমালয়ের পাদদেশে হিল্ স্টেশনে তাঁর বারো বছর কেটেছে। তাঁর মুখে অনেক শিকার কাহিনীর গল্প শোনা গেল। এদেশে বাঘ ভাল্লুক আর বন্য হাতীর দর্শন লাভ অতি সাধারণ ঘটনা। এককালে তিনি নাকি খুব ভালো শিকারী ছিলেন। আশ্চর্য বোধ করছিলুম তাঁর কথা-বার্তা শুনে, কারণ আকৃতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার শিকার-পটুতার কোন সামঞ্জস্যকেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

মেটিলিতে নেমে তিনি যখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগলেন তখন শ্রীমতী শান্তি দেবী আমাদের কাছে তাঁর বীরত্বের সাক্ষ্য দেখিয়ে বললেন, শিকার করতে গিয়েই নিশ্চয়ই ভদ্রলোক পা ভেঙেছেন!

সন্ধ্যার ধূসরতার মাঝে পাহাড়কে দেখলুম, বিরাট গম্ভীররূপ।

সমস্ত দিনের পথ ভ্রমণে দেহে ক্লান্তির জড়তা। শীতের আমেজকেও তীব্ররূপে অনুভব করা যাচ্ছিল। এক কাপ কফি পান করে ক্লান্ত দেহটিকে শয্যা-অঙ্কে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

ধীরেনবাবু সদলবলে রান্নাঘরে ঢুকেছেন, নৈশ আহারের সুব্যবস্থার তদারকে। তাঁর মতে দেশ ভ্রমণের সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ হচ্ছে—Healthy food!

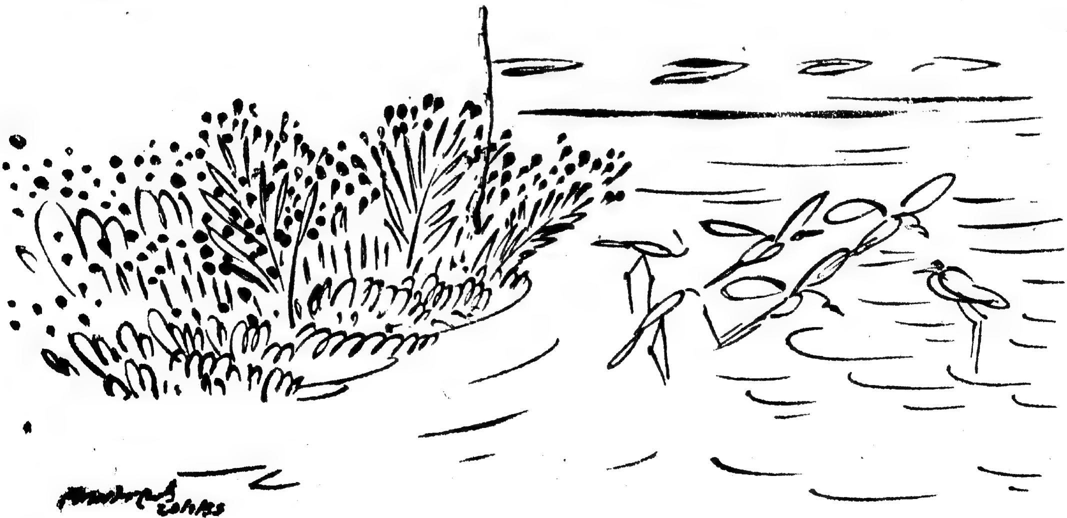
সূর্যাস্তের পর অকস্মাৎ আকাশ ভরে উঠলো ঘন মেঘে। পাহাড়ের মাথায় মাথায় কালো জটাজালে স্তূপীকৃত মেঘরাশি সুগম্ভীররূপ ধারণ করেছে। এ পাহাড়ী মেঘে বর্ষণের অশ্রুসিক্ততা নেই! জীবনের কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য জটিলতাকে এ মেঘ হাতছানি দিয়ে ডাকে।

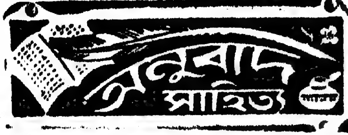
কোন্ মহাশঙ্করের ত্রিশূল ওই মেঘলোকে সৃষ্টিস্থিতি এবং প্রলয়কে ধারণ করে আছে? জীবনের এই রূপ-গাম্ভীর্যে অনুভব করলুম—

তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরাম বিহীন
চঞ্চল অনিবার,
যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

প্রশান্ত সন্ধ্যায় এই মহাক্ষণটিকে অনুভব করে আমি আমার এ পথ-যাত্রার গভীরত্বকে উপলব্ধি করলুম। শান্তমনে হিমাদ্রির রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো—

পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি
মৌন শান্ত হিয়া
সীমা-বিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ
সঁপিয়া।





অন্ধ

ম্যাকিনলে ক্যান্টর

[আমেরিকার বিখ্যাত লেখক Mackinlay Kantor রচিত "A man who had noeyes" নামক ছোট গল্প থেকে অনূদিত।]

মিঃ পার্সন্স যখন তাঁর হোটেল থেকে নামলেন তখন একটা ভিখিরী সে-রাস্তা ধরেই এগিয়ে আসছিল।

ভিখিরী অন্ধ। তার এক হাতে ছিল একটা লম্বা লাঠি, যা দিয়ে সে পথ আন্দাজ করে চলাফেরা করছিল। লোকটা একটু কুঁজো ধরণের, গায়ে পুরোনো ময়লা একটা কোট। অন্য হাত দিয়ে ধরে রেখেছিল কাঁধের ওপরে ছোট একটা ঝুলি। তাতে বিক্রীর জন্যে কোনো জিনিস আছে বলে মনে হচ্ছিল।

বসন্তের হাওয়ায় ছিল পুলকের মাধুরী আর সূর্যের আলোয় রমণীয় উষ্ণতা। মিঃ পার্সন্স হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসা অন্ধ ভিখিরীর পায়ের শব্দ শুনতে লাগলেন। সমস্ত অন্ধ প্রাণীকুলের জন্যে তাঁর মনে সহসা কেমন একটা করুণা জেগে উঠল।

মিঃ পার্সন্স ভাবতে লাগলেন, বেঁচে থেকে তিনি সুখী। কয়েক বছর আগেও তিনি কেবলমাত্র একজন সুদক্ষ শ্রমিক ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। আজ তিনি জীবনে কৃতকার্য, সম্মানিত, প্রশংসিত। আর এই উন্নতির পথে এগিয়ে এসেছেন তিনি একাকী, বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, কারু সাহায্য না নিয়ে।

অন্ধ-ভিখিরী তাঁকে অতিক্রম করে গেলে তিনি দুএক পা এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ ভিখিরী ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—দয়া করে শুনুন বাবু, এক মিনিট।

মিঃ পার্সন্স বললেন—আমি বেশিক্ষণ দেরী করতে পারব না। তুমি কি কিছু ভিক্ষে চাইছ?

—আমি ভিক্ষুক নই বাবু। অন্ধ লোকটি বললে—একটা জিনিস আমি বিক্রী করতে চাই।

ঝুলিটার মধ্যে খানিকক্ষণ হাতড়ে সে একটা ছোট জিনিস মিঃ পার্সন্সের হাতে দিলে, বললে—এটা খুব ভালো একটা সিগারেট লাইটার।

মিঃ পার্সন্স সেখানে দাঁড়িয়ে যেন কিছুটা বিব্রত ও বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন। তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর আর তিনি পরেছিলেন দামী ধূসর রংয়ের পোষাক আর টুপী। হাতে ছিল সুন্দর মালাক্কা ছড়ি। অবশ্য অন্ধ লোকটি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না।

—কিন্তু আমি তো ধূমপান করিনে। মিঃ পার্সন্স বললেন।

—দেখুন নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত অনেক লোক আছেন যাঁরা ধূমপান করেন। আপনি তো তাঁদের কাউকে এটা উপহার দিতে পারেন। একজন গরীব অন্ধকে এটুকু সাহায্য কি আপনি করবেন না?

মিঃ পার্সন্স পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুটো আধা-ডলার বের করলেন। তারপর তা অন্ধ লোকটির হাতে দিয়ে বললেন—করব বৈকি সাহায্য। লাইটারটা আমি যে-কাউকে দিতে পারব।

একটু ইতস্ততঃ করে নিজের কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে মিঃ পার্সন্স বললেন—তুমি কি সম্পূর্ণ অন্ধ?

লোকটি আধা-ডলার দুটো পকেটে রাখতে রাখতে জবাব করলে—চোদ্দ বছর ধরে—বাবু। তারপর ঈষৎ গর্বের সুরে বললে—সবই কপাল! নইলে আমি ছিলাম ওয়েষ্টবারি বংশেরই একজন।

—ওয়েষ্টবারি! মিঃ পার্সন্স বললেন।

—হ্যাঁ বাবু। কিছুদিন আগে যে একটা কেমিক্যাল কোম্পানীতে মস্তবড় একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল তার কথা হয়তো খবরের কাগজে পড়েছেন। এতদিনে সবাই সে কথা ভুলে গেছে, কিন্তু ক্ষতি যাদের হয়েছে তারা কি আর ভুলতে পারে!

মিঃ পার্সন্স একবার কাশলেন। অন্ধ লোকটি শ্রোতার করুণা উদ্রেক করে আর কিছু আদায় করবার জন্যে বলে চললে—একবার ভাবুন কী ভয়ংকর! একশ আটজন মরে গিয়েছিল আর প্রায় দুশো লোক আহত হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ জন লোক অন্ধ হয়ে গিয়েছিল—একেবারে বাদুড়ের মত অন্ধ। একটু থেমে সে বললে—যুদ্ধও এর থেকে ভয়ংকর নয় বাবু। যদি আমি যুদ্ধে গিয়ে অন্ধ হতুম তাহলেও সরকার থেকে সাহায্য পেতুম। কিন্তু আমি ছিলাম সাধারণ একজন শ্রমিক, আর কিছু ত নয়।

মিঃ পার্সন্সের নীরবতায় উৎসাহিত হয়ে সে আবার বললে—কেমন করে আমি অন্ধ হলুম জানেন? ইতিপূর্বে বহুবার যে কাহিনী বলে সে শ্রোতাদের করুণার আকর্ষণ করেছে সেই কাহিনীই নিপুণভাবে বলতে লাগল—আমি ওই কেমিক্যাল কোম্পানীর 'সি' নম্বর দোকানে। যখন বিস্ফোরণ শুরু হল, তখন সবাই ছুটোছুটি করে বাইরে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করল। আমি পড়লাম সকলের পেছনে। ঘরের মধ্যে সমস্ত জিনিসপত্র ভেঙেচুরে ছত্রখান হয়ে আছে। সবাই বেরিয়ে যাবার পর আমি অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেলুম। হঠাৎ পেছন থেকে কে আমার পা ধরে ফেলল, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—আমায় আগে যেতে দাও। বলেই সে আমাকে জঞ্জাল স্তূপের মধ্যে ফেলে আমার ওপর দিয়েই দরজা পেরিয়ে বাইরে চলে গেল। আমার দেহের ওপর নানারকম বিষাক্ত তরল পদার্থ পড়তে লাগল। গ্যাসে আমার দম বন্ধ হয়ে এলো।......অন্ধ লোকটি একটা ঢোক গিললে—একটা অস্ফুট কান্নার ধ্বনি কণ্ঠে চেপে রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

—ঠিক তা নয়। মিঃ পার্সন্স বললেন।

বিস্মিত অন্ধ বললে—ঠিক তা নয় ব... বলছেন বাবু?

মিঃ পার্সন্স বললেন—গল্পটা সত্যি ব... তবে তুমি একটু ঘুরিয়ে বলেছ।

ঘুরিয়ে বলেছি! সে কী বাবু?

মিঃ পার্সন্স বললেন—'সি' নম্বর দোকা... আমিই ছিলাম। তুমিই পেছন থেকে এ... আমায় ফেলে দিয়েছিলে, তারপর আমার ও... দিয়ে বাইরে গিয়েছিলে, মার্কওয়ার্ড!

মার্কওয়ার্ড বজ্রাহতের মত খানিক... দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বলল—হায় ভগবা... আমায় ক্ষমা কর পার্সন্স। কিন্তু সে যাই হো... তুমি তো দেখছ, আমি অন্ধ, আমি অন্ধ হ... গেছি। আর তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে ম... মনে হাসছ। আমি অন্ধ বলে আমায় উপহ... করছ। মার্কওয়ার্ড চীৎকার করে উঠল।

পথচারীরা আশ্চর্য হয়ে তাদের পা... তাকালে।

—তুমি রক্ষা পেয়েছ আর আমি অন্ধ হ... গেছি। শুনতে পাচ্ছ? আমি অন্ধ হয়ে গে...

মিঃ পার্সন্স শান্তকণ্ঠে বললেন—... অনর্থক চীৎকার করছ মার্কওয়ার্ড? আমি... অন্ধ।

অনুবাদক—শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত



[বড় গল্প]

চাঁপাতলার একটা ঘিঞ্জি গলির মধ্যে ডাস্টবিনের পাশে একটি জরাজীর্ণ দোতলা বাড়ি। বাড়ির বাহিরে সদর দরজার উপর একখানা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ঝোলানো; তাহাতে কালো জমির উপর বড় বড় সাদা অক্ষরে লেখা 'পবিত্র কালিকা ভোজন-আশ্রম'। কোনও দুষ্ট লোকে কালিকার 'ক'এর আঁকড়িটি মুছিয়া দিয়াছে, ফলে সম্প্রতি পবিত্র বালিকা-ভোজন আশ্রমের নামটি চক্ষুষ্মান পথিকের কৌতূহল এবং হাস্য উদ্রেক করে। মোটের উপর পাইস হোটেলটি চলে মন্দ নয়। লাহিড়ী বাবুদের নেপালী দরোয়ান, পথের ফুলুরি-ওয়ালা, ফেরিওয়ালা, দোকানদার, মুদির দোকানের কর্মচারী, উড়িয়া মজুর, জুতারুস হইতে আরম্ভ করিয়া মফঃস্বলের মামলাবাজ আগন্তুক, মার্চেন্ট অফিসের কেরানীবাবু এবং স্কুল কলেজের দরিদ্র ছাত্ররা অনেকেই এই হোটেলে অল্প খরচে দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্নভোজন সারিয়া যান, যদিও শেষোক্ত ভদ্রসন্তানেরা একথা বাহিরে, স্বীকার করিতে লজ্জা পাইবেন।

উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সালের কথা। তখনও বাঙলাদেশের অর্ধেক গরিব লোক খাইতে পাইত। কলিকাতার পথে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নর-নারী অনাহারে মরিয়া পড়িয়া থাকিত না।

একতলার দক্ষিণ দিকের ঘরে সুমন্ত্র খাইতে বসিয়াছিল। তাহার পিছন দিকের নোনা-ধরা দেওয়ালে ঠিক তাহার মাথার উপরে বাংলা ক্যালেণ্ডার হইতে কাটা একটি 'সাত' অক্ষর আঠা দিয়া আঁটা, তাহার উপরে বড় বড় অক্ষরে আলকাতরা দিয়া লেখা 'ছয় পয়সার কম খাওয়া নাই।' এই ঘোষণাপত্রটি হোটেলের আভিজাত্যের নিদর্শনস্বরূপ রাখিতে হয় বলিয়া রাখা, কার্যক্ষেত্রে সকলকেই যে ইহার নির্দেশ মানিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। আপনি দুই পয়সার ভাত এক পয়সার মসুর ডাল দিয়া খাইয়া আসিলে কেহ আপত্তি করিবে না, কেবল থালা ও গ্লাসটি আপনাকে মাজিয়া দিয়া আসিতে হইবে। সুমন্ত্রর মাথার উপর দেড় মানুষ উঁচুতে একখানি বাঁধানো ছবি, তাহার মধ্যে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁহার স্বর্গীয় পিতার মতো মুখ করিয়া টেবিলের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া মহাত্মা গান্ধীর করমর্দন করিতেছেন। তাহার পাশে আর একখানি ছবির মাঝখানে দাঁড়াইয়া বন্দিনী ভারত-মাতা হাসিতেছেন, তাঁহার চারিপাশে বেজায় ভীড়, জীবিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁহার বন্ধন মোচন করিবার জন্য সপ্তরথীর মতো উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন এবং ঊর্ধ্বে আকাশ হইতে দেশবন্ধু, মতিলাল, তিলক মহারাজ প্রভৃতি পরলোকগত নেতৃবৃন্দ বড় বড় পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন। ঐ ছবিটির পাশে একখানি কালীঘাটের কালীমাতার পট, তাহার পাশে একখানি নিপ্পন-ইয়েসান-কাইসা'র জাহাজের ছবি দেওয়া ক্যালেণ্ডার এবং একখানি পুরাতন ঘড়ি। ঐ ঘড়িটি হোটেলের চাকর বিশ্বকর্মা পূজার দিন ধরিয়াছিল। সুমন্ত্রের দক্ষিণের, বামের এবং সম্মুখের দেয়ালে শীতলা মাতা, গঙ্গা ও শান্তনু, এবং দেশী ও বিলাতী ছায়াচিত্র-তারকাদের আরও সাতখানি ছোটো বড়ো ছবি বাঁধানো আছে, তাহা ছাড়া অনেকগুলি কাপড়ের ট্রেডমার্ক, থিয়েটার ও বায়োস্কোপের সচিত্র বিজ্ঞাপন এবং সিগারেটের বাক্সের ছবি আঠা দিয়া আঁটা অবস্থায় চতুর্দিক হইতে কর্তৃপক্ষের শিল্পরুচির পরিচয় দিতেছে। সুমন্ত্রর কিন্তু ওসব দিকে নজর দিবার সময় ছিল না, সে দুই পয়সার ভাত দুই পয়সার মাছের ঝোল দিয়া খাইতেছিল। সকাল হইতে তিন ক্রোশ হাঁটা হইয়াছে, বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে; ক্ষুধায় তাহার উদর জ্বলিতেছিল।

এমন সময় ঘরে ঢুকিল ভদ্রেশ্বর। ছোটো-বেলার বন্ধু, পাঁচ বৎসর মথুরবাবুর মাইনর স্কুলে একসঙ্গে পড়িয়াছিল, আজ তেরো বৎসর পরে এই পাইস হোটেলে সহসা সাক্ষাৎ। সুমন্ত্র এক মনে খাইতেছিল, মাথা তুলে নাই, ভদ্রেশ্বরই প্রথমে তাহাকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরে কে ও? সুমন্ত্র না? বেঁচে আছিস তা হলে? ওঃ, কতকাল পরে দেখা?" সুমন্ত্র মুখ তুলিয়া বিমূঢ়ের মতো হাসিল। বলিল, "ভদ্রেশ্বর না?" ভদ্রেশ্বর বলিল, "হ্যাঁরে হ্যাঁ, ভদ্রেশ্বর। তোদের 'কুমড়োপটাশ'।" বলিতে বলিতে তাহার বাঁ পাশের খালি পিঁড়াটায় বসিয়া সশব্দে তাহার পিঠে একটা থাপ্পড় মারিয়া বলিল, "বন্ধুবর গাড়ু, চিনতে পারছ না? এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলে বৎস? আমি যে বৎসহারা গাভীর মতো তোমায় গরু-খোঁজা করে বেড়াচ্ছি। যাক্, এখন কেমন আছিস বল? কি করছিস? থাকিস কোথায়? এখানে কি করতে এসেছিস?" বলিতে বলিতে পকেট হইতে চিরুনি বাহির করিয়া মাথার ব্যাকব্রাশ করা চুলটা আর একবার ঠিক করিয়া লইল।

সুমন্ত্র কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "উপস্থিত করছি না কিছুই। অনেক কিছু করে শেষে একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে ঢুকেছিলুম, বছরে যত টাকার কাজ জোগাড় করবার কথা ছিল তার অর্ধেক করতে পারিনি, তাই আজ দু'দিন হল ছাড়িয়ে দিয়েছে। কলকাতাতেই আছি সেই বাড়িতেই। আর এখানে আমি যে কেন এসেছি সে তো বুঝতেই পারছ, কিন্তু তুমি কেন এসেছ সেইটেই বুঝে উঠতে পারছি না।" বাল্যবন্ধুর সুস্পষ্ট বিপুল দেহের ধোপদস্ত চুনটকরা জামা কাপড়, বিশেষ করিয়া হীরার আংটিটির দিকে চাহিয়া তাহার 'তুই' বলিবার সাহস হইল না। এই প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রেশ্বর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "বলিল, "ও ভুলে গেছলুম! তুই বুঝি কলেজে পড়েছিস, সভ্য হয়েছিস? তুই বলতে বাধে? তা বলে আমি কিন্তু 'তুই'

ছাড়ছি না। হ্যাঁ, যে কথা জিজ্ঞেস করছিস্, এখানে উদয় হল্‌ম কি করে। দ্যাখ, আমার ঠাকুরদা ছিল বেজায় কঞ্জ্‌স, জানিস তো পাড়ার লোকে সকালে নাম করত না। ঠাকুরদা বলত, "পরবে ছে'ড়া ট্যানা, খাবে গ্‌ড়ের পানা, তবে হবে লক্ষ্মীর থানা।" যাক, লাউ, কচু আর কুমড়োর ঘ্যাঁট শ্‌ধ্‌ নিজে খায়নি, আমাকেও বারো বছর বয়েস পর্যন্ত খাইয়েছে। ঠাকুরদা মরতে বাবা ব্‌ড়ো হল, কিন্তু তখনও তার সখ মেটে নি। বললে, "দ্‌ধের লক্ষ্মী। বাবা তিন লাখ টাকা রেখে গেছে সেও ছানা পাড়ছে, লক্ষ্মী যাবে কোথায়? তবে হ্যাঁ, হাজার হোক বাবা বলে গেছে, যে সে নয়, আপন ফাদার (বাবা দ্‌'বছর ইংরিজি পড়েছিল) তার কথাটা একেবারে অমান্য করব না। পরব ছে'ড়া ট্যানা, খাব ঘি, ছানা।"

গোত্রপরিচয়হীন হোটেলের ঠাকুর পাশের ঘরে একঘেয়ে টানা স্‌রে ফিরিস্তি দিতেছিল —বারো নম্বর ভাত, ডাল, মাছের কারী, তেরো নম্বর ভাত, আল্‌পোস্ত, পনেরো নম্বর ভাত, ডাল, আল্‌ভাজা, ম্‌গের কারী, চচ্চড়ি, মাছের দোরমা, মাছভাজা, মাছের কারী, দই; সাত নম্বর—ভাত, মাছের কারীইইই—

ফর্দ শেষ করিয়া সে আসিয়া ভদ্রেশ্বরকে বলিল, "আপনাকে কি দোব বাব্‌?" ভদ্রেশ্বর স্‌মন্ত্রর দিকে চাহিয়া ঢোক গিলিয়া বলিল, "কিরে কি নেব? আচ্ছা, এখন ভাত আর প্‌ই শাকের চচ্চড়ি নিয়ে এস তো আগে"—

পরিচারক বাব্‌র পোষাকের সহিত আহারের অসামঞ্জস্যে ব্যথিত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, আজ চিংড়ি মাছের কাটলেট আছে, মাছের দোরমা"—

ভদ্রেশ্বর বলিল, "আচ্ছা, এই বাব্‌কে এনে দাও। নেঃ নেঃ ফাজলিমি করিস নি, আমার রোজগারের পয়সা নয় যে তোর মানহানি হবে। আমি বাপের হোটেলে মাগ্‌না খাই, তুই পাইস হোটেলে পয়সা দিয়ে খাস। খ্‌'ত খ্‌'ত করিস নি।"

স্‌মন্ত্র আর আপত্তি করিল না, ভদ্রেশ্বর খাইতে খাইতে বলিয়া চলিল, সে একমনে শ্‌নিতে লাগিল।

ভদ্রেশ্বর বলিল "হ্যাঁ, যে কথা বলছিল্‌ম। বাবা মারা গেছে আট দশ বছর হ'ল। ছিটের কোট পরে তক্তাপোষে বসে তেজারতির কারবার যে রকম চালাচ্ছিল, তাতে আরও দ্‌-দশ বছর বাঁচত। তবে গেরোর ভোগ, জন্ম গেছে কচু-কুমড়ো খেয়ে, ঘি, ছানা এক রকম করে সয়েছিল, অখাদ্যটা আর সইল না। দম আটকে মারা গেল।"

স্‌মন্ত্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কিরে?"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "হ্যাঁ, সত্যি। বোষ্টমের ঘরে ম্‌র্গি সইবে কেন? বাড়িতে কেউ জানত না, আমি এনে দিতুম টিফিন কেরিয়ারে করে। দেশী বিলাতী বড় বড় হোটেল-রেস্তোরাঁ, যেখানে যা ভালো জিনিস পাওয়া যায় আমার তো জানতে বাকি ছিল না, বাবাই চুপি চুপি চেখে আসতে পাঠায় নিজে খাবার আগে। যাক, সেদিন শনিবার সন্ধ্যেবেলা সকাল সকাল কাজকর্ম সেরে মা গেছে নন্দীদের ঠাকুরবাড়িতে প্‌জো দিতে চাকর সঙ্গে নিয়ে, বাবা বললে, দোতলার ঘরে নিয়ে আয়। নিয়ে এল্‌ম। কি দোষ বল, পিতৃ-আজ্ঞা। বাড়ি ঢোকবার সময় দ্‌'হাত জোড়া, বাইরের দরজায় খিল দিতে ভুল হয়ে গেছে। আসবি তো আয়, সেইদিনই ঠাকুমা নবদ্বীপ থেকে ফিরেছে। বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে, ভাড়া দেবে, তার টাকা ভাঙাতে পারছে না, দরজা খোলা পেয়ে—বলা নেই, কওয়া নেই—সোজা দোতলার ঘরে এসে হাজির। বাবা তখন পরিতৃপ্তি করে হাড়টি চুষছে, ম্‌খ থেকে বার করলেই আমি জানলা দিয়ে পাশের বস্তির খোলার চালে ফেলে দেব, কাগে ফেললে না বগে ফেললে কেউ টের পাবে না, হঠাৎ সব শেষ।" ভদ্রেশ্বর থামিয়া গেল, স্‌মন্ত্র অসহিষ্ণ্‌ভাবে বলিল, "গলায় আটকে গেল?"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "আটকাবে কেন, ইচ্ছে করে আটকে দিলে। মাতৃভক্ত ছেলে, মায়ের মনে কষ্ট দিলে না, ম্‌খ আর খ্‌ললে না। অতবড় ম্‌রগীর ঠ্যাং গলা দিয়ে নামবে কেন? খানিকক্ষণ ঘড় ঘড় শব্দ, চোখ গেল কপালে উঠে, ঠাকুমা ছ্‌টে এসে বললে, "কি হয়েছে বাবা, অমন করছ কেন?" আর অমন করছ কেন। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি হাত নেড়ে বারণ করলে, কিছ্‌ লিখতে চাইলে। খাতা-পেন্সিল এনে দিল্‌ম, ঠাকুরমা তখনো জড়িয়ে ধরে আছে, অসহ্য যন্ত্রণায় বাঁ হাত দিয়ে ব্‌কটা চেপে ধরে বাবা ডান হাত দিয়ে লিখলে, "আই শেম, কাওয়ার্ড। লাভ মাদার, ইউ ইট হোয়াট লাইক।" বলিতে বলিতে ভদ্রেশ্বরের চোখ সজল হইয়া আসিল। বলিল, "তোরা হয়তো ইংরিজি শ্‌নে হাসবি, কিন্তু কত বড় উদার মন বল দেখি? মরবার সময় পিতৃআজ্ঞা দিয়ে গেল—তুমি যা খ্‌সী খেয়ো। কজন পারে?"

স্‌মন্ত্র র্‌দ্ধশ্বাসে শ্‌নিতেছিল। বলিল "তারপর?"

ভদ্রেশ্বর পরিতৃপ্তি সহকারে প্‌ই ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে বলিল "তারপর আর কি? প্‌ণ্যাত্মা লোক ছিল, সজ্ঞানে পনেরো মিনিটের মধ্যে স্বর্গে চলে গেল। ঠাকুমা আর শ্রাদ্ধের জন্য অপেক্ষা করলে না। নিজের পায়ের ধ্‌লো নিয়ে বাবার মাথায় ব্‌কে মাখিয়ে দিলে, তারপর সেই যে বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছিল, তাকেই ডবল ভাড়া দিয়ে স্টেশনে ফিরে গেল, নবদ্বীপের ট্রেন ধরতে। সেই থেকে আর এ বাড়িতে আসেনি, চিঠি লিখলে জবাব দেয় না।

স্‌মন্ত্র অবাক হইয়া ভাবিতেছিল, ভদ্রেশ্বরে পিতার কথা। জগতের ইতিহাসে অনে মাতৃভক্তের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু মাতৃভক্তি আতিশয্যে গলায় ম্‌রগীর ঠ্যাং আটকাই মারা গিয়াছেন এর্‌প মাতৃভক্ত মহাপ্‌র্‌ দ্‌র্লভ। উভয় সংকটে পড়িয়া দ্‌র্গে দ্‌মরাজ প্রাণ দিয়াছিলেন, তাহার সম্মা দেড়শত বৎসর পরে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনা কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু বাঙলা দেশে রাজধানীতে তাঁহারই সময়ে জীবিত থাকি এই যে কাব্যে উপেক্ষিত ব্যক্তিটি মাতৃভক্তি এ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিরোধ মিটাইতে গি স্বেচ্ছায় প্রাণ দিল, তাহার জন্য সকর্‌ণ কা লেখনী হইতে একছত্র প্রশংসা-বাক্যও নিঃস হইল না। স্‌মন্ত্র প্রথমে ভাবিল, নিজে কবিতা লিখিয়া রত্নেশ্বর কুণ্ডুকে অমর করি যাইবে; পরক্ষণেই মনে হইল, যদি-ই দৈবা কবিতাটি উৎরাইয়া যায়, ম্‌র্গী খাওয়ার উ থাকায় ম্‌সলিম রাজত্বে টেক্সট-ব্‌কে স্থানল করে তাহা হইলে? তাহা হইলে শত বৎ পরেও ঐ কবিতা ম্‌খস্থ করিতে করিতে উহার সন্ধি-সমাস ভাঙিতে ভাঙিতে ছ ছাত্রীরা তাঁহাকে অভিশাপ দিবে। নাঃ, ই নাই কবিতা লিখিয়া! তাহা ছাড়া 'ম্‌র এবং 'ঠ্যাং' কোনটিরই পছন্দমতো মিল পা যাইতেছে না।

ভদ্রেশ্বর তখনও খাইতেছিল, স্‌ আহারান্তে জল খাইয়া বলিল—'তার তুই এখন কি করছিস?' তাহার কথাবার্তা হইয়া আসিতেছিল। ভদ্রেশ্বর বলিল, 'বা সাদা ভাত হয় না, দ্‌-বেলা ঘি-ভাত, পো মাংস ল্‌চি এই সব। বৌ বলে, 'পরবে দানা, খাবে ঘি-ছানা, শরীর হবে চাঁদপা তা চাঁদপানা হয়ে এসেছে শরীর। আমার আড়াই মণ, গিন্নীর দ্‌' মণ বত্রিশ সের। গোল হতে আর বেশি দেরি নেই।" বা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ব 'এখানে ম্‌খ বদলাতে আসি মাঝে মা তাহারা লক্ষ্য করে নাই, এতক্ষণে আর এ ভদ্রলোক ভদ্রেশ্বরের পাশের পিঁড়াটিতে ব বসিয়াছিলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া বলি 'খাচ্ছেন তো প্‌ইশাক, হাসি যে আর না? ঘরে আর পাঁচজন ভদ্রলোক আছে, ভুলে যাবেন না'—

ভদ্রেশ্বর অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, পর্‌নো করবেন, অনেক দিন পরে দেখা। দ্‌টো বন্ধ্‌র সঙ্গে স্‌খ-দ্‌ঃখের কথা হচ্ছিল তারপর স্‌মন্ত্রর দিকে ফিরিয়া বলিল 'এ কিরে? তুই আর কিছ্‌ নিলি না? উঠে পড়ছিস?'

স্‌মন্ত্র বলিল, 'আর না ভাই, পেট ভরে গেছে। তোর হ'ল? নে, তাহলে উঠে পড়।'

কলতলায় আঁচাইয়া হোটেলের প্রাপ্য মিটাইয়া দুইজনে পথে বাহির হইল। ভদ্রেশ্বর বলিল, 'কতদূর পড়েছিলি?'

'সবাই যা পড়ে, এম-এ আর ল।'

ভদ্রেশ্বর বলিল, 'সবাইয়ের কথা বলিস নি, আমি পড়ি নি। তারপর ওকালতি করলি না কেন? ধর্মে বাধল? ধর্ম করলে খেতে দেবে তোকে কেউ? এখন কি করবি ঠিক করেছিস?'

সুমন্ত্র বলিল, 'হয় চাকুরী, না হয় ব্যবসা, না হয় একটা কোন সাধারণের কাজ। নিজের জন্যে ভাবি না, কিছু টাকা থাকলে কিছু কাজ করে যেতে পারতুম।'

ভদ্রেশ্বর বলিল, 'তোকে বলতে ভরসা হয় না, আমার কাছে টাকা নিতে তোর আপত্তি আছে? না-না, চাকুরীর কথা বলছি না, কোন ভালো কাজের জন্যে। ধর, এখনি আমার একটা বাড়ির দরকার, এ-পাড়ায়, একা থাকবার মতো, এই হাজার দশেক টাকার মধ্যে। দু'শ টাকা দালালি দেব, যে কেউ করবে। তুই নিজে না নিস, ভালো কাজে লাগাতে পারিস কোন-রকম। দ্যাখ্ না, যদি পারিস।'

সুমন্ত্র বলিল, 'কেন, তোদের সেই ছকু খানসামার লেনের বাড়ি কি হ'ল? ভাড়া দিবি?'

ভদ্রেশ্বর বলিল, 'তুই এখনও নাইন্টিনথ্ সেঞ্চুরিতে আছিস দেখছি! সে বাড়ি তো কবে বেচে মেরে দিয়েছি, এখন বালিগঞ্জে বাড়ি করেছি যে! এখন আমি কি সেই ভদ্রেশ্বর আছি, এখন যে আমি মিস্টার কুণ্ডু। এখন বাড়িতে মুরগী কাটা হচ্ছে, টি-পার্টি হচ্ছে। থেকে থেকে মিহি গলায় ডাক উঠছে 'বোয়, খানা লাও।' চাকররা কেউ সাহেব না বলে বাবু বললে ফাইন হয়, জানিস।'

সুমন্ত্র বলিল, 'তাহলে তো সুখেই আছিস। এ-পাড়ায় আবার কেন?'

ভদ্রেশ্বর বলিল, 'না ভাই, বেশি সুখ আর সহ্য হচ্ছে না। এজমালি বাড়িতেও আর পোষাচ্ছে না। ভেন্ন হব ঠিক করেছি।'

সুমন্ত্র বলিল, 'ভেন্ন হবি কার সঙ্গে? তুই তো বাপের এক ছেলে?'

ভদ্রেশ্বর বলিল, 'আর বলিস কেন? বৌ বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, দিনরাত খাওয়া-দাওয়া আর বড়মানুষীর গল্প ভালো লাগে না। ওদিকে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স তো শেষ হয়ে এল। সময় থাকতে রাশ না টানলে চলছে না। এক-খানা ছোট্ট বাড়ি দেখে দে, দশ-পনেরো হাজারের মধ্যে, আশেপাশে রেডিও থাকবে না, আর দক্ষিণটা খোলা থাকবে। আমি থাকব আর আমাদের সেখানের চাকর রামশরণ থাকবে, ব্যস্।'

সুমন্ত্র বলিল, 'কি করবি সে বাড়িতে?'

ততক্ষণে তাহারা চলিতে চলিতে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশে আসিয়া পড়িয়াছে। ভদ্রেশ্বর আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, 'খাব-দাব আর কবিতা লিখব।'

'কবিতা!' সুমন্ত্রর মনে পড়িল শৈশবে ভদ্রেশ্বর কবিতা লিখিত বটে। একবার ভূধর-বাবুর গ্রামারের ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়াছিল— 'গ্রামার ইজ দি আটা-কাটি, মেরে দিয়েছি চড়াই পাখি।' বলা বাহুল্য, সেদিন বেতের মাত্রা কিছু বেশি হইয়াছিল। আর একদিন বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের বিদায়-সভায় সে গলা কাঁপাইয়া কবিতা পড়িয়াছিল,

'সহসা নির্মলাকাশে মেঘোদয় প্রায়
আমাদের বিষ্টুবাবু নিলেন বিদায়।
কভু মিথ্যা, কভু সত্য, অন্য নাহি হয়
মিথ্যা নয়, সত্য ভাই নিলেন বিদায়।
মেরেছেন তিনি বটে আমাদের ধরে,
সে কেবল আমাদের কল্যাণের তরে।
বেত্রাঘাত করেছেন যবে মুহুর্মুহুঃ
গলে নাই চিত্ত তাঁর শুনি আহা, উহু।
'কুড়োবা কুড়োবা লিজ্যে' করিয়া প্রচার
জ্ঞাননেত্র খুলেছেন তিনি সবাকার।
আজ তিনি চলিলেন আমাদের ছাড়ি',
আর না দেখিব মোরা ওই পাকা দাড়ি।
কাঁদিছে বালকবৃন্দ বিচ্ছেদের খেদে।
গুরুভক্তি মহাধর্ম লিখিয়াছে বেদে;
অতএব বিভুপদে এই নিবেদন,
বিষ্ণুবাবু যেন আরো দীর্ঘজীবী হ'ন।

সেদিন তাহার কবিতা না দেখিয়া পড়িতে দেওয়ার জন্য হেডমাস্টার সেকেণ্ড মাস্টার মহাশয়কে ধমক দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ভদ্রেশ্বর সেকেণ্ড মাস্টারকে অন্য লেখা দেখাইয়াছিল। সবচেয়ে হাসি পাইল তাহার নিজের বাড়ির ঘটনাটা মনে পড়িয়া। সুমন্ত্রের বাবার বন্ধুরা প্রায়ই তখন তাহাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিতেন, তাহার মা তাঁহাদের যত্ন করিয়া নানারকম খাবার করিয়া খাওয়াইতেন। সুমন্ত্রর সাধ হইল সেও তাহার বন্ধুদের বাড়িতে আনিবে। মার খুব মত ছিল না, তাহার বন্ধুদের উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধাও ছিল না। নেপথ্যে থাকিয়া তাঁহার পুত্রের চুলে বালি, জামায় কালি প্রভৃতি দিয়া তাহারা তাঁহার যথেষ্ট শান্তি ভঙ্গ করিত; তবু তিনি সুমন্ত্রকে না বলিতে পারিলেন না, সেই দিনই ছুটির পর একটি বন্ধুকে সঙ্গে আনিবার অনুমতি হইল সুমন্ত্র বহু চিন্তার পর ভদ্রেশ্বরকে বাড়ী লইয়া গেল। অনেক শিখাইয়া পড়াইয়া লইয়া যাওয়া সত্ত্বেও সে এমন দুই-চারিটি মন্তব্য করিল যাহাতে মা চটিলেন। তাহারা খাইতেছে এমন সময় তাহার বাবা কোর্ট হইতে ফিরিলেন। তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছেন, রান্নাঘর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া ভদ্রেশ্বর প্রশ্ন করিল, "ঐ গুণ্ডার মতন লোকটা কে রে?" সুমন্ত্রর মা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। সুমন্ত্র মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "আমার বাবা।"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "তোর বাবা তো লাস-খানা কম নয়। সাতটা বাঘে ছিঁড়ে খেতে পারবে না। আমার বাবা মাইরি খেঁকুরে-পানা। ঠাকুরদা না খেতে দিয়ে দিয়ে আরো দফা সেরে দিয়েছে।" তারপর আর এক গাল লুচি ও আলুর দম খাইয়া বলিল, "আমি কিন্তু বড়ো হয়ে তোর বাবার মতো হব। হ্যাঁরে, তোর বাবার অত বড় দাড়ি হল কি করে রে? দাড়িতে গন্ধ-তেল মাখে বুঝি?" পরক্ষণেই বাবাকে উদ্দেশ করিয়া সুর করিয়া বলিল—

"আই অ্যাম ভেরি সরি।
বিকজ ইয়োর লম্বা দাড়ি।"

মা বলিলেন, "বাবা তোমার খাওয়া তো হয়ে গেছে; এবার তাহলে বাড়ি যাও। এ বাড়িতে আর এসো না।" তখন সুমন্ত্রর বয়স সবে দশ বৎসর; সেইদিন হইতে সতেরো বৎসর বয়সে কলেজে ঢোকা পর্যন্ত সুমন্ত্রের বাড়িতে বন্ধু আসা বন্ধ ছিল।

একে একে অনেক কথাই মনে পড়িতে-ছিল। সুমন্ত্র প্রশ্ন করিল, "তুই তাহলে এখনো কবিতা লিখিস?" তাহারা ততক্ষণে হ্যারিসন রোডের চৌমাথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভদ্রেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "লিখতে আর সময় পাই কোথায় ভাই? সকাল থেকে সন্ধ্যে দেহের পরিচর্যা খাওয়া আর আড্ডা; হয় ব্রিজ, নয় টেনিস, নয় বিলিয়ার্ড। সন্ধ্যে হল তো হয় থিয়েটার, নয় বায়োস্কোপ। বদখেয়ালী কিছু নেই, তাই এখনো দুমুঠো জুটছে, না হলে এতদিনে সব উড়ে যেত। যাক, যে কথা বলছিলুম, গিন্নী ভয়ানক চটেছে, বাড়িতে আর কবিতা লেখার উপায় নেই। একবার তার ছোটো বোনের বিয়েতে আমাকে পদ্য লিখতে বলে। আমার মাথায় তখন অন্য একটা কবিতা ঘুরছে—'কাঁকুড়ের প্রেম।' সবেমাত্র কয়েক লাইন লিখেছি,—

হায়!
কি হবে উপায়!
বদ্যিবাটী-লোক্যালের বক্ষ হতে নেমে
কুমড়ো পড়িয়া গেল একদিন কাঁকুড়ের প্রেমে
করোলা পটোল উচ্ছে—
সে সংবাদ জানিল না কেহ
ঈর্ষায় মরিল ফাটি'—

'ফুটি' শুধু করিয়া সন্দেহ

ফ্যাকাসে মারিল কচু—

লঙ্কা হল আরক্ত লজ্জায়।

রহিল না গুরুলঘু জাতিধর্ম যায় সব যায়।"

এমন সময়ে এসে বললে, এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলুম, পরশু অণিমার বিয়ে। চট করে একটা কবিতা লিখে দাও তো, কালকেই যাতে ছাপিয়ে নিতে পারি। কবিতা যেন গাছের ফল পেড়ে দিলেই হল। আমি যত বলি এখন মাথায় আসছে না, কিছুতে শুনবে না। তখন লিখে দিলুম—

'অণিমা তোর বিয়ে হল

হল একটা মস্ত কাজ।

কেলে ধেড়ে মেয়েগুলোর

বিয়ের ভাবনা ঘুচল আজ।'

সেই থেকে ভাই, গিন্নী এক মাস আমার সঙ্গে কথা কয়নি।

সুমন্ত্র বলিল, "সে তো পুরোনো কথা। সম্প্রতি কি হল?"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "আসছি, আসছি, পরিস্থিতি না কি বলে তোদের, সেটা বুঝতে হলে 'কণ্টেক্সট' একটু না জানলে হবে কি করে? তারপর আর একদিন বর্ষার রাত্রে আর এক কাণ্ড! বিদুষী বৌয়ের বিচিত্র ফরমাস। বললে, 'মন্দাক্রান্তা ছন্দে একটা কবিতা লেখো,—খুব করুণা করে।' কি করি? ফরমাসী কবিতা আসে না, তবু কষ্টে সৃষ্টে লিখলুম—

'বঙ্গের সন্তান, ভেবোনা অকারণ

ভাবলে পুরে কার মনস্কাম!

এন্তার পান্তায় লবণ মেখে লও

আপনি বাঁচলেই বাপের নাম!

ষষ্ঠীর দৃষ্টির অভাব হবে না;

পত্নী, প্লীহা আর পাওনাদার,—

যদ্দিন বাঁচবে ছাড়বে নাকো ভাই

মিথ্যা চিন্তায় কি ফল তার?'

গিন্নী তারপর দু মাস আমার সঙ্গে কথা কইলে না, বায়োস্কোপে গেল না, পার্টিতে গেল না, ঘরে বসে আরও আধ মণ ওজন বাড়িয়ে ফেললে।"

ম্যাট্রিক ফেল হইলে কি হইবে, ভদ্রেশ্বর বাড়িতে বসিয়া তাহা হইলে কাব্যচর্চা ভালোরূপেই করিয়াছে।

সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "তারপর শেষ কি ঘটেছে সেই কথা বল? বাড়ি ছাড়বি কেন? গিন্নী তো দেখছি তোর কবিতার খুব ভক্ত; না হলে তোকে বারবার কবিতা লিখতে বলে? তুই নিজের দোষেই তো তাঁকে চটিয়ে দিস। আজ আবার ঐ রকম কবিতা লিখেছিস বুঝি?"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "সে আর বলিস নি। আমার মেজো শালী তনিমা কাল বিকেলে জব্বলপুর থেকে এসেছে তার দেওরকে সঙ্গে নিয়ে, দিদির সঙ্গে দেখা করতে। তার রংটা একটু ফরসা, অণিমার মতো কালো নয়। আমার সঙ্গে দেখা হতেই শালীর নাকটা একটু ওপর দিকে উঠে গেল, এই সিকি ইঞ্চিটাক। মনটা বড়োই খারাপ হ'য়ে গেল। কি ক'রব অতিথি, তা'তে শালী! চুপ ক'রে গেলুম। আজ সকালে ঘরে কেউ নেই, গিয়ে দেখি খাটের ওপর একটা প্যাড আর একটা ফাউণ্টেন পেন পড়ে। বোধ হয় বরকে চিঠি লেখা হয়েছে একটু আগে। ভাবলুম, দু' ছত্র প্রাণের কথা লিখে রেখে যাই। তা' ছাড়া সম্পর্কে শালী, দোষ কি?

লিখলুম—এবার ম'রে 'তনি' হ'ব।

বড়ো বোনের ঠাকুরপোটা কালো মোটা, তা'কে দেখে নাক সিঁটকাব।

'ঠাকুরপোটা'টার পাশে অ্যাস্টারিস্ক দিয়ে তলায় লিখে দিলুম 'ঠাকুর=শ্বশুর, ঠাকুরপো=স্বামী।"

সুমন্ত্র বলিল, "তারপর?"

"তারপর আর কি? দুপুরে ঝি এসে ডেকে নিয়ে গেল; গিয়ে দেখি দুই ভগ্নী বিচারাসনে সমাসীন। আমাকে দেখে ছোটোর ঠোঁট দুটো এবং নাকটা ঈষৎ কেঁপে উঠল, চোখের নৈঋত কোণ দিয়ে আধ ফোঁটা জল গালের ওপর গড়িয়ে এল। তাজমহলের সঙ্গে মিল আছে কি না বোঝবার চেষ্টা করছি, ওমা! কোথাও কিছু নেই, গিন্নী 'অসভ্য, ইতর, ছোটোলোক'—এইসব যা'তা ব'লে গালিগালাজ করতে আরম্ভ ক'রলে। যত বলি 'অপরাধ হয়েছে, মাফ করো' তত আরো বাড়িয়ে চলে। ব'লে—'আমার গলায় দড়ি জোটে না, তাই তোমায় বিয়ে করেছিলুম। যেমন বিদ্যে, তেমনি বুদ্ধি।' ইংরিজি, বাঙলা কত কি যে ব'ললে ভাই, অর্ধেক কথার মানেই বুঝতে পারলুম না। দু'বচ্ছর কলেজে পড়েছে কি না, কথায় কথায় ইংরিজির বুকনি ঝাড়ে। শেষে ব'ললে 'হয় এ বাড়িতে তুমি থাকবে, না হয় আমি থাকব। তোমার মতো ছোটোলোকের সঙ্গে কোনো ভদ্র মহিলা এক বাড়িতে থাকতে পারে না।' আমিও শেষে দুত্তোর, তুমিই থাকো, আমি চললুম ব'লে বেরিয়ে এসেছি। ভাবছি, সুখ তো ঢের হ'ল এইবার বাকি জীবনটা আলাদা কোথাও গরিবী চালে শান্তিতে থাকব। তুই একটা বাড়ি দেখে দে দিকি।"

ভদ্রেশ্বর তাহা হইলে নিতান্ত অপমানিত হইয়া এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে? কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া কে বলিবে—তাহার মনে কোনো দুঃখ আছে? পাইস হোটেলে খাওয়াটা অর্থাভাবে নয় তো? সুমন্ত্র চক্ষুলজ্জা ছাড়িয়া বলিল "পকেটে টাকা আছে তো? না থাকে তো বল, গোটা কয়েক ধার দিতে পারি।"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "আমি কি তেমনি কাঁচা ছেলেরে? দেখা করতে যাবার সময় চেক বুক আর এক গোছা নোট পকেটে ভ'রে নিয়েছি। জানতুম, ব্যাপার কিছু দূর গড়াবে। অবশ্য এতদূর গড়াবে তা' ভাবিনি। তুই একটা ব্যবস্থা কর ভাই, এর তার বাড়ি ভেসে বেড়ানো ক'দিন চলে?" সুমন্ত্র বলিল, "তোর তো শ্মশান বৈরাগ্য, কালকে তোর স্ত্রী এসে 'তু' ক'রে ডাকলেই ছুটে যাবি। তখন বাড়ি কি হ'বে? আমি বলি কি বাড়ি না কিনে উপস্থিত একটা মেসে চল। জানা আছে।" ভদ্রেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না ভাই, মেসে বড্ড লোকের ভিড়। আমি ভিড় আর সইতে পারছি না, দিন কতক নির্জনে থাকতে চাই।"

সুমন্ত্র বলিল, "তা' হ'লে একটা বাড়ি ভাড়া কর ছোটো দে'খে। আমার বাড়িতে অবশ্য থাকতে পারতিস দিন কতক।"

কথাটা বলিতেই তাহার পরলোকগতা মাতার কথা মনে পড়িল। ভদ্রেশ্বরেরও বোধ হয় অতীতের একটা দৃশ্য মনে পড়িয়াছিল, বলিল, "না ভাই, সে বাড়িতে আর নয়।" তারপর ম্লান হাসিয়া বলিল "আমার কবিতাই দেখছি আমার শনি।"

সুমন্ত্র এই সুযোগে অপ্রিয় সত্য কথাটা শুনাইয়া দিল, "তোর কবিতা নয়, তোর মাত্রাজ্ঞানের অভাব। যাক, তা হ'লে কি করবি বল?"

"তা' তুই যখন বলছিস তখন দিনকতক না হয় বাড়ি ভাড়া ক'রেই দেখি একটা। কি রকম পড়বে মাসে? একশ?"

সুমন্ত্র বলিল, "একা থাকবার জন্য একশ' টাকার বাড়ির কি দরকার, পঞ্চাশেই হবে।"

ভদ্রেশ্বর বলিল, "সিগারেট খাস?" সুমন্ত্র ঘাড় নাড়িল। "এখনো সেই গুড বয় আছিস?" বলিয়া একটা মূল্যবান সোনার সিগারেট কেস হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতে ধরাইতে ভদ্রেশ্বর বলিল, "কেমন ফস্ ক'রে একশ' টাকা ব'লে ফেললুম, বল দিকি! আমার ঠাকুরদা কুড়ি টাকা বার ক'রতে হ'লে চোখ কপালে তুলত, বাবা পঞ্চাশ টাকা বার করতে বার দুই মাথা চুলকোত। আমার হাজার টাকার চেক কাটা অভ্যেস, শ'য়ের নীচে এখন নামতে মনটা খুঁত খুঁত করে। নিজেকে তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়নি, কি বল?" ভদ্রেশ্বরের কথাবার্তার শ্রী নাই, কিন্তু মনটা সরল। সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "ছ' মাসের ভাড়া বার কর আগে। তোর দু'দিন পরে মত ব'দলে যাবে, আর আমি মাঝ থেকে বাড়িওয়ালার কাছে অপ্রস্তুত হ'ব। ও সবের মধ্যে আমি নেই।"

ভদ্রেশ্বর মনিব্যাগ বাহির করিয়া তিনখানি একশত টাকার নোট সুমন্ত্রর হাতে দিল। তারপর বলিল, "তোর দালালী?"

সুমন্ত্র বলিল,—"সে বাড়ি যখন কিনবি, তখন দেখা যাবে। ভাড়া করার জন্যে আবার দালালী কিসের?" ভদ্রেশ্বর বলিল, "সে হয় না ভাই? তুই ভালো মানুষ লোক, তোকে শুধু শুধু আমি খাটাতে চাই না। মজুরি ব'লে না নিস, বন্ধুর উপহার ব'লে কিছু কিনে নিস; এই একশ' টাকা রাখ।" সুমন্ত্রর মনটা খুঁত খুঁত করিতে লাগিল, তথাপি অবস্থা বিবেচনা করিয়া টাকা রাখিল। ভদ্রেশ্বর বলিল, "তোর বাড়ির খবর ব'ললি না? কে কে আছেন এখন? বিয়ে করেছিস? ছেলে মেয়ে ক'টি? তোদের তো অবস্থা ভালোই ছিল,—পাইস হোটেলে কেন?"

সুমন্ত্র বলিল—"বাবা, মা মারা গেছেন। বিয়ে করিনি। কি করি

কোথায় থাকি তার ঠিক নেই, কেন আর একটা কুঞ্জের জীবকে কষ্ট দিই? বাড়িটা আছে, বাইরের দিকে দু'খানা ঘর ভাড়া দিয়েছি, পাইস হোটেলের খরচটা চ'লে যায়।" ভদ্রেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, কোনো মন্তব্য করিল না। বলিল, "তা হ'লে তিনদিন পরে বিকেলে আসছি, বাড়ি থাকিস। আর দ্যাখ, এই চিঠিখানা কাউকে দিয়ে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারিস? না, না, নিজে যাস্‌নি, জেরায় পড়ে সব ফাঁস ক'রে ফেলবি। অসময়ে দেখা হ'ল, তোকে দেখাতে পারলুম না, লাখ টাকা দিয়ে বাড়িখানা যা করেছি মাইরি! বৌয়ের বড়ো সাধ ছিল। ছকু খানসামার লেনের বাড়িটার জন্যেও মন কেমন করে মাঝে মাঝে, কিন্তু উপায় ছিল না ভাই। সেই পৈতৃক দরজাগুলিতে আমাদের আধুনিক ক্ষীণ দেহগুলি কত না।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সুমন্ত্রর হাতে একখানা খাম এবং নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর লেখা একটা কার্ড ছিল। বলিল, "এখন বৈদ্যবাটী চললুম। সেখানে আমার এক দূর সম্পর্কের দিদিমা আছেন, খুব ভালোবাসেন আমাকে। ছোটো বেলায় তাঁর বাড়ি প্রায়ই যেতুম, সরু চাকলি, গোকুল পিঠে কত কি যে খেতুম! এখন আর গরীব লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার উপায় নেই তো, তাই অনেক দিন যাওয়া আসা নেই। লুকিয়ে টাকা পাঠিয়েছি অবশ্য মাঝে মাঝে। এরা তাঁর ঠিকানা কেউ জানে না, বাড়ি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত সেইখানেই অজ্ঞাতবাস ক'রব ভাবছি। দু'বেলা পুকুরে নাইব আর তাঁর হাতের রান্না খাব, সুক্তো, চচ্চড়ি, ছ্যাঁচড়া"—ভদ্রেশ্বর কল্পনা নেত্রে তাহার ভবিষ্যৎ সুখের চিত্র দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বাস্তব জগতে নামিয়া আসিল। বলিল—"দ্যাখ যদি কোনো দরকার লাগে, ঠিকানাটা রেখে দে।" একখানা ট্রামের টিকিটের উল্টা পিঠে বৈদ্যবাটীর ঠিকানা লিখিয়া দিয়া বলিল, "খবরদার, নেহাৎ বিপদে না পড়লে আমার ঠিকানা কাউকে দিবি না। বলবি কাশী গেছে, কি গঙ্গায় ডুবে মরেছে, কে জানে? কাঁদুক এখন দিনকতক।" একখানা হাওড়াগামী চলন্ত ট্রাম থামাইয়া ভদ্রেশ্বর তাহাতে উঠিয়া বসিল। খানিকটা এসেন্সের গন্ধ কিছুক্ষণের জন্য বাতাসে তাহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিল।

টাকাগুলি ভিতরের পকেটে রাখিতে রাখিতে সুমন্ত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তারপর ভাবিল, এখন কি করা যায়? দিনকতক কাঁদাইবার ইচ্ছাটা যে ভদ্রেশ্বরের আন্তরিক নয় তাহা তাহার কথার ভাবেই সে বুঝিয়াছে। বাড়ি ভাড়ার চেষ্টায় বাহির হওয়ার পূর্বে ভদ্রেশ্বরের স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়াটা তাহার কর্তব্য বোধ হইল। দূত করিয়া পাঠাইবার দ্বিতীয় লোক ছিল না, সুতরাং সেও পাঁচ মিনিট পরে ট্রামে চড়িয়া বসিল।

সুমন্ত্র যখন সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ে পৌঁছিল, তখন বেলা দুইটা। বাড়ি চিনিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হইল না, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ, বৃত্ত প্রভৃতির বিচিত্র সমাবেশে গঠিত সে যেন একখানি মূর্তিমতী জ্যামিতি! হঠাৎ-বড়োলোকের চেয়ে হঠাৎ-সভ্যেরা আরও সাংঘাতিক, নিজের অজ্ঞাতসারে আচারে-ব্যবহারে বেশে-বাসে তাহারা অপরের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আঘাত না করিয়া পারেনা। ভদ্রেশ্বরের বাড়িখানার উগ্রবিদেশী গঠন পথচারীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা'ছাড়া ফটকের একদিকে মিস্টার বি. কুণ্ডুর নাম এবং অপরদিকে বাড়ির 'রত্নগিরি' উপাধি পিতলের ফলকে খোদাই করা কালো অক্ষরে লেখা থাকায় সুমন্ত্র নির্ভয়ে ফটকে গিয়া দাঁড়াইল। দরোয়ান ফটকের পাশে ছোটো ঘরটিতে বসিয়া খৈনি টিপিতেছিল, স্থানত্যাগ না করিয়াই বলিল, "কেয়া মাংতা?" সুমন্ত্র পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া বলিল "সাহেব কো চিঠ্‌ঠি হ্যায়, মেমসাব কো দে দেনা।" সাহেবের চিঠি শুনিয়া দরোয়ান শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, "আইয়ে বাবুসাব, ভিতর আইয়ে। সাহেব আভি হ্যায় কাঁহা বাবু? হামলোক তো ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে থক গয়া!" বলিতে বলিতে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে ভিতরে ছুটিল, একবার মুখ ফিরাইয়া বলিয়া গেল "আপ বৈঠকখানামে জেরাসা ঠহর যাইয়ে। ম্যায় আভি আতা হুঁ।"

সুমন্ত্র ভাবিয়াছিল কাজ সারিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু বাড়িতে আসিয়া গৃহিণীর সহিত দেখা না করিয়া যাওয়াটা অভদ্রতা হইবে মনে হইল। সে বাহিরের ঘরে ঢুকিবার মুখে একবার ভাবিল জুতাটা খুলিবে কি না, কিন্তু সেটা বিলাতী রীতি বিরুদ্ধ হইবে ভাবিয়া জুতা শুদ্ধ পায়ে মূল্যবান গালিচা মাড়াইয়া একটা কোচে গিয়া বসিল। ঘরে কোচ টেবিল কেদারার অরণ্য, সমস্তই ঝকঝকে পালিশ করা মেট্রো প্যাটার্নের খাড়া খাড়া খাঁজ খাঁজ কাটা গঠনের। একজন মধ্য বয়সী দাসী আসিয়া সুইচ টিপিয়া ইলেকট্রিক ফ্যানটা চালাইয়া দিল এবং বিনীতভাবে বলিল, "মেমসাহেবকে চিঠি পাঠিয়েছি একটু বসতে হবে।"

সুমন্ত্র বসিয়াছিল, তাহার দৃষ্টি ঘরের চারপাশে ঘুরিতেছিল। দেওয়ালের ধারে ধারে আলমারিগুলি নানা জাতীয় বাঁধাইকরা মূল্যবান পুস্তকে বোঝাই, তাহার মধ্যে ইংরেজী, বাঙলা, সংস্কৃত সবই আছে কিন্তু সেগুলি এতই নূতন যে, দেখিলে সন্দেহ হয়, কেহ কোনোদিন সেগুলিকে খুলিয়া দেখিয়াছে কিনা। ঘরের চার দেওয়ালে চারটি বড়ো তৈল-চিত্র। একদিকে রত্নেশ্বর কুণ্ডু একখানি মোটা ইংরাজী বই হাতে করিয়া বসিয়া আছেন, আর একদিকে তাঁহার পিতা একটি কাশ্মীরী শালের মধ্য হইতে হাত বাহির করিয়া হরিনামের মালা জপ করিতেছেন। ধনেশ্বর কুণ্ডুর পরিচিত ব্যক্তিরা ছবি দেখিয়া চিনিতে পারিবে না, কারণ জীবিত অবস্থায় তিনি কখনও ফটো তোলান নাই। শ্মশানঘাটে তাঁহার যে ছবিটি রত্নেশ্বর তোলাইয়াছিলেন সেইখানি হইতেই চিত্রকর-বেচারীকে জীবিত মানুষটিকে উদ্ধার করিতে হইয়াছে, ফলে তাঁহার মুখ হইতে মৃত্যুর ছাপ সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। তাঁহার বহু কষ্টার্জিত অর্থের অপব্যবহার দেখিতে চান না বলিয়াই যেন তিনি আড়ষ্ট শিবনেত্র হইয়া আছেন। তাঁহার গায়ের শালটিতে চিত্রকর অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, তিনি জীবিতকালে তাঁহার অর্থে কেনা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ আত্মহত্যা করিতেন। ভদ্রেশ্বরের ছবিটিই সবচেয়ে ভালো হইয়াছে, কেবল চিত্রকর আদর্শকে খুশি করিবার জন্য অল্প একটু আদর্শচ্যুত হইয়াছেন, তাহার রংটা দুই-তিন পোঁছ ফরসা করিয়া দিয়াছেন। তাহার ছবির সামনাসামনি ঘরের অপর দিকের দেয়ালে একটি তন্বী তরুণীর ছবি। সেটিকে ভালো করিয়া দেখিবার অবকাশ সুমন্ত্র পাইল না, ছবির ঠিক তলায় ভিতর দিকের দরজার পরদাটা ঠেলিয়া ছবির জীবন্ত আদর্শ স্বয়ং আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভদ্রমহিলা বেশ স্থূলকায়া, অর্থাৎ দোহারার চেয়ে কিছু বেশি মোটা; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, মাথার ঘোমটা খোঁপার একপ্রান্তে ঠেকিয়া আছে। দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতে বোধ হয় একটু হাঁফাইয়া পড়িয়াছিলেন, উত্তেজনায় কণ্ঠস্বরও একটু যেন কাঁপিতেছিল। নমস্কার করিয়া বলিলেন "আপনি কে? এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন? যিনি দিয়েছেন তিনি এখন কোথায়? তাঁকে আপনি কতক্ষণ আগে কোথায় দেখেছেন?" সুমন্ত্র বলিল "আমি ভদ্রেশ্বরের বাল্যবন্ধু, আমার নাম সুমন্ত্র সেন।" ভদ্রমহিলা বলিলেন, "আপনার নাম ওঁর কাছে শুনেছি, আলাপ হ'য়ে সুখী হলুম। কিন্তু এ চিঠির অর্থ কি মিস্টার সেন? তিনি কি নেই?"

সুমন্ত্র এতক্ষণে চিঠিখানা দেখিবার সুযোগ পাইল। ছোটো একটা স্লিপ কাগজে লেখা, "তুমি যখন এ চিঠি পাবে তখন আমি বহুদূরে। খোঁজবার চেষ্টা কোরো না, এ জীবনে আর সাক্ষাৎ হবে না। সুখী হোয়ো, ক্ষমা করবার চেষ্টা কোরো।"

সুমন্ত্রর ভীষণ হাসি পাইতেছিল, তাহার ছদ্মগাম্ভীর্য সেইজন্য বোধ হয় প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়া গেল। ভদ্রমহিলা আবার বলিলেন, "এর অর্থ কি মিস্টার সেন? তিনি কি আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন?"

সুমন্ত্র বিনীতভাবে বলিল, "কি ক'রে ব'লব বলুন? আমায় চিঠিখানা দিয়ে কোথায় যে গেল"—

ভদ্রমহিলা বলিলেন—"আমার কথাগুলো

একটু কড়া হয়েছিল বটে, তবে তার কারণটা শুনলে আপনি আমার ওপর রাগ করতে পারতেন না। তাই ব'লে তিনি আত্মহত্যা"— ভদ্রমহিলার চোখে জল আসিল।

সুমন্ত্র বলিল, "আত্মহত্যা হয়তো ক'রবে না। যতদূর মনে হ'ল সন্ন্যাসী হ'বার চেষ্টায় আছে। আমার কাছে কাশীর ভাড়া কত জিজ্ঞেস ক'রছিল"—

ভদ্রমহিলা নৈশ্চিন্ত্যের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বললেন, "আপনি বাঁচালেন। কাশীর ট্রেন কটায় বলুন তো? স্টেশনে আটকানো যায় না? মোটরে গেলে?"

সুমন্ত্র ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল "দুটোর গাড়ি ধরবে ব'লে বোধ হয় বেরিয়েছে। হ্যাঁ, হাওড়ার ট্রামেই তো উঠল। নাঃ, স্টেশনে তাঁকে পাবার আশা নেই।"

ভদ্রমহিলা বলিলেন—"আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, আপনাকে অনুরোধ করাটা আমার অন্যায়। তবু না ব'লে উপায় নেই। আমি বড় বিপন্ন, সুদিনের বন্ধু আমার অনেক আছেন, দুর্দিনের বন্ধু আপনাকে ছাড়া কাউকে দেখছি না? আপনার কি আমার সঙ্গে কাশী যাওয়ার সুবিধা হবে?"

সুমন্ত্র ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "আমাকে মাফ করবেন। কাশী যাওয়া আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়; হাতে অন্য জরুরী কাজ আছে।"

ভদ্রমহিলা বলিলেন, "দেখুন আমি আপনাকে কোনোরকম ইনকনভিনিয়েন্সের মধ্যে ফেলতে চাই না, কিন্তু আপনার ফ্রেন্ড আমাকে যে রকম অকোয়ার্ড পোজিশনে ফেলে গেছেন, তাতে নিজের কোনো রিলেটিভের কাছে হেল্প্ চাইতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। আমার সিস্টার তো আজই চ'লে যেতে চাইছিল, আমি অনেক ব'লে ক'য়ে তা'কে ডিটেন ক'রে রেখেছি। অবশ্য আপনার যাওয়া যদি একান্ত পসিব্ল্ না হয় তা'হলে আমাকে অন্য উপায় দেখতে হবে।"

সুমন্ত্র বলিল, "আপনি অকারণ ব্যস্ত হবেন না।"

মিসেস কুণ্ডু বলিলেন, "বলেন কি মিস্টার সেন"—

সুমন্ত্র বলিল, "আমাকে সুমন্ত্রবাবু ব'লে ডাকলেই খুশি হ'ব।"

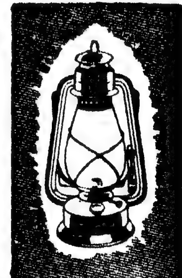
"বেগ ইয়োর পার্ডন্, সুমন্ত্রবাবু, মিস্টার কুণ্ডু এই মুহূর্তে কোথায় না কোথায় পথে পথে বেড়াচ্ছেন,—না খেয়ে না দেয়ে কোন গাছতলায় হয়তো প'ড়ে আছেন,—আর আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে,—না, না, মিস্টার সেন, আই মিন সুমন্ত্রবাবু,—সে আমি পারব না। আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দে'ব ভাবছি। আচ্ছা, আপনার কোনো প্রাইভেট ডিটেক্টিভ এজেন্সীর সঙ্গে পরিচয় আছে? হাজার টাকা পুরস্কার অফার করলে কি রকম হয়?" সুমন্ত্র বলিল, "আমার কথা শুনুন, হৈ চৈ ক'রলে কোনো ফল হবে না। সে আমাকে খবর দেবে ব'লে গেছে, খবর পেলেই আমি আপনাকে জানাব। আপনার স্বামীর নিরাপত্তার জন্য আমি দায়ী রইলুম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" সুমন্ত্র নমস্কার করিয়া মিসেস কুণ্ডুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া এবং নিজের ঠিকানা না দিয়াই দ্রুত বাহির হইয়া আসিল। (ক্রমশ)



সাত লক্ষ গ্রাম

আলোকিত করুন

কোটি কোটি মানুষের হৃৎস্পন্দন বুকে ক'রে ভারত যদি কোথাও জেগে থাকে ত সে তাঁর সাতলক্ষ গ্রামের নিভৃত অনাড়ম্বর পরিবেশে, বড় বড় শহরের জাঁকালো প্রাচুর্য্যের মধ্যে নয়। সূর্য্যাস্তের পর থেকে গ্রামগুলি আলোর অভাবে ম্রিয়মাণ হ'তে হ'তে ক্রমে ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়—মনে হয়, এ-যেন কোন্ অন্ধকারের রাজ্য! এই লক্ষ লক্ষ গ্রাম আলোকিত করবার মহান্ উদ্দেশ্যই রয়েছে 'দীপ্তি' লণ্ঠন প্রস্তুতকারীদের প্রচেষ্টার মূলে।



দীপ্তি

হ্যারিকেন লণ্ঠন

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ

জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা

BDL10/547

সাহিত্য প্রসঙ্গ

কাব্য চিরন্তনত্ব

সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত

দূর অতীতের কোন মানুষ অতর্কিতে আজকের জগতে এসেছে ভাবা যেতে পারে—বিস্ময়ে সে শুধু স্তম্ভিত। কি নয়নস্তম্ভন পরিবর্তন তারই প্রাচীন পৃথিবীর সকল দিগন্ত আচ্ছন্ন করেছে। আমরা দূর অতীতের জীবনধারা বিষয়ে অস্পষ্ট ও আনুমানিক কল্পনায় মগ্ন হতে পারি; বর্তমানের জীবনের চাঞ্চল্য ও প্রগতি দূর কালের আদিম মানুষ ধারণায় আনতে পারবে না।

এক-ই মানুষ। অতীতের ও বর্তমানের। কিন্তু কত বিভিন্ন! সেই প্রাচীন পৃথিবী, কিন্তু জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে, গতি ও ব্যাপ্তিতে যেন নবজীবনের নববিধান ঘোষিত। এ হল ব্যবহারিক জগত, যেখানে বিবর্তনের সুর বিস্তৃত ও বিধৃত; কাব্য ও সাহিত্য জীবনের জয়গানে দীপ্ত—তাই বিবর্তনকে সার্থকতার পথে নেবার প্রচেষ্টা সেখানেই সর্বাপেক্ষা ভাস্বর।

ইতিহাসকে আশ্রয় করে যেটুকু অতীতের ইতিবৃত্তকে আমরা নিশ্চয়তার ভিত্তিতে গড়ে' তুলতে পারি, তাতে দেখা গিয়েছে সময়ের প্রভাব ও বাস্তব অবস্থা আমাদের ভাবনাকে অনেকাংশে করেছে নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য এ থেকে এমন অনুমান অসংগত হবে যে মানুষ, অবস্থার আজ্ঞাবাহী দাসানুদাস। মানুষের সক্রিয়তা ও সচেতনতা তাকে পৃথক করেছে জীব-পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণী থেকে; তাই কেবলমাত্র তার ভাবনাই জীবনের ও জগতের রূপান্তর ও অবস্থান্তর সম্ভব করেছে ও করছে। বাস্তব যেমন ভাবনাকে রঞ্জিত করছে, ভাবনাকে আশ্রয় করেই বস্তুজগত তেমন পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

বাস্তব অবস্থার প্রভাব-প্রসংগে সমাজ ব্যবস্থার প্রশ্ন আসে। অতীতের ছোট ছোট স্বল্পায়তন রাষ্ট্রেও সমাজ-ব্যবস্থা সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি যোগ্য বিচার করে উঠতে পারেনি—সেই অনাদৃত জনসমাজের সমস্যার জের আজো পর্যন্ত মূর্ত। ইতিহাস ত বহু শতাব্দীর পথসংকেত অতিক্রম করে এগিয়ে এসেছে—কিন্তু সকল ব্যক্তির আত্মবিকাশের রাজপথ ত রচিত হয়নি।

রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র নানা দেশের ইতিহাসে কখনো স্বতন্ত্র-রূপে, কখনো একাধিক তন্ত্রের যুক্তরূপে প্রকাশিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও লোলুপতা আরো কত অন্যায় অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এ দীর্ঘ ইতিবৃত্তের প্রতি অধ্যায়েই মানুষকে তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হয়েছে—কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার প্রভাবকে মানুষ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। অনেক মহৎ আদর্শের মন্ত্র বিশ্বের নানা প্রান্তে আদিকাল থেকেই ধ্বনিত হয়েছে; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাদের সংকীর্ণতম প্রয়োগও যেন সার্থক হয়নি। কাজেই অতীতের সে মন্ত্রে সাহচর্যের একটি পরিপূর্ণ রাগ ধ্বনিত হয়নি। অবস্থার শৃঙ্খলে বন্দী অসংখ্য মানুষের ক্রন্দন আজো আমাদের শুনতে হচ্ছে। তবু অতীতের তুলনায় আজকের মানুষের বিকাশের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত—অতীতের পাশে বর্তমানের যেটুকু বিস্তৃতি সেটুকুই মানুষের বিবর্তনের সাক্ষ্য। যে-ব্যক্তি সমাজের ভৃত্য, নৃপতির আজ্ঞাবাহী, রাজন্যের অনুচর, অভিজাতের পদলেহী—সে আজ নিজের শক্তিকে জাগ্রত করবার স্বপ্ন দেখছে, প্রতি মানুষ আজ তার নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে যেন সচেতন, আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষায় যেন চঞ্চল।

মানুষের সমাজ ব্যবস্থার রূপ নিশ্চয়ই সর্বকালের এক নয়। মানুষের উদ্ভাবন, তার চিন্তা ও কর্ম, ব্যবহারিক জগৎকে করেছে রূপান্তরিত; জীবনকে সার্থকতর করে তোলবার জন্য সে বেঁচে থাকার নতুন নতুন অস্ত্র ও উপাদান করেছে আবিষ্কার। পূর্বের অবস্থায় সে এনেছে বিপ্লব। তার চিন্তা ও কর্মের নূতনত্বে মানুষ প্রাচীন পৃথিবীকে দেখেছে সজীব ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে, সে নব-পরিচয়ে জেনেছে মানুষকে; মানুষের সাহচর্য নবরূপে হয়েছে উদ্ভাসিত। মানুষ ও মানুষের পরিচয়ের রূপ বদলেছে তাই প্রতিদিন—অপরিবর্তনীয় অবস্থায় এক স্থানে দাঁড়িয়ে নেই সামাজিকতার রূপ।

মানুষের পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের সংগে তাই তার চিন্তার ভিত্তিমূলও বদলেছে। এ বাস্তবিকতার সত্যকে অস্বীকার করা চলে না। বাস্তবিকতার ক্ষেত্রে মানুষের প্রধান সমস্যা তার প্রাণধারণের, অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা তাই সমাজ ব্যবস্থায় বড় প্রভাব রাখছে এবং এক অর্থে সে বিজ্ঞান আমাদের জীবনের মূল সমস্যাকে স্পর্শ করেছে। এ মূল সমস্যার সার্থকতম সমাধানের শেষেই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক জীবনের শুভারম্ভ। জীবনযাত্রা প্রণালীর নব নব উদ্ভাবন আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তিমূলকে করেছে রূপান্তরিত; প্রকৃতিকে মানুষ যত বেশী তার আয়ত্তাধীন ও আপনার করেছে, ততই সাংস্কৃতিক জীবনের বিস্তৃত বিকাশের সম্ভাবনা আমাদের দৃষ্টিপথে স্পষ্ট হয়েছে।

কাজেই জীবিকা নির্বাহের সমস্যার সংগে জীবনের অন্যান্য সমস্যা অনেক পরিমাণে যুক্ত। জীবন ও জীবিকার অচ্ছেদ্য ও অপূর্ব সংযোগকে অস্বীকার করবার নির্লজ্জ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছে আজকের পরজীবী, দ্বিধা-হীন নির্দয়তায়। তাদের রচিত সমাজবিন্যাসে মানুষ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একে অন্যের শত্রু হয়ে পড়েছে, প্রতি মানুষকে তার বৃহৎ ভূমিকা থেকে করা হয়েছে বঞ্চিত—সমগ্র সম্পূর্ণত্ব বোধ তাই জাগ্রত হয়নি। কাব্যকে এই বহু বিচ্ছিন্ন জীবনের মঞ্চেই স্থান নিতে হয়—সমগ্র জীবনবোধের সার্থক চিত্র তাই সেখানে পাওয়া যায় না। অনেক সময়েই কাব্যের স্বপ্নপ্রয়াণ ঘটে সংকীর্ণতম শ্রেণী-প্রকোষ্ঠে অথবা কোন ব্যক্তিবিশেষের খণ্ডিত ও বিকৃত রুচির করে পোষকতা।

অবকাশের বায়ুস্তরে ভেসে প্রাচীনকালের মহামানবেরা মাঝে মাঝে অভীপ্সার উজ্জ্বল মন্ত্র বা মহত্তর জীবনের সংগীত শুনিয়েছেন—অথচ তাদেরি অবকাশ সম্ভব করতে সহস্র দাসানুদাস পশুজীবন যাপন করেছে। মহত্তর জীবনের সামান্য সুরের রেশ তাদের শ্রবণগোচর হয়নি। সময় ও বিষয় থেকে সম্পর্কচ্যুত ও স্বতন্ত্র ক'রে দেখলে, অতীতের অনেক মন্ত্র ভাস্বর মনে হ'লেও তাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়নি; কাব্যও তাই সংকীর্ণ জীবনের পরিধির মধ্যে ওঠা-নামা করেছে।

মাঝে মাঝে এ বহু-বিভক্ত সংকীর্ণ জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে তাই নিশ্চিত হয়ে পড়েন, এ সংকীর্ণজীবনকে সমাধিস্থ ক'রে এক বৃহত্তর জীবনের প্রয়াস যে জাগ্রত হয়ে উঠেছে এসত্যে অনেক নৈরাশ্যবাদী তাই বিশ্বাসী নন; কিন্তু তাতে ক'রে সমাজ-প্রগতিকে অস্বীকার করা যায় না।

সামাজিক প্রগতির নিদর্শন কি, তার মানদণ্ডই বা কি—এজাতীয় প্রশ্ন এখানে করা চলে। অথবা প্রশ্ন হ'তে পারে মানুষের জন্মগত যে মূল ভাববৃত্তি বা আবেগ, প্রেম, ঈর্ষা, অনুরাগ, বিরাগ, সন্দেহ, বিদ্বেষ, ক্রোধ ও ভয়—তাদের প্রকৃতি সহস্র সহস্র বৎসরের বিবর্তনে কিছু কি পরিবর্তিত হয়েছে? অনেকে এমনও বলে থাকেন, যে আমূল ও

বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আমরা আজকের জগতে প্রত্যক্ষ করছি সে-ত কেবলমাত্র আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিমণ্ডলের পরিবর্তন, যেন মানসিকতার ক্ষেত্রে বা প্রাণ-মন ও বুদ্ধির জগতে একই শাশ্বত আবেগে আমরা আন্দোলিত হচ্ছি!

যে-মানুষকে নিয়ে আমাদের ইতিহাস শুরু, সে আজো পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে প্রকৃতির সংগে সংগ্রামে ও সহযোগিতায়—যতই সে প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনতে পেরেছে, ততই তার জীবন-সংগ্রাম হয়ে এসেছে সহজ। অরণ্যচারী মানুষের হিংস্রতা বা বন্যতা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি—সেদিন জীবন-সংগ্রামের কঠিন তীব্রতায় মানুষের ভাবাবেগ তত সহজ ও ভদ্র হ'তে পারেনি; আজকে সভ্য-জীবনে যেটুকু বিনীত ভব্যতা, জীবন-সংগ্রাম সহজ হয়েছে বলেই সেটুকু সম্ভব হয়েছে। আমাদের সর্বজনের চিন্তারাজ্যে যে-আমূল পরিবর্তন তার অনেকখানিই পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে নির্ভরশীল। সামাজিক অবস্থা তাকে অনেক ক্ষেত্রে করে নিয়ন্ত্রিত; এতে বংশানুক্রমের প্রভাবকে খুব বড় করা চলে না। আমাদের বৃহৎ উত্তরাধিকারের বড় অংশ পাই আমরা সামাজিক বায়ুমণ্ডল থেকে —তার মধ্যে পারিবারিক প্রভাব অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত—তবে এক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সামাজিক হাওয়াবদলের সংগে সংগে মানুষের পারিবারিক জীবনেও হাওয়া-বদল অবশ্যম্ভাবী।

অবস্থা পরিবর্তনে আজ অরণ্য চারণ অনেকের জীবনে সত্য নয়। আদিম প্রকৃতির হিংস্র পশুর সংগে হাতাহাতি যুদ্ধে অনেককেই এখন ব্যাপৃত থাকতে হয় না। যে সমাজে সর্বজনের জীবন সংগ্রাম যত সহজ হয়েছে, সেখানে সাংস্কৃতিক প্রসার তত অধিকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার পথ পেয়েছে।

সভ্যতা ও জীবনের প্রসারের সংগে কাব্যের বিষয়বস্তুর প্রসার ও বৈচিত্র্য গেছে অনেক বেড়ে, সেখানে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে সূচিত। আজকের কোন কোন কবি যে সমস্ত বিশ্বসংসার নিয়ে ভাবিত ও চিন্তিত হয়েছেন, তা কারণ বিজ্ঞানের দানে সমস্ত জগৎ যেন আজ বৃহৎ এক যৌথ পরিবারের চিত্ররূপে আমাদের ভাবদিগন্তে প্রতিভাসিত হয়েছে। সহযোগিতার বিচিত্র সুর ঝঙ্কার তুলেছে পরিবর্তনকামীর মনে। এ বিবর্তনের সত্যে মূল্য আরোপ করে কাব্য বিচার করলে আমরা দেখব যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের সংগে সাহিত্য বা কাব্যের রূপ যাচ্ছে পরিবর্তিত হয়ে এবং কাব্যের উজ্জ্বল কল্পনায় বাস্তবও হচ্ছে পরিবর্তিত। তাই বিষয়বস্তু ও উপাদানে, অতীতের ও বর্তমানের কাব্যে বাহ্যতঃ কোন প্রভেদ নেই মনে হলেও সন্ধানীর তাই সূক্ষ্মদৃষ্টি সেখানে আকাশ-মৃত্তিকা ভেদ খুঁজে পায়।

যেখানে প্রকৃতিকে কবি সম্ভাষণ জানিয়েছেন, সেখানে এ প্রশ্ন হয়ত মনে জাগা স্বাভাবিক যে, সেদিনের আকাশ, সমুদ্র, তরুলতা তারাও কি গেছে পরিবর্তিত হয়ে? তাদের চিত্ররূপেও কি সেই আদিম সংকীর্ণতার দৃষ্টি প্রাচীন কবিকে আশ্রয় করেছিল? এখানেও দৃষ্টিভংগীর বিভিন্নতা ও অবস্থান্তরের প্রশ্ন অবশ্যই আসে। যে পটভূমিকায় আদিকালের প্রকৃতিকে কবি দেখেছিলেন সেখানে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে। বর্তমানের কবির মনে ঘটেছে বিচিত্র পরিবর্তন—চিন্তার ব্যবহারিক প্রকাশেও তাই বিভিন্নতা সূচিত হয়েছে। প্রকৃতিকে পট-ভূমিকায় স্থাপিত ক'রে, আমাদের নব নব উদ্ভাবন সেখানে যুক্ত করেছি। যে পরিবেশের পটভূমিকায় প্রকৃতি রয়েছে যুক্ত, সে পরিবেশের পরিবর্তনে আজকে প্রকৃতিকে আমরা দেখছি পরিবর্তিত দৃষ্টিতে এবং প্রকৃতিও হয়েছে আজ পরিবর্তিত। বিজ্ঞানী দৃষ্টি ও সংস্কারমুক্ত বুদ্ধির সংযোগে আমাদের মানসিক পরি-মণ্ডলেও বিবর্তনের প্রভাব আজ স্পষ্ট। কবি কালিদাসের শকুন্তলা প্রেমানুরাগের ছোট ছোট দোলায় আশ্রমের অরণ্য পরিবেশে আবর্তিত হয়েছেন। আজকের প্রেম-পীড়িতা শকুন্তলার হৃদয় অবশ্যই অনুরাগের বায়ুভরে আন্দোলিত হবে, কিন্তু নবতর পরিবেশের পটভূমিকায় আজকের শকুন্তলার বেশে ভূষায়, দৃষ্টি-ভংগীতে, আলাপে ব্যবহারে কালিদাসের শকুন্তলার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কাব্যের বিষয়বস্তু ও উপাদানের জগতে সমালোচক শাশ্বতসন্ধানী হ'লে অনেক সময়েই ভুল ক'রে বসবেন। ব্যবহারিক জগৎ অনেক পরিমাণে আপেক্ষিক কার্যকারণ সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল—স্থান-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে যদি আমরা কোন অবস্থাকে কল্পনা করতে পারি, তাকেই বলা চলবে শাশ্বত বা চিরন্তনের জগৎ; সে রাজ্যে কাব্যের প্রবেশাধিকার ঘটেনি বললেই সত্য বলা হ'বে।

কাব্য জগতে চিরন্তন সত্য খুঁজতে যাওয়া তবে কি অর্থহীন প্রচেষ্টার নামান্তর হবে? কাব্যের বিষয়বস্তুকে শাশ্বতের সুস্থিরতায় বসিয়ে দিলে, কাব্যের মৃত্যু বা সমাপ্তিকেই আমরা স্বীকার করেছি নির্বিবাদে।

তবে অতীতের কোন কোন মহৎ কাব্যের আবেদনে এখনো আমরা সাড়া দিই কেন, এমন প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে। সেখানে কাব্যের বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত একটা কিছু আমরা সন্ধান করতে চেষ্টা করি; যাকে কেউ বলেছেন কাব্যের রস বা কাব্যপ্রাণতা। এ রসের স্থায়িত্ব স্থান-কাল ও বিষয়ের পরিবর্তনের মধ্যেও শাশ্বত হয়ে থাকে কি না, সে প্রশ্নের যোগ্য মীমাংসা মুহূর্তবিলাসী মানুষ ক'রে উঠতে পারবে কি না তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যাবে। মোহমুক্ত দৃষ্টির বিশ্লেষণে অতীতের অনেক কাব্যে, আজ আমরা ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া, আর বিশেষ মূল্য খুঁজে পাইনে; অবশ্য এসত্যও অনস্বীকার্য যে, কালপ্রবাহের বিচিত্র মৃত্যুধর্মী পরিবর্তনের মধ্যেও অতীত কালের কোন কোন কবি নতুন কালের মানুষের আত্মীয় হয়ে আছেন। এ কারণেই কাব্যরসকে আমরা শাশ্বতের প্রকোষ্ঠে নিতে ব্যাকুল হই—তবু কাব্যরসের ক্ষেত্রেও চিরন্তন স্থির হয়ে বসে নেই; আর তাই যদি সত্য হ'ত তবে নবতর রস-পানীয়ের পিপাসা প্রবল হ'ত না, অতীতের কাব্য-রসেই বর্তমানের কাব্য-রসপিপাসার নিবৃত্তি ঘটত।

অলঙ্কার

ESTD 1918

একমাত্র গিনি স্বর্ণের
তথা রত্নখচিত অলঙ্কার
ও রৌপ্যের বাসনাদি
প্রাপ্তির প্রাচীনতম ও
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান—

প্রতিষ্ঠাতা
মি. এস. চৌধুরী
কার্যাধ্যক্ষ
মি. এইচ. এম. চৌধুরী

ফোন:—
বি.বি. ২৭৪১

Jewellers

M. S. CHOWDHURY & SONS

HEAD OFFICE & WORKSHOP: 203, UPPER CHITPUR ROAD, CALCUTTA

৫/৬ ও ৬৩এ কলেজ স্ট্রীট (মার্কেটের সম্মুখে)। ফোন: বি. বি ৪৮৯৫।
১৬১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাটা জংসন, বালীগঞ্জ। ফোন—পি কে·২১৭৫।
কলিকাতা।

দুর্লভ দুই প্রকার

জগতে যা কিছু দুর্লভ তার আদর, কদর এবং দরটাও যে বেশী তা নিশ্চয়ই সবাই জানেন। সম্প্রতি দুটি দুর্লভ কুকুরের খবর পাওয়া গেছে ইংলণ্ড থেকে। এই কুকুর দুটির মালিক হচ্ছেন শ্রীমতী আলেকসান্দ্রে কুলত্রে—ইনি ইংলণ্ডের এসেক্স অঞ্চলে বাস করেন। এ'র পোষা কুকুর অনেকগুলি আছে তবে তার মধ্যে মারেম্মানিস্ (Maremmanis) জাতের যে কুকুর জোড়া আছে সেই কুকুর দুটি নাকি বর্তমানে পৃথিবীর দুর্লভতম কুকুর। কারণ ঐ জাতের কুকুর বর্তমানে পৃথিবী থেকে প্রায় লোপ পেয়েছে। প্রাচীনকালে ইতালীতে ঐ জাতের কুকুরদের পূর্ব-পুরুষরা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল—কিন্তু তাদের বংশধর বলতে নাকি এদের দুটিকেই পাওয়া গেছে। তাই এই দুই জোড়মাণিক কুকুরকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে গেছে। এ দুটি কুকুরের মালিক হওয়ার জন্য ধনীদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলেছে। অর্থাৎ ক্রমশই কুকুর দুটির দাম বেড়ে চলেছে।

কাহিনী নয় ★ ★ খবর ভবঘুরে



হোটেলের দরজায় আজব আগন্তুক



কুলত্রে আর তাঁর কুকুর

তাক লাগানো আজব আগন্তুক

অনেক সময় আপনাদের দুয়ারে আচমকা দেখা দেয় নানা রকম আগন্তুক—কাউকে দেখে খুবই খুশি হয়ে ওঠেন, কাউকে দেখে বা ওঠেন তেলে-বেগুনে চটে। কাউকে দেখে একেবারে বিনয়ে গদ গদ হয়ে ওঠেন, নয় কি? কিন্তু কিছু-দিন আগে ক্যালিফোর্নিয়ার স্যানডিগো হোটেলের একটি ঘরের অস্থায়ী বাসিন্দারা এমন এক আজব আগন্তুকের দেখা পেয়েছেন—যাতে তাঁরা তো তাজ্জব বনে গেছেনই, রীতিমত হৈ চৈ কাণ্ড বেধে উঠেছিল ক্যালিফোর্নিয়া শহর জুড়ে। ব্যাপারটা কি জানেন—ঘটনার দিন সকাল বেলা ঐ ঘরের বাসিন্দারা বিছানা ছেড়ে উঠে যেমনি হোটেলের পিছনের দিকের দরজা খুলেছেন, দেখেন কি একটি সীল দরজার গোড়ায় কুঁকড়ি শুঁকড়ি মেরে দিব্যি ঘুমিয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক ডাক পড়ে গেল, মেলাই লোক এসে জড়ো হলো হোটেলের এই আজব আগন্তুকটিকে দেখে। সবাই অবাক! কেমন করে কোথা থেকে কখন সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এই অদ্ভুত জানোয়ারটি সেখানে হাজির হোলো! খোঁজ! ব্যাপার কি! পরে জানা গেল ঐ সীলটি ঐ শহরের কাছাকাছি এক চিঁড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে হোটেলের পিছনের দরজাটিতে। বুঝুন ব্যাপারটা! চিঁড়িয়াখানার বাসিন্দারা যদি এই রকম তাদের আস্তানা ছেড়ে হোটেলে আসতে শুরু করে তাহলে হোটেলে যাঁরা থাকেন তাঁদের নিশ্চয়ই চিঁড়িয়াখানায় যেতে হবে।

জনসাধারণ ও বেতার অনুষ্ঠান

পঙ্কজ দত্ত

বেতারের কথা নিয়ে অনেক সূত্র থেকে অনেক রকম কথাই ওঠে এবং এতো স্পষ্ট এবং খোলাখুলিভাবেই হ'য়ে থাকে যে তা বিশেষ ক'রে, কোন শহুরের পক্ষেই এড়িয়ে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সিনেমা-থিয়েটারের সঙ্গে বেতারের পার্থক্য আছে—সিনেমা-থিয়েটার যতই আকর্ষণীয় এবং জনপ্রিয় হ'য়ে উঠুক, বেতারের মত পর্দা ডিঙিয়ে সোজা অন্তঃপুরে গিয়ে আসন ক'রে নিতে পারেনি। এই বিশেষ অধিকার এসে পড়ায় বেতারের দায়িত্বও দাঁড়িয়েছে অনেক বেশী হ'য়ে। তাই শুধু বিষয়বস্তুর নির্বাচনেই নয়, বেতার অনুষ্ঠানের পরিবেশনেও একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কৌশল উদ্ভব হ'য়েছে যার সঙ্গে সিনেমা, থিয়েটার, গ্রামোফোন, পত্রিকা বা অন্য কোন কিছুরই কোন মিল নেই—প্রবন্ধ হোক, গল্প, গান, অভিনয় বা বিবরণ হোক সবই ঐ বিশেষ টেক্‌নীকেই উপস্থাপিত ক'রতে হয়; এ টেক্‌নীকটা যদিও এখনও পাকা হ'য়ে দাঁড়ায়নি এবং এখনও অনেক ঘষামাজা চলেছে, কিন্তু এর প্রতিটি অনুষ্ঠানই যে একেবারে স্বতন্ত্র প্রকৃতির সেটা এখন আর কেউ মেনে নিতে দ্বিধা করে না।

সাধারণভাবে একটা গল্প বা প্রবন্ধ পাঠ, অথবা গান বা অভিনয় বেতারের জন্যে নয়, কারণ তার জন্যে পত্র-পত্রিকা, মঞ্চ, গ্রামোফোন প্রভৃতি আছে এবং বেতারের চেয়ে সেগুলি তাদের স্ব স্ব বাহনের মধ্যেই বেশী শোভা পায়, লোকেও তাতেই বেশী খুসী হয়। তাই বেতারের অনুষ্ঠান এমন হওয়া উচিত যা পত্র-পত্রিকা-সিনেমা-থিয়েটার-গ্রামোফোনের এলাকা বহির্ভূত এবং তাদের সাধ্যেরও বাইরে। আর এই স্বাতন্ত্র্য গড়ে না তোলা পর্যন্ত বেতার নিজস্ব কোন আকর্ষণই সৃষ্টি ক'রতে পারবে না, সে শুধু প্রথমোক্ত উপাদানগুলির প্রতিযোগীই হ'য়ে থাকবে, যে প্রতিযোগিতায় তার জিত কোনকালেই সম্ভব হ'তে পারে না ব'লেই তার পক্ষে জনপ্রিয়তা অর্জনও দুঃসাধ্য হ'য়েই থাকবে, মর্যাদার আসন লাভ তো আরও দূরের কথা।

যে কোন একটা সপ্তাহের সমুদয় অনুষ্ঠান নিয়ে বিচার ক'রলে কথাটা আরও পরিষ্কার হয়। আমাদের বেতার কেন্দ্র ক'লকাতা, তাই আলোচনাও শুধু ক'লকাতা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কেই নিবদ্ধ রাখা হ'য়েছে। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান মিডিয়াম ও শর্ট এই দুটি শব্দ তরঙ্গে প্রচারিত হয়। মূল আসরের জন্যে মিডিয়াম এবং তার পরিপূরণ কার্য সাধনের জন্য শর্টওয়েভ ব্যবহৃত হয়—সাধারণ মতে শর্টওয়েভটা ভিন্ন দেশে অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে মিডিয়াম ওয়েভের বিজাতীয় ও বিদেশীয় অনুষ্ঠানগুলি যাদের মনঃপূত নয় প্রধানত তাদের তুষ্টির জন্যেই শর্টওয়েভ ব্যবহার করা হয়; এ ছাড়া শর্টওয়েভের সাহায্যে নেপাল, উড়িষ্যা ও আসামবাসীদের তাদের নিজস্ব ভাষায় অনুষ্ঠান শোনানো হয়। শর্টওয়েভ ব্যবহারের প্রথম হেতুটি সম্পর্কে বলবার কথা হ'চ্ছে যে, লোকের মনঃপূত নয় অর্থাৎ লোকে শুনতে চাইবে না এমন অনুষ্ঠান মিডিয়ামে দেওয়াই বা হবে কেন? ক'লকাতা বেতার কেন্দ্র বাঙালীর জন্যে, সুতরাং তার সমস্ত অনুষ্ঠানই হওয়া উচিত বাঙলা ও বাঙালী নিয়েই, এতে ইংরিজী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কেন থাকবে—বিশেষ ক'রে যখন তা বাঙালী শ্রোতার মনঃপূত নয় ব'লে জানা যাচ্ছে? ইংরিজী শ্রোতাদের জন্য বহু কেন্দ্র আছে আর তাছাড়া ক'লকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানও এমন কিছু অসাধারণ হয় না, যে কারণে দৈনিক কয়েকঘণ্টা সময় তার ভাগ থেকে কেটে ওদের জন্যে বিশেষ ক'রে নির্ধারিত ক'রে রাখতেই হবে! অন্য কোন কারণে যদি কলকাতায় ইংরিজী অনুষ্ঠান অনিবার্য হ'য়েই ওঠে তো, মিডিয়ামের মূল আসরে ব্যাঘাত সৃষ্টি না ক'রে তার জন্যে শর্ট-ওয়েভটা ব্যবহার ক'রলেই তো চলে। এক সপ্তাহের সমুদয় অনুষ্ঠানের জন্যে বরাদ্দ রয়েছে মোটামুটি হিসেবে প্রায় ৭৪½ ঘণ্টা—এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ সময় ব্যবহৃত করা হ'চ্ছে বাঙালী শ্রোতাদের মনঃপূত নয় এমন অনুষ্ঠানে অর্থাৎ ইংরিজীর জন্যে। বাঙলা খবর দিনে তিনবার পরিবেশন ক'রে সময় নেয় মোট আধ ঘণ্টা আর সে জায়গায় দিল্লী আর লণ্ডন থেকে প্রচারিত ইংরিজী খবরের জন্যে পাঁচ বারে পুরো একঘণ্টা সময় তো নেওয়া হয়ই তার সঙ্গে স্থানীয় ঘোষণা ও আবহাওয়ার সংবাদের নাম ক'রে ফাউ হিসেবে আরও পাঁচ মিনিট ক'রে কেটে নেওয়া হয়। এইভাবে মোট ইংরিজী অনুষ্ঠানের জন্য সাপ্তাহিক বরাদ্দ ১৭ ঘঃ ১৫ মিঃ-এর খরচ আপনার দেওয়া করের অংশ থেকেই নেওয়া হয়। যদি বোঝা যেতো যে, এই ইংরিজী অনুষ্ঠান ইংরেজদের কাছে ভারতীয় এবং ভারতীয়দের কাছে ইংরেজদের শাস্ত্র জ্ঞানবিজ্ঞান সঙ্গীত সাহিত্য কলার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যেই নির্ধারিত, তা হ'লে সময়ের ব্যয়টা অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্য ব'লে বরদাস্ত করার একটা ওজর পাওয়া যেতো। কিন্তু এক খবরপ্রচার ছাড়া ইংরিজী অনুষ্ঠান ধ'রতে গেলে, গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ইংরিজী বক্তৃতাদি হয়—যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য পর্যায়ে সাপ্তাহিক পনেরো মিনিটের অনুষ্ঠান—ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয়দের উদ্দেশেই এবং ভারতীয় বিষয় নিয়েই কিন্তু অভারতীয় ভাষায় অর্থাৎ যতই শিক্ষাপ্রদ ও তথ্যমূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হোক না সে অনুষ্ঠানটি ইংরেজ এবং ভারতীয় উভয়েরই সমস্ত আগ্রহ ও উৎসাহ মুষড়ে দেবেই যদিও প্রখ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ এবং মনীষীদেরই এই সব বক্তৃতা দেবার জন্যে হাজির করা হয়।

শর্টওয়েভ প্রচারের দ্বিতীয় হেতুটি ভারতের প্রধান কেন্দ্র দিল্লীতে চালান ক'রে না দেওয়ার কোন হেতু নেই। আসাম, উড়িষ্যা ও নেপাল থেকে বেতার প্রচারের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু তাই ব'লে কলকাতা-কেন্দ্র সে-ভার বইতে যাবে কেন? ক'লকাতার শর্টওয়েভের ঐ সময়টা ভিন্ন প্রদেশের অথবা বিদেশী নির্বাচিত অনুষ্ঠান দিয়ে ভরিয়ে রাখা যায় অনায়াসেই।

বেতার গৃহস্থের অন্দরমহলের জিনিস এবং মানুষের জীবনের সঙ্গে নিবিড় সৌহার্দ স্থাপনেরও সম্ভাবনা তার প্রচুর। কিন্তু আমাদের বেতার নিজেকে আজও এমন আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে পারেনি বা এমন কোন অনন্যসাধারণ অনুষ্ঠান প্রচার বা প্রচারের সম্ভাব্যতার আভাস পর্যন্ত দিতে পারেনি যার জন্যে বেতারকে আধুনিক জীবনের অপরিহার্য সামগ্রী ব'লে লোকে গণ্য ক'রতে পারে। বেতার আজও তাই আমাদের দেশে আসবাব-বিলাসী ধনীগৃহের শোভাবর্ধনকারী একটা সাজসরঞ্জাম সমাদৃত। লোকে যে কেন এর মধ্যে আকর্ষণের কিছু পায় না অনুষ্ঠানগুলি নিয়ে আলোচনা ক'রলেই তার কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমেই চোখে ঠেকে অনুষ্ঠানগুলিতে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। গান বাজনা আবৃত্তি বক্তৃতা শোনার আরও বহু উপায় আছে, বেতারের তাহ'লে বৈশিষ্ট্য কোথায়, তার নিজস্ব ঢঙই বা কি এবং গান বাজনা বক্তৃতাদি বেতারের দ্বারা পরিবেশিত হ'য়ে এমন কি বিশেষ রূপ পেয়ে যায় যে জন্যে বেতার তার পৃথক অস্তিত্ব সার্থক ব'লে প্রমাণ ক'রতে পারে? কলকাতা কেন্দ্রের সমস্ত অনুষ্ঠানই নিয়মিত এবং বাঁধা-

ধরা অর্থাৎ আজ যে সময়ে যে অনুষ্ঠান শুনছেন আগামী সপ্তাহে এই দিনে সেই সেই সময়ে সেই পর্যায়েরই একটা কিছু শুনতে পাবেন। অর্থাৎ শুক্রবার ৮-১৫তে যদি রবীন্দ্র সংগীত শোনেন তো নিশ্চিত ধ'রে রাখতে পারেন যে, প্রতি শুক্রবার ঐ সময়ে রবীন্দ্র সংগীতই হবে।

সপ্তাহের নির্দিষ্ট ৭৪½ ঘণ্টা সময়ের প্রায় ৪৪ ঘণ্টা থাকে গান ও বাজনার আসর যার মধ্যে শুধু রেকর্ডের জন্যেই নির্ধারিত থাকে প্রায় ৯½ ঘণ্টা। 'পল্লীর মায়া', 'গীতালি,' 'মধুচ্ছন্দা', 'অনুরোধের আসর' ইত্যাদি বিবিধ চটকদার শিরোনামায় খান কয়েক ক'রে রেকর্ড বাজাবার জন্যে দৈনিক সময় নির্ধারিত তো আছেই, এ ছাড়া 'নির্ধারিত অনুষ্ঠানের পরিবর্তে' অর্থাৎ শিল্পী বা বক্তার অনুপস্থিতিতে এবং মহিলা-মজলিস, মজদুর-মণ্ডলী, গল্প দাদুর-আসর প্রভৃতি পৃথক পৃথক প্রতিটি আসরেও কিছু সময় নিয়মিত-ভাবে রেকর্ড বাজাবার জন্য থাকেই। এইভাবে দিনে স্বাভাবিক সময়েই খান তিরিশ রেকর্ড শুনিয়ে বাড়িতে আলাদা ক'রে রেকর্ড কিনে রাখার খরচ বাঁচিয়ে দেবার জন্যে লোকে বেতার কেন্দ্রের কাছে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ!

গানের আবার পর্যায়ও অনেক। Classical-এর তর্জমার অভাবে খেয়াল ঠুংরী, দাদরা ধ্রুপদ ইত্যাদি বলেই অভিহিত হয়, এ ছাড়া রাগপ্রধান, আধুনিক, 'Modern' ও রবীন্দ্র-সংগীতও আছে। এ শ্রেণী বিভাগের অর্থ বোঝা মুস্কিল। খেয়াল, ঠুংরী এবং রবীন্দ্র-সংগীতের জন্যে না হয় স্বতন্ত্র পর্যায় থাকতে পারে, কিন্তু রাগপ্রধান, আধুনিক ও Modern বলতে কি বোঝায়? আধুনিক গান কি Modern নয়, না Modern গানে রাগ-রাগিনীর বালাই থাকে না? এ সম্পর্কে পরি-চালকদের বীতরাগ লক্ষ্য করার বিষয়। ভজনের অতি প্রচলন দেশটাকে প্রায় সাধু করে তোলার উপক্রম করেছে—দু'খানা গান কারুর থাকলেই প্রায় ক্ষেত্রে একখানা ভজন তাকে গাইতেই হয়। ভজন অথবা রাগপ্রধানের পরই পল্লীগীতি মানাক আর নাই মানাক গান তো হয়। ভাল কথা, পল্লীগীতি মানে কি বেতার কর্তৃপক্ষ Folk-Song (লোক সংগীত) বলতে চান?—যদি তাই হয় তো কীর্তনের আলাদা পর্যায় কেন? "এ মাসের গান" নামে একটি অনুষ্ঠান আছে; একমাস ধরে একই গায়কের কণ্ঠে গীত একখানি বিশেষ গানকে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ৫ মিনিট করে সময় দেওয়ার কি যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে? "এ মাসের গান" বলতে শ্রেষ্ঠ গানকেই তো বোঝায়—কিন্তু তার বিচারকর্তা কি বেতার পরিচালকবৃন্দ না আর কেউ? বিচারক যেই হোক তার এ অধিকার কোত্থেকে এলো? গান একদিকে এবং সংগত ভিন্নমুখী দেখলে, যা অতি সাধারণ ঘটনা, শ্রোতারা বড় একটা কিছু মনে করে না, কারণ ওরকম-ধারাকে তারা পূর্বকালের জলসায় ওস্তাদ গাইয়ে ও ওস্তাদ বাজিয়ের লড়াই বলেই ধরে নেয়। এর ওপর শিল্পী নির্বাচনের রীতি ও নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন আর না তোলাই বোধ হয় ভালো।

গানের পরই সময় বেশী নেয় সংবাদ প্রচারে, যদিও আগেই বলেছি, ১০½ ঘণ্টার মধ্যে বাঙলায় খবরের জন্য বরাদ্দ মাত্র ৩½ ঘণ্টা। লোকের সত্যিকারের কোন আকর্ষণ যদি থাকে তো, তা এই সংবাদ অনুষ্ঠানটির ওপরেই; তবে সেটা অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্যের জন্য লেশমাত্রও নয়, খবরটা পরের দিনের খবরের কাগজের চেয়ে আগে পাওয়া যায় এই-জন্যেই। তা নয়তো খবর এমন বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ শোনানো হয় না যার জন্যে সংবাদপত্র না পড়া থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, আর সংবাদ প্রচারের ভাষাও এমনি যে বুঝে ওঠা অনেক সময়েই কষ্টকর হয়। এর উচ্চারণ উপভোগ করার মতো—বিচারপতি চাগলাকে "ঘ্যগলা" মেজর পি বর্ধনকে ওয়াধন ইত্যাদি বহু উচ্চারণ বিকৃতি নিতান্তই সংকোচ-হীনভাবে বলে যেতে শুনবেন, আর Report অর্থাৎ বিবরণী Submit অর্থাৎ দাখিল করেছেন এ ধরণের তর্জমা বাঙলা তো এর সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। প্রচারকের কণ্ঠ অমন উদাত্ত এবং বলবার অমন নাটকীয় ঢংই লোককে শোনবার জন্যে দাঁড় করিয়ে রাখে, নয়তো সংবাদ বলা শেষ হলে অনেককেই কি বললে প্রশ্ন করতে শোনা যায় কেন? আচ্ছা বাঙলা সংবাদ সরাসরি ক'লকাতা থেকে রীলে করলেই তো হয়।—

তাহলে তো সেটা বাঙলা হয় এবং বাঙলারও হয়—তাতে বাধা কিসের এবং কেন? ইংরেজী খবরটাও ক'লকাতার অনুষ্ঠানলিপি থেকে বাদ দিয়ে শুধু দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত করলে কারুর কি আপত্তি থাকবে? সপ্তাহে এর দরুণ সাত ঘণ্টা সময় তো বাঁচে। আমাদের বেতার কর্তৃপক্ষ এক ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশের নজীর কি দেখাতে পারেন যেখানে মূল অনুষ্ঠানলিপির মধ্যে সেখানকার স্থানীয় ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষায় সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা আছে? ভারতের প্রতি বেতার কেন্দ্রেরই স্থানীয় ভাষায় আলাদা সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত এবং দিল্লীর উচিত সব জায়গার সংবাদ সংগ্রহ করে তার সারটুকু প্রচার করা। বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি পরস্পর সময়ের পার্থক্য রেখে দিলে যে কোন কেন্দ্রের শ্রোতা ইচ্ছামত অন্য যে কোন কেন্দ্রের সংবাদ সরাসরিভাবে শোনার একটা বাড়তি সুযোগও লাভ করতে পারে।

আসরের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে প্রতিদিন ২০ মিনিট করে মজদুর মণ্ডলী, সপ্তাহে তিনদিন ৩০ মিনিট করে 'মহিলা মহল', সপ্তাহে দুদিন ৩০ মিনিট করে 'গল্পদাদুর আসর' ও সপ্তাহে দুদিন ৩০ মিনিট করে 'ছাত্রদের আসর'। 'মজদুরমণ্ডলী' পরিচালনা করেন বাঙলা অংশ রঘু সর্দার এবং হিন্দুস্তানী অংশ সুখন ভাইয়া—অনুষ্ঠানটি শুনলে পরিচালক দুজনকে মজদুর বলে মনে করতে বাধে না কিন্তু তারা এতই অশিক্ষিত ও অজ্ঞ যে তাদের পরিবেশিত বস্তু হয় নিতান্তই অপাঙক্তেয় এবং তা যেকোন শ্রেণীর লোকের কাছেই মনে হবে। আর ওদের দেওয়া বস্তু-গুলিই যদি উপযুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে মজদুরদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও রুচি সম্পর্কে অতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করার স্পর্ধা বেতার কর্তৃপক্ষ দেখিয়েছেন বলে মনে করতে হবে। তাছাড়া যে দেশে শতকরা নিরানব্বই জনই মজুর এবং আশী জনই অশিক্ষিত সেক্ষেত্রে মজদুরদের এইভাবে এক-ঘরে করে শ্রেণীবিভাগের এ চেষ্টা কেন! অন্যান্য সাধারণ অনুষ্ঠানগুলি তাহলে কাদের জন্যে এবং কিসের জন্যে? অপর তিনটি অনুষ্ঠানও যাদের জন্যে বিশেষভাবে নির্ধারিত করা হয়েছে, তাদের বা সাধারণের কাউকে আগ্রহশীল করে তুলেছে, এমন সংবাদ বোধ হয় কোন অনাবিষ্কৃত ইথারেই ঘুরে মরছে। সবায়েরই এক কথা—তাদের চেতনা জাগিয়ে আকৃষ্ট করার মত কোন বস্তুই বেতার অনুষ্ঠানে পাওয়া যায় না—তাই মহিলারা তাদের 'মণ্ডল' ফেলে সিনেমা, নয়তো নিদেন পাড়া-বেড়ানোর জন্যে রেডিও বন্ধ রেখে চলে যেতে এতটুকুও দ্বিধা বা আক্ষেপ প্রকাশ করেন না; ছাত্ররা তাদের আসরের খবরই রাখতে চায় না, আর গল্প-দাদুর আসরে নিজেদের নামগুলো প্রচারিত হবার মোহ না থাকলে ঐ একই দশা হোত। 'গল্প-দাদুর আসর' দুদিনে দু-নামে পরিচালিত হয়, নতুনদা' ও হাবিব ভাই, যদিও গলার স্বর শুনে একই ব্যক্তি মনে করা ভুল হবে না—ছোটদের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ স্পষ্ট করে তোলার জন্যেই এই ব্যবস্থা নাকি? —বড়দের জন্যে যেমন আছে সপ্তাহে একদিন ১৫ মিনিট করে কোরাণ ও গীতা পাঠের ব্যবস্থা। তবে বাঁচোয়া এই যে, ধর্মতত্ত্ব প্রচারের সময় এমনি নির্ধারিত যখন কোন কাজের লোকের পক্ষেই পাপস্খালন করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না, নয়তো হিন্দু ও মুসলমান-দের অতিধার্মিক হয়ে যেতে দেখলে খৃশ্চান, জৈন, শিখ সবাই স্ব স্ব ধর্মকথা শোনাবার জন্যে নিশ্চয়ই জিদ্ ধরতো এবং বেতারকে

ঐ দুটি ধর্মাবলম্বীদের একচেটে হওয়া থেকে নিশ্চয়ই নিরস্ত করতো।

খুচরো অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে লণ্ডন থেকে প্রতি শনিবারে প্রচারিত 'বিচিত্রা'ই যা কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে—এ-অনুষ্ঠানটির মধ্যে সত্যই বৈচিত্র্য আছে এবং বেতারের বৈশিষ্ট্যও তার মধ্যে পরিস্ফুট; অথচ অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা এবং পরিচালনা এখানকারই লোকের। 'অরূপের আসর' নামে শনিবার ১৫ মিনিটের একটি অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু কি যে আবোল-তাবোল বকে যাওয়া হয় তাতে কয়েক সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করেও বোঝা গেল না—কোনদিন একটা কোন বিষয়ের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না, বরাবরই তার জের টেনে যাওয়া হয়; ফলে আলোচনার খেই ধরতে না পেরে শ্রোতা দস্তুরমত বিরূপ হয়ে ওঠে। পুস্তক, নাটক ও চলচ্চিত্র সমালোচনার ব্যবস্থাও আছে এবং বলা বাহুল্য, এসব সমালোচনার নিরপেক্ষতা সন্দেহের অতীত নয় বলে নিতান্তই ব্যক্তিগত ও প্রচারমূলক বলেই শ্রোতাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়—কোন বিষয়ের সমালোচনা যদি করতেই হয়, তো তার দায়িত্ব মাত্র এক ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করলে চলবে কেন? — সে ব্যক্তি এমন কি বিচক্ষণ সব্যসাচী যে তারই ধারণাপ্রসূত মত প্রচার করা হবে? 'সবিনয় নিবেদন শিরোনামায়' সপ্তাহে একদিন ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে শ্রোতাদের চিঠির জবাব দেবার নামে অতি বিনয়সহকারে এবং মিষ্টি করে ঔদ্ধত্য প্রকাশের সুন্দর সুযোগ করে নেওয়া হয়েছে। পত্রকার কে কি লেখেন জানা যায় না, সুতরাং উত্তরের অর্থও সব সময়ে বোঝা যায় না, অর্থাৎ এটা সম্পূর্ণরূপে পত্রপ্রেরক এবং জবাবদাতার মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর এই ব্যক্তিগত ব্যাপারের জন্যেই সাধারণের খরচে তৈরী দামী দশটা মিনিট ব্যয় করা হয়। একদিন আগে কারুর পরিচালনায় একটি অনুষ্ঠান ভাল হতো, কিন্তু এখন হয় না এই অনুযোগের উত্তরে জবাব-দাতা বললেন যে, তিনি তা জানেন না—এ-তর্কের মানে কী? —যার জন্যে অনুষ্ঠান সে ভাল না বললে তার ওপরে কথা বলার এ ধৃষ্টতা কেন? আর একদিন কার যেন কি কথার জবাবে দড়াম করে বলে বসলেন—বেতারের জন্য বিশেষভাবে রচিত নাটকগুলি বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেচে—সাহিত্য-রসিকরা কথাটা নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন।

এই আলোচনার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলির গুণাগুণ বিশ্লেষণ আর না করলেও চলবে, যেহেতু বিষয়বস্তুর কোনটিকেই বেতারের স্বতন্ত্র সত্তা সার্থক করে তোলার উপযোগী প্রামাণিক দৃষ্টান্ত বলে ধরা যায় না। এ-আলোচনাটা কারুর ব্যক্তিগত মতামত নয়, জানা শোনা সমস্ত বেতার-গ্রাহকই একই ধারণা পোষণ করেন। লোকে বেতারকে যেভাবে চায় এবং বেতার মারফৎ যা চায়, তা পাচ্ছে না বলেই তাদের অসন্তুষ্টি এবং বেতারও তাই জনপ্রিয়তার আসন লাভে বঞ্চিত। তাহলে লোকে কি চায় এবং কিসে খুশি হয় বিচার করে দেখতে হয়।

মানুষ স্বার্থপর, কোন কিছুতে লাভের সম্ভাবনা না দেখলে তা এড়িয়ে যাবে সে অনায়াসেই, আর এই বস্তুতান্ত্রিক জগতে দেওয়া-নেওয়ার কারবার ছাড়া তো কথাই নেই। সুতরাং বেতারকে খুঁজে পেতে দেখতে হয় যে, মানুষের জীবনযাত্রার পথে সে কি দান করতে পারে এবং জন-কল্যাণে তার কর্তব্য কি হওয়া উচিত। লোকে কি চায় জানবার উপায় হচ্ছে বর্তমান অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি লোকের আগ্রহ ও উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়, তার সন্ধান করা এবং সেই অনুযায়ী বেতারের কর্তব্য নির্ধারিত করে নেওয়া। লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে যে, ঘটনা ও ব্যক্তির সঙ্গে শ্রোতাদের সরাসরি সংযোগ শ্রোতা আকৃষ্ট করে খুব বেশী রকমেই। খেলার খবর শোনার চেয়ে সোজা মাঠ থেকে খেলার বিবরণ প্রচার, শাসনতন্ত্র গঠন সভার অধিবেশনের সরাসরি বিবরণ ইত্যাদি যেমন শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেই; এমন কি, এসব ক্ষেত্রে দেখেছি লোকে সব কাজ ফেলে রেখে রেডিও খুলে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকে। দিল্লীর সংবাদদাতা যে খবর পাঠিয়েছেন তা এখানকার প্রচারকের কণ্ঠ থেকে না শুনিয়ে দিল্লীর সেই সংবাদ-দাতার মুখ থেকেই শুনিয়ে দিলেই ব্যাপার কতখানি মৌলিক এবং প্রাণবন্ত হয় বলুন তো! শ্রমিক ও চাষীর কথা সরাসরি কারখানা বা ক্ষেত থেকে ওদেরই কথায় ও ওদেরই নিজস্ব ভঙ্গীতে শোনালে সর্বজনের কাছেই তা প্রিয় এবং জ্ঞাতব্য উপভোগ্য বস্তু হয়ে উঠবেই। 'সঙ্গীত-পরিক্রমা' নামে একটি অনুষ্ঠান আছে, যাতে বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীতের রেকর্ড দিল্লী থেকে রীলে করে শোনানো হয়। কিন্তু তা না করে যদি ঠিক ঐ সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতের আসরের সঙ্গে পর পর সরাসরি যোগ স্থাপন করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা শ্রোতার কাছে অতি রোমাঞ্চকর এক দুর্লঙ্ঘ্য আকর্ষণ হ উঠবেই। শান্তি ও মিলন প্রতিষ্ঠার জ মহাত্মা গান্ধী যে অভিযান আরম্ভ করেছে তাঁর পথের বিবরণ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেতা মারফৎ প্রচার করলে শ্রোতাদের যেমন আকৃ করতো, তেমনি গান্ধীজীর কীর্তি সম জনগণের মনে কি গভীর রেখাপাত করতে —ইতিহাসের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তির সং সংযোগ স্থাপন করলে বেতারও এক অভ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারতো। এইভাবে সহস্র উপায়ে বেতার তার নিজস্ব সত্তা দ করাতে পারে এবং তার অস্তিত্বকে সার্থ করতে পারে। সমগ্র বৃটিশ-ভারতে এত বছ মধ্যে বেতারযন্ত্রের সংখ্যা মাত্র আড়াই ল এ থেকে বোঝা যায়, সমগ্র দেশের মনে বেত কি নগণ্য আসন লাভ করেছে। তাই বেতারে অনুষ্ঠানগুলি এমনি করে তুলতে হবে লোকে শোনার জন্যে মনের মধ্যে একটা প্র স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ অনুভব করবে, যা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না।

বেতারের অনুষ্ঠান-পরিচালন কর্তা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব এবং ঔদাসীন্যও জনপ্রিয় হওয়ার মুখে প্রতিবন্ধক রয়েছে। সামান্য সামান্য উদাহরণ থেকেই তা বোঝা যায় —'আধুনিক গান শুনুন' ঘোষণা করে একখানা কীর্তনের রেকর্ড অসঙ্কোচে বাজিয়ে দেওয়া, অথবা 'হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান' বলে শৈল দেবীর গান শোনানো, পূর্বাহ্নে মহলা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অনুষ্ঠান যাতে শেষ হতে পারে, সে ব্যবস্থা না করে সময় উত্তীর্ণ হলে চালু অনুষ্ঠানটিকে টুঁটি টিপে বন্ধ করা, একই বিষয় বার বার এবং বিলম্বিত চালে ঘোষণা দ্বারা শ্রোতার বিরক্তি উৎপাদন করে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা ইত্যাদিই তার প্রমাণ। বেতার-পরিচালন কর্তাদের মধ্যে জনপ্রিয় লোক কেউ না থাকায় এবং বর্তমান পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে কারুরই জনপ্রিয় হবার মত যোগ্যতা প্রকাশ না হওয়াও লোককে আকর্ষণ করতে না পারার একটা কারণ। বিভিন্ন দেশ-বিদেশের বেতার অনুষ্ঠান কিভাবে পরিবেশিত হয়, সে বিষয়ে পরিচালক-মণ্ডলী অবহিত হলেও অনেক কিছুই পাওয়া যেতো।

পি, সি, দাস এণ্ড সন্স
সুবাসিত
তরল আলতা
শত বৎসরের সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রসাধন
এ, পি, দাস এণ্ড কোং ৭, অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, কলিকাতা।

শিক্ষা ও শিল্প

সন্তোষকুমার ভঞ্জ চৌধুরী

[৫]

কাজ করিয়া শিক্ষালাভ ও শিক্ষায় সংযোগ

ভারতবর্ষে শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষণীয় সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার চিন্তা প্রথম ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় দেখিতে পাওয়া যায় ও এইরূপ কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীনিকেতন শিক্ষা সত্রে হস্তশিল্প (handicraft), গৃহ শিল্প (housecraft), প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পের ভিতর দিয়া সর্বাঙ্গীন শিক্ষাদানের কথা বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত A Poet's School নামক পুস্তিকার L. K. Elmhurst লিখিত অংশ হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

Under the term housecraft, at the Siksha-Satra, the following functions will be treated as of primary educational importance:—

Care and cleaning and construction of Quarters.
Care and proper use of latrines; sanitary disposal of waste.
Cooking and serving of food; Clothes washing and repair.
Personal hygiene and healthy habits.
Individual self-discipline; group self-government.
Policing and hospitality; Fire drill and control.

Any of the following (handicrafts) can easily be mastered in a few weaks.
Cotton wick, tape and band making; Scarf weaving and belt making; Cotton rug and duree making (the looms can easily be made by the children themselves, out of bamboo). Straw-sandal making. Straw-mat and mattress making.
Sewing; Paper-making; Ink-making.
Dyeing with simple vegetable dyes; Cotton and calico printing with wood blocks.
Making sun-dried mud bricks.
For elder boys and girls the following are suitable:—
Woolwork, Shearing, washing, carding dyeing and coarse blanket weaving. Knitting and darning.
Pottery; Carpentry and carving; Smithy and tool making.
Building with sun-dried bricks; Rush and mud construction, bamboo construction; Thatching.
Tailoring and use of sewing machine. Watch and clock repair.
Block-making, type-setting, printing, typing and duplicating.
Musical instrument making (Drums, flutes, one stringed instrument).
Food preparation; Wheat and grain grinding; Oil extraction, Sap extraction, soap making.
The following out-door crafts can be learnt and practised by small children......
Poultry keeping and chicken rearing for egg production.
Care of fuel and water-supply.
Seed-bed preparation, manuring and planting.
Cultivation of flower's and vegetables.
Drainage and Irrigation; Wood-cutting and Jungle-clearing.

ইহা হইতে একটি বিষয় স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ কেবল মাত্র দুই একটি শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন নাই, নানা শিল্পের ভিতর দিয়া যাহাতে শিশুরা নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিতে পারে তিনি তাহার কল্পনা করিয়াছিলেন। পিপাসুকে পরিতৃপ্ত করিতে যেমন জলসত্র প্রতিষ্ঠা করা হয় তেমনি জিজ্ঞাসু শিশুর মনকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য যাহা কিছু আয়োজনের আবশ্যক তাহার ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা-সত্রে করিবার কথা বলিয়াছিলেন; শিশুর জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রকে অনন্ত প্রসারিত রাখিয়া সম্ভবমত সেই ক্ষেত্রোপযোগী গৃহ-শিল্প, হস্ত-শিল্পাদির কথা চিন্তা করা হইয়াছে। শিক্ষা-সত্রে কাঠ, মাটি, ধাতু প্রভৃতি উপাদান বিশেষের মধ্যে শিশুকে আবদ্ধ না রাখিয়া বহুবিধ উপাদান ও বহুবিধ শিল্প তাহার পক্ষে সহজলভ্য করিয়া এবং খেলাধুলা, উৎসবাদি নানাপ্রকার আয়োজন করিয়া তাহার আপন ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে এরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় "Crafts" যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে এই পরিকল্পনাকে শিল্প কৈন্দ্রিক বা কর্ম-কৈন্দ্রিক (activity centred) বলা যাইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া শিশুকেও কেন্দ্রাপসৃত বা অপ্রধান করা হয় নাই।

শিক্ষায় কেবল শিশুর জিজ্ঞাসাকেই অনুসরণ করিলে চলে না; কারণ তাহার জিজ্ঞাসা আজ প্রজাপতির সম্বন্ধে, কাল নক্ষত্রের বিষয়, পরদিন মোটর গাড়ি সম্পর্কে হইতে পারে এবং তাহার প্রশ্নও এইরূপ বিচিত্র গতিতে চলে। তাহার জিজ্ঞাসাকে অনুসরণ করিলে সে কতকগুলি অসম্বন্ধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু আবার অনেকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ই তাহার অজানা থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং যাহাতে সে সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহার প্রচেষ্টাও আবশ্যক। বলা বাহুল্য, শিক্ষাসত্র এ সম্বন্ধে অনবহিত নহে। এজন্য ছয় হইতে বারো বৎসর বয়সের শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন বিষয়ে কতটুকু শিক্ষালাভ করা প্রয়োজন, প্রথমেই তাহা নির্ধারণ করা উচিত। বিদ্যালয়ে এই বয়সের শিশুদিগকে সাধারণত ১। পঠন, ২। লিখন, ৩। গণিত, ৪। ইতিহাস, ৫। ভূগোল, ৬। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, ৭। বিজ্ঞান, ৮। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ৯। অংকন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ছয় বৎসর (আমি "ছয়" এই সংখ্যার মধ্যে সীমা নির্দিষ্ট করিতে চাহি না, প্রয়োজন হইলে ইহার পরিবর্তন করিলে ক্ষতি নাই) শিক্ষাকালের মধ্যে কোন বৎসর কোন বিষয়ে কি কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহার একটি পাঠ্যসূচি (syllabus) প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা হইবে ন্যূনতম অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য যে শিক্ষাদান তাহার জিজ্ঞাসা ও শক্তিকে অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহারও ব্যবস্থা থাকিবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার চরম উদ্দেশ্যই হইল শিক্ষার্থীর আপন শক্তিকে আবিষ্কার করিয়া তাহার বিকাশ সাধন করা, আর সেই আবিষ্কারের ইঙ্গিত তাহার জিজ্ঞাসা বা আগ্রহ হইতেই পাওয়া যায়।

কেবলমাত্র লিখন পঠনের সাহায্যে গণিত সাহিত্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের দেশে যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা যে কত অন্তঃসারশূন্য, তাহা নানা দেশের Progressive schoolগুলির শিক্ষাপদ্ধতিসমূহের সহিত তুলনা করিলে উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে বিদ্যালয়ে এক এক মানের জন্য নির্দিষ্ট এক একটি ক্লাসঘরের "অচলায়তনে" আর যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না, নানাবিধ কাজের ভিতর দিয়া খেলার মাঠে, মেলায়, হাটে, কৃষিক্ষেত্রে, গোশালায়, শিল্পশালায়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে, রঙ্গমঞ্চে, প্রদর্শনীতে, উৎসব-প্রাঙ্গণে, হাসপাতালে, বনে, নদীতে যেখানকার সহিত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, সেইখানেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান যতদূর সম্ভব হাতে-কলমেই অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রথায়ই শিক্ষা দেওয়া হয়। কেমন করিয়া এই কাজ করিবার ভিতর দিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা যাইতে পারে, বর্তমান অধ্যায়ে তাহারই আলোচনা করিব।

ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি কোন একটি বিষয়কে অপর একটি বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক বলিয়া চিন্তা করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি আমরা কোন একটি জাতির ভাষা বা সাহিত্য ভালরূপে শিক্ষা করিতে চাহি তবে তাহার ইতিহাস জানা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, আবার ইতিহাসের সহিত ভূগোল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেই জাতির শিল্পকলা না জানিলে চলে না। এতদ্ভিন্ন ধর্ম, আচার ব্যবহারও একটি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়, কারণ ভাষা বা সাহিত্যের অনেক সম্পদ জাতির ইতিহাস ধর্ম প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়া থাকে। একটি বিষয়ের সহিত অপর একটি বিষয় যেমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্বন্ধযুক্ত, তেমন, কতকগুলি বিষয় আছে যাহার সহিত অপর অনেকগুলি বিষয়ের সংযোগের ক্ষেত্র বিস্তৃত; ইতিহাস, শিল্প প্রভৃতি শেষোক্ত শ্রেণীর বিষয়।

কাজ করিয়া শিক্ষা করিবার (Learning by doing) পদ্ধতিতে ইতিহাস শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে প্রধানত শিল্প এবং তাহার সঙ্গে লিখন, পঠন, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের অনেকাংশই সহজে শিক্ষা দেওয়া যায়। ইংলণ্ডে St. Christopher School-এ অনুসৃত অনুরূপ প্রথা সম্বন্ধে লিখিত কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

Our scheme does not go nearly so far as the American one, since our children do not choose their subject of study. The teacher follows a certain syllabus, which is modified awarding to the interest of the children—the centre of interest being history. Subjects which have been corelated round the history work in the past have been literature and formal English, geography, craft, drawing, painting, modelling and even French.

মনে করা যাক এই প্রথায় প্রথম মানের শিক্ষার্থীকে ভারতবর্ষের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। একেবারে ভারতবর্ষের ইতিহাস সর্বপ্রথমেই আরম্ভ না করিয়া প্রারম্ভে যে গ্রামে বিদ্যালয় অবস্থিত, সেই গ্রামের একটি প্রতিকৃতি বা মডেল তৈয়ারী করিয়া তথাকার অতীত ও বর্তমান ইতিবৃত্ত শিক্ষার্থীর পক্ষে সংক্ষেপে জানা আবশ্যক। এই প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিলে গ্রামের সহিত তাহার আয়তনের অনুপাত সম্বন্ধে শিশুর ধারণা জন্মিবে। দৈর্ঘ্যে এক হাত দেড় হাত একটি কাঠের পাটা বা পিজবোর্ড প্রভৃতির উপর সেই প্রতিকৃতি নির্মাণ করা চলে। ইহা করিতে মাটি, কাঠ, পিজবোর্ড প্রভৃতি কয়েকটি উপাদানের সহিত শিশুর পরিচয় ঘটিবে, ইহাতে যে শিল্পের সাহায্য লইতে হইবে, তাহা সে শিক্ষা করিতে পারিবে, এতদ্ভিন্ন যে গ্রামকে সে এতদিন ভাসা ভাসা রকমে দেখিয়া ও জানিয়া আসিয়াছে, আজ হাতে-কলমে প্রতিকৃতি করিতে গিয়া তাহার সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতে হইবে। গ্রামের দেবালয়, ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহা বিশেষ করিয়া তাহাকে জানিতে হইবে। গ্রামের সকল প্রয়োজনীয় তথ্যই তাহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে। এই প্রতিকৃতি শেষ করিবার পর যদি তাহাকে লইয়া শিক্ষক ভারতবর্ষের Relief মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তবে তাহার সাহায্যে নদী, পর্বত, জলপ্রপাত, দ্বীপ প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং ভারতের প্রদেশসমূহ ও প্রধান প্রধান নগর, বন্দর ইত্যাদির সংস্থাপন হইতে ভূগোলের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সে জানিতে পারিবে। এই মানচিত্র যত বড় করা যাইতে পারিবে, ততই ভাল হইবে। খেলার মাঠ সাধারণত যেরূপ আকারের হয়, তাহার এক-চতুর্থাংশ স্থান হইলে চলে, বৃহত্তর হইলে আরও ভাল। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও মজুর মিস্ত্রী একযোগে কাজ করিবেন। নদী, হ্রদ, সাগর হইতে মাটি কাটিয়া পাহাড় পর্বত নির্মাণ করিবেন, ছোট ছোট গাছ বসাইয়া বন প্রস্তুত করিবেন, বালি দিয়া মরু রচনা করিবেন, নগর স্থাপন করিবেন, কাজের অন্ত নাই। মনে করা যাক, শিশুরা আদিম যুগ অবলম্বন করিয়া কাজ করিবে। আদিম যুগের প্রথমাংশ যখন প্রত্ন-প্রস্তর যুগ ছিল, তখন গভীর অরণ্যে দেশ পরিপূর্ণ, মানুষ বনে বাস করিত বন্যজন্তুর মতই, প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া বন্যজন্তু শিকার করিত, আম মাংস আহার করিত। ক্রমে নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ ভূমি-কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে শিখিল, অগ্নির ব্যবহার শিখিয়া রন্ধন করিতে জানিল, প্রস্তর হইতে নানাবিধ দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত করিল, মাটি হইতে বিচিত্র গঠনের পাত্র ও ব্যবহারোপযোগী নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিল। তখন তাহারা প্রস্তর দিয়া সমাধি রচনা করিয়া মৃতদেহের সৎকার করিবার প্রথা প্রবর্তন করিল। এই ঘটনাটিকে রূপ দিবার নিমিত্ত শিশুরো নানা বিষয়ে ইতিহাস-শিক্ষকের নিকট হইতে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করিবে, গল্প শুনিবে, শিক্ষক নানা পুস্তক হইতে ছবি দেখাইবেন। শিল্পশিক্ষক শিক্ষার্থীদিগকে সম্ভব হইলে যাদুঘরে লইয়া যাইয়া আদিম অধিবাসিগণের প্রতিকৃতি, তাহাদিগের ব্যবহৃত দ্রব্য ও তৎকালীন অতিকায় বন্যজন্তুর অস্থি বা তাহাদিগের প্রস্তরীভূতরূপ প্রভৃতি দেখাইবেন। শিক্ষার্থীরা তাঁহার নিকট হইতে মাটি, কাঠ, ধাতু, কাগজ, কাপড় প্রভৃতি নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সাহায্যে সেই যুগের রূপদান করিবে। যাহার যেমন কল্পনা, নিপুণতা, যেমন শক্তি সে তেমনি রূপ দান করিবে। কয়েকজনে মিলিয়া অরণ্য রচনা করিবে, কেহ কেহ মানুষ গড়িবে, কেহ আদিম মানুষের জন্য পরিচ্ছদ তৈয়ারী করিবে। কেহ বা বন্যজন্তু সৃষ্টি করিবে, কেহ প্রস্তর হইতে অস্ত্রশস্ত্র এবং কেহ বা মাটির সামগ্রী প্রস্তুত করিবে। যে শিশু যাহা করিতে আগ্রহান্বিত ও সমর্থ হয়, সে তাহাই করিবে। এমনি করিয়া ছাত্র, শিক্ষক, কারিকর, মজুর সকলে মিলিয়া একটি চিন্তা ও একটি সংকল্পকে রূপ দিবার নিমিত্ত কাজ করিবেন। মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পার সময়কার ইতিহাস যখন শিক্ষার্থীরা শিক্ষা করিবে, তখন ঐ সকল বিষয়ের সচিত্র গ্রন্থসমূহ হইতে ছাত্রদিগকে সম্ভব হইলে Epidiascope-এর সাহায্যে চিত্র দেখাইয়া ও এরূপভাবে গল্প বলিয়া শিক্ষক তাহাদিগের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি করিবেন. যে মহেঞ্জোদড়ো মূর্ত হইয়া তাহাদিগের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিবে। এইরূপ চিত্তাকর্ষক করিয়া গল্প বলা বা বর্ণনা করিবার শক্তি সকল শিক্ষকের থাকে না, শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার পক্ষে ইহা শিক্ষকের একটি অপরিহার্য গুণ। সরসভাবে বর্ণনা করিবার শক্তি যে শিক্ষকের আছে, তিনি শিক্ষকতা শিল্পে সহজে কৃতকার্যতা লাভ করিতে ও ছাত্রমহলে সুনাম অর্জন করিতে পারেন। এই-রূপ শিক্ষকের নিকট হইতে মহেঞ্জোদড়ো সম্বন্ধে বর্ণনা শুনিয়া, ছবি দেখিয়া শিশুরা তখন মাটির ঢেলাতে, পাথরের নুড়িতে, হাড়ের টুকরায়, মেঘেতে, ছায়াতে স্বপ্নে, মহেঞ্জোদড়ো দেখিতে থাকিবে। এই ভাবোন্মত্ত শিশুদের লইয়া সেই সময়ে যে সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে, তাহাই রূপে, রঙে, রসে মূর্ত হইয়া উঠিবে। তাহাদিগের সৃষ্টিকার্যে সাহায্য করিবার জন্য কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতিকে একে একে আনাইয়া মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত মাটির পাত্র, পুতুল, শীলমোহর, ইঁট, বাড়ি প্রভৃতি নির্মাণ করিতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইতিহাসের যে অধ্যায়ের জন্য যতটুকু সময় দেওয়া প্রয়োজন সেই সময়ের মধ্যে এই প্রথায় কাজ শেষ করিতে হইলে যদি আবশ্যক হয় বাহির হইতে দরকার-মত জিনিস সংগ্রহ করিয়া আনিলে ক্ষতি নাই। বাড়ি নির্মাণের জন্য বাজার হইতে তৈয়ারী ইঁট আনায় কোন বাধা নাই। প্রসঙ্গত একটি কথা বলা প্রয়োজন, এই প্রথায় বালক বালিকাদিগের সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়, দল বিভাগ করিয়া এক এক প্রকারের কাজ এক এক দলের উপর এবং প্রত্যেক দলের উপর একজন করিয়া নায়ক নির্বাচিত করিয়া তাহার উপর নির্ভর করা ভাল। এই নায়ক পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করিয়া যাহাতে প্রত্যেকেই নায়কত্ব শিক্ষা

করিবার সুযোগ পায়, তাহা শিক্ষক দেখিবেন। নগর পরিকল্পনা (Town planning) এবং গ্রাম পরিকল্পনাও শিক্ষণীয় বিষয়, এই পদ্ধতিতে উহা শিক্ষা দিবার সুযোগ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শিশুরা আপন হাতে সব জিনিস তৈয়ারী করিয়া ইতিহাস শিখিবে, তাহার প্রয়োজন নাই। শিশু যাহাতে মনের সবটুকু নিয়োজিত করিয়া কোন বিষয় অনুধাবন করে, তাহার জন্যই এই প্রথায় তাহাকে আপন হাতে কাজ করানো, কারণ হাতে-কলমে কোন কাজ করিতে হইলে মনকে সম্পূর্ণভাবে কাজ করিতে হয় এবং সেই মনঃ-সংযোগের জন্যই ভাল করিয়া বিষয়বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সম্পূর্ণ মনোনিয়োগই প্রধান বস্তু। হাতে-কলমে কাজ করা মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, উহা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উপায় মাত্র, তবে প্রধান উপায় বটে এ বিষয়ে সংশয় নাই। অতএব ইতিহাসের প্রত্যেক বিষয়, ঘটনা বা অধ্যায় শিশুদিগকে আপনাদিগের হাতে প্রস্তুত জিনিসের ভিতর দিয়া না শিখাইয়া, কোন কোন বিষয়ে যাদুঘর দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়া যায়। যেমন দিল্লীর যাদুঘর দর্শন করিয়া মহেঞ্জোদড়ো সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ে শিশুরা সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে পারে। শিশুদিগের দ্বারা অভিনীত একটি নাটকের সাহায্যে বুদ্ধের জীবনী শিক্ষা দেওয়া চলে। চলচ্চিত্র বা Epidiascope-এর সাহায্যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়। কথকতা, রামায়ণ, কীর্তনাদির দ্বারা পৌরাণিক কাহিনী জ্ঞাত করানো যাইতে পারে।

ইতিহাস শিক্ষা দিবার কালে শিক্ষার্থীদিগকে একটি কথা বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে হইবে যে, শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়, যে জাতির ইতিহাসই আমরা পাঠ করি না কেন, দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানব প্রথম যুগে ছিল বন্য-পশুর মতই আপন আপন আহার্য অন্বেষণে ব্যস্ত, হিংস্র, পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক হইতে বঞ্চিত। ক্রমে, মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে, ততই তাহার অন্তরে সমাজবদ্ধভাবে সকলের সহিত সম্প্রীতিতে বাস করিবার বাসনা জাগ্রত হইয়াছে। মাঝে মাঝে মানুষের মধ্যে সুপ্ত পশুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আর তাহার ফলে মানুষের চির অভীপ্সিত অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা মানব-সভ্যতার চিরন্তন সত্যরূপ নহে, কারণ সকল জাতির মহামানবগণ যুগে যুগে শান্তি কামনা করিয়াছেন এবং যেমন করিয়াই হউক, হানাহানির বহু ঊর্ধ্বে মানবের স্থান থাকা একান্ত প্রয়োজন, একথা উপলব্ধি করিয়াছেন। বর্ণ, জাতি, ধর্মের পার্থক্য রচনা করিয়া ভৌগোলিক সীমারেখা টানিয়া মানুষ যতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠি সৃজন করুক না কেন, তাহা যে সমগ্র মানবজাতিরই অংশ মাত্র এই সত্যকে আজ মানবের অন্তরের অন্তস্তল হইতে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

বিদ্যালয়ে এই প্রথা প্রবর্তিত হইলে প্রথম দুই এক বৎসর যথেষ্ট কাজ বা পরিশ্রম করিতে হইবে এবং শ্রমের তুলনায় ইতিহাসের ইতিবৃত্ত শিশুরা কম শিক্ষা করিবে। তবে যখন একবার একটি প্রযেক্ট-এর সকল উপাদান প্রস্তুত ও কার্য শেষ হইয়া যাইবে তখন পরবর্তী ছাত্রদিগের ও সেই সঙ্গে শিক্ষকের কাজ সহজ হইবে। পূর্ববর্তী শিক্ষার্থীদিগের নির্মিত নানা বস্তু পরবর্তীগণ ব্যবহার করিতে পারিবে এবং তাহার উপর আবশ্যকমত ও যেরূপ সময় পাইবে সেইমত কিছু কিছু নূতন সামগ্রী যোগ করিবে। শিশুদিগের প্রস্তুত দ্রব্য বিদ্যালয়ের যাদুঘরে এক একটি ঘটনা বা বিষয় অনুসারে পৃথক পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এইরূপে সংগৃহীত বস্তু শিশুদিগকে প্রেরণা দিবে। ইহাতে স্থান ও অর্থের প্রয়োজন, এই কথা কেহ কেহ চিন্তা করিতে পারেন, কিন্তু সাধ্যানুসারে কোন বিদ্যালয়ে পাকা ঘরে কাঁচের আলমারি করিয়া আর কোন বিদ্যালয়ে মাটির দেওয়ালে গোঁজ পুঁতিয়া বাঁশের পাটা করিয়া অনেক জিনিস রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। উৎসাহী শিল্পশিক্ষক ছাত্রদিগের সাহায্যেই ইহা করিতে পারেন। কোন বিদ্যালয়ে প্রস্তরপ্রস্তর যুগের জন্য নির্মিত শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ অধিক রাখিবে, কোনখানে বা তাম্রযুগের সংগ্রহ অধিক পরিমাণে রাখিবে। একটি থানা বা একটি মহকুমায় কয়েকটি বিদ্যালয়ের সংগ্রহের সমষ্টি লইয়া হয়ত ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে। এই প্রথায় কয়েকটি বিদ্যালয় একযোগে কাজ করিতে পারে, অথবা কাজের শ্রেণী বিভাগ করিয়া লইয়া এক এক শ্রেণীর কাজ সুবিধা অনুসারে এক এক বিদ্যালয়ে সম্পন্ন করিতে পারা যায়। বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে পরস্পরের সহিত যাহাতে নানারূপে সংযোগ, চিন্তার আদান-প্রদান ও নানারূপে সহযোগিতা ঘটে তাহা করা কর্তব্য।

ভূগোল শিক্ষাও এই পদ্ধতিতে দেওয়া যায়। ছাত্রেরা বন্ধুরতা অনুসারে পার্বত্যপ্রদেশ, সমভূমি, মালভূমি ও নিম্নভূমি এই চারিটি বিভাগে ভারতবর্ষের রিলিফ মানচিত্রকে বিভক্ত করিবে। নদী, গিরি, বন প্রভৃতি সংস্থাপনের কথা ইতিহাসের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। বনজ, খনিজ সম্পদ, কৃষিজাত শস্যাদি, শিল্পদ্রব্য, গোমেষাদি জীবজন্তু, রেলপথ, জলপথ, স্থলপথ, প্রসিদ্ধ স্থাপত্য শিল্প প্রভৃতির প্রতিকৃতি প্রস্তুত বা সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে যথানুপাতে সংস্থাপন করিবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ছাত্রদিগকে সম্ভবমত নানাস্থানে ভ্রমণে লইয়া যাইবেন, ছবি দেখাইবেন, গল্প বলিবেন। আর এক প্রকারে ভূগোল শিক্ষা দিলেও কতকটা এই প্রথার ন্যায় চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হইবে। ভারতবর্ষের বৃহদাকার মানচিত্র কাগজের উপর প্রস্তুত করাইয়া ও যথাস্থানে উপরোক্ত বনজ খনিজ প্রভৃতি সম্পদ ও বস্তুসূচক চিহ্ন এবং বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন আকৃতি ও পরিচ্ছদ বিশিষ্ট অধিবাসী, বাসগৃহাদির চিত্র পৃথক পৃথক অঙ্কিত ও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করাইয়া ভূগোল শিক্ষা দেওয়া যায়। এইরূপ শিক্ষার জন্য Masani প্রণীত Our India নামক গ্রন্থ উৎকৃষ্ট। ভূগোল শিক্ষা দিবার জন্য খেলার ছলে কাজ করিবার নানা পদ্ধতি শিক্ষক উদ্ভাবন করিতে পারেন। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি। ছাত্রো তারের করাত (fret saw) দিয়া পাতলা কাঠ হইতে অথবা ছুরি দিয়া পিজ্‌-বোর্ড হইতে কাটিয়া ও তাহাতে আবশ্যক মত রং দিয়া প্রদেশসমূহের মানচিত্র ও ঐ সকল পাশাপাশি সন্নিবেশিত করিয়া ভারতবর্ষের এবং জেলাসমূহের মানচিত্র করিয়া তাহা হইতে প্রদেশগুলির মানচিত্র রচনা করিতে পারে। এই সন্নিবেশিত করিবার কাজ ধাঁধার সমাধান করিবার মতই চিত্তাকর্ষক। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোলের কথাই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আলোচনা করা হইল, কিন্তু এই পদ্ধতিতে যে কোন দেশের ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যায়। ভূগোল শিক্ষাদান প্রসঙ্গে Bertrand Russel-এর অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি।

> Almost every child becomes interested in geography as soon as it is associated with the idea of travel. I should teach geography partly by pictures and tales about travellers, but mainly by the cinema, showing what the traveller sees on his journey.

এই প্রথায় শিশুরা যে সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিবে তাহার অনেক দোষ ত্রুটি থাকা বিশেষ স্বাভাবিক। সূক্ষ্মভাবে ঐ সকলের বর্ণ, গঠন, অনুপাত বিচার করা চলে না। এ সম্বন্ধে R. N. Sharman তাঁহার Class-room Hardwork নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

> We still have to bear in mind when handworking—
>
> (1) The worker and what he or she will think of it; and
>
> (2) The outsiders—including everybody except the teacher—and what they will think of it.
>
> The nearer we approach the elimination of the second consideration, the better for the child and the handwork spirit. But, alas! alack!—Still we are

tolerably safe if the worker is not discouraged by the resulting product. পক্ষান্তরে শিশুকে আপন খুশিমত যাহা হউক সৃষ্টি করিতে দিবার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়াও হিতকর নহে। যথাসম্ভব ত্রুটি সংশোধন, উপাদান ও যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার অর্থাৎ করণকৌশলেরও (technique) প্রয়োজন যে একেবারেই নাই তাহা নহে, তবে ইহা লইয়া শিশুকে বিরত করা যায় না। শিশু তাহার কাজ অধিকতর ভালভাবে ও সহজে করিবার জন্যই উপরোক্ত করণকৌশলাদি শিক্ষা করিবে। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, কৌশল বা টেকনিক শিক্ষা করিবার জন্য শিশু কাজ করিবে না, কাজ করিবার জন্যই টেকনিক শিখিবে। এই পদ্ধতিতে নানা শিল্প অনুশীলন করিবার সুযোগ আছে। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য শিল্পের সাহায্যে যে সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত করা আবশ্যক শিশুরা যে কেবলমাত্র তাহাই করিবে এমন নয়, শিক্ষক সুকৌশলে অবসর ও সুযোগ সৃষ্টি করিয়া নিত্য ব্যবহারোপযোগী এবং প্রয়োজনীয় বস্তুও (utility goods) নির্মাণ করাইবেন। বিক্রয়ের দ্বারা অর্থাগম হইবে এই বিপজ্জনক লোভ যেন শিশুদিগের মনে আদৌ স্থান না পায়। উপাদানের সহিত সম্যকরূপে পরিচিত হইবার নিমিত্ত, যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার শিক্ষার জন্য, সৃষ্টি করিবার আনন্দে, শিল্পের ভিতর দিয়া অপর কোন বিষয়ে শিক্ষা-লাভ করিবার কারণে বা ব্যবহারের প্রয়োজনেই তাহারা ঐ জিনিসগুলি তৈয়ারী করিবে।

কেবলমাত্র শিল্পের সাহায্যেই যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, ইহা বলিতে চাহি না। শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে, খেলার ছলে, আগ্রহ সহকারে যতদূর সম্ভব সকল ইন্দ্রিয় নিয়োগ করিয়া যাহা কিছু করিবে তাহাই তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিবে, এই কথা স্মরণ রাখিয়া শিক্ষাদানের যে কোন পন্থা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে পারা যায়। এইরূপ সকল পন্থার মধ্যে শিল্প অন্যতম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধানতম। বলা বাহুল্য A Poet's School-এ Crafts যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে আমি সেই অর্থে শিল্প বলিতে চাহি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। কেহ যেন না মনে করেন যে, পুস্তক পাঠ বা গতানুগতিক বাচনিক প্রথায় শিক্ষাকে একেবারে বাদ দিবার কথা বলা হইয়াছে। অনেক বিষয় আছে যাহা শিল্পের সাহায্যে কিম্বা খেলাধুলার ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া কঠিন অথবা আদৌ সম্ভবপর নহে, সেখানে বাচনিক বা লিখন পঠন পাঠন পদ্ধতি অবলম্বন করিতেই হইবে। কেবল তাহাই নহে, এই কাজ করিবার প্রথার সঙ্গে সঙ্গে যদি লিখন পঠন চলে তবে দুই প্রথার মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা বা অভাব আছে তাহা পরস্পরের সাহায্যে দূরীভূত হইয়া একটি সম্পূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি গড়িয়া উঠিবে।

চিরাচরিত নিয়মে প্রাচীন আমলের প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ পড়াইয়া অক্ষর ও ভাষা শিখাইবার রীতি যে বৈজ্ঞানিক মতবিরুদ্ধ তাহা আজকাল অনেকেই জানেন। কাজ করিয়া শিক্ষা করিবার পদ্ধতি ভাষা-শিক্ষাতেও অনেকাংশে অনুসরণ করিয়া সুফল পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ প্রথা অনুসারেই ইংরাজি শিক্ষাদানের পদ্ধতি শান্তিনিকেতনে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত "ইংরাজী শ্রুতি শিক্ষা" ও "ইংরাজি সহজ শিক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এ বিষয়ে বিশেষ উপযোগী। এই প্রথায় শিশুরা খেলার ছলে ভাষা শিক্ষা করে। পুরাতন প্রথার মধ্যে যে নীরসতা বিদ্যমান ইহার দ্বারা তাহাকে জয় করা হইয়াছে। চিন্তাশীল শিক্ষক এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া যে কোন ভাষা সহজেই প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন। ইহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ইহা ভাষা শিক্ষার ড্রিল। শিক্ষক ক্লাসের জন্য ছাত্রগণকে দাঁড় করাইয়া ইংরাজি ভাষায় আদেশ করিবেন, তাহারা পালন করিতে থাকিবে। যখন বলিবামাত্র তাহারা যথারূপে আদেশ সম্পন্ন করিবে তখন বুঝা যাইবে আদেশবাক্যের তাৎপর্য তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ইংরাজি বই পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্বেই এই সহজ উপায়ে বিস্তর ইংরাজি শব্দ তাহাদের কর্ণে ও তাহার অর্থ তাহাদের মনে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, ইহাতে শিক্ষাকার্য অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইবে।" প্রজেক্ট প্রথায় ইতিহাসের ঘটনা বিশেষকে যখন রূপদান করা হয় তখন বহু উপাদান ও সামগ্রী লইয়া বহুবিধ কাজ করিতে হয়। সেই সকল উপাদান ও কাজকর্মের কথা প্রকাশ করিতে বহু শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করিতে হয়। সহজ শব্দ বা বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে কঠিন শব্দ বা বাক্য লিখাইয়া ও পড়াইয়া ও সঙ্গে সঙ্গে কাজ করাইয়া শিক্ষক একেবারে প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে অক্ষরের সহিত ও ভাষার সহিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহজে পরিচিত করাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন। যুগপৎ চোখে দেখিয়া, কানে শুনিয়া ও কাজ করিয়া শিক্ষা করিবে বলিয়া এই পদ্ধতি তাহাদিগের পক্ষে পীড়াদায়ক বা কৃচ্ছ্রসাধনের বিষয় না হইয়া আনন্দদায়কই হইবে। ভাষা শিক্ষার পদ্ধতিকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য নানারূপ ছবির বই এবং শব্দ রচনা (word making) প্রভৃতি খেলার সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। নাটকাভিনয়ও ভাষা শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ইতিহাস ভূগোল যেভাবে শিক্ষা দিবার কথা লিখিত হইয়াছে তদনুসারে কাজ করিবার সময় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের অনেকখানি শিক্ষাই সমাপ্ত হইতে পারে। গণিত শিক্ষক পাটীগণিতের সরলীকরণ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় বা জ্যামিতির কতকগুলি বস্তু ভিন্ন আর সবই এই প্রথায় কাজ কর্মের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিতে পারেন। ব্ল্যাক বোর্ডে বা কাগজে কলমে অঙ্ক কষিতে হইলে, এই প্রথায় কাজ করিতে করিতে যে সকল গণিতের প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তাহার সমাধানের সুবিধার জন্য করা ভাল, কারণ তাহা হইলে শিক্ষার সহিত শিশুর কর্মের একটি যোগ থাকে। গণিতের সকল কথা না হউক অধিকাংশ কথাই ঐরূপ প্রশ্নের সুযোগ লইয়া শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রশ্ন বা সমস্যা আবশ্যক হইলে সৃষ্টি করাও চলে। অঙ্কন শিক্ষার কথা না বলিলেও চলে, প্রতি নিয়ত এই পদ্ধতিতে অঙ্কন শিক্ষা দিবার সুযোগ রহিয়াছে।

কাজের ভিতর দিয়া ইতিহাস শিক্ষা দিবার কালে গণিত সাহিত্যাদি অপর বিষয়ে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহার পরিচয় দেওয়া হইল। এইখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি, কতকগুলি বিষয়ের পাঠ্যসূচীর কয়েকটি অংশ হয়ত ইতিহাসের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া কঠিন বা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকলের নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Project করিতে পারা যায়। বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, কৃষি প্রভৃতির জন্য এইপ্রকার ব্যবস্থা আবশ্যক।

বিজ্ঞান কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষা করা যায় না। হাতে কলমে নানা পরীক্ষা (Practical experiment) করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের ফল নিরীক্ষণ করিয়া তবে শিখিতে হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা পুস্তক পাঠের ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে। শিশু যদি পুস্তকে পাঠ করে কোন পাত্রে জল লইয়া আগুনের উপর বসাইয়া গরম করিবার সময়, পাত্রের তলার জল গরম হইয়া হালকা হয় এজন্য উপরে উঠে ও উপরের ঠান্ডা জল নীচে আসে—তবে এই বৈজ্ঞানিক সত্য তাহার মনে গভীর রেখাপাত বা কোন আনন্দ দান করিবে না। কিন্তু এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষক ছাত্রদিগের দ্বারা যদি একপ্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখান তবে শিশুর উপর তাহার প্রতিক্রিয়া দর্শন করিয়া তিনি বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে হাতে কলমে পরীক্ষা করিবার জন্য যদি কোন ছাত্র একটি টেস্ট টিউবে জল ভরিয়া তাহার নিম্নভাগ হাতে করিয়া ধরে ও উপরিভাগে স্পিরিট ল্যাম্পে গরম করিতে থাকে তবে দেখা যাইবে যে, উপরের জল ফুটিতে থাকিবে কিন্তু তাহার হাতে অধিক উত্তাপ লাগিবে না শিশুরা ইহাকে একটি যাদুবিদ্যার মত চিত্তাকর্ষক মনে করিবে। ইহার পশ্চাতে যে রহস্য

আছে তাহা বিস্মৃত হওয়া শিশুর পক্ষে সহজ নহে। আর একটি উদাহরণ দিতেছি। শিশুদিগকে যদি বলা যায় যে সূর্যের আলোকে রামধনুর সাতটি বর্ণ একটি বিশেষ অনুপাতে আছে, আর সেই বর্ণগুলির সংমিশ্রণে সূর্যের আলোক সাদা দেখায়, তবে শিশুরা কিছুই হৃদয়ংগম করিতে পারিবে না; কিন্তু যদি তাহাদিগের দ্বারা একটি লাটিম প্রস্তুত করাইয়া তাহার উপরিভাগে, কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যন্ত নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে সাতটি ভাগ বা ঘর করিয়া এক এক ভাগে এক একটি রং লাগানো যায়, তবে সেই লাটিম ঘুরাইয়া শিশুরা যে রঙের সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণের রহস্য প্রণিধান করিবে তাহার স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী হইবে সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক মূলসূত্রগুলি অবলম্বনে করিয়া এইরূপ নানাবিধ খেলার উদ্ভাবন করিতে পারিলে শিশুদিগের নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা বাস্তব ও বিশেষ আনন্দের হইবে। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা বা কৃষিবিদ্যাকে বিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া দেখা চলে না, ইহাদিগের প্রত্যেকটির সহিত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ের সাধারণ বিদ্যালয়ে স্থান নাই বলিলেই চলে, কিন্তু এই বিষয়গুলি কোন অংশেই গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নহে। প্রথম দুইটি বিষয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, আবার ইহাদিগের সহিত অন্যান্য বিষয়েরও যে যোগ রহিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। আদর্শ শিক্ষক এই বিষয়গুলির শিক্ষা কি ভাবে দিতে পারেন তাহার ইঙ্গিত নিম্নলিখিত অংশ হইতে পাওয়া যায়। শ্রীনিকেতন শিক্ষাসত্রের প্রসঙ্গে L. K. Elmherst বলিয়াছেন,—

So in the Shiksha-satra it is the individual plot of ground which will be for both boys and girls the basis of much of their reading, of their writing and of most of their arithmetic. From the first the child should feel that this plot is playground as well as experimental farm, where it will try its own experiments as well as carry out the planting, tending and harvesting of some definitely profitable crop. Under such a system, text books, class room, and formal laboratory go by the board. There remain the garden plot, the plotting shed, and the workshop. Records are kept and reports and accounts written up, revised and corrected, giving scope for literary training in its most interesting form. Geology becomes the study of the fertility of the plot; chemistry the use of lime and manures of all kinds, of sprays and disinfectants; physics the use of tools, of pumps, the study of waterlifts and oil-engines; entomology the control of plant parts (and, caterpillars, beetles) and diseases (leaf curl, wilt and bacterial attacks); orinthology the study of birds in their relation first to the garden plot and then to the world in general.

কেবলমাত্র পুস্তক হইতে স্বাস্থ্য বিষয়ক তত্ত্ব ও উপদেশ পাঠ করিয়াও কোন ফল হয় না। শিশুর উঠা, বসা, আহার, নিদ্রা, স্নান, পরিচ্ছদ, পরিধান প্রভৃতি সব কিছুর মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখিবার আছে এবং এই সকল বিষয়ে যখন সে যথোচিতভাবে অভ্যস্ত হইবে ও আচরণ করিবে, এবং কেন সে কি করিতেছে তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে সচেতন থাকিবে তখনই তাহার স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা যথার্থ সম্পূর্ণ ও সার্থক হইবে। কেবলমাত্র পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে অধ্যয়নের মধ্যে অথবা ক্লাসের ভিতর কিম্বা বিদ্যালয়ের দশটা চারটা সময়ের মধ্যে বিদ্যানুশীলনকে ব্যবহারিক প্রয়োগ বর্জিত করিয়া সীমাবদ্ধ রাখিলে বিদ্যা বা জ্ঞানলাভ অত্যন্ত কৃত্রিম হইয়া পড়ে। যে বিদ্যার চরম লক্ষ্যস্থলই হইল পরীক্ষা পাশ, একমাত্র স্মৃতিশক্তির সাহায্যে যে বিদ্যা আয়ত্ত করা হয়, কর্ম বা আচরণের দ্বারা যে বিদ্যাকে আত্মকৃত করা হয় না, তাহা শিক্ষোত্তর জীবনে মানুষকে সাহায্য করিতে পারে না। রোগীর পরিচর্যা, রোগের আক্রমণ নিবারণ ও প্রতিহত করিবার জন্য জঙ্গল পরিষ্কার, খানা ডোবা পূরণ, জল নিকাশের ব্যবস্থা, আবর্জনাদি হইতে যাহাতে সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি না হয় তজ্জন্য যথাযথ কার্য, মাছি মশা প্রভৃতি অনিষ্টকর কীটপতঙ্গাদির বিনাশ সাধন, বাসগৃহকে স্বাস্থ্যকর করিবার জন্য আবশ্যক সংস্কার ইত্যাদি হাতে কলমে করিবার ভিতর দিয়া যে শিক্ষালাভ হয় কেবলমাত্র তাহাই যে প্রকৃত স্থায়ী ও কার্যকরী শিক্ষা এ কথা শুধু মনে মনে উপলব্ধি করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। অবিলম্বে এই কর্মপ্রধান শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে।

শিক্ষার জন্য এইরূপ আয়োজন করিতে হইলে, স্বাস্থ্যের জন্য, আনন্দের জন্য এবং আরও নানাদিক দিয়া বিবেচনা করিলে পল্লীগ্রামে, প্রকৃতির পরিবেশের মধ্যে, উন্মুক্ত আবহাওয়ায় ও প্রশস্ত স্থানে যে বিদ্যালয় স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন একথা সহজেই অনুমান করা যায়। পল্লীগ্রামে আদর্শ বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিলে শহরের বিদ্যালয় যে কত অসম্পূর্ণ তাহা প্রতীয়মান হইয়া ম্লান হইতে থাকিবে। সকল দেশেই আধুনিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অধিকাংশই পল্লীগ্রামে স্থাপিত দেখা যায়।

বিদ্যালয়ের বাহিরের জগৎ বা বাস্তব জীবন ও বিদ্যালয়ের শিক্ষা এতদুভয়ের মধ্যে আজ ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি শিশুর দৈনন্দিন জীবনে কর্তব্যের ভার গৃহ বা অভিভাবকের উপর ন্যস্ত করিয়া এবং কেবল লিখন পঠনের দ্বারা শিক্ষাদানের ভার বিদ্যালয়ের উপর ছাড়িয়া দিয়া বাহিরের জীবন ও বিদ্যালয়ের জীবনের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা হইতেই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অসাফল্য উদ্ভূত। বিদ্যালয়ের সহিত ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করিয়া এই ব্যবধান দূর করা যাইতে পারে। যে বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে, সেখানে গৃহের সহিত বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজন।

আজ শুধু বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলির পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিলে আদর্শ শিক্ষাদান করা হইবে না, এই সংযোগ বা সহযোগ নিবিড়ভাবে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে, ছাত্রে ছাত্রে, শিক্ষকে শিক্ষকে, বিদ্যালয়গুলির পরস্পরের মধ্যে, গৃহ বা বহির্জগৎ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে একান্ত আবশ্যক।

অনেকে হয়ত এই পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার পক্ষে অতীব দুরূহ বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন। উপযুক্ত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় অর্থ, অনুকূল স্থানাদির অভাবে এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা দুঃসাধ্য বলিয়া তাঁহারা চিন্তা করিতে পারেন, কিন্তু আদর্শ যেখানে অতুচ্চ থাকে সেইখানে প্রচেষ্টা দৃঢ় ও সুতীব্র হয়, আর লক্ষ্য যেখানে অনায়াসভেদ্য কর্মোদ্যমও সেইখানে স্বভাবত স্বল্প ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। এ দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত যাঁহারা এই পরিকল্পনাকে তুলনা করিবেন তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা দুঃসাধ্য এমন কি অসম্ভব বলিয়া ভয় পাওয়াকে অস্বাভাবিক মনে করিব না, কিন্তু যে শিক্ষাবিদগণ নানা দেশের আধুনিক Progressive School-গুলির সহিত পরিচিত তাঁহারা ইহার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করিবেন না আশা করি। ইতিহাসাদিতে অশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞানদান করিলেই প্রকৃত শিক্ষা হইবে না কারণ ইহাতে কেবলমাত্র বাহির হইতে কতকগুলি জ্ঞান শিশুকে দেওয়া হইবে মাত্র, কিন্তু শিশুর ভিতরকার শক্তি বিকাশই শিক্ষার চরম লক্ষ্য। ইংরাজিতে Education শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও (E=out, Ducere=lead), ইহাই। অতএব সেই উদ্দেশ্যও যাহাতে সাধিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, ঐ উদ্দেশ্যের জন্যও কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষাদানের পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে।

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর—লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১০ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা। এই সুদৃশ্য (সচিত্র তো বটেই) এবং সুলিখিত পুস্তক বিষয়গৌরবে আর লেখকের সুনামের গুণে বিশেষ পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না, একথা ঠিকই। তবু বাঙলা সাহিত্যরসিক পাঠকদের এটুকু জানানো দরকার, বহুবিচিত্র ও বহুদূরপ্রসারী রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের কোন্ অংশটুকুর দিগ্‌দর্শন ইহাতে আছে। গ্রন্থের নামেই তাহার ইঙ্গিত। প্রমথবাবুর ভাষায় "যে নদীগুলি ভারতবর্ষকে শ্যামল শোভন ও সরস করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের সকলেরই উদ্ভব কৈলাস পর্বত ও মানসসরোবরের হিমভূমি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং কর্মকীর্তিরও একটিমাত্র উদ্‌ভবভূমি অনুমান করা বোধ করি অন্যায় হইবে না। গঙ্গা এবং যমুনা যেখানে জলের নিশানা পরিত্যাগ করিয়া চিহ্নহীন তুষারে মূর্ছিত সেখান হইতে মানসের পথ চিনিয়া যাওয়া বড় সহজ নয়। নিজের মনের বিচার যেখানে মরীচিকাস্রোতকে প্রবলতর করে, নিজের সংস্কার যেখানে ধ্রুবতারা বলিয়া বোধ হয়, সেখানে পথচলা সহজ নয়, চেনা রীতিমত কঠিন।" কিন্তু রবীন্দ্রমানসপ্রসূত স্রোতের অনুসরণে বা উজান পর্যটনেও "রবীন্দ্রকাব্যের শংখ কর্ণে স্থাপন করিলেই সমুদ্রনির্ঘোষ শ্রুত হইতে থাকে।" রবীন্দ্রচিত্তস্রোতের উৎসতটেও এরূপ মন্ত্রপূত শংখ ইতস্তত ছড়ানো আছে, আজও খুঁজিলে পাওয়া যায়। গ্রন্থলেখক সেরূপ কয়েকটি কাব্যখণ্ডের মন্ত্রনিরুদ্ধ সুপ্তিমোহ-জড়িত দৈববাণী কানে ধরিয়া ভালোরূপ শুনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন এবং রবীন্দ্র কাব্যোৎসুক বাঙালী পাঠককে বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। এই গ্রন্থকে রবীন্দ্রকাব্য আলোচনার ভূমিকা বলা যাইতে পারে। লেখকের অধুনাদুষ্প্রাপ্য (কিন্তু 'যন্ত্রস্থ') 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ' গ্রন্থে এবং বিভিন্ন সময়ে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের ব্যাখ্যানে সেই ব্যাপকতর আলোচনার সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝরের বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইল অধুনা বিস্মৃত (অবশ্য, রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম খণ্ড অচলিত সংগ্রহে পাওয়া যাইবে) বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় এবং শৈশবসংগীত এই চারখানি কাব্য, নাট্য ও গীতিগ্রন্থ। সেই আলোচনার প্রারম্ভে 'রবীন্দ্রকাব্যের পারিপার্শ্বিক'এর বর্ণন এবং অর্থ অনুধাবন অত্যন্ত সুন্দর বলিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে জন্মিয়াছেন; আর এমন বংশেও জন্মিয়াছেন এক যুগের সহিত অন্য যুগের, এক সংস্কৃতির সহিত অন্য সংস্কৃতির সেতুবন্ধনের যোগ্য উদ্যোক্তা যাঁরা ছিলেন; তা ছাড়া "বাঙালী সমাজ আজিকার মতো ফাটিয়া এমন চৌচির হইয়া সংকীর্ণ হইয়া পড়ে নাই", বহু বর্ণে ও শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও তখন পর্যন্ত পাশ্চাত্য ধনকৌলীন্যের একান্ত প্রাধান্য না ঘটাতে সকল 'জাত' ও বর্ণকে লইয়া সমাজের একটা সর্বাঙ্গীণ সংহতি ছিল, সমাজদেহের সর্বঅবয়বে একই রক্তধারার চলাচল ছিল, ব্যবস্থা ও স্থিতি ছিল এবং বহু ও বিচিত্র হেতুর যোগাযোগেই রবীন্দ্রনাথের সহজ স্বকীয় প্রতিভা যে আশ্চর্যভাবে সার্থক, ঐশ্বর্যপ্রসূ, যুগপ্রকাশক, যুগপ্রবর্তক এবং ভাবী যুগের পক্ষেও ইঙ্গিতগর্ভ হইতে পারিয়াছে—প্রমথনাথের এই প্রবন্ধে তাহা নিপুণভাবে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত। আমাদের দেশে এখনকার মানুষ সমাজ-সচেতন নয়, অহং-সচেতন মাত্র, কাগজে পত্রে তাহাকে শ্রেণী-সচেতন করিয়া তুলিবারও একটা আনুকারিক উদ্যম দেখা যায় বটে; ইহাই আমাদের দেশে ব্যক্তির বহু ব্যর্থতার ও বহু ক্ষুদ্রতার হেতু, মহৎ কাব্যের বাধাস্বরূপ, ইহারই জালে জড়াইয়া পড়েন নাই বা এই 'ফাটলে' কবলিত হয় নাই বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ প্রতিভা দুর্লভতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে—এ সম্বন্ধে প্রমথনাথের উক্তির পরেও পুনরুক্তি করা চলে। "তখনকার দিনে শহরে গ্রামে প্রভেদ প্রকট হয় নাই; শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধনের এক আসরেই স্থান ছিল। 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র পাতায় পাতায় ইহার প্রচুর উল্লেখ আছে।" প্রচুরতর অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্যও আছে রবীন্দ্রনাথের অজস্র গল্পে, কবিতায় গানে ও অশীতিবর্ষান্ত বহুধা কল্যাণকর্মে। রবীন্দ্র-প্রতিভায় বিশ্বপ্রকৃতির গভীর প্রত্যক্ষ ও সর্বব্যাপী আবেদন; বৈষ্ণব কবি, শেলি ও কালিদাসের অনুপ্রেরণা; বিহারীলাল, মাইকেল, হেমচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি অগ্রজগণের রচনাগত ও সংসর্গসঞ্জাত স্থায়ী বা ক্ষণকালীন প্রভাব—এই বিষয়গুলিও আলোচিত হইয়াছে।

অতঃপর বনফুল, কবিকাহিনী প্রভৃতি আলোচনার সূত্রপাতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য,—"কাব্য হিসাবে রচনাগুলি অত্যন্ত কাঁচা; এত কাঁচা যে, কবি তাঁহার কাব্যসংগ্রহ হইতে এগুলিকে নির্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কবিজীবনের দলিল হিসাবে ইহাদের স্থান এত পাকা যে, এক মুহূর্তের জন্যও ইহাদের নির্বাসন কল্পনা করা যায় না।" একথা সত্য যে, কিশোর কবি আপনাকে আপনি সম্পূর্ণ আবিষ্কার করেন নাই, সুতরাং সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতেও পারেন নাই; মানব সংসারকে সম্যক্‌রূপে জানিবার চিনিবার সুযোগ তখনও হয় নাই, নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়াই, অন্যের অনুসরণের এমন-কি আংশিক অনুকরণের ভিতর দিয়াও হয়তো আত্ম-অনুসন্ধানের ও বিশ্বআবিষ্কারের প্রথম ভীরু চেষ্টা দেখা দিয়াছে; পরিণামে উহা কতটা সাহস সঞ্চয় করিবে, কত যুগ, কত দেশ, মানবজীবনের কত স্তর পরীক্ষা করিবে কবি নিজেও তাহা স্পষ্ট জানিতে পারেন নাই। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ, শেলি, কীটস্‌এর ক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য কাহিনী কাব্যগুলিরও প্রধান বিষয়বস্তু হইল কবিজীবনের বিকাশ বা কবির আত্মবিকাশ; সেই আচ্ছন্ন অসম্পূর্ণ পরিচয়ের ভিতর দিয়াই বিশ্বপ্রকৃতির বা মানব প্রকৃতির ক্রমিক আবিষ্কার। প্রেম হউক আর প্রকৃতি হউক, সমাজ হউক বা ব্যক্তিসত্তা হউক, ইহাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালীন গভীর ব্যাপক ও সমৃদ্ধ যে উপলব্ধি, তাঁর কিশোর বয়সে লেখা এই রচনাগুলিতে কেমন অব্যর্থভাবেই তার নানা সূচনা দেখা দিয়াছে, ইঙ্গিত জাগিয়াছে, প্রমথনাথের ব্যাখ্যায় তাহা সুপরিস্ফুট। সীমার মধ্যে অসীমের অনুভূতি, প্রকৃতি ও মানুষকে এক সংগীতের বাঁধনে বাঁধিয়া দেওয়া, যে প্রেম আপনাকেই দেখে আর যে প্রেম আপনাকে দেয় তাহাদের বিরোধ-ভঞ্জন সমগ্র রবীন্দ্র কবিকৃতির স্থায়ী লক্ষণ ও প্রবর্তনাগুলি এই সব রচনাতে, কিশোর বয়সোচিত ভাষার উচ্ছ্বাস, ভাবের কুয়াশা, বহিরাগত প্রভাব, এসব সত্ত্বেও কিভাবে সক্রিয় রহিয়াছে, কিভাবে রচনার পর পর ক্রমেই কুয়াশা কাটিতেছে, বিষয়বস্তুর পরিচ্ছন্ন মূর্তি জাগিতেছে, পথের দিক ও লক্ষ্য ঠিক হইতেছে—তাহা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

এই গ্রন্থে প্রমথনাথ তাহা ভালো ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচনাছলে তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া লাভ নাই। রবীন্দ্রকাব্যের সার্থক ভাষ্যকারদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশীর নাম অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। তিনি নিজেও কবি বলিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের উপলব্ধি তাঁহার পক্ষে অল্পায়াসলভ্য হইয়াছে, তাহার উপর তাঁহার অধ্যয়ন আছে, চিন্তা আছে, অধীত ও চিন্তিত বিষয়কে উপমার সংকেতে সচকিত ভাষার যাদু দিয়া প্রকাশ করিবার দুর্লভ ক্ষমতা আছে। একটু উদ্‌ধৃত করা যাক না কেন। মাইকেলের 'অমিত্রাক্ষর' উত্তরকালীন রবীন্দ্রকাব্যে কি মূর্তি ধরিয়াছে প্রসঙ্গ হইল এই—"রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর কখনো নাটকোচিত হইলেও অধিকাংশ-স্থলে লিরিক ধর্মাক্রান্ত, সে চলিতে গিয়া নাচিয়া ওঠে, বলিতে গিয়া গাহিয়া ওঠে, তাঁহার অমিত্রাক্ষরের অভিসারিকা পায়ের নূপুর খুলিতে ভুলিয়া যায় বলিয়াই অন্ধকারেও সে শ্রুতিগম্য হইয়া ওঠে।" প্রমথনাথের এই রচনাটুকুতে ছন্দের মাপ-জোখ মান-পরিমাপের হিসাব বা 'আঙ্গিক'এর কথা না থাকিতে পারে, আত্মিক পরিচয়টি ঠিকই আছে।

দু-একটা ছাপার ভুল চোখে পড়িল। তাহার মধ্যে ৪৮ পৃষ্ঠার ১৮শ পংক্তিতে 'সসীম' স্থলে 'অসীম' ছাপা হওয়াটা মারাত্মক কিন্তু 'এহ বাহ্য'। সুধী পাঠক এরূপ দু-পাঁচটা ছাপার ভুল হজম করিতে পারিবেন। লেখকের কাছে আমাদের একমাত্র নালিশ এই যে, আলোচনা ভালো হইলেও স্বল্প হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের রচনা লইয়াও (অথবা অপরিচিতপূর্ব বলিয়া বিশেষ করিয়া ইহা লইয়াই) আরও বিচার আরও বিশ্লেষণ করিলে ক্ষতি ছিল না। তাহার উত্তর হয়তো এই যে, বিশ্লেষণ অপেক্ষা সংশ্লেষণই প্রমথনাথের সহজ প্রবৃত্তি, ঋজুগতি কাল্পনার পক্ষে ভর দিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ও সমগ্রকে একেবারেই দৃষ্টিগোচর করা তাঁর ধর্ম এবং, মোটের উপর ভালোই বলিতে হইবে। আরও বিচার আরও বিশ্লেষণ পরবর্তী পণ্ডিতদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকুক।

প্রমথনাথের নিকট হইতে সন্ধ্যাসংগীত প্রভৃতি রবীন্দ্রকাব্যের পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনার আশায় উৎসুক রহিলাম।

—চন্দ্রচূড়

ভারতের পণ্য (খনিজ—১)—শ্রীকালীচরণ ঘোষ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী লিঃ, ৮।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৮৷৷০ টাকা।

বর্তমান পুস্তক 'ভারতের পণ্য'-এর তৃতীয় সংখ্যা। ইতিপূর্বে তণ্ডুল ও তৈলবীজ এবং তন্তু ও আবাদী ফসল সম্বন্ধে দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙলা ভাষায় ভারতের বিভিন্ন পণ্য সম্বন্ধে বহু তথ্য সমন্বিত বিশদ আলোচনা লেখক ব্রত হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেইজন্য বাঙলার পাঠক মাত্রই লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

বর্তমান পুস্তকে লৌহ ও লৌহশিল্পে উপযোগী ধাতু সকল এবং এই শিল্পের প্রধান সহায়ক কয়লা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব লোহ, টংস্টেন, ক্রোমাইট, ভ্যানেডিয়ম; ম্যানগানিজ; মলিবডেনম্ টাইটেনিয়ম, নিকেল ও কয়লা এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের তালিকাভুক্ত। অবশ্য লৌহই সকল আলোচনার মূল সূত্র।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে লৌহশিল্পের প্রচলন ছিল এবং অতীতে এই শিল্পের যে প্রভূত উৎকর্ষ হইয়াছিল তাহার নিদর্শন আজও ভারতের বহু স্থানে বিদ্যমান। কিন্তু ইংরেজ শাসনের প্রসারের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় লৌহশিল্পেরও অবনতি ঘটে। ভারতের ভূগর্ভস্থিত খনিজ পদার্থের পরিমাণ আজও অজ্ঞাত। ইংরেজের স্বার্থ এবং সন্দেহই ইহার জন্য দায়ী।

স্বদেশী যুগের নবজাগরণই এই শিল্পের পুনরুত্থানের প্রেরণা যোগায় এবং নূতন পদ্ধতিতে ভারতে লৌহ শিল্প গড়িয়া ওঠে। লেখক এই লৌহ শিল্পের ক্রমবিকাশ; ইহার প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ, অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনাত্মক আলোচনা, শিল্প প্রসারে ইহার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ে বিষদ আলোচনা করিয়াছেন এবং বহু সংখ্যাতালিকার সাহায্যে এই অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের একটা সুস্পষ্ট হিসাব পাঠককে পরিবেশন করিয়াছেন। প্রত্যেক খনিজ সম্বন্ধেই ইহার প্রয়োজনীয়তা, উপযোগ, ব্যবহারের রীতি, প্রাপ্তিস্থান, বিশ্ববাণিজ্যে ইহার স্থান, আমদানী, রপ্তানি প্রভৃতি বিষয়ে বিষদ আলোচনা করা হইয়াছে।

এই তথ্যপূর্ণ পুস্তকখানির জন্য আমরা লেখককে অভিনন্দন জানাইতেছি। ১৪৮।৪৬

দ্বীপপুঞ্জ (উপন্যাস)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক—'পুস্তকালয়', ২৯নং বাদুড়বাগান রো। পৃষ্ঠা ২১৫। মূল্য ৩৷০।

অনুন্নত সাহা পাড়ায় মুরলী একমাত্র ব্যতিক্রম। সে চা খায়, সিগারেট খায়, ধোপদোস্ত কাপড় পরিয়া অভিজাত মহলে আনাগোনা করে। বাপের কারবারের দিকে তাহার লক্ষ্য নাই, কিন্তু তাহার টাকার উপরে লক্ষ্য আছে। সেই টাকা যদৃচ্ছ ব্যয় করিতে তাহার ভাল লাগে। সন্তানবতী, বিবাহিতা স্ত্রী ঘরে থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের সম্বন্ধে তাহার দুর্বলতা মরিতে চায় না। কিষ্টু-ফটিক-মধুর দল, মুরলীর বাবা নবদ্বীপের ধারের টাকায় যাহাদের দৈনন্দিন দোকানদারী চলে, মনে মনে তাহারা যাহাই ভাবুক নবদ্বীপের মোড়লীকে অস্বীকার করিবার দুঃসাহস তাহাদের নাই, কিন্তু সুবলের আছে সে সাহস। সে জানে নবদ্বীপের মোড়লী একদিন তাহারই হাতে খসিয়া পড়িবে, তাহার তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বুদ্ধির জোরেই। মুরলীর লাম্পট্যের সে প্রতিবাদ করে, শনির পূজার আয়োজন করিয়া নবদ্বীপের বিরুদ্ধে দল পাকায়। অবশ্য জিত তাহার হয় না, তবু সুবল ভরসা রাখে এই হারের মধ্য দিয়াই জয় একদিন আসিবে। কিন্তু বাহিরে নয়, সুবলের চরম পরাজয় আসিল ভিতর হইতেই। স্ত্রী মঙ্গলার রূপ আছে। সমস্ত সাহা পাড়ায় তাহার গুণের তুলনা মেলে না। সকল আয়োজন, অনুষ্ঠানে মঙ্গলার ডাক পড়ে সর্বাগ্রে। কিন্তু মঙ্গলার মন তাহাতে ভরে না। সে বন্ধ্যা, সবকিছুর আড়ালে অপূর্ণ মাতৃত্বের ক্ষুধা তাহাকে নিয়ত পীড়িত করে, এক দুর্বার আকর্ষণে সে মুরলীকে টানিয়া আনিল। মুরলীর উদগ্র কামনা এই রূপ-ঐশ্বর্যময়ী নারীর দেহে শেষবারের মত মরিয়া জড়াইতে চাহিল। কিন্তু হারের মধ্যে আছে জয়ের ইঙ্গিত। মৃত্যুর মধ্যে জীবনের। মঙ্গলা হইল সন্তান-সম্ভবা। মুরলী অকৃতজ্ঞ নয়। পাড়ার পাঁচজনের নিন্দা-মন্দ হইতে মঙ্গলাকে অনেক দূরে লইয়া গিয়া তাহাকে সে মুক্ত করিতে চাহিল। কিন্তু মঙ্গলা জানে তাহার ভার বহিবার ক্ষমতা মুরলীর নাই। আর এই আজীবনের পরিচিত পরিবেশ ছাড়িয়া সে যাইবেই বা কোথায়? ক্ষুব্ধ, অপমানিত সুবল ভাবিল মুক্তির অন্য পথ। পরস্পরকে জানিবার বুঝিবার আর কিছুই বাকী রহিল না। তারপর একদিন 'শেওড়াতলায়' পূজা দিবার অছিলায় মঙ্গলাকে সুবল নিজের নৌকায় নিয়া তুলিল। অন্ধকারে অসাবধানে খুঁটার আঘাতে নৌকার তলা ফুটা হইয়া গেল, জলে ডুবু ডুবু। নৌকা ডুবিবে, সেই সাথে মঙ্গলাও। প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়াছে। ঝড়ের তীব্র ঝাপটা আর অশ্রান্ত বারিপাতের মধ্যে দুইজন দুইজনকে আবার নূতন করিয়া চিনিল। গর্ভিণী দেহের সমস্ত ভার লইয়া মঙ্গল-বৌ নির্ভয়ে ভাসিয়া রহিল সুবলের কঠিন বুকের উপরেই।

অবৈধ সন্তান সম্ভাবনার যে চিরন্তন সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া দ্বীপপুঞ্জের মূল কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নূতন নয়। কিন্তু কোন এক বিশেষ-ক্ষেত্রে, অখ্যাত, অবজ্ঞাত এক পল্লীজীবনে সেই সমস্যার পরীক্ষা নিরীক্ষা বাঙলা সাহিত্যে নূতনত্বের দাবী করিতে পারে। আজকের দিনের মানুষ হইয়াও দ্বীপপুঞ্জের সাহাশ্রেণী শিক্ষা-দীক্ষায় একযুগ পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। জীবনের গতি সেখানে অনগ্রসর মন্থর। কিন্তু পর-পুরুষের সন্তান গর্ভে ধরিয়া এক প্রাণান্তিক বিপর্যয়ের মধ্যে মঙ্গলা যেদিন স্বামীর মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইল সেদিন দেখা গেল চিরাচরিত সংস্কার আর জড়ত্বকে অতিক্রম করিয়া মানুষের স্বাভাবিক জীবনবোধ জয়ী হইয়া উঠিয়াছে।

চরিত্র রূপায়ণে নরেনবাবুর অসাধারণ দক্ষতা দ্বীপপুঞ্জে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। নবদ্বীপ, মুরলী, সুবল, মঙ্গলা, আলতা, বিনোদ প্রত্যেকটি চরিত্র এক একটি স্বতন্ত্র দ্বীপের মত স্বকীয় প্রভায় উজ্জ্বল, পরিস্ফুট। দ্বীপপুঞ্জ নামটি সার্থক। কিন্তু ঘটনা সংযোজনায় একটু সংগতির অভাব চোখে পড়ে। মূল কাহিনীতে পৌঁছাইতে যেন একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে মনে হয়। কিন্তু প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়াই পড়িতে পড়িতে কোথাও ক্লান্তি আসে না। আলতা-বিনোদ কাহিনীর সঙ্গে মূল গল্পের সম্পর্ক সামান্যই অথচ কাহিনীটি এরূপ সম্পূর্ণ এবং রসোত্তীর্ণ যে আলাদা করিয়া রসোপভোগের বাধা ঘটে না।

দ্বীপপুঞ্জের আরেকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ করিয়া চোখে পড়িল। প্রকৃত বর্ণনায় কোথাও আতিশয্য তো নাই-ই বরং প্রচলিত অর্থে প্রকৃতি অনেক স্থানেই অনুপস্থিত। অথচ পাত্র-পাত্রীদের প্রতিদিনের চলাফেরায়, কাজেকর্মে তাহার একটি সংযত সম্পূর্ণরূপ যেন চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে। বিনোদের কীর্তনের আসরে, মঙ্গলাদের কুলা-নামানোর দৃশ্যে সামান্য কয়েকটি আঁচড়ে লেখক পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামাংশকে যে কুশলতায় পাঠকের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে বিস্ময় মানিতে হয়। বাঙলা উপন্যাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নয় একথা অসঙ্কোচে স্বীকার করা চলে।

অনন্য কেশ প্রসাধনীর গুণগান ক্ষান্ত হলে···

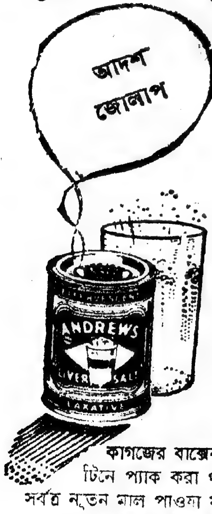


কোকোনল

কেশরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য 'ভাইটামিন এফ' সংযুক্ত অতুলনীয় সুগন্ধি খাঁটি নারিকেল তৈল।
৫, ১০ ও ২০ আউন্স সুদৃশ্য আধারে প্রাপ্তব্য।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ





প্রত্যুষেই এক গ্লাস উজ্জ্বল ফেনিল এণ্ডরুজ আপনাকে যে মধুর ভাব এনে দেবে তার প্রভাব থাকবে সারা দিন। মনে রাখবেন, এণ্ডরুজ আপনার শরীরের ভিতরে যে শুচিতা এনে দেয় তা আপনার স্বাস্থ্যরক্ষা করে এবং দৈনন্দিন পীড়া দূর করে।

এণ্ডরুজ মুখ ও জিহ্বা পরিষ্কার ও সঞ্জীবিত করে।

এণ্ডরুজ পাকস্থলীকে অম্লমুক্ত করে স্বাভাবিক রাখে।

এণ্ডরুজ লিভারকে সবল রাখে ও পিত্তাধিক্য দমন করে।

এণ্ডরুজ ধীরে ধীরে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে দেহাভ্যন্তর সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন রাখে। ইহা যন্ত্রণাদায়ক বিষবস্তু দূর করে, কোষ্ঠকাঠিন্য ভাল করে এবং রক্তকে বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ রাখে।

কাগজের বাক্সের মধ্যে টিনে প্যাক করা থাকে। সর্বত্র নূতন মাল পাওয়া যায়।

ANDREWS

এ ণ্ড রু জ লি ভা র স ল্ট

১০০ স্নিগ্ধ করে পুনঃ সঞ্জীবিত করে সতেজ করে

শ্বাস অর্থাৎ হাঁপানি কাসির দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহৌষধ। ইহা দুই দিন মাত্র সেবন করিতে হয়। মৃতপ্রায় রোগীর ইহাই একমাত্র প্রাণদাতা। মূল্য ডাকব্যয়-সহ ২৸৵০। কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী। মূল প্রতিষ্ঠান—পুলশিটা মেদিনীপুর। শাখা—৬নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চিঠিপত্র মূল প্রতিষ্ঠানে পাঠাইবেন।

পুরস্কার

উচ্চ শ্রেণীর হাতঘড়ী চামড়ার সুটকেস প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হইবে। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন

এন, পি, হাউস
পোষ্ট বক্স নং ১১৪৫৮
কলিকাতা

সতীশ কবিরাজের

শ্বাসারি

হাপানি ও ব্রঙ্কাইটীসে

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নিরাময়কারী মহৌষধ

১ মাসে হাঁপ কমে
১ শিশিতে আরোগ্য

মূল্য—প্রতি শিশি ৩।৵
ডাক মাশুল ৸০

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ
এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড সন্স
সাহাপুর • বেহালা • দক্ষিণ কলিকাতা

শাইকো

খোস, একজিমা, হাজা, কাটা, ঘা, পোড়া ঘা নালীঘা, ফুস্কুড়ি চুলকানি, ও চুলকানিযুক্ত সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগে অব্যর্থ।

এবিধান রিসার্চ ওয়ার্কস
চিত্তরঞ্জন এভেনিউ (নর্থ)

বিদ্যাসাগরী চটি

কথাটা উঠল ঐ নীল দর্পণের আলোচনা সম্পর্কেই। তারপরে যেমনটা হয়, আড্ডার কথা পাক খেয়ে খেয়ে মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে থাকে। সেই যে নীল দর্পণের অভিনয় দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে বিদ্যেসাগর মহাশয় কুঠিয়াল সাহেবের দিকে তাঁর চটি ছুড়ে মেরেছিলেন সে কথাও আলোচনা প্রসঙ্গে এসে গেল। একজন জিগগেস করলেন, আচ্ছা কুঠিয়াল সাহেবের ভূমিকায় কে নেবেছিলেন, বলুন তো। জনৈক সভ্য বললেন, যদ্দুর মনে পড়ছে, বোধহয় অর্ধেন্দু মুস্তুফি হবেন। আমি বললুম, ও প্রশ্নটা অবান্তর। বিদ্যেসাগর মহাশয় চটি ছুড়ে মেরেছিলেন সমগ্র ইংরেজ বণিক সমাজের মুখে। তাঁর চটি হচ্ছে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নিপীড়িতের আয়ুধ। যে যুগে কমিউনিষ্ট জন্মগ্রহণ করে নি বিদ্যেসাগর সে যুগের কমিউনিষ্ট। সকল রকম অত্যাচার এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এই অমিত-তেজ ব্রাহ্মণ যেভাবে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন সেরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। আমাদের Social order এর মূলদেশে তিনি যেমন নিদারুণ আঘাত হেনেছেন এমন আর কেউ করেনি। সেই নিরতিশয় কঠিন সংগ্রামে বলতে গেলে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একাকী। একদিকে আধা-বিলিতি সমাজ অপর দিকে সনাতনী হিন্দু সমাজ—এ দুই এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে—এই বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষকে কঠিন হস্তে শাসন করেছেন। একবার এই বিদ্রোহী বীরের চেহারাটি কল্পনা করে দেখুন—গায়ে বিদ্যেসাগরী মোটা চাদর—সেই তাঁর বর্ম—তূণে একটি মাত্র অস্ত্র, বলতে পারেন ব্রহ্মাস্ত্র—সেটি হচ্ছে পায়ের বিদ্যেসাগরী চটি। সেই সুপ্রসিদ্ধ চটির আস্ফালনে সমগ্র বঙ্গ সমাজ কম্পিত হয়ে উঠেছিল।

বিদ্যাসাগর যেমন প্রাতঃস্মরণীয় এবং চিরস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের চটিও তেমনি চিরস্মরণীয়। এমনকি প্রাতঃকালে স্মরণ করলেও লাভ বই ক্ষতি নেই। পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং না করে যদি ঐ চটি-যুগলকে নিত্য স্মরণ করি তবে বলব বাঙালী জাতির মহাপাতক নাশনং এর সম্ভাবনা আছে। শুনেছি বিদ্যেসাগর মশায় রঙ্গমঞ্চের ওপর যে চটি ছুড়ে মেরেছিলেন অর্ধেন্দুবাবু তৎক্ষণাৎ তুলে নিয়ে তা মাথায় রেখেছিলেন। বলেছিলেন, অভিনেতা জীবনে এই তাঁর চরম পুরস্কার। বিদ্যেসাগরী চটির চলন আজও আছে। ঘাড় বাঁকানো চটি পরে লোককে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে দেখি। অবিশ্যি তার চেহারার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। রং এর চাকচিক্য বেড়েছে, চামড়া আগের চাইতে অনেক নরম এবং তুলতুলে হয়েছে। সবলকে দুর্বল করতে বাঙালী সব সময়েই ওস্তাদ।

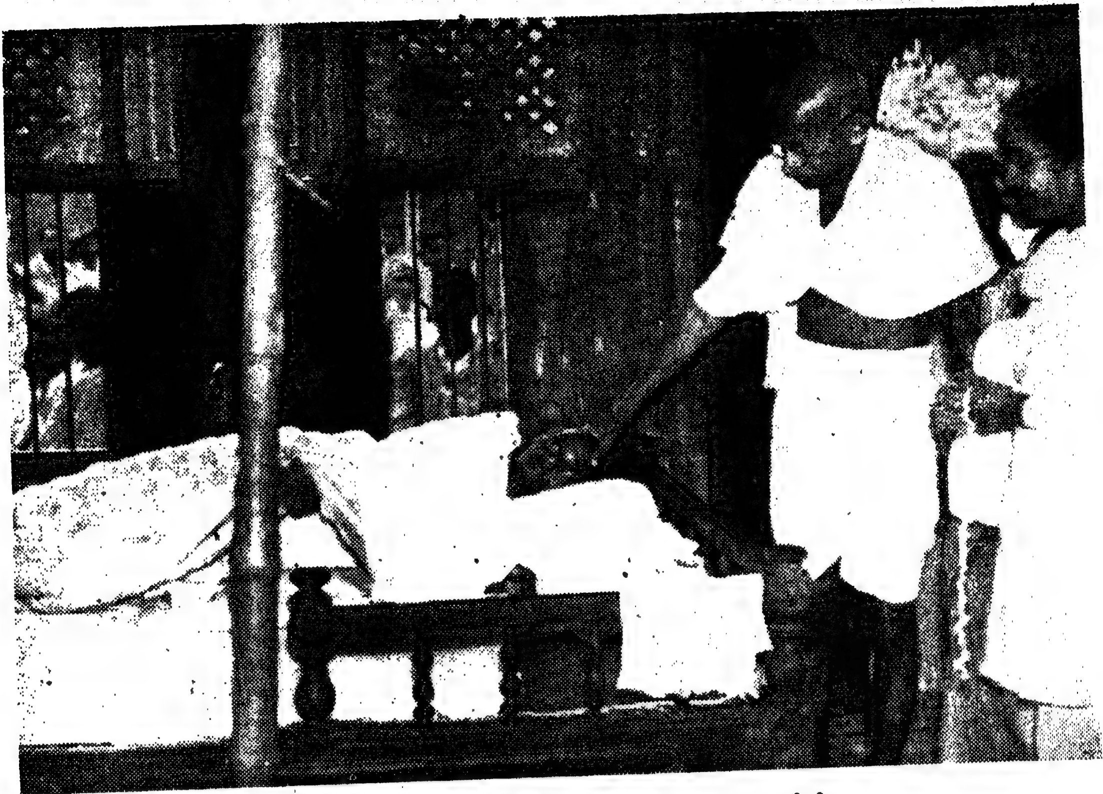


আদি এবং অকৃত্রিম বিদ্যেসাগরী চটিতে আর তার আধুনিক সংস্করণে যে তফাৎ বিদ্যাসাগর চরিত্রে আর আজকের বাঙালী চরিত্রে ঠিক সেই তফাৎ। বাঙালী জাতি যদি সত্যিকারের hero-worshipper হত তবে বিদ্যেসাগরী চটি পায়ে না রেখে অর্ধেন্দুবাবুর মতো মাথায় রাখত। যে জিনিস তার পদশোভা বর্ধন করে সে জিনিস তার শিরোভূষণ হতে পারত। কারণ আমার মতে বিদ্যেসাগরী চটি একটা symbol—বিদ্যাসাগরের দুর্জয় তেজস্বিতার প্রতীক। এই হিসেবে বিদ্যেসাগরী চটি বাঙলাদেশের একটা ইনস্টিটিউশন। বাঙলাদেশের এক যুগের ইতিহাস ঐ চটিকে কেন্দ্র করে এবং সে ইতিহাস অতিশয় গৌরবের ইতিহাস।

সেই বিদ্যাসাগরী উত্তরীয় এবং তালতলার চটির মর্মবাণী বাঙালী যদি যথার্থই অন্তরে গ্রহণ করত তবে আজকের শিক্ষাভিমানী বাঙালী সমাজ কখনই বিলাতি ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারত না। সেকালের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীরা যখন সাহেব সেজে ইংরেজ প্রভুদের উদ্দেশে চাটুবাক্য বর্ষণ করতেন তখন বিদ্যাসাগর পারপাটিরূপে তাঁদের প্রতি চটি বর্ষণ (figuratively) করতেন। ইতঃপূর্বে 'স্নব' নামক প্রবন্ধে আমি সে কথার আভাস দিয়েছি। তার জীবিতকালে সমগ্র বাঙালী সমাজ যে চরণ বন্দনা করেছে চটি সমেত সেই শ্রীচরণ তিনি উদ্ধত স্বভাব ইংরেজ রাজকর্মচারীর নাকের ডগায় তুলে ধরতেও কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নি। সে কাহিনী বোধ করি আপনাদের অবিদিত নেই। কার্যোপলক্ষে হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন। অভব্য সাহেব তাঁর সবুট পদযুগল টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। পরে যখন ঐ কার সাহেব সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাড় বাঁকানো চটি সমেত দুই পা টেবিলে তুলে দিয়ে সাহেবের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। বলা বাহুল্য সাহেব তাতে বিলক্ষণ বিরক্তি বোধ করেছিলেন। করবারই কথা, ইংরেজি এটিকেট শাস্ত্রমতে চটির চাইতে বুটের কৌলিন্য বেশী। সাহেবের উষ্মার কথা জেনে বিদ্যাসাগর মশায় হেসে বলেছিলেন, কি জানি, সাহেবি কায়দা কানুন তো ভালো জানিনে, আমি ভেবেছিলাম ওটাই বুঝি বিলিতি ভব্যতা।

চটি জুতার প্রতি ইংরেজের বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। শিবনাথ শাস্ত্রী বর্ণিত উড্রো সাহেব ও চটি জুতার উপাখ্যান আমাদের জানা আছে। বোধ করি বিদ্যাসাগরের চটির আঘাতেই ইংরেজের মনে এই চটি জুতো ভীতি জন্মেছে। সেটা আজ পর্যন্তও আছে কি না জানি না; কিন্তু কুড়ি পঁচিশ বৎসর আগে পর্যন্তও ছিল। স্যার আশুতোষ মুখার্জির এক সহযাত্রী ইংরেজ তাঁর চটি জুতো দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করেছিলেন। পরে আশুতোষ যখন নিদ্রিত তখন ঐ ইংরেজ পুঙ্গব তাঁর চটি কামরা থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আশুতোষ জেগে উঠে চটি খুঁজে পান না, ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। সহযাত্রীটি স্বয়ং তখন নিদ্রিত। আশুবাবু তৎক্ষণাৎ পেগ-এ ঝোলান সাহেবের কোটটি তুলে চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন। সকাল বেলায় জেগে উঠে সাহেব কোট খুঁজছেন, আশুবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন। আশুতোষ অতিশয় গম্ভীর মুখে বললেন, your coat has gone to fetch my slippers. ইংরেজ বীরপুঙ্গব আর কথা বাড়াতে সাহস করেন নি। ততক্ষণে বেশ বুঝতে পেরেছেন চটির চাইতে চটির মালিক আরো সাংঘাতিক বস্তু। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ যুগের বাঙালীদের মধ্যে স্যার আশুতোষ বহুল পরিমাণে বিদ্যেসাগরী চটির মান রক্ষা করেছেন অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিধ গুণ তাঁর মধ্যে বর্তিয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের কথাতেই আবার ফিরে আসা যাক। পূর্বেই বলেছি এই পুরুষ সিংহের বিক্রমে একদা সমগ্র বাঙালী সমাজ প্রকম্পিত হয়েছিল। শুনেছি এমন কথাও তিনি বলেছিলেন, বাঙলাদেশে এমন লোকটা কে আছে যার মাথার ওপরে এই চটিটা রাখতে পারিনে। সেদিন বাঙলাদেশ সত্যিই তাঁর চটিকে শিরোধার্য করে নিয়েছিল। এই স্পর্ধাপূর্ণ উক্তি শুনে অনেকে হয়ত বলবেন বিদ্যাসাগর অতিশয় অহঙ্কারী ব্যক্তি ছিলেন। তা তো ছিলেনই, যিনি অনন্যসাধারণ ব্যক্তি, অহঙ্কার তাঁকেই সাজে। বিনয় আমার এবং আপনার ভূষণ; কারণ আমরা অকিঞ্চন ব্যক্তি। বিদ্যাসাগরের বেলায় অহঙ্কারই অলঙ্কার। পুকুরে ঢেউ থাকে না, সাগরেই পর্বত প্রমাণ ঢেউ থাকে। প্রদীপে উত্তাপ থাকে না, সূর্যের উত্তাপে দহন জ্বালা আছে। হিমালয় উন্নত শির আকাশে তুলেছে, সে কি তার অহঙ্কার নয়? বিদ্যাসাগর সাগরের ন্যায় বিশাল, নগাধিরাজের ন্যায় উন্নত-শির; এই জন্যই অহঙ্কারে তাঁর বিধিদত্ত অধিকার।



নোয়াখালির শিরণ্ডী গ্রামে মিস আমতুস সালাম সকাশে গান্ধীজী



কেথুরি (নোয়াখালি) গ্রামে মহাত্মাজী সকাশে মৌলানা আনোয়ারউল্লা নামক জনৈক বিশিষ্ট মুসলমানকে দেখা যাইতেছে



বেলগাছিয়া ভিলাতে সাংবাদিক বৈঠকে মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ প্রমুখ আজাদ হিন্দ ফৌজের বিশিষ্ট সেনানায়কগণ আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শ বর্ণনা করিতেছেন

নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষে নেতাজী-ভবনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সহ আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়কগণ। বাম হইতে দক্ষিণে মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ, কর্ণেল বো ইয়ান নাইং, লেঃ কো কো কো এবং কর্ণেল হাবিবর রহমান

বৈদেশিকী

ভিয়েৎনাম

বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির মধ্যে বর্তমানে ভিয়েৎনামের সংগ্রামই সকলের চেয়ে জরুরী হয়ে উঠেছে। এর সংগে ভারতবর্ষের বর্মার এমন কি এশিয়ার ও আফ্রিকার ভাগ্যসূত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়ায় এই উপলক্ষে একটি শ্বেতজাতি ও অশ্বেত জাতির সংঘর্ষ ক্রমশ পেকে উঠবার উপক্রম হচ্ছে। এইসব কারণে আমাদের বৈদেশিক আলোচনায় এখন ভিয়েৎনাম সংগ্রামই শ্রেষ্ঠ আসন পাবার যোগ্য।

সামরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক, এই দুদিক থেকেই ভিয়েৎনামের ক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। সামরিক দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, বর্মায় ভিয়েৎনাম স্বেচ্ছাসৈন্য সংগঠন শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর আহ্বানের পরে ব্রহ্মী ভিয়েৎনামী স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক কর্ণেল ইয়ান নাইং যুক্ত ভারত-ব্রহ্ম স্বেচ্ছাবাহিনী গঠনের প্রস্তাব তুলেছেন ও শরৎচন্দ্রের সংগে পরামর্শের পরে তার পুরো ব্যবস্থা ঠিক হবে। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র প্রস্তাব করেছেন, ভারত থেকে ভিয়েৎনামে একটি মেডিক্যাল মিশন পাঠানো হবে। ভিয়েৎনামী প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হো-চি-মিন্ সমস্ত এশিয়াবাসীকে ভিয়েৎনামের সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন যে, এই সংগ্রাম যদি চলে, তবে আল্‌জিরিয়া, টিউনিশিয়া, মরক্কো, মাদাগাস্কার ও অন্যান্য ফরাসী উপনিবেশে গণ-অভ্যুত্থান হবে।

সুতরাং সামরিক দিক থেকে ভিয়েৎনামের সংগ্রাম ও তার জের এশিয়ার ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। এই সমস্ত জায়গায় এক সংগে সংগ্রাম চালাবার মত ক্ষমতা ফ্রান্সের বর্তমানে আছে কিনা সন্দেহ। ভিয়েৎনামে ফ্রান্সের যে দুর্ধর্ষ বৈদেশিক বাহিনী বা 'ফরেন লিজিয়ন' (এই বাহিনীটি সাধারণত ফ্রান্সের গুন্ডা, দস্যু প্রভৃতি মরিয়া শ্রেণীর লোকেদের দ্বারা গঠিত এবং এদের বেশীরভাগই বিপৎসংকুল যুদ্ধে বিশেষত 'কলোনিয়াল ওয়ার'এ পাঠানো হয়) লড়াই করছে। সম্প্রতি তাদের একজন সামরিক নেতা বলেছেন, 'ভিয়েৎনামীরা যেরূপ সংঘবদ্ধ ও দুর্ধর্ষ, এদের দমন করতে গেলে অন্তত পাঁচ লক্ষ ফরাসী সেনা দরকার। এত সৈন্য পাঠাতে গেলে ফ্রান্স ধ্বংস পাবে।' এই উক্তি থেকেই বোঝা যাবে ভিয়েৎনামের সংগ্রাম সামরিক দিক থেকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্স ব্যাপকভাবে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করছে এবং তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করতে, কিন্তু ভিয়েৎনামীরা গেরিলা নীতি অবলম্বন করেছে এবং শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে, গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে পোড়ামাটী নীতি চালাচ্ছে। সুতরাং সামরিক দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, ফ্রান্সের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে, যদি না ফ্রান্স তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলে।

ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব আরও বেশী। ফরাসী সাম্রাজ্যের এক কোণের এই সংগ্রাম আজ ব্রিটিশ, ডাচ প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সংগ্রামের সংগে যুক্ত হয়ে যেতে পারে এবং যেখানে এখন সংগ্রাম নেই সেখানেও হতে পারে। বর্মায় ও ভারতে এর ছোঁয়াচ এরি মধ্যে লেগেছে দেখা যাচ্ছে। শ্যামের এক লক্ষ ভিয়েৎনামী সহানুভূতি জানিয়ে ঘোষণা করেছে, আন্দোলন শুরু হওয়া বিচিত্র নয়। ইন্দোনেশিয়া সহানুভূতি জানিয়েছে। আফ্রিকায় আলজিরিয়া, টিউনিশিয়া, মরক্কো, মাদাগাস্কার প্রভৃতি ফরাসী উপনিবেশে যদি সংগ্রাম শুরু হয়, তবে তার পাশাপাশি বা কাছাকাছি ব্রিটিশ উপনিবেশ বা সম্পর্কিত দেশগুলি যেমন মিশর পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্তাইন আরব প্রভৃতি থেকে ছোঁয়াচ বাঁচানো কঠিন হবে। ফরাসী সাম্রাজ্যের বেনো জল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী।

সেই জন্যে হঠাৎ দেখা যাচ্ছে ইংরেজ ফরাসীতে একটি নূতন মৈত্রী বন্ধনের গরজ ব্রিটিশ জাতির হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছে।

গত যুদ্ধে ডানকার্কে ফ্রান্সকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালিয়ে আসবার পরে ইংরেজকে ফরাসীরা বিশ্বাসঘাতক মনে করত। তার পাল্টা জবাব দেন জেনারেল দ্য'গল, ফ্রান্স স্বাধীন হবার সংগে সংগে অপ্রত্যাশিতভাবে ইংরেজের মাথা ডিঙিয়ে সোভিয়েটের সংগে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। তার পাল্টা জবাব ইংলন্ড দেয় যখন ইংরেজের প্ররোচনায় সিরিয়াবাসীরা সংগ্রাম করে সিরিয়া থেকে ফরাসীকে বিদায় করে। সুতরাং অনেকদিন থেকেই ফরাসী-ইংরেজ মনকষাকষি চলছিল, যদিও তার বাহ্যপ্রকাশ ছিল কম।

কিন্তু এখন গরজ বড় বালাই। তাই ইংরেজকে নিজের সাম্রাজ্য বাঁচাবার জন্যে আগ বাড়িয়ে ফ্রান্সের সংগে একটি 'চাচা-আপন-বাঁচা' মৈত্রীর চুক্তি করতে হচ্ছে। তার প্রাথমিক কথাবার্তাও হয়ে গিয়েছে। ভিয়েৎনামের যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসীর হাতে বিলাতী 'স্পিট্‌ফায়ার' বিমানও দেখা দিয়েছে।

তবে ফরাসীর বিপক্ষে আবার মার্কিনের তৈরী বিমান দেখা দেওয়ায় এবং ইন্দোচীনের পাশের দ্বীপেই হঠাৎ চীনারা এসে খুঁটি গেড়ে বসায় ভিয়েৎনাম সংগ্রামের রাষ্ট্রনীতিক দিকটি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। হো-চি-মিন নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যবর্তিতা আহ্বান করেছেন।

বর্মা

বর্মায় প্রস্তুতির সংগ্রাম বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। বিলাতের আলোচনা এখনো চলেছে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতা সপ্তাহের আন্দোলন উপলক্ষে বর্মায় গোলোযোগের সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানীয় কমিউনিষ্ট দল জাতীয় গভর্নমেণ্টের সশস্ত্র বিরোধিতা শুরু করেছে, কোনো কোনো জায়গায় 'প্যারালাল্ গভর্নমেণ্ট' ও পাল্টা সরকার খাড়া করেছে। চার্চিল ও এটলি বর্মায় যে ভাঙনের আশায় সময় নেবার চেষ্টা করছিলেন, দেখা যাচ্ছে, সেই ভাঙনের শুরু হয়েছে। তবে ব্রহ্মের জাতীয় গভর্নমেণ্ট অতি কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করছেন, যাতে ক'রে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে নিজেদের ভিতর দলাদলি, ভাঙন না থাকে। আশা করা যায় এটলি সাহেব এইবারে ঘোষণা করতে পারবেন যে, বর্মার সকল দলে মিলন হলেই সেখানকার স্বাধীনতা বা গণপরিষদে কোনো বাধা থাকবে না।

এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বর্মায় যাঁরা জাতীয় সংগ্রামে, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করছেন, তাঁরা যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রকৃত বন্ধু, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

মিশর

নীল নদের জল অনেক দূর গড়ালো। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ যে পৃথিবীর সব জায়গার মতো মিশরেও তার ভেদনীতির দ্বারা চেপে বসবার সুবিধা করে নিয়েছে সে কথা আমরা পূর্বে একবার বলেছি। পরে যদি কোনদিন ইংগ-মিশরীয় চুক্তি বদলের ফলে ইংরেজকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে মিশর ছাড়তে হয়, সেই ভেবেই কূটনীতিজ্ঞ ইংরেজ বহু পূর্ব থেকেই আরেকটি কায়েমী ভাগাভাগির সূত্রপাত করে রেখে দিয়েছে। মিশর থেকে সুদানকে বিচ্ছিন্ন করে সেখানে একজন ইংরেজ গভর্নরের অধীনে একটি পৃথক শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। এবং সুদানকে একটি জোর বৃটিশ সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেছে, যাতে করে সুদান হাতে থাকলে সারা মিশরের উপর ইংরেজ সামরিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

মিশরের জাতীয় আন্দোলনের একটি দাবী

...মন মিশরের থেকে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ, ...মান দ্বিতীয় দাবী হ'ল মিশর ও সুদানের ...ক্য। ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি বদল উপলক্ষে যে ...ন্দোলন চলেছে মিশরে তার প্রধানতম বাধা ...ড়িয়েছে মিশরের সংগে সুদানের একীকরণ ...মস্যা। সুদানের যে বিলাতী গভর্নর, ঐ চুক্তি ...নুসারে তাঁর নিয়োগ-কর্তা হলেন যুক্তভাবে ...শরীয় ও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট। তাঁর চাকরীর ...য়াদ প্রায় শেষ হয়েছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট চান তাঁর পুনর্নিয়োগ, মিশরীয় গভর্নমেণ্ট তার ঘোর বিরোধী, কারণ ঐ গভর্নর প্রত্যক্ষভাবে এই ভেদনীতিক আন্দোলনে ইন্ধন যোগাচ্ছেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ইংরেজের সংগে চুক্তি বদল সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনায় কোনও ফল পাওয়া যাবে না জেনেই মিশরীয় গভর্নমেণ্ট ঐ আলোচনা খতম করে দিয়েছেন। প্রকাশ যে মিশরীয় গভর্নমেণ্ট ১৯৩৬ সালের ঐ চুক্তি সংশোধনের সমস্ত ব্যাপারটি আর ইংরেজের হাতে না রেখে সরাসরিভাবে সম্মিলিত জাতি সংঘের নিকট পেশ করবার আয়োজন করছেন।

দেখা যাচ্ছে, জাতি সংঘে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্বের ফলে অশ্বেত ও শোষিত জাতিগুলির কাছে জাতি সংঘ একটি নূতন মূল্য নিয়ে দেখা দিয়েছে।

যো

রঙ্গজগৎ

ভারতীয় চিত্রশিল্পের সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি সাধিত হ'লো ...সপ্তাহে কুন্দনলাল সায়গলের মৃত্যুতে। ...কাল রোগভোগের পর বিগত শুক্রবার তাঁর ...বাস পাঞ্জাবের জলন্ধর শহরে সায়গল ...লোকগমন ক'রেছেন। ভারতের রসপিপাসু ...ই এ সংবাদে মর্মাহত হ'য়েছেন, কিন্তু ...লার চলচ্চিত্রানুরাগীদের ব্যথাটা হ'য়েছে ...ী মর্মান্তিক। কারণ সায়গল পাঞ্জাবের ...বাসী হ'লেও বাঙলা দেশই তাকে আবিষ্কার ...র এবং শিল্পীজীবনের বেশী অংশ বাঙলার ... ও রেকর্ডের সেবায় নিরত থেকে বাঙলার ...ধিক জনপ্রিয় গায়করূপে সম্মানিত হ'য়ে ...ছেন। প্রধানত তাঁকে অবলম্বন ক'রেই ...উ থিয়েটার্স তথা বাঙলার চিত্রশিল্প ভারতে ...নের আসন করে নিতে সমর্থ হয়। প্রথমে ...নি নিউ থিয়েটার্সের আদিকালে 'জিন্দালাশ' ...মক একখানি ছোট ছবিতে অবতরণ করেন, ...র আগে অবশ্য হিন্দুস্থান রেকর্ডসে তিনি ...নকয়েক গান দিয়েছিলেন। তার যথার্থ ...রিচিতি ঘটে 'দেবদাস' চিত্রে দুখানি অমর ...নের মধ্যে দিয়ে—'কাহারে যে জড়াতে চায়' ...র 'গোলাপ হ'য়ে উঠুক ফুটে' আজও শ্রেষ্ঠ ...নরূপে পরিগণিত হ'য়ে আছে। এরপর ...বজয়া'-তে গান, 'ইহুদী কা লেড়কী', 'ডাকু ...নসুর', 'চণ্ডীদাস' (হিন্দী), 'ক্রোরপতি', ...পলেখা', 'দেবদাস', 'পূজারিন' 'দিদি', ...দেশের মাটি', 'জীবন মরণ', 'দুষমণ', ...রিচয়', 'সাথী', 'জিন্দগী', 'মাই সিস্টার', ...ছাড়া নিউ থিয়েটার্সের চিত্র অবতরণ ক'রে তার কণ্ঠমাধুর্যে সমগ্র ভারত বিশেষ ক'রে বাঙলাদেশকে মোহাচ্ছন্ন করেন। কোন অবাঙালীর পক্ষে বাঙালী হৃদয়ে এতখানি আসন ক'রে নেওয়া যাদুকরী কীর্তিরই সমান। কলকাতায় তাঁর সর্বশেষ ছবি ইউনিটি প্রোডাকসন্সের 'কুরুক্ষেত্র'। অতঃপর সায়গল বম্বেতে চ'লে যান। এখানে থাকতেই তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্বল ও খারাপ হ'য়ে যায়, বম্বেতে গিয়ে অত্যধিক কাজের চাপে তা মরাত্মক হ'য়ে দাঁড়ায়। মাত্র বছর তিনেকের মধ্যেই তিনি সেখানে 'ভক্ত সুরদাস', 'তানসেন', 'ভ'ওরা', 'ওমর খৈয়াম', 'সাজাহান', 'পরওয়ানা' প্রভৃতি প্রায় ডজনখানেক চিত্রে অবতরণ করেন, মৃত্যুকালে খানতিনেক ছবির কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। অর্থের দিক থেকেও সায়গলের মত আর কোন শিল্পীই চিত্রশিল্পকে সমৃদ্ধ ক'রতে পারেনি। মিশুকে এবং আসরজমানো এমন লোকও খুব কম দেখা গিয়েছে। ছবির অর্থকরী ক্ষমতা সম্পর্কে সায়গলই ধরতে গেলে ব্যবসায়ীদের চোখ খুলে দেন, ছবি যে কতখানি জনপ্রিয় হ'তে পারে সায়গল অভিনীত ছবিগুলিই তার প্রমাণ দিতে থাকে। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত শহরে গ্রামে যেখানেই চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে সেখানকার রসিকদের মন সায়গল জয় ক'রে নিয়েছেন তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত অনন্যসাধারণ সংগীতমাধুর্যে। অশরীরে সায়গল আমাদের কাছে অনুপস্থিত হ'য়ে গেলেও চিরকালের জন্য কিন্তু তাঁর কণ্ঠ দেশবাসীর কাছে অমর হ'য়ে থাকবেই। শিল্পীশ্রেষ্ঠ সায়গলের আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।



গায়ক সত্য চৌধুরী: শীঘ্রই এ'কে পর্দায় দেখা যাবে

* * *

ভেবেছিলুম লড়ায়ের দয়াতে দু' পয়সার মুখ দেখে মালিকরা লাভের ভাগ না হোক অন্তত মাসের মাস তাঁদের নির্ধারিত পারিশ্রমিকটা ঠিকমত দিয়ে যাবার মত মনোবৃত্তি অর্জন করেছে। আগেকার দিনে কর্মীদের পারিশ্রমিক ফাঁকি দেওয়া বেশীরভাগ মালিকের একটা পাশবিক খেয়াল থাকতে দেখা যেতো,—যার পয়সা আছে তারও, যার পয়সা নেই তার কথা বাদই

দিন। এই কারণে চিত্রনির্মাণ কাজে নিযুক্ত কর্মীদের দুর্দশার অন্ত ছিল না: লক্ষ লক্ষ রূপোর চাক্‌তীর জৌলুসের আড়ালে তাদের চক্‌চকে চোখের জল চাপা পড়ে যেতো। সে সব কর্মীদের মুখে একটু রা ছিল না, নির্বিরোধে নিতান্ত শান্তভাবে তারা নিজেদের জীবনপাত ক'রে শিল্পটিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে; মালিকরা বস্তা বেঁধে লাভের কড়ি সিন্দুকে ভরেছে কিন্তু ওদের দিকে ফিরেও চায়নি কোনদিন, ওরাও সেই লাভের কড়ির একটাও কোনদিন শুধু চায়নি নয়, নিজেদের ন্যায্য পাওনা পারিশ্রমিক ফাঁকি দিতে দেখেও মুখ বুজে চলেছে। যুদ্ধের পর পারিশ্রমিকের হার যত সামান্যই হোক অন্তত নিয়মিত পেতে আরম্ভ ক'রে কর্মীরা তবু দিন কতক আশ্বস্ত হ'য়েছিল। কিন্তু এখন কয়েকটি সংবাদ থেকে মনে হ'চ্ছে অবস্থা আস্তে আস্তে যথাপূর্বং হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। অবশ্য এটা শোনা যাচ্ছে একদল উট্‌কো প্রযোজকদের সম্পর্কেই। অনেকে ছবি তুলতে আসছে অত্যন্ত অল্প পুঁজি নিয়ে তারপর হালে পানি না পেয়ে সর্বাগ্রে কর্মীদের পাওনার ওপরে হাত বসিয়ে খানিকটা ছবির খরচ বাঁচাতে চেষ্টা করে শেষে পরিবেশকদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে ছবি শেষ ক'রে দেয় বটে কোন রকমে কিন্তু কর্মীরা আর তাদের পাওনার মুখ দেখতে পায় না। আর একদল আছে যারা নিজেদের আর পাঁচটা ব্যবসার সঙ্গে ছবি তোলাও একটা করে নেয় এবং এটার টাকা ওটার ওটার টাকা আর একটায় চালাচালি করতে করতে কোন বিপাকে পড়লেই সব প্রথম ছবি তোলার কর্মীদের পাওনাটাই বাদ দিতে আরম্ভ করে। আর তৃতীয় দল আছে যারা ফাঁকি দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার মতলব ক'রেই আসে। এসব প্রযোজকদের আগে থেকে চেনা মুস্কিল হয়। কথায় কথায় লাখ বিশ লাখ যারা মারে তারা কর্মীদের সামান্য বেতনই মারবার তালে থাকে এ ধারণা চট্ ক'রে লোকে কি ক'রেই বা ক'রে বসে—বিশেষ ক'রে আজকালকার দিনে কৃষ্ণ-বাজারের মুনাফাকারীরা যখন ছবি তোলার ব্যবসা ক'রতে আসছে। গোটা তিনেক এই ধরণের ভুয়ো প্রযোজকদের পাল্লায় প্রবঞ্চিত জনকয়েক ভুক্তভোগী চিত্রনির্মাণকর্মী তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাদের জানিয়েছেন। চলচ্চিত্র-কর্মীদের দেখেছি জোর ক'রে প্রাপ্য আদায় করার মুরোদ আগেও যেমন ছিল না এখনও নেই। সুতরাং কোন স্বাধীন প্রযোজকের অধীনে কাজ নেবার আগে তারা যাতে ভাল ক'রে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর যোগদান করে এইজন্যেই সাবধান ক'রে দেওয়া। নতুন প্রযোজকেরা লোক যোগাড় করার জন্যে নিয়োগ করার সময় অনেকরকম বড় কথা বলবে, অনেকভাবে প্রলুব্ধও ক'রবে সে সব ফাঁদে পা পড়লে সমস্ত কর্মজীবনটাই খর্ব হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

বিবিধ

গত রবিবার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ভারতীয় চিত্র-প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি 'জয় হিন্দ'-এর মহরৎকার্য সজীব চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সুসম্পন্ন হ'য়েছে। পরিচালক নিজেই কাহিনীর রচয়িতা।

* * *

গত সপ্তাহে মুক্তিলাভ ক'রেছে দীপক ও চিত্রপুরীতে মনোরঞ্জন পিকচার্সের 'নামুমকিন', জ্যোতি-প্রভাত প্রভৃতিতে 'উর্বশী' এবং গণেশে মুরলী মুভীটোনের 'ধ্রুবকুমার'।

* * *

লাহোরের ছাত্ররা আন্দোলন ক'রে ওখানকার সিনেমাগুলি থেকে পরাধীনতা ও দাসত্বের অন্যতম প্রতীক 'গড্ সেভ দি কিং' তুলে দিতে বাধ্য ক'রেছে। কলিকাতার ছাত্ররাও এ বিষয়ে নিশ্চয়ই পিছিয়ে থাকবে না। তার চেয়ে সিনেমার কর্তৃপক্ষরা যুগের হাওয়া মেনে নিয়ে নিজেরাই ওটা বন্ধ ক'রে দিলে তো আর কোন গোলমালই থাকে না—শেষ অবধি যখন বন্ধ তাদের করতেই হবে।

* * *

রাজা মুভীটোনের জহুর রাজা তার হীরে ছবি 'ক্লিওপেট্রা' প্যারিসের সেণ্ট মরিস স্টুডিওতে তুলবে ঠিক ক'রেছে। ছবিখানি হবে হিন্দুস্থানী ও ফরাসী ভাষায়; কাহিনী সাংবাদিক জাবাকের, পরিচালনা জহুর রাজার। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি এরা প্যারিস যাত্রা ক'রবেন।

অর্দ্ধ সাপ্তাহিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

যেখানে নিয়মিত ডাক পৌঁছে না সেখানে অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকাই একমাত্র সম্বল। দেশ বিদেশের খবর জানতে আজই বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র অর্ধ সাপ্তাহিক আনন্দবাজারের গ্রাহক হউন।

মূল্য সডাক

বাৎসরিক—১২, টাকা

ষাণ্মাসিক— ৬।০ „

ত্রৈমাসিক— ৩।০ „

১নং বর্মণ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট :: কলিকাতা।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

	বৎসর	আদায়ী মূলধন		ডিপোজিট	
এপ্রিল (উদ্বোধন মাস)	১৯৪০	৩,০৯,০০০,	উর্দ্ধে	১,০৫০,	উর্দ্ধে
ডিসেম্বর —	১৯৪০	৫,৭২,০০০,	„	৩,১৯,০০০,	„
ডিসেম্বর —	১৯৪১	৮,১৮,০০০,	„	২৪,৮২,০০০,	„
ডিসেম্বর —	১৯৪২	৯,৪৭,০০০,	„	৪০,০০,০০০,	„
ডিসেম্বর —	১৯৪৩	১০,০০,০০০,	„	১,১০,০০,০০০,	„
ডিসেম্বর —	১৯৪৪	১০,২০,১৭৫,	„	২,১৪,৬৯,২২৭,	„
ডিসেম্বর —	১৯৪৫	১০,৫৭,৬৫০,	„	৩,০৭,১১,৬৪০,	„

জাতীয় শিল্প ও ব্যবসার সমৃদ্ধিকল্পে প্রকৃত ব্যবসায়ীকে সুবিধাজনক সর্তে টাকা দেওয়া হয়।

আলামোহন দাশ
চেয়ারম্যান

খেলাধূলা

ক্রিকেট

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলায় বাঙলা দলকে হোলকার দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। হোলকার দল খুবই শক্তিশালী। সেই জন্য মনে হইয়াছিল বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ যুক্তপ্রদেশের বিপক্ষে যে দল গঠন করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী দল গঠন করিবেন। কিন্তু বাঙলার দল যখন হোলকারের বিরুদ্ধে খেলিবার জন্য ইন্দোর অভিমুখে প্রেরিত হইল তখন দেখা গেল দল পূর্বাপেক্ষাও শক্তিহীন। শোনা গেল অনেক খেলোয়াড় কর্মস্থল হইতে ছুটি না পাওয়ায় যাইতে পারিলেন না। পরিচালকগণ বিশেষভাবে চেষ্টা করিলে ছুটি পাওয়া সম্ভব হইত, ইহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। বাঙলা দল হোলকার দলের নিকট পরাজিত হইবেন ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজয় বরণ করিলে অনেক ভাল হইত। আমরা সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হইয়াছি দলের অধিনায়ক পরিবর্তন হইতে দেখিয়া। এইরূপ প্রাদেশিক দলের অধিনায়ক পরিবর্তন করিতে ইতিপূর্বে কখনই দেখা যায় নাই। যিনি অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে যখন সন্দেহ ছিল তখন তাঁহাকে উক্ত পদ না দিলেই হইত। একবার অধিকার দিয়া ঠিক পরের খেলায় তাঁহাকে সেই স্থান হইতে অপসারিত করায় সাধারণের নির্বাচকমণ্ডলী সম্পর্কে কি ধারণা হইল ইহা কি পরিচালকগণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? নিশ্চয়ই সাধারণে অনেক কিছু বলিবার সুযোগ পাইল। এই সুযোগ দিবার কি প্রয়োজন ছিল? চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পূর্বে ভবিষ্যৎ বিষয় একটু ভাবিয়া দেখা কি উচিত ছিল না? যে ব্যক্তি অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল তাহারই বা কি অবস্থা হইল? সে কি খুব শান্তিতে আছে? তাহাকে কি অনেক কটূক্তি শুনিতে হয় নাই? কতগুলি অদূরদর্শী লোকের জন্য বেচারাকে কতই না কষ্ট পাইতে হইতেছে এই কথা যখন মনে উদয় হইতেছে তখনই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে "ভগবান ইহাদের সুবুদ্ধি দাও। ইহাদের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি কর।" বাঙলার পক্ষ সমর্থন করিতে ইন্দোরে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল:—কার্তিক বসু (অধিনায়ক) কমল ভট্টাচার্য, নির্মল চ্যাটার্জি, ডি আর পুরী, পি সেন, এস ব্যানার্জি, ডি আর দাস, এ চ্যাটার্জি, এন চৌধুরী, এস মুস্তফী, শিশির ঘোষ, এস মিত্র, পি চ্যাটার্জি ও পি রায়। ইঁহাদের বিরুদ্ধে খেলিবেন নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ:—কর্নেল সি কে নাইডু (অধিনায়ক), মুস্তাক আলী, সি এস নাইডু, সি টি সারভাতে, এম এম জাগদেল, বি বি নিম্বলকার, জে এন ভায়া, গাইকোয়াড়, ও পি রাওয়াল, কপুর, মহারাজকুমার সুরেন্দ্র সিং।

হকি

নিখিল ভারত হকি ফেডারেশন স্থির করিয়াছেন লণ্ডনের আগামী বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে একটি ভারতীয় হকি দল প্রেরণ করিবেন। ভারতীয় দলের চূড়ান্ত নির্বাচন আগামী বৎসরের ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে হইবে। তবে এই বৎসর আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় যে সকল হকি খেলোয়াড় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন তাঁহাদের লইয়া একটি দল গঠন করা হইবে। ঐ গঠিত দল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিবেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, আমাদের ধারণানুযায়ী যদি কোন খেলোয়াড় দৃষ্টির বাহিরে থাকেন, তবে তাঁহাকে আবিষ্কার করা। ইহা ছাড়া নির্বাচিত খেলোয়াড়গণ একত্রে খেলিবারও সুযোগ পাইবেন। উদ্দেশ্য খুবই মহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা কথা কেবলই মনে হইতেছে, বাঙলার কেহ কি ভারতীয় দলে স্থান পাইবেন? বাঙলার হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড পূর্বাপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে। এই বৎসর বিশেষ উন্নতি হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। শীতকালীন হকি খেলা প্রবর্তন করিয়া পরিচালকগণ যে আশা করিয়াছিলেন তাহা পূরণ হয় নাই। যে সকল খেলোয়াড় এই শীতকালীন হকি খেলায় যোগদান করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও ভারতীয় দলে লওয়া যাইতে পারে না। কথাটা শুনিতে খারাপ লাগিলেও না বলিয়া পারা যায় না। কোন দলের কোন খেলোয়াড়ই আন্তরিকতার সহিত এই শীতকালীন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। বাঙলার হকি পরিচালকগণ কোনদিনই খেলার উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন নাই, কোনদিন করিবেন কি না সেই বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইহা কি খুবই সুখের বিষয়?

ব্যাডমিণ্টন

নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন সিংহলে যে দল প্রেরণ করিয়াছেন এই পর্যন্ত সকল খেলাতেই অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি প্রথম টেস্ট খেলায় ৭টি খেলাতেই বিজয়ী হইয়াছেন। ৫টি সিংগলস ও ২টি ডাবলস কোন খেলাতেই সিংহলী ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়গণ ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে বাঙলার খেলোয়াড় মনোজ গুহের সাফল্য। তিনি পরবর্তী সকল খেলাতেই সাফল্যলাভ করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। তবে ইহাতে আমরা সুখী হইলেও আনন্দিত হইতে পারিব না যতক্ষণ না বাঙলার কোন খেলোয়াড়কে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হইতে দেখিতেছি। আমরা আশা করি বাঙলার ব্যাডমিণ্টন পরিচালকগণ এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

কুস্তি

বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘের কর্মসূচীর তালিকা দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। ইঁহারা সকল সময়েই কর্মসূচী যে বিশেষ চিন্তার ও আলোচনার পর করেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মার্চ মাসে সিংহলে একটি দল প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন খুবই সুখের বিষয়। তবে দলটি সম্পূর্ণ বাঙালী মল্লবীর দ্বারা গঠিত হইলেই ভাল হইবে। সারা ভারতের মল্লবীরগণ বাঙালী মল্লবীরদের বিশেষ সুনজরে দেখেন না। নাম উল্লেখ করিব না, ভারতের কোন এক বিশিষ্ট মল্লবীরকে বলিতে শুনিয়াছি "মাছ খেয়ে কুস্তি লড়া যায় না।" আমরা আশা করি বাঙলার প্রত্যেক মল্লবীর এর সমুচিত উত্তর দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। শ্রদ্ধেয় মল্লবীর গোবরবাবু তাঁহার সন্তান ও শিষ্যদের লইয়া এক সময়ে ইহার উপযুক্ত জবাব দিয়াছিলেন। তিনি সাধারণের সহানুভূতির অভাবেই একরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন। বাঙলার সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের উচিত ইহাকে সজাগ করিয়া তোলা, তাহা হইলেই আমাদের অভীষ্ট কার্য সম্পন্ন হইতে দীর্ঘ দিন সময় লাগিবে না। এই সঙ্গে আর একটি বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে সেইটা হইতেছে বাঙলার কুস্তি পরিচালনা হিসাবে বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সংঘকে একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লওয়া। বাঙলায় কুস্তির বিষয়ে যেটুকু উৎসাহ বর্তমান আছে তাহা অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘের পরিচালকগণের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্যই, ইহা বলিতে আমাদের কোনরূপ দ্বিধা বোধ হইতেছে না।

ভালবল

বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণ এই বৎসর নিখিল ভারত ভলিবল প্রতিযোগিতা বাঙলায় অনুষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। নিখিল ভারত অলিম্পিক পরিচালকমণ্ডলী যে নিখিল ভারত ভলিবল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহা ঠিক নিখিল ভারতীয় অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানেরও কোন স্থিরতা নাই। অলিম্পিক অনুষ্ঠান না হইলে এই অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে। ইচ্ছামত প্রতিযোগিতা পরিচালনা করার দরুণই ভলিবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের খুব উন্নতি হয় নাই। বাঙলায় যে সামান্য উন্নতি হইয়াছে তাহা বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের জন্য হয় নাই, হইয়াছে বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েশনের জন্য। এই এসোসিয়েশন বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে জেলা এসোসিয়েশন সৃষ্টি করিয়াছেন। আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতাও করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া বাঙলার প্রায় দুইশতটি প্রতিষ্ঠান ইহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছেন। অপর দিকে অলিম্পিকের অধীনে থাকিয়া যে ফেডারেশন কার্য করিতেছেন তাঁহাদের অস্তিত্ব আছে কি না কেহই জানিতে পারে না। কেবল যখন প্রাদেশিক অলিম্পিক অনুষ্ঠান হয় তখন দেখা যায় কয়েকটি মাত্র ক্লাব লইয়া ভলিবল চ্যাম্পিয়ানশিপ অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই প্রহসন আর দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। যাঁহারা এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে আছেন তাঁহাদের আমরা বাঙলার ভলিবল খেলার ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়া অনর্থক এসোসিয়েশনের কার্যে বাধা সৃষ্টি না করিতে অনুরোধ করি।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২০শে জানুয়ারী—নয়াদিল্লীতে গণ-পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। দেশকে প্রকৃত স্বাধীনতা দানে সক্ষম শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে সত্যনারায়ণ সিংহ কর্তৃক উত্থাপিত কার্যপরিচালনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। লীগ গণ-পরিষদে যোগদান না করায় সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দুঃখ প্রকাশ করেন।

ভারতীয় নৌ-বাহিনীর গত বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসের বিদ্রোহ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল, অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট ঐ সম্পর্কে তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। রিপোর্টে যে সকল অভিযোগের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, গভর্নমেণ্ট তাহা দূর করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

২১শে জানুয়ারী—'ভিয়েৎনাম দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে অদ্য কলিকাতায় ছাত্র শোভাযাত্রী ও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ এবং তাহার ফলে একজন নিহত ও শতাধিক আহত হয় এবং প্রায় ২০ জন ছাত্রীসহ দুই শতাধিক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সংঘর্ষের সময় পুলিশ কয়েকবার গুলী চালায় এবং অনেকবার লাঠি চালনা করে ও কাঁদুনে গ্যাস ছাড়ে।

গত রাত্রিতে শিরণ্ডীতে (নোয়াখালি) স্থানীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দ মহাত্মাজীকে এই মর্মে এক লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন যে, উভয় সম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী যাহাতে অনুষ্ঠানাদি করিতে পারে, সেজন্য স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে তাহারা সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। গান্ধীজীর সাম্প্রদায়িক শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উক্ত প্রতিশ্রুতি পাইয়া ২৫ দিন পরে গত রাত্রিতে মিস আমতুস সালাম গান্ধীজীর নিকট হইতে কিছু কমলা লেবুর রস গ্রহণ করিয়া অনশন ত্যাগ করেন।

গান্ধীজী শিরণ্ডী ঠাকুরবাড়ীতে সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং ধর্মানুষ্ঠানে স্বাধীনতা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, ঐ প্রতিশ্রুতির পরেও যদি ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের রক্ষা না করে, তবে তিনি অনশন শুরু করিবেন। গান্ধীজী অদ্য শিরণ্ডী হইতে কেতুড়া গ্রামে গমন করেন।

নয়াদিল্লীতে গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে পরিষদের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাবের মুলতুবী বিতর্ক পুনরারম্ভ হয়। পরিষদের উদ্দেশ্যাবলী ঘোষণা সম্পর্কে নেহরুর প্রস্তাব বিবেচনা মুলতুবী রাখার জন্য ডাঃ এম আর জয়াকরের যে সংশোধন প্রস্তাব ছিল, অদ্য সকালে তিনি তাহা প্রত্যাহার করেন।

মজুরী বৃদ্ধি ও বোনাস মঞ্জুরের দাবীতে কলিকাতার ট্রাম কর্মীরা অদ্য ধর্মঘট শুরু করে।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, প্রায় ৪০ জন বন্দুকধারী ডাকাত টঙ্গী-ভৈরব লাইনের জিনার্দি ষ্টেশনের পার্শ্বে এক হোটেলে গত রবিবার রাত্রে হানা দিয়া কয়েকজন বস্ত্র ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বস্ত্র ও অর্থে প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

২২শে জানুয়ারী—ভারতের রাষ্ট্রিক আদর্শ ঘোষণা সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রস্তাবটি অদ্য গণ-পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতায় 'বেলগাছিয়া ভিলায়' অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ বলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ ঐক্যের আদর্শে বিশ্বাসী। কলিকাতায় নেতাজী জন্মোৎসব উপলক্ষে আগত প্রায় ১৫০ জন আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বাঙলার বৈষ্ণব সমাজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাগবত-ব্যাখ্যাতা প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কলিকাতায় ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

২৩শে জানুয়ারী—অদ্য কলিকাতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একপঞ্চাশতম জন্মোৎসব পরম প্রীতি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় ছিল কলিকাতায় এলগিন রোডে "নেতাজী ভবনের" দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজের ১৫০ জন অফিসারের উপস্থিতিতে গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উক্ত অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। এইদিন সকালে "বেলগাছিয়া ভিলায়" মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন। অপরাহ্নে ২২৭।২নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ ভবনে সুভাষ ইনস্টিটিউট অব কালচারের উদ্বোধন হয়।

গতকল্য ময়মনসিংহে ভিয়েৎনাম দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সর্বসম্প্রদায়ের ছাত্র লইয়া গঠিত এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রারা ধৃত ছাত্রদের মুক্তি দাবী করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকিলে পুলিশ তাহাদের উপর প্রথমে লাঠিচালনা ও পরে গুলীবর্ষণ করে। ইহার ফলে একব্যক্তি নিহত ও অনেক মহিলাসহ কয়েকজন আহত হয়। পুলিশ ১২ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে।

২৪শে জানুয়ারী—পাঞ্জাব সরকার সংশোধিত ফৌজদারী আইন মতে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক সংঘকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার সংগে সংগেই ন্যাশনাল গার্ড ও সেবক সংঘের অফিসে পুলিশ হানা দেয়। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের অফিসে খানাতল্লাসী করিতে পুলিশকে বাধা দেওয়ায় ফিরোজ খাঁ নুন (বড়লাটের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য), পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মামদোতের ইফতিকার হোসেন খান প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট লীগ নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আসাম গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্টের দরং জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ জারী করা হইয়াছিল, উহার অর্ন্তকাল আরও তিন মাস বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আসাম শান্তি-শৃংখলা অর্ডিন্যান্স অনুসারে ১১ জন মুসলিম লীগপন্থীকে আটক রাখার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

২৪শে জানুয়ারী—অদ্য গণ-পরিষদের অধিবেশনে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ কর্তৃক উত্থাপিত মাইনরিটির স্বার্থ সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই কমিটিতে ৭২ জন সদস্য থাকিবেন।

গত ২১শে জানুয়ারী কলিকাতায় ভিয়েৎনাম দিবসে পুলিশের গুলীতে আহত শ্রীধীররঞ্জন সেন (কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র) হাসপাতালে মারা গিয়াছেন।

২৫শে জানুয়ারী—আজ নয়াদিল্লীতে গণ-পরিষদের অধিবেশনে কার্য পরিচালনা কমিটি এবং যুক্তরাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত বিষয় নির্ধারণ কমিটি গঠন সংক্রান্ত দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর পরিষদের অধিবেশন আগামী এপ্রিল মাস পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। এই দিন ডাঃ এইচ সি মুখার্জি সর্বসম্মতিক্রমে গণ-পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

স্যার মহম্মদ সালেহ্‌ আকবর হায়দারী আসামের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯৪৭ সালের ৩রা মে তারিখে আসামের বর্তমান গভর্নর স্যার এণ্ড্রু ক্লোর কার্যকাল শেষ হইবে।

মহাত্মা গান্ধী অদ্য হিরাপুর (নোয়াখালি) গ্রামে পৌঁছেন। হিরাপুর তাঁহার পদব্রজ-পরিক্রমার বিংশতি গ্রাম।

জলন্ধরের সংবাদে প্রকাশ, পাঞ্জাব জনরক্ষা অর্ডিন্যান্স অমান্য করার দায়ে পুলিশ ২৪ জন লীগপন্থীকে গ্রেপ্তার করায় সহস্রাধিক লোকের এক জনতা স্থানীয় কারাগারে হানা দিয়া জেলের ফটক ক্ষতিগ্রস্ত এবং কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীর চুরমার করিয়া ফেলে।

২৬শে জানুয়ারী—অদ্য কলিকাতাবাসী অধিবাসীবৃন্দ কর্তৃক যথোপযুক্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

নেতাজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় সমাগত আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সেনানীবৃন্দকে অদ্য 'বেলগাছিয়া ভিলায়' এক বিপুলায়তন অনুষ্ঠানে কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে রাজোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মিঃ ফিরোজ খাঁ প্রমুখ ৭ জন লীগ নেতাকে অদ্য লাহোর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২০শে জানুয়ারী—ইন্দোচীনে হানয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শেষ সংগ্রামের জন্য ভিয়েৎনাম গেরিলা বাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাত্রাবাসের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। এই বাহিনীর মধ্যে মহিলা ও তরুণীও আছে।

২৪শে জানুয়ারী—ব্রহ্মের ফ্যাসী বিরোধী গণ-স্বাধীনতা সংঘের হেড কোয়ার্টার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আউংসান এবং তাঁহার সহকর্মীদের নিকট ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসার জন্য তার করা হইয়াছে। ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, লণ্ডন আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে—এই ঘোষণার সংগে সংগেই ব্রহ্ম শাসন পরিষদ হইতে ফ্যাসী বিরোধী গণ-স্বাধীনতা-সংঘের প্রতিনিধিগণ ব্রহ্মের গভর্নরের নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিবেন।

মার্কিন দস্যুদলের সর্দার আলফানসো কাপোন মিয়ামিতে (ফ্লোরিডা) মারা গিয়াছেন।

ব্রহ্মের কম্যুনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মের পুলিশ কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

২৫শে জানুয়ারী—মিশর মন্ত্রিসভা সুদান সম্পর্কে বৃটিশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন জানাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

২৬শে জানুয়ারী—কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, মিশরের সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। মিশর মন্ত্রিসভা দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

১৪শ বর্ষ

(১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত)



জীবন ও মৃত্যু!

জীবনে পরম সত্য মৃত্যু, মৃত্যুকে কেহ রোধ করিতে পারে না—কিন্তু উহার নির্মম আঘাতকে লাঘব করে একমাত্র জীবনবীমা।

দি

পিয়ারলেস লাইফ

এসিওরেন্স কোং লিমিটেড।

হেড অফিসঃ
৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

পলিসি হোল্ডারদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

= চেয়ারম্যান =
কাশিমবাজারের মহারাজা
শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, বাহাদুর
এম্-এ এম-এল-এ।

মিঃ আর রায়,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

জিতেন্দ্রকুমার পুরকায়স্থের আধুনিক উপন্যাস

'জীবনের ভুল"

(সংবাদপত্রে উচ্চপ্রশংসিত) সডাক মূল্য ২॥০

সমস্ত জীবনই ভুল, কিন্তু ভুল করা দুঃখ নয়, ভুল ভাঙ্গাই দুঃখ। পাওয়ার চেয়ে পাওয়ার আশাই বড়, প্রেমের চেয়ে প্রেমের কল্পনাই মধুর। মহৎ সব কিছুরই প্রেরণা আসে সংস্কার থেকে। সতীত্বই নারীত্বের মর্যাদাকে বড় করেছে। অতি আধুনিকতা অতি বৃষ্টির মতই মারাত্মক।

মূল্য অগ্রিম দেয়
(সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক)

প্রাপ্তিস্থান—লেখক জিতেন্দ্রকুমার পুরকায়স্থ
পোঃ আঃ হেতিমগঞ্জ, কায়স্থগ্রাম (শ্রীহট্ট)
(এম)

পুরস্কার

উচ্চ শ্রেণীর হাতঘড়ী চামড়ার সুটকেস প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হইবে। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন

এন.পি. হাউস
পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৮
কলিকাতা

খ্যাতনামা সাহিত্যিক
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের
চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক উপন্যাস

তরুণের স্বপ্ন

১ম পর্ব ৩॥০ ২য় পর্ব ২৬০

বাংগালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সুখ ও দুঃখের সবুজ সজীব আলেখ্য।

তাসের ঘর—২॥০
কণ্ট্রোলের শাড়ী—২৲

চলতি নাটক-নভেল এজেন্সী
১৪৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



ফুটবল !!• (ব্লাডারসহ)

সুগোল, টেঁকসই, মোলায়েম, সর্বোৎকৃষ্ট

প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত T. I. F. A. ৫নং—২৫৲, T. C. F. L.—২৩॥০; T. সর্বোৎকৃষ্ট—১৯॥০; ৪নং ১৫॥০, ৩নং ১২॥০; T. প্র্যাকটিস—১৬॥০, ৪নং ১২॥০, ৩নং ১১॥০; শীল্ড উইনার—১৫॥০, ৪নং ১১॥০, ৩নং ৯॥০, ২নং ৭॥০; খোকন—১০॥০, ৪নং ৭॥০, ৩নং ৬॥০, ২নং ৪॥০, ১নং ৩॥০; ব্লাডার—৫নং ২॥০, ৪নং ২৲, ৩নং ১৸০, ২নং ১৷৵০, ১নং ১৷০; পাম্প—৪॥০, ৩॥০ ও ২॥০; লোসং অল—৸০; সলিউসন—১৵০।

ভিঃ পিঃতে মাল পাইবেন—ক্যাটালগ ফ্রি

মোহনতোষ ব্রাদার্স লিঃ

স্থাপিত—১৯১১ সাল। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

তৃতীয় সংস্করণ বর্ধিত আকারে বাহির হইল। বাংগালী হিন্দুর এই চরম দুর্দিনে প্রফুল্লকুমারের পথনির্দেশ প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য।

মূল্য—৩৲
—প্রকাশক—
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।
—প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা।
ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

শ্বাস অর্থাৎ হাঁপানি কাসির দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহৌষধ। ইহা দুই দিন মাত্র সেবন করিতে হয়। মৃতপ্রায় রোগীর ইহাই একমাত্র প্রাণদাতা। মূল্য ডাকব্যয়-সহ ২৸৵০। কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী। মূল প্রতিষ্ঠান—পদ্মলশিটা, মেদিনীপুর। শাখা—৬নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চিঠিপত্র মূল প্রতিষ্ঠানে পাঠাইবেন।

আই, এন, দাস
(আর্টিষ্ট)
ফটো এনলার্জমেন্ট, ওয়াটার কলার ও অয়েল পেণ্টিং কার্যে সুদক্ষ, চার্জ সুলভ, অদ্যই সাক্ষাৎ করুন বা পত্র লিখুন। ৩৫নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



আপনার স্বাস্থ্য-সংবাদ

রক্ত দূষিত হইলে, দু'দিন আগেই হউক পাছেই হউক আপনার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে ফলে আপনার চেহারা বিশ্রী হ'য়ে উঠবে, মেজ খারাপ হয়ে যা জীবনের আনন্দ উপভো করতে পারবেন না।



যখনই রক্ত দূষিত হওয়ার এই সমস্ত রোগ যথা—বাত, আড় ও বেদনাযুক্ত গ্রন্থি বিখাউজ, ফোঁড়া, ইত্যাদি জাতীয় রো দেখা দিবে, তখনই এ বিখ্যাত মহৌষধ একটি পুরা কো সেবন করতে ভুল না।



সমস্ত ঔষধালয়েই ট্যাবলেট বা তরল আকারে পাওয়া যায়।

রোগান্তে...

ভগ্নস্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তিকে দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে হলে লঘুপাচ্য অথচ পুষ্টিকর বলাধানের প্রয়োজন। বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীর "এসেন্স অব চিকেন" বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে প্রস্তুত এবং সহজপাচ্য ও আশুফলপ্রদ।



বি, আই, এসেন্স অব চিকেন
আদর্শ পুষ্টিবর্দ্ধক

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা —১৩

সতীশ কবিরাজের
শ্বাসারি
হাপানি ও ব্রঙ্কাইটীসে

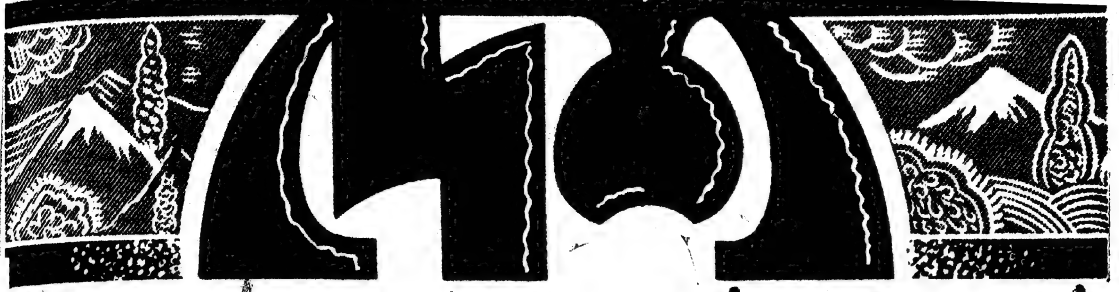
বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ
নিরাময়কারী মহৌষধ

১ দাগে হাঁপ কমে
১ শিশিতে আরোগ্য

মূল্য—প্রতি শিশি ১॥০
ডাক মাশুল ৬০

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে
পাওয়া যায়।

কবিরাজ
এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড সন্স



ম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

তুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ২৫শে মাঘ, ১৩৫৩ সাল Saturday, 8th February, 1947. [১৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গের নীতি প্রকৃতি

গণ-পরিষদ অবিলম্বে ভাঙিয়া দেওয়া ত, লীগ এই আব্দার তুলিয়াছে। বলা লা, এই আব্দার ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ঃ বস্তুত, লীগ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকেই র প্রধান মুরুব্বি বলিয়া মনে করে। লীগের তী অধিবেশনের সিদ্ধান্তের মূলে সাম্রাজ্য-দীদের গূঢ় প্রশ্রয়ই স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বাহুল্য, সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগের এই ধান্ত আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়, বরং ত ভারতের স্বাধীনতাকে প্রতিহত করিবার লীগ আগাগোড়া যে একটা দুরভিসন্ধি য়া চলিতেছে এবং তদনুযায়ী লীগের এই ধান্ত পূর্ব হইতেই পরিকল্পিত ছিল, ইহা মান করা গিয়াছিল। কার্যত ইংলণ্ডের জ্যবাদীদের ভারত সম্পর্কিত মনোভাব এবং রাচারপরায়ণ ভারতীয় সামন্ত নৃপতিবর্গ কে ইতিমধ্যে অনেকটা স্পর্ধিত করিয়া য়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে করাচীতে পরি-ীত প্রস্তাবে লীগ একই চালে দুই উদ্দেশ্য ধ করিতে চায়। একদিকে কংগ্রেসের উপর দিয়া লীগওয়ালারা আরও কিছু সুবিধা য় করিতে ইচ্ছুক; লীগ এই আশা অন্তরে ষণ করিতেছে যে, এইভাবে গণ-পরিষদ ত দূরে থাকিয়া যদি তাহার বাধাদানের নীতি ম্বন করিয়া চলে, তবে দেশের আভ্যন্তরীণ তর দায়ে পড়িয়া কংগ্রেস আসাম ও সীমান্ত শ প্রভৃতিকে মণ্ডলী গঠনে রাজী করাইয়া গর হাতে সমর্পণ করিবে; তবেই তাহাদের কস্থানী পরিকল্পনা পূর্ণ করিবার সুযোগ । অন্যদিকে কংগ্রেস যদি লীগের সেই গত এবং গণতন্ত্রবিরোধী ফ্যাসিস্টপন্থী তে সম্মত না হয়, তখন লীগের প্রধান ধীরা রহিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেক্ষেত্রে লীগকে আসিয়া সাহায্য করিবেন। এইভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কংগ্রেসের সংঘর্ষের পথ সযত্নে খুলিয়া রাখিয়া লীগ নিজের সুবিধা করিয়া লইতে চায়। এজন্যই করাচীর প্রস্তাবে কংগ্রেসের উপর লীগ সকল দোষ চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছে। মিঃ জিন্না এবং তাঁহার অনুগত দল সুদীর্ঘ বিবৃতি ফাঁদিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, কংগ্রেস ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যা সাধুভাবে স্বীকার করিয়া লয় নাই, সুতরাং মন্ত্রী মিশনের সমগ্র পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু মিঃ জিন্না ও তাঁহার অনুগত দল যাহাই বলুন না কেন, কংগ্রেস যে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা স্বীকার করিয়া লইয়াছে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এ সত্য মানিয়া লইয়াছেন এবং তদনুযায়ীই অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। গণ-পরিষদের কাজও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের স্বীকৃতিকে ভিত্তি করিয়াই অগ্রসর হইতেছে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগই মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে নাই, অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে প্রবেশের সুযোগটুকু অসাধুভাবে লুফিয়া লইয়া সেপুনরায় করাচী সিদ্ধান্তের দ্বারা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া গেল অর্থাৎ মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা স্পষ্টভাবেই পরিবর্জন করিল। এইরূপ অবস্থায় লীগ সদস্যদের অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে থাকিবার কোন অধিকার থাকিতে পারে না; কারণ, মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা বর্জন করিয়া অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে থাকার উদ্দেশ্য দেশের শাসনকার্যে বাধা দেওয়া এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না। লীগ এইভাবে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্জন করিবার পরও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কিরূপ মতিগতি অবলম্বন করেন, বর্তমানে তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহারা বহুদিন হইল এ সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করিয়া আছেন এবং লীগকে কূটচক্র পাকাইবার পক্ষে সুযোগ দিতেছেন। এখন আর তাঁহাদের নীরব হইয়া থাকিলে চলিবে না। যদি ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতাদানের সদিচ্ছাই তাঁহাদের থাকে, তবে লীগের দলকে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট ত্যাগ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করাই এখন তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে আমরা ভাল করিয়াই জানি এবং তাঁহাদের নিকট হইতে এতটা সাধুতা ও সরলতা আমরা আশা করিয়া উঠিতে পারি না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আগাগোড়া এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন যে, যাহারা মন্ত্রী মিশনের ১৬ই মে'র সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইবে, শুধু তাহারাই অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে যোগদানের যোগ্যতা লাভ করিবে। লীগের ওয়ার্কিং কমিটি স্পষ্টভাবেই এ কথা বলিয়াছেন যে, "গত জুলাই মাসে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা বর্জনের যে সিদ্ধান্ত তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, করাচীর অধিবেশনেও তাহা পরিবর্তনের পক্ষে কোন কারণ দেখিতে পাইতেছেন না।" সুতরাং ইহার পরও অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের ভিতরে ঢুকিয়া থাকিয়া আভ্যন্তরীণ সঙ্কট সৃষ্টির দুরভিসন্ধিপূর্ণ চক্রান্ত জাল বিস্তারে লীগকে সুযোগদানের কোন কারণ থাকিতে পারে না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এখন কোন্ পথ ধরিবেন? প্রচ্ছন্নভাবে লীগের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া তাঁহারা কি ভারতে নিজেদের স্বার্থ কায়েম রাখিবার কূট খেলা চালাইবার জন্য নূতন ফন্দী আবিষ্কার করিবেন? যদি সেই অভিপ্রায়ই

তাঁহাদের থাকে, তবে বিলম্ব না করিয়া খোলাখুলি নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করাই তাঁহাদের পক্ষে উচিত। স্বাধীনতাকামী ভারত সেজন্য প্রস্তুত হইয়াই আছে; বিদেশীর দাসত্ব আর সে কিছুতেই মাথা পাতিয়া লইবে না।

ব্যক্তি স্বাধীনতার ধুয়া

দেখিতেছি কিছুদিন হইতে মুসলিম লীগ দেশের সর্বত্র নিজেদের উপদলীয় নীতিকে তীব্রভাবে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। পাঞ্জাবে আমরা বিশেষ ভাবে এই নীতির পরিচয় পাইতেছি। পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট মুসলিম লীগের ন্যাশনাল গার্ড দলের উপর হইতে নিষেধবিধি তুলিয়া লইয়াছেন; কিন্তু লীগের দল নিবৃত্ত হইবার নহেন। তাঁহারা এই ধুয়া তুলিয়াছেন যে, জনগণের ব্যক্তিগত এবং রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্য তাঁহারা পাঞ্জাবে আইন অমান্যের আন্দোলন চালাইতে থাকিবেন। লীগের অনুগামিগণ এই ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িকতা এবং অহিংসার কথাও বলিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা দেখাইতে চাহিতেছেন যে, কংগ্রেস যেমন জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, তাঁহারাও সেইরূপ স্বাধীনতারই উপাসক। কিন্তু লীগের কর্মনীতি বিশ্লেষণ করিলে এই ক্ষেত্রে তাঁহারা কিরূপ ধোঁকাবাজী চালাইতেছেন এবং উপদলীয় সাম্প্রদায়িকতাকেই উস্কাইয়া তুলিতেছেন, তাহা ধরা পড়িবে। আমরা দেখিতেছি, এই আন্দোলন সম্পর্কে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ফাঁকা বুলি আওড়াইলেও পাকিস্থানী জিগীর তাঁহারা ছাড়িতেছেন না। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের অন্যতম সদস্য এবং লীগের অন্যতম নেতা মিঃ গজনফর আলী খান এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি পাঞ্জাবের সংগ্রামকে পাকিস্থানের জন্য সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, লীগ-নেতৃগণ তাঁহাদের প্রচারকার্যের দ্বারা ভারতবর্ষের সর্বত্র এমনভাবেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছেন যে, তাঁহাদের দ্বারা প্ররোচিত আন্দোলনে পাকিস্থানকে কেন্দ্র করিয়া সাম্প্রদায়িক ভেদবাদই স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং অন্যান্য বিষয় পরোক্ষ হইয়া পড়ে। পাঞ্জাবেও লীগের নীতি দ্বারা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িকতামূলক উপদলীয় স্বার্থাগ্নিই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের বৃহত্তম আদর্শে পরিকল্পিত সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলনের সংগে লীগের প্ররোচিত এই সব আন্দোলনের কোন তুলনা করাই চলে না। কংগ্রেস যত আন্দোলন করিয়াছে, সেগুলি বিদেশী আমলাতন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু মুসলিম লীগের আন্দোলন তাহা নয়। ইহার মূলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ পুরোদস্তুর রহিয়াছে। পাঞ্জাবের মন্ত্রিমণ্ডল লীগের দলভুক্ত নয়, সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের জন্য সংগ্রাম চালাইতে হইবে, লীগের আন্দোলনের মূলীভূত এই মনোবৃত্তির দ্বারা ভারতের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতাকেই চাড়া দিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। স্বাধীনতাকামী ভারতের দৃষ্টি হইতে এই সত্য প্রচ্ছন্ন রাখা চলিবে না।

পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে মিঃ জিন্না

পূর্ববঙ্গ বিশেষভাবে নোয়াখালির ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা এতকাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের নেতা মিঃ জিন্নার কোন আগ্রহের পরিচয় পাই নাই। সম্প্রতি এই আগ্রহের কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সম্পর্কে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী করাচীতে গেলে মিঃ জিন্না তাঁহার সহিত নোয়াখালির সম্বন্ধে আলোচনা করেন বলিয়া জানা যায়। বলা বাহুল্য, নোয়াখালির উপদ্রুত জনগণের জন্য মিঃ জিন্নার এ পর্যন্ত কোনরূপ আগ্রহই উদ্দীপ্ত হয় নাই। গান্ধীজী নোয়াখালিতে গমন করিবার পর লীগওয়ালাদের তরফ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সব প্রচারকার্য আরম্ভ হইয়াছে, বুঝা যায় মিঃ জিন্না সেই সম্পর্কেই বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করেন। গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিভ্রমণের ফলে লীগের নীতির দিক হইতে কিরূপ অসুবিধা সৃষ্টি হইতেছে, সম্ভবত সেই চিন্তাই এতদিন পরে হতভাগ্য নোয়াখালির প্রতি মুসলিম লীগের মহামান্য অধিনায়কের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। এই আলোচনার ভিতরের কথা কিছু জানা যায় না; তবে মিঃ সুরাবর্দী করাচী হইতে গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিভ্রমণ সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করেন; তাহা হইতে গান্ধীজীর পরিভ্রমণ সম্পর্কে সুরাবর্দী সাহেবের মনোভাবের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। মিঃ সুরাবর্দী বলেন, গান্ধীজীর পরিভ্রমণের ফলে পূর্ববঙ্গে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে এবং তাহাতে জনসাধারণের মনে আশ্বাসের ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। হয়ত ব্যক্তিগতভাবে সুরাবর্দী সাহেবের ইহা নিজের কথা; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, মুসলিম লীগওয়ালারা গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিভ্রমণকে আগাগোড়া সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখিতেছেন। সেদিনও মুসলিম লীগের একদল প্রতিনিধি গান্ধীজীর সংগে সাক্ষাৎ করিয়া গান্ধীজীর নিকট যে সব প্রস্তাব উপস্থিত করেন তাহাতে তাঁহাদের সেই মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা অন্তত কিছুদিনের জন্যও গান্ধীজীকে বিহা[রে] গমন করিতে পরামর্শ দেন। বিহারে অরাজকতা এবং অশান্তি সম্বন্ধে গান্ধীজ[ী] তাঁহার মনের ভাব সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়া[ছেন]। ইহার পরও বারংবার তাঁহাকে বিহা[রে] যাইবার জন্য অভদ্রভাবে চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্য [কি] আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। গান্ধীজী সত[্যই] বলিয়াছেন, বিহারে গিয়া যদি তিনি দেখি[তে] পান বিহার গভর্নমেণ্ট দুর্গতদের পু[নঃ]সংস্থিতির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছে[ন] তবে সেকথা তাঁহাকে বলিতে হইবে এবং তে[মন] কথা যদি তিনি একবার বলেন, তবে মুসলি[ম] লীগের কাজে কোন সুবিধা হইবে না। বস্[তুত] সে ক্ষেত্রে লীগওয়ালাদের অন্যরকম উদ্দে[শ্য] রহিয়াছে। গান্ধীজী একবার যদি তেমন ব[থা] বলেন, তবে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে লীগওয়াল[ারা] দ্বিগুণিতবেগে তাঁহাদের ভ্রান্ত প্রচার কা[র্যের] সুযোগ লাভ করিবেন এবং সেইভ[াবে] গান্ধীজী নোয়াখালিতে কঠোরভাবে যে [ব্রত] পরিপালনে নিযুক্ত আছেন, তাহা পণ্ড কা[রিয়া] দিতে তাঁহারা সুবিধা পাইবেন। গান্ধীজ[ীর] প্রার্থনা সম্বন্ধে লীগের তরফ হইতে যাঁ[হারা] আপত্তি তুলিতেছেন তাঁহাদের চিন্তাধারা সম[্পূর্ণ] অযৌক্তিক এবং সমুদার সংস্কৃতির বিরে[াধী] মনোবৃত্তির পরিচায়ক। বস্তুত কোন দা[য়িত্ব]সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের তরফ হ[ইতে] মানবতামূলক সার্বভৌম সংস্কৃতির বির[ুদ্ধে] এইভাবে যে আজও আপত্তি উঠিতে পারে, [ইহা] বিস্ময়ের বিষয়। ফলত সকল ধর্মের মূলে [ঐক্য] ও মানবতার উদার আদর্শ রহিয়াছে এবং [সেই] আদর্শ পারস্পরিক সংস্কৃতির সমুচ্চয়ে [মানব]সমাজকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের মূলে সাম্যের এই আদর্শ সমন্বয়ের কাজ না করিলে মানবসমাজ পশুর জীবনে পরিণত হইত। গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনায় ধর্মের এই মহান্ আদর্শই নরনারীর কাছে উপস্থিত করিতেছেন। প্রকৃত ধর্মমূলক সংস্কৃতি এবং সাধনাগত উদার অনুভূতি যাঁহাদের অন্তরে আছে, তাঁহারা ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করা তো দূরের কথা, আনন্দবোধই করিবেন। লীগ-ওয়ালাদের দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারকার্য সত্ত্বেও নোয়াখালির জনসাধারণ গান্ধীজীর পরিভ্রমণে মহদাদর্শের অনুপ্রেরণাই লাভ করিতেছেন এবং ভারতের এই মহামানবের ত্যাগময় জীবনের অত্যুজ্জ্বল আদর্শের প্রতিই তাঁহারা সমধিক আকৃষ্ট হইতেছেন, ইহা সুখের বিষয়।

পাকিস্থানী নীতির প্রসার

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী এতদিন প[রে] খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন যে বিহার হইতে দেড় লক্ষ মুসলমানকে বাঙলা[য়] আনিয়া বসতি-স্থাপনের সুযোগ ও সুবিধ[া]

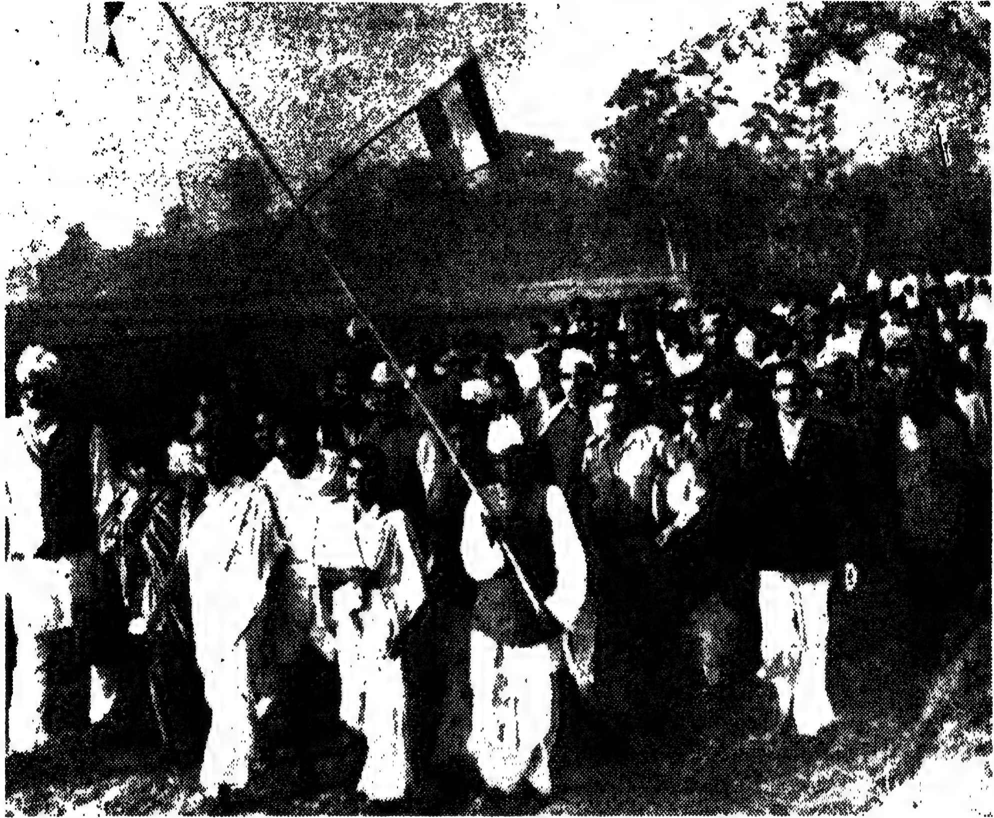
প্রদান করা হইয়াছে। আমরা এতদিন পর্যন্ত বাঙলা সরকারের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত তথ্য জানিতে পারি নাই; শুধু সাময়িকভাবে নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় দিয়া বাঙলা সরকার আমাদিগকে পুণ্য সঞ্চয়ের অবসর দিয়াছেন, এইটুকু জানিতে পারিয়াছিলাম। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর উক্তিতে সে সন্দেহের নিরসন হইল এবং বাঙলা সরকারের প্রিয় কর্মচারী মিঃ এন এম খাঁর বিহার অভিযান যে ব্যর্থ হয় নাই, সেই সঙ্গে বিহার কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে লীগওয়ালাদের ক্রমাগত প্রচার কার্য যে ফলপ্রসূ হইয়াছে ইহা বুঝা গেল। বিহার হইতে আগত এই মুসলমানেরা বাঙলার কোন কোন অঞ্চলে বসতি বিস্তার করিয়াছে, আশা করি অতঃপর সে সংবাদ প্রকাশিত হইবে এবং ইহাদের জন্য কোথায় কতটা জমিজমার সংস্থান করা হইয়াছে, তাহাও জানা যাইবে। বলা বাহুল্য বাঙলা সরকার পাকিস্থান বিস্তারের নীতি লইয়া পূর্ব হইতেই এজন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বাঙলা সরকার পতিত জমি খাস করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিল প্রণয়ন করিয়াছেন। গত সোমবার হইতে বাঙলার ব্যবস্থা-পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এই অধিবেশনে এই বিলটি উপস্থিত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। বাঙলার লীগ মন্ত্রিসভা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, ঐ সকল পতিত জমি খাস করিয়া তাহাতে যুদ্ধ-ফেরত লোকদের, ভূমিহীন শ্রমিকদের এবং গৃহচ্যুত ব্যক্তিদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইবে। কিছুদিন পূর্বে বাঙলার রাজস্বসচিব, আমাদিগকে শুনাইয়াছেন যে, ভারত শাসন আইনে যে সকল বিষয় আছে তাহাতে কেবল বাঙলার লোকের জন্য এইসব জমি সংরক্ষিত রাখা যায় না। সুতরাং বাঙলার ভূমিহীন কৃষক-দের ভাগ্যে এইসব জমি কতটা মিলিবে, সকলেই বুঝিবেন। কি কারণে এতদিন পরে এইসব পতিত জমি খাস করিবার দিকে বাঙলা সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা বুঝিতেও বেগ পাইতে হয় না। ভিন্ন প্রদেশ হইতে লোক আমদানী করিয়া বাঙলাকে পাকিস্থানে পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে। উক্ত বিলের বলে সংগৃহীত জমিগুলি বাঙলার দাবীকে বঞ্চিত করিয়া সেই উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করিলে কেহই বিস্মিত হইবেন না। বস্তুত বাঙলার ভূমিহীন মুসলমান কৃষকদিগকে আসামের দিকেই উস্কাইয়া পাঠানো হইবে। এইভাবে পূর্ব এবং পশ্চিম দুই দিক হইতে পাকিস্থান সম্প্রসারণের সুমহৎ পরিকল্পনাকে বাস্তব আকার দানের চেষ্টা চলিবে। লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের এমন নীতির ফলে বাঙালীর দুঃখ-দুর্দশা বাড়িবে ছাড়া কমিবে না; কিন্তু বৃহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত লীগ-মন্ত্রীদের কাছে বাঙলার গরীবদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কিত সুখ-দুঃখের সেসব ব্যাপার ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

বিদেশে ভারতের দূত

প্রতিপক্ষের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ বর্তমানে অপ্রতিহতগতিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মিঃ আসফ আলী ভারতের দূতস্বরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করিতেছেন। স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ এবং শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও ভারতের দূতস্বরূপে নিযুক্ত হইবেন, শোনা যাইতেছে। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের লীগ মনোনীত সদস্যগণ ইঁহাদের নিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু বড়লাটের কাছে আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও তাঁহারা পণ্ডিত জওহরলালকে তাঁহার সংকল্প হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হন নাই। বলা বাহুল্য, মিঃ আসফ আলী, স্যার রাধাকৃষ্ণন্ এবং শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী ইঁহারা প্রত্যেকেই ভারতের বিশিষ্ট সন্তান এবং বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্যতা ইঁহাদের সম্পূর্ণভাবেই আছে। দুইশত বৎসরের অধিককাল পরাধীন ভারত স্বাধীন ও সভ্য জগতের সর্ববিধ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিবর্জিত ছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন এই পরাধীনতার যুগে জগতের কাছে ভারতবর্ষকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যেই সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ হইতে প্রচারকার্য চলিয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্যের পশুবলদৃপ্ত প্রভাব ভারতবাসীদিগকে শুধু নাগপাশের বন্ধনেই আবদ্ধ রাখে নাই। সেই জড়বাদ ভারতের আত্মাকেও পিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে। জাতীয় আত্মার উপর এই নিষ্ঠুর পীড়নের বিরুদ্ধে বাঙলা দেশই প্রথমে বিদ্রোহ অবলম্বন করে। বঙ্গভূমির মনীষামূলক সাধনা পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপের বীভৎসতা উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং জাতির আত্মাকে নবগর্বে উদ্বুদ্ধ করে। স্বামী বিবেকানন্দের বজ্র-নির্ঘোষে বাঙলার তন্দ্রা ভাঙিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞানময়ী বাণী ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতন স্বরূপকে জাতির দৃষ্টিতে ভাস্বর এবং উজ্জ্বল করিয়া তোলে; ভারত ঘৃণ্য পরানুকরণ পরিত্যাগ করে এবং আপনার পথ ফিরিয়া পায়। কিন্তু পরাধীন ভারতের মনীষিবর্গের সে সব অমর অবদান জগতের সর্বত্র সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসারিত হইতে সুযোগ লাভ করে নাই; তাহা শুধু বিদেশের সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতিই সঞ্চার করিয়াছে। পরাধীনতার গ্লানি এমনই। পরাধীন যে জাতি বিশ্বদেবতার পূজা হইতে তাহারা এমনভাবেই বঞ্চিত থাকে। রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির এইভাবে অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে। রাজনীতিক অধিকারে জাগ্রত বিদেশীর প্রভাব বিনির্মুক্ত ভারত জগৎকে নবীন আলোকে উদ্দীপ্ত করিবে, সন্দেহ নাই।

সৈয়দপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙলার রাজধানী কলিকাতায় নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। তাহার বীভৎসতম প্রকাশ নোয়াখালিতে ঘটে। নোয়াখালির দৌরাত্ম্যের সে জ্বালা হইতে বাঙলার বুক এখনও সম্পূর্ণরূপে জুড়ায় নাই। ইহার মধ্যে গত সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে রংপুরের অন্তর্গত সৈয়দপুর হইতে নিদারুণ সাম্প্রদায়িক অশান্তির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সৈয়দপুরের উপদ্রুত অঞ্চল হইতে এপর্যন্ত ২৩টি মৃতদেহ বাহির করা হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি মারোয়াড়ী পরিবার সৈয়দপুর হইতে জলপাইগুড়ি শহরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন; সুতরাং এখানকার দৌরাত্ম্যও সামান্য রকমের হয় নাই, এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে। বাঙলা গভর্নমেণ্ট অবশ্য আগাগোড়া এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, তাঁহারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই ধরণের আশ্বাস আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করিতে পারে না। কারণ অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সরকারের এই ধরণের আশ্বাস প্রদান সত্ত্বেও অশান্তি সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। সুতরাং শুধু সরকারের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা দেশবাসীকে সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত থাকিয়া পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতির সম্পর্ক দৃঢ় রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা আজ এই সত্য অন্তরে একান্ত উপলব্ধি করুন যে, ভ্রাতৃঘাতী এই ধরণের বিরোধের ফলে কোন সম্প্রদায়েরই কল্যাণ অনুষ্ঠিত হয় না। এতদ্দ্বারা কতকগুলি স্বার্থান্ধ নেতৃত্বাভিমানীরই প্রতিষ্ঠা ঘটিয়া থাকে এবং দরিদ্র দেশবাসীরাই মারা পড়ে। ধর্মের নামে এইরূপ আত্মঘাতী বিরোধ বর্বরতারই পরিচায়ক। এই বিরোধ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জগতের দৃষ্টিতে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে এবং ভারতের স্বাধীনতার শত্রুপক্ষই এতদ্দ্বারা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বাঙলার তরুণ সম্প্রদায় মারাত্মক এই ধর্মান্ধতার কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিবার বীর ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করুন এবং এজন্য তাঁহারা বাঙলার গ্রামে গ্রামে সঙ্ঘবদ্ধ কর্মোদ্যমে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।



জয়াগ গ্রামের পথে মহাত্মাজী



পাল্লা হইতে পাঁচগাঁওয়ের পথে মহাত্মাজী



শিরণ্ডী গ্রামে মুসলমানদের মুখপাত্ররূপে মৌ লানা আনওয়ার উল্লা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবেন বলিয়া গান্ধীজীকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন। গান্ধীজীকে বিছানায় শায়িত দেখা যাইতেছে



গান্ধীজীর পল্লী-পরিক্রমায় একটি মুসলমান গৃহে অবস্থান কালে তাঁহাকে যে ফল ও মিষ্টি দেওয়া হয়, তাহা তিনি বালকদিগকে বিতর করিতেছেন

বৈদেশিকী

সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘ : মানব অধিকারের সনদ

সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের মানব অধিকার সম্বন্ধীয় কমিশনের কাছে গত সপ্তাহে ভারতবর্ষের তরফ থেকে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীযুক্তা হংস মেটা মানব অধিকারের সনদ সম্বন্ধে একটি খসড়া পেশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার, পূজার স্বাধীনতার, একত্র সম্মেলনের ও সমিতির স্বাধীনতার অধিকার আছে। তাছাড়া যেখানেই মানব অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে বা ক্ষুণ্ন হবার আশংকা আছে, সেখানেই সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের কাছে প্রতিকারের জন্যে যাবার অধিকারও তার আছে। মানবের অধিকার সম্বন্ধীয় এই ধরণের অনেকগুলি মূল কথা এই খসড়ায় দেওয়া হয়েছে।

সকলের চেয়ে দরকারী কথা এই আছে যে, যে-সমস্ত দেশে স্বায়ত্তশাসন নেই বা যারা অছি-ব্যবস্থার অধীন, এরূপ প্রত্যেক দেশই এই সনদের শাসনের অধীনে আসা উচিত; এমন কি যেসব দেশ এখনও জাতি সঙ্ঘের সভ্য হয় নাই, তারাও। শুধু তাই নয়, যারা এই সনদের সঙ্গে নিজেদের একবার যুক্ত করবে, তাদের আর কোন অধিকার থাকবে না একে অস্বীকার করবার। এই সনদকে লংঘন করলে সেই ব্যাপারটি জাতি সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

জাতি সঙ্ঘের মুখবন্ধে জেনারেল স্মাটস মানব অধিকার সম্বন্ধে এর আগে অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেগুলোকে কি করে কার্যকরী করা যায়, তার কোন নির্দেশ দেন নি। অর্থাৎ তাঁর কথাগুলোর পিছনে কোন আন্তরিকতা ছিল না। তাঁর কথার সঙ্গে শ্রীযুক্তা মেটার রচিত সনদের তফাৎ ঐখানে।

ব্রিটেন : সাম্রাজ্য-রক্ষার সামরিক নীতি

ইংলণ্ডে সাম্রাজ্য-রক্ষার ('ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স') জন্য একটি নূতন মন্ত্রী বিভাগ খোলা হ'ল, তার মন্ত্রী নিয়োজিত হলেন মিঃ আলেকজান্দার।

যুদ্ধ-শান্তির দু'বছর পরে এই 'আত্ম-রক্ষার' হঠাৎ প্রয়োজন কেন ঘটল ইংলণ্ডের পক্ষে, সেটি ভাববার কথা। এত বেশী প্রয়োজন হ'ল যে, তার জন্যে একজন আলাদা মন্ত্রীকেই নিয়োগ করতে হ'ল। এই যে 'আত্মরক্ষা', এ কার বিরুদ্ধে? অনেকগুলি আন্তর্জাতিক ঘটনার গতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা আর একটি মহাযুদ্ধ বাধাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বর্তমান ঘটনাটিও তারই আর একটি নিদর্শন। ইংলণ্ডে অন্ততঃপক্ষে দশ লক্ষ সৈন্য তোলা হবে এবং ফিল্ড মার্শাল লর্ড মণ্টগোমারী সৈন্যদের কড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন।

দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের নির্দেশের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি, এমন কি, তাকে অস্বীকার করবার জন্যে একটা উদ্ধত মনোভাব দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে গ্রাস করা সম্বন্ধে তার যে মতলব ছিল, সে বিষয়েও দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতি সঙ্ঘের স্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করবার জিদ দেখা যাচ্ছে। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার পিছনে ইংলণ্ডের সমর্থন বরাবরই ছিল। এই যে দক্ষিণ আফ্রিকার আপত্তি ও ইংলণ্ডের সমর্থন, এটা সাধারণ সাম্রাজ্যবাদীর রুটিন-মাফিক আপত্তি নয়। এর পিছনে এবারে কিছু নূতন কারণ ও রহস্য আছে এবং তার সঙ্গে ভারতের ভাগ্যও কিছু ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং ব্যাপারটি একটু বুঝে নেওয়া দরকার হয়েছে।

সুয়েজ খাল খুলবার পর থেকেই ভূমধ্য-সাগরের যাতায়াতের পথটির উপর প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য ইংলণ্ডকে ঘাঁটি বসাতে হয় মিশরে। তখন থেকে গত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইংলণ্ডই ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নৌশক্তি। কিন্তু বর্তমানে আমেরিকার কাছে ইংলণ্ডকে সে-গৌরব হারাতে হয়েছে। বিশেষত, বিমান-যুদ্ধের নীতি ও কৌশলের দ্রুত উন্নতি হওয়ায় ও তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় আধুনিক যুদ্ধ-নীতিতে নৌশক্তির সামরিক মূল্যের অনেক বদল হয়েছে। সুতরাং ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য-রক্ষার নূতন নীতিতে ভূমধ্যসাগরের স্ট্র্যাটেজিক মূল্যের পরিবর্তন ঘটেছে। এই সব কারণে এবং মিশর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে অশান্তি অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংলণ্ডকে তার মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক ও কূটনৈতিক বা স্ট্র্যাটেজিক ঘাঁটি মিশর (কায়রো ও আলেকজেন্দ্রিয়া) থেকে সরিয়ে আনার প্রয়োজন হয়েছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, এই ঘাঁটি হবে পূর্ব আফ্রিকায়। পূর্ব আফ্রিকা যদি সাম্রাজ্য-রক্ষার নূতন পরি-কল্পনার বা 'ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স স্কীমের' একটি প্রধান কেন্দ্র হয়, তবে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও ঘনিষ্ঠভাবে এই সাম্রাজ্য-রক্ষার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে; সেখানে জাতি সঙ্ঘের কোনরূপ কর্তৃত্ব ব্রিটেনের নূতন সাম্রাজ্য-রক্ষার প্ল্যানের পক্ষে বিঘ্ন-স্বরূপ হতে পারে। সেই জন্যেই জাতি সঙ্ঘ সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার এই কড়া মেজাজ।

পূর্ব আফ্রিকা যদি সাম্রাজ্যিক সামরিক ঘাঁটি হয়, তবে ভারত সম্বন্ধে ভাববার বিষয় আছে। কায়রো অপেক্ষা পূর্ব বা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতকে সামরিকভাবে, বিশেষত যুদ্ধ-বিমান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হবে। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে আণবিক বোমা নির্মাণের উপযোগী খনিজ ধাতু আবিষ্কৃত হওয়ায় এই নিয়ন্ত্রণের ও নূতন ঘাঁটির জন্য দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার স্ট্র্যাটেজিক মূল্য বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে।

চীনে মার্কিনের নূতন নীতি

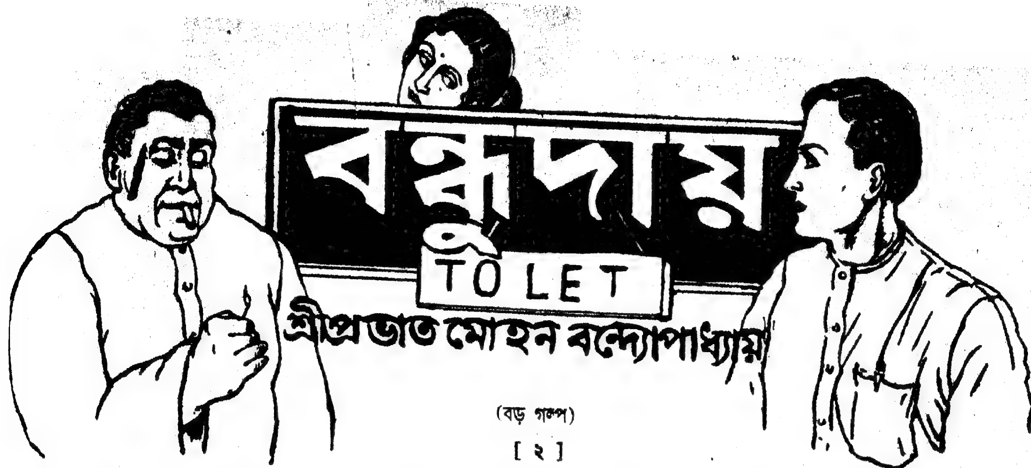
গত ২৯শে জানুয়ারী আমেরিকা সরকারী-ভাবে ঘোষণা করেছে যে, ১৯৪৫ সালে চিয়াং-কাইশেকের চীনা গভর্নমেণ্ট, কমিউনিস্ট চীন ও আমেরিকা—এই তিনকে নিয়ে যে বৃহৎ ত্রয়ী গঠিত হয়েছিল, তাথেকে আমেরিকা সরে দাঁড়াল।

গত মহাযুদ্ধের এশিয়া-পর্ব শেষ হবার সময়ে দেখা গেল মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার সামরিক প্রভুত্ব ও চীনা কমিউনিস্টরা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। চিয়াং-কাইশেকের সামরিক তৎপরতা ও শক্তি কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে এত কম যে, তাদের দখল থেকে চীনের উত্তরাংশকে উদ্ধার করে চিয়াংএর অধিকার বসানো প্রায় অসম্ভব। শুধু তাই নয়, কমিউনিস্ট সেনা উত্তর চীন একবার পূর্ণভাবে দখল করতে পারলে তাদের হাত থেকে বাকী চীনকে রক্ষা করাও অসম্ভব হবে।

সুতরাং উভয়ের পক্ষে মিটমাটের নামে ও "গৃহযুদ্ধ" ঠেকাবার নামে আমেরিকা "মধ্যস্থতার" ভূমিকা গ্রহণ করে, আমেরিকার বর্তমান সেক্রেটারী অব্ স্টেট্ জেনারেল মার্শালের নেতৃত্বে। মার্কিন সেনাপতিরা চিয়াংয়ের সৈন্যদের আধুনিক কায়দায় তৈরী করতে লাগল, লীজ্-লেণ্ডের বাড়তি যুদ্ধসরঞ্জাম আমেরিকা উদারভাবে চিয়াংকে দান করে ফেল্লে, অবশ্য লেবেল্ তুলে দিয়ে, মার্কিন বিমান ও যুদ্ধজাহাজ চিয়াংয়ের সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে পেঁাছে দিতে লাগল, সবই "মধ্যস্থ" হিসেবে।

কিন্তু দেখা গেল চীনারা এই "মধ্যস্থতার" ঠিক কদর বুঝতে পারল না। গৃহযুদ্ধ বাধাবার পক্ষে "সাহায্য" করবার অভিযোগ চীনারা ক্রমশ বেশী করে আনতে লাগল এবং মার্কিনের বিরুদ্ধে 'চীন ছাড়ো' আন্দোলন ক্রমে বাড়তে লাগল। সেই সময়ে চীনা মেয়েদের উপর মার্কিন নাবিকদের দুর্ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ আন্দোলন অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক হয়ে উঠল। এ হেন কালে ট্রুমান্ চীন থেকে জেনারেল্ মার্শালকে ডেকে পাঠালেন ও তাঁকে সেক্রেটারী অব্ স্টেট্ নিযুক্ত করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মার্কিনের 'নূতন' নীতি ঘোষিত হ'ল—চীনের ব্যাপারে আর আমেরিকা "মধ্যস্থ" থাকবে না, চীনা রঙ্গমঞ্চ হতে মার্কিনের নিষ্ক্রমণ। এবার চীনের 'গৃহযুদ্ধ' বেশ পাকাপাকি রকম বাড়বার সম্ভাবনা আছে,—যদি না কেউ এই ব্যাপারটি জাতিসঙ্ঘের দরবার পর্যন্ত নিয়ে যায়। —ঘো—



(বড় গল্প)

[২]

সুমন্ত্র বন্ধুর জন্য বাড়ি খুঁজিতেছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে সকালবেলা বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল। এখন বেলা দুইটা বাজে। পাড়ায় আর একখানি বাড়িও দেখিতে বাকি নাই। সুমন্ত্র ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছিল। যতগুলি বাড়ি দেখিয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই তাহার পছন্দ হয় নাই, যেগুলি পছন্দ হইয়াছে সেগুলির হয় ভাড়া অত্যধিক, না হয় পাশের বাড়িতে রেডিয়ো বাজে। কোথাও বাড়িওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, কোথাও তাহার সহিত তর্কাতর্কি হইয়াছে। কালিদাস সিংহের লেনে একটা বাড়িতে তো মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। বাড়িওয়ালা ভাড়া বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকেন, অনেক ডাকাডাকির পর গামছা পরিয়া আসিয়া বহু কষ্টে কব্জাহীন পতনোন্মুখ দরজাটি খুলিয়া দিলেন। একটা পাল্লা ঈষৎ কাৎ হইয়া রহিল, আর একটি অর্ধেকটা খুলিল। তাহারই ফাঁক দিয়া ভদ্রলোক সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "কোত্থেকে আসছেন? মোশায়ের নাম?" সাতপুরুষের ফিরিস্তি লইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমার বাড়ি কি আপনি নিতে পারবেন মোশাই? ষাট টাকা ভাড়া লাগবে। দু'টি মাসের ভাড়া আগাম দিতে হবে আর দু'টি বচ্ছরের কণ্ট্যাক্টো ক'রতে হবে।"

সুমন্ত্র বলিল, "বাড়ি পছন্দ হ'লে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দিতে পারি, আর ছ' মাসের ভাড়া আগাম দিতে পারি। বাড়ি তো আগে দেখি।"

বাড়িওয়ালা খুসি হইয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ, কথাবার্ত্রা পরে হবে, বাড়ি তো দেখুন আগে। পটলা, এই পটলা, এই বাবুটিকে তিন লম্বোরটা খুলে দেখিয়ে দে তো।" তারপর সুমন্ত্রর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একটু নোংরা হ'য়ে আছে মোশাই, একটা মজুর লেবে।"

আন্দাজ বিংশতিবর্ষবয়স্ক একটি যুবক স্নানের পর লুঙ্গি পরিয়া সদর দরজার ওপাশে দাঁড়াইয়া আরশি হাতে পরিপাটি করিয়া পাতা তুলিয়া তেড়ি কাটিতেছিল এবং মাঝে মাঝে সুমন্ত্রর দিকে তাকাইতেছিল, পিতার আদেশ শুনিয়াও শুনিল না। বাড়িওয়ালা আবার হাঁকিলেন, "বলি লবাবপুত্তুরের কথাটা কানে গেল, না গেল না? তিন লম্বোর বাড়ির চাবিটা লিয়ে এস।"

এইবার যুবক অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীরমন্থর-গমনে ভিতরে চলিয়া গেল, তাহার পিতাও তাহাকে অনুসরণ করিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে যুবক গায়ে একটা চুড়িদার পাঞ্জাবী আঁটিয়া এবং স্লিপার পায়ে দিয়া চাবির গোছা লইয়া বাহির হইলঃ বলিল, "আসুন, স্যার।"

পিতাপুত্রের কথাবার্তায় একটিমাত্র 'স' উচ্চারিত হইতেছিল, উহা বিশুদ্ধ সংস্কৃত দন্ত্য 'স', ইংরাজি 'এস'এর নামান্তর, বাঙলায় উহার বহুল ব্যবহার নাই। বাড়ির দরজায় দুই দুইটি বৃহৎ তালা, সেগুলিকে বশ করিতে এবং সদর দরজা খুলিতে কিছুক্ষণ কসরৎ করিতে হইল। যুবক অর্থাৎ পটোল অনুচ্চস্বরে বলিল, "যেমন সালার বাড়িওলা, তেমনি স্লার বাড়িও জুটেচে।"

দরজা খুলিতেই সুমন্ত্র নাকে কাপড় দিল, পটোলকে অনুসরণ করিয়া অন্ধকারেই ভিতরে ঢুকিল বটে, কিন্তু দুই পা গিয়াই আর অগ্রসর হইতে পারিল না। পটোল বলিল, "সাবধানে আসবেন মোসাই, সাপ খোপ কোথায় কি আচে স্লা, কে জানে? টর্চ্ অনেন নি? আপনি তো মোসাই আচ্ছা লোক? টর্চ্ না নিয়ে ভদ্দরলোকে বাড়ি দেখতে আসে?"

সুমন্ত্রর টর্চ না আনার জন্য অনুতাপ হইল বটে, কিন্তু দিনদুপুরে বাড়ি দেখিবার জন্য যদি কেহ টর্চ না আনে তবে সে ভদ্রলোক-পদবাচ্য নহে, পটোলের এই উক্তিটি সে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। যাহা হউক অন্ধকার চোখে সহিয়া গেলে সুমন্ত্র কোনো-রকমে পটোলের পিছন গোটা দুই ঘর পার হইয়া আলো দেখিতে পাইল। পটোল এতক্ষণ হাততালি দিতে দিতে অগ্রসর হইতেছিল এইবার একটা নৈশ্চিন্ত্যের নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাসিল; বলিল, "কই মোসাই, একটা সিগ্রে টিগ্রেট ধরান! ড্যাম্পো যে স্লা! কথ থেকে গলাটা সুড়সুড় ক'রছে মাইরি!"

সুমন্ত্র বলিল, "আমি তো সিগারেট খা না।"

পটোল সন্দেহভরে বলিল, "দাঁত দেকি?

সুমন্ত্র হাসিল, শুভ্র সুন্দর দন্তপং দেখিয়া পটোলের সন্দেহ গেল বটে, কি অপ্রসন্নতা ঘুচিল না। বিরক্তিভরে বলি "স্লা আর জন্মে দিয়ে এসেচেন কি, খাবেন?" অগত্যা পটোল নিজের প হইতেই একটা আধপোড়া বিড়ি বাহির কর ধরাইতে ধরাইতে স্বগতোক্তি করিল, "স্লা, ভাড়াটেও কি জুট্ল তেম্নি অগামারা? সিগ্রেট খায় না,—সে কি মানুস?"

বাড়িটি বহুকালের। ঘরগুলির মেঝে রাস্তার চেয়ে এক হাত নীচু। সারি সারি ছোটো ছোটো ঘর, তিনদিকে অন্য বাড়ির উঁচু পাঁচিল। বাড়িটির ঠিক মধ্যস্থলে দুই হাত চওড়া একটি উঠান, সেইখানেই নোংরা সবচেয়ে বেশি। উঠানের চারিদিকে এক হাত করিয়া রক। ঠিক দুপুরের রৌদ্র তাহার ঔজ্জ্বল্য হারাইয়া কোনো গতিকে সেই উঠানে এবং রকে পৌঁছিয়াছে। উঠানের এক পাশে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। কোনো ধাপের ইঁট নড়িতেছে কোনো ধাপের দুই একখানা খসিয়াও গিয়াছে সেই ভাঙা ভাঙা সিঁড়ি দিয়া আবর্জনার স্তূপ ডিঙাইয়া লাফাইতে লাফাইতে তাহারা দোতলায় উঠিল। চতুর্দিকে ছেঁড়া কাগজ, পচা ন্যাকড় ও চট, ভাঙ্গা হাঁড়ি সরা, পশুপক্ষীর মল এব বিবিধ জাতীয় আবর্জনা পচিতেছে, দুর্গন্

দম বন্ধ হইয়া আসে। বহুদিন নয়—বহু বৎসর যে সে বাড়িতে মানুষ বাস করে নাই তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল। সুমন্ত্র দমিয়া যাইতেছিল; বলিল, "এ যে ভূতের বাড়ি হ'য়ে আছে, মশাই?"

পটোল বলিল, "ভূতের বাড়িই তো! পাড়ায় খোঁজ না নিয়ে এসেছেন কি ক'রতে? অনেক দিন আগে এক স্লা ভাড়াটের পরিবার গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেল যে ঐ ঘরে, সেই থেকে, মোসাই, এ বাড়িতে আর ভাড়াটে ঘে'সে না।" তারপর নাক দিয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া সুমন্ত্রকে আশ্বাস দিল, "আপনি ব্যাটা ছেলে, একা মানুস, আপনার ভয় কি, মোসাই? আমরা সব এসে পাহারা দোবো, স্লা ভূতের বাবাও কছু ক'রতে পারবে না।" এই বলিয়া দোতলার রাস্তার দিকের জানালাটা খুলিয়া দিল। খানিকটা দক্ষিণের বাতাস ঘরে ঢুকিতেই সুমন্ত্রের মনটা একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল, বলিল, "কাছাকাছি কোথাও রেডিয়ো বাজে না তো?"

পটোল বলিল, "সিটি হ'বার জ্যো নেই, মোসাই। আমাদের থিয়েটারের কেলাব আছে, রিহার্সেলের সময় রেডিয়ো বাজলে কাজের বড়ো ক্ষেতি হয়; তাই যখন খুসি হয় বাইরে গিয়ে শুনে আসি, পাড়ার মধ্যে স্লাকে ঢুকতে দিই না। একবার একজনরা এনেছিল, দু'দু'বার জানলা দিয়ে ঢিলিয়ে ফাঁক ক'রে দিতেই আর বাজালে না।"

যাক থিয়েটারের আখড়া, ব্যান্ডপার্টি যাহাই থাকুক সে চিন্তা সুমন্ত্রের নয়, ভদ্রেশ্বরের সর্ত—রেডিও না থাকিলেই হইল। সহসা ঘরটার চড়খাওয়া অবস্থার দিকে নজর পড়িতেই সুমন্ত্র বলিল, "দেওয়াল মেঝে সব যে ফেটে চৌচির হ'য়ে আছে। মেরামত করিয়ে দেবেন তো?"

পটোল বলিল, "তবেই হ'য়েছে! এ কোম্পানীর আমলের বাড়ি মোসাই, দু'সো বচর বয়েস হোলো, ফাটবে না? ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা চাল মেরে ক'রে গেছলো সাতখানা বাড়ি, এখন আমরা সালারা মেরামত ক'রতে ম'রছি ফেটে। জানেন মোসাই, আমরা বোনেদি বড়ো লোক, আজকালকার কাপুড়ে বাবু নই।" তারপর স্বর এক পর্দা নামাইয়া বলিল, "স্লা; বাবা এক পয়সা খরচ ক'রবে না, সে আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন। আপনি বাড়িভাড়া কমিয়ে দেন মোসাই, যে টাকাটা বাঁচবে তাই দিয়ে মেরামত করিয়ে নেবেন। স্লা বাড়িওলাকে খাইয়ে আপনার কি লাভ?"

এতক্ষণে সুমন্ত্রর নজরে পড়িল, উপরের ছাদ হইতে চারি পাশে দেওয়ালের গায়ে লোহার হুক ও তার দিয়া আটকানো কয়েকটি লম্বা লম্বা কেরোসিন কাঠের বাক্স ঝুলিতেছে। তাহাতে সারি সারি পায়রার খোপ। একতলার উঠানে এবং দোতলার ভিতর দিকের বারান্দায় রেলিংয়ে গোটাকয়েক পায়রা বসিয়া আছে, তাহা ছাড়া আরও অনেকগুলি এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করিতেছে, অথবা খোপে বসিয়া 'বক্ বকুম কুম' করিতেছে। বাড়ির দুর্গন্ধের কারণ এতক্ষণে বোঝা গেল। সুমন্ত্র বলিল, "মানুষ নেই বাড়িতে, এত পায়রা এল কি ক'রে?"

পটোল দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "ওসব আমার সকের পায়রা মোসাই। আমরা ছাতে ছাতে যাওয়া-আসা করি কিনা! স্লা নিজেদের বাড়ি নোংরা হয় ব'লে বাবা এ বাড়িতে রাকতে বলেচে। মজা দেখবেন? আ-তিতি, আ-তিতি!'



আ-তিতি—আ-তিতি

দেখিতে দেখিতে এক ঝাঁক পায়রা উড়িয়া আসিল, গোলা, মুক্ষি, লোটন—নানা জাতীয় পায়রা, সুমন্ত্র তাহাদের নামও জানে না। দুইটা পায়রা পটোলের দুই কাঁধে বসিল আর একটা আসিয়া সুমন্ত্রের মাথায় বসিয়া ডানা ঝাপটাইতে লাগিল। সুমন্ত্র সেটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল, "এসব কিন্তু আমি রাখব না, আপনাকে সরাতে হবে।"

পটোল হঠাৎ যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তারপর মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিল,—"ইল্লি! প্রাণটা ঠান্ডা ক'রে দিলে মাইরি। ওরে আমার বাপের ঠাকুর রে,—অত সুকে আর কাজ নেই। এঃ, পায়রা সরাতে হবে? বাড়ি ভাড়া নিচ্ছেন ব'লে কি মাতা কিনে নিয়েছেন নাকি মোসাই? বাবা বলে, কুকুর পুসিবিনি, মা বলে, বেরাল পুসিবিনি, দাদা বলে বিলিতি ইঁদুর পুসিবিনি, এইবার সাতপুরুষের কুটুম ভাড়াটে এসে বল্লেন, পায়রা পুসবে না! উনি বাড়িভাড়া নেবেন ব'লে আমি সক ক'রতে পা'ব না! যান যান, মোসাই, এ বাড়ি ভাড়া নেওয়া আপনার কম্মো নয়।"

সুমন্ত্র বলিল, "আপনার বাবাকে ব'লে দেখি, তিনি কি বলেন।"

পটোল দগ্ধপ্রায় বিড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপর আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে বলিল, 'খবরদার বলছি, বাবাকে যদি এ নিয়ে একটি কথা বলবেন, তবে স্লা আপনার হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় করে ছেড়ে দোবো বলে দিচ্চি। হাঁ, বাবাকে বলবে, না আরো কিছু। বাবা তো ঐ চায় দশটা টাকা পেলে স্লা গায়ের চামড়াখানা বেচে দিতে পারে। পাড়ার সব ছেলে আমার দলে বলে কিছু করতে পারে নি এতদিন—সব্বাইকে বলে রেকেচি ভূতের বাড়ি বলে ভাড়াটে এলেই ভাগাবি। তা না হ'লে এ বাড়ি এতদিন প'ড়ে থাকে! এমনিতে কিছু হোলো না, তাই চুপি চুপি কাগজে নুটিস ঝেড়েছে। স্লা ভগোমানের বিচার নেই, মরেও না।' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়াও যখন সুমন্ত্রের কোনো উত্তর পাইল না, তখন যুবক ডান দিকের কাঁধ হইতে একটা পায়রাকে নামাইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে খানিকটা আত্ম-সংবরণ করিয়া লইল, তারপর হাসিয়া বলিল, 'মোসাই, যা বলি সুনুন, ঘরের ছেলে মানে মানে ঘরে যান। বাবার সংগে দ্যাকা-ট্যাকা ক'রবেন না। পায়রা যদি সরাতে হয় তাহ'লে আপনাকে এ বাড়িতে তেরাত্তির বাস করতে হবে না ব'লে দিচ্ছি। স্লা মাথা ফাটিয়ে ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে ছেড়ে দেবো, হ্যাঁ! আমরা বাদুড়-বাগানের ছেলে।'

ভয় না পাইলেও সুমন্ত্র ভাবিয়া দেখিল ঐ অন্ধকূপের জন্য যুবকের মনে আঘাত দেওয়া তাহার কর্তব্য হইবে না।

সে বাড়িওয়ালাকে না জানাইয়াই চলিয়া আসিল।

সকালে যে কয়খানা বাড়ি দেখিয়াছিল, তাহার মধ্যে সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িটি ছিল সব চেয়ে ভালো। বড় রাস্তার উপর তিনতলা দক্ষিণ খোলা নূতন বাড়ি, তিনটি ফ্ল্যাটে ভাগ করা। প্রত্যেক ফ্ল্যাটে পাঁচখানি ঘর। ইলেকট্রিক কনেকশন আছে, আলো হাওয়া প্রচুর। বাড়ি-ওয়ালা থাকেন একতলায়, তেতলায় একজন এঞ্জিনীয়র সম্প্রতি থাকেন। দোতলাটা খালি আছে, ভাড়া মাত্র চল্লিশ টাকা। সুমন্ত্রকে বাড়ি-ওয়ালা খুব যত্ন করিয়া ফ্যানের হাওয়া এবং গরম চা ও টোস্ট খাওয়াইলেন, পাঁচ বৎসরের মেয়ে ঋতার 'কাজরীনৃত্য' দেখাইলেন, কিন্তু তাহার বিবাহ হয় নাই শুনিয়া এবং তাহার বন্ধুর স্ত্রী সংগে থাকিবেন না শুনিয়া বাঁকিয়া বসিলেন। সুমন্ত্র বলিল, 'দেখুন, আমরা ভদ্র-সন্তান আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।' ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, 'ঘোর কলি পড়েছে মশায়, বিনা কারণেই ক্লার্ক হচ্ছে আজ-কাল। দেখুন, সত্যি কথা ব'লতে কি, আমার মেয়েরা বড় হচ্ছে, দু'জনের তো বিয়ের বয়স

পেরিয়েই গেছে বলতে গেলে সেকালের হিসেবে। আপনার মুখের সামনে বললে খোসামোদ হবে, তা হোক, আপনার চেহারা-খানাও নেহাৎ নিন্দের নয়, দু'চার শ'র মধ্যে একটা এমন চোখে পড়ে। কিন্তু আপনি বৈদ্য, আমরা ব্রাহ্মণ। অবশ্য সন্ধ্যেও করি না, মুর্গীও খাই, মেয়েদের স্কুল কলেজে পড়তেও ছেড়ে দিয়েছি, তবু জাতটা খোয়াতে রাজী নই। সুতরাং'—

সুমন্ত্র অপ্রস্তুতভাবে বলিল,—'আচ্ছা, এ সব আপনি কি ব'লছেন?'

ভদ্রলোক বলিলেন, 'সত্যি কথাই ব'লছি, রাগ করবেন না। আমি মেয়েদেরও ঐ কথা বলি, প্রেমে প'ড়বি পড়িস, পালটি ঘর দেখে পড়িস, বাপপিতাম'র জাতটা খোয়াস নি। তা' যথাসময়ে কি আর এই সব ওল্ড ফুলদের উপদেশ মনে থাকবে? তবু আমার সাবধান ...য়া কর্তব্য। আপনি অপরাধ নেবেন না, ...পনার বন্ধুটি তো বললেন, কুণ্ডু; যজ্ঞকুণ্ডু ... নরককুণ্ডু তা'ও আপনি ভালো ক'রে জানেন ... তেরো বছর পরে দেখা হয়েছে ব'লছেন। ...নি পত্নী ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাঁকে ...মি অন্তত শত হস্ত দূরে রাখলেই সুখী ...।' তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, ...াপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সুখী হ'লুম। ...দ আমার অফিসে মাঝে মাঝে আসেন তা ...লে আরও সুখী হ'ব, আপনার কোনো ...গ্যাল অ্যাডভাইস যদি দরকার হয়—বিনা ...লো পাবেন'—

সুমন্ত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ধন্যবাদ ...া প্রয়োজন হবে না। আমি নিজেও উকীল, ...র ওকালতিতে কিছু করতে পারলুম না ...লে ছেড়ে দিয়েছি'—

ভদ্রলোক উঠিয়া বলিলেন, 'আশা ছেড়ে ...বার বয়স আপনার হয় নি। আমি প্রথম ...ক্লল পাই কবে জানেন, কোর্টে বেরোবার তিন ...র পরে। 'ফি' কি দিয়েছিল জানেন?—...কটা লাউ। তার ছেলেকে জেল থেকে বাঁচিয়ে-...লুম—লাউ চুরির কেসে। না, না, আপনার ...ড়ে দেওয়া উচিত হয় নি।'

সুমন্ত্র বলিল, 'ভেবে দেখুন, ধর্ম আর ...র্থ একসঙ্গে হবার নয় এ পথে। তাই ছেড়ে ...য়েছি, উন্নতির আশা ছিল না ব'লে নয়।'

দুইজনেই দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। ...মন্ত্র বিদায় নমস্কার করিতে ভদ্রলোক ক্ষুন্ন ...ইয়া বলিলেন, 'আপনি নিশ্চয় খুব দুঃখিত ...য়েছেন,কিন্তু আমি নিরুপায়! এই দেখুন না, ...মাস আগেই আমাদের পাড়াতে একটা কেস ...য়ে গেছে। বিরাজবাবুর মেজ মেয়েটি 'ইলোপ' ...দে তাঁদের পাশের বাড়ির একটা মেসের ...াকরার সঙ্গে।

...মতা নাচ শেষ হইবার পর বাহিরের ঘরে ...সিয়া খানিকক্ষণ এটা সেটা নাড়িতেছিল। তারপর কিছুক্ষণ তাহার পিতার কোলে উঠিয়া হাঁ করিয়া তাঁহাদের গল্প শুনিতেছিল। পিতার সঙ্গে সঙ্গে সেও সদর দরজায় আসিয়াছিল, সে সোৎসাহে কোঁকড়া চুলের গোছাগুচ্ছ মাথাটা নাড়িয়া ঘোষণা করিল, 'আমি ইলোপ ক'রব, বাবা!' তাহার পিতা হাসিয়া বলিলেন, 'করবে



"আমি ইলোপ করব বাবা!"

বৈকি; মা, ক'রবে বৈকি। আর একটু বড় হও।'

সুমন্ত্র হাসিতে হাসিতে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ি খোঁজার উৎসাহে সেদিন দুপুরে ভাত জুটিল না, চার পয়সার আলুকাবলি এবং রাস্তার কলে একপেট জল খাইয়া গোয়া-বাগান লেনের বাড়িটার সন্ধানে গিয়া সুমন্ত্র দেখিল সে বাড়ির ভাড়াটে আসিয়া গিয়াছে, গরুর গাড়ি হইতে মাল নামিতেছে। সুমন্ত্র সেখানেই সন্ধান পাইল, কার্বালা ট্যাঙ্ক লেনে একটা মাঝারি গোছ বাড়ি ভাড়া আছে। খোঁজ করিতে করিতে বাড়ি মিলিল। এক প্রৌঢ় ভদ্র-লোক বাহিরের খোলা দরজার চৌকাঠে উবু হইয়া বসিয়া পরিতৃপ্তিপূর্বক একটি পলতোলা কাচের গ্লাসে করিয়া চা খাইতেছিলেন, তাঁহার কোলে এক ঠোঙা লেড়ে-বিস্কুট। তিন ধাপ নীচে পথে দাঁড়াইয়া একটা রোঁয়া-ওঠা কুকুর সোৎসুক নেত্রে ল্যাজ নাড়িতেছিল। সুমন্ত্রর আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া ভদ্রলোক বিন্দু-মাত্র বিচলিত হইলেন না। আর এক ঢোঁক চা খাইয়া আর একখানি বিস্কুট মুখে পুরিলেন এবং কুড়মুড় করিয়া চিবাইতে লাগিলেন। তার-পর চায়ের গ্লাসটি এক ঢোঁকে শেষ করিয়া হাঁক দিলেন,—'ম-অ-অ!' ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল, 'কেন রে?' ভদ্রলোক জলদগম্ভীর স্বরে হাঁকিলেন 'ভাড়াটে'। ভিতর হইতে আদেশ আসিল 'ভেতরে পাঠিয়ে দে।' ভদ্র-লোক এক ইঞ্চি সরিয়া বসিলেন, বলিলেন, 'যান'। সুমন্ত্র তাঁহার ঘাড়ের উপর দিয়া কোনোরূপে লং জাম্প করিয়া দরজা পার হইয়া ভিতরে গেল।

বাড়িটা দুই মহলা; মাঝে একটা প্রকাণ্ড উঠান, সেইখানে কল চৌবাচ্চা। পাশেই একটা গরু বাঁধা আছে। গৃহিণীর বয়স ষাটের কম হইবে না, তবে গড়ন আঁটসাট, ঠেঁটি পরিয়া বিধবা কলতলায় বসিয়া একরাশ বাসন মাজিতে-ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে হাত তিনেক দূরে একটি বধূ চোখ পর্যন্ত ঘোমটা টানিয়া একটা বড় গামলায় করিয়া চাল ধুইতেছিল, তাহার পাশেই একটি বারো তেরো বছরের মেয়ে জল লইবার জন্য বালতি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গৃহিণী বাঁ হাতের পিছন দিক দিয়া মাথার কাপড় এক ইঞ্চি টানিয়া দিলেন। বলিলেন, 'এ দিকে এস, বাছা। এই আমাদের বাড়ি; কি দেখবে দ্যাখো। সামনের দিকে ওপরে নীচে দু'খানা করে চারখানা ঘর ভাড়া দে'ব। এমন দক্ষিণ খোলা খাসা বাড়ি এ পাড়ায় আর একটি পাবে না। ভাড়াটি কিন্তু মাসের পয়লা চাই বাপু, আগের ভাড়াটে দু' মাসের ভাড়া বাকি ফেলে পালিয়েছে।'

সুমন্ত্র বলিল, 'সেজন্য ভাববেন না, বাড়ি পছন্দ হয় তো ছ' মাসের ভাড়া আগাম দে'ব। কিন্তু কল পায়খানা আলাদা পাব তো?'

গৃহিণী বলিলেন, 'আলাদা আর কোথা পা'ব বাছা, ঘরের ছেলের মতো থাকো তো আমাদের কল পাইখানাই দরকার মতো পাবে।'

সুমন্ত বলিল, 'কিন্তু একটা বাথরুম তো চাই,—মানে—স্নানের ঘর একটা।'

'গৃহিণী বলিলেন, ও-ও, বৌ বুঝি সাবান মাখবে? তা' এইখানে ব'সেই না হয় মাখলে, কেউ নজর দেবে না। আমরাই না হয় সেকেলে লোক, তা' ব'লে কি আমাদের বাড়িতেই সখসৌখিনতা নেই? আমাদের এই বৌমাকেই জিজ্ঞেস করো না, গেল বছরে দু' দু'খানা সাবান কিনে দিয়েছি কি না? কি নাম গা বৌমা, 'মেচেতা' না, কি?'

বধূ মৃদুস্বরে বলিল, 'অজন্তা'।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ হোলো। তবেই দ্যাখো, আমরাও ওসব জানি। তা' তোমার বৌ বুঝি স্বাধীন জেনানা? যাই বলো, আমার পষ্টো কথা বাছা, আজকালকার মেয়েগুলো দিন দিন বড় বেহায়া হচ্ছে। ঐ বাথরুমে যে কি কম্মো ক'রতে ঢোকেন, সে তো আমার জানতে বাকি নেই। আমাদের মাথা কেটে ফেললেও কিন্তু ওসব আমাদের শ্বারা হবে না।'

সুমন্ত্র কথা বদলাইবার জন্য বলিল, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি। আমরা কিন্তু উপস্থিত কেবল পুরুষমানুষ থাকব। আমার এক বন্ধু

নিয়ন্ত্রিত থাকবেন, আমি মাঝে মাঝে যা'ব আসব।'

গৃহিণী বলিলেন, 'কেন, তোমার বৌ বাথরুম না হ'লে আসবে না? মেয়েমানুষের এত কি জেদ? সোমত্ত বয়েস, বাপের বাড়িতে বেশি দিন ফেলে রাখা কি ভালো হ'বে?'

সুমন্ত্র মাথা নীচু করিয়া বলিল, 'আমার এখনো বিয়েই হয় নি।'

গৃহিণী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, 'কেন বাছা, কুলে কোনো দোষটোষ আছে না কি? একলা পুরুষমানুষ, বাপ মা এই বয়েস পর্যন্ত ছেড়ে রেখে দিয়েছে যে বড়?'

সুমন্ত্র বলিল, ''বাবা, মা, দু'জনেই অনেক দিন হ'ল মারা গেছেন।'

গৃহিণী নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, 'ওঃ, তাই। আমি বলি বুঝি বা'র-টান টান কিছু আছে। তা' বেশ তো, এখানে এসো, আমিই একটা ব্যবস্থা ক'রে দেব যা হয়। কি নাম বললে সুমন্ত্র সেন? বদ্যি না কায়েত? বৈদ্য? বেশ হয়েছে। পুঁটি যাতো, ওবাড়ি থেকে তোর বদ্যি মাসিমাকে ডেকে আন তো? আহা, বৌটা কে'দে কে'দে মরে, তিন বচ্ছর ধ'রে মেয়েটার একটা ভালো পাত্তর জুটল না। দ্যাখো দিকি, এমন সোনার চাঁদ ছেলে,—এ কি পড়তে পায়? কেবল মাথার ওপর দাঁড়িয়ে কেউ কাজটা করিয়ে দেবার নেই বলেই না? তা' বাছা, আমি আছি, তোমার কোনো ভয় নেই।'

সুমন্ত্র কিন্তু মোটেই আশ্বস্ত হইল না, বরং এক কথা দুই কথার পর জরুরী কাজের ছুতা করিয়া পলায়ন করিল। দরজায় উপবিষ্ট ভদ্রলোক দুই ইঞ্চি সরিয়া রাস্তা দিলেন, কোনো প্রশ্ন করিলেন না।

বৈকালে হেদুয়ার মোড়ে সন্ধান পাইল গুলুওস্তাগর লেনে একটা বাড়ি ভাড়া আছে। সদর দরজা খোলাই ছিল। সুমন্ত্র চৌকাঠে দাঁড়াইয়া বেয়ারা বলিয়া হাঁক দিতেই পাশের ঘর হইতে বাড়িওয়ালা বলিলেন, 'এটা সায়েব বাড়ি নয় মশায়, বেয়ারা ফেয়ারা নেই আমার। আসুন, এই ঘরে। বসুন।'

সুমন্ত্র নমস্কার করিয়া চেয়ারে বসিল, তিনি ঘরের অপর প্রান্তে একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে মিনিটখানেক তাহার আপাদমস্তক তীব্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন। পরে বলিলেন, 'মশায়ের নাম'?

শ্রীসুমন্ত্র সেন।

'আমার নাম অঘোর চক্রবর্তী।'

আবার মিনিট দুই কাটিল, অঘোর চক্রবর্তী হতাশভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বলিলেন, ব্রাহ্মণ দেখে মাথা নীচু করার প্রথা আজকাল উঠে গেছে, না? হ্যাঁ, আপনার নিবাস?'

'নিবাস বর্ধমান, উপস্থিত আসছি পটোলডাঙা থেকে?'

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'হু, গ্রামে কি কীর্তি ক'রে এসেছেন?'

সুমন্ত্র কথাটা বুঝিতে পারিল না, শঙ্কিতভাবে বলিল, 'আজ্ঞে'?

'বলি পুলিশ নেই তো পেছনেশ? কারো বাক্স ভেঙে বা মেয়ে চুরি ক'রে আসেন নি তো?'

সুমন্ত্র বিরক্ত হইয়া বলিল, 'আপনি কি বলছেন?'

'ব'লছি কি তা' আপনি বেশ বুঝতে পারছেন। আজ বর্ধমান, কাল পটোলডাঙা, পরশু গুলুওস্তাগর লেন,—কতদিন অ্যাবস্কন্ড ক'রে আছেন' পরে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'পুলিশের কাজ করে চুল পাকালুম, পেনসনই পাচ্ছি সাত বছর। জানতে কোনো মিয়াকেই আমার বাকি নেই। আমার বাড়িতে দু'জাতের ভাড়াটে আসে মশায়, এক ম্যাদামারা গোবেচারা, আর এক দাগী বদমাইস। এই বছর দুই হ'ল এক ব্যাটা স্বদেশী খুনে এসে আমার বাড়িতে উঠেছিল। আপনারই মতন খদ্দরের জামা, দিব্যি ভালো মানুষের মতো চেহারা। একবার আস্পর্ধাটা বুঝুন। আমি অঘোর চক্রবর্তী, নিজের ছেলে স্বদেশীতে নুন ক'রতে গেছ'ল ব'লে তাকে জেলে দেবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি দিয়েছি, আমার নাকের ওপর সে শালা ডাকাত দেড়টি বচ্ছর বাস করে গেল! আরে মশাই, শেষে পেনসন নিয়ে টানাটানি! কমিশনার সায়েব চটেই লাল, ডেকে পাঠিয়ে বলে, "তুমি জেনে শুনে স্বদেশী ডাকাত পুষেছ।" ওঃ কি ফ্যাসাদেই পড়েছিলুম! সায়েবের পায়ে ধরে কোনো রকমে সে যাত্রাটা উদ্ধার পেয়েছি। তারপর ছ'মাস আর বাড়ি ভাড়ার নাম করিনি। এদিকে উপরি আয়ও নেই, অথচ চালটিও গেছে বেড়ে, পেনসনের টাকায় তো সংসার চলে না, অগত্যা বাড়ি ভাড়া দিতেই হচ্ছে। তবে আর ওপথে যাচ্ছি না, মান্যগণ্য গভর্নমেণ্ট অফিসার কারো রেকমেণ্ডেশন যদি আনতে পারেন, তবেই বাড়ি দেখাব।"

সুমন্ত্র উঠিতেছিল, ভদ্রলোক বলিলেন, "উঠছেন কেন মশাই, একটু বসুন না। পায়ে বাত, বেশী হাঁটতেও পারি না আবার একা বসে বসে সময়ও কাটে না। চিরদিন পাঁচজনকে নিয়ে কাটানো অভ্যেস কিনা? থানায় যখন ঢুকতুম দুধারে পাঁচিশটা সেলাম পড়ত। এখন বেঁচে মরে আছি মশাই, সেলাম দেবারও কেউ নেই, নেবারও কেউ নেই! পেনসন আনতে গিয়ে তবু দু'মাস ছ'মাসে বড় বড় সাহেবসুবোকে সেলাম করে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ত, এখন একদম পঙ্গু। ঐ আরসীতে নিজেকেই নিজে সেলাম করি মাঝে মাঝে। তা' মশায়, দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে?" সুমন্ত্র আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া স্থান ত্যাগ করিল।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া বাড়ি ফিরিবার পথে ল্যাম্প পোস্টের গায়ে আঁটা একটা কাগজে একটি হাতে লেখা বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল। যুগলকিশোর দাস লেনে দক্ষিণ খোলা একটা বাড়ি পঁয়ত্রিশ টাকায় ভাড়া আছে। নম্বর খুঁজিয়া বাড়িটার দরজায় পোঁছিতেই সুমন্ত্র নারী কণ্ঠের আর্ত-চীৎকার শুনিতে পাইল, "মেরে ফেললে, মেরে ফেললে ওগো কে আছ? বাঁচাও, বাঁচাও।" মুহূর্তকাল সুমন্ত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল তাহার ভদ্রতাজ্ঞান বলিল, অপরের বাড়ির মধে পারিবারিক কলহের ব্যাপারে তাহার হস্তক্ষে করা উচিত নহে। পরক্ষণেই আবার চীৎকা উঠিল, "খুন করলে, খুন ক'রলে। ওরে, দেশে কি মানুষ নেই?" সুমন্ত্রর পক্ষে ইহার প আর ধৈর্য ধারণ করা অসম্ভব হইল। সে প্রথমে জোরে জোরে কড়া নাড়িল, চীৎকার করি



"দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে?"

কয়েকবার বাড়িওয়ালাকে ডাকিল, তাহার পর দুমদাম করিয়া দরজায় লাথি মারিতে আরম্ভ করিল। দরজা ভাঙিল না, কিন্তু লাথির ফল ফলিল। একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক একটা লাঠি হাতে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। বলিলেন, "কি মনে করেছেন বলুন তো? দিনদুপুরে দরজা ভেঙে ডাকাতি ক'রতে এসেছেন?"

সুমন্ত্র কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করিয়া বলিল, "এসেছিলুম বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখে কিন্তু—"

ভদ্রলোক লাঠিটা দরজার পাশে রাখিয়া বলিলেন—"ওঃ, বাড়ি দেখবেন? দাঁড়ান চাবি নিয়ে আসি, এই পাশেই বাড়ি, "দুটো দরজা পরেই"—

সুমন্ত্র বলিল—"কিন্তু উপস্থিত আমি আপনার বাড়ির ভেতরে যেতে চাই।" শু থামিয়া গিয়াছিল, ভদ্রলোক বলিলেন—" শিভ্যালরি? আপনি বুঝি নারীর সমিতির মেম্বার? যদি না যেতে দিই?

সুমন্ত্র কঠোর কণ্ঠে বলিল—"আমি যা

আপনার শাস্তি থেকে আটকান। পুলিশ ডাকতে পারেন।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আসুন তবে। আপনি বোধ হয় এ পাড়ায় থাকেন না।"

বৈঠকখানার পিছনেই ভিতর দিকে একটা লম্বা বারান্দা তাহার পর উঠান। বারান্দায় একসারি খিলান-করা থাম, তাহারই একটির সহিত একটা লম্বা শিকল দিয়া বাঁধা একজন মধ্য বয়সী স্ত্রীলোক! ভদ্র মহিলার দুই পায়ে বেড়ি, মাথার চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা, পরনের কাপড়খানি ধূলিধূসরিত, কিন্তু রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে! ভদ্রমহিলার মুখখানি বড়ো করুণ, তাঁহার অশ্রুসিক্ত চোখ দুটির দিকে চাহিয়া সুমন্তর রক্ত গরম হইয়া উঠিল। এই বিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা শহরের বুকের উপর বসিয়া কোনো পুরুষ যে স্ত্রীলোকের উপর এইরূপ অত্যাচার করিতে পারে তাহা সে কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই, এদৃশ্য যে কোনোদিন চোখে দেখিতে হইবে তাহা সে কখনও ভাবে নাই। রমণী তাঁহাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এসেছেন? আমি জানি এদের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। পুলিশ সঙ্গে এনেছেন? না, না, পুলিশ কিছু ক'রবে না, ষড় আছে। ঐ যে—ঐ উনি" —বলিতে বলিতে তাঁহার বড়ো বড়ো চোখ দুইটিতে রুদ্ধরোষের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল; বলিলেন, "উনি আমার ছেলেকে বিষ দিয়ে মেরেছেন, স্বামীকে জেলে দিয়েছেন, বাপকে পথের ভিখিরি করেছেন—তাতেও সাধ মেটেনি ও'দের। আমাকে কুকুরের মতো বেঁধে রেখে দিয়েছেন, না ম'রলে আর নিস্কৃতি নেই আমার।" তারপর সহসা নিজের বাহু দুইটি হইতে কাপড় সরাইয়া বলিলেন, "আমাকে কি রকম মেরেছে দেখেছেন? রোজ মারে, সকাল বিকেল মারে। আমি আর পারি না। এত করে বলি, আমায় একবারটি ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি ক'রব না, গঙ্গায় ডুবে সকল জ্বালা জুড়োব,—তাও দেবে না। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন তো?"

সুমন্ত্র গৃহস্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল— "আপনি কি মানুষ?"

"না, পশু। আপনি দিনকতক এসে বাস করুন না আমাদের সঙ্গে।"

সুমন্ত্র বলিল—"আপনার একটু দয়া হয় না?"

রমণী ব্যঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "হুঃ, দয়া হবে? পাষাণ, পাষাণ।" পরক্ষণেই উঠানে নামিয়া এক কোণ হইতে একটা ঝাঁটা তুলিয়া লইয়া নিজের বাঁ হাতে, পায়ে, সর্বাঙ্গে সপাসপ করিয়া মারিতে মারিতে বলিলেন—"এই রকম ক'রে মারে। আপনি আমাকে মারবেন না তো?"

সুমন্ত্র বলিল—"না মারব না।" কিন্তু তাহার মনে এই প্রথম কেমন একটা সন্দেহ হইল যে, হয়তো রমণীর গায়ের কালসিটাগুলো তাহার স্বকৃত আঘাতেরই ফল।

ঠিক সেই সময়ে একটি পনেরো ষোলো বছরের মেয়ে উঠানের ও পাশের রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহার এক হাতে একটা রেকাবিতে খান কয়েক লুচি ও একটু তরকারী, আর এক হাতে একটি জলের গ্লাস। বারান্দার এক প্রান্তে রেকাব ও গ্লাস নামাইয়া সে দ্রুত-পদে আসিয়া রমণীর হাত হইতে ঝাঁটাটা কাড়িয়া লইল; ভর্ৎসনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা বাবা, তোমরা দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছ? কেড়ে নিতে পারোনি?" তারপর সহসা সুমন্ত্রর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কে? কি ক'রছেন এখানে?" রমণী বাধা দিয়া বলিলেন, "তার খবরে তোর দরকার কি রে? উনি আমার নাচ দেখতে এসেছেন।" পরক্ষণে সুমন্ত্রর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি খুব সুন্দর নাচতে পারি। দেখবে তুমি? দাঁড়াও দেখাচ্ছি।" বলিতে বলিতে বারান্দার কোণ হইতে তিনি একটি কেরোসিন কাঠের বাক্স টানিয়া আনিলেন। সেই বাক্স হইতে একটি বিচিত্র বস্তু বাহির হইল। একটি লম্বা দড়িতে কতকগুলো ভাঙা পুরাতন লণ্ঠন ও ছেঁড়া জুতা বাঁধা ছিল, ভদ্রমহিলা সেই দড়িটি কোমরে বাঁধিয়া বলিলেন, "পায়ের মলগুলো বড্ড ভারী, এপ'রে আমি নাচতে পারি না ভালো।" বলিতে বলিতে দুই পায়ের বেড়িতে বেড়িতে ঠুকিয়া "দেখে যা, নাচ দেখে যা" বলিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে শরীর বাঁকাইয়া লণ্ঠন ও জুতাগুলি দোলাইয়া নাচিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র চোখ নামাইল, পরক্ষণেই ভদ্রমহিলা লাফ দিয়া উঠানে আছাড় খাইয়া পড়িলেন এবং আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মেরে ফেললে, খুন করলে! বাঁচাও! বাঁচাও!" ভদ্রলোক বলিলেন, "সারাদিন সারারাত এই চলছে। কচি ছেলেটি নয়, বাইশ বছরের একমাত্র ছেলে একদিনের মধ্যে মারা গেছে কলেরা হয়ে।" মেয়েটি ততক্ষণে গিয়া তাহার মায়ের মাথা নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়াছিল এবং ঘটি হইতে জল লইয়া তাঁহার চোখে মুখে ছিটা দিতে দিতে পাখার বাতাস করিতেছিল, সে সেখান হইতে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ও'কে যেতে বলো বাবা।"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার বাড়ি ভাড়া নিতে হলে স্টীং নার্ভের দরকার, আপনি টিঁকতে পারবেন না। আচ্ছা, তাহ'লে" —তিনি পিছন ফিরিয়া সদর দরজার দিকে চলিলেন। সুমন্ত্র তাহার পিছন পিছন চলিতে চলিতে বলিল, "না বুঝে কটু কথা বলেছি, অপরাধ নেবেন না। কিন্তু রাঁচিতে পাঠান না কেন?"

"আমিও ভাবি মাঝে মাঝে। কিন্তু ওকে পাঠিয়ে দিলে আমরা বাঁচব কি নিয়ে? তা' ছাড়া সেখানে ও কি ঐ মেয়ের যত্ন পাবে? দেখি আর কিছুদিন। চিকিৎসা তো অনেক রকমই হ'ল"—

পরদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সন্ধান চলিল। কোথাও বাড়িতে ঢুকিতেই শুনিল, "নমস্কার। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো, ক'লকাতা কেন্দ্র"—ইত্যাদি। সুমন্ত্র বিনা বাক্য ব্যয়ে সরিয়া পড়িল। কোথাও ঢুকিয়াই দেখিল দশ বারোজন জুটিয়া তবলা পিটিতেছে অথবা হেঁড়ে গলায় হুঙ্কার ছাড়িতেছে, "পাষাণী, আমি তব ধাইব পশ্চাতে"—ইত্যাদি। সেও সুবিধা মনে হইল না। শেষে পাকা বাড়ি ছাড়িয়া সুমন্ত্র দু'একটা খোলার ঘরও দেখিল। কোথাও হৈ হৈ করিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া হিন্দুস্থানীর দল হোলির গান ধরিয়াছে, কোথাও উড়িয়া কালোয়াত হারমোনিয়ম বাজাইয়া 'রসবন্তী যাউঁচি' বলিয়া পাশের ঘরে বেসুরা চীৎকার করিতেছে; কোথাও কলের জল কে আগে লইবে তাই লইয়া বাড়ির সামনে জলের কলে ক্যান্ত নেত্য, পদী, খেঁদী, পটলি, গেঁড়ি প্রভৃতির মধ্যে ঝুটোপুটি ঝগড়া এবং অশ্লীল গালি গালাজের আদান প্রদান চলিতেছে। খোলার ঘরেও কাব্য নাটক চর্চার ঢেউ পৌঁছিয়াছে সেখানে একটি ঘরে কয়েকটি যুবক ঠিক দুপুর বেলা যুগপৎ নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের বক্তব্য "যৌবনায় তুফান দেকে জা পেয়ো না বেরজাঙ্গনা"।

'দুত্তোর' বলিয়া সুমন্ত্র চলিয়া আসিল।

(ক্রমশ

পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের আয়ুর্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করুন এবং ৬০ বৎসর পর্যন্ত আপনার পাকা চুল কালো রাখুন। আপনার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হইবে এবং মাথাধরা সারিয়া যাইবে। অল্প সংখ্যক চুল পাকিলে ২॥০ টাকা মূল্যের এক শিশি, বেশী পাকিলে ৩॥০ মূল্যের এক শিশি, যদি সবগুলিই পাকিয়া থাকে তাহা হইলে ৫ টাকা মূল্যের এক শিশি তৈল ক্রয় করেন। ব্যর্থ হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে।

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবলে কয়েক দিন এই ঔষধ প্রয়োগের পর আশ্চর্যজনক ফল দেখা যায় [illegible] ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই ভয়াবহ ব্যাধির [illegible] হইতে মুক্তিলাভ করুন। শত শত [illegible] ডাক্তার কবিরাজ বা বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক [illegible] হইয়া থাকিলেও ইহা নিশ্চয়ই কার্যকরী হইবে। ১৫ দিনের ঔষধের মূল্য ২॥০ আনা।

বৈদ্যরাজ অখিলকিশোর রায়

[illegible] ১০৪, [illegible] গয়া।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

বেহুলা

শ্রীসুলতা কর

প্রাচীন যুগে বহু কবি বেহুলা কাব্য লিখে গেছেন, সেগুলি পড়তে পড়তে আমাদের মন বর্তমানকালের আবহাওয়া থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে প্রাচীন বাঙলার রূপ ও রসে, আনন্দ ও সৌন্দর্যে প্লাবিত হয়ে যায়। কাব্য সৌন্দর্যে, ভাবগভীরতায় ও চরিত্র-সৃষ্টি-নৈপুণ্যে এই কাব্যগুলির তুলনা হয় না।

এই বেহুলা কাব্যগুলিতে যে চরিত্র সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে হ'ল রূপসী বেহুলার চরিত্র। প্রাচীনযুগেব রমণীর যে কমনীয় অথচ অতি দৃঢ়মূর্তি বেহুলার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তা দেখে আমরা মুগ্ধ হই।

পিতৃগৃহে কুমারী বেহুলার ছবি দেখে মনে হয় যেন অতি কোমল শিউলি ফুল প্রাঙ্গণ আলো করে ফুটে উঠেছে। অপরূপ তাঁর রূপ। বাপ-মায়ের তিনি নয়নমণি। সাত ভায়ের একমাত্র আদরের বোন। কুমারী বেহুলার রূপ বর্ণনা করে কবি কেতকদাস লিখেছেন,—

"চন্দ্রমুখী খঞ্জননয়নী কলাবতী।
অধর অরুণ জিনি' বিদ্যুতের দ্যুতি॥
শ্রবণে কুণ্ডল তার খোঁপায় বকুল।
বেহুলার রূপেতে মোহিত অলিকুল॥"

ছোটবেলা থেকে তাঁর নাচ গান এত সুন্দর ছিল যে, উজানীর লোক বালিকার আর এক নাম দিয়েছিল "বেউলা নাচনী"।

পিতৃগৃহকে একদিকে নাচে গানে যেমন আনন্দমুখর করে রেখেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি স্নেহে সেবায় সে গৃহের প্রাণস্বরূপা হয়েছিলেন।

"মা বাপের বাড়িতে বেহুলা নাচে গায়।
বেহুলার গানেতে অমলা মোহ যায়॥"

—কেতকাদাস

বধূরূপিণী বেহুলার ছবিটিও কত কোমল, কত মধুর। শত শত দেশ খুঁজে স্বর্গের অপ্সরীর মত সুন্দরী, সকল গুণে গুণবতী সেই তরুণীকে যখন চাঁদসওদাগর তাঁর সর্বগুণান্বিত একমাত্র পুত্রের বধূরূপে মনোনীত করে আনলেন, তখন নববধূর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়নি, এমন কেউই ছিল না। ঘটক বেহুলার রূপ-গুণের বর্ণনা করে চাঁদসওদাগরকে বললেন,

"ঘটক বলেন সাধু তোমার পুত্রের বধূ
রূপে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী।
দেখিনু অনেক ঠাঁই তাহার তুলনা নাই
যেন লক্ষ্মী উর্বশী অপ্সরী॥"

কেতকাদাস

কাজলকূট পাহাড়ের মাথার উপর লোহার বাসর ঘরে রূপসী তরুণী বধূ যখন লখীন্দরকে প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ জানাচ্ছেন, তাঁর তখনকার ছবিটি কত রমণীয়, কেমন শ্রী ও হ্রীমণ্ডিত!

লখীন্দর মনে মনে জানতেন যে, সেই রাতে নিয়তির বিধানে তাঁর জীবন-সংকট হতে পারে। তাই তিনি পরিহাস করে বেহুলাকে বলছেন—"বেহুলা আজ যদি আমায় সাপে কামড়ায়, যদি আমি মারা যাই, তবে তুমি কি করবে?"

নববধূ সপ্রেম নয়ন তুলে বললেন,—"যদি তাই হয়, তবে আমি মৃত্যুপুরী পর্যন্ত তোমায় অনুসরণ করব।" বলতে বলতে তাঁর মুখখানি ঈষৎ লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠল, শুভ্র কপোলে অপরূপ দ্যুতি খেলে গেল।

বেহুলার এই কোমল হৃদয়ের রূপে পাঠক মুগ্ধ হয়ে রয়েছেন। হঠাৎ দেখতে দেখতে সেই শিউলী ফুলের মত পেলব নম্রা বালিকা কোথায় মিলিয়ে যায়,—আর বজ্রের চেয়েও কঠোরা, হিমাদ্রির মত অটলা সাধনমগ্না এক তপস্বিনী মূর্তি পাঠকের চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে।

কালরাত্রিতে বেহুলা যখন জেগে উঠে দেখলেন যে, তাঁর এক মুহূর্তের অনবধানতায় নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁর দয়িতকে চিরদিনের জন্য হরণ করে নিয়েছে, তখন তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল, ক্ষণপূর্বে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাবাণীকে তিনি তাঁর জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করলেন।

এর পরের দৃশ্যে দেখি, বারো বছরের কুসুম-কোমলা বালিকা বেহুলা স্বামীর শব নিয়ে একাকিনী কলার ভেলায় ভাসতে ভাসতে যাত্রা করেছেন। বাহিরের কোন সম্বল নাই, কেবল মনের মধ্যে রয়েছে মৃত্যুকে জয় করবার দুর্জয় সংকল্প।

মৃত্যুঞ্জয়ের পথে কত প্রলোভন, কত বিভীষিকা! হিংস্র বাঘ ভেলার উপর লাফ দিয়ে পড়তে উদ্যত। বেহুলা লখীন্দরের শব বুক দিয়ে আড়াল করে বলছেন,—

"অভাগিনী বেহুলার সহায় কেবা আছে।
আগেতে আমারে খাও, প্রভুরে খাইও পাছে॥"

—বিজয় গুপ্ত

জোঁক শবকে কামড়ে ধরছে, বেহুলা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে জোঁক ছাড়াচ্ছেন।

শুধুই কি বিভীষিকা, প্রলোভনও কম নয়! একদিকে জল জন্তুরা শব কেড়ে নিয়ে যেতে আসছে, অন্য দিকে—

"পথের পথিক যত পথ বাইয়া যায়।
বেহুলার রূপ দেখি মন মন চায়॥
ত্রিজগৎ-মোহিনী কেন মড়া লৈয়ে কোলে।
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউয়ের হিল্লোলে॥"

—কেতকাদাস

একজন বৈদ্য অশিষ্ট প্রস্তাব করেছিল, বেহুলা তাকে ধিক্কার দিয়ে চলে গেলেন। গোদা, ধনা, মনা তাঁর লোভে জলে সাঁতার দিয়েছিল, বেহুলার সতীত্বের তেজে পরাস্ত হয়ে ফিরে গেল।

এমনি শত ভয় সহস্র প্রলোভন জয় করে বীর রমণী দেবলোকে এসে উপস্থিত হলেন। মর্ত্যের মানবী তপস্যার প্রভাবে স্বর্গলোকে পৌঁছে মৃত্যুকে জয় করে দয়িতকে জীবলোকে ফিরিয়ে আনলেন।

বেহুলার পরই এই কাব্যে যে চরিত্র আমাদের মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, সে হল চাঁদসওদাগরের চরিত্র। কী কঠোর পুরুষকার, কী অদম্য দৃঢ়তা প্রতিফলিত হয়েছে চাঁদসওদাগরের চরিত্রের প্রতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ থেকে!

ভ্রূকুটিটিল ললাট, হেমতালের বাড়ি হাতে, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ চাঁদসওদাগর পৌরুষের জীবন্ত প্রতীক। পদ্মার সঙ্গে বিবাদে একদিকে যেমন তাঁর চরিত্রের অদম্য দৃঢ়তা, দৃপ্ত পৌরুষ সতেজে ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনই অসীম ঐশ্বর্যের মাঝখানে তাঁর বিষয়বিরাগী ধ্যানী চিত্তের রূপও ফুটে উঠেছে।

তিনি শিবভক্ত ধ্যানী পুরুষ। পদ্মার সাধ তাঁর হাতের পূজা নেবেন, কিন্তু সওদাগর এক শিব ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নত করবেন না। তাঁর কথা হ'ল—

"যে হস্তে পূজিয়াছি শঙ্কর ভবানী
সেই হাতে পূজিব কি চেঙ্গমুড়ী কাণী?"

প্রথমে পদ্মা বহু অনুনয় করলেন, সনকাকে দিয়ে ছল করে তাঁর গৃহে পূজার আসন বসালেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ সওদাগর এই খবর জানা মাত্রই লাথি মেরে ঘট ভেঙে ফেললেন। এরপর থেকে আরম্ভ হল দেবতা-মানবে যুদ্ধ। সেই অসমান যুদ্ধে সওদাগরের রূপবান গুণবান ছয় ছেলে সাপের কামড়ে প্রাণ হারাল। তরুণী পুত্রবধূরা বিধবার শুভ্রবেশ পরিধান করে সওদাগরের চোখের সামনে ঘুরতে লাগলেন সওদাগরের ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদ শ্মশান হয়ে গেল।

হাহাকারমুখর, শোকনিমগ্ন প্রাসাদ সওদাগর আর সহ্য করতে পারলেন না, তিনি সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিয়ে বাণিজ্যে বেরোলেন। দূর পাট

শে বাণিজ্য াপত করে বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে প্তডিঙ্গা মধুকর যেইমাত্র কালীয়দহে পৌঁছল, মনি পদ্মার শাপে অকাশ মেঘে আবৃত হল, ণ্ড ঝড় বইতে লাগল, উত্তাল তরঙ্গের লায় সপ্তডিঙ্গা মধুকর সওদাগরের সব শ্বর্য নিয়ে ডুবে গেল, সেই সঙ্গে সওদাগরও বলেন।

পদ্মা এক মুঠা পদ্ম ফুল জলে ফেলে লেন। গভীর অন্ধকার রাতে অগাধ ঢেউয়ের ধ্যে ডুবতে ডুবতে পদ্মফুল কটিকে আশ্রয়-াধে ধরতে চাঁদসওদাগর হাত বাড়িয়েছেন, এমন ময় বিদ্যুৎ চমকে উঠল, দেখলেন পদ্মফুল। খন মনে হল এ পদ্মার দান, ঘৃণার সঙ্গে াত টেনে নিয়ে সওদাগর অগাধ সমুদ্রে ডুব লেন।

আসন্ন মরণের মুখে চাঁদসওদাগরের এই যে পৌরুষের জ্বলন্ত শিখার ন্যায় মূর্তি কবি টিয়েছেন, তা যথার্থই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের রিত্র।

কিন্তু পদ্মা চাঁদকে মারতে পারলেন না, াই বীরের পূজাই তাঁর চাই। চাঁদসওদাগর সতে ভাসতে তীরে গিয়ে উঠলেন।

বহু দুঃখভোগের পর সওদাগর স্বদেশে পৌঁছলেন। লখীন্দরের চাঁদমুখ দেখে ছয় ত্রের বিয়োগ-ব্যথা, সপ্তডিঙ্গা মধুকরের জল নমজ্জনের কথা, নিজের অশেষ দুর্গতির কথা ব ভুলে গেলেন। কিন্তু এই ক্ষণিক সুখ-ভোগের পরই এল চরম পরীক্ষার দিন।

যে লখীন্দরের মুখ দেখে সওদাগর সর্ব-দুঃখ ভুলেছিলেন, বাসররাতের প্রভাতে সেই ত্রের মৃতদেহ যখন তাঁর চোখের সামনে আনা লে, তখন সকলকার হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে, নববধূ বেহুলার শোকাশ্রুপাতে পাষাণ পর্যন্ত গলে গল, কিন্তু দুঃখে তাঁর বুক ফেটে গেলেও তখনও তিনি প্রতিজ্ঞায় অটল অচল রইলেন। আত্মীয় বন্ধু অনুরোধ করে বললেন—"সওদাগর তুমি এক মুঠো ফুল পদ্মার চরণে অঞ্জলি দাও, তাহলে লখীন্দরকে ফিরে পাবে, ধনরত্ন সর্বস্ব ফিরে পাবে।" তার উত্তরে তিনি বললেন,—

"শতেক লখাই যদি যায় এই মতে।
তবু না পূজিব কানী জীবন থাকিতে॥"

এই দৃপ্ত বীরচরিত্রকে কবি সবশেষে পদ্মার কাছে অবনত করিয়েছেন বটে, কিন্তু তাও কত মহিমার সঙ্গে।

চাঁদ ছয়পুত্রের মৃত্যুশোক সহ্য করে-ছিলেন, লখীন্দরকে হারিয়েও ধৈর্য ধরে ছিলেন. কালীয়দহে মৃত্যুর মুখে মিলিয়ে যাবার মুহূর্তেও সংকল্পচ্যুত হননি, কিন্তু শেষে বেহুলার অনন্ত স্নেহের কাছে এই বীর পরাভব মেনে নিলেন। যে পুত্রবধূ ঠিক তাঁরই মত মৃত্যুকে তুচ্ছ করে দৃঢ় সাধনার বলে অমরলোক থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এল, সেই তাপসীর অগাধ তপস্যাবলকে তিনি অপমান করতে পারলেন না। সেই করুণাময়ীর অসীম স্নেহের কাছে তাঁর বীর হৃদয় নতিস্বীকার ক'রল।

যেমন চরিত্রসৃষ্টি-নৈপুণ্যে, তেমনি কাব্য-সৌন্দর্যে ও নানা বিচিত্র দৃশ্যের সমাবেশে এই বেহুলা কাব্যগুলিতে এত বিভিন্ন রসের পরিবেশন করা হয়েছে যে, কোথাও নীরস একঘেয়েমি স্থান পায়নি।

লখীন্দর ও বেহুলার বাসররাত্রি-যাপনের দৃশ্যে কত বিভিন্ন রসের পরিবেশন করা হয়েছে। কাজলকূট পাহাড়ের মাথার উপর ছিদ্রবিহীন লোহার বাসরঘরে বর-বধূ প্রথম মিলন-রজনী যাপন করছেন। বহুক্ষণ পর্যন্ত বেহুলা-লখীন্দর প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলেন। ক্রমে রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হ'তে লাগল। সেই জনমানবহীন বাসরঘরের চারপাশে যেন কি ঘোর অমঙ্গল ঘনিয়ে উঠতে লাগল। চারদিকে হিংস্র পশুর গর্জন শোনা যেতে লাগল, লখীন্দর অঘোর নিদ্রায় ঢলে পড়লেন।

এমন সময় ছিদ্রপথে প্রবেশ করতে লাগল—একের পর এক বিষধর সাপেরা। বেহুলা লখীন্দরের শিয়রে একদৃষ্টে চেয়ে বসে আছেন। তিনি দুধকলা দিয়ে প্রহরে প্রহরে তাদের বন্দী করে ফেলতে লাগলেন। রাত্রি প্রভাতের দিকে এগিয়ে গেল, বালিকাবধূ নিঃশঙ্কচিত্তে ভাবলেন,—আর কোন ভয় নাই। সারারাত বিনিদ্র থেকে তাঁর চোখে ঈষৎ তন্দ্রার আবেশ নেমে এল, আর সেই মুহূর্তে বিষধর কাল-নাগিণী লখীন্দরকে দংশন করল। লখীন্দর "জাগো বেহুলা, জাগো বেহুলা" বলতে বলতে কাল-নিদ্রায় ঢলে পড়লেন। সচকিতে বেহুলা জেগে উঠে দেখলেন, তাঁর জীবনের শুভরাত্রি কালরাত্রিতে পরিণত হয়েছে।

পরম সুখ থেকে গভীর দুঃখে পতন মুহূর্তের এই বর্ণনা পড়তে পড়তে আমাদের মন সুখ-দুঃখ-ভয়ের বিচিত্র দোলায় দুলতে থাকে।

শুধু এই একটি দৃশ্য নয়, এমনি আরও কত দৃশ্যে পাঠকের মনে কাব্যরস ঘনিয়ে ওঠে।

দেবসভায় বেহুলার নাচের দৃশ্য তারই একটি নিদর্শন। কি কঠিন দুঃখসাগর পার হয়ে মর্ত্যের মানবী বেহুলা দেবলোকে পৌঁছে দেবতাদের কাছে লখীন্দরের প্রাণভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনও পরীক্ষার শেষ হয়নি। মহাদেব আদেশ দিলেন—"বেহুলা তুমি শ্রেষ্ঠ নর্তকী, তোমার নাচ দেখিয়ে দেবতাদের প্রসন্ন ক'রে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে নাও।"

দুঃখে, ব্যথায় বেহুলার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে আদেশ হ'ল আনন্দের নাচ দেখাও। একি কখনও সম্ভব! কিন্তু মৃত্যুকে যিনি জয় করতে কৃতসংকল্প, তাঁর পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়।

দেবসভায় বেহুলা নাচতে উঠলেন। দুঃখ-তাপে বিক্লিষ্ট অন্তরের অনির্বাণ তেজে উদ্ভাসিত তাঁর মুখশ্রী দেখে দেবতারা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বেহুলা প্রথমে বসন্ত-রাগ আলাপের সঙ্গে সঙ্গে নাচতে লাগলেন, সে নাচের তালে তালে স্বর্গের চির-আনন্দলোকে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল। কিন্তু মর্ত্য-মানবীর বেদনা-দীর্ণ অন্তর কি বেশীক্ষণ শাসন মানে! হঠাৎ তাঁর নাচের ছন্দ বদলে গেল, বেহুলার চরণছন্দে মর্ত্যের ব্যথাভরা করুণ রাগিণী বেজে উঠল। সেই নাচের ভিতর থেকে পৃথিবীর সব শোক সব দুঃখ যেন ঝংকৃত হয়ে উঠতে লাগল। মন্দাকিনী তার ছন্দ হারাল, দেবতাদের চিরশুষ্ক চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। প্রসন্ন হয়ে তাঁরা বেহুলাকে মৃত্যুজয়ের বর দিতে চাইলেন।

দেবসভার এই আনন্দ-ব্যথায় বিহ্বল দৃশ্য দেখতে দেখতে পাঠকের মনে কত যে ভাব-ব্যাকুলতা ঘনিয়ে ওঠে, তার আর অন্ত নাই।



নেশা

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

ঝকঝকে ধারাল ছুরিখানা অবু কোমরে গুঁজে রাখল। তারপর সন্তর্পণে বড় রাস্তাটা পার হয়ে সরু গলিটার মুখে ঢুকে পড়ল।

রাস্তায় লোক চলাচল নেই। সারা সহরটা যেন জনহীন প্রেতপুরীর মত খাঁ খাঁ করছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষে যেন নগরীর সারাটা গা কালো হয়ে গেছে।

কালো হোক ক্ষতি নাই—বরং লাল হলে আরো বেশী ভাল হত। সারাটা সহর রক্তে লাল হয়ে গেলে অবুর খুব ভাল হত। সে পেট ভরে খেতে পারত দু'বেলা। দু'একটা লোককে খুন করে যা পাওয়া যায় তা'তে তার বেশ এখন দিন চলে যায়। কোন ভদ্রলোককে মারতে পারলে সেদিন রোজগার হয় উপরি অনেক কিছু। সোনার বোতাম রিস্টওয়াচ ফাউণ্টেনপেন, আংটি......

অবুর হিংসা হয় গফুরকে। পাকা ওস্তাদ গফুর। সে কোনদিন পাঁচটি, ছ'টি কোনদিন বা দশটি লোককে খুন করে ফেলে। ছুরিতে ওরকম পাকা হাত করতে পারলে সে-ও গফুরের মত টাকা রোজগার করতে পারত।

ভাবতে ভাবতে অবু একটু অন্যমনস্ক—উদাসীন হয়ে পড়ল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা লোক সদর রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। অবুর বুকটা আনন্দে নাচতে লাগল।

ঐ লোকটা এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে আসছে। চোখে যেন ভীত ও হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টি। যাক্—সেদিকে লক্ষ্য করবার সময় অবুর নেই। সে গলির একটু আড়ালের মাঝে নিজকে লুকিয়ে ফেলল।

গলির মুখটা পার হয়ে যাওয়া মাত্রই অবু লোকটার উপর লাফিয়ে পড়ল। কোন চিৎকার করবার সুযোগ না দিয়েই লোকটার বুকে ছুরি বসিয়ে দিল। তবু মৃত্যুর পূর্বে লোকটি অস্ফুট চিৎকার করে উঠল—মাগো।

তারপর সব শেষ। রাস্তার দু'পাশের দোতলার জানালাগুলি বন্ধ হয়ে গেল।

অবু লোকটার পকেটগুলি হাতড়িয়ে বের করল দু'টি টাকা, এক টুকরো কাগজ আর একটি খালি শিশি। হয়তো লোকটা ডাক্তারখানায় যাচ্ছিল ওষুধের জন্য। বাসায় কারুর অসুখ......এজন্যই লোকটার চোখে ছিল হতাশা ও ভয়ের দৃষ্টি।

সেদিকে লক্ষ্য করলে চলবে না। সে তাড়াতাড়ি টাকা দু'টো কোমরে গুঁজে ও খালি শিশিটা রাস্তার পাশে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গলির ভিতরে ঢুকে পড়ল।

খালটার ওপারে বটতলায় হল ওদের আড্ডা। সন্ধ্যার পরে সবাই এসে এখানে মিলিত হয়। ইয়াসিন আসে, বাচ্চু আসে, গফুর এবং অবুও আসে। গফুরের সঙ্গে আলাপ হয় অবুর।

অবু জিজ্ঞেস করে—আজ ক'টা হল?

গফুর নিরুদ্বেগে জবাব দেয়—বেশী নয়, পাঁচটা।

পাঁচটা, তাই বেশী নয়? সব শুদ্ধ পেলে কত?—জিজ্ঞেস করে অবু।

—সেই জন্যই তো বলছি বেশী নয়। প্রথমটার ট্যাঁকে কিছুটা পেয়েছিলাম। বারোটা টাকা ছিল আর ছিল ওর হাতে একটা আংটি। তার পরের দু'টো একেবারে ফাঁকা। তার পরের লোকটার সঙ্গে ছিল চার টাকা পনের আনা এক পয়সা। লোকটা ট্রাম থেকে নেমেছিল। আর শেষের লোকটাও একেবারে ফাঁকাই যেত; ভাগ্যিস ওর উপরু পকেটে ছিল কয়েক আনা খুচরো পয়সা আর আনকোরা নতুন এক প্যাকেট সিগারেট—

—সিগারেট?—অবু লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকায়।

গফুর সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে একটা সিগারেট অবুকে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'টো হাত এগিয়ে আসে। বাচ্চু ও ইয়াসিনের। ওরা এদের আলোচনার অন্য কিছুতে মনোযোগ না দিলেও সিগারেটের কথা শুনতে পেয়েছিল।

গফুরের খরচ হয়ে যায় আরও দু'টি সিগারেট। তারপর নিজে আর একটি ধরিয়ে তার নির্দিষ্ট খাটিয়ার উপর বিশাল দেহটা এলিয়ে দেয়।

সিগারেটের ধোঁয়াটা উপরের দিকে ছাড়তে ছাড়তে বলে—টাকা পাওয়া যায়—তবু সিগারেট পাওয়া যায় না। দোকানদারগুলো সব পালিয়েছে। একদিন দেব শালাদের দোকান পুড়িয়ে।

অবু তখন বাতাসে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে চেয়ে চেয়ে হিসেব করছিল—দশ টাকা, একটা আংটি ত্রিশ টাকা, আর চার টাকা পনের আনা এক পয়সা......ভাবতে ভাবতে অবুর চোখ স্ফীত হয়ে উঠছিল।

এত টাকা রোজগার করে গফুর? অবুর মনটা হকচকিয়ে ওঠে। তার হিংসা হয়। নরহত্যার নেশা তার মনকে উন্দাম করে তোলে।

পরদিন ভোরে ছোরাটাকে ভাল করে শানিয়ে নেয় অবু। আরো ঝকঝকে করে নেয়। তারপর বেরিয়ে পড়ে তার নির্দিষ্ট মহল্লার দিকে।

আজ রাস্তাঘাট যেন আরও নির্জন। গাড়ি ঘোড়াও নেই। বোধ হয় স্থানে স্থানে 'কারফিউ' জারি হয়েছে। অবুর মনটা একটু দমে গেল।

ধীরে ধীরে পরিচিত গলিগুলি পার হয়ে চলতে লাগল।

মোড়টার কাছে এসেই দাঁড়িয়ে গেল সে। ভোঁস করে একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি মোড়টার কাছে এসে থামল। হয়তো কল বিগড়ে গেছে। গাড়ি থেকে ড্রাইভার নামল। অবুর চেনা লোক সে। লছমন।

অবু লছমনের কাছে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ চমকে ওঠে লছমন। তারপর হাসে।

—কি খবর অবু? জিজ্ঞেস করে লছমন।

—খবর ভাল। সিগারেট আছে? দাওনা একটা।—অবু কথাটাকে লঘু করে।

লছমন ট্যাক্সির মুখের দিককার সেডটা খুলে একটু কারিগরি করে নেয়। হঠাৎ যেন ট্যাক্সির কলটা মুখর হয়ে ওঠে। লছমন আশ্বস্ত হয়ে ভিতরের সিটটায় গিয়ে বসে। সঙ্গে সঙ্গে অবুও। লছমন ঘাবড়ে যায় একটু। আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। সে একটু সতর্ক হয়ে বসে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে তাড়াতাড়ি বিদেয় করবার চেষ্টা করে অবুকে।

অবু কিন্তু নড়ে না। সিগারেটটা ধরিয়ে লছমনের পাশে বসেই টানতে থাকে। লছমন ভয় পায়। মোটরটা স্টার্ট দেবার আগে অবুকে বলে—গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি অবু—নেমে পড়।

—কোন্ দিকে যাবে?—জিজ্ঞেস করে অবু।

—সোজাসুজি—ট্রাঙ্ক রোড।—লছমন জবাব দেয়।

—আমাকে ঐ মোড়টায় নামিয়ে দিও। ওখানে একটু দরকার আছে। অবু সিগারেট টানতে থাকে।

লছমন রাজী না হয়ে পারে না। গাড়িটা চালিয়ে দেয়।

অবু মোড়টার কাছে নেমে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মোটরটাও থেমে যায়। মোটরের ভিতর পড়ে থাকে লছমনের আহত দেহ।

লছমনের [illegible]ণিব্যাগটা নিয়ে গলিটা পার হয়ে অবু তখন [illegible]নেকদূর চলে গেছে।

পড়ো বাজারটার [illegible] কাছাকাছি ভাঁটিখানা। দেশী মদ ও তাড়ির এটাই হল গুপ্ত আড্ডা। অবু সেখানে এসে হাজির হয়। ভাঁটিখানায় তখন বেশ ভীড় জমে গেছে।

একটা খালি বেঞ্চে বসে মণিব্যাগটা খুলে পয়সা গুণতে সুরু করে অবু। সাত টাকা পাঁচ আনা দু'পয়সা—একটা ব্যাঙ্কের চেক লছমনের একটা ফটো ও লাইসেন্স।

ভাগ্যিস লছমন চেনা লোক। তাই রেহাই দিয়েছে। নইলে দু'টুকরো করে কেটে ফেলত লছমনকে।

টাকা পয়সাগুলো রেখে অবু ফটো, লাইসেন্স ও চেকখানা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে। তারপর দেশলাইটা জেবলে সেগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

পাশেই একটি লোকের নেশা তখন বেশ জমে উঠেছে। উৎসাহের আতিশয্যে তার রুমালটা সেই আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়। আগুনটা আরও জবলে ওঠে। লোকটা হিঃ হিঃ করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে আমোদ উপভোগ করে।

অবুও তখন নেশার বশবর্তী হয়ে পড়েছে। দেশী মদে নেশা সহজেই ধরে। সে-ও পয়সাগুলো রেখে মণিব্যাগটা আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়। চামড়া পোড়ার বিশ্রী গন্ধে যায়গাটা ভরে ওঠে।

বেহায়া লোকগুলোর পিত্তি নেই। একজন বলে ওঠে—বাঃ, খাসা গন্ধ! আর একটি লোক টেবিলে জোর চাপড় মেরে বলে—চালাও চিংড়ির কাট্‌লেট্—

অবুর পাশে এসে বসে ইসমাইল। ইসমাইল সর্দার। বেলতলার সর্দার সে। সর্দার অবুকে একটা দাঁওয়ের সন্ধান দেয়।

সর্দার বলে—যাবি অবু?

—কোথায়? অবু জিজ্ঞেস করে।

—রাজার চক। সেখানে আপিস আছে। আপিসে নাম লেখাবি আর ছোরা নিয়ে ঘুরবি। একটা লোককে খুন করতে পারলে দশ টাকা আর জখম করলে তিন টাকা—বুঝলি?

—সত্যি? অবু যেন সহজে বিশ্বাস করতে চায় না।

—সত্যি না তো কি মিথ্যা? চল্ না আজই দেখে আসবি। সেখানে কি টাকার অভাব আছে? ওপরের আপিস থেকে রোজই টাকা আসছে।

অবুর মনে লোভ হয়। হিংসা হয়। নরহত্যার নেশা আবার নূতন করে তার মনে চেপে বসে।

—কাল যাব ভাই। আমাকে ভর্তি করিয়ে দিস। অবু কথা দেয় ইসমাইলকে।

অবু আরও মদ খেয়ে নিজকে চাঙা করে নেয়। নেশাটাকে পাকিয়ে তোলে। আজ যে ভাবেই হোক গফুরের চেয়ে বেশী তাকে রোজগার করতে হবে।

অবু ধীরে ধীরে রাস্তার দিকে রওনা হয়। শরীরটা টলতে থাকে।

সন্ধ্যার পর অবু যখন আড্ডায় ফিরল তার মনটা তখন বেশ প্রফুল্ল। মনে মনে ভাবল আজ সে গফুরকে অবাক করে দেবে। আজ সে দু'টোকে জখম করেছে—দু'টোকে খুন করেছে—সব শুদ্ধ পেয়েছে চব্বিশ টাকা নগদ আর একটি হাতঘড়ি।

গফুর এসেছে অবুর আগেই। খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়েছে। অবু মনে মনে খুসী হল। গফুর তাহলে আজ সুবিধা করতে পারেনি নিশ্চয়ই।

গফুরের পাশেই অবু শুয়ে পড়ল। বেশ একটু ভারিক্কি চালে। যেন এই মাত্র যুদ্ধ জয় করে ফিরেছে।

—কিরে অবু খবর কি? গফুর জিজ্ঞেস করল।

—তোমার খবর কি আগে তাই বল। অবু বলল।

—আমার খবর বিশেষ সুবিধার নয়। শরীরটা বেশী ভাল ছিল না—তাই শীগ্‌গীর ফিরে এলাম। মাত্র একটাকে খুন করেছি। তা-ও চেনা লোক। ঘোষ পাড়ার সেই দাশু স্যাকরা। ব্যাটার সঙ্গে ছিল এক ছড়া সোনার হার—এইটুকু বলে গফুর একটা সিগারেট ধরাল।

সোনার হারের কথা শুনে অবুর মন উৎকণ্ঠায় ভরে গেল। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল বাকী কথাটুকু শুনবার জন্য।

গফুর বলতে সুরু করল—মনটা মানল না এত দামী হারটা দেখে। আলাপ করতে করতে বুকে ছুরি বসিয়ে দিলাম। বেটা চিৎকার করতেও পারল না।

—তারপর? অবু জিজ্ঞেস করল।

—তারপর আর কি? হারটা নিয়ে এলাম। সঙ্গে একটা [illegible] টাকা আর কয়েক আনা পয়সা ছিল—ওগুলো আর আনলাম না।

—কত ভরি হবে হারটা? অধীরভাবে জিজ্ঞেস করল অবু।

—ভরি চারেক হবে।

—চার ভরি? তবে তো প্রায় চার শো টাকা দাম! অবুর চোখ দু'টো উজ্জ্বল—বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

—বিশ্বেস না হয় দ্যাখ্‌না—ট্যাঁক থেকে বার করল গফুর হারটা। অবু হাতে ধরে দেখল—বাস্তবিক ভারী—দামী—আর কি উজ্জ্বল! চোখ ফেরানো যায় না।

হারটা কোমরে গুঁজে রেখে গফুর আবার শুয়ে পড়ল। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল—একটা সিগারেট দে তো অবু। সবাইকে দিতে দিতে আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। গিয়েছিলুম বিলিতি মদ কিনতে—পকেট থেকে কে দিয়েছে ভরা সিগারেটের প্যাকেটটা মেরে।

অবু একটা সিগারেট দিল গফুরকে। সেটা ধরিয়ে গফুর প্রাণপণে টানতে লাগল। মনটা যেন আজ তার ভাবনাহীন—বিস্তৃত—উদার। বলল—যাই বলিস আজ নেশাটা জমেছে ভালো।

গফুর এবার নির্ভাবনায় চোখ বুজল

অবুর মনটা ধুক্‌পুক্ করতে লাগল। আজ কি হার হয়ে গেল তার? গফুরের প্রতি হিংসা হল অবুর। এমন সোনার হার......

অবুর মনে লোভ জাগে......দুর্নিবার নেশা তাকে পাগল করে তোলে।

গফুরের এবার নাক ডাকা সুরু হল।

অবু ধীরে ধীরে ডাকল—গফুর—ও গফুর—ঘুমুলে নাকি?

গফুর এবার সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। হয় তো বা তার নেশা ধরেছে।

অবুর মনে জেগে উঠেছে হিংসা—লোভ ......নেশার ক্রূর প্রবৃত্তি। সে ধীরে ধীরে উঠে বসল। কোমর থেকে বের করল তার ধারাল ছুরি। তারপর হিংস্র জন্তুর মত লাফিয়ে পড়ল গফুরের উপর। গলায় ছুরিটা বসিয়ে দিল।

অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণে গফুরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে গলার কাছে অনুভব করল তীব্র ব্যথা। মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে তারপর অবুর হাতখানা ধরে ফেলল এবং এক ধাক্কা দিয়ে অবুকে নীচে ফেলে দিল। অবুর হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে সজোরে বসিয়ে দিল অবুর পেটে। গলায় কঠোর আঘাতের যন্ত্রণা গফুরও বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারছিল না। সেও আর্তনাদ করে উঠল।

বাচ্চু ও ইয়াসিন পাশেই ছিল। তারা ঘুমায় নি। নেশায় বিভোর হয়ে পড়েছিল। ধস্তাধস্তি ও চিৎকার শুনে তারা উঠে বসল।

কিন্তু নেশার ঝোঁকে চোখে সবই যেন আবছা ও উলট্‌পালট্ দেখছিল। কাজেই কিছু না বুঝতে পেরে তারা চেঁচিয়ে উঠল—বাঃ ক্যায়া খবসুরত হ্যায়।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাঙলায় "নেতাজী জয়ন্তীর" সময় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এক নূতন পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একটি নূতন দল গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন; সে দল—

সুভাষচন্দ্রের আদর্শ গ্রহণ করিবেন

এবং

তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ করিতে অবহিত হইবেন।

তিনি যে দল গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার সহিত কংগ্রেসের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। কেবল বলা হইয়াছেঃ—

প্রস্তাবিত "আজাদ হিন্দ" দল—

(১) ভারতবর্ষ স্বাধীন ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র চাহেন।

(২) দলের মত এই যে, স্বাধীন ভারতে জমি কৃষকের হইবে—অর্থাৎ হাল যা'র, জমি তা'র হইবে। সুতরাং কোনরূপ জমীদারী স্বত্ব থাকিবে না।

(৩) দেশের প্রাথমিক শিল্প সরকারের হইবে।

(৪) স্বাধীন ভারতে সকলেরই ধর্মাচরণে স্বাধীনতা থাকিবে।

(৫) ৪০ বৎসর পর্যন্ত বয়স্কের পক্ষে সামরিক কাজ বাধ্যতামূলক হইবে।

বাঙলা হইতে যে নূতন দলের—প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রচারিত হইয়াছে, ইহা আমরা সংগত বলিয়াই বিবেচনা করি।

কারণ, বাঙলাই এদেশে প্রথম মুক্তির ও জাতীয়তার কথা লোককে শুনাইয়াছে। এই বাঙলায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দেশকে মাতা বলিয়া সন্তান ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সন্তানের কথাঃ—

"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয় সমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা"—জন্মভূমি।

যে কথা রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, ইহা সেই কথা—যে মন্ত্র তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহাই। রামচন্দ্র যখন অত্যাচারী রাবণের লঙ্কায় আবদ্ধা সীতার উদ্ধার সাধনের জন্য সমুদ্রকূলে উপনীত, তখন একদিন প্রভাতারুণ-কিরণপাত সমুজ্জ্বল লঙ্কা দেখিয়া লক্ষ্মণ মুগ্ধ হইলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—লঙ্কা রত্নসৌধ-কিরীটিনী হইলেও আমার রুচিকর নহে: কেন না জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের জন্য অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষি বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছিলেন—যেদিন আমরা জন্মভূমিকে সত্য সত্যই মা বলিয়া মনে করিব—সেই দিনই আমাদিগের মনে স্বাধীনতার আদর্শ উজ্জ্বল হইবে।

আর এই বাঙলায় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী সকলকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"সদর্পে বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

সুভাষচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্তিত "সন্তান ধর্মে" দীক্ষিত। তিনি বিবেকানন্দের উপদেশে প্রভাবিত।

তাই তিনি "আজাদ হিন্দ ফৌজ" গঠনে অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। আজ উপদ্রুত পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থাপনের বাধা অনুভব করিয়া গান্ধীজী বার বার বলিতেছেন, সুভাষচন্দ্র—বিদেশে সত্য সত্যই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

যখনই কংগ্রেস গতি হারাইয়াছে, যখনই কংগ্রেস প্রগতি পথে আর অগ্রসর হয় নাই, তখনই বাঙলা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। প্রথম বিদ্রোহ বঙ্গবিভাগ আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া। সেই আন্দোলনই এদেশে প্রথম ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে কংগ্রেসে—

(১) লালা লাজপত রায় বলিয়াছিলেন—সেই আন্দোলন প্রবর্তনের গৌরব বাঙলার জন্য ছিল; তাহা বাঙলার প্রাপ্য। অর্থাৎ বাঙলার গোমুখী মুখে যে ভাবগঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই ভারতের উদ্ধার সাধন করিয়াছে।

(২) গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন—বাঙলার আন্দোলন যদি কোথাও কোথাও সংযম সীমা লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তাহাতে বিস্মিত বা বিরক্ত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কারণ, নদীতে যখন বন্যা আসে তখন জল কোথাও কোথাও কূল অতিক্রম করে।

বাঙলার বিদ্রোহ দমিত করিবার জন্য তখন স্বাধিকারপ্রমত্ত পুরাতন দল যে চেষ্টা করেন, তাহাতেই সুরাটে কংগ্রেস ভাঙিয়া গিয়াছিল। কংগ্রেস জড়ত্ব শাপ ভোগ করিয়া দশ বৎসর পরে জাতীয়তার ভাবের স্পর্শে আবার মুক্তিলাভ করিয়াছিল। তখন কংগ্রেসের সভাপতি বাঙালী অম্বিকাচরণ মজুমদার বলিয়াছিলেন—প্রবাহিনীর আবিল জলও বদ্ধজলাশয়ের নির্মলবারি অপেক্ষা অধিক উপকারী।

বাঙালী চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসে গান্ধীজীর

'বিনা অস্ত্রে'

আমরা যে কোন প্রকার কঠিনঃ—অর্শ, ভগন্দর, নালী, হাড়পচা, গণ্ডমালা, রক্তদুষ্টি, নেত্র নালী, পৃষ্ঠাঘাত, বিখাউজ, গজচর্ম, পোড়া, দূষিত ক্ষত, পচা ঘা, স্ফোটক প্রভৃতি বিনাঅস্ত্রে চিকিৎসা করিয়া থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

লক্ষ্মীবাজার ক্ষত চিকিৎসালয়

১৩নং কে, জি, গুপ্ত লেন, ঢাকা।

রঞ্জ-টোন

স্নায়বিক ও সর্বপ্রকার দৌর্বল্যে শক্তিবর্দ্ধক ওয়াইন টনিক।

মাত্রা—চায়ের ২ চামচ অথবা ৪ চামচ আহারান্তে প্রত্যহ তিনবার।



রঞ্জন ল্যাবরেটারীজ

৬নং হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা।

নীতির প্রতিবাদ করেন এবং গয়ায় পরাভূত হইলেও দিল্লীতে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বাঙালী সুভাষচন্দ্রও কংগ্রেসের ব্যবহারে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; তাই তিনি বিদ্রোহী সুভাষ। আজ তাঁহার জয়গানে ভারতবর্ষের গগন-পবন মুখরিত।

আজ যে কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তনের ও পদ্ধতি সংশোধনের কারণ ঘটিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। আজ যে কংগ্রেসের মধ্যে অন্য কোন দলের অবস্থানে কেহ কেহ শঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতেই সে কারণ সপ্রকাশ।

শরৎবাবু বিলাতের মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব গ্রহণের বিরোধী ছিলেন,কংগ্রেস সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাহার পরে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে অনেক কথাই শুনা গিয়াছিল। তখন বলা হইয়াছিল, গণ-পরিষদ প্রদেশসঙ্ঘ গঠনের ব্যবস্থায় সম্মত হইবেন না। গান্ধীজী এখনও আসামকে সে ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার ডিসেম্বর মাসে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে প্রদেশসঙ্ঘ গঠন বাধ্যতামূলক বলা হইয়াছে। কংগ্রেসও পূর্বমত বর্জন করিয়া সেই ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

শরৎবাবু কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

মিস্টার সুরাবর্দী বলিয়াছেন—বিহার হইতে দেড় লক্ষ মুসলমান আনিয়া বাঙলায় তাহাদিগের বসতি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কেন্দ্রী সরকার কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। বাঙলার গভর্নর যে সে বিষয়ে সচিবদিগের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, এ আশা আমরা করিতে পারি না। তিনি বাঙলায় কিরূপ অপ্রীতি অর্জন করিয়াছেন, তাহার পরিচয় প্রথমে কার্শিয়ংএ পাওয়া গিয়াছিল। গত ১৬ই মাঘ জলপাইগুড়িতেও পাওয়া গিয়াছে। ঐদিন তিনি জলপাইগুড়ীতে উপনীত হইবেন, কথা ছিল। সেই জন্য তথায় হরতাল হয়। তিনি বৃহস্পতিবারে তথায় না যাইয়া পরদিন তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি যাহাই কেন করুন না—ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কেন্দ্রী সরকারের আছে।

কংগ্রেস যখন বড়লাটের শাসন-পরিষদে সদস্যপদগুলি গ্রহণ করেন, তখন সর্ত ছিল—সদস্যদিগের যৌথ দায়িত্ব থাকিবে। কিন্তু মুসলিম লীগ—পরে—লর্ড ওয়াভেলের চেষ্টায় শাসন-পরিষদে প্রবেশ করিয়া সেই যৌথ দায়িত্ব অস্বীকার করেন। তাহাতেও কংগ্রেসীরা আপত্তি করেন নাই—পদত্যাগ করেন নাই। তাহার পূর্বে তাঁহারা কলিকাতার ও পূর্ববঙ্গের ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও খুব তিক্ত। পণ্ডিত জওহরলাল কেন্দ্রী পরিষদেই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা যে বাঙলার ব্যাপারে বেদনানুভব করেন নাই, তাহা নহে; কিন্তু বাঙলার সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনশীল—তাহার কার্যে হস্তক্ষেপ কেবল বড়লাট করিতে পারে। সপার্ষদ বড়লাটের সে ক্ষমতা নাই। কিন্তু একথা কি সত্য নহে যে, বড়লাট তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন,

ডাক্তার বলেন

"কিচ্ছু না। তবে, সংক্রামন এড়াবার জন্যে এক শিশি ডেটল কিন্তু ব্যবহার করতেই হবে।"
"আচ্ছা ডাক্তার আমার প্রসবের সময় বিশেষ গোলমালের ভয় নেই তো?"
"ডাক্তার বাবু, এখনি চলুন! বাচ্চাটি ভালোই আছে কিন্তু তার মা বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।"
"এক্ষনি আসছি, কিন্তু এক শিশি ডেটল কিনে রেখেছেন তো?"
"আমাদের এই সুস্থ ও সুখী পরিবারটির জন্যে ধন্যবাদ কিন্তু ডাক্তারেরই পাওনা। তবে ভবিষ্যতের জন্যে বাড়িতে এক শিশি ডেটল সব সময়ই রাখতে হবে।"
"আমি বলছি, চারদিকের নানা রকম বীজানু আর সংক্রামন থেকে বাঁচতে হলে ডেটলের বাড়া ওষুধ নেই। একটু কাটা আঁচড়ও সাংঘাতিক হতে পারে যদি না তক্ষুনি তাতে ডেটল দেয়া হয়। যেমন হাসপাতালে, তেমনি বাড়িতেও রোগীর সেবা করবার সময় ডেটল দিয়ে হাত ধুয়ে নেয়া উচিত। ডেটল হচ্ছে সব চাইতে নির্ভরযোগ্য বীজাণুনাশক প্রত্যেক ক্ষেত্রে।"

'DETTOL'
'ডেটল' আধুনিক বীজাণুপ্রতিষেধক
অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিঃ, ২০/১, চেৎলা রোড, কলিকাতা।

তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে কাজ করিবেন? কবে কিরূপে তাঁহাদিগের পরামর্শ ত্যক্ত হইল?

এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু "আজাদ হিন্দ" দল গঠনের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, সেই দল কংগ্রেস বর্জন করিয়া কাজ করিবে না—পরন্তু কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াই কাজ করিবে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের বঙ্গ বিভাগ বিরোধী আন্দোলন হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের আন্দোলন পর্যন্ত কংগ্রেসের ইতিহাস মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলেই ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেই ক্রমোন্নতি যে "অধীর আদর্শবাদীদিগের" কার্যফল, তাহা বলা বাহুল্য।

সুভাষচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, তিনি কেবল আদর্শবাদী ও আশাবাদী নহেন। তিনি স্বপনকে বাস্তবে পরিণত করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন। তাহা তিনি দেশের শাসক-শক্তির জন্য যেমন দেশবাসীর জন্যও তেমনই—দেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইয়া দেখাইয়াছেন।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্য-পদ ত্যাগকালে বলিয়াছিলেন—গণ-পরিষদ যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণানুসারে কাজ করিবেন, তখন গণ-পরিষদের নিকট কিছুই আশা করা যায় না। এখন মুসলিম লীগও বলিতেছেন, বৃটিশ সরকার ঘোষণা করুন—গণ-পরিষদ ব্যর্থ হইয়াছে। গণ-পরিষদ যদি বৃটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিতেন, তবে অবশ্য তাঁহারা বলিতে পারিতেন—পরিষদের কার্য অব্যাহতভাবেই চলিবে। কিন্তু ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যাও গ্রহণের পরে তাঁহাদিগের পক্ষে আর সেকথা বলা শোভা পায় না। সুতরাং হয়ত কংগ্রেসকে আবার নূতন আন্দোলনের আয়োজন করিতে হইবে।

এই সময়ে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু নূতন রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য আমরা [illegible] বাবুকে অনুরোধ করি, তিনি তাঁহার পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানের সকল জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে প্রকাশ করুন।

[বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা]

সম্পাদনা : জগদিন্দু বাগচী

পঙ্কিল

Kuprin-এর Yama the pit-এর প্রথম সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন কুমারেশ ঘোষ ও সুকুমার গুপ্ত। রাশিয়ার বারবনিতাদের কলঙ্কময় করুণ কাহিনী। দাম ৩৸০।

রোড্ ব্যাক্

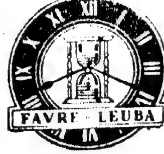
Remarque-এর Der Weg Zuruck-এর অনুবাদ করেছেন কুমারেশ ঘোষ। দাম ২৷০।

১৪ই ডিসেম্বর (যন্ত্রস্থ)

Merezhkovsky-র December the Fourteenth -এর সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করেছেন চিত্তরঞ্জন রায় ও অশোক ঘোষ। জার-শাসিত রাশিয়ার স্বরূপ পরিচয়—ভয়াল, মর্মন্তুদ, মহৎ।

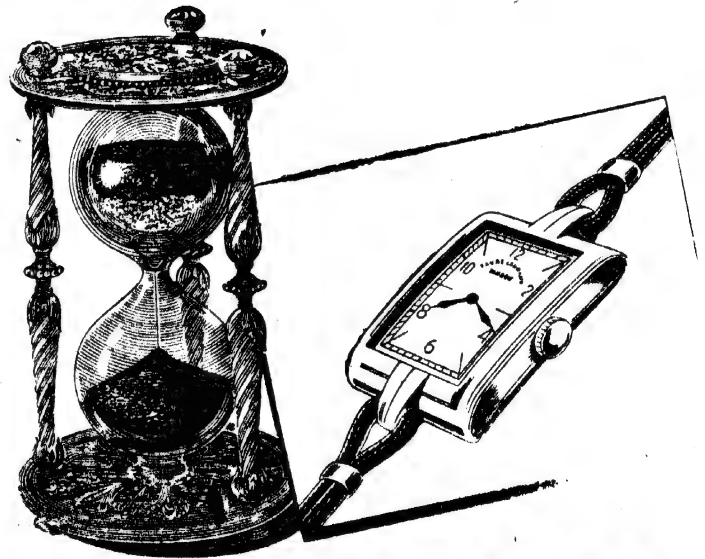
রীডার্স কর্ণার

৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।



সময় অতীব প্রয়োজনীয়

বালি-ঘড়ি ও সূর্য-ঘড়ির দিন আর নাই—সময়ের মাপ এখন মিনিটে সেকেণ্ডে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এজন্য সকলেই চায় ফেব্র-লিউবা ঘড়ি—দেখতে মনোরম অথচ নির্ভুল সময় দেয়। দুঃখের বিষয়, এখনও ফেব্র-লিউবা ঘড়ি অতি দুর্লভ, কিন্তু একদিন আসবে যখন উহা প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যাবে।



FAVRE-LEUBA

ফেব্র-লিউবা এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড্ * বোম্বাই * কলিকাতা।

অনুবাদ সাহিত্য

একটি রাস্তার নম্বর

ফ্রাঞ্জ মলনার

(হাঙ্গেরীয় একাঙ্কিকা)

[বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় নাট্যকার মলনারের একটি াটিকার অনুবাদ ইতিপূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় কাশিত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে নাটকারের কটি পরিচিতিও দেওয়া হয়েছিল। বাহুল্যবোধে বার আর নাট্যকার-পরিচিতির পুনরাবৃত্তি করা ল না। নীচে তাঁর অপর একটি একাঙ্কিকার নুবাদ মুদ্রিত হল। —অনুবাদক]

ডানিয়ুব নদীর তীরে একটি ভ্রমণের জন্য র্মিত স্থান। সেখানে দুটো চেয়ারে রামে হেলান দিয়ে বসে আছে একজন রুষ ও একজন নারী। পুরুষটির বয়েস ঞ্চাশ—আর নারীটির বয়েসও কিছু বেশী—য়তাল্লিশ। মধ্যাহ্ন কাল। এপ্রিলের উজ্জ্বল র্যালোক চারিদিকের গাছের উপর সোনা ড়াচ্ছে।

পুরুষ : তারপর কি হল?

নারী : তখন আমি আবিষ্কার করলাম পত্নীসুলভ বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকারেরও মা আছে। পারিবারিক শান্তি অতিরিক্ত হলে আবার টেঁকে না।

পুরুষ : তাই নাকি?

নারী : আমি জানতে পারলাম যে, আমার ামীর পারিবারিক শান্তিতে অরুচি ধরে গছে। নিখুঁত নীরবতা, পরিপূর্ণ মিল এবং মাদের গৃহের বাঁধাধরা জীবন তাকে যেন ার তৃপ্তি দিতে পারছে না। তার তিটি অভাব পূরণের সব ব্যবস্থাই ছিল। টবিলে তার প্রিয় খাদ্যসমূহ দেয়া হত—সে যদি াইরে যেতে চাইত, তবে আমরা উভয়েই বরোতাম। সে যদি বাড়ীতে থাকতে চাইত, বে আমরা বাড়ীতেই থাকতাম। এমন কি মাদের যদি বাইরে যাবার কথাও থাকত—মন ধর আগেই কোন থিয়েটারের টিকিট কনা থাকত—আর সেই সন্ধ্যায় সে মাথা-থা নিয়ে বাড়ী ফিরত, তবে আমি বিনা বধায় সান্ধ্য পোষাক খুলে ফেলে ড্রেসিং াউন পরতাম এবং তার মাথা ব্যথা সারানোর ন্যে তৈরী হতাম। তার অর্থ কি তুমি তা ান—মাথায় ঠাণ্ডা কম্প্রেস দেয়া, ঠাণ্ডা নৈশ াবার খাওয়া, নীরব থাকা এবং সকালে সকালে য়ে পড়া।

পুরুষ : এককথায় দাম্পত্য-সুখ।

নারী : দাম্পত্য সুখ আমার স্বামীর াল লাগছিল না। সে একই সঙ্গে দাম্পত্য-খ এবং আমার উপরে বিরক্ত হয়ে উঠল। অন্ততঃপক্ষে আমার সম্বন্ধে তার ঔদাসীন্য এসে গেল। কি ঘটছিল তা যখন আমি বুঝতে পারলাম, তখন আমি বাছাইকরা সুন্দর সুন্দর ফ্রক ও প্রসাধন দ্রব্য কিনতে লাগলাম। কিন্তু সে এ সব ফিরেও দেখত না। তখন আমি ধরলাম ঠিক বিপরীত পথ। বেশ কিছুদিন আমি তার সামনে শুধু ময়লা ও বিবর্ণ গাউন পরেই বেরুতে লাগলাম। আশা করেছিলাম যে এর মধ্যে হয়ত সে নতুনত্বের আস্বাদ পেতে পারে। কিন্তু সে সমান উদাসীন থেকে গেল......তার কাছে আমার আর কোন মূল্য ছিল না, বুঝলে; শেষ পর্যন্ত সে অন্যত্র উত্তেজনা খুঁজতে আরম্ভ করেছিল। অবশ্য আমি একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, সে উত্তেজনার খোঁজে অন্য কোন মেয়ের কাছে যায় নি। সে ষ্টক মার্কেটে জুয়া খেলতে সুরু করল—আরম্ভ করল রাজনীতি চর্চা—এ সবই সে কত উত্তেজনা লাভের প্রত্যাশায়। এই সময়ে সে পার্লামেণ্টে নির্বাচন প্রার্থীও হয়েছিল।

পুরুষ : সেকথা আমার মনে আছে। আর তুমি কি করলে?

নারী : আমি তার মনে উত্তেজনা সঞ্চার করব স্থির মনে করলাম। আমার মনে পড়ল যে ঔৎসুক্য তার চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাজেই যে খাতাটায় আমি পারিবারিক হিসাব-পত্র রাখতাম সেই খাতাটা নিয়ে একদিন তার মলাটের মধ্যে পেন্সিলে লিখে রাখলাম : "১৭নং ব্রুয়ার ষ্ট্রীট।"

পুরুষ : ১৭নং ব্রুয়ার ষ্ট্রীট?

নারী : হাঁ। আমি যেমনটা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই ঘটল। শীঘ্রই একদিন সন্ধ্যাবেলা সে নিছক বিরক্তিবশতঃ ওই খাতাটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে সেই কথা কয়টি দেখতে পেল। সে কথা কয়টি পড়ল—কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। কয়েকদিন পরে আমি আবার তাকে দেখলাম সেই খাতাটি হাতে নিয়ে চিন্তান্বিতভাবে সেই "১৭নং ব্রুয়ার ষ্ট্রীটের" ঠিকানাটা পড়তে, আমি পাশের ঘর থেকে তার উপরে নজর রাখলাম।

পুরুষ : তার ঔৎসুক্য জেগেছিল?

নারী : আমি এমন ব্যবস্থা করলাম যাতে সে ঔৎসুক্য আরও বেড়ে যায়। সেই রাত্রে আমি সেই একই "১৭নং ব্রুয়ার ষ্ট্রীট" কথা কয়টি একখণ্ড শাদা কাগজের উপর লিখলাম এবং আমি মাঝে মাঝে পরতাম এমনই একটা লকেটের উপর সেটা রেখে দিলাম।

পুরুষ : কিন্তু ১৭নং ব্রুয়ার ষ্ট্রীটের ব্যাপারটা কি?

নারী : মোটেই কিছু নয়। এমনই আমার মনগড়া একটা ঠিকানা। আমি ভল্টা ষ্ট্রীট, বার্নার্ড ষ্ট্রীট কিংবা অন্য যে কোন রাস্তার নাম লিখতে পারতাম। তাতে কিছুই যেত আসত না। হঠাৎ আমার মনে এসেছিল ঐ ব্রুয়ার নামটা......তা যাক, আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার স্বামী লকেটের উপর সে ঠিকানাটা দেখতে পেয়েছিল। সেদিন থেকে সে একেবারে বদলে গেল।

পুরুষ : তার মানে?

নারী : আমার প্রতি তার আগ্রহ পুনরায় বেড়ে গেল। আমি যা কিছু করতাম বা বলতাম তাতেই তার প্রবল আগ্রহ দেখা যেত। আমার বেরিয়ে যাবার সময় সে জানতে চাইত আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি বাড়িতে ফেরার পর সে জানতে চাইত আমি কোথায় ছিলাম। আর আমি এমন ভাব দেখাতাম যে তার আগ্রহ একেবারে স্বাভাবিক। আবার তার সমস্ত চিন্তা জুড়ে আছি আমি এই বোধ আমাকে খুব সুখী করত। সে আরও নিয়মিতভাবে দাড়ি কাটত, তার নেকটাইয়ের দিকে আরও বেশী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দিত, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরত, টেবিলের প্রত্যেকটি খাদ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত, আমার নতুন ফ্রক ও গাউন তার চোখে পড়ত এবং সে প্রশংসা করত।

পুরুষ : এ সবই তুমি পেলে একটা রাস্তা এবং তার নম্বর লেখার জন্যে! আমরা পুরুষরা সত্যই কি সহজলভ্য,নই কি?

নারী : এটাই অবশ্য সব নয়। একদিন সে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে একটু দেরী করে বাড়ী ফিরল। যদিও সে হাসছিল, নিজের মনে গুণ গুণ করছিল এমনভাব দেখাচ্ছিল যে তার মনে সুখের অন্ত নেই, তবু তার চেহারা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে সে সবেমাত্র ১৭নং ব্রুয়ার ষ্ট্রীট থেকে আসছে এবং সে সেই হলদে বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে ঈর্ষা-কাতর আগ্রহে তার প্রতিটি জানালা খুঁটিয়ে দেখে এসেছে।

পুরুষ : ওঃ, সে বাড়ীটা বুঝি হলদে?

নারী : হাঁ, কিন্তু তা নিয়ে তোমার ঠাট্টা

করার কিছু নেই। আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে বাড়ীর রঙের কথা বলেছি।......যাক, তার-পর থেকে আমার স্বামী হল একেবারে নিখুঁত। সে রোজ ব্রুয়ার স্ট্রীটের বাড়ীতে যেত, সে বিষয়ে আমার সংশয় নেই—কিন্তু আমার প্রতি তার মনোযোগ ও সুবিবেচনার অন্ত ছিল না, সে আমার জন্যে উপহার নিয়ে আসত এবং আমার মনের ইচ্ছা আঁচ করে তদনুযায়ী কাজ করত। আমি বড় সুখী হলাম। আর সে যে আমার প্রতি আগে অবিচার করেছিল তার শোধও নিতাম আমি পুরোমাত্রায়। তখন মাথা ধরতে সুরু করল আমার।

পুরুষ : চমৎকার!

নারী : হাঁ, চমৎকারই বটে। কিভাবে একটি সহজ ঠিকানার দ্বারা আমি একটি উত্ত্যক্ত ও উদাসীন স্বামীকে রীতিমত ভাবপ্রবণ প্রেমিকে পরিণত করেছিলাম, আজও সেকথা যখন আমি ভাবি, তখন নিজের উপর নিজেই খুসী হয়ে উঠি। ......কিন্তু এখন আসছে গল্পের বোকামীর দিকটা......আমি প্রায় সমস্ত ব্যাপারটাই নষ্ট করতে বসেছিলাম।

পুরুষ : কি ভাবে?

নারী : তোমার ধারণা যে নারীদের তুমি ভাল বোঝ। তুমি ভাবতে পারবে না সমস্ত ব্যাপারটির প্রতি আমার কি অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল।

পুরুষ : আকর্ষণ আবার কিসের? আমি স্বীকার করছি যে, এটা আমার কাছে দুর্বোধ্য।

নারী : এ তো অতি সহজ ব্যাপার। আমার অভিনয় আমাকে এত আনন্দ দিয়েছিল যে, এটা নিছক অভিনয় বলে আমার অনুতাপ হচ্ছিল। আমি সতী নারী, এ বোধ অত্যন্ত সুস্থ এবং আনন্দদায়ক—কিন্তু অসতী নারীর অভিনয় করতে গেলে একটা অস্বাভাবিক ক্ষমতা-বোধ দেখা দেয়। তখন ভাবতে হয়, "যদি এটা সত্য হত! কি রোমাঞ্চকর আর কি মজার ব্যাপারই না হ'ত!" ......আমার কি হয়েছিল তুমি জানো? ব্রুয়ার স্ট্রীটের যে বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে আমার স্বামী রোজ আমার খোঁজ করত, সে বাড়ীটা স্বচক্ষে দেখার একটা অদম্য কামনা দেখা দিয়েছিল আমার মনে। আমি জানতাম যে, সে যদি একবার আমাকে ও-পথে দেখতে পায়, তবে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে—কিন্তু বিপদ আছে বলেই আমার যেন বেশী করে রোখ চেপে গেছিল।

পুরুষ : তুমি কি দেখতে গেছিলে?

নারী : আমি গেছিলাম। আমি একটা ভারী ওড়না পরে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে গেছিলাম। গলিটা সংকীর্ণ এবং ধূলিমলিন। ১৭নং বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়েছিলাম। আমার হৃৎপিণ্ডের গতি থেমে গিয়েছিল। দেখি বাড়ীটার ঠিক বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে আমার স্বামী একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে আছে। এমনই করে আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে, সে বাড়ীটা হলদে রঙের। আর কখনও সে বাড়ী দেখি নি। আর কখনও দেখবার ইচ্ছাও আমার হয়নি। কেননা, যে মুহূর্তে আমি আমার স্বামীকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, সে মুহূর্তে আমার এমন একটা অনুভূতি হয়েছিল —যে অনুভূতি সতী নারীর পক্ষে দুর্লভ... একটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজে ধরা পড়বার ভয়ংকর অথচ রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

পুরুষ : শুনতে বেশ মজা লাগে বটে—কিন্তু আমার মনে হয় যে, তোমার প্রেমিকের জন্যে অধিকতর আকর্ষণযোগ্য কোন বাসভবন তোমার পছন্দ করা উচিত ছিল। ব্রুয়ার স্ট্রীট এত—

নারী : ঐ স্ট্রীটটাই আমার প্রথম মনে পড়েছিল। আর তাছাড়া...তাছাড়া...এটা যথেষ্ট দূরে ছিল......

পুরুষ : দূরে ছিল? কিসের থেকে দূরে ছিল?

নারী : সে সময় তুমি যে এলিজাবেথ স্ট্রীটে থাকতে তার থেকে।

[পুরুষটি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে বসে তারা সমস্ত ব্যাপারটা স্মরণ করতে থাকে।]

অনুবাদক—গোপাল ভৌমিক

ছুটি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এখানে বাতাসে কী নেশা জড়ায় সারা সকাল।
বাদামী বালুর এই প্রগল্‌ভে ঢেউ কখন
মৃদু ছোঁয়া মনে লাগালো। পাহাড়ে চকিত শাল—
সারা গায়ে তার ঘন-মর্মর। মায়াবী মন!
ওরে মন, ওরে মায়া প্রজাপতি, রে যৌবন।

ওরে মন, ওরে মায়া প্রজাপতি, এ কী নেশায়
অগোছালো কথা ভিড় করে; এই স্বপ্ননীল
মায়া-ঝিম্‌ঝিম্‌ রোদ্দুরে মন হারিয়ে যায়।
হাল্‌কা ডানায় পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে যায়
সোনালী ঈগল। রৌদ্র পোহায় সারা নিখিল।

ওরে মন, ওরে মিঠে বসন্ত, সারা প্রহর
সোনা-মোড়া ঘন অবসর দিয়ে ভরা নিটোল।
দেহাতি পথের দুই ধারে দুটি একটি ঘর
রৌদ্র পোহায়। পাহাড়িয়া পথে মৃদু মাদল
ঝঙ্কার তোলে। এখানে ঝিমায় ছোট শহর।

ছায়ার দিশারী মধু-মালঞ্চ, রে যৌবন!
বাতাসের গান থেমেছে। আকাশ কী নিঝুম
অগাধ ছুটির ইশারা ছড়ায়। মায়াবী মন!
ধু-ধু বালিয়াড়ি দৃষ্টি হারিয়ে যায় কখন।
ছায়া-ঝিম্‌ঝিম্‌ শহরে নামবে সোনালী ঘুম।

দেবানন্দপুর

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম বর্তমানে একটি নগণ্য স্থান হইলেও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান শহর এবং একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া খ্যাত ছিল। সুদূর অতীতকালে বাসুদেবপুর, বংশবাটী, খামারপাড়া, কৃষ্ণপুর দেবানন্দপুর, শিবপুর ও ত্রিশবিঘা এই সাতটি স্থানে সপ্তঋষি তপঃ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহা সপ্তগ্রাম বলিয়া প্রখ্যাত হয় এবং গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সংগমস্থল বলিয়া ইহা হিন্দুগণের নিকট একটি তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত হয়। দেবানন্দপুর সেই সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও সপ্তগ্রাম ৫৩টি পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলাগুলির অংশবিশেষ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সপ্তগ্রামের বৈভব গৌরব সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন যে, প্লিনীর সময় হইতে পোর্তুগীজদের আগমন কাল পর্যন্ত এই স্থান রাজকীয় বন্দর ছিল। কালক্রমে এই প্রাচীন স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও পরবর্তীকালে যাঁহাদের গৌরবে এই দেবানন্দপুর গৌরবান্বিত হইয়াছিল সেই 'মুন্সী' বাবুদের কীর্তি অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

দেবানন্দপুরের মুন্সী বাবুদের পূর্বপুরুষ কামদেব দত্ত এই স্থানে আসিয়া প্রথমে বাস করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণপ্রসাদ দত্ত নবাব সরকারে কার্য করিয়া দিল্লীতে উচ্চ পদ এবং 'মুন্সী' আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র রামরাম দত্ত-ও রাজকার্যে কৃতিত্ব এবং পারস্য ভাষায় অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট হইতে ১১৫১ সালে বংশানুক্রমে 'মুন্সী' পদবী ব্যবহার করিবার অনুমতি এবং বহু জায়গীর প্রাপ্ত হন। তাঁহার চেষ্টায় এই গ্রামে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার একটি কেন্দ্রস্থল হয় এবং বাঙলার প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ভুরিশ্রেষ্ঠ* বা ভুরশুট পরগণা হইতে বাল্যকালে দেবানন্দপুর গ্রামে রামরাম দত্ত মুন্সী মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতিপূর্বক পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভুরিশ্রেষ্ঠ পরগণার শাসনকর্তা ছিলেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র * কর্তৃক তিনি হৃতসর্বস্ব হইলে, বালক ভারতচন্দ্র বাটী হইতে পলায়ন করেন। তিনি যে কবিত্ব রত্নের আকর তাহা পূর্বে কেহ জানিত না। একদিন দেবানন্দপুরে মুন্সী বাবুদের বাড়িতে সত্য-নারায়ণদেবের সিন্নি উপলক্ষ্যে, ভারতচন্দ্র পাঁচালী পাঠ করিবার জন্য আদিষ্ট হন। কিন্তু তিনি অন্যের রচিত পাঁচালী পাঠ না করিয়া, স্বয়ং ত্রিপদী ছন্দে এক নূতন পাঁচালী রচনা করিয়া সভা মধ্যে পাঠ করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম কাব্য রচনা; এই পাঁচালী শুনিয়া সভাস্থ নর-নারী ভারতচন্দ্রের অলৌকিক কবিত্বশক্তি দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই পাঁচালীর শেষভাগে দেবানন্দপুর গ্রামকে তিনি দেবের আনন্দধাম বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ১২৬১ সালের সংবাদ প্রভাকরে লিখিয়াছেন—"আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম, যৎকালে ঐ পুস্তক প্রচারিত হয়, তৎকালে পুস্তককারকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই।" নিম্নে উক্ত পাঁচালী হইতে কয়েক লাইন উধৃত হইল:

দেবানন্দপুর গ্রাম,
দেবের আনন্দ ধাম,
হীরারাম রায়ের বাসনা॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়,
দয়া কর মহাশয়,
নায়েকেরে গোষ্ঠীর সহিত।
ব্রতকথা সাঙ্গ হল,
সবে হরি হরি বল,
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত॥

ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির বিষয় রামরাম দত্ত মুন্সীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি বিশেষ প্রীত হন এবং ইহার কিছুদিন পরে পুনরায় সত্যনারায়ণ দেবের সিন্নি দিবার ব্যাপার উপস্থিত হইলে, রামরাম দত্ত তাঁহাকে পাঁচালী পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার পূর্বরচিত পাঁচালী পাঠ না করিয়া চৌপদী-ছন্দে হিন্দী মিশ্রিত আর একটি কবিতা রচনা করিয়া সভাস্থলে পাঠ করেন। ইহার শেষভাগে দেবানন্দপুরের মুন্সীবাবুদের কথা এবং তাঁহার নিজ পরিচয় লিখিত আছে। নিম্নে উহার কিয়দংশ উধৃত হইল:

"ভরদ্বাজ অবতংশ, ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হত কংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্ররায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত
ফুলের মুখটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম-রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্ররায়, দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হোন বরদায়
ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা॥

অতঃপর ভারতচন্দ্র তাঁহার জমিদারী পুনরুদ্ধারকল্পে ভুরিশ্রেষ্ঠ পরগনায় যাইয়া, তথায় বর্ধমান রাজ কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া তিনি কটকে মহারাষ্ট্র সুবাদার শিব ভট্টের আশ্রয় লন, পরে বিভিন্ন স্থান গৈরিক বস্ত্রে অজ্ঞাত ও অখ্যাত অবস্থায় পরিভ্রমণ করিয়া গোন্দলপাড়ায় ফরাসী গভর্নমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর * আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই স্থানের দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গৃহে বাস করিতেন, পরে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বাল্য জীবনের কিছু অংশ উক্ত ভবনে অতিবাহিত করেন। তিনি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব দর্শনে প্রীত হইয়া ফরাসীদের গৃহে কাজকর্ম করিলে, তাঁহার প্রকৃত গুণের প্রকাশ পাইবে না বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের গুণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে ৪০, টাকা বেতনে নিজ সভাষদরূপে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে "গুণাকর" উপাধিতে ভূষিত করেন। এই স্থানে তিনি রাজার অনুমত্যানুসারে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডী' কাব্যের ন্যায় 'অন্নদামঙ্গল'

---

* 'ভুরিশ্রেষ্ঠ' নামক প্রবন্ধে উক্ত স্থানের প্রাচীন বিবরণ বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে—প্রবর্তক, শ্রাবণ, ১৩৫৩, পৃঃ ১৯৯-২০১।

*হাণ্টার সাহেব তাহার Statistical Account of Bengal নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিতভাবে লিখিয়াছেন:
"Kirtti Chandra Rai inherited the ancestral Zamindari and added to it the Parganas of Shetwa, Bhursut, Barda and Monohar Sahi. He was bold and adventurous and fought with the Rajas and dispossesed them of their kingdoms."

* "ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; প্রবর্তক, ফাল্গুন ১৩২৮ সাল।

রচনা করিয়া তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহের উপাখ্যান কৌশলে সংযোজিত করিয়া দেন। ইহার পর তিনি 'রসমঞ্জরী' নামক আর একখানি কাব্য রচনা করিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে, তিনি যে স্থানে বাস করিতেন, তথায় শ্রীযুত শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত একখানি প্রস্তর ফলকে তাঁহার সহিত দেবানন্দপুর মুন্সীবাবুদের সম্বন্ধের বিষয় লিপিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

পুণ্যশ্লোক রামরাম দত্ত মুন্সীর অন্যতম অধস্তন বংশধর রায় শ্যামচন্দ্র দত্ত মুন্সী একজন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি "সদর আলা" অর্থাৎ Principal Sudder Amin বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং মধ্য ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধি (Political Agent) পদে উন্নীত হন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন এবং দেবানন্দপুর গ্রামে দুইটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি উক্ত মন্দিরগুলি তাঁহার পুণ্যকীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শ্যামচন্দ্রের পৌত্র মোহিনীমোহন দত্ত মুঙ্গেরের সাবজজ ছিলেন; তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ ও সুবিচারক বলিয়া তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং অবসর গ্রহণ করিয়া বহু বৎসর যাবৎ তিনি কলিকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কার্য করেন। এতদ্ভিন্ন বিহারের গঠনকর্তা গুরুপ্রসাদ সেনের অনুরোধে তিনি "বিহার হেরাল্ড" নামক ইংরাজী পত্র সম্পাদনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার বহু রচনা তৎকালীন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি সমস্তিপুর হইতে বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত তালপাতার পুঁথি আবিষ্কার করেন; পরবর্তীকালে উক্ত পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রামের ঈশানচন্দ্র দাস একজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন; সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে তিনি এলাহাবাদে যান এবং তথায় ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হিসাব-রক্ষকের কার্য করিতেন। প্রবাসে তাঁহার ন্যায় সুনাম অর্জন খুব অল্প ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। তাঁহার এরূপ বাঙালী প্রীতি ছিল, যে তিনি এলাহাবাদ স্টেশনে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন কোন নবাগত বাঙালী আসিলে তাঁহার বাড়িতে প্রথমে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বাঙালীদের জন্য তাঁহার বাড়ি সর্বসময় উন্মুক্ত থাকিত। অদ্যাপি তাঁহার নামে এই প্রবাদ এলাহাবাদে প্রচলিত আছে—"বাবু তো ঈশান বাবু থে, এ্যায়সা বাবু ঔর নেহি হোগা।"

দেবানন্দপুর গ্রাম বর্তমানে ম্যালেরিয়ায় অধ্যুষিত বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বসবাস করিলেও, বঙ্গের অপরাজেয় কথা-শিল্পী, বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মে এই স্থান পবিত্র হইয়াছে এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের লীলাভূমি হিসাবে এই স্থান বঙ্গবাসীর নিকট পূর্ব হইতে পরিচিত থাকিলেও, বাঙলার জনপ্রিয় সাহিত্যিকের জন্মস্থান বলিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রাম আজ সর্বজনপরিচিত। এই স্থানের চট্টোপাধ্যায় বংশে ১২৮৯ সালের ৩১শে ভাদ্র তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্র নিজের জীবন-কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা ছিলেন খুব জ্ঞানী ও সাহিত্যানুরাগী; ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক কবিতা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য রচনায় তিনি হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটাই তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়াই শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাস রচনায় প্রথম প্রেরণা আসে। তাঁহার পিতা বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না বলিয়া, বাল্যকাল তাঁহার বহু বিপত্তির মধ্যে অতিবাহিত হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি ভাগলপুরে, তাঁহার মাতুলালয়ে চলিয়া যান এবং তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তেজনারায়ণ কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময় হইতেই তিনি সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। এই কলেজে তিনি এফ-এ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরীক্ষার পূর্বে, তাঁহার মাতৃদেবী গতাসু হওয়ায়, এই স্থানেই তাঁহার লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর তিনি ভাগ্যান্বেষণে বহির্গত হইয়া কলিকাতায় আসেন, কিন্তু এই স্থানে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায়, সকলের অগোচরে তিনি একদিন রেঙ্গুনে চলিয়া যান।

রেঙ্গুনে যাইয়া তিনি একটি সওদাগরী অফিসের হিসাব বিভাগে কর্ম করিতে আরম্ভ করেন এবং এই স্থান হইতেই তাঁহার সাহিত্য-সেবা আরম্ভ হয়। যতদূর জানা যায়, 'কাশীনাথ' শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা এবং সেই সময় তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসরের অনধিক ছিল। তাহার পর 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' প্রভৃতি রচনা প্রকাশিত হয়; বড়দিদি বেনামীতে 'ভারতী' মাসিক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইলে, সাহিত্য জগতে বেশ সাড়া পড়িয়া যায় এবং এই শক্তিমান লেখকের খোঁজ পড়িতে থাকে। ইহার পর 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিলেও, তখনও তিনি বঙ্গদেশে আসেন নাই। ১৩২০ সালে তিনি কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করেন। এই সম্বন্ধে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য

বাতে হাত পা ফুলিয়া গিয়াছিল

এই মহিলাটি চলিতে বা ঘুমাইতে পারিতেন না

ক্রুশেন ব্যবহারে এখন বেদনা দূর হইয়াছে

এই মহিলাটি বাতে এত দীর্ঘদিন ধরিয়া ভুগিয়াছিলেন যে, তিনি ভাবিতেন, তিনি আর কখনও আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন না। বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও তিনি কোন ফল পাইলেন না, অবশেষে তাঁহাকে ক্রুশেন ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হইল। ছয় সপ্তাহ ব্যবহারে তিনি আশ্চর্য ফললাভ করিলেন। এখন আর তাঁহার বাত বেদন নাই।

ঐ মহিলাটি লিখিতেছেন, "বাতে আমার হাত পা ফুলিয়া গিয়াছিল; আমি চলিতে বা ঘুমাইতে পারিতাম না। বহু অর্থব্যয় করিলাম, কিন্তু কোনটাতেই স্থায়ী ফল হইল না। প্রথমতঃ আমি ক্রুশেন সল্টস ব্যবহারে অসম্মত হইলাম। আমি আরোগ্য লাভের আশা সম্পূর্ণরূপেই ত্যাগ করিয়াছিলাম। আমি জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িল এবং মৃত্যু কামনা করিলাম। ক্রুশেন ব্যবহারে পনর দিন পরেই আমি ভাল বোধ করিলাম। ৬ সপ্তাহে আমি ভাল হইলাম এবং গৃহস্থালীর কাজকর্ম করিতে লাগিলাম। তিন শিশি ক্রুশেন ব্যবহারে আমি চলাফেরা করিতে সক্ষম হইলাম। এখন আর আমার বেদনা নাই। ফোলা নাই এবং এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।" —(মিসেস) এফ ডবলিউ।

মাংসপেশী ও গাঁটে ইউরিক এ্যাসিড জমা হওয়ার ফলেই সাধারণতঃ বাত বেদনা হইয়া থাকে। ক্রুশেন এই জমাট পদার্থকে গলাইয়া তরল পদার্থে পরিণত করে এবং উহা সত্বর স্বাভাবিক পথ কিডনী দিয়া বাহির হইয়া যায়। ক্রুশেন দেহাভ্যন্তর ভাগ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখে বলিয়া উহা কখনও জমাট বাঁধে না।

সকল সম্ভ্রান্ত কেমিষ্টের নিকট এবং ষ্টোরে ক্রুশেন সল্টস পাওয়া যায়। R 1

বিনা অস্ত্রে চক্ষুছানি

ভিজল্স "আই-কিওর" (রেজিঃ) চক্ষুছানি এবং সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়। নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩ টাকা, মাশুল ৷৹ আনা।

কমলা ওয়ার্কস (দ) পাঁচপোতা, বেঙ্গল।

সম্মেলনে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি কল্পনাও করিনি যে সাহিত্য সেবাই একদিন আমার পেশা হয়ে দাঁড়াবে। প্রায় বছর দশেক পূর্বে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের আগ্রহ ও একান্ত চেষ্টার ফলেই আমি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ি।"

তাহার পর বাঙালী চরিত্রের আলোক-চিত্র স্বরূপ তাঁহার 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী', 'চরিত্রহীন', 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি কিভাবে পাঠকসমাজকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল, সে ইতিকথা আজ কাহারও অবিদিত নাই। সাধারণ বাঙালী চরিত্রের আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম যেভাবে তাঁহার রচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনন্যসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহাকে তিনি আপনার মনের বেদনা ও মাধুরী দিয়া এরূপভাবে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, যে সেইরূপ সৃজনীশক্তি অন্য কোন লেখকের রচনায় সাধারণত দেখা যায় না। সেই জন্য তাঁহার লেখা পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। মনে হয় যেন আমাদের একান্ত পরিচিত কোন নরনারীর সহিত আমাদের পুনঃ পরিচয় ঘটিয়াছে।

তাঁহার সর্বজন সমাদৃত উপন্যাসগুলি নাটক ও বাণীচিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন; পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের জন্য "ডি-লিট" উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। দেবানন্দপুরে তাঁহার বাস্তু ভিটার প্রতি বিশেষ দরদ ছিল এবং প্রায়ই তিনি জন্মভূমি দর্শন করিতে যাইতেন। ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ তিনি পরলোকগমন করেন।

দেবানন্দপুরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে একটি স্মৃতি-মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ১৩৫২ সালের ১৩ই মাঘ উক্ত মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে একটি সভাগৃহ, একটি পাঠাগার এবং একটি মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তিনি যে গৃহে জন্মগ্রহণ করেন সেই গৃহের বাহিরের দেওয়ালে, হুগলী জেলা বোর্ড "এই গৃহে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন" এই কথাগুলি একটি মর্মর প্রস্তরে লিখিয়া গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন এবং রাস্তার উপর বাটির সম্মুখস্থ ময়দানেও একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন :

বঙ্গের অপরাজেয় কথা-শিল্পী
প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক
ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এই ভবনে জন্মগ্রহণ করেন।
জন্ম—৩১ ভাদ্র ১২৮৯
মৃত্যু—২ মাঘ ১৩৪৪।

কবি নজরুল ইসলাম তাঁহার সম্বন্ধে যে সংগীত রচনা করেন, তাহার কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি:—

সেদিনও দেখেছি আকাশের শোভা শরৎচন্দ্র তিলকে।
শূন্য গগন বিষাদ মগন সে তিলক মুছি দিল কে॥
পৃথিবীর চাঁদ অস্ত গিয়াছে,
আলো তা'র প্রতি ভবনে।
তেজ-প্রদীপ্ত তেমনি জ্বলিছে,
নিভিবে না তাহা পবনে॥

ইন্দোনেশিয়া

শ্রীকরুণাময় বসু

শ্যামল বনশ্রী দ্বীপ
যেন কাঁচপোকা টিপ
সমুদ্র মেখলা রূপসীর;—
যৌবন হেথায় নতশির
শস্যে ফলে প্রাচুর্য সম্ভারে,
বসন্তের পুষ্প উপহারে।

প্রশান্তির ধ্রুব বাণী
উৎকীর্ণ রয়েছে জানি
পাষাণ ফলকে,
সেই লিপি পাঠ করি সায়াহ্নের প্রদীপ আলোকে।

বহুদিন
এই দ্বীপ রয়েছে নবীন
গভীর প্রাণের রসে,
ললিত শ্যামল রঙে, প্রেমের পরশে।

অকস্মাৎ উঠিয়াছে ঝড়,
সেই কল্লোলিত স্বর,—
তীর হ'তে তীরে
ধ্বনিত করিয়া ফিরে
জীবনের মুক্তির বারতা;
বিদ্রোহের সেই কথা
অকস্মাৎ
করেছে আঘাত
ভারতের মর্ম-উপকূলে;
আত্মীয়তা লভিলাম আঙুলে আঙুলে।
প্রাণ যারা দিতে জানে,
প্রাণের নিবিড় যোগ তাহাদের টানে,—
এই সত্য করিনু স্বীকার।
আজ তাই করি অঙ্গীকার,
তোমাদের কাছাকাছি
আমরাও আছি,
জয় হোক ইন্দোনেশিয়ার।

পাঞ্জাবে লীগপন্থীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কায়েদে আজম কোন বিবৃতি দান না করায় আমরা একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম, পরে



বুঝিলাম—(অবশ্য বিশু খুড়োর কল্যাণে)—তাঁহারা কংগ্রেসের আদর্শে সত্যাগ্রহ করিতেছে দেখিয়া জিন্নাজী হতবাক্ হইয়া গিয়াছেন।

* * *

প্রার্থনা সভায় মহাত্মা বলিয়াছেন—"প্রেমপূর্ণ কুটীর প্রেমহীন প্রাসাদ অপেক্ষা শ্রেয়।"—জানি অনেকেই মহাত্মার সঙ্গে একমত হইবেন না। তাঁহারা বলেন—প্রাসাদটি যদি কোনরকমে দখল করা যায়, তবে প্রেম ?—ফুঃ!

* * *

ফিরোজ খাঁ নুনের ইংরেজ পত্নীকে পাঞ্জাবে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সংবাদদাতা বলিতেছেন—তিনি ঘোমটাপরা মেয়েদের মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। খুড়ো ভাষ্য করিয়া বলিলেন—"মিছিল আর ঘোমটা কখনই একসঙ্গে চলে না!"

* * *

POLICE asked to keep off University precincts—
একটি সংবাদের শিরোনামা। খুড়ো বলিলেন—'ইহাতে পুলিস অণুমাত্রও দুঃখিত হইবেন না। হাতে লাঠির অধিকার থাকিলে তাঁরা নিশ্চয়ই হাতে-খড়ির অনধিকার গ্রাহ্য করিবেন না।"

* * *

বিলাতে লরী-চালকদের ধর্মঘটের একটা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সংবাদে বলা হইতেছে—Lorry-drivers got almost—all they wanted. আমাদের দেশের ট্রাম



এবং অন্যান্য ধর্মঘটীদের অবস্থা দেখিয়া ডি এল রায়ের গানটার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা হয়—অর্থাৎ বিলাত দেশটা সোণা-রূপার না হইতে পারে, তবে সেটা যে শুধু মাটির নয়, একথা অবধারিত সত্য।

* * *

'সংবাদপত্র আজ গীতা, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের স্থান অধিকার করিয়া আছে"—কথাটা বলেন মহাত্মা। "কিন্তু এই আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থের উপর পূর্ণ অধিকার বা দখল একমাত্র সরকারের; সুতরাং ধার্মিক একমাত্র সরকারী কর্মচারী"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

দিল্লীতে কসাইরা ধর্মঘট করিয়াছে। সাধারণ মানুষ আজ কসাইদের



অধিকার কাড়িয়া নিতেছে বলিয়াই কি তাদের এই অভিযান?

* * *

নিখিল বঙ্গ মিউনিসিপ্যাল সম্মেলনে মিঃ মহম্মদ আলী বলিয়াছেন——"Other amendments of the existing law are designed to give you wide powers to compel uncivic citizens to behave in a more orderly manner"—কিন্তু মিউনিসিপ্যাল কর্তাদের orderly mannerএ কাজ করিতে বাধ্য করার অধিকার নাগরিকদের হাতে না আসা পর্যন্ত অবস্থার কোন উন্নতি হইবে কি ?

* * *

CONTROL of pul[illegible] to continue—একটি সংবাদের শিরোনামা; খুড়ো বলিলেন—এবারে ঠেলা সামলাও; 'নাড়ী' চলাচলটিও এখন হইতে সরকারী মর্জিতে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

* * *

MADRAS lifts all bans on Independence Day—
অন্য একটি সংবাদ। আমরা জানি, জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান এবং অভিবাদন জ্ঞাপনের জন্যই এই ঘোষণা; যাঁরা অন্যরকম ভাষ্য করিয়া "স্বাধীন" হইতে গিয়াছেন, শ্রীযুক্ত প্রকাশম্ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে লোকচক্ষে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

* * *

কর্ণেল হাসান মেয়েদিগকে Male tyranny'র বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বলিয়াছেন—"অর্থাৎ অতঃপর Female tyranny অবাধে চলিতে থাকিবে"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

বিশুখুড়ো এই প্রসঙ্গেরই জের টানিয়া বলেন—"অফিসের বেলায় ভাতে-ভাত যা হোক কিছু চারটা মুখে গুঁজিয়া আসার সুবিধা যা ছিল, তা-ও বুঝি গেল; কেননা কর্ণেল বলিয়াছেন—"The place of women is not by the hearth."

* * *

কর্ণেল আরও বলিয়াছেন—The women have to guard against emotional appeal"—
খুড়ো এই কথাটারও টীকা করিয়া বলিলেন—



"যাঁরা প্রথমে প্রেমের কবিতা, লিখিয়া হতাশ হইয়া পরে লেকের জলে ডুবিয়া মরিতে চান-তাঁহারা অতঃপর সতর্ক হইয়া অন্যরূপ tactics অবলম্বন করুন।"

গান্ধী টুপি

সেদিন আমাদের বৈঠকে বিদ্যাসাগর মশায়ের কথা আর শেষ হ'তে চায় না। একেক জন এক একটা [illegible] কাহিনী বলছেন, কথা আর ফুরোয় না। আমরা আড্ডাচারী মানুষ, পরনিন্দা পরচর্চা ঢের করে থাকি। মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের গুণকীর্তন করে সে পাপক্ষয় করতে হয়। বহুদিন পরে সমবেত ভাবে কিছু পুণ্যসঞ্চয় করা গেল, কারণ বিদ্যাসাগরের কথা অমৃত সমান এবং যাঁরা শ্রবণ করলেন তাঁরা সকলেই পুণ্যবান। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন জনসনের মতো বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল ছিল না। বস্‌ওয়েলের অভাবে বিদ্যাসাগর জীবনের কত কত ক্ষুদ্র অথচ অমূল্য কাহিনী চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। সাগরের অতলে কত মণিমুক্তা ছড়িয়ে ছিল, ডুবুরীর অভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালেই তা পড়ে রইল। বাঙলা দেশের পক্ষে সেটা কত বড় ক্ষতি বাঙালী মাত্রেই তা বুঝতে পারবেন। এমন অরিজিনাল বা স্বতন্ত্র চরিত্র ব্যক্তি বাঙলাদেশে বোধ করি আর জন্মগ্রহণ করেন নি। বাঙলা দেশ যা দিয়ে বড় হয়েছে তার বহু জিনিসের উৎস সন্ধান করলে শেষ পর্যন্ত গিয়ে বিদ্যাসাগরে ঠেকে। বহু জিনিস তাঁর কাছ থেকে নেওয়া তিনি কারো কাছ থেকে কিছু নেন নি। তিনি একেবারে অরিজিনাল—হিমালয় কিম্বা গঙ্গা নদী যেমন অরিজিনাল। এই দুই এর সঙ্গে তাঁর চরিত্রের আশ্চর্য রকম মিল রয়েছে।

বন্ধুরা বলছিলেন, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আরো কিছু লিখতে। আমি বললুম, সাগরকে কি ঝিনুক দিয়ে সেঁচা যায়? ইন্দ্রজিতের খাতার গোটা খাতাটাই যদি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লিখে যাই তাহলেও আমার সব কথা ফুরোবে না। সেজন্য সব কিছু বাদ দিয়ে আমি শুধু বিদ্যাসাগরের চটির কথাই বলেছি। শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকার মতো বিদ্যাসাগরের পাদুকাই ইন্দ্রজিতের খাতার পাতা অলঙ্কৃত করুক।

গত প্রবন্ধে বলেছিলাম বিদ্যাসাগরী চটি বাঙলা দেশের এক যুগের প্রতীক। সারা ভারতবর্ষের এই যুগের প্রতীক যদি সন্ধান করি তবে পাই গান্ধী-টুপি। বিদ্যাসাগরের যুগে ভারতবর্ষে জাতীয় একতার বন্ধন ততটা দৃঢ় হয় নি। এইজন্য তাঁর চটি বাঙলা দেশেরই ঐতিহাসিক সামগ্রী। গান্ধীজীই বলতে গেলে সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতকে একতার বন্ধনে বেঁধেছেন। ভারতবর্ষ এক বিষম বৈষম্যের দেশ—জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত, ভাষাগত তদুপরি পোষাকগত বৈষম্যের ফলে অবস্থা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। ইয়ুরোপীয়দের মধ্যে জাতিগত এবং ভাষাগত বৈষম্য আছে, কিন্তু ধর্ম এবং পোষাকের বৈষম্য নেই। আমরা কথায় বলে থাকি ভারতবর্ষে



তেত্রিশ কোটি দেবতা অর্থাৎ যত মানুষ তত দেবতা। সেই সূত্র ধরে যদি বলি ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি রকমের পোষাক তাহলে বোধ করি কিছু অন্যায় বলা হয় না। এই যে আমাদের এই ঘরে আমরা 'জন দশেকে জটলা করছি তক্তপোষে বসে'—তার মধ্যেও কারো পোষাকের সঙ্গে কারো পোষাকের মিল নেই। ভারতবাসী হিসাবে আমাদের সাজে সজ্জায়ও কোথাও একটা মিল থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ সজ্জাগত বৈষম্য ক্রমে মজ্জাগত হয়ে যায়। গান্ধী টুপি সেই মিলের একটা চেষ্টা এবং আমি মনে করি কাছা কোচায় মিল হওয়ার চাইতে মাথায় মিল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইজনাই বলছিলাম যে গান্ধী টুপি সেই সর্বভারতীয় মিলনের প্রতীক। অবশ্য ইদানীং ভারতীয় জাতিটিকে দ্বিধাবিভক্ত করবার চেষ্টা চলেছে অর্থাৎ মাথাটিকে দ্বিখণ্ডিত করে তার এক অংশে পরানো হবে গান্ধী টুপি অপর অংশে জিন্না-টুপি। অর্থাৎ দুটোর একটাও থাকবে না কারণ মাথা ফাটাফাটি যখন হবে তখন মাথায় ফেটি বাঁধা ছাড়া অন্য কিছু পরা সম্ভব হবে না।

বিদ্যাসাগরী চটি বিদ্যাসাগর মশায় নিজে ব্যবহার করতেন। গান্ধী-টুপি আর সবাই ব্যবহার করে কেবল গান্ধীজী করেন না। এ যুগে যে সব শক্তিমান ব্যক্তি দেশে দেশে ইতিহাস রচনা করেছেন তাঁদের নামের সঙ্গে এক একটা জিনিস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। চার্চিলের চুরুট, চ্যাম্বারলেনের ছাতা, হিটলারের কপাল-ঢাকা চুল, স্ট্যালিনের গোঁফ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে থাকবে। এ্যাটম বম্ব আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত চার্চিলের চুরুটটাই ছিল মিত্রপক্ষের সব চেয়ে বড় আগ্নেয়াস্ত্র। চ্যাম্বারলেনের ছাতা ইংলণ্ডের লজ্জাকর appeasement policy-র প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, আমার কলমটা চ্যাম্বারলেনের ছাতার বাঁট দিয়ে তৈরি নয়। সে কথা তিনি যে অর্থেই বলে থাকুন আমার মতে একথার মানে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের লেখনী নির্ভীক এবং অপরাজেয়। হিটলার চুল দিয়ে কপাল ঢেকেছিলেন, কিন্তু কপালের লিখন খণ্ডাতে পারেন নি। স্ট্যালিনের গোঁফের মধ্যে এমন একটা অনমনীয় দৃঢ়তা আছে যা রাশিয়ার যুদ্ধ জয়ে রীতিমতো সহায়তা করেছে। স্ট্যালিন কথাটার মানে—man of steel. আমার বোধ হয় স্ট্যালিনের গোঁফ made of steel.

যে সব জিনিসের কথা এখানে উল্লেখ করলুম সেগুলো উক্ত ক্ষণজন্মা পুরুষদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু গান্ধী-টুপির সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্ক ঠিক সে ভাবের নয়। ঐখানেই গান্ধী অরিজিনাল। কংগ্রেসের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তিনি যেমন বলেন—I am not even a four-anna member of the congress—এও তেমনি। যে গান্ধী টুপি গত পঁচিশ বৎসর ধরে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক সেই গান্ধী টুপি তিনি আপন মস্তকে ধারণ করেন নি। পাঁকাল মাছের মতো পাঁকে ডুবে থাকেন কিন্তু পাঁক গায়ে লাগে না। অবশ্যি আমি গান্ধী টুপিকে পঙ্কিল পদার্থের সঙ্গে তুলনা করছিনে। আমার বক্তব্য হচ্ছে তিনি রাজনীতির চর্চা করেন কিন্তু রাজনৈতিক পোষাক পরিধান করেন না। অপর দিকে তিনি সংসার বিরাগী পথের ভিক্ষুক কিন্তু সন্ন্যাসীর গেরুয়া তিনি ধারণ করেন না। তিনি যে কটিবাস ধারণ করেছেন সেটা দরিদ্র ভারত সন্তানের প্রতীক। কিন্তু তাই নিয়ে তিনি জাঁক করেন না। রাউন্ড টেবল বৈঠক উপলক্ষে যখন বিলেতে গিয়েছিলেন তখন কৌতূহলী ইংরেজ সন্তানেরা তাঁর কটিবাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি হলে তক্ষুণী ভারতের দুর্নিবার দারিদ্র্য সম্বন্ধে অন্তত ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা করে ফেলতুম, কিন্তু গান্ধীজী শুধু মৃদু হেসে বলেছিলেন, you people in your country use plus fours, we in our country use minus fours. এই সংক্ষিপ্ত জবাব যেমন কৌতুকোজ্জ্বল তেমনি অরিজিনাল। গান্ধী ছাড়া আর কারো মুখ থেকে এমন জবাব বেরোত না।

গান্ধী এ যুগের সব চেয়ে অরিজিনাল ব্যক্তি। শুধু আমাদের দেশের কথা বলছিনে, সমগ্র পৃথিবীর কথাই বলছি। গত কয়েক বৎসরে আমরা পৃথিবীর নানা দেশে বহু একচ্ছত্র নেতা দেখেছি। এঁদের নেতৃত্বের পশ্চাতে অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যসামন্ত, আইনকানুন, বিধিনিষেধ, কনস্ক্রিপসন, কনসেনট্রেশন ইত্যাদি কত কি যে ছিল। ওদিকে গান্ধীজী কেবলমাত্র আপন ব্যক্তিত্বের মহিমায় কোটি কোটি লোকের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছেন। বাধ্যবাধকতার দ্বারা কিম্বা কোন প্রকার লাভের লোভ দেখিয়ে তিনি মানুষের আনুগত্য লাভ করেন নি। তিনি যে পথে তাঁর দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন সেটা দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ এবং লাঞ্ছনার পথ। সেই দুর্গম পথে ভারতবাসী যেভাবে তার নেতার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। গান্ধী টুপি সেই দুঃখ, ত্যাগ এবং লাঞ্ছনার প্রতীক। এর মধ্যে এমন একটি নির্মল আভিজাত্য আছে, যে আভিজাত্য ধনে নয়, মানে নয়, প্রাণের সমৃদ্ধিতে।

শক্তির

সারিবাদ্যারিষ্ট

শ্রেষ্ঠ রক্ত-পরিশোধক ও টনিক

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

শক্তি ঔষধালয় · ঢাকা

ভারতের শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান · স্থাপিত ১৯০১

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটি নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক ঃ	ম্যাঃ ডিরেক্টর ঃ
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, জি. বি. ই. কে. সি. এস. আই।	মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ
চীফ অফিস—আগরতলা ত্রিপুরা ষ্টেট।	রেজিষ্টার্ড অফিস গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।

টেলিফোন ঃ ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম ঃ "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ ঃ

শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর চানগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মানু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত.

সিরোলিন 'রচি'

ফুসফুসের যাবতীয় রোগে অব্যর্থ



চা

না হলেই চলে না

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষাগুরু শাস্ত্রী শিবনাথ

শ্রীযতীন্দ্র সেন

বর্তমান ১৯৪৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী,—ইহার ঠিক একশত বৎসর পূর্বে, ১৮৪৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী কলিকাতা হইতে দশ মাইল দূরবর্তী, ২৪ পরগণা জেলার চাংড়ি পোতা গ্রামে যে মানবকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি অন্য দশজনের মত জনতার মধ্যে হারাইয়া না গিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রূপে, চরিত্রের দৃঢ়তায়, মনুষ্যত্বের মহিমায়, ধর্মপ্রাণতার গৌরবে দেশ ও সমাজ-সেবার দৃক্‌পাতহীন নির্ভীকতায় ও অকুণ্ঠ আত্মোৎসর্গে যে সকলের উপরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেন, প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবেন, তাহা বোধ হয় বিধি-নির্দিষ্ট ছিল।

বাল্যকালেই যে তাঁহার চরিত্রে বিদ্রোহের বীজ নিহিত ছিল তাহা তাঁহার সেই সময়ের আচরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য দৃঢ়চরিত্র, নিষ্ঠাবান্, ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। বহু গৃহ-দেবতা প্রত্যহ তাঁহার গৃহে পূজিত হইতেন। গৃহ-দেবতাগণকে নিবেদিত অন্ন তাঁহার পরিবারের সকলে প্রসাদরূপে আহার করিতেন। যে অন্ন নিবেদিত নয়, তাহা কেহই আহার করিতেন না। কিন্তু বালক শিবনাথ এই নিবেদিত অন্ন কিছুতেই আহার করিতে চাহিতেন না। এই প্রসাদ-গ্রহণের ব্যাপার এড়াইবার জন্যই অন্ন নিবেদন করিবার পূর্বেই তিনি আহারে বসিয়া যাইতেন। কোন দিন অন্ন নিবেদন করিয়া যাইবার সময় তাঁহার পিতা কৌতুক করিয়া তাঁহার অন্নের উপর কুশীর জল ছিটাইয়া দিলে তিনি 'খাইব না' বলিয়া উঠিয়া পড়িতেন। এই ব্যাপারে প্রতিবেশিনী-গণ কোনরূপ মন্তব্য করিলে এবং যৌবনে পৈতা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহার মাতা গোলোকমণি দেবী বলিতেন যে, তাঁহার পুত্রকে 'জাতহরণী' হরণ করিয়াছে। বাল্যকালে গৃহদেবতাগণের প্রসাদ প্রত্যাখ্যানে তাঁহার বিদ্রোহী মনের যে অভিব্যক্তি লক্ষিত হইত, যৌবনে উপবীত পরিত্যাগপূর্বক ব্রাহ্ম ধর্ম-গ্রহণে, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠায়, সরকারী চাকুরি-পরিত্যাগে জাতীয়তার বাণী প্রচারেও সেই বিদ্রোহী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

পিতা হরানন্দ ধর্মপরায়ণ, সদাশয়, পরদুঃখ-কাতর অথচ দৃঢ়চেতা পুরুষ ছিলেন। চরিত্রের সে দৃঢ়তা কিছুতেই টলিত না। একমাত্র পুত্র শিবনাথ উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহাকে 'ত্যাজ্যপুত্র' করিলেন। বাহ্যত ইহা তাঁহার নিষ্ঠুরতা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আদর্শের জন্য পিতৃসুলভ স্নেহের দুর্বলতা দমন করিয়া সংকল্পে এক-নিষ্ঠ ও অবিচল থাকা চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পিতার চরিত্রের এই বজ্র-কঠোর দৃঢ়তা পুত্র শিবনাথ উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়া-ছিলেন। পিতার মর্মবেদনা, সতর্ক প্রহরা ও বিরূপতা, মাতার উদ্গত অশ্রু ও কাতর অনুনয়, মাতুলের নির্নিবন্ধ মিনতি—কিছুতেই তাঁহাকে উপবীত ত্যাগে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। নিজের মনের সহিত দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনি আদর্শভ্রষ্ট হন নাই, সকল দুর্ভোগ অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন, অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়ী হইয়াছিলেন।

কেবল উপবীত ত্যাগ ও ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণে নয়, ব্রাহ্ম সমাজে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্তনের চেষ্টায়, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠায়, সমাজ-সংস্কারে, স্বদেশ-সেবায় তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে উচ্চ-পদস্থ সরকারী চাকুরি দুর্লভ ছিল না। কিন্তু শিবনাথ পদ ও প্রতিষ্ঠার সে মোহ ত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত হেয়ার স্কুলে হেড-



পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (বৃদ্ধ বয়সের চিত্র)


শিবনাথের পিতা পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য

পণ্ডিতরূপে যে সরকারী সংস্রবে আসিয়াছিলেন, অগ্নি সাক্ষী করিয়া শপথ-গ্রহণ করার ফলে তাহাও ত্যাগ করিয়াছিলেন। দুর্লভ উদার মনুষ্যত্বের সাধনায় তিনি কোন দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। কর্মত্যাগ করিলে জীবনের চির-সহচর যে দারিদ্র্য, তাহা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দুঃসহ হইবে, পরিবার-পোষ্যের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে—এ চিন্তায়ও তিনি মুহূর্তের জন্য বিচলিত হন নাই।

১৯০৮ সালে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ নয়জন বিশিষ্ট দেশনেতা বাঙলা দেশ হইতে বহিষ্কৃত ও কারারুদ্ধ হইলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াও শিবনাথ এই কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ-সভায় সভাপতিত্ব করিলেন। তখনকার দিনে এইরূপ একটি জনসভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু একষট্টি বৎসর বয়সেও শিবনাথ উদ্যত শাসনদণ্ডকে ও আইনের রক্তচক্ষুকে গ্রাহ্য করেন নাই।

শিবনাথ যে কেবল ব্রাহ্ম ধর্মের একজন বিশিষ্ট নেতা, প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভাও ছিল। ব্রাহ্ম ধর্ম ও অন্যান্য সংস্কার-মূলক কাজে অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মনিয়োগ না করিলে তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যিকরূপেও অধিকতর খ্যাতি অর্জন করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ধর্মজীবন', 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' সর্বজন সমাদৃত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁহার রচিত 'হিমাদ্রি কুসুম', 'নির্বাসিতের বিলাপ' 'পুষ্পমালা', 'পুষ্পাঞ্জলি', 'ছায়াময়ীর পরিণয়' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ, 'মেজবৌ', 'যুগান্তর', 'নয়নতারা', 'বিধবার ছেলে'—প্রভৃতি উপন্যাস এবং ব্রাহ্ম ধর্ম ও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় তাঁহার ইংরেজি গ্রন্থগুলি এক সময়ে সমধিক সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং চিন্তার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল

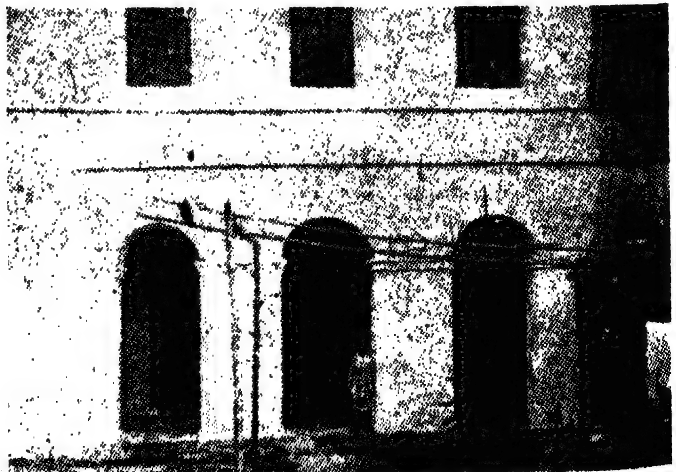
রবীন্দ্রনাথ একবার শিবনাথের সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে এক পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—"বঙ্গ-সাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজকেই আপনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে চলিবে না—কারণ সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে।" বাঙলার তরুণগণ জীবন-গঠনোপযোগী দুর্জয় প্রেরণা ও অনুপ্রাণনাময় আদর্শ শিবনাথের "আত্মচরিত" হইতে লাভ করিতে পারেন। কিন্তু হায়, দুর্লভ মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য সে ঐকান্তিক সাধনা—দুঃসাধ্য তপশ্চরণ, অবিচল আদর্শের জন্য প্রাণপাতী দুঃখব্রত বর্তমানে বুঝি অচল হইয়া পড়িয়াছে!

তৎকালে ব্রাহ্মসমাজে জাতীয়তাবোধ প্রবল থাকিলেও রাজভক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু শিবনাথ ধর্মের ভিত্তির উপর রাজনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মাঘোৎসবে একটি দিন জাতীয় ভাব প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত চৈত্র-


শিবনাথের মাতা গোলোকমণি দেবী

মেলায় যোগদানের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই চৈত্র-মেলা, স্বদেশী মেলা তৎকালে জাতীয় ভাব প্রচারের ক্ষেত্র ছিল।

বর্তমানে আমরা 'অগ্নিযুগ' ও 'অগ্নিমন্ত্র' কথা দুইটি শুনিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে অগ্নি


চাংড়িপোতায় শিবনাথের জন্মগৃহ (মাতুল-ভবন)



উপরের চিত্র : সপরিবারে শিবনাথ। দণ্ডায়মান—শিবনাথ। মধ্যের সারি (বাম হইতে দক্ষিণে)—জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী, কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা সুহাসিনী দেবী। সম্মুখে সারি (বাম হইতে দক্ষিণে)—পালিতা কন্যা শ্রীমতী রমা দেবী, পুত্র শ্রীযুত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য, মধ্যমা কন্যা শ্রীযুক্তা তরঙ্গিনী দেবী



শিবনাথের প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী

মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের প্রবর্তকও স্বয়ং শিবনাথ। শাস্ত্রী শিবনাথের প্রবর্তনায় বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখ তৎকালীন নেতৃগণ অগ্নিসমক্ষে দেশসেবার ও নানা সমাজ-সংস্কার-মূলক কার্যসাধনের শপথ গ্রহণ করেন।

এই দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে শিবনাথ বলিয়াছিলেন, 'স্বাধীনতার অর্থই মুক্তি। সংশয় এবং মোহের বন্ধন ছিন্ন করাই মুক্তি। ......হোমানলে সেই সমস্ত বন্ধনকে বিসর্জন দিয়া দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিতে হইবে।' ১৮৭৭ সালের আশ্বিন মাসে দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব রাত্রে কলেজ স্ট্রীটের একটি মেসে শিবনাথ ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ তাঁহার বন্ধুগণ গোপনে মিলিত হইয়া এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন। শক্তিলাভের জন্য তাঁহারা নীরবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডলে দৃঢ় সঙ্কল্প রেখায়িত হইয়া উঠিল। পর দিবস শেষ রাত্রি প্রায় তিনটার সময় হেয়ার স্কুলের এক গোপন কক্ষে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শাস্ত্রী শিবনাথ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া আছেন। শাস্ত্রী মহাশয় স্বরচিত একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিলেন। তৎপর তাঁহারা অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে যে বটপত্রগুলি আহুতি দিলেন, তাহাতে লিখিত শপথগুলি মোটামুটি এইরূপ ছিলঃ—

স্বায়ত্ত-শাসনই (তখন স্বরাজ শব্দের প্রচার হয় নাই) আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি। তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আমরা বর্তমান গবর্ণমেণ্টের আইনকানুন মানিয়া চলিব কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গবর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।

আমরা জাতিভেদ মানিব না; পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসরের পূর্বে এবং রমণীর পক্ষে ষোলো বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব না এবং বিবাহে সাহায্য করিব না।

আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব না; যে যাহা অর্জন করিব, তাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে এবং সেই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্মে জীবন উৎসর্গ করিব।

আমরা নারীর উন্নতি, স্ত্রী-শিক্ষা, জন-শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ হিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিব।

এইরূপ কার্যে সক্ষম হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং আমাদের গৃহ ও পরিবারকে স্বাধীনতার শত্রুদের হস্ত হইতে রক্ষার নিমিত্ত আমরা ব্যায়াম, বন্দুক



শিবনাথের দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনী দেবী

প্রভৃতি অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা, অশ্বারোহণ ইত্যাদি শরীরচর্চায় মনঃসংযোগ করিব।

অগ্নি সাক্ষী করিয়া শপথ গ্রহণের এই যুগ হইতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে ভারত বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক বাঙলা কি সেই সংগে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে? এক সময়ে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মত বাঙলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ়চরিত্র ও মনুষ্যত্বের মহিমায়, আত্মত্যাগে ও স্বদেশ-সেবার সাধনায় বাঙলা দেশ যে গৌরবোজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই বাঙলা আজ সকলের করুণার পাত্রী। বাঙলার এই হৃতশ্রী, লাঞ্ছিতা, দীনা মূর্তি কেন হইল! ভগবানের আশীর্বাদ-পূত অজস্র দানের মত যে মহাপুরুষগণ ঊনবিংশ শতকে বাঙলার বুকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বাঙলা দেশের প্রতি ভগবানের সেই করুণা-নিঃসৃত অকৃপণ দান কি নিঃশেষিত হইয়া গেল! বাঙলার চরম সৌভাগ্যের পর এই চ দুর্ভাগ্যই কি বিধিলিপি?

আসল কথা, আমরা মনুষ্যত্বের সাধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি; চরিত্রের হিমাদ্রি সদ অটল দৃঢ়তা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, আ আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছি। শিবনাথের মত সিংহপ্র পুরুষশ্রেষ্ঠের তেজোদৃপ্ত জীবনকাহি অনুধ্যান করিয়া অকুতোভয় মনুষ্যত্ব ও আদ নিষ্ঠার সাধনায় আমরা যদি আত্মনিয়োগ ক তবেই বাঙলা হৃত গৌরবের আসনে প প্রতিষ্ঠিত হইবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়ন

গান

শ্রীবিশ্বনাথ দাস

যৌবনেরই শুভক্ষণে প্রথম পরিচয়
মনের বনে রঙ লাগালে
বসন্তেরই জয়
ফাগুন দিনে শুকনো পথে
অরুণ আলোর বিজয় রথে
একি দোলা লাগলো প্রাণে
স্নিগ্ধ মধুময়।

নূতন দিনের নূতন আলো
পথ দেখালো মোরে
তোমার স্মৃতির পরশনে
বাঁধলো প্রেমের ডোরে
সেদিন হতে মনের কবি
সুরে সুরে আঁকলো ছবি
আনলো তোমার আমার মাঝে
মধুর সমন্বয়।

সব পেয়েছির দেশে

শ্রীসুধা চক্রবর্তী

এখানে এখন তুষার পড়িছে শীতে
হিমেল বাতাস ঝির ঝির করে বয়।
রাতজাগা পাখী মুখর করিছে গীতে
বনমৃগী হেথা আপন ছন্দে রয়।

পাহাড়ী নদীর উর্মিমুখর স্রোতে
কল্পলোকের মধু সংগীত শুনি,
আবেশে বিভোর প্রাণ ওঠে মোর মেতে
মনে মনে ভাবি ফেলে আসা দিনগুলি।

এখানে নেমেছে বনজোছনার ঢেউ,
আকাশে এখানে তারাফুলগুলি শোভে,
বিরহী হেথায় কাঁদিয়া ফিরিছে কেউ
মৌমাছি ছোটে কমলা-মধুর লোভে।

এখানের রোদে তুষার গলিয়া পড়ে,
এখানে ধূসর সন্ধ্যা ঘনায় নড়ে,
ঝরণা এখানে অঝোর ধারায় ঝরে
কবি-মন হেথা মনের মুক্তি লভে॥



কাহিনী নয় খবর

ভবঘুরে

গাছ-হাতী

কয়েক সপ্তাহ আগে—'আজব বাগান আজব মালি'—এই শিরোনামা দেওয়া খবরে—বিদেশের এক বাগানের খবর দিয়েছিলাম—যেখানে রকমারী গাছকে ছেঁটে কেটে রকমারী জন্তু-জানোয়ারের আকার দেওয়া হয়েছে। সে বাগানের ছবি দেখেছেন, খবরও পড়েছেন। এ বার জানাচ্ছি, আমাদের দেশেও ঐ রকম গাছপালা ছেঁটে কেটে



গাছকে ছেঁটে কেটে হাতীর রূপ দেওয়া হয়েছে

জন্তু-জানোয়ারের রূপ দেওয়া হয়েছে যে, সে খবরও পেয়েছি। কোথায় আছে এই ধরণের গাছ জানেন কি? আছে ভারতবর্ষের কয়েক যায়গায় কয়েকটি প্রসিদ্ধ বাগানে। এমন একটি বাগান আছে যুক্তপ্রদেশের প্রতাপগড় বলে যায়গাটিতে। শহর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে 'কাটর গুলাব সিং' বলে এই বাগানটি পরিচিত। এখানে গাছপালা ছেঁটে কেটে জন্তু-জানোয়ারের আকার দেওয়া

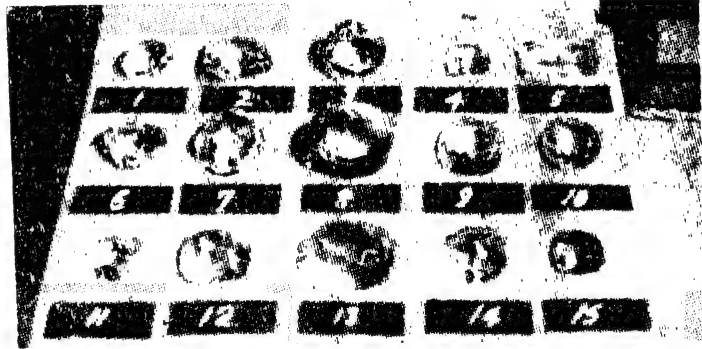


কোন্ জানোয়ারের চেহারা বলতে পারেন কি?

তো হয়েছেই—এছাড়া কয়েকটা অদ্ভুত জিনিসের রূপও দেওয়া হয়েছে। এখানে একটি গাছকে ছেঁটে কেটে একটি সোফা-চেয়ারের আকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই বাগানে গাছ ছেঁটে একটি হাতীর রূপ দেওয়া হয়েছে—সেটি ভারী চমৎকার! এখানে আরও একটা গাছ কেটে একটি জন্তুর আকার দেওয়া হয়েছে—তবে সেটা যে কি তা ঠিক করা বেশ শক্ত। তার ছবিও ছাপলাম, বলুন তো কোন জানোয়ারের চেহারা? এছাড়া এই ধরণের শিল্পের নমুনা দেখা যায় এদেশে বোম্বাই প্রদেশের মালাবার হিল বলে যায়গাটিতে—'ফিরোজ শাহ মেহটা গার্ডেন' নামে খ্যাত বাগানটিতে। যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে 'Topiary' বা গাছ-ছাঁটন-কলায় —ভারতবর্ষ পিছিয়ে নেই।

মণি-মাণিকের মেলা

সম্প্রতি লণ্ডনে গ্রেটবৃটেনের মণি-মাণিক্য সভার (Gemmolosical Association of Great Britain) উদ্যোগে পৃথিবীর কয়েকটি সেরা ও মূল্যবান মণিরত্নের প্রদর্শনী খুলে জনসাধারণকে দেখানো হয়েছে। ভাগ্যবানরা সে প্রদর্শনী দেখেছেন—অভাগা যারা আমরা এদেশে রয়েছি, তাদের ছবি দেখে আর খবরটি জেনেই সান্ত্বনা লাভ করা ছাড়া "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। অতএব ছবিটাই দেখুন—সংখ্যানুসারে রত্নের নাম, ওজন ও দাম লিখে দেওয়া হলো। (১) "দি পোলার স্টার"—৪০ ক্যারেট—দাম ১৫000 পাউণ্ড। (২) "দি পিগট" —ওজন ৪৯ ক্যারাট, দাম ৩0000 পাউণ্ড। (৩) "দি অরলফ্"—১৯৫ ক্যারাট, দাম—৩৬৯000 পাউণ্ড; এই রত্নটি রুশিয়ার রাজদণ্ডে ছিল। (৪) "দি পাশা অফ্ ঈজিপ্ট", দাম—১৩0000 পাউণ্ড। (৫) "দি শাহ অফ্ পারসিয়া"—৮৬ ক্যারাট, দাম—৩0000 পাউণ্ড। (৬) "দি নাম-শোক"—৮৯ ক্যারাট, দাম—৩৫0000 পাউণ্ড। (৭) "দি কোহিনূর"পুরানো কাটা—১৮৬ ক্যারাট দাম—৩৫0000 পাউণ্ড। (৮) "দি গ্রেট মোগল" —২৩৯ ক্যারাট—দাম—৪২0000 পাউণ্ড। (৯) "দি কোহিনূর"—(নূতন কাটা)—১০৬ ক্যারাট—দাম—৪00000 পাউণ্ড। (১০) "দি স্যান্সী"—৫৪ ক্যারাট—৪0000 পাউণ্ড। (১১) "দি ফ্লোরেনটাইন"—১৩৯ ক্যারাট—দাম ১১0000 পাউণ্ড। (১২) "দি রিজেন্ট"—১৩৭ ক্যারাট—দাম—৪৮0000 পাউণ্ড। (১৩) "দি জুবিলী"—২৩৯ ক্যারাট—দাম—৫00000 পাউণ্ড; এই রত্নটিই সবচেয়ে দামী রত্ন। (১৪) "দি সাউথ ষ্টার" —২৫৪ ক্যারাট—সবচেয়ে বড় ব্রেজিল দেশীয় রত্ন; দাম—৩00000 পাউণ্ড। (১৫) "দি হোপব্লু" ৪৪ ক্যারাট—দাম—৩0000 পাউণ্ড। জানেন বোধ হয় যে এর মধ্যে ৭, ৮ ও ৯নংএর তিনটি রত্নই ভারতের রত্ন। এই তিনটি রত্ন ফিরে পাওয়া যাবে তো ইংরাজ ভারত ত্যাগ করে চলে গেলে?



পৃথিবীর কয়েকটি মূল্যবান মণিমাণিক্য

জীবে দয়ার বিপদ

সম্প্রতি বিদেশের এক খবরে জানা গেছে যে, ক্যালিফর্নিয়ার উডল্যান্ড অঞ্চলের এক পক্ষীশিকারী 'জীবে দয়া' দেখাতে গিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েছিলেন। পক্ষী শিকারীটির নাম চার্লস রোলার—তিনি একদিন জলা অঞ্চলে পক্ষী শিকার করতে গিয়ে দেখলেন এক ডানা ভাঙ্গা পেলিক্যান পাখী যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে—উড়তে পারছে না। যদিও পাখী-শিকার করাই তাঁর সখ—তবু পেলিক্যান পাখীটির দুর্দশা দেখে দয়া হোল। তিনি পাখীটির ভাঙা ডানার হাড়টাকে ঠিক করে বসিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। পাখীটির ডানাটাকে নিয়ে চেষ্টা চললো অনেকক্ষণ —পাখী কিছুতেই স্থির হয়না, ডানাও জোড় লাগেনা, কিন্তু রোলার সাহেব ক্ষান্ত হবার লোক নন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এই 'জীবে দয়া'র পরিণতি কি ঘটলো জানেন? হঠাৎ দেখা গেল পেলিক্যান পাখীটি তার পনের ইঞ্চি লম্বা ঠোঁটের মধ্যে পুরে ফেলেছে রোলার সাহেবের মাথাটি শুদ্ধ! আশপাশের লোকরা ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে মাথাটি বাঁচাতে সাহায্য করলেন। নইলে কি অবস্থা হোত ভগবানই জানেন! 'জীবে দয়া' কলিযুগে অচল—নয় কি?

শরৎচন্দ্র ও আমি

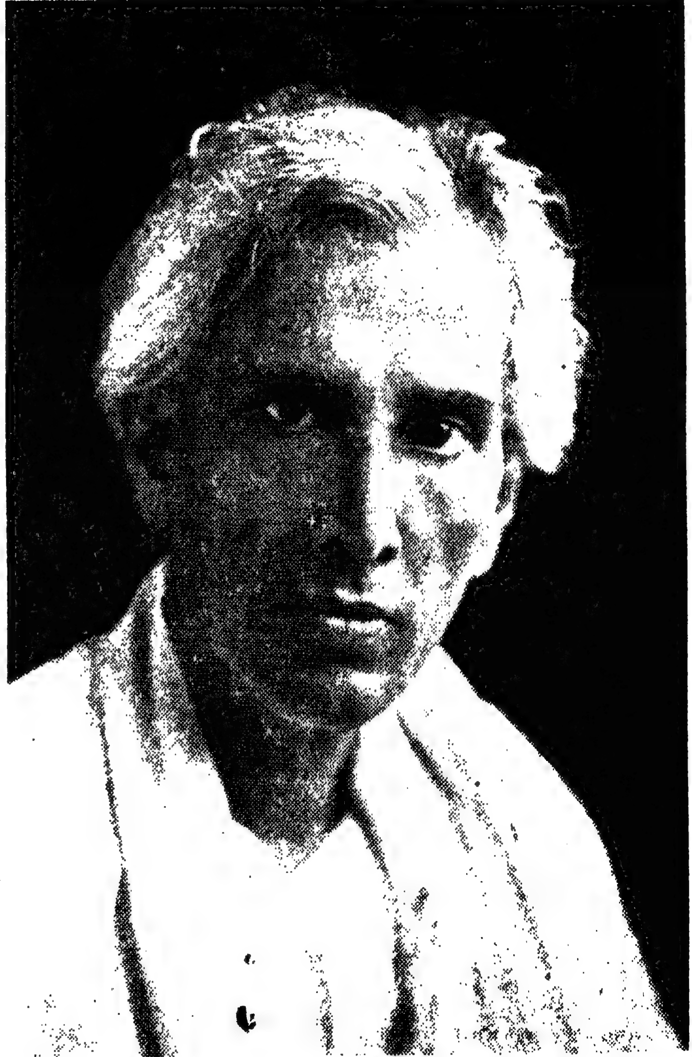
শ্রীবিমল মিত্র

শরৎ সাহিত্য উপভোগ করবার দু'টো উপযুক্ত বয়স আছে। এক প্রথম যৌবনে আর পরিণতবুদ্ধি প্রৌঢ় বয়সে। প্রথম যৌবনের কথাই বলি। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর প্রথম অনুমতি পেলাম উপন্যাস পড়বার। বন্ধু-বান্ধবের কাছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সুখ্যাতি শুনেছিলাম। কিন্তু বাড়িতে পড়বার অনুমতি ছিল না। আলমারীর চাবী হস্তগত হবার পর প্রথমেই ধরলাম শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। কোথা দিয়ে যে দিনরাতগুলো কাটলো মনে নেই। চোখের সামনে এক নতুন জগৎ দেখতে পেলাম। পৃথিবীতে যে এত মানুষ আছে, তাদের যে এত রকমফের তা তার আগে জানতাম না। অভিভূত হলাম, মুগ্ধ হলাম। এবং ক্রমেই শরৎচন্দ্রকে দেখবার ইচ্ছে মনের মধ্যে জাগ্রত হলো।

কিন্তু তখন কা'কেই বা চিনি, আর কে-ই বা চিনিয়ে দেবে। শুনলাম তিনি কলকাতায় থাকেন না। আমার দিনরাত্রের স্বপ্নের মানুষ তখন স্বপ্নেই রয়ে গেলেন।

কী উপলক্ষ্যে কলেজ স্ট্রীটে গিয়েছিলাম জানি না। ফুটপাথের ওপর পুরোণ বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ নজরে পড়লো একখানা 'ভারতী'র ওপর। 'ভারতীর' একটা বোধহয় বিশেষ সংখ্যা সে-খানা। খুলে দেখি প্রথমেই শরৎচন্দ্রের লেখা নাটক "ষোড়শী" রয়েছে। কাছে তখন ছ'আনা পয়সা সম্বল। দু'আনা আমার বাড়ি ফেরবার বাস ভাড়া রাখতেই হবে। কিন্তু 'ভারতী'খানার দাম চাইলে ছ'আনা। ছ'আনা দিলে বাড়িতে হেঁটে আসতে হয়। শেষ পর্যন্ত পাঁচ আনার কমে কিছুতেই রাজী হ'লো না। অগত্যা পাঁচ আনা দিয়ে বইটা কিনে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত এলাম। সেখান থেকে ট্রামে চার পয়সার টিকেটে বাড়ি আসবো!

ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে এক কোণে বসে' ষোড়শী'খানা খুলে বসলুম। আজ বলতে লজ্জা নেই বাড়তি এক পয়সা দিয়ে একটা সিগ্রেট কিনে ধরিয়েও নিয়েছি। সে যে কোথা দিয়ে চলেছি কিছুই জ্ঞান নেই। জীবানন্দ তখন আমার কল্পনায় ভর করেছে। কলকাতার গোলমাল, হকারের চীৎকার, ট্রামের চাকার শব্দ সমস্ত অতিক্রম করে আমি তখন জীবানন্দের কাছারী বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছি। গায়ের শালখানা বিছিয়ে দিয়েছেন জীবানন্দ বিছানায়। সামনের টেবলে মদের পাত্র, একটা সিগ্রেট ধরিয়ে সোনার রিষ্টওয়াচের ওপর জীবানন্দ ছাই ঝাড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো আমার শরৎচন্দ্রের কথা। কোন্ দেশের মানুষ তিনি। তাঁর কলমে এ কোন্ মানুষ সশরীরে আমার সামনে আত্মপ্রকাশ করলো! চোখের সামনে ভেসে উঠলো এককড়ির [illegible] ধূর্ত মূর্তি। আর তারপরেই এল ভৈরবী ষোড়শী!



ট্রাম চলছে। কিন্তু কোথায় এলুম তা' দেখবার ফুরসুৎ নেই তখন। ষোড়শীর সে কী আবির্ভাব! আমার জীবনে আমি সেই দুপুর-বেলা সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের কামরায় যে জগৎ দেখলুম তা আর কখনও দেখিনি। সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ! মনে হ'লো বুঝি এখনি সর্ব-নাশ হয়! মনে হলো, ট্রাম থেমে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চক্রমণ স্তম্ভিত হ'য়ে প্রতীক্ষা করছে কী ঘটবে দেখবার জন্যে। বাতাস বন্ধ, সূর্যের আকর্ষণ বুঝি ঢিলে হ'য়ে গেছে, এখনি প্রলয় ঘটবে! অনন্ত কালের

সমুদ্রের অভ্যন্তরে যে আগ্নেয়গিরি এতদিন সুপ্ত ছিল আজ বুঝি তা' আবার নিজের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে। কাছারী বাড়ির দরজার আড়ালে তখন আড়ি পেতে যেন সব দেখছি, সব শুনছি!

এক সময় জীবানন্দ ষোড়শীকে জিগ্যেস করলেন—তোমার বয়েস কত?

আর সঙ্গে সঙ্গে 'আগুন' আগুন' চীৎকার উঠলো। আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। চেয়ে দেখি সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের কামরার মধ্যে আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে ব'সে আছি, আর ট্রামশুদ্ধ লোক সবাই ভীড় করে এসেছে আমার সামনে। একজন লোক আমাকে মারতে উদ্যত!

—একি মশাই, এমন ক'রে সিগ্রেট খেতে হয়—এখনি যে কাপড়ে আগুন ধরে যেত!

সবাই আমার হাত ধ'রে ফেলেছে। আমায় গলা টিপে ধরবে নাকি! দেখি আমার সিগ্রেটের আগুন লেগে আমার পাশের ভদ্রলোকের কাপড়ের এতখানি অংশ পুড়ে গেছে।

অপরাধীর মত চুপ করে' রইলাম। কীই বা আমার বলবার ছিল। আমি কি সজ্ঞানে করেছি। ওরা তো জানে না যে আমি তখন অক্ষম। সমস্ত উত্তেজিত জনতা এসে আমাকে শেষ ক'রে ফেলবার মতলব করেছে।

পাশের ভদ্রলোক শেষে কাপড়ের শোকে সত্যাই উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে বোধহয় আমার মুখের ওপর ঘুষি মারবার উদ্যোগ করলেন।

হঠাৎ আমার সামনের এক ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বাধা দিলেন। এতক্ষণ তাকে দেখিনি। মাথার বড় বড় পাকা চুল, পরণে আধময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবী আর থান ধুতি কোলের ওপর একটা ক্যানভাসের পেটকোলা ব্যাগ। তিনি যেন আর সকলের দলে নয়। বললেন—ওকে মারবেন না, ওর কোনও দোষ নেই, দোষ আমারই—

সবাই অবাক হ'লো। আমিও কম হলাম না। কে এ মানুষটি!

কিন্তু তাঁর বোধহয় নামবার সময় হয়েছিল। উত্তেজনা থামিয়ে দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ট্রাম থেকে হাজরা রোডের মোড়ে নেমে পড়লেন। তাকে জিগ্যেস করা হলো না কেন তিনি আমার অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিলেন। তাকে ধন্যবাদ দেওয়াও হলো না। শুধু হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। ট্রামশুদ্ধ লোক তা'র দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল।

আমি অব্যাহতি পেলাম সে-যাত্রা।

তারপর বহুদিন পরে একদিন যতীন দাশ রোড দিয়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে বেড়াতে বেরিয়েছি। কোনও কাজ নেই। কথা হচ্ছিল শরৎচন্দ্র নিয়ে। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে সবাই দেখেছে। তিনি নাকি বাড়ি করেছেন বালীগঞ্জে। হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে এসে আমার এক বন্ধু বললেন—ওই যে শরৎচন্দ্র—

চমকে উঠলাম। শিল্পী সতীশ সিংহের বাড়ির একতলার ঘরের মেঝেতে একটা তাসের আড্ডা বসেছে। চার পাঁচ জন তাস খেলায় মত্ত। আর তক্তপোষের ওপর একা এক ভদ্রলোক বসে গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে খেলা দেখছেন।

আমার বন্ধু বললে—ওই লোকটিই শরৎচন্দ্র—

আমি যেন সামনে ভুত দেখছি। সেই পাকা পাকা চুল মাথায়, লংক্লথের পাঞ্জাবী। চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি। সেদিনকার সেই ট্রামের ভদ্রলোকটি। যিনি আমায় চরম অপমান থেকে সেদিন অব্যাহতি দিয়েছিলেন। বুঝতে পারলাম কেন সেদিন তিনি আমার সমস্ত অপরাধ নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন।

সেই অন্ধকার যতীন দাশ রোডের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সেই লোকটির উদ্দেশ্যে বল্লাম—তোমায় প্রণাম করি হে শিল্পী! মানুষকে তুমি এমনি ক'রে দরদ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, ক্ষমা দিয়ে দেখেছ তাই তোমার সৃষ্টি মহৎ! তুমি আমার অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ করো।

সাথের চলা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

সাথের চলা সাঙ্গ হ'ল, পথ যে হ'ল শেষ,
ধূসর ধূলি অঙ্গ মম কালি,
সারাটী পথ ধ্বনিল কাণে তাহারি গীতরেশ,
কত না ফুল ভুলিয়া গেনু দলি';
কখনো হাত চাপিনু হাতে,
আত্মহারা চলিনু সাথে,
পথের শেষে ব্যাকুল ব্যথা
বহিতে আমি নারি।
বিদায়কালে মগ্ন হ'ল বুকের উর্মিরবে
অফুট কথা প্রাণের ছবি খানি,
মাতিয়া ছিনু তোমাতে নিতি দৃষ্টি মহোৎসবে
দ্বিধা না করি' হার যে আমি মানি;
প্রণয় কথা কহিলি এত,
স্বপন জাল রচিলি কত,
কি ফল পেলি? কিছুই নহে
কেবলি অশ্রুবারি।
সাথের চলা সাঙ্গ হ'ল, পথ যে হ'ল শেষ
হাতেতে রহে বিদায় পাত্রখান,
যে মধু লয়ে তাহার লাগি' করিনু উদ্দেশ
জানি না তার কি পাব প্রতিদান;
আবেশ ভরে সকল হিয়া
প্রতি নিমেষে উঠে কাঁপিয়া,
তাহারে হেরি' শূন্য ভরি'
উছলি' উঠে সুখে।

বিদায়কালে মগ্ন হ'ল বুকের উর্মিরবে
কি সান্ত্বনা গেল সে দিয়া মোরে,
মিলন মালা উজল হ'ল পরশ গৌরবে
শিহরে প্রাণ পুলক মধুঘোরে;
আমারে মনে রাখিবে কি না
কি ঠাঁই পাব—আমি জানি না,
বেদন-রাঙা একটী কাঁটা
বিঁধিবে তার বুকে।
সাথের চলা সাঙ্গ হ'ল, পথ যে হ'ল শেষ
যাত্রা পথ নবীন করে সুরু,
জয় পতাকা রচেছি পুন, নাহিক দৈন্য লেশ
রক্তকমলে ভরা মোর মরু;
প্রাণের খেলা এখনো চলে
আপন মনে না চাহি' ফলে,
মরম মম গরমে মরে,
মন কেমন করে।
জীবন যবে বিদায় নিবে ধরণী বক্ষ হ'তে—
আঁখির 'পরে কালো যবনিকা
মৃত্যু-আঁধার ঘনায়ে আসি' নামিবে ইন্দ্ররথে,
শোভিবে ভালে তারি প্রেমটীকা;
সমুখে আলো উদিবে ধীরে
আমারে হাসি' স্মরিল কি রে?
প্রেম যে মম তাহারি তরে
শুধু তাহারি তরে।



চিত্রশিল্প আবার নয় ছয় অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। একদিকে যুদ্ধ বাজারের কাপ্তেন প্রডিউসর্সদের ফতুর অবস্থা আর অন্যদিকে রাষ্ট্রিক অশান্তি মিলে অবস্থাকে বেশ ঘোরালো ক'রে তুলেছে। দলে দলে যেমন সব ছবি তুলতে এসেছিলো তেমনি সব দলে দলে আধা তোলা ছবির টিন কাঁধে নিয়ে সেই সব কাপ্তেনরা বাজার চষে বেড়াচ্ছে টাকা দাদন পাওয়ার চেষ্টায়। কত রকম প্যাঁচ পয়জার ওরা যে খাটাচ্ছে শুনলে আশ্চর্য হ'তে হয়। অধিকাংশ স্বাধীন উটকো প্রডিউসর্সদের দেখছি ছবি তোলার জন্যে কাঁচা ফিল্মের quota নেই, তারা ফিল্ম কিনচে চোরাবাজার থেকেই, কিন্তু তার জন্যে ধরা পড়চে না কেউই। চিত্রগৃহের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকলেও সেগুলি মাত্র কয়েকটি পরিবেশকের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাওয়ায় ছবির মুক্তিলাভ ক্রমশই দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠচে। সবাই আগে যেমন প্ল্যান ক'রেছিলো এখন তা স্থগিদ রেখে দিয়েছে। ছোট ছবি ও সংবাদচিত্রের বেশ একটা বাজার তৈরী হ'য়েছিল, দিশী ছবি চলছিলও ভালই. কিন্তু দিশী ছোট ছবির একচেটে কারবারি সিনে কর্পোরেশন ভাড়া কমানো নিয়ে অনমনীয় ভাব দেখানোতে বিদেশীরা এসে অনেক কম ভাড়ায় বিদেশী ছোট ছবি সরবরাহের ব্যবস্থা ক'রে ছোট ছবির বাজারটা দখল ক'রে নিয়েচে। দিশী ছবি ও চিত্রগৃহের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে বিদেশী ছবি তার হারানো প্রসার আস্তে আস্তে অনেকখানি পুনর্লাভে সমর্থ হ'য়েছে। তবে একটা সুখের বিষয় যে. মাঝেতে ছবির ব্যবসায় ফাটকা বাজারী চালের যে উদ্ভব হ'য়েছিল তা অনেকটা কমে গিয়েছে। ছবি তোলা যে মিল চালানো নয় তা বুঝতে পেরে অনেক জাঁদরেল মহাজনরাই পিছু হটে গিয়েছেন। ভীষণ ঝড়ের পর যে ছত্রাকার অবস্থা ঘটে ছবির রাজ্যের এখন সেই অবস্থা—শান্ত এবং সুপরিকল্পিত অবস্থায় ফিরে গিয়ে দেশের ও দশের প্রকৃত মঙ্গলজনক ছবি যে কবে হবে বলা শক্ত। বিশৃঙ্খলা এতদূরে পরিব্যাপ্ত যে ছবির বাজার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত কোন কথা বলাও এখন সম্ভব নয়।

নূতন ছবির পরিচয়

এ সপ্তাহে দু'খানি নতুন বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ ক'রছে—বীণা-পূর্ণ-খান্না-পারিজাত-অলকায় বসুধারা বাণী চিত্রের 'অভিযাত্রী' যার প্রযোজক ও রচয়িতা হ'চ্ছেন 'উদয়ের পথে' খ্যাত জ্যোতির্ময় রায়। রচনার জোরে ছবি, না পরিচালনার জোরে ছবি এই নিয়ে 'উদয়ের পথে' যে বিতণ্ডার সূত্রপাত করে 'অভিযাত্রী' তার জবাব. সুতরাং ছবিখানি বেশ আগ্রহ জাগিয়েছে; এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন বিনতা, রাধামোহন, নির্মলেন্দু, কমল, শম্ভু মিত্র, নরেশ বসু প্রভৃতি, পরিচালনা হেমেন গুপ্তের এবং সুর যোজনা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। অপর বাঙলা ছবি হ'চ্ছে উত্তরা-উজ্জলা-পূরবীতে রজনী পিকচার্সের 'তপোভঙ্গ' যার বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন, জহর, জীবেন, কমল, সন্ধ্যা, বনানী, প্রমীলা প্রভৃতি এবং পরিচালক হ'চ্ছেন প্রাক্তন আলোক-চিত্র-শিল্পী বিভূতি দাস। হিন্দী ছবি এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ ক'রছে জ্যোতিতে রাজলক্ষ্মী পিকচার্সের 'বীজ', পরিচালনায় সুধীন সেন এবং ভূমিকায় রেহানা, বিমান ব্যানার্জি, মায়া ও বিক্রম কাপুর; প্যারাডাইস-দীপক-চিত্রলেখায় ফিল্মিস্তানের 'সফর' যার পরিচালক হ'চ্ছেন বিভূতি মিত্র আর ভূমিকায় আছেন কানু রায় ও শোভা। এ ছাড়া গত দু সপ্তাহে মুক্তিলাভ ক'রেছে ক্রাউন-প্রভাত-রূপালি-পার্কশোতে স্ট্যাণ্ডার্ড পিকচার্সের 'বৈরাম খাঁ, ভূমিকায় জাগীরদার, মেহতাব. ডেভিড প্রভৃতি পরিচালনায় জাগীরদার; গণেশ টকীতে মুরলী মুভীটোনের 'শ্রবণকুমার' ভূমিকায় পাহাড়ী ও মমতাজ শান্তি, পরিচালনায় রাম দরিয়ানী এবং সেণ্ট্রাল-দীপক-চিত্রলেখা-সিটিতে জয়ন্ত দেশাই প্রডাকসন্সের 'মহারাণা প্রতাপ', পরিচালনা ঈশ্বরলাল এবং ভূমিকায় খুরশীদ ও ঈশ্বরলাল।

বিবিধ

'ডাঃ কোটনীশ', 'শকুন্তলা' ও 'পর্বত পে অপ্না ডেরা'র মুক্তিলাভ ঘটিয়ে সস্ত্রীক শান্তারাম বম্বেতে ফিরে এসেছেন।

* * *

আমেরিকায় ভারতীয় ছবির মুক্তিলাভ সম্ভাবনা বিষয়ে শান্তারামের কৃতিত্বে উৎসাহিত হ'য়ে প্রকাশ পিকচার্সের বিজয় ভট্ট ওখানে 'রামরাজ্য' ও 'ভরত মিলাপ' দেখাবার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই আমেরিকা যাত্রা ক'রেছেন।

* * * * *

হলিউডি খেয়ালের আর এক পরিচয়—প্রযোজক চার্লস ফেল্ডম্যান 'দি গ্লাস মিনেজারি' নামক একখানি উপন্যাসের চিত্রস্বত্ব পনের লাখ টাকারও বেশী দিয়ে কিনে নিয়েছেন।

* * *

বম্বের ন্যাশনাল স্টুডিও গত বছরের দরুণ প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্যে ৫% এবং সাধারণ শেয়ারের জন্যে ১০% লভ্যাংশ দিয়েছে—কিন্তু এ লাভটা ওরা ক'রলে কি ক'রে? গত ক বছরে ন্যাশনালের একখানি ছবিও তো মুক্তিলাভ ক'রতে শুনিনি!

* * *

সমরসেট মমের 'দি রেজর্স এজ' নামক উপন্যাসের তেইশটি বিভিন্ন ভাষায় চিত্ররূপ দেওয়া হ'চ্ছে, তার মধ্যে হিন্দীও আছে। ছবিখানি তোলার খরচ প্রায় ১৩ কোটি টাকা।

মুক্তির আর বিলম্ব নাই!!



অতীতের শোকাচ্ছন্ন স্মৃতিতে মলিন
ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় উদ্দীপিত

মন্দির

পরম দুর্দিনে চরম নির্ভীকতার বাণী
বহন করিয়া আনিবে!!

কাহিনী—প্রণব রায় :: পরিচালনা—ফণী বর্মা
সঙ্গীত—সুবল দাশগুপ্ত
শ্রেষ্ঠাংশে—চন্দ্রাবতী, ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র, অমর মল্লিক, জহর, রবি, কানু প্রভৃতি

= একযোগে =

মিনার * বিজলী * ছবিঘর

—এ, ডি, রিলিজ—

খেলা ধূলা

ক্রিকেট

বাঙলা দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় হোলকার দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া এক ইনিংস ও ৩২ রাণে পরাজিত হইয়াছে। বাঙলা দলের এই শোচনীয় পরাজয় দুঃখের হইলেও অপ্রত্যাশিত নহে। ইহা খুবই সুখের বিষয় যে, হোলকার দলের কোন খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করিতে পারেন নাই। এমন কি হোলকারের প্রথম ইনিংসের রাণ সংখ্যা খুব বেশী হয় নাই। তবে এই-জন্য বাঙলা দলের তরুণ বোলার পি চ্যাটার্জির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে হয় যে, প্রথম শ্রেণীর খেলায় যোগদান করিয়া হোলকারের ন্যায় শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে তিনি বোলিংয়ে সাফল্য-লাভ করিয়াছেন। আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি অদূরে ভবিষ্যতে এই তরুণ খেলোয়াড়টি একজন শ্রেষ্ঠ বোলার হইতে পারিবেন।

খেলার বিবরণ

হোলকার দল প্রথম খেলিয়া ৩৫০ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করেন। বাঙলা দল পরে খেলিয়া তৃতীয় দিনের প্রথমেই ১৬৫ রাণে ইনিংস শেষ করে। ফলে বাঙলা দলকে "ফলো অন" করিতে হয়। বাঙলা দল ইনিংস পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু সাফল্যলাভ করিতে পারে না। দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৩ রাণেই শেষ হয়। হোলকার দল খেলায় এক ইনিংস ও ৩২ রাণে জয়লাভ করে। হোলকার দলের গাইকোয়াড় একাই উভয় ইনিংসে ১১টি উইকেট দখল করেন। খেলার ফলাফল :—

হোলকার দল প্রথম ইনিংস :—৩৫০ (মুস্তাক আলী ৩২, জাগদেল ৪৭, সারভাতে ৪২ সি এস নাইডু ৭৮, জে এন ভায়া ৫৪, এন চৌধুরী ৮৬, রাণে ৩টি ও পি চ্যাটার্জি ৮০ রাণে ৫টি উইকেট পান)।

বাঙলা দলের প্রথম ইনিংস :—১৬৫ রাণ (কে বসু ৬১, এস মুস্তাফি ৩৯, মিঃ এস নাইডু ৫ রাণে ৪টি ও গাইকোয়াড় ৪২ রাণে ৬টি উইকেট পান)।

বাঙলা দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—১৫৩ রাণ (পি সেন ৫০, এন চ্যাটার্জি ৪২, কে বসু ২৩, মহারাজ কুমার ১৯ রাণে ৫টি ও গাইকোয়াড় ৩২ রাণে ৫টি উইকেট পান)।

টেনিস

বিশ্ব টেনিস সঙ্ঘ টেনিস ক্রমপর্যায় তালিকা এখনও গঠন করেন নাই। তবে সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার একজন বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় এক ক্রমপর্যায় তালিকা গঠন করিয়াছেন। তাঁহার তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় জ্যাক ক্রামার। ক্রামার এই স্থান পাইবার যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। তবে আমাদের আশ্চর্য করিয়াছে এই তালিকার মধ্যে সেরা খেলোয়াড় ড্রবলীর নাম দেখিয়া। এই খেলোয়াড়টি কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় আসিয়া-ছিলেন। তাঁহার খেলা দেখিবার অনেকেরই সৌভাগ্য হইয়াছে। এমন কি ইনি ভারতের তরুণ খেলোয়াড় মানমোহনের বিরুদ্ধে খেলিয়া শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন তাহাও অনেকে দেখিয়াছেন। পরাজয়ের পর ইনি কিরূপ অখেলোয়াড়ীসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। এই সকল ঘটনা বিভিন্ন সংবাদ-পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পরও অষ্ট্রেলিয়ার "মেলবোর্ন হেরাল্ডের" ন্যায় পত্রিকায় ড্রবলীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়-দের মধ্যে স্থান দিবার সময় একটু চিন্তা করিলেন না, ইহা ভাবিয়াই আমরা আশ্চর্য হইতেছি। তিনি উইম্বলডেন প্রতিযোগিতায় ভাল ফল প্রদর্শন করিয়াছিলেন সত্য হইলেও ভারতের প্রতিযোগিতায় সেইরূপ কিছুই করিতে পারিলেন না ইহা ক্রমপর্যায় তালিকা গঠনকারীর স্মরণ করা উচিত ছিল। হইতে পারে পরাধীন ভারতের খেলোয়াড়ের সাফল্য তিনি গণ্য করার কোন প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করেন নাই। তবে ইহা ঠিক, একদিন ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়গণ এই সকল সাংবাদিকদের প্রশংসা বাণী প্রচার করিতে বাধ্য করিবেন। নিম্নে উক্ত সাংবাদিকের ক্রমপর্যায় তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—(১) জ্যাক ক্রামার (আমেরিকা), (২) টে ষ্রোডার (ঐ), (৩) জন ব্রমউইচ (অষ্ট্রেলিয়া), (৪) ফ্রাঙ্ক পার্কার (আমেরিকা), (৫) ডিনী পেলস (অষ্ট্রেলিয়া), (৬) গার্ডনার মুলয় (আমেরিকা), (৭) টম ব্রাউন (আমেরিকা), (৮) ইভোনী পেত্রা (ফ্রান্স) (৯) মার্শাল বার্নার্ড (ফ্রান্স), (১০) জে ড্রবলী (চেকোশ্লোভাকিয়া)।

এ্যাথলেটিকস

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরি-চালকদের সুপরিচালনার ফলে বাঙলার স্পোর্টস স্ট্যান্ডার্ড গত বৎসর হইতেই ঊর্ধ্বগামী না হইয়া নিম্নগামী হইয়াছে। এইবারের কয়েকটি স্পোর্টস অনুষ্ঠান অবলোকন করিয়া এইটুকুই উপলব্ধি করিলাম স্ট্যান্ডার্ড চরম স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই স্তর হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে দুই এক বৎসরের সাধনায় কিছুই হইবে না, প্রয়োজন কয়েক বৎসরের আন্তরিক সাধনার। কিন্তু সেই সাধনা কাহারা করিবে ? কে সেই সাধনার পথের নির্দেশ দিবে? বর্তমান বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের দ্বারা যে হইবে না এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। ইহারা কেবল অনুষ্ঠানের সময় বিভিন্ন রংয়ের ব্যাজে ভূষিত হইয়া মাঠ ভর্তি করিতে শিখিয়াছেন, শেখেন নাই উৎসাহী এ্যাথলেটিককে পথের সন্ধান দিতে। যে শিক্ষা ও দীক্ষার প্রয়োজন তাহা ইহাদের মধ্যে অনেকেরই নাই এবং তাহা অর্জন করিবার জন্যও ইহাদের আগ্রহ নাই। ইঁহাদের কবে যে জ্ঞান-চক্ষু খুলিবে জানি না।

জাতীয় খেলা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘ সম্প্রতি চন্দননগরে আর একটা শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই শিবিরে হুগলী জেলার প্রায় একশত ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের দুইশত সভ্য ও সভ্যা যোগদান করেন। শিবির মাত্র চারিদিন ব্যাপী হয় কিন্তু যাঁহারা এই শিবিরে পদার্পণ করিয়াছেন তাঁহারাই একবাক্যে সঙ্ঘের কর্মব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারেন না। ফরাসী চন্দননগরের প্রধান পরিচালক মঁশিয়ে বাজঁ্যা এই শিবিরের কার্যকলাপ দেখিয়া এতই সন্তুষ্ট হন যে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনের সময় পরি-চালকদের বলিতে শোনা গিয়াছে "আপনারা চন্দননগরে একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করুন। আমি আপনাদের কেন্দ্র স্থাপনের সকল বিষয় সাহায্য করিব। দেশের যুবশক্তি ঠিক পথে চালিত করিতে হইলে আপনাদের মত শত শত শিক্ষা-শিবিরের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।" স্বাধীন দেশের লোক মঁশিয়ে বাজঁ্যা; সুতরাং তিনি শিক্ষাশিবিরের মূল্য বুঝেন। আমাদের দেশের লোকও একদিন বুঝিবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। এমন কি এই জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের পরিচালকগণই সারা ভারতের জনগণের প্রাণে এই সাড়া আনিবেন ইহাতেও আমাদের কোনই সন্দেহ নাই।

—

সাহিত্য-সংবাদ

আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

চন্দননগর কালচারাল এসোসিয়েশনের দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে।

১। "ক" বিভাগ—আবৃত্তি—রবীন্দ্রনাথের "পত্রপুটের" তিন নং কবিতা (পৃথিবী) "আজি আমার প্রণতি গ্রহণ করো..."

"খ" বিভাগ—আবৃত্তি ১০ হইতে ১৫ বৎসর বালকবালিকাদিগের জন্য রবীন্দ্র-নাথের "সঞ্চয়িতা" অন্তর্গত "প্রশ্ন"

"গ" বিভাগ—আবৃত্তি—১০ বৎসর অবধি বয়স্ক বালকবালিকাদিগের জন্য রবীন্দ্রনাথের "খাপছাড়া" নামক পুস্তকের প্রথম কবিতা "খাপছাড়া"।

২। প্রবন্ধ—সর্বসাধারণের জন্য লিখিত-ভাবে দাখিল করিতে হইবে।

বিষয়—সাহিত্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-বাদ ও রবীন্দ্রনাথ।

নাম ও প্রবন্ধ দাখিল করিবার শেষ তারিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭।

কোনও প্রবেশমূল্য নাই। আবৃত্তিতে 'ক' ও 'খ' বিভাগে দুইটি 'গ' বিভাগে তিনটি রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার এবং প্রবন্ধে একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে।

—সম্পাদক, কালচারাল এসোসিয়েশন, C/o. শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, পোঃ আঃ গোন্দলপাড়া, চন্দননগর (জেলা হুগলী)।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৭শে জানুয়ারী—গত ২২শে জানুয়ারী ময়মনসিংহে পুলিশের গুলী চালনা ও লাঠি চার্জ সম্পর্কে সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে, সর্বসমেত মোট ১৬ জন আহত হয় এবং ইহাদের মধ্যে শ্রীমান অমলেন্দু ঘোষ (দশম শ্রেণীর ছাত্র) ঘটনাস্থলে নিহত হন।

পাঁচগাঁ (নোয়াখালি) হইতে ৭ মাইল দূরে এক গ্রামে গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখ অনুমান তিন শত লোকের এক জনতার উপর পুলিশকে গুলী চালাইতে হয়, কেহ আহত হয় নাই। আজ প্রাতে গান্ধীজী পাঁচগাঁয় গিয়া পেঁাছেন।

আজ পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে ৫ শত লীগপন্থী পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়।

২৮শে জানুয়ারী—কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের যে নূতন খসড়া রচিত হইয়াছে, কংগ্রেস গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি উহা ৩০শে জানুয়ারী বৈঠকে আলোচনা করিবেন। এই গঠনতন্ত্র অনুসারে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র দল থাকিতে দেওয়া হইবে না।

পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

মিঃ হবিবর রহমান নেতাজী জন্মোৎসব উপলক্ষে বর্তমানে কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, নেতাজী জার্মানীতে "হিজ এক্সেলেন্সী অরল্যান্ডো মাজোট্টো" এই ছদ্ম নামে কিছুদিন কাজ করার পর আত্মপ্রকাশ করেন। জার্মান গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, তিনি যেমন মনে করিবেন তদ্রূপ সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবে তাঁহার ও তাঁহার দপ্তরের কার্য সম্পন্ন করিবেন।

২৯শে জানুয়ারী—গতকল্য রংপুর জেলার সৈদপুরে সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রা যাইবার সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গৃহদাহ এবং লুঠ-তরাজ হয়। ইহার ফলে ৮ জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

গতকল্য নোয়াখালি জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক মিঃ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল জয়াগে (নোয়াখালি) গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, "নোয়াখালিতে অহিংসার চরম পরীক্ষা হইতেছে। এখানে যদি আমি ব্যর্থকাম হই, তাহা হইলে ইহার সঙ্গে আমার অহিংসা নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।"

নয়াদিল্লীতে নরেন্দ্রমণ্ডলের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির বৈঠকে দেশীয় রাজ্যসমূহের গণ-পরিষদে যোগ-দানের প্রশ্ন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে ভারতের ভাবী যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এ সম্পর্কে কতকগুলি সর্ত আরোপ করা হইয়াছে। প্রধানত এই দাবী করা হইয়াছে যে, অন্তর্বর্তী শাসন-ব্যবস্থার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে সার্বভৌম ক্ষমতা ভারতের ভাবী যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্নমেণ্টের হস্তে হস্তান্তরিত হইবে না পরন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

৩০শে জানুয়ারী—বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি করাচীতে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর পূর্ব বঙ্গ পরিক্রমা জনসাধারণের মধ্যে আস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইয়াছে।

মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী মিঃ টি প্রকাশম এক বিবৃতি প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের তীব্র আক্রমণ করিয়া বলেন যে, কৃষকদের প্ররো-চিত করিয়া তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে এবং মানুষের ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

সৈদপুরে এতাবৎ ১৮টি মৃতদেহ পাওয়া যায়।

শিলংয়ের সংবাদে প্রকাশ, আসাম গভর্নমেণ্টের বহিরাগত উচ্ছেদ নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য ময়মনসিংহ জেলার বাহাদুরাবাদে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন হইবে।

৩১শে জানুয়ারী—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ অবলম্বনে সংকল্পবদ্ধ এবং সুভাষচন্দ্র বসুর অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ করার মুখ্য উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত 'আজাদ হিন্দ দল' নামক একটি সর্ব-ভারতীয় দল গঠনের জন্য শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এক প্রস্তাব করিয়াছেন। গত ২৭শে জানুয়ারী উত্তর কলিকাতায় "বেলগাছিয়া ভিলায়" আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সদস্যগণের এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের সম্মেলনে শ্রীযুত বসু পূর্বোক্ত মর্মে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

করাচীতে নিঃ ভাঃ মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন সম্পর্কে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গভর্নমেণ্টকে এই মর্মে অনুরোধ জানাইয়াছে যে, কংগ্রেস ১৬ই মে'র বিবৃতি মানিয়া লয় নাই বলিয়া বৃটিশ মন্ত্রিপ্রতিনিধিদল কর্তৃক উদ্ভাবিত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা ব্যর্থ বলিয়া ঘোষিত হউক। অধিকন্তু অনতিবিলম্বে গণ-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্যও উহাতে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে।

অধিবাসী বিনিময় সম্ভবপর কিনা সেই সম্পর্কে স্বীয় অভিমত প্রকাশ প্রসঙ্গে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি করাচীতে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' জনৈক প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, বিহারের এক লক্ষ ৫০ হাজার মুসলমান বাঙলায় বসবাস স্থাপন করিয়াছে এবং তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদত্ত হইয়াছে।

সৈদপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে এতাবৎ মোট ২৩ জন নিহত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে পর নারীরা কি করিবে—এই সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী নবগ্রামে (নোয়াখালি) বলেন যে, কাপুরুষতা প্রদর্শন অপেক্ষা হিংসার আশ্রয় লওয়া অনেক ভাল।

১লা ফেব্রুয়ারী—বিখ্যাত সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক, সাহিত্যিক এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হলে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

নোয়াখালির নোয়াখোলা গ্রামে একদল ডাকাতের আক্রমণে দুইজন নিহত ও একজন গুরুতর আহত হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী অদ্য আমিষাপাড়া (নোয়াখালি) গ্রামে গিয়া পেঁাছেন। এই গ্রামটি গান্ধীজীর গ্রাম পরিক্রমার ২৭তম গ্রাম।

২রা ফেব্রুয়ারী—মহাত্মা গান্ধী আজ প্রাতে সাতঘরিয়ায় (নোয়াখালি) আসিয়া পেঁাছিয়াছেন। তাঁহার পল্লী পরিক্রমার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হইতে আর মাত্র একটি গ্রাম বাকী আছে।

বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, মাদারীপুর, মুন্সীগঞ্জ, আউটসাহী (ঢাকা) প্রভৃতি স্থানে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বাঙলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নবম স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে অদ্য অপরাহ্নে শরৎচন্দ্রের বাসভূমি দেবানন্দপুরে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৮শে জানুয়ারী—ব্রহ্ম সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স অদ্য লর্ড সভায় ঘোষণা করেন যে, ব্রহ্ম প্রতিনিধি দলের সহিত বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এক মীমাংসা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, আগামী এপ্রিল মাসে একটি গণ-পরিষদ গঠিত হইবে এবং নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত একটি অন্তবর্তী গভর্নমেণ্ট শাসনকার্য চালাইয়া যাইবেন।

২৯শে জানুয়ারী—বৃটিশ উপনিবেশ সচিব আর্থার জোন্স কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ নারী ও শিশুদিগকে প্যালেস্টাইন হইতে সরাইয়া আনা হইতে পারে। সন্ত্রাসবাদী ইহুদীদের আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষার জনাই উহা প্রয়োজন হইবে।

মার্কিন রাষ্ট্রদপ্তর হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন গভর্নমেণ্ট ও চীনা কম্যুনিস্টদের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে গঠিত ত্রিশক্তি কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছে।

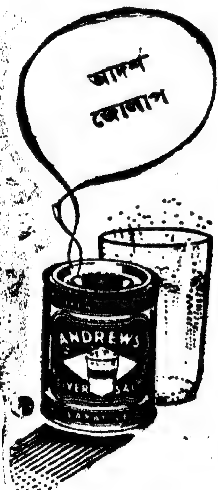
৩১শে জানুয়ারী—প্যালেস্টাইনের হাই-কমিশনার জেনারেল স্যার এলান কনিংহাম অদ্য প্যালেস্টাইনস্থিত বৃটিশ নারী ও শিশুদিগকে অপসারণ করিবার জন্য এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

১লা ফেব্রুয়ারী—রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ সোমবার ব্রহ্মে সাধারণ ধর্মঘট আরম্ভ হইতে পারে।

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী গভর্নমেণ্ট ইন্দোচীনে আরও অনেক সৈন্য পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।



আড়ম্বরহীন পরিচ্ছন্নতা প্রথম প্রয়োজন"



নিয়মিত এক গ্লাস এণ্ড্রুজ খেয়ে দেহাভ্যন্তর মধুর ও শুচি রাখা দৈনন্দিন ভাল স্বাস্থ্যের মূল ভিত্তি—লোকেরা ক্রমশঃই এ ভাল নিয়মের তাৎপর্য্য বুঝছে। এণ্ড্রুজ মধুর ও স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয়। সমস্ত দেহযন্ত্রকে ইহা স্নিগ্ধ সঞ্জীবিত ও সতেজ করে। মৃদু অথচ সম্পূর্ণ ক্রিয়া বিশিষ্ট এণ্ড্রুজ সব বয়সের লোকের পক্ষে আদর্শ মৃদু বিরেচক। এই ভাবে এণ্ড্রুজ আপনাকে কর্ম্মঠ, আপনার দৃষ্টি উজ্জ্বল ও বর্ণ পরিষ্কার রাখে :—

এণ্ড্রুজ মুখ ও জিহ্বা পরিষ্কার ও সঞ্জীবিত করে।

এণ্ড্রুজ পাকস্থলীকে অম্লমুক্ত করে স্বাভাবিক রাখে।

এণ্ড্রুজ লিভারকে সবল রাখে ও পিত্তাধিক্য দমন করে।

এণ্ড্রুজ ধীরে ধীরে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে দেহাভ্যন্তর সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন রাখে। ইহা যন্ত্রণাদায়ক বিষ-বস্তু দূর করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য ভাল করে এবং রক্তকে বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ রাখে।

কাগজের বাক্সের মধ্যে টিনে প্যাক করা থাকে। সর্ব্বত্র নূতন মার্কা পাওয়া যায়।

ANDREWS

এ ণ্ড্রু জ লি ভা র স ল্ট

৩।। স্নিগ্ধ করে পুন সঞ্জীবিত করে সতেজ করে

বাংলা সাহিত্যে অভিনব পদ্ধতিতে লিখিত রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থমালা

শ্রীপ্রভাকর গুপ্ত সম্পাদিত

১। ভাস্করের মিতালি মূল্য ১৲
২। দুয়ে একে তিন „ ১।৵
৩। সুচারু মিত্রের ভুল „ ১৲
৪। দুই ধারা „ ১৲
৫। হারাধনের দশটি ছেলে „ ১৲

প্রত্যেকখানি বই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক আপনার পাঠাগারের জন্য শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বুকল্যাণ্ড লিমিটেড

বুক সেলার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স
১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৪০৫৮



কোরে

সত্বর বেদনা নিরাময় করে

কোরে ইংলণ্ডে প্রস্তুত বেদনানাশক একটি ঔষধ। ইহা এই জাতীয় অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ অধিক শক্তিশালী। সুতরাং বেদনায় আক্রান্ত হইলেই সত্বর ফলপ্রদ কোরে ট্যাবলেট ব্যবহার করিয়া অবিলম্বে নিরাময় করুন। অত্যাশ্চর্য ঈষৎ লাল রঙের কোরে ট্যাবলেট ব্যবহারের কয়েক মিনিট পরেই মাথাধরা, স্নায়ুপ্রদাহ, বাত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কটিবাত প্রভৃতির বেদনা উপশম হয়। ছয় ট্যাবলেটের একটি প্যাকেটের মূল্য দুই আনা। ৩০ ট্যাবলেটের একটি প্যাকেটের মূল্য দশ আনা। সমস্ত সম্ভ্রান্ত ডীলারের নিকট পাওয়া যায়।

কোরে লিমিটেড
২৫, হ্যানোভার স্কোয়ার,
লণ্ডন, ডব্লিউ ১
ভারতবর্ষ স্থিত
প্রতিনিধি ঃ
জি এথারটন এণ্ড
কোং লিঃ
কলিকাতা ও বোম্বাই।





ইহার বদলে অন্য কিছু লইবেন না। চিত্রে প্রদর্শিতানুরূপ প্যাকেটে কোরে বিক্রীত হয়। কোন জিনিষই ইহার ন্যায় ফলপ্রদ নহে।

কর্মশক্তি বাড়ায়...
ভাইভিনা
VIVINA
VIVINA
ক্যালকাটা কেমিক্যাল

ধবল ও কুষ্ঠ

গাত্রে বিবিধ বর্ণের দাগ, স্পর্শশক্তিহীনতা, অঙ্গাদি স্ফীত, অঙ্গুল্যাদির বক্রতা, বাতরক্ত, একজিমা সোরায়েসিস্ ও অন্যান্য চর্মরোগাদি নির্দোষ আরোগ্যের জন্য ৫০ বর্ষোধ্র্বকালের চিকিৎসালয়

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আপনি আপনার রোগলক্ষণ সহ পত্র লিখিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপুস্তক লউন।

—প্রতিষ্ঠাতা—

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া।
ফোন নং ৩৫৯ হাওড়া।
শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
(পূরবী সিনেমার নিকটে)

তত: কিন্তু!

দুষ্টোমি করাই শিশুদের অভ্যাস

কিন্তু পরিণামে সামান্য বা সাঙ্ঘাতিক ক্ষত দেখা যায় অথচ সময়ে উহা নির্মূল করিতে যত্ন না নিলে পরে অনিষ্টকর হয়। "কণ্ডুদাবানল" এই অনিষ্ট অব্যর্থ ভাবে বিনষ্ট করে। পাচড়া, ফোড়া, কাটা, পোড়াঘা বা যে কোনও প্রকার ক্ষত এই পরীক্ষিত এ্যান্টিসেপ-টিকে নিশ্চিত আরোগ্য হয়।

কণ্ডুদাবানল

TRADE MARK
SANKHANIDHI LALMOHAN SAHA'S
Kandudavanal
FOR ITCHES, CUTS, BURNS, ECZEMA, CHRONIC ULCERS AND SORES ETC.

এল, এম, সাহা শঙ্খনিধি এণ্ড কোং লিঃ - ঢাকা
ব্রাঞ্চ ৩২ই, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

আপনার
কম খরচার খাজাঞ্চী

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং
করপোরেশন
লিমিটেড

হেড অফিস—
২১এ, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা ১
ফোন—কলিকাতা ১৭৪৪
টেলিগ্রাম—স্টারম।

শাখাসমূহ
ঢাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, ক্যানিং, সোণারপুর, কোন্নগর, রামপুরহাট বারহারওয়া, সাহিবগঞ্জ (এস্., পি) রঘুনাথগঞ্জ, আওরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—
ডি. এন. চ্যাটার্জি,
এফ. আর. ই. এস্. (লণ্ডন)

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা

খ্যাতনামা সাহিত্যিক
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের
চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক উপন্যাস

তরুণের স্বপ্ন

১ম পর্ব ৩।৹ ২য় পর্ব ২৬৹

বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সুখ ও দুঃখের সবুজ সজীব আলেখ্য।

তাসের ঘর—২॥৹

কণ্ট্রোলের শাড়ী—২৲

চলতি নাটক-নভেল এজেন্সী
১৪৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

তৃতীয় সংস্করণ বর্ধিত আকারে বাহির হইল।
বাঙালী হিন্দুর এই চরম দুর্দিনে
প্রফুল্লকুমারের পথনির্দেশ
প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য।
মূল্য—৩৲
—প্রকাশক—
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।
—প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা।
ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

ডায়াপেপসিন



ডায়াস্টেস্ ও পেপসিন্ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংমিশ্রণ করিয়া ডায়াপেপসিন্ প্রস্তুত করা হইয়াছে। খাদ্য জীর্ণ করিতে ডায়াস্টেস্ ও পেপসিন্ দুইটি প্রধান এবং অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। খাদ্যের সহিত চা চামচের এক চামচ খাইলে একটি বিশিষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়া সৃষ্ট হয় যাহা খাদ্য জীর্ণ হইবার প্রথম অবস্থা। ইহার পর পাকস্থলীর কার্য অনেক লঘু হইয়া যায় এবং খাদ্যের সবটুকু সারাংশই শরীর গ্রহণ করে।

ইউনিয়ন ড্রাগ
কলিকাতা

সতীশ কবিরাজের
শ্বাসারি
হাপানি ও ব্রঙ্কাইটিসে

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ
নিরাময়কারী মহৌষধ

১ দাগে হাঁপ কমে
১ শিশিতে আরোগ্য

সর্বত্র বড় বড় দোকানে
পাওয়া যায়।

কবিরাজ
এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড সন্স
সাহাপুর বেহালা দক্ষিণ কলিকাতা

সুন্দর স্বাস্থ্য
উপভোগ করুন

PASSING SHOW
CIGARETTES

Smoke
PASSING
SHOW

সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতোপায়ে প্রস্তুত পাসিং শো সিগারেটগুলি স্নিগ্ধকর, সজীবতা আনে ও চমৎকার বলকারক। স্বাস্থ্যের জন্য পাসিং শোই আপনি সর্বদা পান করুন।

৩ আনায় দশটা

PS/97

শ্বাস অর্থাৎ হাঁপানি কাসির দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহৌষধ। ইহা দুই দিন মাত্র সেবন করিতে হয়। মৃতপ্রায় রোগীর ইহাই একমাত্র প্রাণদাতা। মূল্য ডাকব্যয়-সহ ২৸৵০। কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী। মূল প্রতিষ্ঠান—পুলশিটা, মেদিনীপুর। শাখা—৬নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চিঠিপত্র মূল প্রতিষ্ঠানে পাঠাইবেন।

কটিবাতে অচল অনড়

কয়েকসপ্তাহ তিনি নাড়তে চড়িতেই পারিতেন না

ক্রুশেন অসহ্য ব্যথা বেদনা দূর করিল

"কোন ভাল বিষয় জানা মাত্রই বন্ধু-বান্ধবকে বলার" নীতি অনুসরণ করিয়া জনৈক ব্যক্তি লিখিতেছেন:—"আমি কটিবাতে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলাম এবং কয়েক সপ্তাহ বিছানায়ও নড়াচড়া করিতে পারিতাম না। চিকিৎসায়, ব্যথা-বেদনার তেমন কিছু উপশম হইল না। জনৈক বন্ধু "ওহে, তুমি ক্রুশেন সল্টস্ খাওনা কেন? প্রত্যহ প্রাতে উহা খাইতে এবং কয়েকদিন মধ্যেই দেখিতে পাইবে যে পিঠের অসহ্য ব্যথা দূর হইয়াছে।" কাজেই আমি প্রাতে উহা খাইতে সুরু করিলাম। আমি এখন দ্বিতীয় শিশি খাইতেছি,—"আবার আমি কাজের উপযুক্ত হইয়াছি—ক্রুশেনকে ধন্যবাদ। আমি আমার বন্ধুবান্ধবকে ক্রুশেনের কথা নিশ্চয়ই বলিব।" সি বি।

ক্রুশেন সল্টের নিকট কটিবাত, পৃষ্ঠবেদনা বাত ইত্যাদি জব্দ হয় কেন? ইহার গোপন রহস্য খুবই পরিষ্কার। শিশির ছয়টি খনিজ সল্টেই উহার কারণ নিহিত রহিয়াছে। এই সমস্ত সল্টের প্রত্যেকটিই পৃথক পৃথক-ভাবে কাজ করে এবং যেখানে একটি ঢুকিতে পারে না, সেখানে অন্যটি ঢুকিয়া কাজ করে। ক্রুশেনের ছয়টি সল্ট আপনার দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহকে সুস্থ, সজীব ও সক্রিয় করে এবং যে সমস্ত এসিড ও বিষ, রক্তকে দূষিত করে সেই সমস্ত এসিড ও বিষকে বাহির করিয়া দেয়। ফলে সত্বর বাতের যন্ত্রণা দূর করিয়া আপনার দেহকে আবার সুস্থ-সবল করে।

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঔষধালয় ও ষ্টোরে ক্রুশেন সল্টস্ পাওয়া যায়।

R2.



ম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৫৩ সাল। Saturday, 15th February, 1947. [১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বতার মর্যাদাহানি

মোশ্লেম লীগের ভেদ-বিদ্বেষমূলক ারকার্য এবং মধ্যযুগীয় প্রগতি-রোধী মতবাদের প্রভাব বাঙলার াভাবিক সংস্কৃতিকে কতটা দূষিত করিয়া লিয়াছে, গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় স্থাপক সভা এবং পরিষদে নোয়াখালি ্পর্কিত বিতর্কেই আমরা তাহার কিছু রিচয় পাইয়াছি। লীগ-প্রতিনিধিদের ধ্যে কেহই এই বিতর্কে সাম্প্রদায়িক প্রভাবমুক্ত ংস্কৃতিমূলক উদার মনোবৃত্তি প্রকাশ করিতে রেন নাই। তাঁহারা সকলেই সংকীর্ণ দলগত ার্থে পড়িয়া সত্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন এবং নব-ধর্মকে লঘু করিয়াছেন। নোয়াখালি এবং পুরার উদ্দাম দৌরাত্ম্যের পাশবিক তাণ্ডবকে তান্ত নির্লজ্জভাবে তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপন্ন রিবার দিকেই লীগ প্রতিনিধিদের প্রধানত ষ্টি নিবদ্ধ ছিল। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ রাবর্দী যেন গর্বে বুক ফুলাইয়াই থা বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মিঃ রাবর্দীর বক্তৃতা আগাগোড়া পড়িলে হাই মনে হয় যে, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার যাপারে তিনি একটুও লজ্জাবোধ করেন না; পক্ষান্তরে আত্মশ্লাঘাই অনুভব করিয়া থাকেন। মিঃ সুরাবর্দীর পশ্চাতে মতলব-বাঁধা লীগ দলের ভোটের জোর রহিয়াছে এবং সে নির্বিবেক ভোটের জোর। এই জোরে তিনি পরিষদে বিতর্কের উত্তরে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করেন নাই; ব্যবস্থাপক সভায় আমাদিগকে তিনি এই আশ্বাস দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন যে, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় বিশেষ গুরুতর কিছুই ঘটে নাই। তিনি হিসাব দেখান যে, নোয়াখালিতে মোট ১৪৫ এবং গোটা ত্রিপুরা জেলায় সর্বসাকুল্যে ৩৭ জন মাত্র নিহত হইয়াছে। নোয়াখালিতে ৩৭টি মাত্র নারীহরণ ঘটিয়াছে, কিন্তু ত্রিপুরায় একটিও নয়।

নোয়াখালির বলপূর্বক নারীহরণের খতিয়ান লইলে সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র দুইটি, কিন্তু ত্রিপুরায় তেমন দুষ্কার্য আদৌ অনুষ্ঠিত হয় নাই। বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ বাঙলার প্রধান মন্ত্রী স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহার মতে ঐ অপরাধ সম্বন্ধে গুরুত্ব প্রদান করা একান্তই অনাবশ্যক; কারণ কি হিন্দু, কি মুসলমান কেহই তেমন ধর্মান্তরিতকরণ মানিয়া লয় নাই। বলা বাহুল্য, মিঃ সুরাবর্দীর প্রদত্ত এই হিসাব সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্টই সন্দেহ আছে। বস্তুত নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় লীগ গুণ্ডাদের হাতে কত নরনারী নিহত হইয়াছে, তাহার সঠিক হিসাব এ পর্যন্ত জানা যায় নাই এবং নারী-হরণ ও নারী-নির্যাতনের অনেক কথাই চাপা রহিয়াছে। যে দুইজন বিচার বিভাগীয় কর্মচারী নারীহরণ এবং নির্যাতন সম্বন্ধে রিপোর্ট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রিপোর্ট সরকার অদ্যাপি লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হন নাই; এই প্রসঙ্গে এ কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকারী কর্মচারীদের প্রদত্ত রিপোর্ট নিরপেক্ষ হইবে, এমন আশা অবশ্য করা যায় না, তথাপি তাহা প্রকাশ করিতেই লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের যেখানে এইরূপ সংকোচ দেখা যায়, সেখানে তাঁহারা নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার সম্বন্ধে সব সত্য সরলভাবে উপস্থিত করিবেন, ইহা কল্পনা করাও ভুল। তাঁহারা নিজেদের ঢাক জোরে বাজাইবার উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গে বিহারের ব্যাপার টানিয়া আনিয়াছেন। যদি তাঁহাদের কিছুমাত্র লজ্জাবোধ থাকিত, তবে তাঁহাবা বুঝিতেন যে, বিহারের ব্যাপার যতই ভয়াবহ হউক না কেন, তাহা কলিকাতা এবং নোয়াখালি ও ত্রিপুরার ব্যাপারের পরের ঘটনা। শুধু তাহাই নহে, বাঙলার লীগ গুণ্ডাদের বীভৎস তাণ্ডবেরই তাহা প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। বাঙলায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জেহাদী জিগীর ছাড়িয়া যদি বর্বর পাশবিকতাকে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া না হইত, তবে বিহারে বিভীষিকার কোন কারণই ঘটিত না। সুতরাং লীগের মতবাদ এবং প্রচারকার্যই যে অশান্তির মূল কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার যত দৌরাত্ম্য লীগের নামেই ঘটিয়াছে এবং লীগের টুপি পরিয়া লীগের নিশান উড়াইয়া পাকিস্থান আনিবার আয়োজনেই বাঙলার বুকে ব্যাপক বিপর্যয় সংসাধিত হইয়াছে। বাঙলার কোমল মাটি নির্দোষের রক্তে ভিজিয়াছে এবং অগণিত মানবাশ্রুতে সিক্ত হইয়াছে। যদি মিঃ সুরাবর্দীর মুসলিম বাঙলার মাথার মুকুট ইহাতে উজ্জ্বল হয়, তবে মনুষ্যত্বের সেখানে স্থান নাই; যদি মুসলিম লীগের গৌরব ইহাতে বাড়ে, তবে লীগের নীতিগত হিংস্রতা ও বর্বরতাই সর্বত্র উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। বিহারের অরাজকতা এবং দৌরাত্ম্যকে আমরা লঘু করি না। হিন্দু কোনদিনই দুর্বল ও অসহায়কে আঘাত সমর্থন করে না এবং নারীর অঙ্গে হস্তক্ষেপের অপরাধ কল্পনা করিতে সে ঘৃণা বোধ করে। বিহারের ব্যাপারে নিন্দা সকলেই করিয়াছেন। জওহরলাল করিয়াছেন, গান্ধী করিয়াছেন, বিহারের প্রধান মন্ত্রী সেদিনও সুতীব্র ভাষায় সেজন্য বিহারবাসীকে ধিক্কার দিয়াছেন; বিহার পরিভ্রমণরত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বারংবার এজন্য বিহারের সমস্ত হিন্দু সমাজকে তিরস্কার করিতেছেন। কিন্তু আমরা একথা বলিবই, বিহারের ব্যাপারের উপর জোর দিয়া এবং সেইভাবে নোয়াখালি ও

ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত অনাচারকে লঘু প্রতিপন্ন করিয়া বাঙলার লীগকে সাংস্কৃতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার মূলে বিদ্বেষ-বুদ্ধিদুষ্ট এবং নিতান্তই দুরভিসন্ধিপূর্ণ কপটতা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার দৌরাত্ম্যকে লঘু করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের যুক্তি মানুষের যুক্তি নয়। বস্তুত সে দৌরাত্ম্যকে তাঁহারা যতই লঘু করিতে প্রয়াসী হউন না কেন, এ-সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় যাহা ঘটিয়াছে, স্মরণাতীত ঐতিহাসিক কালের মধ্যেও বাঙলায় কোনদিন তেমন ব্যাপক অরাজকতা অনুষ্ঠিত হয় নাই। যে গভর্নমেণ্টের শাসনে ইহা সম্ভব হয়, তাঁহাদের সভ্যসমাজে মুখ দেখাইবার স্থান নাই এবং অবিলম্বে তাঁহাদের পদত্যাগ করা উচিত। দুষ্ট শাসন-নীতিতে নিয়ন্ত্রিত ভোটের জোরে বাঙলার লীগ গভর্নমেণ্ট বাঁচিয়া গেলেও তাঁহারা সভ্যসমাজের ধিক্কার হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। তাঁহাদের কুকীর্তির কলঙ্ককর অধ্যায় বাঙলার ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করিয়া রাখিবে এবং লীগের পাকিস্থান পরিকল্পনা-সংশ্লিষ্ট এই অধ্যায় জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের মনে যুগপৎ ঘৃণা ও বিভীষিকার সঞ্চার করিবে।

আপোষের সূত্র কোথায়

মহম্মদ বীন কাশিম স্বল্পসংখ্যক মুসলমান সঙ্গে লইয়া আসিয়া যদি হিন্দুদিগকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধু দেশ অধিকার করিতে পারেন, তবে ভারতের দশ কোটি মুসলমান কেন ত্রিশ কোটি হিন্দুকে জয় করিতে পারিবে না? ভূতপূর্ব রাজা এবং অধুনা মিঃ গজনফর আলী খাঁ কিছুদিন পূর্বে করাচীর এক জনসভায় দম্ভভরে এই কথা বলিয়াছেন। গজনফর আলী শুধু মুসলিম লীগেরই একজন মাতব্বর পুরুষ নহেন, তিনি অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টেরও অন্যতম সদস্য। লীগের নেতারা প্রত্যক্ষভাবেই এইরূপ হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করিতেছেন, অধিকন্তু হিংসাত্মক প্ররোচনাতে মুসলমান সমাজকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছেন। নোয়াখালিতে হিন্দু-দিগকে বয়কট করিবার যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা এই ধরণের প্রচারকার্যেরই পরিণতি। গান্ধীজী সেদিন বিজয়নগরের সভায় এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। হৃদয়ে তীব্র বেদনা লইয়া গান্ধীজীকে এমন কথাও বলিতে হইয়াছে যে, মুসলমানগণ যদি হিন্দুদিগকে তাহাদের শত্রু বলিয়া মনে করে এবং নোয়াখালিতে তাহাদের অবস্থান বর্জন করিতে চায়, তবে মুসলমানদের তেমন কাজ হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমান হইবে এবং তাহার ফল প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে ভয়াবহ হইবে। বলা বাহুল্য, গজনফর আলীর করাচীর উক্তি হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের সদস্য হিসাবে তাঁহার এমন উক্তির মারাত্মকতা আরও বেশী। ইহার দ্বারা ইহাই বোঝা যায় যে, অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের লীগ সদস্যগণ দেশের শান্তি এবং স্বস্তি কামনা করেন না। প্রকৃতপক্ষে দেশের শান্তি-পূর্ণ আবহাওয়া যাহাতে বিপর্যস্ত হয় এবং গণ-পরিষদের কার্য চালানো অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, তাঁহারা গভর্নমেণ্টের সদস্যস্বরূপে থাকিয়া সেই চেষ্টাই করিতেছেন। বস্তুত সুশৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য পরিচালনার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা দেশের সর্বত্র একটা অবাঞ্ছিত এবং অব্যবস্থিত অবস্থা আনয়ন করিতে চাহেন এবং সেই অশান্তি ও অরাজকতার চাপে নিজে-দের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবেন ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। অথচ দেশের শাসনকার্যে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের সদস্যদের সহিত লীগ সদস্যগণ সহযোগিতা করিবেন, এই সর্তেই তাঁহারা অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অবশ্য অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের লীগের সদস্য-গণ শাসনকার্যে বাধাদান করিয়া অসুবিধা সৃষ্টির কথা মুখে স্বীকার করিতেছেন না; কিন্তু কার্যত তাঁহারা যে বাধা দানেই প্রবৃত্ত আছেন, সেদিন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে লীগের পক্ষ হইতে আনীত পণ্ডিত জওহরলাল পরিচালিত বিভাগের বিরুদ্ধ প্রস্তাবেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বস্তুত লীগ করাচীতে গৃহীত সিদ্ধান্তে মন্ত্রিমিশনের সাময়িক এবং স্থায়ী দুই পরিকল্পনাকেই সোজাসুজি বর্জন করিয়াছে, ইহার পরেও লীগের সদস্যদের পক্ষে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে থাকিবার অধিকার আছে কিনা, এই প্রশ্ন স্বভাবতই দেখা দিয়াছে। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের নয় জন কংগ্রেস সদস্য বড়লাটকে সুস্পষ্টভাবে এই প্রশ্নের উত্তর জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। শোনা যায়, ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের উপর এই প্রশ্নের উত্তর এখন নির্ভর করিতেছে এবং তাঁহাদের নিকট প্রশ্নটি উত্থাপিত হইয়াছে। ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল এখন কোন পথ অবলম্বন করিবেন, ইহাই বিচার্য বিষয়। ফলত লীগ মন্ত্রীমিশনের সমগ্র পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে সর্ববিধ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছে। গণ-পরিষদের কাজকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য সে পূর্বেই তাহার ব্রিটিশ মুরুব্বি-দের কাছে আব্দার জানাইয়া রাখিয়াছে; এখন দেশময় অশান্তির আবহাওয়া পাকাইয়া তুলিয়া সে সেই আব্দারের জোর বাড়াইতে চায়। কিন্তু লীগের দুষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার নহে। লীগের দলবল গণপরিষদে যোগদান করুক আর না করুক, গণ-পরিষদ স্বাধীন ভারতের শাসন-তন্ত্র রচনা করিবে এবং পরিষদের সে কার্যে বাধা দানের ক্ষমতা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নাই। ইহা সুস্পষ্ট যে, লীগের দল যোগদান না করাতেও গণ-পরিষদের প্রতিনিধিত্ব-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ দেশের স্বাধীনতাকামীরাই কার্যত এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারী। ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্টের বাধ্যবাধকতা ভারতের স্বাধীনতাকামী-দেরই সঙ্গে এবং যাহারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধতা প্রবৃত্ত তাহাদের সঙ্গে নয়। বস্তুত ব্রিটি[শ] গভর্নমেণ্ট কৃপাপরবশ হইয়া ভারতের স্বাধীন[তা] দান করিতে উদ্যোগী হন নাই। ভারতে[র] স্বাধীনতামূলক আন্দোলনের চাপে পড়ি[য়া] বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে এই পথে আসিতে হইয়াছে। সুতরাং মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে যোগদান না করিলেও পরিষদের কার্যে হস্তক্ষেপের যোগ্যতা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বর্তে না। বিলাতের ‘টাইমস’ পত্র স্পষ্টই স্বীকার করিয়া-ছেন যে, মুসলিম গণ-পরিষদে যোগদান না করিলেও লীগ পরিষদকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া যেরূপ প্রচারকার্য চালাইতেছে, তাহা ভিত্তিহীন, কারণ লীগ ব্যতীত ভারতের সকল সম্প্রদায়ই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। সামন্ত নৃপতিবর্গ সাম্রাজ্যবাদীদের চালে পড়িয়া কিছুদিন বেয়াড়া মনোভাব দেখাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু বোধ হইতেছে, এখন তাঁহাদেরও চোখ খুলিয়াছে এবং তাঁহারা যে গণপরিষদে যোগ-দান করিবেন, এখন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই বলা চলে। পরিষদের পক্ষ হইতে পণ্ডিত নেহরু ও নরেন্দ্রমণ্ডলে[র] চ্যান্সেলারস্বরূপে ভূপালের নবাবের যু[ক্ত] বিবৃতি হইতেই ইহা বোঝা যায়। এরূ[প] অবস্থায় গণ-পরিষদের কার্যের সুপরিচাল[না] এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত[র] দায়িত্ব সম্যকভাবে প্রতিপালন করিতে হইলে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট হইতে লীগের সদস্য-দিগকে অপসারিত করাই সর্বা[গ্রে] প্রয়োজন এবং সেক্ষেত্রে তাহাদের কে[...] ন্যাকামি বরদাস্ত করা উচিত ন[য়।] বিলাতের ‘নিউ স্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশন’ [...] খোলাখুলিই সেই পরামর্শ দিয়াছেন। এট[লী] গভর্নমেণ্ট এই সহজ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবে কিনা আমরা জানি না। এখনও যদি ভার[ত]বর্ষকে স্বাধীনতা না দিবার মতলব তাঁহাদের মাথায় থাকে এবং কূটনীতির প্যাঁচে লীগ[কে] পুরোভাগে রাখিয়া তাঁহারা মধ্যযুগীয় শো[ষণ] এবং পীড়নের হিংস্র ও বর্বর ব্যবস্থা ভা[...]

অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, এই স্বপ্নেই তাঁহারা বিভোর থাকেন, তবে দীর্ঘ পরাধীন জীবনের দুঃসহ ব্যথা হইতে জাগ্রত ভারত প্রয়োজন হইলে শোণিতস্রাবী বিপ্লবের পথে তাঁহাদের সে স্বপ্ন ভাঙিয়া দিতেও দ্বিধা করিবে না।

গান্ধীজীর পরিক্রমা

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বর্তমানে নোয়াখালির নিভৃত অঞ্চলে তপস্যায় নিরত হইয়াছেন। দীর্ঘ যষ্টি ভর করিয়া তিনি পল্লীপথ দিয়া চলিয়াছেন। আর্তের সেবাই তাঁহার একান্ত ব্রত, মৈত্রীই তাঁহার পরম সাধনা। দেহ তাঁহার শীর্ণ; কিন্তু অন্তরে তাঁহার অগ্নিময় প্রেরণা। দীর্ঘ তপস্যার বলে প্রবৃদ্ধ তাঁহার সেই অগ্নিময় অন্তরের শক্তির পরিচয় জগৎ বহু ক্ষেত্রে পাইয়াছে। তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরাধীন ভারতের জীবনধারা বহুবার বৈপ্লবিক গতিতে আবর্তিত হইয়াছে। প্রধানত গান্ধীজীর সাধনা-প্রভাবেই আজ সমগ্র ভারত স্বাধীনতার সংগ্রামে অধৃষ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং সম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবমুক্ত হইয়া সে জাতীয় মুক্তির তোরণ দ্বারে উপনীত হইয়াছে। গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিক্রমাও ভারতের সেই ব্যাপক স্বাধীনতা সংগ্রামেরই একটি অবিভাজ্য অঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যেই অশীতিপ্রায় এই মহামানব সূর্যালোকে ঈষদুষ্ণ নোয়াখালির শিশিরসিক্ত পথ দিয়া চলিয়াছেন। ভেদ-বিরোধ এবং অনৈক্য ভারতের স্বাধীনতার পথ নয়। বস্তুত বিদেশীর তরবারি ভারতের স্বাধীনতার পথে এখন আর অন্তরায় নহে, অনৈক্য এপথে প্রধান বাধা এবং একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মুসলিম লীগের অনুসৃত নীতি নিত্য নূতনভাবে এই বাধা জমাট করিয়া তুলিতেছে। সেদিন বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলিয়াছেন, গান্ধীজীর অনশন সঙ্কল্প ঘোষিত হইবামাত্র বিহারের ব্যাপক অনর্থের আগুন নিভিয়া যায়। বিহারে আজ পূর্ণ শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহার কারণ এই যে, বিহারের মন্ত্রিমণ্ডল সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কিন্তু বাঙলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের শক্তির মূল ভিত্তি সাম্প্রদায়িকতা। বাঙলা দেশে লীগের দল সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের দ্বারা অজ্ঞ জনশ্রেণীকে এমনই বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে হইলে সাম্প্রদায়িকতার নীতি তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতেই হইবে। বাঙলা সরকারের বিভিন্ন নীতিতেই আমরা সে পরিচয় পাইতেছি। বিহারের আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কিত সরকারী নীতি হইতে আরম্ভ করিয়া আসামের ঘরোয়া ব্যাপারে তাঁহাদের হস্তক্ষেপের চেষ্টা, সাম্প্রদায়িক শিক্ষার জন্য বিশেষ বরাদ্দ, স্বতন্ত্র মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ধুয়া, সেই একই কথা। শুনিতেছি, বাঙলা দেশে এইভাবে পর পর সাম্প্রদায়িকতামূলক আইন পাশ করানোই হইবে নাকি লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অন্যতম পরিকল্পনা। কিন্তু ইহা নূতন কিছু নয়। বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ সত্যই বলিয়াছেন, এইরূপ সাম্প্রদায়িক নীতির দ্বারা বাঙলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডল পাকিস্থানকে বিভীষিকার স্থলে পরিণত করিতেছেন এবং বস্তুত তাঁহারা পাকিস্থানের সমাধিক্ষেত্রই রচনা করিতেছেন। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের প্রশ্রয়ে পুষ্ট দলীয় স্বার্থের দৃষ্টিতে অন্ধ নেতৃত্বাভিমানীদের প্রভাব হইতে ভারতের রাজনীতিক সাধনাকে মুক্ত রাখিবার জন্যই গান্ধীজীর প্রাণপাতী সঙ্কল্পে অশেষ বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও নোয়াখালির এই প্রব্রজ্যা। রাজনীতি ইহার প্রত্যক্ষ না হইলেও রাজনীতি ইহার পরোক্ষ ফল এবং তাহা সর্বজনীন মঙ্গলেরই পরিপোষক। বাঙলার আইন সভার সাম্প্রতিক বিতর্কে লীগের প্রতিনিধিদলের অনেকে গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিক্রমার মঙ্গলকর প্রভাবের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইঁহাদের কেহ কেহ হয়ত মনের কথা অন্তত লোকসমাজে চক্ষুলজ্জার দায়ে মুখে বলিয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু কেহ কেহ সাম্প্রদায়িকতার তীব্র উত্তেজনাকে চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। তাঁহারা গান্ধীজীর ন্যায় মহামানবকেও গ্লানিসূচক ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। এইভাবে মহতের অপভাষণে তাঁহাদের নিজেদের প্রবৃত্তিরই তাঁহারা পরিচয় দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের আক্রমণ গান্ধীজীর ন্যায় মহামানবকে স্পর্শও করিবে না; পক্ষান্তরে তাঁহার মহিমা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে। বাঙলার সংস্কৃতির মূলীভূত ঐক্য, প্রেম এবং জাতীয় সংহতির উদার সত্যের অনুভূতিকেই গান্ধীজী কঠোর তপস্যায় জাগ্রত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই সূর্যের প্রখর আলোকে অতীতের ন্যায় দূর ভবিষ্যতেও বাঙলার অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং স্বাধীন ভারতে যৌবন-গরিমাদীপ্ত নবজীবনের উদ্বোধন ঘটিবে। এই আশা অন্তরে লইয়া আমরা ভারতের মহামানবের পল্লী-পরিক্রমা শ্রদ্ধার সহিত লক্ষ্য করিতেছি।

হক সাহেবের ব্যথা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নোয়াখালি এবং চাঁদপুর সম্পর্কিত বিতর্কে মৌলবী ফজলুল হকের বক্তৃতায় বোঝা যায়, হক সাহেব এবার নূতন ভঙ্গী ধরিয়াছেন। মিঃ সুরাবর্দী এবং তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা করিতে পারেন নাই, হক সাহেব একথা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সেই স্বীকৃতিকে সাম্প্রদায়িকতার পথে ঘুরাইয়া নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করাই তাঁহার মতলব। হক সাহেব নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় মুসলমানদের উপর পুলিশ ও সেনাদের অত্যাচারের অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, নির্বাচনী প্রচারকার্যেরই ইহা একটা চাল। ইহার মূলে কোন সত্য নাই। মিঃ সুরাবর্দীও এই চাল কাটাইবার কৌশল না জানেন, ইহা নয়। ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার নিজের বক্তৃতায় তিনি নিজেও এই সুর ভাঁজিয়া লইয়াছেন এবং নোয়াখালি ও ত্রিপুরার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নির্দোষ লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করিতেছে, আর সেইভাবে তাহাদিগকে জেলে পাঠাইতেছে, এমন অভিযোগ তিনিও করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার অনুষ্ঠিত ব্যাপক অপরাধকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যেই সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর পুলিশ জুলুমের এই সব কথা উত্থাপন করা হইতেছে এবং লীগের দুই দলের প্রত্যেকে লীগ নীতিতে বিভ্রান্ত সাম্প্রদায়িকতান্ধ লোকদের উপর নিজের প্রভাব বজায় রাখিবার দুরভিসন্ধিতে এই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হইতেছেন। তাঁহাদের দুই দলের মধ্যে কোন দল কতটা হিন্দু-বিদ্বেষী ইহা প্রতিপন্ন করিতে আড়াআড়ি আরম্ভ হইয়াছে। এমন হী[ন] স্বার্থ-সংগ্রামে এই বৃদ্ধ বয়সেও হক সাহে[ব] সর্বজনীন সংস্কৃতির ভিত্তি ছাড়িয়া সঙ্কী[র্ণ] সাম্প্রদায়িকতার ফাঁদে পতিত হইয়াছেন দেখি[য়া] আমরা দুঃখবোধ করিতেছি। সাম্প্রদায়ি[ক] স্বার্থের ধুয়া তুলিয়া তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির নিষ্ঠুর খেলাতেই প্রমত্ত হইয়াছেন এ[বং] তাঁহাদের সেই পাপে বাঙলার সর্বনাশ ঘটি[য়া] চলিয়াছে।

পরলোকে ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বি[ক] এবং সাহিত্যিক ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশা[লী] পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঙলার সংস্কৃ[তি] ক্ষেত্রে ভট্টশালী মহাশয়ের অবদান সাম[ান্য] নহে। ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা তিনি বাঙলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বাঙলার সংস্কৃতির সাধনাকেই তিনি জীবনের মুখ্য ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙলা দেশ একজন মনস্বী সন্তানকে হারাইল। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের গভী[র] সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।



"যারে মাঝে পেয়ে কাজিয়া থামায়ে হিন্দু ও মোসলেম,
'আত্মদমন স্বরাজ' সবাই জুড়ে পরম প্রেম,
তার আগমনী গা-রে ও খেয়ালী! গৌড়বঙ্গময়,
গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধীর গাহ জয়।"

গান্ধী প্যারাডক্স

কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশে যে পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন এসেছিল অন্যতম সভ্য মিঃ নিকলসন্ গান্ধীজীর গ সাক্ষাতের পরে বলেছিলেন যে, একদিকে ধীজীর চেহারা আর পোষাক—অপর দিকে ধীজীর মুখের ইংরেজী—এ দুটো নসের মধ্যে আমি কোনই সামঞ্জস্য খুঁজে াইনি। অর্থাৎ মুণ্ডিত মস্তক, পেটে টির প্রলেপ লাগানো একটি অর্ধনগ্ন ব্যক্তির খ থেকে যে এমন অত্যাশ্চর্য ইংরেজি রোতে পারে, তাই দেখে তিনি অবাক হয়ে য়েছিলেন। ইংরেজী ভাষার উপরে তাঁর দ্ভুত দখলের কথা লুই ফিশারও বলেছেন। থচ সেই গান্ধীজী পারতপক্ষে ইংরেজী লেন না, বরং বলেন ইংরেজী বলা মহাপাপ। তনি হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করেন, সে বক্তৃতার রো আনা আমি বুঝতে পারিনে। আপনারাও খুব বেশি বোঝেন এমন আমি মনে করি া। গান্ধীজী বৃথা বাক্য ব্যয় করে কখনো ক্তি ক্ষয় করেন না, এমন কি এজন্য সপ্তাহে কদিন মৌনাবলম্বন করেন। কিন্তু রাষ্ট্র-াষার দৌলতে তাঁকে কতখানি বাক্য এবং ক্তি বৃথা ব্যয় করতে হয় তা ভেবে আমি িস্মিত হই।

গান্ধীজীর চরিত্রে এরকম আপাত-রোধী ব্যাপার বহু আছে, অসাধারণ ব্যক্তি াত্রেরই এরূপ হতে বাধ্য। আমরা সাদাসিধে াধারণ মানুষ। মুখে যা বলি কাজে তাই রি, বোধ করি সেই জন্যেই আমরা সাধারণ। াঁরা অসাধারণ তাঁরা মুখে এক কাজে আর। র্থাৎ তাঁদের কথায় এবং কাজে মিল থাকলেও টা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির গোচর নয়। জন্যই যে মহাত্মাজী বলতে গেলে সরলতার তিমূর্তি তাঁর জীবন বাস্তবিক পক্ষে টিলতায় পূর্ণ।

গান্ধীজী ব্যারিস্টার মানুষ। অবশ্যি সেটা খন ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় হয়ে ড়েছে। গান্ধীজী বিদেশে গিয়ে যেটুকু লিতি রং মেখে এসেছিলেন, সেটা দেশে সে তেরাত্রিও টেকেনি। এখন তাঁর পোষাক বং চেহারা দেখলে কে বলবে তিনি ব্যারিস্টার নুষ। ব্যারিস্টার সাহেবেরা বোধ করি তাঁকে ারিস্টারকুলকলঙ্ক বলে গাল দিয়ে থাকেন। মিট্ রায়ের পোষাক বর্ণনা করতে গিয়ে বীন্দ্রনাথ বলেছেন, ঐ'কে ঠিক সাজ বলব না, হচ্ছে ওর এক রকমের উচ্চ হাসি। ব্যারিস্টার



অমিট্ রায়ের সঙ্গে গান্ধীজীর এক জায়গায় মিল আছে। দুজনেরই ট্যাক ঘড়ি কোমর থেকে ঝুলেছে, যদিচ গান্ধীজীর ঘড়িটা বৃন্দাবনী ছিটের থলিতে গোঁজা নয়। কিন্তু সবটা মিলিয়ে গান্ধীজীর পোষাকটাও তাঁর এক ধরণের অট্টহাসি।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গান্ধীজী আমাদের যে অস্ত্রটি দিয়েছেন সেটির নাম অহিংসা। এটি হচ্ছে গান্ধীজীর আর একটি প্যারাডক্স। অহিংস ব্যক্তি হয়েও তিনি অস্ত্র ধারণ করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন অহিংস সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামের তিনি হলেন প্রধান সেনাপতি। একবার তিনি নিজেকে জেনারেলিসিমো আখ্যা দিয়েছিলেন। তাতে স্টেটসম্যান পত্রিকা উষ্মা প্রকাশ করে বলেছিলেন গান্ধী অহিংসার উপাসক বটে, কিন্তু তাঁর ভাষা অত্যন্ত মিলিটারী ধরণের। গান্ধী চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্যারাডক্সটি এঁরা বুঝতে পারেননি বলেই অমন বোকার মতো কথা বলেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রভুত্ব করতে এসে ইংরেজ চরিত্রের যথেষ্ট অধোগতি হয়েছে। কিন্তু তারা যে তাদের sense of humour-ও হারিয়ে ফেলেছে সেটাই সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার।

গান্ধীজী যথার্থই অহিংস ব্যক্তি। মানব হিতার্থে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন, প্রত্যেকটি মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁর ব্যাকুলতার অন্ত নেই, অথচ সেই গান্ধী যখন তাঁর অহিংস সংগ্রাম শুরু করেন, তখন সহস্র সহস্র ব্যক্তির দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। কত লোক কারাগারে রুদ্ধ হয়, কত লোক লাঠির আঘাতে আহত, কত লোক পুলিশের গুলীতে নিহত হয়। যিনি কোন মানুষের অনিষ্ট চিন্তা কোনকালে করেন না, তাঁর কার্যের ফলে এমন মহামারী ব্যাপার কেমন করে হয়? এটিও গান্ধী-চরিত্রের এক প্যারাডক্স: কিন্তু আর সব প্যারাডক্সের মতো এটিও অস্বাভাবিক নয়। যে বিধাতা একদিকে সৃষ্টি এবং স্থিতির দেবতা, সেই বিধাতাই আবার প্রলয় সংঘটন করে থাকেন। অহিংসার যিনি পূজারী তাঁরও রুদ্রমূর্তি তাঁরও সংহার-মূর্তি আছে।

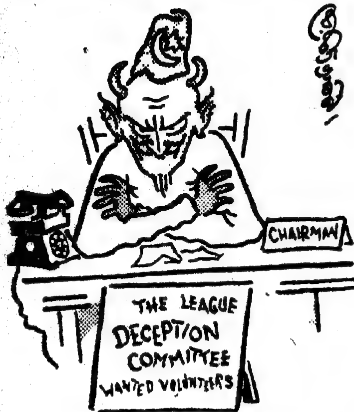
এ পর্যন্ত গান্ধী-চরিত্রের এই আপাত-বিরোধিতা আমি এক রকম বুঝেছি, কিন্তু একটি ব্যাপারে তাঁর কথায় এবং কাজে সত্যিকারের বিরোধ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এটা যান্ত্রিক যুগ। গান্ধীজী যন্ত্র বিরোধী। তাঁর মতে যন্ত্রই এ যুগের সকল যন্ত্রণার মূলে। যন্ত্রকে তিনি শয়তান আখ্যা দিয়েছেন। অথচ এ-যুগের যন্ত্রপাতি তিনি যে পরিমাণে ব্যবহার করেন এমন আর কেউ করে না। তিনি ভারতবর্ষের সবচেয়ে widely travelled man এবং সে ভ্রমণ তাকে রেলে স্টীমারে মোটরেই করতে হয়। একমাত্র এরোপ্লেনে তিনি আজ পর্যন্ত ভ্রমণ করেননি। তবে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য আমাদের নেতৃবর্গ এরোপ্লেনে চড়ে সকালে এসে বিকেলে ফিরে যান। এই এরোপ্নে ব্যবহার প্রকারান্তরে তিনিই করছেন। আমাদের মতো সাধারণ ব্যক্তিরা জীবনে যতবার টেলিগ্রাফ কিম্বা টেলিফোন যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি, ততবার বোধ করি তিনি প্রতিদিন করে থাকেন; আর তাঁর মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁর সহকর্মীরা ততোধিক ব্যবহার করেন। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করতে হলেই তাঁকে মাইক ব্যবহার করতে হয়। তাঁর হরিজন পত্রিকা বিভিন্ন ভাষায় প্রতি সপ্তাহে অন্তত এক লক্ষ কপি বিক্রি হয়। বলা বাহুল্য সে পত্রিকাটি হস্তলিখিত নয়। প্রতিদিনের খবরের কাগজে তিনি যতখানি জায়গা জুড়ে থাকেন পৃথিবীতে আর কোন ব্যক্তি ততখানি নয়। মুদ্রাযন্ত্রের কাছে তাঁর ঋণ অসীম। তাঁর লক্ষ লক্ষ ফটোগ্রাফ দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলিও কিছু মন্ত্রবলে সিদ্ধ হয় না। এমন কি তিনি যে চরকা মন্ত্র জপ করেন, সেটিও একটি যন্ত্র, হস্তচালিত হলেও যন্ত্র। আমি উপরে যে সব যন্ত্রের উল্লেখ করেছি, সে সব যন্ত্র না থাকলে গান্ধীজীর কি যন্ত্রণাই হত একবার ভেবে দেখুন। নোয়াখালিতে পদব্রজে চলতে গিয়ে পায়ে ফোস্কা পড়েছে, মাইকহীন মিটিং-এ বক্তৃতা করতে গিয়ে গলা ভাঙছে। মুদ্রাযন্ত্রহীন সংসারে গান্ধীজীর কি দুর্দশা ঘটত তাই ভেবে আমার বিষম আতঙ্ক হয়। গান্ধীজী তো মহাপুরুষ। ছাপাখানা না থাকলে আমার মতো কাপুরুষটি তার মনের আতঙ্ক আপনাদের কাছে কেমন করে প্রকাশ করত বলুন দেখি।

করাচীতে মুসলিম লীগ যে প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন, তাহাতে নাকি তিন হাজার শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ কথা পূর্ণ না হইলে বৃহৎ কর্ম সম্পন্ন হয় না; সুতরাং অনুমান করিতেছি, এখনও ঢের দেরী।

* * * * *

লীগ অনেক গবেষণার পর আবিষ্কার করিয়াছেন—

"The Congress has again attempted to deceive the British Government, the Muslim League and public opinion."



খুড়ো বলিলেন—Parity বজায় রাখিতে কংগ্রেসের অনুকরণে লোক ঠকাইবার চেষ্টা করিলেই ত আর গাত্রদাহের কারণ থাকে না!

* * * * *

ডাঃ কিচলু বলিয়াছেন—Mr. Jinnah has again missed the Bus'—খুড়ো বলিলেন—'সুতরাং পরের বাস্ ধরিতে ঢের দেরী, আর ধরিলেও আসিতে হইবে বাদুড়-ঝোলা হইয়া!'

* * * * *

পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক ব্যাপার-প্রসঙ্গে মিঃ জিন্না বলিয়াছেন — 'Punjab Government have chloroformed the Press'—খুড়ো বলিলেন—'আমরাও পাঞ্জাব সরকারের আচরণের প্রতিবাদ করিতেছি। ব্যাপারটা নেহাৎ মিছিল বা তামাসা Major Operation নয়, সুতরাং ক্লোরোফরমের কি প্রয়োজন ছিল।'

* * * * *

বিলাতের জনসাধারণের আর্থিক অসচ্ছলতা আর হইবে না বলিয়া ডাঃ ডালটন তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন—

"As a chancellor of the Exchequer I have always been asked to put my hand in your pocket to finance some one or other in some other part of the world."—



'কিন্তু অতঃপর পৃথিবীর অন্য কোথাও অন্যদের পকেটে হাত দিবার পরিকল্পনা তিনি করিতেছেন কিনা, সেই কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই'—কথাটা খুড়োর।

* * * * *

ভারতের পাওনা ঋণ পরিশোধের প্রসঙ্গে মিঃ চার্চিল কমন্স সভায় বলেন—'ভারত সরকারকে একথা কি জানানো হয় নাই যে, ভারতের কাছেও বৃটেনের পাল্টা পাওনা আছে। যুদ্ধের সময় বিদেশীর আক্রমণ হইতে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বৃটেন অনেক কিছু করিয়াছেন!' —কথাটা শুনিয়া ডাঃ ডালটন বলেন—'হয়ত হবে, I cannot charge my memory'—খুড়ো বলেন—আমাদেরও memory charge করার প্রয়োজন নাই, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার কথাটা নূতন শুনিলেও 'ভারত রক্ষার' কথা আমাদের বেশ মনে আছে।

* * * * *

কংগ্রেস এবং লীগ পরস্পর কলহ করিলে কিছুতেই তাঁরা স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন না'—বলেন মহাত্মা।



'কিন্তু লীগ স্বাধীনতার পথেই অগ্রসর হইতে চাহিতেছেন, একথাই বা মহাত্মাজীকে কে বলিল?'—প্রশ্নটা খুড়োর।

* * * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, অন্তর্বর্তী সরকার নাকি Rubber সম্বন্ধে ভাবিতেছেন। শ্যাম কথাটা ঘুরাইয়া বলিল—'ভাবিলেই Rubber নেওয়া যায় না, হাতে ভাল তাস্ আসা চাই, তারপর চাই পার্টনারের সহযোগিতা!'

* * * * *

দিল্লীর শিক্ষকদের ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে। সংবাদদাতা বলিতেছেন—'All the demands made by them



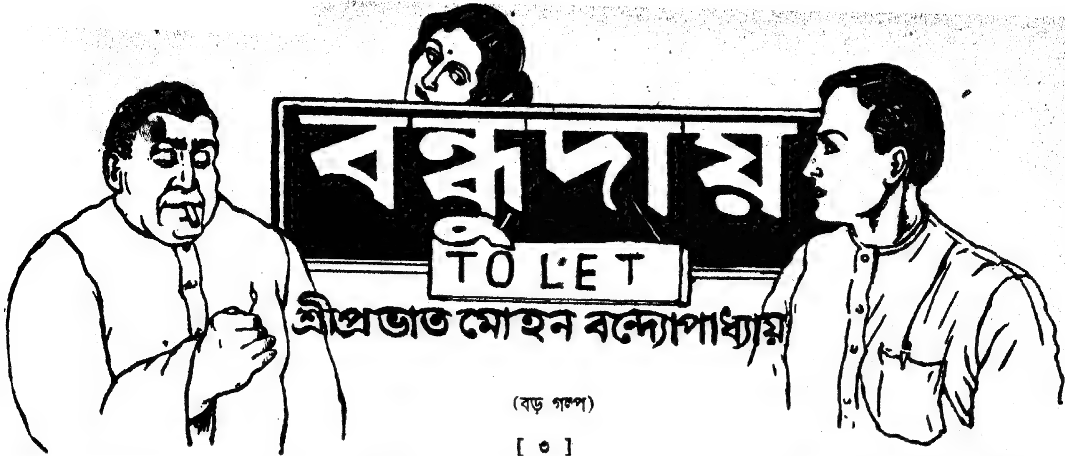
were met'— 'অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের আদেশে শেষ পর্যন্ত kneel down হইতে বাধ্য হইয়াছেন'—বলেন খুড়ো।

* * * * *

ট্রামের ধর্মঘট-প্রসঙ্গে জনৈক পত্রপ্রেরক বলিতেছেন—'না-ই বা থাকিল ট্রাম; ছয়-সাত মাইল রাস্তা হাঁটিয়া অফিস করা এমন কিছু শক্ত নয়, বরং এই অভ্যাসে স্বাস্থ্যও ভাল হয়।' খুড়ো বলিলেন—'শুধু তাই নয়, সাত মাইল হাঁটিয়া সময়মত অফিস ধরিতে হইলে খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলাটাও থাকে না এবং উপবাসে স্বাস্থ্য আরও ভাল হইয়া উঠে; সুতরাং এক ডাক্তার ছাড়া এই সার্বজনীন স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থায় কাহারও আপত্তি থাকার কথা নয়!'

* * * * *

আমেরিকাতে Telivision Set-এ খেলাধুলা দেখাইবার ব্যবস্থা নাকি করা হইতেছে—তাতে আর মাঠে যাইবার প্রয়োজন নাই, বাড়ি বসিয়াই খেলা দেখা যাইবে। একদল এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন—আমরাও ইহার পক্ষপাতী নই। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যদি খিস্তিই না করিতে পারিলাম, যদি ছাতা-জুতাই উড়াইতে না পারিলাম (ফুটবলে), আর শাড়ি আর সুট-ই যদি দর্শককে দেখাইতে না পারিলাম (ক্রিকেটে) তবে আর খেলা দেখার কী মানে হইল?



(বড় গল্প)

[৩]

সেদিন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে একটা পাইস হোটেলে খাইয়া সারা বিকালটা সুমন্ত্র বাড়ির সন্ধানে ফিরিল। গাটা বাড়ির সম্বন্ধে হতাশ হইয়া সে বিবেকানন্দ রোড, মাণিকতলা স্ট্রীট প্রভৃতি রাস্তায় কয়েকটা ফ্ল্যাটও দেখিল। মাণিকতলা পারে একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে দোতলায় একটি মনের মত ফ্ল্যাট পাওয়া গেল। নূতন বাড়ি, দক্ষিণ খোলা; দরোয়ানজী সাক্ষ্য দিল, বাড়িতে কাহারও রেডিয়ো নাই। ভাড়া বাহান্ন টাকা। এস্টিমেট ছাড়াইয়া যায়, তা' যাক্, ভদ্রেশ্বর তাহাতে কিছু মনে করিবে না। একমাত্র সিঁড়ি ছাড়া অন্য কোথাও কাহারও সহিত কোনো যোগ থাকিবে না, কবির কাব্যরচনার ব্যাঘাত হইবে না। তখন রাত্রি নয়টা; সুমন্ত্র স্থির করিল বাড়িওয়ালার সহিত দেখা করিয়া কালই পাকা কথা কহিবে। বাহির হইয়া আসিবে, এমন সময় মাথার উপর দুম দুম করিয়া শব্দ আরম্ভ হইল। সুমন্ত্র কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই পাশের ফ্ল্যাট হইতে কে চীৎকার করিয়া বলিল "আপনি কি মনে করেছেন বলুন তো? রোজ মাঝ রাত্তিরে মাথার ওপর কয়লা ভাঙবেন?" উপরের জানালা হইতে উত্তর আসিল "কি করি বলুন, ছুটি পাই রাত সাড়ে আটটায়। মনিবকে ব'লে ছুটিটা সকাল সকাল করিয়ে দিন না।" পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক হাঁকিলেন "ওসব কোনো কথা শুনতে চাই না, থামবেন কি না বলুন!" এ প্রশ্নের উত্তরে আবার দ্বিগুণ বেগে দুম্ দুম্ শব্দ আসিতে লাগিল পাশের ফ্ল্যাট হইতে হুঙ্কার শোনা গেল "সহ্যেরও একটা সীমা আছে! ভদ্রতা রেখে আর চ'লল না! বলি, মশাই শুনচেন? আজ শেষ ওয়ার্নিং দিচ্ছি আপনাকে, থামবেন তো থামুন,—না হ'লে"—উপর হইতে ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে জবাব আসিল, "না হ'লে কি করবেন? মাথাটা কেটে ফেলবেন নাকি? ওঃ থাকেন তো পায়েরতলায়, মেজাজ দ্যাখো না! আমি নিজের ঘরে ব'সে যা ইচ্ছে ক'রব, তাতে আপনার কি?" "নাঃ, ভালো কথায় হ'বে না দেখছি। ঘাড় ধ'রে বাড়ি থেকে বা'র করে না দিলে চলছে না। যতসব কয়লার কুলি এসে জুটেছে ভদ্দরলোকের পাড়ায়।" এতক্ষণ উপরতলার কণ্ঠস্বর নীচের তলার হুঙ্কারের চেয়ে এক পর্দা নীচে ছিল, এইবার তাহাকে ছাড়াইয়া দুই পর্দা উঠিল। "কোনো শালার ধার ধারি না, কারোর বাবার চাকর নই। ওপরে উঠে আসুন না মশাই, কে কাকে বার করে দেয় দেখে নিই। ওরে আমার ভদ্দরলোক রে? বলে 'আধ পয়সার পিড়িংশাক, যেমন মুরোদ তেমনি থাক।' ভদ্দরলোক তো আলাদা বাড়িভাড়া ক'রে থাকোগে যাও না চাঁদ! শালার আস্পর্ধা দেখেছ,—"বলে কি না ঘাড় ধ'রে বার করব?" পাশের ফ্ল্যাটের হুঙ্কার আরও এক পর্দা চড়িল, "দেখুন শালা শালা করবেন না বলছি, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দে'ব!" "ওরে আমার জুতাওলারে! বাপের জন্মে জুতো দেখেছ?" চারিদিকের বিভিন্ন ফ্ল্যাট হইতে উভয়পক্ষের সমর্থনে নানারূপ মন্তব্য শোনা গেল। সুমন্ত্র দারোয়ানকে বলিল, "তোমরা কিছু বলো না? এরকম ক'রে কয়লা ভাঙলে বাড়ি জখম হবে যে।" দরোয়ান বলিল "কেউ সবেরে ভাঙবে কেউ সন্ধ্যাতে ভাঙবে, কাকে কি বোলা যায়? আওয়াজ তো সারাদিন হোতেই করে। ফেল্যাটকা দস্তুর এ হি বাবুজী। বড়বাবুর হুকুম, 'কাউকে কুছু বলবে না।"

অগত্যা সে বাড়িও চলিল না।

মধ্যে আর একটি দিন, পরদিন বিকালে ভদ্রেশ্বরের আসিবার কথা। সেদিন সকাল হইতে সুমন্ত্র দ্বিগুণ উৎসাহে খোঁজ-খবর আরম্ভ করিল এবং একে একে পাঁচটা বাড়ি দেখিল। কোথাও তাহার বনিল না, কোথাও বাড়িওয়ালার ভাড়াটে পছন্দ হইল না। বেলা বারোটা নাগাদ সে একরূপ হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। ডি এল রায় স্ট্রীট ও চালতা বাগান দিয়া শর্টকাট করিবার অভিপ্রায়ে সে বড়ো রাস্তা ছাড়িয়া গলির পথ ধরিল। শেষের বাড়িটাতে বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মেজাজটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, চলিতে চলিতে নিজের মনে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বাড়িভাড়া করা নয়তো, গেরোর ভোগ! ব'লে দে'ব, আমার দ্বারা হ'ল না। এর চেয়ে ইনসিয়োরেন্সের দালালী ভালো ছিল।"

সহসা পাশ হইতে একটি যুবক বলিল, "বাড়ি খুঁজছেন? দেখুন তো, ঐ গ্যাস-পোস্টের সামনের বাড়িটা বোধ হয় ভাড়া আছে।"

সুমন্ত্র বাড়ির দরজায় গিয়া দুই তিনবার কড়া নাড়িল, কেহ সাড়া দিল না। সুমন্ত্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বেয়ারা!" সাড়া নাই।" "ঠাকুর, অ, ঠাকুর!" সাড়া নাই। "ঝি,—অ ঝি?"

ভিতরে একতলায় কোথায় কে একজন বালতি বালতি জল ঢালিতেছে, সাড়া দেয় না কেন? বাড়িশুদ্ধ সবাই বোবা কালা নাকি? সুমন্ত্র দ্বিগুণ বিক্রমে হাঁকিল, "ঝি, অ—ঝিইই!"

এইবার মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। উপরতলা হইতে কে বলিল, "উদাসী, দরজাটা খুলে দাও না ভদ্রলোক কখন থেকে ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছ না?" তাহার উত্তরে নীচের তলা হইতে কে বলিল, "উদাসী দাদা ঘুমোলে ডাকাত পড়লেও উঠবে না, মা! আমার হ'য়ে গেছে, যাচ্ছি। ভদ্দরলোক আর কে এমন সময় আসবে, বোধ হয় পাড়ার কোনো দুষ্টু ছেলে।" বলিতে বলিতে বছর-কুড়ি-একুশ বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। মেয়েটি হঠাৎ সুমন্ত্রকে দেখিবে বলিয়া যে প্রস্তুত ছিল না। তাহার এক হাতে একখানি লাল গামছা ও একটি কাঁচকড়ার সাবানদানি, কাপড়জামা একটু আলুথালু। তাহার মাথার চুলে তখনও জল ঝরিতেছে, মুখে, হাতে পায়ে ইতস্তত সংলগ্ন শত শত শুভ্র জলকণা তাহার সদ্যস্নাত স্নিগ্ধ তনুদেহখানিকে এক

অনির্বচনীয় মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে! সুমন্ত্রও ঠিক এইরূপ একটি দৃশ্য এই পাড়ায় এবং এই সময়ে দেখিবে বলিয়া বোধকরি আশা করে নাই, সে সসম্ভ্রমে এক পা পিছাইয়া আসিল। মেয়েটি সাবানদানি ও গামছাশুদ্ধ হাত দুইটি কোনোরকমে কপালের কাছাকাছি তুলিয়া নমস্কার করিল। বলিল "কি চান?" সুমন্ত্র থতমত খাইয়া প্রতি নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেল, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আপনারা কি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?"

মেয়েটির আরক্তমুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়াই মিলাইয়া গেল, সে বৈঠকখানার শিকলটা খুলিয়া দিয়া বলিল, "আপনি বসুন, আমি মা'কে ডেকে দিচ্ছি।"

সুমন্ত্র বসিল। নারীর কেশসৌরভ অথবা দেহসৌরভ—অর্থাৎ 'নবপুষ্পল' অথবা 'খস্ খস্' সাবান,—কোনটির মোহিনীশক্তি ঠিক দুপুরবেলায় ক্ষুধার্ত অবিবাহিত পুরুষের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই, কিন্তু সুমন্ত্র অভিভূতের মতো কিছুক্ষণ যে বসিয়াছিল একথা ঠিক। তাহার কি মাথা খারাপ হইয়া গেল? কালিদাস, সেক্সপীয়র, চণ্ডীদাস রবীন্দ্রনাথ সকলে হঠাৎ অসময়ে মগজের মধ্যে উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন কেন? সহসা বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ।" ঠিক কথা, কিন্তু দুপুর রৌদ্রে এই শুঁড়িপাড়ার গলিতে? নাঃ, এ চোখের নেশা। সুমন্ত্র সামলাইয়া উঠিল। মিনিট দুয়েক পরেই সে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার,—অর্থাৎ বৈঠকখানা ঘরের সুরুচি-সম্মত গৃহসজ্জার,—তদারক করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মাঝখানে একটি কাশ্মীরী গোলটেবিলে মুরাদাবাদী ফুল দানিতে রজনীগন্ধার কয়েকটি শুভ্র পুষ্প-দণ্ড মৃদু সৌরভ বিতরণ করিতেছে। তাহার চারপাশে শুভ্র আস্তরণে ঢাকা চারটি ঈষদুচ্চ জলচৌকি। দেওয়ালের গায়ে গায়ে তিনদিকে তিনটি এককোমর উঁচু বইয়ের র‍্যাক। আর দেখিবার সময় হইল না, দোতলা হইতে ডাক শুনিয়া পাশের বাড়ির একটি দশ বারো বছরের ছেলে কিছু পূর্বে এ-বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল, সে আসিয়া বলিল, "মাসিমা এসেছেন।" সুমন্ত্র বুঝিল, পুরুষ অভি-ভাবকের অভাবে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গেই কথ কহিতে হইবে। অগত্যা সে তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াই রহিল। পরক্ষণেই ভদ্রমহিলা দ্বারের পাশ হইতে বলিলেন, "ওঁকে ব'সতে বল্, আমি এখান থেকেই কথা ব'লব।" সুমন্ত্র বসিল। "ওঁর নামটা জিজ্ঞেস করতো?" পাশের বাড়ির ছেলেটি প্রশ্ন করিল "আপনার নাম?" "শ্রীসুমন্ত্র সেন।" দরজার পাশ হইতে আবার অনুচ্চস্বরে প্রশ্ন আসিল "জিজ্ঞেসা কর, পড়াশোনা কতদূর করেছেন?" সুমন্ত্র বলিল "এম, এ দিয়েছিলুম বছর পাঁচেক আগে, ল' পাশ করেছি তার পরের বছর।" প্রশ্ন হইল "আপনাদের বাড়ি?" "আপাতত ক'লকাতাতেই, আগে বর্ধমান জেলায় ছিল।" "বাড়িতে কে কে আছেন?" "বাবা, মা মারা গেছেন। একটি বোন, তার বিয়ে হয়েছে এলাহাবাদে।" "কলকাতায় নিজেদের বাড়ি, না, ভাড়া?" সুমন্ত্র বলিল "আমার নিজের বাড়িই আছে। উপস্থিত আমার এক বন্ধুর জন্য একটা ভাড়া বাড়ি দরকার।" দরজার পাশে কিছুক্ষণ কোনো কথা শোনা গেল না, ছেলেটি মধ্যস্থ থাকার কোনও প্রয়োজন না দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে সরিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে আবার প্রশ্ন হইল "কি রকম চান?" সুমন্ত্র বলিল "আগে তো দেখি। পছন্দ হ'লে টাকার জন্য আটকাবে না।" ভদ্রমহিলা আবার প্রশ্ন করিলেন "অভিভাবক কে? কার সঙ্গে কথা কইতে হবে? আপনি দেখলেই হবে, না আর কেউ দেখবেন?" সুমন্ত্র বলিল, "আমি দেখলেই হবে।" ভদ্রমহিলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কি গোত্র?" "ধন্বন্তরি।" ভদ্রমহিলা অনুচ্চস্বরে স্বগতোক্তি করিলেন "ভালোই হয়েছে, আমরা শক্তি-গোত্র।" পরে উচ্চতরকণ্ঠে বলিলেন, "আপনাদের দেশ কোথায় ছিল শুনেছেন? কোথাকার সেন আপনারা?"

সুমন্ত্র বলিলেন, "প্রপিতামহের বাবা সেনহাটি থেকে এসেছিলেন শুনেছি। তারপর বালি, বর্ধমান"—ভদ্রমহিলা আবার স্বগতোক্তি করিলেন "সেনহাটির সেনগুপ্ত আর 'কালিয়া'র দাশগুপ্ত। ভালোই হবে। আপনি একটু বসুন। বড় অসময়ে এসেছেন, বাড়িতে এক বুড়ো চাকর ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ মানুষ নেই। আমার এক দূরসম্পর্কের ননদাই অবশ্য মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেন। আমাদের পক্ষ থেকে অভিভাবক এখন তিনিই ব'লতে গেলে। আমার দাদারা থাকেন লাহোরে, দু'দশ বছর অন্তর একবার দেশে আসেন। 'আচ্ছা, আমি এখনি আসছি, একটু অপেক্ষা করুন।"

বলিতে বলিতে ভদ্রমহিলা দরজার পাশ হইতে সরিয়া গেলেন। সুমন্ত্রর মনের মধ্যে কি যেন একটা সন্দেহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল, কোথায় যেন কি একটা গুরুতর ভুল হইয়াছে। এ কি রে বাবা? বাড়ি দেখিব, তাহার জন্য এত গোত্রকুলের পরিচয় কেন? হঠাৎ খোলা জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়িল গলির অপর পারে সামনের বাড়ির বারান্দা হইতে একটুকরা সাদা কার্ডবোর্ড ঝুলিতেছে, তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'টু লেট'। তাহা হইলে সে কি ভুল করিয়া অন্য বাড়িতে ঢুকিয়াছে? কি সর্বনাশ! সহসা একটা বুককেয়াকের উপর সেদিনকার আনন্দবাজার খানা চোখে পড়িল। কাগজখানা খুলিতে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের তালিকার মধ্যে লা পেন্সিলের দাগ দে[...] কয়েকছত্র তাহার দৃ আকর্ষণ করিল। সে রুদ্ধনিশ্বাসে পড়িল স্বাস্থ্যবান, সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র পাত্র চাই। পাত্রী বৈদ্য, শক্তি-গোত্র, দর্শনে বি, এ; সুন্দরী সঙ্গীতজ্ঞা, রন্ধন ও গৃহকর্মনিপুণা কলিকাতায় বাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি উত্তরাধিকারিণী। সকালে বা সন্ধ্যায় পাত্র স্বয়ং আসিলে ভালো হয়। পোস্ট বক্স নং .... আনন্দবাজার।" বহু অনুসন্ধানেও চালতা বাগানে কোনো বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন পাওয়া গেল না।

সুমন্ত্রর মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, সে যেন ভাবিবার শক্তি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেছিল। একবার মনে করিল কেহ কোথাও নাই, এই সময় উঠিয়া পলাইয়া গেলে কিরূপ হয়? পরক্ষণেই এক চোঙা খাবার লইয়া সেই পাশের বাড়ির ছেলেটি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, ভিতর হইতে লুচি ভাজার গন্ধও আসিতে লাগিল। সুমন্ত্র স্থির করি, নাঃ, যখন নামিয়াছে তখন শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িবে না। এখন পলায়ন করা কাপুরুষের কাজ হইবে।

মিনিট পাঁচেক পরে পাশের বাড়ির ছেলেটি ঘরে ঢুকিল। তাহার এক হাতে শ্বেত পাথরের থালায় খানদশেক লুচি ও আলুর দম, তাহা সঙ্গে একটু বাড়ির তৈয়ারি আমের জেলি এব দুইটি করিয়া বড় বড় সন্দেশ ও রসগোল্লা অপর হাতে শ্বেত পাথরের গ্লাসে কর্পূর দেওয় ঠাণ্ডা জল। ছেলেটি থালা ও গ্লাস টেবিলে নামাইয়া বলিল, "মাসিমা ব'ললেন, একটু জ খেয়ে নিতে। ও'রা এখনি আসছেন।"

সুমন্ত্রকে দ্বিতীয়বার বলিতে হইল ন একখানি লুচি এবং একটি রসগোল্লা বা থাকিতে হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, ছেলে কখন ভিতরে চলিয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে গ আরম্ভ করিয়াছে, "পেট হাতে ক'রে এসেছি মাসিমা, এক এক গালে দু'খানা ক'রে পুর বাপ্‌স্, ঢের ঢের খাওয়া দেখেছি"। সুম আহারের প্রবৃত্তি হঠাৎ চলিয়া গেল, সে খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিল গৃহিণী বলি ছেন, "আহা, এখনও হয়তো ভাত খা হয়নি। বেশ করেছে খেয়েছে, জোয়ান ছে খাবে না? আর ক'খানা লুচি দিয়ে আসি ময়দা মাখাই আছে, আমি এখনি ভেজে দি হ্যাঁরে সুদেষ্ণা, তোর এখনও হ'ল না?"

সুমন্ত্র একবার ভাবিল পাতে ফি ফেলিয়া রাখিবে, আবার ভাবিল পে বদনাম তো হইয়াই গিয়াছে, এই দুর্মূ বাজারে উঁহাদের খাবারগুলো নষ্ট যায় বে সে থালাখানি নিঃশেষ করিয়া জানালার বা

বাড়াইয়া পীতাবশিষ্ট জলে মুখ ধুইয়া লাক হইয়া বসিল। সুদেষ্ণা! বেশ নামটি তু! দাড়ি কামাইয়া আসিলেই ঠিক হইত, ভুল হইয়া গিয়াছে।

আরও কয়েক মিনিট পরে আধ ঘণ্টা গকার দেখা সেই মেয়েটি আসিয়া ঘরে কল। গতি কিছু ধীর, বেশবাস ছু সংস্কৃত ও সংযত, চুলে লা খোঁপা এবং কপালে একটি দুরের টিপ ছাড়া কিন্তু সাজের কোনো কণ চোখে পড়িল না। সুমন্ত্রকে হাত তুলিয়া স্কার করিয়া সে টেবিলের এক পাশে ড়াইল। সুমন্ত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতি-স্কার করিল, পরে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল রিয়া বলিল, "আপনি বসুন।" মেয়েটি বিলের ওপাশে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া সল, আস্তে পাশের বুকর‍্যাক হইতে একখানা বর বই টানিয়া লইয়া নতনেত্রে নিবিষ্টমনে ব দেখিতে লাগিল। সুমন্ত্র খবরের কাগজটা ড়িতে ব্যস্ত ছিল, কেবল হঠাৎ পড়ার ফাঁকে ক নজরে ছবিটা দেখিয়া লইল। একটা জগর একটা মহিষকে পাকের পর পাক দিয়া ড়াইতেছে, মহিষটা পরিত্রাহি চীৎকার রিতেছে, তাহার অবস্থা কাহিল। মেয়েটিও বি দেখার ফাঁকে সুমন্ত্রর দিকে একবার দৃষ্টি নক্ষেপ করিয়াছিল; সুমন্ত্রর পাঠে মনোযোগের ভাব ছিল না, কেবল কাগজটা উল্টা করিয়া রা ছিল।

আরও মিনিট পাঁচেক কাটিল। দুই পক্ষই চুপচাপ। দ্বারপ্রান্তে একখানি সাদা থানের আঁচল দেখা গেল। সুকল্যাণী দেবীর কল্যাণ-মণ্ডিত মুখখানি একবার সুমন্ত্রের দৃষ্টিপথে পড়িল। পরক্ষণে তিনি দরজার আড়ালে সরিয়া গেলেন। মৃদুমধুর কণ্ঠে তাঁহার অনুযোগ আসিল, "আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না?"

সুমন্ত্র সাহস পাইয়া মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল, "আপনি কি পড়া ছেড়ে দিয়েছেন?"

মেয়েটি চোখ তুলিয়া বলিল, "না, পড়ছি তো। এবার ফিফ্‌থ্ ইয়ার হোলো।"

সুমন্ত্র বলিল, "আজ কলেজ যান নি?"

মেয়েটির মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইল, সে চোখ নীচু করিয়া বলিল, "বেরিয়েছিলুম, মাঝপথে একটা অ্যাক্সিডেণ্টের জন্য একটু আগে বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে।"

সুমন্ত্র ব্যস্ত হইয়া বলিল, "হাড়টাড় কিছু ভাঙেনি তো। দেখুন, আমি ফার্স্ট এড্ জানি, যদি কোনো উপকারে লাগতে পারি তো বলবেন। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে? তাহ'লে তো বড়োই অন্যায় হ'ল, আপনাকে এভাবে বসিয়ে রাখা! খুব লাগছে কি?"

মেয়েটি সলজ্জভাবে বলিল, "না, না, সেরকম কিছু নয়।"

দরজার পাশ হইতে মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল। সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "আর ব'লবেন না, মেয়েটি আমার বড় তড়বড়ে! রোজ বাড়ি থেকে বেরোবে শেষ মুহূর্তে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ট্রাম ধ'রবে। আজ রাস্তায় এক উড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে।"

সুমন্ত্র হাসি চাপিয়া বলিল, "তা' ধাক্কা অমন আমরাও তো অনেক খেয়েছি, কিন্তু ক্লাশ কামাই ক'রে বাড়ি ফিরলেন কেন?"

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল, "তার মাথায় ছিল এক টিন আলকাতরা, ধাক্কা সামলাতে না পেরে সমস্ত আমার গায়ে ঢেলে দিয়েছিল। সে অবস্থায় কি ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া চলে? তেল দিয়ে সাবান দিয়ে তুলতেই এক ঘণ্টা গেল।"

সুমন্ত্র গম্ভীর হইয়া বলিল, "তাহ'লে তা'র খুব ক্ষতি ক'রে দিয়েছেন বলুন? কি ব'ললে?" পরক্ষণে কণ্ঠস্বর আরও নামাইয়া,—সুকল্যাণী দেবী শুনিতে না পান এরূপ স্বরে—বলিল, "মারিলি তো মারিলি, ধাক্কা মারিলি কাঁই!"

মেয়েটি অনুচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তার ক্ষতিপূরণ করে দিয়ে এসেছি, আমারই কাপড় জামাগুলো নষ্ট হোলো। লংস্লীভ জামাটা সবে করিয়েছিলুম"—

কথাবার্তা সহজ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া সুকল্যাণী দেবী দরজার পাশ হইতে আর একবার উভয়কে স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। বোধ হয়, সুমন্ত্রর মুখ দেখিয়া এবং থালা দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহার ক্ষুধা মিটে নাই—আর কয়েকখানা লুচি ভাজিবার প্রয়োজন আছে।

সুমন্ত্র এইবার বলিল, "আমাকে আপনি কিছু প্রশ্ন করবেন না?"

মেয়েটি ছবি দেখিতে দেখিতে বলিল, "না।"

"কেন?"

"বিজ্ঞাপন দেখে মাল খরিদ করতে এসেছেনঃ পছন্দ হ'লে নেবেন, 'পছন্দ না হলে নে'বন না, এর মধ্যে আমার কি বলবার আছে?"

সুমন্ত্র বলিল, "আপনারাও তো মাল নিজেরা দেখে নেবার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন; সুতরাং অপরাধ এক পক্ষের নয়।"

মেয়েটি এইবার আবার হাসিল। বলিল, "আজ চার বছর ধ'রে মার সঙ্গে টাগ্ অব ওয়ার চ'লছে জানেন? আমিও পড়া ছাড়ব না, মাও বিয়ে দেবে। বি এ পাশ ক'রবার পর ব'ললে, 'আর কোনো কথা শুনব না।' ঘটক লাগিয়েছিল, দুটি মাস জ্বালাতন করে মেরেছে। বড় বড় বনেদ ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ এল প্রথমে। কেউ দশ হাজার চায়, কেউ বিশ হাজার চায়, কেউ বাবার উইল দেখতে চায়, কেউ আমাকে না দেখেই সম্পত্তির ফর্দ দেখতে চায়। গোড়ায় কারো সামনে বেরোতে চাইনি, মা কাঁদে। বেরোলুম তো, এ এসে বলে 'চুল খোলো, ও এসে বলে, 'পায়ের কাপড় তোলো',—এত অপমান লাগত! আপনি কিছু মনে করবেন না, অনেক বরপক্ষই মেয়েদের অপমান করতে পারলে ভারি সুখী হয়। কেউ ব'ললে, 'ছেলের ঠাকুরমার বয়সী', কেউ ব'ললে 'তাল গাছ', কেউ বললে, 'নাক বাঁশীর মত নয়', কেউ বললে, 'প্যাকাটি'! এক জমিদার গিন্নী এসে প্রশ্ন করলেন, "ছেলেমেয়ে ক'টি? প্রথম পক্ষ, না দ্বিতীয় পক্ষ।" বলিতে বলিতে সহসা অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সুমন্ত্র বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন, অনর্থক আপনার মনে কষ্ট দিচ্ছি—ওসব আলোচনা থাক।"

মেয়েটি বলিল—"ওসবে সত্যিই খুব কষ্ট হয়নি, সব সহ্য করেছিলুম, কিন্তু শিক্ষিত ছেলেরা যখন এসে প্রশ্ন করে, 'স্মোক করি কিনা, ড্রিঙ্ক করি কিনা, কম্প্যানিয়নেট ম্যারেজে আপত্তি আছে কিনা, বল্‌ড্যান্স করতে জানি কিনা', তখন কি জানি কেন—বড় অপমান বোধ হয়।" সহসা মেয়েটি তাহার চোখে চোখ রাখিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনি ক'টি মেয়ে দেখেছেন এভাবে?"

"একটিও না। এই প্রথম এবং যতদূর মনে হয় এই শেষ।"

মেয়েটি বলিতে লাগিল, "আমার এক পিসেমশাই আছেন, মা তাঁকেও হয়রাণ ক'রে ছেড়েছেন। অবশ্য আমারও দোষ ছিল, তিনি দোজবরে আই সি এস, পাগল প্রফেসার প্রভৃতি ভালো ভালো পাত্রের সন্ধান দিয়েছেন, আমাদের মত হয়নি। আজকাল তিনি আর বড়ো আসেন না, মা অনেক ক'রে বলাতে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়েছেন।" বলিতে বলিতে মেয়েটি নিজের প্রগল্‌ভতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া সহসা যেন থামিয়া গেল। মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনি কি ভাবছেন জানি না, এসব কথা সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো পুরুষের কাছে এভাবে ব'লব, দু'দিন আগে আমি নিজেই ভাবতে পারতুম না। কেন কে জানে, আপনাকে বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছে করে।"

সুমন্ত্র দ্রুত চিন্তা করিতেছিল, সুদেষ্ণার এই কথার পূর্বেই সে নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল। এই সরল সুন্দর দেহ-মনের অধিকারিণীকে আজন্ম সুখলালিতা ধনীর দুলালীকে সে তাহার নিম্নবিত্ত

দারিদ্র্যের মধ্যে পাইস হোটেলের কদর্যতার মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। ইহাকে প্রতারণা করা তাহার পক্ষে মহাপাপ হইবে। এতক্ষণ অধিকাংশ সময়েই সে খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কথাবার্তা কহিতেছিল, এইবার সোজাসুজি মেয়েটির মুখের দিকে তাকাইল। হাঁ, রাজরাণী হইবার যোগ্য রূপ বটে। পরমুহূর্তেই সে নিজেকে সংযত করিয়া লইল, শান্ত অকম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "আমাকে মাফ করবেন, আমি আপনার বিশ্বাসের যোগ্য নই। ভেবে দেখলুম এখানে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

মেয়েটির মুখের উপর কে যেন সপাং করিয়া এক ঘা চাবুক মারিল, একমুহূর্তে তাহার সমস্ত মুখ রক্তশূন্য হইয়া গেল, পর-মুহূর্তেই অপমানে, লজ্জায়, ক্রোধে তাহার কান পর্যন্ত টকটকে রাঙা হইয়া উঠিল। সে একবার কি যেন একটা প্রশ্ন করিতে গেল, কিন্তু খুব সম্ভবত ইহার পর আর কথা বাড়াইতে তাহার রুচিজ্ঞানে বাধিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নিঃশব্দে সুমন্ত্রকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। সুমন্ত্র বলিল, "যাবেন না, দাঁড়ান, একটা কথা বাকি আছে।" সুদেষ্ণা দাঁড়াইল। সুমন্ত্র বলিল—"আমি যে কত দরিদ্র, আপনার চেয়ে কত নীচে—তা আপনি জানেন না। বিয়ের কথা কোনদিন ভাবি নি, উপার্জনের চেষ্টা করা কোনদিন প্রয়োজন ব'লে অনুভব করি নি। পিতৃ-পুণ্যে কলকাতায় একখানা ছোট বাড়ি আছে, তারই নীচের দু'খানা ঘর ভাড়া দিয়ে একার পাইস হোটেলের খরচটা কোনরকমে চলে যায়। কয়েকবার চাকরী পেয়েছি, কোনটাতেই টি'কে থাকতে পারি নি, শেষ কাজটাও কয়েকদিন পূর্বে গেছে। বিয়ে করাই আমার মতো লোকের পক্ষে পাপ, আপনার মতো মেয়েকে বিয়ে ক'রবার চিন্তা করাও আমার পক্ষে মহাপাপ। আমি আপনার যোগ্য নই।"

সুদেষ্ণা প্রশ্ন করিল, "তবে সব জেনে-শুনে এসেছিলেন কেন? তামাসা দেখতে?"

সুমন্ত্র বলিল, "সত্যি কথা বলতে কি, আমি আপনার কথা কিছুই জানতুম না। এক বন্ধুর জন্যে বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছিলুম, একজন ব'ললে, ল্যাম্পপোস্টের পাশে বাড়িটা ভাড়া আছে, তারই খোঁজ নিতে এসেছিলুম। আপনার মা'র সঙ্গে কথাবার্তা অনেকদূর এগোবার পর বুঝতে পারলুম ব্যাপারটা; কিন্তু তখন আর ফেরবার পথ দেখতে পাচ্ছিলুম না।

মেয়েটির মুখ হইতে বিষাদের মেঘ কাটিয়া গিয়াছিল; বিস্ময় এবং কৌতূহলে পরিপূর্ণ দুইটি বড় বড় চোখ তুলিয়া সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুমন্ত্রের মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। সুমন্ত্র বলিয়া চলিল, "বিশ্বাস করবেন, এখানে এসে আপনাদের বাড়ির ঐ কাগজে ঐ বিজ্ঞাপন দেখার পূর্বে আমি কিছুই জানতুম না।"

"কিন্তু আপনি যে ব'ললেন, বিজ্ঞাপন দেখে এসেছেন?"

"ছেলেটি বললে বাড়িভাড়া, ভাবলুম নিশ্চয় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন; নিঃসন্দেহ হবার জন্য জিজ্ঞেস ক'রেছিলুম, বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কি না। উত্তর পাইনি?

সুন্দর মুখখানি আবার আরক্ত হইয়া উঠিল, মেয়েটি চোখ নামাইয়া পায়ের নখ দিয়া মাটিতে দাগ কাটিতে লাগিল। সুমন্ত্র বলিল, "ইতিপূর্বে বহির্জগতের সমস্যা,—মানুষের দৈহিক দুঃখ, অপমান, দেশের দারিদ্র্য, পরাধীনতা এই সব নিয়েই বেশী মাথা ঘামিয়েছি, হৃদয়ের জগৎ বা মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল কোনদিনই ছিল না। আপনাকে দেখে হঠাৎ প্রথমটা সব গোলমাল হ'য়ে গেছল, মনে হয়েছিল মন্দ কি? কিন্তু আপনাকে যতই চিনছি, ততই মনে হচ্ছে, অন্যায় করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা ক'রতে চেষ্টা ক'রবেন,—আমার ক্ষণিক দুর্বলতা দিয়ে আমাকে বিচার করবেন না। বিশ্বাস করবেন, আপনাকে অসম্মান করবার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না।"

শেষ দিকটায় সুমন্ত্রর গলার স্বরটা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। সে নমস্কার করিয়া সুদেষ্ণার পাশ কাটাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল; সুদেষ্ণা সহসা বলিয়া উঠিল—"যাবেন না, কথা আছে।"

সুমন্ত্র অপ্রস্তুতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে এক নিমেষের জন্য তাকাইয়া চোখ নামাইয়া লইল; বলিল, "আবার কি কথা?"

মেয়েটি বলিল, "সামনেই ঐ বাড়িটা ভাড়া আছে। আমাদেরই বাড়ি। আপনার বন্ধুটি যদি নিয়মিত ভাড়া দেন, তবে নিতে পারেন। পঞ্চাশ টাকা ভাড়া।"

সুমন্ত্র পকেট হইতে তিনখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "এই ছ'মাসের টাকা আগাম রাখুন।"

সুদেষ্ণা হাসিয়া বলিল, "বাঃ, আপনি তো বেশ লোক? বাড়ি দেখলেন না, দরদস্তুর ক'রলেন না। আপনার বন্ধুর যদি পছন্দ না হয়? তিনি করেন কি?"

সুমন্ত্র বলিল, "কিছু করে না, বাপের পয়সা আছে, ওড়ায়। সম্প্রতি শালীর নামে কবিতা লিখে স্ত্রীর কাছে অপমানিত হয়েছে, তাই নির্জনে কাব্যচর্চা করবার জন্য একটা বাড়ি খুঁজছে। তার সর্ত কেবল বাড়ির দক্ষিণ দিক খোলা থাকবে, আর পাশের বাড়িতে রেডি থাকবে না।"

সুদেষ্ণা হাসিয়া বলিল, "তাহলে তো ভালো ভাড়াটে জুটিয়ে দিচ্ছেন আমাদের?"

"ও রকম ভাড়াটে রাখবেন না?"

সুদেষ্ণা বলিল, "দেখুন, বাবা থাকা ঐ বাড়িতে এক ভদ্রলোক পাঁচ বৎসর ভা ছিলেন। তিনি সরকারী চাকুরে, বছরখানেক বদলি হয়ে মফঃস্বলে চলে গেছেন। তারপর দু'মাস একটা মেম ভাড়া এসেছিল, শেষে তাড়াতে পথ পাই না। ও বাড়িতে এলেই কেন জানি না, সকলের কাব্যচর্চা ক'রতে ইচ্ছে করে। কেউ গান গায়, কেউ চীৎকার ক'রে কবিতা পড়ে, কেউ বাঁশীর সুরে করুণ রাগিণী আলাপ করে, রাত্রে ঘুমোতে দেয় না, কেউ প্রেমপত্র লেখে। তারা যাবার পর এলেন এক স্বিপত্নীক বৃদ্ধ। এখানে যখন এলেন, তখন তাঁর মাথার চুল গোটাকতক কাঁচা ছিল, সাতদিন ঐ বারান্দায় দাঁড়াতে না দাঁড়াতে সব কাঁচা হয়ে গেল। তাঁর গিন্নী ব্যাপার দেখে শঙ্কিত হলেন, মা'র কাছে তাঁর শঙ্কার কারণও জানালেন। মা ব'ললেন, অন্য বাড়ি খুঁজতে, বৃদ্ধ অনেক ওজর আপত্তি ক'রে পারিবারিক অশান্তির জ্বালায় শেষে অন্যত্র গেলেন। তারপর ক'মাস বাড়িটা পড়েই আছে। ঠিক ক'রেছি—অন্ধ অথবা বাতে পঙ্গু অথবা স্ত্রীর কড়া শাসনে থাকবেন এই রকম একটি গো-বেচারা ভালো মানুষ ভাড়াটে পেলে তবেই রাখব, তা' না' হ'লে বাড়ি খালি থাকবে, সেও ভালো। সেইজন্য তো কাগজে বিজ্ঞাপন দিই নি। 'টু লেট'টা সবে পরশু ঝুলিয়েছি পিশেমশায়ের কথায়।"

সুমন্ত্র বলিল—"তা হ'লে ভাড়া দেবেন না আমাদের? মানে, আমার বন্ধুকে?"

সুদেষ্ণা হাসিয়া বলিল—"দিতে পারি, যদি আপনি তাঁর 'গুড কন্ডাক্টের' জন্য দায়ী থাকেন। স্ত্রী সঙ্গে থাকবেন না, আমার নামে কবিতা লিখে যদি ঢিলে বেঁধে ছাদে ছুড়তে আরম্ভ করেন, তা' হলে?"

সুমন্ত্র বলিল—"তা' হ'লে তার মাথাটা গুঁড়ো ক'রে দে'ব।"

তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বিষয়ে তাহা মুখভাব দেখিয়া সুদেষ্ণার সন্দেহের অবকা রহিল না, সে বলিল, "তা'হলে একটু বসু মা'র সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আসি। মা'র ম হয় তো রসিদ দিয়ে দেব।" এই বলিয়া নো কয়খানা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

সুমন্ত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার চেয়া বসিয়া পড়িল। সুদেষ্ণা ঘরের বাহির হইয় হাঁক দিল, "মা, মাগো! কোথায় তুমি সুকল্যাণী দেবী ভিতর বাড়ি হইতে সা দিলেন, "এই যে রান্নাঘরে। দাঁড়া, যাচ্ছি

ন্‌চি ক'খানা হ'য়ে গেছে, সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" সুদেষ্ণা হাঁক দিল, "ও থাক, তুমি আগে এস। উনি চ'লে যাচ্ছেন।"

"সে কি রে?" বলিয়া সুকল্যাণী হন্ত-দন্ত হইয়া কড়া নামাইয়া ছুটিয়া আসিলেন। বৈঠকখানা ঘরের পিছনেই ভিতরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া মাতা কন্যার কথোপকথন হইল, তাহার কোনো কথাই সুমন্ত্রের কান এড়াইল না। সুকল্যাণী হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "চ'লে যাচ্ছে কেন? পছন্দ হ'ল না? তুই নিশ্চয় কোনো রকম বে-আদবী করেছিলি।"

"না মা, আমি কিছু করিনি। ঘাড়টি হে'ট ক'রে বসেছিলুম,—মুখ বুজে"—

"হ্যাঁ, মুখ বুজে বসে থাকবার মেয়েই বটে তুমি। আচ্ছা, তুই কি কোনদিন বড় হবি না? আমি মানুষকে ডেকে ডেকে আনব, আর তুই অপমান করে করে তাড়াবি? বল, ওকে কি বলেছিস, চলে যাচ্ছে কেন? দাঁড়া, আমি ওকেই জিজ্ঞেস করছি কি হল?"

সুদেষ্ণা বলিল, "না, মা, তোমাকে যেতে হবে না, উনি যাচ্ছেন যান। ওঁর"—

সুকল্যাণী বাধা দিয়া বলিলেন,—"যাব বললেই অমনি চলে যেতে দেব? দ্যাখ সুদেষ্ণা, তুই আমার মেয়ে, আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা করিসনি। এবার তোর পছন্দ হয়েছে—আমি বুঝতে পারছি।"

সুদেষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, তুমি সবই অমনি বুঝতে পারো। ও বিয়ে করবে না, তুমি বিয়ে দেবেই। এওতো বড়ো জুলুম।"

সুকল্যাণী বলিলেন, "তুই কি জিজ্ঞেস করেছিলি আগে বল। চটল কেন?"

সুদেষ্ণা বলিল, "তুমি বিশ্বাস করবে না, তা' কি বলব? আমি শুধু বলেছিলুম, 'সুদেষ্ণা বানান করুন তো? ঠিক বানান করলে, মূর্ধণ্য ষ নয়ে আকার।"

"আচ্ছা, এম এ পাশ করেছে, তোর চেয়ে বয়সে ছ'সাত বছরের বড় হবে, তাকে ওকথা বললে চটবে না?"

"সত্যি পাশ করেছে কিনা সেটা তো জেনে নিতে হবে? তোমার সেই বিলেত ফেরত পাত্র তো পারেনি! মনে আছে? দন্ত্য সয়ে নয়ে বলেছিল। হ্যাঁ, তারপর জিজ্ঞেস করলুম, কে ছিল জানেন? তাও ঠিক বললে, বিরাট রাজার রাণী। জিজ্ঞেস করলুম, সুমন্ত্র কে ছিলেন? তাও ঠিক বললে। 'দশরথের মন্ত্রী এবং সারথি! অবাককাণ্ড!"

সুকল্যাণী বলিলেন, "তোর জ্বালায় কি আমি পাগল হয়ে যাব?"

সুদেষ্ণা বলিয়া চলিল, "তারপর বললুম আপনি তো হিস্টিতে এম এ, বলুন তো থার্ড ব্যাটল অফ প্ল্যাসি কবে হয়েছিল? ঠকে গেল, বললে, ইতিহাসে পাইনি।"

সুকল্যাণী বলিলেন, "তুই এমনি করেই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিস। এইরকম বেহায়াপনা কি কোনো ভদ্রলোকে সহ্য করতে পারে? তারপর আর কি কথা হল?"

"আর কি কথা হবে? বিদ্যায় না পেরে তখন বলে কিনা, আপনার উড়ে স্পর্শ দোষ ঘটেছে, ছ-মাস প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমি বললুম, বেশ, ততদিন আপনি আমাদের সামনের বাড়িতে নজরবন্দী থাকুন, আমরাও খোঁজ খবর নিই, আপনার কিছু স্পর্শ দোষ ঘটেছে কিনা। এই নাও, ছ'মাসের বাড়ি ভাড়া আগাম দিয়েছে, ঐখানে থেকে ছ'মাস আমার সঙ্গে কোর্টশিপ চালাবে।"

সুকল্যাণী অবাক হইয়া বলিলেন, "কি বেহায়া হচ্ছিস মা তুই দিন দিন? বেচারী মেয়ে দেখতে এসেছে বলে তার কাছে ছ'মাসের বাড়ি ভাড়া আদায় করলি? না না, আমাদের বাড়ি এসব বেলেল্লাগিরি চলবে না। এঃ, কোর্টশিপ করতে দেবে, না আরো কিছু! যা, এখুনি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়।" মেয়েটি তৎক্ষণাৎ টাকা ফেরত লইয়া আসিল; বলিল, "মা টাকা নিলেন না।"

সুমন্ত্রর ভীষণ হাসি পাইতেছিল। অনেক কষ্টে গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া বলিল, "কেন বলুন তো?"

মেয়েটি ভালোমানুষের মতো মুখ করিয়া বলিল, "কি জানি? মার বোধ হয় সন্দেহ হয়েছে, আপনার কোনো দুরভিসন্ধি আছে। মার আমার ঐ রকম! সকল তাতেই সন্দেহ। বলছেন, এল মেয়ে দেখতে, করছে বাড়ি ভাড়া, বলছে তিনকুলে কোথাও কেউ নেই, এ আবার কি? টাকাকড়ি কি চাই তার ফর্দ দিলে না, হীরের আংটি, খাট বিছানা, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, মেয়ের গায়ে দু'শ' ভরি গহনা কিছুই চাইলে না, এ আবার কি রকম? একজনরা তো নমস্কারীই চেয়েছিলেন পাঁচ হাজার টাকার! চাইবে না? মার সন্দেহ হয়েছে আপনি যখন ছোটোখাটো কিছু চাইছেন না—তখন নিশ্চয় বড়োরকম কিছুর সন্ধানে আছেন! সামনের বাড়িতে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন সুযোগ সন্ধান জেনে তাঁর লোহার সিন্ধুকটি লুঠ করবেন? হীরের গয়নার"—

দরজার ওপাশ হইতে সুকল্যাণী দেবীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাক শোনা গেল "সুদেষ্ণা"।

সুদেষ্ণা বলিল, "ইনি টাকা ফেরত নিচ্ছেন না যে! কি করি?"

সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, না নেন, ঐখানে ফেলে রেখে চলে এস। দেখুন, আমাদের বংশে এ পর্যন্ত কারো কোর্টশিপ পরে বিয়ে হয়নি, সুদেষ্ণারও হবে না। আমার মেয়ে সুন্দর, প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি পাবে। (ক্রমশ)

'অ্যাসপ্রো'
পাওয়া যাচ্ছে!



জাল জিনিস নিয়ে প্রতারিত হবেন না। প্রত্যেকটি বড়ির উপরে 'অ্যাসপ্রোর' নাম লেখা আছে কিনা দেখে নেবেন। 'অ্যাসপ্রো' দশ মিনিটের মধ্যেই ব্যথা বেদনা ও জ্বর বন্ধ করে। বুকের বা পেটের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।



'অ্যাসপ্রোর'
নিয়ন্ত্রিত মূল্য
এক আনায় ৩টি বড়ি
দশ আনায় ৩০টি বড়ি

পরিবেশক:
জে. এল্. মরিসন, সন অ্যাণ্ড জোন্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ: পোষ্টবক্স ৩০৭ কলিকাতা,
টেলিফোন Calcutta 796

'অ্যাসপ্রো'
সব দোকানেই পাওয়া যায়

62



রোগ ধরবার উপায়

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডি-টি-এম

টিউবারকুলোসিস রোগটিকে এখন আর তেমন নিশ্চিত মারাত্মক বলা উচিত নয়। কারণ প্রথম অবস্থা থেকে ধরতে পারলে এ রোগ এখন নিশ্চয়ই আরোগ্যসাধ্য। এর আরোগ্যের কেবলমাত্র অন্তরায় এই যে, রোগটি অনেক স্থলে ধরা পড়ে অনেক বিলম্বে। অধিকাংশ রোগই আমাদের আক্রমণ করে প্রকাশ্যভাবে, কিন্তু এটি আক্রমণ শুরু করে প্রচ্ছন্নভাবে। এই হলো এর বিশেষত্ব। শরীরের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখলে এ রোগ সামান্য অসুস্থতার মতো রূপ নিয়ে অথবা সুস্থভাবের মতোই রোগীর শরীরে কিছুকাল যাবত নির্বিঘ্নে আপন ক্রিয়া করতে থেকে যায়। সেই-জন্য প্রথম অবস্থায় একে একটা রোগ বলে প্রায়ই অনেকে ধরতে পারে না। সাধারণ লোকের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, এই রোগ অনেক সময় বিজ্ঞ চিকিৎসকদেরও ফাঁকি দিয়ে কিছু-কাল ছদ্মবেশে কাটিয়ে দেয় এবং উপযুক্ত চিকিৎসায় বিলম্ব ঘটিয়ে দেয়। কিংবা এমনও হয় যে, চিকিৎসক সময় মতো সতর্ক করিয়ে দিলেও অনেকে কথাটা তখন অগ্রাহ্য করে। লোকে এই রোগকে অত্যন্ত ভয় করে বলে এর কথা সহজে মেনে নিতেই চায় না, মনে করে চিকিৎসকের ধারণা ভুল। কোথাও কিছু নেই এই রোগই বা হবে কেন! তারপর নিতান্ত যখন এর নগ্নতা বেরিয়ে পড়ে, তখন আর না মেনে কোন উপায় থাকে না; কিন্তু তখন হয়তো সহজে আরোগ্যের সুযোগ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এমনি করেই চিনবার উপায় এবং আরোগ্যের উপায় জানা থাকতেও অধিকাংশ রোগীর জীবন অনর্থক নষ্ট হয়ে যায়। অথচ একটু সচেতন থাকলে প্রথম আক্রমণ থেকেই একে সময়মতো চিনতে পারা খুব যে কঠিন তা নয়। এমন কি, একটু লক্ষ্য রাখলে সাধারণ লোকেও প্রথম অবস্থাতে একে ধরে ফেলতে পারে। কেবল মনে রাখলেই হলো, কোন কোন লক্ষণ থেকে এর সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত। আজকালকার দিনে প্রত্যেক লোকের পক্ষে এটুকু জেনে রাখা বিশেষ দরকার।

টিউবারকুলোসিস আক্রমণের কতকগুলি বিশিষ্ট চিহ্ন আছে। এমন কি, প্রাচীনকালের লোকেরাও সেগুলি জানতো। ইতিহাসে পড়া যায় যে, হিপোক্রেটিসের সময়ে প্রাচীন এথেন্স নগরে একটি মেয়ে ছিল, সে নাকি তখনকার গ্রীস দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে প্রখ্যাত ছিল। তখনকার দিনে লঘু তন্বী দেহের এমনি একটা সৌন্দর্যের আভিজাত্য ছিল, যেন যে-যত বেশি রোগা ছিমছিমে হবে তাকে ততই বেশি সুন্দরী বলা হবে। সেই মেয়েটি ছিল কৃশাঙ্গী, তার ফ্যাকাশে গাল দুটি সামান্য কিছুতেই টলটলে রক্তিম হয়ে উঠতো, চোখ দুটি অস্বাভাবিক দীপ্তিতে সদাসর্বদা ছলছল করতো, আর সেই চোখের দৃষ্টিতে ছিল কি এক কাব্যময় ক্লান্ত বিষণ্ণতার আভাস। লোকে মনে করতো এই সকল হলো বুঝি চারু রমণী সৌন্দর্যের সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষণ। মেয়েটি আরো যতই কৃশ হতে লাগলো, ততই লোকে মুগ্ধ হয়ে ভাবতে লাগলো তার সৌকুমার্য বয়সের সঙ্গে আরো নিখুঁত হয়ে উঠেছে। ক্রমে তার ক্লান্তির ভাবটা আরো বেড়ে যেতে লাগলো, শীতের রাত্রে জানলা খুলে শুয়েও সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঘামতে লাগলো, মাঝে মাঝে একটু কাসতেও লাগলো। তখন ভয় পেয়ে তার বাপ তাকে হিপোক্রেটিসের কাছে নিয়ে গেল। হিপো-ক্রেটিস তার ঐ চেহারা আর ক্লান্ত দৃষ্টি দেখে আর তার নাড়ি ধরে বুঝতে পারলেন যে, সৌন্দর্যের মধ্যে কীট প্রবেশ করেছে। তখন তিনি তার বাপকে বললেন, তোমার মেয়ে দারুণ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছে, সেই জন্যেই সে এমন শুকিয়ে যাচ্ছে। একে বলে থাইসিস যাতে শরীর ক্রমে ক্রমে জীর্ণ এবং শীর্ণ হয়ে যায়। একে যদি বাঁচাতে চাও, তাহলে নগর থেকে সরিয়ে পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে রাখো, যেখানে সর্বদাই প্রচুর সূর্যালোক আর মুক্ত বাতাস পাবে। ওকে প্রচুর দুধ, আর টাট্‌কা ডিম, আর সদ্য-ধরা নদীর মাছ খেতে দাওগে, তাহলে হয়তো কিছুকাল ও বাঁচবে। তখনকার দিনে অবশ্য স্টিথোস্কোপও ছিল না, থার্মোমিটারও ছিল না, আর এক্সরেও ছিল না। কিন্তু তিনি ঐ মেয়েটির বাহ্য লক্ষণগুলি দেখে আর নাড়ি ধরেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা টুবার-কুলোসিস। অতএব এই রোগের এমন কতক-গুলি লক্ষণ আছে, যাতে বাহ্যদৃষ্টিতেই খানিকটা চেনা যায়।

টিউবারকুলোসিসের প্রথম লক্ষণ শরীরের ওজন কমা। রোগা হলেই যে এই রোগ হবে, তা অবশ্য নয়। অনেক লোক স্বভাবতই চিরকাল রোগা, অথচ তারা চিরকালই সুস্থ। এমন অনেকের রোগা ধাত আছে, যারা কোন কালেই মোটা হয় না অথচ কোন কালেই অসুস্থ হয় না। এছাড়া নব্য-ভাবের মেয়েরা এবং ছেলেরাও অনেক সময় খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছা করেই দস্তুরমতো রোগা হয়ে যায়। তাতেও বলা যায় না যে, তাদের এই রোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগেও অনেকে রোগা হয়ে যায়। অনেকে দারিদ্র্যের কারণে ভালো খাদ্য খেতে না পেয়ে রোগা হয়ে যায়। অনেকে আবার মনের কষ্টেও খানিকটা রোগা হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যেভাবে ওজন কমার কথা বলছি, ঐসব জাতীয় রোগা হওয়ার সঙ্গে তার বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। মানুষকে আগেকার চেয়ে খানিকটা রোগা দেখালেই যে বাস্তবিক তার ওজনটাও কমে গেছে এমন প্রায়ই হয় না। একুশ-বাইশ বছর বয়সের পরে শরীরের ওজন সাধারণত বিশেষ কোন কারণ না ঘটলে অল্প-বিস্তর সমানই থাকে। কিংবা যদি কোন বিশেষ কারণে ওজন খানিকটা কমেও যায়, তবু সেই-খানেই সেটা স্থায়ী হয়ে যায়, আরো ক্রমশ ক্রমশ কমতে থাকে না। অতএব প্রথমত রোগা হয়ে গিয়ে যার ওজন সত্যই খানিকটা কমে গেছে, তার এ সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত একটা কিছু কারণ থাকবে। আর দ্বিতীয়ত সেই কারণটা দূর হয়ে গেলে আর তার ওজন কমবে না; বরং আবার বাড়বে। কিন্তু এখানে আমরা বলছি এমন ওজন কমার কথা যার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ যা সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস ক্রমশ আরো কমেই চলেছে। অথচ রোগীর শরীরে তেমন কোন বলবার মতো রোগ নেই। দেখা যায় যে, সে ভালোমতেই খাওয়া-দাওয়া করছে, ক্ষুধাও রয়েছে আগেকার মতো, হয়তো আগেকার চেয়ে ক্ষুধাটা কিছু বেড়েও গেছে। অথচ কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, তার বিনা কারণেই ক্রমশ একটু একটু করে ওজন কমছে। এমন যে দুর্বোধ্য রকমের ওজন কমা, একে টুবারকুলোসিসের লক্ষণ বলেই বিবেচনা করা উচিত এবং সময় থাকতে তার প্রতিবিধান করা উচিত।

টিউবারকুলোসিসের সূত্রপাতেই কেন যে এমন ওজন কমতে শুরু হয়, তার একটা কারণ আছে। এই রোগ যদিও অধিকাংশ স্থলেই ফুসফুসেই দেখা দেয় এবং ফুস-ফুসকেই আশ্রয় করে, তথাপি এটা মাত্র

ফুসফুসেতেই সীমাবদ্ধ রোগ নয়। রোগের বীজাণুগুলি বাতাসের মধ্যস্থতায় প্রথমে শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে বলেই সেখানে তারা কেন্দ্র করে আপন কাজ শুরু করে। কিন্তু এই রোগ শ্বাসযন্ত্র ছাড়াও শরীরের অন্যান্য অনেক যন্ত্রকেই আক্রমণ করতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে এটা সর্বদৈহিক ব্যাধি। যদিও এর প্রত্যক্ষ লক্ষণ কেবল ফুসফুসেই পাওয়া যায় বটে, তথাপি এর বিষক্রিয়া সর্ব শরীরেই ব্যাপ্ত হয়। সেইজন্য এ রোগের দুই রকম লক্ষণ থাকে। এক রকম লক্ষণ স্থানীয়, যা ফুসফুসেই পাওয়া যায়। আর এক রকম লক্ষণ সর্বাঙ্গীন, সেটা তার বিষক্রিয়াজনিত। আর সেই বিষক্রিয়ার সূত্রপাতেই শরীরের ওজন কমতে থাকে। এ রোগের এই দ্বিবিধ চরিত্র সম্বন্ধে একবারও ভুল করলে চলবে না। চিকিৎসার সময়েও এই কথাটি বরাবর মনে রাখতে হবে। তখন ওজন বাড়লেই বুঝতে হবে রোগ আরোগ্যের দিকে যাচ্ছে, আর ওজন কমলেই ধরে নিতে হবে রোগ আধিপত্য বিস্তারের দিকে যাচ্ছে। সেইজন্য ওজন যন্ত্রের ব্যবহার এই রোগে বিশেষ প্রয়োজন।

এই রোগের আর একটি লক্ষণ **শক্তিক্ষয়।** এটা অবশ্য রোগীর নিজেরই অনুভব করবার বিষয়। সে নিজের থেকেই বুঝতে পারে যে তার যেন আর আগেকার মতো খাটবার শক্তি নেই, কোনো বিষয়ে তার উদ্যম নেই, একটু কিছুতেই অস্বাভাবিক ক্লান্তি বোধ করে। এমন কি সারা রাত ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিলেও সে ক্লান্তি দূর হ'তে চায় না। আজকালকার দিনে কিন্তু এ কথাটা বলারও একটা বিপদ আছে। এখনকার দিনের স্ত্রী পুরুষ অনেকেই নার্ভাস প্রকৃতির হ'য়ে পড়েছে, তারা এমনিতেই যথেষ্ট ক্লান্তি বোধ করতে থাকে, এবং ঘুম থেকে ওঠবার পরে তো বটেই। তার কারণ বিকারগ্রস্ত মন নিদ্রাভঙ্গে প্রথমেই নিজের দুর্বলতার কথাটা স্মরণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার লক্ষণটাও শুরু হয়ে যায়। সুতরাং এই কথা শুনলে অনেকেই ভাবতে পারে, এই রোগ তবে তারও হয়েছে। বস্তুত নবীন বয়সের অনেকেরই পক্ষে এই রোগ হয়েছে বলে কল্পনা করা যেন একটা ব্যসনের মতো হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তারা সর্বদাই অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকে, অথচ মনের সন্দেহটাকে দৃঢ়তর করবার যেন একটা সূত্র খুঁজে বেড়ায়। তাদের কাছে এমন ধরণের কথা বলতে যাওয়াই হয়তো বিপজ্জনক। কিন্তু প্রকৃত ক্লান্তি আর কাল্পনিক ক্লান্তির মধ্যে পার্থক্য একটা নিশ্চয়ই আছে। প্রকৃত ক্লান্তিতে দেখা যাবে যে আগে যে কাজটা আমি অবলীলাক্রমে করে যেতাম, এখন সেই কাজটা করতে আমার যথার্থই কষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া সাময়িক প্রকৃত ক্লান্তিরও অন্যান্য বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। সব কিছুই বিবেচনা করে তার কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। যদি দেখা যায় যে কোনো কারণই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ দিন দিন যেন শক্তিক্ষয় হ'য়ে আসছে। কাজ কমিয়ে বিশ্রাম নিয়েও সেটাকে দূর করা যাচ্ছে না, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেহের ওজনও কমছে, তাহ'লে তখন এই রোগের সম্বন্ধে সন্দেহ করতে হবে। এই যে উদ্যমহীনতা ও ক্লান্তির লক্ষণ, এও রক্তের মধ্যে জীবাণুদের বিষক্রিয়ার ফল। আর এটা মনের ওপরেও ক্রিয়া করে। সেইজন্য রোগীর মনটা কেমন অকারণ বিষণ্ণ হয়ে থাকে, কখনও বা মেজাজ বিগড়ে গিয়ে স্বভাবটা পর্যন্ত খিট্‌খিটে হ'য়ে যায়।

আর একটি লক্ষণ **ক্ষুধার বিকৃতি।** এতে কখনো বা ক্ষুধা কমে যায়, কখনো বা অস্বাভাবিক হ'য়ে যায়। যাকে আমরা দুষ্ট ক্ষুধা বলি, অনেক সময় তেমনি একটা ভাব এসে পড়ে। সুখাদ্যের বদলে মুখরোচক কুখাদ্য খাবার জন্যেই যেন একটা ঝোঁক দেখা যায়। অথচ ভাত খেতে বসে যেন কিছুই খেতে ভালো লাগে না। কারো কারো আবার হজমের দোষও হয়।

অবশ্য এই রোগের প্রধান লক্ষণ **জ্বর।** টুবারকুলোসিসের সক্রিয় আক্রমণ শুরু হ'লে সেই সঙ্গে জ্বর একটু হবেই। তবে এর প্রাথমিক অবস্থায় এমন সামান্য ঘুষঘুষে জ্বর হ'তে থাকে যে, বিশেষ ক'রে থার্মোমিটার দিয়ে না দেখলে সে জ্বর প্রায় ধরাই পড়ে না। হয়তো ঘুম থেকে ওঠবার পরে কিংবা সন্ধ্যার দিকে শরীরটা জ্বরভাব বোধ করতে থাকে, চোখ দুটো ছল ছল করতে থাকে, একটুও নড়তে চড়তে ইচ্ছা হয় না। সে সময় থার্মোমিটারে মাত্র ৯৯ ডিগ্রির বেশি উত্তাপ ওঠে না, সুতরাং সেটা প্রকৃত জ্বর কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। এই সামান্য জ্বরের তেমন কিছু নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন এটাকে হয়তো মৃদু প্রকৃতির ম্যালেরিয়া বা অন্য কিছু বলে বিবেচনা হয়। আর এটা যথার্থ জ্বর কিনা তাই বিচার করতে করতেই অনেক সময় কেটে যায়। প্রথমে মনে হয় ও বিশেষ কিছু নয়, যা হয়েছে তা আপনিই সেরে যাবে। তারপর হয়তো সারলো না দেখে কিছু টোট্‌কা চিকিৎসা শুরু হয়, তার পরে কুইনিন ও অন্যান্য গোঁজামিল দেওয়া রকমের ডাক্তারি ঔষধও খাওয়া হয়, এমনভাবে অকারণ সামান্য জ্বর হতে দেখলে বিলম্ব না ক'রে প্রথম থেকেই তার পুরাপুরি বিহিত করা উচিত। দুঃখের বিষয় এই যে, জ্বর হচ্ছে কি না এই ব্যাপারটা আমরা অনেক সময় আন্দাজেই বুঝে থাকি, থার্মোমিটারের সাহায্য নিতে সহজে আমরা গা করি না। আর এই রোগের ঘুষঘুষে জ্বরের প্রকৃতিটাই এমন যে, রোগী নিজেও বুঝতে পারে না যে তার জ্বর হচ্ছে, কাজেই তার আত্মীয়স্বজনেরাও রোগীর মুখে কিছু না শুনে সে বিষয়ে কিছু খেয়াল করে না। সেইজন্য প্রায়ই এমন দেখা যায় যে, বহুদিন থেকে রোগীর একটু একটু জ্বর হচ্ছে অথচ কেউ সে কথা জানে না। যখন বিশেষ ক'রে বলা হলো যে জ্বর হোক কিংবা নাই হোক, প্রত্যহ নিয়মিত চারবার ক'রে থার্মোমিটার লাগিয়ে টেম্পারেচারটা কাগজে লিখে রাখতে হবে, তখন দেখা গেল যে প্রত্যহই এক সময় কিছু কিছু ক'রে জ্বর হচ্ছে। এমনি ভাবেই অনেক অনির্দিষ্ট রোগ ধরা পড়ে যায়। অতএব আমাদের ভালো ক'রেই শিখে রাখা দরকার যে অসুস্থতার কোনো সন্দেহ হ'লেই কুঁড়েমি না ক'রে কিংবা নিজের আন্দাজের উপর নির্ভর না ক'রে থার্মোমিটার দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করতে হবে। মানুষের আন্দাজ সব সময় নির্ভুল হয় না বলেই থার্মোমিটার যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের চোখ যেখানে দেখতে পায় না সেখানে অনেক সময় এই যন্ত্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এমন একটা উপকারী যন্ত্রের সময়মতো সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। তবে আমরা কেবল সদ্ব্যবহারেরই কথা বলছি, অসদ্ব্যবহারের নয়। ঘন ঘন থার্মোমিটার লাগাতে শুরু করা, সেটাও একটা রোগ।

আরো একটি প্রধান লক্ষণ **নাড়ির দ্রুতগতি।** টুবারকুলোসিসের বিষক্রিয়াতে নাড়ির গতি নিশ্চয়ই কিছু বেড়ে যাবে, অর্থাৎ রোগীর নাড়ি সাধারণ মানুষের নাড়ির চেয়ে বেশি চঞ্চল হবে। ঘড়ি ধরে নাড়ি স্পন্দনের সংখ্যা গুণে দেখলে বিশ্রামের অবস্থাতেও হয়তো তার সংখ্যা ১০০র কাছাকাছি হবে। নাড়ির এই দ্রুতগতি দেখেই কবিরাজরা এই সব ক্ষেত্রে বলে থাকেন যে গায়ে জ্বর না থাকলেও নাড়িতে জ্বর আছে। প্রকৃতপক্ষে হয়ও তাই। পরীক্ষার সময়টিতে হয়তো থার্মোমিটারে জ্বর নেই কিন্তু নাড়ির গতি দেখেই বোঝা যায় যে, প্রত্যহ নিশ্চয়ই তার জ্বর হচ্ছে। যারা অভিজ্ঞ তারা নাড়ি ধরলেই এটা বুঝতে পারে, নতুবা গণন করলেই ধরা পড়ে যায়।

শুধু দ্রুতগতি নয়, এই রোগে নাড়ির চাপ কমে যায় অর্থাৎ ব্লাড প্রেসার কমে যায়। এটাও একটা বিশেষ লক্ষণ। এটাও হয় বীজাণুদের বিষক্রিয়ারই ফলে। আমাদের ব্লাড প্রেসার সাধারণাপেক্ষা ১০০ মিলিমিটারের চেয়ে খানিকটা বেশিই হয়ে থাকে, এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেটা কিছু কিছু বাড়ে। কিন্তু এই রোগে ব্লাড প্রেসার যথেষ্ট কমে যায়, এমন কি ১০০ মিলিমিটারের কাছাকাছি কিংবা তার নিচেও নেমে যায়। ব্লাড প্রেসারের যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা না করলেও এই ব্যাপারটা নাড়ি ধরে টের পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এমনও কেউ কেউ বলেন যে, রোগীর যেদিকের ফুসফুসে রোগের আক্রমণ হয়েছে সেই দিকের নাড়ির চাপ অন্য দিকের অপেক্ষা আরো খানিকটা কমে যায়। এই

একসঙ্গে দুই হাতের নাড়ি ধরে তুলনা ক'রে দেখলে সেটা বুঝতে পারা যায়। অবশ্য এটা বুঝতে হ'লে কিছু অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, ...লের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

এ ছাড়া আর একটি বিশেষ পরিচিত লক্ষণ হলো কাসি। ফুসফুস কিংবা শ্বাসযন্ত্রের অন্য কোনো অংশ এই রোগে আক্রান্ত হ'লে কাসি অবশ্য থাকবেই। কিন্তু সেটা টুবারকুলোসিসের কাসি হলেও তার বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। সাধারণ কাসির সঙ্গে এই রোগের কাসির কোনো একটা বিশেষ পার্থক্য থাকে না। সে কাসি শুকনো খকখকে ধরণেরও হ'তে পারে আবার ভিজে ঘংঘং শব্দযুক্ত কাসিও হ'তে পারে। কাসির শব্দ কিংবা ধরণ দেখে রোগ চেনবার কোনো উপায় নেই। গলার কাসি কিংবা বুকের কাসি কিংবা পেটের কাসি, সব রকমই এ রোগে হতে পারে। তেমনি কাসির সঙ্গে নিক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবন দেখেও রোগ চেনবার উপায় নেই। সেটা গাঢ় শ্লেষ্মামিশ্রিতও হ'তে পারে, আবার পাতলা লালা মিশ্রিতও হ'তে পারে। সেটা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করিয়ে তবেই কখনো কখনো জানা যায় যে তার মধ্যে টি বি আছে, তাও সকল সময়ে নয়। সুতরাং ঐ পরীক্ষাতেও যে রোগটা ধরা পড়বে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে কাসির সঙ্গে যদি রক্তের ছিট দেখা দেয়, সেটা নিশ্চয়ই ঘোরতর সন্দেহজনক। বীজাণুর ক্রিয়াতে রক্তের শিরা নষ্ট হয়েই এটা হয়। রোগের প্রথম অবস্থাতেই যদি এমনি কাসির সঙ্গে রক্ত নির্গত হ'তে দেখা যায় তা'হলে তো সকলে রোগটাকে সহজেই বুঝতে পারলে, আর রোগীর পক্ষেও সেটা শাপে বর পাবার মতো। কারণ রক্ত দেখলেই সকলে ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ তার সমুচিত পরীক্ষা আর চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে ছুটবে, শীঘ্রই তার একটা কিনারা হবে। কিন্তু রক্ত না দেখলে কেসে কেসে দম ফেটে মরে গেলেও সহজে কেউ ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করাবে না। অথচ মাসখানেকের চেয়ে বেশি দিনের কাসি মাত্রই সন্দেহজনক।

মোট কথা অনেকগুলি বাহ্য লক্ষণ থেকেই এই রোগের সন্দেহ করা যেতে পারে। যদি দেখা যায় যে, বিশেষ কোনো কারণ ব্যতীত কারো ওজন কমে যাচ্ছে, তার শরীরটা ক্রমশ নিস্তেজ হ'য়ে যাচ্ছে, তার ক্ষুধার গোলমাল হচ্ছে, অনেকদিন থেকে তার একটু একটু কাসি হচ্ছে, আর লক্ষ্য করে যদি দেখা যায় যে, তার একটু একটু জ্বর হচ্ছে, তার নাড়ির গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত, তার নাড়ির চাপ কম, তা'হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তার শরীরে টুবারকুলোসিসের সূত্রপাতের খুবই সম্ভাবনা। তাকে সকল রকম উপায়ে রীতিমত পরীক্ষা করানো দরকার। অতএব কালবিলম্ব না করে সে বিষয়ে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে।

ডাক্তারি পরীক্ষার নানাবিধ উপায় আছে। তার মধ্যে প্রথম উপায়টি হলো **স্টিথোস্কোপ যন্ত্র**। বক্ষ গহ্বরের দুই পাশে দুটি ফুসফুস আছে, আর মাঝে আছে হৃদপিণ্ড। সেইজন্য এই যন্ত্রের দ্বারা হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুস দুইই পরীক্ষা করা হয়। ফুসফুসে বায়ু প্রবেশের দরুণ যে শব্দ হয়, এর দ্বারা তারই প্রকৃতি শুনে আমরা রোগ নিরূপণ করি। ফুসফুসের মধ্যে বীজাণু কর্তৃক যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাতে কোষগুলির মধ্যে শ্লেষ্মাজাতীয় কিছু তরল পদার্থ জমে। অতএব লম্বা লম্বা শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার সময় সেখানে বায়ু প্রবেশ ক'রে ঐ তরল পদার্থকে নাড়াচাড়া দিয়ে যে অস্বাভাবিক শব্দ উত্থিত হয়, আমরা স্টিথোস্কোপের নলের সাহায্য নিয়ে বুকের উপর থেকে তাই শুনতে পাই। সে পদার্থ বেশি তরল হলে জলে ভুড়ভুড়ি কাটার মতো একপ্রকার শব্দ শোনা যায়। সেটা ফুসফুসের যে অংশে শোনা যায় সেই অংশটাকেই তখন আক্রান্ত বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু ঐ পদার্থ যদি কিছু ঘন হয় অথবা কম পরিমাণে থাকে, তাহ'লে ছোটো ছোটো বুদ্বুদ ফাটার মতো চিড়চিড় ক'রে এক একটা পৃথক পৃথক শব্দ হ'তে থাকে। কিন্তু যদি ঐ তরল পদার্থে স্থানীয় কোষগুলি একেবারে পরিপূর্ণ হ'য়ে যায় তাহ'লে সেখানে বায়ু আদৌ প্রবেশ করতে না পারায় আর কোনো শব্দই হয় না, শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক সোঁ সোঁ শব্দটাও আর সেখানে শোনা যায় না। ফুসফুসের কোনো অংশ এইরকম বায়ুপ্রবেশের শব্দবিহীন হ'লে আমরা অনুমান করতে পারি যে, কোষগুলি কোনো অস্বাভাবিক পদার্থের দ্বারা পরিপূর্ণ হ'য়ে রয়েছে, তাই সেখানে বায়ু আর প্রবেশ করতে পারছে না। যাকে বলে প্লুরিসি, তাতেও অনুরূপ শব্দহীনতা প্রকাশ পায়। সুতরাং এই তিন রকম বৈচিত্র্যের দ্বারাই আমরা ফুসফুসের রোগ নিরূপণ ক'রে থাকি।

দ্বিতীয় উপায় **পারকাশান ও প্যালপেশান**। পারকাশান অর্থে বুক ঠুকে পরীক্ষা করা। এক হাতের আঙুল বুকের উপর বসিয়ে অন্য হাতের আঙুল দিয়ে তার ওপর ঠুকে ঠুকে শোনা হয় ভেতরটা ফাঁপা না কঠিন। ফুসফুস স্বভাবত বায়ুপূর্ণ যন্ত্র, সুতরাং সেটা ফাঁপাই হওয়া উচিত এবং উপর থেকে ঠুকলে ফাঁপার মতো আওয়াজটাই হওয়া উচিত। কিন্তু তার মধ্যে কোনো স্থানে যদি কোনো তরল পদার্থ জমে যায়, তাহ'লে সে জায়গাটা পূর্ণকুম্ভের মতো বোদা খট্‌খট্‌ ভাবের আওয়াজ করবে। এই পরীক্ষা অনেকটা রাজমিস্ত্রিদের কর্নিক ঠুকে দেয়ালের পলস্তারা মজবুত আছে কিনা পরীক্ষা করবার মতো। যারা এ পরীক্ষায় অভিজ্ঞ তারা ঠোকার শব্দ শুনে অনায়াসেই বুঝতে পারে কোন ফুসফুসের কতটা অংশ আক্রান্ত হয়েছে। আর প্যালপেশানের পরীক্ষাতে রোগীর বুকের দুই পাশে দুটি হাত রেখে তাকে কথা বলতে আদেশ করা হয়। এতে বোঝা যায় তার কথার শব্দতরঙ্গ ফুসফুসের ভিতর দিয়ে এসে কোনভাবে হাতের উপর আঘাত করছে, আর দুই দিকের অনুভূতিতে কোনো পার্থক্য আছে কিনা।

তৃতীয় উপায় **নিষ্ঠীবন পরীক্ষা**। স্বাভাবিক বা চেষ্টাকৃত কাসির দ্বারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে শ্লেষ্মা গয়ার নিষ্ঠীবন প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হয় তাই কোনো পাত্রে সামান্য ফর্মালিন সহযোগে রোগীকে সঞ্চয় ক'রে রাখতে বলা হয় এবং তাই থেকেই ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় যে, তার মধ্যে কোনো টিউবারকল বীজাণু আছে কি না। অনেক স্থলে এই পরীক্ষার দ্বারাই রোগটি ধরা পড়ে যায়, কিন্তু অনেক স্থলে আবার পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা সত্ত্বেও কিছু পাওয়া যায় না। বীজাণু পাওয়া গেলে রোগটি যে হয়েছে তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু না পাওয়া গেলে এ রোগ যে নয় সেকথা বলা যায় না।

চতুর্থ উপায় **রক্ত পরীক্ষা**। এতে পূর্বোক্ত রূপে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও পরোক্ষভাবে এমন কতকগুলি চিহ্ন পাওয়া যায় যার দ্বারা রোগের সন্দেহটা দৃঢ়তর কিংবা অমূলক ব'লে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটা ঠিক রোগ নির্ণয়কারী পরীক্ষা নয়, রোগ নির্ণয়ের সহায়ক মাত্র।

কিন্তু আমরা যে চার রকম পরীক্ষার কথা উল্লেখ করলাম, তার প্রত্যেকটিরই আপেক্ষিক সার্থকতা থাকলেও, কোনোটিই যে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিতভাবে রোগ নির্দেশক নয়, এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এই সকল পরীক্ষার দ্বারা অনেকের রোগই যে ধরা পড়ে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তথাপি খুব প্রথম অবস্থায় অনেকের রোগই সনাক্ত হ'তে বাদ পড়ে যায়। তাতে যে সব সময় পরীক্ষকের অমনোযোগিতাই প্রমাণ হয় এমনও কোনো কথা নয়। অন্যান্য পরীক্ষার কথা ছেড়ে দিলেও ডাক্তারেরা সাধারণত নিজের নিজের স্টিথোস্কোপের উপর খুবই আস্থা স্থাপন ক'রে থাকে। তারা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করেও যখন দেখে যে বুকে কিছু পাওয়া গেল না, তখনই তারা রোগীকে আশ্বাস দিয়ে বলে যে, তোমার ও কিছু নয়। কিন্তু কোনো কোনো স্থলে তারা কিছুদিন পরেই অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে দেখতে পায় যে ঐ অভিমত দেওয়া তাদের ভুল হয়েছিল। এতে রোগীরও কোনো দোষ নেই কারণ সে সময়মতো ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, আর ডাক্তারেরও কোনো দোষ নেই কারণ সে তার সাধ্যমতই পরীক্ষা করেছিল। কিন্তু

আসলে রোগটারই এই স্বভাব, সে এমনিভাবেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। সুতরাং কেবল স্টিথোস্কোপের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকলে আর আমাদের চলবে না।

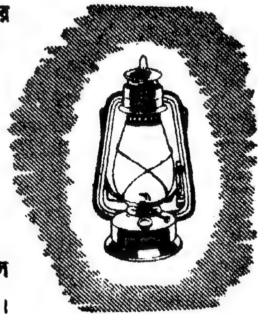
পুনঃ পুনঃ ঠেকে শিখে এখন আমরা দুটি কথা বিশেষভাবেই জেনেছি। একটি কথা এই যে, টুবারকুলোসিস রোগের প্রকৃত সূচনা বলতে যা বোঝায় সে সময়ে রোগীর শরীরে তার কোনোরকম ধর্তব্য লক্ষণই প্রায় থাকে না। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, রোগ খানিকটা অগ্রসর হ'লেও এবং শরীরে তার কিছু লক্ষণাদি প্রকাশ পেলেও স্টিথোস্কোপের দ্বারা পরীক্ষায় অনেক সময় ফুসফুসে তার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব নিখুঁত পরীক্ষার জন্য আরো আমাদের প্রত্যক্ষ এবং কঠোরতর উপায় অবলম্বন করতে হবে। আগেকার দিনে আমরা কেবল নাড়ি টেপার অনুভূতির ওপরেই নির্ভর করতাম। স্টিথোস্কোপ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর আমরা তার বদলে কানে শোনার উপরে নির্ভর করতে লাগলাম। কিন্তু কানে শুনে নিশ্চিন্ত হবার দিনও এখন চলে গেছে। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, টুবার-কুলোসিস কানে শুনে ধরবার রোগ নয়, এটি চোখে দেখে ধরবার রোগ। ফুসফুসের অবস্থাটা কেবল কানে শুনে অনুমান করে নিলেই চলবে না, এর অবস্থাটা রঞ্জন রশ্মি ফেলে স্বচক্ষে দেখে নিতে হবে। আর আন্দাজে বুঝে অন্ধকারে ঢিল ফেলার মতো চিকিৎসাও এখন চলবে না, স্পষ্ট করে বুঝে নিয়ে কৃতনিশ্চয়ভাবে চিকিৎসায় নামতে হবে।

অতএব রোগ চেনবার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হলো **রঞ্জন রশ্মির দ্বারা পরীক্ষা**। এ দ্বারা আমরা নির্ভুলভাবে জানতে পারি যে ফুসফুসের কতখানি অংশ কেমনভাবে আক্রান্ত হয়েছে, আর আদৌ আক্রান্ত হয়েছে কিনা। শুধু তাই নয়, চিকিৎসা শেষ হয়ে যাবার পরেও এর দ্বারা বলা যায়যে রোগটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়েছে কিনা। সুতরাং এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর অনেকটাই নির্ভর করতে পারা যায়। ভ্রান্তি হওয়া কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এতে খুবই কম। বিশেষত রোগের প্রথম অবস্থা ধরবার পক্ষে এই উপায়টি অদ্বিতীয়। সুতরাং সন্দেহস্থলে গৌণ হিসাবে নয়, মুখ্য হিসাবেই এই পরীক্ষা করানো উচিত, এবং সেটা বিলম্ব না করে প্রথম কর্তব্য রূপেই করা উচিত। বিলম্ব করলেই একজনকে সহজ প্রাণ রক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতে পারে। যদি এই পরীক্ষায় কিছু দোষ না পাওয়া যায়, তাহলে রোগীকে নিশ্চিন্তভাবেই বলা যেতে পারে যে তার এ রোগ হয়নি। আর যদি সামান্যও কিছু পাওয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তার আশু প্রতিকার হতে পারে। শুধু তাই নয়, এতে রোগীর বাড়ির লোকদের এবং প্রতিবেশীদেরও অনেক মঙ্গল হতে পারে, কারণ রোগটা জানা গেলে অন্যান্য লোকদের যথারীতি সাবধান করাও যায়। এইজন্যই ডাক্তারেরাও আজকাল এক্সরে পরীক্ষার ফলাফলের উপর সব চেয়ে বেশি নির্ভর করে থাকেন।



৩৩'৭২ কোটি পল্লীবাসীর প্রাণ
দীপ্তির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক

গ্রামবাসী সারাদিন ধরে তার নিজের ছেলেমেয়ে পরিবার-পরিজনের জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। সে জানে তারই উপর নির্ভর করছে একটি ছোট্ট পরিবারের সুখদুঃখ, হাসি-কান্না। দিনের শেষে ঘরে ফিরে তার সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায় যখন দীপ্তির ঝক্‌ঝকে আলোর মাঝখানে সে তার প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হয়।



দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা

BDL.11/S47

বিষুব রেখা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে যামিনী। ইনিয়ে বিনিয়ে হাপুস-নয়নে কাঁদে অনেকক্ষণ ধরে। মাটির দেয়ালে ঘসে নেয় পিঠটা। ঘামাচিভরা পিঠটা মাঝে মাঝে চিড়বিড় ক'রে ওঠে বুঝি।

আ মরণ, কান্নার ঢং দেখো। লজ্জাও করে না বুড়োবয়সে সুর তুলে চেঁচাতেঃ কুয়োতলা থেকে খিঁচিয়ে ওঠে মানদা। ক্ষার মাখিয়ে কাপড়টা সাবধানে আছড়াচ্ছে শান-বাঁধানো চাতালটায়। একে ফেঁসে গেছে কাপড়টা সাত জায়গায়, তার ওপর অনেকদিনের পুরোণোও হ'লো বৈকি। গামছা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে উদলা গায়ে তালে তালে কাপড় আছড়ায় মানদা। হাওয়ায় সজনে পাতাগুলো ঝরে পড়ে তার গায়ে আর মাথায়। মাঝে মাঝে কাপড় কাচা থামিয়ে হাত দিয়ে মাথা থেকে ফেলে দেয় পাতাগুলো, আর গজ্ গজ করে আপন মনে।

আড়চোখে শাশুড়ীর দিকে একবার চেয়ে দেখে যামিনী। কাপড় কাচার ঢং দেখে মুচকে একটু হেসেই ফেলে বুঝি, তারপর সামলে নিয়ে আবার চীৎকার ক'রে কাঁদে তার বছরখানেক আগের সাত মাসের মরা ছেলেটার নাম ধরেঃ খোকন রে, তোর মায়ের হেনস্তা একবার দেখে যা বাপ। তুই থাকলে এ অভাগীর গায়ে হাত দিতে কোন ড্যাকরা সাহস করতো রে।

পথচলতি দু-একটা লোক বেড়ার ধারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। উঁকি ঝুঁকি দেয় রাং-চিতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে। ননী বৈরাগীর ছোট ছেলে কুঞ্জ কিন্তু নড়বার নাম করে না। বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আর হাসে মুচকে মুচকে। গায়ের আঁচলটা মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছে যামিনী। পিঠটা ঘসছে মাটির দেয়ালে, আর দুলে দুলে কাঁদছে জোরগলায়।

মন্দ লাগে না কুঞ্জর। মাতাল নন্দর বরাতই বলতে হবে, নয়ত এ বৌ ঘরে তোলা আর তার ভাগ্যি নাকি? হাত-পায়ের নিটোল গড়ন আর সুডৌল পিঠের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন যেন মনে হয় কুঞ্জর। বোকামিই করেছে সে এ জিনিস হাতছাড়া ক'রে। পারুল এর পায়ের যুগ্যি নাকি? দেখতে দেখতে বেড়া ফাঁক ক'রে উঠানেই ঢুকে পড়ে কুঞ্জ, ঢুকেই কিন্তু একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। ঠিক দাওয়ার পাশে বাজপড়া সিঁদুরে আমগাছটার তলায় বসে তীর-ধনুক তৈরী করছিল নন্দ। রাংতা দিয়ে তীরের ফলাগুলো চক্‌চকে ক'রছিল একমনে, হঠাৎ উঠানে ছায়া পড়তেই দেখে চোখ তুলে। একবার শুধু চোখ তুলে চাওয়ার অপেক্ষা, ব্যস, তারপরেই তীর-ধনুক হাতে ক'রে একেবারে কুঞ্জর সামনে এসে দাঁড়ায় নন্দ ঃ বলি ভেবেছো কি মনে? বৌ-ঝি নিয়ে গাঁয়ে কাউকে বাস ক'রতে দেবে না, না কি?

উত্তরটা এড়িয়ে যায় কুঞ্জ। নন্দর হাত থেকে চট্ করে তীরটা টেনে নিয়ে বলেঃ মাইরি, বলিহারী হাত নন্দদা তোমার। কে বলবে যাত্রার তীর-ধনুক। একেবারে সত্যিকারের মতন ঝকঝক করছে তীরের ফলাটা।

হতভম্ব হ'য়ে যায় নন্দ। লজ্জা নেই নাকি কুঞ্জটার। ফিকির খুঁজে খুঁজে ঠিক এসে জোটে যামিনীর সামনে। যামিনীরও সরম নেই একটু। কান্না থামিয়ে ড্যাবড্যাব ক'রে চেয়ে আছে বেহায়ার মতন। হ'লোই বা বাপের বাড়ির দেশের লোক, তা ব'লে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে অমন ক'রে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে নাকি কারুর বাড়ির ঝি-বৌ?

সময় একটুও নষ্ট করে না কুঞ্জ। একটা হাত দিয়ে চাপড়ায় নন্দর পিঠ আর বলে ঃ ও, কাল যা দেখালে তুমি সত্যি, পায়ের ধুলো দাও নন্দদা। শহরেও তো দেখেছি রামের পার্ট—এমন কি রমণী দাসেরও রাম দেখেছি, ওর নাম কি বিলাসপুরের জমিদার বাড়িতে, আরে ছো, ছো—কিসে আর কিসে। তোমার মতন এমন গলা পাবে কোথায় রমণী দাস! ভেমো গয়লার ছেলে এমন চেহারাই বা পাবে কোথায়? কাল বাবুর বাড়ির মেয়েরাও সব বলছিলো,—হ্যাঁ গলা বটে নন্দর, যেমনি চেহারা, তেমনি গলা। রিহার্সালেই এই, আসল দিনে পোষাক-আষাক প'রে না জানি কেমন দেখাবে।

ভিজে যায় নন্দ। ওর চোখ-মুখের চেহারাই যায় বদলে। কপালের ওপর এসে পড়া চুলের গোছাটা হাত দিয়ে পিছনে ঠেলে দিয়ে বলেঃ বাবুর বাড়ির মেয়েরা বলছিলো বুঝি আমার কথা?

ঃ হ্যাঁ গো, ও'দের আমিই বাড়ি পৌঁছে দিলুম কি না। সারাটা রাস্তা কেবল নন্দ আর নন্দ। ওই যে চশমা চোখে ছুঁড়িটা, কলেজে পড়ে বুঝি ক'লকাতায়, সে তো একেবারে থামতেই চায় না। বলে, অন্নমাসী, এই সব লোক শহরে গেলে লুফে নেবে একেবারে। আহা, কি ছিরি, আর কিবা গলা। সেই মেয়েটিকে তুমি দেখেছো নন্দদা, রিহার্সালের সময়?

হাত দিয়ে গোঁফের কোণ দুটো মুচড়ে নেয় নন্দ। চোখ দুটোয় একটা উদাস ভাব আনেঃ পার্টের সময় কি কিছু আমার খেয়াল থাকে কুঞ্জ! সীতা বনবাসে যাবে, বুকের ভেতরটা আমার হাঁচোড়-পাঁচোড় করে শুধু। সামনে কে আছে, আর কে নেই, খেয়ালই থাকে না। তবে মেজবাবু বলছিলেন বটে,—নন্দ, আজ ভালো ক'রতে হবে পার্ট, বাড়ির মেয়েরা সব আসবে রিহার্সাল শুনতে।

আহা হাঃ উবু হ'য়ে ব'সেই পড়ে কুঞ্জঃ তোমার সেই চীৎকারটা নন্দদা। দু-চোখ বেয়ে জল পড়ছে গড়িয়ে, দু'হাতে বুকটা চেপে ধরেঃ সীতা, সীতা, ব'লে চীৎকার—সত্যি অমন যে পাষণ্ড রাধানাথবাবু, সুদের সুদ তসা সুদ আদায় করে, ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে লোকের কাছাগলায় কচি ছেলেকে আর কাঁচা বিধবাকে পথে বসায়, সেও পর্যন্ত কোঁচার খুঁটে চোখ মুছছিলো কালকে। দাও দাদা, পায়ের ধুলো দাও, ভেতরে একটু ইয়ে না থাকলে এসব জিনিস হয় না। সত্যিই হাত দিয়ে পায়ের ধুলো নেয় কুঞ্জ। কপালে আর ঠোঁটে ঠেকায় আর বলেঃ সাথক জন্মেছিলে দাদা।

কাপড় কাচা বন্ধ করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মানদা। ভিজে কাপড়টা ভাঁজ করে বুকে জড়ায়। নজর বড়ো খারাপ কুঞ্জর কচি-কাঁচা তো দূরের কথা, বুড়োহাবড়ার ওপর আলগোছে নজর বুলাতেও একটু ইতস্তত করে না। হবে না কেন, রক্তের দোষ যাবে কোথায়। ওর খুড়ো আদিনাথ বৈরিগী বুড়ো বয়সে হরিদাসী বোষ্টুমীকে নিয়ে কি কীর্তিটাই ক'রলে পাড়ার মধ্যে। আর ওর বাপের কথা তো ছেলেবুড়ো থেকে শুরু ক'রে কারো আর জানতে বাকি নেই। বাগ্দীদের বৌ উজ্জ্বলাকে নিয়ে বাগ্দীপাড়ায় গিয়ে ডেরা বাঁধলো শেষে। তাদেরই বংশধর তো কুঞ্জ ও আর ভালো হবে কি করে? কিন্তু নন্দর সঙ্গে এত কথা কি ওর? হেসে হেসে হাত মুখ নেড়ে কিসের এত আলাপ? নন্দটাও আকাট মুখ্যু—যাত্রাগান আর হৈ চৈ ক'রে যা কিছু ছিলো জমিজেরাৎ সমস্তই দিলে মহাজনের পেটে। বাপ পিতেম'র ভিটেটা এখন টলমল করছে শুধু, গেলেই হয় এমনি অবস্থা।

মানদাকে এক নজরে দেখে নেয় কুঞ্জ। চট ক'রে উঠে পড়ে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করে মানদাকে। সাথক ছেলে গব্বে ধরেছিলে ...সী. সারা গাঁয়ের লোকের মুখে সুখ্যেত আর ...রে না। চরবংশীর নাম যদি কেউ রাখে তো আমাদের নন্দদা।

লাফিয়ে তিন হাত সরে আসে মানদাঃ সরো বাছা, এই চান করে উঠলুম, আর চান করতে পারবো না এই সাতসকালে।

ইঙ্গিতটা বোঝে কুঞ্জ। পায়ে পায়ে সরে এসে বসে নন্দর কাছে। বলেঃ নন্দদা, সেই-খানটা একটু শোনাও মাইরী। লক্ষ্মণ শক্তিশেল খেয়ে আছড়ে পড়েছে মাটিতে, আর রাম বিলাপ করছে।

হাতের তীর-ধনুকটা সরিয়ে রাখে নন্দ। কাঁধের গামছাটা দিয়ে মুখটা মুছে নেয় তারপর চোখদুটো বুজে শুরু করেঃ

ভাই রে লক্ষ্মণ,
চেয়ে দেখ, মেল রে নয়ন। বল রে কেমনে
প্রবোধিব সুমিত্রা মাতা রে। রে অনুজ,
ওঠ আজি
ভূমিশয্যা ত্যজি। দুই ভাই দাঁড়াই আবার
দেখি শক্তিমান কে আছে এ রক্ষপুরে,
আঁটিবে সমরে।

লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ, অনুজ আমার—

বরাতই বলতে হবে কুঞ্জর। ওপর থেকে গাছের ছোট একটা ডাল ভেঙে পড়ে একেবারে নন্দর মাথার উপর—শুকনো একটা ডালের টুকরো কাকেই ঠুকরে ফেলে বুঝি। চমকে চোখ চেয়েই চীৎকার করে ওঠে নন্দঃ তবে রে শালা, এই তোমার রামের পার্ট শুনতে আসা? বেরোও, বেরোও এক্ষুনি, নইলে খুনোখুনি হয়ে যাবে বলছি।

দোষ অবশ্য কুঞ্জরই। নন্দর চোখ বোজার সুযোগে যামিনীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সে। যামিনীও ঘোমটার ফাঁক দিয়ে পিট পিট করে চেয়ে চেয়ে দেখে। মাথায় রক্ত উঠে যায় নন্দর। কঞ্চির তীর দিয়ে ধাঁ করে একটা বসিয়েই দেয় কুঞ্জর পিঠে। বাইরের আপদটা বিদেয় হোক তো আগে, তারপর ঘরের বৌকে শায়েস্তা করতে আর কতক্ষণ।

রাংচিতার বেড়া পার হয়ে উধাও হয়ে যায় কুঞ্জ। ততক্ষণে কিন্তু সামলে নিয়েছে যামিনী। ভুলে যাওয়া কান্নার রেশটা আবার শুরু করে। পা দুটো ছড়িয়ে এবার কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

নন্দ নয়, এবার মানদা আসে এগিয়েঃ বলি বাছা, সরমভরম কি কিছুই নেই তোমার! হ'লোই বা বাপের বাড়ির চেনাজানা লোক, ঘোমটা খুলে. তাব'লে অমনি ক'রে চেয়ে থাকাটা কি জন্য শুনি? তোমার আস্কারা পেয়েই তো ঘুর ঘুর করে আসে এখানে।

উত্তর দেয় না যামিনী। বোকা বোকা মুখ করে ফ্যাল ফ্যাল করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শাশুড়ীর দিকে। ওর এই ন্যাকাপনায় গা যেন জ্বলে ওঠে মানদার। প্রতিবাদ করুক কিংবা চেঁচিয়ে মেঁচিয়ে পাড়া মাত ক'রে বলুক দু-একটা কথা নিজের পক্ষে, কিন্তু কথাটি পর্যন্ত নয় শুধু এই হাঁ করে চেয়ে থাকা,—কিছুই যেন জানে না ও। ঘরের বৌ হয়ে পরপুরুষের নজরে পড়া যে পাপ, এও যেন বোঝা ওর ক্ষমতার বাইরে।

ন্যাকা চণ্ডী,—সপ্তমে সুর ওঠে মানদার—লজ্জা-ঘেন্না কিছুই নেই বুঝি। এই সকালে নন্দ দিলে দুদ্দাড়িয়ে ঠেঙিয়ে, তবু হুঁস আছে! ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো।

সকালের ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকমের। নারকোলের পাতার ফাঁকে ফাঁকে পায়রা আর শঙ্খচিলের পালক দিয়ে চমৎকার মুকুট তৈরী করেছিলো নন্দ,—রামের মুকুট। ভাড়া করে আনা মুকুটের চেয়ে কোন অংশে বেমানান হয় নি। এর ওপর রাংতার পাত পড়লে হার মানাবে আসল মুকুটকে। কি জানি কি খেয়াল হ'লো যামিনীর। ভোরবেলা উঠে মশারির চাল থেকে মুকুটটা পেড়ে নিয়ে মাথায় দেয় নিজের। শুধু কি তাই, বিয়ের সময় পাওয়া ভাঙা আয়নার সামনে ব'সে উঁকি মেরে মেরে দেখে যামিনী—নিজের রূপ।

এতে অবশ্য একটুও রাগ করে নি নন্দ। বরং পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে আর বলেছেঃ বা, বা, দিব্বি মানিয়েছে কিন্তু। যুগীদের চোয়ালভাঙা সতীশের বদলে তোমাকেই নামিয়ে দেবো সীতার পার্টে। মাইরী, কি চমৎকারই হবে তাহ'লে।

কিন্তু চটে উঠেছে যামিনী। মুকুটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলেছে মেঝেয়, তারপর বলেছেঃ ঝাঁটা মারি তোমার পার্টের মুখে। ভদ্দরলোকের ছেলে হ'য়ে লজ্জাও করে না চুণকালি মেখে গাঁয়ের দশজনের সামনে নাচতে।

ব্যস, আর বলতে হয় না। এইটুকুই যথেষ্ট। নিজের বৌ-ঝিয়ের নিন্দেও শুনবে কাণ পেতে, একটি কথাও বলবে না, কিন্তু নিজের পার্টের নিন্দে ও বরদাস্ত করবে না কিছুতেই। জ্বলে উঠবে। কিছুতেই সামলাতে পারবে না নিজেকে। সেদিন হাটে তো যদু গোঁসাইয়ের সঙ্গে হাতাহাতিই হবার জোগাড়। আজ ঠিক সেই কথাই বলতে শুরু করেছে যামিনী। ঘরের বৌ বলে পার পেয়ে যাবে না কি সে।

খবদ্দার: হাতটা উঁচিয়ে একেবারে টান হ'য়ে দাঁড়ায় নন্দ: সাবধান বলছি, আর যা ইচ্ছে বলতে চাও বলো, এইটি বাদ দিয়ে.—খুন হ'য়ে যাবে কিন্তু।

বরাত খারাপই বলতে হবে যামিনীর। অন্য মেয়েছেলে হ'লে চুপ করে যেত নিশ্চয়। কিংবা হয়ত মেজাজ ঠাণ্ডা করতে বিনিয়ে বিনিয়ে অন্য সব কথা বলতো, কিন্তু মরণ যামিনীর! সেও সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বললেঃ ওঃ, বিষ নেই কুলোপানা চক্কর। ভাত আনবার মুরোদ নেই, কিল মারবার গোঁসাই। গাজনের সং সেজে বেপাড়ায় বেড়াবে ঘুরে ঘুরে আর ঘরে এসে বৌয়ের ওপর তম্বি!

আর কিছু বলতে হয় না। জানলার মাথা থেকে কঞ্চি টেনে নিয়ে সপাসপ বসিয়ে দেয় যামিনীর পিঠে। এলোপাথারি মারতে শুরু করে। মানদা ছুটে এসে সরিয়ে দেয় নন্দকে। এতক্ষণ কিন্তু টুঁ শব্দটি করেনি যামিনী। মার থামতেই পা ছড়িয়ে বসে দাওয়ার উপর আর চীৎকার ক'রে পাড়া মাত করে। এসে জুটুক পাড়ার সবাই, ওর হেনস্থাটা দেখুক সকলে। বিচার করুক একটা,—বিহিত করুক এর। কিসের জন্য গায়ে হাত তুলবে শুনি? সোয়ামী ব'লে কি পীর নাকি?

সুপুরী গাছগুলোর পিছন দিয়ে দৌড়ে এসে মল্লিকদের এঁদো ডোবার পাশে ব'সে ব'সে হাঁপায় কুঞ্জ।

পাড়াতে একটা কানাঘুষো আছে অবশ্য যাই বলুক কুঞ্জর বাপ,—উজবুলার মুখ বসানে কুঞ্জর মুখে—এমন কি নাকের পাশের তিলটা পর্যন্ত। আজই না হয় মেজবাবুর পেয়ারের লোক হয়েছে সে। দশজনের সঙ্গে বসে আসরে বাবুরা উঠে গেলে গড়গড়ায় টানও দে... দু একটা, কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত গাঁয়ের মাতব্বররা এড়িয়ে চলতো তাকে। দে... হ'লে কোনরকমে ঘাড় নেড়ে পাশ কাটাতে সবাই। বাগ্দীর ছেলে আবার বৈরিগী ত... আবার ধম্মোনিষ্ঠা! ঘোর কলি বৈ কি, নইলে এ পাপ বসুমতী সইতো না কি কোনদি... চরবংশীর মাটি চিড় খেয়ে ফেটে যেতো না, বাঁজা হ'য়ে যেতো ফলফুলুরীর বাগান। অ... কিন্তু ভোল ফিরে গেছে সবাইয়ের। মেজবা... দয়ায় জাতে উঠেছে কুঞ্জ, গাঁয়ের এক মাতব্বর হ'য়েছে সে। টাকার জোরে বা... বৌ ধর্ম ছাড়ে, মা বাপ বেচে দেয় কো... ছেলেকে—আর এতো পাড়াপড়শী। কিন্তু গাঁ... দু একটা বুড়ী যেন কিছুতেই ভুলতে ... না পুরোনো কথাগুলো। আজও মাঝ... দেখা হ'লে, পায়ে পায়ে সরে যায় তারা, ছেড়ে ঘাসের ওপর গিয়ে দাঁড়ায় আর চলে ... বলেঃ ঘোর কলি দিদি, ঘোর কলি। বা... ছেলে দাবদাবিয়ে বেড়াচ্ছে গাঁয়ের বুকে চন্দ সুয্যি ঠিক উঠছে এখনো। ভগমান সত্যিই ঘুমোচ্ছে দিদি।

এই দলের লোক মানদা। অন্য ... কথা তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না কুঞ্জ। মানদার কথা আলাদা। যামিনীর শা... ওর সুনজরে থাকতে না পারলে সবই ... হ'বে যে তার। ঘুর ঘুর ক'রে আসা

নাকি যামিনীর বাড়ির আনাচে কানাচে। ভালোমন্দ দুটো কথা বলবারই বা অবকাশ পাওয়া যাবে কেমন করে।

চেষ্টা করে কিন্তু হতাশই হয়েছে কুঞ্জ। ঠিক দুপুর বেলা সুযোগ বুঝে একবার দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলো সে। খবর পেয়েছিলো ভোরবেলা উঠে মনসাপুরে রওনা হয়েছে নন্দ। হরিশচন্দ্র যাত্রা হবে মনসাপুরের মেলায়। দশকোশ ঝেঁটিয়ে লোক আসবে দলে দলে। নন্দর নামেতেই দশগুণ হয় ভীড়। এ তল্লাটে রাজারাজড়ার পার্ট করতে ওই নন্দ ঘোষাল সম্বল। ডাক আসে কাছে পিঠের দশ বিশখানা গাঁ থেকে,—পুজোপাব্বনে নন্দর হাজির থাকা চাই, নইলে আসরই মাটি।

কিন্তু আসল কাজের কিছুই হয়নি। উঠানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই জোর গলার আওয়াজ ঃ নন্দ বাড়ি নেই, কি দরকার তোমার বাছা?

আমতা আমতা করেছে কুঞ্জ ঃ দরকারটা তার সঙ্গেই ছিলো একটু। চট করে একটা মতলব মাথায় এসে যায় কুঞ্জর। ডুবন্ত লোক খড়ের কুটো ধরে বৈ কি সময়ে সময়ে ঃ একটু জল দিতে পারো মাসী, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

উঠানের এককোণে নারকেলের ছোবড়া চিরে রোদে দিচ্ছিলো মানদা আর যামিনী পা দুটো মেলে বসেছিলো দাওয়ায়। নন্দর পিরাণ একটা সেলাই করছিলো বুঝি। মানদা উঠতেই হাঁ হাঁ করে উঠেছিলো কুঞ্জ ঃ আহা হা, তুমি কেন কষ্ট করছো আবার! বৌদির কাছ থেকেই চেয়ে নিচ্ছি জল। দাও গো বৌদি, তেষ্টায় বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো।

পায়ে পায়ে দাওয়ার দিকে এগোতেই লাফিয়ে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলো মানদা, একেবারে কুঞ্জর সামনাসামনি ঃ তোমার এ তেষ্টা আমরা মেটাতে পারবো না বাছা। একটু এগিয়ে বাগ্দীপাড়ায় খোঁজ করো, বাপের কুটুম তো তারা, ঘড়া ঘড়া জল পাবে তুমি।

মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিলো কুঞ্জর অপমানে আর লাঞ্ছনায়। মাথাটা নীচু করে হন হন করে বেড়া পার হয়ে জামরুল বাগানের ভেতর ঢুকে পড়েছিলো।

ঃ তেষ্টার জলটা মা, আহা, হাজার হোক বোষ্টুম তো বটে ঃ যামিনীর গলাটা সহানুভূতিতে যেন কোমল হয়ে আসে।

ঃ তুমি থামো বাছা, লোক চিনতে আমার আর বাকী নেই। আধকোশ পথ হেঁটে তেষ্টার জল খেতে এসেছেন। খ্যাংরা মারি অমন তেষ্টার মুখে। যেমনি বাপ তার তেমনি ব্যাটা।

এর পরে সত্যি সত্যিই ভেবেছিলো কুঞ্জ আর কোন সম্পর্ক রাখবে না যমিনীর সঙ্গে, অন্তত ওই দজ্জাল শাশুড়ীর কিছু একটা না হওয়া পর্যন্ত। নন্দদকে অবশ্য হাত করা খুব শক্ত নয়; কিন্তু ওই ঘরের উঠান পর্যন্ত। মানদাকে ডিঙিয়ে দাওয়ায় ওঠবার সাহস নেই কুঞ্জর।

কিন্তু মুস্কিলে পড়ে যায় কুঞ্জ। সরু আলের ওপরে একেবারে সামনাসামনি দেখা হয় যামিনীর সঙ্গে। মার নামে প্রকান্ড দীঘি কাটিয়েছে মেজবাবুরা। এদিক ওদিক থেকে ঝি-বৌরা জল নিতে আসে 'অন্নদা দীঘিতে'। বাবুরা বলেছে আসছে বছরের মধ্যেই নাকি টেপাকল বসাবে পথের মোড়ে মোড়ে। মাঠঘাট ভেঙে ঘরের ঝি বৌকে কাঁকালে কলসী নিয়ে আর আসতে হবে না এতদূরে।

কলসীটা চেপে ধরে একপাশে সরে দাঁড়ায় যামিনী। একেবারে অচেনা লোক নয় কুঞ্জ। ওর বাপের বাড়ীর দেশের এক আখড়ায় বেশ কিছুদিন আড্ডা গেড়েছিলো সে। ফোঁটাতিলক কেটে গোপীযন্ত্র হাতে নিয়ে লোকের দোরে দোরে গান গেয়েও বেড়িয়েছিলো। গলাটা ভারি মিষ্টি ছিলো কুঞ্জর। যামিনীর বাপ তাকে দাওয়ায় বসিয়ে ভজন শুনতো রোজ। চাল আর আলু দেবার সময় চোখাচোখি হতো যামিনীর সঙ্গে। দিব্বি মেয়েটি,—আঁটসাঁট গড়ন, একমাথা কালো চুলের চাল। মনটা উসখুস করে কুঞ্জর। এই না হলে মেয়ে। খুঁজে খুঁজে এমন সময়ে আসতে শুরু করলো কুঞ্জ ঠিক যে সময়টা যামিনীর বাপ বেরোত বাইরে। প্রথমে আলতো কথাবার্তা, এদিক-সেদিক খোঁজ-খবর তারপরে ঘোর লাগলো যামিনীর চোখে, কুঞ্জর ছলাকলায় নতুন দেশের খবর মিললো বুঝি। সত্যিই ওকে সংগে নিয়ে যাবে নাকি কুঞ্জ মঠ ভেঙে ভেঙে মানচরের ইস্টিশনে। রেলে উঠবে দুজনে, ঘেঁসা ঘেঁসি বসবে আর ভাব দেখাবে যেন বিয়ের পরে স্বামীর ঘর করতে চলেছে সে। তারপর ইস্টিশনের পর ইস্টিশন ডিঙিয়ে ওর বাপের নাগালের বাইরে গিয়ে আস্তানা বাঁধবে দুজনে। কথাবার্তা তো ঠিকই ছিল একরকম, কিন্তু সব যেন গোলমাল হয়ে গেলো কেমন করে।

খালের ধারে নতুন লোকের আমদানী হলো। মাটি কেটে দেয়াল তুললো তারা, খড়ের চাল দিলো ওপরে। উঠতি বয়সের মেয়ের পাল এসে জুটলো। কাঁচপোকার টিপ পরে কপালের মাঝখানে আর পান খেয়ে রাঙা টুকটুকে করে দুটি ঠোঁট, সবচেয়ে কম বয়সের মেয়েটির নাম বুঝি পারুল। কম বয়স হলে কি হবে, রঙের জেল্লায় সে হার মানিয়েছে আর সবাইকে। কুঞ্জর আঁখড়ার সামনে দিয়ে কাঁচের চুড়ি বাজিয়ে কাজে অকাজে আনাগোনা করতে লাগলো সে। গা যেন জ্বালা করে উঠেছে যামিনীর ঃ আ মরণ, চলার ঢং দেখো। লজ্জা-সরমের মাথাটা চিবিয়েই খেয়েছে বুঝি। এতো জায়গা থাকতে এখানে মরতে এলো কেন এ আপদ।

কিন্তু যামিনীর শাপশাপান্তর কাজ হয়নি কোন। কুঞ্জ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল একদিন, সঙ্গে সঙ্গে পারুলও।

কুঞ্জ একেবারে আচমকা গায়ের ওপর গি... পড়ে যামিনীর। চমকে ওঠে যামিনী। কলসী... জল ছলকে উঠে বুকের কাপড়ের খানিক ভিজিয়ে দেয়। আবছা অন্ধকারে একটু ... ভয়ই পায় যামিনী।

ঃ কিগো বাছা, পথ আগলে দাঁড়াও কেন ভিন্ গাঁয়ের মানুষকে আটকানো কি ভা... বলবে কি পড়শীরা,—মেয়েলী গলার নকল ক... চিবিয়ে চিবিয়ে বলে কুঞ্জ।

চিনতে দেরী হয় না যামিনীর। এদি... ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখে। ধারে কাছে ... তো কেউ। তিলকে তাল করতে আর কতক্ষ... বদনাম তো রয়েইছে তার।

ঃ ছুঁলে তো?—আবার নাইতে হবে ... সাঁঝের বেলায় ঃ শাশুড়ীর গলার ধাঁজে উ... দেয় যামিনী। মুচকে মুচকে হাসে কু... দিকে চেয়ে।

ঃ চান করলে কি কাটবে নাকি পা... মেজবাবুদের দীঘিতে ডুবতে হবে দুজনকে কুঞ্জর গলার আওয়াজ যেন ভারি ভারি মনে হ... ছোঁয়াছুঁয়ির ইংগিত করেছে যামিনী। কথ... পরিহাস হলেও কোথায় যেন সামান্য খোঁচা র... গিয়েছে,—তীক্ষ্ম ধারালো একটু খোঁচা।

ঃ ডুবতে হয় তুমি ডুববে, আমি ডুববো কোন পাপে,—কলসীটা কাঁকাল থেকে নামায় যামিনী। বুকের কাপড়টা নিংড়ে নিংড়ে জলের ফোঁটা ফেলে মাটিতে।

ঃ মাতালটার সঙ্গে কদ্দিন ঘর করবে আর?—আসল কথাটা পেড়ে ফেলে কুঞ্জ। যামিনীর ভিজে হাতটা ও ধরেছে ওর হাতে। ভারি নরম হাতখানি যামিনীর, তুলতুলে।

ঃ সোয়ামী যে দেবতা গো। বদল করার অভ্যেস নেই আমাদের মধ্যে। সবাই তো আর পারুল নয়ঃ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে টিপে টিপে হাসে যামিনী। কলসীটা তুলে নেয় কাঁকালে।

হাসতে অবশ্য পারে যামিনী,—একথা বলতেও পারে বৈকি। যামিনীদের গাঁয়ে সেই খালের ধারে ফিরে গেছে পারুল নতুন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। এবার বাপের বাড়ী গিয়ে নিজের চোখে তাকে দেখে এসেছে যামিনী। কিন্তু সে পারুল যেন আর নেই। টোল খেয়ে গেছে,—তুবড়ে তাবড়ে গেছে অমন নিটোল শরীর। কালি পড়েছে চোখের কোণে। ফুর্তি কিন্তু একটুও কমেনি তার। নতুন মানুষটিকে নিয়ে গাঁয়ের পথে পথে তেমনি করেই ঘুরে বেড়ায় সে।

ঃ মাইরি, কি ভুলই করেছি সেদিন। নিজের হাতপা কামড়াতে ইচ্ছে কচ্ছে আমার,—কুঞ্জ যেন সত্যিই অনুতপ্ত মনে হয়।

কি একটা উত্তর দিতে গিয়েই চমকে ওঠে যামিনী। শুকনো পাতার খস খস শব্দ। সর্বনাশ, কে এসে পড়লো নাকি! এ অবস্থায়

দখলে পর কেলেংকারীর আর সীমা থাকবে না।

হন হন করে এগিয়ে যায় যামিনী আলের ওপর দিয়ে দিয়ে। কুঞ্জ মাঠের ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে আরম্ভ করে। কেলেঙ্কারীর ভয় অবশ্য ওর কম, তবু এমন হাতে-নাতে কে আর ধরা পড়তে চায়।

ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সামান্য। উলুখড়ের ঝোপ থেকে বাচ্চা শিয়াল একটা উঁকিঝুঁকি দেয়। লোকের শব্দ পেয়ে চট করে ঢুকে পড়ে ভিতরে তারপরে মুখ তুলে তারস্বরে চীৎকার শুরু করে।

কোমড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কুঞ্জঃ শালা বেড়াতে বেরোবার আর সময় পেলে না তুমি। পিছনে ফিরে চেয়ে চেয়ে দেখে, জোর পায়ে হেঁটে হেঁটে অনেকটা এগিয়ে গেছে যামিনী। এখনও অবশ্য নাগাল পাওয়া যায় তার—সোজাসুজি মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলে অনায়াসেই ধরা যায় তাকে। কিন্তু থাক —একেবারে গাঁয়ের মুখে গিয়ে পড়েছে যামিনী। কি জানি কে দেখে ফেলবে কোথা থেকে।

কিন্তু সেই দেখাই কাল হলো কুঞ্জর। যামিনীর কথাটা যেন ঘুমিয়েছিলো ওর রক্তের তলায়, সেদিনের ব্যাপারে আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে পুরোনো দিনের কামনা। শুধু কি মাথা চাড়া দেওয়া। কুঞ্জর মনে হয় বিরাট ফণা তুলে ঘুমন্ত কামনা যেন ছোবল মারে ওর বুকের দেয়ালে। দিন কয়েক ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় কুঞ্জ। দীঘির পথে, আলের ধারে পায়চারী শুরু করে, কিন্তু কোন খবর নেই যামিনীর। শেষে একদিন সাহস করে নন্দর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তোলে কুঞ্জ। নগদ পয়সা দিয়ে কেনা তাড়ির ভাঁড় এগিয়ে দেয় তার মুখের কাছে, তারিফ করে তার পার্টের, কাজের অছিলায় জোটে গিয়ে তার পাশে। কিন্তু ওই অবধি। চোখের দেখা ছাড়া আর কোনদিক দিয়েই সুবিধা হয় না কোন। মানদা যেন পাখা বিছিয়ে আগলে থাকে যামিনীকে। চোখে চোখে রাখে সর্বদা, কাজের ছল করে সরিয়ে নিয়ে যায় কুঞ্জর সামনে থেকে।

ওর মধ্যেই সুবিধা একটু হয়ে যায়। বাড়ির পিছনের পুকুরের পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে হিঞ্চে আর কল্মিশাকের ঝোপ। চুবড়ি হাতে শাক তুলতে যায় যামিনী ভোরের ঝোঁকটায়। তক্কে তক্কে থাকে কুঞ্জ। চুপ করে বসে থাকে নারকোল বাগানের ভেতর। প্রথম প্রথম শুধু চোখে চোখে দেখা কিংবা বড়ো জোর মুচকি হাসা একটুখানি। তবু মন্দের ভালো। চোখের আড়াল হলে আর মনের আড়াল হতে কতক্ষণ। সবুর সইতে গররাজি নয় কুঞ্জ। ছুটোছুটি করুক না মাছটা, তোলপাড় করুক ঘাটের জল —বড়শী তো রইলই হাতে, টেনে তুলতে কতক্ষণ। তারপরে একটু একটু করে এগিয়ে আসে কুঞ্জ। ঘাটের কাছ বরাবর এসে ফিসফাস কথাও চলে মাঝে মাঝে। কিন্তু সে কি আর কথা—দুজনেরই নজর থাকে ঘাটের পথের দিকে। তবু রক্ষে যে বেতোরুগী মানদা, ভোরে ওঠবার ইচ্ছে থাকলেও সাধিাতে কুলোয় না।

আজ আর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই নন্দর। সন্ধ্যায় যাত্রা। ভিন গাঁ থেকে বাজনার দল আসবে, তাদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত থেকে সুরু করে যাত্রার আসরের টুকিটাকি সব কিছু কাজের ভার তার ওপরে। একটু ভুলচুক হলেই টিট্‌কিরী দেবে সবাই, মুখ মটকে হাসবে অন্য পাড়ার লোক, বলবেঃ নন্দদা থাকতে কিন্তু এটা আমরা আশা করিনি। পান থেকে চুণটুকু খসলেই বলবে ঃ যাত্রার দল চালানো কি আর সোজা কথা, না, সবাই পারে। দূর, দূর, বন্দোবস্ত বলতে কিছু নেই এদের।

বিকেলের আলো থাকতেই বেরিয়ে পড়ে নন্দ। যাবার সময় উঁকি মেরে দেখে যায় মানদার ঘরে। বাতের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে মানদা, ব্যথাটা বড্ড বাড়ে এই সময়ে। গাঁটে গাঁটে কাপড়ের ফালি জড়িয়ে পরিত্রাহি চীৎকার করে। দাওয়ায় বসে তেঁতুল দিয়ে পিলসুজটা মাজছে যামিনী। নন্দ সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মুচকি হাসে যামিনী ঃ মার এতটা বাড়াবাড়ি না হলে, সত্যি যেতুম যাত্রা শুনতে আজ। এত নামডাক তোমার, একবার পোড়াচোখে দেখেই আসতুম ব্যাপারটা।

সব কিছু নতুন ঠেকে। ঠাট্টা করছে নাকি যামিনী। এর আগে তো কতবার নিয়ে যেতে চেয়েছে তাকে, কিন্তু ঠোঁটটা বেঁকিয়ে বলেছে যামিনীঃ তা আর যাবো না! সোয়ামী মুখে চুণকালি মেখে হাড়ি-বাগ্দীদের সঙ্গে নাচবে আর আমি দেখবো চিকের আড়ালে বসে। মুখে আগুন তোমার।

যামিনীর থুৎনীটা ধরে একটু নাড়া দেয় নন্দ, বলে ঃ আজ আবার নতুন রকম ঠেকছে যে?

ঃ ঠেকবেই তো। পুরোনো আর কদ্দিন ভালো লাগে!

বেশী সময় নষ্ট করা চলে না নন্দর। তীর ধনুকের গোছাটা বেঁধে নিয়ে এগিয়ে যায় জোর পা ফেলে ফেলে। সত্যি বড্ড আফশোষ তার মনে। নিজের বৌকে একবার দেখাতে পারলে না কিছু। দশখানা গাঁয়ের লোক একটু বসবার জায়গার জন্য ঝুটোপুটি লাগিয়ে দেয় নন্দ ঘোষাল নামবে শুনলে। তারই ঘরের বৌয়ের একি কাণ্ড! শখ বলতেও কিছু নেই এর।

অনেক রাতে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে যামিনী। আস্তে আস্তে বেরিয়ে শেকলটা তুলে দেয় দরজার। হঠাৎ যেন দরকার হলে চট করে বেরোতে পারে না তার শাশুড়ী। খিড়কীর আগল খুলে পায়ে পায়ে পুকুরের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ায়। আবছা দেখা যায় র‍্যাপারটা মুড়ি দিয়ে কলাগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে কুঞ্জ। যামিনীকে দেখে এগিয়ে আসে তাড়াতাড়ি, কিগো, কোন অসুবিধে হয় নি তো আসতে?

মাথাটা নাড়ে যামিনী আর কুঞ্জর পিছন পিছন চলতে শুরু করে। বাগান পার হয়ে কাঁচা সড়কে গিয়ে ওঠে দুজনে। ছই ঢাকা গরুর গাড়ী একটা পথের ওপরে। গাড়িতে যামিনীকে তুলতে তুলতে আস্তে আস্তে বলে কুঞ্জ ঃ কি জানি, পাছে জানাজানি হয়ে যায় এই ভয়ে দুকোশ দূর থেকে ভিনগাঁয়ের গাড়োয়ান যোগাড় করে আনলাম।

এবারেও কোন কথা বলে না যামিনী। কুঞ্জর পাশে গিয়ে বসে চুপচাপ। গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঠেকাঠেকি হয় গায়ে গায়ে, কাঁচের চুড়ির শব্দ হয় ঝুনঝুন করে। যামিনীর একটা হাত তুলে নেয় কুঞ্জ নিজের হাতে। উঁকি মেরে মেরে দেখে যামিনী বৈঁচি ঝোপের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় তার ফেলে আসা ঘরের চালা। কেমন যেন মনে হয় পুরোনো সবকিছু পিছনে ফেলে আসতে এইভাবে। আর কোনদিনই বুঝি ফিরে আসতে পারবে না এই পথে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুঞ্জর দিকে মুখটা ফেরায় যামিনী।

ঃ নিঃশ্বেসটা কার জন্যে গো? সোয়ামী না শাশুড়ী,—মন টানছে কে? কুঞ্জর গলায় যেন ঠাট্টার আমেজ।

পিছটান থাকলে কি আর আসি এই পথে? উল্টে প্রশ্ন করে যামিনী।

গাড়ির একটানা শব্দে বুঝি ঝিমুনী এসেছিলো যামিনীর; আচমকা ঝাঁকুনীতে একেবারে সে গায়ে ঠিকরে গিয়ে পড়ে কুঞ্জর। হাঁউমাঁউ করে ওঠে যামিনীঃ কি গো, নালায় পড়লো নাকি গাড়ির চাকা, না বলদই পড়লো মুখ থুবড়ে।

মুখ বের করে দেখে কুঞ্জ। সেসব কিছু নয়। প্রকাণ্ড একটা পাকুড় গাছ উপড়ে পড়েছে পথের ওপর। ঝড় নয় ঝাপটা নয়, এতো বড় পেল্লয় গাছটা পড়লো কি করে গো কত্তাঃ গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করে কুঞ্জ।

বাতি নিয়ে দেখে গাড়োয়ান নেমেঃ গোড়াটা উইয়ে খেয়েছে গো দাঠাকুর। ইস্, ফোপরা করে ফেলেছে একেবারে।

উপায় নেই, ফেরাতে হয় গাড়ি। পিছু হটে হটে বাঁ দিকের সড়ক ধরে মাঠ বরাবর চলতে শুরু করে।

তাই তো, মুস্কিল হলোঃ একটু যেন চিন্তিত মনে হয় কুঞ্জকে।

কি মুস্কিল গো ঃ ভয়ই পায় যামিনী। কেমন যেন মনে হয় ওর। হঠাৎ গাছই বা উপড়ে পড়লো কেন ওর পথের ওপর। সব কিছু ছেড়ে কোথায় চলেছে সে। বাইরের জমাট

অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে যামিনী, ছোঁয়া যায় এমনি গাঢ় অন্ধকার। পারুলের কথা মনে পড়ে যায় তার। এই লোকটার সঙ্গেই তো ঘর ছেড়েছিলো পারুল, কিন্তু ফিরে তাকে আসতে হয়েছে আবার। নির্ভরসায় পথ চলা যাবে তো এই লোকটার হাত ধরে!

অনেক দূর থেকে কার যেন গলার আওয়াজ ভেসে আসে। চমকে ওঠে যামিনীঃ নিঝুম রাতে মনিষ্যির আওয়াজ আসে কোত্থেকে গো?

ঃ তোমার কত্তার যাত্রা চলেছে যে মেজবাবুর বাড়ির মাঠে। তাই তো বলছিলুম, ওই পথেই যে যেতে হবে আমাদের, কথার সংগে সংগে র‍্যাপারটা খুলে গাড়ির পিছন দিকে টাঙিয়ে দেয় কুঞ্জ, বলেঃ সাবধানের মার নেই, এই ভালো, কি বলো? কে দেখে ফেলবে কোথা দিয়ে।

চুপচাপ বসে থাকে যামিনী। র‍্যাপারের ফাঁক দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে মাঠের মাঝখানে আসর বসেছে। অনেকগুলো গ্যাসবাতি ঝুলেছে বাঁশের ডগায়। লোকে লোকারণ্য। কিন্তু টুঁ শব্দটি নেই, একেবারে চুপচাপ সারা আসর।

উঁকি মেরে দেখে যামিনী,—খুব চেনা লাগছে আসরের লোকটিকে। মাথায় মুকুট,—ঝকমক্ করছে গায়ের পোষাক; লাল টুকটুকে গায়ের রং। নতুন লাগে নন্দকে। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। আসরের সমস্ত লোকের বুঝি পলক পড়ে না চোখের। গাড়ি আরো কাছে আসতেই গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পায় যামিনীঃ

—সীতা, সীতা, কোথা যাও চলে।
কেমনে রহিব দেবি তোমার বিহনে।
রাজপুরী বন্দীশালা সম মনে হবে,
দুই চক্ষু অন্ধ হবে নয়নের জলে।

ও, সীতা বনবাসে যাচ্ছে বুঝি, তাই কাঁদছে রাম। চেয়ে চেয়ে দেখে যামিনী—সত্যিই কাঁদছে নন্দ। বাতির জোর আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় নন্দর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। বৌ চলে যাবে তাই কেঁদে ভাসাচ্ছে রাম। অজানিতে যামিনীর গাল বেয়েও গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা। চোখের জলে সমস্ত আসরটা ঝাপসা হ'য়ে আসে।

কেমন যেন হ'য়ে যায় যামিনী। দুটো হাতে টেনে সরিয়ে দেয় র‍্যাপারটা আর লাফিয়ে নেমে পড়ে গাড়ি থেকে। ঢালু জমির পাড় বেয়ে বেয়ে মাঠে নেমে পড়ে। বুঝতে পারে পিছনে পিছনে কুঞ্জও আসছে এগিয়ে। কেমন যেন ভয় করে ওর, মনে হয় ওকে ধরতে পারলেই বুঝি ছিনিয়ে নিয়ে যাবে রামের বুক থেকে। কেঁদে কেঁদে তাহ'লে সত্যিই অন্ধ হ'য়ে যাবে রাম। আরো জোর পায়ে চ'লে ও মেয়েদের আসরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাড়াতাড়িতে কার গায়ের ওপর গিয়েই পড়ে যামিনী।

ঃ কিগো বাছা, দেখতে পাও না চোখে?

—তারপরেই কিন্তু সুরটা নরম হ'য়ে আসে যদুপিসীরঃ কে লা, যামিনী বুঝি, আয় আয়, এতো দেরী করলি যে? আহা হা, কি সুন্দর পালাই গাইছে নন্দ, আহাহা, এমন সোয়ামী পাওয়া বড়ো ভাগ্যের কথা লো।

আশে পাশের অনেকগুলো মেয়ে দেখে চেয়ে চেয়ে যামিনীর দিকে। সরে সরে তার বসবার জায়গা করে দেয়। যদুপিসীর কথাগুলো কিন্তু ভালো ক'রে কানে যায় না যামিনীর। মাটিতে হাতের ভর দিয়ে বসতে বসতে ভাবে যামিনীঃ এখনও কাঁদছে কেন নন্দ অমনভাবে হাপুস নয়নে?



ধাত্রী বলেন







"দাইয়ের কাজ তো আর আজ থেকে করছি না, সব ভালো ডাক্তারকেই দেখেছি পদে-পদে ডেটল ব্যবহার করতে। সংক্রমণ ঠেকাবার জন্যে এর চাইতে ভালো জিনিস আর নেই। রান্নাঘরে যেমন হলুদ, হাসপাতালে তেমনি ডেটল। প্রত্যেক ব্যাপারে ডেটল। বাড়িতেই সব সময় হাতের কাছে ডেটল রাখা উচিত, তা নইলে সামান্য কাটা বা আঁচড়েও সাংঘাতিক হয়ে বহুদিন ভোগাতে পারে।"



'DETTOL'
TRADE MARK
'ডেটল' আধুনিক বীজাণুপ্রতিষেধক

অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিঃ, ২০/১, চেৎলা রোড, কলিকাতা।

প্রসাদী-ফুল

৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা

(শ্রীশ্রীগুরুদেব প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশে, সংসর্গে ও ব্যবহার-দর্শনে লেখকের মনে যে সকল তত্ত্বের উদয় ও ভাবের সঞ্চার হইয়াছে, সে সকলের কিয়দংশ অবলম্বন করিয়া "প্রসাদী-ফুল" লিখিত হইল।)

ধর্ম জীবনের পঞ্চ-স্তর।

উপদেশ প্রসঙ্গে একদিন শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাকে বলিলেন যে, সাধক-জীবনের প্রধানতঃ পাঁচটি স্তর, যথা নীতি, ধর্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ ও লীলা।

নীতি।

কতকগুলি লোক নীতি পালনকেই ধর্ম মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত এই যে, সমাজ-সেবা, লোক-সেবা, সত্য বাক্য বলা, কাহারও অনিষ্ট না করা, সমাজের সুখ সুবিধার জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দেওয়া, জগতের উন্নতির চেষ্টা করা প্রভৃতিই প্রকৃত ধর্ম, ইহার অতিরিক্ত ধর্ম আর কিছু নাই। যাঁহারা এইরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে নীতিবাদী বলা যাইতে পারে। নীতিবাদিগণ, নীতি পালন করিতে পারিলেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকেন, তাঁহাদের হৃদয় এতদতিরিক্ত অন্য কোন আকাঙ্ক্ষায় লালায়িত হয় না। ইঁহারা প্রথম স্তরের লোক।

ধর্ম।

কেবল নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া অনেকের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। একটি পারলৌকিক ভাব দূরশ্রুত বংশীধ্বনির ন্যায় যাঁহাদের মনকে টানিয়া লয় এবং সেই ভাবকে উপেক্ষা করিলে সহজেই যাঁহাদের প্রাণ শান্তি-হারা হয়, কোন হারানো প্রিয়তম ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিবার জন্য মানুষ যেমন ছুটো-ছুটি করে, কি যেন প্রাণের বস্তু হারাইয়াছে, কোথায় গেলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, প্রাণের শান্তিসুখ যেন সেই হারানো বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, এ সংসারে সকল থাকিতেও যেন কিছু নাই, এইরূপ একটা ভাব যাঁহাদের হৃদয়ে রাজত্ব করে, তাঁহারা শুধু নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকেরা ইহকালকে নশ্বর ও ক্ষণ-স্থায়ী মনে করিয়া পারলৌকিক কল্যাণের জন্য বিবিধ প্রকারের ধর্মকার্য অর্থাৎ যাগযজ্ঞ, ব্রত-প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থ পর্যটন ও বিবিধ উপচারে পূজা এবং বিবিধ প্রকারে উপাসনা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই দ্বিতীয় স্তরের লোকেরা "ধর্মী" নামে অভিহিত হইতে পারেন।

ব্রহ্ম জ্ঞান।

কেবল বাহ্য পূজা ও প্রণালীগত উপাসনা প্রার্থনায় যাঁহাদের প্রাণ তৃপ্তিলাভ করে না, ক্ষুদ্র ও খণ্ড বস্তুর আরাধনায় যাঁহারা শান্তি পান না, তাঁহারা এই বিশাল বিশ্ব-সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তাকে অন্বেষণ করেন এবং যিনি এই বিশ্বকার্যের কারণরূপী অব্যক্ত ব্রহ্ম, তাঁহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। এই সৃষ্টিকার্যের অন্তরালে যে জ্ঞানবস্তু কারণ রূপে রহিয়াছেন, উদ্দেশে তাঁহাকেই অর্চনা করিয়া কৃতার্থ হন। যে সকল ঋষি এই অব্যক্ত ব্রহ্ম বা কারণ ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার উদ্দেশে পূজা করিয়াছেন।

"যো দেবোগ্নৌ যোঽপসু
যো বিশ্বং ভুবন মাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

অর্থাৎ যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার নমস্কার।

পুনশ্চ

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন
জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাস স্ব
তদ্‌ব্রহ্ম।

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই সকল ভূত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতিগমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষ-রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।

এই তৃতীয় স্তরটি পরোক্ষ জ্ঞানের অবস্থা সূচিত করে। সৃষ্টি দর্শনে স্রষ্টা সম্বন্ধে যে অনুভূতি অথবা শাস্ত্র ও সাধুবাক্য শ্রবণ করিয়া যে ঈশ্বর-বিশ্বাস, উহা পরোক্ষ জ্ঞান। এই অবস্থার সাধকদিগকে 'ব্রাহ্ম' নামে অভিহিত করা যায়।

যোগ।

উপরোক্ত তৃতীয় স্তরেও যাঁহার হৃদয় চরম তৃপ্তিলাভ না করে, কারণ-রূপী অব্যক্ত ব্রহ্মকে স্তব স্তুতি ও আত্মসমর্পণ করিয়াও যাঁহার আত্মা অধিকতর পিপাসায় তাঁহার সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতার জন্য ব্যাকুল হয়, তিনি যোগ অবলম্বনপূর্বক বহির্জগতের অতীত হইয়া অন্তরের অন্তরে "প্রাণস্য প্রাণম্"-রূপী জীবন্ত ভগবৎ সত্তা সম্ভোগ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। শ্রীগুরুদেব একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যোগযুক্ত সাধকের নিকট ভগবান মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় অনুভূত হন। গর্ভিণী পাঁচজন সঙ্গিনীর সঙ্গে বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময় গর্ভস্থ শিশু পেটের ভিতর পা ছুড়িয়াছে, পোয়াতি 'উ' করিয়া উঠিলেন, কেননা জীবন্ত শিশুর পায়ের লাথি তাঁহাকে লাগিয়াছে, কিন্তু সঙ্গিনীরা কিছুই বুঝিল না। এইরূপ যোগযুক্ত সাধকের হৃদয় মধ্যে প্রাণস্য প্রাণম্ রূপী জীবন্ত ব্রহ্ম নড়েন চড়েন, কিন্তু এই নড়াচড়া কিরূপ, যিনি তাহা অনুভব করেন নাই, তাঁহাকে বুঝানো অসাধ্য। বাহ্য জগৎ এবং কার্য জগৎ হইতে চিত্ত সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইয়া অন্তর রাজ্যে প্রবেশ না করিলে অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা না ঘটিলে প্রাণস্য প্রানম্ ব্রহ্মকে কিছুতেই উপলব্ধি করা যায় না। এ বিষয় জ্ঞানীচূড়ামণি ও কর্মি-শ্রেষ্ঠ ভগবান শঙ্করাচার্যও তাঁহার 'বিবেক চূড়ামণি' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "সমাধির মধ্য দিয়া ভিন্ন অন্য কোনরূপে চিদ্‌ব্রহ্মের বিকাশের সম্ভাবনা নাই।"

এই অবস্থা সাধনের চতুর্থ অবস্থা, এই অবস্থায় সাধকদিগকে 'যোগী' নামে অভিহিত করা যায়। যোগী দুই প্রকার, জুঞ্জন যোগী ও যুক্ত যোগী, যিনি মাঝে মাঝে প্রাণস্য প্রাণকে অনুভব করেন, তিনি জুঞ্জন যোগী এবং যিনি পূর্ণ গর্ভবতীর ন্যায় সর্বদা জীবন্ত ব্রহ্মকে অন্তরে অনুভব করেন, তিনি যুক্তযোগী।

লীলা।

যোগের অবস্থায় যে ব্রহ্মকে সাধক গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় জীবন্ত অনুভব করেন, যোগের গাঢ় অবস্থায় তাঁহাকে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এই আকাঙ্ক্ষা অতীব স্বাভাবিক। গর্ভিণীর মনে সন্তানের মুখ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা যেমন স্বাভাবিক, ইহাও তেমনই স্বাভাবিক। দেহধারী জীব আপনার প্রিয়তম বস্তুকে ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভোগ না করিয়া পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাঁহারই বরে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ইচ্ছা মাত্র স্বামীকে অন্তরে দেখিতে পাইতেন, কাল্পনিক দর্শন নহে, সত

সুতাই শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে প্রকাশিত হইতেন। *

কিন্তু পতিপ্রাণা প্রিয়তমকে কেবল অন্তরে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, সেই হৃদয়স্থিত মূর্তিকে বাহিরের চর্ম-চক্ষে দেখিতে তাঁহার লালসা হইল, তখন হৃদয়স্থ মূর্তির প্রতিরূপ বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অদ্যাপি নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিষ্ঠিত সেই গৌরাঙ্গ মূর্তি পূজিত হইতেছেন। যোগী যতই প্রানের প্রাণরূপ পরব্রহ্মকে অন্তরের অন্তরে অনুভব ও সম্ভোগ করেন, ততই তাঁহাকে অধিকতর-রূপে সম্ভোগের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন, স্বাভাবিক নিয়মে অথবা ভগবৎ কৃপায় গর্ভস্থ সন্তান প্রসূত হইয়া যেমন মাতার নয়ন মনকে পূর্ণ তৃপ্তি দান করে, ভগবানও সেইরূপ যোগীর হৃদয় হইতে প্রসূত হইয়া সমস্ত বাহ্য জগতে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া সাধককে কৃতার্থ করেন। তখন এক-দিকে যেমন সমস্ত সৃষ্টি ব্রহ্মসত্তায় পরিপূর্ণ হয়, অন্য দিকে বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ব্যক্তির মধ্য দিয়া তাঁহার বিশেষ বিশেষ ভাবের বিকাশ হয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মের নাম 'ভগবান', এইখানেই তিনি লীলাময় এবং এই স্থান হইতেই বৈষ্ণব ধর্মের আরম্ভ। একই সূর্যালোক সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন বস্তুর উপর পতিত হয়া উহা বিচিত্রভাবে প্রকাশিত; কতই রূপ, কতই বর্ণ, কতই সৌন্দর্য—কতই বিভিন্নতা, কতই বিচিত্রতা, একের প্রকাশে বহু, বহুভাবে প্রকাশ পাইতেছে। তখন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর ভাবগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির ভিতর দিয়া ফুটিতেছে। ভগবান এখন গোপাল সাজিয়াছেন, কেহ সৌভাগ্যশালী নন্দ-যশোদা হইয়া তাঁহার মুখে ক্ষীর-ননী দিতেছেন, কেহ-বা সখ্যভাবে রাখাল হইয়াছেন, কেহ-বা কান্তাভাবে গোপী রূপ ধারণ করিয়াছেন, এখানে আর বৈধ ভক্তি নাই, ভগবান এখানে পুত্ররূপে, সখা-রূপে, কান্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, কেহ পুত্ররূপে তাঁহাকে স্নেহ ও শাসন করেন, কেহ সখাভাবে আধখানি ফল খাইয়া উচ্ছিষ্ট-ফল প্রদান করেন, কেহ-বা সেই হৃদয়-রাজের সহিত অভিমান করেন। এই সমস্ত মহোচ্চ ভাবগুলি শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আশ্চর্যভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাই লীলার সাধারণ অবস্থা, ইহার উপরে অসাধারণ অবস্থা আছে।

প্রাচীনকালে অনেক ব্রহ্মজ্ঞানী লীলা বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু যাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ও এই লীলারই পুনরভিনয় হইয়াছে। তাঁহার অনুগত প্রধান প্রধান ভক্তগণ অধিকাংশই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। বৈষ্ণবগণ বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের পরেই লীলার ধর্মের আরম্ভ। কার্যত সর্বত্র ইহা দেখা যাইতেছে, তবে যুক্তিমুখে ইহার প্রমাণ সহজসাধ্য নহে। ধর্ম-রাজ্যের কোন্ তত্ত্বই-বা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়? অনেকে মনুষ্যদেহে ভগবানের আবির্ভাব দর্শনের কথা শুনিলে যেমন পরিহাস করেন, সেইরূপ অনেক বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ব্যক্তি ভগবানের অস্তিত্ব কি ব্যক্তিত্বের কথা শুনিয়াও পরিহাস করেন। যুক্তিমুখে সকলই অসিদ্ধ।

বিচিত্রতায় বিরোধ নাই।

উপরে যে পাঁচটি ভাবের কথা লিখিত হইল, উহার একটির সহিত অপরটির প্রতি-দ্বন্দ্বিতা নাই, বিরুদ্ধতা নাই, অপিচ একটি তরুর মূল, কান্ড, পুষ্প, পত্র ও ফল যেমন একেরই বিভিন্ন অঙ্গ, উক্ত পঞ্চ ভাবও একের বিভিন্ন অঙ্গ।

মূলকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন কা পত্র, পুষ্প, ফল কেহই বিকশিত হইতে পা না, সেইরূপ নীতিকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম, কি ব্রহ্মজ্ঞান এবং কি যোগ, কি লী কিছুই বিকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু শু মূল লইয়াই যেমন বৃক্ষত্ব নহে, সেইরূপ শু নীতি লইয়াই সাধক-জীবন সার্থকতা ল করে না। নীতি না হইলে ধর্মই হয় না, কি নীতি হইলেই যে ধর্ম হইল, তাহা নহে। ক্রমবিকাশশীল, সুতরাং কোন অবস্থায়ই বে স্তরের সহিত তাহার বিরোধ ঘটিবার সম্ভা নাই। তবে যে বিরোধ দেখা যায়, সে কে মতের ধর্ম, এবং শেখা ধর্মের কথা লই বিরোধ। যে সাধকের জীবনে ধর্ম ফু উঠিবে, তিনি দেখিবেন, সমস্ত ধর্মই, সম স্তরই একই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।



কত জীবন অকালে শেষ হয়ে যায় ...

যদি সময়োচিত সাবধানতায় তাদের রক্ষা করা না যায়। যখনই অবসাদ বোধ করিবেন বা কর্ম্মশক্তির অভাব বোধ করিবেন.........তখনই বুঝিবেন যে আপনার স্বাস্থ্যে কোথাও টুট ধরিয়াছে.........সত্বর প্রতিকারের প্রয়োজন......... ।

সুপার-নিও-কড পরিমিত মাত্রায় বিবিধ খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) সমন্বিত স্বাদু ও পুষ্টিকর রসায়ন...পুষ্টিহীনতা, যক্ষ্মার পূর্ব্বাবস্থা এবং রোগ মুক্তির পর সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্যে আশু কার্য্যকরী।

কর্ম্মশক্তিই জীবন

ক্ষীয়মান শক্তির পুনরুদ্ধার চাই



বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ : কলিকাতা ১৩

---

* যাঁহারা ইউরোপের সাইকিক্যাল-রিসার্চ সোসাইটির রিপোর্ট পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ সকল কথা বিশ্বাস করিতে পারেন।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার পুলিশ কোর্টে ও হাইকোর্টে বিভিন্ন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থায় ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ৪টি মামলা হইয়াছে।

(১) গত ২৭শে ও ২৯শে অক্টোবর দুইদিন যথাক্রমে "নাসিকা কর্তন" ও "গতকল্য শহরে ২২ জন নিহত"—দুইটি রচনা প্রকাশের জন্য এবং কলিকাতায় একটি দগ্ধ দোকান ও হাইমচরে (ত্রিপুরা জিলার) একটি অগ্নি-দগ্ধ বাজারের চিত্র প্রকাশ করায় 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রের সম্পাদক এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে সরকার যে মামলা দায়ের করিয়াছেন, তাহার এক দফা শুনানী পুলিশ কোর্টে হয়। সম্পাদক ভারতবর্ষে নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা বাতিল করিয়া—তিনি ফিরিলে আবার মামলা দায়েরের অনুমতি সরকারকে দিয়া এখন মুদ্রাকর ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা চলান হইতেছে। অভিযোগ—সাম্প্রদায়িক সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার যে অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন—ঐ দুইটি প্রবন্ধে ও চিত্রে তাহার নির্দেশ ভঙ্গ করা হইয়াছে।

(২) ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই নবেম্বর তারিখের 'ন্যাশনালিস্ট' পত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদের জন্য বাঙ্গলা সরকার পত্রের সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন। ঐ দিন এই মামলারও এক দফা শুনানী হয়।

(৩) গত ২৮শে অক্টোবর তারিখে 'জয়-হিন্দ' পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে যে মামলা দায়ের হইয়াছে তাহার ডাক হইলে বাঙ্গলা সরকারের উকীল বলেন, আসামী-দিগের বিরুদ্ধে মামলা—এক নহে দুই; উভয় মামলার শুনানী এক সঙ্গে হউক। ম্যাজিস্ট্রেট 'তথাস্তু' বলিয়া দিন ফেলিয়াছেন।

(৪) বাঙ্গলা সরকার অনেকগুলি সংবাদ-পত্রের জামিন তলব করিয়াছেন। 'হিন্দুস্থান' সে সকলের অন্যতম। জামিনের ২ হাজার টাকা জমা দিয়া 'হিন্দুস্থানের' পক্ষ হইতে ঐ আদেশ বাতিল করিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করা হইয়াছে।

এই সকল মামলা ব্যতীত হাওড়ায় জাগৃতী'র বিরুদ্ধেও মামলা চলিতেছে।

এই সকল মামলায় অর্ডিন্যান্সের বৈধতার প্রশ্ন উঠিবে।

সে যাহাই হউক—এই সকল মামলায় বাঙ্গলা সরকারের' সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় নীতির ও ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

এদিকে বাঙ্গলা সরকার কিরূপে কাজ করেন, তাহার পরিচয় প্রধান সচিবের সহিত 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রের সম্পাদকের পত্র ব্যবহারে পাওয়া গিয়াছে। প্রধান সচিব বলেন, 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের লোকই স্বীকার করিয়াছেন—বোম্বাই সরকার যে সংবাদপত্রসমূহকে আপনারা সমবেতভাবে বিবেচনা করিয়া হাঙ্গামা সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন, তাহাতে কাজ চলে নাই। এই সংবাদ তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন জিজ্ঞাসা করায় প্রধান সচিব বলিয়াছেন ঐ উক্তি প্রাদেশিক সাংবাদিকদিগের পরামর্শ কমিটিতে করা হইয়াছিল। কিন্তু:—

(১) সমিতির কার্য বিবরণে সেরূপ কিছুই দেখা যায় না।

(২) 'স্টেটস্‌ম্যানের' সম্পাদকীয় বিভাগের কে ঐ উক্তি করিয়াছিলেন, তাহাও প্রধান সচিব বলিতে স্বীকৃত হয়েন নাই।

সেই অবস্থায় 'স্টেটস্‌ম্যান' সম্পাদক ঐ উক্তি ভিত্তিহীন বলিলে প্রধান সচিব উত্তর দিয়াছেন—তাঁহার সরকারের পক্ষে যিনি কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি "গোপন রিপোর্টে" ঐ কথা বলিয়াছেন। কাজেই দুই কথা বিবেচ্য—

(১) সরকারী কর্মচারীর ঐ উক্তি ভিত্তি-হীন কিনা তাহা কে বলিবে ?

(২) সরকারী কর্মচারী যিনি আহূত হইয়া সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন, তিনি যদি গোয়েন্দা পুলিশের মত কাজ করেন, তবে বলিতে হয় তিনি আমন্ত্রণের অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

সে কথাও 'স্টেটস্‌ম্যান' সম্পাদক প্রধান সচিবকে লিখিয়াছিলেন; তিনি কোন উত্তর দেন নাই। তাঁহার কারণ হয় 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্' নহেত উত্তর দিবার কোন উপায় নাই।

বাঙ্গলা সরকারের সংবাদ প্রকাশের অধিকার সঙ্কোচক আদেশের পরে সংবাদপত্র-সমূহের পক্ষ হইতে একযোগে পরীক্ষা করিয়া সংবাদ প্রকাশের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, বাঙ্গলা সরকার তাহাও বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

এদিকে কয়খানি পাকিস্তানী পত্র ঐরূপ পরীক্ষিত সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থায় অসম্মত হইয়া সেই কার্যে সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাতে বাঙলা সরকার বলিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন—পরামর্শ সমিতি আর সকল শ্রেণীর সংবাদপত্রের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

এই অবস্থার পূর্বেও একবার বাঙ্গলা সরকারের ব্যবহার বিস্ময়কর হইয়াছে। কেন্দ্রী সরকার যখন নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সহিত একটি চুক্তি করেন, তখন বাঙ্গলা সরকারের একজন কর্মচারী একটি মামলায় কলিকাতার পুলিশ কোর্টে সেই চুক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতার কথাও বলেন! তখন মিণ্টার পোর্টার বাঙ্গলায় সংবাদপত্র শাসনে বদ্ধ-পরিকর।

এবার সে দিন—'ভিয়েৎনাম দিবসে' লোক পুলিশের গুলীতে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইবার কয় ঘণ্টা পরে—বাঙ্গলা সরকারের দপ্তরখানা হইতে কোন সান্ধ্য সংবাদপত্রের সম্পাদককে টেলিফোনে বলা হয়—তিনি ঐ সংবাদ প্রকাশ না করিলেই ভাল হয়; কারণ "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে" মিণ্টার সুরাবর্দী যে লালবাজারের পুলিশ অফিসের কণ্ট্রোল রুমে ছিলেন, সেই লাল-বাজার তখনও গুলী চলার কথা সমর্থন করেন নাই!

এই সকল হইতেই সংবাদপত্রে সত্য সংবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

যুদ্ধের সময় কেন্দ্রী সরকার যে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সহযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার দায়িত্ব ও গুরুত্ব কখনই সামান্য হইতে পারে না। আমেরিকার জর্জ হোমস্ বলিয়াছিলেন—

"যখন কোন জাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তখন শান্তির সময় যে সকল কথা বলা যায়, সে সকল কথা যুদ্ধোদ্যমের পক্ষে এত ক্ষতিকর হয় যে, যত দিন যুদ্ধ চলে তত দিন সে সকল বলিতে দেওয়া যায় না।"

আব্রাহাম লিঙ্কনও তাহাই স্বীকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমাদিগের দেশে বিশেষ বাঙলায় যুদ্ধের সময়েও যে প্রতিষ্ঠানের সহযোগ গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রী সরকার কার্য পরিচালনা করিয়াছেন, সেই প্রতিষ্ঠান আর সরকারের নিকট সম্ভ্রম লাভ করিতেছেন না।

বেঞ্জামিন রাস বলিয়াছেন—আমাদিগের দেশে সংবাদপত্রই স্বাধীনতার রক্ষী।

তবে তাহা আমেরিকার কথা এবং আমেরিকা স্বাধীন দেশ ও গণতন্ত্রসম্পন্ন। সেই দেশের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছিলেন—ভগবান কোন জাতিকে অপর কোন জাতির শাসনের অবশ্যক গুণ

দৈন নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে একটি প্রসিদ্ধ মোকদ্দমার রায় দিবার সময় ইলিনইসের চীফ জাস্টিস টম্পশন মন্তব্য করিয়াছিলেন:—

মানুষের অন্যান্য স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামেরই মত মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম সভ্যতার উন্নতির সহগামী হইয়াছে। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, অভাব অভিযোগ প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষের স্বাধীনতা-লাভ সম্ভব নহে। সভ্যতা যত উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং মানুষের অভাব-অভিযোগ প্রকাশের পথ যত অধিক হইয়াছে, স্বৈরাচারী শাসকদিগের সহিত জনগণের সংগ্রাম ততই প্রবল হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে সংবাদপত্র প্রকাশ আরম্ভ হয় এবং সেইজন্য সম্পাদকদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচারের বিবরণও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

একথা সত্য যে, কোন সরকারকে যদি স্বাধীনভাবে রক্ষা করিতে হয়, তবে সেজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু পরাধীন দেশের ব্যবস্থা তাহার অবস্থানুসারে ভিন্নরূপ হয়। এদেশে তাহাই হইয়াছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকাল হইতে আজ পর্যন্ত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্তমান।

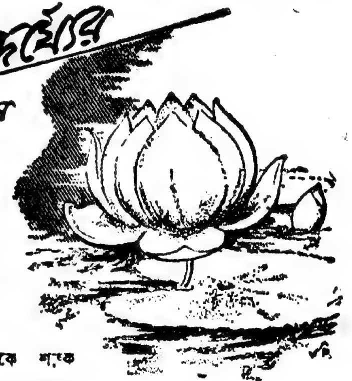
আজ আমরা শুনিতেছি, ভারতবর্ষের মুক্তির আর বিলম্ব নাই। যাঁহারা সেই মুক্তির সংগ্রামে বহু ত্যাগ স্বীকার ও বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাও আজ মনে করিতেছেন—অন্ধকার ভেদ করিয়া তরুণ-অরুণ-কিরণ বিকাশ সূচনা লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা যদি মনে করেন, আবার আন্দোলন এবং আরও চেষ্টা ব্যতীত মুক্তিলাভ ঘটিবে তবে তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তাহা বোধ হয় তাঁহারাও যত দিন যাইতেছে, তত বুঝিতেছেন। বড়লাটের যে শাসন-পরিষদ—বর্তমান শাসনপদ্ধতির পরিবর্তন না করিয়া—ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতিক দলের মনোনীত ব্যক্তিদিগকে লইয়া গঠিত হইয়াছে এবং সেই জন্য অন্তর্বর্তী সরকার নামে অভিহিত হইয়াছে সেই শাসন-পরিষদের সদস্যগণও ক্রমে তাঁহাদিগের ক্ষমতা কত সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ, তাহা বুঝিতেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বীকার করিয়াছেন, নোয়াখালীর ব্যাপারে তাঁহারা যে বিচলিত হন নাই, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাদিগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ—যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা প্রতিকার করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ যে প্রদেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত আছে, সে প্রদেশের সরকারের কাজে কেবল বড়লাট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন— সপরিষদ বড়লাটের সে ক্ষমতা নাই। এই উক্তি আক্ষেপোক্তি বলিলেও বলা যায় এবং ইহাতে মনে হয়, তাঁহারা সে সম্বন্ধে লর্ড ওয়াভেলকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, লর্ড ওয়াভেল তদনুসারে কাজ করেন নাই। অথচ যখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়, তখন লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছিলেন, তিনি শাসন-পরিষদের পরামর্শানুসারে কাজ করিবেন। অবশ্য মুসলিম লীগকে শাসন-পরিষদে যোগ দিতে সম্মত করিবার পরে সে-মত পরিবর্তিত হইয়াছে কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমরা শুনিয়াছি, বাঙলায় সংবাদপত্রের সম্বন্ধে সচিবসঙ্ঘ যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সদস্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে জানান হইয়াছিল। তিনি তাহাতে বলিয়াছেন, যে প্রদেশ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধীন, সে প্রদেশের সরকারের কার্যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না; তবে অনুরুদ্ধ হইলে পরামর্শ দিতে পারেন—এই পর্যন্ত। তাঁহারা যদি সেরূপ কোন পরামর্শ দেন, তাহার অনিবার্য ফল কি হইবে জানিয়া কেন সাংবাদিকগণ তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিতে অনুরোধ করিবেন?

যে প্রদেশে সাংবাদিক সমিতি শিষ্টাচার-হেতু সরকারী কর্মচারীকে অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি যাইয়া 'গোপন রিপোর্ট' দেন এবং প্রধান সচিব সেই রিপোর্টের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সংবাদপত্রের অধিকার-সঙ্কোচ চেষ্টা করেন—সে প্রদেশে সংবাদপত্রকে কেবল আপনাদিগের চেষ্টায় আত্মরক্ষা করিতে হয়। সে বিষয়ে অন্যান্য প্রদেশে ও দেশে অবস্থা জানাইয়া সহানুভূতি লাভ করা সম্ভব এবং সেই সহানুভূতি দুঃসময়ে সান্ত্বনার কারণ হইতে পারে। কিন্তু আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণাই সংবাদপত্রকে বিঘ্ন-বিপদ-কঙ্কর কণ্টকিত পথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা দিতে পারে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উক্তির পরে—বাঙলার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের পক্ষে আপনাদিগের কর্তব্য স্থির করিয়া সংঘবদ্ধভাবে কাজ করা ব্যতীত অন্য পথ নাই। তবে সাংবাদিকদিগকেও সে বিষয়ে সতর্ক ও আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া কাজ করিতে হইবে—সরকারের কোনরূপ কার্যে প্রলুব্ধ হইয়া সঙ্ঘের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না।

ভারত সরকার ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রাদেশিক সরকারের হস্তে সংবাদপত্র শাসনের ক্ষমতা ন্যস্ত করায় বিশেষ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—যখন প্রাদেশিক সরকার ইচ্ছানুসারে নোটিশ দিয়া সংবাদপত্রের জামিন তলব করিতে পারেন, তখন সংবাদপত্রের সরকারের কার্যের সমালোচনা করিবার অধিকার-স্বাধীনতা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়। তখন প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীনতা কেন্দ্রী



ক্যালকেমিকোর লাবণি স্নো—দিবা-প্রসাধনে ধূলির মালিন্য ও উত্তাপের দাহ থেকে পেলবতনুর কমনীয়তাকে বর্মের ন্যায় রক্ষা করে। এর উপর পাউডার দীর্ঘস্থায়ী হয়।

লাবণি ক্রীম—নিশীথ শয়নে তনুদেহকে শীতের রুক্ষতা ও দীর্ণতা থেকে রক্ষা করে গাত্রচর্মের স্নিগ্ধ কোমলতা অক্ষুণ্ণ রাখে।



লাবণী
স্নো এবং ক্রীম

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

রকার ...র্তৃক নিয়ন্তি হইতে পারিত—কেন্দ্রী রকার ...দেশিক সরকারের কার্যের প্রতিকার করিতে পারিতেন। বাঙলায় ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট জুরীর বিচার নষ্ট করিলে ভারত সরকার সে আদেশ নাকচ করিয়াছিলেন; যুক্তপ্রদেশে স্যার জেমস মেস্টন কাণপুরে মসজেদ ভাঙ্গার আদেশ দিলে ভারত সরকার তাহার প্রতিকার করিয়াছিলেন। এখন একদিকে যেমন কেন্দ্রী সরকারের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়াছে—অপরদিকে তেমনই সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায় কোন কোন প্রদেশে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট সচিব-সঙ্ঘ কিরূপ ব্যবহার করিবার স্বাধীনতা সম্ভোগ করেন, তাহার প্রমাণ আমরা বাঙলায় পাইয়াছি ও পাইতেছি।

এই অবস্থায় নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সঙ্ঘের পক্ষে বাঙলার অবস্থার মত অবস্থায় কি করা কর্তব্য, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাঁহারা—অর্থাৎ সমগ্র দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিরা সকল প্রদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কি চেষ্টা করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। বাঙলায় যাহা প্রকাশের স্বাধীনতা থাকিবে না, তাহা হয়ত দিল্লী হইতে প্রকাশ করা যায়; কিন্তু সে অবস্থা কখনই ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের পক্ষে সম্মানজনক হইতে পারে না।

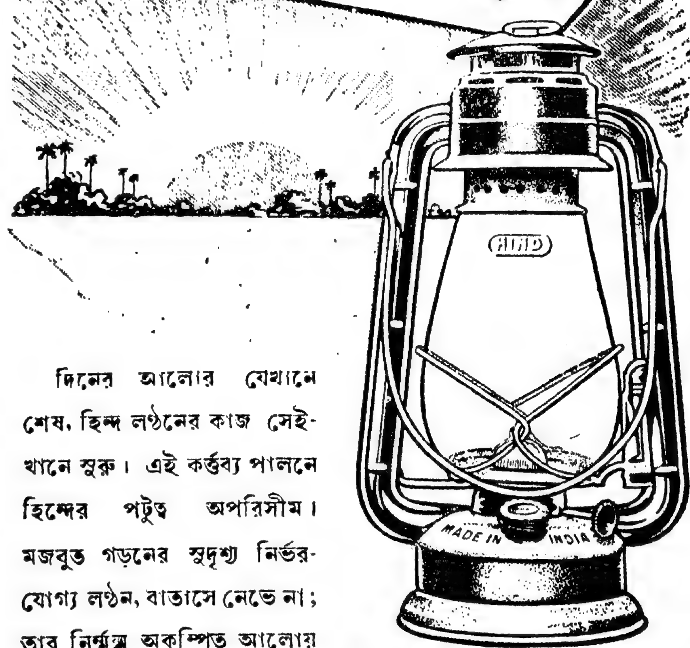
কবে স্বাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইবে, তাহা এখন বলিবার উপায় নাই। অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে করা অসঙ্গত নহে, তাহার বিলম্ব আছে। ততদিন যদি বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধিত না হয়, তবে যে মুক্তির জন্য প্রচারকার্য পরিচালিত করিয়া লোককে প্রস্তুত করার পথও বিঘ্ন-সঙ্কুল থাকিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশে বাধাদান য অসঙ্গত, তাহা সকল সভ্য দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু স্বৈর-শাসনের সহিত সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব নহে।

বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যগণ—বিশেষ স্বরাষ্ট্র বিভাগ—সংবাদপত্র সম্পর্কিত আইনের পরিবর্তনের বিষয় আলোচনা করিয়া মত প্রকাশের জন্য এক সমিতি গঠিত করিবার আয়োজন করিয়াছেন। সেই সমিতির নির্ধারণে যে আইন রচিত হইবে, তাহা কি সকল প্রদেশেই গৃহীত হইবে? যদি না হয়, তবে তাহার সার্থকতা কি?

রুশোর 'সোশ্যাল কণ্ট্রাক্ট' যখন সুইটজার-ল্যাণ্ডে দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তখন ভল্টেয়ার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার একবর্ণও আমি সমর্থন করি না। কিন্তু আমি মৃত্যুপণ করিয়া একথা বলিব যে, আপনি যাহা বলিতে চাহেন, তাহা বলিবার স্বাধীনতা আপনার থাকিবে।

যদি এই কথা স্বীকার্য হয় যে, জাতির স্বাধীনতা সংবাদপত্রের মতপ্রকাশস্বাধীনতার উপর নির্ভর করে, তবে মুক্তিকামী সকলেরই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য।



দিনের আলোর যেখানে শেষ, হিন্দ লণ্ঠনের কাজ সেই-খানে সুরু। এই কর্তব্য পালনে হিন্দের পটুত্ব অপরিসীম। মজবুত গড়নের সুদৃশ্য নির্ভর-যোগ্য লণ্ঠন, বাতাসে নেভে না; তার নির্মল অকম্পিত আলোয় সকলেই সাহস, সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে খুশি হয়।

সর্বত্র পাওয়া যায়

HIND
Lantern

প্রস্তুতকারক

ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড

৫৫।১, ধর্ম্মতলা রোড, সালকিয়া, হাওড়া।

ASP

যুদ্ধোত্তর ভারতে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা

শ্রীউষাপতি ঘটক

যুদ্ধোত্তর ভারতে শ্রমিক আন্দোলন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের মধ্যে শ্রমিক ও শিল্পীর যেমন প্রয়োজন ছিল, এখন আর তেমন নাই যুদ্ধের প্রয়োজনে নিযুক্ত শ্রমিকের কাজ শেষ হইয়াছে বলিলেই নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যার সমাধান চাই; কাজ চাই, খাদ্য চাই। রাষ্ট্রের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান; কিন্তু, যে অবস্থার মধ্যে মানুষ মানুষের মত বাঁচিতে পারে, সে অবস্থা সৃষ্টির দায়িত্ব প্রত্যেক সরকারের; কারণ সুনিয়ন্ত্রিত সরকারের মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রের স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

এদিকে যাহারা কলকারখানায়, সওদাগরী কার্যালয়ে, ব্যাঙ্কে বা বীমার কার্যে নিযুক্ত,—কিংবা যাহারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের দপ্তরখানায় বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিতেছে, তাহারাও বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে। জিনিসপত্রের দাম যেখানে তিন-চারগুণ বাড়িয়াছে, সেখানে সামান্য মাগ্‌গী ভাতা ও যুদ্ধ-পূর্ব হারে সুনির্দিষ্ট বেতন লইয়া কোন শ্রমিকই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। অথচ যুদ্ধ-পরবর্তীকালে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহাও অনিশ্চিত। শ্রমিক ও কর্মচারীর বর্ধিত হারে বেতন ও ভাতা অব্যাহত রাখা শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হইবে কিনা তাহাও দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে। যৌথকারবার অনেক স্থাপিত হইতেছে সত্য,—কিন্তু ইহার মধ্যে কতগুলি বৈদেশিক প্রতিযোগিতার মুখে টিকিয়া থাকিবে তাহা এখনই বলা যায় না।

এখন যাহাদের নিজস্ব কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে, বা যাহারা উন্নতিশীল ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত,—তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা ভাল; কিন্তু চাকুরী যাহাদের একমাত্র উপজীবিকা, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা শোচনীয়। এই অবস্থা ক্রমশ আরও অবনতির দিকে যাইতেছে।

জার্মান অর্থনীতি সংক্রান্ত লেখক এঙ্গেলের বিধান (Engel's Law of Consumption) অনুসারে দেখা যায় যে, সাধারণ শ্রমিক শান্তির সময় আয়ের প্রায় শতকরা ৬২ ভাগ খাদ্যাদির জন্য ব্যয় করে; মধ্যবিত্ত পরিবার ব্যয় করে ৫৫ ভাগ এবং স্বচ্ছল অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত পরিবারে আয়ের অর্ধাংশ খাদ্যাদির জন্য ব্যয় করা হয়।

এই বিধান সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশে প্রয়োগের উপযোগী নহে; বরঞ্চ দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে বস্ত্রাদির প্রয়োজন পাশ্চাত্য দেশসমূহ অপেক্ষা অনেক কম,—এই জন্য খাদ্যাদির জন্য ব্যয় আরও অধিক হইবার সম্ভাবনা। এই দেশে শান্তির সময় সাধারণ শ্রমিক আয়ের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ খাদ্যাদির জন্য ব্যয় করিত। এখন ঠিকমত খাদ্য সংগ্রহের জন্য আয় ৩।৪ গুণ বর্ধিত হওয়ার কথা। এই অনুপাতে আয় যেক্ষেত্রে বর্ধিত হয় নাই, সেখানে ধরিতে হইবে যে শ্রমিকের পরিবার জীবনধারণের অত্যাবশ্যক সামগ্রীসমূহ হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে।

সম্প্রতি ভারতীয় স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ১৮০০ মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছেন যে, শতকরা ৯০টি পরিবারের সামান্য আয় খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য ও বাড়িভাড়া দিতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। যে সকল পরিবার সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাহাদের মাসিক আয় ৫১ টাকা হইতে ২০০ টাকার মধ্যে। উক্ত ইনস্টিটিউট স্থির করিয়াছেন যে, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ১৯৩৯ সালে যাহা ছিল, বর্তমানে মোটামুটি তাহার তিনগুণ হইয়াছে। এই আয় হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই সকল পরিবার কিরূপ খাদ্য আহার করে ও কিরূপ বাড়িতে বাস করে। এই সকল পরিবারের খাদ্য ও বাড়িভাড়ার ব্যয় নির্বাহ করিবার পর শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও কাজে খরচের জন্য প্রায় কিছুই থাকে না। এদিকে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য,—এমন কি সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যও বাড়িয়া চলিয়াছে।

সম্প্রতি ভারতের বুকে অনেক ধর্মঘট হইয়া গেল। এখনও এই শ্রেণীর ধর্মঘট ক্রমশ বাড়িতেছে। সরকার সাধারণের আন্দোলনের চাপে ও শ্রমিকের মানসিক দৃঢ়তায় বিব্রত হইয়া শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করিয়াছেন সত্য; কিন্তু শ্রমিকের এই বর্ধিত হারে মাহিনা, ভাতা ইত্যাদি—যাহা সরকার দিতে বাধ্য হইতেছেন,—তাহার ফলে সরকারের খরচ ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে। অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ শ্রমিক, কর্মচারী ও কেরাণীর বর্ধিত হারে বেতন প্রভৃতি দিবার জন্য পণ্য-দ্রব্যের মূল্য যেমন বর্ধিত করিতেছেন তেমনি কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য দেশবাসীর উপর নূতন নূতন কর-ভার চাপাইতে বাধ্য হইবেন। দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির জন্য সাধারণ ক্রেতার ক্রয়শক্তি নিঃশেষিত হইতেছে; নূতন নূতন কর-ভার হইতে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার যদি রেহাই না পায়, তাহা হইলে ইহারা আরো দুর্দশা ডাকিয়া আনিবে; কারণ সাধারণ ব্যক্তির আয় বাড়াইবার কোন সুযোগ নাই। দ্রব্য-পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলে,—যদি জনসাধারণের কিনিবার শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়,—সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিধানে দ্রব্যমূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিদেশে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, কাঁচা মাল এবং খাদ্যের অভাব ও অপচয় প্রভৃতি বহু কারণে দ্রব্যমূল্য কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

পাশ্চাত্য দেশগুলি শিল্প-বিজ্ঞানে উন্নত বলিয়া দরিদ্র শ্রমিক বা মধ্যবিত্ত পরিবারকে করভার হইতে যথাসম্ভব রেহাই দেওয়া হইয়া থাকে,—অধিকাংশ কর ধনশালী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় সরকারের আয়কর, যৌথকারবারের কর, মৃত্যু কর প্রভৃতি হইতে আয় সর্বাপেক্ষা বেশী। যুদ্ধের মধ্যে ভারত সরকারের আয়কর ও যৌথকারবারের কর হইতে আয় অপ্রত্যাশিতরূপে বর্ধিত হয়। ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটে ভারত সরকারের মোট আনুমানিক আয় ধরা হইয়াছিল ১৩১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা, কিন্তু আয়কর এবং যৌথকারবারের কর হইতে আয় যথাক্রমে ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ও ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দেখানো হয়। এই টাকা সমগ্র রাজস্বের শতকরা ১৫ ভাগের কিছু কম। কিন্তু, ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুমানিক আয় যেখানে দেখানো হইয়াছিল,—৩৫৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা, সেখানে আয়কর ও যৌথকারবারের কর হইতে রাজস্ব ধরা হইয়াছিল যথাক্রমে ১০৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা এবং ১০৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। এই দুই খাতে আয় ছিল সমগ্র রাজস্বের শতকরা ৫৮ ভাগের কিছু অধিক।

এদিকে ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটে আয়-কর ও যৌথকারবারের কর হইতে আয় পূর্ব-বর্তী বৎসর অপেক্ষা প্রায় ২০ কোটি টাকা

কম [illegible]নো হয়। সমগ্র রাজস্ব যেখানে ছিল ৩৬২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা, সেখানে আয়কর ১০০ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা এবং যৌথ-কারবারের কর ৮[illegible] কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়। পূর্ব বৎসর এই দুই খাতে আয় ছিল ২১০ কোটি টাকা; কিন্তু আলোচ্য বৎসরে এই রাজস্ব প্রায় ১৯০ কোটি টাকা অনুমিত হইয়াছিল। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব ১৯৪৫-৪৬ সালের যে সংশোধিত বাজেট পেশ করেন তাহাতে দেখা যায় যে এই বৎসর ভারত সরকারের প্রায় ১৪৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা। সামরিক বিভাগের ব্যয় সংশোধিত আকারে ৩৭৬ কোটি টাকা ধরা হয়।

পুনরায় ১৯৪৬-৪৭ সালে আয় আরো হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; এই বৎসর অনুমিত রাজস্ব প্রায় ৩০৭ কোটি টাকায় নামিয়া আসিয়াছে; অথচ আনুমানিক খরচ ৩৫৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা; এই হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৪৯ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। যুদ্ধ-বিরতির জন্য সামরিক বিভাগের খরচ বিশেষ কিছুই কমে নাই; কারণ সামরিক বাবদবরাদ্দ যেখানে ২৪৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, অসামরিক বিভাগের আনুমানিক খরচ মাত্র ১১২ কোটি টাকা। যুদ্ধের মধ্যে সামরিক বিভাগের ব্যয় চালাইবার জন্য ভারত সরকারকে ১১৭৮ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করিতে হয়; এখনও সামরিক বিভাগের ব্যয় বাহুল্যের জন্য অসামরিক বিভাগের জন্য সামান্যই বরাদ্দ হইয়াছে। দেশের বর্তমান আর্থিক দুর্গতির জন্য সামরিক বিভাগের ব্যয় কমাইয়া উদ্বৃত্ত অর্থ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি কার্যে নিয়োগ করিতে পারিলে জনসাধারণের কষ্টের লাঘব হইত। অর্থসচিব অবশ্য আশ্বাস দিয়াছেন যে, আগামী বৎসর শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির জন্য ব্যয় বরাদ্দ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকারে পেশ করা হইবে; কিন্তু এই আশ্বাস শেষ পর্যন্ত বাস্তব আকার ধারণ করিবে কিনা তাহা ভাবী দুর্ভিক্ষের উপর নির্ভর করিতেছে।

উপরিউক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে; অথচ খরচ বাড়িয়া চলিয়াছে। আয় কমিবার একটি প্রধান কারণ দেশের দারিদ্র্য এবং আয়কর ও অনুরূপ কর হইতে আয়ের ক্রমিক অবনতি। সুতরাং আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য নূতন নূতন কর দেশবাসীর উপর স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা। এই কর হইতে সাধারণ শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত পরিবার রেহাই পাইবে কিনা তাহা সন্দেহস্থল। 'এদিকে ক্রমাগত অর্থনীতিক বিশৃঙ্খলা ও শোষণের ফলে আজ ইহারা দারিদ্র্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে; চোরা ব্যবসায় কিছু কমিলেও এখনও অবস্থা সুসংহত হয় নাই। ইহারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতেছে। ইহার উপর আছে বিদেশী বণিকের শোষণ।

প্রথমতঃ এদেশের কাঁচা মাল, খনিজ সম্পদ (যাহা ভারতীয় শিল্পে ব্যবহৃত হইতে পারিত) এবং খাদ্যাদি স্টার্লিং এর বিনিময়ে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। এই স্টার্লিং আর কিছুই নয়,—ভারতের নিকট ব্রিটেনের ঋণের স্বীকৃতি পত্র মাত্র। কোন কোন অর্থনীতিবিদ ইহাকে টাকার ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট এবং বিনিময়ের (Exchange) সমস্ত শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু ইহার সাহায্যে ভারতের এখনই কোন বিদেশী পণ্য (বিশেষতঃ কলকব্জা) প্রাপ্তির অবাধ সুযোগ নাই। এই স্টার্লিং-এর ভবিষ্যৎ যাহাই হউক না কেন, ইহার বর্তমান মূল্য কমাইবার জন্য বিদেশে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। ইহার প্রত্যক্ষ ফল এই যে, কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভারতীয়গণ যে অর্থনীতিক সম্পদ বা সেবাকার্য (services) লাভ করিলেও করিতে পারে, তাহার সম্ভাবনায় বর্তমান যুগের ভারতীয়গণ জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এই সকল কারণে একদিকে যেমন মুদ্রাস্ফীতির জন্য দ্রব্যমূল্য কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না,—অপর দিকে তেমনি দেশে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর (Necessaries) অভাব দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশের বহু অর্থ-নীতিবিদ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন; কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ,—জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স জাপান প্রভৃতি শক্তিগুলি এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বাধীনভাবে পুর্ণোদ্যমে অবতীর্ণ হইবার যোগ্যতা অর্জন না করায়, আজ ব্রিটেন ও আমেরিকা আন্ত-র্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছে। আজ মাল-নিয়ন্ত্রণ, কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ, যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের ছদ্মবেশে তাহারা এশিয়াকে শোষণ করিতে বদ্ধপরিকর। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে আজ প্রতিযোগী নাই। অবাধ বাণিজ্য-নীতির (Free Trade) কথা এখন আর শোনা যায় না। ইহাই যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদ।

এখন ভারতে কলকব্জা আসিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না; অথচ অস্ট্রেলিয়াতে নূতন নূতন যন্ত্রশিল্প স্থাপনের তোড়জোড় চলিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ, মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতিক ঘনঘটা সামান্য নহে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ যে মধ্যপ্রাচ্যকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ব-যুদ্ধে পরিণত হইবে ইহা আজ আর সম্ভাবনা নহে, সুস্পষ্ট সত্য। তাই ভারতের কাছাকাছি অঞ্চলে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রমবর্ধমান ও সুদূর প্রাচ্য হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং কলকারখানায় প্রস্তুত সামগ্রীর বাজার নিরঙ্কুশ রাখা সম্ভবপর হইবে। ভারতের কাঁচামালের চাহিদা এখন সারা বিশ্বে, কিন্তু সমগ্র ব্যবসায় এখন ব্রিটেন ও আমেরিকার হাতে। আজ বাঙলাদেশে সূতার অভাবে বহু তাঁতি কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেছে; ভারতের কাঁচামাল প্রভৃতি ভারতীয়গণের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিলে আজ এ শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইত না।

ভারতের কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদ যদি ভারতীয়গণের প্রয়োজনে, ভারতীয় শ্রমে, ভারতীয় মূলধনের সাহায্যে ও ভারতীয়গণের পরিচালনাধীন নানা যৌথকারবারে বা কুটীর শিল্পে নানাপ্রকার সামগ্রীতে (manufactured goods) রূপান্তরিত হইত,—তাহা হইলে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির সৃষ্টি হইত,—

(১) দেশের লোকের ক্রয়শক্তি (Purchasing Capacity) ক্রমশ বর্ধিত হইত এবং ঐ ক্রয়শক্তি দেশের মধ্যে থাকিতঃ

(২) জাতীয় শিল্পের উন্নতি হইত;

(৩) ভারতীয় প্রতিযোগীর উপস্থিতিতে বিদেশী পণ্যের দাম কমিত;

(৪) দেশের টাকার আয় হইতে মালিক (জমির বা মূলধনের), শ্রমিক, পরিচালক এবং ক্রেতা সকলেই লাভবান হইত। এই কারণে বিদেশীর শোষণের কোন উপায় থাকিত না;

(৫) যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহ হইতে বরখাস্ত বেকারগণের নানা কর্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগলাভ হইত;

(৬) আয়কর ও যৌথকারবারের কর হইতে সরকারের আয় ক্রমশ বাড়িতে থাকিত; ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় করভার হইতে রেহাই পাইতেন;

(৭) দ্রব্যের প্রাচুর্য ঘটিলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস-প্রাপ্ত হইত; আর্থিক সঙ্গতি জীবনযাত্রার মান উন্নত করিত।

কিন্তু,—সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি এই পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছে। শিল্প-প্রসারের প্রতিবন্ধকতার অন্যান্য কারণও আছে।

এখন কোন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে বা নূতন কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইলে মূলধন-নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের অনুমতি চাই। এ অনুমতি পাওয়া গেলেও শিল্প-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম বিদেশ হইতে আনয়ন করা শক্ত; বিদেশে কলকব্জার অভাব ত আছেই। তাহা ছাড়া, যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ দপ্তর বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনয়নের অনুমতি দিবেন কিনা সন্দেহ। এই অসুবিধার জন্

অনেক যৌথ-কোম্পানীকে প্রারম্ভেই পাততাড়ি গুটাইতে হইবে; সুতরাং অনেক শ্রমিক, শিল্পী ও বিশেষজ্ঞের অন্নসংস্থানের সুযোগ ঘটিবে না। ইহা ব্যতীত অনেক কর্মীর কর্মচ্যুতির আশঙ্কা রহিয়াছে। যৌথকারবারই যদি উঠিয়া যায়,—অযৌক্তিক ধর্মঘটের দ্বারা সুফল প্রাপ্তির আশা অল্প।

মূলধন বিভিন্ন কারবারে খাটাইবার সুযোগ না থাকায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ লাভ করিতে পারিবে না; টাকা সস্তা (Cheap Money) বলিয়া এবং লাভজনক কারবারে টাকা খাটাইবার সুযোগ না থাকায় সুদের হার ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। ভারত সরকারও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের উচ্চতর সুদের পূর্ববর্তী বণ্ডসমূহ নিম্নতর হারের সুদের বণ্ডে রূপান্তরিত করিতেছেন। ভারতীয়গণের সঞ্চিত টাকা স্বর্ণ বা রৌপ্যে রূপান্তরিত করিবার প্রলোভন সংযত করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার স্বর্ণ এবং রৌপ্যের উপর আমদানী শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন; তবে সম্প্রতি ঐ শুল্ক অর্ধেক করা হইলেও,—ইহা যে ভারতে স্বর্ণ বা রৌপ্য আসিতে বাধা সৃষ্টি করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ভারতকে সর্বপ্রথমে এই অর্থনৈতিক অবস্থার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইতে হইবে; কারণ বর্তমান অব্যবস্থা আর কিছুদিন চলিলে এই দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভাঙিয়া পড়িবে। এই উদ্দেশ্যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করিতেছি।

প্রথমতঃ, স্বর্ণের উপর হইতে আমদানী শুল্ক বন্ধ করিয়া ভারত হইতে বিদেশে স্বর্ণ লইয়া যাওয়া বন্ধ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, ভারতকে যদি কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদ একান্তই বিক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে স্বর্ণই হইবে তাহার বিনিময়ের সামগ্রী; স্টার্লিং (Sterling)এর দাম পরিশোধ ব্যবস্থার রদ হওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতি না হইলে দেশের দুর্দশা ঘুচিবে না; এই উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে নানা শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন; এই জন্য, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা লোপ করা কর্তব্য। বিদেশ হইতে যদি কলকব্জা না আসে, তাহা হইলে দেশেই কলকব্জা ও সাজসরঞ্জাম নির্মাণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক; কিন্তু এই সমস্ত শিল্পকে সরকারী সাহায্যে ও রক্ষণাবেক্ষণে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে।

চতুর্থত, যদি বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে ভারতের কাঁচামাল ও খনিজসম্পদ কুটীরশিল্পের কাজে লাগান উচিত। মহাত্মাজীর বনিয়াদী শিক্ষা (Basic Education) পরিকল্পনায় গ্রামে গ্রামে বহু কুটীরশিল্পাশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। এই সমস্ত আশ্রমের শিল্প-সামগ্রী যাহাতে বিদেশী প্রতিযোগিতার সমকক্ষ হইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক; প্রথম অবস্থায় আইন প্রণয়ন করিয়া বিদেশী পণ্যের ব্যবহার কমাইয়া স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার বর্ধিত করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় ও প্রদেশিক সরকারগুলির নিজস্ব প্রয়োজনে বহু সামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হয়। অনুরূপ দ্রব্য যথাসম্ভব বিদেশ হইতে না কিনিয়া স্বদেশে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইলে,—সরকারের অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে। ঐ উদ্বৃত্ত অর্থ নানা জনহিতকর কার্যে নিয়োগ করা সম্ভবপর।

পঞ্চমত, ভারতীয়গণকে 'স্বদেশী ক্রয়'-নীতি কার্যকরীভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। কোন বিদেশী সামগ্রী ক্রয়ের পূর্বে অনুরূপ স্বদেশী দ্রব্য বাজারে আছে কি না,—তাহা অনুসন্ধান করা কর্তব্য; স্বদেশী ও বিদেশী দ্রব্যের গুণাগুণে তারতম্য থাকিবেই; কিন্তু স্বদেশী দ্রব্য নেহাৎ অব্যবহার্য না হইলে স্বদেশীর পরিবর্তে বিদেশী সামগ্রী ক্রয় করা উচিত নয়।

ভারতীয় শিল্প-প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করিতে হইবে। এককালে পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত ভারতের প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইতিমধ্যে ভারতের বহু প্রস্তুত সামগ্রী (manufactured goods) বিদেশে চালান যাইতেছে। ইহা যে শুভলক্ষণ তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন সমগ্র বিশ্বে নিদারুণ অভাব-অনটন। ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা তত প্রবল নহে। চাহিদা অপরিমিত; সুতরাং কুটীর-শিল্প বা যন্ত্র-শিল্প,—যাহাই গড়িয়া উঠুক না কেন, তাহারই মূল্য রহিয়াছে। বিধ্বস্ত ইউরোপ পুনর্গঠনের পূর্বে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে; কিন্তু, তাহার পূর্বেই ভারতকে কৃষি ও শিল্পে আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে হইবে।

সম্প্রতি ভারতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সদস্য মিঃ সি এইচ ভাবা গত ১৮শে সেপ্টেম্বর বাণিজ্য-নীতি কমিটির সমক্ষে নবগঠিত সরকারের বহির্বাণিজ্য-নীতি কিরূপ হইবে বা ভারতের শিল্পোন্নয়ন কোন পথে চলিবে তাহার কিছু আভাস দিয়াছেন। তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার বাজারগুলিতে বিক্রয়ের জন্য ভারতীয় প্রস্তুত সামগ্রী (manufactured goods) রপ্তানি বর্ধিত করিবার ও সঙ্গে সঙ্গে বহির্বাণিজ্য শুল্ক-নিয়ন্ত্রণ ও অনুরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা দ্বারা বিদেশ হইতে আমদানী সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে মার্কিণ গভর্নমেণ্ট বিশ্ব-বাণিজ্য-প্রসার ও শ্রমশিল্পে নিয়োগের জন্য যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন কমিটির সদস্যগণকে সে সম্বন্ধে মতামত দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে কয়েকটি আলোচনার পর ভারতের বাণিজ্য ও শুল্কনীতি চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হইবে।

কিছুদিন হইল কলিকাতার মাড়োয়ারি চেম্বার অব্ কমার্সের পরিচালক সমিতি (Committee) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাণিজ্য-সদস্য-সকাশে কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি সাহায্যে যুদ্ধ-কালীন নিয়ন্ত্রণ (War-time Control) ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। এই সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বে কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহারা সেইরূপ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা ভারত হইতে বস্ত্র-রপ্তানির সংকোচ-সাধন এবং বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকের অতিরিক্ত মজুরীর ব্যবস্থা করিয়া দৈনিক শ্রমের কাল আট ঘণ্টা পর্যন্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতে বস্ত্র-সংকট সামান্য নহে; যাহাতে সমভাবে ভারতবাসীর বস্ত্রবরাদ্দ নির্ধারিত হইতে পারে,—এইরূপ প্রস্তাবও বিজ্ঞপ্তির মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে।

যাহা হউক, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের (Cabinet) দায়িত্ব ব্যাপক,—বাধাবিপত্তি তুচ্ছ নহে। তাঁহাদের প্রচেষ্টা কতদূর সাফল্য-মণ্ডিত হইবে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পি, সি, দাস এণ্ড সন্স
সুবাসিত
তরল আলতা
শত বৎসরের সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রসাধন
এ, পি, দাস এণ্ড কোং ৭, অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, কলিকাতা।

আজকের সাহিত্য ও তার কর্তব্য

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

আজ আমাদের জীবনের পেছনে যে সংকটের কালো পটভূমিকা, তাতে অবিরত চলছে জীবন-মৃত্যুর উদ্দাম-সংগ্রাম। বিশেষত বাঙলার বুকে আমরা দেখছি লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব বুভুক্ষুর মাঝে মৃত্যুর সে কী নিষ্ঠুর মর্মভেদী স্বরূপ—জীবনকে কোনোমতে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে অসহায় নরনারীর কী ব্যাকুল করুণ প্রচেষ্টা! এই মৃত্যুর আর ক্ষুধার—ক্রন্দনের আর অভিশাপের পারিপার্শ্বিকের মাঝে মানুষের কাছে আজ সাহিত্য প্রচেষ্টার কোনো প্রয়োজন আছে কি না—এ প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। কোনো কোনো যুক্তিবাদী বলে থাকেন—দেশে আজ অন্নবস্ত্র যোগাও, তোমার ওই সাহিত্য থামাও বাপু। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার করলেও দেখতে পাই, দেশে অন্নবস্ত্রের আজ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সাহিত্যের। ওর কোনোটিই বাদ দেওয়া চলে না। পশুর পক্ষে শুধু দেহটাই সত্য, মানুষের পক্ষে সত্য দেহ আর মন দুই-ই। দেহের ক্ষুধা মেটাবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের প্রয়োজন মনের ক্ষুধা মেটাবার। তার hunger সত্য, desire-ও মিথ্যা নয়। বাইরের কোনো বস্তুর চাপেই মানুষের মন বস্তুটি ধ্বংস হতে পারে না, এবং যতদিন মানুষের মন আছে—desire আছে, ততদিন সাহিত্যেরও প্রয়োজন আছে তার জীবনে।

এর পরেই প্রশ্ন হতে পারে যে, আজকের দিনেও সাহিত্যের প্রয়োজন যদি বা থাকে তাহলে তার স্বরূপ কী হবে। সে কি ধ্যান-লোকে বসে স্বপ্নজাল বুনবে, না ক্লেদাক্ত পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশার ফোটোগ্রাফ আর ডায়েরী রাখবে? উত্তরে বলতে হয়, এ-দুয়ের কোনোটিই নয়। ধ্যানলোকের স্বপ্নজাল রচনা আজকের দিনেও সাহিত্য হতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের প্রিয় তা হবে না। অপরপক্ষে বর্তমানের নিখুঁত বিবরণমাত্র আজকের মানুষের প্রিয় হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য সে হয়ে উঠবে না। তা'হলে কর্তব্য কী? এ সম্পর্কে একজন ইংরেজ সমালোচকের কথা মনে পড়ছে। তিনি উপন্যাস সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন তা প্রায় সকলপ্রকার সাহিত্যিক রচনার পক্ষেই প্রযোজ্য। তা হচ্ছে এই যে, সাহিত্যে তিনটি 'দূরত্ব' আজ প্রয়োজন। আমরা যখন একটি খোলা মাঠে গিয়ে দাঁড়াই তখন প্রথমেই নজরে পড়ে নিকটের বড় বড় গাছ, পাহাড়, বাড়িঘর, মানুষ, পশু-পাখী ইত্যাদি। একে বলা চলে 'প্রথম দূরত্ব'। তারপর আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় সমগ্র প্রান্তরটির দিকে—তার নিকটের, দূরের, আশপাশের সমস্ত বস্তুর দিকে। একে বলা যায় দ্বিতীয় দূরত্ব। তারপর ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টি চলে যায় আকাশ ও প্রান্তরের মিলনস্থল দিগন্তরেখার পানে, যা দেশকে ছাড়িয়ে গেছে—সীমাকে অতিক্রম করে গেছে। এ হচ্ছে 'তৃতীয় দূরত্ব'। সাহিত্যেও থাকবে তিনটি দূরত্ব। সেখানকার প্রধান চরিত্রগুলো এবং তাদের কার্যকলাপ হচ্ছে প্রথম দূরত্ব। পটভূমিকা (atmosphere) হচ্ছে দ্বিতীয় দূরত্ব এবং আদর্শ হচ্ছে তৃতীয় দূরত্ব। প্রথম দুটি দূরত্ব হবে দেশের সমসাময়িক অবস্থার সংগে জড়িত, যা সাহিত্যকে প্রিয় করে তুলবে। তৃতীয় দূরত্বটি হবে দেশকালব্যতিরিক্ত এক চিরন্তনরসের অভিব্যক্তি, যা রচনাকে সাহিত্য করে তুলবে। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসখানার দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। এখানকার প্রথম দূরত্ব হচ্ছে গোরা, বিনয়, ললিতা, সুচরিতা প্রভৃতি চরিত্র-গুলি এবং তাদের কার্যকলাপ দ্বারা সৃষ্ট ঘটনাবলী। দ্বিতীয় দূরত্ব হচ্ছে বাঙলার স্বদেশী-যুগের পটভূমিকা। এ-দুটি দূরত্বই দেশের তদানীন্তন সমাজ ও ভাবধারার সংগে সংযুক্ত। এ-গ্রন্থে তিনি ব্রাহ্ম পরিবারের ও ব্রাহ্ম সমাজের নরনারীর এবং দেশের অবস্থার যে-চিত্র অংকিত করেছেন তা সমসাময়িক। কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর এ পুস্তকে অন্তর্নিহিত আরো কিছু বলবার কথা আছে। সে কথা হচ্ছে এই যে, বিশ্বপ্রেমের বিরোধী যে স্বদেশ-প্রেম তা মিথ্যা। দেশপ্রেম যখন হবে বিশ্ব-প্রেমেরই অংগ তখনই তা হয়ে উঠবে সার্থক ও সত্য। একেই বলব তৃতীয় দূরত্ব।

এই যে তৃতীয় দূরত্ব—এই যে বলবার কথা—এতো অনেক রকমেরই হতে পারে। একথা যে শুধু সরসই হবে তাই কেন—একথা তো প্রয়োজনীয়ও হতে পারে। অনেকেরই মনে একটা ধারণা আছে যে, সাহিত্যের এই বলবার কথা—যাকে বলা চলে 'ফলশ্রুতি'—তা কেবল রসাত্মকই হবে, আর কিছু না। সংস্কৃত 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' এবং ইংরেজী 'Art for art's sake' কথাদুটির মানে তাই দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন যে, সাহিত্য হচ্ছে 'প্রয়োজনের আনন্দ'। 'আবেদন' কবিতায় তিনি সাহিত্যকে বলেছেন "অকাজের যত কাজ, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়"। 'অনাবশ্যক' কবিতায় বলেছেন,—

চেয়ে দেখি শূন্য কাশের বনে
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।

—অর্থাৎ সাহিত্যও এমনি অকারণে ভাসিয়ে দেয়া প্রদীপ,—অন্ধকার ঘরের আলোর প্রয়োজন পূর্ণ করবার কাজ তার নয়।

কিন্তু সাহিত্যকে এমনি করে মানুষের প্রয়োজন থেকে দূরে রাখবার কোনো অর্থ হয় না। বার্ণার্ড শ' তো স্পষ্টই বলেছেন, "All art must be didactic"। বাস্তবিক সাহিত্য যে মানুষের প্রয়োজনের সংগে—সমস্যার সংগে যুক্ত হতে পারে না, তাকে দিয়ে যে অন্ধকার ঘরের প্রদীপের কাজ চালানো যায় না—একথা কোনোমতেই মানা চলে না। বিশেষত যখন জাতীয় জীবনে আসে দুর্দিন—দেশের বুকে যখন জমে ওঠে ব্যথার অশ্রু আর অভাবের হাহাকার, তখন সাহিত্যকে দেশ এবং জীবনের সংগে যুক্ত হতেই হবে,—দেশের অভাব-অভিযোগ, দৈন্য-সমস্যা মেটাবার কাজে সাহিত্যকেও যোগ দিতেই হবে এবং এই হবে তখন তার প্রধান কর্তব্য।

আপত্তি হতে পারে যে, তাহলে সাহিত্য 'প্রপাগাণ্ডা' হয়ে উঠবে। কিন্তু তাই কি হয়? প্রপাগাণ্ডার কাজ শুধু বুদ্ধিকে নাড়া দেওয়া, কিন্তু এ সাহিত্যের কাজ হবে শুধু বুদ্ধিকে নাড়া দেওয়া নয়—হৃদয়ের অনুভূতিকে নাড়া দেওয়া, যা প্রপাগাণ্ডার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। প্রপাগাণ্ডা জানিয়ে দিতে পারে যে বাঙলার নারীরা সংসারের কারাগারে আবদ্ধ; এই কারাগার থেকে তাদের মুক্তি চাই। কিন্তু একথা সে অনুভব করাতে পারে কি, যেমন পারে কবি রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' বা 'বধূ' কবিতা? যখন দেখি বাঙলার নারী মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বলছে—

এ সংসারে এসেছিলাম ন বছরের মেয়ে,
তারপরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাববো এমন সময় ছিল কোথা

জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ
বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি
রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।

* * * *

দাও খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

—তখন বঙ্গনারীর করুণ ও বেদনাময় অবস্থাটিকে আমরা যে শুধু জানতে পারি তাই নয়, গভীরভাবে একে অনুভব করি।

সমাজ ও জীবনকে উন্নত করবার কাজে সাহিত্য অন্য সময়ে যদি বা এগিয়ে না আসে, যখন দেশের বুকে ঘনিয়ে আসে চরম দুর্দিন, চিত্তাকাশ যখন আচ্ছন্ন হয়ে যায় গভীর কালো মেঘে, তখন সাহিত্যকে এ পথেই এগিয়ে আসতে হবে। আজ আমাদের দেশের বুকে অন্ধকারের যুগ ঘনিয়ে এসেছে, আমাদের বুকে নেই সাহস, দেহে নেই শক্তি মুখে নেই হাসি—চারিদিকে দারিদ্র্যের করাল মূর্তি। অন্নের জন্যে হাহাকার, বস্ত্রের জন্যে আকুতি। এ সময়ে সাহিত্য যদি হস্তিদন্তনির্মিত সৌধ-তোরণে বসে আপন খুসীতে আনন্দের গানই গেয়ে চলে,—Shelley-র Skylark-এর মত মাটিকে বিস্মৃত হয়ে কেবল আকাশের শূন্যতার দিকেই ডানা মেলে, তাহলে তা সাহিত্য হতে পারে, কিন্তু মানুষের প্রিয় কখনই হবে না।

আমি একথাই বলতে চাইছি যে, সাহিত্যকে আজ শুধু আনন্দ বিলালেই যথেষ্ট হবে না, তাকে হাতে তুলে নিতে হবে একটা বিরাট কাজের ভার। আজ তাকে 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' না হয়ে হতে হবে 'প্রয়োজনের আনন্দ'। আমাদের সমাজে যে ত্রুটী আছে, সংস্কারের মধ্যে যে মিথ্যা আছে, আমাদের জীবনে যে দুর্বলতা ভীরুতা আছে, সাহিত্যে তার সুস্পষ্ট চিত্র এঁকে জনসাধারণের চোখের সামনে মেলে ধরতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে সমাধানের ইঙ্গিত ও প্রেরণা।

সহজ কথায় আজ সাহিত্যকে প্রচারমূলক হতে হবে। দেশের উন্নতির জন্য জাতীয় মঙ্গলের জন্যে তাকে দিয়ে আমাদের পরোক্ষে প্রচারকার্যই চালাতে হবে।

'প্রচারমূলক সাহিত্য'—কথাটা অনেকের কাছেই হয়তো অসহ্য ঠেকবে, কারণ আমাদের সনাতন ধারণা এই যে, প্রচারমূলক সাহিত্য কখনো রসোত্তীর্ণ হতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা কখনেই সত্য বলে মানা চলে না। প্রচারধর্মী হলেই সাহিত্য কেন রসধর্মী হতে পারবে না? প্রচার এবং রস তো পরস্পর বিরোধী নয়। কড্-লিভার অয়েল জিনিসটা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু খেতে সুস্বাদু মোটেই নয়। এই থেকে কেউ যদি ধারণা করে বসেন যে, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে যে-সকল খাদ্যের উদ্ভব, স্বাদের দিক থেকে তারা নিঃস্ব, তাহলে তাদের সে ধারণা আমরা নিশ্চয়ই যথার্থ বলে মেনে নেবো না। প্রকৃতির রাজ্যে এমন খাদ্য দুর্লভ নয় যা একাধারে সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর। কবি রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

অথবা—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে।

তখন তা 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' হতে পারে, কিন্তু তিনিই আবার যখন বলেন—

ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে। কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল। কোন্ অন্ধকারা মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়।

অথবা—

বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

তখনও কি একে 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' বলব, না, এতে প্রয়োজন মেটাবার দাবী প্রচারের ইঙ্গিত আছে বলে একে সাহিত্যের শ্রেণীতে অপাংক্তেয় বলে মনে করব?

প্রচার আর রস যে সুস্বাদ আর স্বাস্থ্য-কারিতার মতই পরস্পরবিরোধী নয় তারই উদাহরণ গোর্কীর 'Mother', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ', শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'।

সাহিত্যের মাঝে আমাদের সমাজ ও জীবনের ত্রুটী-বিচ্যুতি, দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে আমরা যেমন গভীরভাবে অনুভব করি তেমন আর কিছুতে নয়। সাহিত্যই মানুষকে সত্যের পথে—পূর্ণতার পথে—নির্ভীকতার পথে চলবার প্রেরণা যোগাতে পারে।

আজ বাঙলার প্রতিটি কবি ও সাহিত্যিকেরই এদিকে মনোযোগী হবার সময় এসেছে। দেশকে এবং জাতিকে উন্নতির পথে—সৌভাগ্যের পথে এগিয়ে নেবার গুরু দায়িত্ব নিয়েই তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। কবিতা হোক, গল্প হোক, উপন্যাস হোক, প্রবন্ধ হোক—যতটুকু কিছুই যার দ্বারা সৃষ্টি হোক না কেন, সে যেন বহন করে এই বৈশিষ্ট্য—এই আদর্শ। গল্প উপন্যাস আঁকবে সমস্যার চিত্র—দেবে সমাধানের ইঙ্গিত, আর কবিতা যোগাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট :: কলিকাতা।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

	বৎসর	আদায়ী মূলধন		ডিপোজিট	
এপ্রিল (উদ্বোধন মাস)	১৯৪০	৩.০৯.০০০,	উর্দ্ধে	১.০৫০,	উর্দ্ধে
ডিসেম্বর —	১৯৪০	৫.৭২.০০০,	"	৩.১৯.০০০,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪১	৮.১৮.০০০,	"	২৪.৮২.০০০,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪২	৯.৪৭.০০০,	"	৭০.০০.০০০,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪৩	১০.০০.০০০,	"	১.১০.০০.০০০,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪৪	১০.২০.১৭৫,	"	২.১৪.৬৯.২২৭,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪৫	১০.৫৭.৬৫০,	"	৩.০৭.১১.৬৪০,	"

জাতীয় শিল্প ও ব্যবসার সমৃদ্ধিকল্পে প্রকৃত ব্যবসায়ীকে সুবিধাজনক সর্তে টাকা দেওয়া হয়।

আলামোহন দাশ
চেয়ারম্যান

স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের স্বদেশপ্রেম

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙলার জাতীয়তা সৃষ্টির মূলে বাঙালী কবিদের দান অতুলনীয়। াতীয় জাগরণের ইতিহাস বিরচিত হইবার দিনে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ নেতাগণের নামের হিত বাঙলার কবি ও বাঙালী রাষ্ট্রীয় রুদের নাম থাকিবে চিরস্মরণীয় হইয়া। ষি বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতবাসীর মধ্যে নব উদ্দীপনার সুর জাগাইয়া ঐক্য সাধন মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস জাতীয় জাগরণের জন্য নবীন সুরে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। স্বভাব-কবি গোবিন্দ-দাস অর্ধ শতাব্দী পূর্বে দেশাত্মবোধক মহা-মিলনের বাণী প্রচার করেন। তিনি গাহিয়াছিলেন :

আমরা হরিহর!
আমরা বঙ্গ আমরা আসাম,
হোক্ না মোদের সহস্র নাম,
আমরাই সদিয়া সিন্ধু সেতু রামেশ্বর,
আমরা নাগা আমরা গারো,
কেহই ত পর নাহি কারো,
খজা বর্গী গুর্খা জাঠ্ আর পার্শী সওদাগর,
পণ্ডিচেরী ফরাসডাঙ্গা,
নামে কি যায় ভারতভাঙা?
কেউ বা কালো কেউ বা রাঙা একই কলেবর,
কেউ বা চরণ কেউ বা হস্ত,
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত,
একই দেহের রক্ত মাংস আমরা পরস্পর,
*　　*　　*　　*

আমরা হরিহর!
একই সলিল একই বায়ু,
একই মৃত্যু পরমায়ু,
একই মোদের শীত বসন্ত একই দিবাকর।
একই মোদের ক্ষুৎ পিপাসা,
একই ভরসা একই আশা,
এক আকালে এক পেলেগে মরি নিরন্তর!
পীলা ফাটে একই বুটে,
একই পিশাচ নারী লুঠে,
একই ঘৃণা একই লাজে সবাই জরজর!
একই মোদের দর্দবিধি,
একই মোদের গুণের নিধি,
এক চরণে তিরিশ কোটি লুটি নারীনর!
একই ক্ষোভে একই রোষে,
সবার বুকের রক্ত শোষে,
গর্জে প্রাণে অপমানে বজ্র ভয়ঙ্কর।
এক মরণে আমরা মরি সবাই নারীনর!
*　　*　　*　　*

নাইক নীচ নাইক উচ্চ,
নাইক প্রধান নাইক তুচ্ছ,
কোরাণ পুরাণ জেন্দাবেস্তা সবাই একত্তর,
ভাই ভগিনী তিরিশ কোটি,
আমরা যদি জেগে উঠি,
আমার তুমি জন্মভূমি কারবা রাখ ডর!

কবির এই নির্ভীক মিলন-বাণীর অনুরূপ সংগীত মোস্লেম কবি মহম্মদ ইকবালের কণ্ঠেও শুনিতে পাই :

পুরাণপন্থী কোরাণপন্থী
হিন্দে মোদের ঘর
ধরমের বাণী, না শেখায়, জানি
কলহ পরস্পর।
দুষ্মনি মোরা হারাম জেনেছি,
চিনেছি ভ্রাতৃ প্রেম,
হিন্দের মোরা চির-বাসিন্দা
হিন্দু ও মোস্লেম!

ভারতবর্ষের উন্নতির মূলে স্বাধীনতা-লাভের মধ্যে সর্বজাতির মধ্যে ঐক্য ও সঙ্ঘবন্ধ ভাবই হইতেছে প্রধান কথা। রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ধর্মকে টানিয়া আনিলে জাতীয় প্রগতির পক্ষে যে বিঘ্ন, কলহ ও অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা কবি ও সাহিত্য-স্রষ্টা ঋষিরা বুঝিতে পারিয়া মহা ঐক্যের বাণী নিয়ত প্রচার করিয়া আসিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে গাহিয়াছিলেন :

দাঁড়া দেখি তোরা আত্ম পর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলী,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহরে।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশ দিক সুখে হাসিবে!
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন,
আসিবে, সেদিন আসিবে।

ভেদবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ দলাদলি দ্বারা মহাভারতের সৃষ্টি হইতে পারে না। কংগ্রেস সৃষ্টির পূর্বে ভারতীয় মহাজাতি সংগঠনের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সকলের মধ্যে—হিন্দু-মেলা, ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। ঐ সময়ে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলে মিলিতভাবে জাতীয় উন্নতির জন্য উদ্বুদ্ধ হন এবং সভা-সমিতি, পত্রিকা এবং বক্তৃতা ইত্যাদি চলিতে থাকে—ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তার ও স্বদেশপ্রেমের নবপ্রেরণা এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে থাকে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা জাতীয় মহা-সমিতির সৃষ্টির সময় প্রথমত যে আদর্শ ছিল—ক্রমশ তাহার মধ্যে নানা পরিবর্তন আসিল—সে ইতিহাস আলোচনার স্থান এখানে নহে। সম্প্রতি ইংরেজি ও বাঙলা ভাষায় জাতীয় মহাসমিতির কয়েকখানি ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে।

কংগ্রেসের প্রথম অভ্যুদয় ও কার্যাবলী—তৎকালীন বাঙলা দেশের কোন কোন সংবাদ-পত্র বিরুদ্ধ আন্দোলন, উপহাস ও বিদ্রূপ করিতেন। তাঁহারা কংগ্রেসকে গোটা ভারত-বর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতে চাহিতেন না। যেবার স্বর্গত মনোমোহন ঘোষ জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন, সেবার তিনি বলেন : কংগ্রেস চিন্তাশীল ভারতবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপ—

"The National Congress represents the thinking portion of the people of India."

ইহাতে বিদ্রূপকারীরা বলেন : কংগ্রেস কি তবে শিক্ষিত জনগণের—দীন দরিদ্র সর্ব-সাধারণের নহে ? সেকালের সেই বিদ্রূপকারী-দের লক্ষ্য করিয়া কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছিলেন :

কি বল হে ব্যঙ্গভাষী একি কঙ্গরস?
তুমি ত বোঝনা অজ্ঞ,
এ মহা জাতির যজ্ঞ,
ধমনী চুয়ান নাহি চিন সোমরস!
এ যে মহা মাতৃপূজা,
নহে সর্ষে শরগুজা,
নহে রেড়ী নারিকেল তিসি তিল রস!
কাণে তালা, চক্ষে ঠুলি,
একবার দেখ খুলি,
এ নহে সে 'কেঁড় কেঁড়' কঠোর কর্কশ!
*　　*　　*　　*
কি বল হে ব্যঙ্গভাষী একি কঙ্গরস?
জান না জাতির যাগে,
অস্থির সমিধ্ লাগে,
হবির্মেদ, মহাচরু মজ্জার পায়স!
হিমাদ্রি এ মহাযূপ,
আত্মদ্রোহী পশু রূপ,

তোমার মতন লাগে গণ্ডা দুই দশ!

কবি কংগ্রেসের মহৎ উদ্দেশ্য সর্বজাতি সম্মেলনকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাই মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন :

এ যে সঞ্জীবনী সুরা।
আগেয় আনন্দ পুরা
এ যে অমরের সেব্য অমৃত সরস!
এ জ্বলন্ত সুধাপানে,
দৈববল জাগে প্রাণে,
হুঙ্কারে ভুবন ভয়ে কাঁপে চতুর্দশ!

ভগ্ন অস্থি লাগে যোড়া,
ভাল হয় কাণা খোঁড়া,
উল্লাসে নাচিয়া উঠে ধমনী অবশ!
যারা খায় জুতা লাথি,
জাগে সেই মৃত জাতি,
তাদেরি বিজয় কেতু উড়ে দিক্‌দশ!
কি বল হে ব্যঙ্গভাষী একি কংগরস?
কি বল হে ব্যঙ্গভাষী একি কংগরস?
একবার দেখ খুলি,
গো-চর্ম চক্ষের ঠুলি,
দেখ একবার খুলি মূর্খতা মুখস!
সহস্র যুগান্ত ফিরে,
পুণ্য ভাগীরথী তীরে,
দেখ কি অপূর্ব যজ্ঞে মুগ্ধ দিক্‌দশ!
এক প্রাণে সবে মিশি,
হিন্দু মোসলমান ঋষি,
গায় শোন নব ঋক্‌ গায়ত্রী ছন্দস্‌!
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা,
এ মন্ত্রের এ দেবতা,
দেয় তারা সদ্য ফল সুখ মোক্ষ যশ!
বর্ণে বর্ণে অগ্নিজিহ্বা,
জ্বলিয়া উঠিছে কিবা,
দেব দৈত্য নর ত্রাস অভয় সাহস!
বাধা বিঘ্ন যায় দূরে,
কোন্‌ রসাতল পুরে,
নিকটে আসে না ভয়ে পিশাচ রাক্ষস!
এ মহান্‌ প্রজ্ঞা হোমে,
কবোষ্ণ শোণিত শোমে,
সদা প্রীতি প্রজাপতি সহস্র শিরস্‌!
কি বল হে ব্যঙ্গ ভাষী একি কংগরস?

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা হইতে পারে না। সে সময়েও স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই কবিতাটি কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল, ১১ই পৌষ—১৩০৩ সালে। কংগ্রেসে সেই অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও (১) বড়লাট ও ছোট-লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসীর কর্তৃত্ব থাকা চাই; (২) ভারতে যুদ্ধ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই; (৩) ভারতবাসীর ভলাণ্টিয়ার সেনাদলে প্রবেশ করা; (৪) গভর্নমেণ্ট ভারতে গোরা সৈন্য এবং সিপাহী সৈন্য রাখিতে যে টাকা ব্যয় করেন, তাহা হ্রাস করা—অর্থাৎ বেতনভুক সৈন্য-সংখ্যা কমান চাই; (৫) ইংল্যাণ্ডে এবং ভারতে এক সময়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হওয়া চাই। এই সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব তৎকালেও আলোচিত ও পরিগৃহীত হইয়াছিল। তাহার অনেক প্রস্তাবই কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ রাজতন্ত্র মানিয়া নেন নাই? —সেকালের কোন কোন সংবাদপত্র কংগ্রেসের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া এবং ঐ সমুদয় প্রস্তাব লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেনঃ "ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, ইংরেজ! তুমি পালাও, আমরা একবার ভারত শাসন করিব!" 'Quit India'র ভারত-ত্যাগের অঙ্কুর—কি কংগ্রেসের সেই আদি যুগ হইতেই আরম্ভ হয় নাই?

কবি গোবিন্দদাস কংগ্রেসের ছিলেন একজন অনুরক্ত ভক্ত। বিবিধের মাঝে তিনি মহামিলনের আশা করিয়াছিলেন, তাই সেই সুরে সুর মিলাইয়া পৌরুষকণ্ঠে কবি গাহিয়াছেনঃ

পশু পক্ষী তরুলতা,
ভারতের যে আছে যথা,
অণু রেণু কীট পতঙ্গ জঙ্গম স্থাবর,
কামার কুমার জোলা তাঁতি,
হাড়ী মুচি সকল জাতি,
মুনি ঋষি গরীব দুঃখী রাজা রাজেশ্বর।
* * * *
আমরা হরিহর!
একটা পদ্ম-আঁখি দিয়া,
রাম পূজিল লঙ্কা গিয়া,
শঙ্কা কিরে, আম্‌রা ত ভাই তারি বংশধর!
আয়রে আমরা সবাই জুটি,
পূজি মায়ের চরণ দুটি।,
উড়াইয়া ষষ্টি কোটি নেত্র মনোহর।
হৃৎপিণ্ড মুণ্ড হস্ত,
আর যা লাগে সে সমস্ত,
আয়রে সবাই দেইরে মায়ের পদ্ম পায়ের পর
অনেকদিন মা পায়নি পূজা
সাগর পরা শ্যামলভুজা
নলিন চরণ মলিন মায়ের রক্তে রাঙ্গা কর।
আয়রে পূজি মায়ের চরণ মায়ে দিবেন বর!
* * * *
আয়রে আমরা আগাগোড়া,
ভাঙ্গা ভারত লাগি যোড়া,
আয়রে পূজি মায়ের চরণ মায়ে দিবেন বর।

শক্তি যেখানে নাই, স্বাধীনতা সেখানে সম্ভব নয়। প্রেম ও ঐক্যই হইতেছে স্বাধীনতালাভের মূল সাধন মন্ত্র। কবি ঐক্যের সাধন মন্ত্রের পূজারী। সেখানে হিন্দু নাই—মুসলমান নাই, কামার কমার জোলা তাঁতি কিছুই নাই—কোরান, পুরান, জেন্দাবেস্তা সবই একত্তর—আমরা যদি জেগে উঠি.

আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখ ডর। কবি অর্ধশত বৎসর পূর্বেও এ সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিতে হয়, তবে চাই জনগণ মধ্যে স্বজাতি ও স্বদেশপ্রীতির আদর্শকে সংহত করা, এবং সেই সংহতি সম্ভবপর কংগ্রেসের সাহায্যে, নতুবা নয়! এজন্যই যাঁহারা কংগ্রেসকে 'কংগরস' বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন তাঁহা-দিগকে কবি মার্জনা করিতে পারেন নাই। কবির মানসস্বপ্নঃ

"এক প্রাণে সবে মিশি,
হিন্দু মুসলমান ঋষি,
গায় শোন নবঋক্‌ গায়ত্রী ছন্দস্‌!
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা,
এ মন্ত্রের এ দেবতা,
দেয় তারা সদ্য ফল সুখ মোক্ষ যশ!

কংগ্রেসের এই মহামিলনের আদর্শকেই কবি তাঁহার কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন!

১৩৪৭ সালের ২২শে চৈত্র কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধক ২নং বিলের প্রতিবাদকল্পে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ ... হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের ... সম্মিলিত সভায় সৈ... হবিবুর রহমান ... সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং প্রস... বলেনঃ—"আজ বাঙ্গলার দিকে তাকা... গভীর নৈরাশ্য ও বেদনায় মন ভরিয়া ... যে বাঙ্গলা একদিন স্বাদেশিকতার মহা... সমগ্র ভারতে এক অপূর্ব উদ্দীপনার ... করিয়াছিল, আজ সেই বাঙ্গলা কো... কোথায় সেই স্বাধীনতার পূজারি বাঙ... যুবশক্তি? যে বাঙ্গালী একদিন আপন ব... মত্তার জন্য মনে মনে গৌরব বোধ করি... আজ তাহাদের সাম্প্রদায়িক হানাহানি দে... কে তাহাদিগকে বুদ্ধিমান বলিয়া ভ্রম করি... আজ বাঙ্গলার আকাশ ও বাতাস ... দায়িকতার বিষবাষ্পে বিষাক্ত হইয়া উঠি... বিগত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বঙ্গভূমির হিন্দু-মুসলমান সমানভাবে পুষ্ট ... উঠিয়াছে, পাশাপাশি ঘর বাঁধিয়া যে ভূ... হিন্দু-মুসলমান বসবাস করিয়া আসি... আজ সেখানে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অসহ্য তিক্ততা কেন?

"যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা সাম্প্রদ... বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত নহেন, তাঁহারা একটু ভ... দেখিলেই রোগের মূল কারণ বুঝিতে পারিবেন। আজ আর একথা গোপন করিয়া লাভ নাই যে, বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যে অশুভ ক্ষণে ধর্মের জিগীর তুলিয়া, ইসলাম রক্ষার জন্য সংগ্রামের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেইক্ষণ হইতেই সাম্প্রদায়িকতার তিক্ততা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, তাহার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, মন্ত্রিমণ্ডলী আজ নিজ মসনদ রক্ষার জন্য ধর্মের নামে সাধারণ লোককে ধাপ্পা দিয়া চলিয়াছেন। যে বিষবৃক্ষ তাঁহারা রোপণ করিয়া চলিয়াছেন তাহার ফলস্বরূপ আজ অরাজকতা বাঙ্গলার প্রগতিশীল শান্তিপূর্ণ জীবনে উপদ্রবের মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।" [প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৪৮, ১১... পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

কিন্তু এই ভারতবর্ষ—এই বাঙ্গলা ভূমি কাহাদের করতলগত? এ 'স্বদেশ' কাহার? কবি ১৩১৪ সালের 'নব্যভারতে' প্রকাশিত 'স্বদেশ' কবিতায় সে কথার উত্তর দিয়াছেন! বৃথা দম্ভ, বৃথা কলহ ও অশান্তি বিরোধ কাহার জন্য? সে দেশ কাহার?

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়,
এই যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হ'ত যদি
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্মাভরা চুণীমণি
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়!

২

যে ক্ষেত শস্যভ... তোমার ত নয় একটি ছড়া,
মার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয়?
ম পাওনা একাট মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্তগোষ্ঠী
দের কেমন কান্তি পুষ্টি জগৎভরা জয়!
ম কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়!

৩

দেশ স্বদেশ কচ্ছ্ কারে? এদেশ তোমার নয়,
ই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে প্যালেস্
এই যে বাড়ী,
ই যে থানা জেহেলখানা—এই বিচারালয়,
ট ছোটলাট তারাই সবে, জজমাজিষ্টর তারাই হবে,
বুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়
বুরচি, খান্সামা আর মেথর মহাশয়!

৪

দেশ স্বদেশ কচ্ছ্ কারে? এদেশ তোমার নয়,
াইন কানুনের কর্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকলধারা
জার্ভ করা সুখসুবিধা তাদের ভারতময়,
তামার বুকে মেরে ছুরি, ভরচে তাদের তেরজুরি,
াদের চার্চে তাদের নাচে তাদের বলে ব্যয়!
কুশ রকম টেক্স দিবা, ব্যয়ের বেলা তোমরা কিবা
াধার কাছে বাধার বল, বাঘের কবে ভয়?
দেশ স্বদেশ কচ্ছ্ কারে,? এদেশ তোমার নয়!

৫

দেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এদেশ তোমার নয়;
দেশ যাদের অধিকারে, তারাই তাদের
বল্‌তে পারে।
র, মেকুর, ছাগল কবে দেশের মালিক হয়!

* * * *

দশ স্বদেশ করিস্ কারে? এদেশ তোদের নয়,
ার লাঠি তাহার মাটি, চিরদিনের কথা খাঁটি,
' নয় যে চা'র পেয়ালা চুমুক দিলে জয়,
তে যারা কাঁপে ডরে, মরবার আগে আপনি মরে,
ষর বদল ঘুষি করে সেলাম মহাশয়!
দশ স্বদেশ করিস্ কারে? এদেশ তোদের নয়!

দশ স্বদেশ করিস্ তোরা, এদেশ তোদের নয়;
ার বাংলা সোণার ভূমি, হীরার ভারত
বললে তুমি,
ত তোমার আসবে কোলে এই কি মনে-লয়?
ার যাদু মিষ্টিভাষে, ছেলেমেয়ে কোলে আসে,
াজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয়;
...র কথায় তুষ্ট নহে ভবি মহাশয়!

কবি তাঁহার সুদীর্ঘ 'স্বদেশ' কবিতায় ...কৃত 'স্বদেশ' বলিতে আমরা যে 'নিজ বাসভূমে ...রবাসী' তাহাই বলিয়াছেন। দেশের নামেরও ...রিবর্তন হইয়াছে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অধিকার-...লে। যেমন—

...খন বাদ্শা মুসলমান, তখন তাদের "হিন্দুস্থান",
...রেজ 'ইণ্ডিয়া' বলে এখন কেড়ে লয়!
...যোধ্যা কই আউধ এযে, দাক্ষিণাত্য ডেকান সেজে
...লনে গিলেছে লঙ্কা—মুক্তা মণিময়!

তারপব কবি মর্ম্মান্তিক দুঃখে বলিয়াছেনঃ

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এদেশ তোদের নয়,
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্ম বিদ্যালয়?
কোথায় বা সে ব্রহ্মচর্য, অসীম স্থৈর্য অসীম ধৈর্য
কইবা উগ্র সে তপস্যা ইন্দ্রে লাগে ভয়?
কোথায় বা সে শৌর্যে-বীর্যে অসুর পরাজয়?
স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি, চমকে উঠস্ ভেড়াগুলি
উইয়ের ঢিবি দেখে তোদের শিবির বলে ভয়!
প্রতিজনের প্রতিপক্ষে, কোটি কোটি লক্ষে লক্ষে
কই সে তোদের দেশভক্তির দুর্গ সমুদয়?
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্তবিন্দু,
পর্শ থাকুক দর্শনে তার শত্রু কুলক্ষয়!
লোহার চেয়ে মহাশক্ত, ভক্ত বীরের মাংসরক্ত,
তাদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়!
ব্রহ্মাবর্তে প্রথম আসি, তাইত তারা দৈত্যনাশি
পুণ্যভূমি ভারতভূমি—প্রথম করে জয়।
তাদের স্বদেশ ভারত ছিল, তোদের স্বদেশ নয়।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে কবি 'স্বদেশ' কবিতাটি রচনা করেন। তারপর এ ত্রিশ বৎসরে রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে কতই না পরিবর্তন ঘটিয়াছে!,

কবি গোবিন্দচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন ভাওয়াল জয়দেবপুরে ১২৬১ সালে এবং তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ১৩২৫ সনের ১৩ই আশ্বিন। বর্তমান সময় হইতে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে তাঁহার জন্ম হয়, কাজেই সে যুগের কবিদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনও কবির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন নাই। রবীন্দ্রনাথ হইতে তিনি সাত বৎসরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনও কবির ছিলেন না, কাজেই তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া আমরা একজন খাঁটি বাঙ্গালী কবির পরিচয় পাই। পাশ্চাত্য কোন কবির বা কাব্য সাহিত্যের প্রভাব তাঁহার লিখিত কোন কবিতায় নাই। তিনি সেই কৈশোরকাল হইতেই মাতৃভূমিকে উদ্দেশ করিয়া ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে অনেক কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সে সময়েও দেশাত্মবোধ প্রচারে গোবিন্দ-দাস ছিলেন অগ্রণী। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে যে সাহস, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা আবশ্যক, সহজে ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলে না, কবি দেশবাসীকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া বলিতেছেনঃ

নেতাজীর জন্মদিবসে আপনার অবশ্য-পাঠ্য পুস্তক
"THE SUBHASH I KNEW"
By Dilip Kumar Roy

দিলীপকুমার রায় ও সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে বিদ্যালয়ে পড়ার সময় হইতেই বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং অক্সফোর্ডেও তাঁহারা দুইজনে একসঙ্গেই ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন হইলেও চিঠিপত্রের মারফৎ তাঁহারা পরস্পরের হৃদ্যতা বজায় রাখিয়াছিলেন। 'এমঙ্গ দি গ্রেটের' গ্রন্থকারের লেখনী গুণে, এই পুস্তকে সুভাষচন্দ্র জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছেন। ইহাতে সুভাষচন্দ্রের বহু অপ্রকাশিত আলোক-চিত্র ও আন্দামান হইতে গ্রন্থকারের নিকট লিখিত পত্রাবলীও রহিয়াছে। উহাতে একখানি পত্রের চারি পৃষ্ঠাব্যাপী অবিকল প্রতিলিপি এবং কাগজের আবরণীর ভিতর ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার স্বহস্তলিখিত একটি বাণীও আছে। মূল্য—৫৷৹ টাকা

নালন্দা পাব্লিকেশন্স্, ধুন-নুর,
স্যার ফিরোজশা মেটা রোড, বোম্বাই ১।

কেশিকা
ক্যান্থারাইডিন
কেষ্টার অয়েল
আমলা ও
লাইমজুস
ধানিকা কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ
আগরতলা, কলিকাতা, পাটনা.

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত মরণ যদি আসিবে আসুক।
স্থাপ তুমি জয়স্তম্ভ,
কর আত্ম অবলম্ব,
দেও অস্থি মেদমজ্জা লাগে যতটুক,
শত সূর্য করি গড়া,
গড় সে উজ্জ্বল চূড়া
দেবতা দেখুক।
বাধাবিঘ্ন ঠেলি পদে,
সিংহ ফিরে বীর মদে,
আত্মগৃহে সভয়ে শম্ভুক।

ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে হইলে দেশবাসীদের মধ্যে যাহাতে কোনরূপ অনৈক্য বৃদ্ধি না পায় তাহার ব্যবস্থা করা সর্বপ্রধান কর্তব্য। ভারতবর্ষে নানা সম্প্রদায় ও নানা জাতির বাস। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন সাধনের জন্য ভারতের নেতাগণ বহুকাল যাবত চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। ভারতের প্রধান দুইটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মিলন সর্বাগ্রে প্রার্থনীয়। এ সম্বন্ধে গবেষণারও প্রয়োজন ছিল। দেশের জনসাধারণের অর্থাভাব, দারিদ্র্য, কৃষকদের দুরবস্থা, শিক্ষার অভাব, শিক্ষিত যুবকগণের বেকার সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ের মীমাংসায় পৌঁছিতে হইলেই চাই—ভারতের হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধন। তাহা না হইলে Liberty, Independence, Freedom প্রভৃতি যত কথাই ব্যবহার করি না কেন তাহা সার্থক হইতে পারে না। কবি গোবিন্দদাস প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য দ্বারা যে ভারতের বিশেষ বাঙ্গলার কত বড় অনিষ্ট হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া ১৩২০ সালের পৌষ মাসের "নব্যভারতে" 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। সেই দীর্ঘ কবিতাটি হইতে আমি এখানে কয়েকটি কলি উদ্ধৃত করিলাম:

তোমরা মুসলমান—
তোমাদের সব শিরা সেঁচে, হিন্দুর রক্ত ফেল্লে কেচে,
কতটুকু আরব রক্ত রহে বিদ্যমান?
হিন্দুর শত উপনদী তোমাতে না মিশ্‌তে যদি,
'ফেরাত' কবে ফেরত যেত আবার মরুস্থান!
মিলে মিশে হিন্দুর সাথে, ধর্মেকর্মে এক কায়াতে
জরাসন্ধের মত হলে বিপুলে বলবান,
কবর খুজ্‌লে মিল্‌বে নাকো বাবর সাজাহান।
এখন হিন্দু কর্লে ভিন্ন, হারাইবে সকল চিহ্ন

* * * *

কেন আজ্‌কে ভুলে তাই, ঝগড়া বিবাদ কর্ছ ভাই,
ঘাড়ে তোমার চাপ্‌লে কি আজ্‌গবি সয়তান,
ভারতের অদৃষ্ট মন্দ, তাই বুঝনা মূর্খ অন্ধ
আপ্‌না বুকে আপনি আজি হান বজ্রবাণ।

তোমরা মুসলমান—
বটে তোম্‌রা বেজায় যোদ্ধা, বটে তোম্‌রা
বেজায় বোদ্ধা,
পাঁচ যুতিতে নিয়াছিলে সোণার হিন্দুস্থান,
ডবল দামে বেচ্‌লে আজি, খতিয়ে দেখ পুঁজিপাঁজি
সুদ পোষায়ে হল কেমন লাভ কি লোকসান।
হিন্দুর সাথে বিবাদ করা, আপ্‌না মরণ
আপ্‌নি মরা,
হিন্দু তোমার মজ্জা মগজ, হিন্দু তোমার জ্ঞান!

* * *

আপ্‌না বুকে মেরে ছুরি, আর কর'না বাহাদুরী
দোয়া কর্‌বে খোদাতাল্লা খোয়া যাবে না মান!

* * *

কবি শেষাংশে বলিতেছেন, ভারতের এই প্রধান দুই জাতি মিলিত হইয়া অগ্রসর হইলে অসাধ্য সাধিত হইতে পারে। ভারতবর্ষের একত্ব বিধানের মূলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে হইলে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। হিন্দু-মুসলমানকে কবি দৃঢ়কণ্ঠে আহবান করিয়াছিলেন:

হিন্দু মুসলমান!
দুজনাতে হও হে মাল্লা, মাঝি কর খোদাতাল্লা,
ভাসায়ে দিয়ে জীবন-তরী দাঁড়ে মার টান,
হাজার বজ্র হানুক মেঘে, চলুক তুফান ভীষণ বেগে,
আসুক ধেয়ে আকাশ ছেয়ে প্রলয় ডেকে বান!
ভক্তিভাবে কর্ম কর, কিংবা বাঁচি কিংবা মর,
ঘোরতরঙ্গে রণরঙ্গে কবুল কর জান,
বেহেস্তে ফেরেস্তা শুন, ডাকছে সবে পুনঃ পুনঃ
নাদয়র উপর পাল তুলে দেও মায়ের আঁচলখান।

বাঙ্গালী মুসলমান যদি ধ্বংসাত্মক নীতি, পরবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া গ্রহণ না করিতেন, তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নিত্য অশান্তি, নরহত্যা, লুণ্ঠন, নিপীড়ন ও নির্যাতনের শবলুব্ধ কুক্কুর, শৃগাল, শকুন ও গৃধিনীর তাণ্ডবলীলা বাঙ্গলায় ও ভারতে ঘটিত না। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, কলহ ও অনাহূত ও অনাবশ্যক সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং কলিকাতার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হইত না; আকাশ ও বাতাস গলিত শবের দুর্গন্ধে দূষিত হইত না।

কবি গোবিন্দদাস কংগ্রেসের জন্মকাল সেই ১৮৮৫ সাল হইতেই উহার উদারনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। বোম্বাই নগরীতে ইহার প্রথম অধিবেশন হয় এবং বাঙ্গলার গৌরব স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি হন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলিকাতায়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা সভার সভাপতি হন। তিনি তৎকালে তাঁহার ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন:

"It has been the dream of life that the scattered units of my race may someday coalesce and come together; that instead of living merely as individuals we may someday combine as to live as a nation."—

"আমার জীবনের স্বপ্ন ছিল যে, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতের বিভিন্ন জাতি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে না রহিয়া মহামিলন দ্বারা এক মহাজাতিতে পরিণত হয়।" আজ কি তাহা ব্যর্থ হইবে? রবীন্দ্রনাথ ঐ দ্বিতীয় অধিবেশনে গাহিলেন:

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে?
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে?
ইত্যাদি।

সেই উৎসব দিনে কবি হেমচন্দ্র রাখীর রচনা করিয়া গান করেন:

ভারত জননী জাগিল।
পূরব বাঙ্গালী, মগধ বিহার,
দেরাইসমাইল হিমাদ্রির ধার
করাচী, মান্দ্রাজ সহর বোম্বাই
সুরাট, গুজরাটী, মারাঠী, ভাই
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিয়া
প্রেম আলিঙ্গনে করে রাখি কর
খুলে গেছে হৃদি হৃদি পরস্পর
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
সুখে জয়ধ্বনি করিল।

এই একই সুরে সুর মিলাইয়া গোবিন্দদাস অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে গাহিয়াছিলেন:

আমরা বঙ্গ আমরা আসাম,
হোক্ না মোদের সহস্র নাম,
আম্‌রা সদিয়া সিন্ধু সেতু রামেশ্বর,
আম্‌রা নাগা, আম্‌রা গারো,
কেহই ত পর নহি কারো,
খজী বর্গী গুর্খা জাঠ আর পার্শী সওদাগর।

জাতীয় জীবন যজ্ঞে গোবিন্দদাসের দেশাত্মবোধের বহু কবিতার মধ্য হইতে আমরা এখানে সামান্য দু-একটি কবিতার কয়েকটি কলি মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। তরুণ বয়সে মাত্র ২২ বৎসরের যুবক গোবিন্দদাস লিখিয়াছিলেন:

আমরাই হব সচীব-প্রধান
আমরাই হ'ব দ্বারে দ্বারবান,
আমরাই হ'ব বণিক কৃষাণ,
তাঁতি, কর্মকার, আমরা সেহ।
আমরা মারিব সাহিব ভাইরে,
এতে অপমান কিছুই নাইরে,
আমরা বেচিব, আমরা কিনিব,
আমাদের টাকা আমরাই পাব
লইতে নারিবে কড়াটি কেহ।

আসুন আমরা কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আজ চল্লিশ কোটি ভারতবাসী জন্মভূমি ভারত জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলি:

যে জাতীয় উদ্দীপনা জাতীয় সম্মান,
মহান জাতীয় স্বত্ব শিক্ষা দিছ তুমি,
ভুলিব না সেই আত্ম অধিকার জ্ঞান,
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' প্রিয় জন্মভূমি।'



জয়াগ গ্রামে আশ্রয়প্রার্থী বালকবালিকা দের জন্য বিদ্যালয় উদ্বোধনকালে গান্ধীজী একটি বালককে পুস্তক ও শ্লেট উপহার দিতেছেন



সাধুরখিল হইতে সাতঘরিয়া যাইবার পথে জনৈক মুসলমান পল্লীবাসীর গৃহে মহাত্মা গান্ধীর সম্বর্ধনা

আই, এন, দাস

(আর্টিষ্ট)

ফটো এন্‌লার্জমেণ্ট, ওয়াটার কলার ও অয়েল পেণ্টিং কার্য্যে সুদক্ষ, চার্জ সুলভ, অদ্যই সাক্ষাৎ করুন বা পত্র লিখুন। ৩৫নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এম্‌ব্রয়ডারী মেশিন

নূতন আবিষ্কৃত। কাপড়ের উপর সূতা দিয়া অতি সহজেই নানা প্রকার মনোরম ডিজাইনের ফুল ও দৃশ্যাদি তোলা যায়। মহিলা ও বালিকাদের খুব উপযোগী। চারটি সূচ সহ পূর্ণাঙ্গ মেশিন—মূল্য ৩৲ ডাক খরচা ৷৷৵০। ডীন ব্রাদার্স, আলীগড়, নং ২২।



শ্রীযুত মহাদেব দেশাই বলেন ঃ—

আমি ও আচার্য্য কৃপালনী অদ্য শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা পরিদর্শন করিয়া দেখিলাম যে ইহা একটি বৃহৎ আয়ুর্বেদীয় কারখানা। এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সুপরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় বাস্তবিকই প্রশংসার পাত্র। এখানকার সুবিশুদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীতে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি।

স্বাঃ মহাদেব দেশাই।

তাং ১৯।৫।২৮



অধ্যক্ষ মথুর বাবুর
শক্তি ঔষধালয়-ঢাকা

নির্ভীক জাতীয় সাপ্তাহিক

"দেশ"

প্রতি সংখ্যা চার আনা

বার্ষিক মূল্য—১৩ ষাণ্মাসিক—৬৷৷০

"দেশ" পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপ ঃ—

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চ প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

ঠিকানা ঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা
১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাইকা

খোস, একজিমা, হাজা, কাটা, ঘা, পোড়া ঘা নালী ঘা, ফুস্কুড়ি চুলকানি, ও চুলকানিযুক্ত সর্ব্ব প্রকার চর্ম্মরোগে অব্যর্থ

এরিয়ান রিসার্চ ওয়ার্কস
পি১৩ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ (নর্থ)
কলিকাতা ফোন-[illegible]

রেজিষ্টার্ড

অনসূইয়া পার্ব্বত্য বনৌষধি

হাঁপানির অমিত শক্তিশালী সুপ্রসিদ্ধ অনন্যসাধারণ মহৌষধ। ১৫০ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ জনৈক সিদ্ধ মহাত্মা কর্তৃক প্রচারিত। মাসে একবার পূর্ণিমা তিথিতে (৭-৩-৪৭) সেবনীয়।

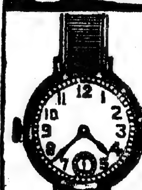
ইংরাজীতে চিঠিপত্র লিখুনঃ

Mahatma, S. K. Dass

SRI SANT SEWA ASHRAM

P. O. Chitrakot (Banda)

পুরস্কার



উচ্চ শ্রেণীর হাত ঘড়ী চামড়ার সুটকেস্ প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হইবে। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন

এন.পি. হাউস
পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৮
কলিকাতা

কাহিনী নয় ★ ★ খবর

ভবঘুরে

কুর্তা-পরা কুত্তা

অনেক দেশের অধিকাংশ মানুষ বস্ত্রাভাবে অর্ধনগ্ন ও নগ্ন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে—এমন কি ইংল্যান্ডেও বস্ত্রের অভাব ঘটেছে, সাহেব-মেমদের প্যান্ট কোট ও গাউনের রীতিমত টানাটানি পড়েছে। কিন্তু তা হলে কি হয়—সম্প্রতি সেখানে এক কুকুর প্রদর্শনীতে এক কুত্তাকে চার-পা-ওলা ট্রাউজার ও কোট পরিয়ে আনা হয়েছিল ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে। কুকুরটির নাম 'মার্কো'—'মার্কো'র পোষাকের বহর দেখে অনেক হতভাগ্য দর্শককেই এই মন্তব্য করতে শোনা গেছলো,—"আহা যদি হতেম কুত্তা—মিলতো তবে নয়া কুর্তা।"



'মার্কো' আর তার মালিকা

বাসেই বাসর ব্যবস্থা!

বিদেশে প্রায় রকমারী রোমাঞ্চকর বিবাহ ইত্যাদি ঘটে থাকে বলে আপনারা জানেন, কিন্তু সম্প্রতি ক্যান্সাসের গার্ডেন সিটি থেকে যে বিবাহের খবরটি পাওয়া গেছে— সেটি বড়ই তাজ্জব! ব্যাপারটা হচ্ছে কয়েকদিন আগে ঐ সহর থেকে জন ল্যাভোর বলে এক ভদ্রলোক দূরগামী এক বাসের আরোহী হন এবং ঘটনাক্রমে কথায় কথায় তাঁর পাশের আরোহী শ্রীমতী থেল্‌মা ম্যাকলীনের সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ সুরু হয়। গন্তব্যস্থলে পোঁছোনোর জন্য বাসটিতেই তাঁদের দু'জনকে ঐভাবে পাশাপাশি দু'টি রাত কাটাতে হয় এবং তাঁরা দু'জনে এই দু'টি রাত অনর্গল প্রেমালাপ করেন এবং পরের দিনই পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এদেশের বাসে চাপলে তখনই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হয়ে যাবার জোগাড়— আর ওদেশের বাসে বাসর-ব্যবস্থা!

গাড়ী থামাতে—সব থামলো!

কয়েকদিন শিকাগো সহরের ফুটপাথে পথ চলতে চলতে হঠাৎ প্যাট্রিক রজারস্ দেখলেন যে, তাঁর পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ সোঁ করে তিন তিনটে মটর গাড়ি পেরিয়ে গেল। হঠাৎ তার কি খেয়াল হোল—বলে উঠলেন 'পরের গাড়ীটা আমি থামাবোই।' এই বলে ফুটপাথ থেকে রাস্তার ঠিক মাঝখানে নেমে পড়লেন—সামনেই যে গাড়ীখানা ছুটে আসছিল, তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে গাড়ীটিকে থামাবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হায়, গাড়ী আর থামলো না—গাড়ী তাকে চাপা দিলে এমনভাবে, সঙ্গে সঙ্গেই ঘটলো জীবনান্ত। গাড়ী থামাবার জিদ বজায় রাখতে গিয়ে বেচারা রজারসের সবই থেমে গেল!

চলমান হ্যাণ্ড ব্যাগ!

আটলাণ্টা সহরের এক রেস্তোরায় খেতে গিয়ে, রুথ ব্রাউন বলে একটি মহিলা তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগটি হারিয়ে ফেললেন। কোথাও খুঁজে পেলেন না। শেষে হতাশ হয়ে রেস্তোরা থেকে বেরিয়ে পড়ে নতুন একটি ব্যাগ কেনার মতলবে ঢুকলেন গিয়ে কাছাকাছি একটি বড় দোকানে। দোকানে গিয়ে দেখেন, কাউণ্টারের ওপরে তাঁরই ব্যাগটি রয়েছে—লেখা রয়েছে, 'বিক্রয়ের জন্য।'



প্রস্ফুটিত কান্তি

প্রভাতী আলো গোলাপের গালে যে সুষমা নিয়ে ঝরে পড়ে তারই একটু ছোঁয়া এসে লাগে যৌবনদীপ্ত আননে। কিন্তু তার সমস্ত মহিমা ফুটিয়ে তুলতে চাই বিশুদ্ধ প্রসাধনের প্রলেপ। লাবণ্যবৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে "স্নোফায়ার" বিলেতে যে প্রশংসা পেয়েছে তার পরিচয় আপনিও পাবেন একবার ব্যবহার করে দেখলে। প্রস্ফুটিত কান্তির আয়ু বাড়াতে এর জুড়ি নেই। স্নোফায়ার কোল্ড ক্রীম ব্যবহারে মুখমণ্ডল পরিষ্কার এবং স্নিগ্ধ থাকে। পাউডার দেবার আগে স্নোফায়ার ভ্যানিসিং ক্রীম ব্যবহার করলে মুখশ্রী বৃদ্ধি পায়। একটু আর্দ্র ভাব থাকলে, স্নোফায়ার পাউডার ক্রীম লাগিয়ে তারপর পাতলা করে স্নোফায়ার ফেস্ পাউডার মাখতে হয়।

Snowfire



স্নোফায়ারের আর সব সামগ্রীর মধ্যে লিপ-ষ্টিক, রুজ, ওয়েভ সেটিং লোশান এবং হাণ্ড জেলিরও বিশিষ্ট স্থান আছে।

ডি ষ্ট্রি বি উ ট র্স কামা নর্টন এণ্ড কোং, ২৩, মেডোস্ ষ্ট্রীট, বম্বে। শিমওয়েল এণ্ড ব্রাদার্স (ক্যালকাটা) লিঃ, ১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। নসেরওয়ানজী এণ্ড কোং, মাচি মিয়ানি রোড, করাচী।

S.1

রঙ্গজগৎ

আমাদের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা সাংঘাতিক একটা আত্মঘাতী পথ ধ'রে চলে যার জন্যে ভারতীয় চিত্রশিল্প যেমন প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হ'চ্ছে তেমনি অপরদিকে সেই সুযোগে বিদেশী ব্যবসায়ীরা বিনা চেষ্টায় পয়সা ক'রে নিচ্ছে। এটা হ'লো ছবি দেখানো ব্যাপার নিয়ে। অসংখ্য দিশী ছবি থাকা সত্ত্বেও বহু চিত্রগৃহ কেন বিদেশী ছবি দেখাচ্ছে তাই নিয়ে অনুসন্ধান ক'রতে গিয়েই কতকগুলো ভাববার মত তত্ত্ব আমরা পেয়েছি। কেন বিদেশী ছবি দেখানো হ'চ্ছে—সরাসরিভাবে এ প্রশ্নের সোজা জবাব এলো—দিশী ছবি পাওয়া যায় না। সাধারণের কাছে কথাটা অতিমাত্রায় মিথ্যে ব'লে মনে হবে হয়তো, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই তাই। কারণ আপনি কোন পরিবেশকের কাছে একখানা ছবি চাইতে গেলে তার লেজুড় হিসেবে তাদের পছন্দ মত আরও খানকয়েক ছবি আপনাকে নিতেই হবে এবং প্রত্যেক ছবির ক্ষেত্রেই আপনাকে একটি ন্যূনতম আয়ের গ্যারাণ্টী তাদের দিতেই হবে, সে টাকাটা ছবি দেখিয়ে আপনি তুলতে পারুন আর নাই পারুন। আপনার হাতে বছরে পাচ্ছেন মোট ৫২টি সপ্তাহ অথচ হিন্দী বাঙলা মিলিয়ে দিশী ছবি মুক্তিলাভ করে তার অনেকগুণ বেশী; সেক্ষেত্রে ছবি আপনাকে বাছাবাছি ক'রতেই হয় এবং আপনার দৃষ্টি স্বাভাবিক নিয়মে ভাল ছবিগুলোর দিকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হবে। কিন্তু বাছাবাছা সেরা ছবি পাবার উপায় নেই তার কারণ, ভাল ছবি কোন একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের একচেটে না হওয়ায় আপনাকে যেতে হয় বহু পরিবেশকের কাছেই, অর্থাৎ এক একখানা ভাল ছবির লেজুড় হিসেবে বাজে ছবি কিছু নিতে আপনি বাধ্য হন। ফলে, সারা বছর যদি দিশী ছবি দেখানোই পণ ক'রে বসেন তাহ'লে ৫২ সপ্তাহের মধ্যে জনগণকে খুসী করার মত ১০।১২ খানির বেশী ভাল ছবি দেখাবার উপায় আপনার থাকেই না, বাকি সবই হবে ঐ ১০।১২ খানা ভালর লেজুড় অতি বাজে ছবি—তাতে পৃষ্ঠপোষকদের সামলানো আপনার পক্ষে দায় হ'য়ে ওঠে বৈকি! আবার ছবিয়ালাদের কি অসার যুক্তি দেখুন—একই প্রতিষ্ঠানের দু'খানা ভিন্ন ভিন্ন ছবির একখানা ধরুন গঙ্গাপার চেতলায় আর অপরখানা বালিগঞ্জে চলতে পারবে না, কারণ, ছবিয়ালাদের বিশ্বাস তাতে দর্শক ভাগাভাগি হ'য়ে যায়! দুজায়গায় একই ছবি হ'লে, তর্কের খাতিরে, তা মেনে নেওয়া যেতো, কিন্তু স্বতন্ত্র ছবি হওয়া সত্ত্বেও তাই হবে এ ধারণা পোষণ করা চিত্রব্যবসায়ীদের পক্ষেই সম্ভব। এছাড়া আরও অনেক দিক আছে। কোন চিত্রগৃহে প্রথম মুক্তিলাভ করা ছবি কোন সময়ে জনাকর্ষণে অক্ষম হ'য়ে পড়লেই সপ্তাহের সংখ্যা বাড়িয়ে নেবার জন্যে নানারকমের চাপ দেওয়া হয়, তাতে সুবিধে না হ'লে শেষ পর্যন্ত ঘুষের ব্যবস্থা তো থাকেই। ঐভাবে অস্বাভাবিক উপায়ে ছবির সপ্তাহ সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে সেই নজীরে মফঃস্বলের প্রদর্শকদের কাছে দাম বাড়িয়ে তাদের ঘায়েল করাটা অধিকাংশ পরিবেশকই একটা মস্ত বাহাদুরী মনে করে। বড় বড় সব তারকা এবং অন্যান্য বিভাগে নামকরা লোককে যুক্ত ক'রে ছবি তোলার দিকে যারা বেশী ঝোঁক দেয়, মনে ক'রবেন না ছবিকে একটি অসাধারণ অবদান ক'রে তোলার প্রচেষ্টাতেই তারা এইরকম ব্যবস্থা ক'রেছে, আসলে ঐরকম আকর্ষণ দেখিয়ে প্রদর্শকদের ঘায়েল করা হ'চ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তৈরী আরম্ভ হবার আগেই ঐ ধরণের অতি আকর্ষণযুক্ত ছবিগুলি দেখানো বিষয়ে বিভিন্ন স্থানের প্রদর্শকদের সঙ্গে চুক্তি সম্পূর্ণ হয়ে যায়।



গোহাটীর ইস্টার্ন মুভিজের অসমীয়া চিত্র "বদন বরফুকনের" রাজমাতার ভূমিকায় সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মিসেস্ দেববালা চালিহা

মুক্তির আর বিলম্ব নাই!

মহামন্বন্তরের মর্মবেদনায় অনুরণিত

মন্দির

রচনা : প্রণব রায়

পরিচালনা : ফণী বর্মা, সঙ্গীত : সুবল দাশগুপ্ত

প্রধান ভূমিকায় : চন্দ্রাবতী, ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র, জহর, অমর মল্লিক, রবি রায়, কানু, বেচু, মায়া, বুদ্ধদেব প্রভৃতি

মন্দির

দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় আঁকা মানব জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী!

মন্দির

— একযোগে —

মিনার * বিজলী * ছবি ঘর

○ এ, ডি, রিলিজ ○

শুধু তাই নয়, ঐ অদেখা ছবির লেজুড় হিসেবে বাধ্যতামূলক প্রদর্শন চুক্তিতে বাজে ছবিও জুড়ে দেওয়া হয় খানকয়েক ক'রে। প্রদর্শকদের কিভাবে প্রলুব্ধ করা যায়, কিভাবে ভাঁওতা দেওয়া যায় ঝানু চিত্রনির্মাতা ও পরিবেশকদের লক্ষ্য থাকে সেই দিকেই; জনসাধারণ অর্থাৎ ছবির যারা আসল পৃষ্ঠপোষক তারা কি বল'লে না বললে তা ওরা থোড়াই কেয়ার করে। প্রদর্শক পড়ে মুস্কিলে—একদিকে, জনসাধারণের রুচি ও রোষের তুষ্টি তাকেই ক'রতে হয়, অপর দিকে ছবিয়ালাদের মর্জি ও ফাঁদের শিকারও আবার হ'তে হয় তাকেই। সুতরাং এ ঝামেলাকে কাটাবার জন্যেই তারা বিদেশী ছবিয়ালাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, বলাবাহুল্য, বিদেশীরাও এই তালে নিজেদের কারবার বাড়াতে প্রদর্শকদের সুবিধাজনক হারে ছবি দিতে কুণ্ঠিতও হয় না। নয়তো সোজাভাবে যদি দিশী ছবির ব্যবসা চলতো তাহ'লে এদেশে অতো বিদেশী প্রতিষ্ঠানের একটিও কি আজো টি'কে থাকতে পারতো?

বিবিধ

করাচীতে ছবির প্রতি প্রদর্শন পিছু পনেরো টাকা বিশেষ কর ধার্য করার কথা সরকার পক্ষ থেকে বিবেচনা করা হ'চ্ছে। ঘাটতি বাজেট পূরণ ক'রতে বাঙলা সরকারও এ পথ অনুসরণ না ক'রবেই বা কেন!

* * *

এ সপ্তাহে মহরৎ সম্পাদিত হ'য়েছে—ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওতে ৯ই তারিখে ড্রিমল্যাণ্ড পিকচার্সের 'মানুষ ভগবান', পরিচালক ও রচয়িতা উদয়ন, সুরযোজনা আহাদ, প্রধান ভূমিকায় বিপিন মুখার্জী; ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ৯ই তারিখে রঙ্গশ্রী কথাচিত্রের 'সাহারা', পরিচালনায় সুনীল মজুমদার; এবং ১০ই তারিখ রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে শ্রীগোপাল পিকচার্সের 'উনিশ বিশ', পরিচালনায় ফণী রায়, হ্যাঁ ঐ ফণী রায়ই!

* * *

প্রতি সপ্তাহে সমগ্র পৃথিবীতে সাড়ে তেইশ কোটি লোক সিনেমায় যায় ছবি দেখতে।

* * *

মাদ্রাজের জেমিনী স্টুডিওতে তামিল ছবি 'চন্দ্রলেখা' তুলতে খরচ হয়েছে সতেরো লক্ষ টাকা। এতে একটিমাত্র নৃত্যদৃশ্য তুলতেই খরচ হ'য়েচে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা।

* * *

কলকাতায় বর্তমানে যতগুলি বাঙলা ছবি তৈরী হ'চ্ছে, গত বছরের হিসেবে সেই সব ছবিগুলির মুক্তিলাভ সম্পূর্ণ হ'তে পাঁচ বছর সময় লাগবে।

অসমীয়া চিত্র 'বদন বরফুকন'

গৌহাটীর ইস্টার্ন মুভিজের নির্মীয়মান অসমীয়া ঐতিহাসিক চিত্র 'বদন বরফুকনে'র কার্য কালী ফিল্মস স্টুডিওতে প্রায় সমাপ্তির পথে। চিত্রখানিকে যথাসম্ভব সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বহু পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইতেছে। আসামের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এই চিত্রের বহির্দৃশ্যে দেখা যাইবে এবং জাঁকজমকপূর্ণ সুরুচিসম্পন্ন অন্তঃদৃশ্যে আসামের প্রাচীন ঐতিহ্যের নিখুঁত পরিচয় দিবে। বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মিত একটি ব্রহ্মদেশের নৃত্যের দৃশ্য এই ছবিখানিকে বিশেষভাবে সুন্দর করিয়া তুলিবে।

আসামের সম্ভ্রান্ত বংশীয় শিল্পী কাম ঠাকুর, মিসেস দেববালা চলিহা, দ্বিজেন চৌধুরী, চারু বরদলৈ, সর্বেশ্বর চক্রব রমেশ চৌধুরী, মিস বিমলা সৈকিয়া প্র ছবিতে অভিনয় করিতেছেন। মো বাগানের অধিনায়ক শরৎ দাস একটি বি চরিত্রে রূপদান করিয়াছেন।

আসামের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী ভূ হাজরিকা, যোগেশ ভড়ালী, গিরিশ বায়ন, প্রেম সৈকিয়া প্রভৃতি চিত্রের সংগীতাংশে র দান করিতেছেন।

চিত্র ও শব্দ গ্রহণ করিতেছেন যথা সুশান্ত মৈত্র এবং গোবিন্দ মল্লিক। সংগ পরিচালনা করিতেছেন গৌর গোস্বামী।



কৃষ্ণনগরের জাগরণী ক্লাবের সরস্বতী পূজা প্রতিমা নির্মাতা—শ্রীবিরূপাক্ষ পা

খেলাধূলা

ক্রিকেট

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ ক্রিকেট টেস্ট চ অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া ন প্রথম দুইটি খেলায় বিজয়ী হইয়া পরবর্তী ইটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিতে বাধ্য হল। ইহা দ্বারা ইংলণ্ড দলের খেলার মোন্নতির পরিচয় পাওয়া গেল সন্দেহ নাই তবে স্ট্রেলিয়া দল এইবারের টেস্ট খেলার বিজয়ীর ম্মান লাভ করিল। "রবার" অস্ট্রেলিয়া পাইল এবং "এসেজও" অস্ট্রেলিয়াতেই রহিয়া গেল। পঞ্চম টেস্ট ম্যাচের ফলাফলের কোনই গুরুত্ব রহিল না।

নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এই চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ খেলায় এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিল। এই খেলায় ব্যাটিংয়ের এক নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার মোরিস ও ইংলণ্ডের কম্পটন, একই খেলায় পর পর দুই ইনিংসে শতাধিক রান সংগ্রহ করিয়া এই রেকর্ড করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কোন টেস্ট খেলায় উভয় দলের দুইজন খেলোয়াড়কে পর পর দুই ইনিংসে এইরূপভাবে শতাধিক রান করিতে দেখা যায় না। ইহাদের এই কৃতিত্ব সত্যই প্রশংসনীয়। এই প্রসঙ্গে আরও লেখ করা প্রয়োজন যে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় সাবে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে কোন খেলোয়াড় ইতি-র্বে টেস্ট খেলায় এইভাবে পর পর দুই ইনিংসে তাধিক রান করিতে পারেন নাই। সুতরাং মোরিসের তিত্ব অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় এক নূতন কর্ড করিল। কম্পটনের কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য। রণ তিনি ইংলণ্ডের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসাবে স্ট খেলায় পর পর দুই ইনিংসে শতাধিক ন করিলেন। ইতিপূর্বে ১৯২৪-২৫ সালে র্বাট সাটক্লিফ মেলবোর্ণ মাঠে প্রথম ইনিংসে ৭৬ রান ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৭ রান রিয়াছিলেন। এমন কি ১৯২৮-২৯ সালে য়ালটার হ্যামণ্ড এডিলেড মাঠে প্রথম ইনিংসে ১৯ রান নট-আউট ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৭ ন করেন। অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় হিসাবে ওয়ারেন ব্রাডসলী ১৯০৯ সালে ইংলণ্ডের ওভাল ঠে প্রথম ইনিংসে ১৩৬ রান ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০ রান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

খেলার বিবরণ

ইংলণ্ড দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং হণ করে। দিনের শেষে ৪ উইকেটে ২৩৯ ন করিতে সমর্থ হয়। হাটন ও ওয়াসব্রুক থম খেলোয়াড় হিসাবে প্রথম উইকেটে ১৩৭ রান রেন। দ্বিতীয় দিনের প্রায় সমস্ত দিন খেলিয়া লণ্ড দল প্রথম ইনিংস ৪৬০ রানে শেষ করে। পটন ১৪৭ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন রেন। ইংলণ্ড দলও এই ইনিংসে এইবারের ট খেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক রান সংগ্রহ করে। অস্ট্রেলিয়া দল খেলিয়া দিনের শেষে উইকেটে ২৪ রান করে। দলের অধিনায়ক ও ঠ খেলোয়াড় ডন ব্রাডম্যান কোন রান না করিয়া উট হন। ইহাতে সকলেই মনে করে স্ট্রেলিয়া অধিক রান সংগ্রহ করিতে পারিবে না। ন্তু তৃতীয় দিনের খেলায় দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ান লোয়াড়গণ অধিক রান তুলিতে দৃঢ় সংকল্প। তীয় দিনের শেষে ৪ উইকেটে ২৯৩ রান করে। রিস ১২২ রান করিয়া আউট হন। চতুর্থ নের চা-পান পর্যন্ত খেলিয়া অস্ট্রেলিয়া দল ৭ রানে ইনিংস শেষ করে। কিথ মিলারও ৪১ রান করেন। ইংলণ্ড দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ও দিনের শেষে ৯৬ রান করে। পঞ্চম দিনের শেষে ৮ উইকেটে ২৭৪ রান করে। কম্পটন ৫২ রান করিয়া নট আউট থাকেন। ষষ্ঠ দিনের মধ্যাহ্ন-ভোজ পর্যন্ত খেলিয়া ইংলণ্ড দল ৮ উইকেটে ৩৪০ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। কম্পটন ১০৩ রান করিয়া নট আউট থাকেন। অস্ট্রেলিয়া দল খেলায় জয়লাভের জন্য চেষ্টা করে কিন্তু সময়াভাবে করিতে পারে না। ষষ্ঠ দিনের শেষে ১ উইকেটে ২১৫ রান করে। মোরিস ১২৪ রান ও ব্রাডম্যান ৫৬ রান করিয়া নট আউট থাকেন। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। খেলার ফলাফল:—

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস:—৪৬০ রান (হাটন ৯৪, ওয়াসব্রুক ৬৫, কম্পটন ১৪৭, হার্ডস্টাফ ৬৭, লিণ্ডওয়াল ৫২ রানে ৪টি, ডুল্যাণ্ড ১৩৩ রানে ৩টি উইকেট পান।)

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস:—৪৮৭ রান (মরিস ১২২, মিলার নট আউট ১৪১, জনসন ৫২, বেডসার ৯৭ রানে ৩টি, ইয়ার্ডলী ১০১ রানে ৩টি, রাইট ১৫২ রানে ৩টি উইকেট পান।)

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস:—৮ উইঃ ৩৪০ রান ডিক্লেয়ার্ড (হাটন ৭৬, ওয়াসব্রুক ৩৯, এডরিচ ৪৬, কম্পটন ১০৩ রান নট আউট, টোসাক ৭৬ রানে ৪টি, লিণ্ডওয়াল ৬০ রানে ২টি উইকেট পান।)

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস:—১ উইঃ ২১৫ রান (হার্ভে ৩১, মোরিস ১২৪ রান নট আউট, ব্রাডম্যান ৫৬ রান নট আউট, ইয়ার্ডলী ৬৯ রানে ১টি উইকেট পান।)

আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড গত বৎসর প্রথম আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করেন। অনিবার্য কারণে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া শেষ হয় নাই। এই বৎসর পুনরায় এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক অঞ্চলের দলও মনোনীত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ অঞ্চলের অধিনায়ক হইয়াছেন বর্তমান ভারতের খ্যাতনামা উদীয়মান খেলোয়াড়। একমাত্র দক্ষিণাঞ্চলের অধিনায়ক হইয়াছেন প্রবীণ খেলোয়াড় পি ই পালিয়া। কণ্ট্রোল বোর্ড একটু চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই এক-জন উদীয়মান খেলোয়াড়কে অধিনায়কের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিতেন। পূর্বাঞ্চলের দলে বাঙলার কয়েকজন খেলোয়াড় স্থান পাইয়াছেন ইহা খুবই সুখের বিষয়। আমরা আশা করি বাঙলার খেলোয়াড়গণ দেশের সুনাম বৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়া খেলায় দৃঢ়তা ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য চেষ্টা করিবেন। নিম্নে বিভিন্ন অঞ্চলের দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল:—

পশ্চিমাঞ্চল দল:—বিজয় মার্চেণ্ট (অধি-নায়ক), ই এস মাকা, বিজয় হাজারী, ডি খাদকার; বিনু মানকড়, আমীর ইলাহি, কে সি ইব্রাহিম, এইচ অধিকারী, কে রঙ্গনেকার, আর এস মোদী ও গুলমহম্মদ। অতিরিক্ত—কে মন্ত্রী, কে কে তারাপোর ও রণবীর সিংহজী।

উত্তরাঞ্চল দল:—অমরনাথ (অধিনায়ক), মহম্মদ সৈয়দ, জে কে ইরাণী, ইমতিয়াজ আমেদ, খান মহম্মদ, রাজর মহম্মদ, মকসুদ আমেদ, কিষেণচাঁদ; ফজল মহম্মদ, জুলফিকার আমেদ, ফজল লাকদা ও বলবীরচাঁদ।

পূর্বাঞ্চল দল:—মুস্তাক আলী (অধিনায়ক), কার্তিক বসু, সি এস নাইডু, সি টি সারভাতে, বি বি নিম্বলকার, মহারাজকুমার বলেন্দু শা, এন চৌধুরী, এন চ্যাটার্জি, গাইকোয়াড়, এস ব্যানার্জি (বিহার), পি চ্যাটার্জি, পি সেন ও ফানসালকার (যুক্তপ্রদেশ)।

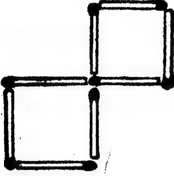
দক্ষিণাঞ্চল দল:—পি ই পালিয়া (অধিনায়ক), বি ফ্রাঙ্ক, গোলাম আমেদ, আসঘর আলী; এস ডবলিউ সোহনী, এম আর রেগে, ডক্টর এস গজালি ও সি রঙ্গচারী। অতিরিক্ত—বি আলভা (মাদ্রাজ), শ্যামসুন্দর (মহীশূর) ও ডবলিউ সানে (মধ্যপ্রদেশ)।

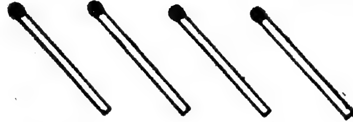


ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে ব্রাডম্যানের কোন রান না করিয়া আউট হইবার দৃশ্য

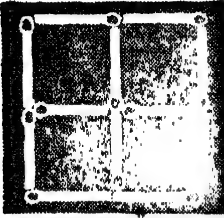
বিনা অসুবিধায় কি ভাবে বেশী টাকা জমানো যায়

AC 92.





সমস্যা: চারটি দেশলাই কাঠির সাহায্যে প্রস্তুত দুইটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রকে চারটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে পরিবর্তিত করুন।



সমাধান: ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভাবে অতিরিক্ত চারটি কাঠিকে সাজাতে হবে।

বুদ্ধি খাটালে চারটি কাঠি দিয়ে আটটি কাঠির কাজ বেশ করে নেওয়া যায়। ঠিক তেমনি সাংসারিক ব্যাপারে জমানো টাকা সুবিধে মতো খাটাতে জানলে সবচেয়ে বেশি লাভ পাওয়া যায়। ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন—অল্প আয়ের লোকের পক্ষে টাকা জমানোর এমন সুবিধে আর নেই।

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটস

আসল কথা জেনে রাখুন—

১। ৫৲, ১০৲, ৫০৲, ১০০৲, ৫০০৲, ১০০০৲ কিংবা ৫,০০০৲ টাকা দামের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনতে পারেন।

২। পরিবারের ছোট বড়ো প্রত্যেকেই ৫,০০০৲ টাকা মূল্য পর্যন্ত সার্টিফিকেট কিনতে পারেন। দু'জনে একত্র ১০,০০০৲ টাকা কেনা চলে।

৩। বারো বছরে সার্টিফিকেটের মূল্য শতকরা ৫০৲ টাকা বেড়ে যায়। ১৲ টাকায় ১।০ টাকা পাওয়া যায়। সরকারী সিকিউরিটী থেকে এর চেয়ে আর বেশী সুদ পাওয়া যায় না।

৪। সুদের উপর ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না।

৫। দু'বছর পরে সার্টিফিকেট ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা নিতে পারেন। ৫৲ টাকা দামের সার্টিফিকেট আঠারো মাস পরেই ভাঙ্গানো যায়।

৬। যাদের আয় কম তারা চার আনা, আট আনা কিংবা ১৲ টাকা দামের সেভিংস ষ্টাম্পও কিনতে পারেন। এভাবে ৫৲ টাকার ষ্টাম্প জমলেই তার বদলে একখানা সার্টিফিকেট নিয়ে নিতে পারেন।

৭। এই সার্টিফিকেট ও ষ্টাম্প কিনতে পারেন পোষ্ট আফিসে, গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত এজেন্টদের কাছে অথবা সেভিংস বুরোতে।

আপনার এলাকার সঞ্চয়-সঙ্ঘে যোগ দিন!

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৩রা ফেব্রুয়ারী—ময়মনসিংহ শহর হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরবর্তী সুসঙ্গের নিকট হাজং ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে এক সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উহার ফলে পুলিশের গুলীতে তিনজন হাজং এবং হাজংদের বল্লমের আঘাতে দুইজন পুলিশ নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ অঞ্চলের আদিবাসী হাজংগণ ফসলের পরিবর্তে নগদ টাকায় জমির খাজনা দেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে যে 'প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ' আরম্ভ করে, তাহার ফলেই এই হাঙ্গামা হয়।

নয়াদিল্লীতে শ্রীযুত জি ভি মবলংকরের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়। হাজারা জেলায় হাঙ্গামা, পাঞ্জাবের ঘটনাবলী, কম্যুনিস্ট পার্টির অফিস-সমূহে খানাতল্লাসী, কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট শাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারী ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়—প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী বিবৃতি প্রদান করেন। দুর্নীতি ও উৎকোচ নিয়ন্ত্রণকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দার প্যাটেল কর্তৃক আনীত বিলটি পরিষদে গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই দিন নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার বিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস দল হইতে উত্থাপিত একটি মুলতুবী প্রস্তাব বিবেচনার অনুমতি দেওয়া হয়।

পাঞ্জাব জনরক্ষা অর্ডিন্যান্স অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিবার সময় লাহোরে ৪২ জন লীগ কর্মী গ্রেপ্তার হন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—পাটনার এক সংবাদে প্রকাশ, গত তিন মাসের মধ্যে বিহারে প্রায় ১০ হাজার হিন্দু শিখ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র পাটনা সহরেই দুই হাজার নরনারী শিখ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

গৌহাটির সংবাদে প্রকাশ, গৌহাটিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে আসাম গভর্নমেণ্ট শীঘ্রই একটি বিশ্ববিদ্যালয় বিল আনয়ন করিবেন। পান্ডুর নিকটে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

লক্ষ্ণৌয়ে শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের ফলে ৬ জন আহত হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রায় ৩৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গতকল্য ফতেগড় সিভিল হাসপাতালে অনশনের ফলে ফতেগড় সেণ্ট্রাল জেলের বন্দী সুরজবালী ওরফে নাদিরের মৃত্যু হইয়াছে। সুরজবালী আমৃত্যু অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।



আমেরিকাস্থ ইণ্ডিয়া লীগের প্রেসিডেণ্ট সর্দার জে জে সিং ৮ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। দমদম বিমানঘাঁটিতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

৫ই ফেব্রুয়ারী—আজ সকাল হইতে মহাত্মা গান্ধীর পদব্রজে পল্লীপরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইয়াছে। আজ সকালে তিনি সাধুরখিল গ্রাম হইতে রওনা হইয়া শ্রীনগর গ্রামে উপনীত হন। বিশ দিনব্যাপী ভ্রমণ তালিকায় ইহাই প্রথম গ্রাম।

আজ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলিম লীগ দলের জনৈক সদস্য উপজাতীয় লোকজনের উপর পিটুনী কর ধার্য করার এবং তাহাদের প্রতিভূ-স্বরূপ আটক রাখার 'বর্বর ও মধ্যযুগীয়' পদ্ধতি অবলম্বনের বিরুদ্ধে আলোচনার জন্য এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাব ৬৪—১৬ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

৬ই ফেব্রুয়ারী—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুত হারাণচন্দ্র চৌধুরী এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণ করিতে গভর্নমেণ্টের অক্ষমতার নিন্দা করা হয় এবং বলা হয় যে, উক্ত দুই জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্বসাধারণই ঐ হাঙ্গামাদিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বিভিন্ন দলের প্রায় ১২ জন বক্তা এই প্রস্তাব সম্পর্কিত বিতর্কে যোগ দেন। অতঃপর ৭৪—১০৭ ভোটে মুলতুবী প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিরোধী দল নোয়াখালী ও ত্রিপুরার হাঙ্গামা সম্পর্কে এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিতর্কের উত্তর-দান প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী বলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের খুব বেশী ক্ষতি না হইতে



দিল্লীর পালাম বিমান ঘাঁটিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নবনিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ আসফ আলির সম্বর্ধনা। চিত্রে মিঃ আসফ আলির পার্শ্বে পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলিকে দেখা যাইতেছে।

অবস্থা দ্রুত আয়ত্তে আনা হইয়াছে বলিয়া গভর্নমেণ্ট প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। তিনি বলেন যে, নোয়াখালীতে ১৪৫ জন ও ত্রিপুরায় ৩৭ জন নিহত হইয়াছে। নোয়াখালীতে ১০ জন নারী অপহৃতা হইয়াছেন, ত্রিপুরায় নারী হরণ ঘটে নাই। মুলতুবী প্রস্তাবটি ১৫—২৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

কুমিল্লার সংবাদে প্রকাশ, লাকসাম থানার এলাকাস্থ লক্ষ্মণপুর হইতে পুলিশ দল সরাইয়া লওয়ার পর সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক-জনকে ভীতি প্রদর্শন এবং নিগৃহীত করা হইতেছে।

শ্রীরামপুরের (নোয়াখালী) সংবাদে প্রকাশ, সেখানে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, একটি প্রদেশের পক্ষেও নিজস্ব গঠনতন্ত্র রচনা করিয়া উহা কার্যকরী করার অধিকার আছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে জনৈক মুসলিম লীগ সদস্যের প্রস্তাবে আসাম গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ নীতির আলোচনা হয়। প্রস্তাবে আসাম হইতে বাঙালী বহিরাগতদের উচ্ছেদকার্য বন্ধ করিতে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁহারা বলেন যে, বাঙলা গভর্নমেণ্ট অন্য একটি প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। মুসলিম লীগ আসামকে গ্রাস করিয়া এই প্রদেশকে পাকিস্থানে পরিণত করিতে চায়। ইহাই আসল উদ্দেশ্য।

গত ২১শে জানুয়ারী ভিয়েৎনাম দিবসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে ছাত্র শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশের লাঠি ও গুলী চালনার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেসী সদস্য শ্রীযুত ললিতমোহন দাস অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

"দেশে"র ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় "লাঞ্ছিত নোয়াখালী" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বাঙলা সরকার ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র (জরুরী ক্ষমতা) আইন অনুসারে 'দেশের' মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নিকট ২০০০ টাকা এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের (এই স্থানে পত্রিকাখানি মুদ্রিত হয়) কীপারের নিকট আরও ২০০০ টাকা জামানত তলব করিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত মিঃ আসফআলি লণ্ডনের পথে বিমানযোগে নয়াদিল্লী হইতে করাচী পেঁছিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী ঘোষণা করেন যে, বঙ্গীয় সরকার জেলা বোর্ডসমূহে মেয়েদের ভোটাধিকার দান করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

২রা ফেব্রুয়ারী—প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী সরকার ইন্দো-চীনে প্রচুর পরিমাণে সেনা ও সমরোপকরণ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফরাসী সেনা ও ইন্দো-চীন জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যে লড়াই চলিতেছে—অনতিবিলম্বে উহার অবসানের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হইবে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—ব্রহ্ম সরকারের দেশরক্ষা সচিব মিঃ রিকফোর্ড রেঙ্গুণে রয়টারের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতীয় সৈন্যদের সত্বর প্রত্যাবর্তনের কোন সম্ভাবনা নাই।

কোচিন চীনে আনামীরা ফরাসী ঘাঁটিসমূহের উপর বহুবার আক্রমণ চালায়। তদুপরি আনামীরা সাইগনের ১৫ মাইলের মধ্যে একটি শহরের উপর আক্রমণ চালায়।

৫ই ফেব্রুয়ারী—ব্রহ্মের সীমান্ত অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য সহকারী ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ বটমলি গতকল্য রেঙ্গুণে পেঁছেন।

চার্চিল মন্ত্রিসভার ভূতপূর্ব সদস্য মিঃ রিচার্ড ল জার্মানী সম্বন্ধে আলোচনার দাবী করিয়া কমন্স সভায় এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, জার্মানীর বৃটিশ এলাকায় কুশাসনের ফলে তৃতীয় জার্মান যুদ্ধের বীজ উপ্ত হইয়াছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী—বৃটিশ মন্ত্রিসভার একমাত্র মহিলা মন্ত্রী মিস এলেন উইলকিন্সন লণ্ডনের একটি হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী—লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, লীগের করাচী প্রস্তাবের পর যে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, সে সম্বন্ধে বৃটিশ মন্ত্রিসভা এখনও আলোচনা করিতেছেন। এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে যে, নিউজিল্যাণ্ড যাইবার পথে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী স্বয়ং কোন প্রতিনিধিমণ্ডলী লইয়া নয়াদিল্লী আসিতে পারেন।



সূচী দেশ সূচী

ডায়াপেপসিন



হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্যই করা উচিত। ডায়াপেপসিন সেই কার্যই করিবে। পাকস্থলীর কার্য কতক পরিমাণে ডায়াপেপসিন বহন করিবে এবং খাদ্যের সারাংশ লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বললাভ করিবে ও তখন খাদ্য হজম করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপসিন ঠিক ঔষধ নহে বরং পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায় মাত্র।

ইউনিয়ন ড্রাগ

কলিকাতা

(২)

খ্যাতনামা সাহিত্যিক
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের
চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক উপন্যাস

তরুণের স্বপ্ন

১ম পর্ব ৩৷৷০ ২য় পর্ব ২৷০

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সুখ ও দুঃখের সবুজ সজীব আলেখ্য।

তাসের ঘর—২৷৷০

কণ্ট্রোলের শাড়ী—২৲

চলন্তি নাটক-নভেল এজেন্সী
১৪৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

তৃতীয় সংস্করণ বর্ধিত আকারে বাহির হইল।
বাঙ্গালী হিন্দুর এই চরম দুর্দিনে
প্রফুল্লকুমারের পথনির্দেশ
প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য।
মূল্য—৩৲
—প্রকাশক—
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।
—প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা।
ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

জীবন ও মৃত্যু!

জীবনে পরম সত্য মৃত্যু, মৃত্যুকে কেহ রোধ করিতে পারে না—কিন্তু উহার নির্মম আঘাতকে লাঘব করে একমাত্র জীবনবীমা

দি

পিয়ারলেস লাইফ

এসিওরেন্স কোং লিমিটেড।

হেড অফিস:
৮, লায়ন্স রেঞ্জ কলিকাতা।

পলিসি হোল্ডারদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

- চেয়ারম্যান -
কাশিমবাজারের মহারাজা
শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, বাহাদুর
এম-এ এম-এল-এ।

মিঃ আর রায়,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।



প্রস্ফুটিত কান্তি

প্রভাতী আলো গোলাপের গালে যে সুষমা নিয়ে ঝরে পড়ে তারই একটু ছোঁয়া এসে লাগে যৌবনদীপ্ত আননে। কিন্তু তার সমস্ত মহিমা ফুটিয়ে তুলতে চাই বিশুদ্ধ প্রসাধনের প্রলেপ। লাবণ্যবৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে "স্নোফায়ার" বিলেতে যে প্রশংসা পেয়েছে তার পরিচয় আপনিও পাবেন একবার ব্যবহার করে দেখলে। প্রস্ফুটিত কান্তির আয়ু বাড়াতে এর জুড়ি নেই।

স্নোফায়ার কোল্ড ক্রীম ব্যবহারে মুখমণ্ডল পরিষ্কার এবং স্নিগ্ধ থাকে। পাউডার দেবার আগে স্নোফায়ার ভ্যানিসিং ক্রীম ব্যবহার করলে মুখশ্রী বৃদ্ধি পায়। একটু আর্দ্র ভাব থাকলে, স্নোফায়ার পাউডার ক্রীম লাগিয়ে তারপর পাতলা করে স্নোফায়ার ফেস্ পাউডার মাখতে হয়।

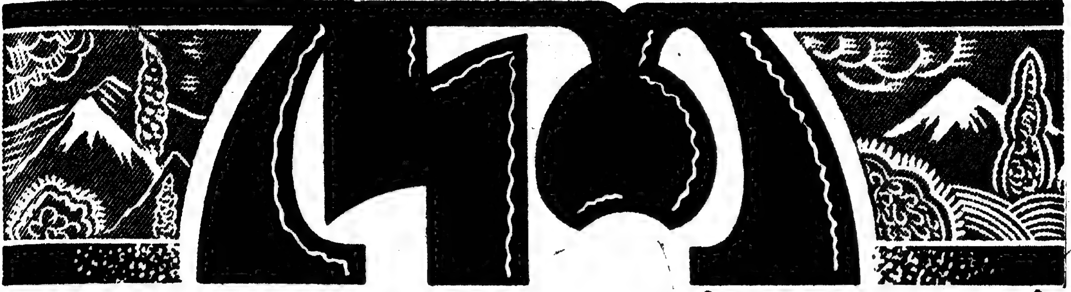
Snowfire



স্নোফায়ারের আর সব সামগ্রীর মধ্যে লিপ-ষ্টিক, রুজ, ওয়েভ সেটিং লোশান এবং হাও জেলিরও বিশিষ্ট স্থান আছে।

ডিষ্ট্রিবিউটর্স কামা নর্টন এণ্ড কোং, ২৩, মেডোস্ ষ্ট্রীট, বম্বে। শিমওয়েল এণ্ড ব্রাদার্স (ক্যালকাটা) লিঃ, ১, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। নসেরওয়ানজী এণ্ড কোং, মাচি মিয়ানি রোড, করাচী।

S.1



সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৩৫৩ সাল। Saturday, 22nd February, 1947. [১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

দুষ্প্রবৃত্তির প্ররোচনা

নোয়াখালিতে লীগ দলের নূতন অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। মৌলবী ফজলুল হক এই সংগ্রামের সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়াছেন। হক সাহেবের নিত্য নব মূর্তি। লীগ দলে প্রবেশ করিয়া মল্লিকবাজার লুণ্ঠনে লীগ-গুণ্ডাদের বীরত্ব কাহিনী তিনি বর্ণনা করেন এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সান্ধ্য ভাষায় তিনি হিন্দু মুসলমান মৈত্রীর জন্য জান কবুল করেন। ইহার পর কলাবাগানের মুসলমান-বস্তীতে খানাতল্লাসকারী পুলিশের বিরুদ্ধে হক সাহেবের উত্তেজনার অপূর্ব অভিনয় আমরা দেখিতে পাই; তৎপর প্রস্তাবিত মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি যে লুণ্ঠন এবং ডাকাতি করিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না, হক সাহেব প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে সংকেতময় এই শুভ সংকল্প ঘোষণা করেন। ইহার পর নোয়াখালি হইতে গান্ধীজীকে অপসারিত করিবার জন্য নোয়াখালির পুলিশের উৎপীড়ন-ব্যথিত হক সাহেবের সদয় হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। তদনুসারে তাঁহার নোয়াখালিতে অভিযান। চাঁদপুরে গিয়া তিনি গান্ধীজীকে অভদ্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। নোয়াখালি হইতে গান্ধীজীকে অপসারিত করিবার জন্য তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে হক সাহেব এই ফরমাণ জারী করিয়াছেন। বাঙলার লীগ-শার্দুল হক সাহেবের এই সব বীরত্বপূর্ণ উক্তির মূলে তাঁহার দৃষ্টি কোন দিকে রহিয়াছে, বুঝিতে অবশ্য বেগ পাইতে হয় না। চাঁদপুরের বক্তৃতায় হক সাহেব নিজেও বলিয়াছেন যে, বাঙলার মন্ত্রিগিরি বড় একটা লাভের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্ট হইতে অর্থ সাহায্য স্বরূপে ৮ কোটি টাকা অল্প দিনের মধ্যেই বাঙলার মন্ত্রীদের হাতে আসিতেছে, সুতরাং লাভের এই কারবারটা আরও জমিয়া উঠিবে, কাজেই আজীবন পরমার্থতত্ত্ববিদ হক সাহেব নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন না। মন্ত্রিত্বের গদি তাঁহাকে দখল করিতেই হইবে। তিনি কৌশল-পরায়ণ ব্যক্তি; সুতরাং কোন্ কৌশলে এই শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায়, হক সাহেব তাহা বুঝিয়া লইয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িকতাকে পুষ্ট করিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ ও ফলপ্রদ পন্থা বাছিয়া লইতেও বাঙলার বর্তমান অবস্থায় তাঁহাকে বেগ পাইতে হয় নাই। নোয়াখালির লীগ গুণ্ডারা ভারতের ইতিহাসে পাকিস্থানী মহিমা উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, এবং সেই যশ-সূর্যের আলোক দিগদিগন্তে ছড়াইয়া লীগের সংগ্রাম-নীতি সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। গান্ধীজীর অবস্থানে গুণ্ডাদের বীরত্বে উদ্ভাসিত নোয়াখালিতে প্রতিষ্ঠিত লীগের সাম্প্রদায়িকতার ঐ মহিমা পাছে বিমলিন হয় ইহাই হইতেছে আতঙ্কের বিষয়। লীগ-সাম্প্রদায়িকতাকে এইভাবে পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিলেই বাঙলার মন্ত্রিত্ব দখলে হক সাহেবের নীতিগত চাতুরী অব্যর্থ হইতে পারে। বলা বাহুল্য, বাঙলার লীগ শার্দুলের এই আন্দোলনের ঢেউ নোয়াখালিতে ইহার মধ্যেই গিয়া লাগিয়াছে। ফরিদপঞ্জ থানায় কিছুদিন পূর্বে ৪ শত লোকের এক সশস্ত্র জনতা পুলিশ দলকে আক্রমণ করে এবং ঐ সময়ই আর একটি জনতা নিকটবর্তী একটি গ্রামের পুলিশের ফাঁড়িতে চড়াও হয়। ইহা তো গেল প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের পর্ব; ইহা ছাড়া মোজাহেদ দলের গোপন আন্দোলনেরও জোর বাড়িয়াছে। গান্ধীজীর পল্লী-পরিক্রমা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত চেষ্টা চলিতেছে। রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া এই দলের গুপ্তচরেরা ভ্রমণপঞ্জীতে নির্দিষ্ট গান্ধীজীর পথ নষ্ট করিতেছে। সাঁকোগুলি ভাঙিয়া দিতেছে। মুসলমানেরা যাহাতে তাঁহার প্রার্থনা সভায় যোগদান না করে, সেজন্য উত্তেজনাপূর্ণ ইস্তাহারসমূহ বিলি করা হইতেছে এবং হিন্দুদিগকে বয়কট করিবার আন্দোলন তোড়েজোড়ে আরম্ভ হইয়াছে। মহাত্মাজী উপদ্রুতদের মনে নিরাপত্তার ভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছেন এবং স্থানে স্থানে কৃতকার্য হইতেছেন। কিন্তু যাহারা উপদ্রবের দ্বারা অরাজক রাজ্যের বাদসাহীর স্বাদ পাইয়াছে, তাহারা ইহাতে তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। তাহাদের গুণ্ডাগিরিতে অর্জিত সেই বাদশাহী যাহাতে দুই দিনের বাদশাহী না হয় এবং তাহা যাহাতে বর্বর সাম্প্রদায়িক জিঘাংসাকে তৃপ্ত করিবার জন্য নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় কায়েম রাখা যায় তাহারা এজন্য এখনও সক্রিয় হইবার শুভ সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। হক সাহেব সেদিন দয়া করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিয়া সব কথা খুলিয়া বলিবেন। তিনি গান্ধীজীকে নিন্দা করেন নাই এবং সমগ্র সভ্য জগতের শ্রদ্ধাভাজন একজন মহামানবের সম্বন্ধে তিনি অসম্মান-জনক উক্তি করিতে পারেন না, একথাও বলিয়াছেন। কিন্তু হক সাহেব যাহাই এখন বলুন, নীতির চাল তিনি শেষ পর্যন্ত ঠিকই রাখিবেন। সম্প্রতি হক সাহেবের এই চালের পাল্টা হিসাবে মন্ত্রিগিরি বজায় রাখার সঙ্কটে পড়িয়া মিঃ সুরাবর্দীও গান্ধীজীর নোয়াখালি ত্যাগের ঔচিত্য প্রদর্শনে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি নোয়াখালিতে থাকায় মুসলমানদের মধ্যে নাকি উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। হইবারই কথা; কারণ গান্ধীজী উপদ্রবকারীদের সব চেষ্টাকে

উপেক্ষা করিতেই পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন; বস্তুত তিনি ইহাতে একটুও বিচলিত নহেন। আমরা জানি, এই ধরণের উপদ্রব গান্ধীজীর উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিবন্ধকতা করিতে সমর্থ হইবে না। মানবতার মূল ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া তিনি অগ্রসর হইতেছেন। দুষ্প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনা সে শক্তির কাছে দাঁড়াইতে পারে না। নোয়াখালিতে আজ যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহা মানবতারই সংগ্রাম। মানব-বিরোধী দৌরাত্ম্য এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধেই সে সংগ্রাম। সাম্প্রদায়িক দৌরাত্ম্য এবং দুর্নীতিকে যাহারা নিজেদের ব্যবসায়ের মূলধন স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা এই সংগ্রাম চাহে না। মহাত্মাজীর অস্ত্র প্রেমের অস্ত্র, তাহাদের বুকে এই অস্ত্র তীক্ষ্ণতর আঘাত হানিতেছে। গান্ধীজীর বাণী মিলনের বাণী, কিন্তু সেই ধ্বনি তাহাদের স্বার্থ কলুষিত কর্ণে বজ্রের মতই বাজিতেছে। বস্তুত গান্ধীজী নোয়াখালিতে যে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন তাহা সমস্ত ভারতেরই সমস্যা। ঐ সংগ্রাম বাহ্যতঃ ঘটনা-বহুল না হইলেও মানবতার বিপুল বেদনায় ঘনীভূত। ইহার প্রেরণা সুদূর-প্রসারী। সুদৃঢ় মনোবল না থাকিলে এমন সংগ্রামে সার্থকতা লাভ করা সম্ভব নহে। গান্ধীজীর সমগ্র জীবনের তপস্যা অর্জিত মনস্বিতা স্বার্থসংকীর্ণতার দানবীয় ক্রুরচক্র কাটাইয়া সমগ্র বাঙলাকে শান্তিপূর্ণ সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠার পথ দেখাইবে, শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই এই আশা করিতেছেন।

সোজা উত্তরের অপেক্ষা

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়া দিয়াছেন যে, মুসলিম লীগের সদস্যদিগকে যদি বর্তমান অবস্থাতে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে থাকিতে দেওয়া হয়, তবে কংগ্রেস সদস্যগণ পদত্যাগ করিবেন। সর্দারজী নির্ভীক এবং স্পষ্টবাদী পুরুষ; বস্তুত, অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মুসলিম লীগের অসংযত আবদার সংযত না হইলে কংগ্রেস সদস্যের পক্ষে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে থাকিয়া কোন লাভ নাই। বলা বাহুল্য, বড়লাটের পূর্বতন শাসন-পরিষদের সদস্যদের ন্যায় গোলামগিরি করিবার জন্য তাঁহারা অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে প্রবেশ করেন নাই। দেশের স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যেই নানা অন্তরায় সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতৃগণ অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লীগের সদস্যগণ অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের সদস্যদের এই পথে পদে পদে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছেন। ভারতের স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা লাভের গতিকে প্রতিহত করিয়া অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে খাস ব্রিটিশের গোলামগিরির পত্তন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, লর্ড ওয়াভেল এবং ব্রিটিশ সিভিলিয়ান দল কূটনীতির চালে লীগ দলের এই দুরভিসন্ধিকে প্রশ্রয় দিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে বড়লাটই কৌশলক্রমে লীগের দলকে গোপন পথে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টে প্রবেশ করাইয়াছিলেন এবং এখন তিনিই তাঁহাদিগকে আগুলিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞে আত্মদান-ব্রত কংগ্রেস সদস্যগণ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষক লর্ড ওয়াভেলের এমন কূটচক্রে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহাদের চির-দিনের আদর্শকে মলিন করিতে পারেন না। বস্তুত দীর্ঘ দিনের সাধনায় এবং বহু আত্মোৎসর্গের ফলে ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতার তোরণ দ্বারে পোঁছিয়াছে, কংগ্রেস এরূপ অবস্থায় পুনরায় ভারতকে মধ্যযুগীয় শোষণের যুগের মধ্যে লইয়া যাইবার ব্যাপারে কোনক্রমেই প্রশ্রয় দিবে না। লীগ-কংগ্রেসের এই সমস্যা সম্বন্ধে ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের মতিগতি কিরূপ এখনও সুস্পষ্ট বোঝা যাইতেছে না। নানারূপ জল্পনা-কল্পনাই শোনা যাইতেছে মাত্র। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন সেদিন মিঃ আসফ আলীর সংবর্ধনা সভায় ভারতের শান্তি, স্বস্তি এবং সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য কামনা করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছেন, একান্ত আশাবাদীরা তাহার উপর ভিত্তি করিয়া অনেক বড় বড় কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সেই বক্তৃতা হইতেই নাকি বোঝা যায় যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মুসলিম লীগের অন্যায় আবদার আর বরদাস্ত করিবেন না এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে ভারতের সর্ব-জনীন অগ্রগতি প্রতিহত করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া বহুদিন পূর্বে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবার লীগকে সোজা ভাষায় অসংযত আবদার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিয়া তিনি নাকি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন। এই প্রসঙ্গে বড়লাটের পদ-ত্যাগের সম্ভবনাও কেহ কেহ প্রকাশ কতিতেছেন। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ রাজনীতিক-দের শুভবুদ্ধিতে আমরা এতটা বিশ্বাসী নহি এবং তাঁহারা যে এতটা সরলভাবেই সোজা পথে আসিবেন, আমরা তাহা মনে করি না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, সোজাসুজিভাবে ভারতের স্বাধীনতার গতিকে প্রতিহত করিতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এখন হয়ত সাহস পাইবেন না; কারণ আন্তর্জাতিক অবস্থা তদনুরূপ নহে; কিন্তু মুসলিম লীগের আবদারকে আড়াল করিয়া তাঁহারা যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে অন্ততঃপক্ষে বিলম্বিত করিবার নূতন রকমের ফন্দীর অবতারণা করিবেন, সে সম্বন্ধে আমরা একরূপ নিঃসন্দেহ। আমাদের কাছে এটলী এবং চার্চিলের মধ্যে বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই। কথার খেলা ইহারা সকলেই জানেন, জটিল কথার জালে জড়াইয়া সেই কথার ব্যাখ্যা-ভাষ্যের তাৎপর্যতার সূত্রে ভারতের অন্তর্দ্বন্দ্বকে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দীর্ঘ করিবেন, এই অভিপ্রায়েই ব্রিটিশ মন্ত্রীরা বসিয়া আছেন এবং সেই পথে নিজেদের মোড়লগিরির সুযোগ খুঁজিতেছেন বলিয়াই আমরা মনে করি। এই সব ধাপ্পাবাজি ভাঙিয়া দিবার জন্য সমগ্র জাতিকে প্রাণবলের সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে। শেষ সংগ্রাম দিন সমাগত; সুতরাং আর অপেক্ষা করিলে চলিবে না।

ক্ষমতা লিপ্সার মূল কারণ

মুসলিম লীগ পাঞ্জাবে জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য প্রযুক্ত জরুরী আইনের বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করিয়াছে। সেক্ষেত্রে লীগের যুক্তি এই যে, এই সব জরুরী ব্যবস্থা স্বেচ্ছামূলক এবং শাসকদের হাতে এই সব বিশেষ ক্ষমতা থাকিলে জনসাধারণের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। কিন্তু বাঙলার সম্বন্ধে লীগ-ওয়ালাদের দৃষ্টি ভিন্ন রকমের। মিঃ সুরাবর্দির লীগ মন্ত্রিমণ্ডল এখানে বিধানের পর বিশেষ বিধান জারী করিয়া জনসাধারণের স্বাধীনতার সংকোচ সাধন কয়িয়াছেন এবং এখন সে সব অতিরিক্ত ক্ষমতা সুদীর্ঘকালের জন্য বহাল রাখিবার জন্য আইন পাশ করাইয়া লইয়াছেন। সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী ইহার কৈফিয়ৎস্বরূপে স্বেচ্ছাচারী আমলা-তন্ত্রের মামুলী যুক্তি উপস্থিত করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক অশান্তি প্রশমিত করিবার জন্য এবং চোরাকারবার দমন করিবার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের হাতে এই সব বিশেষ ক্ষমতা আর কিছুকাল থাকা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দমন এবং চোরাকারবার দমনে মিঃ সুরাবর্দীর আন্তরিক আগ্রহ সম্বন্ধে আমাদের স্বতঃই সন্দেহ জাগে। বস্তুত ইতিহাসে এ পর্যন্ত যাহা ঘটে নাই, সুরাবর্দী মন্ত্রিমণ্ডলের শাসনে বাঙলা দেশে তাহাই ঘটিয়াছে। গুণ্ডার ছুরির আঘাতে অসহায় অবস্থায় বাঙলার বুকে কলিকাতা এবং নোয়াখালির মত বর্বরোচিত নিধন যজ্ঞ আর কোনদিন অনুষ্ঠিত হয় নাই। অসহায় নরনারীর আকুল ক্রন্দন দৌরাত্ম্য-দমনে বাঙলার শাসকদের দণ্ডকে সমুদ্যত করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রকাশ্য দিবালোকে সহরে, মফঃস্বলে লুঠের রাজত্ব চলিয়াছে এবং দিনের পর দিন গিয়াছে, শাসকদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণাপর্বে দুইদিনের মধ্যে এক কলিকাতা সহরেই সম্প্রদায় বিশেষের অন্তত ৩০ কোটি

সঙ্গারে যাত্রা করিত, তাহাদের সহিত এই আধুনিকা অভিসারিকার কোথাও কোনো মিল ছিল না। দীর্ঘ ঋজুদেহ শুভ্রবসনে শোভিত করিয়া সে যেন অবাধগতি অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ললাটে জয়পত্র বাঁধিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে। জুতার শব্দে নিঃশব্দ গলি-পথ সচকিত করিয়া অন্যান্য পথিকদিগের বিমুগ্ধ দৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া সে যখন বড় রাস্তায় গিয়া পড়িল তখন ল্যাম্প পোস্টের নীচে দাঁড়াইয়া বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে শুঁড়ি-পাড়ার একটা বখা ছেলে কেবল মন্তব্য করিল, "ইস্‌স্‌! মানোয়ারী গোরা!"

স্বপ্নচালিতের মতো আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সুদেষ্ণা যখন পটলডাঙ্গার গলির মুখে আসিয়া পৌঁছিল তখনও তাহার কোনো ধারণা ছিল না, সে কোথায় যাইতেছে এবং কেন যাইতেছে। খুঁজিতে খুঁজিতে একটা বিশেষ নম্বরের বাড়ির সম্মুখে সে যখন গিয়া দাঁড়াইল তখন অকস্মাৎ কোথা হইতে, রাজ্যের লজ্জা তাহাকে পাইয়া বসিল। কলেজে, পথে ট্রামে বাসে—পিতৃহীন হইবার পর যেদিন হইতে নিজের পায়ে না দাঁড়াইলে নয় এ বিশ্বাস তাহার হইয়াছে সেদিন হইতে সর্বত্র—সে নারীসুলভ লজ্জাকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। তাহার তীব্র দৃষ্টি এবং শাণিত ভাষার ভয়ে ইচ্ছা সত্ত্বেও ক্লাসের সহপাঠী ছাত্রেরা তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে সাহস করিত না। আজ বহুদিন পরে একটা বিশেষ নম্বরের অপরিচিত বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে নিজের মাতৃ-মাতামহীর সনাতন রক্তধারার সহিত তাঁহাদের নারীত্বের সনাতন দুর্বলতার উত্তরাধিকারিণী বলিয়া নিজেকে নিজে আবিষ্কার করিয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে একি করিল, কোথায় আসিল? তাহার এই ব্যবহারে না জানি তিনি কি মনে করিবেন? হয়তো ভাবিবেন, এই তাহার স্বভাব, অপরিচিত সুশ্রী পুরুষের পিছনে ছুটিয়া বেড়ানোই তাহার পেশা! ছি ছি, কি লজ্জা! একবার ভাবিল, কেহ তো দেখে নাই এখনও ফিরিয়া গেলে কেহ কিছুই জানিতে পারিবে না। পরমুহূর্তে মনে হইল, এই বাড়িটার ভিতরের রহস্য একটু জানিয়া লইতে, ইহার অধিকারীর গোপন মনের কথা স্পষ্ট ভাষায় শুনিয়া যাইতে, দোষ কি? চিরজীবনের জন্য যাহার সহিত নিজের জীবন যুক্ত করিতে যাইতেছে, তাহার সঙ্গে পূর্বাহ্নে একটা বোঝাপড়া করিয়া লওয়া কি কর্তব্য নয়? তিনি যাহাই মনে করুন, সুদেষ্ণার তো মনে কোনো পাপ নাই। তিনি মানুষ হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে ভুল বুঝিবেন না। যদি ভুল বোঝেন, তবে সুদেষ্ণার যোগ্য তিনি সত্যই নন।

বাড়িটা কিন্তু বেশ, ছোটোর মধ্যে। একটু বদল করা দরকার,—আর সামনের ঘরে ভাড়াটে সে রাখবে না। সহসা তীব্র হর্ন শুনিয়া সে পথ ছাড়িয়া ওপাশের একটা বাড়ি ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলে, তাহার পাশ দিয়া একখানা প্রকাণ্ড মোটর একশত তিপান্ন নম্বর বাড়িখানার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়িখানার মধ্যে উগ্রকমের উজ্জ্বল সাজ-পোষাক পরিহিতা এনামেল করা মুখ একজন স্থূলাঙ্গিনী বিলাসিনী রমণী বিচিত্র ভঙ্গীতে হেলিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার বাঁ হাতের ঘোর লাল রং করা নখগুলি ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে পাউডার বাহির করিয়া নাকে লাগাইবার সময় সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল। শোফার কড়া নাড়িতেই সুমন্ত্র ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিল এবং রমণীকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। সেখান হইতে সাত আট হাত দূরে তাহারই প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মানা সুন্দরী অভিসারিকার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। কিন্তু গালে ফেট্টি বাঁধা কেন? কোনো অসুখ করে নাই তো? একবেলার মধ্যে আবার কি হইল? যাহাই হউক, সে চিন্তা সুদেষ্ণার নয়। যিনি আসিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্বপরিচিতা, বাড়িতে ঢুকিবার সময় তিনি যে পলাতক সুমন্ত্রকে ধরিতে আসিয়াছেন সে কথা উচ্চকণ্ঠে উচ্চহাস্যের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরেই বাড়ির ভিতর হইতে আবার ঘন ঘন উচ্চহাস্যের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। সুদেষ্ণা একবার নিজ মনে বলিল,—"কি টেস্ট! এই জন্যে এতদিন বিয়ে করা হয় নি?" একবার মনে হইল ঐ ধনী বিলাসিনীর নর্মসহচর দরিদ্র অপদার্থটাকে বেশ করিয়া দুই কথা শুনাইয়া সে জন্মের মতো বিদায় লইবে, আবার ভাবিল বিদায় লওয়া তো পড়িয়াই আছে লইলে ঠেকাইবে কে? কিন্তু আদালতে খুনের আসামীকেও নিজের পক্ষ সমর্থন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, লোকটাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দেওয়া অন্যায় হইবে। যাক, ঐ মুখপুড়িটা আগে চলিয়া যাক একটা বোঝাপড়া করিয়া সেও যাইবে। দু'একজন পথচারী তাহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছে দেখিয়া সুদেষ্ণা বাড়ি খোঁজার ভান করিয়া গলির মধ্যে খানিকটা পায়চারি করিয়া আসিল কিন্তু বোঝাপড়ার সুযোগ আর হইল না, সুমন্ত্র সেই রমণীর সহিত হাসিতে হাসিতে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল, মোটরখানা হর্ণের শব্দে গলি কাঁপাইয়া হেড লাইট জ্বালিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া বাহির হইয়া গেল। সুদেষ্ণার একবার মনে হইল তাহার পা দুটা কেমন যেন কাঁপিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে, এখনই বোধ হয় সে পড়িয়া যাইবে। অনেক কষ্টে একটা বাড়ির গায়ে হেলান দিয়া সে কিছুক্ষণ ধরিয়া বল সংগ্রহ করিল, তারপর ধীরে ধীরে শূন্য মনে বাড়ির দিকে রওনা হইল। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে ক্রমে চোখে মুখে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া সে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইল, গতির বেগ বাড়াইয়া দিল। হন হন করিয়া চলিতে চলিতে নিজের মনে বলিতে লাগিল, "ও আমার যোগ্য নয়, সত্যিই ও আমার যোগ্য নয়।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কেশিকা কেশ নিকেতন
৮ কেশিকা
৮ ক্যান্থারাইডিন
৮ কেষ্টার অয়েল
আমলা ও
৮ লাইমজুস
ধানিকা কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
আগরতলা, কলিকাতা, পাটনা

মোটে দু'বার ফেল করেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাড়ীতে তো ওসব পাঠ ছিল না, আমি আসার পর অ্যাটমোসফিয়ার কিছুটা বদলেছে উপস্থিত। হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল। ও'র আর একবার ডাকিলেই খাইব গো'হের অবস্থা কি? আমি চুপ করে বসে থাকলে নিজেই ফিরবেন বলে মনে হয় দু'চার দিনের মধ্যে।"



"মাই গুড্নেস! কি কান্ড্লো!"

সুমন্ত্র বলিল, "ফিরবে, তবে তার রাগ পড়েনি। আপনার সঙ্গে থাকবে না, ভিন্ন হবে। আমাকে একটা বাড়ি ভাড়া করতে লিখেছে। ভেবে দেখলুম, তার মানসিক চিকিৎসার পক্ষে এখন দিনকতক আলাদা থাকাই ভালো। বাড়ি আমারও একটা ছিল, কিন্তু সে এখানে থাকবে না। যাই হোক, এইদিকেই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি,—ছ'মাসের ভাড়া আগাম দেওয়া হ'য়েছে।"

মিসেস কুণ্ডু বলিলেন, "তাঁকে সেপারেট করতে দিচ্ছি কিনা? হাউস রেণ্ট এ্যাডভান্স দেওয়া হ'য়ে থাকে, কিছু আক্কেল সেলামী দেবে তাঁর।"

সুমন্ত্র বলিল, "আপনি বুঝতে পারছেন গোড়ায় একটু আস্পা দেওয়া ভালো। রহে এবং অযত্নে কিছুদিন কষ্ট পেয়ে যখন ধাতে আসবে তখনই আপনাকে খবর দেব। আমার নাম করবেন না, আপনি যেন কা'রো কাছে খবর পেয়েছেন—এইভাবে একদিন গিয়ে পড়বেন। আমি ব'লে দিয়েছি জানলে সে আমার মুখদর্শন করবে না কিন্তু।"

মিসেস কুণ্ডু বলিলেন, "বন্ধুকে মিত্রে ... করবেনই তখন আর মিথ্যে দেরি করছেন কেন, মিস্টার সেন? আপনি মিথ্যে কথা গুছিয়ে ক'রে ব'লতে পারেন না, আপনার মুখ চোখকে বিট্রে করে। আপনি ঠিক জানেন, এ মুহূর্তে তিনি কোথায় আছেন। দয়া করে আমাকে নিয়ে চলুন! আমার কিভাবে দিন কাটছে আপনি বুঝতে পারছেন না। সার্ভেণ্টদের কাছে পর্যন্ত আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে।" বলিতে বলিতে তিনি নাকে মুখে আলতোভাবে রুমাল ঠেকাইলেন।

সুমন্ত্র এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করিল, তারপর বলিল, "আমি ঠিকানা জানি সত্যি, কিন্তু বাড়ি জানি না। তবে খুঁজে বার ক'রতে পারব মনে হয়।" "বেশ, তাহ'লে চলুন।" "এখুনি? এই সন্ধ্যেবেলা!" "আমার কারু সঙ্গে আছে ভয় কি?" "তা' বটে। তা'হলে আমাকে একটু"—

মিসেস কুণ্ডু বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি, আপনি শেভ করাটা শেষ ক'রে নিন। গলে রুমাল বেঁধে অসুবিধে হচ্ছে।" এইবার উভয়েই উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। সুমন্ত্র দাড়ি কামাইয়া প্রস্তুত হইলে মিসেস কুণ্ডু আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনার ভয় নেই, বাড়ির সন্ধান পেলেই আপনাকে দূর থেকে বিদায় দে'ব।" উভয়ে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন। সুমন্ত্র বলিল, "তা দেবেন বই কি! আমে দুধে এক হয়, আঁদাড়ের আঁটি আঁদাড়ে যায়। মোটরে চড়ে যাব, হোঁচট খেতে খেতে ফিরব।"

উভয়েই আবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে মিসেস কুণ্ডু বলিলেন "সে কি কথা? আপনাকে বাড়িতে পেঁৗছে দিয়ে যাব। তারপর একদিন আপনাকে নিয়ে পার্টি করব আমাদের বাড়িতে। যা খেতে ভালোবাসেন"—

সুমন্ত্র বলিল "এটা কিন্তু আমাকে অপমান করা হল। মিষ্টান্ন ইতরের জন্যে শাস্ত্রে আছে। তা আপনি যা খুসি বলুন। ভদ্রেশ্বর বাড়ি ছেড়েছে বলে আমি বাড়ি ছাড়ছি না।" উভয়ে হাসিতে হাসিতে আসিয়া মোটরে উঠিল।

সুদেষ্ণা সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত দোতলার ঘরে একটা বই মুখে দিয়া বসিয়া রহিল। পিতা বর্তমানে সে বাহিরের ঘরে বসিয়াই পড়াশোনা করিত এবং কেহ আসিলে দরজা খুলিয়া দেওয়ার কাজটা তাহার প্রায় একচেটিয়া ছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর বাড়িতে কোনো পুরুষ অভিভাবক না থাকায় সুকল্যাণী তাহার নীচের ঘরে নিয়মিত বসা বন্ধ করিয়াছিলেন। আজকাল দরজা খুলিয়া দেয় সাধারণত উদাসী; সে ঘুমাইলে বা বাড়িতে না থাকিলে এবং দুপুরে ঠাকুর এবং ঠিকা ঝি উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে আজকাল কদাচ কখনও সুদেষ্ণাকে দরজা খুলিতে হয়। আজ এমনই একটা পরিস্থিতিতে দরজা খুলিতে গিয়া কি জানি কি একটা বিপর্যয়কাণ্ড হইয়া গেল, সারা দিন ধরিয়া কেমন একটা অদ্ভুতপূর্ব সুখদুঃখমিশ্রিত অনুভূতি তাহার সমস্ত দেহমন আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। বৈকালে অক্ষুধার ছুতা করিয়া সে কিছু খাইল না। নীচে কয়েকবার কড়া নাড়ার শব্দ হইল। তিনজন যুবক এবং একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক পাত্রীর সন্ধানে আসিয়া ফিরিয়া গেলেন। উদাসী প্রথমবার উপরে খবর দিয়াছিল, সুকল্যাণী উপর হইতেই বলিয়া দিলেন—বাবুকে ব'লে দাও সাতদিন পরে খবর নিতে। আসছে রবিবার মেয়ের পিসেমশাইকে আসতে ব'লব তাঁর সঙ্গে কথা হবে।" উদাসী ব্যাপারটা বুঝিল, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এবং তাহার পর কয়দিন ধরিয়া যে কেহ আসিয়া সন্ধান লইল প্রত্যেককে সে জানাইয়া দিল, পাত্র স্থির হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সুকল্যাণী বলিলেন, "হ্যাঁরে, মুখ হাত ধুবি না, কিছু করবি না?" সুদেষ্ণা বলিল, "মাথাটা বড্ড ধরেছে মা, কিছু ভালো লাগছে না।" মা বলিলেন "সারাক্ষণ বই মুখে দিয়ে বসে থাকলে মাথা ধরবে না? গা ধুয়ে একটু ছাদে ঘুরে আয় দেখি?" সুদেষ্ণা মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে বাথরুমে ঢুকিল, কিন্তু সেদিন তাহার গা ধুইতে অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশী সময়ই লাগিল। হাতের ও পায়ের আলকাতরার কালি সম্পূর্ণ দূর হয় নাই বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় বেশ কিছুক্ষণ মুখটায় শুধু সাবান ঘসিয়া স্নানশেষে আরক্ত গৌরবর্ণ দেহে ধবধবে সাদা শান্তিপুরে শাড়ী এবং গরদের ব্লাউজ পরিয়া সে যখন বাহির হইল ততক্ষণে তাহার মনোভাবের বোধ হয় ঈষৎ পরিবর্তন হইয়াছে; সুকল্যাণী ভাঁড়ার ঘরে কুটনা কুটিতে বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া বলিল "মা, আমি একটু বাইরে ঘুরে আসি। তোমার ঐ ছাদের ওপর দু'হাত জমির মধ্যে পায়চারি করলে আমার মাথা ছাড়বে না।" সুকল্যাণী দেবী বলিলেন "তা যাবি যা, উদাসীকে সঙ্গে নিয়ে যা।" "হ্যাঁ, উদাসীকে নিয়ে যাব না আরো কিছু। তার সঙ্গে ঠুক ঠুক করে হাঁটতে আমি পারব না মা, তার চেয়ে আমার ঘরে বসে থাকাই ভালো।" সুকল্যাণী বলিলেন, "তোমার যা খুসী করো বাপু, কেবল ফিরতে রাত কোরো না। রাস্তাঘাট খারাপ, আমার বড্ড ভয় করে।" সুদেষ্ণা অনুমতি পাইয়া নিজের ঘরে আসিল, একবারটি বড় আরসিটার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার স্বভাবকুঞ্চিত চুলগুলোকে চিরুনির সাহায্যে সংযত করিয়া একটা এলো খোঁপা বাঁধিল। তারপর কপালে একটি সিঁদুরের টিপ পরিয়া এবং জয়পুরী ব্রোচটা কাপড়ে আটকাইয়া সে যখন বেড়াইতে বাহির হইল তখন ভাঙকর মাথা ধরার কোনো চিহ্ন তাহার মুখে চোখে কোথাও প্রতিফলিত হইতে দেখা গেল না। নারীসুলভ গজেন্দ্রগমন তাহার কোষ্ঠীতে ছিল না। সে যে অভিসারে চলিয়াছে, সে কথাটা তাহার নিজের কাছেও বোধ হয় তখনও সুস্পষ্ট হয় নাই সুতরাং দুই সহস্র বৎসর পূর্বে যে ভীরু অভিসারিকারা সূচীভেদ্য অন্ধকারে রুদ্ধালোকে উজ্জয়িনীর 'নরপতি পথে' গোপন পদ-

প্রভৃতির মধ্য দিয়া সত্যকার মানুষটিকে আর চেনা যায় না। যেন কোন নাট্যশালায় অভিনয় করিতে করিতে ভদ্রমহিলা হঠাৎ বাহির হইয়া আসিয়াছেন। কেবল বেশে-বাসে নয়, কথায় এবং ব্যবহারে তাঁহার অভিনয়ের কৃত্রিমতা সুমন্ত্রকে পীড়া দিতেছিল। হায়, ইঁহারই জন্য কি সে সারা বৈকালটা ধরিয়া সযত্নে বাড়ি সাজাইয়াছে? ইহাকেই বলে 'উল্টা বুঝিলি রাম!'

মিসেস কুণ্ডু উচ্চকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে গাড়ি হইতে নামিলেন। মাথাটা ঈষৎ কাৎ করিয়া সুমন্ত্রর মুখের বিব্রত ভাবটা আধ মিনিটকাল উপভোগ করিলেন। তারপর মন্তব্য করিলেন, "কট্!"

প্রথমটা সুমন্ত্র ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। এ কি বলে রে বাবা? তান্ত্রিক মন্ত্র আওড়াইতেছে নাকি? স্বামী শোকে মাথা খারাপ হইয়া গেল? পরক্ষণেই মনে পড়িল, ভূধরবাবুর ক্লাসের 'ক্যাচ কট, কট!' ঠিক ইংরেজিই বলিতেছে, ভয়ের কারণ নাই। এবার মিসেস কুণ্ডু উচ্চতর কণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, "কেমন ধরে ফেলেছি? যাবেন বলে গেলেন না যে?"

অভিমানের পর বিস্ময়ের সুর আসিল, "আপনার গালে কি হল? আই হোপ, নথিং সিরিয়স? অ্যাবসেস? পুলটিস দিচ্ছেন?"

সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "ও কিছু না, একটু ব্যথা হয়েছে, সেরে যাবে।"

"নো, নো, ইউ মাস্ট বি ভেরী কেয়ারফুল।"

মিসেস কুণ্ডু সুমন্ত্রের পিছন পিছন দোতলায় উঠিয়া তাহার পড়িবার ঘরে সদ্য-বিছানো ফরাসের উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মাই গুডনেস। কি কামড়াল?"

সুমন্ত্র ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও কিছু না, আমার ক্ষুর। বেশি লাগেনি তো? না, না, কাটবার ভয় নেই; মধ্যে মাদুর আছে, সতরঞ্চি আছে, চাদর আছে"—

মিসেস কুণ্ডু নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছিলেন না। বলিলেন, "রেজর? মাই! দেখুন দিকি কাণ্ড! বিছানার তলায় মানুষে 'রেজর' পুরে রাখে?" তিনি দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

সুমন্ত্র ফরাস তুলিয়া জিনিসপত্র সরাইতেছিল, অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "আমি কি একটা মানুষ?"

মিসেস কুণ্ডু চেয়ারের অন্বেষণে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন; সুমন্ত্রের মন্তব্যে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এক্সকিউজ মি, মিস্টার সেন—আই মিন সুমন্ত্রবাবু, আপনাদের বাড়িতে কি বসবার আর কোনরকম 'অ্যারেঞ্জমেণ্ট'—মানে ব্যবস্থা নেই? অর্থাৎ চেয়ার-টেয়ার? 'আই ডোণ্ট থিঙ্ক, দে কস্ট মাচ্?"

সুমন্ত্র অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "আপনার কষ্ট হল বুঝতে পারছি। আগে জানতে পারলে ব্যবস্থা রাখতুম। আমাদের তেমন প্রয়োজন হয় না। নিন, বসুন, আর কোন ভয় নেই।"

মিসেস কুণ্ডু বলিলেন, "ভরসাও নেই। যে রকম স্বদেশী ব্যাপার দেখছি!" বলিতে বলিতে তিনি আবার হাসিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই অতি সন্তর্পণে জুতা ফরাসের বাহিরে রাখিয়া প্রথমটা হাঁটু গাড়িয়া এবং ক্রমে সম্পূর্ণরূপেই পা মুড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। সুমন্ত্রও একটু দূরে ফরাসের উপর বসিল।

মিসেস কুণ্ডু এইবার মুখখানাকে অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "আমার এভাবে 'উইদাউট এসকর্ট' আসাটা আপনি বোধ হয় 'লাইক' করেন নি? আপনি কি 'ব্যাচিলর'? আই সি! তাই এই রকম অবস্থা। আমি অবশ্য পূর্বে জানতুম না! 'হাউ এভার', আই হ্যাড নো আদার অল্টারনেটিভ, মিঃ সেন—'আই মিন' সুমন্ত্রবাবু—এছাড়া আমার আর পথ ছিল না। ইউ আর দি অন্‌লি পারসন, আপনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি আমার 'হাসব্যাণ্ডের হোয়্যার অ্যাবাউট' জানেন। না, না,—লেট মি ফিনিশ—আমাকে শেষ করতে দিন। সুতরাং—আমার মেণ্টাল অ্যাংজাইটির' কথা বিবেচনা করে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে 'এক্সকিউজ' করবেন—'অ্যাট লিস্ট আই হোপ সো'—অন্তত আমি তাই আশা করি। তাছাড়া মিস্টার কুণ্ডুর কাছে আপনার কথা বেটুকু শুনেছি, তাতে আমার ধারণা হয়েছিল—'ইউ ক্যান বি ট্রাস্টেড'—আপনাকে বিশ্বাস করা চলে। 'ইউ ওয়্যার দি ওনলি বয়'—ও'দের ক্লাসে আপনিই নাকি একমাত্র ভালো ছেলে ছিলেন,—যিনি 'লাস্ট বেঞ্চের' ছেলেদের সঙ্গে মিশতে লজ্জাবোধ করতেন না। আপনার বাড়িতে একা এসেছি শুনলে আপনার 'ফ্রেণ্ড' নিশ্চয়ই কিছু 'মাইণ্ড' করবেন না।" মিসেস কুণ্ডু জুতা খুলিয়া ভালো করিয়া বসিলেন।

সুমন্ত্র বলিল, "আমরা কেউ কিছু মনে করব না, আপনি কেন ভাবছেন?"

মিসেস কুণ্ডু বলিলেন, "আপনার ফ্রেণ্ডের এদিক নেই, ওদিক আছে কিনা! 'জেলাসি'টি আছে ষোল আনা। হ্যাঁ, আপনার 'অ্যাড্রেস' পেলুম কোথায়? সেদিন জিজ্ঞেস করে নিতে ভুল হয়ে গেছল, আপনি বেরিয়ে যাবার পর মনে পড়ল। অনেককে জিজ্ঞেস করলুম, টেলিফোন গাইডে দেখলুম—একটা ফোন রাখেন না কেন? হাল ছেড়েই দিয়েছিলুম। আজ বিকেলে ওঁর চেনাশোনা বন্ধুবান্ধব—যাঁদের ঠিকানা জানি, সকলের কাছে সন্ধান নেওয়া শেষ করে ওঁর একটা পুরানো ঠিকানার খাতা ঘাঁটছিলুম, হঠাৎ দেখি তাইতে আপনার ঠিকানা। তের বছর আগের ঠিকানা অবশ্য, এতদিন পরে এ-বাড়িতে পাব আশা করিনি। তবু 'আই টুক দি চান্স', যদি পাই বলে কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়লুম। 'অ্যাণ্ড আই অ্যাম লাকি!' আমার ভাগ্য নিতান্ত ভালো—তাই ধরতে পেরেছি। যাই হোক, আপনি গেলেন না কেন, তাই বলুন? আমি অন্য সমস্ত 'এনগেজমেণ্ট' ক্যান্সেল করে দিয়ে ক'দিন ধরে আপনার জন্যে 'ওয়েট' করেছি। 'গুডনেস', কেবল বাজে কথাই বকছি! 'এনি নিউজ',—আপনার ফ্রেণ্ডের নতুন খবর কিছু আছে?"

সুমন্ত্র বলিল, "সন্ধান পেয়েছি, সে কাশী যায়নি! কলকাতার কাছেই একটা কোন গ্রামে আছে বোধ হয়। এখনও সন্ন্যাস নেয়নি। যিনি দেখে এসেছেন, তিনি বললেন, ওজন কিছু কমেছে, জামা-কাপড় ঠিকই আছে। আমার না যাবার তো কোন কারণ নেই, এখনও কিছু ঠিক করে নি সে। একটা পাকা খবর পেলেই আপনার কাছে যেতুম।"

মিসেস কুণ্ডু ইলেকট্রিক ফ্যানের সন্ধানে ঊর্ধ্বে ব্যর্থ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "উপস্থিত মহম্মদ না যাওয়ায় পর্বতই এসে হাজির হয়েছে।" বলিতে বলিতে নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

সুমন্ত্র আশ্বাস দিয়া বলিল, "না, না, আপনাকে পর্বত বলা চলে না। একটু—ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্লাম্প!' আমি অবশ্য ভদ্রেশ্বরের কথা শুনে আপনাকে আরো একটু"—

মিসেস কুণ্ডু হাসিয়া বলিলেন, আপনার কাছেও নিন্দে করে গেছেন তো? আর বলবেন না, তেষট্টি পাউণ্ড ওজন বেড়েছি তিন বছরে তাই আর সহ্য হচ্ছে না, খুঁড়ে খুঁড়ে শেষ করলেন। তা পোড়ার শরীর একটু টসকায় না তো? এত করে আধপেটা খেলুম, মিষ্টি খাওয়া ছাড়লুম"—এতক্ষণে প্রাণের কথা বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় বাহির হইল।

সুমন্ত্র বলিল, "না, না, ওসব করবেন না, স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে। তাছাড়া ভদ্রেশ্বর নিজে তো ঐ! সে কোন্ মুখে আপনার খোঁড়ে?"

মিসেস কুণ্ডু বলিলেন, "বলুন তো! ও তো আবার কাঠখোট্টা রসিকতা জানে কীর্তনের সুরে এক গান বেঁধেছেন—'আ শুটকী দেখিয়া বিবাহ করিনু মুটকী হই গেল'" বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সত্যি ত বেশ স্লিম ছিলুম—আমি আই-এ পড় পড়তে আমার বিয়ে হয় কিনা। ওঁর বিদ্যে জানেন?' ঊনিশটিবার ম্যাট্রিকে ঘায়েল হয়ে থামল শেষে।" বলিতে বলি আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিতে

যা-ও-বা সামান্য ছিল, আমার গ্রামের কাজে শেষ হয়ে গেছে। অবশ্য সে এমন কাজ যে, ক্রোর টাকা রেখে গেলেও ফুরিয়ে যেত। অল্প ছিল, অল্পই গেছে।"

সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "ঐ যাঃ, তোমার জন্যে আর ক'খানা লুচি ভাজছিলুম, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল এতক্ষণে। তুমি একটু বোস বাবা, আমি খাবারটা নিয়ে আসি। আচ্ছা, সত্যি বলো ত, তোমার কি আজ দুপুরে ভাত খাওয়া হয়েছে?"

সুমন্ত্র বলিল, "হয়নি বটে, তবে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আপনি কিছু ভাববেন না।"

সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "দ্যাখো দিকি, দেড়টা বাজে। যাই, তোমার নাম করে করেছি, ও ক'খানা তুমি না খেলে বড্ড মন কেমন করবে। তুমি দু'মিনিট বোস।" বলিতে বলিতে তিনি দ্রুত চলিয়া গেলেন।

সুদেষ্ণা বলিল, "বুনলুম সরষে, হল তিল, ফলল রুদ্রাক্ষ, খেলাম কিল।"

সুমন্ত্র হাসিয়া বলিল, "তার মানে?"

"মানে আর কি রেখেছেন? দেখে মনে হল পাত্রপক্ষ, দাঁড়াল ভাড়াটে, কথা কইতে গেলেন সাতপুরুষের কুটুম; এখন মা'র যে রকম বাৎসল্য রসের বান ডেকেছে, তাতে আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে আপনাকে না পোষ্যপুত্তুর নিয়ে বসেন! আমার রোমান্সটা মাঝ থেকে মাঠে মারা গেল। যাই, এখন ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। আপনার জন্যে মা লুচি ভাজছে, দেখি তাতে ভাগ বসাতে পারি কিনা।"

সুমন্ত্র বলিল, "আপনি সত্যিই খেতে পারেন, আমার"—

"পাইস হোটেল আছে, কি বলুন? যত্ন করছেন, নিতে দোষ কি? আমায় কেউ যতটুকু যত্ন করলে আমি তার কেনা গোলাম হয়ে থাকি।"

সুমন্ত্র বলিল, "আমিও থাকতুম, শুধু তাঁর নয়, তাঁর মেয়েরও; কিন্তু যেখানে স্নেহের সঙ্গে গরীবের প্রতি ধনীর দয়া মেশানো থাকে, সেখানে সেই স্নেহের প্রতি লোভ করলে নিজের কাছে ছোট হয়ে যেতে হয় সুদেষ্ণা দেবী!"

সুদেষ্ণা বলিল, "এটা আপনার ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের ফল। আপনাকে দয়া আমরা করিনি। আপনার দারিদ্র্য স্বেচ্ছাকৃত,—দয়ার পাত্র আপনি নন। আর ধনীমাত্রেই খারাপ লোক না-ও হতে পারে; হয়তো সকলে কিছু করবার সুযোগ পায় না—সুমন্ত্র বাবু, কিন্তু মহতের বড়ত্বটুকু বোঝবার শক্তি অন্তত তাদের মধ্যে কারো কারো থাকতে পারে।"

সুদেষ্ণা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যে সুকল্যাণী দেবী একখানি বিরাট কাঁসার থালায় খানকুড়ি ফুলকো লুচি এবং কতকগুলি আলু ভাজা ও বেগুন ভাজা লইয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "তাড়াতাড়িতে আর কিছু হল না; তুমি ঘরের ছেলে, কিছু মনে করবে না জানি।"

সুমন্ত্র বলিল, "আমি কি রাক্ষোশ! এ কি করেছেন? এই একটু আগে এক পেট খেয়ে—"

সুকল্যাণী বলিলেন, "করতে আর সময় পেলুম কোথায় বাবা? বেলা দুটো বাজে, এখনও ভাত খাওনি; এ ক'খানা খুব খেতে পারবে।" অগত্যা সুমন্ত্র থালাখানা নিঃশেষ করিয়াই ফেলিল। হাত-মুখ ধুইয়া সে সুকল্যাণী দেবীর পদধূলি লইয়া বলিল, "তাহলে বাড়ি ভাড়া দেবেন না?"

সুকল্যাণী বলিলেন, "তুমি বলছ তোমার বন্ধুর জন্যে, তাই টাকাটা হাত পেতে নিচ্ছি। তোমার টাকা হলে নিতুম না। যাই হোক, তুমি কিন্তু আসবে মাঝে মাঝে।"

সুমন্ত্র ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "সে আসিবে।"

"তাহলে একটা রসিদ নিয়ে নিতে বলি?"

"তার জন্যে তাড়াতাড়ি কি, তিনি এসেই নেবেন। আপনি কেবল চাবিটা দিন। কাল সকালে তাকে নিয়ে এসে হয়তো গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ে যেতে হবে। বাড়িটাও ধুইয়ে-মুছিয়ে সাফ করিয়ে দিয়ে যাব।"

সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "সে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি কাল সমস্ত নিজে দাঁড়িয়ে সাফ করিয়েছি। তাহলে এক কাজ করো না? কাল তো রবিবার আছে, তোমরা দুজনেই না-হয় এখানে খাবে?"

সুমন্ত্র বলিল, "সে কখন এসে পৌঁছবে তার তো ঠিক নেই, তারপর তার কি কেনা-কাটা আছে, তাতে কতক্ষণ লাগে কে জানে? শূন্যহস্তে তো বাড়ি থেকে চলে এসেছে। আপনি কোন ব্যবস্থা রাখবেন না। কেন অকারণ নষ্ট হবে?"

সুকল্যাণী বলিলেন, "কয়েকখানা তক্তপোষ ও-বাড়িতে আছে, শুধু বিছানা আনলেই চলবে। কি জানি বাছা, আমার কেমন ভালো লাগছে না। তুমি তো বাড়ি না দেখেই ভাড়া নিচ্ছ, শেষে যদি তাঁর পছন্দ না হয়।",

"না হলে আমি নিজেই নেব, আপনি ভাববেন না" বলিয়া সুমন্ত্র বাহির হইয়া গেল। সুকল্যাণী দেবী বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে।"

সেদিন সারা বৈকালটা সুমন্ত্র বাড়ির বাহির হইল না। বহুদিনপরে হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল, বাড়িটা বড়োই নোংরা হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল সুমন্ত্র চাকর রাখে না, নিজের হাতেই বাড়ির কাজ সমস্ত করে। এ কয়দিন সারাদিন পথে পথে ঘোরায় বাড়িতে সে বাসিঝাঁট দিবার সময় পায় নাই। একতলার বাহিরের ঘর দুইখানি ভাড়া খাটিত, তাহা ছাড়া নীচে দুইখানি এবং উপরে তিনখানি ঘর ছিল। প্রায় ঘণ্টা চারেক পরিশ্রম করিয়া সে উপরতলাটা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া সাফ করিল। তারপর দোতলায় যে ঘরটিতে সে পড়াশুনা করিত, তাহার মেঝেতে সতরঞ্চের উপর একখানা ফরসা চাদর বিছাইয়া, ফুলদানীটাকে মাজিয়া চকচকে করিয়া নিজে স্নান করিয়া কয়েকদিন পরে আরসির আলমারিটার সামনে দাঁড়াইয়া দাড়ি কামাইতে কামাইতে গান ধরিল "লক্ষ্মী যখন আসবে—তখন কোথায় তারে দিবিরে ঠাঁই?"

এমন সময়ে বাহিরের দরজায় কড়া নড়িল "খট খট খট।" কে? ভদ্রেশ্বর আসিল নাকি? মোটরের শব্দ শোনা গেল 'ভঁপ, ভঁঅ-অ-অ-প।' সুমন্ত্র জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, একখানা প্রকাণ্ড বি-রঙের মোটর তাহারই দরজায় দাঁড়াইয়া আছে, ভিতর হইতে একটি মেয়ের শাড়ির আঁচলের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। কি বিপদ? সুদেষ্ণাদের কি মোটর আছে? তাহলে হাঁটিয়া কলেজে যায় কেন? আর কেহ আসিল না তো? এখন উপায়? দাড়ির একটা দিকও তখন পুরা চাঁছা হয় নাই। এ অবস্থায় ভদ্রমহিলার—তা তিনি যিনিই হউন না কেন; তাঁহার—সম্মুখে যাওয়া যায় কি করিয়া। অথচ তাহার দাড়ি কামাইতে বেশ একটু দেরিই হয়; বিশেষ করিয়া দিনের আলো কমিয়া আসিতেছে; এখন বিশেষ সাবধানে কামানো প্রয়োজন; ততক্ষণ ভদ্রমহিলাকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখাটা কি উচিত হইবে? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সুমন্ত্র প্রথমে তাহার দাড়ি কামাইবার—ক্ষুর, সাবান, শেভিং ব্রাস—সমস্তই মেঝেয় বিছানো ফরাসের তলায় গুঁজিয়া দিল, কারণ ধুইয়া মুছিয়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিবার সময় ছিল না। তারপর বুদ্ধি করিয়া একটা বড় রুমাল লইয়া দাড়ি ও গালে ঢাকা দিয়া মাথায় জড়াইয়া বাঁধিল। তারপর পাঞ্জাবীটা গায়ে গলাইতে গলাইতে চটি পায়ে দিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

দ্বার খুলিতেই উর্দিপরিহিত শোফার সেলাম দিল; বলিল, "মেমসা'ব আয়ী হ্যায়।"

সুমন্ত্র একটা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস রোধ করিয়া হাসিমুখে অপ্রত্যাশিত অতিথি মিসেস কুণ্ডুকে সম্বর্ধনা জানাইল এবং পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া গেল। মিসেস কুণ্ডুর সঙ্গে প্রথম দিনের পরিচয়ের প্রথম দিকটায় সে তাঁহার যে স্বাভাবিক রূপ দেখিয়াছিল, পতি-বিয়োগসম্ভাবনাব্যাকুলা সতী-হৃদয়ের যে অকৃত্রিম সৌন্দর্য সেদিন সহসা তাহার চোখে পড়িয়াছিল, আজ খানিকটা নৈশ্চিন্ত্য ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে রূপ অন্তর্হিত হইয়াছে; লিপস্টিক, ক্রীম, পেন্ট, পাউডার

তিনি হেসে বললেন, 'বেশ, তাই উঠো; তবে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙো না। তুমিও জেনে যাবে, আমিও [illegible]লে যাব তাহলে।

সুকল্যাণী দেবী হাসিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সেই মাসিমা, বাবা।"

"সে আমি বুঝেছি" বলিয়া সুমন্ত্র নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধুলো লইল। তিনি তাহার মাথায় হাত রাখিয়া মনে-মনে কি যেন আশীর্বাদ করিলেন, তারপর বলিলেন, "কিন্তু তোমার তো খুব মনে থাকে। তোমরা যখন ওখান থেকে চ'লে এলে তখন তো তোমার পাঁচ বছরও পূর্ণ হয়নি! তার বছরখানেক পরে আমার মেয়ে হ'ল; তখনও তোমার মা'র সঙ্গে আমার চিঠিপত্র চ'লত। কি সুন্দর কবিতা লিখতেন তিনি—আর কি অদ্ভুত সেবা ক'রতে পারতেন লোকের বিপদে-আপদে! এত বয়েস হ'ল, কিন্তু তোমার মায়ের মতো অমন লক্ষ্মীপ্রতিমা বুদ্ধিমতী মেয়ে আমি আর জীবনে দেখলুম না। হ্যাঁ, যা বলছিলুম, তাঁকেই লিখি, আমার মেয়ের একটা নাম ঠিক করে দিতে। তাতে তিনি লিখলেন, 'সুকল্যাণীর মেয়ে সুদর্শনাই হোক।' তাতে আমি ঠাট্টা করে লিখি, 'দেখা হ'লে তো নাম ধরে ডাকতে পারবেন না, তখন কি বলবেন? 'কুদর্শনা' না 'নিদর্শনা'? যাই হোক মেয়ের আমার সেই নামই ছিল বছর তিনেক। তারপর উনি নিজেই নিজের নামকরণ করলেন। সুদর্শনা উচ্চারণ করতে পারত না, ব'লত 'সুদেষ্ণা'। তখন ওর বাবা বললেন, 'এই নামটাই বা মন্দ কি? ও স্বনামধন্যাই হোক। আসলে ওর নাম কিন্তু তোমার মায়েরই দেওয়া বাবা।"

সুমন্ত্র নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বাবা, একটু বোসো।" সকলেই বাহিরের ঘরে বসিলেন। সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "সেই চিঠির মধ্যে তোমার মা কিন্তু আর একটি কথা লিখেছিলেন।"

সুমন্ত্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইল, তিনি বলিলেন, "লিখেছিলেন, 'আমার ছেলে যদি কখনও মানুষ হয় তাহ'লে আপনার মেয়েটিকে আমি নে'ব। সুকল্যাণী দেবী স্থির দৃষ্টিতে সুমন্ত্রর দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুমন্ত্র কাতরভাবে বলিল, "কিন্তু আমি তো মানুষের মতো মানুষ হ'তে পারিনি মাসিমা!"

"তুমি কি করছ এখন?"

"কিছু না, সম্পূর্ণ বেকার। পাশ ক'রে দিনকতক ওকালতি করি। সুবিধে হ'ল না। তারপর একটা খবরের কাগজের সহসম্পাদক হ'য়েছিলুম কিছুদিন। কর্তৃপক্ষের অন্যায় হুকুম না মানতে পারায় চাকরী ছাড়তে হ'ল। তারপর এক মার্চেণ্ট অফিসে ঢুকি। সেখানে আমার ওপরওয়ালা সাহেব একদিন মদ খেয়ে এসে একজন বেহারাকে মুখ খারাপ ক'রে গালাগাল দিচ্ছিল, আমি বারণ করাতে আমার দিকে তেড়ে এল; ব'ললে, 'ইউ সন্ অফ্ এ বীচ্, হাউ ডেয়ার ইউ!' আমি বেশী কিছু না বলে একটি মোক্ষম ঘুষি মারলুম তার নাকে, তারপর সোজা বাড়ি চ'লে এলুম। ভেবেছিলুম পুলিশ কেস ক'রবে, কিছু ক'রলে না। এক মাসের মাইনে পাওনা ছিল, বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে বেয়ারা দিয়ে।"

সুকল্যাণী এবং সুদেষ্ণা উভয়েই মনোযোগের সহিত শুনছিলেন। সুদেষ্ণা মৃদু হাসিল, "বলিল, মোটে একটা ঘুষি?" সুকল্যাণী বলিলেন, "তা' যা'ই বলো বাছা, কাজটা ভালো হয়নি। অন্যায় দেখলে ব'লবে বই কি, তবে মুখোমুখি যা' হচ্ছিস হচ্ছিল, হাতাহাতি করাটা অন্যায় হয়েছে। ধরো সায়েব, রাজার জাত, যদি জেল দিত?"

সুমন্ত্র বলিল, "সে দেয়নি, তবে পরে অন্য লোকে দিয়েছে। লবণ আইন অমান্য ক'রে এবং আইন অমান্য আন্দোলন ক'রে বারকয়েক রাজবাড়িতে ঘুরে এসেছি। গ্রামে গ্রামে অর্ধাহারে অনাহারেও কাটিয়েছি কয়েক বছর—

সুকল্যাণী বলিলেন, "বোলো না, বাবা, বোলো না। শুনলেও কষ্ট হয়। আহা, মায়ের কত যত্নের ছেলে!" সুমন্ত্র বলিয়া চলিল, "গ্রামেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ক'রতে আরম্ভ করি পুঁথিপড়া বিদ্যে নিয়ে। তারপর ক্রমে নানারকমে শরীর খারাপ হয়ে প'ড়ল; তা'ছাড়া রোগীদের শুধু বিনা পয়সায় ওষুধ দিলেই চ'লত না, পথ্যও দিতে হ'ত, সেই পথ্যের পয়সাও শেষে আর জুগিয়ে উঠতে পারলুম না। তখন অগত্যা কলকাতায় ফিরে ইন্সিওরেন্সের দালালি করি কিছুদিন। বড্ড খোসামোদ ক'রতে হয়, পেরে উঠলুম না। কয়েকদিন হ'ল সে কাজটাও গেছে। সম্প্রতি আমি বেকার।"

সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "তুমি যে দুর্ভাগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তা' নাহ'লে এ বয়সে অমন বাপ মা হারাবে কেন? তবে যেটুকু শুনলুম তাতে অমানুষের কাজ কোনোটা করেছ ব'লে মনে হ'ল না।"

এমন সময় একটি বৃদ্ধ ভৃত্যশ্রেণীর লোক তামাক খাইতে খাইতে আসিয়া বৈঠকখানার দরজায় দাঁড়াইল। সুমন্ত্রর দিকে চাহিয়া তাহার কি মনে হইল কে জানে, হুঁকাটি দরজার চৌকাঠে ঠেস দিয়া রাখিয়া ঠিক তাহার সামনে মেঝের উপর দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার পর উবু হইয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, "বাবুর বাড়ি কুনানো?"

সুমন্ত্র বলিল, "কলকাতাতেই।" "ঠিক অইসে। বাবুর নাম?" "সুমন্ত্র সেন।" "ঠিক অইসে।" তাহার পর দরজা হইতে হুঁ[illegible] কলিকা আনিয়া তামাকে আর এক টান দি[illegible] বলিল, "অয়, অউ জামাইয়ই ঠিক অইলে[illegible] কইইন্যার লগে মানাইব।" তারপর এক[illegible] সুখটান দিয়া মন্তব্য করিল, "বাবুর মু[illegible] বেমন সান্দর লাখান। তবে বয়স অই[illegible] আমার থনি থুরা বরোই অইব।"

সুকল্যাণী বলিলেন, "বাড়ির কাজ সম[illegible] পড়ে আছে, তুমি যাও দিকি এখন। এখা[illegible] ব'সে টিপ্পনি কাটতে হবে না।" সুমন্ত্[illegible] দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমাদের চাকর-[illegible] উদাসী। সিলেটে থাকতে আমাদের বাড়ি[illegible] ঢোকে, বহুকাল আছে। এখন উনিই আমাদে[illegible] গতি। মনিব, বামুন, ঝি—সবাইকেই [illegible] কথা শুনে চলতে হয়।"

উদাসী বলিল, "অয়, আমি ওইলা[illegible] কইন্যা কহর্তা। মা'রে অত করি কইই[illegible] যে, একটা লগ্‌গুণ দিলাও, তা দিল ন[illegible] আয়, তা' আমি অন্যায় কইলাম কি তা? এ[illegible] আমারে কিতা দিবায় কও?

সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, 'তুমি যাও বাপু এখান থেকে।"

সুদেষ্ণা বলিল, "উদাসী দাদা, তো[illegible] বিয়ের গল্পটা বলব?"

উদাসী বলিল, "কইবা কও? পু[illegible] বরো পুহাজি!"

সুদেষ্ণা বলিল, "বন্ধুর বিয়েতে কন্যে[illegible] হলে বাজনা চাই। ওর এক বন্ধু ছিল, [illegible] মত গরীব। সে একটা কাঁসি চেয়ে এনে[illegible] কার বাড়ি থেকে, ওকে বলেছিল, "অ[illegible] বিয়েতে তুই বাজনা বাজা, তোর বি[illegible] আমি বাজাব। সে টোপর মাথায় দিয়ে [illegible] গেছে, আর ও-বেচারী তার পেছন [illegible] কাঁসি পিটতে পিটতে গেছে সারা [illegible] আশায় আশায়। তার দু'বছর পরে ওর [illegible] ঠিক হল, আর ঠিক সেই সময় ওর [illegible] হল কলেরা। ওর বিয়েতে বাজনা আর হল[illegible]

উদাসী উষ্ণ হইয়া কহিল, "আমার [illegible] অইল কিতা? হে হালা মারয়া [illegible] ঠকহাইল, আমার অপহরাদ ওইল [illegible] সে গজ গজ করিতে করিতে উঠিয়া গেল, [illegible] হাসিয়া উঠিলেন।

হাসি থামিলে সুকল্যাণী দেবী ব[illegible] "কিন্তু তোমার বাবার তো শেষ দিকে[illegible] ভালো প্র্যাক্টিস হয়েছিল শুনেছিলুম, [illegible] তো অর্থ-কষ্ট হবার কথা নয় বাবা।"

সুমন্ত্র বলিল, "হ্যাঁ, তা হয়েছিল। মা মারা যাবার পর তিনি ওকালতি দিয়েছিলেন একরকম। শেষ দিকটা জমানো টাকা ভেঙে খরচ হয়েছে। বোনের বিয়ে দিতে হয়েছে, দান-ধ্যান[illegible] খুব। কিছুই প্রায় রেখে যেতে পারে[illegible]



(বড় গল্প)

[৪]

'কত রাজারাজড়ার বাড়ি থেকে সম্বন্ধ এসেছে; আমাদেরই পাত্র পছন্দ হয়নি লে দিতে পারিনি। আপনার যদি পছন্দ না য়ে থাকে তবে আপনি যেতে পারেন। বাড়ি ভাড়া নিতে হবে না।"

সুমন্ত্র বুঝিল ভদ্রমহিলা মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছেন। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "আপনি আমাকে ল বুঝবেন না। আমি বড়ো গরীব, আপনাদের ঙ্গে আমার অবস্থার তুলনা হয় না, আপনার য়েকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অন্যায় হবে লই আমি সে প্রস্তাবে রাজি হইনি। টিশিপের কথা আমি বলি নি"—

সুকল্যাণী দেবী নরম হইয়া বলিলেন, না, আপনার দোষ নেই, আমার মেয়েই াছে। ভারি ওটা বেহায়া হচ্ছে দিন দিন, ওর া ওকে আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটি খেয়ে ছন। হ্যাঁ, তা আপনি নাকি উড়ে-স্পর্শ- ষের কথা কি বলেছিলেন? তা দেখুন, ওসব কলে লোকেরা বাছতেন। আপনারা শিক্ষিত লরাও যদি ঐসব ছোটো কথা নিয়ে মাথা ান তাহলে কি চলে? আজকাল মেয়েরা ীন হয়েছে, পথে-ঘাটে ঘোরাফেরা করতে ন মাঝে মাঝে লোকের গায়ে গা ঠেকে যায় কি?"

"না, না, সে নিয়ে তো আমি কিছুই বলি আপনার মেয়ে বোধ হয় আপনার সঙ্গে করেছেন। আসলে আমার একটা বড়ো হয়ে গেছে। বাড়ি ভাড়া নিতে এসে বার ভুলে আমি এ-বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। নি প্রথমটা যখন আমাকে প্রশ্ন করতে ভ করলেন, তখনই আমার একটু সন্দেহ । তারপর আর পেছোবার পথ লুম না"—

সুকল্যাণী বলিলেন, "তবে যে সুদেষ্ণা বিজ্ঞাপন দেখে এসেছেন? আমরা তো ভাড়ার বিজ্ঞাপন দিইনি।"

সুমন্ত্র বলিল, "ওটা আমার বলবার ভুল হয়েছে। পাড়ায় খবর পেলুম—ভাবলুম হয়তো বিজ্ঞাপন দিয়েছেন?"

এইবার সুকল্যাণী দেবী অনুচ্চকণ্ঠে হাসিলেন; বলিলেন, "তা যা হবার হয়েছে, কিন্তু এত কথাবার্তার পর ও-বাড়িতে থাকা কি আপনার উচিত হবে?"

সুমন্ত্র বলিল, "আমি তো থাকব না, আমার একটি বন্ধু থাকবেন।"

সুকল্যাণী প্রশ্ন করিলেন, "তিনি কি করেন?"

"কিছু করেন না, বড়লোক। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, তাই কিছুদিন নির্জন বাস করবেন।"

সুকল্যাণী বলিলেন, "কোন গোলমাল নেই তো ভেতরে? সত্যি কথা বলতে কি, ঐসব অপদার্থ বড়লোকের চেয়ে আমার গরীব পাত্রই পছন্দ। তাছাড়া, জীবনে অনেক কিছু দেখলুম কিনা! আমার এক সইয়ের দক্ষিণপাড়ায় বিয়ে হয়েছে রাজবাড়িতে। হীরে-মুক্তোয় জড়ে আছে, দাসী-চাকরের অন্ত নেই; কেবল স্বামী রাত্রে বাড়ি থাকেন না, চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে বাইরে যান। তবে স্ত্রীর হাতের রান্না তাঁর বড়ো পছন্দ। একা খেয়ে তৃপ্তি হয় না, তাই স্ত্রীকে টিফিন-কেরিয়ারে পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে দিয়ে দিতে হয়; —শুধু তাঁর জন্যে নয়—তাঁর উপসর্গটির জন্যেও!"

একটু থামিয়া সুকল্যাণী দেবী আবার বলিলেন, "সুদেষ্ণার বাবা যখন তার খাবার-পরবার ভাবনা রেখে যাননি, তখন কী দরকার আমার বড়লোকে? আমি ওকে গরীবই চলেই মনস্থ করেছি। আমি চাই একটি সদ্বংশের শিক্ষিত ছেলে, যে আমার মেয়ের মূল্য বুঝবে, তাকে অনাদর করবে না। আচ্ছা, আপনার বাবার নাম কি ছিল বলুন তো? কি করতেন তিনি? দেশ কোথায় বললেন যেন?

সুমন্ত্র বলিল, "আমার বাবার নাম সুদর্শন সেন। তিনি কিছুদিন বহরমপুরে কলেজে প্রফেসারী করেছিলেন, তারপর কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেছেন। আমাদের দেশ বর্ধমান, সেখানে কিছু জমি-জায়গা আছে, তবে আদায়-পত্র হয় না। বাবা কলকাতায় একটা ছোট বাড়ি রেখে গেছেন।"

সুকল্যাণী দেবী দরজার আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, "তুমি বহরমপুরের সুদর্শনবাবুর ছেলে? তোমার নাম মণ্টু? বহরমপুরে তোমাদের পাশের বাড়ির সবজজবাবুদের কথা মনে পড়ে?"

সুমন্ত্র বলিল, "খুব পড়ে। মাঝখানে একটা পাঁচিল ছিল, একটা পেয়ারা গাছের ডাল তার ওপর দিয়ে ও-বাড়ি থেকে এ-বাড়িতে এসে পড়েছিল। আমরা সেই ডাল ধরে ঝুলে ঝুলে গাছে উঠতুম পেয়ারা খেতে। একবার আমরা সাতজন ছিলুম, গাছে উঠতেই মড়মড় করে ডাল ভেঙে পড়ল। কে কোথায় পালাল, অন্য ডালে বা পাঁচিলে লাফিয়ে উঠে বেঁচে গেল, আমি ঝুপ করে পড়ে গেলুম নীচে মালীর সামনেই। মালী এই মারে-তো এই মারে, টানতে টানতে নিয়ে গেল বাবুর কাছে। ভদ্রলোক খুব লম্বা-চওড়া, সুন্দর চেহারা; আমাদের বাড়িতে বাবার কাছে মাঝে মাঝে দেখেছি তাঁকে। তাঁর স্ত্রী তো রোজ দুপুরে আমাদের বাড়ি আসতেন মা'র কাছে, আমরা তাঁকে 'সবজজ মাসিমা' বলতুম। ভদ্রলোক আমাকে দেখে গম্ভীর মুখ করে বললেন—'পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে কি হয়?' আমি বললুম, 'চুরি করা হয়।' তিনি বলিলেন, 'তুমি চোর? তুমি না সুদর্শনবাবুর ছেলে?' আমি বললুম, 'এতো আমার মাসিমার বাড়ি। মাসিমা কি পর?' তিনি বললেন, 'তাহলে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে রান্নাঘরে যাওনা কেন, তোমার মাসিমা কত কি খেতে দিতে পারেন?' আমি বললুম, পাঁচিল ডিঙিয়ে উঠতে খুব মজা লাগে।'

চিত্তকে অপূর্ব আনন্দ দেয়। কিন্তু তার পর তিনি যে উপমাটি দিয়েছেন তাতে বুঝতে পারি দুঃখের যথার্থ মূল্য তিনি কিছুতেই দিতে পারলেন না।

কিন্তু সাধকদের কাছে দুঃখের মূল্যটুকু না ধরা পড়ে যায় নি। তাঁরা বুঝলেন দুঃখের মধ্যে যতই তাপ, যতই জ্বালা থাক না কেন, সেই তাপ বিনা তো জীবনের দীপ্তি পাওয়াই যাবে না। এই তাপটুকুর ভয়ে যদি জ্বলতে সাহস না পাই তবে চিরদিন অন্ধকারেই জীবন কাটিয়ে যেতে হবে। জীবনের মহৈশ্বর্যের কোনো খবরই পাব না। আর তা হলেই কি মৃত্যুকে এড়াতে পারবো? লাভের মধ্যেও তো মরতেই হবে অথচ এই জীবনের মহিমাটুকুর সন্ধান না পেয়েই চলে যেতে হবে। কথাটা বুঝতে যদি একটু কঠিন হয় তবে কোনো মহাকবির শরণ নিলে আমাদের সুবিধে হ'তে পারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কণিকা গ্রন্থের ছোট্ট ছোট্ট খুব সহজ দুই একটি কবিতার মধ্যে এই রহস্যের চমৎকার সমাধান দিয়েছেন। "প্রতাপের তাপ" নামে একটি ছোট্ট কবিতা উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি—

ভিজা কাঠ অশ্রুজলে ভাবে রাত্রি দিবা,
জ্বলন্ত কাঠের আহা দীপ্তি তেজ কিবা।
অন্ধকার কোণে পড়ে মরে ঈর্ষা রোগে,
বলে, আমি হেন জ্যোতি পাব কি সুযোগে।
জ্বলন্ত অঙ্গার বলে কাঁচা কাঠ ওগো,
চেষ্টাহীন বাসনায় বৃথা তুমি ভোগো।
আমরা পেয়েছি যাহা মরিয়া পুড়িয়া,
তোমারি কি হাতে তাহা আসিবে উড়িয়া?
ভিজা কাঠ বলে—বাবা, কে মরে আগুনে।
জ্বলন্ত অঙ্গার বলে—তবে থাক ঘুণে।

বাইবেলে একটি চমৎকার কথা আছে। (St. John 15-2 Hebrews 12.5-11) মালীর ফলের-ফুলের বাগান। যে গাছগুলিতে সে ফুল-ফল হবার আশা রাখে সেগুলিকে সে রোজ ছাঁটে কাটে, যে গুলিতে কোনো আশা নেই সেগুলিতে সে হাতও দেয় না। যে সব গাছ মালীর হাতে দুঃখ পায় না তারা হয়তো মনে করতে পারে আমরাই ভাগ্যবান, ঐ হতভাগা গাছগুলোই দুঃখে দুঃখে ম'রলো। কিন্তু হায় যখন ফুল ফলের মরশুম দেখা গেল তখন দুঃখ পাওয়া গাছগুলি আপনাদের সার্থকতায় হোলো ধন্য, আর দুঃখ না পাওয়া গাছগুলিকে উপড়ে মালী দিল পুড়িয়ে।

কণিকার মধ্যে কতকটা এই ভাবেরই একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের আছে। সেটাও এখানে বলবার লোভটা সংবরণ করতে পাচ্ছিনে। কবিতাটির নাম "অকর্মার বিভ্রাট"

লাঙ্গল কাঁদিয়ে বলে ছাড়ি দিয়ে গলা,—
তুই কোথা হতে এলি ওরে ভাই ফলা।
যেদিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি'
সেই দিন হতে মোর এত ঘোরাঘুরি।
ফলা কহে—ভালো ভাই, আমি যাই খসে,
দেখি তুমি কি আরামে থাক ঘরে বসে।
ফলাখানা টুটে গেল, হালখানা তাই
খুসি হয়ে পড়ে থাকে, কোনো কর্ম নাই।
চাষা বলে এ আপদ কেন আর রাখা,
এরে আজ চালা করে' ধরাইব আখা।
হাল বলে—ওরে ফলা, আয় ভাই ধেয়ে
খাটুনি যে ভালো ছিল জ্বলুনির চেয়ে।

ঐতরেয় আরণ্যকের ঋষি মহীদাস ছেলেবেলা থেকে বড় দুঃখ পেয়েছেন। দুঃখের মহিমার সন্ধান তাই তিনি পেয়েছিলেন। তিনি বল্লেন—দুঃখে দুঃখে হও হয়রান তবেই তোমার শ্রী তোমার কাছে হবে দীপ্ত—'

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি।

এই যে সূর্যের এত মহিমা তার মূলে রয়েছে তার দিবারাত্রি অশ্রান্তভাবে জ্বলতে জ্বলতে নিরন্তর এগিয়ে চলা। এই দুঃখের মহারাতে তার এক মুহূর্ত তন্দ্রা বা শৈথিল্য নেই।

সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্।

উপনিষদের ঋষিরাও এই রহস্যটুকুর সন্ধান জানতেন। যজুর্বেদের এক বৃহদারণ্যক উপনিষৎ থেকেই দেখান যাক। ঋষি বল্লেন, আদিতে ছিল জল, ক্রমে হোলো ভূমি, সেইখানে শ্রান্ত তপ্ত হয়ে যে তেজ-রস নিঃসৃত হোলো তাই তো অগ্নি—দুঃখের সৃষ্টি হোলো অগ্নি ও তার দীপ্তি

তস্য শ্রান্তস্য তেজো রসো নিরবর্ততাগ্নিঃ॥
১, ২, ২

এই বিশ্ব জগৎ ছিল তিমিরে আচ্ছন্ন। পুড়ে থাক না হলে তো আলো নেই। কে দেবে তার মধ্যে আলোক? "অগ্নি বল্লে আমি জ্বলতে রাজি আছি।"

জ্বলিষ্যামেবাহম্ ইত্যগ্নি র্দধ্রে।

তার আগুনের দীপ্তিতে তিমির উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

তাপে পুড়ে যেতে আমি রাজি আছি বলতেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আদিত্য।

তপ্স্যামাহমিত্যাদিত্যঃ। ঐ ১, ৫, ২২

মৃত্যুকে, মৃত্যুর দুঃখ-জ্বালাকে অতিক্রম করবার সাহস পেয়েছে বলেই এই সূর্য এই রূপে দীপ্যমান—

অসাবাদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তস্তপতি॥
ঐ, ১, ৩, ১৪

আদিত্য আপনাকে শ্রান্ত ও তপ্ত করলেন। অমনি তার মধ্য হ'তে যশ ও বীর্য উৎপন্ন হোলো—

স তপোহতপ্যত তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য যশোবীর্যম্ উদক্রামৎ॥ ঐ ১, ২, ৬

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে এই একই কথা আরও জোরের সঙ্গে অতি সোজা-সুজিভাবে বলা হয়েছে। আদিতে সৃষ্টি ছিল না, তখন কর্তার মনে ইচ্ছা হোলো বিচিত্র কি হয়ে আমি প্রকাশিত যেন হই—

সোহকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি।
১, ২,

তখন দেখলেন ইচ্ছার সঙ্গে দুঃখ তপস্যাও থাকা চাই, তাই তখন তিনি করলে তপস্যা। তপস্যার দুঃখের মধ্য দিয়ে হোলো এই সৃষ্টি। যা কিছু সবই সেই দুঃখ তপস্যার ফল।

স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজ যদিদং কিঞ্চ। ঐ

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনি সেখানে দেখতে পাই প্রজাপতি কঠিন তপ করলেন। তার ফলস্বরূপ যে রস উচ্ছ্বসি হয়ে উঠলো তাতেই পৃথিবীতে দীপ্ত হোলো জ্যোতির্ময় অগ্নি ও অন্তরীক্ষে আ দীপ্যমান হয়ে উঠলো। অন্তরীক্ষ লোকে—

প্রজাপতি র্লোকানভ্যতপৎ তেষাং তপ্যমানানাং রস প্রাবৃহৎ অগ্নিং পৃথিব্যা আদিত্যং দিবঃ॥
ছান্দোগ্য, ৪, ১৭

অগ্নির দ্বারা পিহিত অগ্নিময় তপ ফলে এই সৃষ্টি, এই জ্যোতির সাক্ষাৎক যজুর্বেদের কৃষ্ণশাখার অন্তর্গত উপনিষৎ বলেন—

য এব তপতি অগ্নিরিবা গ্নিনা পিহিতঃ।

সব সৃষ্টির মূলেই এই দুঃখকে বরণ নেবার প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তাও এই তপ দুঃখটুকু এড়াতে চান নি। এই দু স্বীকার না করলে তিনি কোথায় পেতেন এই ঐশ্বর্য? কোথায় পেতেন তাঁর এই ব্যাপ্তি? কোথায় পেতেন তাঁর এই ম সাধককেও জ্বলতে জ্বলতে চলতে হবে তাঁরই পথে, তখন তিনিও জ্বলতে জ পাবেন সবচেয়ে মহত্তম বিভূতি—

এষ এব জ্বলন্ এষ হি ব্যাপ্ততমঃ।
এষ এব জ্বলন্ এষ হ্যোবোৎকৃষ্টঃ।
এতদ্ এব জ্বলন্ এতদ্ধি মহাবিভূতিঃ।
নৃ, উ, তাপ

জ্বলতে জ্বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ বিধাতার সঙ্গীত তার নামই সৃষ্টিধারা—

জ্বলতি স উদগীথঃ। ছান্দোগ্য, ২,

বিধাতার মত সাধকও হবেন দুঃখের জ্বলতে জ্বলতে পূর্ণ, জ্বলতে জ্বলে থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে সৃষ্টির ধারা, তার সর্বপ্রাণ হয়ে যাবে দুঃখে সঙ্গীতময়, সেই দুঃখের আলোকেই তি উঠবেন সংদীপ্ত। তিনি তখন এই ঐশ্বর্যে হবেন বিভু, তিনি তখন সেই হবেন প্রভু, তিনি হবেন দুঃখের জ্যোতির্ময়। ঋষির ভাষাতে তাঁকে সম্বোধন করে ব'লবো—

জ্বলদসি, পূর্ণমসি, উদ্গীথমসি, উদ্গী
সংদীপ্তমসি, বিভূরসি, প্রভূরসি, জ্যোতির
ব, আরণ্যক,

দুঃখের চিন্ময় আলোক

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

মা|নুষ বড় অদ্ভুত জীব। ছোট ছোট খুচরো হিসাবের দিকে তার মনো-গের অন্ত নেই, অথচ বড় বড় হিসাবের সময় একেবারে অন্ধ। একদিকে একটি পয়সার সাব মেলাতে সে প্রাণপাত পর্যন্ত করবে থচ অন্য দিকে হয়তো তার সর্বস্ব ভেসে লে, তার খবরও সে রাখলো না। খুব বড় বড় সংবাদীর কথাতেও বলা যায়, এরা সব

কড়ায় কড়া কাহনে কানা—

যাকে ইংরেজিতে বলে Penny-wise und-foolish.

ভক্ত রামপ্রসাদের কপালে জুটেছিল তহবিলে বার চাকরী! তখন মনের দুঃখে তিনি ছিলেন—

মন রে কৃষি কাজ জাননা।
এমন মানব জমীন রৈলো পতিত
আবাদ কল্লে ফলতো সোণা।

মানবজীবনের সেই অপরিসীম সম্পদের ন পেয়েই এই সংসারী তহবিলদারী ছেড়ে ন সেই আধ্যাত্মিক তহবিলদারী চেয়েছিলেন। তাঁর গান—

আমায় দেমা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শংকরী।

আমরা সংসারী মানুষ, আমাদের সাংসারিক ধর উপর আমাদের আস্থার আর অন্ত অথচ নিজেদের জীবনের কত ক্ষেত্রের কত যে আমরা উপেক্ষায় উপেক্ষায় প্রতি র্তে ক্রমাগতই হারিয়েচি ও এখনও হারাচ্ছি খবর কি আমরা রাখি? আমাদের মধ্যে সম্ভাবনা ঘুমিয়ে আছে। সেই সব বনাকে জাগাতে না পারলে তার ঐশ্বর্যের াণই করা অসম্ভব। যতক্ষণ সে নিদ্রিত, ণ সে সব সম্ভাবনার মধ্যে কোন শক্তিও কাঠের মধ্যে যে আগুন আছে, যতক্ষণ আগুন ঘুমিয়ে আছে, ততক্ষণ তার কি-ই ল্য, কি-ই বা শক্তি; কিন্তু যেই ঘর্ষণে সেই আগুন জ্বলে উঠল, তখন তার আর অন্ত নেই। প্রকাণ্ড অরণ্যকে সে একেবারে নিঃশেষে ফুঁকে দিতে পারে। র দ্বারা উপলব্ধি না হলে এই শক্তি ও নেই।

মানুষের মধ্যেও অনেক শক্তি ঘুমিয়ে পড়ে আছে। দুঃখের ঘর্ষণ পেলে অকস্মাৎ ভিতরের এই ঘুমন্ত শক্তির মহিমা দেখে আমরাই অবাক হয়ে যাই।

সাধক বাউল মদন ছিলেন এই রহস্যের পাকা সমঝদার। তাই তিনি গেয়েছেন—

আগুনেতে জ্বলে রে আগুন মূল আগুন
কোন খানে।
তোরই মাঝে আছে রে আগুন
জ্বলে দুখের ঘসানে রে বান্দা দুখের ঘসানে
লুকান আগুন আছে বান্দা বাহির যদি রে হয়
তবে কৈ বা ভিতর কৈ বা বাহির সকল বেড়া ভস্মময়।
রে বান্দা বেড়া ভস্মময়।

কাজেই দুঃখের ঘর্ষণে আমাদের ভিতরের আগুন যখন জ্বলে, তখন শুধু যে সব অন্ধকারই ঘুচে যায় তা নয়, তখন যত সংকীর্ণ মানুষের হাতগড়া সব সীমার বেড়া পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দুঃখে, বেদনাতে মানুষের যত ভেদ দূর করে. এত আর কিছুতে নয়। এ তো হ'লো সাংসারিক অভিজ্ঞতার কথা। সাধনার রাজ্যেও ঐ একই কথা।

তাই সাধনার্থীকে তাঁর প্রথম উপদেশ হ'ল এই,—

আগুন মাঝে পোড় রে বান্দা খাক হ'য়ে আগে।

তাঁর আশীর্বাদও অদ্ভুত।

(তোর) দুখে দুখে জ্বলুক রে আগুন
পরাণ ফাইট্যা আঁধার কাইট্যা বাইরোক রে আগুন।

জ্বলে উঠলে এই আগুনে পরাণ ফাটবে বটে, কিন্তু এই আগুন না জ্বলে উঠলে কিছুতেই ভিতর বাহিরের সব আঁধার কাটবে না।

এ তো হ'লো নিরক্ষর সাধকের কথা। বড় বড় দর্শনেরও সেই একই কথা, সুখ-দুঃখের একই রহস্য। তাই আমরা ভারতীয় দর্শনে দেখি—

অনুকূলবেদনীয়ং সুখম্।
প্রতিকূলবেদনীয়ং দুঃখম্॥
(তর্কসংগ্রহ, ৫৩)

অর্থাৎ সুখ পেলে আমরা তা পছন্দ করি বলে বার বার তা পেতে চাই, আর তা ছাড়তে চাই না। তাই আমরা ঐ একই জায়গায় বন্দী হয়ে থাকি, এগুতে পারি না। যাকে ইংরেজিতে বলে "Static"। আর দুঃখ হলে আমরা তা চাই এড়াতে, কাজেই সব শক্তি দিয়ে আমরা চাই তাকে ছাড়িয়ে যেতে। এই চলাটাই হ'লো "Dynamic." পাশ্চাত্য দর্শনের মতেও এই একই কথা।

সাধনার রাজ্যে Staticটাই হোলো বন্ধন। Dynamicটাই মুক্তি। দুঃখ, বেদনা না হ'লে আমাদের অন্তরের সেই বিরাট ঐশ্বর্যের সন্ধানই আমরা পাই না। দুঃখের আঘাতে এগিয়ে চল্‌তে চল্‌তে আমরা মনুষ্যত্বের বিরাট মহিমা ও ঐশ্বর্য আবিষ্কার করি।

হাজার হাজার বছর পূর্বে বেদের যুগে ঋষিরাও এই নিগূঢ় মহাসত্যটি জানতেন।

তাই ঋষি শ্রুতি বলছেন—

প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা প্রাণং দেবা উপাসতে।
অথর্ব ১১, ৬, ১১

প্রাণ অর্থাৎ যা সব কিছুকে এগিয়ে নিয়ে যায় তার সংগে মৃত্যুর ও দুঃখ জ্বালার কোনো বিরোধ নেই। সেই প্রাণের বিরাট ক্রন্দনই ধ্বনিত হচ্ছে মানবের সদা-অগ্রসর ইতিহাসে।

নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়।
অথর্ব, ১১, ৬, ২

সেই প্রাণই সর্বজীবকে নিয়ে যাচ্ছেন চালিত করে—

যো ভূতঃ সর্বস্য ঈশ্বরঃ॥ অথর্ব ১১, ৬, ১

ভিতরের এই সাধনার খবর ভাল করে জানেন সাধকেরা। দেখা গেছে দার্শনিক বা সাহিত্যিকেরা সব সময় তা ভাল করে বুঝতে পারেন নি। সংস্কৃত অলংকারের বিখ্যাত গ্রন্থ হোলো সাহিত্যদর্পণ। সাহিত্যদর্পণরচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রথমটাতে তো দুঃখের যথার্থ মর্যাদাটাই বুঝলেন না, তিনি বলেন, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভ করতে হোলে নীরস বেদাদি শাস্ত্র পড়তে ও তার সাধনা করতে হবে। পরিণতবুদ্ধি না হ'লে সেই সাধনা অসম্ভব। আর দুঃখ বিনা এই সাধনা অসম্ভব।

চতুর্বর্গপ্রাপ্তি র্হি বেদশাস্ত্রেভ্যো নীরসতয়া দুঃখাদেব পরিণতবুদ্ধিনামেব জায়তে।
(প্রথম পরিচ্ছেদ)

এ একেবারে সংসারী লোকের মত কথা। সাহিত্যিকের মত কথা তো নয়। কিন্তু তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি সেই ত্রুটি অনেকটা সেরে নিয়েছেন। তিনি বলেন, "বুদ্ধিমান লোক তো আপনার দুঃখ চায় না।"

নহি কশ্চিৎ সচেতন আত্মনো দুঃখায় প্রবর্ততে।

অথচ করুণ রস পড়তে গিয়ে চোখের জল ফেলে আমরা অপরিসীম তৃপ্তি পাই। রামের বনবাস প্রভৃতি পড়তে মনে কত না দুঃখই হয়। কিন্তু কাব্যে নাট্যে

বনবাসাদয়ো লোকে দুঃখকারণানি। ত এব হি কাব্যনাট্য সমর্পিতা,.........

হয়ে অপূর্ব হয়ে ওঠে,
এই দুঃখও অলৌকিক কবিত্ব শক্তিবলে

প্রসাদী ফুল

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

(২)

ভাব-সন্ধি

বয়ঃসন্ধি যেরূপ, ভাব-সন্ধিও সেইরূপ নিগূঢ় বিষয়। বয়ঃসন্ধি অনেক পরিমাণে বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ, কিন্তু ভাব-সন্ধিকে বুঝিতে হইলে অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে।

যাঁহারা নদী কিম্বা বড় খালে জোয়ার ভাঁটার খেলা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বয়ঃসন্ধি ও ভাবসন্ধির প্রণালী বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ। পূর্ণ জোয়ারের পরে যখন ভাঁটা আরম্ভ হয়, তখন দুই আনা আন্দাজ ভাঁটা সরিয়া গেলেও উপরের জল ফিরে না। নদীর তটের দিকে চাহিয়া দেখ, জল অনেকটা কমিয়াছে, কিন্তু তখনও স্রোত ফিরে নাই, জোয়ারে যে দিকে যাইতেছিল, সেই দিকেই জলের টান রহিয়াছে; ইহার পরে জল গতিহীন হইয়া স্তব্ধ ভাব অবলম্বন করিবে, পূর্ব্ববঙ্গের মাঝিরা ইহাকে "দুমদুড়ি" বলে, কালিদাসের ভাষায় ইহাকে "ন যযৌ ন তস্থৌ" বলা যাইতে পারে। এই দুমদুড়ির পরে যখন জলের গতি হয়, তখনই ভাঁটার টান পড়ে, অর্থাৎ স্রোত বিপরীত দিকে বহিতে থাকে। জোয়ারের পরে যেমন দুমদুড়ি হয়, ভাঁটার পূর্ণাবস্থায় ঠিক সেইরূপই হইয়া থাকে, জোয়ার আরম্ভ হইয়া যখন দুই আনা পরিমাণ জলবৃদ্ধি হয়, তখনও উপরের জলের টান ফিরে না, দুমদুড়ি হইয়া যখন স্রোত ফিরে, তখন নদীর কিনারার দিকে চাহিয়া দেখিবে, জল অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে, অনেক পূর্ব্বে জোয়ার আসিয়াছে, কিন্তু উপরের স্রোত ফিরে নাই। জোয়ার ভাঁটার এইরূপ লীলা খেলার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, বয়ঃসন্ধি ও ভাবসন্ধির লীলাখেলাও এইরূপই।

লোকেরা সচরাচর যাহাকে পূর্ণ কৈশোর বলে, তখন তাহাতে দুই আনা যৌবন প্রবেশ করিয়াছে। ভিতরে ভিতরে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বাহিরের আকৃতিতে তখনও উহা ধরা পড়ে নাই। এই অবস্থার বর্ণনা করিতে যাইয়াই সূক্ষ্মদর্শী বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন, "কৈশোর যৌবন দুহুঁ মেলি দুহুঁ দলবলে ধনী দ্বন্দে পড়ি গেল।" যৌবন তখনো বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু নয়নের চাহনীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, লজ্জা সরম আসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে "কভু উঘারয় অঙ্গ কভু খোলে গাত।" কিন্তু ভাঁটা যেমন জোয়ারকে সহজে স্বীকার করিতে চাহে না, সেইরূপ, কৈশোরও আপনার পূর্ণাধিকার অস্বীকার করিতে চাহে না, যৌবনের যে ভাবটুকু আসিয়া পড়িয়াছে, সে টুকুকে আপনার অধিকারের মধ্যে মিলাইয়া লইতে চাহে। ভাব-সন্ধির বেলায় যখন পুরাতন ভাবের মধ্যে নূতন ভাব আসিয়া পড়ে, তখন পুরাতন নূতনকে সহজে স্বীকার করে না, একটা বেজায় দোটানার মধ্যে পড়িয়া নূতনের আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া উহাকে আপনার মধ্যে সামলাইয়া লইতে চায়। কিন্তু নূতন যখন পূর্ণজোরে বানের জোয়ারের মত আসিয়া পড়ে, তখন পুরাতন সম্পূর্ণরূপে তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করে। তখন আর দোটানা ভাব থাকে না, সুতরাং বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

হরিরাম নীতিকেই পূর্ণ ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু সৎকার্য্যকে অকপটভাবে জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া গ্রহণ করায় ক্রমে ক্রমে তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকিবে এবং চিত্তের নির্ম্মলতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাতে পারলৌকিক বিশ্বাস ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটা আভাস আসিয়া পড়িবে। হরিরাম সহজে সে বিশ্বাসকে আমল দিতে চাহিবে না, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহার ধর্ম্মকথা শুনিতে ভাল লাগিবে, তীর্থ পর্য্যটনে আনন্দ হইবে, সাধুসঙ্গের লালসা জন্মিবে। হরিরামকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন, "ওসব কিছু নয়, ঐরূপ নানাপ্রকার সৎকথা শ্রবণ, নানাদেশ ভ্রমণ ও সাধুদিগের সঙ্গ করিলে মানসিক বল বৃদ্ধি পায় এবং নৈতিক জীবন উন্নত হয়, সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, এই জন্যই ঐ সকলের দরকার, বস্তুত নীতির ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" হরিরাম বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি ভাব-সন্ধিতে পড়িয়াছেন, তাঁহার জীবন-নদে নূতন ভাবের জোয়ার আসিয়াছে। কিছুদিন পরে দেখিবে, হরিরাম পূজাপাঠ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তাঁহার কর্ম্ম করিবার অবসর বড়ই কম, জিজ্ঞাসু হইয়া তিনি বলিবেন "ওহে প্রীতি না হইলে কি প্রিয় কার্য্য হয়? শুধু সুগৃহিণী হইলে কি হইবে? পতিপ্রাণা হওয়া চাই।" এই সময় হরিরামের হৃদয়-নদীতে পূর্ণবেগে ধর্ম্মের জোয়ার আসিয়াছে, এখন আর নীতিবাদের সঙ্গে মিলাইয়া ধর্ম্মকার্য্যগুলির অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না, এখন পূর্ণ জোয়ারের পূর্ণ যৌবন।

এইরূপে এক একটি স্তর অতিক্রম করিয়া অন্য স্তরে প্রবেশ করিবার সময় এক একটি ভাব-সন্ধিকে অতিক্রম করিতে হইবে, এক একটি দুমদুড়ির ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। দ্বিতীয় স্তরকে যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে হইয়াছিল, অন্য স্রোত আসিয়া পড়ায় ক্রমে ক্রমে সে বিশ্বাস লইয়া তেমন গোঁড়ামী করা চলিবে না, এই সময় সমস্ত সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে কারণ ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া তাঁহারই পূজায় প্রবৃত্তি জন্মিবে, এবং এখানেও প্রথম প্রথম উভয়কে মিলাইবার জন্য, একটি যে কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে। এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতে মানুষ আপনার ধর্ম্মমতকে অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া প্রচার করিতে চায় অধিকাংশ মনুষ্যের চরিত্রের মধ্যেই এইভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, কেহই ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। পুরাতন বস্তু, যাহাকে শত সাধনে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে একান্ত শত্রুর ন্যায় উপেক্ষা করা মানব-হৃদয়ের স্বধর্ম্ম নহে, তাই পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িলে তাহাকে যথাসাধ্য পুরাতনের ঘরে আশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা করা মানবের স্বধর্ম্ম।

এই ভাব-সন্ধির তাৎপর্য্য যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারা ধর্ম্মের বিকাশকে ধর্ম্মের বিকার বলিয়া মনে করে, তাহারা পরিবর্ত্তনের মধ্যে বিকাশের ক্রম দেখিতে পায় না।

মতান্তর ও মনান্তর

একই ধর্ম্মের যদি বিভিন্ন স্তর, তবে বিভিন্ন স্তরের সাধকদিগের মধ্যে মতান্তর ও মনান্তর ঘটে কেন? ইহার উত্তর আছে। গোমুখীতে গঙ্গা অতিশয় অপ্রশস্তা একটি খরস্রোত মাত্র, উভয় পার্শ্বের শিলাখণ্ড সকল সরাইয়া নির্জ্জন পথে অভ্রভেদী পর্ব্বত-শৃঙ্গের মধ্য দিয়া প্রকাণ্ড অজগরের ন্যায় অবিরাম তীব্র গতিতে নিম্নদিকে ছুটিয়াছে। সেই গঙ্গা, প্রয়াগের সমতলভূমিতে আসিয়া উভয় পার্শ্বস্থ ক্ষেত্ররাজিকে শ্যামল শস্যে পরিশোভিত করিয়া সুপ্রশস্ত প্রবাহিনীরূপে আপনার সৌন্দর্য্য-প্রভায় আপনি মুগ্ধ হইয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে। গোমুখীর চঞ্চল

বালিকা প্রয়াগে যৌবন-শ্রী ধারণ করিয়া, আপনার আবেগ আপনাতে সম্বরণ পূর্বক মৃদুমন্দভাবে চলিয়াছে। কলিকাতায় আবার ভিন্ন শ্রী; এখানে অতুল ঐশ্বর্যের মুকুট মাথায় পরিয়া, ঘোরতর সংসার কোলাহলের মধ্য দিয়া রাজরাজেশ্বরীরূপে সাগরসঙ্গমে ছুটিয়াছে। গোমুখী হইতে সাগরসংগম পর্যন্ত একই স্রোত, কিন্তু বাহ্যলক্ষণ কিরূপ বিসদৃশ! কোথাও অত্যুন্নত পর্বত শ্রেণী, কোথাও শ্যামল সমতল ক্ষেত্র, কোথাও জনকোলাহলপূর্ণ মহানগরী, কোথাও শ্বাপদাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যের মধ্য দিয়া এই স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। কোথাও ঋজু, কোথাও কুটিল, কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও প্রশস্তভাবে বিভিন্ন অভিমুখে ইহার গতি হইয়াছে। কোন এক ব্যক্তিকে গোমুখীতে গঙ্গা দেখাইয়া যদি প্রয়াগে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সে কখনও বুঝিতে পারিবে না যে, এই সকল স্থানেই সেই একই নদী। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি গোমুখীর স্রোতে অবগাহন করিয়া বরাবর সেই স্রোতেই ভাসিয়া ডুবিয়া আইসে, তবে বাহ্যিক সহস্র পরিবর্তনের মধ্যেও তাহার কখনও সন্দেহ হইবে না যে, এই সমস্ত একই স্রোত কি না? সেই প্রকার মানুষ যতদিন ধর্মরাজ্যে তর্কের শুষ্ক পথে চলে, বাহিরের কতকগুলি পার্থক্য, কতকগুলি মতামতের বিভিন্নতা দেখিয়া সে মনে করে, এই সকল ধর্মই ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু যখন অন্তর নিহিত একটি নিগূঢ় ভাব-স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিতে পারে, তখন সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এক আশ্চর্য সামঞ্জস্য দেখিতে পায়, সমস্ত বিবাদের একই মিলনে পরিণতি হয়। তখন মত লইয়া সম্প্রদায় হয় না এবং অলক্ষ্য সাংসারিকতা-মিশ্রিত স্বদলবদ্ধ সংকীর্ণ ভাব লইয়া প্রেম আর গণ্ডীর মধ্যে থাকে না। হৃদয় এমন একটি উদার ভূমি প্রাপ্ত হয় যে, সকল সম্প্রদায়, সকল দলকেই সেখানে সযত্নে বসাইতে পারে। আমার মত যে বিশ্বাস করে না, সে সুবোধ নহে এবং আমার আচরণের ন্যায় যে আচরণ করে না সে ধার্মিক নহে, এরূপ দূষিত-জ্ঞান তখন বিদূরিত হয়। যে সাধক সাধনার পথে চলিয়া নীতি হইতে স্তর পরম্পরা অতিক্রম করিয়া লীলার স্তরে উপস্থিত হন, তিনি নীতি, ধর্ম ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগ ইহার কাহাকেও অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিতে পারেন না, যৌবন যেমন বাল্য কৈশোরকে অস্বীকার করিতে পারে না, বৃক্ষের পুষ্প ও ফল যেমন কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখাকে উপেক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ পঞ্চম স্তরের সাধকগণও নিম্নস্তরগুলিকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারেন না, পরন্তু ঐ সকল স্তরই তাঁহার উচ্চতম সাধনার ভিত্তি, ইহা সর্বদা মনে রাখিয়া অধিকারীভেদে ঐ সকল স্তরের উপযোগী সাধকদিগকে তাহাদের অবলম্বিত পথে চলিতে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন।

কিন্তু যাঁহারা সাধন পথে না চলিয়া কেবল বিতর্ক ও বিচার দ্বারা ধর্মমত গ্রহণ করেন, তাঁহারা শুধু আপনার মতটিকেই একমাত্র ধর্ম সাধনের উপায় বলিয়া বুঝেন এবং তাহার উপরে কিম্বা নীচে যাহা কিছু আছে, সে সকলকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করেন। কেহ বলেন, নীতিই সর্বোচ্চ ধর্ম, অন্য সকল কুড়েমী ও কুসংস্কার মাত্র; কেহ বলেন সাকারের উপাসনা হয় না; কেহ বলেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না; কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্ম কিছু নহে; কেহ বলেন, যোগী কিছু নহে; কেহ বলেন, লীলা কুসংস্কারের ও ভ্রান্তিদর্শনের ফল; আবার কেহ বা বলেন, লীলা ভিন্ন আর কিছু কিছুই নহে ও সবগুলি নিম্নাধিকারীর জন্য, এইরূপ যত মতান্তর ও মনান্তর, সে সকলই বাহিরের বিচার বুদ্ধিরই ফল।

সাধকদিগের মধ্যেও যে মতান্তর না ঘটে, তাহা নহে। যিনি যে স্তরের সাধক, সেই স্তরই তাঁহার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। এ বিষয় ভক্তি-বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ লেখক কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"যার যেই ভাব তার সেই সর্বোত্তম,
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর তম।"

তটস্থ হইয়া বিচার করিলে ভাবের মধ্যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্টতর ও উৎকৃষ্টতম ভাব আছে, কিন্তু যিনি যে ভাবের অধিকারী, তাঁহার পক্ষে সেই ভাবই "সর্বোত্তম।" বস্তুত যিনি যে ভাব সাধন করেন, সেই ভাবকে "সর্বোত্তম" জ্ঞান না করিলে তাঁহার সেই সাধনের প্রতি পূর্ণশ্রদ্ধা হয় না, সুতরাং তাহাতে তাঁহার সিদ্ধিলাভও হয় না, কিন্তু তিনি যদি আপনার সাধন পথকেই একমাত্র পন্থা মনে করেন, তবেই গোঁড়ামী আসিয়া পড়ে এবং অন্য মতাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ জন্মে, সুতরাং মতান্তরে মনান্তর উপস্থিত হয়। হিন্দুশাস্ত্র, অধিকারীভেদের কথা বলিয়া ধর্মসাধকদিগকে ধর্মবিদ্বেষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব নিজে এই পঞ্চ স্তরের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সমস্ত স্তরগুলির একটির পর একটি সাধন করিয়া প্রত্যেক স্তরে আপনার অসাধারণ তপস্যার ফল প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার বাল্যের নীতি, কৈশোরের ধর্মচর্যা, যৌবনের ব্রহ্মজ্ঞান, প্রৌঢ়ের যোগসাধন এবং শেষজীবনের লীলারস প্রত্যেক স্তরের সাধকের জন্য আদর্শ হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার সমস্ত জীবনে সমস্ত ভাবেরই সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সে জীবনে ব্যাকুলাত্মা সাধক যাহা চাহিবেন, তাহাই পাইবেন। তিনি পাঁচটি বাগান হইতে পাঁচ রকমের পাঁচটি ফুল কুড়াইয়া আনিয়া একটি পাঁচফুলের তোড়া গঠন করেন নাই, সমস্ত ফুলগুলিই তাঁহার হৃদয়-ভূমিতে সাধন-সলিল-সিঞ্চনে সত্যের বীজ হইতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে ধর্ম-বিদ্বেষের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

ভাব-স্থিতি।

মতান্তরের আর একটা কারণ "ভাব-স্থিতি।" শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।"

সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কদাচিৎ কোন এক ব্যক্তি সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করে, সেইরূপ, যত্নসিদ্ধ লোকদিগের মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে।

বস্তুত সাধকদিগের মধ্যেও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি উচ্চতম অবস্থা (১) লাভ করেন, অধিকাংশ সাধকই কোন না কোন স্তরে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন। কেহ নীতিতে, কেহ ধর্ম কর্মে, কেহ ব্রহ্মজ্ঞানে ও কেহ যোগে অবস্থিতি করেন, কদাচিৎ কোন ব্যক্তি লীলা ভোগের অধিকারী হন।

যিনি যে স্তরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন, সেই স্তরের অধিকারিগণ তাঁহার অনুগত হইয়া থাকে। সুতরাং সকল স্তরের মহাত্মাদিগেরই অসংখ্য চেলা জুটিয়া যায়, কেননা লোকের রুচি বিভিন্ন। সকল স্তরের প্রতিষ্ঠার জন্যই শাস্ত্র ও মহাপুরুষের প্রয়োজন। যে দেশে বা যে জাতির মধ্যে যে ভাব প্রচারিত হওয়া আবশ্যক, সেই দেশবাসিগণ কিম্বা সেই জাতীয় লোকেরা সেইভাবে আকৃষ্ট হইয়া কোন শাস্ত্র বা কোন মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া এক একটি স্বতন্ত্র ধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। যেমন প্রধানত নীতি লইয়া বৌদ্ধ ধর্ম, একেশ্বরবাদ লইয়া ইহুদী ও মুসলমান ধর্ম, অবতার বাদ লইয়া খ্রীষ্টধর্ম এবং সকল প্রকার ভাব লইয়া হিন্দু ধর্ম। (২)

"ভাবস্থিতি" কাহাকে বলে? যে সাধক যেভাবে অধিককাল অবস্থিতি করেন অথবা ইহজীবনের শেষকাল পর্যন্ত তিনি যেভাব ধরিয়া থাকেন, উহাই তাহার ভাবস্থিতির অবস্থা। যাঁহার যে স্তরে ভাবস্থিতি হয়, সেই

---

(১) ভগবানের অনন্তলীলা, ধর্মেরও অনন্ত স্তর আছে, তবে ইহলোকে সাধক জীবনে তাহার যে সর্বোচ্চ প্রকাশ দেখা যায়, তাহাকেই "উচ্চতম অবস্থা" বলা হইল।

(২) বস্তুত 'হিন্দুধর্ম' নামে কোন ধর্ম নাই, এমন কি, প্রাচীন গ্রন্থে 'হিন্দু জাতি' বলিয়া কোন জাতিরও উল্লেখ নাই। বর্তমানে হিন্দু বলিতে যাহাদিগকে বুঝায়, তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল ধর্ম মত প্রচলিত আছে এ স্থানে সেই সকলেরই নামই হিন্দুধর্ম বলা হইল। ভারতীয় আর্য জাতি ধর্মকে ধর্মই বলিতেন, উহা বিশ্বজনীন ধর্ম।

স্তরকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, উহা অপেক্ষা উচ্চতর কোন স্তরের কথা তিনি বুঝিতে পারেন না, সুতরাং উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। এজন্য কখন কখন প্রকৃত সাধকে সাধকেও মতান্তর ঘটে। সকলকেই যে ইহজীবনে প্রথম স্তর হইতে পঞ্চম স্তরে যাইতে হইবে, এরূপ নহে, কদাচিৎ কোন ব্যক্তির জীবনে সেরূপ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু হয় জন্মজন্মান্তরে অথবা লোক-লোকান্তরে সকলেরই সকল অবস্থা লাভ হইবে। তখন সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, ইহজীবনে যাঁহারা এই তত্ত্বের আভাস পান তাঁহাদের মধ্যেও মতান্তরে মনান্তর ঘটে না।

এই প্রবন্ধে "ধর্ম জীবনের পঞ্চস্তরের" কথা বলিতে যাইয়া এই বিষয়ের সহিত যে যে বিষয়ের বা ভাবের সম্বন্ধ আছে, সেই সকল কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। পাঠকের মনে যে সকল মীমাংসার জন্য সংক্ষেপে যতটুকু ইঙ্গিত করা যায়, তাহাই করিতে চাহিয়াছি, এই জন্যই "বিচিত্রতায় বিরোধ নাই" "ভাবসন্ধি" "মতান্তর ও মনান্তর" "ভাবস্থিতি" প্রভৃতি, বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইয়াছে, উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং প্রচলিত ধর্মচিন্তা হইতে একটু ভিন্ন আকারের বস্তু, কাজেই আমাকে বিশেষ সংকোচ রাখিতে হইয়াছে। যদি কোন ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া থাকি, সে সমস্ত অপরাধই আমার, কেননা ব্যাখ্যার ভার আমিই গ্রহণ করিয়াছি।

(ক্রমশঃ)



আমার প্রেম

আর্নেস্ট টেম্পল থার্সটন

[গল্পটির লেখক—আর্নেস্ট টেম্পল থার্সটন, ইংরাজী কথা-সাহিত্যিক। গল্পটিতে মানব মনের চিরন্তন আবেগের দিকটিই অপরূপ শব্দ যোজনায় কাব্যময় হইয়া উঠিয়াছে।]

দূরের পাহাড় যখন আপনার চোখে নীলাভ বেগুনে রঙে দেয় দেখা, গাছের নীচে ছায়ার রঙ যখন আপনি ঘন-নীল লোহিত ব'লে মনে করেন—নিশ্চয়ই জানবেন আপনার চোখে লেগেছে রোমান্সের কাজল। কেন না পাহাড়ের ওপর উঠলে দেখবেন তার রঙ হয়তো সবুজ আর গাছের ছায়ার নীচ দিয়ে যাবার সময় হয়তো দেখতে পাবেন সেখানে সমস্তই চিরহরিৎ। রোমান্সের মজাই এই। তবে দেখার মত চোখ থাকা চাই। আর কারও জীবনে এমন কোনো ব্যাপার ঘটেছে, যা হয়তো আপনার নিজের জীবনে আনন্দ এনে দেবে।

মানুষের প্রাণে লাগে রঙ-এর পরশ কখনো কখনো। হয়ত আপনার প্রাণে লাগে নি এখনও, কিন্তু অন্য কারও প্রাণে তা' লেগেছে। আমি একবার সুন্দর একটি ছোট্ট রোমান্সের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কেননা আমি নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারিনি তার মধ্যে। আর তাছাড়া আমি ত ওসব বিষয়ে তেমন ওস্তাদও নই।

কোনও এক দোকানে কাজ করত সে ছোট্ট পাখীর মত মেয়েটি—সাদা কোমল মুখখানি আর সুন্দর দুটি ঠোঁট, স্পর্শমাত্রেই নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লাগে। আমার ত মনে হয় মেয়েদের ঠোঁটের সঙ্গে একমাত্র তুলনা হ'তে পারে গোলাপের পাপড়ির। তুলনাটা খুবই হয়ত চলতি তবু সত্যি।

তার ঠোঁট দুটি ছিলো ভোরের গোলাপের মতই, যার পাপড়িতে লেগে রয়েছে বিন্দু বিন্দু শিশির। আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে বসেছিলো সে। চাপা গলায় কত কি যে বললে আমায় তা আপনাদের বুঝিয়ে বলার মত ভাষা আমার কই? তার দেহবল্লরী আর তার পরনের স্কার্ট'ও সব যেন মৃদুস্বরে কথা বললে। বললে যেনঃ তোমার কি দরকার? হ্যাঁ, সে আমার জন্যে গোপনে অপেক্ষা করছিল কিনা। কখনো কখনো তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতাম। ব্যক্তিগত প্রশ্নের সাহায্যে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করতাম। আজ তার শরীর ভালো যাচ্ছে কিনা, কোন পোষাকে তাকে সবচেয়ে ভালো দেখায় ঠিক কল্পলোকের অপ্সরীর মত, কিংবা ছুটিতে কবে সে কোথায় বেড়াতে যবে এই সব পুরোনো অবান্তর অর্থহীন মামুলী যত সব প্রশ্ন। একটা অছিলায় একটু সুযোগ ক'রে নিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তায় মেতে যাওয়া ছিলো আমার মস্ত লোভ, খুঁজে বেড়াতাম তার মধ্যে সহজ কথায় যাকে বলে রোমান্স। মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে একটা সাড়াও যেন অনুভব করা যেত। বলি বলি ক'রেও অন্তরের অনেক গভীর কথাই না-বলা থেকে যায়।

সেদিন কিন্তু বেপরোয়া হ'য়ে মুখর হ'য়ে উঠিঃ আমার একখানা ফটোগ্রাফ দিতে চাই তোমাকে। বুঝলে?

আর একটু হ'লেই তার হাতের কাপ-প্লেটগুলি মাটিতে প'ড়ে গুঁড়ো হয়ে যেত। আমি ত অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ি। তবে কি কথাটা ঠিকভাবে বলা হোলো না? বোকার মত বললাম নাকি? আমার ঠিক এই কথাগুলি শোনার জন্যে সে প্রস্তুত ছিলো না এটা তো স্পষ্টই ধরা পড়লো।—আমি একবার একখানি ছবি তুলিয়েছিলুম আমার, বললে সে। নিজের ওপর বিশ্বাস যেন ফিরে পায় সে। কথাটা মিষ্টি আর স্পষ্ট ক'রে শোনাবার জন্যে টেবিলের ওপরে ঝুঁকে প'ড়ে এগিয়ে আসে সে। তার মিহি গলার স্বর মধুর হ'য়ে বেজে ওঠে আমার কানেঃ ছবিখানা তোলানো রাতের পোষাক প'রে। তবে উপস্থিত ত সেখানির কোনো কপি নেইকো আমার কাছে। সবশেষের যে কপিটা ছিলো তা'ও কাকা মারা যাবার পর কাকীকে দিয়ে দিয়েছি।

—কেন? ছবি দেখে তাঁর শোক কমেছিলো কিছু? পরিহাস-মাখা প্রশ্ন ক'রে বসি তাকে। অথচ কি বাজে প্রশ্নটা! কিন্তু আমি যে তাকে ভুলোতে চাই হাসিতামাসায়। কেবল ভাবছি নিজের কথা, রসিকতা করতে মন কেড়ে নিতে যে আমিও জানি সেইটাই ত নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দিতে চাই। কিন্তু আমাকে বোধ হয় পরাজয় স্বীকার করতে হোলো, আমার সে কৃতিত্বের অভিমান টি'কলো না। খানিকক্ষণ সে তার দুই স্বচ্ছ সুন্দর চোখ ভ'রে চেয়ে থাকে আমার দিকে, কি আলো আর আকর্ষণ তার ঐ দুটি ছোট চোখে, যেন কাঁচের তৈরী ঐ চোখ দুটি। আরো কাছে স'রে এসে ফিসফিস করে আবেগভরেঃ তা' জানিনে। তবে খুড়ো তার পনের দিন পরেই মারা গেলেন।

দেখুন আপনারা, রসিকতা আর হাসা পরিহাসের ক্ষমতায় মেয়েটি আমার ওপর যায় বোধ হয় সারা বছর ধ'রে হাসারস নিয়ে অভ্যাস বা চর্চা করলেও কি পারতাম আমি এর চেয়ে রসালো উত্তর জোগাতে? কাজেই এবার আমি গম্ভীরভাবে কিন্তু গভীর আবেগের সঙ্গেই বললামঃ সে যাক, আর একখানা ছবি তোলাবে আবার? অবিশ্যি তার খরচ দেবো আমি। তার ঠোঁটের ফাঁকে বিস্মিত আনন্দে উচ্ছ্বাস ঝলসে ওঠে, লুকিয়ে রাখতে।

পারে না। মধুর হেসে বললে সেঃ তাই নাকি? তা' হোলে তো ভালোই হয়!

—তা' হলে আমাকেও একখানা দিতে পারো আর তোমার সেই তাকেও—। রহস্যজনকভাবে থেমে যাই আমি কথা শেষ করার আগেই। রামধনুর মত ভ্রূ দুটো তার নেচে ওঠে যেন।

—কি ক'রে জানলে তুমি? তার মিনতিভরা প্রশ্ন।

—তোমার চোখে দেখেছি আমি তার ছায়া। তাইতেই ত তোমারই কাছে শুনতে চাই তার যত কথা। আমি কবিত্বে টলমল ক'রে উঠি।

—যাঃ, এখন আমার সময় নেই ওসব বাজে গল্প করার। ব'লে পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে। পিছনে তখন সাজিয়ে-রাখা কেকগুলির ওধারে ইঁদুর উঁকি মারছে। কেকগুলি কি সুন্দর আর রঙচঙে দেখতে!

মনে হলো সে আমাকে যেন সবকথা খুলে বলতেই চাচ্ছিল, ইচ্ছে আছে কিন্তু লজ্জাও রয়েছে সেই সঙ্গে। তাই আমি আদর ক'রে বললামঃ তা' হোলে কখন বলবে সে কথা?

—যাও, তুমি ভারি ইয়ে; আমি বলতে পারব না ওসব।

—আচ্ছা, আসছে রবিবার ছুটিতে কোথাও কি যাবে?

—কেন বলত! আমরা ত ঠিক করেছি সেদিন দুজনে এপিঙ-এ যাবো।

—তা' পরের রবিবারে গেলে হয় না?

—কি ক'রে হবে? তাকে যে রবিবারেও কাজে বেরোতে হয়।

—কেবল এই রবিবারেই তার ছুটি?

—হ্যাঁ। ছোট্ট উত্তর। আমার কিন্তু আরো ভালো লাগতে থাকে তাকে। তাই বক্তৃতা করার মতই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠিঃ বেশ, চলো তা' হলে কিউ-গার্ডেনে যাওয়া যাক। এখন ত সমস্ত বাগানটাই খুলে দেওয়া হয়েছে সাধারণের জন্যে। ব্লু-বেল ফুল দেখে যখন তোমার সাধ মিটবে তখন বোলো আমাকে তার কথা। ভুলো না যেন—বেলা তিনটের সময় চ্যারিংক্রশ টিউব ষ্টেশন থেকে—আর আসছে রবিবারে। তাকেও বোলে এসো যে, তুমি এখানে আসছো। তার কাছে কিছু লুকোবার দরকার নেই, বুঝেছো তো! আর সে যদি আমার সম্বন্ধে জানতে চায় ত তাকে পাঠিয়ে দেবো আমার ফটো। মনে রেখো, আসছে রবিবার বেলা তিনটে আর চারিংক্রশ—

ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে আসি, বেশ রঙ আর রসের সৃষ্টি করা গেছে তো! কথাগুলি কিন্তু একটু বেশী রঙীন আর স্বপ্নময় হ'য়ে উঠেছিলো যেন। তা' হোক্, একটু আধটু কবিত্ব না করলে চলে নাকি, নাটুকে না হলে

জীবনে আর কোনও রবিবারের আশাপথ চেয়ে এত উৎকণ্ঠা আর কৌতূহল বোধ করি নি। আর কোনো রবিবারের জন্যে এতো আক্ষেপ আর লজ্জাও পাই নি। তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট থাকতে হাজির হলুম সেখানে। ব্লু-বেল ফুলগুলি দেখা যাচ্ছে ঐ অদূরে। শুনতে পাচ্ছি সেই আমার ছোট পাখীর কথা ফুলের ঝোপের ভিতর থেকে। সবই তাদের কথা। কবে তাদের বিয়ে হচ্ছে, কোথায় গিয়ে তারা নতুন ঘর-সংসার পাতবে, এই সব। তারপর সে এগিয়ে আসে ভিলিয়ার্স ষ্ট্রীট ধ'রে। সে আর এখন তেমনটি নেই আগের মত। ভারী ভালো লাগে তার সাজগোজ আর তাকে। এখন তাকে দেখাচ্ছে যেন কাকাতুয়ার মত। মুখখানিতে পড়ন্ত আলো লেগে শিল্পীর গড়া-মূর্তির মত সুষমায় ভ'রে উঠেছে, মাথার চুলের গোছা ঢেকে রয়েছে বেগুনে রঙ-এর একটা হ্যাট, বেগুনে রঙের পালক দিয়ে সাজানো মস্ত বড় হ্যাটটা। তার এই রঙ যেন সারা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ফুলবীথির মাঝে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি আমি তাকে। কিন্তু আমার যেন ইচ্ছে করে তার কাছ থেকে দূরে স'রে যেতে, চলে যেতে, পালিয়ে যেতে।

সে চলেছে রাস্তা দিয়ে, যেন স্বর্গের ইন্দ্রাণী। এমনি অহঙ্কার ভরেই কি পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে চলেছিলো এ্যাণ্টনীর হাত ধরে কামনারাজ্যের রাণী ক্লিওপেট্রা? ভুলে যাই—মোহ, ভুলে যাই প্রেম, কোথায় রোমান্স? এমন একটা হ্যাটের সঙ্গে খাপ খাওয়াবো কোন্ পোষাকে? নিজের অনুভূতির জালে জড়িয়ে পড়ি আমি। বুঝি না, রোমান্স বলতে মেয়েটা কি তার ঐ মস্ত রঙীন হ্যাটটাকেই বোঝে তবে? একটা বইয়ের দোকানের পাশে আত্মগোপন করি তাকে আসতে দেখে। বিজয়িনীর মত আসছে সে, সেইখানটায় দাঁড়ায়, অপেক্ষা করে কতক্ষণ। পথ-চলা লোকজন তাকায় এক দৃষ্টিতে তার দিকে। তাদের চাহনি দেখে যেন সে আনন্দে উঠে হেসে। যেন সে সব কাহিনীই শুনিয়ে দেবে তাদের।

এবার আমি দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসি। ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়াই তারই পাশে। টুপিটা তুলে জিগ্যেস করি তাকেঃ তারপর, কেমন আছ? বেশ চমৎকার সেজেছো তো, বড় সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে ঠিক মনের মতন লাগছে তোমাকে। যাও, ছুটে গিয়ে টিকিটটা কেটে আনো আমি ততক্ষণ একখানা খবরের কাগজ কিনে নি। এই ব'লে একটা গিনি গুঁজে দিলাম তার হাতে।

আজও জানিনা, টিকিট নিয়ে সে কি করেছিলো! আজো জানিনা, ব্লু-বেল দেখতে সে একা একাই গিয়েছিল কিনা। কিন্তু এখনও চোখের ওপর ভেসে ওঠে সেই ছবিটি, ব্লু-বেল ফুলগুলি সমানভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার সেই লাবণ্য-ভরা মুখের দিকে।

অনুবাদক—শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

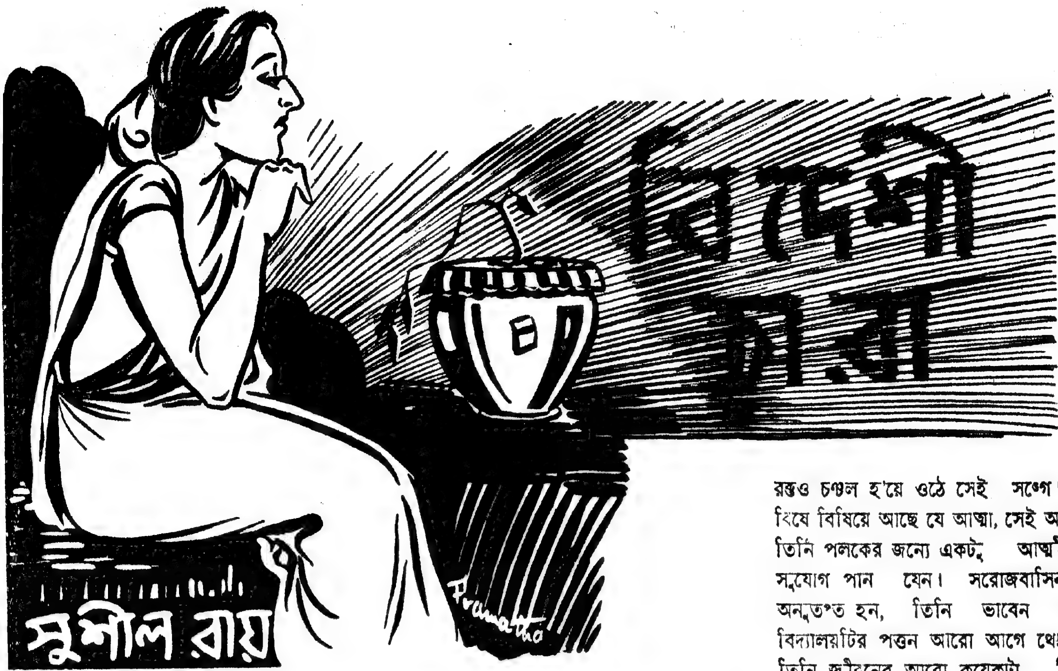
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট :: কলিকাতা।

ক্রমোন্নতির পরিচয়

	বৎসর	আদায়ী মূলধন		ডিপোজিট	
এপ্রিল (উদ্বোধন মাস)	১৯৪০	৩,০৯০০০,	ঊর্দ্ধে	১,০৫০,	ঊর্দ্ধে
ডিসেম্বর —	১৯৪০	৫,৭২,০০০,	"	৩,১৯,০০০,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪১	৮,১৮,০০০,	"	২৪,৮২,০০০,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪২	৯,৪৭,০০০,	"	৪০,০০,০০০,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪৩	১০,০০,০০০,	"	১,১০,০০,০০০,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪৪	১০,২০,১৭৫,	"	২,১৪,৬৯,২২৭,	"
ডিসেম্বর —	১৯৪৫	১০,৫৭,৬৫০,	"	৩,০৭,১১,৬৪০,	"

জাতীয় শিল্প ও ব্যবসার সমৃদ্ধিকল্পে প্রকৃত ব্যবসায়ীকে সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা দেওয়া হয়।

আলামোহন দাশ
চেয়ারম্যান



এর আগে সরোজবাসিনী দেবী অর্ডার দিয়ে ফ্রান্স থেকে একটি আইভি-লতা আনিয়েছিলেন। কিন্তু সে লতা তাঁর হাতে বাঁচলো না। মন প্রাণ দিয়ে তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন লতাটিকে বাঁচিয়ে রাখার। কিন্তু বিদেশী মাটি থেকে উপড়ে আনা লতাটা তাঁর বাগানের মাটির রস খেয়ে কেমন যেন হ'য়ে যেতে লাগলো। আইভি যেন হয়ে দাঁড়ালো হেলঞ্চা লতার মত অনেকটা। শেষে বেশ লতাটা কুঁকড়ে শুকিয়ে একদিন ম'রে গেলো। তারপর তিনি ওক গাছের চারা আনিয়েছেন একটা। তাঁর লাইব্রেরী ঘরের একটি পরিচ্ছন্ন কোণে তিনি সেটি পেতলের টবে ক'রে বসিয়ে রেখেছেন। ভূমধ্যসাগরের নোনতা বাতাস আর সুদূরে দেশের মাটির রস থেকে বঞ্চিত হ'য়ে, এ দেশের মাটিতে জলে আর বাতাসে ওক বিশেষ আপত্তি জানিয়েছে ব'লে সরোজবাসিনী দেবীর মনে হয় না। তিনি শিশু ওকের নিবিড় সান্নিধ্য পেয়ে আইভির শোক প্রায় ভুলে গেছেন।

রূপ আর গুণ দিয়ে গড়া সরোজবাসিনী দেবী। তাঁর রুচিও তাঁর রূপের আর গুণের সমান হ'য়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে। শ্বশুরের ঐশ্বর্য আগলে আগলেই সরোজবাসিনীর বয়স পঞ্চান্ন পার হ'য়ে গেলো। স্বামীর ঐশ্বর্য একে তিনি মনে করেন না। প্রকৃতপক্ষে তেমন মনে করার কোন যুক্তিই তিনি খুঁজে পান না। বিয়ের পরই তাঁর স্বামী গেলেন বিদেশে, সেখান থেকে তিনি আর ফিরলেন না। তিনি মারা গেলেন। বৈধব্য গ্রহণ করার রীতি একটা আছে। সরোজবাসিনীও গ্রহণ করলেন। সেই বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘাড়ে এসে পড়লো শ্বশুরের বিষয়-আসয় তদারক তদ্বির করার ভার। কেননা, শ্বশুরও চিরঞ্জীব নন্।

দাসী বাঁদী ঠাকুর আর চাকর—সরোজবাসিনীর এই হ'লো আবাল্য সহচর। বাগান-বাগিচা, পূজোমণ্ডপ, প্রাঙ্গণ সব মিলিয়ে তাঁর মনে একটি মরুভূমি তৈরী হ'য়ে রইলো। স্বামীর কথা একটু-আধটু কখনো মনে পড়লে তিনি জানলা দিয়ে তাকিয়ে সূর্যাস্ত দেখে নিজেকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করতেন। চোখের জলের সঙ্গে পরিচয় তাঁর তেমন নেই। কৈশোর আর যৌবন তিনি টেনে টুনে পার হ'য়ে এসে, এখন এই আধা বার্ধক্যের দোরগোড়া পর্যন্ত এসে একটু নিশ্চিন্ত হ'য়েছেন। এখন তিনি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন—কোন দুর্ভাবনা তাঁর আর নেই। এখন সরোজবাসিনী নামটাও তাঁকে মানায়। নামটা তাঁকে মানায় বটে, কিন্তু তাঁর এই বিরাট অট্টালিকাটি একেবারেই যেন বেমানান। সময় কাটানোর ও সেই সঙ্গে দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার জন্যে তিনি আশ-পাশের শিশুদের কুড়িয়ে কাচিয়ে লাইব্রেরী ঘরে একটা নৈশ বিদ্যালয়ের আয়োজন ক'রেছেন। এই বিদ্যালয়টি তাঁর জীবনের এক পরম সান্ত্বনার সামিল। এখানে তিনি শিশুদের পড়াবার চেয়ে তাদের সঙ্গে খেলাই করেন বেশী।

শিশুদের কল-কোলাহলে তাঁর নিষ্প্রাণ প্রাসাদটি হাজার বছরের স্বপ্নের ভেতর থেকে যেন নিমেষের জন্যে গা মোচড় দিয়ে জেগে ওঠে। সরোজবাসিনীর শরীরের মধ্যে চাপা রক্তও চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সেই সঙ্গে। বাসনার বিষে বিষিয়ে আছে যে আত্মা, সেই আত্মার সঙ্গে তিনি পলকের জন্যে একটু আত্মীয়তা করার সুযোগ পান যেন। সরোজবাসিনী দেবী অনুতপ্ত হন, তিনি ভাবেন এই নৈশ বিদ্যালয়টির পত্তন আরো আগে থেকে করলে তিনি জীবনের আরো কয়েকটা দিন সার্থক ক'রে তুলতে হয়ত বা পারতেন।

বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস বড় একটা হয় না, তবুও এটা চাই। এটা তাঁর বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে এখন। শিশু সঙ্গ না হলে সরোজবাসিনীর মন এই বিরাট অট্টালিকার মতই খাঁ খাঁ ক'রে ওঠে।

বাসনার আকর্ষণ একটা আছে। চাওয়ার মতো চাইতে জানলে পাওয়া অবশ্যই যায়। সরোজবাসিনী দেবী এই বৃদ্ধ বয়সে একটি শিশু পেলেন।

ছেলেটার নাম রামু। রামুর বাপের নাম হারাধন, জাতে সে কৈবর্ত। হারাধন কৈবর্ত সরোজবাসিনীর বাগানের মালির জ্ঞাতি ভাই। লোকটা নাম করা লম্পট এ তল্লাটে। জমিদার বাড়িতে তার গতায়াত অনেকদিন থেকেই। সরোজবাসিনীর সঙ্গে তার জানা-পরিচয়ও বহুকাল আগে থেকে। হারাধনকে দেখলেই সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় সরোজবাসিনীর। লোকটা ভিখিরির মতো এসে দাঁড়ায়। কাপুরুষের একশেষ। সারা গায়ে কুৎসিত ব্যাধির ছাপ। পরনে নোংরা ছেঁড়া কাপড়। কাজে মন নেই, কিন্তু লোভ আছে সাড়ে ষোলো আনা। বলে, 'দেশে এমন রাণী থাকতে, দেশের লোক না খেয়ে মরবে, রাণী-মা তাই দেখবেন নিজের চোখ দিয়ে?'

নানান্ অছিলায় এইভাবে নানা সময় হাত পেতে এসে দাঁড়াতো হারাধন। কখনো বিরক্ত হ'য়ে, কখনো বা রাগ ক'রে রাণী-মা তাকে নানা সময় নানাভাবে সাহায্য ক'রেছেন। চাইলেই যার কাছ থেকে পাওয়া যায় তার ওপর পাওয়ার দাবী জন্মে যাওয়াই স্বাভাবিক। সেই

স্বাভাবিক দাবী নিয়ে একদিন গভীর রাত্রে এসে হারাধন গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিলো। তার নাকি সর্বনাশ হ'য়েছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন সরোজবাসিনী দাসী-বাঁদীরা এ ঘর ও ঘর থেকে ছুটে এলো ব্যাপার কি? হারাধন এত রাত্রে কাঁদে কেন? জবাবে সে কেঁদে কেঁদে কেবল জানায়, তার সর্বনাশ হয়েছে। তার বৌ ম'রেছে।

বৌ ম'রেছে হারাধনের। সে তবে মরেনি, সে বেঁচেছে। এই পাষণ্ডটার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে মেয়েটা। কিন্তু সর্বনাশের হেতু এর থেকে কেউ যেন বুঝতে পারলো না। ভগবানদেরই ত বৌ মরে। ভাগ্য হারাধনের তা হ'লে ফিরেছেই বলতে হবে।

বৌ মরাটা নাকি কিছু না। মরার সময় সে মেরে রেখে গেছে হারাধনকে। এর থেকে ছাড়ান পাবার জন্যেই তার নাকি এই কান্না। একটা ছেলে হ'য়েছে তার। ছেলেটাও যেই কঁকিয়ে কেঁদে উঠেছে, তার বৌও অমনি চোখ বুজেছে। এখন এই ছেলে নিয়ে সে করে কী

শিউরে উঠলেন সরোজবাসিনী, বললেন, ছেলেটা কই?

—তার মার পাশে শুয়ে আছে, রাণী-মা হারাধন যথাসম্ভব চেষ্টা ক'রে কেঁদে বললো

—সেই মড়ার কাছে শিশুটাকে রেখে—

সরোজবাসিনীর কথায় বাধা দিয়ে হারাধন বললো, আমার আর কে আছে, রাণী-মা! কে আমায় দেখবে?

সমস্ত ছবিটা ভেসে উঠলো সরোজবাসিনীর চোখের সামনে। ভাঙা একটা ঘর। বাতার দেয়াল ফাঁক হ'য়ে আছে। ভিজা মাটির মেঝে। এক কোণে একটি মৃতদেহ চুপচাপ প'ড়ে আছে, তারি পাশে সদ্য শিশুটি হয়ত বা চার হাত-পা দিয়ে শূন্যের ওপর আছড়া আছড়ি করছে। তার সমস্ত শরীর আবার শিউরে উঠলো। রাণী-মা ভুলে গেলেন তাঁর গাম্ভীর্য, খেঁকিয়ে উঠে বললেন, চল।

মা হারা শিশুটিকে কুড়িয়ে নিয়ে এলেন সরোজবাসিনী। পর্ণকুটীরের ভিজে মাটির মেঝে থেকে শিশুটি প্রাসাদের পুষ্প শয্যায় উঠে এলো সেই রাত্রে। দাসী বাঁদীদের মনঃপূত হ'লো না এটা, তারা বিরূপ মন নিয়ে শুধু ফরমাস খাটতে লাগলো।

লাইব্রেরী ঘরে ওকের টবে জল দিয়ে এসে শিশুটির মুখে ফিডিং বোতল ধরেন সরোজবাসিনী। তুলসী মঞ্চে জল দেয় দাসী-বাঁদীরা, তুলসী তলায় প্রদীপ দেবার জন্যেও সরোজবাসিনীর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। ও সব কাজের জন্যে লোক আছে। তিনি একটা মোটা পলতের প্রদীপ জেৃলে রামুর সর্বাঙ্গে তেল মালিশ করেন।

রামু! এ আবার একটা নাম নাকি? [illegible] এই নামটা।


হারাধন গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিলো

কিন্তু শিশুটিকে তিনি তুলে এনেছেন হারাধনের অনুরোধে, আর হারাধনের অনুরোধ পালন ক'রেই তিনি একে রামু নামেই ডাকছেন। ছেলের নাম রামু রাখার সখ নাকি তার অনেক কালের। থাক গে নাম। একে যদি তিনি মনের মত মানুষ ক'রে তুলতে পারেন, তাহ'লে এই নামটাই অন্য সুরে লোকের মুখে মুখে বাজবে। রাজা রামমোহনের তৈল চিত্রটির দিকে একবার তাকালেন সরোজবাসিনী দেবী। তাঁর স্বামীর আদর্শ ওই মহাপুরুষটি, তাঁর স্বামীর সখের ও সুখের জিনিস ওই চিত্রপটটি।

আর এই শিশু, এই রামু—ঐ তো তাঁর সখেরও নয়, সুখেরও নয়! তবু কেন যে এমন ভাবে একে নিয়েই তিনি জড়িয়ে পড়ছেন, সরোজবাসিনী ভেবে পান না। মেটে ঘরের কাঁচা মেঝে থেকে তিনি শিশুটিতে আলগোছে তুলে এনেছেন, মানুষের এই চারাটিকে তিনি যদি তাঁর প্রাণের সাধনা দিয়ে বিরাট এক মহীরুহে পরিণত করতে পারেন, তাহ'লে সেইটিই হবে তাঁর সখের ও সুখের জিনিস। তাই রামুকে নিয়ে তাঁর এত বিভ্রাট, এত লাঞ্ছনা। লাঞ্ছনাই একে তিনি বলবেন। দাসী-বাঁদীরা যদি তাঁর কাজের সমালোচনা করে, দাসীরা যদি রামুকে আর তাঁকে জড়িয়ে চাপা-উপহাস করে, সেটা লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী তবু, তবু কোনো কিছুতেই তিনি যেন কান দেন না, এইরূপ কৃত্রিম উদাসীনতা নিয়ে সরোজবাসিনী রামুর তদারক তদ্বিরে রত থাকেন। এই বিরাট অট্টালিকা, আর এই অট্টালিকার নেপথ্যে অদৃশ্য ভূ-সম্পত্তি, বলা কি যায়, এই রামুবাবুই একদিন তার মালিক হ'য়ে বসবেন। রামুর থুৎনি ধরে আদর করতে করতে ভাবেন সরোজবাসিনী দেবী। এই প্রাসাদের শ্রী ফিরবে সেইদিন। সেদিন সরোজবাসিনী দেবী যদি জীবিত থাকেন, স্বচক্ষে তাহ'লে তিনি তা দেখে খুসি হবেন. আর জীবিত যদি না থাকেন, সারা গ্রামের লোকেরা তো খুসি হবে অন্তত। তাঁর শ্বশুরের সুযোগ্য হাতে যে ঐশ্বর্য মানিয়েছিলো, তাঁর এই নাতির হাতে—। শিউরে ওঠেন সরোজবাসিনী। নাতি! হারাধনের ছেলে মহেন্দ্রলালের নাতি!

সরোজবাসিনী গলা ছেড়ে গান করেন,—
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা। দু' চোখে ঘুম একটুও নাই, দুষ্টু ছেলেটা। আয় রে দেয়া, বা' ক'রো রে দুধের বাটিতে। ফুলশয্যা পেতে দেব শেতল পাটিতে৷

ফিক ক'রে হেসে উঠলো মনকা। আঁচল



ওকের টবে জল দিয়ে এসে শিশুটির মুখে ফিডিং বোতল ধরেন

য়ে ঠোঁটের হাসি মুছতে মুছতে বললো, ওকে খন নাওয়াবেন না, রাণী-মা!

বুঝলেন সরোজবাসিনী, সংক্ষেপে বললেন, হুঁ। নিজের কাজে যাও, মনক্কা।

মনক্কা যেন পালিয়ে বাঁচলো। সিঁড়ি দিয়ে মতে নামতে তার হাসির খিল খুলে গেলো। দৌড়ে গিয়ে দাসীদের ভিড়ে গিয়ে সে হাসতে াসতে গড়িয়ে পড়লো।

—কি হ'লো রে মনক্কা! এত হাসছিস কন?

মনক্কা দম ধ'রে গম্ভীর হ'য়ে বসে দুলে লে সুর ক'রে বলতে লাগলো, দেখবি যদি যা জনী উপর তলাতে। মুক্তমালা দুলছে হেথায় বানর গলাতে।

মনক্কার রঙ্গ দেখে সবাই হল্লা ক'রে হাসতে লাগলো। কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই তারা বুঝলো না। অবশেষে মনক্কা বুঝিয়ে বললো তদের। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, বুধা রাণী-মা রামুকে আদর করছেন।

হরিমতি চাপা মন্তব্য ক'রে বললো, রঙ্গ দেখে লাজে মরি।

সাবিত্রী বললো, হ'য়েছে এক সং। প্রথম পোয়াতির যেন আদুরে দুলাল।

এলোকেশী বললো, আস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে উনি ভদ্দরলোক বানাচ্ছেন। এ-ও কখনো সম্ভব! ওই হারাধনের ব্যাটার বাঁদীগিরি করতে হবে, অদেষ্টে এতও ছিল! ওর নাতা কাচতে কাচতে জাত-জন্ম আর রইলো না।

এদের এই মন্তব্যের নেপথ্যে রামু ক্রমশ বড় হ'য়ে উঠতে লাগলো। সে আজকাল একটু আধটু হেঁটে চলে বেড়ায়। হাঁটি হাঁটি পা পা। রামু চলে মথুরা॥ হাত তালি দিয়ে দিয়ে সরোজবাসিনী রামুকে হাঁটা অভ্যাস করান্। হাঁটা শেখা রামু এক রকম অভ্যাস ক'রে নেবার পর সরোজবাসিনী তাকে পড়াবার দিকে মন দিলেন। তাঁর নৈশ-বিদ্যালয় ভেঙে গেছে অনেকদিন হ'লো। এই গৃহে রামুর পদার্পণের প্রায় পর পরই বিদ্যালয়টি তুলে দিতে বাধ্য হ'য়েছেন সরোজবাসিনী। একা পেরে ওঠা তাঁর পক্ষে মুস্কিল। একটা শিশুকে মানুষ ক'রে তোলা তো যেমন তেমন কাজ নয়। তার ওপর তাঁর অনভিজ্ঞ হাতে শিশু লালনের ভার পড়ায় তিনি কিছুটা বিব্রত হ'য়েই প'ড়েছিলেন।

লাইব্রেরী ঘরে ব'সে তিনি রামুকে পড়ান। এই ঘরে অজস্র শিশুর কোলাহলে নিষ্প্রাণ প্রাসাদের প্রাণ সঞ্চার এককালে হ'তো, আজ এই একটি মাত্র শিশুই সমস্ত প্রাসাদটিকে প্রাণময় ক'রে তুলছে। সরোজবাসিনী দেবী বলেন, এসো বাবা পড় ব'সে ক খ গ। এই দেখ ঘ আর ঙ চ ছ॥

রামু আধ আধ ভাষায় দুলে দুলে সরোজবাসিনীর গলায় গলা মেলাবার চেষ্টা করে। আটকে গেলে সরোজবাসিনী তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে আবার বলেন, ক খ গ।

রামু পড়ে। রোজ পড়ে, রোজই আবার ভুলে যায়। রোজ প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হয় সরোজবাসিনীকে। এতটুকু ছেলে এত কথা মনে যে রাখতে পারে না, তা বোঝেন সরোজবাসিনী। বয়স তাঁর হ'য়েছে, ধৈর্য তিনি অর্জন ক'রেছেন। তিনি বলেন, মন দিয়ে পড়ে যেই। গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সেই।

গাড়ি ঘোড়ার কথায় রামু মুখ তুলে তাকায়, বলে, একটা গাড়ি দেবে?

সরোজবাসিনী বলেন, একটা কেন দুই-তা দেব। লক্ষ্মী ছেলে!

রামু ইস্কুলে যায়। গাড়ী চ'ড়ে ইস্কুলে যায় রামুবাবু—রামমোহন। তার ইস্কুলের নাম রামমোহন। দেয়ালের তৈলচিত্রটির দিকে তাকিয়ে সরোজবাসিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। হবে, হবে। তাঁর জীবন সার্থকতায় ভ'রে উঠবে একদিন। তাঁর জীবনের আশা-ভরসা এখন এই রামুবাবু—এই রামমোহন।

রাম এসে বলে, মা, ডাংগুলি খেলবো।

—ডাংগুলি কেন, সরোজবাসিনী বলেন, তোমাকে ব্যাট এনে দেব, বল এনে দেব।

রামু বলে, উঁহু'ও ওরা সবাই ডাংগুলি খেলে।

সরোজবাসিনী কথা বলেন না। কিন্তু তাঁর ভয় হয়, ডাংগুলি খেলতে গিয়ে চোখে যদি ঘা লাগে কখনো। তিনি রামুকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রামু বুঝতে চায় না। সে জেদ্ ধরে। ছেলেদের মন ফেরাবার উপায় কি. ভাবতে বসেন সরোজবাসিনী। তার ওপর এই জেদ্ যদি গোঁ-এ দাঁড়ায় ও সেই গোঁ যদি শেষ-বেশ গোঁয়ার্তুমিতে পরিণত হয়, এই তার ভয়। শেষ-বেশ তিনি রামুর কথায় রাজি হ'য়ে যান।

সারা গায়ে ধুলো মেখে রামু ডাংগুলি খেলা শেষ ক'রে ফিরে আসে। দূর থেকে চেয়ে দেখেন সরোজবাসিনী। তারপর উঠে গিয়ে গা-হাত-পা ধুইয়ে মুছিয়ে তিনি রামুকে নিয়ে পড়াতে বসেন। রামু বলে, আজ মাস্টার আমাকে মেরেছে।

সরোজবাসিনী দেবী বলেন, মাস্টার না, মাস্টারমশায়। মেরেছে না, মেরেছেন। কেন মারলেন তিনি?

রামু বললো, মাস্টারটা ভারী পাজি আর মিথ্যুক। বলে, আমি নাকি নাসি নিয়েছি।

শিউরে উঠলেন সরোজবাসিনী. সে আবার কি? এমন কথা তোমাকে বললেন কেন?

রামু রুখে বললো, বললাম যে, ও একটা মিথ্যুক।

সরোজবাসিনী বললেন, ছিঃ, মিথ্যুক

বলতে নেই। উনি তোমার মাস্টারমশাই, উনি তোমার গুরুজন।

রামু বললো, গুরুজন না, শালা!

সারা গা জ্বলে উঠ্‌লো সরোজবাসিনীর। তাঁর চোখে নিমেষের জন্যে অন্ধকার ঠেকলো চারদিক। রামুর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে তিনি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন অনেকক্ষণ।

—এ-সব কথা কোত্থেকে শিখলে, রামু? সরোজবাসিনীর রুদ্ধ গলার স্বর শুনে রামু তাঁর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালো একবার। তার চোখের দৃষ্টি দেখে সরোজবাসিনীই যেন ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, কাল থেকে ইস্কুলে যাবে না। যত সব খারাপ ছেলের সঙ্গে তুমি মিশছ।

রামকে ইস্কুল ছাড়ানো হ'লো কেন, জানতে এলেন হেডমাস্টারমশায়। সরোজবাসিনী ব'ললেন, আমার মনে হচ্ছে, ও লেখাপড়া শিখছে না, শুধু গালাগাল শিখছে।

হেড্‌মাস্টারমশায় কি যেন ভাবলেন, বললেন, তাহ'লে আর পাঠাবেন না।

রামু কড়া-পাহারায় বাড়িতেই পড়াশুনো ক'রতে লাগলো। সারাদিন-রাত সরোজবাসিনী তাকে চোখে চোখে রাখেন। তাকে ভাল ভাল কথা মুখস্থ করান। রামু ওপর-নীচের বারান্দায় ছুটোছুটি করে, আর সরোজবাসিনীর শেখানো বুলি আবৃত্তি করে।

খাঁচার ময়নাটা সন্ধ্যার সময় বুলি কপচায়, বলে, শতদল ঘরে তোল।

হরিমতির হাতে পুজোর বাসন দিয়ে শতদল খাঁচাটা নিয়ে ঘরে রেখে দিয়ে আসে।

সরোজবাসিনী দিনে ঘুমোন না। সেদিন একটু তন্দ্রা তাঁর এসেছিলো। তন্দ্রা ভেঙে তিনি রামুকে ডাকলেন। রামু নেই।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবার পর রামু এলো। খালি পা, পরনের প্যাণ্ট ধুলো-কাদায় মাখা। সে নাকি খেলতে গিয়েছিলো। জানা গেলো, শুধু খেলেই সে ফেরেনি; সে মোহন্ত মশাইদের বাগানে ঢুকে লিচু চুরি ক'রেছে। কথাটা মোহন্তমশাই অনেক কষ্টে স্বীকার ক'রলেন। রামু তাঁর বাগানে ঢুকে তাঁকেই যেন অপরাধী ক'রেছে রাণীমার কাছে। কথা শুনে সরোজবাসিনী রামুকে ডাকলেন। রামু বেপরোয়া মূর্তি ধ'রে এসে দাঁড়ালো; বললো, চুরি আবার কিসের—লিচু পাকলে খাব না?

লজ্জায় নত হ'লেন সরোজবাসিনী, বললেন, তোমার বাগানে লিচু পাকেনি, রামু? মোহন্তমশাইয়ের বাগানে তুমি গেলে কেন?

এর পর এলো রথ। সরোজবাসিনী ঘটা ক'রে এই উৎসব করেন। এবারও তিনি আয়োজন করলেন। বাইরে থেকে তিনি যাত্রাদল আনিয়ে যাত্রার আয়োজন করালেন। জলসার আয়োজন হ'লো। রামুকে বোঝালেন, রামু যেন এই ক'টা দিন লক্ষ্মীছেলে হ'য়ে থাকে। কত লোকজন আসবে, কত আত্মীয়-স্বজন আসবে—সবাই যেন রামুকে লক্ষ্মীছেলে বলে, রামু যেন তেমনি হ'য়ে থাকে।

রথের সময় গ্রামের চেহারাই প্রায় বদলে যায়। নতুন চক্ বসে, আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন আসে নানান্ পণ্য নিয়ে। বাজারে নতুন নতুন স্টল বসে। গ্রামটা প্রায় শহরের মত দেখায় তখন।

সরোজবাসিনীর গৃহও উৎসবে মেতে উঠেছে। আত্মীয়স্বজনরা এসেছেন চারদিক



কাপ ধুই, প্লেট ধুই। খদ্দেরদের চা দিই

থেকে। কিন্তু রামু যেন তার মধ্যে বেমানান, রামু তাই বুঝি এদের মধ্যে নেই। সরোজ-বাসিনী তার খোঁজে লোক পাঠালেন। এত হৈ-হাঙ্গামার মধ্যে রামুকে না পেয়ে তাঁর কাছে সব যেন বিস্বাদ ঠেকছে। মাঝে মাঝেই তিনি বলছেন, ছেলেটা গেলো কোথায়, একবার খোঁজ কর মনক্কা। তোরা যে গা ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছিস্।

গা ছেড়ে দিইনি রাণী-মা! তাকে খুঁজতে লোক গেছে।

রামু ঠিক এলো না; তাকে ধ'রে নিয়ে আসা হ'লো। সরোজবাসিনী বললেন, ছিল কোথায় ও?

হরিমতি বললো, বলো রামু, লক্ষ্মী ছেলে বলো! কোথায় গিয়েছিলে রাণী-মা জিজ্ঞেস ক'রছেন।

রামু বললো, পদুর দোকানে।

সেখানে কি? সরোজবাসিনী একা রেগেই বললেন।

রামু বললো, সেথায় কাজ নিয়েছি।

—কাজ? কী কাজ রে রামু?

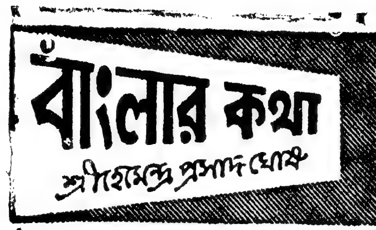
—কাপ ধুই, প্লেট ধুই। খদ্দেরদের চা দিই।

সরোজবাসিনী আর কিছু বললেন না। চ'লে যাবার সময় শুধু একবার আদেশ ক'রলেন, ওকে ছেড়ে দে।

রথের মেলা শেষ হ'য়ে গেছে। রামু আজও ফেরেনি। না ফিরুক, কোন কষ্ট নেই সরোজবাসিনীর। জীবনের এতটা দিন যখন কেটেছে, বাকিটাও কোন গতিকে তিনি টেনে নিয়ে যেতে পারবেন। সেই রাত্রেই তিনি শতদলকে ওকের টবটাও জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়ে কি যেন ভেবে আবার সেটি রেখে দিলেন। ওকের পাতাগুলো এত যত্নেও কিছুতে সতেজ হচ্ছে না।

ছয় মাস পূর্বে ১৬ই আগস্ট কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছিল; মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" দিবস ঘোষণা করিয়া বাঙ্গলার লোককে লীগের ক্ষমতা দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর চারি মাস পূর্বে—১০ই অক্টোবর নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। সেদিন বিহারের ব্যবস্থা পরিষদে বিহারের প্রধান সচিব অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন,—ভারতবর্ষের এক প্রান্তে যাহা হয়, অন্য প্রান্তে তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়—ভারতবর্ষ এক। কারণ, কলিকাতায় ও নোয়াখালিতে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, বিহারে তাহারই প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। "যদি একজন মুসলিম লীগপন্থীও নোয়াখালির ও কলিকাতার ঘটনার (অর্থাৎ মুসলমানদিগের উপদ্রবের) নিন্দা করিতেন, তবে যে বিহারে কোনরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটিত না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই।" সকল প্রদেশে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করা যে বড়লাটের কর্তব্য তিনি যখন কলিকাতায় গিয়াছিলেন, যদি তাহার পূর্বে তথায় যাইয়া হত্যা ব্যাপার সম্পর্কে কোন কাজ করিতেন, তবে নোয়াখালির ব্যাপার ঘটিত না এবং বিহারে তাহার প্রতিক্রিয়াও নিবারণ করা যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। আবার বিহারে (অর্থাৎ হিন্দুদিগের উপদ্রবের) প্রতিক্রিয়া হাজারায় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ যে নিদান-নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা সমীচীন। তিনি বড়লাটের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে বিচার করা প্রয়োজন। প্রদেশে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক গভর্নরের। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন যে বিবৃতিতে প্রাদেশিক গভর্নরের সহিত তাঁহার সচিব সঙ্ঘের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা বলা হয়, তাহাতে দেখান হয়—সাধারণতঃ গভর্নরের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু যে স্থলে সচিব সঙ্ঘের পরামর্শে প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বা কোন কোন অঞ্চলের বা অন্য কোন স্বার্থ ক্ষুন্ন হইবে, সে স্থলে সচিব সঙ্ঘের পরামর্শ গ্রহণ না করাই গভর্নরের কর্তব্য। যে প্রদেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত তথায় সরকারের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার সপার্ষদ বড়লাটের নাই। অর্থাৎ বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণ তাহা করিতে পারেন না—কেবল বড়লাটই তাহা করিতে পারেন। কেন বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণ বাঙ্গলার সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই, শাসন পরিষদের সহকারী সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহারও পূর্বে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছিলেন, শাসক



ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড ওয়াভেল তাহা করেন নাই—ফলে অন্যান্য প্রদেশে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বিহারের ব্যাপার সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় বহু বিহারী হতাহত ও সর্বস্বান্ত হইয়াছিল, যাহারা কলিকাতার হত্যাকাণ্ডের পর বিহারে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের প্রদত্ত বিবরণে বিহারের গ্রামে গ্রামেও লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার পরে নোয়াখালির ঘটনার বিবরণে—বিশেষ স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের বিবরণে, বিহারে হিন্দুদিগের ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘিত হইয়াছিল। বিহারে কংগ্রেসী সচিব সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত, তথায় সচিবগণ কংগ্রেসী নেতৃগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের কার্য কেবল গভর্নর নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন নাই। তিনি বিলাতে নোয়াখালির ব্যাপারের যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন, তাহার পরে তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। পণ্ডিত জওহরলালের ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উক্তিতে বুঝা যায়, লর্ড ওয়াভেল তাঁহাদিগের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়াছিলেন—বাঙলার গভর্নরকে তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে আবশ্যক উপদেশ প্রদান করেন নাই।

এই অবস্থা বিবেচনা না করিলে বাঙলার পুনর্বসতি সমস্যার সমাধান কিরূপ জটিল ব্যাপার তাহা বুঝা যাইবে না। অথচ এই পুনর্বসতি সমস্যাই আজ বাঙলার প্রধান সমস্যা।

কলিকাতা বাঙলার রাজধানী—কলিকাতা একটি নগর—কলিকাতায় লোকরক্ষার ব্যবস্থাও সহজ। সেই কলিকাতায় আজও অবস্থা পুনর্বসতির পক্ষে অনুকূল হয় নাই। একথা গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙলার প্রধান সচিব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেনঃ—

কলিকাতায় যে ১৪৪ ধারার বলে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বহাল রাখিবার কারণ দূর হয় নাই। এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, এখনও অবস্থা স্বাভাবিক হয় নাই এবং লোকের মন হইতে ভয় দূর হয় নাই। মুসলমানরা কি হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে যাইতে সাহস করেন? যে সব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সে সকল অঞ্চল হইতে যে সকল হিন্দু গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা কি আপনাদিগের ত্যক্ত গৃহে ফিরিতে পারিতেছেন? এখনও ভয় আছে—এখনও হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে বিশ্বাস করে না।

একদিকে এই কথা বলা হইয়াছে, আর একদিকে পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত স্থানসমূহ হইতে গৃহত্যাগীদিগকে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য বলা হইয়াছে। গ্রামে রক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা নাই। কলিকাতায় মিস্টার সুরাবর্দী "শান্তি কমিশনার" নিযুক্ত করিয়াছেন—তিনিও মোটা মাহিয়ানা পাইতেছেন। তথাপি কলিকাতার অবস্থা কিরূপ, তাহা মিস্টার সুরাবর্দীর স্বীকৃতিতেই সপ্রকাশ। শান্তি কমিশনার কি করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তিনি কি অস্বীকার করিতে পারিবেন, আণ্টনীবাগান লেনে হিন্দুরা যে সকল গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, সে সকল কেবল লুণ্ঠিত হয় নাই; পরন্তু সে সকলে অন্য শ্রেণীর লোক অবাধে প্রবেশ করিয়াছেন এবং পুলিশে প্রতীকার প্রার্থনা করিলে পুলিস বলিয়াছে—গৃহস্বামী অনধিকার প্রবেশের জন্যই ঐ সকল লোকের নামে আদালতে নালিশ করিতে পারে। একথা কি সত্য নহে যে, পল্লীবাসীরা প্রত্যাবর্তন করিতে চেষ্টা করিতে তাহাদিগকে ভয় দেখান হইয়াছে—ফিরিলে বিপদ ঘটিবে।

পূর্ববঙ্গে যখন গান্ধীজী পলায়িতদিগকে স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন, তখন কোন পাকিস্তানী সংবাদপত্র বলিয়াছেন—যাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন, তাঁহারা কি প্রত্যাবৃত্তদিগের নির্বিঘ্নতার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন?

বিহারে সরকার উপদ্রবের জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহারা ঘটনার গুরুত্ব অস্বীকার করেন নাই। তথাপি তথায় মুসলিম লীগ মুসলমানদিগের জন্য নিম্নলিখিত সর্ত দাবী করিয়াছেনঃ—

যে সকল অঞ্চলে মুসলমানরা বাস করিতেছেন, সেই সকল অঞ্চলেই উপদ্রুত স্থানসমূহের মুসলমানদিগকে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। সে জন্য হয় জমীর বিনিময় করিতে হইবে, নহে ত তাহাদিগের জন্য জমী কিনিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ পাকিস্তান করিয়া দিতে হইবে।

মোট দাবী এখনও ১৪ দফায় পৌঁছে নাই—১১ দফা আছেঃ—

(১) যাহারা হত্যা বা অন্য কোনরূপ হিংসাদ্যোতক কাজ করিয়াছে এবং এখনও

গ্রেপ্তার হয় নাই তাহাদিগকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিয়া জামিন না দিয়া আটক রাখা হউক।

নোয়াখালী ত্রিপুরায় কি উপদ্রবকারী-দিগের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে? বরং দেখা গিয়াছে, পুলিস আপত্তি করিলেও সেই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া পুলিস যাহা-দিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল, তাহাদিগের অনেককে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

(২) উপদ্রুত অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর পাইকারী জরিমানা স্থাপিত করিতে হইবে।

নোয়াখালী ত্রিপুরা অঞ্চলে যে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপদ্রব বাঙলার গভর্নরও অস্বীকার করেন নাই, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পাইকারী জরিমানা আদায়ের কোন প্রস্তাবই করা হয় নাই। বিহারে যে দাবী করা হইতেছে, সেই দাবী কি বাঙলাতেও করা যায় না?

(৩) যে সকল মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে।

যে বিহারে মুসলমানরা উপদ্রুত সেই বিহারে যেমন মুসলমানদিগকে মুক্তি দিবার দাবী করা হইয়াছে, তেমনই যে নোয়াখালীতে মুসলমানরা উপদ্রবকারী সেই নোয়াখালীতেও সেইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে, হিন্দুরা মুসলমান উপদ্রবকারীদিগের বিরুদ্ধে যে সকল এজাহার জানাইয়াছে, সে সকল প্রত্যাহার করা হউক। এমন কি যে গোলাম শারওয়ারের সম্বন্ধে মিস্টার সুরাবর্দী বলিয়াছিলেন, পুলিশ সর্বত্র তাহার সন্ধান করিতেছে, কিন্তু তাহাকে পাইতেছে না, তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হউক। তথায় মুসলমানদিগের সম্বন্ধে যে সকল দাবী করা হইয়াছে, সে সকল এতই অসঙ্গত যে, গান্ধীজীও সে সকল শোভন বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই।

এ বিষয়ে বাঙলার অভিজ্ঞতা অতি তিক্ত। কারণ ঢাকায় যে ব্যাপক হাঙ্গামার সময় বহু হিন্দু বৃটিশাধিকৃত স্থান ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাঁহা-দিগকে আশ্রয়দান জন্য বাঙলার তৎকালীন গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট ত্রিপুরার মহারাজাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন—সেই ব্যাপক দাঙ্গার পরে যখন সম্মিলিত সচিবসঙ্ঘ গঠিত হয়, তখন হিন্দুদিগকে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত মামলা প্রত্যাহার করিতে বলা হইয়াছিল। তাঁহারা তাহা করিয়াছিলেন; কিন্তু সরকার যেমন তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থা করেন নাই; তেমনই সেই উদারতার দ্বারা উপদ্রবকারীদিগের মনোভাবের পরিবর্তনও সাধিত হয় নাই।

(৯) [illegible] মুসলমান নারীদিগের

উদ্ধার সাধন জন্য মুসলমান রাজ কর্মচারী ও বে-সরকারী মুসলমান রেফারী নিযুক্ত করিতে হইবে।

কিন্তু বিহার সরকার বলিয়াছেন, বিহারে কোথাও নারীর উপর উপদ্রব হয় নাই; নারী হরণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আর নোয়াখালী, ত্রিপুরায় নারী লাঞ্ছনা ও নারী-হরণের অনেক প্রমাণ আছে। অল্পদিন পূর্বেও অপহৃতা নারীর উদ্ধারসাধন হইয়াছে। সেই কার্যের জন্য শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী প্রভৃতি মহিলাদিগের উপদ্রুত অঞ্চলে অবস্থিতির প্রতিবাদ করিতেও কোন কোন পাকিস্তানী পত্র লজ্জানুভব করেন নাই; তাঁহাদিগের আবাস আক্রমণ করিবার সম্ভাবনাও ঘটিয়াছিল। এ বিষয়ে ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীর বিবৃতি বিশেষ স্মরণীয়। এখনও যে বহু অপহৃতা নারীর উদ্ধার সাধিত হয় নাই তাহা জানা গিয়াছে।

(৫) অধিক সংখ্যক মুসলমানকে এক এক স্থানে বসতি করাইতে হইবে।

কিন্তু নোয়াখালী ত্রিপুরা অঞ্চলে সেইভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদিগকে বসতি করাইবার কোন প্রস্তাবেই বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘ কর্ণপাত করেন না। তাঁহারা বিহার হইতে মুসলমান আমদানী করিয়া বাঙলায় তাঁহাদিগের বসবাসের সুবিধা দিতেও ব্যস্ত। কোন মুসলমান সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচনকালে বিহার হইতে আমদানী মুসল-মানদিগকে কোন প্রার্থীর ভোট সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছিল।

(৬) দাঙ্গা সম্বন্ধীয় তদন্তের ভার কোন হিন্দু রাজকর্মচারীকে দেওয়া হইবে না এবং যথাসম্ভব দ্রুত তদন্ত শেষ করিতে হইবে।

কিন্তু পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত স্থানে যে সকল রাজকর্মচারী পূর্বে সংবাদ পাইয়াও উপদ্রব নিবারণের চেষ্টা করেন নাই তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করাও হয় নাই। আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন, কোন কোন রাজকর্মচারী নোয়াখালী ত্রিপুরা অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপদ্রবায়োজনে বাধা দেন নাই—কেহ কেহ সহায়তাও করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কি বাঙলা সরকার অমুসলমান কর্মচারীদিগের দ্বারা অনুসন্ধানের কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাঁহারা কি তাঁহাদিগের দ্বারা নিযুক্ত ২জন কর্মচারীর রিপোর্ট প্রকাশ করিতে সম্মত আছেন?

(৭) ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদিগের অবস্থা ও মর্যাদা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের ও গৃহ নির্মাণার্থ অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৮) মুসলমানদিগের গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক জমি অধিকার করিতে হইবে।

(৯) অভিভাবকহারা মুসলমান স্ত্রীলো ও অনাথ বালকবালি[illegible]র জন্য আশ্রম স্থা করিতে হইবে।

এইরূপ কোন ব্যবস্থা পূর্ববঙ্গের উপদ্র হিন্দুদিগের সম্বন্ধে করা হইবে কি?

(১০) মুসলমানদিগের শতকরা অন্ত ১০ জনকে বন্দুক রাখিবার ছাড় দিতে হই

বন্দুক রাখার অধিকার সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকতা কিরূপে সমর্থনীয়?

(১১) যে সকল কেন্দ্রে মুসলমানদি বসতি ব্যবস্থা করা হইবে, সে সকল স্থ থানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া থানায় সশস্ত্র পু শতকরা ৫০ জন মুসলমান নিযুক্ত ক হইবে।

এইরূপ ব্যবস্থা কি বাঙলায় বিশেষ প বঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুরা দাবী করিলে তাহ স্বীকৃত হইবে? যদি না হয় তবে তাহার কার কি?

বাঙলায় পুনর্বসতির ব্যবস্থায় কাহার বাধা দিতেছে তাহাও বিবেচ্য।

গান্ধীজী পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত স্থা যাইয়া হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি স্থাপনে যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে যাহারা আপ করিতেছে, তাহারা কি চাহে তাহা সহজে অনুমেয়।

সম্প্রতি মিস্টার ফজলুল হক পূর্ববঙ্গে উপদ্রুত অঞ্চলে যাইয়া বলিতেছেন—গান্ধীজী বাঙলা ত্যাগে বাধ্য করিতে হইবে। গান্ধীজ অবস্থিতি যে ত্রিপুরা ও নোয়াখাল মুসলমানরা সহ্য করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকাশ করিয়া তিনি অশিষ্টভাবে বলিয়াছেন তিনি বরিশালের লোক, গান্ধীজী বরিশালে যাইলে তিনি তাঁহাকে ঠেলিয়া খালে ফেলিয়া দিতেন। যিনি এইরূপ উক্তি করিতে পারেন, তিনিও কি আপনাকে সভ্য বলিয় পরিচয় দিতে পারেন?

লক্ষ্য করিতে হইবে, যখন মিস্টার ফজলুল হক এইরূপ উক্তি করিয়া মুসলমানদিগকে গান্ধীজীকে বিতাড়িত করিবার জন্য আন্দোলন করিতে বলিতেছেন, সেই সময়েই কয়জন গৃহত্যাগী গৃহে ফিরিলে যাহারা তাঁহাদিগকে উপদ্রুত করিয়াছে তাহাদিগকে পুলিশ গ্রেপ্তা করিলে ৪ শত লোকের এক জনতা মারাত্ম অস্ত্র লইয়া পুলিশকে আক্রমণ করিয়া ধ ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করিয়াছে একটি থানা আক্রমণের আয়োজনও করিয়াছে

বিহারে সরকার পুনর্বসতির জন্য চে করিতেছেন। কিন্তু বাঙলায় সরকা সেরূপ চেষ্টা কোথায়? সেইজন্যই রাজন অর্থনীতি ও শিল্প সম্বন্ধীয় ক্ষমতা মুসলি লীগের হস্তগত থাকায় কেহ কেহ বাঙলা দুই ভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তা করিতেছেন।

রেসকোর্সের গ্যালারী

(শেষ পর্ব)

অমর সান্যাল

সংসারে ক্ষণিকের মোহ অনেক সময় মানুষকে বিপর্যয়ের পথে ডাক দেয়। একবার এই মোহগ্রস্ত হওয়ার দুর্বুদ্ধি আমারও হয়েছিল। রেস কোর্সের গ্যালারির মায়া এক ভাস্বর অপরাহ্ন বেলায় আমি ছিন্ন করেছিলাম।

একদিন হঠাৎ এক থিয়েটার দেখার নিমন্ত্রণ লিপি পেলাম। বন্ধুরা বিস্মিত হলেন।—তাইত! আপনাকে এ অনুগ্রহ দেখাবার কারণ কি! এ শহরে মাস্টারদের এসব কালচারাল ব্যাপারে ডাক পড়ে না। আপনার সঙ্গে ওদের খাতির আছে নাকি মশায়?

আমি কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম, বাধা দিয়ে সনতবাবু বললেন,—আপনার আর কি খাতির মশায়, সে জিনিষ পেয়েছি ধলভূম কলেজে; প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন পরম বৈষ্ণব, বিদায়ের দিন আমার বাড়িতে এসে বল্লেন,—মহাপ্রভু সঙ্গ দিয়েছিলেন, তিনি আবার বন্ধন ছিন্ন করালেন!

সনতবাবুকে বাধা দিলেন নিবারণবাবু।—তা যদি বলেন সনতদা, খাতির ছিল বনগাঁ কলেজে। আমি ছাড়া কলেজ কাণা। ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গেও আমার আলাপ ছিল।

মুচকি হেসে সনতবাবু বললেন,—কিন্তু মশায়, শুনতে পাই আপনি ওখানে হাকিমদের সঙ্গে যেচে আলাপ করতেন।

—সব কথায় আপনি খুঁত ধরেন সনতদা এটা বোঝেন ত, ডেপুটি সাব ডেপুটির সঙ্গে আলাপ থাকলে পাবলিকের কাছে খানিকটা খাতির পাওয়া যায়।

এই অবসরে আমি সরে পড়লাম টাউন হলের দিকে। রাজপথে আলো তখন সবে জ্বলে উঠেছে। মাঘের কনকনে হাওয়ায় তরুশাখে জেগেছে শিহরণ। বালাপোষ মুড়ি দিয়ে আমি চলেছি থিয়েটার দেখতে।

গতি পথে বাধা পেলাম হলের দরজায়। বাধা দিল আমারই এক ছাত্র,—স্থানীয় ছাত্র-আন্দোলনের কর্মী ও মার্কসপন্থী। ছাত্রপ্রবর বলল,—কার্ড আছে স্যার?

আমি কার্ড দেখাতে সে একটু বিস্মিত হল। এ শহরে মাস্টারকে কার্ড দিয়ে আমন্ত্রণ যেন একটা ব্যতিক্রম! দলে দলে লোক ঢুকছে দরজা দিয়ে, ছাত্রপ্রবর কার্ডের জন্য উত্যক্ত করছে না কাউকে।

থিয়েটার হল লোকে লোকারণ্য। কত রকমের লোক, ফিস ফিস বাক্যালাপ, হাসির ফোয়ারা, ব্যালকনির দিকে সতর্কিত চাহনি। সুগন্ধে ঘরের বাতাস যেন লুটিয়ে পড়েছে মেঝের উপর। এখানে এসে ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলাম পঞ্চাশের মন্বন্তর আর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তাণ্ডবলীলা। শুধু একবার মনে পড়ল লোলচর্ম এক বৃদ্ধকে,—যিনি এই হিমার্ত রজনীতে বাঙলাদেশের এক নগণ্য জেলার গ্রামে গ্রামে পদব্রজে ভ্রমণ করছেন।

ভিড়ের মধ্যে পরিচিত মুখ চোখে পড়ল মাত্র দুটি। আমাদের পাড়ার রমেশবাবুর ছেলে খ্যাঁদা আর সহকর্মী বিনয়বাবু। খুশী হয়ে উঠল মনটা, জলে পড়ি নি তাহলে! কিন্তু হতাশ হতেও বেশীক্ষণ লাগল না। ওরা তাকাচ্ছে আমার দিকে, কিন্তু চোখে পরিচয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। আমার সামনে বসে আছেন শহরের কবি। বিরক্তিভরা কুঞ্চিত মুখ, কবে হয়ত কবিতা লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সেই অচল দুয়ানি ভাঙিয়ে এখনও জীবিকা অর্জন করছেন। দু' পাশে দুই ভদ্রলোক আপাদমস্তক শাল জড়িয়ে বসে খুঁত খুঁত করছেন আমার দিকে তাকিয়ে। দু'জনের অনাবৃত স্থানের মধ্যে দেখা যাচ্ছে হাতের আঙুল কটি। হীরে বসান আংটি যেন আমাকে মুখভঙ্গি করছে।

শাস্ত্রে বলে, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। থিয়েটার হলে বেশীক্ষণ থাকলে মাথা সেদিন খারাপ হয়ে যেত নিশ্চয়ই। বিশাল বিশ্বের প্রতি কণা আমাকে চারিদিক থেকে আকর্ষণ করছে, এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মোহ আমাকে ডাক দিল কোন্ বন্ধনে! সকলের অবজ্ঞা ও করুণা মিশ্রিত দৃষ্টি উপেক্ষা করে আমি বেরিয়ে গেলাম হল থেকে। রেসকোর্সের গ্যালারিতে এখনও হয়ত সনৎ-নিবারণের নিভৃত আলাপ চলেছে; কার্ডটা নিবারণকে দিয়ে দি, তার কাজে লাগতে পারে।

কী সুন্দর বাইরের জগৎ! আকাশে চলেছে তারায় তারায় লুকোচুরি খেলা, ঝাঁকাল গাছটার আবরণ ভেদ করে পঞ্চমীর চাঁদ উঁকি মারছে। অদূরে স্বপ্নাচ্ছন্ন রেসকোর্স ঘন কুয়াসাজালে পরিবেষ্টিত। আমার যাত্রাপথ শেষ হবে সেখানে—সনৎ-নিবারণের বাক্-যুদ্ধের আসরে।

নিশিতে পাওয়ার মত সেদিন পথ চলেছিলাম। ছাত্রের দল সিনেমা দেখে ফিরছে, কাঁচা মুখ সিগারেটের আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছে। অন্য দিন মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত,—স্বাস্থ্যসম্পদহীন বাঙালী ছাত্র সিগারেটকেই পরম মিত্রের মত আলিঙ্গন করেছে! সেদিন একটা আশ্চর্য ভাব মনের মধ্যে এসেছিল,—এদের জন্য নাই বা ভাবলাম আমি! আমার জগৎ ত ভিন্ন, তথাকথিত সভ্য সমাজের বাইরে! সেখানে আমারি চেতনার রঙে রাঙিয়ে উঠবে সারা ভুবন, দানব হবে বশীভূত আমারি মন্ত্রবলে। প্রাণ সেখানে প্রতিষ্ঠা হবে আত্মবিকাশের ভিতর দিয়ে, কল্যাণ আসবে প্রথম আলোর সঙ্গীরূপে।

নিবারণবাবু একদিন দুই সঙ্গীসহ গ্যালারিতে হাজিরা দিলেন। সনতবাবু তখন সবেমাত্র সস্তায় বাজার করবার কায়দাটা আমাকে শিখিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু নিবারণের আগমনে প্রসঙ্গ বন্ধ রাখলেন।

নিবারণবাবু বললেন,—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই এ'দের। ইনি হলেন আমাদের রমেশবাবুর ছেলে খ্যাঁদা আর ইনি তার বন্ধু পশুরাই সরোকভ।

প্রতিবাদের সুরে খ্যাঁদা বলল,—ভুল করছেন নিবারণবাবু, পশুরাই নয়, পরশুরাই সরোকভ।

বাধা দিয়ে আমি বললাম,—খ্যাঁদাকে আমি চিনি, কিন্তু তার ভাল নামটি জানি না; তার বন্ধুরও বোধ হয় এটি ডাক নাম।

বিদ্রূপের হাসি হেসে খ্যাঁদা বলল,—আপনি কিছুই জানেন না শত্রুঘ্নবাবু, এ শহরে ডাকনামের প্রচলনই বেশী। আমার ঠাকুর্দার নাম ছিল বোঁচা, তাঁর নামে রাস্তার নামকরণ পর্যন্ত হয়েছে—বোঁচাবাবুর গলি। আমার বন্ধু অবশ্য এ ক্যাটিগরিতে পড়ে না। এঁর পূর্বেকার নাম ছিল পরশুরাম সরকার। ১৯৪২ এর আগস্ট মাস থেকে নাম গ্রহণ করেছেন পরশুরাই সরোকভ।

সনতবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর স্বভাবত বৃহৎ চক্ষু বৃহত্তর আকার ধারণ করেছে, নিবারণবাবুর চোখে প্রশংসনীয় দৃষ্টি।

উৎসাহের সঙ্গে খ্যাঁদা বলতে লাগল—আগামী দিনের অগ্রদূত হচ্ছেন এই সরোকভ। নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে বিপ্লবময় পরিবর্তন এনেছেন ইনি। আপনাদের মত বাপ মা দেখা মেয়ে মন্ত্র পড়ে বিবাহ করেন নি। পথ-চলতি একটি মেয়ের সঙ্গে মনের মিল হওয়াতে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করছেন দুজনে! মেয়েটির নতুন নামকরণ করেছেন—কামনাস্কায়া। ট্রেণ জার্নিতে এক পয়সাও খরচ করেন না; দেশের হোটেল-ওয়ালারা ওঁকে চেনে সবাই, কারণ খেয়ে

কোথাও পয়সা দেন নি। কিছুদিন আগে ওঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছে; অশৌচ পালন, মস্তক মুণ্ডনাদি কিছুই করেন নি, শ্রাদ্ধের দিন হোটেল-ডি-মাস্-এ চিকেন রোস্ট ও চার পেগ হোয়াইট লেবেল উদরস্থ করেছেন। দেশ-সেবার মূলেও ওঁর অবদান কম নয়। জেলে গেছেন তিনবার,—

নীতিবাগীশ সনতবাবু বলে বসলেন,—হোটেলওয়ালারা ছাড়েনি তাহলে।

খ্যাঁদা ও সরোকভ যুগপৎ বিষ দৃষ্টিতে তাকাল সনতবাবুর দিকে। একটা লোকের জীবনে হোটেলে খেয়ে 'পয়সা না দেওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। হুঁ, যা বলছিলাম,—বর্তমানে উনি সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। শতাব্দীর সেরা উপন্যাস ওঁর একখানি শীগ্‌গীরই বেরুবে, নাম দিয়েছেন খেঁকি কুকুর বনাম পেতি বুর্জোয়া'।

হঠাৎ পিছন ফিরে বসলেন সনতবাবু, বুঝলাম তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন হাসি চাপতে।

গদ গদ ভঙ্গীতে নিবারণবাবু তাকালেন সরোকভের দিকে। ঢোক চিপে বললেন,—জেলে আমিও ছিলাম পশু—ইয়ে—পরুশাই-বাবু! তিরিশ সালে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করে সাত দিন হাজত বাস করছি, এমন সময় মামা গিয়ে হাজির। মামাকে চেনেন ত? গোবিন্দপুর কলেজের প্রোফেসর। আমার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মামার তাড়ায় জেল থেকে বেরিয়ে আসতে হল।

সনতবাবু বললেন—মুচলেখা দিয়ে।

চোখ পাকিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আবার আরম্ভ করলেন নিবারণবাবু। অবশ্য তাই বলে মুভমেণ্ট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইনি আমি। এখানকার বিপ্লবী যুবক দলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে।

খ্যাঁদা বলল,—ওঃ, সেইজনাই বুঝি এ শহরে নতুন এসে আপনি আমার কাছে খোঁজ করেছিলেন, এখানে কোন্ দলের প্রাধান্য বেশী। শহরে অবশ্য,—ও কি মশায় নমস্কার করছেন কাকে!

সচকিত হয়ে দেখি একটি বৃহদাকার শৃগাল সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে, আর সনতবাবু যুক্ত করে মন্ত্র পাঠ করছেন—

কৃশোদরি মহাচণ্ডে! মুক্তকেশি বলিপ্রিয়ে!
কুলচার প্রসন্নাস্যে! নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে!

বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল সরোকভ। —মশায়, দেখছি এ যুগের মানুষ নয়! আপনার মত লোক শহরে অচল। গ্রামে ফিরে যান মশায়; চরকা কাটুন, আর লোককে ধর্ম-কথা শিখিয়ে দিন। সরোকভ হা হা করে হাসতে লাগল।

খ্যাঁদা বলল,—ডারুইনের বিবর্তনবাদ অনুসারে আধুনিক মানুষের পর্যায়ে আসতে সনতবাবুর আরও দু' এক জন্ম লাগবে বোধ হয়।

খুশীর হাসি দেখা দিল নিবারণবাবুর মুখে। আমারও মনে হয় সনতদা বাড়াবাড়ি করেন একটু।

সনতবাবুর প্রণাম ততক্ষণ শেষ হয়েছে। শান্তভাবে তিনি বললেন—ডারুইনের থিয়োরী আপনাদের পক্ষেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য আমার হিসাবে উল্টোভাবে। শহরে আমি সত্যিই অচল মিঃ সরোকভ। শুধু শহর কেন, আপনাদের আধুনিক জাতীয় জীবনে মাস্টার মাত্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে অত্যাবশ্যক আবর্জনা। আমাদের শিক্ষা ও সমাজ সেবার মূল্য আপনারা দেন উপেক্ষা ও অবজ্ঞা। শিক্ষায়তনে ছাত্রের দল আপনাদের এজেণ্ট ছাড়া আর কিছু নয়, কিশোর মনকে উদ্‌ভ্রান্ত চঞ্চল করে দিয়েছেন আপনারা, নীড়হারা পাখীর মত তারা দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে।

কি একটা বলতে যাচ্ছিল খ্যাঁদা। এক ধমকে সনতবাবু থামিয়ে দিলেন তাকে।—কি পারেন মশায় আপনি! আপনাদের কাজ ত দেখি ম্যাথরদের স্ট্রাইক করিয়ে গরীব করদাতাদের অসুবিধা ঘটান। মার্কসীয় বদহজমের এক একটি এক্সপেরিমেণ্ট আর কি! ওদের উপর সত্যিকার দরদ থাকে যদি, ওদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে মানুষের মত বেঁচে থাকার শিক্ষা দিন।

সনতবাবু চুপ করলেন। তাঁর কথার ভারে রেসকোর্সের গ্যালারি সেদিন থম থম করছিল। পূর্বদৃষ্ট বৃহদাকার শৃগালটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মৃদু কণ্ঠে বললাম,—কস্তম্! মনুষ্য কণ্ঠে আওয়াজ যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম, জম্বুকোহম্!

রেসকোর্সের গ্যালারির দৌলতে আমার বন্ধুর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সময়ে অসময়ে পরিচিতের দল হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে। বহু আয়াসে সংগৃহীত খাবার জিনিস অতি সহজে বন্ধুদের উদরে স্থানলাভ করে। দু'দিন না যেতেই রেশনের চিনিতে টান পড়ে। সপ্তাহের বাকী কটা দিন আমার ভাগ্যে জোটে গুড়ের চা। বন্ধুদের ঘন ঘন যাতায়াতে পড়া-শুনার পাট উঠে গেল আমার। বিকেল হলেই চেয়ারে শক্ত এঁটে বসে থাকি, একে একে পরিচিত পদধ্বনির সাড়া পাই। নির্জন বাসের কামনায় জলাঞ্জলি দিতে হল আমাকে।

ওরা সকলেই যে যার কাজ সেরে আসে। নিজের বাড়িতে আড্ডা জমাতে সকলেই নারাজ, অন্দরমহলের আপত্তি এড়ানো বড় কঠিন। শুধু নিবারণবাবু মাঝে মাঝে ঈর্ষামলিন মুখে বলেন,—আমার বাড়িতে আপনারা যান না একদিনও। সরোকভের কথা ভেবে কাল রাতে আমার ঘুম হয়নি সনতদা! শত্রুঘ্নবাবু, প্রাইভেট্ একটা টক্ আছে আপনার সঙ্গে। ইত্যাদি অসংলগ্ন কথা।

একদিন কি একটা কারণে বন্ধুরা এক-যোগে অনুপস্থিত হলেন। এরকম মাহেন্দ্রযোগ জীবনে আসেনি প্রায় এক মাস। পুলকিতচিত্তে যাত্রা করলাম রেসকোর্সের দিকে।

রাজপথে গোধূলি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমাদের পাড়ার পবন গোয়ালা ফিরছে গোধন নিয়ে, নিরপেক্ষভাবে তার পাঁচন পড়ছে গোপালের পৃষ্ঠদেশে, তারা পুলকের বন্যায় ভেঙে পড়ে ছুটেছে 'উড়ায়ে পথের ধূলি।'

পবন একটু সংযত হল আমাকে দেখে। প্রশ্ন করল,—কুথায় গো বাবু!

—এই একটু রেসের মাঠে, এত গরু কার রে!

—হুই ও পাড়ার যাদববাবুর।

—এত দুধ যাদববাবু কি করেন রে! বিক্রি করেন নাকি?

জোরে হেসে উঠল পবন। —বাবু যেন কি! গাই তো মোটে চারটে তেনার, আর সব এঁড়ে।

বিস্ময়ের সুরে আমি বললাম,—এঁড়ে পুষে যাদববাবু করেন কি!

—কে জানে বাবু, বড়লোকের খেয়াল। এই ত সেদিন গোয়াল ঘর তুললেন পাকা ইঁটের গাঁথনি। আমাদের শোবার ঘরও অমন নয় বাবু! এই বাজারেও গোয়ালঘরে হ্যারিকেন জ্বলে রোজ রাতে বিশটা। গরু ভয় পায় নইলে আঁধারে! মাঠে এই সাঁঝের বে... যেওনি বাবু, ওনারা সব আছেন। পবন এ... হাত কপালে ঠেকাল।

পবনকে বিদায় দিয়ে আমি এগিয়ে চলে রেসকোর্সের দিকে। শহর সেদিন আলোকমালায় সজ্জিত,—দেশনায়কের জন্মতিথি। পঞ্চাশের মন্বন্তরে দেশবাসীর সমাধির উপর যারা গড়ে তুলেছে সুখের বাসর, কালাবাজার যাদের জীবনে এনে দিয়েছে সোনালী স্বপন, তাদের বাড়িতেই আলো ও সাজসজ্জার ঘটা বেশী। তাদের সুসজ্জিত অট্টালিকা সারা দেশকে যেন ব্যঙ্গ করছে;—বাঙলা দেশের লোককে আমরা চিনি,—ভাবপ্রবণ স্বপ্নবিলাসী জাতি। পঞ্চাশ সালে জাতির মর্মবেদনা ও অপরিসীম লজ্জা আজ নিশ্চয়ই ভুলে গেছ তোমরা। তাই না আজ আবার ছুটে এসেছ আমাদেরি কাছে জীববিশেষের মত নতশিরে!

গ্যালারির কাছে প্রায় এসে গেছি। নক্ষত্রের মৃদু আলোয় দেখতে পাচ্ছি কারা যেন ছুটে আসছে আমার দিকে। আমাকে দেখে থমকে নিঃশ্বাস ফেলে দাঁড়াল তারা,—সনতবাবু ও নিবারণবাবু। বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম আমি। সনতবাবুর এণ্ডি আর নিবারণবাবুর সিল্কের চাদর গাঁটছড়ার মত বাঁধা, দুজনে ছুটে এসেছেন প্রায় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়।

তেভাগা আইন

শ্রীমনকুমার সেন

গত কয়েক মাস যাবৎ বাঙলার গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বর্গা জমির প্রাপ্য ফসল সম্পর্কে একটি ব্যাপক আন্দোলন চলিতেছে। বাঙলার লীগ মন্ত্রিসভা বিভিন্ন স্থানে দমন-নীতির দ্বারা এই আন্দোলন রুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকিলেও শেষ পর্যন্ত ভাগচাষী-দের দাবী পূরণ সম্পর্কে একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। বাঙলার যাট লক্ষ কৃষক, প্রায় এক লক্ষ বৃহৎ জোতদার পরিবার, ২১০টি প্রথম শ্রেণীর জমিদার পরিবার ও মোট ২০০০ ছোট বড় জমিদার এবং সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক জীবন, তথা বাঙলার গ্রামাঞ্চলের উপর এই আইনের যে সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়া হইবে, তৎপ্রতি দেশবাসী মাত্রেরই সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

কৃষক আন্দোলনকে নিষ্ঠুর দমননীতির দ্বারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়া পরে, কৃষকের ভোগ দখল ব্যাপকতর ও কায়েমী করিবার সদুদ্দেশ্যে বর্গা জমি সম্পর্কে এই নূতন আইন প্রণয়নের প্রয়াস যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যময় তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুত যে অগণিত নিরীহ ও নিরক্ষর চাষীর অজ্ঞতা ও অন্ধ ধর্মবুদ্ধিকে ভিত্তি করিয়া মুসলীম লীগের পাকিস্থান প্রাসাদ রচনার অপপ্রয়াস চলিতেছে, প্রস্তাবিত আইনের ফাঁক ফাটলগুলি দৃষ্টে তাহাতে এই আশঙ্কাই বদ্ধ-মূল হয় যে, লীগের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি বাঙলার মন্ত্রিসভা সেই উদ্দেশ্যেই আজ কৃষক বন্ধুর অভিনয় করিতেছেন। একদিকে লক্ষ লক্ষ চাষী, কৃষক ও ক্ষেত মজুর অপর দিকে লীগের চাঁই একদল মুসলমান জমিদার, এই উভয় কুল রক্ষা করিবার অপকৌশল হিসাবেই বাঙলার লীগ মন্ত্রিসভা এই মধ্যপন্থার আশ্রয় করিয়া-ছেন বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হয়।

শতকরা ৭৫জন বাঙালীই চাষী বা চাষের উপর নির্ভরশীল, একথা আমাদের সকলেরই জানা আছে। আজ যে গ্রামাঞ্চলের শোচনীয় দুরবস্থা চলিতেছে এবং বারো মাসই যে বাঙালী আমরা কাঙালী হইয়া দুর্ভিক্ষের মুখে পড়িয়া আছি এবং অন্নের জন্য দেশদেশান্তরের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি, ইহাতেই প্রমাণিত হয়, সহস্র সহস্র বছর ধরিয়া যে সোনার বাঙলার গ্রামাঞ্চলে সোনালী ফসল ফলিয়াছে তাহাতে ভাঙন ধরিয়াছে; এই ব্যবস্থার আমূল পরি-বর্তন আবশ্যক।

রাজা বাদশাহদের আমলে আইন ছিলঃ যে চাষ করে জমি তার। চাষী আপন জমিতে সানন্দে সমগ্র শ্রম ও উৎসাহ ঢালিয়া দিত। চাষী ও চাষের উপর নির্ভরশীল সকলের উদরান্নের সংস্থান করিয়াও প্রভূত পরিমাণ ফসল উদ্বৃত্ত হইয়া থাকিত সেই সোনার বাঙলা আজ স্বপ্ন বিশেষ। শ্মশান মৃত্তিকায় প্রমথ-কুলের উন্মত্ততা আর মরণোন্মুখ কঙ্কাল শ্রেণীর শোভাযাত্রাই আজ আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ বাণিয়া এই দেশে প্রবেশ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা চাষীকে জমির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিল এবং একদল তোষণপ্রিয় ও প্রসাদভোজী জমি-দার সৃষ্টি করিয়া কায়েমী স্বার্থের মূল দৃঢ়তর করিল। ফলে চাষী চাষের প্রেরণা হারাইল, জমিদারকুল দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন ও শোষণ চালাইয়া সাম্রাজ্যবাদীর প্রীতিভাজন হইল। আজ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া চাষী পরের জন্য প্রাণপাত করেঃ পরিবর্তে যে সামান্য ফসল পায় তাহা দুই দিনেই নিঃশেষ হইয়া যায়ঃ তারপর মহাজন, জোতদার ইঁহাদের কাছ হইতে ধার কর্জ চলে, ক্রমে সুদ চক্রসুদ ইত্যাদি শোষণমূলক দাবী দাওয়ার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া একদিন তাহার জীবনান্ত হয়, বক্তৃতায় ও কাগজে এই অবস্থার যতই আবেদনমূলক বিশ্লেষণ করা হউক না কেন, পল্লীবাসী ছাড়া পল্লীর এই চিত্র শহরবাসী ও আজন্ম শহরে বর্ধিত ও শিক্ষিত জনসমাজ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে না। আমাদের এত কথা বলি-বার ইহাই উদ্দেশ্য যে, লীগ মন্ত্রিসভা শীঘ্রই পরিষদে এই বিলটি উপস্থাপিত করিতেছেন। নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিবার পূর্বে দেশ-সেবী প্রত্যেক পরিষদ সদস্যই যেন এই চিত্রটি সম্মুখে অঙ্কিত রাখেন।

বর্গা প্রথায় জমি চাষ করিবার রীতি বাঙলায় বিশেষ প্রচলিত। কাজেই এই সম্পর্কে যে নূতন আইন লিপিবদ্ধ হইতে চলিয়াছে, তাহার অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়া আমরা ইহার কয়েকটি বিধান আলোচনা করিব।

বিলের ৩নং ধারায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ১৯৪৭ সনের ২২শে জানুয়ারী বা তৎপূর্ববর্তী কৃষি মরশুমে গৃহীত বর্গা জমি আগামী ১৯৪৯ সনের ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত জমির মালিক বর্গাদারের নিকট ফিরিয়া পাইবেন না কিংবা সে জমির চাষা-বাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। এ পর্যন্ত চাষের প্রয়োজনীয় লাঙ্গল, গরু, সার সমস্তই বর্গাদার জোগাইয়া জমির মালিককে অর্ধেক ফসল দিয়া আসিয়াছে। আলোচ্য বিলের ৬নং ধারায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে প্রচলিত অন্য যে কোন বিধান থাকুক না কেন, ভবিষ্যতে বর্গা জমি সম্পর্কে জমির মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে এই নিয়ম প্রতিপালিত হইবে।

(১) মালিক যদি লাঙ্গল, গরু, বীজ ও চাষের যন্ত্রপাতি ও সার ইত্যাদি সরবরাহ করেন, তাহা হইলে জমির ফসল অর্ধেক হারে বণ্টিত হইবে।

(২) যদি মালিক ঐ সমস্ত সরবরাহ না করেন, তাহা হইলে ফসলের একতৃতীয়াংশ পাইবেন। বাকী দুই-তৃতীয়াংশ চাষী নিজে প্রাপ্যরূপে গ্রহণ করিবে।

ইহা দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে চাষীর স্বার্থ ও অধিকার প্রসারিত হইয়াছে মনে হইলে অতঃপর যে কতকগুলি বিশেষ সর্ত জুড়ি





"বাকি আমি রাখ্‌বো না কিছুই
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেবো ভুঁই..."

[দ]েওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা চাষীর স্থায়ী স্বার্থের [প্র]তিকূলতা করা হইয়াছে। এই বিশেষ [ব্যব]স্থানুসারে (ক) কোন বর্গা জমির মালিক [য]দি নিজে বা নিজ পরিবারের লোকজনদের [স]াহায্যে উক্ত জমি চাষ করিবার ইচ্ছা করেন, [(]খ) জমির চাষবাদের ব্যাপারে বর্গাদার যদি [ক]োনও গাফিলতি প্রদর্শন করে, (গ) বর্গাদার [য]দি বর্তমান বিল অনুসারে প্রাপ্য হইতে [ম]ালিককে বঞ্চিত করে এবং (ঘ) বর্গাদার যদি জমির কোনরূপ অপব্যবহার বা অযত্ন করে তাহা হইলে জমির মালিক জমি ফিরাইয়া পাইবার জন্য জেলার কালেক্টরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাও বলা হইয়াছে যে, কালেক্টর যদি মালিকের অনুকূলে রায় প্রদান করেন এবং মালিক যদি পুনঃপ্রাপ্ত জমির উপযুক্ত চাষাবাদ না করেন, সেই স্থলে পূর্ব বর্ণিত বর্গাদার উক্ত জমির পুনরায় চাষের জন্য কালেক্টরের নিকট আবেদন করিতে পারিবে। জমির মালিকদের দিক হইতে দেখিতে গেলে এই আইনের ফলে তাঁহাদের অধিকার যথেষ্ট সঙ্কুচিত হইবে এবং নিজেরা চাষাবাদ না করাইলে বা গরু লাঙ্গল ইত্যাদি বর্গাদারকে সরবরাহ না করিতে পারিলে বর্তমান আইন অনুসারে যে একতৃতীয়াংশ ফসল পাইবেন, তদ্দ্বারা খাজনা ইত্যাদি মিটানও দুঃসাধ্য হইবে। ইহা ছাড়া জমির মালিক যদি মহিলা হন অর্থাৎ উপযুক্ত পুরুষ তত্ত্বাবধানকারী যদি কেহ না থাকে বা যেস্থলে জমি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে রহিয়াছে, সেই সেই স্থলেও বর্তমান আইন শুভ হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যাহাই হউক, বর্গা জমির মালিকের অধিকার সঙ্কোচন ও চাষীর স্বার্থ ও অধিকার সম্প্রসারণই যদি এই বিলের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আধুনিক যুগে চাষী মজুরের কল্যাণকল্পে যে যুগধর্ম প্রবাহিত হইতেছে, জমির মালিকদের তাহা মানিয়া লওয়াই উচিত। শহরবাসী পরশ্রমজীবী মুষ্টিমেয় জমিদারের হস্তে চাষভূমির মালিকানা স্বত্ব কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া উহা লক্ষ লক্ষ চাষী ও মজুর তথা দেশের বৃহত্তর অংশের কল্যাণে বণ্টন করিবার যে দাবী আজ উঠিয়াছে, তাহাকে স্বীকার করাই উচিত।

কিন্তু চাষীর কল্যাণের ধুয়া তুলিয়া তৎসঙ্গেই জমির মালিককে যে অনাবশ্যক সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তদ্দ্বারা একটি বৃহৎ ফাটলের সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। বর্তমান কালের কঠোর জীবন সংগ্রামে জমির মালিকেরা স্বভাবতঃই এই বিধানের বলে বর্গা জমি ফিরাইয়া লইতে আরম্ভ করিবেন। নিজে বা নিজ পরিবারভুক্ত লোকের নামে শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া চাষাবাদের ব্যবস্থা করাইবেন। ফলে বর্গা জমির একটা বৃহৎ অংশই ক্রমে ক্রমে চাষীর হাত ছাড়া হইয়া তাহার সমধিক লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের কারণ হইবে। আদালতের বিড়ম্বনাও তাহাতে বাড়িবে, সত্যিকারের সুযোগ সুবিধা কৃষক তেমন কিছুই লাভ করিবে না।

পশু শিক্ষকের বিপর্যয়!

সম্প্রতি আমেরিকার নামকরা পশু শিক্ষক ও সার্কাসের খেলোয়াড় ডিক্ ক্লিমেন্স নিদারুণ এক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন বলে জানা গেছে। ডিক্ ক্লিমেন্সের নাম সারা পৃথিবীতে খ্যাত। কারণ তিনি নাকি বনের দুরন্ত বাঘ সিংহকে অদ্ভুত উপায়ে বশ করে নিয়ে অসাধ্য সাধন করাতে পারেন। হিংস্র বন্য জন্তু জানোয়ার নিয়ে তাঁর জীবনের অধিকাংশ অংশটাই অতিবাহিত হয়েছে একথা বলা চলে—কারণ গত ৩০ বছর ধরে তিনি বন্য জন্তু বশ করে তাদের রকমারি শিক্ষা দেওয়ার কাজ করছেন এবং এই দুরূহ কাজ করতে গিয়ে বাঘ সিংহের আঁচড় কামড়ও যে বহুবার খেয়েছেন তা শরীরের অসংখ্য দাগ থেকেই প্রমাণিত হয়। তাঁর পিঠের ১১৮ জায়গায় ডাক্তারদের সেলাইয়ের দাগ আছে, এ ছাড়া হাতে পায়েও বহু সেলাইয়ের দাগ আছে। এমন যে পাকা-পোক্ত পশুশিক্ষক—হঠাৎ এই কিছুদিন আগে তাঁরও প্রাণ যাওয়ার দাখিল হয়েছিল। ঘটনার দিন সকালবেলা ক্লিমেন্স সাহেব তাঁর সিংহ-পাঠশালার মস্ত লোহার খাঁচায় ঢুকলেন। প্রথমে



পশু-শিক্ষক ডিক্ ক্লিমেন্স

খাঁচার চারধারে চারটি উঁচু টুলের উপরে ভাল মানুষের মত চারটি সিংহের বাচ্চাকে এনে বসিয়ে দিলেন—বাচ্চা হলেও এদের এক একটির ওজন ২০০ পাউন্ডের মতো। এই চারটি বাচ্চাকে সেদিনই সব প্রথম একটা 'দৃশ্য অভিনয়' বা Act-এ তালিম দিতে তিনি এনেছেন। তারপর খাঁচায় ঢোকানো হলো দুটো ডোরা-কাটা বাঘ 'প্রিন্স' আর 'রজার'-কে এরা খাঁচায় ঢুকেই থমকে থেমে গিয়ে প্রথম একচোট বেশ গড়িয়ে নিয়ে তারপর যে যার যায়গায় গিয়ে বসলো। কিন্তু এর পর যে পাঁচটি বড় বড় সিংহ এসে ঢুকলো খাঁচায় তাদের দেখে মনে হলো তারা বেশ বহাল তবিয়ৎ ও খোশমেজাজেই আছে। 'টাইরোন' বলে ধীর স্থির সিংহটা খাঁচায় ঢুকেই



লাফিয়ে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসলো তার নির্ধারিত যায়গায়। 'বেটি' আর 'প্যাটসী' টিমে তালে ঢুকলো গোঁ গোঁ করতে করতে—যাক তবু তারা বিনা প্রতিবাদেই নিজের নিজের যায়গায় গিয়ে বসলো। 'জেবু' বলে দুষ্টু সিংহটা খাঁচায় ঢুকে ঘুরতে লাগলো, 'ভোলি' বলে সিংহটাও এসে বসলো। ক্লিমেন্স সাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন—বাঘ-সিংহগুলো একটু স্থির হয়ে বসলেই খেলা শেখানো শুরু করবেন। তাঁর হাতে একটা লম্বা চাবুক আর একটা মোটা লাঠি অন্য হাতে একটা চেয়ার। তিনি তাঁর সহকারী 'কে মেলোনা'কে' ডেকে বললেন—"ব্যাপারটা তো সোজাই মনে হচ্ছে হে" সে জবাব দিলে "নিশ্চয়!"

তারপর ঘটনা শুরু হলো—'প্রিন্স' নামে বাঘটি হঠাৎ ঘাবড়িয়ে গিয়ে তার লেজ আছড়াতে লাগলো, তার ল্যাজের ঝাপটা গিয়ে লাগলো 'টাইরোন' বলে সিংহটার গায়ে, সিংহটা ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠে—থাবা দিয়ে এক থাবড়া দিলে 'প্রিন্স' বলে বাঘটার মুখে। বাঘটাও গর্জে লাফিয়ে উঠলো কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল নীচে। 'টাইরোন'ও তার ওপর লাফিয়ে পড়লো এক বস্তা কয়লার মতো—সঙ্গে বাকি সব সিংহগুলোও লাফিয়ে পড়লো। তারপর ১৫ মিনিট ধরে সমস্ত বাঘ-সিংহগুলো মিলে চেঁচিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গড়াগড়ি কামড়া কামড়ি আঁচড়া আঁচড়ি করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললে। ডিক্ ক্লিমেন্স লাফিয়ে উঠলো শেষ পরিত্রাণের জন্য। প্রথমেই তিনি বাঘ দুটোকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন—কারণ এক একটা বাঘের দাম এক এক হাজার ডলার। বাঘ দুটোকে চাবুকের শব্দে ভয় দেখিয়ে প্রথমে তিনি ওপরে তুলে দিলেন। কিন্তু দেখলেন বড় সিংহ কটা বাচ্চা সিংহগুলোকে মেরে ফেলছে। ক্লিমেন্স সাহেব পাগলের মত চাবুক হাঁকড়াতে লাগলেন এবং তাঁর সাহসের ফলে পনের মিনিটের মধ্যে একে একে সব কটা সিংহই যে যার যায়গায় গিয়ে বসলো। দেখা গেল বাচ্চা সিংহ চারটের মধ্যে দুটো একেবারে লুটিয়ে পড়েছে খাঁচার মাঝখানে—একটার ঘাড় মটকিয়ে মারা গেছে—আর একটি কামড়ের ঘায়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মরতে চলেছে। আর দুটো ভয়ে কাঁপছে। যাক্ রক্ষে। এর পর ক্লিমেন্স সাহেব ধীরে ধীরে সুকৌশলে বড়ো সিংহগুলোকে আর বাঘ দুটোকে যে যার খাঁচায় পাঠিয়ে দিয়ে সেদিনকার খেলা শেষ করলেন। তারপর মাথার টুপি খুলে খাঁচা থেকে বেরিয়ে মাঠের ওপর এসে বসে পড়লেন—তখন তাঁর দেহ একেবারে কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে। কনকনে শীতের সকালে তাঁর গা দিয়ে ঝর ঝর করে ঘাম ঝরছে। খানিকক্ষণ দম নিয়ে তিনি বলে উঠলেন 'এতদিনের পর আমি আজ সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম।

ধর্মযাজকের অধার্মিকা পত্নী

আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরের বিচারালয়ে একটি মামলায় রেভারেন্ড আইজ্যাক্ বোবস্ট্ বলে এক ধর্মযাজক তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করেছেন। তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে এই যে, তিনি যখন গীর্জা ঘরে উপাসনা করছিলেন—তখন উপাসনার সারাটি ক্ষণ তাঁর স্ত্রী অনবরতই শব্দ করে কেশে-ছেন এবং যখন তিনি তাঁর ধর্মযাজকের পুলপিট বা গদীতে সমাসীন ছিলেন—তখনও তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভেঙচিয়েছেন এবং নাকের উপর বুড়ো-আঙুল চেপে মুখ-বিকৃতি করেছেন। তিনি বলেছেন একজন ধর্মযাজকের স্ত্রীর পক্ষে এ রকম ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ নিতান্ত গর্হিত যে তাতে সন্দেহ নেই।

সন্দেহ শুধু আমাদের এই যে, ধর্মযাজকটির মানব-ধর্মবোধটা কিছু কম, নয় কি?

ভাঙা হাড়ের ভেল্কী!

কিছুদিন আগে ওয়াশিংটনের ভ্যান্কুভার বলে যায়গাটিতে লিওন হাচিসন বলে একটি লোকের পা ভেঙে যাওয়ায় ডাক্তাররা পাটিকে জোড়া লাগাতে প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে গোটা পাটিকে ঢেকে সেটা শক্ত করে জমিয়ে দেন। বেচারা হাচিসন প্লাস্টার অফ প্যারিস মোড়া ভাঙা ঠ্যাঙ নিয়ে শয্যাশায়ী থাকার কয়েক দিন পরে ঐ ভাঙা পাটাকে একটু নড়াবার মতলবে তার তলায় তার আ-ভাঙা পাটাকে ঢুকিয়ে একটু চাড় দেন। ভাঙা পাটাকে ঐভাবে চাড় দিয়ে সরাতে গিয়ে বেচারা হাচিসন আস্ত পাটিকেও ভেঙে ফেলেছেন।

সতীশ কবিরাজের
শ্বাসারি
হাপানি ও ব্রঙ্কাইটীসে
বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ
নিরাময়কারী মহৌষধ
১ দাগে হাঁপ কমে
১ শিশিতে আরোগ্য
মূল্য—প্রতি শিশি ১।৹
ডাক মাশুল ৷৹
সর্বত্র বড় বড় দোকানে
পাওয়া যায়।
কবিরাজ
এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড সন্স
সাহাপুর · বেহালা · দক্ষিণ কলিকাতা

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩ **ষাণ্মাসিক—৬॥০**

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাময়িক বিজ্ঞাপন—৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জ্ঞাতব্য।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার বলেন









"আমার দেশের প্রত্যেক মা-বোনের কাছে আমি শুধু এই বলি যে তাঁরা যেন তাঁদের প্রত্যেক শারীরিক ব্যাপারে ডেটল ব্যবহার করেন: এমনকি গূঢ় ব্যাপারেও। এতে বিষ নেই, ব্যবহারের পরে দাগও লাগে না। শিশুদের পক্ষেও ডেটল পরম উপযোগী। বাড়িতে সর্বদা হাতের কাছে ডেটল রাখেন প্রত্যেক বিচক্ষণ গৃহস্থ।





'DETTOL'

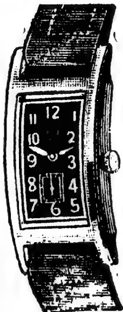
TRADE MARK

'ডেটল' আধুনিক বীজাণুপ্রতিষেধক

এ্যাটলানটিস (ইস্ট) লিঃ, ২০/১, চেৎলা রোড, কলিকাতা।

যুদ্ধের পূর্ব মূল্যে জুয়েলযুক্ত

লীভার ওয়াচ



সুইস মেড, লীভার মেশিন, নির্ভুল সময়রক্ষক, ৫ বছরের জন্য গ্যারাণ্টী দত্ত। ক্রোমিয়াম কেস, গোলাকার ২৫,, চতুষ্কোণ ৩০,, উৎকৃষ্ট ৩৩,, রেক্টাঙ্গুলার বা টোনো শেপ ৪৫,, রোল্ড গোল্ড ১০ বছরের গ্যারাণ্টীযুক্ত ৬০,। ১৫টি জুয়েল খচিত রোল্ড-গোল্ড ৭৫,, কার্ভ শেপ রোল্ড-গোল্ড ৮০,, উপরোক্ত ঘড়ি-গুলির মধ্যে মহিলাদের সাইজ লইতে হইলে শতকরা ১২॥০ করিয়া অতিরিক্ত লাগিবে। ডাকব্যয় অতিরিক্ত ৸০ আনা; একত্রে দুইটি ঘড়ি লইলে ডাক-ব্য লাগে না। ক্যাটালগ ষ্টকে নাই।

ফাউণ্টেন পেন (আমেরিকান বা ইংলিশ রোল্ডগোল্ড অথবা প্ল্যাটিনাম নিব সমন্বিত। বিভিন্ন ডিজাইনের পাওয়া যায়। মূল্য—১০, সুপিরিয়র ১২, উৎকৃষ্ট ১৫ টাকা। ডাকব্যয় অতিরিক্ত।

প্যারাগন ওয়াচ কোং

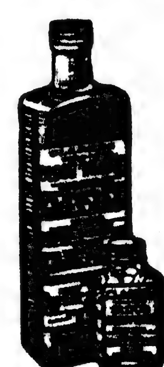
পোষ্ট বক্স নং ১১৪১৯, কলিকাতা (ডি)

রক্তদুষ্টিজনিত গোলমাল?



হতাশ হইবেন না।

প্রারম্ভে ক্লার্কস ব্লাড মিক্শ্চার ব্যবহারে উহা নিরাময় হয়। রক্ত দুষ্টিজনিত যাবতীয় উপসর্গ দূরীকরণে বিশেষ ফলপ্রদ পৃথিবীখ্যাত রক্ত-পরিষ্কারক এই প্রাচীন ঔষধটীর উপর অনায়াসেই নির্ভর করিতে পারেন।



বাত, ঘা, ফোড়া, বিখাউজ, সন্ধির বেদনা এবং অনুরূপ অন্যান্য অসুখ এই ঔষধ ব্যবহারে অবশ্যই নিরাময় হইবে।



সমস্ত সম্ভ্রান্ত ডীলারদের নিকট তরল বা বটিকাকারে পাওয়া যায়।

...ন্তর্জাতিক খাদ্যশস্য

যুদ্ধের সময়ে বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষ ...টিশ সাম্রাজ্যবাদের চিরকলঙ্করূপে ইতিহাসে ...কবে। যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে আজ ...র্যন্ত ইউরোপের ও এশিয়ার বহু দেশে ...র্ভিক্ষের বিভীষিকা রয়েছে। তার জন্য বার ...র ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি মিত্রপক্ষের ...রিগুলির মধ্যে কনফারেন্স বসেছে, এই ...ন্তর্জাতিক দুর্ভিক্ষ-বিভীষিকাকে দূর ...রবার জন্যে।

...গোড়াতে তৈরী হ'ল U. N. R. R. A ...র্থাৎ ইউরোপের যে সমস্ত দেশ যুদ্ধে ...ধ্বস্ত হয়েছে তাদের সাহায্য ও পুনর্বসতির ...ন্য ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে শুরু হ'ল সম্মিলিত ...তিপক্ষের সাহায্য ও পুনর্বসতি সমিতি। ...দেশে এই সাহায্যের নাম ক'রে বৃটেন সেখানে ...ঢুকে হয়ে ঢুকে অনেক রাষ্ট্রনৈতিক গণ্ডগোল ...কোবার সুবিধা ক'রে নিয়েছিল। যুগো-...লাভিয়াতে তেমন সুবিধা হয়নি, কারণ ...গোস্লাভিয়া সোজাসুজি বলে দিয়েছিল, ...ন্দ্রণটনের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব যদি আমাদের হাতে ...কে তবেই আমরা ঐ সাহায্য নেব নতুবা নয়। ...পোলাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি রুশ-...প্রভাবিত দেশগুলিতেও U. N. R. R. A বিশেষ ...সুবিধা করতে পারে নি। কারণ খাদ্যশস্য ...ন্টনের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজের হাতে রেখে যদি ...ই সেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ...নাক গলানোর যোগ ঘটিয়ে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত ...করবার সুবিধেই না হ'ল তবে "সাহায্য" দিয়ে ...লাভ কি? শেষ পর্যন্ত U. N. R. R. A কাজ ...বন্ধ করে দিতে হয়।

U. N. R. R. A-র কাজ যখন চলছিল ...খন থেকেই World Food Conference ...রু হয়েছিল। তাতে স্থির হয় যে, যুদ্ধোত্তর ...পৃথিবীতে বহু দেশের দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ...থাকাতে পৃথিবীর সমস্ত শস্যোৎপাদক জাতি-...গুলির উৎপন্ন শস্য একত্র করতে হবে। সেই ...মিলিত শস্যভাণ্ডার থেকে কোন্ দেশের কি ...রকার সেইটে স্থির করে সেইভাবে বাঁটোয়ারা ...রবে একটি কমিটি—তার প্রধান নেতৃত্ব হ'ল ...ইঙ্গ-মার্কিনের, আসলে মার্কিনের।

আমেরিকা অনেক দেশকেই লোভ দেখিয়ে ...আসছে খাদ্যশস্য জোগাবার, কিন্তু কথা যত ...বলেছে, কাজ করেছে তার চেয়ে অনেক কম। ...ই আন্তর্জাতিক শস্যভাণ্ডারীদের কাছে ...ভারতবর্ষ বহুকাল থেকেই উমেদার ছিল।

যে সব দেশ 'দিন আনে দিন খায়' তাতেও ...চলোতে পারে না, প্রতিনিয়ত একটা দুর্ভিক্ষের ...আশঙ্কার মধ্যে বাস করতে হয়, তাদের এই ...দুর্যোগ ও অশান্তি শেষ করবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ...আন্তর্জাতিক জরুরী খাদ্য সংসদ' বা

বৈদেশিকা

'ইণ্টার ন্যাশন্যাল এমার্জেন্সী ফুড কাউন্সিল'-এর ভারতীয় প্রতিনিধি ডাঃ ভি কে আর ভি রাও জোর ক'রে একটি প্রস্তাব এনেছেন। এই প্রস্তাব দীর্ঘকাল গোপন আলোচনার পর প্রকাশ্য অধিবেশনে গৃহীত হয়।

প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারী দেশগুলির যথা আমেরিকার, অবিলম্বে দীর্ঘ-সূত্রতা ত্যাগ করে একটা কার্যকরী শস্য রপ্তানির পরিকল্পনা গ্রহণ করানোতে বাধ্য করা।

মার্কিনদেশ বুভুক্ষু দেশকে খাদ্য জোগাবার বিষয়ে অনেক বড় বড় কথা বলেছে। দেখা যাক এবারে কি হয়। মার্চ মাসের জন্য ভারতের জন্য মার্কিন থেকে ৭৮,০০০ টন বা প্রায় ২২ লক্ষ মণ শস্য আসবার কথা কত দূর সফল হয়, আমাদের বিশ্বাস সেটা নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্কিনদেশ কোন্ নীতি অবলম্বন করছে তার উপর।

খাদ্য শস্যের মহতী বিনষ্টি

একদিকে পৃথিবীর বহু দেশে লোকে একবেলা পেট পুরে খেতে পাচ্ছে না, সকল সময়ে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় বাস করছে এবং সেই সঙ্গে মার্কিন নেতৃত্বে চালিত খাদ্য সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কমিটি-গুলি মারফৎ আমেরিকা ঐ সব দেশগুলির প্রতি অফুরন্ত সহানুভূতি জানিয়ে অক্লান্ত ভাবে তাদের খাদ্য জোগাবার "পরিকল্পনা" করে চলেছে, অন্যদিকে, সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে যে আমেরিকা অতি ব্যাপকভাবে মজুত খাদ্য শস্য বিনাশের আয়োজন করছে, পাছে বাজার দর পড়ে যায়। এইভাবে লক্ষ লক্ষ মণ আলু এরই মধ্যে নষ্ট করা হয়েছে। এটা নূতন কিছু নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জাহাজ জাহাজ গম সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মণ চাউল ও অন্যান্য খাদ্য শস্য গুদামজাত অবস্থায় পচিয়ে ফেলা হয়েছে, হাজার হাজার বিঘে কফির পাকা ফসল আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, পাছে বেশী বাজারে ছাড়লে দর পড়ে গিয়ে মুনাফা কম হয়। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণের চেয়ে ব্যবসায়ীর মুনাফার দাম বেশী।

তবে এই মুনাফা ছাড়াও এই নীতির আর একটি কারণ আছে—রাষ্ট্রনৈতিক। আন্ত-র্জাতিক রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃক আন্তর্জাতিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণের খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। সে বিষয়ে আপাতত বলা সম্ভব নয়।

নিখিল এশিয়ার কনফারেন্স

আগামী মার্চ মাসে দিল্লীতে যে নিখিল এশিয় সম্মেলন বসবে, জানা গিয়াছে, এশিয়ার অন্তত পনেরোটি বিভিন্ন দেশ তাতে যোগ দিতে সম্মত হয়েছেন। আমরা আগেও বলেছি এই কনফারেন্সের গুরুত্ব অনেক দিক থেকে খুব বেশী। এতদিন পর্যন্ত আন্ত-র্জাতিক কনফারেন্স ডাকত প্রধানত আমেরিকার বা ইউরোপের স্বাধীন জাতিরা এবং সেগুলো ডাকা হত প্রধানত ইউরোপে বা আমেরিকায়। কিন্তু দিল্লীর আগামী নিখিল এশিয় কনফারেন্সের উদ্যোক্তারা ভারতবাসী, শ্বেতচর্মী নয় এবং ঐ আন্ত-র্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে ভারতবর্ষে—ইউরোপে বা আমেরিকায় নয়। এ ছাড়াও এর আর একটি গুরুত্ব আছে। এবারে যারা মিলিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাবে তারা কেউই সাম্রাজ্য-বাদী শোষক জাতি নয়, অধিকাংশই শোষিত নিপীড়িত পরাধীন বা শ্বেতাঙ্গের উপনিবেশ-বাসী। অর্থাৎ পাশ্চাত্য শোষক জাতিদের বিরুদ্ধে প্রাচ্য শোষিত জাতিদের সংঘবদ্ধতার প্রয়াস এই প্রথম। আনন্দের কথা এর আহ্বায়ক, ভারতবর্ষ।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-বিরোধী কনফারেন্স

ইউনাইটেড প্রেসের বিশেষ সংবাদদাতার সংবাদ থেকে জানা যায়, মহাত্মা গান্ধীও ভারতবর্ষে একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরোধী কনফারেন্স ডাকবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার য়োরোপীয় ও মার্কিনী বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। স্মরণ থাকতে পারে, গত যুদ্ধের আগের যুদ্ধের বিরোধিতার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ইউরোপে হয়েছিল এবং এদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ দিয়েছিলেন। এবারে তার আয়োজন একেবারে ভারতবর্ষে এবং উদ্বোদ্ধা স্বয়ং গান্ধীজী। সত্যই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ক্রমেই আগাইয়া যাইতেছে। —যো—

রেজিষ্টার্ড "এইচ এইচ"

১০০ বছর যাবৎ খ্যাত চিত্রকূটের পার্বত্য মহৌষধ মাত্র ১ মাত্রা ব্যবহারেই হাঁপানি আরোগ্য হয়। ৭-৩-৪৭ তারিখে পূর্ণিমা রজনীতে ইহা সেবন করিতে হইবে। বৃন্দাবন গুরুকুল বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত গৌতম শাস্ত্রী মহোদয় লিখিয়াছেন:—

"এই ঔষধ ব্যবহারে ১১ জনের মধ্যে ৯ জন আরোগ্যলাভ করিয়াছে।"

ইংরাজীতে আবেদন করুন:—

শ্রী১০৮ মহাত্মা সিদ্ধবাবা

চিত্রকূট, ইউ, পি। (এম)

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটি নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক:
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য
বাহাদুর, জি বি, ই, কে, সি, এস, আই।
চীফ অফিস—আগরতলা ত্রিপুরা ষ্টেট।

ম্যাঃ ডিরেক্টর:
মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর
দেববর্ম্মণ
রেজিষ্টার্ড অফিস গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

অন্যান্য অফিসসমূহ:
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, চান্দুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মানু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গোহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।



নববর্ষ উপলক্ষে

অর্দ্ধ মূল্যে কনসেসন

এ্যাসিড প্রুভড 22Kt মেট্রো
রোল্ডগোল্ড গহণা
—গ্যারাণ্টি ২০ বৎসর—

চুড়ি—বড় ৮ গাছা ৩০ স্থলে ১৬, ছোট—২৫, স্থলে ১৩, নেকলেস অথবা মফচেইন—২৫ স্থলে ১৩, নেকচেইন ১৮" একছড়া—১০ স্থলে ৬, আংটী ১টি—৮ স্থলে ৪ বোতাম এক সেট -৪ স্থলে ২, কানপাশা, কানবালা ও ইয়াররিং প্রতি জোড়া ৯ স্থলে ৬। আর্মলেট অথবা অনন্ত এক জোড়া ২৮ স্থলে ১৪। ডাক মাশুল ৸০, একত্রে ৫০, অলঙ্কার লইলে মাশুল লাগবে না।

নিউ ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড কোং

১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর, বি, রোজ নস্য

প্রস্ফুটিত গোলাপ গন্ধে ভরপুর
ভি, পি, সমেত ২০ তোলা টিন ৩৸৵
সুশীলকুমার পাল এণ্ড ব্রাদার,
পোষ্ট বক্স নং ১০৮০৪ কলিকাতা—১।



ভাল থাকা:—ভাল থাকা প্রধানতঃ নির্ভর করে দুটী জিনিষের উপর।

প্রথম হচ্ছে যথেষ্ট ক্ষুধা থাকা আর দ্বিতীয় হচ্ছে যা খাওয়া যায় তা হজম হওয়া। এই দুটী কাজেই কুমারেশ অপরিহার্য, কারণ কুমারেশ একদিকে লিভারকে সতেজ রেখে ক্ষুধা বৃদ্ধির সহায়তা করে অন্যদিকে ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করতে সাহায্য করে। কুমারেশ শিশু যকৃত, উদরাময়, ক্ষুধামান্দ্য, সূতিকা, পুরাতন ও জটিল কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লিভার ও পেটের পীড়া সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে।

মাত্রা:—পূর্ণ বয়স্ক—জলের সহিত ৫ হইতে ১০ ফোঁটা প্রত্যহ ২ বার। শিশুদিগের—জলের সহিত ২ হইতে ৫ ফোঁটা প্রত্যহ ২ বার এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুদিগে মাতৃস্তন্য অথবা গো-দুগ্ধের সহিত ১ হইতে ২ ফোঁটা প্রত্যহ ২ বার সেব্য।

ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ।
সালকিয়া — হাওড়া।



সিঙ্গার মেশিন

গান্ধীজী দুনিয়ার সব যন্ত্র নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁর পরিকল্পিত সমাজে যন্ত্রের কোনো স্থান নেই—একমাত্র চরকা আর তাঁত ছাড়া। যন্ত্র মানুষের হাতে আসুরিক বল দিয়েছে; মানবকে দানব করেছে যন্ত্র। যান্ত্রিক শক্তি পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে ধন সঞ্চিত হয়ে ক্যাপিটালিজম-এর উৎপত্তি হয়েছে। যন্ত্র মানুষের লোভ দিয়েছে বাড়িয়ে। এখন লোভে যুদ্ধ, যুদ্ধে মৃত্যু।

গান্ধীজী যদিচ সকল প্রকার যন্ত্রের বিরোধী তথাপি তিনি স্বীকার করেছেন যে, এ যুগের একটি যন্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই যন্ত্রটি হচ্ছে সিঙ্গার মেশিন। তাঁর এই অনুরাগের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি উক্ত যন্ত্রটির জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে ঐ জন্ম ইতিহাসটি অতিশয় রোম্যাণ্টিক। সিঙ্গার সাহেব ছিলেন গরীব কেরানী, তাঁর সামান্য আয়ে সংসার ভালোভাবে চলত না। তাঁর স্ত্রী সংসারের আয় বাড়াবার জন্য ছেলেপেলের জামা সেলাই করে বিক্রি করতেন। সংসারের গৃহকর্ম সব সেরে অবসর সময়টুকু ভদ্রমহিলা সূঁচসুতো হাতে করে কাটাতেন। স্ত্রীর অবিশ্রান্ত খাটুনি দেখে স্বামীর মনে দুঃখ হত। কিন্তু উপায় কি? স্ত্রীর উপার্জিত টাকা ক'টি না হ'লেও সংসার চলে না। সুতরাং কিভাবে স্ত্রীর মেহানৎ বাঁচানো যায় সিঙ্গার সারাক্ষণ তাই ভাবতেন। সূঁচ সুতোতে সেলাই করে কি পোষায়? বহুদিন ধরে ভেবে ভেবে এই সেলাই কলটির পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। এই মেশিন তিনি একান্তভাবে তাঁর স্ত্রীর জন্যই করেছিলেন, আমার কিম্বা আপনার স্ত্রীর জন্য করেন নি। এইটিই হচ্ছে সিঙ্গার মেশিনের রোম্যাণ্টিক ইতিহাস। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর গভীর অনুরাগ এই মেশিনকে বিশেষ একটি মর্যাদা দান করেছে। গান্ধীজীর মতো যন্ত্র-বিরোধী মানুষও এর কাছে মাথা নত করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর কাছ থেকে আমার এইটুকু শুধু জানতে ইচ্ছে করে যে, ঐ মেশিনটি প্যাটেণ্ট করে সিঙ্গার সাহেব জীবদ্দশায় ক্যাপিটালিস্ট হয়েছিলেন কিনা।

যাক্‌গে সিঙ্গার সাহেব তাঁর মেশিনের দৌলতে বড়লোক হলেও আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, কারণ আমি পরশ্রীকাতর ব্যক্তি নই। এমন কি আমি পরস্ত্রীকাতরও নই। সিঙ্গার পত্নীর শ্রম লাঘবে আমার আপত্তি হবে কেন? বরঞ্চ গান্ধীজীর মতো আমিও সিঙ্গার মেশিনের কাছে মাথা নত করেছি। তাঁর স্ত্রীর দুঃখ মোচনের মধ্য দিয়ে তিনি বহু দরিদ্র পরিবারের দুঃখ দূর করেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারে এমন অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস বোধকরি আর দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু আপনারা শুনে অবাক হবেন আমার ঘরে সিঙ্গার মেশিন নেই, কিন্তু স্ত্রী আছেন এবং সেই স্ত্রীকে সিঙ্গার পত্নীর মতো সারাক্ষণ সেলাই করতে হয়। ছুঁচ সুতো দিয়ে সেলাই করার দুঃখ সিঙ্গার সাহেবের মতো আমিও প্রতিনিয়ত দেখছি। অথচ সিঙ্গারের মতো আমার মাথা থেকে কোনো উপায় তো বের হয়-ই নি, পকেট থেকেও এমন পয়সা বের করতে পাচ্ছি না, যা দিয়ে অন্তত মেশিনটি কিনে নেওয়া যায়। আমার স্ত্রী সেলাই করেন আর ছুঁচের প্রত্যেকটি ফোঁড় অক্ষম স্বামীর গায়ে এসে লাগে। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন স্ত্রীর জন্য আমার ব্যাকুলতা সিঙ্গার সাহেবের চাইতে কিছু কম নয়। এই ব্যাকুলতাটাই হ'ল রোমান্স। আমি যদি কবি হ'তাম তবে হুড-এর মতো Song of the shirt লিখতুম, অবশ্যি সেটা song না হয়ে dirge হ'ত। দুঃখের বিষয় গান্ধীজী সিঙ্গার সাহেবের যন্ত্রজাত রোমান্সটির খোঁজ রেখেছেন কিন্তু আমার হৃদজাত রোমান্সের খোঁজ রাখেন নি। এজন্য আমি নিজেকে গান্ধী মহত্ত্বের উপেক্ষিত বলে মনে করি।

আমার মতে প্রত্যেকটি যন্ত্রের ইতিহাসই রোম্যাণ্টিক। অনাবশ্যক দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে একটিমাত্র যন্ত্রের দৃষ্টান্ত দেব। হারগ্রিভস্-এর আবিষ্কৃত স্পিনিং জেনির নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। ইনি ল্যাংকাশায়ারের একজন দরিদ্র অধিবাসী। ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্রশিল্প আজ জগৎ প্রসিদ্ধ, কিন্তু এর মূলে ছিলেন হারগ্রিভস্। স্বামীস্ত্রীতে চরকা কেটে অতিকষ্টে সংসার চালাতেন। বহুদিনের চেষ্টায় ইনি একটি উন্নত প্রণালীর চরকা উদ্ভাবন করেছিলেন, তাতে ত্রিশটি টাকু লাগানো ছিল। চাকা ঘরালে এক সঙ্গে ত্রিশটি সুতো বের হ'ত। এ কাজে একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। দুঃখের বিষয় যন্ত্রটি সমাপ্ত হবার আগেই ও'র স্ত্রী মারা যান। মৃত পত্নীর নামে যন্ত্রের নাম দিয়েছিলেন 'স্পিনিং জেনি'। কিন্তু রোমান্স এখানেই সমাপ্ত হয় নি। এই যন্ত্রের খবর পেয়ে গাঁয়ের লোকেরা একদিন ও'র ঘরে ঢুকে তাঁর এত সাধের যন্ত্রটিকে আছড়ে ভেঙে চুরমার করে দেয়। সর্বনাশ, ত্রিশটি সুতো এক সঙ্গে বেরোলে যে ও একাই সকলকার ভাত মারবে। হারগ্রিভস্ প্রাণভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়েছিলেন। তবেই দেখুন এই যন্ত্রটির ইতিহাসে একাধারে রোমান্স, ট্রাজিডি, কমেডি সব কিছুই মিশ্রিত রয়েছে।

যাক্ সিঙ্গার মেশিনের প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসা যাক। আমি সত্যই সিঙ্গার মেশিনের একজন বিশেষ ভক্ত। বিশেষ করে ঐ মেশিনের শব্দটি আমার বড় প্রিয়। সিঙ্গার সাহেব স্বনামধন্য। কাজের সঙ্গে তিনি গান জুড়ে দিয়েছেন—একেই বলে music of work. আমার মতে কর্ম সঙ্গীত ধর্ম-সঙ্গীতের চাইতেও বড় কথা। মনে আছে ছেলেবেলায় দর্জির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমি এ শব্দটা শুনতাম। ছেলেবেলার ভালো লাগা সহজে মন থেকে যায় না, কাজেই সে শব্দের মোহটা আজও আমার মনে তেমনি রয়ে গেছে। পথে চলতে হঠাৎ কোনো বাড়ি থেকে এ শব্দটা এলেই একটি কর্মনিরত গৃহবধূর সুস্নিগ্ধ মূর্তি চোখে ভেসে ওঠে।

ছেলেবেলায় দর্জির দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অনেকদিন ভেবেছি বড় হয়ে দর্জির কাজ করব। এটা ছিল আমার জীবনের একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আরেকটু বড় হয়ে সে আকাঙ্ক্ষা আরো দৃঢ় হয়ে ছিল যখন জানলুম—a gentleman is what his tailor makes him। এ্যাঁঃ তাহ'লে দর্জিরা ভদ্রলোক তৈরি করতে পারে! এ তো কম কথা নয়, এ যে সকল কাজের সেরা কাজ। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ভদ্রলোক খুব কমই সৃষ্টি করেছেন—ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি—nature's gentleman। বাদ বাকী দুনিয়ার সব ভদ্রলোক দর্জির সৃষ্টি কিম্বা বলতে পারেন সিঙ্গার মেশিনের সৃষ্টি। জীবনের অনেক আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়নি। দর্জি হয়ে ভদ্রলোক তৈরি করব, এ উচ্চাশাও অপূর্ণ থেকে গেছে। এখন আমি নিজেই দর্জির তৈরি ভদ্রলোক হয়ে বসে আছি।

ডাকযোগে সম্মোহনবিদ্যা শিক্ষা

ডাকযোগে হিপ্নোটিজম্ মেস্মেরিজম, মাইণ্ড রিডিং, একাগ্রতা শক্তি ইত্যাদি বহুমূল্য বিদ্যা ১০ সপ্তাহে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা বহু প্রকার রোগ আরোগ্য এবং চরিত্র ও অভ্যাস দোষ দূর করা যায়। গত ৪০ বৎসর যাবৎ দেশে ও বিদেশে সহস্র সহস্র শিক্ষার্থীকে এই সকল গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই মহোপকারী বিদ্যা সাহায্যে আর্থিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করুন।

নিয়মাবলীর জন্য ৷১৫ ডাকটিকেট পাঠান।

—আর, এন্, রুদ্র—

লা কুঠী, হাজারিবাগ, বিহার (এম)

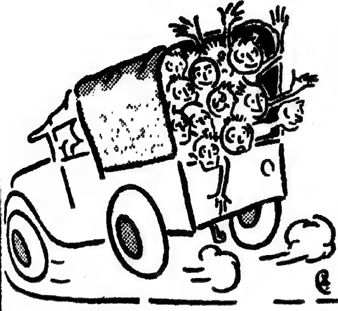


নন্দীগ্রাম হইতে বিজয়নগরের পথে গান্ধীজী : পথ পার্শ্বে একটি পল্লীতে মুসলমান বালকবালিকারা সকালবেলায় খোলা রৌদ্রে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছে দেখিয়া গান্ধীজী আনন্দ প্রকাশ করেন।



প্রসাদপুর অভিমুখে গান্ধীজী : মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ (৩য় সারি) ও অন্যান্য কর্মিগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছেন।

ট্রামে-বাসে না বলিয়া ট্রাকে-পথে বলিলেই ঠিক বলা হইত। ট্রাম চলে না আর বাসে চড়িতে পারি না। আগে ঠিক মত নামা ওঠা না হইলেও কনডাকটার চেঁচাইয়া বলিতেন—"যাও ঠিক হ্যায়" এবং ফলে যাত্রীরা বেঠিক হইয়া ছিটকাইয়া পড়িতেন। হালে নূতন Slogan আমদানী করা হইয়াছে—"আগে বাড়িয়ে, আগে বাড়িয়ে" এবং অগ্রগমনের এই



clarion call শুনিয়াও যাঁরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন তাঁহাদিগকে খাঁচার মুরগীর মত ঠেলাইয়া বা গা ধরিয়া ধাক্কা দিয়া সামনে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং বাধ্য হইয়াই অগত্যা—"পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া" বলিয়া পথ ধরি এবং নেহাৎ বরাতজোর থাকিলে ট্রাকে উঠিয়া পড়ি। কর্তারা নির্বিকার, আমাদেরও মাথাব্যথা নাই বাস্ আর ট্রাম না পাইয়া ট্রাক নিয়াই tra-la-la-la করিতেছি।

* * *

গান্ধীজী জনৈক মুসলমানকে বলিয়াছেন—"I want your heart and nothing else." কিন্তু যাঁদের এই জিনিসটির বালাই নাই তাঁরা, কি দান করিবেন সেই কথাটাও বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল।

* * *

আঠার হইতে পঞ্চাশের মধ্যে যাঁদের বয়স ভোটের অধিকার একমাত্র তাঁদেরই থাকা উচিত—এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন গান্ধীজী এবং এই প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন—"Of course I would debar lunatics and loafers." "গান্ধীজীর এই কথায় রাগ করিয়া আমরা স্বতন্ত্র ভোটাধিকারের দাবী না জানাইলেই বাঁচি"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

মুসলিম লীগ গণ-পরিষদ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না জানাইয়া নাকি লাট সাহেবকে এক পত্র দিয়াছেন। তাঁদের এই স্পষ্টবাদিতায় খুশী হইলাম। ছাড়িব বললেই কি ছাড়া যায়?—"কেন আর মিছে মায়া কাণ্ডন কান্না তো রবে না" বলিয়া কত উপদেশই তো দেওয়া হইয়াছে কিন্তু মায়া আর কাণ্ডন কজনেই বা ছাড়িয়াছেন?

* * * * * *



রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধার অনেক আশ্বাসের কথা অনেকবার শুনিয়াছি। তার পরিবর্তে সম্প্রতি শুনিতেছি তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া নাকি বৃদ্ধি করা হইবে। "ইহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ভাঁড়ামি ছাড়া আর কি বলা যায়।"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

অন্য একটি সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতায় শীঘ্রই নাকি টেলিফোন লাইন বৃদ্ধি করা হইবে। অনেক লাইনের প্যাঁচে পড়িয়া অতঃপর বে-লাইনে পড়িবার আশঙ্কা থাকিলেও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিতে পারিলাম না কেননা বিষয় বস্তুটি নেহাৎ "হ্যালোড্"!

* * *

কেন্দ্রীয় পরিষদে হিন্দু-বিবাহ সংস্কার বিলের যাঁরা বিরোধিতা করিয়াছেন—তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্তা অম্মু স্বামি-



নাথন জিজ্ঞাসা করেন—"আপনাদের স্ত্রীরা আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন এই ভয়েই কি আপনারা বিলটির বিরোধিতা করিতেছেন?"—"এই সুকঠিন প্রশ্নের উত্তর দেবতারাও দিতে পারিতেন না—কুতো সদস্যাঃ"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

একটি পরীক্ষায় জানা গিয়াছে মেয়েদের স্মৃতিশক্তি নাকি ছেলেদের অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহাতে ছেলেদের লজ্জিত বা আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই—"ভুলে গেছ জানি তবু ভুল করে আমারে স্মরিও প্রিয়"—বলিয়া প্রেম নিবেদন করিতে

তাঁরা কখনই কুণ্ঠিতা হইবেন না—সুতরাং মাভৈঃ।

* * * * *

একটি গবেষণায় জানা গেল, মানুষ নাকি বাঁদরের বংশধর নয়। কপিকুলের ভাগ্য ভাল যে, তাঁরা মানুষের পূর্বপুরুষ



হওয়ার অপবাদ হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইয়া গেলেন!

* * * * *

বিলাতে নাকি নিদারুণ কয়লা সঙ্কট দেখা দিয়াছে। এইবারে New Castle-এ Coal Carry করার সুযোগ সমুপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু করিবে কে, আমাদের পক্ষে আসানসোলও যে—আসান্-এর বদলে শুধু শূলই হইয়া রহিল।

* * * * *

বিলাতে যে দুগ্ধ সরবরাহ করা হয় তাহাতে কত ভাগ জল থাকে এই সংবাদটি জানিতে চাহিয়াছেন কেন্দ্রীয় পরিষদের শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ। খুড়ো বলিলেন—বিলাতের দুধ খাই নাই সুতবাং সঠিক খবর দেওয়া শক্ত। তবে আমার মনে হয় জল মিশাইলেও তাঁরা দুধেই জল মেশান, আমাদের মত জলে দুধ মেশান না!

* * * * *

প্রসঙ্গত অন্য একটি সংবাদ মনে পড়িয়া গেল। কোন Dairy বিশারদ নাকি বলিয়াছেন যে, জলভরা রবারের কম্বল পরাইয়া রাখিলে গাভীদের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। "আমাদের খাটাল বিশারদরা দুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধির আরও সহজ পন্থা বাৎলাইয়া দিতে পারেন, প্রয়োজন হইলে আবেদন করিতে পারেন"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

একজন মস্তিষ্ক বিশারদ মার্শাল স্টালিনের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন—"I found nothing wrong with Stalin's brain"—এই সংবাদ শুনিয়া অনেকেরই নাকি মস্তিষ্ক বিকার ঘটিতেছে—অবশ্য এই মাথা খারাপের খবরটা অসমর্থিত!

রঙ্গজগৎ

অভিযাত্রী—কাহিনী ও প্রযোজনা—জ্যোতির্ময় রায়। পরিচালনা—হেমেন গুপ্ত। প্রধান ভূমিকায়—রাধামোহন ভট্টাচার্য ও বিনতা রায়। সঙ্গীত পরিচালনা—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বসুধারা বাণী চিত্র কর্তৃক গৃহীত।

এক বাঙ্গালী মিল-মালিকের দুই পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্রটি বিলাত হইতে স্বদেশ-প্রেমিক হইয়া দেশে ফিরিয়া রিলিফ ইত্যাদি নানাপ্রকার সেবামূলক কাজে যোগ দিল। তাহারি পিতার অফিসের অ্যাকাউণ্টাণ্টের কন্যার সহিত এই সেবাকার্যের সম্পর্কেই উক্ত ধনী সন্তান দেশ-প্রেমিক যুবকের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইল। অবশেষে ইহার পরিণতি অনুরাগের রূপ গ্রহণ করিল। মালিকের প্রথম পুত্র অ্যাকাউণ্টাণ্টকে একদিন অপমান



অভিযাত্রী চিত্রে বিনতা

করে। ইহার কারণ অ্যাকাউণ্টাণ্টের কন্যা মিলের শ্রমিকদিগের মধ্যে সংগঠন আন্দোলন করিতেছিল। প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এই পরিস্থিতিতে উদারপন্থী দ্বিতীয় পুত্র মিল পরিচালনার ভার গ্রহণ করে এবং শ্রমিক-দিগকে তাহার সততা ও উদারতার উপর নির্ভর করিয়া কার্যে যোগদানের আবেদন জানায়। এক দল শ্রমিক ইহাতে খুসি হয়, এবং কাজে যোগদানে রাজি হয়। ঠিক এই সময় তাহারি সহব্রতিনী ও প্রণয়ে অনুরক্তা অ্যাকাউণ্টাণ্টের কন্যা ইহার প্রতিবাদ করে। শ্রমিক-আন্দোলনের অন্যতম পরিচালিকা এই তরুণীর বক্তব্য হইল—কাহারো ব্যক্তিগত সততার উপর নির্ভর করিয়া শ্রমিকেরা তাহারি সদিচ্ছার উপর সকল দাবীর বিবেচনা ছাড়িয়া দিতে পারে না। মালিকের প্রথম পুত্র, যিনি অ্যাকাউণ্টাণ্টকে অপমান করিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া তাহার অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তবেই শ্রমিকেরা কাজে ফিরিয়া যাইবে, ইহাই ছিল অপর দল শ্রমিকের দাবী। কিন্তু মিল-মালিক ও তাঁহার প্রথম পুত্র এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। অ্যাকাউণ্টাণ্টের কন্যার নেতৃত্বে একদল শ্রমিক মিলের ফটকে পিকেটিং করিতেছে ও অপর দল কাজে যোগদানের জন্য মিলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল। এই ধর্মঘট-বিরোধী দ্বিতীয় দলের মধ্যে অ্যাকাউণ্টাণ্ট ভদ্রলোকটিও ছিলেন। কারণ তিনি মিল-মালিকের দ্বিতীয় পুত্রের সততা ও উদারতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ঠিক এই গণ্ড-গোলের সময় মিল-মালিকের নির্দেশে কতকগুলি উর্দি পরিহিত সশস্ত্র লোক আসিয়া গুলী চালাইল। ফলে অ্যাকাউণ্টাণ্ট নিহত হইলেন। মরিবার আগে ইনি তাঁহার কন্যা ও সম্মুখে উপস্থিত মালিকের দ্বিতীয় পুত্রকে 'মতের মিল' করিবার জন্য উপদেশ দিয়া গেলেন। শেষ দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার মিলনের ইঙ্গিতপূর্ণ এই উপদেশটির পরই ঘটনার যবনিকাপাত ঘটিল।

চিত্রে প্রদর্শিত এই কাহিনী আগাগোড়া একটি রিপোর্টের মত মনে হইল। ঘটনা কোথাও যথার্থ নাটকীয় স্বরূপ লইয়া কৌতূহল দ্বন্দ্ব সংঘাত ও ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কাহিনীর সমস্যা বা বিষয় বস্তুটির মধ্যে কোনও জোর নাই। "দুইটি সংঘবদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষ" যাহা মূল কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বলিয়া মনে হইল, তাহা কাহিনীর মধ্যে কোথাও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। পরিণামে যাহা হইল তাহা একটি অবাস্তব মেলোড্রামা মাত্র, ধর্মঘটী পিকেটারদের দমন করিবার জন্য যে গুলী চালান হইল, তাহার ফলে একজন পিকেটারেরও কিছু হইল না, মরিল একমাত্র অ্যাকাউণ্টাণ্ট ভদ্রলোক—যিনি ধর্মঘটের বিরোধী এবং মিলে প্রবেশের উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। গুলী চালনায় অনেক ক্ষেত্রে ভুল হইয়া থাকে অবশ্য কিন্তু আমরা ধরিয়া লইতে পারি, 'অভিযাত্রী' কাহিনীর বিষয়বস্তু গুলী চালনায় ভ্রান্তি নহে। বহু অবান্তর চরিত্র সৃষ্টি করিয়া কাহিনীকার কাহিনীর মধ্যে জঞ্জাল বাড়াইয়াছেন। জেল মুক্ত যক্ষ্মারোগী রাজবন্দী যুবকটির জন্য কয়েক হাজার ফুট সেলুলয়েড খরচ হইয়াছে, কিন্তু কাহিনীর মধ্যে এই যক্ষ্মারোগীটি কেহই নহে। সেবা-সমিতির অফিসের বিস্তৃত সরঞ্জাম কাগজপত্রের ঘটা ও ফার্ণিচারের চটক দেখিয়া রাইটার্স বিল্ডিং লজ্জিত হইবে।

বন্যা প্লাবিত মেদিনীপুরের দুর্গত-দিগকে কয়েকখানা করিয়া ফুলকো লুচি খাওয়াইয়া সেবা-ব্রতের আদর্শ ও পদ্ধতির বাস্তব পরিচয় দেওয়া হয় না। মিল-ঘটিত ব্যাপার, অথচ চিত্রে কোথাও যদি মিলের একটি চিমনীও উঁকি না দেয় তবে দর্শকবর্গ হয়ত কষ্ট করিয়া উহার অবাস্তবতা মনে মনে সহ্য করিবে কিন্তু উহার দ্বারা প্রয়োগকর্তা ও পরিচালকের রুচি ও দক্ষতা অবাস্তব বলিয়া বিবেচিত হইবে। মিল, মিলের



ভ্যানগার্ড প্রডাকসন্সের 'জয়তারা' চিত্রে সুমিত্রা

শ্রমিক, 'ধনতান্ত্রিক শোষণ' মেদিনীপুরের বন্যা, ধর্মঘট ইত্যাদি ব্যাপার রূপকথা নহে, কাজেই উহার পরিচয়ও মাত্র 'বাক্যোন আশ্রিত' নহে। কতকগুলি আবছা ও অবাস্তব হুড়া-হুড়ির দৃশ্য দেখাইয়া প্রকৃত ঘটনার তাৎপর্য পরিস্ফুট করা যায় না। কাহিনীর প্রধান দুর্বলতা হইল—একটি সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া কাহিনী গড়িয়া উঠে নাই। কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা অকারণে গড়াইয়া গড়াইয়া শেষে একটা নাম-মাত্র সমস্যায় (মিল-মালিকের প্রথম পুত্রের ক্ষমা প্রার্থনার সমস্যায়) পৌঁছিয়াছে।

অভিনয়। নিতান্ত দুঃখের বিষয় 'অভিযাত্রী'র কোন ভূমিকার অভিনয় দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবার অবকাশ মিলিল না। রাধা মোহনের অভিনয় সাবলীল হইয়াছে সত্য কিন্তু ভাবহীন আবৃত্তির মত। বিনতা অভিনয় মার্জিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু সু-অভিনয় করিবার ক্ষমতা ে

তাঁহার আছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জনৈক নূতন অভিনেতা (শম্ভু মিত্র) মিলমালিকের প্রথম পুত্রের ভূমিকায় অফিস ম্যানেজাররূপে ম্যাজিকওয়ালার মত যে মাত্রাহীন লম্ফঝম্প ও অতি-অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে দর্শকমাত্রই পীড়িত হইয়াছে। বৃদ্ধ মিলমালিকের ভূমিকায় কমল মিত্র মোটামুটি ভালই অভিনয় করিয়াছেন। একমাত্র অ্যাকাউণ্টান্টের ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় কিছুটা প্রশংসার দাবী করিতে পারে।

ফোটো। ফোটোগ্রাফী অপরিচ্ছন্নতার দোষে দুষ্ট, শব্দগ্রহণ ততোধিক—স্থানে স্থানে সংলাপ একেবারেই শ্রুতিগোচর হয় নাই এবং রবীন্দ্রনাথের ভাল কয়েকটি গানের মাধুর্য এই ত্রুটির জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সংলাপের ভাষা অতিরিক্ত সাহিত্যিকতার প্যাঁচে মর্মহীন হইয়াছে।

আর একটি কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব। চিত্রটি দেখিয়া লায়নেল ব্যারিমুর অভিনীত ইংরাজি ছায়াচিত্র Valley of Decision-এর কথা স্বতঃই মনে পড়িয়া যায়। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, কাহিনীকার ও পরিচালক উক্ত চিত্রটির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া তাহারি অনুসরণের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন।

পুস্তক পরিচয়

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য নাটিকা—অধ্যাপক শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সান্যাল এণ্ড কোম্পানী, ১।১এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

গ্রন্থ মধ্যে এই কয়টি নাটক নাটিকা স্থান পাইয়াছে—নেতাজী সুভাষচন্দ্র, মহুয়া, কঙ্ক ও লীলা, কবি চন্দ্রাবতী। নেতাজী সুভাষচন্দ্র নাটকে লেখক তিনটি অঙ্কে নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের কাহিনীকে নাট্যরূপ দান করিয়াছেন। মহুয়া নাটিকা একটি পল্লী গীতিকা অবলম্বনে রচিত। কবি চন্দ্রাবতী ময়মনসিংহের মনসার ভাষাণ রচয়িতা বংশীদাসের কন্যা। তিনি নিজে কবি ছিলেন এবং পদ্যে রামায়ণ এবং বহু লোকসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-কাহিনী অতি বিচিত্র; কিন্তু লেখক যেরূপ সংক্ষেপে উহা নাটিকায় গ্রথিত করিয়াছেন তাহাতে চন্দ্রাবতীর জীবনের বিশেষ কোন পরিচয় ফুটিয়া উঠে নাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাটকের সহিত, এতগুলি নাটিকা জুড়িয়া দিবারও সার্থকতা দেখিলাম না। তবে লেখকের ভাষা, ভঙ্গী এবং পাত্রপাত্রীর সংলাপ নাট্যোপযোগী। মইটি সুমুদ্রিত। ১২।৪৭

বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা

সম্পাদনা: জগদিন্দু বাগচী

পঙ্কিল

Kuprin-এর Yama the pit-এর প্রথম সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন কুমারেশ ঘোষ ও সুকুমার গুপ্ত। রাশিয়ার বারবনিতাদের কলঙ্কময় করুণ কাহিনী। দাম ৩৸০।

রোড্ ব্যাক্

Remarque-এর Der Weg Zuruck-এর অনুবাদ করেছেন কুমারেশ ঘোষ। দাম ২॥০।

১৪ই ডিসেম্বর (যন্ত্রস্থ)

Merezhkovsky-র December the Fourteenth -এর সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করেছেন চিত্তরঞ্জন রায় ও অশোক ঘোষ। জার-শাসিত রাশিয়ার স্বরূপ পরিচয়—ভয়াল, মর্মন্তুদ, মহৎ।

রীডার্স কর্ণার

৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬

নকল হইতে সাবধান

পাকা চুল কাঁচা হয়

(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)

কলপে সারে না। আমাদের নির্দোষ কেশরঞ্জন সুগন্ধি আয়ুর্বেদীয় তৈলে চুল চিরতরে স্বভাবিক কাল হইবে, আর পাকিবেই না। এই তৈল মাথা ও চক্ষুরও খুব উপকারী, বিশ্বাস না হইলে, মূল্য ফেরতের গ্যারাণ্টি লউন। মূল্য ২॥০, অল্প পাকায়, ৩॥০ তাহার বেশী পাকায় ও ৫, সব পাকায়।

HIND KALYAN AUSHADHALAYA
No. 19 P.O. Katri Sarai (Gaya)

শুভ স্বার উদ্ঘাটন
শনিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারী



কাহিনী—প্রণব রায়
সংগীত—সুবল দাশগুপ্ত
অন্যান্য ভূমিকায়ঃ—অমর মল্লিক, জহর, অহীন্দ্র, বেচু, রবি রায়, মায়া প্রভৃতি

= একযোগে চলিতেছে =

মিনার ✻ বিজলী ✻ ছবিঘর

(৩, ৬, ও রাত্রি ৮॥টা) (২, ৫, ৭॥টা)

দুই দিন পূর্বে অগ্রিম সিট রিজার্ভ করিয়া আসিবেন।



শক্তির
চ্যবনপ্রাশ

সর্দি, কাশি, শ্বাসনালী ও বুকের যাবতীয় রোগ নিরাময়ের জন্য

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর
শক্তি ঔষধালয়
ঢাকা

ভারতের শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান · স্থাপিত ১৯০১ সাল

খেলাধূলা

ক্রিকেট

আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে একটি খেলা শেষ হইয়াছে। ঐ খেলায় পশ্চিমাঞ্চল দল ২৭০ রাণে পূর্বাঞ্চল দলকে পরাজিত করিয়াছে। উভয় দলের শক্তি বিচার করিলে যোগ্য দল সাফল্য লাভ করিয়াছে। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তবে খেলা খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই। বিশেষ করিয়া পূর্বাঞ্চল দল ব্যাটিংয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। কোন ইনিংসেই ২০০ রাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এই দলে বাঙ্গলার চারিজন খেলোয়াড় খেলিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম, ইঁহাদের কেহ না কেহ ব্যাটিং অথবা বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু আমাদের সেই আশা নিরাশায় পরিণত হইয়াছে। কি ব্যাটিং, কি বোলিং কোন বিষয়েই বাঙ্গলার কোন খেলোয়াড় সুবিধা করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে কেহই যে অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় দলে স্থান পাইবেন না, এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তরুণ খেলোয়াড় পি চ্যাটার্জিকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। দিলে কি করিতেন বলা কঠিন। এই বৎসর অধিকাংশ খেলায়, এমন কি রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলাতেও তিনি বোলিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকে খেলিবার সুযোগ কেন যে দেওয়া হইল না, আমরা বুঝি না।

রঙ্গনেকারের প্রশংসনীয় ব্যাটিং

পশ্চিমাঞ্চল বনাম পূর্বাঞ্চলের খেলায় একমাত্র রঙ্গনেকার পশ্চিমাঞ্চলের পক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে প্রশংসনীয় ব্যাটিং করিয়াছেন। তিনি নির্ভীকভাবে ৩০৮ মিনিট খেলিয়া শেষ পর্যন্ত ২০০ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। ইনি ইংলণ্ড প্রত্যাগত ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে বোম্বাইতে ও কলিকাতায় শতাধিক রাণ করেন। সেই দুই খেলায় তিনি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ইঁহাকে অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় দলে নির্বাচকগণ স্থান দিতে বাধ্য, ইহা বলাই বাহুল্য। ইহার পরেই আর একজনের নাম না করিলে অন্যায় করিব—তিনি হইতেছেন ফাদকার। ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়েই পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। ইনিও অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী দলে স্থান পাইবেন বলিয়া মনে হয়।

খেলার বিবরণ

পশ্চিমাঞ্চল দল প্রথম ব্যাটিং লাভ করে। বিজয় মার্চেণ্টের এই দলের অধিনায়কত্ব করিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি অসুস্থতার জন্য অধিনায়কতা করিতে পারেন না। বিজয় হাজারী তাঁহার পরিবর্তে দলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। চা-পানের দুই মিনিট পূর্বে পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ২৬৯ রাণে শেষ হয়। সি এস নাইডু ও সারভাতের বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়। পূর্বাঞ্চল দল খেলিয়া প্রথম দিনের শেষে ৩ উইকেটে ৬১ রাণ করে। দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্নভোজের অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে পূর্বাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ১৯৭ রাণে শেষ হয়। একমাত্র নিম্বলকার শেষ পর্যন্ত ৭৬ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। তিনি উক্ত রাণের মধ্যে দুইটি ওভার বাউণ্ডারী ও ৮টি বাউণ্ডারী করেন। পশ্চিমাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় দিনের শেষে ৬ উইকেটে ২২৪ রাণ করে। রঙ্গনেকার ১৩০ রাণ ও ফাদকার ৫ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্নভোজ পর্যন্ত খেলিয়া পশ্চিমাঞ্চল দল ৬ উইকেটে ৩২৪ রাণ করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। রঙ্গনেকার ২০০ রাণ ও ফাদকার ৩১ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। পূর্বাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। রাণ তুলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ফাদকার ও আমীর ইলাহির মারাত্মক বোলিংয়ের জন্য মাত্র ১২৬ রাণ করিয়া ইনিংস শেষ করে। ফলে পশ্চিমাঞ্চল দল ২৭০ রাণে খেলায় জয়লাভ করে।

খেলার ফলাফল :—

পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংস :— ২৬৯ রাণ (আর এস মোদী ৬১, বিজয় হাজারী ৬৪, গুল মহম্মদ ৪৫, ফাদকার নট আউট ২৭, সারভাতে ৫৪ রাণে ২টি, সি এস নাইডু ৫২ রাণে ৩টি ও এস ব্যানার্জি ৪৪ রাণে ২টি উইকেট পান)।

পূর্বাঞ্চল প্রথম ইনিংস :—১৯৭ রাণ (নিম্বলকার নট আউট ৭৬, এন চ্যাটার্জি ৩৫, কে বসু ৩০, সি এস নাইডু ২৬, ফাদকার ৩২ রাণে ২টি, রণবীর সিংজী ১৪ রাণে ৩টি ও আমীর ইলাহী ১৩ রাণে ২টি উইকেট পান)।

পশ্চিমাঞ্চল দ্বিতয় ইনিংস :—৬ উইঃ ৩২৪ রাণ (রঙ্গনেকার নট আউট ২০০, ফাদকার নট আউট ৩১, এস ব্যানার্জি ৬৫ রাণে ৩টি, এন চৌধুরী ৫২ রাণে ১টি উইকেট পান)।

পূর্বাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংস :—১২৬ রাণ (সারভাতে ২৯, এস ব্যানার্জি ২৩, ফাদকার ৫৪ রাণে ৫টি ও আমীর ইলাহি ২৭ রাণে ৪টি উইকেট পান)।

টেনিস

নিখিল ভারত টেনিস এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ আগামী ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য পাঁচজন খেলোয়াড়কে মনোনীত করিয়াছেন। নির্বাচক ঠিক কাহারা ছিলেন জানি না, তবে তাঁহারা উপযুক্ত নির্বাচন করিয়াছেন ইহা আমরা স্বীকার করিতে অক্ষম। এমন কি পক্ষপাতদুষ্ট রোগ হইতেও যে সম্পূর্ণ মুক্ত ইহাও আমরা বলিতে পারি না। এই দলে এমন একজন খেলোয়াড়কে লওয়া হইয়াছে যিনি আন্তঃর্জাতিক তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজ গুরুদ্ভার লইয়া কিরূপে খেলিবেন তাহাই আমরা কল্পনা করিতে পারি না। যদি কো[...] খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় আমাদের আশঙ্কা হ[...] ইনি এক সেটের বেশী কোনরূপেই খেলি[...] পারিবেন না। তাহা ছাড়া গত কয়েক বৎসরই ইঁ[...] ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন খেলায় শোচনী[...] ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। উদীয়মান তরু[...] খেলোয়াড়গণ ইহাকে অনায়াসে পরাজিত করিয়াছেন এমন কি এইবারের টেনিস মরসুমের কোন প্রতি[...] যোগিতাতেই অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করি[...] পারেন নাই। ইহার পরও ইহাকে দলভুক্ত করিবার [...] যুক্তি থাকিতে পারে আমরা বুঝিতেই পারি না।

অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড়দের লইয়া ডেভি[...] কাপ দল গঠিত হইবে ইহাই ছিল আমাদের দৃ[...] বিশ্বাস। কিন্তু এখন অতি দুঃখের সহিতই বলি[...] হইতেছে নির্বাচকগণ সেইদিকে একেবারেই দৃ[...] দেন নাই। যে দল তাঁহারা নির্বাচন করিয়াছেন তাহ[...] মধ্যে একমাত্র সুমন্ত মিশ্র ছাড়া কাহাকেও তর[...] বলা চলে না। আমরা আশ্চর্য হইতেছি নির্বাচক[...] কিরূপে তরুণ খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ উপে[...] করিলেন? যে তরুণ খেলোয়াড় বিশ্ববিখ্যাত চেকে[...] শ্লাভিয়ান ড্রুনবীকে পরাজিত করিয়া সকল চমৎকৃত করিল তাহার সম্বন্ধে কি ইঁহাদের একব[...] বিবেচনা করা উচিত ছিল না? নির্বা[...] খেলোয়াড়দের ন্যায় হয়ত বা তাঁহার অভিজ্ঞতা ন[...] কিন্তু তাহা বলিয়া কি নির্বাচিত খেলোয়াড়[...] সমতুল্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে কি তরুণ খেলোয়াড় অক্ষম? আমাদের মতে তরুণ খেলোয়াড় অনেকের অপেক্ষা ভাল খেলি[...] পারে। যদি তাহাই না পারিত তাহা হইলে ড্রুন[...] ন্যায় একজন বিচক্ষণ খেলোয়াড়কে পরাজিত তাহার পক্ষে এত সহজ হইত না। যে খেলোয়াড় গঠন করা হইয়াছে তাহা লইয়া ডেভিস কাপ করা অসম্ভব, সুতরাং স্থূলকায়, খেলিতে অ[...] খেলোয়াড় দ্বারা দল গঠন না করিয়া অধিক[...] তরুণ খেলোয়াড়দের লইয়া একটি দল গঠন ক[...] কি ক্ষতি ছিল?

নিম্নে মনোনীত খেলোয়াড়দের নাম [...] হইল :—গউস মহম্মদ (অধিনায়ক), ইফতি[...] আমেদ, দিলীপ বসু, জিম মেটা ও সুমন্ত [...] গউস মহম্মদ, দিলীপ বসু ও সুমন্ত মিশ্রের হইতে সিংগলস এবং দিলীপ বসু, ইফতি[...] আমেদ, জিম মেটা ও সুমন্ত মিশ্রের মধ্য হ[...] ডাবলস দল গঠন করা হইবে।

হকি

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় বা[...] পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ১৬ জন খেলে[...] মনোনীত করা হইয়াছে। যে সকল খেলোয়[...] নির্বাচিত করা হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে [...] কিছুই বলিতে চাহি না তবে প্রতিযোগিতায় [...] সুনাম অর্জন করিবে ইহা আমাদের ভরসা হ[...] বাঙলা দল সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আ[...] আন্তরিক কামনা। নিম্নে মনোনীত খেলোয়[...] নাম প্রদত্ত হইল :—আর কার (অধিনায়ক), জ[...] জয়েল, ডেভিড, হজেস, আই মিড, এস ম[...] টার্নবুল, ক্লডিয়াস, ডালজে, এস মল্লিক, ম[...] কুশল সিং, রোচ, জাকী ও প্লাকেন।

"মাপ করুন!"



"আগে ভিতরের আবর্জনা পরিষ্কার করা স্বাস্থ্যতত্ত্বের মূল কথা"



কাগজের বাক্সের মধ্যে টিনে প্যাক করা থাকে। সর্বত্র নূতন মাল পাওয়া যায়।

সকালে উঠে মুখ-হাত ধোবার আগেই দেহের ভিতরটাকে পরিষ্কার করার কথা ভাবুন। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের দৃঢ় ভিত্তি এরই উপর। এক গ্লাস ঝলমলে এণ্ডরুজই শুধু একাজ করতে পারে। প্রয়োজন মত নিয়মিত ব্যবহারে ইহা সমস্ত দেহযন্ত্রকে সজীব ও সতেজ করে, দেহ-চর্ম্ম পরিষ্কার করে, দৈনন্দিন বহু ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করে। এণ্ডরুজের ক্রিয়া মৃদু কিন্তু অব্যর্থ। এণ্ডরুজ কি কি করে দেখুন:—

এণ্ডরুজ মুখ ও জিহ্বা পরিষ্কার ও সঞ্জীবিত করে। এণ্ডরুজ পাকস্থলীকে অম্লশূন্য করে স্বাভাবিক রাখে। এণ্ডরুজ লিভারকে সবল রাখে ও পিত্তাধিক্য দমন করে। এণ্ডরুজ ধীরে ধীরে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে দেহাভ্যন্তর সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন রাখে। ইহা যন্ত্রণাদায়ক বিষবস্তু দূর করে, কোষ্ঠকাঠিন্য ভাল করে এবং রক্ত বিশুদ্ধ ও ঠাণ্ডা রাখে।

ANDREWS

এণ্ডরুজ লিভার সল্ট

স্নিগ্ধ, সতেজ ও সবল করে

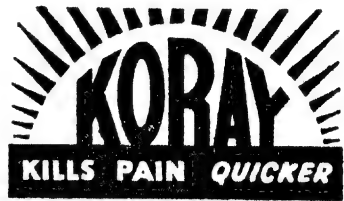
এই অভিনব ব্যবস্থায় দ্রুত বেদনা নিরাময় করুন



মাথাধরা বা অনুরূপ ব্যথা বেদনায় আপনি ইহাই করুন। ঈষৎ লাল একটি কোরে বটিকা সেবন করুন। তারপর কয়েক মিনিট বিশ্রাম গ্রহণ করুন।



দেখিবেন, বেদনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত ডীলার মাত্রেই কোরে রাখিয়া থাকেন। ৬ বটিকার একটি প্যাকেটের মূল্য দুই আনা। ৩০ বটিকার প্যাকেটের দশ আনা। পরিবর্তে অন্য কিছু লইবেন না। স্মরণ রাখিবেন, কোরে অতি সত্বর বেদনা নিরাময় করে।



কোরে

অতি সত্বর বেদনা নিরাময় করে

কোরে লিঃ, ২৫, হ্যানোভার স্কোয়ার, লণ্ডন, ডব্লিউ ১

ভারতের প্রতিনিধি :

জি এথারটন এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা ও বোম্বাই

রঞ্জ-টোন

স্নায়বিক ও সর্বপ্রকার দৌর্বল্যে শক্তিবর্দ্ধক ওয়াইন টনিক।

মাত্রা—চায়ের ২ চামচ অথবা ৪ চামচ আহারান্তে প্রত্যহ তিনবার।



রঞ্জন ল্যাবরেটারীজ

৯নং হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা।



বাংলাদেশের মেয়েদের দীর্ঘ বলিষ্ঠ ও বিস্তৃত প্রদেশের স্বল্পকেশী কেশরাশি অন্যান্য ভগ্নীদের প্রশংসার বস্তু। স্বভাবতই বাঙ্গালী মেয়েদের কেশবিন্যাসে বিভিন্ন মৌলিক পদ্ধতি দেখা যায়। আজ আর পুরাণো ধরণে কবরী বন্ধনের প্রচলন নেই।

কেশের এই সৌন্দর্য বজায় রাখতে কেশ-তৈল বাঙগালী মহিলাদের পক্ষে একটি অপরিহার্য প্রসাধন সামগ্রী। কেশের বৃদ্ধি ও সজীবতা যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, রূপচর্চায় কেশের স্থানই যদি সর্বোচ্চ হয়, তা হলে কেশমূল যাতে সতেজ থাকে, তার জন্য বিশিষ্ট কেশ তৈল দ্বারা তা নিয়মিত ঘর্ষণ করতে হবে। **বাথগেটের** পরিষ্কৃত ও স্নিগ্ধ—গন্ধযুক্ত **ক্যাষ্টর অয়েল** একশো পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে কেশচর্চায় সুনাম অর্জন করে আসছে। আপনার নিকট এর দাবী সেই সুনামের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

বাথগেটের
সুবাসিত
ক্যাষ্টর অয়েল



Bathgate & Co. Ltd.
CALCUTTA BOMBAY LONDON

ধবল ও কুষ্ঠ

গাত্রে বিবিধ বর্ণের দাগ, স্পর্শশক্তিহীনতা, অঙ্গাদি স্ফীত, অঙ্গুলাদির বক্রতা, বাতরক্ত, একজিমা, সোরায়েসিস্ ও অন্যান্য চর্মরোগাদি নির্দোষ আরোগ্যের জন্য ৫০ বর্ষোর্দ্ধকালের চিকিৎসালয়

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আপনি আপনার রোগলক্ষণ সহ পত্র লিখিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপুস্তক লউন।

—প্রতিষ্ঠাতা—

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া।
ফোন নং ৩৫৯ হাওড়া।
শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
(পূরবী সিনেমার নিকটে)

বিনা অস্ত্রে
চক্ষুছানি

ডিজন্স "আই-কিওর" (রেজিঃ) চক্ষুছানি এবং সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়। নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩৲ টাকা, মাশুল ৸৹ আনা।

কমলা ওয়ার্কস (দ) পাঁচপোতা, বেঙ্গল।

বাংলা সাহিত্যে অভিনব পদ্ধতিতে লিখিত রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থমালা

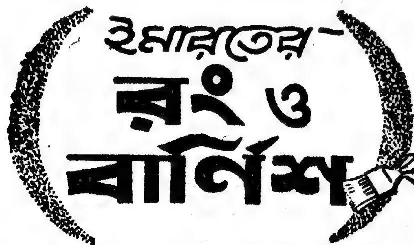
শ্রীপ্রভাকর গুপ্ত সম্পাদিত

১। ভাস্করের মিতালি মূল্য ১৲
২। দুয়ে একে তিন " ১৷৹
৩। সুচারু মিত্রের ভুল " ১৲
৪। দুই ধারা " ১৲
৫। হারাধনের দশটি ছেলে " ১৲

প্রত্যেকখানি বই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক আপনার পাঠাগারের জন্য শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বুকল্যাণ্ড লিমিটেড

বুক সেলার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স
১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৪০৫৮





মার্কেন্টাইল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মিসেলেনী
৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ



রূপ-পরিচর্য্যায়

কেশকল্যান
ও
সন্ধ্যা স্নো



কোহিনুর পারফিউম কোং
কলিকাতা

আই, এন, দাস
(আর্টিস্ট)

ফটো এনলার্জমেণ্ট, ওয়াটার কলার ও অয়েল পেণ্টিং কার্য্যে সুদক্ষ, চার্জ সুলভ, অদ্যই সাক্ষাৎ করুন বা পত্র লিখুন। ৩৫নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'অ্যাসপ্রো'
পাওয়া যাচ্ছে!

ASPRO

জাল জিনিস নিয়ে প্রতারিত হবেন না। প্রত্যেকটি বড়ির উপরে 'অ্যাসপ্রোর' নাম লেখা আছে কিনা দেখে নেবেন। 'অ্যাসপ্রো' দশ মিনিটের মধ্যেই ব্যথা বেদনা ও জ্বর বন্ধ করে। বুকের বা পেটের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

'অ্যাসপ্রোর'
'নিয়ন্ত্রিত মূল্য
এক আনায় ৩টি বড়ি
দশ আনায় ৩০টি বড়ি

পরিবেশক:
জে. এল্. মরিসন, সন অ্যাণ্ড জোন্স্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ : পোষ্টবক্স ৬৮৭ কলিকাতা,
টেলিফোন Calcutta 796



'অ্যাসপ্রো'
সব দোকানেই পাওয়া যায়

112

সতীশ কবিরাজের
শ্বাসারি
হাপানি ও ব্রঙ্কাইটীসে

১ মাস হাঁপ কমে
১ শিশিতে আরোগ্য

মূল্য—প্রতি শিশি ১॥৹

সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

কবিরাজ
এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড সন্স
সাহাপুর-বেহালা দক্ষিণ কলিকাতা

অলঙ্কার

একমাত্র গিনি স্বর্ণের
তথা রত্নখচিত অলঙ্কার
ও রৌপ্যের বাসনাদি
প্রাপ্তির প্রাচীনতম ও
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান—

Jewellers
M. S. CHOWDHURY & SONS

ব্রাঞ্চ : ৬৩এ, কলেজ ষ্ট্রীট (মার্কেটের সম্মুখে)। ফোন : বি, বি ৪৪৯৫।
১৬১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাটা জংসন, বালীগঞ্জ। ফোন—পি কে ২১৭৫।
কলিকাতা।

---

৮ কেশিকা
৮ ক্যান্থারাইডিন
৮ কেষ্টার অয়েল
আমলা ও
৮ লাইমজুস

ধানিক্য কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ
আগরতলা, কলিকাতা, পাটনা.

ক্লিয়ারিংএর সুযোগ সম্বলিত একটি নির্ভরশীল জাতীয় ব্যাঙ্ক

দি এসোসিয়েটেড

ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক :	ম্যাঃ ডিরেক্টর :
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, জি বি. ই. কে. সি. এস. আই।	মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ
চীফ অফিস—আগরতলা ত্রিপুরা ষ্টেট।	রেজিষ্টার্ড অফিস গঙ্গাসাগর।

কলিকাতা অফিসসমূহ—১১, ক্লাইভ রো ও ৩নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড।
টেলিফোন : ১৩৩২ কলিকাতা টেলিগ্রাম : "ব্যাঙ্কত্রিপুর"

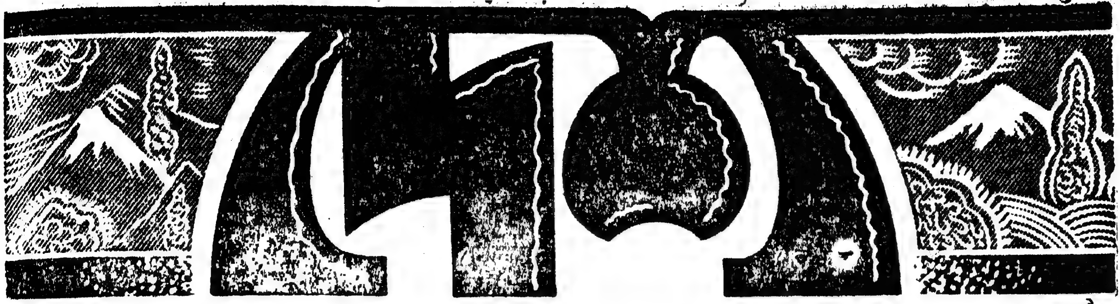
অন্যান্য অফিসসমূহ :
শ্রীমঙ্গল, আজমীরিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কৈলাসহর, সমসেরনগর, নর্থ লখীমপুর, ঢাকা, কমলপুর, চান্দুগাছ, জোড়হাট (আসাম), চকবাজার (ঢাকা), মানু, গোলাঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গৌহাটী, তেজপুর, হবিগঞ্জ, শিলং, সীলেট, ভৈরববাজার।

খেলো ধুলোয়



চা-ই
চাঙ্গা
করে তোলে

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট
এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত



সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ]   শনিবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৫৩ সাল   Saturday, 1st March, 1947   [১৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

[ব্রি]টিশ গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্ত

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ব্রিটিশ গভর্ন-[মে]ণ্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তকে বিজ্ঞজনোচিত [এব]ং সাহসিকতাপূর্ণ বলিয়া অভিহিত [ক]রিয়াছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও [বলি]য়াছেন যে, কোন কোন স্থলে ঘোষণাটি [অস্]পষ্ট এবং বিশেষ ধীরতার সঙ্গে বিবেচ্য। [প]ণ্ডিতজীর সহিত আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ [এক]মত নহি। আমাদের মতে ঘোষণাটি স্থানে [স্থা]নে একটু আধটু অস্পষ্ট নয়, তাহা আগা-[গো]ড়াই অস্পষ্ট এবং মন্ত্রী মিশনের কাজ যে [ধা]রা ধরিয়া চলিতেছিল, এই সিদ্ধান্তে [তা]হার পাশ কাটাইয়া সমগ্র পরিকল্পনাটিকে [এ]কেবারে ডামাডোল পাকাইয়া ফেলা [হ]ইয়াছে। অবশ্য চতুর ব্রিটিশ রাজ-[ন]ীতিকগণ এতদিন পর্যন্ত ভারতের সম্পর্কে [এ] কথাটা মুখের বাহির করেন নাই, এবার [মি]ঃ এটলীকে তাহাই করিতে হইয়াছে। এই [ঘো]ষণায় বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৮ [স]ালের ৩০শে জুনের পর আর একদিনও ব্রিটিশেরা ভারতে থাকিবে না বরং তৎপূর্বে [য]াইতে পারিলেও তাহারা ভারত ছাড়িয়া [য]াইবে। এতদ্দ্বারা কার্যত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট [ক]ংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' দাবীই মানিয়া [ল]ইয়াছেন। মিঃ এটলী এবং তাঁহার মন্ত্রি-[ম]ণ্ডলের ইহাই যদি মনের কথা হয়, তবে তাঁহাদের সত্যই বুকের পাটায় জোর আছে বলিতে হইবে; কারণ সাম্রাজ্যবাদের সনাতন সংস্কার কাটাইয়া তাঁহাদিগকে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে। ইহা বড় সহজ কথা নয়। বস্তুত ব্রিটিশ জাতি কোন-দিন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত জনশক্তির চাপে না পড়িয়া এবং গলাধাক্কা না খাইয়া এইরূপ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে, ইতিহাসে এমন প্রমাণ মিলে না। কিন্তু তাঁহাদের মুখে ভারত ছাড়িবার এমন দিন তারিখ বাঁধিয়া দিবার নির্দেশ সত্ত্বেও আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে এবং মিঃ এটলীর গভর্নমেণ্টের অতি আধুনিক বিবৃতির অস্পষ্টতা সেই সন্দেহকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। দেখা যায়, কংগ্রেস যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া-ছিল, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাহার কোনই জবাব প্রদান করেন নাই। অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের লীগ সদস্যগণকে তাহাদের বাধাদানের নীতি অবাধে চালাইবারই সুযোগ রাখা হইয়াছে, অধিকন্তু গণপরিষদ যে সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা নাকচ করিয়া দিবার স্পর্ধাই এখনও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। মুসলিম লীগের দল গণপরিষদে যোগদান না করিলে তাঁহারা গণপরিষদের সিদ্ধান্ত মানিবেন না, এমন কথাই বলিয়াছেন; অবশ্য, সে অবস্থায় তাঁহারা ভারতে পুনরায় পসার সাজাইয়া বসিবেন, এমন কথা খোলাখুলি বলেন নাই। কেন্দ্রে হউক, প্রদেশে হউক, ভারতবাসীদের স্বার্থ যাঁহারা প্রকৃষ্ট-ভাবে রক্ষা করিবেন এইরূপ দায়িত্বসম্পন্ন ভারতবাসীদের হাতে শাসনের ভার দিয়া তাঁহারা সরিয়া পড়িবেন তাঁহাদের বিবৃতির বহিরঙ্গের ভঙ্গি এইরূপ। এইভাবে অখণ্ড ভারতের মৌলিক নীতির ভিত্তিকে তাঁহারা কার্যত এতদিনে অস্বীকার করিয়াছেন। বিশেষত কাহারা যে এইরূপভাবে দেশ শাসনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহারাই তৎসম্বন্ধে বিচারকর্তা সাজিয়া বসিয়াছেন এবং ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব-মর্যাদার যত বালাই চুকাইয়া দিয়াছেন। তারপর তাঁহাদের সেই নিরপেক্ষ বিচারে যদি কোন দলই যোগ্যতাসম্পন্ন বিবেচিত না হয়, তবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারত শাসনের তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অবাঞ্ছিত এই পাপের বোঝা লইয়া কি করিবেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁহারা মোড় ঘুরিয়া ভবিষ্যতের ভরসায় দিন গণিতে আরম্ভ করিবেন কিনা বিবৃতিতে সে কথাটাও উহ্য রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সামন্ত নৃপতিদের সঙ্গে সন্ধি-পত্রের পুনর্বিবেচনার প্রশ্নটি সমস্যাকে সমধিক জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে আমরা এই প্রশ্ন উত্থাপন নিতান্তই অনধিকার চর্চা বলিয়া মনে করি। ইংরেজ যদি সত্যই ভারত ছাড়িয়া যায়, তবে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে অবস্থিত ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিসর্তে আটঘাট বাঁধিয়াও সামন্ত নৃপতিরা বাঁচিতে পারিবেন না। ভারত শাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখিয়াই তাঁহাদিগকে চলিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের পিঠ চাপড়াইতে যাইবার মূলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের দুরভিসন্ধি ছাড়া অন্য কোন নীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিবৃতিতে আগাগোড়া অস্পষ্টতা রহিয়াছে। আমরা জানি, জাগ্রত জনশক্তির প্রত্যক্ষ সংগ্রামে স্বার্থের গোড়ায় ঘা না পড়িলে ব্রিটিশ রাজনীতিক-দের মুখ হইতে স্পষ্ট কথা কোনদিন বাহির হয় না, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মুখের স্পষ্ট কথা, বোধ হয়, সেই দিনেরই অপেক্ষা করিতেছে।

সোজা পথের ইঙ্গিত

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতে এতটা অস্পষ্টতা থাকিলেও তাঁহাদের সাহসিকতার পরিচয় ইহাতে আছে, একথা আমরাও স্বীকার করি। তাঁহারা

হামচাঁদি হইতে কাফিলাতলীর পথে মহাত্মাজী



হামচাঁদি গমনের জন্য বিজয়নগর হইতে গান্ধীজীর বিদায়গ্রহণের দৃশ্য



আলুনিয়া হইতে বিরামপুর গমনকালে গান্ধীজী : মুসলমান গ্রামবাসীরা পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে।



আলুনিয়া গ্রামে মেয়েরা পুষ্পমাল্য হস্তে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করিতেছে।



কুমিল্লার এক জনসভায় ফজলুল হক সাহেব বলিয়াছেন—"গান্ধীজী বাঙলাদেশ ত্যাগ করিয়া গেলে আমি বাঙলার সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর ছাগলটি বহন করিয়া নিতে রাজী আছি।" কথাটা শুনিয়া বিশু-



খুড়ো বলিলেন—"বৃদ্ধ বয়সে হক্ সাহেব কি শেষ পর্যন্ত ছাগল চরাইবার কাজটাই বাছিয়া নিলেন?"

* * * * *

উক্ত সভাতেই হক্ সাহেব গান্ধীজীকে গান্ধী-পোকার সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। যাঁহারা এই উক্তিতে দুঃখিত হইয়াছেন—তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি—হক্ সাহেব পরবর্তী বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, গান্ধীজীকে অপমান করার ইচ্ছা তাঁর ছিলনা অর্থাৎ ইহা নিতান্তই রসিকতা। ইহাতেও যদি মহাত্মার অনুরক্তদের সান্ত্বনা না জোটে তবে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, রসিকতাটি করিয়াছেন শেরে বঙ্গাল; শেরের যত খ্যাতিই থাক্ রসিকতার খ্যাতি নাই, সুতরাং অমৃতম্ ব্যাঘ্রভাষিতম্ বলিয়া অগ্রাহ্য।

* * * * *

"**O**bedient boys are no good"—বৃটেনের জনৈক লেখকের অভিমত। খুড়ো বলিলেন—"বৃটেনের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যে যাঁরা সুবোধ বালক গোলাপ ফুল হইয়া আছেন তাঁরা এখন হইতেই অবহিত হউন এবং সময় থাকিতে প্রতিবাদ করুন!"

* * * * *

"**জা**পানে আণবিক শক্তি ব্যবহার নিষিদ্ধ" —একটি সংবাদের শিরোনামা। যাঁরা একদিন জাপানে আণবিক শক্তি ব্যবহার করিয়াছেন—প্রয়োজন হইলে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁরা অবশ্যই পারিবেন,—নিষেধাজ্ঞাটা শুধু জাপানের প্রতি—ইতি টীকা বিশ্বনাথস্য অর্থাৎ বিশুখুড়োর!

* * * * *

একটি সংবাদে দেখিলাম—অস্ট্রেলিয়ায় নাকি শব্দহীন ট্রাম আবিষ্কার করা হইয়াছে। "আমরাও যে এ ব্যাপারে পশ্চাতে পড়িয়া নাই সে-কথা শহরের ট্রাম-লাইনগুলি ঘুরিয়া আসিলেই বোঝা যাইবে"—বলেন খুড়ো।

* * * * *

অন্য একটি সংবাদে জানা গেল—চীনে ট্রামের ধর্মঘটীরা—ট্রাম চালাইয়াছেন—কিন্তু কন্ডাক্টার যাত্রীদের নিকট হইতে ভাড়া আদায় করেন নাই। এই ব্যবস্থায় ট্রাম কোম্পানী নাকি একদিনেই সায়েস্তা হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতার ধর্মঘটীরা অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে—কোম্পানী সায়েস্তা না হইতে পারে—কিন্তু সর্বসাধারণের সহানুভূতি সম্বন্ধে আর কোনই যদি-কিন্তু থাকিবে না!

* * * * *

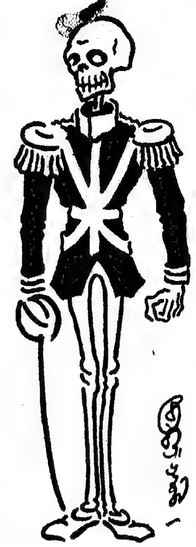
বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পল্ রবসন—দুই বৎসর কোন সিনেমায় গানের কন্-



ট্রাক্ করিবেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন —"It seems I must raise my voice but not by singing pretty songs"—কিন্তু রবসনের এই নূতন Music আমেরিকাবাসী Face করিতে পারিবেন ত?

* * * * *

"**G**HOST club of Britain to be revived soon"—একটি খবর।" বৃটিশ ভারত হইতে চলিয়া গেলে যাঁরা ভূতপূর্ব



শ্রেণীতে পড়িবেন, তাঁদেরই সুবিধার জন্য এই ভৌতিক ক্লাব"—বলে শ্যামলাল।

* * * * *

আফ্রিকার পথে এরোপ্লেনে ভ্রমণের সময় রাজা ও রাণী পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তার সুবিধার জন্য তাঁদের পৃথক্ পৃথক্ দুইটি প্লেনে নাকি একটি ছোট টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হইয়াছিল। সম্রাট ক'বার Wrong number পাইয়াছেন —সে সম্বন্ধে সংবাদদাতা নীরব!

* * * * *

"**T**HE total weight of F. M. Montgomery's decorations is one stone" —একটি সংবাদ। খুড়ো বলিলেন—"তাই মেয়েদের মধ্যে স্বর্ণালঙ্কারের ওজন যার যত বেশি—তিনি প্রায় ফিল্ড মার্শালের মতই বিক্রমশালিনী হইয়া থাকেন, 2nd Front বা ঘরের যুদ্ধে তাঁর জয় অনিবার্য।"

* * * * *

"**ভ**গবানের ইচ্ছায় কয়েক লক্ষ মুসলমানই কোটি কোটি হিন্দুকে পরাজিত করিতে পারিবে"—বলিয়াছেন স্বাস্থ্য সচিব গজনফর আলি। খুড়ো বলিলেন—"স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িলে আমরা ভগবানকে ডাকি বটে তবে এ-সব মারামারির ব্যাপারে ভগবানের ইচ্ছা নিয়া টানাটানি না করাই ভাল, কেননা হিন্দুদের পিছনে আবার তেত্রিশ কোটি ভগবানের ইচ্ছা আছে কিনা, "Brute majority"তে ব্যাপারটা আরও জটিল হইয়া পড়িবে!



(বড় গল্প)

[৫]

সেদিন সারারাত সুদেষ্ণার ঘুম হইল না। ভোররাত্রে কখন হঠাৎ একবারটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। স্বপ্ন দেখিল, সুমন্ত্র যেন একটা ঘি-রঙের প্রকাণ্ড মোটর লইয়া তাহাদের বাড়ির দরজায় আসিয়া তাহাকে ডাকিতেছে,—সে যেন ঠোঁটে এবং নখে রঙ্ মাখিয়া ক্রেপের সাড়ী পরিয়া প্রস্তুত, মোটরে উঠিতে যাইবে এমন সময় সুমন্ত্রর মুখটা সেই উড়িয়া মজুরটার মতো হইয়া গেল, সে হুড়হুড় করিয়া এক টিন আলকাৎরা তাহার গায়ে মাথায় ঢালিয়া দিল। সুদেষ্ণার ঘুম ভাঙিয়া গেল, ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

পরদিন সকাল হইতে চারজন প্রার্থী ফিরিয়া গেল, সুদেষ্ণা উপরে বসিয়া তাহাদের আগমন এবং বিসর্জনের সমস্ত সংবাদই পাইল। একবার ভাবিল মা'কে স্পষ্ট বলিয়া দিবে, সে যাহাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে তিনি তাহার যোগ্য নন, সুতরাং আজীবন কৌমার্য ব্রত পালন করা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, মা তো সকলকেই ফিরাইয়া দিতেছেন, যতদিন না বিশেষ কোনো একজনকে বিবাহ করিবার জন্য চাপ দেন, ততদিন খুঁচাইয়া ঘা করবার দরকার কি?

রবিবার দিন সুদেষ্ণা মাঝে মাঝে তাহার এক বান্ধবীর বাড়ি বেড়াইতে যাইত, আজ তাহার বাড়ির বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না। খাটে শুইয়া টেবিলের কাছে পড়িতে বসিয়া মার পূজার ঘরের অথবা রান্না ঘরের কাজে সাহায্য করিতে গিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল সেই অপদার্থ লোকটা এখনই বোধ হয় আসিবে। তাহার সহিত কথা কহিতে হইবে ভাবিয়াই সুদেষ্ণার মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। না, সে তাহার সামনে আর বাহির হইবে না। ভাড়াটে ভাড়াটের মতই থাকা ভালো, কুকুরকে নাই দিলে মাথায় উঠিতে পারে! কিন্তু সারাদিনের মধ্যেও সেই অপদার্থটা বা তাহার বন্ধু আসিল না তো?

সোমবার সকালে সুদেষ্ণার কলেজ যাইবার সময় সুকল্যাণী বলিলেন, "কি পাগলা ছেলে বাবা! বাড়ির ভাড়া আগাম দিয়ে বসে রইল, তারপর আর কোন খোঁজ খবর নেই। কিন্তু ওর মনটা বড়ো ভালো! জানিস ছোটোবেলায় রাজ্যের কাণা খোঁড়া কুকুর বেরালকে নিজের খাবার থেকে খেতে দিত। একবার দেখি কোথাকার একটা নেড়ি কুকুর কা'র বাড়ি হাঁড়ি খেতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙে এসেছে, ও ব'সে ব'সে তার পায়ে ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। দ্যাখ্, অর্থভাগ্য সকলের হয় না, কিন্তু ওর মা-বাপের রক্ত ওর দেহে আছে, ও ছেলে কখনো মন্দ হ'তে পারে না। ওকে যে স্বামী-রূপে পাবে সে ভাগ্যবতী।"

সুদেষ্ণা বলিল, "ছোটোবেলায় কে কি ক'রেছিল তাই দিয়ে বুড়ো বয়সে তার চরিত্র-বিচার করা ঠিক নয়, মা। আর মা-বাপ ভালো হ'লেই ছেলে ভালো হ'বে এমন কোনো কথা নেই; অনেক মহাপুরুষের ছেলেও মহাপাপী হয়েছে, ইতিহাস তা'র সাক্ষী।"

সুকল্যাণী বলিলেন, "তুই কি ব'লতে চাস স্পষ্ট ক'রে বল দিকি? সুমন্ত্রকে বিয়ে করা তোর মত নয়?"

সুদেষ্ণা বলিল, "আমি কিছুই ব'লতে চাই না। শুধু ভালো ক'রে খোঁজ খবর না নিয়ে তোমরা আমাকে যার তার হাতে গছিয়ে দিয়ো না, এই অনুরোধ। তিনি যদি আসেন তাহ'লেও তাঁর সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠতা করা আমার মত নয়। ভাড়াটে ভাড়াটের মতন থাকবেন।" সে দ্রুতপদে চোখের জল চাপিতে চাপিতে বই খাতা গুছাইয়া লইয়া নীচে নামিয়া গেল। সুকল্যাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহার পিছন পিছন নামিয়া গেলেন। সুদেষ্ণা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলে তিনি 'দুর্গা, দুর্গা' বলিয়া ফিরিয়া স্নানের ঘরে ঢুকিলেন। মনে মনে বলিলেন, "আজকালকার ছেলেমেয়েদের অন্ত পাওয়া ভার। কার মনে যে কি আছে?"

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও সুমন্ত্র যখন বাড়ির দখল লইতে আসিল না তখন সুকল্যাণী সত্যই বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "হ্যারে, ছেলেটা ট্রামে বাসে কোথাও চাপা পড়ল না তো? কাগজ দেখেছিলি আজ?"

সুদেষ্ণা নিজেও ক্রমে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। তবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "কচি খোকা! ট্রামে চাপা পড়েনি মা, ছেলে ধরায় ধ'রে নিয়ে গেছে।" সুকল্যাণী বলিলেন, "তোর সবতাতে ঠাট্টা। ওর যদি আজ মা থাকত তা'হলে কি ওকে ঐ রকম বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়াতে দিত?" সুদেষ্ণা চুপ করিয়া মাথা নীচু করিয়া একটা বই দেখিতে লাগিল। সুকল্যাণী শেষ পর্যন্ত উদাসীকে পটলডাঙ্গায় খোঁজ লইতে পাঠানোই কর্তব্য স্থির করিলেন। উদাসী দুপুরে কাজকর্ম সারিয়া সুমন্ত্রর সন্ধানে গেল। ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া খবর দিল, তিনদিন হ'ল বাবু কোথায় গিয়াছেন কেহ জানে না। তবে বাহিরের ঘরের ডাক্তারবাবু তাহার দরজা খোলা দেখিয়া চাবি দিয়া রাখিয়াছেন, তিনি বললেন, বাবু কলিকাতায় নাই, তাঁহার খুব অসুখ। সুদেষ্ণা কলেজ হইতে ফিরিয়া তখন সবেমাত্র জুতা খুলিতেছিল, সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তারপর বলিল, "মা, আমি যা'ব?" সুকল্যাণী বলিলেন, "তুমি একলা মেয়েমানুষ গিয়ে কি ক'রবে, মা?" "মানুষটা বাঁচল কি মরল একবার খোঁজও নেবে না।" "তারা তো কেউ

ঠিকানা জানে না বলেছে।"

"উদাসী দাদার কাণ্ড তো? আমি নিজে একবার খোঁজ নিয়ে আসি মা?"

সুকল্যাণী বলিলেন, "আচ্ছা যাবে যাও, একটা ট্যাক্সি ক'রে নিয়ো, আর উদাসীকে সঙ্গে নিয়ে যাও। কদিন তোমার শরীরটা ভালো নেই, বেশি হেঁটো না। টাকা যা দরকার হয় নিয়ে যাও।"

সুকল্যাণী আঁচল হইতে তাঁহার লোহার সিন্দুকের চাবি খুলিয়া দিলেন। সুদেষ্ণা সিন্দুক খুলিয়া দুখানি নোট বাহির করিয়া তাহার হাত-ব্যাগে পুরিল। বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কি মনে হওয়াতে থামিয়া তাহার স্বর্গীয় পিতার ছবিখানির নীচে আসিয়া দাঁড়াইল এবং নতজানু হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। তারপর মাকে চাবি ফেরত দিয়া ধীর পদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সুকল্যাণী দূর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করতেছিল, কন্যা বাহির হইয়া যাইবার পর তিনিও আসিয়া নিঃশব্দে স্বামীর ছবির তলায় দাঁড়াইয়া কি যেন প্রার্থনা করলেন, তারপর নতজানু এবং গলবস্ত্র হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন।

ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সুদেষ্ণা সোজা একদিকের বাহিরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ হোমিওপ্যাথ অধরবাবু থতমত খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

সুদেষ্ণা একবার ইতস্ততঃ করিল। পর-মুহূর্তে হাসিয়া বলিল, "আমাকে আপনি চেনেন না। আমি সুমন্ত্রবাবুর মাসিমার বাড়ি থেকে আসছি। ক'দিন তাঁর কোনো দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাই খোঁজ নিতে এলুম।"

অধরবাবু তাহাকে একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "তাঁর কথা আর ব'লবেন না। কোনদিন খান, কোনদিন খান না, কোথায় কখন যান, তারও ঠিকানা নেই। থাকেন সাধু সন্ন্যাসীর মতন, পানটি পর্যন্ত খান না, কিন্তু কত লোকে যে তাঁকে ঠকিয়ে খায়! সুদিনে কারও মনে পড়ে না, দুর্দিনে ব্যাগার খাটবার দরকার হ'লে অমনি তাঁর খোঁজ পড়ে। সম্প্রতি কে এক বন্ধু খুব অসুখে পড়েছেন, তিনি তাঁর সেবা করতে গেছেন। তা' যাবি যা, দরজাটা পর্যন্ত বাইরের খুলে রেখে চ'লে গেছে! কি ব'লব মা, এতকরে বলি, 'সুমন্ত্রবাবু হয় বিয়ে করুন, না হয় ঠাকুর চাকর রাখুন।' তাতে বলে কি, 'বাবুয়ানি অভ্যেস ক'রলেই বেড়ে চলে; আত্মসম্মান খুইয়ে চাল বজায় রাখবার জন্যে শেষে পরের গোলামী করতে হয়, টাকার জন্যে অন্যায়কে মেনে নিয়েও। সে আমার দ্বারা হ'বে না।' ভদ্রলোক সুমন্ত্রকে তুমিই বলিতেন, অপরিচিতের কাছে সম্মান দেখাইতে গিয়া কেবলই তুমি, আপনি মিশাইয়া ফেলিতেছিলেন।

সুদেষ্ণা বলিল, "ও'র অসুখ শুনেছিলুম। সেটা তা হ'লে সত্যি নয়?"

অধরবাবু বলিলেন, "তা'তো আমি কিছু শুনিনি, মা। এক বস্ত্রে চ'লে গেছলেন দরজা খুলে। ভাগ্যি আমার চোখে পড়ে, তাই আমি রাত্রে তালা লাগিয়ে রাখি। সকালে মিস্টার কুণ্ডুর শোফার এসে বললে, তার বাবুর খুব অসুখ, ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া না কি হয়েছে, সেনবাবু এখন কিছুদিন ফিরবে না। একটা স্লিপ এনেছিল, তার হাতের লেখা, দু'খানা জামা আর কাপড় চেয়ে পাঠিয়েছিল। বোঝো দিকি নি মা, আমার কি এ সব পোষায় এই বয়সে? বাক্স তোরঙ্গ এক রাশ, অথচ কাপড় চোপড় কোথাও কিছু নেই, সব বইয়ে বোঝাই। ও'র ঐ একমাত্র নেশা, পুরোনো বই কেনা! সেদিন সে কি বিপদ! একে বুড়ো মানুষ খুঁজে পাই না, তা'তে বড়োলোকের শোফার খালি তাড়া মারে!"

সুদেষ্ণা বলিল, "তাহ'লে কি ক'রলেন শেষ পর্যন্ত?"

"কি আর ক'রব, অনেক খোঁজ পত্তর করে দু'টো পাঞ্জাবী পেলুম আধ ময়লা, তাই দিয়ে দিচ্ছিলুম। তারপর মনে প'ড়ল উনি তো আবার খদ্দর ছাড়া পরেন না, পরের বাড়িতে গিয়ে কষ্ট পাবেন। শুধু পাঞ্জাবী পরে তো আর বাইরে চলে না, বাড়িতে কি ক'রে ওই জানে! হয় তো সব এক সঙ্গে ধোপার বাড়ি দিয়েছে। ভেবে চিন্তে শেষে বুদ্ধি জোগাল, সেই মোটরেই গিয়ে খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে দু'খানা কাপড় কিনে দিয়ে দিলুম। ভাড়ায় বাদ যাবে।" সুদেষ্ণা হাস্য দমন করিয়া বলিল, "আচ্ছা তাঁর বাড়িতে মেয়েরা কাঁরা খুব আসেন, তাঁরা একটু গুছিয়ে দিয়ে যেতে পারেন না?"

অধরবাবু বলিলেন, "ও কথা বলো না মা, আমি তো ও'র বাবার আমল থেকে ভাড়া আছি, মেয়েদের কাউকে আসতে যেতে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, পাড়ার গরীব দুঃখী মেয়েরা আসে বই কি। বাবা ব'লে এসে পড়ে, টাকাটা সিকেটা, ওষুধটা কাপড়টা নিয়ে যায় বই কি! যখন কোনো ভালো চাকরী পান তখন তাদের ভিড় বাড়ে; চাকরী গেলেই, তারা এসে ফিরে যায় গাল দিতে দিতে। ও'র বাবার মার কম কাপড় চোপড় ছিল না কি? সবই তো ঐ ক'রে গেছে। তোমরা যে তার আত্মীয় ক'লকাতায় আছ তা কি জানি, তা হলে এর আগেই গিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আসতুম।"

সুদেষ্ণা বলিল, "কিন্তু আমি শুনেছি একজন খুব সাজ পোষাক পরা ভদ্রমহিলা রোজ মোটরে করে আসেন"—

অধরবাবু বলিলেন, "আপনি বোধ হয় ঐ কুণ্ডুবাবুর স্ত্রীর কথা বলছেন। তা' তিনি তো সেই একদিনই এসে ছিলেন। তাঁর কর্তা বাড়ি ছেড়ে চ'লে এসেছেন, সুমন্ত্রবাবু তাঁর ঠিকানা জানতেন তাই কুণ্ডুগিন্নী তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে কোথায় কোন্ গাঁয়ে গেছেন সেই রাত্রে। শোফার ব'ললে কি না, গিয়ে দেখেন তাঁর বেহুঁস জ্বর। ব্যস, সেইখানেই আটকে গেছেন।" আপনারা বোধ হয় পাড়ার লোক কারো কাছে শুনে থাকবেন মন্দ কথা। তা' যা রং চং মেখে বেড়ান ও'রা, তা'তে লোকে মন্দ কথা ব'লতে পারে বই কি। তবে সুমন্ত্রবাবু, মা, ওসব পছন্দ করেন না, এ আমি জোর ক'রে ব'লতে পারি। বলেন, 'যারা নিজের জন্যে বেশী খরচ করে, পরের জন্যে তাদের খরচ করবার পয়সা থাকে না।"

সুদেষ্ণা বিদায় লইবার জন্য নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অধরবাবু বলিলেন, "এবার ফিরে এলে"—

সুদেষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, ফিরে এলেই ব'লবেন, তাঁকে তাঁর মাসিমা ডেকেছেন। আমরা বড্ড দুশ্চিন্তায় আছি।"

অধরবাবু বলিলেন, "বুড়ো মানুষ, আমারও ভুল হ'য়ে গেল ঠিকানাটা জেনে নিতে।"

সুদেষ্ণা বলিল, "বাড়ির চাবি কি শোফার নিয়ে গেছে।"

অধরবাবু বলিলেন, "না মা, কখন আবার কি ফরমাস আসে, তাই আমার কাছেই রেখেছি।"

সুদেষ্ণা বলিল, "আমাকে দিতে আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো দিতে পারেন। এবার কেউ এলেই তা'কে তা' হ'লে আমার কাছে যেতে হবে। এই ঠিকানাটা রাখুন।" সুদেষ্ণা নাম ঠিকানা লিখিয়া দিল। অধরবাবু চাবিটি বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, "তোমরা হ'লে মা তা'র আপনার লোক। তোমরা ভার নিলে তো আমি বাঁচি। বুড়ো বয়সে কি আমার আর এ সব পোষায়? আমি কেবল অবাক হ'য়ে যাচ্ছি মা, এত কাছে তোমরা আছ, অথচ তার অসুখে বিশুখেও কেউ একবার উঁকি মেরে দেখো না! সে একা রাজ্যের লোকের ক'রে মরে, নিজে অসুখে পড়লে তার মুখে জল দেবার দ্বিতীয় লোক নেই, সাবুটা বার্লিটা জোটে না!"

সুদেষ্ণা বলিল, "সত্যি আমাদের অপরাধ হয়েছে। উনিও কোনো খোঁজ খবর রাখতেন না, আমরাও রাখতুম না। এখন মাঝে মাঝে যান, তাই না গেলে দুর্ভাবনা হয়।"

অধরবাবু আর কিছু বলিলেন না, তাহাকে ট্যাক্সীতে তুলিয়া দিলেন। সুদেষ্ণা গাড়ীতে বসিয়া একবার ভাবিল, "ট্যাক্সিটা ভাড়া না

ক'রলেই হ'ত।" তাহার শরীর মন সবই যেন হাল্কা লাগিতেছিল, তাহার বুকের উপর হইতে একটা গুরুভার বোঝা কে যেন এইমাত্র তুলিয়া লইয়াছে। আম[illegible] স্ট্রীট দিয়া ট্যাক্সী ছুটিতেছিল, সুদেষ্ণা একবার ভাবিল আর আট আনা উঠিলেই নামিয়া পড়িবে। পরক্ষণে ড্রাইভারের পাশে নিদ্রামগ্ন উদাসীকে দেখিয়া তাহার দয়া হইল, ভাবিল, "থাক, কত আর খরচ হবে।" উদাসী গাড়ীতে উঠিয়া চোখ বুজিয়াছিল, বাড়ির দরজায় ড্রাইভারের ধাক্কা খাইয়া চোখ খুলিল। সুদেষ্ণা বলিল, "ভালো লোককে মা পাহারা দিতে পাঠিয়েছিলেন আমার সঙ্গে!" উদাসী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "মজাক্ সাও গুম দিসি একটা!"

সাতদিনের দিন দুপুরে ভদ্রেশ্বরকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া সুমন্ত্র বাড়ি ফিরিল। ভদ্রেশ্বরের অসুখ খুব বেশীই হইয়াছিল, তাহারা সময়ে গিয়া না পৌঁছিলে তাহার কি অবস্থা হইত কে জানে! দিন কয়েক জীবন লইয়া যমে মানুষে টানাটানি চলিয়াছে, রক্ত-পরীক্ষা, ডাক্তার, ঔষধ, ইন্‌জেক্‌শন, মাথা ধোয়ানো পথ্য তৈয়ারী প্রভৃতি লইয়া সুমন্ত্রের নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। ইহার মধ্যে বার পাঁচেক সে ভদ্রেশ্বরের মোটরে ঔষধ কিনিতে বা ডাক্তার ডাকিতে কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু চালতা বাগানে যাইবার সুযোগ একবারও হয় নাই। আজ জ্বর ছাড়িতে ডাক্তারের অনুমতি লইয়া ভদ্রেশ্বরকে মোটরে শায়িত অবস্থায় কলিকাতায় আনা হইয়াছে। সে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছিলে ভবিষ্যতে খুব সাবধানে রাখিবার পরামর্শ এবং ঔষধ ও পথ্য তালিকা ঠিক করিয়া দিয়া সুমন্ত্র বিদায় লইয়াছে। কয়দিনের অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং রাত্রি জাগরণে তাহার শরীরটা বড়োই ক্লান্ত বোধ হইতেছিল, স্থির করিয়াছিল বাড়ি ফিরিয়া বেশ একটি লম্বা ঘুম দিবে। অধরবাবুর কাছে চাবি চাহিতেই তিনি বলিলেন, চাবিটাবি আমি জানি না। তোমার মাসিমার বাড়ি থেকে চাবি নিয়ে গেছে।"

সুমন্ত্র বলিল, "বলেন কি, আমার মাসিমার বাড়ি থেকে? আমার তো মাসিমা কেউ নেই।" এইবার অধরবাবুর মুখ শুকাইল। বলিলেন, "সে কি? অমন মুখ, অমন চেহারা, সে কি আমাকে ঠকিয়ে নিয়ে গেল? চালতাবাগানে বাড়ি ব'ললে। এই যে ঠিকানা রেখে গেছে। এও কি সব মিথ্যে তা' হ'লে?" তিনি স্লিপ কাগজখানি বাহির করিয়া দিলেন, তাহাতে গোটা গোটা মেয়েলি হস্তাক্ষরে সুদেষ্ণাদের ঠিকানা। সুমন্ত্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহা হইলে সুদেষ্ণা নিজে তাহার সন্ধানে আসিয়াছিল? সত্যই তাহা হইলে তাহাদের স্নেহ যত্ন দারিদ্র্যের প্রতি ধনীর দয়ার নামান্তর নয়। কিন্তু এমন সময় আসিল সে যে তাহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার লোক বাড়িতে নাই! অধরবাবুর এই ময়লা বেঞ্চিটাতেই হয়তো বসিয়াছিল। তাহার লক্ষ্মী তাহার গৃহদ্বারে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, হৃদয় সরোবরে পদ্মটি প্রস্তুত ছিল না, তা' না হয় গেল, কিন্তু চাবি লইয়া গিয়া যে তাহাকে বিপদে ফেলিয়া গেল। এই ময়লা কাপড়ে এক মুখ দাড়ি লইয়া সে কি করিয়া লক্ষ্মীর



"সুমুন্দিবাবু, অমুনে দি আও"—

মাতৃ গৃহে যাত্রা করিবে? তাহার হঠাৎ খেয়াল হইল, অধরবাবু শঙ্কিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। বলিল, "না, না, আপনাকে ঠকায়নি। আমারই ভুল হয়েছিল। উনি মানে আমার, ঠিক আমার নিজের মাসিমা নন। মানে—'মা'র খুব বন্ধু ছিলেন।" অধরবাবু বলিলেন, "আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! তা' যাও না, তাঁদের বাড়ি গিয়েই একেবারে নাওয়া খাওয়া সেরে এসো না? অনেক ক'রে বলে গেছে। তোমার চাবি খুললেই বা কি রাজ ঐশ্বর্য পেতে? কাপড় তো একখানি নেই, সব কি ধোপার বাড়ি দিয়েছ?" সুমন্ত্র বলিল, "ঠিক বলেছেন, এই কাছেই একটা ডায়িং ক্লিনিংএ দিয়েছি। দাঁড়ান, নিয়ে আসি।" মিনিট দশেক পরে ময়লা কাপড় পুঁটলি বাঁধিয়া অধরবাবুর আলমারির পিছনে রাখিয়া সুমন্ত্র ফরসা ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়া বাহির হইল। হ্যারিসন রোডের মোড়ে হিন্দুস্থানী নাপিতের কাছে পথে বসিয়া দাড়ি কামাইয়া বেশ করিয়া কলের জলে মুখ হাত ধুইয়া সুমন্ত্র চালতাবাগানে গেল। সুদেষ্ণাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া একবার ইতস্তত করিল, তারপর ভাড়াবাড়ির দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। এই পাড়ায় এত অল্প মূল্যে এইরকম বাড়ি সে আশা করে নাই। ঘরগুলির লাল সিমেন্টের মেঝে নিয়মিত ধোয়ামোছায় ঝকঝক্ করিতেছে। দরজা জানালা সমস্ত খোলা। দোতালায় একখানি বড় ঘরে খাট-বিছানা পাতাই আছে। কলঘরে চৌবাচ্চা ভর্তি জল, সাবান তোয়ালে এবং কুঁজায় টাটকা তোলা জল দেখিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল, গৃহস্থালী সমস্ত প্রস্তুত, একটি গৃহিণী হইলেই হয়। যাহা হউক, অনেক দিন পরে সুমন্ত্র তৃপ্তি করিয়া স্নান করিল, তারপর এক গ্লাস জল খাইয়া আরাম করিয়া খাটে গিয়া শুইল। যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা চারটা। উদাসী ডাকিতেছিল, "সুমুন্দিবাবু, অমুনে দি আও, মায়ে ডাকইন্।" সুমন্ত্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে সুকল্যাণীর বাড়ি গেল। মনে পড়িল, মাথার চুলটা আঁচড়ানো হয় নাই, কিন্তু আরশি চিরুনি দেখিতে না পাওয়ায় হাত দিয়াই চুলগুলোকে সংযত করিয়া লইল।

সুমন্ত্র গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই সুকল্যাণী দেবী বলিলেন, "তুমি আচ্ছা ছেলে যা হোক বাছা! পরের দিন আসবে বলে গেলে, সাতদিন খোঁজ খবর নেই। আমরা এদিকে ভেবে মরি! একটা খবরও তো দিতে হয়?" সুমন্ত্র স্বীকার করিল, তাহার অপরাধ হইয়া গিয়াছে। তাহার বন্ধুর জীবন লইয়া টানাটানি চলিতেছিল, আজ তাঁহার জ্বর ছাড়িতে তাঁহাকে কলিকাতার বাড়িতে নামাইয়া দিয়াই সে আসিয়াছে। সুকল্যাণী বলিলেন, "আমরা সে খবর নিয়েছি। তোমরা যে কোথায় ছিলে, সেই ঠিকানাটা জানতুম না বলেই সেখানে সন্ধান নিতে পারিনি। তা বাড়ির তাহলে কি ব্যবস্থা হবে? তাঁরা কি আসবেন? তোমার টাকা না হয় ফেরত নাও বাপু, আমি অন্য লোক দেখি।"

সুমন্ত্র মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তাঁরা আসবেন না, তবে টাকা ফেরতও নেবেন না। আমিই মাঝে মাঝে এসে থাকব, আর কি হবে? ভদ্রেশ্বর বলেছে, আমি যদি ঘরের খেয়ে পড়তে রাজি থাকি তবে সে আজীবন বাড়িভাড়া দেবে—একটা গরিবের ছেলেমেয়েদের ফ্রি স্কুল করবার জন্যে। ভাবছি, রাজি হব কি না?"

সুকল্যাণী বলিলেন, "তুমি যা ভালো বোঝো করো বাছা, তবে আমার মাথার অসুখ। সামনের বাড়িতে বেশী চেঁচামেচি হলে"—সুমন্ত্র বলিল, "আমার নিজের বাড়িতেই স্কুলটা করব তাহলে। আপনাদের বাড়িতে খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।" সুকল্যাণী বলিলেন, "সুদেষ্ণাকে ডেকে দিই, সে কি বলে দ্যাখো। সুদেষ্ণা, শুনে যা এদিকে। সুমন্ত্র এসেছে, কি বলে শোন্। ঐ এক মেয়ে বাছা! এদিকে বলে তোমার সামনে বেরোবে না, এদিকে দু'দিন না আসতেই ভেবে অস্থির! তা' তোমরা কথাবার্তা কও, আমি রান্নার কতদূর কি হ'ল দেখি। আজ তো সারাদিন পেটে ভাত পড়েনি, ঘুমিয়েই কাটালে। উদাসী এসে খবর দিলে বাবু এসে ঘুমোচ্ছে। ভাবলুম,

আহা, ঘুমুচ্ছে ঘুমোক। ভাত ডাল সমস্ত হয়েছে, শুধু একটা কফি চচ্চড়ি ক'রতে দিয়ে এসেছি ঠাকুরকে, সেইটে হ'লেই হয়। তুমি অসবে আসবে করে রোজ স্নানের জল আর খাবার জল ধরিয়ে রাখছি ক'দিন।" দরজার বাহিরে উড়িয়া পাচকের ডাক শোনা গেল। বলভদ্র এক বৎসর বাংলাদেশে আছে, সুতরাং বাংলায় মিশাল দিয়া উড়িয়া ভাষা বলে, ফলে যাহা হয় তাহা বাংলাও নহে, উড়িয়াও নহে। সে ডাকিল, "মা, ইয়ড়ে আসেন—"

"কেন, কি হ'ল? চচ্চড়ি নেমেছে?"

"সে চচ্চড়িও হ'লানি, ঝোলও হ'লানি, মদিখানে রয়ি গলা। সে মু পারিব নি।"

সুকল্যাণী বলিলেন, "খুব লোককে রাঁধতে দিয়ে এসেছিলুম।" বলিতে বলিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

সুদেষ্ণা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সুমন্ত্র বলিল, "আপনার শুনলুম আমার সামনে বা'র হ'তে বাধা আছে। কা'রো ওপর জুলুম করা আমার ইচ্ছে নয়—"

সুদেষ্ণা বলিল, কি ক'রব, মাতৃ আজ্ঞা।"

সুমন্ত্র বলিল, "আমার বাড়ীর চাবিটা যে নিয়ে এসেছেন, সেও কি মাতৃ-আজ্ঞায়?"

সুদেষ্ণা শঙ্কিতভাবে বলিল, "মার কাছে বলেছেন নাকি?"—"না, কিন্তু কারণটা জানতে কৌতূহল হচ্ছে?" সুদেষ্ণা বলিল, "বাড়ীতে রংবেরং-এর মেয়েরা আসা-যাওয়া এবং হাসি-তামাসা করলে পাড়ায় আপনার বদনাম হতে পারে, তাই চাবিটা নিজের কাছেই রেখেছি। সেইজন্যেই সামনে বেরোনো উচিত কিনা ভাবছিলুম।"

সুমন্ত্র অপ্রত্যাশিত আঘাতে সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। পরক্ষণেই উত্তেজিত-ভাবে বলিল, "আমি? আমার বাড়িতে মেয়েরা যাতায়াত করে? আপনি ব'লছেন কি? কে বলেছে আপনাকে?"

সুদেষ্ণা বলিল, "কেউ বলেনি, আমারই দুর্মতি আমি গত শনিবার সন্ধ্যাবেলা আপনার বাড়ি দেখতে গেছলুম। সেই এনামেলকরা ভদ্রমহিলাকে মোটর থেকে আপনি যখন হাসতে হাসতে নামিয়ে নিয়ে গেলেন, তখন আমি হাতকয়েক দূরে দাঁড়িয়ে। হাসির শব্দে পাড়া তোলপাড় হ'চ্ছিল, তাও শুনে এসেছি।"

সুমন্ত্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর ম্লান হাসিয়া বলিল, "সমস্তই আমার ভাগ্য। সেদিন আমার মন বলেছিল, আপনি আসবেন, আমি তাই বাড়ি গুছিয়ে সাজিয়ে বসেছিলুম। সেই আপনি গেলেন, কিন্তু শুধু আঘাত পেয়েই ফিরে এলেন বাইরে থেকেই। যিনি ভেতরে গিয়ে বসলেন তিনি আমার বন্ধুপত্নী, মিসেস কুণ্ডু। পাছে তিনি বাড়িতে আসেন, সেই ভয়ে আমি তাঁকে ঠিকানা দিইনি, জীবনে তার পূর্বে একবার মাত্র তাঁকে দেখেছি, দেখে বড়ো শ্রদ্ধা হয়নি। তিনি ভদ্রেশ্বরের ঠিকানার খাতায় আমার সন্ধান পেয়ে এসেছিলেন আমাকে ধরে নিয়ে তাঁর স্বামীর সন্ধানে যাবার জন্যে। আমি দাড়ি কামাতে কামাতে উঠে এসেছিলুম, ক্ষুরটা ফরাসের তলায় লুকিয়ে রেখে, তিনি তারই ওপর গিয়ে বসলেন ভাগ্যক্রমে। তাইতে একটু হাসাহাসি হয়। আমার আধখানা কামানো দাড়ি রুমাল দিয়ে ঢেকেছিলুম, তাই নিয়েও তিনি হেসে-ছিলেন। নিজেকে পর্বতের সঙ্গে তুলনা করেও একবার হেসেছিলেন। স্বামীর সন্ধান পেলেই আমায় বিদায় দেবেন বলেছিলেন, তাতে একটু টিপ্পনি করে, তা'তেও হাসাহাসি হয়। হ্যাঁ, পতিবিয়োগকাতরা সতীর পক্ষে এতটা হাসি সকলের চোখে ভালো লাগবার কথা নয়, কিন্তু সকলের স্বভাব তো একরকম নয় সুদেষ্ণা দেবী। কেউ সন্দেশ খায় গোমড়ামুখ করে, কেউ ফাঁসিকাঠে চড়ে হাসতে হাসতে। আমি হয়তো তাই ক'রব সেজন্য যদি বন্ধুরা আমায় বর্জন করেন তবে আমি নাচার। আপনার মনে যখন সন্দেহ এসেছে, তখন আপনার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা, আপনাকে আমি আর বিরক্ত ক'রব না। তবে আমার এই কথাটা বিশ্বাস করবেন, সুরুচি এবং মাত্রাজ্ঞান সকলের সমান থাকে না, কিন্তু তাই ব'লে এনামেলকরা মেয়েমাত্রেই খারাপ নয়। ভদ্রেশ্বরের অসুখে যে সেবা তাঁকে ক'রতে দেখেছি, তাতে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয়েছে। আর আমার নিজের কথা? আপনি বিশ্বাস করুন, বা না করুন, জীবনে এমন কোনো কাজ আমি করিনি, যা'র জন্যে কোন ভদ্রনারীর চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে আমি লজ্জিত হ'তে পারি, কিংবা কোনো ভালো মেয়ের স্নেহপ্রীতি থেকে বঞ্চিত হ'তে পারি।" সুমন্ত্র উঠিতেছিল, সুদেষ্ণা বলিল, "মিস্টার কুণ্ডুর বাড়িতে নিশ্চয় টেলি-ফোন আছে, একবার মিসেস কুণ্ডুকে ডেকে দেবেন দয়া করে?" টেবিলে টেলিফোন ছিল।

সুমন্ত্র বলিল, "কেন, জেরা করবেন? তাঁর স্বামী এখন অসুস্থ, মনের অবস্থা ভালো নয়। এখন থাক?"

সুদেষ্ণা বলিল, "তাঁর স্বামী কেমন আছেন সেই খবরটা নিতেও কি দোষ আছে?"

সুমন্ত্র বলিল, "ঠিক বলেছেন, অনেকক্ষণ খোঁজ নেওয়া হয়নি। আচ্ছা, আমি ডাকছি। হ্যালো, সাউথ, সেভেন্ নাইন ফাইভ টু। ইয়েস্। হ্যালো, কে আপনি? মিসেস কুণ্ডু? আমি সুমন্ত্র কথা বলছি। ভদ্রেশ্বর কেমন আছে? ঘুমুচ্ছে? জ্বর আসেনি তো আর? সুখবর। আমি? ভালোই আছি, এতক্ষণ ঘুমিয়ে এইমাত্র উঠলুম, এইবার খেতে যাব। আমি টেলিফোন করছি কোথা থেকে? আমার এক আত্মীয়ার বাড়ী। সম্পর্কে মাসিমা হ'ন। বেশ তো, আপনি [illegible] এ'দের সঙ্গে আলাপ করবেন? ইনি সুদেষ্ণা দাসগুপ্তা, এম এ পড়েন। আমার বোন? না,-ঠিক বোন নন, মানে—সম্পর্কে,—না, মানে তাও নয়—ভয় পাচ্ছি কেন? না, ভয় কিসের? সন্দেহ হচ্ছে? কি বিপদ! ওদিকেও সন্দেহ, এদিকেও সন্দেহ, আমি যাই কোথায়? নিন, আপনি ধরুন।"

সুদেষ্ণা রিসিভারটা ধরিল। বলিল, "নমস্কার। হ্যাঁ, আমি সুদেষ্ণা। না, রক্তের সম্পর্কে কিছু নেই, আমার মা ও'র মা'র বন্ধু ছিলেন। না, ওসব কথা কিছু হয়নি। আমাদের বাড়িই আপনারা ভাড়া নিয়েছেন। আসার সুবিধে হবে না এখন? নেমন্তন্ন না পেলে আসবেন না? বেশ তো, নেমন্তন্ন রইল। এরকম নেমন্তন্ন নয়? তবে আবার কি রকম? চিঠিতে? প্রজাপতি আঁকা? ধ্যেৎ!" সুদেষ্ণা টেলিফোনের রিসিভারটা নামাইয়া রাখিতেই আবার ক্রিং ক্রিং করিয়া উঠিল। সে আবার সেটা তুলিয়া লইল,—"হ্যালো? হ্যাঁ, উনি এখন আপনাদের ভাড়া-নেওয়া-বাড়িতেই থাকবেন কিছুদিন। খুব সেবা করেছেন? ক'রবারই কথা। ওটা'তো মানুষের কাজ। কৃতজ্ঞ? বেশ তো সাহায্য? দরকার হ'লেই জানাবেন, কাজ করতে হ'লেই টাকার দরকার হয়। চাকরীর চেষ্টা, না, আর চাকরী ক'রবেন না। মনিবদের মারলে তারা রাগ করে কথা না শুনলে মাইনে দেয় না। একটা ব্যবসা ক'রবেন এবার। চীনেবাদাম বা লজেঞ্জেস অর্থাৎ বিক্রি না হ'লে শেয়ার হোল্ডাররা খেতে পারবে। এই রকম জিনিস। অবশ্য যৌথ কারবার, হ্যাঁ, লিমিটেড্ কোম্পানি। আমি কিছু শেয়ার কিনছি, আপনি কিনবেন? একশ' টাকা করে। মোটে দশখানা? বেশ, আপনার নামে আলাদা করা থাকবে। আমার প্রয়োজন? কিচ্ছু না। হার, চুড়ি, ব্রেসলেট্? মুক্তোর মালা? কঙ্কণ? কণ্ঠি? সব আছে। কিছু না দিয়ে ছাড়বেন না? বেশ, একটা বেলফুলের মালা আনবেন আসবার সময়। না, না, রোজ নয়, মা ভীষণ রাগ করবেন। না, ঘরের ছেলের মতো উনি আসবেন যাবেন যখন খুসী, তবে কোর্টশিপ ক'রতে পাবেন না। না, মার নিষেধ, আমাদের বংশে কেউ কখনো কোর্টশিপ ক'রে বিয়ে করেনি।"

সুকল্যাণী দেবী ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, "কার সঙ্গে ওসব কথা হচ্ছে টেলি-ফোনে? কি বেহায়া মেয়ে বাবা!"

তিনজনেই সমস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

[সমাপ্ত]

শিক্ষা ও শিল্প

সন্তোষকুমার ভঞ্জ চৌধুরী

শিল্প শিক্ষার অনুষঙ্গ

শিল্পজ্ঞান লাভের জন্য হাতে-কলমে কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণোন্মুখ মন লইয়া বহু শিল্পবস্তু দর্শন, অভিজ্ঞ শিল্পী-দিগের নিকট হইতে শিল্পবিষয়ক আলোচনা শ্রবণ ও শিল্প-গ্রন্থ পাঠাদি আবশ্যক হয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের কাজ প্রদর্শনীতে ও তাঁহাদিগের শিল্পশালায় যাইয়া পুরাতন ও প্রসিদ্ধ শিল্প-সামগ্রীর সংগ্রহ যাদুঘরে বা অপর যে প্রতিষ্ঠানে আছে, তথায় গমন করিয়া এবং ইতিহাস-বিখ্যাত, প্রাচীর-মন্দিরাদি নানা স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি যেখানে আছে, তথায় যাইয়া শিক্ষার্থিগণকে শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করিতে হইবে ও সেই সকলের প্রসিদ্ধির কারণ কি, তাহা অবগত হইতে হইবে। বর্তমানে কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের জন্য মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। সুযোগ্য শিক্ষকের সহিত না যাইলে শিক্ষার্থীর ভ্রমণের উদ্দেশ্যই যে সিদ্ধ হয় না, এই সহজ অথচ অত্যন্ত সত্য কথা বলিবার আবশ্যকতা আছে। বহু বিদ্যালয়ই এ বিষয়ে অনবহিত অথবা উদাসীন। তাজমহল দর্শন করিয়া তাহার ভিতর যে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাহাতে শিক্ষার্থীর মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়, কিন্তু এই বিশ্ববিশ্রুত স্থাপত্যের গরিমার আর কোন কারণই হয়ত তাহার চোখে ধরা দেয় না বা উহার বৈশিষ্ট্যের আর কোন রূপই শিক্ষার্থীর স্মৃতিপটে থাকে না, এই ধরণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ছাত্রকে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম এই বস্তুটির সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবার বা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। ঐতিহাসিকের জ্ঞান লইয়া, কবির হৃদয় লইয়া ও শিল্পীর চক্ষু লইয়া উহা দর্শন করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে সকল যাদুঘরেই শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয়প্রকার সামগ্রীই দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পবস্তুর সংগ্রহ বা সন্নিবেশ শিল্পদৃষ্টি লইয়া করিতে পারিলে উত্তম হয়। শিল্পদৃষ্টিতে যে সকল সামগ্রী মন্দ, ঐতিহাসিক বা সৃষ্টি-কৌশলের মূল্যের দিক হইতে বিচার করিলে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে। শিল্প-শিক্ষার্থী বা দর্শকদিগের মনে ভ্রান্ত ধারণা বা কুরুচি জন্মাইতে না পারে, এজন্য ঐ সকল দ্রব্য বিশেষ বিশেষরূপে চিহ্নিত ও কি জন্য যাদুঘরে স্থান পাইয়াছে এবং উহাদের কি ত্রুটি, গুণ বা বৈশিষ্ট্য তাহা লিখিত থাকা কর্তব্য। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদিগের সাহায্যে নির্বাচিত উৎকৃষ্ট বস্তু, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মূল্যবান সামগ্রী ও প্রস্তুতি পদ্ধতির বিচারে প্রশংসনীয় দ্রব্যের জন্য পৃথক পৃথক স্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। যাদুঘর একটি অতীব মূল্যবান শিক্ষায়তন। দেশে শিল্প-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার মূল্য যতই উপলব্ধ হইবে, যাদুঘরের উন্নতিবিধানে ততই দেশবাসী সচেষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। এই যাদুঘর প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে,

> "......by care in the arrangements of its exhibits, it may become a centre of light and education the dry bones made to speak, and the broken stones to tell their story. Indeed to all who have eyes to see, and a mind and heart tuned to understand and love a museum is akin to a university."

আমাদের দেশে যাদুঘরে প্রহরীর অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থী ও দর্শকদিগকে যাদুঘরে প্রদর্শিত কোন বস্তু সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিবেদন বা আলোকসম্পাত করিতে সক্ষম করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান ও এরূপ বহু ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবার যে আবশ্যকতা আছে, এই কথা কোনও যাদুঘরের কর্তৃপক্ষ আজও পর্যন্ত বিবেচনা করেন নাই। Curator নামধারী রাজ-পুরুষের দর্শন কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে জানি না। যাদুঘরে শিল্পসামগ্রীর সাথে সাথে প্রত্যেক শিল্পের আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মালের নমুনা, প্রস্তুতি পদ্ধতিসমূহের চিত্র এবং বিস্তারিত বিবরণ লিখিত থাকা প্রয়োজন। যাদুঘরে শিল্পের আসনে যে সকল সামগ্রী স্থান পাইবে, তাহা এদেশের সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করিবে, এই কথা স্মরণ করিয়াই শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ শিল্পদ্রব্য নির্বাচন করিবেন। শিল্পসামগ্রী প্রাচীন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে কিংবা আধুনিক বলিয়া অনাদর করিতে হইবে এমন নহে। প্রত্যেক যাদুঘর হইতে নানা শ্রেণীর শিল্পবস্তুসমূহের বর্ণচিত্রসম্বলিত এবং তাহাদিগের প্রাপ্তিস্থান, শিল্পীর নাম, নির্মাণপদ্ধতি প্রভৃতি বিবরণীযুক্ত নানা পুস্তক প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই পুস্তকগুলি শিল্প বিষয়ে প্রমাণ গ্রন্থ ও অভিধানের ন্যায় মূল্যবান হইবে। প্রত্যেক বিদ্যালয় এই পুস্তকগুলি রাখিবে ও সাধ্যানুসারে, প্রয়োজন-মত আপন আপন যাদুঘর গড়িয়া তুলিবে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদিগের দ্বারা মনোনীত দ্রব্য-সমূহের চিত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইলে তাহাদিগের আভিজাত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

প্রায় সকল স্থানেই কোন না কোন শিল্প প্রচলিত আছে। দুই একজন স্থানীয় উৎকৃষ্ট কারিকর রাখিয়া বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদিগকে কারু শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা চলে। এই স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। অনেক সাধারণ বিদ্যালয়ে কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে বিদ্যা নিছক কারিগরিই; কারণ তাহার সাহায্যে কেবলমাত্র হস্ত নিপুণতায় শিক্ষাদানের প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার সহিত বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের বা ক্রিয়া-কর্মের কোন যোগ দেখা যায় না। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই তন্তুবায়, কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি আছে। ইহাদিগের মধ্যে উত্তম শ্রেণীর শিল্পীর সাহায্যে উপযুক্ত শিল্প শিক্ষক প্রথমে নিজে হাতে কলমে কাজ শিখিয়া লইবেন। পরে প্রস্তুতি পদ্ধতির প্রত্যেক পর্যায়, প্রত্যেক যন্ত্রপাতি, উপাদানাদির সহিত শিক্ষণীয় অপর কি কি বিষয়ের সংযোগ বা সম্বন্ধ আছে তাহা নির্ণয় করিয়া সেই সেই বিষয়ের কতটুকু জ্ঞান, কখন, কেমনভাবে শিক্ষার্থীকে দান করা যাইতে পারে তাহা স্থির করিবেন ও সেই অনুসারে শিক্ষা দিবেন। শুধু কাগজে কলমে বা ব্ল্যাক বোর্ডে গণিত শিক্ষা দিলে, ব্যবহারিক নহে বলিয়া ছাত্রদিগের নিকট অঙ্ক শাস্ত্র যেরূপ নীরস প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের যোগবিহীন কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থী শিল্প হইতে পূর্ণ আনন্দ লাভে বঞ্চিত হয় ও শ্রমজীবী মাত্রে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এই প্রথায়ই এদেশে হতভাগ্য শিশুরা শিক্ষালাভ ও শিল্পানুশীলন করিতেছে দেখা যায়। সৃষ্টি করিবার আনন্দ-লাভের সাথে সাথে শিক্ষার্থী যে জ্ঞান আহরণ করে তাহা আপনার সৃষ্টি হইতেই উদ্ভূত, এ কারণ তাহা সত্য, সরস, বাস্তব ও প্রাণবন্ত হইয়া থাকে। নানাস্থানের উৎকৃষ্ট শিল্পবস্তু দেখিয়া শিখিবার ও নানারূপ নূতন নূতন পরীক্ষা করিবার সুযোগ ও সময় কারিগর ও

শিল্প শিক্ষককে দেওয়া উচিত। ইহাতে বিদ্যালয়ে শিল্প সৃষ্টিতে অভিনবত্ব দেখা দিবে এবং ফলত শিক্ষার্থিগণ শিল্পে অধিকতর আকৃষ্ট হইবে ও নূতন প্রেরণা পাইবে।

সমাজে আমরা কর্মকার, কুম্ভকারকে যেমন হরিজনের স্থান দিয়া অবহেলা করিয়া থাকি, বিদ্যামন্দিরে শিল্প শিক্ষককেও তেমনি হীন চক্ষে দেখিবার একটি মনোভাব সহজেই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বিদ্যালয়ে এই মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিলে শিল্পের প্রতি শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধার অভাব পরিলক্ষিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই মনোভাব যে, কেবল আমাদের দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় এমন নহে, ইংলণ্ডেও শিল্প শিক্ষকদিগের প্রতি এই অবিচারের পরিচয় পাওয়া যায়। এদেশে কোন বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষককে ইংরাজি শিক্ষকের সমান মর্যাদা দান করা হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ বলিলেও চলে। বিদ্যায়তনে সংগীত ও শিল্পের মর্যাদা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

In the centre of Indian Culture which I am proposing, music and art must have their prominent seats of honour, and not be given merely a tolerant nod of recognition.

কাজ করিয়া শিক্ষালাভ করিবার নীতি যে বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হইবে সেখানে শিল্প শিক্ষকের স্থান যে অপর শিক্ষকের সমান হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ এই পদ্ধতিতে শিল্প অপরাপর বিষয়ের মধ্যে প্রধান না হইলেও অন্ততপক্ষে যে সমতুল্য সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শিল্পসৃষ্টি করিবার প্রেরণা ও নানা ইঙ্গিত প্রকৃতি হইতেই লাভ করা যায়। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ মানব মনোবিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করে। নীল আকাশ ও সবুজ ধরিত্রী এই দুইটি আচ্ছাদনে মণ্ডিত যে বিরাট গ্রন্থ লিখিত আছে তাহা পাঠ করিয়া কোন্ বিষয় না জানা যায়! আদিকাল হইতে মানব এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছে, তবু আজিও তাহার কত যে রহস্য মানবের নিকট অজানিত রহিয়া গেল তাহার অন্ত নাই। এই গ্রন্থের লিখন পাঠ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকের চক্ষু ও শিল্পীর দৃষ্টি সমানভাবে আবশ্যক হইয়া থাকে। প্রকৃতি রত্নগর্ভা, তাহার সাহায্যে সকল প্রকার জ্ঞানের ভাণ্ডারকেই সমৃদ্ধ করিয়া তোলা যাইতে পারে। প্রকৃতির ভাষা অর্থাৎ সৃষ্টি কর্তার হস্তাক্ষরের সহিত পরিচয় ঘটিলে যে জ্ঞানলাভ করা যায়, শত পুস্তকের মধ্যেও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং বিদ্যালয়ের প্রাচীরের বাহিরেই উন্মুক্ত আকাশের তলেই শিশুদিগের শরীর ও মন গড়িয়া তুলিতে হইবে। কেবলমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কারণেই যে প্রকৃতির পরিবেশ শিশুর পক্ষে আবশ্যক তাহা নহে, তরুলতা, নদী, প্রান্তর প্রভৃতি প্রকৃতির প্রত্যেকটি বস্তু উপভোগ বা সে সকল হইতে রসাস্বাদন করিবার শক্তি লাভের নিমিত্তই শিশুকে প্রকৃতির ক্রোড়ে মানুষ করিতে হইবে। জীবনে এই উপভোগ বা রসবোধের মূল্য কম নহে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও, তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিও না। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্য-গম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্র-খচিত অন্ধকারের মধ্যে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখা পল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারস বিচিত্র গীতি নাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক নববর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজল নিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দ গর্জনে চির-প্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত বাতাসে চঞ্চল নানাবর্ণে বিচিত্র দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও।"

বিদ্যালয়ে ঋতু উৎসব, ঋতু সংগীত বন-ভোজন প্রভৃতির প্রবর্তন করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ নিয়মিতভাবে সাধ্যানুসারে যাহাতে সে সকল বিষয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ঋতুতে ঋতুতে ধরণী কি বিচিত্র নব নব রূপ গ্রহণ করে তাহা আমরা কয়জন দেখিয়া থাকি? প্রকৃতির হাত ছানিতে যাহার চিত্ত নিস্পন্দ থাকিয়া সাড়া না দেয় তাহার ন্যায় হতভাগ্য নাই, সে চিরজীবন ঘনতমসাবৃত পৃথিবীতে বাস করিতেছে মনে করে; এইরূপ ব্যক্তিরই ক্রূরচিত্ত পাষণ্ড হইবার সম্ভাবনা অধিক। পক্ষান্তরে যে প্রকৃতিকে ভালবাসে সে মানুষকেও ভালবাসিতে পারে, আর এইরূপ ব্যক্তির অন্তরেই জনহিতকর সদ্-গুণাবলী দেখিতে পাওয়া সম্ভব। শিল্প শিক্ষকের একটি প্রধান কর্তব্য শিশুর মনে প্রকৃতির উপর ভালবাসা জন্মাইয়া দেওয়া।

অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ, সাজসজ্জা প্রস্তুত প্রভৃতি সব কিছুর মধ্যেই শিল্পের ব্যবহার আছে। কেবলমাত্র শিল্প নয়, নানা বিষয়ের দিক হইতে বিচার করিলে শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সকলের বিশেষ মূল্য আছে ইহা উপলব্ধি করা যায়। শিশুরা আপন হাতে পুতুল (marionette) তৈয়ারী করিয়া পুতুলের অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে; এতদ্ভিন্ন ছায়াবাজি (shadow performance), চলচ্চিত্র, ব্যঙ্গকৌতুক (caricature) প্রভৃতির আয়োজন করিতে পারিলে শিশুরা যেমন প্রচুর আনন্দলাভ করিবে তেমনি শিল্প শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার দিক হইতেও তাহারা এগুলি হইতে বহু জ্ঞান লাভ করিবে। বিচক্ষণতার সহিত বিষয় নির্বাচন করিলে পূর্বোক্ত অভিনয়াদির ভিতর দিয়া যে জ্ঞান অতি সরল ও সরসভাবে শিশুরা লাভ করিতে পারে, লিখন পঠন বা গতানুগতিক প্রথায় ক্লাসের ঘরে বসিয়া শিক্ষাদানের ভিতর তাহা কখনই সম্ভব নহে। এই সকল কাজে অর্থাৎ নাটক রচনায় বা অভিনয়ের বিষয় নির্বাচনে, সংগীত, সাজসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ পরিচালনাদি বিষয়ে যতদূর সম্ভব, শিক্ষার্থী-দিগকে আপন আপন শক্তি বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে।

মধ্যে মধ্যে শিল্প শিক্ষক Epidiascope ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে খ্যাতনামা শিল্পিগণের চিত্র ও অন্যবিধ শিল্পকার্য এবং পুস্তক হইতে নানা চিত্র দেখাইয়া বক্তৃতা সহযোগে শিল্প বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে পারেন। প্রতি বৎসর দুই একবার শিল্প প্রদর্শনী করিয়া শিশুদিগের প্রস্তুত নানারূপ শিল্প কার্য সকলকে দেখাইবার ব্যবস্থা করিলে শিল্পীদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সমস্ত শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করিবে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করিবে, হিসাব রাখিবে, প্রত্যেক দ্রব্যে শিল্পীর নাম, বয়স ও অন্যান্য বিবরণ লিখিবে, প্রদর্শনী সাজাইবে, তাহার বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করিবে, দর্শকদিগকে প্রদর্শনী দেখাইবে, বিচার করিয়া শিল্পবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে স্থান বা মান নির্ধারণ করিবে এবং এতদুপলক্ষে যাহা কিছু করা প্রয়োজন নিজেরাই যাহাতে যথাসম্ভব সবই করে, তাহা করিতে পারিলে প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া অনেক বিষয় তাহারা শিখিতে ও পরিচালনাদি করিবার শক্তি লাভ করিতে পারিবে। শিক্ষার্থিগণকে কখনো কখনো বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তথাকার ছাত্র-দিগের শিল্পকার্য প্রদর্শন করা যুক্তিযুক্ত। শিল্প শিক্ষক শিশুদিগকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের জীবন চরিত সম্বন্ধে পরিচিত করিবেন। সভা, নানা অনুষ্ঠান উৎসবাদির সময় আল্পনা, পুষ্প, পত্র, ধূপ দীপ প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত করিবার প্রথা বিদ্যালয়ে প্রচলন করা উচিত। সময়ে সময়ে শিল্পের নানা বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্কের উদ্দেশ্যে সভার আয়োজন করা যাইতে পারে। শিল্প শিক্ষক মধ্যে মধ্যে ছাত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া ভাল অভিনয়, চলচ্চিত্র বা অন্যবিধ চিত্ত বিনোদনের অনুষ্ঠানে লইয়া যাইবেন। বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের প্রত্যেকটি কক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় ও পরিপাটী করিয়া

সাজাইয়া রাখিবার জন্য এবং বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিকে ফুল ফলের গাছ লাগাইয়া, কেয়ারি রচনা, পথ নির্মাণাদির দ্বারা মনোরম উদ্যানে পরিণত করিতে শিক্ষক মাঝে মাঝে শিশুদিগকে সাথে লইয়া কাজ করিবেন। বিদ্যালয়ের উদ্যানে কয়েক প্রকার পশু পক্ষী রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাহার ভিতর দিয়া শিশুরা আনন্দ ও শিক্ষা-লাভ করিবে।

গ্রন্থালয়ে কেবলমাত্র যে ভারতবর্ষের শিল্প সম্বন্ধে পুস্তক রাখিলেই যথেষ্ট হইবে তাহা মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে, সম্ভব হইলে নানা দেশের প্রসিদ্ধ শিল্পীদিগের কার্যের চিত্র-সম্বলিত গ্রন্থসমূহ বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে। নানা জাতির সহিত সাংস্কৃতিক যোগ স্থাপনের জন্য তাহাদিগকে শিল্পের সহিত পরিচয় লাভ করিবার যে প্রয়োজন আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। শুধু তাহাই নহে, আমাদিগের শিল্পকে সমৃদ্ধ করিবার কারণেও অপর জাতির শিল্প ভাণ্ডারে কি মণিরত্ন রহিয়াছে তাহার সন্ধান লইতে হইবে। বিদ্যালয়ে বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য শিল্পীদিগের দ্বারা নির্বাচিত, বিখ্যাত চিত্রশিল্পিগণ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপির (Print) একটি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক শিল্পীর এক একটি বৈশিষ্ট আছে, বার বার একই শিল্পীর বহু কাজ দেখিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শিল্প শিক্ষক, এই বিশেষত্ব কোথায় তাহা এবং বর্ণ সমন্বয়, ছন্দগতি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থিগণের মধ্যে যাহারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম বলিয়া শিক্ষক মনে করিবেন তাহাদিগের সহিত আলোচনা করিবেন। বিদ্যালয়ের যাদুঘরে বা গ্রন্থালয়ে বহু সংখ্যক চিক এক সংগে প্রদর্শন না করিয়া সুনির্বাচিত কয়েকটি চিত্র রাখা কর্তব্য এবং মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনানুসারে সেগুলি পরিবর্তন করিবার ব্যবস্থা করা যুক্তি-যুক্ত। ইতিহাস সাহিত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনার সময় সেই সকল বিষয়ের শিক্ষকগণ ঐ চিত্র বা কারুশিল্পের সংগ্রহের সাহায্য লইতে পারেন।

ডাকটিকিট সংগ্রহ করিবার খেয়াল আজ-কাল বিশেষ প্রচলিত ও জনপ্রিয় হইয়াছে। এই সংগ্রহ করিবার বাসনাকে নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিবার কার্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে। শিশুরা ফটো, সংবাদপত্রাদি হইতে বহুবিধ চিত্র সঞ্চয়ন করিয়া গ্রন্থাগারে রাখিতে পারে। নানা লোক, নানাবিধ ফুল, ফল, গাছ পশু পক্ষী দৃশ্য ইত্যাদির চিত্র এইরূপে আহরণ করা যায়। তাহা ছাড়া নানাপ্রকার পাথর, ঝিনুক মাটি কাঠ পাতা ফুল বীজ পালক প্রজাপতি পোকামাকড় হাড় ছাপা ও ছিটের কাপড় পুঁতি শিশি প্রভৃতি শত শত দ্রব্য সংগ্রহ করা চলে। সংগ্রহের বিষয়বস্তু মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন করিয়া বিদ্যালয়ের যাদুঘর সহজেই গড়িয়া তোলা যায়। এই সংগ্রহের ভিতর দিয়া উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণ বিদ্যা মণিক বিদ্যা চিকিৎসা বিদ্যা শিল্প ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি কত বিষয়ে যে শিক্ষাদান করা যাইতে পারে, তাহার সংখ্যা নাই। ইহা কাজও বটে খেলাও বটে। বিদ্যালয়ের এইরূপ সংগৃহীত সামগ্রী সম্বন্ধে, উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষার্থিগণের সাহায্যে সচিত্র পুস্তক রচনা করিতে পারেন। ঐ সকল সামগ্রীর তত্ত্বাবধান, উন্নতি সাধন বা পরিচালনার কার্য ছাত্রগণের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে।

মধ্যে মধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয়ের উদ্যোগে শিক্ষা সম্মেলন করিয়া তথায় শিক্ষার্থীদিগের শিল্প কার্য ও নানা সংগ্রহের প্রদর্শনী, নানা বিষয়ের তথ্যজ্ঞাপক পরিসংখ্যান লেখা চিত্র প্রভৃতির সমাবেশ এবং নানা সমস্যা লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। গৃহে অবসর সময়ে শিক্ষার্থীকে নানারূপ শিল্প কার্য করিতে উৎসাহিত করা ভাল। তবে গৃহে শিশুরা যদি কিছু কাজ করে তাহা শিল্প শিক্ষক দেখিয়া দোষ ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিবেন। একেবারে আপন খেয়াল খুশি মত তাহাদিগকে কাজ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিলে উপকার না হইয়া অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

অঙ্কন সকল প্রকার কারুশিল্পের পক্ষে অপরিহার্য। এজন্য বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র কারুশিল্পের প্রবর্তন করিলেই চলিবে না অঙ্কন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাও একান্ত আবশ্যক। পরিকল্পনায় সুদক্ষ না হইলে শিল্পীর পক্ষে কারুশিল্পের উন্নতি করা অসম্ভব। এখানে পরিকল্পনা অর্থে কোন বস্তুর উপর আরোপিত অলঙ্কারের কথা বলিতেছি না। Constructive ও Decorative design অর্থাৎ শিল্প বস্তুর গঠন বর্ণ প্রভৃতি কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে জ্ঞানের কথাও ইহার সহিত গণ্য করিতেছি। অলঙ্করণের ক্ষেত্রেই কারুশিল্পের সহিত চারুশিল্পের মিলন বা যোগ। শিল্প সামগ্রীর উপরিভাগে কেবলমাত্র অলঙ্কার আরোপ করিয়া শিল্পের শিল্পমূল্য বৃদ্ধি করা যায় না। কারণ যে সামগ্রীকে অলঙ্কৃত করা হইবে, তাহা নিজেই যদি গঠনে, বর্ণে, উপাদানে অসুন্দর হয়, তবে প্রক্ষিপ্ত অলঙ্কারের সাহায্যে তাহাকে সুন্দর করিয়া তোলা যায় না। অঙ্কন শুধু কোন কিছু দেখিয়া নকল করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলে না। মন হইতে কল্পনা করিয়া মৌলিক অঙ্কন কার্যে সকল শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করিতে হইবে। চারুশিল্পে শিল্পী যে পরিমাণে অধিকার লাভ করিবে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার রুচি সেই পরিমাণে মার্জিত হইবে এবং সে কারুশিল্পেও সেই মত বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে।

শিল্পের অনুষঙ্গ প্রসঙ্গে যে সকল ব্যবস্থা বা আয়োজন করিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলির মধ্যে সরকারী যাদুঘর ভিন্ন আর সব কিছুই, বিদ্যালয় আপন প্রচেষ্টায় করিতে পারে। শিল্প শিক্ষা অথবা রুচি সংস্কার বা শিল্প দৃষ্টির জন্য আর যে সকল ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিব তাহার জন্য সরকার বা জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইলে ভাল হয়। দেশের সরকার অথবা জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা না পাইলে কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সম্যকরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না, ইহা যেমন সত্য, সরকারের সাহায্য যদি একান্ত না মিলে তবে, অভাব মোচনের জন্য দৃঢ়সংকল্প থাকিলে, একটি বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভবপর না হইলেও কয়েকটি বিদ্যালয় মিলিতভাবে যে অনেক কিছুই করিতে পারে একথাও তেমনি সত্য। এক্ষণে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। দেশের সর্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা প্রকৃত শিক্ষার অভাব। এই অভাবের ফলেই দৈন্য, রোগ, নিরানন্দ, শ্রীহীনতা ও বিরোধ অনিবার্য গতিতে দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য একটি সুনির্বাচিত কর্মপন্থা লইয়া ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ভারতে সর্বাঙ্গীন শ্রীসম্পদ ফিরাইয়া আনিতে জাতীয় সরকার আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ইহা দেখিবার জন্য আকুল আগ্রহে দেশবাসী অপেক্ষা করিয়া আছে। কর্ম-পন্থায় শিক্ষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে করণীয়ের অন্ত নাই। শিল্পকলার ভিতর যে শিল্প আছে তাহা শিল্প বাণিজ্যের শিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধযুক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে, পূর্বোক্ত শিল্প শিক্ষার সহিতই অধিক যোগযুক্ত এবং শেষোক্ত শিল্প কেবল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। আমি যে শিল্প, শিক্ষার সহিত সংযুক্ত তাহা লইয়াই আলোচনা করিতেছি। বর্তমানে শিল্পকলা ও শিক্ষার দপ্তর একই মন্ত্রীর পরিচালনাধীন করা হইয়াছে; ইহাই বাঞ্ছনীয়। এই ক্ষণে আশা করা যায়, দেশের মধ্যে অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য যাঁহারা শিক্ষকতাকে শত দুঃখ সহিয়াও একান্ত কর্তব্য বলিয়া ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ও বহু দিনের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এমন শিক্ষকদিগকে এবং যাঁহারা লোভমুক্ত হইয়া পরম সুন্দরের উপাসনার জন্য শিল্পসাধনা করেন ও সকল বস্তুকে তথা সমগ্র দেশকে পরম সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সাধ্যমত নানা প্রচেষ্টায় ব্রতী রহিয়াছেন, এমন শিল্পীদিগকে ও সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে এইরূপ সকল যোগ্য গুণীকেই সরকার আহ্বান করিবেন এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ-

ক্রমে বর্তমান অবস্থার উন্নতিকল্পে একটি পন্থা বা পরিকল্পনা নিরূপিত হইবে। আর আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে সেই পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষের কেন্দ্রে এবং প্রত্যেক প্রদেশে ও প্রতি জেলার রাজধানীতে শিক্ষা ও শিল্পের উন্নতি বিধানকল্পে একটি করিয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। যোগ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রথমেই লুপ্ত এবং পরে লুপ্তপ্রায় শিল্পের নিদর্শনসমূহ সংগৃহীত ও তাহাদের ইতিহাস, প্রস্তুতিপদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হইবে। প্রাচীন ও নূতন মন্দির, মসজিদ, স্তম্ভ মূর্তি ইত্যাদি স্থাপত্য ভাস্কর্যাদি শিল্প দৃষ্টিতে মূল্য আছে এরূপ বস্তুর রক্ষা ও সংস্কার সাধনের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হইবে। লুপ্ত শিল্প ও লুপ্ত সংগীতের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহার পুনঃ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা হইবে। প্রচলিত শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে একে একে সকল শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ লিখিত, ছায়াচিত্র ও আলোকচিত্র গৃহীত ও পুস্তক প্রকাশিত হইবে; কথকতা, যাত্রাদি লুপ্তপ্রায় লোকসংগীত ও উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রবর্তিত ও তাহাদের রেকর্ড ও সবাকচিত্র গ্রহণ করিয়া এবং স্বরলিপি লিখনের ব্যবস্থা করিয়া সেগুলিকে বিলোপের আশঙ্কা হইতে মুক্ত করা হইবে। প্রত্যেক শিল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে, লোকসংগীত ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞকে, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, সাহিত্যিক, কবি পণ্ডিতাদি গুণীকে বৃত্তি বা প্রয়োজন অনুসারে অন্যাবিধ সাহায্য করিয়া আপন আপন সাধনায় ক্রমোন্নতিসাধন ও গবেষণার জন্য উৎসাহিত করা হইবে। এই সকল শ্রেষ্ঠ গুণীর দান যাহাতে স্থান বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহার প্রচেষ্টা হইবে। এই সকল ব্যক্তিকে লইয়া বিশেষজ্ঞ পরিষদ বা গুণীমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইবে ও ঐ মণ্ডলীগুলিতে নানা গঠনমূলক পরিকল্পনা রচিত হইবে। উপযুক্ত লেখকদিগের দ্বারা শিক্ষা, শিল্প, সংগীতাদি বিষয়ে নানা গ্রন্থ প্রণীত হইবে। প্রতি জেলার সকল বিদ্যালয়ে যাহাতে একটি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা লইয়া কাজ হয় এবং বিদ্যালয়গুলির পরস্পরের মধ্যে যাহাতে সংযোগ ও সহযোগ স্থাপিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হইবে। প্রদর্শনী, মেলা ও সংগীত শিল্পাদির সম্মিলনী হইবে। শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে কোথায় কিরূপ কার্য হইতেছে, পৃথক পৃথকভাবে তাহার বিবরণী ও মাসিকপত্র প্রকাশিত হইবে। প্রাদেশিক ও কে[illegible]নানা সরকারী বিভাগের সহিত এবং ভারতবর্ষের নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগরক্ষা করিয়া উন্নতির ও বাধাবিঘ্ন অপনয়নের চেষ্টা হইবে। কুরুচি পরিচায়ক শিল্পপণ্য, সংগীত, ফিল্ম পুস্তকাদি কোন বস্তু যাহাতে রুচি বিকৃতি না ঘটায়, তজ্জন্য যথোচিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বন করা হইবে। সবাক চিত্র, বেতার যন্ত্রাদির সাহায্যে গ্রামে গ্রামে নানা বিষয়ে প্রচার ও আনন্দ পরিবেশনের এবং ভ্রাম্যমাণ প্রথায় বিভিন্ন জেলার তথা বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পবস্তু, গ্রন্থ, রেকর্ড, ফিল্ম প্রভৃতি বিনিময় ও আদানপ্রদানের ব্যবস্থা হইবে। উপরোক্ত সকল কার্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিবার নিমিত্ত পরিসংখ্যান বিভাগ স্থাপিত হইবে। পরিকল্পনায় এইরূপ বহু বিষয়েরই উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেশকে সর্বপ্রকারে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিবার আকুল বাসনা দেশবাসীর চিত্তে জাগ্রত হইলেই করণীয় বিষয়গুলি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিবে।

তৃষ্ণা

কমলা দত্ত

রাত্রি হোলো;—
মিলিয়ে গেল আলোর শেষ রেখা
দিগন্তরে।
স্তব্ধ হোলো
সংসারের শতকর্ম কোলাহল।
শোনা যায়—একটানা ঝিল্লীস্বর,
কত অজানা কীটের অশ্রান্ত ঝঙ্কার।
দিনের আলোয় ছড়িয়ে পড়ি
—হীরকের দ্যুতির মত—
কত কাজে, কত ভীড়ে;
এখন ফিরে এলাম আপন
মনের নীড়ে।
মিল পাই খুঁজে
আকাশে বাতাসে।
কাঁপে তারাদল,
কথা বলে আলোর ইসারায়।
এখন জাগলো অতৃপ্তি,
জাগে চিরন্তন প্রশ্ন—
"কী আমার চাই?"

প্রতীক্ষা

শেফালিকা সেনগুপ্তা

আমার ভুবনে যবে চির অন্ধকার
আসিবে জীবন ছেয়ে, সকল দুয়ার
রুদ্ধ হয়ে যাবে যবে মোর মুক্তিপথে,
তখন তোমার ডাক যেন দূরে হতে
আপন অন্তর মাঝে শুনিবারে পাই;
আজিকার দুঃখ যত পুড়ে হোক ছাই।

চলে গেছে কত দিন কত মহানিশা,
বেদনায় কতবার হারায়েছি দিশা,
অন্তরের দ্বন্দ্ব কত উঠিয়াছে জাগি,
পারিনি বুঝিতে তবু,—তাই তোমা লাগি
ওগো প্রিয়তম, যা কিছু সঞ্চিত মোর
সব সাধনার—এই মূর্ত আঁখি-লোর
আমার জীবন-শেষে থাক তোমা তরে;
প্রতীক্ষিয়া রব আমি মরণের পরে॥

প্রসাদী ফুল

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

[৩]

নিরাপদ ভূমি

কোন এক গ্রামের সন্নিধানে একজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; হিন্দু-দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে সু-বিজ্ঞ কয়েকজন লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শিষ্যবর্গের নিকট তিনি গ্রীক্, জার্মান ও ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রের সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিত মধুচক্রে মক্ষিকার ন্যায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং তাঁহার বিচার ও মীমাংসায় পরিতুষ্ট ও বিগত-সন্দেহ হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। অচিরে সর্বত্র রাষ্ট্র হইল যে, সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি বর্তমান সময়ে সু-দুর্লভ। শুধু বিদ্বান নহেন, তিনি জ্ঞান-যোগী ছিলেন। শত শত নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

সন্ন্যাসী জ্ঞানবলে আপনাকে এতই নিরাপদ মনে করিতেন যে, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপিকর্ষতি।" অর্থাৎ বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্বান ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে, এই উক্তিকে অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেন; তিনি বলিতেন, বিদ্বান ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয়গণ কখনও আকর্ষণ করিতে পারে না।

সন্ন্যাসীর আশ্রমের সন্নিকটে এক জীর্ণ কুটীরে এক দরিদ্রা প্রৌঢ়া রমণী বাস করিত। একদিন রাত্রিযোগে সন্ন্যাসী সেই নিরাশ্রয়া প্রৌঢ়ার কুটীরের চালা বিদীর্ণ করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। অনাথা রমণী এই ঘটনা দর্শন মাত্র ঘরের বাহির হইল এবং বাহির হইতে দ্বাররুদ্ধ করিয়া চীৎকারপূর্বক পাড়া প্রতিবেশীদিগকে সেই স্থলে উপস্থিত করিল। সন্ন্যাসী লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া মাটীতে পড়িয়া ছিলেন, উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন দ্বার উন্মুক্ত করিলে তিনি বাহির হইয়া সকলের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 'এ ব্যক্তি আর কখনও এরূপ কুকার্য করে নাই, ইহার হঠাৎ পতন হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং তাঁহার পতনে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী অন্ধকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু লোকের মনে এই এক বিষম প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে, "তবে জ্ঞানে কি হইল? জ্ঞান যদি সাধককে পতন হইতে রক্ষা করিতে না পারিল, তবে জ্ঞানের মাহাত্ম্য কি? বস্তুত ধর্মের মর্ম বুঝা অসম্ভব।

ভূপেন্দ্রনাথ দয়ারসাগর, যুবক যেন দয়ার দ্বারাই গঠিত। যেখানে অন্নক্লেশ কি দুর্ভিক্ষ, ভূপেন্দ্র সেখানে উপস্থিত। রাত্রি নাই, দিন নাই। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দুঃখীকে অন্ন যোগাইতেছেন। নিজের আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্ধাশনে থাকিয়া আপনার অর্ধেক অন্ন অন্যকে দান করিতেছেন। রোগীর শয্যাপাশে ভূপেন্দ্রনাথ, দুঃখীর কুটীরে ভূপেন্দ্রনাথ, নিরক্ষরকে শিক্ষাদানে নিযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ; এমন সৎকার্য কিছুই নাই, যাহার সহিত ভূপেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। একদিনকার একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই ভূপেন্দ্রনাথের দয়ার পরিচয় পাওয়া যাইবে। একদিন তিনি কোন এক অনাথ রোগী বালকের জন্য ঔষধ পথ্য লইয়া রেলযোগে দশ ক্রোশ দূরস্থ এক গ্রামে গিয়াছিলেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া তাহার সুশ্রূষার জন্য তাহাকে ৩।৪ দিন যেখানে থাকিতে হইয়াছিল। যখন তিনি বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন রাস্তায় কতকগুলি দুঃখীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তাহারা তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিল। ভূপেন্দ্রনাথ বড়ই বিপদে পড়িলেন, একটু ইতস্তত করিয়া সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত দান করিয়া দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বাড়ী আসিলেন, তাঁহার পা ফুলিয়া গোদ হইয়াছিল।

এই দয়ার সাগর, কর্মযোগী ভূপেন্দ্রনাথকে তাঁহার একজন ডাক্তার বন্ধু হঠাৎ কোন এক কারাগারে কয়েদীর পোষাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভূপেন্দ্রবাবু আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? আপনি এখানে কি অপরাধে? আপনাতে কি পাপ সম্ভবে?" ভূপেন্দ্র উত্তর করিলেন, "আমি দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের অর্থ অপহরণ করিয়াছি।" বন্ধু বলিলেন, "ইহা কি সত্য? এমন দয়ার শরীরে কি এমন কু-কার্য সম্ভব হয়? যিনি দুঃখীর পাতে একমুঠা অন্ন দিতে আপনি উপবাস করিয়াছেন, তিনি কি দুঃখীর পাতের ভাত কাড়িয়া লইয়াছেন? বোধ হয় নিরাপরাধে আপনার শাস্তি হইয়াছে।" ভূপেন্দ্র গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "না, আমি সত্য সত্যই অপরাধী।" বন্ধু বলিলেন, "তবে ধর্মের মর্ম বুঝিলাম না। ঐকান্তিক সৎকর্মও লোককে পতন হইতে রক্ষা করিতে পারে না।"

হরিহর একজন ভক্ত; ভগবানের নাম করিলে গলিয়া যান। ভজনে কি কীর্তনে তাঁহার ভাব যে দেখিয়াছে, সে-ই মোহিত হইয়াছে। তাহার সেই ভক্তিভাবের মধ্যে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নাই। একদিন এক কীর্তনের দলের সঙ্গে রেলে করিয়া হরিহর কোন এক গ্রামে যাইতেছিলেন, রেলওয়ে স্টেশন হইতে অনেক দূর পথ হাঁটিয়া সেই গ্রামে যাইতে হইবে। সকলে কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন। এদিকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন সকলে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, আর কাহারও পা চলে না, তখন একজন বলিলেন, "অদূরে গোঁসাই হরিদাসের কুটীর দেখা যাইতেছে।" এই কথা শ্রবণমাত্র কীর্তনকারি-গণের মধ্যে নববলের সঞ্চার হইল, 'হরিদাস প্রভুর নামে সকলে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন, কোথায় গেল ক্ষুধা, কোথায় গেল পিপাসা, কীর্তন করিতে করিতে কুটীরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রেমাবেশে সকলের শরীর ভারি হইয়া পড়িল। মত্ত মাতালের মত মাতোয়ারা হইয়া কুটীরের চৌকাট পার হইতে ভাবাবেশে চরণ অবসন্ন হইয়া পড়িল। রাত্রি ১১টা পর্যন্ত এই ভাবের স্রোত বহিল। এই ভক্ত দলের মধ্যে হরিহরের ভাবভক্তি সর্বাপেক্ষা অপূর্ব ছিল। তাহাতে কিছুমাত্র কৃচ্ছ্র বা কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু হায়! এই হরিহর আপনার আশ্রয়দাতার বাড়ীতে এমন একটি কুকার্য করিয়া পলায়ন করিল যে, পরদিন হইতে সকলে তাহার নামে ধিক্কার দিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, যে "তবে ত ধর্মের মর্ম বুঝা গেল না, এরূপ অকপট ভক্তেরও যদি এইরূপ পতন হইল, তবে আর ভক্তিপথ ধর্মকে রক্ষা করিল কৈ?"

এইরূপে জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত, ত্রিবিধ সাধকের পতন দেখিয়া সাধারণতঃ ধর্মের প্রতি

লোকের অবিশ্বাস জন্মে, লোকেরা মনে করে, ধর্মকর্ম সকলই মিথ্যা, ভগবানের নামের কোন মাহাত্ম্য নাই।

এক শ্রেণীর লোকেরা এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া বলেন যে, একাঙ্গ সাধনার দোষেই এইরূপ বিপদ ঘটে, যদি কোন সাধক জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমানভাবে সাধনা করিতেন, তবে এরূপ দোষ ঘটিত না, এরূপ পতনের সম্ভাবনা থাকিত না। বাস্তবিক এ কথাও ঠিক নহে। সেই জ্ঞানী সন্ন্যাসীর জ্ঞান, ভূপেন্দ্রনাথের কর্ম এবং হরিহরের ভক্তি যদি এক ব্যক্তিতে প্রকাশ পাইত, তথাপি পতনের হস্ত হইতে তাহার রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। কারণ সেই পরিমাণ কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি কেহই সাধককে রক্ষা করিতে পারে না। আবার কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি যে কোন সাধকের সাধনকালে সমানভাবে ফুটিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। বাগানের মালী যেরূপ পাতাবাহারের গাছগুলিকে কাঁচি দ্বারা ছাটিয়া একাকার করিয়া দেয়, একখানি ডালকে বেশী বাড়িতে দেয়না, সাধকের হৃদয়োদ্ভূত ভাবগুলিকে সেইরূপ ছাটিয়া কাটিয়া দেওয়ার কোন মালী বা অস্ত্র নাই। যদি থাকিত, তবে জগতের বড়ই দুর্দশা হইত, কেন না, ধর্মের কোন অঙ্গই স্বাভাবিকভাবে বাড়িবার অবকাশ পাইত না, ধর্ম ছোটই থাকিয়া যাইত। বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীর অবোধ বালকের সঙ্গে যদি সুবোধ বালককে অপেক্ষা করিতে হয়, তবে সে কখনই অগ্রসর হইতে পারে না। বৃত্তিসমূহের সম্বিকাশ (Harmonious development) সাধারণ লোকদিগের জন্য বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয় বিশেষে অসাধারণত্বই তাঁহাদের মহত্ত্বের নিদর্শন। বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট ও শ্রীগৌরাঙ্গ শৃঙ্খলা করিয়া সংসার করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের অসাধারণত্ব ও মহত্ত্ব বিনষ্ট হয় নাই, সংসার করিতে গেলে তাঁহারা ছোট হইতেন। এই সকল জগৎপূজ্যদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বৈজ্ঞানিক জগতের ব্যক্তিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় যে, এক এক বিষয় লইয়া এক একজন পাগল, অন্য জ্ঞান-শূন্য হইয়া একই সাধনায় তন্মনা হইয়া আছেন। দশ কর্মান্বিত পুরোহিতের মতন সকল ব্যঞ্জনের হলুদের গুঁড়া হইলে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিশেষত্ব থাকিত না। তাঁহাদের দ্বারা জগতের কোন উপকারও হইত না।

এ সকল গেল বিতর্কের কথা, শ্রীশ্রীগুরুদেব উপরোক্ত কঠিন প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, সাধকদিগের পতন দেখিয়া ধর্মের প্রতি জনসাধারণের যে সন্দেহ জন্মে, সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, নিম্নে তাহাই নিবেদন করিতেছি। তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ সত্য, যাহা জীবনে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহা তিনি বলিতেন না। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "যে সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ কর নাই, তাহা প্রচার করিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি গুরুমুখে শুনা যায়, তবু কি তাহা বিশ্বাস করিব না?" তিনি বলিলেন, "কোন কিছু বিশ্বাস করা না করা মানবের ইচ্ছাসাপেক্ষ নহে, বিশ্বাস যদি হয়, তবে ত বিশ্বাস করিতেই হইবে, কিন্তু যতদিন সেই সত্য নিজের প্রত্যক্ষ না হয়, ততদিন পরকে তাহা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে।" তিনি নিজে যে আচরণ করিতেন, শিষ্যদিগকে তাহাই উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম এই, শাস্ত্রে প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ এই তিনটি অবস্থার কথা আছে। প্রবর্তক ও সাধকের পতন কিছুই আশ্চর্য ব্যাপার নহে। কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় আর পতন নাই। এই সিদ্ধাবস্থার অর্থ এই যে, মানুষের এমন একটি অবস্থা লাভ হয়, যে অবস্থায় মানুষ অচ্যুত পদ প্রাপ্ত হয়। যদি চিরদিনই পতনের সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত মানুষের পরিত্রাণ লাভের আশা থাকিত না; অনন্তকালই নরকের আশঙ্কা থাকিত। গোলকধাম খেলার খেলোকারিগণ এক একবার উৎকৃষ্ট লোকে যাইতেছে, অনতিবিলম্বে শুণ্ডিকালয় পতিত হইতেছে, সেখান হইতে নরককুণ্ডে এবং নরককুণ্ড হইতে সূতিকাগারে আসিয়া আবার কাঁদিয়া বসিতেছে। এইরূপে উত্থান পতন অনবরত চলিতেছে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যে ব্যক্তি একবার "ব্রহ্মলোক" নামক ঘরে উপস্থিত হইতে পারিল, তাহার আর পতন নাই; খেলায় দান যাহাই পড়ুক না কেন, তাহার আর পতন নাই। যদি উৎকৃষ্ট দান পড়ে, তবে গোলকধামের দিকে ঊর্ধ্বগতি হইল, যদি না পড়ে, সেই ব্রহ্মলোকেই বিশ্রাম করিতে লাগিল। তাহার আর পতন নাই। ইহাই অচ্যুত অবস্থা। সাধক যে পর্যন্ত এই অচ্যুত অবস্থা লাভ না করেন, ততদিন প্রতি পলকে পতনের সম্ভাবনা আছে, তাঁহার পতন দেখিয়া ধর্মের প্রতি সংশয় জন্মিবার কোন কারণ নাই।

আর একটি দৃষ্টান্ত,—

সমভূমিতে দশ হাত নীচে জল আছে, তোমাকে একটি কূপ খনন করিয়া জল উত্তোলন করিতে হইবে। প্রতিদিন তুমি কিছু কিছু করয়া মাটী কাটিয়া কূপ খনন করিতেছে, দশ হাতের এক অঙ্গুলি অবশিষ্ট থাকিতেও তুমি গণ্ডূষমাত্র জল পাইবে না। দশ হাত খনন করা হইলে ভোগবতী গঙ্গা পাতাল হইতে আসিয়া তোমার সাধনা সার্থক করিয়া দিবেন। কিন্তু তুমি যে নয় হাত খনন করিয়া জল পাও নাই, এজন্য যদি কেহ বলে যে "এই লোকটা জলের জন্য মাটী খুঁড়িয়া মরিতেছে, কিন্তু জলের সঙ্গে সম্পর্ক নাই" তাহার যেরূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত হইবে না, সেইরূপ সাধক যতদূর গেলে তাঁহার পিপাসার বারি পাইবেন, তিনি প্রবর্তক বি সাধক অবস্থায় ততদূর যাইতে পারেন নাই মাঝে মাঝে তাঁহার বিঘ্ন ঘটিতেছে, এজন সাধকের সাধনাকে এবং তাঁহার সাধ্য বস্তুকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই।

যতক্ষণ পর্যন্ত সাধকগণ নিরাপদ অবস্থা লাভ না করেন, ততক্ষণ মনে করিতে হইবে যে তাঁহারা গাছের আগ্‌ডালে শয়ন করিয়া আছেন কোন্ মুহূর্তে পতিত হইবেন, তাহার ঠিকানা নাই; যে সাধকের কিছুমাত্র আত্মদৃষ্টি আছে সে সর্বদাই সশঙ্কিত থাকে, অন্যের পতন দেখিলে সে পরিহাস করে না, ভীত হয় নিজকে একান্ত দীনহীন মনে করিয়া আত্মরক্ষা জন্য সর্বদা সতর্ক থাকে। প্রখর নদীর স্রোতে বড়ই উজান পড়িয়াছে, রাত্রি আগতপ্রায়, তাহাতে ডাকাইতের ভয়ঙ্কর উপদ্রব, সাথীনৌকাগুলি চলিয়া যাইতেছে, এই অবস্থায় পড়িয়া নৌকার মাঝিগণ যেমন প্রাণপণে দাঁড় টানিতে থাকে, পলকের বিরাম নাই, শ্বাস লইবার সময় নাই, অনবরত কেবল দাঁড়ের টান পড়িতেছে, টানের উপর টান। এই এক বাঁক উজান কাটিয়া উঠিলেই জোয়ার পাওয়া যাইবে, তখন শুধু হালটী ধরিয়া তামাক খাইতে খাইতে নিশ্চিন্ত হইয়া বন্দরে পেঁছাইতে পারিবে, কিন্তু এই এক বাঁকের মধ্যে আলস্য করিলে বিশ্রাম করিলে আর রক্ষা নাই, ডাকাইতের হস্তে নিশ্চয় মৃত্যু। সঙ্গিগণ আগে চলিয়া যাইতেছে একাকী ডাকাতের হস্তে পড়িয়া নিশ্চয় মৃত্যু সাধকের মনের ভাব, সাধকের মনের অবস্থা যখন এইরূপ হয়, তখন তাঁহার ধর্ম আরম্ভ হয়। তখন কেবল ত্রাহি ত্রাহি! বাজে কথা বাজে কাজ, বাজে আলাপ—কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না, একটি শ্বাস বৃথা ফেলিবার তাঁহার অবসর নাই, সেই বিপন্ন মাঝির মত টানের উপর টান্, অন্য কথা কিছু নাই, অন্তরে সর্বদাই ত্রাহি ত্রাহি! প্রবর্তক ও সাধকের অবস্থা এইরূপ।

অরুচির মুখে মিছরিও তিক্ত লাগে, কিন্তু মিছরিই সেই পিত্তিতিক্ত রোগের মহৌষধ সেইরূপ, বিষয়-বিকার-গ্রস্ত মানুষের নিকট ভগবানের সুধাময় নাম ভাল লাগে না, পরন্তু তিক্ত বোধ হয়, কিন্তু সেই নামই এই শুষ্কতা বিকারের একমাত্র মহৌষধ। নাম জপ করিতে করিতে সেই নাম মিষ্ট লাগিতে থাকে, ক্রমে ক্রমে সেই "নামামৃত পানে সাধকের নখাগ্র হইতে

* সম্ অর্থ সংগত, তুল্য, সমান। সম্+বিকাশ= সম্বিকাশ, সমানভাবে তুল্যরূপে বিকাশ পাওয়া।

কেশাগ্র পর্যন্ত অমৃতময় হইয়া যায়। সেই অমৃত চুষিতে চুষিতে অন্য আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া সাধক নিষ্পাপ হয়, তখন সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আপনি প্রাণে প্রকাশিত হন।" এই অবস্থা যখন স্থায়ী হয়, তখন সাধক সিদ্ধাবস্থা লাভ করেন, নিরাপদভূমি প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হন, তখন আর পতনের ভয় থাকে না।

নিরাপদ ভূমিতে উপস্থিত হইতে যাইয়া রাস্তায় যদি সাধকের পতন হয়, সাধক যদি সে অবস্থায় কখন কিছুকালের জন্য বিপথেও চলেন, সেজন্য তাঁহার সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়া যায় না, কেননা ধর্ম একটা মানসিক-ব্যায়াম (mental exercise) নহে। যিনি ধর্মাবহ, তিনিই ব্যাকুল আত্মাকে স্বহস্তে ধারণ করেন, সাদরে গ্রহণ করেন এবং অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে ও মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া গিয়া নিরাপদভূমি প্রদান করেন। এই যে নিরাপদ ভূমি, ইহাই ব্রহ্মলোক, এই স্থান হইতে আর পতন নাই, এখান হইতে সাধক অনন্ত উন্নতির পথে চলিয়া গোলকধামে যাত্রা করেন। ইহা কল্পনার কথা নহে, ইহা সাধক-জীবনের প্রত্যক্ষ সত্য। যদি এ বিষয়ের সাক্ষী না থাকিত, তবে ধর্ম ব্যর্থ হইয়া যাইত। অতএব কাহারও কাহারও পতন হইয়াছে, অথবা নয় হাত পর্যন্ত খুঁড়িয়াও কেহ বিন্দুমাত্র জল পায় নাই, তাহা দেখিয়া ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা কি অবিশ্বাস হওয়া উচিত নহে। নিরাপদ ভূমি প্রাপ্ত না হইলে প্রতি দণ্ডে পতনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। যখন সাধক এই ভূমির নিকটবর্তী হন, তখন তাঁহার জীবনে স্তরে স্তরে অবস্থার পরিবর্তন হইতে থাকে। শাস্ত্রে যে সকল অবস্থার নির্দেশ আছে, খামখেয়ালী করিয়া কেহ বলিতে পারিবে না যে, নিরাপদভূমি পাইলাম। লক্ষণের সহিত মিল হওয়া চাই। যতদিন এই অবস্থালাভ না হয়, ততদিন সাধকের অন্তরে কেবল ত্রাহি, ত্রাহি। **(ক্রমশ)**

* গীতা



বিপ্লবী

এ ওকুলফ্

দিনটা ছিল আলোকোজ্জ্বল মে মাসের প্রথম প্রভাত। চারিদিক তাই ঝলমল করছিল। নতুন আলোতে অবগাহন করে হাসছিল রুক্ষ পৃথিবী। নতুন রূপ নিয়ে আকাশের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছিল দিবাকর—স্বচ্ছ, সুন্দর, আনন্দদায়ক।

পথ দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছিল সৈন্যদল। তালে তালে বাজছিল সামরিক বাদ্যভাণ্ড। সেই যন্ত্র-সংগীতে ফুটে উঠেছিল যুদ্ধের আনন্দ আর এগিয়ে যাবার চিরন্তন আহ্বান। জয়-ঢাকটি যেন সুগম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করছিল : এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।......

ছোট্ট একটি কাঠের ঘরে বসেছিলেন মা ও ছেলে। আঙিনায় এসে পড়েছিল একফালি রোদ্র। সেদিকে তাকিয়ে মা মন্দ বলছিলেন তাঁর পুত্র এলেক্সিকে।

"এতে তোমার আনন্দিত হবার কি আছে?" মা বলছিলেন : "লাল ফৌজের কমাণ্ডার হয়েছো...তা ভাল! ...তোমার মানে এলেক্সি স্কোবিয়েকের পক্ষে খুবই সম্মানের কথা, না? কিন্তু তোমার পিতার কথা ভুলে গিয়েছ বোধহয়? তাঁর দুঃখ, তাঁর অভিযোগ... কিছুই মনে নেই, না?"

না, এলেক্সি তার পিতার কথা বিস্মৃত হয়নি, তার পিতা যে ধনী ছিলেন, বেশ বড় ব্যবসা ছিল তার সে কথাও সে ভোলেনি। তিনি শ্বেত রুশদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, এর পর থেকেই আর তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। এলেক্সি এর জন্যে প্রায়ই নির্জনে দুঃখ করত। ভাবত পিতার শ্বেত-রুশ-প্রীতির কথা। লজ্জা করত তার। তাই, তাইতো সে ভুলতে পারেনি পিতাকে, কোনদিন পারবেও না।

মা তার এদিকে তিরস্কার করেই চলেছেন।

"বুড়ো তুমি হওনি। বয়স তোমার কুড়িও পেরোয়নি। তোমাকে বালক ছাড়া আর কিছুই বলতে পারিনে। তাই বলি, বুড়োমি না করে বাপের কথা একবার ভাবো। তিনি তোমাদের অভিভাবক। তিনি সব কিছুই জানেন, বোঝেনও সব কিছু। তোমার মত ফচকে তিনি নন। এখন সব ছেড়ে তাঁকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করো, বুঝলে?......একটু থেমে তিনি আবার শুরু করলেন : "তিনি দেশকে আর ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে লড়াই করছেন।...আর তুমি কি করছ? না, দেশের রক্ষকদের কি করে খুন করতে হবে তারি শিক্ষা নিচ্ছ তোমার লাল ফৌজের দল থেকে। একেবারে বংশছাড়া হয়েছো তুমি।...হতভাগা।"... বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এ বকুনি আজ নতুন নয়। প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার। তবু এলেক্সি ধৈর্য হারিয়ে ফেলত। মার সঙ্গে আরম্ভ করত ঝগড়া করতে।

কিন্তু আজ আর সে কথা কাটাকাটি করবে না। এমনি সুন্দর দিনটাকে তিক্ততায় ভরে তুলবে না। বাইরের সোনালী আলো আর সৈন্যদলের সঙ্গীত মূর্চ্ছনা অপরূপ আবহের সৃষ্টি করেছে। নির্মেঘ নীল আকাশ তার মনে জাগিয়ে তুলেছে দিগন্তপ্রসারিত সেই তেপান্তরের কাহিনী। বিবাদ করার মত মনের অবস্থা তার নেই। ডিউটিতে যাবার আগে সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে এসেছে মাত্র।

বাইরে আঙিনায় এলেক্সির ছোট্ট ভাইটি একখানা খোলা তরবারি নিয়ে খেলা করছিল। সূর্যের আলো সেই তরবারির উজ্জ্বল ইস্পাতে প্রতিফলিত হয়ে চকচক করছিল।

এলেক্সি উঠে গিয়ে তার সঙ্গে খেলা শুরু করে দিল।

এমনি সময় রান্না ঘর থেকে তাদের বুড়ি ঝি ডেকে বলল : "ব্যারিন, বারিন, তোমার একখানা চিঠি আছে।"

"আমার চিঠি?" এলেক্সি শুধালো : "কে এনেছে?"

"একটি সৈনিক দিয়ে গেল।"

এলেক্সি পত্রখানা নিয়ে পড়ল। চিঠি নয় এটা, সামরিক আদেশ পত্র। তাতে তাকে জানান হয়েছে : কোলচকের পলায়নের পর বারাবিন জলাভূমিতে হাজার হাজার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সবগুলো দেহই পচতে সুরু করেছে। তাতে স্থানীয় অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা করা যাচ্ছে। ঐ সব মৃতদেহ কবর দেয়ার জন্যে একটা অতিরিক্ত কমিশন সংগঠন করা হয়েছে। ই, সি, সি।... এদের উপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ কাজ করার। রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার ২য় এন এন পদাতিক বাহিনীকেও প্রস্তুত হতে হবে।... সাধারণতন্ত্রের মঙ্গলার্থে আদেশ দেয়া হচ্ছে যে, একাজ যত শীঘ্র সম্ভব, সযত্নে শেষ করতে হবে।

এলেক্সি তৎক্ষণাৎ ভাবতে বসে গেল : কি কি অস্ত্র শস্ত্র, পোষাক পরিচ্ছদ সঙ্গে নিতে হবে। তাছাড়া কি করে তাড়াতাড়ি কার্য-

ক্ষেত্রে পৌঁছান যাবে তারও একটা পরিকল্পনা করে ফেলল।

এ সময় নাটাশা সাপোসনিকোভা এসে ঘরে ঢুকল। এসেই সে জিজ্ঞেস করল ওলগার কথা। তারপর জানতে চাইলো তাদের প্রাতর্ভোজন সমাপ্ত হয়েছে কি না।

এলেক্সি মুচকি হেসে জানালো যে, প্রাতর্ভোজন তাদের হয়েছে কিন্তু আরও হতে বাধা নেই। শুনে নাটাশা কিছু কাঠ নিয়ে পুরানো স্টোভটায় আগুন ধরাতে লাগলো।

এলেক্সি বসে বসে ওকে লক্ষ্য করতে লাগল। ক্ষণপরে হঠাৎ উঠে নাটাশাকে জিজ্ঞেস করল যে, সে যদি বায়ু পরিবর্তনের জন্য অন্যত্র যায়, তা ওর কাছে ভাল মনে হবে কি না। "কিছুদিনের জন্য মরুভূমিতে গিয়ে বাস করা ভাল, না?" বলে সে নাটাশাকে জড়িয়ে ধরে বুকের দিকে আকর্ষণ করল।

"কেন? তুমি কোথায় যাবে?" এলেক্সির কাঁধে মাথা রেখে নাটাশা জিজ্ঞেস করল।

এলেক্সি তাকে সব খুলে বলল। দুজনে কিছুক্ষণ ধরে বলল সুখ দুঃখের কথা। দেখতে দেখতে চুল্লি জ্বলে উঠল। নাটাশা উঠে গিয়ে ওমলেট তৈরী করতে লাগল।

এলেক্সির বোন ওলগা এসে ঘরে ঢুকল। এলেক্সি তাকে লক্ষ্য করে বলল : "আমি কাল চলে যাচ্ছি ওলগা। আমার পোষাকপত্রগুলো ঠিক করে দে।"

"কি ঠিক করে দেব? সবই যে অপরিষ্কার।" ওলগা জানাল।

"তা আর কি করা যাবে। যা আছে তাই দিয়ে দিস।" বলে থেমে নাটাশাকে লক্ষ্য করে বলল : "যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে আবার মিলিত হতে চাই, নাটাশা। কখন দেখা হবে বলতো?"

"বাড়িতেই যেয়ো," বলল নাটাশা : "আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

(২)

নাটাশার সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে এলেক্সি দেখে তার মা আর বোনে মিলে কাপড়চোপড় গুছিয়ে দিচ্ছে। দেখে সে বেরিয়ে পড়ল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে। জল-কাদা ভেঙে সে ওমস্ক বাজারে গিয়ে হাজির হল। সেখানে তার বন্ধু অটো কার্লোভিচের একখানা দোকান ছিল। সে চা, কফি, পিষ্টক আর চুরি করে আনা মদ বেচত।

সে দোকানে তখন অনেকেই ছিল। তাকে দেখে সবাই মিলে হৈ চৈ করে উঠল। একজন বলে উঠল : "আরে, দেখ দেখ আমাদের পদাতিক সৈন্যদলের জেনারেল এসেছেন।"

এলেক্সি দোকানের দোরে দাঁড়িয়ে ভিতর দিকে তাকাল। ধোঁয়ায় ভিতরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তবু তার পক্ষে বন্ধুদের চিনে নিতে কোন অসুবিধা হল না।

এলেক্সি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বলল : "আমি কাল শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি হে অটো।"

তার বিদায়বার্তা কাউকে বিচলিত করল না। সবাই মুচকি হাসতে লাগল। বন্ধুদের একজন শ্লেষভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল : তুমি নাকি লাল ফৌজে নাম লিখিয়েছ? সত্যি নাকি? কি করে ওখানে ঢুকলে শুনি।"

এলেক্সির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, একটা সন্দেহের ছায়া পড়ল সেখানে। টুপিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল : "কি করে লাল ফৌজে নাম লেখালাম? দাঁড়াও বলছি।" কিন্তু বলেই তার মনে হলো এসব কথা ওদের বলে লাভ নেই। কারণ লাল ফৌজকে সবাই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। সুতরাং ওর কথা বলা মানে বালিতে জল ঢালা। যাক্ ইতস্তত করেও সে বলতে সুরু করল :

"কেন লোকে লাল ফৌজে যোগ দেয় তা সব সময় বুঝিয়ে বলা যায় না, যেমন যায় না সমাজের উঁচুনীচু স্তরকে বলে বোঝাতে। এ বলে বোঝানর জিনিষ নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার কথা। যেমন ধর, ধনীদের কথা। তাদের দুঃখের মুখ দেখতে হয় না, কোন কাজ করতে হয়না, কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না। আর গরীব যারা তাদের সংগ্রাম করতে হয় প্রতিনিয়ত দুঃখের সঙ্গে। কাজ না করলে তাদের আহার জোটে না। জীবনে বসন্ত কোন দিন দেখা দেয় না।...এর মাঝে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়। বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তন সম্ভবপর।... বিপ্লব তোমরা চাও। পরিবর্তন করতে চাও সমাজ ব্যবস্থার? বল।...তোমরা অহরহ শ্রমিকদের ইতর বলে সম্ভাষণ কর। বোধহয়, সে কথা ঠিক। কিন্তু আমি যদি বলি যে, যারা কোন কাজ করে না তারাও ইতর, তবে তার জবাবে তোমরা কি বলবে, শুনি? জারের আমলে তারা কি করেছে সে কথা বোধহয় তোমরা ভোলনি। কোলচক আর সমস্ত কর্ম-চারী আর জেনারেলদের নিয়ে কি করেছে তাও বোধহয় তোমাদের স্মরণ আছে। এরা কি ঐ সব অতি মূর্খ গ্রাম্য চাষাদের চেয়েও খারাপ কাজ করেনি? এর চেয়ে জঘন্য ব্যবহার আর কি হতে পারে বলত? যাক্, বাক্য ব্যয়ে কোন লাভই নেই। কেন যে বিপ্লব আমার এত প্রিয় সে কথা তোমাদের বলে বোঝাতে পারব না, কিন্তু বিপ্লব ছাড়া আমি আর কিছু বুঝিও না।" বলে সে উঠে পড়ল।

(৩)

এলেক্সি তার রেজিমেণ্ট শুদ্ধ ট্রেনে উঠে একটা ওয়াগনের মেঝেতে শুয়ে শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ল। চলন্ত [illegible]র বাঁশী, স্টেশনের ঘণ্টা, সৈন্যদের পদধ্বনি, কথাবার্তা ইত্যাদি সব কিছু যেন তার স্বপ্নের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল।

স্টেশনে পৌঁছবার দশ মিনিট আগেই সে জেগে গেল।

স্টেশনের ঘরগুলিতে তখন সবেমাত্র নতুন প্রভাতের ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে। 'সিগন্যাল ম্যান' তার জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল। চেহারা তার অতি শীর্ণ, গাল দুটো বসে গেছে। বিনিদ্র রজনী যাপনের জন্য চোখদুটি তার জবা ফুলের মত লাল। স্টেশনে সে ছাড়া আর কেউ ছিল না।

"ট্রিকোনাফ?" নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে এলেক্সি ডাকল। "প্যাভেল পেট্রোভিচ্?...কমরেড... ওমস্কে আমার মা আর স্যাসফনিকফ আছে, তাঁদের জন্য এক পাউণ্ড করে ময়দা পাঠাতে পারবে?...আমি পরে দাম দিয়ে দেব।... পারবে? ......এই, পারবে?"

"পারব।"

গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। চারিদিকের গভীর নির্জনতার মাঝে অকস্মাৎ ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। কাঁচা মাটির উপর পাতা রেলগুলি গাড়ীর চাকার চাপে আর্তনাদ করে উঠল। এলেক্সি আবার ট্রেনের মেঝেয় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে আবার স্বপ্ন দেখতে লাগল সুমধুর প্রেমের, তার অনাগত যশো-মুকুটের আর অতীত কার্যাবলীর।

ট্রেন চলতে লাগল এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই এলেক্সির রেজিমেণ্ট ই সি সি রাজ্যে প্রবেশ করল।

বরফ গলে ফোঁটা ফোঁটা করে মাটিতে পড়ছিল। , স্তূপ থেকে সরিয়ে আনা মৃতদেহগুলি এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিল। কোনখানে হয়ত একখানা হাত, কোনখানে জানুচ্যুত একখানা পা, ছেঁড়া সার্টপরা একখানা পিঠ পড়েছিল। পাঁজর বের-করা অসংখ্য গলিত শব স্তেপভূমির মাঝে ছড়িয়ে ছিল।

মাঠের উপর বায়সের দল চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছিল। একজন আর একজনকে ডাকছিল, একে অপরের ডানায় আঘাত করছিল। কেউ হয়ত উপর দিকে উড়ে যাচ্ছিল। আবার কেউ হয়ত হঠাৎ নীচের এই গলিত শবকুণ্ডে নেমে আসছিল, শবের উপর বসে নীরবে তাকে নিজের পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

কাকগুলি এই সব উল্টানো পাল্টানো মৃতদেহের উপর বসে অনবরত তাদের মুখে ঠোকর মারছিল। গালের মাংস উপড়িয়ে আনছিল। চোখের তারা তুলে ফেলছিল, আবার মাঝে মাঝে বিনা কারণে আকাশের দিকে চলন্ত

গাড়ি আর ট্রেনের ধোঁয়ার দিকে তাকাচ্ছিল। এলেক্সি ট্রেনের জানালা থেকে তাদের লক্ষ্য করতে লাগল।

ট্রেন যথাস্থানে এসে থেমে গেল। এলেক্সি দেখল সেখানে অনেক লোক কাজ করছে। কেউ গর্ত করছে, কেউ পরিষ্কার করছে, আবার কেউ কেউ নীচু হয়ে শাবল দিয়ে কি যেন করছে।

কাছাকাছি কোনস্থানে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। কালো ধোঁয়ায় আকাশ ভরে গেল।

রেজিমেণ্টের সৈন্যদের ট্রেন থেকে নামবার হুকুম দেবে কি না একজন এসে তা জানতে চাইলো। এলেক্সি তখন ভাবছিল মা'র কথা, নাটাশার কথা। ভাবছিল সে ওমস্কের কথা, বসন্তদিনের কথা, লার্ক পাখীর কথা, আর মানুষের কথা; হ্যাঁ, সেই সব মানুষের কথা—যাদের শব তারা এবার কবর দেবে। একটা অব্যক্ত বেদনায় তার মনটা কঁকিয়ে উঠল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে সে জবাব দিলঃ "হ্যাঁ।"

(৪)

এলেক্সি তার তাঁবুর বাইরে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসেছিল। বনে বনে মর্মর ধ্বনি তুলে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। অগ্নিশিখা তারই তালে তালে কাঁপছিল থর থর। দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে সে বসেছিল। এই মৃত্যুর রাজ্যে, এই ই সি সি'র আবেষ্টনীর মাঝে কাটছে তার প্রথম রাত।

আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ল তার স্বপ্নের কথা। আশা ও আশঙ্কা, আলো ও আঁধার, স্মৃতি ও বিস্মৃতি, বিষাদ ও আনন্দ—সব কিছু মিলে এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হলো। চারিদিকের অস্বস্তিকর আলোছায়ার মাঝে সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তার আর ভাল লাগল না। উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল তার পিতাকে। অনেকদিনের ভুলে-যাওয়া একটি কণ্ঠস্বর যেন তার কানে ভেসে এলো ঃ "হুঁসিয়ার থাকিস। আর দেখ, কাউকে বিশ্বাস করিস না। মনে রাখিস, অন্যেরা নিজের কথাই আগে ভাবে। তা ছাড়া অন্যের কথার ভিতরও থাকিসনে।"

মনে হোল স্বপ্নের মধ্যেই সে তার পিতাকে ডাকছে।

এস বাবা, এস। এসে দেখে যাও তুমি কি করেছ।"

বসন্ত!......ই সি সি সূর্যকিরণ, সুগন্ধ আর পূতিগন্ধ। নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না এলেক্সির। বুকের উপর যেন জগদ্দল পাথর চাপানো হয়েছে। অকস্মাৎ সে উঠে বসল। শূন্যদৃষ্টিতে সর্বশরীর কেমন যেন কেঁপে উঠল। চারিদিকে তাকাতে লাগল। রাত অবসান হয়ে গেছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাচ্ছে যত স্বপ্ন আর কল্পনা। আগুন নিভে গেছে। নতুনভাবে কবর দেয়ার কাজ আরম্ভ হয়েছে। স্বপ্ন-রাজ্য থেকে ফিরে তার মন এসে থমকে দাঁড়াল এ সব বীভৎস মৃত্যুর নগ্নরাজ্যে।

(৫)

"মুখ-হাত ধোন, কমরেড কমাণ্ডার।"

এলেক্সির প্রিয় সহকারী এনিসিফ এসে বলল।

কয়েকজন শ্রমিক তার জন্যে জল এনেছিল। সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জল দিয়ে সে তার চোখ থেকে ঘুম দূর করে দিল। তারপর এনিসিফের দেয়া টেলিগ্রামটা পড়তে লাগল।

"তাড়াতাড়ি মৃতদেহগুলি সরিয়ে ফেলতে হবে, অন্যথায় সৈন্যদলের ও স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি হচ্ছে। যে কোন উপায়ে হোক শীঘ্র শীঘ্র কাজ শেষ করতে হবে।

"বেশ। কমরেড চলুন, আমরা তবে সবাই মিলে লাগি।" টেলিগ্রামটি পড়া শেষ করেই এলেক্সি চীৎকার করে বলল। তারপর সবাই কাজে লেগে গেল।

একটি বালকের ধূসর বর্ণের স্কুলের পোষাক ওরা খুলে ফেলল। বোধ হয় সে কোন স্কুলের ছাত্র। ছেলেটির জুতো খুলতে গিয়ে জুতো ধরে টান দিতেই পা শুদ্ধো চলে এল। আর একজনের পা-জামা খুলতে গিয়ে দেখে, তাতে মোটা লাল লাল দাগ কাটা। এ যে জেনারেলের চিহ্ন! জেনারেল!

"আমরা বড় পরিশ্রান্ত হয়েছি, কমরেড কমাণ্ডার। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেব।"

"না, না, কাজ কর, কাজ কর।" ভ্রূ কুঁচকে এলেক্সি জবাব দিল।

"এতগুলো দেহ ওরা আজ কিছুতেই কবর দিতে পারবে না।"

"ওরা পারবে কি পারবে না, এ দেখা আমাদের কাজ নয়। তোমরা তোমাদের কাজ কর।"

দুর্গন্ধে এলেক্সির মাথা ঘুরছিল। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল। তার দেহ ও মন অবসাদে ভেঙে পড়ছিল। শ্রমিকদের মধ্যে কে একজন ধূমপান করবে বলে ম্যাচটা চাইলো। এলেক্সি ক্ষণিকের জন্য ঐ বিষাদকরুণ দৃশ্য তুষার রেখাঙ্কিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, বনভূমির বুকে ঝুলে-পড়া তিমিরাচ্ছন্ন মেঘরাশি ও আকাশে উড্ডীয়মান পাখীর ঝাঁকের দিকে তাকাল। যেখানে ডিনামাইট বসান হয়েছিল, সেখানে ঘন ঘন বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। জলাভূমির অদূরবর্তী স্থান-সমূহ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তার কাজ বন্ধ করে ইচ্ছে হোল তার মাথাটা টিপতে। "উঃ! কি বীভৎস ব্যাপার, কিন্তু এজন্য তো কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি," সে মনে মনে বললঃ প্রধান দুর্বৃত্ত তো আগেই পালিয়েছে।" সে নিরর্থক একে মার্জনা করতে চেষ্টা করল। ভাবল এই সমস্ত বিপর্যয়ের কারণ ঐতিহাসিক, এ শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষ, এর সংঘটন অপরিহার্য। "ইতিহাসের নির্মমতা......হোক তাই! বিপ্লবের জন্য যদি এমনি ধারার জীবন বলিদান দেওয়া প্রয়োজন হয়, তাতে আমার আপত্তি নেই।"

লালফৌজের লোকদের মধ্যে সে একবার ঘুরে এল। সবাই শাবল নিয়ে ব্যস্ত।

এলেক্সি দেখল এনিসেফ আরও তিনজন লোক নিয়ে একজন বৃদ্ধের গলিত মৃতদেহ থেকে একটি অতি জীর্ণ ওভারকোট খোলার জন্যে টানাটানি ক'রছে। এনিসেফ তাকে দেখে মৃদু শ্রান্তির হাসি হাসল। তারপর মৃতদেহটা টেনে তুলল।

"টানো ভাইসব, টানো।"

এলেক্সি সেই হতভাগ্য বৃদ্ধের গলিত শবের পানে তাকাল। লোকটির থুতনি পর্যন্ত নেমে-আসা দাড়ি, কাদায় জট পাকানো চুল এবং ব্লাউজের কলার দেখে সে চমকে উঠল। ভয়ে ও ভাবনায় তার প্রাণ কেঁপে উঠল।

—নাঃ, এবার আর তার চিনতে কোন কষ্ট হয়নি। ঐ দাড়ি, ঐ ধূসরাভ কেশ আর ঐ ব্লাউজ নিঃসন্দেহে স্মরণ করিয়ে দিল পিতার কথা। মনে পড়ল গৃহের শেষ দিনের সেই স্মৃতি।......'সর্বদা সাবধানমত চলাফেরা করো, বৎস। আমার কথা মনে রেখো। দেশকে প্রতারণা করো না।'......

তার চারধারের সৈন্যেরা অন্য বিষয়ে আলোচনা করছিল।

এলেক্সি অতিকষ্টে নিঃশ্বাস ফেলল। চোখ ছাপিয়ে অশ্রুরাশি গড়িয়ে পড়তে লাগল। তার গলায় কি যেন বিঁধে গেল।

"বাবা......" সে অস্ফুটে বললঃ "তাহলে এই হয়েছে আপনার? শেষ পর্যন্ত এখানে স্থান নিয়েছেন আপনি।......"

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করল।

"এই আপনার শেষ পরিণতি......"

তীব্র মনোবেদনা তার অন্তরের অন্তঃস্থলে আঘাত ক'রল। তার সজল চোখের সম্মুখে স্তেপ প্রান্তর যেন চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। স্মৃতির বন্যায় তার অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হয়ে উঠলঃ আঃ! সেই যত্ন, আনন্দ! মনে পড়ল তার পিতা তাকে শিক্ষা দিত, বনে গিয়ে তাকে নিয়ে শিকার ক'রত। সবুজ ঘাসের মাঝ দিয়ে তাকে নিয়ে বেড়াতে যেত।

এলেক্সি ঝুঁকে পড়ে, দু'হাত দিয়ে মৃতদেহটি উঠাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার

পুরানো পশুলোমের তৈরী ক্লোকটি এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল। তার ফাঁক দিয়ে নীচের শতছিন্ন কোটটিও দেখা যাচ্ছিল। তাঁর পকেটে যা ছিল, তা সবই কাদায় এবং বরফের মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। কম্পিতহস্তে এলেক্সি ওগুলি সব কুড়িয়ে নিল। ওর ভিতর পেল সে বাড়ির উদ্দেশ্যে লেখা ডাকে না-দেওয়া শেষ চিঠিখানা। চিঠিটা তার মা'কে উদ্দেশ করে লেখা। চিঠির সঙ্গে একখানা দৈনিক পত্রিকার কর্তিতাংশ জুড়ে দেয়া হয়েছে। সেই অংশে আছে কোলচকদের প্রত্যাবর্তনের ও শ্বেত-রুশদের নিশ্চিত জয়ের সংবাদ।

বিহ্বল দৃষ্টিতে এলেক্সি তার চারিদিকে তাকাল। শ্বেত-রুশদের বিজয়!......হ্যাঁ, সেজন্যই এই স্তেপভূমি মৃতদেহে আজ আচ্ছন্ন। কিন্তু এই শ্বেতদের বিজয় কিসের সূচনা করত? ধরণী যেত লাল হয়ে। নগরে, গ্রামে, শহরে বইত রক্তের স্রোত......লক্ষ লক্ষ লোক হ'ত অত্যাচারিত, ঝুলত ফাঁসীতে।

রুমালের পরিবর্তে সে এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় দিয়ে চোখ মুছল। কিন্তু উদ্গত অশ্রু রোধ করতে পারল না।

“আমায় একটু সাহায্য করবে কমরেড এনিসিফ,” সে বলল।

এনিসেফ এগিয়ে এল।

“আপনাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি, কমরেড কমান্ডার।”

“ইনি আমার পিতা। একে উপযুক্তভাবে সমাধিস্থ করতে চাই। কিন্তু কাজ আমাদের বন্ধ রাখলে চলবে না। কবর খনন করা শেষ হলেই আমি আবার আসব।” বলে সে চলে গেল।

(৬)

সমবেত লোকেদের চেষ্টায় স্তেপভূমি পরিষ্কার হয়ে গেল। ওমস্কে ফিরে যাওয়ার জন্য আবার এলেক্সির উপর আদেশ হলো।

ফেরার পথে এলেক্সির দৃষ্টি পড়ল ক্ষুদ্র একটি শ্বেত ক্রসের উপর। ক্রসটি ছিল তার পিতার সমাধির উপর।

পিতার জন্য সে দুঃখবোধ করছিল, কিন্তু কি যেন সে দুঃখকে তীব্র করে তুলতে পারছিল না। চোখ বুজে সে ভাবতে লাগল গত বছরের ঘটনাবলীঃ সোভিয়েট সৈন্যদলের পরাজয়, কোলচকের দলে পিতার যোগদান, নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনার উন্মেষ, লাল দলে নিজের যোগদান; মাতার সঙ্গে বিবাদ, বিপ্লবের প্রতি কঠোর নিষ্ঠা।......কি অদ্ভুত সব ঘটনার সমাবেশ এবং পরিবর্তনও কত দ্রুত! তারপর সবচেয়ে যা গুরুতর, তা হচ্ছে নির্বাচন-জয় অথবা মৃত্যু, হাঁ অথবা না, পক্ষে অথবা বিপক্ষে, কপটতা বা বাগাড়ম্বরের উপায় নেই। বেয়নেট ধরে নির্ধারিত হচ্ছে ভাগ্য।......

(৭)

ওমস্কে পেঁছে সে ঠিক করল যে, বাবার মৃত্যু সংবাদ আরও কিছুদিন লুকিয়ে রাখবে। এর ভিতর মা ও বোনকে প্রস্তুত করে নেবে, যাতে এ সংবাদ শুনে তারা অভিভূত হয়ে না পড়ে। অধিকন্তু তারও একটু আত্মিক বিশ্রাম প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, যাতে মৃত্যুর রাজ্যের যে ছায়া তার মনে পড়েছিল, তা বিনষ্ট হবার অবসর পায়। তার মনকে অন্য দিকে চালনা করবার ইচ্ছে তার হোল এবং জোর করে ভাবতে চেষ্টা করলো যে, আনন্দ এবং বসন্তই হচ্ছে প্রকৃত সত্য।

নাটাশার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার বালিকাসুলভ চাপল্য দেখে সে আশ্চর্য হোল। তার নরম বক্ষের ওঠানামা, পোষাকের সাধারণত্ব তাকে মুগ্ধ ক'রল। আঃ ঠিক পূর্বের মত...... তার চোখের প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টি ঠিক তেমনি রয়েছে......হ্যাঁ সে তো আদৌ বদলায়নি।

কিন্তু মৃত্যুর নিঃশ্বাস যেন তার ললাটে এসে লাগল।

সে নাটাশার দিকে তাকাল।

মানবের প্রেম একেবারে নিঃসহায়, ভঙ্গুর আর অরক্ষিত। বাত্যাপ্রকম্পিত ক্ষুদ্র দীপ-শিখার মত কাঁপছে সে থর থর করে, যেন চাচ্ছে প্রশান্তি, চাচ্ছে মুছে যেতে। দুঃখ হয়ত আসবে, কিন্তু যে পর্যন্ত এই অনির্বাণ, প্রকম্পিত প্রেমশিখা থাকবে দীপ্যমান সে পর্যন্ত তা মানব-হৃদয়কে করবে উজ্জ্বল, আর উত্তপ্ত।

“আমায় সব কিছু খুলে বল, এলয়সা।” নাটাশা অনুরোধ জানাল।

এলেক্সি বলতে শুরু ক'রল, কিন্তু বর্তমানের প্রতি নিষ্ঠা বার বার তাকে অতীতের গল্প বলায় বাধা দিচ্ছিল। সে আজ পরিশ্রান্ত, জীর্ণ। জীবনের ধারা প্রতিহত।

এলেক্সির কথা শেষ হতেই নাটাশা বললঃ “বন্ধু আমার, আমি জীবনকে ভালবাসি এবং তোমাকেও। আমি যেভাবেই হোক বাঁচতে চাই এবং তা তোমারি সঙ্গে। তুমি জয়ী হও কি পরাজিত হও, আমার কাছে তা সবই সমান। আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার সঙ্গেই বাঁচতে চাই।

নাটাশার কোন কথাই এলেক্সির কানে যাচ্ছিল না। সে ভাবছিল ঃ ‘জীবনে রয়েছে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, সে বিপ্লব। আমি এর জন্যে পারি বিসর্জন দিতে সব কিছু—বিন্দুমাত্র নিজের জন্য না রেখেও।”

অনুবাদক—**শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়**

পুস্তক পরিচয়

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র—শ্রীসাবিত্রী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—নালন্দা প্রেস, ১৫৯-৬০নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

সুভাষচন্দ্রের জীবনী বিষয়ে এই গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। লেখক আবেগ ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বিশেষ দরদের সহিত সুভাষ জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। কলিকাতায় সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবনের সহিত লেখক নিজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে সুভাষচন্দ্রের জীবনের এমন অনেক খুঁটিনাটি বিষয় তিনি বিবৃত করিতে পারিয়াছেন, যাহা অন্যের পক্ষে বিবৃত করা হয়ত সম্ভব হইত না। সুভাষ জীবনকে লেখক প্রধানত দুই ভাগে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের নামকরণেই তাহা পরিস্ফুট। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিশ্ববিশ্রুত কার্যাবলী যে সুভাষচন্দ্রের তৎপূর্বে জীবনের কার্যকলাপেই আভাস দিয়াছিল, লেখক তাহা দেখাইয়াছেন। বস্তুত নেতাজীর একখানা তথ্যপূর্ণ ও সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ জীবনী গ্রন্থ হিসাবে আলোচ্য বইটি বাঙালী পাঠক মাত্রেরই সমাদর লাভে সক্ষম হইবে। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট মনোরম।

গুড আর্থ—শ্রীপুষ্পময়ী বসু অনূদিত। প্রকাশক—রেডিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা।

বিখ্যাত কথাশিল্পী পার্ল বাকের গুড আর্থ সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছে এবং বহু ভাষায় ইহার অনুবাদ বাহির হইয়াছে। এই বঙ্গানুবাদখানি যে বঙ্গ ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে সে কথা বলাই বাহুল্য। যে পটভূমিকায় গুড আর্থ রচিত, তাহা এখন আর শুধু চীনেই সীমাবদ্ধ নহে, সমরকালীন বাঙলাদেশে আমরা ইহা অপেক্ষাও ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করিলাম। বাঙলার দুর্ভিক্ষ নিয়া এদেশে কথা সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা যে না হইয়াছে তাহা নহে; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, যাহা কিছু রচিত হইয়াছে, নিতান্ত অক্ষম অকিঞ্চিৎকর রচনা হিসাবে তাহা মানুষের দুঃখ বেদনার অন্তরালেই বুদ্বুদের মত তলাইয়া গিয়াছে। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এতদ্দেশীয় বর্তমানকালের কথাশিল্পীরা এই মানবীয় দুর্গতিকে যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা হইতেও বঞ্চিত। মার্কিন মহিলা চীন-দেশে বসিয়া তথাকার মানবীয় দুর্গতিকে যেভাবে রূপদান করিয়াছেন, তদৃষ্টে আমাদের কথাবিলাসী সাহিত্যিকদের দৈন্য ও অক্ষমতার জন্য স্বভাবতঃই লজ্জানুভব হয়।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বিগত ১০ই অক্টোবর নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক উপদ্রব আরম্ভ হয়। তাহার সংবাদ বাংলার সর্বত্র প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ২৫শে নবেম্বর পশ্চিম বঙ্গ হইতে 'দেশ' পত্রের একজন পাঠক আমাকে এক পত্র লিখেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেনঃ—

"সাম্প্রতিক দাঙ্গা ও ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের ফলে হিন্দু মহলে বঙ্গ বিভাগের প্রশ্নটি বিশেষভাবে জাগরিত হইতেছে। প্রায় সকলেরই স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ বিভক্ত হইয়া বাঙলার হিন্দুর দুর্গতির লাঘব হউক। কিন্তু সমস্যা এই যে, ইহাতে লাভ না ক্ষতি হইবে? বাঙলার রাষ্ট্রিক, অর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা জাগরণের মূলে আছে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ। তাঁদের কোথায় রাখা হইবে? বঙ্গ ভঙ্গের ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যে কারণে বিরোধিতা করা হয়, তাহার সমস্যা আবার চলিবে কিনা? বঙ্গ ভঙ্গের সুফল বা কুফল হিন্দু মুসলিম ও বৃটিশ স্বার্থসমূহের লাভ বা ক্ষতি কি হইবে, তাহার বিশদ আলোচনা (সংক্ষেপে নহে—প্রমাণাদি বিস্তৃতভাবে) যদি 'দেশ' পত্রে ধারাবাহিক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন, তবে সাধারণের অনেক সংশয় নিরসন হয়।"

'দেশ' সম্পাদক ঐ পত্র আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পত্রে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করা হইয়াছিল, আজ সেই সকল বাঙ্গালীকে বিশেষভাবে চিন্তিত করিতেছে। একান্ত পরিতাপের বিষয়, বাঙ্গালীর এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লইয়া অনিবার্য মতভেদ দলগত ব্যাপারের মত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায় বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর কল্যাণকামী সকলেরই পক্ষে সমবেত চেষ্টায় এই সমস্যার সমাধান চেষ্টা করিয়া সমবেতভাবেই কার্যে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, যদিও দেখা যাইতেছে বাঙ্গলার বাহিরের কংগ্রেসী নেতারাও বাঙ্গলার সমস্যা সম্বন্ধে ঈপ্সিত মনোযোগ দিতেছেন না, তথাপি বাঙ্গলার এই সমস্যা যে সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্যা তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে কারণেই হউক, বাঙ্গলায় যে পাকিস্থানের পরীক্ষা হইতেছে, তাহা বলা অসঙ্গত নহে। মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের স্থিতিকালে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়া গ্রামাঞ্চলে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল তাহার ফলে বহু হিন্দু ধনপ্রাণ রক্ষার্থ বৃটিশ শাসিত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া সামন্ত রাজ্য ত্রিপুরায় গমন করেন। তাহাতে আপনার প্রাথমিক কর্তব্য পালনে অক্ষমতায় লজ্জানুভবও না করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয়দান করার জন্য বাঙ্গলার গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট ত্রিপুরার মহারাজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বাঙ্গলার উপদ্রুত হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। স্যার জন হার্বার্ট তখন সম্মিলিত সচিব সঙ্ঘ গঠনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর চেষ্টা ব্যর্থ করিতে না পারিলেও স্যার জন সে সচিব সঙ্ঘ অধিক দিন সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি আবার মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ গঠিত করেন এবং সেই সচিব সঙ্ঘের কার্যকালে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বাঙ্গলায় লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। সচিব সঙ্ঘের ত্রুটিতে যে বহু লোক প্রাণ হারাইয়াছিল তাহা সরকারের দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে দেখান হইয়াছে। কিভাবে সাম্প্রদায়িক বণ্টননীতি অনুসারে ব্যবস্থা করিতে যাইয়া বাঙ্গলা সরকার খাদ্য-দ্রব্যের দোকান খুলিতে অযথা বিলম্ব করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই-বা এজেণ্ট নিয়োগের ব্যাপারে প্রদেশের বহু ক্ষতি হয় সেসব যেমন ঐ কমিশনের রিপোর্টে দেখা গিয়াছে তেমনি আবার দেখা গিয়াছে—

লক্ষ টাকা লাভ করিতে সঙ্কোচানুভব করেন

(১) নিরন্নদিগের অন্নদানেও সরকার লক্ষ নাই।

(২) ব্যবস্থার দোষে অনেক খাদ্যদ্রব্য বিকৃত করিয়াছেন।

স্যার জন হার্বার্টের পরে মিস্টার কেসী বাঙ্গলার গভর্নর হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনিও যেরূপে মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘের প্ররোচনায় হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অধিকার লোপের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনার বিষয়। তাঁহার পরে স্যার জন বরোজ গভর্নর হইয়া আসিয়াছেন। তিনি নোয়াখালীর ঘটনা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট বিলাতে পার্লামেণ্টে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে ব্যাপারটির গুরুত্ব হ্রাস চেষ্টাই দেখা গিয়াছে। তিনি কার্শিয়াংএ ও সেদিন জলপাইগুড়ীতে যে ব্যবহার জনগণের নিকট পাইয়াছেন, তাহাতেও যে তিনি পদত্যাগ করেন নাই, তাহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবার বিষয়। গভর্নরের কর্তব্য সম্বন্ধে যে নির্দেশ আছে, তাহাতে সচিবদিগের কোন পরামর্শ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিরোধী হইলে সেই পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া বর্জন করাই গবর্ণরের কর্তব্য। কিন্তু স্যার জন মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" সরকারী ছুটি ঘোষণায়ও আপত্তি না করায় তিনি যে বাঙ্গলার সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থ-বিরোধী—এমন কি প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের সম্ভাবনাত্মক কার্যেও সচিব সঙ্ঘকে বাধা দেন নাই, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঐ দিন সরকারী ছুটি ঘোষণার প্রতিবাদে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনা হয়, তাহাতে অন্যতম সচিব মিস্টার মহম্মদ আলীও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন—বাঙ্গলার প্রধান সচিব লীগের অনুসৃত লীগ "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" ঘোষণা করায় তাঁহাকেও তাহা করিতে হইয়াছে। ঐদিনের ঘটনা এখনও তদন্তাধীন; সুতরাং সে বিষয়ে অধিক কিছু বলা যায় না। নোয়াখালীর ঘটনা সম্পর্কে স্যার জন বারোজের কার্যের উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। কিন্তু বর্বরতায় নোয়াখালীর ব্যাপার যে বর্তমান যুগে অতুলনীয় তাহা অনায়াসে বলা যায়। যাঁহারা নোয়াখালীর ব্যাপারের বিবরণের সহিত প্রথম জার্মান যুদ্ধকালে জার্মানদিগের যুদ্ধকালীন ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগের তদন্ত কমিটির ব্রাইস কমিটি রিপোর্ট মিলাইয়া দেখিয়াছেন—তাঁহারা স্বীকার করিবেন নোয়াখালীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অত্যাচার ফ্লাণ্ডার্স প্রভৃতি স্থানে জার্মানদিগের বর্বরতাকে অনায়াসে নিষ্প্রভ করিয়াছে।

এই সকল হইতে এমন মনে করা অসম্ভব নহে যে, বাঙ্গলায় পাকিস্থানের পরীক্ষা হইতেছে এবং কোন নীতির বশবর্তী হইয়াই বাঙ্গলার বিদেশী সরকার মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই; পরন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা রক্ষা করিতেছেন বলিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কর্তব্যে অনবহিত থাকিয়াছেন।

বিলাতের মন্ত্রী মিশন প্রস্তাবের সহিত এ বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডল যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বর্তমান প্রদেশগুলিকে সার্বভৌম অধিকার প্রদানের কথাও রহিয়াছে।

কাজেই বলিতে হয়—বাঙ্গলায় পাকিস্থানের যে পরীক্ষা হইতেছে, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করা জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী মাত্রেরই কর্তব্য। কারণ যদি ভারতবর্ষকে

বিভাগ করাই বৃটিশ রাজনীতির অভিপ্রেত হয় তবে তাহার ফল কিরূপ হইবার সম্ভাবনা অপরিহার্য, তাহা বাঙ্গলায় পাকিস্থানের যে পরীক্ষা হইতেছে, তাঁহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে। কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালনী নোয়াখালী অঞ্চলে "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থানের"—"মারকে লেঙ্গে পাকিস্থানের" পরিণতির বিষয় লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন। গান্ধীজী যে জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন তাহার ফলে কি তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন? অহিংস নীতির চরম পরীক্ষায় কি হয় তাহা তিনি নিশ্চয়ই পরে লোককে জানাইয়া দিবেন। লোককে স্থানান্তরিত করা তাঁহার অভিপ্রেত না হইলেও তিনি যে এখন বলিতে বাধ্য হইতেছেন—সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি সংখ্যালঘিষ্ঠের স্থিতি সহ্য করিতে অসম্মত হয়, তবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইলে সংখ্যালঘিষ্ঠের পক্ষে স্থানত্যাগ করাই ভাল। তাহাতেই বুঝা যায়, তিনি বাঙ্গলার সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের মনোভাবের যে পরিচয় পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, তাহা অহিংসনীতির দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না।

বাঙ্গলার অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণের প্রয়োজনের দ্বিতীয় কারণ—সামন্তরাজ্যসমূহ যেমন বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মতামত অবস্থা-ব্যবস্থা হইতে আপনাদিগকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারে না—ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশও তেমনই বাঙ্গলার ব্যাপারের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। তাহা এবার বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রথমে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছিলেন—শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবে তাঁহারা লর্ড ওয়াভেলকে কলিকাতার হত্যাকাণ্ডের পরে বাঙ্গলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি সে পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই—ফলে বিহারে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে—অন্যান্য প্রদেশেও হইবে।

বিহারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছিলেন—কলিকাতার ব্যাপারের প্রতীকার না হওয়ায় বিহারের ব্যাপার ঘটিয়াছে। কলিকাতায় বহু বিহারী স্বজন হারাইয়াছিল—সর্বস্বান্ত হইয়াছিল। তাহারা বিহারে আসিয়া সেই "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের" ব্যাপারের অভিজ্ঞতা বিবৃত করায় সেই বিবরণ গ্রামে গ্রামে ব্যাপ্ত হওয়ায় সর্বত্র বিশেষ উত্তেজনার উদ্ভব হয়। তাহার পরে যখন নোয়াখালিতে হিন্দুদিগের উপর উপদ্রবের সংবাদ বিহারে আসিল, তখন তথায় স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের সংবাদে বিহারীদিগের বিক্ষোভ আর সীমাবদ্ধ রহিল না। তখন বিহারে হাঙ্গামা আরম্ভ হইল। বাঙলার উপদ্রবকারী মুসলমান—উপদ্রুত হিন্দু। বিহারে বাঙলার ব্যাপারের প্রতিক্রিয়ায় উপদ্রবকারী হিন্দু—উপদ্রুত মুসলমান। বাঙলায় হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠ—বিহারে মুসলমান তাহাই।

ইহার পরে বিহারের হাঙ্গামার আলোচনা প্রসঙ্গে বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংই কথাটি আরও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—ভারতবর্ষ এক, তাহার এক প্রান্তে যাহা ঘটে, অপর প্রান্তেও তাহার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। তিনি বলেন, কলিকাতায় মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে" যে সকল ঘটনা ঘটে, বড়লাট যদি তাহার পরেই কলিকাতায় যাইতেন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেন, তবে নোয়াখালির শোচনীয় ঘটনা ঘটিত না। নোয়াখালির ঘটনা না ঘটিলে বিহারে তাহার প্রতিক্রিয়া হইত না। আর বিহারে (হিন্দুদিগের উপদ্রবে) সুদূর হাজারায় যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছে, তাহা ঘটিত না।

একথা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

কি জন্য লর্ড ওয়াভেল কলিকাতার ব্যাপারের অব্যবহিত পরে কলিকাতায় আসিয়া সকল পক্ষের লোকের সহিত আলোচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া তাহা পালন করেন নাই, তাহা কে বলিবে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়—তিনি যদি

(১) সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কর্তব্য পালন না করায় গভর্নরকে তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে নির্দেশ দিতেন এবং

(২) কলিকাতায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় অক্ষমতার জন্য সচিব সঙ্ঘকে পদচ্যুত করিবার জন্য গভর্নরকে আদেশ করিতেন;

তবে নোয়াখালির ব্যাপার ঘটিত না এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় বিহারে হাঙ্গামা হইতে পারিত না। সে কর্তব্য কেবল বড়লাটই করিতে পারিতেন। কারণ, বর্তমানে ভারত শাসন আইনের বিধানে বদ্ধ শাসন পরিষদ (অর্থাৎ সপরিষদ বড়লাট) প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনশীল প্রদেশের সরকারের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না—কেবল বড়লাটই পারেন। তিনি যে তাহা করেন নাই, তাহার ইঙ্গিতও আমরা কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উক্তিতে পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন—বাঙলার ব্যাপারে কেহই অবিচলিত থাকিতে পারেন না—শাসন পরিষদের সদস্যগণ সে নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না; কিন্তু তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। অর্থাৎ লর্ড ওয়াভেল তাঁহাদিগের পরামর্শে চালিত হয়েন নাই।

সেই জন্যই আমরা মনে করি, বাঙলার মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের কার্যে যে গভর্নর বা গভর্নর-জেনারেল কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই—তাহা ব্রিটিশের অবলম্বিত নীতির জন্য। সে যাহাই হউক—যখন বাঙলায় যাহা ঘটিবে, তাহার প্রভাব হইতে অন্যান্য প্রদেশের অব্যাহতি লাভ ঘটিতে পারে না, তখন অন্যান্য প্রদেশের—বিশেষ সমগ্র দেশের জাতীয় দলের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের পক্ষে—মুসলিম লীগের সচিব সঙ্ঘের অধীন বাঙলার অবস্থা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

বাঙলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ে সংখ্যাভেদ অধিক নহে—এমন কি হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকারও লাভ করেন না। তথাপি বর্তমান শাসনপদ্ধতিতে রাজশক্তি মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘের হস্তগত হওয়ায় রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও শিল্প সম্পর্কিত ব্যাপারে সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

সেই অবস্থার জন্যই আজ বাঙলায় হিন্দুদিগের মধ্যে বাঙলাকে পশ্চিম ও পূর্ব দুই ভাগে বিভক্ত করার প্রশ্ন আলোচিত হইতেছে—পশ্চিম বঙ্গ এখনও হিন্দুপ্রধান আর পূর্ববঙ্গ মুসলমানপ্রধান।

এই বিভাগ ব্যাপার লইয়া মতভেদ বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সেইজন্যই কোন কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে।

নকল হইতে সাবধান

পাকা চুল কাঁচা হয়

(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)

কলপে সারে না। আমাদের নির্দোষ কেশরঞ্জন সুগন্ধি আয়ুর্বেদীয় তৈলে চুল চিরতরে স্বভাবিক কাল হইবে, আর পাকিবেই না। এই তৈল মাথা ও চক্ষুরও খুব উপকারী, বিশ্বাস না হইলে, মূল্য ফেরতের গ্যারাণ্টি লউন। মূল্য ২৸০, অল্প পাকায়, ৩৸০ তাহার বেশী পাকায় ও ৫৲ সব পাকায়।

HIND KALYAN AUSHADHALAYA
No. 19 P.O. Katri Sarai (Gaya)

শাইকো

খোস, একজিমা, হাজা, কাটা, ঘা, পোড়া ঘা নালীঘা, ফুস্কুড়ি চুলকানি, ও চুলকানিযুক্ত সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগে অব্যর্থ

এরিয়ান রিসার্চ ওয়ার্কস
পি১৩ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ (নর্থ)
কলিকাতা। ফোন-বি.বি. ২৬৩৬

যঃ পলায়তে

শ্রীসুমথ নাথ ঘোষ



অসময়ের ফুলকপি ও তার সঙ্গে একটা বড় ভেটকি-মাছ হাতে ঝুলিয়ে অনিল 'মেন-স্টেশনে' গিয়ে ঢুকলো। সে ডেলি-প্যাসেঞ্জার—বেলেঘাটা স্টেশন দিয়েই যাতায়াত করে। কিন্তু ইদানীং রাস্তা দিয়ে ঘুরে না গিয়ে এই পথ দিয়ে যায়। উদ্দেশ্য, পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত অঞ্চল থেকে যারা পালিয়ে এসে মালপত্রের মত ঠেসাঠেসি, পেশাপেশি ক'রে স্টেশনের দড়িঘেরা খোঁয়াড়ের মধ্যে পড়ে আছে, তাদের দেখা। উৎপীড়িত, হৃতসর্বস্ব, গৃহহারা এইসব নরনারীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তার লজ্জা করে না। সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে, সিগারেট টানতে টানতে যারা সেখানে ভীড় ক'রে তামাসা দেখে, তাদের পাশে গিয়ে অনিলও দাঁড়ায়। কেন তা সে-ই জানে!

একদিন অনিলকে দেখে একজন লোক ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বললে, এই যে অনিলবাবু! যাক্ বাঁচলাম।

অনিল সন্দিগ্ধ নেত্রে তার মুখের দিকে তাকাতেই লোকটি বললে, চিনতে পারছেন না, আমি সুশীল! তারপর মুহূর্তখানেক চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, আপনার বৌদিদির খুড়তুতো ভাই—সেই যে আমার বোনের বিয়ের সময় আমাদের দেশে গিয়েছিলেন আপনি, আপনার বৌদিদিকে নিয়ে! তারপর কত পাশাখেলা, কত মাছধরা—সব ভুলে যাচ্ছেন?.

ওঃ এইবার মনে পড়েছে। তারপর কেমন আছেন? কথাটা বলে ফেলেই আবার সামলে নিয়ে অনিল প্রশ্ন করলে, সব নিয়ে বুঝি চলে এলেন?

সুশীল গলাটা খাটো ক'রে বললে, চলে এলুম নারে ভাই—পালিয়ে এসেছি কোনরকমে প্রাণ নিয়ে। সে সব অনেক কাণ্ড—বলবোখন পরে—আগে চলুন আপনাদের বাসায় গিয়ে উঠি! ভাল-ই হলো ভগবান আপনাকে মিলিয়ে দিলেন। বলতে বলতে উৎসাহভরে সুশীল বলে উঠলো, দেখুন না ভোর থেকে এখানে পড়ে আছি। আত্মীয়স্বজন কারুর বাসায় উঠবো মনে করে সকাল থেকে ঘুরছি, কিন্তু যার বাসায় যাই দেখি ইতিমধ্যে লোকজনে ভরে গেছে।...... যাক ভালই হ'লো, আপনার দেখা পেলুম। কৃষ্ণা অনেকবার আপনাদের বাসায় আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ ক'রছিল, কিন্তু সময় আর হয়ে ওঠেনি। কৃষ্ণা, মানে আপনার বৌদিদি, ভাল আছে ত? তার ছেলেমেয়েদের সব কুশল ?

অনিল কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে শুধু মাথা নেড়ে জানালে, সব একরকম ভাল।

সুশীল এইবারে বললে, আপনাদের বাসাটা যে বালীগঞ্জে তা জানি, তবে ঠিকানাটা গেছি ভুলে—তাই যেতে পারিনি। তা না হ'লে সকালেই চলে যেতুম।

অনিল একটু ইতস্তত করে বললে, সে ত খুব সৌভাগ্যের কথা। তবে কি জানেন, বাড়িতে দুটো 'টাইফয়েড কেস', তা না হ'লে আমি কি আপনাকে ছাড়তুম, এতক্ষণ জোর করে ধরে নিয়ে যেতুম।

সুশীলের সমস্ত উৎসাহ যেন নিমেষে নিভে গেল। তবু বার দুই ঢোক গিলে সে বললে, না, না, তা হয় না; সত্যিই ত 'টাইফয়েড রোগ' কি সোজা ব্যাপার? তার ওপর একটা নয়, দু দুটো। এতগুলো ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে আমার সেখানে গিয়ে ভীড় বাড়ানো কখনো উচিত নয়। এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ সুশীল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর

আবার উদ্বেগপূর্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কার অসুখ ভাই? কেমন আছে?

অনিল এইবারে একটু মুশকিলে পড়লো। তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই যে সে এইরূপ মিথ্যার অবতারণা করেছিল তা সুশীল বুঝতে পারেনি। পাড়াগাঁয়ের সরলপ্রকৃতির মানুষ সে, চিরদিন আত্মীয়স্বজন ও পাঁচটা বাইরের লোক নিয়ে থাকা অভ্যাস, কাজেই মানুষের এই চরম-বিপদের সময় যে কোন আপনার লোক তার সঙ্গে এইভাবে প্রতারণা করতে পারে তা ছিল তার কল্পনার বাইরে। তাই তার কণ্ঠে সত্যকারের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেতে অনিল যেন কেমন 'নার্ভাস' হয়ে পড়লো এবং বার দুই ঢোক গিলে চট করে বলে ফেলে, আমার এক ভাগনের আর এক ভাইপোর!

সুশীল এইবার তাদের জন্যে আরো একটু সহানুভূতি প্রকাশ করে বললে, তাহলে ওরা ভাল হলে একদিন গিয়ে দেখাশুনা করে আসবো, কৃষ্ণাকে বলবেন!...হাঁ আপনাদের বাসার ঠিকানাটা কি বলুন ত ভাই, আমি ভুলে গেছি।

একটা ভুল ঠিকানা বলে দিয়ে অনিল তৎক্ষণাৎ সরে পড়লো সেখান থেকে।

সুশীল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে আশ্রয় পাবার ভরসায় সে ছুটে এসেছে কলকাতায়। তার চখমেলানো বাড়ি, দীঘি, বাগান-বাগিচা আজ কোথায় পড়ে রইল! সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অত্যাচারে সব ফেলে রেখে শুধু প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে এসেছে! গুণ্ডারা তাদের গ্রামের দিকে আসছে এই খবর পেয়েই সুশীল স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের হাত ধরে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিল। পাশের গ্রামে যখন নরহত্যা, গৃহদাহ, ধর্মান্তরিতকরণ, স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার প্রভৃতি চলেছে তখন স্ত্রীর গায়ের সমস্ত গহনা মাঝিকে ঘুষ দিয়ে তবে সুশীল রেল স্টেশনে এসে পৌঁচেছে। কোন রকমে একবার কলকাতার মাটিতে পা দিতে পারলে যেন বাঁচে! আপনার-লোকের পরিচিত লোকের সেখানে অভাব নেই। কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয় মিলবেই!

এমনি একটা প্রত্যয় ও বিশ্বাস বরাবরই ছিল সুশীলের মনে। তাই সর্বশেষ আশা—অনিলের কাছ থেকে এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হতে সে বড়ই দমে গেল। তবু মনের সে দুর্বলতা জয় করে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সেই বিভীষিকাময় নারকীয় পরিবেষ্টনীর মধ্যে থেকে সে ত চলে আসতে পেরেছে, এই স্বজাতি, স্বধর্মী, সুসভ্য ও সুশিক্ষিত সমাজের মাঝখানে! এই তার পক্ষে ঢের আশাতীত, কল্পনাতীত।

তখন সুশীল স্থির করলে একটা হোটেল কিংবা মেসে গিয়ে উঠবে। কিন্তু বিপদ হলো যেখানে যায় কোনো সিট্ নেই! অনেক কাকুতিমিনতি করেও বিশেষ ফল হলো না। সবশেষে যে দেশ থেকে সে আসছে তার নাম উল্লেখ করে তাদের মনে করুণা উদ্রেক করবার চেষ্টা করলে কিন্তু তাতেও কোন সুবিধা হলো না। বরং বিপরীত ফল ফললো। যেই দেশের নাম শোনা অমনি তাকে ঘিরে ধরে সবাই নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে। কেউ বললে, আচ্ছা মশায় খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে সব কি সত্যি? কেউ বা বড় বড় চোখ বার করে জিজ্ঞেস করলে, কি করে চলে এলেন মশায় তাদের মধ্যে থেকে একটু বলুন না? আপনাদের কি একেবারে চারিদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেছিল? সংক্ষেপে দু'একটা কথার উত্তর দিয়ে সুশীল বিরক্ত হয়ে চলে আসে। যেন সবাই মজা পেয়েছে।

মুটেরা মাথায় মোট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তিনটি ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর হাত ধরে সুশীল আবার অনন্ত আশ্রয়ের খোঁজে চলে যায়।

কিন্তু সে কি ওই এক ব্যাপার! লোকের কৌতূহলের শেষ নেই! তারা যে আশ্রয়হীন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তিনদিন তিন রাত্তির পেটে ভাত নেই, চোখে ঘুম নেই—সেদিকে কেউ খেয়াল করে না। ভল্লুকনাচ বা কোন তামাসা দেখবার জন্যে যেমন ভিড় লেগে যায় তেমনি তাদের দেখবার জন্যে বারান্দায়, দরজায়, ওপরে নীচে যেন লোক ধরে না।

শহরের লোকেরা যে এত অসভ্য তা সুশীল কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। সে ভাবত কোন রকমে একবার এখানে আসতে পারলে হয়! খবরের কাগজে কত সহানুভূতির বাণী, কত সাহায্য-প্রতিষ্ঠানের আবেদন, কত মনীষীদের দরদ—দীর্ঘদিন ধরে পড়ে তার মনে এই রকম একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল। তাই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বার বার সুশীল কেবল এই কথা ভাবতে লাগল, তবে কার কাছে এলুম!

এমন সময় হঠাৎ একটি হোটেলওলা দয়া করে তাদের জায়গা দিতে রাজী হলো। সুশীল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু মুটেদের বিদায় করতে গিয়ে সুশীল পড়লো বিপদে। তারা তিনজন দুটাকার কম কিছুতেই নিতে রাজী হয় না! শেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে হোটেলের ম্যানেজারকে সুপারিশ ধরে পাঁচ টাকায় রফা হলো কিন্তু তাতেও তারা খুশি নয়। বিহারী কুলি, মোট বয়ে তারা টাকা রোজগার করতে এসেছে তারা শুনবে কেন?, তিনবার টাকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শেষে এক সময় আবার কুড়িয়ে নিয়ে গজ গজ করতে করতে চলে গেল। বললে, যো লোক্ জান্‌সে মারতা, যোলোক ছিনকে লেতা, 'ওহি আচ্ছা কম করতা!

ম্যানেজারবাবু তখন পান-খাওয়া কালো রঙের দুপাটি দাঁত বার করে বললেন, খুব সুবিধে পেয়ে গেছেন!

সুশীল সে কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে যায়। কুলিদের এই অত্যধিক চার্জ তার কাছে জুলুম বলে মনে হয়। শিয়ালদা স্টেশন থেকে মৃজাপুর স্ট্রীট-এর দূরত্বই বা কতটুকু, আর মালই বা কি এত। তার মনে হয় গায়ের জোরে পকেট থেকে ছিনিয়ে না নিয়ে এইভাবে লোককে ঠকাবার এও একটা ফন্দী।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর সুশীল শোবার আয়োজন করছে এমন সময় ম্যানেজারবাবু একটা সিগারেট টানতে টানতে দরজার কাছে এসে বললেন, শুয়ে পড়ছেন নাকি?

সুশীল হ্যাঁ কি না, কোন উত্তর দেবার আগেই তিনি একখণ্ড রঙীন কাগজ পকেট থেকে বার করে বললেন, আজকের বিলটা এনেছিলুম—আজকাল আমি নিয়ম করেছি 'ডেলি পেমেণ্ট'—তা না হলে পেরে উঠি না কিনা!

হাত বাড়িয়ে বিলটা নিয়েই সুশীলের মুখ শুকিয়ে গেল। এ যে একদিনে তিরিশ টাকা। তখন যোগটা ঠিক আছে কিনা তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল, ছোট ছেলেটার আধসের দুধের দাম ধরেছে বারো আনা, দুবেলা আট কাপ চা ও আটখানা টোস্টের জন্যে আড়াই টাকা। সুশীল আর দেখতে পারলে না। ম্যানেজারবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, এসব করেছেন কি, অনেক বেশী বেশী ধরেছেন যে। তারপর বিলটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, ঠিক করে কাল সকালে আনবেন, টাকা দিয়ে দেবো।

শেষ সিগারেটের টুকরেটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে ম্যানেজারবাবু বললেন, ওথেকে আর এক পয়সা কমাতে পারবো না, বিল যা করেছি তাই 'ফাইনাল' জানবেন!

সুশীলের মুখ দিয়ে খপ্ করে বেরিয়ে পড়লো, বলে কি, এ যে একেবারে ডাকাতি! একদিনে চারটে লোকের দুবেলা খাওয়া ও থাকার চার্জ তিরিশ টাকা?

আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, আপনার কাছে আমি একেবারে লাভ করিনি!

সুশীল বললে, লাভ না করেই তিরিশ টাকা। লাভ করলে তাহলে কত টাকা হতো!

ম্যানেজারবাবু মুখে একটু করুণ হাসি হেসে বললেন, আপনারা ভদ্রলোক বিপদে পড়ে দেশভুঁই ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেছেন, এখন ত আমাদের সাহায্য করা উচিত আপনাদের—তা না হলে আমি চল্লিশ টাকার কম কিছুতেই এ বিল করতুম না।

সুশীল বললে, কার কাছে কি করতেন

শুনতে চাই না, তবে আমার বিল থেকে আরো দশটা টাকা কমিয়ে দিতে হবে—আমার ক্ষমতা নেই এর চেয়ে বেশী দেবার।

ম্যানেজারবাবু এইবার একটু হেসে বললেন, ক্ষমতা নেই বলবেন না স্যার—কত



"আপনার কাছ থেকে একেবারে লাভ করিনি।"

কা ত গুণ্ডাদের দিয়ে এলেন অথচ সত্যি যা যারা বলে তাদের বলেন ক্ষমতা নেই!

সুশীলের চোখ দুটো নিমেষে হিংস্র হয়ে লো। সে বললে, গুণ্ডারা কেড়ে নিয়েছে ল বাকী যা আছে তা আপনাদের দিয়ে যেতে য়! বাঃ চমৎকার যুক্তি। এই না হলে ঙালী। এই বলে সুশীল তার মনে দেশপ্রীতি গাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলে কিন্তু ন ফল হলো না। বিলটা সম্পূর্ণই তাকে তে হলো। তবে তখনি সুশীল মনে মনে তিজ্ঞা করলে এখানে আর একদিনও থাকবে । কতক্ষণে ভোর হবে এই চিন্তায় সারারাত র চোখে ঘুম এলো না।

পরদিন ভোরে উঠেই সুশীল বেরুলে কটা ধর্মশালার সন্ধানে। কিন্তু যেখানে যায় নে জায়গা নেই! শেষে একটা ধর্মশালায় য়ে সুশীল চটে উঠলো। ঘর খালি রয়েছে থচ ভুঁড়িওলা হিন্দুস্থানী চৌকীদার বলে ই। সুশীল ভেতর থেকে দেখে এসে বললে, ই ত এতগুলো ঘর খালি পড়ে রয়েছে!

চৌকীদারটি তখন সুর করে তুলসীদাসী মায়ণ পড়ছিল। বিরক্তিকর দৃষ্টিতে তার খের দিকে তাকিয়ে বললে, উয়ো সব তো জর্ভ হ্যায়—বড়লোক আভি আ যায়গা!

একজন বাঙালীবাবু একঠোঙা খাবার তে করে ধর্মশালার মধ্যে ঢুকছিলেন। হঠাৎ শীলকে পাঁড়ের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, তারপর ইসারা করে তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, গোটাচারেক টাকা হাতে গুঁজে দিন না মশায়, ঘর এখুনি পেয়ে যাবেন। বুঝতে পারছেন না আসল ব্যাপারটা! 'আজকাল শুধু কথায় কি চিঁড়ে ভেজে' মশায়।

সুশীল বললে, কিন্তু এখানে ত বিনা পয়সায় পাঁচদিন থাকতে দেওয়া হয়, এই ত সামনেই পাথরে 'নিয়মাবলী' খোদাই করা রয়েছে!

আরে মশাই আজকাল কোন কাজটা ঠিক নিয়মমত হচ্ছে, বলুন ত? বলে গলাটা আর একটু খাটো করে বললেন, আমাকেও ঠিক ওই কথাই বলেছিল কিন্তু আমি হলুম মুর্শিদাবাদের লোক আমার সঙ্গে চালাকী করবে ও? যেই আড়ালে নিয়ে গিয়ে হাতে টাকা কটা গুঁজে দিয়েছি অমনি বাপের সুপুত্তুর হয়ে ঘরের চাবী খুলে দিলে! একেবারে তিন তলার 'রেস্ট রুম'! আজকাল কলকাতায় একটা হোটেলে থাকতে গেলে কত লাগে বলুন দেখি?

আর বলতে হলো না। হোটেলের অভিজ্ঞতায় তখনো তার মন তিক্ত হয়েছিল। কাজেই সুশীল সেই ভদ্রলোকের কথামতই কাজ করলে। বলা বাহুল্য ঘর পেতে আর তার একমুহূর্ত দেরী হলো না।

আগে ঘর ঠিক করে তখন সুশীল হোটেলে ফিরে গেল 'ফ্যামিলি' আনতে। ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায় না। তারপর হিন্দু রিক্সা এক একখানা দুটাকা ভাড়া চায়। সুশীল হিসেব করে দেখলে অন্তত চারখানা রিক্সা না হলে চলবে না। অথচ একখানা ট্যাক্সিতেই কুলিয়ে যাবে! কিন্তু ট্যাক্সি ডাকতে গিয়ে আবার মুস্কিলে পড়লো। যাকে ডাকে সেই বলে কত ভাড়া দেবে? সুশীল বললে, যা মিটারে উঠবে।

যেতে তারা রাজী হয় না। বলে, যা মিটারে উঠবে তার ওপরে আরো চারটাকা চাই!

একখানা, দুখানা করে প্রায় আটখানা ট্যাক্সি সুশীল দর করে ছেড়ে দিলে। সকলেরই মুখে ওই এক কথা। শিখ ট্যাক্সিওয়ালা, তাদের মনে হিন্দু, পূর্ববঙ্গের ওই বিশেষ স্থানের অধিবাসী বলেও সে কেন সহানুভূতি জাগাতে পারলে না। অগত্যা সুশীলকে ওই সর্তে রাজী হতে হলো।

ধর্মশালায় উঠে জিনিসপত্তর সব গোছ-গাছ করে রেখে সুশীল প্রথমেই লেগে রান্নার ব্যবস্থা করতে: কাল হোটেলে যা খেয়েছিল তা মনে করতে গেলে এখনো তার গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। আজ স্ত্রীর হাতের রান্না চারটি ঝোলভাত খেয়ে তবে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে। নিকটবর্তী ফুটপাতের ওপর থেকে কয়েকটা তরিতরকারী কেনবার পর সহসা সুশীলের মনে পড়ে গেল চালের কথা।' কলকাতায় যে খাদ্য রেশন, চাল ত এমনি পাওয়া যাবে না! কি হবে? ভাবতে ভাবতে ফটকের



"শুধু কথায় কি চিঁড়ে ভিজে মশায়?"

কাছে এসে পড়তেই সহসা পাঁড়েকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর ইসারায় কাছে ডেকে তাকে জিজ্ঞেস করলে চালের কি হবে কোথায় মিলবে।

পাঁড়ে দুহাতে খইনী টিপতে টিপতে উদাস কণ্ঠে বললে, সংসারমে এইস্যা কোউন্ চীজ হ্যায় যো কলকত্তা শহরমে নেহি মিলতি!

সুশীল যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেলে। ব্যাকুলকণ্ঠে বলে উঠলো, তাহলে মিলবে পাঁড়েজী? এইবার পাঁড়ে বাঁ হাতের নীচের ঠোঁটটা টেনে ধরে তাতে ডান হাতের দুই আঙুলে করে এক চিমটি খইনী ঠেসে দিতে দিতে বললে, মিলেগা। লেকিন্ দাম ত কুছ বেশী গিরেগা।

বেশী! বলেই সুশীল সহসা যেন থেমে গেল। তারপর মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে বললে, আচ্ছা সের আড়াই আজ এনে দাও—তারপর কাল রেশন-কার্ডের ব্যবস্থা করা যাবে।

পাঁড়ে তখন হিসেব করে বলল, তব আড়াই রূপেয়া দিজিয়ে! এক রূপেয়া সের হ্যায়।

সুশীল যেন শিউরে উঠলো। বললে, এক টাকা সের? অর্থাৎ চল্লিশ টাকা মণ! কিন্তু রেশনে যে ষোল টাকা চার আনা!

মুচকি হেসে পাঁড়ে উত্তর দিলে, তব রেশনসে লিজিয়ে?

পাঁড়ে রাগ করলে যে চাল আর কোথা থেকে সুশীল জোগাড় করতে পারবে না, তা সে জানতো। তাই সে কথার উত্তর না দিয়ে

শুধু নিঃশব্দে সুশীল তার হাতে আড়াইটে টাকা বার করে দিলে।

খেতে বসে সুশীলের চোখে জল এসে পড়লো। ভাতে এত কাঁকর যে কার সাধ্য মুখে তোলে। প্রতি গ্রাসে দু'টো তিনটে করে সাদা পাথরের কুচি! দাঁত ভেঙে যাবার উপক্রম! নেহাত খুব ক্ষিদে পেয়েছিল তাই গিলে গিলে কিছুটা খেয়ে সে উঠে পড়লো। ছেলেমেয়েগুলোর অবস্থা আরো খারাপ! আর সুশীলের স্ত্রীর কথা না বলাই ভালো! হাঁড়ির তলার ভাত—তার অধিকাংশই কাঁকর। ভদ্রমহিলার একেবারে খাওয়াই হলো না। নিজের জমিতে উৎপন্ন, চাষের সরু চাল খাওয়া অভ্যাস!

একটু পরে ছেলেমেয়েগুলো ক্ষিদে পেয়েছে বলে মায়ের কাছে বায়না ধরলে। ছেলেদের ত পাবেই। সুশীলের পেটেও যেন আগুন জ্বলছিল। বড় ছেলের হাতে সুশীল জামার পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে দিয়ে বললে, সেটা ভাঙিয়ে কিছু খাবার নিয়ে আনতে।

ছেলেটি চোখের নিমেষে এক ঠোঙা খাবার এনে হাজির করলে। যাবার সময় মায়ের কাছে সে জিগ্যেস করে গিয়েছিল কি কি আনতে হবে। কিন্তু নোটটার ভাঙানী হাতে দিতেই সুশীল একেবারে লাফিয়ে উঠলো। এ্যাঁ, মাত্র একটাকা চার আনা ফেরত। এতো খাবার তোকে কে আনতে বললে? সুশীল ধমক দিয়ে উঠলো।

ছেলেটি বললে, বেশী ত আনিনি। পাঁচটা রসগোল্লা, পাঁচটা সন্দেশ, আর দশখানা কচুরী!

সুশীল ক্রুদ্ধস্বরে বললে, এতেই তিন টাকা বারো আনা লেগে গেল?

ছেলেটি বললে, হ্যাঁ। এক একখানা কচুরীর দাম দু'আনা করে আর সন্দেশ ও রসগোল্লাগুলো চার আনা করে!

সুশীলকে তখনি পাতায় করে তার স্ত্রী খাবার দিয়ে গেল। খাবারের সাইজ দেখে সে রীতিমত বিস্মিত হলো। এতটুকু সাইজের এক একখানা খাবারের এত দাম! এ যে দিনে ডাকাতি। খাবারের দিকে তাকিয়ে খাবার বাসনা তার মন থেকে যেন দূর হয়ে গেল!

এরপর পয়সাগুলো বাক্সয় চাবী বন্ধ করে রেখে যেমন সে একটা কচুরীতে কামড় দিলে, অমনি একপ্রকার দুর্গন্ধময় তেলের সৌরভে তার গা বমি বমি করে উঠলো। থু থু করে তখনি মুখ থেকে সবটা ফেলে দিয়ে সুশীল মুখ ধুয়ে ফেললে এবং ছেলেদের নিষেধ করলে খেতে। কিন্তু তারা অনেক আগেই সব খেয়ে ফেলেছিল, কাজেই ফেলা হলো না। স্ত্রীর অনুরোধে মিষ্টিগুলো খেতে গিয়েও সুশীলের কেমন গন্ধ লাগল। কোনক্রমে জল খেয়ে সে গলাধঃকরণ করলে।

কিন্তু এর ফল অনেকদূর গড়ালো। রাত্রে সুশীলের স্ত্রী আর জলস্পর্শ করলে না, অম্বলে তার বুক জ্বলে যাচ্ছিল। এদিকে শেষ রাত্রির থেকে মেজ ছেলেটার এমন পেট ছেড়ে দিলে যে, সকাল হতেই সুশীল ছুটলো ডাক্তার ডাকতে।

ডাক্তার আট টাকা ভিজিট নিয়ে এমন ওষুধ লিখে দিয়ে গেল যা কোন দোকানেই পাওয়া যায় না। শেষে প্রায় কুড়িটা দোকান ঘুরে সুশীল দু'টাকার ওষুধটা দশ টাকা দিয়ে এক জায়গা থেকে সংগ্রহ করলে। ছেলেটা দু'দিন পরে বেশ সুস্থ হয়ে উঠলো।

তখন সুশীল ঘর ভাড়ার খোঁজে উঠে পড়ে লাগল। ইতিমধ্যেই সে কিছু কিছু চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোথাও ঘরের সন্ধান পায়নি। কলকাতার শহরে যেখানে যত ঘর আছে, সব লোকে ভর্তি। তার জন্যে আর যে একটা ঘরও কোথাও খালি নেই! এবার তাই সে পণ করে লাগল। ঘর চাই, যেমন করে হোক! অন্তত একখানা হলেও চলবে। কোন রকমে একটা মাথা গোঁজবার স্থান চাই। ধর্মশালায় পাঁচ দিনের বেশী থাকতে দেবে না। তাই সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—সে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত যেন চষে ফেলে দিতে লাগল। চারদিন অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান করবার পর সে খোঁজ পেলে বৌবাজার অঞ্চলে এক গলির মধ্যে দু'খানা ঘর আছে। এই বিরাট শহরের বুকে যে এরকম সরু ও অপরিচ্ছন্ন কোন গলি থাকতে পারে তা সুশীল আগে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। তবু তারি মধ্যে গিয়ে সে বাড়িওলার দোরের কড়া নাড়লে। বাড়িওলা বিরক্তিপূর্ণ মুখে বেরিয়ে এসে বললে, কি চাই? সুশীল বিনয় নম্রকণ্ঠে বললে, শুনলাম আপনার দু'খানা ঘর আছে ভাড়া দেবেন—তা যদি অনুগ্রহ করে ঘরটা একবার দেখান—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাড়িওলা বললে, ঘর দেখাবো পরে, আগে ভাড়া ঠিক করুন—সকাল থেকে ঘর দেখাতে দেখাতে হয়রাণ হয়ে গেলুম!

সুশীল জিজ্ঞেস করলে, ঘর কি ওপরে?

বাড়িওলা মুখটা আরো কঠিন করে বললে, না, নীচে, একতলার ঘর দু'খানা, আট ফুট সাড়ে ন'ফুট করে। রান্নাঘর নেই। রাঁধবার জায়গা ঘরের সামনে বারান্ডায়!

সুশীল বললে, ভাড়া কত?

বাড়িওলা মুখস্থ পড়ার মত এক নিঃশ্বাসে বলে গেল, ভাড়া ষাট টাকা, তবে ছ'মাসের ভাড়া আগে জমা রাখতে হবে, এছাড়া এক হাজার টাকা সেলামী।

ইতিপূর্বে সুশীল লোকের মুখে শুনেছিল যে আজকাল কলকাতায় ঘর ভাড়া ওই রকম সর্তে হচ্ছে কিন্তু নিজ কানে এই প্রথম শুনলো। শুনে কিছুক্ষণ পর্যন্ত তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মিনতি করে বাড়িওলাকে বললে, ঘর-বাড়ি সব ছেড়ে পালিয়ে এসেছি এখানে আপনাদের ভরসায়—আপনারা যদি আমাদের এই দুরবস্থার সুযোগ নেন তা হলে আমরা কোথায় যাবো? কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো?

বাড়িওলার মুখটা সংগে সংগে হিংস্র হয়ে উঠলো এবং কণ্ঠস্বরও গেল বদলে। তার দিকে একপা এগিয়ে এসে বললে, কোথায় যাবেন তো আমি কি জানি! ওর এক আধলা কম বললে আমি পারবো না। বলে সংগে সংগে বাড়ির মধ্যে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলে। হতভম্বের মত কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সুশীল গলি থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে ঠিকানাটা দেখে চললো টালায়। সেখানে একটা বাড়িভাড়া আছে, খবর পেয়েছে। সেখানে গিয়ে সুশীল আরো আশ্চর্য হলো। বাড়িওলা বললে, একতলার দু'খানা ঘরের জন্যে দু'হাজার টাকা সেলামী চাই, এছাড়া পঞ্চাশ টাকা করে ভাড়া এক বছরের জমা রাখতে হবে—আজকাল কোন ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই।

এ ঘর দু'খানা অপেক্ষাকৃত ভালো তাই সুশীল ভদ্রলোকের হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে বললে, দয়া করুন, আমি বড় দুরবস্থায় পড়ে আপনাদের কাছে এসেছি। শুধু দু'মাসের বাড়িভাড়া অগ্রিম নিয়ে আমায় থাকতে দিন, বিশ্বাস করুন, আমার এর বেশী আর দেবার ক্ষমতা নেই—আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনি যদি এটুকু অনুগ্রহ না করেন তাহলে আমায় ছেলেপিলের হাত ধরে ফুটপাতে আশ্রয় নিতে হবে। আপনার আরো অনেক ভাড়া বাড়ি আছে—এটুকু সাহায্যভিক্ষা আমায় দিতেই হবে। অনুনয়ে সুশীলের কণ্ঠস্বর যেন ভেঙে পড়লো।

ভদ্রলোক সুশীলের হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললেন, আমিও এখানে দানছত্র খুলে বসিনি, কাজেই আমায় ওকথা বলা বৃথা! তারপর কণ্ঠস্বর একটু মোলায়েম করে বললেন, আপনার অবস্থা বুঝেই আমি কম করে বলেছি, তা না হলে আজকের দিনে এই রকম আলোবাতাসওলা ঘর কেউ কখনো পঞ্চাশ টাকায় দেয়? আপনি ভদ্রলোক গুণ্ডাদের অত্যাচারে দেশঘাট সব ছেড়ে যে পালিয়ে এসেছেন তা আপনাকে দেখেই বুঝেছি। তা না হলে পঁয়ষট্টি টাকা বলতুম। তাছাড়া সেলামী আজকাল এর চেয়ে খারাপ বাড়িতে তিন হাজার চার হাজার টাকা পর্যন্ত লোক দিচ্ছে, দু'হাজার টাকা শুধু আপনার জন্যেই বলেছি!

সুশীল আবার তার হাতদুটো ধরে বললে, দাদা, দয়া হবে না! আপনাদের মত স্বজাতি, ও স্বদেশবাসীর ঘর থাকতেও আমি স্ত্রীপুত্র নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবো, তাতে কি আপনাদের মুখ উজ্জ্বল হবে? আজ দেশের এই চরম দুর্দিনে আপনার মত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে কি আমি এটুকু আশা করতে পারি না?

ভদ্রলোক এর উত্তরে কি বলবেন যেন বুঝতে পারছিলেন না। তাই মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে যেন ফেটে পড়লেন। বললেন, যান না ওসব বড় বড় বক্তৃতা দেশের যারা হোমরাচোমরা নেতা তাদের কাছে বলুনগে—আমি ছাপোষা লোক আমায় কেন শোনাতে এসেছেন? বলতে বলতে একটু থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করলেন, এই যে বোমা পড়ার সময় দেড় বছর বাড়ী খালি পড়েছিল, তখন কি কেউ দেখতে এসেছিলেন, আমার সংসার কিভাবে চলছে, কিভাবে টেক্সখাজনা দিচ্ছি। লম্বা লম্বা কথা সবাই বলতে পারে—যান যান দেশের লোককে আর চিনতে আমার বাকী নেই।

সুশীল বিনীত কণ্ঠে বললে, এই রকম সেলামী, অগ্রিম এক বছরের ভাড়া এত কখনো শুনিনি—এটাতে কি আমাদের দুরবস্থার সুযোগ নেওয়া হচ্ছে না?

সবাই নিচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না, তবে আমায় কেন বকাতে এসেছেন? যা বলেছি এর কম আমি পারবো না, আমায় অনুরোধ করবেন না। বলে ভদ্রলোক এক হাত তুলে নমস্কার করে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন।

ক্ষোভে দুঃখে সুশীলের যেন মরে যেতে ইচ্ছা করছিল। যাদের ভরসায় সে এখানে পালিয়ে এসেছে, তাদের ব্যবহার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তখন এক সঙ্গে সব তার মনে পড়তে লাগল। এরা কি মানুষ! রক্তশোষকে যেন ছেয়ে আছে সমস্ত শহরটা। সাধুতা নেই, দয়া নেই, ধর্ম নেই কারো প্রাণে! দেশের এই দুর্দিনেও দেশের লোক দেশের লোককে ঠকাতে ছাড়ে না। সুশীল আর চিন্তা করতে পারলে না। তার চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুন বেরুতে লাগল। সে তখন শেষ চেষ্টা করবার জন্যে দেশবরেণ্য এক নেতার শরণাপন্ন হলো। সোফা, কাউচ ও কার্পেট মোড়া ঘরে পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি তখন দুর্গতদের সাহায্য করবার জন্য খবরের কাগজে এক বাণী প্রেরণ করছিলেন।

সুশীল ঘণ্টাখানেক বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে দ্বারোয়ানের তোসামোদ করে শেষে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য লাভ করলো। নমস্কার করে পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের অবস্থার কথা সব জানিয়ে সে তাঁর কাছে একটু আশ্রয় ভিক্ষা করলে। একখানা অন্তত ঘর চাই তার। নতুন একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে তিনি বললেন, ঘর আমি কোথায় পাবো—আপনি চেষ্টা করে দেখুন।

সুশীল বললে, আমি চেষ্টা করে অনেক দেখেছি, পাইনি।

তিনি একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, তা আমি কি করবো?

সুশীল হাতজোড় করে বললে, আপনার বাড়ীতে অনেক ঘর পড়ে রয়েছে, তারি যে কোন একটাতে যদি থাকতে দেন।

লোকটির স্পর্ধা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন! বললেন, আমার বাড়ীতে জায়গা নেই—আমায় বিরক্ত করবেন না, কাজ করতে দিন এখন—আপনি তাহ'লে এখন আসুন?

সুশীল তখন তাঁর সেই প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকার দিকে চেয়ে বললে, আপনার এই দুমহল বাড়ীর ওপর নীচে সারি সারি ঘর সবই ত দেখছি খালি পড়ে রয়েছে—কোনটাতেই লোক নেই—অন্তত এর কোন একটার বারান্দার এক কোণেও যদি পড়ে থাকতে দেন—

দেখুন বিরক্ত করবেন না। বলে দিয়েছি, একবার যে হবে না। আমার ঘর নেই—যান—আমায় কাজ করতে দিন।

সুশীল একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর তাঁর এক একটা সুসজ্জিত ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দ্বারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, আচ্ছা ও ঘরটায় কে থাকে?

কি রকম ঐশ্বর্যবান মনিবের সে দারোয়ানী করে তাই দেখাবার সুযোগ পেয়ে দারোয়ানটা সগর্বে বলে যেতে লাগল, একটা ঘরে বাবুর মেয়ে নাচ শেখে, একটা ঘরে ছেলে পড়ে, একটা ঘরে মেয়ে পড়ে, একটা ঘরে অতিথি অভ্যাগতরা চা খায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও আরো বহু ঘর পড়ে থাকে খালি—শুধু শোভাবর্ধন করবার জন্যে।

সেদিন ধর্মশালায় ফিরে এসেই সুশীল তার জিনিসপত্র বাঁধতে লাগল।

তার স্ত্রী বললে, কোথায় বাড়ী পেলে গো—কত ভাড়া?

সুশীল বললে, দেশে ফিরে যাবো। বাড়ী পাইনি।

সে কি! বলে ভয়ার্তদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে সে চেয়ে রইল।

সুশীল গম্ভীরকণ্ঠে বললে, আমি কি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি!

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তার বুঝতে বাকী রইল না যে, সে যা বলছে তা সত্যি। তাই শঙ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কিন্তু সেখানেই যদি যাবে, তবে এতকষ্ট করে পালিয়ে এলে কেন এখানে?

স্বামীকে নিরুত্তর দেখে সে আবার বললে, তাছাড়া এখন সেখানে যাওয়া মানে—জাতধর্ম কি কিছু থাকবে?

যেন বারুদে অগ্নিসংযোগ হ'লো। সুশীল রাগে ফেটে পড়ে বললে, এতদিন জাতধর্ম রেখে দেখলুম—এইবার না রেখে দেখবো।

স্ত্রী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, তুমি কি পাগল হলে? সুশীল ধমক দিয়ে বলে উঠলো, আমি পাগল নই, সবচেয়ে সুস্থ!

শ্বাস অর্থাৎ হাঁপানি কাসির দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহৌষধ। ইহা দুই দিন মাত্র সেবন করিতে হয়। মৃতপ্রায় রোগীর ইহাই একমাত্র প্রাণদাতা। মূল্য ডাকব্যয়-সহ ২৸৹। কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী। পত্রাদির ঠিকানা—পুলশিটা, মেদিনীপুর। শাখা—৬নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এম্‌ব্রয়ডারী মেশিন

নূতন আবিষ্কৃত। কাপড়ের উপর সূতা দিয়া অতি সহজেই নানা প্রকার মনোরম ডিজাইনের ফুল ও দৃশ্যাদি তোলা যায়। মহিলা ও বালিকাদের খুব উপযোগী। চারটি সূচ সহ পূর্ণাঙ্গ মেশিন—মূল্য ৩৲, ডাক খরচা ॥৵৹। ডীন ব্রাদার্স; আলীগড়, নং ২২।



প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

তৃতীয় সংস্করণ বর্ধিত আকারে বাহির হইল।
বাঙ্গালী হিন্দুর এই চরম দুর্দিনে
প্রফুল্লকুমারের পথনির্দেশ
প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য।
মূল্য—৩৲
—প্রকাশক—
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।
—প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা।
ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

শিল্পী গোপাল ঘোষ



মরাই



ষোলই আগষ্ট

বাঙালী না খেয়ে যেমন কবিতা লিখতে পারে, সেইরকম না খেয়ে তারা ছবিও আঁকতে পারে। বাঙলাদেশের মত এত বেশীসংখ্যক সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পী আর কোন প্রদেশে আছে কিনা সন্দেহ। সাহিত্য ও চিত্র জাতির কৃষ্টির মাপকাঠি। কৃষ্টিসম্পন্ন জাতির সাহিত্য ও শিল্প তার চিন্তাধারা, তার সৃজনীশক্তি ও প্রতিভার বিকাশ নির্ণয় করে। বাঙলা দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবনের পরিবেশে অনেক সাহিত্যিক ও শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়, তাই ত বাঙালী জাত-শিল্পী। কিন্তু সাহিত্যিক ও শিল্পীর সংখ্যা বেশী হলেই যে সকলেই ভাল হবে, এমন কোন কথা নেই।

বাঙলা দেশের চিত্রশিল্পে কিছুদিন থেকে একটা বিপ্লব এসেছে, সত্য কথা বলতে গেলে কি, এই বিপ্লব প্রথম আনেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ছবি দেখলেই ইংরেজ মনীষীর সেই কথা স্বতঃই উদিত হয়ঃ I can not draw a cow, but I can draw the soul of a cow. রবীন্দ্রনাথ-বিপ্লব সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। তাই ত বাঙলায় আজ একদল নতুন



অলেন শয়ন বিলম্বা

শিল্পী জেগে উঠেছে, তাঁরা পুরাতন পথকে আর আঁকড়ে থাকতে চান না, তাঁরা হলেন শিল্পীদের মধ্যে বিপ্লবী। তাঁরা চান নতুন পথের সন্ধান দিতে।

এই রকম একজন শিল্পী হলেন শ্রীযুত গোপাল ঘোষ। একদা অবনীন্দ্রনাথ ও দেবীপ্রসাদের নিকট শিল্প শিক্ষা করলেও তিনি তাঁদের অনুকরণ করেন নি; তিনি নিজের স্বতন্ত্র পথ বেছে নিয়েছেন। তিনি জীবনকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেন, ছবিও আঁকেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তাঁর ছবির বিশেষত্ব হল এই যে, মাত্র কয়েকটি বলিষ্ঠ অথচ সাবলীল রেখায় তিনি ছবিতে নিহিত ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেন। 'ইম্প্রেসনালিজম্', 'কিউবিজম্', 'সিওরিয়ালিজম্' ইত্যাদি যে সমস্ত নতুন অথবা পুরাতন কথা চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে আজকাল শোনা যায়, সে সমস্ত মাপকাঠির বিচারে আমরা গোপাল ঘোষের ছবিকে বিচার করব না, কেবলমাত্র ছবি বলেই যদি তার ছবি দেখা হয় ও তার সমালোচনা করি, তাহলে অনুভব করতে হবে যে, তাঁর ছবিগুলি সজীব অথচ কমনীয়। তাই ত তাঁর ছবিগুলি ছবি বলেই মনে হয়। ছবি দেখে যদি মনের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি আপনা-আপনি সাড়া না দেয়, তবে সে ছবির যে সংজ্ঞাই দেওয়া হোক না কেন, তা ছবি নয়—অন্য কিছু।

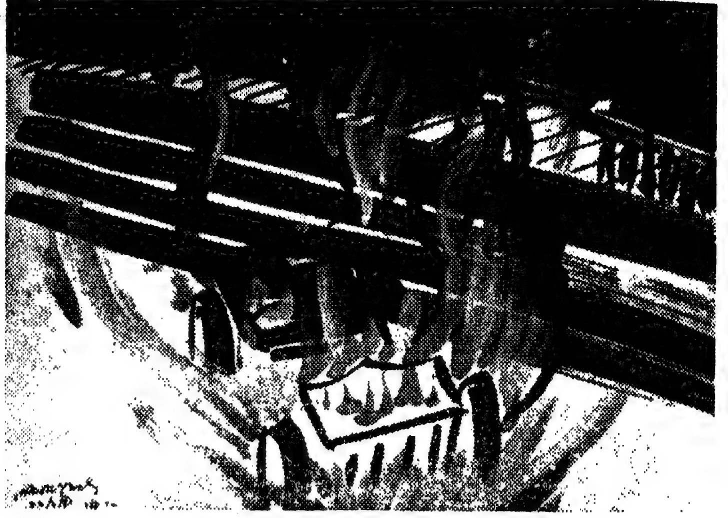
গোপাল ঘোষের আর একটি কৃতিত্ব হল যে, তাঁর অঙ্কিত বাঙালী জীবনের ছবিগুলি যেন প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত, আর



আসন্ন বর্ষণ



প্রাঙ্গণে



প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দৃশ্য

সেগুলি যে 'মনে-প্রাণে বাঙালী' শিল্পীরই আঁকা, এটুকু সন্দেহ করবার অবকাশ থাকে না।

গত জানুয়ারী মাসে অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফ্টস সোসাইটির উদ্যোগে দিল্লীতে তাঁর চিত্রগুলির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবার সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নবীন শিল্পীকে অভিনন্দন করে তাঁর নির্ভীক প্রাণবন্ত ছবিগুলির প্রশংসা করেন।

এই নতুন ভঙ্গীতে ও এত স্বল্পরেখায় আঁকা ছবি আর কোন চিত্রশিল্পীর দেখেছি বলে মনে হয় না; কিন্তু যাঁর দেখেছি বলে মনে হয় তিনি শিল্পী নন; তিনি একজন লেখক ও শিল্প-সমালোচক, হেণ্ডরিক উইলেম ভ্যান লুন।



পণ্ডিত নেহরুর সহিত শিল্পী গোপাল ঘোষ



সাহিত্য প্রসঙ্গ

সাহিত্য, সমাজ, সভ্যতা ও শিক্ষক

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর ইতিহাসে আজও ভারতবর্ষের নিজস্ব এক স্থান রহিয়াছে। কৃষ্টি ও সমাজ-জীবনে ঐশ্বর্যময় তাহার সভ্যতার ইতিহাস, বহু প্রাচীন জাতির নিকটও গৌরবময় ছিল। শিক্ষায় ও আনন্দে, ত্যাগে ও ক্ষমায় এ দেশের অপরূপ এক বিকাশ ঘটিয়াছিল। বহু রাষ্ট্রবিপ্লব এদেশে ঘটে, বিভিন্ন জাতি উপজাতির আক্রমণও এ দেশের উপর কম হয় নাই, কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও আদর্শভ্রষ্ট হয় নাই; ভারতবর্ষ বাঁচিয়াছিল।

তারপর অকস্মাৎ একদিন দেখা গেল য়ুরোপীয় সভ্যতা দুরন্ত বেগে ডানা মেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহারই মধ্যে সংগোপনে নিজেদের আসন বিছাইতে গিয়া যেখানে আসিয়া আমরা দাঁড়াইয়াছি, তাহাই আজিকার রূপ। য়ুরোপীয় সভ্যতাকেও সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারি নাই, অন্যদিকে ভারতীয় জীবনের আদর্শকেও আমরা অনেকখানি দূরে সরাইয়া দিয়াছি। দুইয়ের সমন্বয় করিতে পারিলে হয়ত ভালই হইত অথবা পুরাপুরি যদি য়ুরোপীয় ভাবধারাকে গ্রহণ করিতে পারিতাম তাহাতেও বোধ হয় দুঃখের মাত্রা আজিকার মত এত প্রচণ্ড হইয়া উঠিত না। এক আদর্শের বদলে অন্য এক আদর্শকে গ্রহণ করার মধ্যে কিছু যুক্তি থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু কোন আদর্শকেই জীবনে আমরা পূর্ণভাবে মানিয়া না লওয়ায় সব দিক হইতেই পিছনে পড়িয়া গিয়াছি। ফলে এক বিসদৃশ অদ্ভুত এবং পঙ্কিল সমাজ-জীবনের মধ্যে আমরা আসিয়া আজ উপস্থিত হইয়াছি। যেন কোন আদর্শই আমাদের সম্মুখে নাই।

(২)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সমাজ জীবন নানাদিক হইতে সংকীর্ণতার যে অবেষ্টনীতে আটকা পড়িয়াছিল আমাদের দেশের বর্তমান সমাজ-সভ্যতার দিকে তাকাইলে তাহার কিছুটা মিল দেখা যায় মেকী ও অন্ধ অনুকরণস্পৃহা আমাদের জীবনকে নানাভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে ফলে আমাদের আধুনিক সমাজ-জীবনে সভ্যতা বলিতে আমরা যাহা শিখিয়াছি তাহা নানা কারণে দাস-মনোবৃত্তির রূপান্তর মাত্র। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মার খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছি—নারীর উপর অত্যাচারও "এটিকেটে"র নাম দিয়া হজম করিয়া যাই, বড়জোর কাগজে প্রতিবাদ করি, কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করার কোন উপায়ই আমরা দৈনন্দিন সমাজ-জীবনের ছোটখাট অত্যাচারের বিরুদ্ধেও করিতে ভয় পাই। তাই এই আমদানী করা সভ্যতা আমাদের প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, জাতি হিসাবে আমাদের একেবারে উৎসন্নের পথেও টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

জাতির দেহে নাকি সভ্যতার হাওয়া লাগিয়াছে! হয়তো লাগিয়াছে। কিন্তু বিদেশী শিক্ষার মারফৎ পাওয়া বিশেষভাবে এদেশের জন্য তৈরী সভ্যতা ও শিক্ষা না আসিলেই যেন ভাল ছিল। আমরা হয়তো বাঁচিতাম। আজিকার সমাজ-জীবনে হয়তো খানিকটা শান্তি থাকিত, সাহিত্যও হয়তো জীবন যুদ্ধে বিজয়ীর বেশে আমাদের দেখিতে চাহিত। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় আমরা বোধহয় এতটা অক্ষম হইতাম না। আমরা শিক্ষিত হই নাই—হইয়াছি কেরানী। সভ্যতার বদলে আমরা আদেশ-বাহী ক্রীতদাসের দলে নাম লেখাইয়া বসিয়া আছি। দীর্ঘ আড়াই শত বৎসরের য়ুরোপীয় চিন্তাধারা ও তাহাদের দেওয়া শিক্ষায় ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড বাঁকা হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা যুগে যুগে দেশের ইতিহাস গড়িয়া তোলে, যাঁহাদের মধ্যে দেখা দেয় উন্নত চরিত্র, সবল স্বাস্থ্য—সেই সাহিত্যিক সম্প্রদায় ও শিক্ষককুল বর্তমান ভারতের সমাজ-দেহের বহির্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমরা তাহাদের প্রত্যাখ্যান করিয়া ভাবিতেছি আমরাই জয়লাভ করিলাম। সেই প্রত্যাখ্যানের সুরঙ্গ পথে রাশি রাশি আবর্জনা জমিয়া সভ্যতা ও সমাজ-জীবনকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের এতো দুঃখ, এতো অপমান, এতো লজ্জা তাহার কারণ সাহিত্যিক ও শিক্ষককে তাহার আদর্শ-পালন করিতে দিতে আমরা সচেষ্ট হই নাই বলিয়াই। কোন কালে কোন দেশের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস বলিতে গেলে ইঁহাদের বাদ দিয়া চলে না। ইঁহারাই জাতির প্রাণ। ইঁহাদের মধ্য দিয়াই জাতির দেহে কল্পনা গড়িয়া উঠে—তাহাই একদা ফলে ফুলে ছাইয়া যায়। যে দেশে যখনই আমরা ইহার বিপরীত ব্যবহার লক্ষ্য করি সেখানকার ইতিহাসই পরাধীনতার ইতিহাস।

(৩)

নিজস্ব মতবাদ সম্পন্ন একখানি পত্রিকার একখানি পুরাতন সংখ্যায় "সংবাদ সাহিত্য" পাঠ করিতে করিতে তাহাই ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম যে আমরা যে সভ্য হইয়াছি তাহা কবে? তাহার কি প্রমাণ দিতেছি আমরা? আর এ সভ্যতা আমাদের সমাজকেই বা কি উপহার দিল!

প্রসঙ্গত পত্রিকাটি রাশিয়ার সমাজ-সাহিত্য বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। লেখক দেখাইয়াছেন যে একটা দুর্বল ও অসহায় জাতিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইলে সে দেশের সাহিত্যিক ও শিক্ষকের কতখানি কষ্ট-সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া সম্ভব। অল্প কিছুকাল পূর্বেও রাশিয়া আমাদেরই মত দুর্বল অসহায় ছিল। আজ তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে অন্যতম। কথায় বার্তায় বর্তমানে আমাদের অনেকেই রাশিয়ার তথাকথার এক একজন এক্সপার্ট। ইহাদের ইতিহাস জানি বলিয়া গর্বও আমাদের কম নয়—কিন্তু ইহাদের সত্যিকারের ইতিহাস কয়জন জানে? কয়জন জানি যে "বহু বৎসর ধরিয়া মাসের পর মাস নিদারুণ শীত ও অভাব অনটনের মধ্যে এই সকল দরিদ্র লেখক নিজের বুকের রক্তে জাতির আদর্শ রচনা করিয়াছেন এবং এই সকল অনশনক্লিষ্ট শিক্ষক সেই আদর্শ সমগ্র জাতির কাছে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়াছেন তবেই আজ রাশিয়ার বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। লেখক এবং শিক্ষক উভয় সম্প্রদায়ের অপরিসীম কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগ স্বীকার—রাশিয়ার এই অভাবনীয় পরিবর্তনের মূলে।"

এই যে উন্নতি রাশিয়ায় এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হইয়াছে তাহার মধ্যে স্বদেশীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে সম্ভব হইত না। অন্যদিকে সমাজে, সাহিত্যিক ও শিক্ষকের স্থান সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠে নাই। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে তাহার অভাবটাই সকলের চেয়ে বেশী। জাতি হিসাবে আমরা এতই নীচে নামিয়া গিয়াছি যে, যাহাদের চেষ্টায় একটা দেশের উন্নতি ঘটিতে পারে সে শিক্ষকদের আমরা শ্রদ্ধা করি না, কৃপার চোখে দেখি। বারো বৎসর শিক্ষকতা করিলে তাহাকে নিকৃষ্টতম জন্তুর সহিত উপমা দিয়া দাঁত

---

* শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৫০, ২৯৪—৩০৭ পৃষ্ঠা।

বাহির করিয়া হাসি। অন্যদিকে সাহিত্যিকদের অবস্থাও একই রূপ।

প্রসঙ্গত আর একটা দেশের কথা ধরা যাক। জাপান যে এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল তাহার মূলেও রহিয়াছে সে দেশের শিক্ষক ও সাহিত্যিক। সর্বভাবে তাহারা ইঁহাদের সম্মানের চোখে দেখে।

আমাদের এসব বালাই নাই। ঘৃণিত কার্যের দ্বারা অর্থসঞ্চয়ীকে আমরা সম্মান দেই, কিন্তু দেশের ইতিহাস যাহারা গড়িয়া তুলিবে—জাতির কণ্ঠে যাঁহারা নূতন সুর দিবে তাঁহাদের অবজ্ঞা করি। নিকৃষ্ট বেতন, নিকৃষ্ট খাদ্য, নিকৃষ্ট পরিধেয় ও পঙ্কিল গৃহে আমরা তাহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। রাষ্ট্র তাকায় নাই তাহার জন্য দুঃখ নাই। দুঃখ হয় দেশবাসীর সমানভূতির অভাব দেখিয়া। তথাপি যে ইহারা বাঁচিয়া আছে তাহার কারণ তাহাদের আদর্শ। তাহারা জানে তাহারাই দেশের ইতিহাস। এই ইতিহাসকে রক্ষা করিতে হইবে—এই প্রেরণা আছে বলিয়াই আজো আমাদের এদেশে সাহিত্যিক ও শিক্ষক বাঁচিয়া আছে। সম্মুখে নবজাত শিশুর মৃত্যুও যে দেশে "শিক্ষিত সমাজের" জীবনযাত্রায় বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে না সেখানে ইহারা বাঁচিয়া আছে কি করিয়া?

(৪)

'শিক্ষিত সমাজ'। নিটোল ও ভরাট দুটি শব্দ। এই যে শিক্ষিত সমাজ এদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে দুর্ভাগ্যবশত বহুলাংশে ইঁহারা দেশের বহু দুঃখ দুর্দশার কারণ। শাসক শ্রেণী তাহাদের শাসনের উদ্দেশ্য একদল লোককে তৈয়ারী করে। উদ্দেশ্য তাহাদের সহায়ে দেশ শাসন। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া একদা আমরা বাঁকাভঙ্গিতে সিগারেট খাইতে শিখি, প্যান্ট ধরি। ভাবিলাম কি হইয়াছি। নামকে পর্যন্ত পাল্টাইয়া ভোস বোস হইলাম। শাসনযন্ত্রের এক কোণে সিভিলিয়ানের মূর্তিতেও কেহ কেহ বিরাজ করিতে লাগিল। আমরা ধন্য হইলাম। মনে মনে নিজেদেরই শাসকশ্রেণী ভাবিতে লাগিলাম। তারপর না হইলাম কি? এফ্ আর. এস পর্যন্ত হইলাম।

ভাবিলাম সভ্যতার শেষ ধাপে আসিয়া আমরা পৌঁছিয়াছি এবং অন্যান্য সভ্যজাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের দেশ আমাদেরই লোক আই সি-এস হইল, আই-পি এস হইল, সিভিল সার্জন হইয়া শোভা পাইতে লাগিল এদিক ওদিক। ভারতবাসীর মধ্য হইতেই গভর্ণর পর্যন্ত হইয়া গেল। গ্রাজুয়েট ও জল ভাত।

এলোমেলো ছড়ানভাবে নয়, রূপকথার কাহিনীও নয়, বাঙলাদেশের কোন একটি জিলার একটি মহকুমাতেই এইরূপ "তৈরী শাসকশ্রেণী"তে সেখানকার সব জায়গা ভরিয়া গেল। সে দেশের লোক যাহারা তাহাদের কি গর্ব। সে জেলার সদরে একটা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং উল্লিখিত মহকুমায় প্রায় পঞ্চাশটা হাই স্কুল, একটা এ গ্রেড কলেজ।

এই আজব মহকুমায় আমি কয়েকবার গিয়াছি। সৌভাগ্যই বলিব। ছোট্ট মহকুমা। নদী মাতৃক বংগভূমির অপরূপ দৃশ্য এখানকার প্রাত্যাহিক জীবনের প্রকৃতি।

সেবার সাথী ছিলেন এক বন্ধু। বিদেশী ডিগ্রীওয়ালা প্রকাণ্ড এক অধ্যাপক। তাহারই সহিত বেড়াইতে বাহির হইলাম।

গ্রামগুলির চেহারা হতচ্ছাড়া। বর্ষা চলিয়া গিয়াছে কিন্তু মাঝে মাঝে এখনও জল জমিয়া আছে। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ। মান্দার ও বহুবিধ আগাছায় দিনের বেলায়ও সূর্য বড় দেখা যায় না—তাহারই মধ্য দিয়া পথ। পচা দুর্গন্ধের শেষ নাই।

আগাইয়া চলিলাম।

বন্ধু দেখাইতে লাগিলেন : ঐযে বাড়িটা, ওটা জজের বাড়ি। ডিস্ট্রিক্ট জজ। তিন পুরুষ জজ ওরা। তারপর আই-সি-এসের বাড়ি দেখিলাম, আই-পি-এসের বাড়ি দেখিলাম ময় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের দেশও এখানে। ডেপুটি অধ্যাপক ইত্যাদি ত সর্বত্রই ছড়ান।

বন্ধু সগর্বে কত কি বলিয়া চলিলেন। কতক কানে গেল, কতক গেল না। বর্ষার শেষেও কচুরী পানা সর্বত্র বিজয়ীর বেশে আসন বিছাইয়া আছে। সাঁত সেঁতে, অন্ধকার, দুর্গন্ধময় রাস্তায় চলিতে চলিতে কি যেন মনে হইতে লাগিল।

গৃহে ফিরিলাম। বন্ধু বলিলেন: All educated here. মেয়েদের ভিতরেও শিক্ষিতের অভাব নাই।

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এই যে এতো এতো শাসক সম্প্রদায়ের বাসভূমি এই মহকুমা, এই যে এতো এতো বৈজ্ঞানিক জন্ম নিয়াছেন এখানে—কি লাভ হইল এদেশের।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন লাগিল?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া তাকাইয়া বলিলাম : ভাল লাগল না। এতো শিক্ষিতের বাস এই দেশে—তারা পারলেন না এদেশের চেহারা পালটাতে! এইত ছোট্ট একটুখানি জায়গা! অন্তত একটা গ্রামকও তারা গড়ে তুলতে পারলেন না হলাণ্ডের মত সুন্দর করে। এমন বিশাল জলাকীর্ণ নদীকে দিয়ে কাজে লাগান গেল না বৈদ্যুতিক প্রবাহের? কি হল তবে তোমাদের এ শিক্ষায়?

কথাটা বলিয়াছিলাম অনেক দিন আগে। কিন্তু এই আমদানী করা শিক্ষা ও তৈরী শিক্ষিত সমাজ আলোচ্য দেশের কোন কাজেই তো লাগিল না। প্রায় প্রতি বছরই ত এ জেলায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দাংগা বাধিয়া আছে—কি করিল বিশ্ববিদ্যালয়? অভিশাপের মত চোর ডাকাতের উৎপাত এখানেই যেন সব চেয়ে বেশী!

এ পর্যন্তও সহ্য করা চলে, যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায় তাহাদের ইহাতে কিছু করার নাই।

কিন্তু তারপর যখন দেখি এই আজব মহকুমা—এতো এতো ধনী, এতো এতো শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক, সিভিলিয়ান পরিপূর্ণ এই ছোট্ট অল্প কয়েক লক্ষ অধিবাসীর বাসস্থান এই আজব মহকুমা বর্তমান কালের বিচারে দাড়াইতে পারিল না, কি বলিব তখন? আমি বিগত দুর্ভিক্ষের কথা বলিতেছি। এই মহকুমায়ই মৃত্যুসংখ্যা সব চেয়ে বেশি হইল কেন? রাজধানীতে যাহারা প্রাসাদ তুলিয়া গর্বে ফাটিয়া পড়িতেছে, দল গড়িয়া নিজেরাই নিজেদের বংশ পরিচয় ছাপাইয়া বাহির করিতেছে, তাহাদের কয়জন আগাইয়া গেল? যদি নাই গেল তবে শিক্ষিত সমাজ গড়িয়া দেশের লাভ হইল কি? বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তার যদি তাহারই দেশের লোকেরে বাঁচাইতে না পারিল তবে বিশ্বসভায় বক্তৃতা করিয়া কি লাভ আমাদের।

ইহারই নাম কি সভ্যতা?

ইহারই নাম কি শিক্ষা?

(৫)

যাহা বলিতেছিলাম। ভারতের নিজস্ব যে সমাজ ও সভ্যতা তাহার ভিৎ ভাঙিয়া গিয়াছে। নব শিক্ষার যে Reaction আসিয়াছে তাহা জাতির পক্ষে পরম অকল্যাণের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

যাহাদের দ্বারা এই অবনতি হইতে দেশকে রক্ষা করা যায়, সেই শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক প্রভৃতি মাঙ্গলিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমরা নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিয়াছি। তাহারা অপমানিত হইয়া অভিমানে দূরে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু জাতিকে ভোলে নাই। তাই বিদেশী শিক্ষায় ভূষিত হইয়াও বঙ্কিম আসে। আসে গুরুদাস; ভূদেব, নবীনচন্দ্রকেও আমরা পাই। পাই বিবেকানন্দ-কেশবচন্দ্রকে। চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষের আবির্ভাব ঘটে। এত ব্যথা বেদনার মধ্য দিয়াও বিপুল বিস্ময় লইয়া আসে রবীন্দ্র প্রতিভা। শরৎচন্দ্র থাকিয়া থাকিয়া মনকে সাড়া দিতে চায়। ইঁহারা সকলেই সমাজ-সাহিত্যিক ও সমাজ-শিক্ষক। ইঁহারাই ত দেশের ইতিহাস। না হইলে কবে কোন এক বাঙ্গালীর ছেলে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছে বা জাঁদরেল রাজকর্মচারী হইয়া স্যার উপাধিতে ভূষিত হইয়াছে অথবা

কোনো এক মহারত্ন ছেলে অপরের পাঠ মুখস্থ করিয়া প্রকাণ্ড ডক্টরেট। তাহারা কি দেশের ইতিহাস? নিশ্চয়ই না। পরাধীন জাতির জীবনে ইহারা দুঃস্বপ্নের মত। না হইলে আমরা হই নাই কি? আকাঙ্ক্ষিত কোন পদবী পাই নাই আমরা? কিন্তু ইহাদের কয়জন দেশকে সুন্দর করিতে আগাইয়া আসিল।

আগেই বলিয়াছি যে জাতির কণ্ঠে নূতন সুর সংযোজনার কাজ যাহাদের তাহারাই আজ সকলের চেয়ে বেশী দুর্গতি ভোগ করিতেছে। সাহিত্যিক ও শিক্ষকের দুর্দশার শেষ নাই। প্রাচীনকালে জীবন ছিল সহজ ও সরল। কিন্তু আজিকার জীবনে বাঁচিয়া থাকিতে হইলেও জটিল সমস্যাকে বাদ দিবার উপায় নাই। ফলে সাহিত্যিক কতকাংশে হয় নিজেরাই প্রকাশক অথবা প্রকাশকের হাতের মুঠোয়। শিক্ষকগণ দুবেলা খাইতে পায় না। ফলে সামান্য লাভের লোভে লেখক—সাহিত্যিকেরা প্রতিপত্তিশালী ধনীর অথবা রাজশক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া মিথ্যাচার আশ্রয় করিতেছেন। শিক্ষকেরা নোট মেকাররূপে রাতারাতি বড়লোক হইবার ফিকিরে আছেন।

প্রশ্ন উঠিবে কেন এমন হইল? প্রশ্ন উঠিবে এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায় ইহাদের এজন্য দোষ নাই। ইহারা আজো আদর্শচ্যুত সম্পূর্ণভাবে হয় নাই। কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে এ "দোহন প্রবৃত্তি" কি করিয়া আসিল। পূর্বেই বলিয়াছি প্রত্যাখ্যান ও অবমাননাই ইহার প্রধানতম কারণ। কোনদিক হইতেই ইহাদের আমরা আমল দিতে রাজি নই। বিশ্ববিদ্যালয়ও সাহিত্যিকদের যথোপযুক্ত সম্মান দেয় নাই, অথচ লেখকের রচনাকে জগৎ সভায় পরিচিত করাইয়া দিবার দায়িত্ব তাহাদের কম নয়।

সাহিত্যিক এবং শিক্ষকের ভাগ্যকে লইয়া যতক্ষণ পরিহাস চলিবে, ততক্ষণ জাতির মঙ্গল নাই। বক্তৃতায় আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে ইহাদের প্রয়োজন ও দান স্বীকার করি; কিন্তু তথাপি ইহাদের উপর অত্যাচার অবিচারের শেষ নাই। দিনের পর দিন এই নিরহঙ্কার কর্মীর দল তাহাদের কর্তব্য-কর্ম করিয়া যাইতেছে, কিন্তু কি পাইল তাহারা—"He is starved crushed, terrorised by the fear of daily bread." অপরাধ আমাদের তাহারা তৈরী করিয়াছে এবং আমাদের বংশধরদের তৈরী করার দায়িত্ব লইয়াছে। অপরাধ তাহারা ফাটকা বাজারে ফাটকা খেলে না।

না। ফাটকা খেলিবার জন্য তাহারা নয়। তাহাদের কাজই তাহারা করিবে, কিন্তু আধুনিককালের জীবনযাত্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানী ব্যক্তির যে যে সুখ-সুবিধা আবশ্যক, তাহার সম্পূর্ণ সুখ-সুবিধা ইহাদেরও দিতে হইবে।

রাশিয়ার কথা আবার বলিতে হইল। সমাজে ইহাদের স্থান কি হওয়া অবশ্যক, তাহার নির্দেশ পাই ম্যাক্সিম গর্কীর নিকট অ্যাণ্টন চেখভের লেখা পত্রেঃ

...The teacher ought to be the first man ... (The people) ought to recognise him as a power worthy of attention and respect. No one should dare to shout at him or humilate him ..."

রাশিয়া বুঝিয়াছিল যে, যাহাদের হাতে আগামীকালের রাশিয়া গঠনের ভার, ভবিষ্যৎ সন্তানেরা যাহাদের কাছে মানুষ হইবে, তাহাদের সম্মান হইবে শ্রেষ্ঠ। কারোই নিম্নে নয়। বুঝিয়াছিল যে......

..."It is ridiculous to pay in farthings the man who should educate the people. It is intolerable that he should walk in rags, shiver with cold in damp ... catch cold and about the age of thirty get laryngitis rheumatism or tuberculosis, we ought to be ashamed of it..."

শিক্ষক বলিতে আমি সাহিত্যিক ও সাংবাদিককেও ধরিয়াছি। উপরের চিত্র ইহাদেরই চিত্র।

সাদা মেঘে ঢাকা হিমালয়, নীলাম্বু মহাসমুদ্র......এর শস্য-শ্যামল কুঞ্জ উপবনের মাঝে ভারতবর্ষের যে আত্মা দুঃখে ও পাপে ধ্যানগম্ভীর পিঙ্গল হইয়া আছে; যাহার সমাজ ও সভ্যতা মৃত্যুর দুয়ারে আসিয়া ভিক্ষুকের মত অপরের দয়াপ্রার্থী, তাহার অবসানের দিন আগাইয়া আসিবে, নিজেদের ভুল সংশোধন দ্বারাই।

ফাগুন

আশরাফ সিদ্দিকী

এই এনেছিঃ মউ-মহুয়ার নেশা!
এই এসেছিঃ দখিন হাওয়ার গানে!
এই যে এসোঃ ফুলশর অক্লেশা!
রাই কোথা সে? বলবে কানে কানে?

এখন ব্রজে শক-শকুনের মেলা,
কমলবনে মত্ত হাতীর খেলা!
শ্রীরাধিকা লজ্জা ঢাকেন চীরে!
হায় রে! কলস ভরান আঁখি নীরে!

অপ্সরীদের নূপুর গেছে থেমে
ফুল-ফাগুনে ধূ ধূ ধূ কারবালা
বিশ্বামিত্র আর মেনকার প্রেমেঃ
মোদের মেয়ে নয় সে শকুন্তলা!

তবু আসে, ফাগুন তবুও আসে।
বাঙলাদেশে শ্যামল বন ঘাসে॥

একটি সনেট

রওশন ইজদানী

ঘনশ্যাম তৃণ ঘেরা এক ময়দানে
দলে দলে ছাগ আর ভেড়া চরে খায়;
চতুর রাখাল সবে দড়ি ধরে টানে,
দূরে শুয়ে ছায়াতলে আরামে ঘুমায়...

একদিন তোলে শির ভেড়া আর ছাগ,
বলে সবে—"আমাদের দেহ স্বাধিকার;
আমরা একই সবে থাক যত ভাগ;
গলায় দড়ির ফাঁস পরিব না আর।"

চতুর রাখাল তবে সাধে কৌশল,
দলপতি প্রত্যেকে কথা দিলো কানে;
ভাগাভাগি হয়ে তারা গড়ে নিলো দল,
একে অন্য অপরের কথা নাহি মানে।

আত্মকলহে শেষে একে অন্যে দলে
মুক্তির নামে আরো ফাঁসি বষে গলে।

বৈদেশিকী

বৈদেশিক ভারত : আসফ আলী ও বেভিন

অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক আমেরিকার জন্য নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ আসফ আলি তাঁর কাজে যোগ দেবার জন্য আমেরিকায় চলে গিয়েছেন। পথে তিনি লণ্ডনে থেমেছিলেন ও সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। সেই সম্বর্ধনা প্রসঙ্গে বৃটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ বেভিন যা বলেছিলেন সে কথা উল্লেখযোগ্য।

তিনি মিঃ আসফ আলিকে শুনিয়ে "রুশীয় সাম্রাজ্যবাদের এবং মার্কিনী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিপদ" থেকে সাবধান থাকবার উপদেশ দেন। কথাটা খানিকটা ধান ভানতে শিবের গীতের মত হয়েছে, তা ছাড়া হয়েছে অত্যন্ত রূঢ় এবং অশোভন।

জাতীয় ভারত অন্তর্বর্তী সরকারে ঢুকবার পর থেকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বৈদেশিক সম্বন্ধ স্থাপন করবার চেষ্টা করে' আসছে। তার প্রধান উদ্দেশ্য আজ সকলের সঙ্গেই মৈত্রী স্থাপনা—কোনো জাতি বা দেশের সঙ্গে ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব বা শত্রুতা দিয়ে ভারতবর্ষের নিজের বন্ধুত্ব বা শত্রুতা নির্ণীত হবে না। সুতরাং বেভিন সাহেবের জবাবে মিঃ আসফ আলি ঠিকই বলেছেন যে, ভারতবর্ষ সকল জাতির সঙ্গেই মৈত্রী স্থাপন করতে চায়। যাই হোক, আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার, বেভিন সাহেব হঠাৎ গায়ে পড়ে' এরূপ 'সদুপদেশ' দিলেন কেন। রুশাতঙ্ক বেভিন সাহেবের বরাবরই আছে; সুতরাং "রুশীয় সাম্রাজ্যবাদ" সম্বন্ধে তাঁর সাবধান বাণীর অর্থ বোঝা যায়, যদিও বর্তমান ক্ষেত্রে সেটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক. কারণ রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের কোনও আন্তর্জাতিক কূটনীতিক সম্বন্ধ এখনও স্থাপিত হয় নি। কিন্তু আমেরিকার জন্য নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কাছে আমেরিকার বিরুদ্ধে এই সাবধান বাণী উচ্চারণ কেন?

তার মোটামুটি কারণ আমাদের পাঠকরা অবশ্যই আন্দাজ করতে পারেন। যুদ্ধের পর থেকে আমেরিকার অর্থনৈতিক শক্তির কাছে ইংলণ্ডকে মাথা নামিয়ে চলতে হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই, শিল্পে ও বাণিজ্যে বৃটেনকে হটিয়ে আমেরিকা বসবার চেষ্টা করছে। অনেক জায়গায় সফল হয়েছে। ভারতবর্ষে 'ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স' প্রভৃতির জন্য বাধা পাচ্ছে।

কিছুকাল আগে আমেরিকা ভারতের সঙ্গে সরাসরি একটা বাণিজ্য-চুক্তি বা কমার্শিয়াল ট্রীটি করবার চেষ্টা করেছিল. কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত আইনে বৃটিশ বাণিজ্যের কতকগুলি রক্ষা কবচ থাকার জন্য সুবিধা হয় নি। তখন অন্তবর্তী সরকার হয়নি। এবারে যদি সেই আইনকে পাশ কাটিয়ে কংগ্রেসী সরকার আমেরিকার সঙ্গে সরাসরি (bilateral) কোনও বাণিজ্য-চুক্তি করে বসে বৃটিশ স্বার্থকে উপেক্ষা করে, তবে ভারতে বড় রকমের ঘা পড়বে। ইংলণ্ড চায় আমেরিকা, ইংলণ্ড, ভারত সকলের স্বার্থ জড়িয়ে (অর্থাৎ প্রধানত প্রথম দুইটি স্বার্থ বজায় রেখে) একটি 'মাল্টিল্যাটারাল' চুক্তি, এবং সেই চুক্তি বন্দোবস্ত করার মালিক হবে ইংরেজ, কংগ্রেসী সরকার নয়। বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় ইংলণ্ডের বিশেষ অসুবিধা এবং সম্ভবত কিছু ভয়ও হয়েছে। এবং এই ভয়ের একটি বাস্তব পটভূমিও আছে। সকল রকম রক্ষাকবচ সত্ত্বেও মার্কিনী বাণিজ্য বৃটিশ বাণিজ্যকে হটিয়ে, নানা কারণে এবং নানাভাবে ভারতবর্ষে এরই মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করতে আরম্ভ করেছে এবং দেশীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে ইংলণ্ডের মাথা ডিঙিয়ে স্বাধীন সম্বন্ধ স্থাপন করতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং অন্তর্বর্তী সরকারের লোক মিঃ আসফ আলির নিয়োগে বেভিন সাহেবের ভয় পাবারই কথা, সেই জন্যই এই সাবধান বাণী।

ইংলণ্ডে কয়লা সমস্যা

যুদ্ধে জিতেও প্রায় না জেতার উদাহরণ যদি কারো থাকে তবে সে ইংলণ্ডের। যুদ্ধের আগে ইংলণ্ড প্রবল প্রতাপশালী প্রথম শ্রেণীর শক্তি ছিল। যুদ্ধের পরে একদিকে রাশিয়া অন্যদিকে আমেরিকা এই দুই প্রবল শক্তির চাপে পড়ে ইংলণ্ড তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সকলের চেয়ে তার মুস্কিল হয়েছে নিজের ঘর সামলানো।

বন্দরে, কয়লার খনিতে, নানা কারখানায় ধর্মঘট এবং তার সঙ্গে বস্ত্রাভাব ও গৃহাভাব ইংলণ্ডে লেগেই ছিল। নিজের দেশের কয়লা প্রভৃতির উৎপাদনে যত ব্যাঘাত হচ্ছিল ততই তাকে অন্তত সাময়িকভাবে নির্ভর করতে হচ্ছিল বিদেশের আমদানীর উপর। ঠিক এই সময়ে দেখা দিল আধুনিক ইতিহাসের বৃহত্তম ও দীর্ঘতম তুষার-ঝড়। ইংলণ্ডের পূর্বে নর্থ সী (উত্তর সাগর) ও আরও পূর্বের বরফাবৃত সাগর-অঞ্চল থেকে অতি শীতল ও তীব্র ঝড়ে বড় বড় বরফের চাঁই ভেসে এসে ইংলণ্ডের পাশের সমুদ্র অঞ্চল ও বন্দরগুলি প্রায় ভরে দিয়েছে. জাহাজ চলাচল প্রায় অসম্ভব করেছে, আমদানীর আশা কম।

সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের আবহাওয়া অসম্ভব রকম ঠাণ্ডা হয়েছে. কয়লা প্রায় নেই. বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ, শীতে সমস্ত দেশ জমে যাবার মত হয়েছে। এই অসাধারণ ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও শীত আজ প্রায় এক মাসের উপর হল চলেছে। ইংলণ্ডের গত একশ' বছরের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা ঘটে নি। তার উপর মুস্কিল হল জন্য বিশেষ নির্ভর করবার উপায় নেই, সেখানকার দীর্ঘকালব্যাপী কয়লা শ্রমিকদের বিগত ধর্মঘটের জন্য। পূর্বদিকে পোল্যাণ্ডের কয়লাই প্রায় একমাত্র ভরসা।

তার সঙ্গে সোনায় সোহাগা হয়েছে ইংলণ্ডের সরকারী নির্বুদ্ধিতা। ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনেকদিন থেকেই এই ধরণের বিপদের সম্ভাবনা থাকাতেও গবর্ণমেন্ট দেশবাসীকে ভুল আশ্বাস দিয়ে আসছিল। কয়লা বিদ্যুৎ প্রভৃতি fuel-এর মন্ত্রী মিঃ শিনওয়েল গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেন, "বিদ্যুৎ কণ্ট্রোল করার (হিসাব করে খরচ করার) কথা যে আজকাল শোনা যাচ্ছে সেটা একেবারে আহাম্মকের কথা। আমি হলাম মন্ত্রী সুতরাং বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আসল অবস্থা আমার জানবার কথা।" অথচ, আজ ইংলণ্ডের আপিসে আপিসে মোমবাতি জ্বালাতে হচ্ছে, বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুতের 'রেশন'। ২৪শে অক্টোবর মিঃ শিনওয়েল ঘোষণা করেন: "কয়লা সম্বন্ধে কোনও crisis বা সংকট হবে না, অর্থাৎ শিল্প বিষয়ে কোনও বিশেষ অব্যবস্থা হবে না বা কারখানা বন্ধ হবে না।" অথচ আজ কয়লা ও বিদ্যুতের স্বল্পতার জন্য বহু কারখানা বন্ধ, সমগ্র ইংলণ্ডের শিল্পীয় ব্যবস্থা প্রায় ভাঙবার জোগাড় হয়েছে।

সুতরাং আজ কয়লার সঙ্গে ইংলণ্ডের পলিটিক্স জড়িয়ে পড়েছে। শিনওয়েলের বিরুদ্ধে জনমত ক্রমে বাড়ছে এবং তার জন্য ক্যাবিনেট বদলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে অথচ প্রধান মন্ত্রী এটলী সাহেব জিদ ধরেছেন কোনও বদল করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই কিছুকাল আগেই কয়লার খনিগুলির 'জাতীয়করণ' বা ন্যাশন্যালিজেশন সম্পূর্ণ হয়েছে। ইংলণ্ডের কয়লার পিছনে অনেক পলিটিক্স আছে।

ফ্রাঙ্কো ও আয়ারলণ্ড

সম্প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশ, ফ্রাঙ্কো নাকি আয়ারলণ্ডে একটি প্রাসাদ কিনেছেন। এই নিয়ে নানান দেশের সংবাদপত্রে কিছু লেখালেখিও হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গত সপ্তাহে কিলালোর বিশপ ডাঃ মাইকেল ফগার্টি ধর্ম সম্বন্ধীয় একটি পত্রে প্রকাশ করেছেন যে, ফ্রাঙ্কো যদি স্পেন পরিত্যাগ করেন, তবে স্পেনে গৃহযুদ্ধ সুরু হয়ে যাবে। কমিউনিস্টরা নাকি দুনিয়ার মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি ভয় করে ফ্রাঙ্কোকে। যাই হোক, ফ্রাঙ্কো যদি স্পেন ছেড়ে আয়র্লণ্ড গিয়ে বাস করেন, তবে আমাদের মনে হয়, কমিউনিস্টদের এবং গৃহযুদ্ধের হাত থেকে স্পেনকে বাঁচাবার জন্য অবিলম্বে ইংলণ্ডকে স্পেনে গিয়ে বসা উচিত। গ্রীসে ঐ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বৃটিশ সৈন্য বসে রয়েছে. স্পেন কি বাদ পড়বে? দুনিয়াকে বাঁচানোই তো ইংলণ্ডের "মিশন" বা উনিশে শতাব্দীর ভাষায় 'হোয়াইট ম্যানস্ বার্ডন'!

—যো—



যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একটি দিক

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী এম-এ

যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা হইতে যুদ্ধোত্তর অবস্থায় পরিবর্তন প্রত্যেক দেশেই অল্প-বিস্তর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, কিন্তু স্বাধীন দেশের সরকার এই বিপর্যয়কে যথাসম্ভব লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অনুসরণ করেন, ফলে বহু সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব হয়, কিন্তু পরাধীন দেশে কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত হইলেও তাহার লক্ষ্য থাকে শাসককুলের স্বার্থরক্ষা, অতএব দেশের পক্ষে যথার্থ মঙ্গলকর কোন পরিকল্পনা রচিত হইলেও তাহা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে না।

যুদ্ধকালে প্রত্যেক দেশেই মুদ্রাস্ফীতি ও চাহিদার অনুপাতে ব্যবহার্য দ্রব্যের (consumer goods) স্বল্পতা হেতু দ্রব্য-মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিগত যুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলিকে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডকে সমরোপকরণ ও কাঁচা মাল সরবরাহ এবং শ্রম (Service) বিনিয়োগের দরুণ ভারতবর্ষের নিকট ঋণী হইতে হয়। এই ঋণই বর্তমানে 'স্টার্লিং ব্যালান্স' বলিয়া পরিচিত। এই 'স্টার্লিং ব্যালন্সের' (যাহা সম্পূর্ণ আদায় হইবে কিনা এখনও স্থির হয় নাই) উপর নির্ভর করিয়া এদেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিপুল পরিমাণে নোট ইস্যু করিয়াছেন, ফলে এদেশে মুদ্রাধিক্য ঘটিয়াছে। যদি কোন দেশে কোন বিশেষ সময়ে সরকার ও ঋণদাতৃ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত মুদ্রা সংখ্যা শিল্প-বাণিজ্যের চাহিদার অনুপাতে অধিক হয়, তবে মূল্যমান (price-level) উন্নীত হয় অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় আবার মুদ্রাসংখ্যা শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া আরো অনেক পরোক্ষ কারণের ঘাতপ্রতিঘাতও দ্রব্যমূল্যকে নিয়ন্ত্রিত করে।

যতদিন যুদ্ধ চলিতেছিল, ততদিন সমরোপকরণ উৎপাদন ও যুদ্ধ পরিচালনার কার্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল এবং মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও শ্রমজীবীরা উপার্জনে নিযুক্ত থাকায় এবং তাহাদের আয় বৃদ্ধি হওয়ায় বর্ধিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য অবশ্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমরোপকরণ উৎপাদন ও যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যও শেষ হইয়াছে। ফলে ব্যাপকভাবে শ্রমজীবীদের কর্মচ্যুতি ঘটিতেছে, অথচ আশু মুদ্রা সংকোচন (contraction) কিম্বা সাধারণের ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইহার ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হইতেছে, ইহাই আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয়।

যুদ্ধ শেষ হইলে সমরোপকরণ উৎপাদনের প্রয়োজন থাকে না, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য লোক নিয়োগেরও প্রশ্ন উঠে না। আবার বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত আয়ত্তে না থাকায় মুদ্রা সংকোচনের ব্যাপারে সাধারণের পক্ষে শুধুমাত্র সমালোচনা ও জনমত গঠন ভিন্ন বিশেষ কিছু করিবার নাই। কিন্তু এইজন্য এমন কথা বলা চলে না যে, এই বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর কিছুই করিবার নাই।

যুদ্ধকালে বে-সামরিক শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব হয় না। সমর শিল্পের প্রতিই তখন বিশেষ লক্ষ্য থাকে। বেসামরিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্যন্ত সমরোপকরণ উৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত করিতে হয়। অতএব যুদ্ধ শেষ হইলে পর শিল্পের জন্য অর্থের চাহিদা হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ সাধারণের ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের স্বল্পতা, উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ, যানবাহনের অভাব ইত্যাদি কারণে বাণিজ্যের অবস্থাও যুদ্ধকালে অত্যন্ত মন্দ থাকে, যুদ্ধ শেষ হইলে পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে সময়ের প্রয়োজন। তদুপরি শিল্প বা বহির্বাণিজ্য প্রসার লাভ না করা পর্যন্ত ব্যবহার্য দ্রব্যের স্বল্পতা হেতু বাণিজ্যের প্রয়োজনেও অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে না। এই কারণে যুদ্ধ শেষ হইলেও দ্রব্য মূল্য হ্রাস পাওয়া সময়সাপেক্ষ। কিন্তু যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত শিল্পের প্রসার করিয়া শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি ক্ষমতা দেশবাসীর অবশ্যই থাকে, যদিও পরাধীন দেশ এবং স্বাধীন দেশের মধ্যে এক্ষেত্রেও প্রভূত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে এ সম্বন্ধে কর্তব্যের ভার সরকারের উপরই পড়িত. কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষকেই অগ্রণী হইতে হইবে। কিন্তু শুধু শিল্প প্রসারের দ্বারাই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। দেশের উন্নয়ন ও সংগঠনমূলক কার্য আরম্ভ করিবার পক্ষে ইহাই প্রকৃষ্ট সময়, কিন্তু উন্নয়ন ও সংগঠনমূলক কার্যের দায়িত্ব সরকারের। একদিকে দেশের অর্থপ্রাচুর্য ও অপরদিকে কর্মচ্যুত শ্রমিককুল আজ বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। শিল্প প্রসার এবং দেশোন্নয়ন ও সংগঠনমূলক কার্য ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইলে দেশের উদ্বৃত্ত অর্থ ও বেকার সমস্যারই যে শুধু সমাধান হইবে, তাহা নহে, দ্রব্যমূল্যও অনুপাতে হ্রাস পাইবে। উন্নয়নমূলক কার্যে সরকার সাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে এবং মুদ্রা-সংকোচনের (contraction) অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করিলে মুদ্রাস্ফীতির কুফল দেশবাসীকে অধিক দিন ভোগ করিতে হইবে না।

ইদানীং দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বহু সসীম দায়িত্বযুক্ত (limited liability) যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে. কিন্তু যন্ত্রপাতির অভাবে কার্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইতেছে এবং হইবে। এ সময় যুদ্ধ দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে সত্বর বে-সামরিক দ্রব্য উৎপাদন আরম্ভ করা উচিত। বিশেষত যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যুদ্ধ-সংক্রান্ত ঠিকা কাজে (contract) প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, তাহাদের দায়িত্ব অত্যধিক। ঠিকাদারদের অনেকেই বহু শ্রমিক ও শিক্ষিত কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তাহারা কারবার গুটাইয়া ফেলিতেছেন। ইহাতে প্রথমত তাহাদের নিজেদের ভবিষ্যত আয়ের কোন নিশ্চয়তা থাকিতেছে না। দ্বিতীয়ত উপার্জিত অর্থের বিনিয়োগে (investment) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। তৃতীয়ত তাঁহারা যে সকল শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন কারবার গুটাইবার ফলে ইহারা বেকার হইয়া পড়িতেছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ঠিকাদারদের পক্ষে এখন সু-পরিকল্পিত কর্মপন্থা অনুসরণের অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ঠিকাদারদের কার্যকলাপ হইতে ভবিষ্যত দৃষ্টি, উদ্যম ও ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ইহারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিলেও স্বাভাবিক সময়ে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ ধারণা বা অভিজ্ঞতা নাই. এমনকি ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেও কেহ কেহ ভীত কিম্বা কুণ্ঠিত। কিন্তু ইহার ফলে শুধু যে বেকার সমস্যার প্রসারই বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নহে, তাঁহাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও রুদ্ধ হইতেছে।

ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতা অনেককে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে, তাহাতে ক্ষতিই হইবে সমধিক যাহাতে প্রতিযোগিতা প্রবল আকার ধারণ করিবার পূর্বেই ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য এখনই তৎপর হইতে হইবে এবং উৎপাদন, বণ্টন ও পরিচালনা আধুনিকতম পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। গভর্নমেণ্ট এবং দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই এ বিষয় অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে যতই বিলম্ব হইবে, বিপর্যয় ততই সুদূরপ্রসারী হইবে।

জাতীয় গ্রন্থাগার

আদিত্য ওহদেদার

জাতির সংস্কৃতির একটা বিশেষ পরিচয় জড়িয়ে থাকে তার প্রকাশিত গ্রন্থে। আবার সেই সকল গ্রন্থের সংগ্রহ ও সংরক্ষণও জাতির সংস্কৃতির আর এক পরিচয়। দেশ-বিদেশের সংস্কৃতির খবর যাঁরা রাখেন, তাঁদের কাছে জাতীয় গ্রন্থাগারের কথাটা নতুন নয়।

এই জাতীয় গ্রন্থাগার কি? যে গ্রন্থাগারের ওপর সমগ্র জাতির দাবী ও অধিকার স্বীকৃত, সেই গ্রন্থাগারই জাতীয় গ্রন্থাগার। স্থানে স্থানে গঠিত পাবলিক লাইব্রেরী বা সাধারণ গ্রন্থাগার জাতীয় গ্রন্থাগার নয়—তাতে জনসাধারণের অধিকার থাকলেও জাতির দাবী মেটাবার সাধ্য তার নেই।

গ্রন্থাগারের পক্ষে জাতির দাবী মেটান সম্ভব হয় কখন? সেটা তখুনি ঘটে, যখন গ্রন্থাগারে সমগ্র জাতির মাথার কাজ স্থান পায়। অর্থাৎ যখন দেশের সমস্ত প্রকাশিত গ্রন্থই গ্রন্থাগারে প্রবেশ লাভ করে। কোন নির্বাচন নেই, বাদ-বিচারের বালাই নেই, ছোট-বড়র ভেদ নেই: সকল তারতম্যনির্বিশেষে সন্তুষ্টচিত্তে সকল গ্রন্থকে জায়গা দিতে হবে। দেশের যে কোন স্থানে যে কোন বই প্রকাশিত হোক না কেন, তার স্থান অমনি জাতীয় গ্রন্থাগারে অবধারিত। প্রকাশককে সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থের অন্তত একটি কপি জাতীয় গ্রন্থাগারে পাঠাতে হবেই, জাতীয় গ্রন্থাগারকে তাই Copyright Library-ও বলা হয়। অর্থাৎ কিনা জাতীয় গভর্নমেণ্টের আইন অনুসারে জাতীয় গ্রন্থাগারের এই অধিকার থাকে যে, প্রত্যেক প্রকাশিত পুস্তকের কপি তাকে পাঠানো হবে। দেশের সব গ্রন্থই পাওয়া যাবে, এমন গ্রন্থাগার যে স্বপ্নরাজ্যের নয়, তা জাতীয় গ্রন্থাগারই প্রমাণিত করে। উন্মুক্ত এর দরজা। বাহু মেলে প্রসন্ন বদনে সদাই সকলকে আহ্বান জানিয়ে থাকে। দেশে প্রকাশিত যে কোন বই চাওয়া যাক, তখুনি সে বই উপস্থিত করা হবে। 'নেই' এমন বিরক্তিকর ও হতাশা-ব্যঞ্জক শব্দ সেখানে শোনা যাবে না।

এখন বলা বাহুল্য যে, এরকম গ্রন্থাগার আমাদের দেশে নেই। আমাদের সরকারের সেরকম কোন আইনও নেই। সরকার হয়ত কতকগুলি পাবলিক লাইব্রেরী খুলে দিয়েছেন, তার জন্যে কিছু খরচ বরাদ্দও করে থাকেন; কিন্তু তাদের পুস্তক-সংগ্রহ যথোপযুক্ত নয়। সে সংগ্রহ বরাদ্দ অর্থ ও ভারপ্রাপ্ত কমিটির নির্বাচন সাপেক্ষ হয়ে থাকে। ফলে আপনি যে বই চান, তা পেতেও পারেন, নাও পেতে পারেন। শ্যামবাবু হয়ত কোন বিষয়ে গবেষণা করছেন, তার জন্যে তিনি যে যে বই ঘাঁটবার লিস্ট নিয়ে ঢুকলেন, তাদের খানিক হয়ত পেলেন, বাকিগুলি হয়ত দামে পোষায় নি বা নির্বাচকমণ্ডলীর মতে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে অনেক বই আছে কিন্তু দেশের প্রকাশিত সব বই সেখানে নেই। অতএব সে গ্রন্থাগারও জাতীয় গ্রন্থাগার নয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সপ্তাহ হইতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস "অশ্বত্থের অভিশাপ" "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে প্রায় প্রত্যেক দেশেই জাতীয় গ্রন্থাগার আছে। ইংলণ্ডের বৃটিশ মিউজিয়ম (লণ্ডনে), আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস লাইব্রেরী (ওয়াশিংটন শহরে), রাশিয়ার লেনিন লাইব্রেরী (মস্কোতে), ফ্রান্সের বিব্লিওথেক ন্যাশনাল (প্যারিসে) ইত্যাদির নাম পৃথিবী জোড়া। এ সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি Copyright Library অর্থাৎ দেশে প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থের কপি পাবার আইনগত অধিকার এই গ্রন্থাগারগুলির আছে। ইংলণ্ডে বহুদিন আগে থেকেই এই অধিকারের আইন প্রচলিত করার প্রচেষ্টা দেখতে পাই। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে একটা আইন মতে ইংলণ্ডে নটা গ্রন্থাগারকে এই রকম অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশের সমস্ত গ্রন্থরাজিকে একত্র সংগ্রহ করার প্রয়াস সভ্যজাতির মনে স্থান পেয়েছে বহু পূর্ব হতেই।

জাতীয় গ্রন্থাগারের বিশেষ প্রয়োজন জাতীয় জীবনে। জাতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গ্রন্থাগারের স্থান বিশিষ্টভাবে স্বীকৃত। সভ্যতার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাসের সাথে গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্তও জড়িয়ে আছে বিস্ময়করভাবে। যে দেশ সভ্যতার ঔজ্জ্বল্যে যতো দীপ্ত, তার গ্রন্থাগারও আকৃতি ও প্রকৃতিতে তত আকর্ষণীয়। দৃষ্টান্ত দিতে বাধা নেই। বর্তমানে এগিয়ে চলা জাতিদের পুরোভাগে রয়েছে রাশিয়া তাই তার গ্রন্থাগারও সর্বশ্রেষ্ঠ। লেনিন গ্রন্থাগারের গ্রন্থমালার সংখ্যা ১২০০০০০০। রাশিয়ার প্রতিপক্ষ আমেরিকাকেই নিশ্চয় সকলে বলবেন। তার গ্রন্থাগারও ঠিক পরেই স্থান পায়। কংগ্রেস লাইব্রেরীর গ্রন্থ-সংখ্যা ৬০০০০০০। আমেরিকা-বন্ধু ইংলণ্ডের জাতীয় গ্রন্থাগার বৃটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থ-সংখ্যা ৪,৪৫০,০০০।

কার্লটন বলেছেন, The true University is a collection of books কথাটা অত্যন্ত খাঁটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি হয় জ্ঞান দেওয়া, তাহলে 'a collection of books' গ্রন্থ-সংগ্রহ বা গ্রন্থাগার যতটা দিতে পারে, তার অতি সামান্য অংশ পাণ্ডিত্যমন্য বক্তৃতাস্ফীত প্রফেসররা দিতে পারেন। প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে শিষ্যকে থাকতে হত। তার ফল এই ছিল যে, শিষ্যকে ঘিরে সর্বদাই অধ্যয়ন ও জ্ঞানানুসন্ধানের আবহাওয়া পরিব্যাপ্ত থাকত। নির্দিষ্ট সময়ে বাধ্যতামূলকভাবে চর্বিত-চর্বণ বুলি শোনার নিত্যকর্ম সে যুগে ছিল না। শিষ্যের প্রয়োজন-মত ও গুরুর অবসরমত শরীর ও মন অনুকূল রেখে জ্ঞানচর্চা হ'ত। আমার তো মনে হয়, আধুনিক যুগে গ্রন্থাগারই সেই গুরুগৃহ। জাতির কাছে তার গুরুগৃহ জাতীয় গ্রন্থাগার। জাতির চিন্তা, ভাব ও ধারণার পীঠস্থান জাতীয় গ্রন্থাগার। সেই-খানেই সে তার অর্জিত মানস-সম্পদ সংগৃহীত রেখেছে।

এখন বাস্তব কার্যকারিতা হিসেবে দেখা যাক, কীভাবে আমাদের দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার গড়ে তোলা যেতে পারে। দেশের সরকার-বিভাগ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অজ্ঞ। সেক্ষেত্রে অন্য দেশের মত আইন প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীকে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার করবার জন্যে

ভারতীয় গ্রন্থাগার-সঙ্ঘ অনেক আন্দোলন করেছে, কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট তাতে কর্ণপাত করে নি। বাঙলা দেশেও অতএব কোন ফল হবে না। সুতরাং ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হবে। সে পথ আর কিছু নয়—সেই পুরাতন আবেদন-নিবেদন। বাঙালীর হৃদয় নাকি অতি কোমল, ভাবুকতাদ্রব; অতএব আবেদনে অতি সহজেই সাড়া পাওয়া যায়। তাই যথেষ্ট প্রচারকার্যের সংগে আবেদন জানাতে হবে পুস্তক-ব্যবসায়ী মহলে যে, জাতির সংস্কৃতির পুষ্টির জন্যেই প্রত্যেক প্রকাশক নিজের কর্তব্য হিসেবেই যেন প্রকাশিত পুস্তকের কপি জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করেন। এ-দান সমগ্র জাতিকে দান, কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষকে নয়, অতএব কোন স্বার্থের প্রশ্ন আসে না। ঠিকভাবে আবেদন জানালে নিশ্চয়ই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার ও শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার দুয়ের একটি বাঙলার জাতীয় গ্রন্থাগার হবার দাবী করতে পারে। তবে যেহেতু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার কলকাতায় অবস্থিত, অতএব পরিষদ গ্রন্থাগারেরই সেই সম্মান পাওয়া বাঞ্ছনীয়। সব দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার দেশের রাজধানীতেই অবস্থিত। তার কারণ রাজধানীতেই জাতির জীবন-প্রবাহ কর্ম-চাঞ্চল্যে সমধিক মুখর। অতএব সেই কর্মচাঞ্চল্য সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে জাতীয় গ্রন্থাগারের স্থানও রাজধানীতে হওয়া চাই। অন্যপক্ষে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার বিশেষভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য গ্রন্থাগারই হওয়া উচিত। রবীন্দ্র-জীবনী ও সাহিত্যবিষয়ক সকল তথ্য ও প্রকাশিত সকল লেখা যাতে সেখানে স্থান-লাভ করে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য এবং কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় সেদিকে যত্নবান।

শুধু গ্রন্থ-সংগ্রহ সব নয়। এই গ্রন্থ-সংগ্রহ সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে, তবেই এই সংগ্রহের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'লাইব্রেরীর নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে, সেই হেতু বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। সে অক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে।' এই সক্রিয়ভাবে ডাক দেবার ক্ষমতা গ্রন্থাগার অর্জন করতে পারে যোগ্য গ্রন্থাগারিক গোষ্ঠীর সাহায্যে। গ্রন্থাগার-পরিচালনা আজ একটা বিশিষ্ট বিজ্ঞান বলে স্বীকৃত হয়েছে। সেই বিজ্ঞান-দক্ষ ব্যক্তিদের হাতে গ্রন্থাগার-পরিচালনার ভার থাকা চাই। এ'দের নিয়ে একটা বিশেষ বিভাগ গড়ে তুলতে হবে, যার কাজ হবে জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ও পত্রিকা-সংগ্রহের বিজ্ঞানসম্মত তালিকা, পঞ্জী ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা। এই কাজ যে কতখানি প্রয়োজনীয়, তা যাঁরা গবেষণার কাজে লিপ্ত, তাঁরা বুঝতে পারেন। আপনি হয়ত বাঙালী কবি গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করতে চান, পাবেন কি সেই কবির গ্রন্থপঞ্জী, পাবেন কি তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় যেসব রচনা প্রকাশিত হয়েছে, সে সব রচনার সন্ধান? অথচ কত সহজেই সেসব সাহায্য দেওয়া যায়, যদি ওদের দেশের আদর্শে বাঙলা ভাষায় Bibliography, Abstracting, Indexing কাজ আরম্ভ হয়। এসব কাজ বাঙলা সাহিত্যে কিছুই নেই বলতে গেলে। জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হলে তার প্রথম ফলই হবে জাতীয় ভাষায় গবেষণার প্রসার বৃদ্ধি। কারণ দেশের প্রকাশিত সকল গ্রন্থ-সংগ্রহের ফলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব, কোন বিষয়ে কতটা কাজ হচ্ছে। যেমন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর হয়ত অনেক বই লেখা হ'ল; কিন্তু বাঙলা দেশের ইতিহাসের ওপর তেমন বই দেখা গেল না। এই ব্যতিক্রম জাতীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-তালিকায় ধরা পড়বে এবং জাতির মস্তিষ্ককে সেই অভাব পূরণ করতে চালিত করবে। সুতরাং একদিকে প্রেরণা ও অন্যপক্ষে বাস্তব সহায়তা, দুই কাজই জাতীয় গ্রন্থাগার জাতির জ্ঞানানুশীলনের জন্যে করতে পারবে।

এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে দানের ওপরেই বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান গঠিত ও চালিত হয়ে আসছে। সুতরাং দানের ওপরেই জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অনায়াসে হতে পারে। আইন করে দেশে Copyright Library তৈরী করা সে বহুদূরের কথা। সে প্রস্তাব নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে লাভ কি। বিনা আইনেই যাতে জাতীয় গ্রন্থাগার গড়া সম্ভব হয়, সেই চেষ্টা করা যাক না। তাতে মাথাত বাঙলার উপকার, পরোক্ষে সেই আদর্শে ভারতের অন্য প্রদেশের কাছে বাঙলার সম্মানলাভ।

"খুলে দিয়েছিনু কেশভারখানি" সেই কেশ হবে সৌন্দর্য্যের মুকুটমণি —
ক্যাষ্টরল
চকচকে, নরম ও সুন্দর কেশগুচ্ছের জন্য মূল্যবান রিফাইন খাঁটি ক্যাস্টর অয়েলের সংগে কেশপ্রাণ 'ভাইটামিন এফ' সংযোগে প্রস্তুত।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ

এক মাসের জন্য
অর্দ্ধ মূল্যে কনসেসন
এ্যাসিড প্রুভড 22K' মেট্রো রোল্ডগোল্ড গহনা
—গ্যারাণ্টি ২০ বৎসর—
চুড়ি বড় ৮ গাছা ৩০ স্থলে ১৬, ছোট- ২৫ স্থলে ১৩, নেকলেস অথবা মফচেইন ২১ স্থলে ১৩ নেকচেইন ১৪" একছড়া ১০ স্থলে ৬ আংটী ১টি ৮ স্থলে ৮ বোতাম এক সেট ৮ স্থলে ২, কানপাশা, কানবালা ও ইয়ারিং প্রতি জোড়া ৯ স্থলে ৬ আর্মলেট অথবা অনন্ত এক জোড় ২৮ স্থলে ১৪। ডাক মাশুল ৸৵০, একত্রে ৫০ অলংকার লইলে মাশুল লাগে না।
নিউ ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড কোং
১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড পরিচালিত আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চল এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। চারিটি দলের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চল দলই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। সুতরাং এই দলের সাফল্য যুক্তিসংগতই হইয়াছে। ফাইন্যাল খেলায় এই দল ভালই খেলিয়াছে। ব্যাটিংয়ে আর এস মোদী ও হাজারী এবং বোলিংয়ে ফাদকার তারাপোর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া এই বৎসর এই প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করা হইল, তাহা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইল জানি না। তবে খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যগণ এই প্রতিযোগিতার ফলে ভারতের সকল বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের বর্তমান খেলিবার শক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিলেন। এই জ্ঞান অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় দল গঠনে বিশেষ সাহায্য করিবে। ঠিক কোন্ কোন্ খেলোয়াড় লইয়া ভারতীয় দল গঠিত হওয়া উচিত সেই বিষয়ে এখন আমরা কিছুই বলিতে চাহি না। আমাদের বিশ্বাস আছে, নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যগণ এই প্রতিযোগিতায় যে যে খেলোয়াড় ব্যাটিং ও বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন। রংগনেকার দলভুক্ত হইবেনই এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। সেই সংগে আশা করি, কিষেণচাঁদ, ফাদকার, ফজল মামুদ প্রভৃতিকে দলভুক্ত করা উচিত। উইকেট রক্ষক হিসাবে একমাত্র ইরাণী ছাড়া কেহই সুবিধা করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ড ভ্রমণকারী দলের হিন্দেলকার অথবা নিম্বলকারের মধ্যে কেহ যদি যাইতে না পারেন, ইরাণীকে দলে লওয়া চলে। যাহা হউক দল গঠন হইলে এই বিষয় আলোচনা করিব।

উত্তরাঞ্চল দলের সাফল্য

আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় খেলায় উত্তরাঞ্চল দলের সহিত দক্ষিণাঞ্চল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উত্তরাঞ্চল দল এই খেলায় ১০ উইকেটে বিজয়ী হয়। দক্ষিণাঞ্চল দল প্রথম ইনিংস মাত্র ২২৭ রাণে শেষ করে। ফজল মামুদ ও অমরনাথের বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়। ইহার উত্তরে উত্তরাঞ্চল দল ৯ উইকেটে ৫০৬ রাণ করিয়া ডিক্লেয়াড করে। কিষেণচাদ ২১৮, ফজল মামুদ ১০০ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। পরে দক্ষিণাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০৬ রাণ করে। এম আর রেগে ১৪৯ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। উত্তরাঞ্চল দলকে দ্বিতীয় ইনিংস সামান্য কয়েকটি রাণের জন্য খেলিতে হয় ও খেলায় ১০ উইকেটে জয়লাভ করে। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

দক্ষিণাঞ্চল দল প্রথম ইনিংস:—২২৭ রাণ (শ্যামসুন্দর ৬৫, ফ্রাঙ্ক ৪৩, অমরনাথ ৩১ রাণে ৪টি ও ফজল মামুদ ৬৪ রাণে ৪টি উইকেট পান।)

উত্তরাঞ্চল প্রথম ইনিংস:—৯ উইঃ ৫০৬ রাণ কিষেণচাঁদ ২১৮, ফজল মামুদ ১০০ নট আউট, রংগচারী ১৩১ রাণে ৬টি উইকেট পান।)

দক্ষিণাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংস:—৩০৬ রাণ (রেগে ১৪৯, সোহনী ৩৬, আসঘর আলী ৪৬, অমরনাথ ৪৬ রাণে ৩টি ও খাঁ মহম্মদ ৭২ রাণে ২টি উইকেট পান।)

উত্তরাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংস:—কেহ আউট না হইয়া ২৮ রাণ।

আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল

আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় পশ্চিমাঞ্চল দলের সহিত উত্তরাঞ্চল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পশ্চিমাঞ্চল দল এই খেলায় এক ইনিংস ও ৩৪ রাণে বিজয়ী হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চল দল প্রথম ব্যাটিং করিবার সুযোগ পায় ও ৪৯২ রাণ করিয়া ইনিংস শেষ করে। আর এস মোদী ১২৪ রাণ ও বিজয় হাজারী ১৮৫ রাণ করেন। গুলমহম্মদ ৪৭ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। পরে উত্তরাঞ্চল দল খেলা আরম্ভ করে ও ২৫৩ রাণে ইনিংস শেষ করে। একমাত্র কিষেণচাঁদ ৬৯ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ফাদকার ৫৪ রাণে ৪টি উইকেট পান। পশ্চিমাঞ্চল দল ২৩৯ রাণে অগ্রগামী থাকিয়া উত্তরাঞ্চল দলকে ফলো অন করিতে বাধ্য করে। অমরনাথ নিজে গুরুদায়িত্ব লইয়া খেলা আরম্ভ করেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ২০৫ রাণে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। পশ্চিমাঞ্চল দল ইনিংসে বিজয়ী হয়। খেলার ফলাফল:—

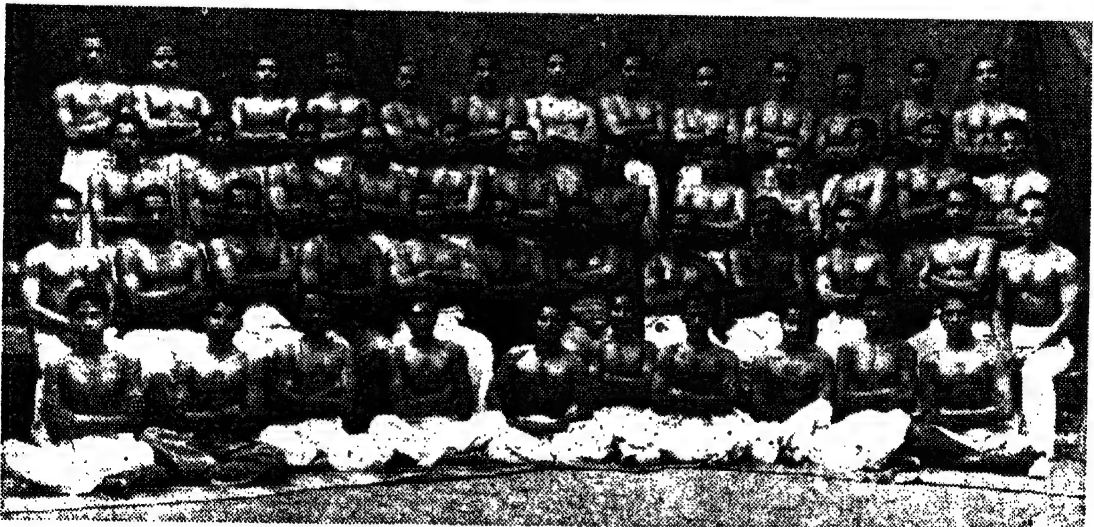
পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংস:—৪৯২ রাণ (আর এস মোদী ১২৪, হা[illegible] ১৮৫, গুলমহম্মদ ৪৭ রাণ নট আউট, অধিকারী ৪০, মাঙ্কড় ৪১, ফজল মামুদ ১১৮ রাণে ৫টি ও অমরনাথ ১১৭ রাণে ২টি উইকেট পান।)

উত্তরাঞ্চল প্রথম ইনিংস:—২৫৩ রাণ (কিষেণচাঁদ ৬৯, মহম্মদ সৈয়দ ৪৩, আনওয়ার হোসেন ৪০, ফাদকার ৫৪ রাণে ৪টি ও আমীর ইলাহি ৭৬ রাণে ২টি উইকেট পান।)

উত্তরাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংস:—২০৫ রাণ (অমরনাথ ৪৯, মকসুদ আমেদ ৪০, তারাপোর ৪০ রাণে ৩টি, ফাদকার ৪৬ রাণে ৩টি ও মানকড় ১৮ রাণে ২টি উইকেট পান।)

আন্তঃকলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস ক্লাব আন্তঃকলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করিয়াছেন। গত বৎসর এই খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই বৎসরও হইয়াছে। ইহার দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণকে উৎসাহিত করা ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে বুঝিতে পারি না। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় গত ৪।৫ বৎসরের মধ্যে মাত্র একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলকে যোগদান করিতে দেখা গিয়াছিল। যে দুই বৎসর এই আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইল, তাহার মধ্যে একবারও যোগদান করিতে দেখা গেল না। এই প্রতিযোগিতায় পর পর দুই বৎসর বিদ্যাসাগর কলেজ দল সাফল্যলাভ করায় উক্ত কলেজ দলের খেলোয়াড়গণ প্রশংসনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, এই কলেজের খেলোয়াড়গণ অন্ততঃপক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল গঠনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন।



বালীগঞ্জ ব্রতীসংঘের পরিচালকগণ ও সভ্যগণ

বৈষ্ণব সাধনার প্রাণশক্তি

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণশক্তির দিকটাই বিশেষভাবে মনে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব-ধর্ম নির্জীবের ধর্ম নয়, দুর্বলের ধর্মও নয়। স্বার্থকেন্দ্রিক নিষ্ক্রিয়তা, প্রমাদ, আলস্য বৈষ্ণবের জীবনে কোনদিন প্রশ্রয় পেতে পারে না। সে জীবনধারা এমনই স্বচ্ছ এবং সবল। মহাপ্রভুর পার্ষদদের জীবনী আলোচনা করলেই এর পরিচয় পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম মৃতের ধর্ম নয়, প্রাণের প্রগাঢ় সংবেদনে বৈষ্ণব সকলকে আপন করতেই চেয়েছে। অস্পষ্ট বা আঁধার পথে নিরুদ্দিষ্টের অভিযানে বৈষ্ণব চলে নাই, ক্ষুদ্র স্বার্থের সংকীর্ণতা ছেড়ে প্রাণের বিলাসে মেতে উদার এক আনন্দময় নিত্য প্রকাশের রাজ্যের অভিসারে তার যাত্রা। নামকে ধরে ধামের পথে এই যে গতি, প্রবল এর বেগ, সব বাধাকে তুচ্ছ করে, অভীষ্টের সাধনায় এ নিজকে উৎসর্গ করতে চায়। অনুমানের রাজ্যে মনের এই গতিবেগ লাভ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তকে ধরেই অব্যক্তের দিকে, সান্তকে ধরেই অনন্তের অভিমুখে বিকারকে ছেড়ে সঞ্চারের মধ্যে এই শক্তি উৎসারিত হয়ে থাকে। বৈষ্ণবের ভগবান সর্বত্র। তিনি জলে, তিনি স্থলে, ধূলিবিন্দু-লিপ্ত বালুকণাতেও বৈষ্ণব বিশ্ব-দেবতার সংবেদনাই লাভ করে থাকেন। প্রত্যক্ষ-চেতনাময় এই সুমহান্ সত্যের সঙ্গে যিনি মনকে যুক্ত করতে না পেরেছেন তাঁর বৈষ্ণব সাধনার বিশেষ কোনই মূল্য নেই। বৈষ্ণব সকলকে আপন করতে চান। তিনি কাহাকেও তুচ্ছ করেন না। দোষ বা ত্রুটিই যার সব সময় দৃষ্টিতে পড়ে, বৈষ্ণব-সাধনা তাঁর পক্ষে বিড়ম্বনা হয়েই দাঁড়ায়। এজন্যই মহাজনের বাণী রয়েছে—অনিন্দক হইয়া যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে, সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে।

বাস্তবিক সমাজের দিক থেকে এ বড় কঠিন প্রশ্ন। প্রশ্ন এই দাঁড়ায় যে, দোষ না দেখলেই কি দোষ চলে যাবে। এ প্রশ্নের সোজা উত্তর এই যে, সত্য দর্শনের যে সংবেদন, তারও একটা শক্তি রয়েছে। সত্য-দ্রষ্টা সাধকের সমগ্র জীবন এই শক্তির কেন্দ্র বা ছন্দ হয়ে দাঁড়ায়। সেই ছন্দ সমাজ-জীবনে ভাব-পদার্থকে সৃষ্টি করে, তার ফলে কাম-ভোগের অভাবগত তাড়না, পশু জীবনের ইতর স্বার্থগত বেদনা কমে যায়। এতে সমাজে শান্তি এবং স্বস্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। বাইরের কোন উপচারের দ্বারাই মানুষের মনের এমন স্থায়ী সুখের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশটি গড়ে তোলা যায় না। বাইরের যত কিছু সব দেখতে দেখতে এলিয়ে পড়ে। স্বার্থের সংস্পর্শে সব সুখ কর্পূরের মত উবে যায়। বৈষ্ণবের জীবন-সাধনা থেকে যে শক্তি স্ফুরিত হয়, তা একান্ত এবং কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাকে প্রতিহত করতে পারে না বলে তা অমোঘ।

বাইরের শক্তি বা জড় বলের দিকে জগৎ এতটা বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে যে, বৈষ্ণব-সাধনার অন্ত-র্নিহিত এই শক্তির সঙ্গে সহজে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, শুধু সত্যদ্রষ্টা সাধকের জীবনের প্রত্যক্ষ সংসর্গেই মানুষ এ শক্তির সম্যক পরিচয় পেতে পারে। অনুধ্যানের প্রভাবেই এই ভাবময় আনন্দময় রাজ্যের দিকে চিত্তের উন্মেষ ঘটে। প্রাণের টান আমাদের সবাইকেই টানে, সুতরাং প্রাণই প্রত্যক্ষতার মূলে রয়েছে। বৈষ্ণবের জীবনের থেকে প্রাণের ধারা আত্মদানের বিলাসে ও উচ্ছ্বাসে ছড়িয়ে পড়ে, আর সেই প্রাণের টানে জাগ্রত বেদনার প্রত্যক্ষ বলে সমাজ-দেহ সরস এবং সঞ্জীবিত হয়ে থাকে। কাজেই প্রাণ দেওয়াতেই বৈষ্ণবের মান। যে ধর্মের প্রাণের এমন উদ্বোধন না ঘটে তা বৈষ্ণব ধর্ম নয়। যাহা বাহ্য আচার এবং বিচারের তা খোসা ভুসি মাত্র। সর্বত্র স্বচ্ছন্দ আনন্দের সাড়া তাতে চিত্তজগতে পরিস্ফূর্ত হয় না। চোখের সামনে অন্ধকারই আচ্ছন্ন থাকে, ভবিষ্যতে কি হবে কোন ভরসাই পাওয়া যায় না। অদৃষ্টের অন্ধ গতিতে নিত্য ভীরুর জীবনই যাপন করতে হয়। পাতা পড়লে বুক কেঁপে ওঠে, হাতের কসরৎ করে বুকের এই কাঁপ এড়ানো যায় না। প্রবলতর বাইরের শক্তির চাপের আতঙ্ক মনের গোড়ায় ঘেঁষে কাঁপ তোলে। বছর খানেকের মধ্যেই



প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

আমরা এই ভীতির মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা পেয়েছি। মানুষ ঘায়ে মরে নাই যতটা, ভয়ে মরেছে তার চেয়ে বেশী। প্রকৃতপক্ষে অন্তরের বলকে যুক্তির যোড়া-তালি দিয়ে গড়ে তোলা যায় না। এই সেদিনও নোয়াখালি মেঘনার উপকূলবর্তী চর অঞ্চল থেকে আমার কাছে একজন কর্মী চিঠি লিখেছেন, এই ভয়ের কথা আমাকে জানিয়েছেন। কথায় জানা যায় বাঙলায় বলিষ্ঠ ব'লে যে সম্প্রদায়ের খ্যাতি আছে, এই অঞ্চলের সে সম্প্রদায়ের লোকেরাও ভয়ে একেবারে যেন জড় সড় হয়ে পড়েছে। তাদের মনের বল আর কিছুতেই গড়ে তোলা যাচ্ছে না। বাস্তবিক পক্ষে এমন অবস্থা অস্বাভাবিক নয়। নোয়াখালির ব্যাপারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার ঘটেছে এবং যেমন অসহায় অবস্থার মধ্যে এই উপদ্রবের ঘা এসে পড়েছিল, তাতে ওদের মনের অবস্থা এমন হবারই কথা। এখনও ওরা কর্মীদের মুখের কথায় মনের বল গড়ে তুলতে পারছে না। সমগ্র সমাজের সংবেদন এরা অন্তরে আপন করে নিতে পাচ্ছে না। এর জন্য দোষ আমাদের সমাজের রয়েছে এবং সে দোষ প্রধানত ঘটেছে বৈষ্ণব-ধর্মের অন্তর্নিহিত সংস্কৃতিরই অভাবে। বাঙলার বৈষ্ণব সংস্কৃতি যদি সজীব থাকত, তবে মনের গোড়া থেকে সেই শক্তি সাড়া দিত। এক একজন মানুষ, মনের বলে দশজন হ'য়ে উঠত। অবশ্য, প্রতিরোধ কি আকারে হ'ত, সে কথা স্বতন্ত্র, তবে কথা এই যে, বৈষ্ণব সাধনা কোন অবস্থাতেই কাউকে দুর্বল হ'তে দেয় না। মন এমন প্রতিকূল অবস্থায় পড়েও প্রকাশাত্মক যে অনুভূতিতে অচঞ্চল, অনায়াস এবং বিলসিত হয়, তার স্থূলে সূক্ষ্মভাবের সঙ্গে মেশামেশি, ঘেঁষাঘেঁষির উপরই অসি, বাঁশী—ঝনৎকার বা ঝঙ্কার, আর হাসির সৌন্দর্য ও মাধুর্য-বীর্যের স্ফুরণ ঘটে থাকে। 'তটস্থ হৈয়া বিচারিলে আছে তারতম্য'—কিন্তু বৈষ্ণব সাধনায় কোনক্রমেই দুর্বলতা থাকে না। সে ধর্মের প্রাণের তাজা সাড়া যদি আমাদের সমাজ জীবনে থাকত, তবে পশুবল এত সহজে এদের অভিভূত করে ফেলতে পারত না। ভয়ে পড়ে এরা এমনভাবে মনুষ্যত্ব হারাত না, আর হাজার হাজার লোক গুণ্ডার ভয়েও ধর্মান্তর গ্রহণে রাজী হত না। অবশ্য ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যাপারটা বাস্তবে সত্য হয়ে দাঁড়ায় নাই; কিন্তু তাতেই তৃপ্তি লাভ করা যায় কি? সত্য কথা বলতে গেলে বৈষ্ণবকে কেউ ধর্মান্তরিত করতে পারে না। বৈষ্ণব সাধনা জড়দেহাশ্রিত নয় যে মেরে ধরে সে সাধনাগত চেতনা ছাড়ানো যাবে। তবে দেহ সম্পর্কিত ত্রুটি সাময়িকভাবে ঘটতে পারে। নোয়াখালি থেকে ভক্ত নরনারীরা কেউ কেউ এজন্য আর্তি প্রকাশ করে লিখেছেন। তাঁদের এই শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে নিশ্চিন্ত করা যায় যে, নাম শুনলেই তাঁদের এই গ্লানিটুকু কেটে যাবে। সেজন্য তাঁদের কোন ভাবনাই করতে হবে না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, নিষ্ঠার এই যে অভাব এটাই ঘটল কেন! 'খণ্ড খণ্ড কর যদি বাহিরায় প্রাণ, তথাপি না বদনে ছাড়িব হরিনাম,'—এমন দৃঢ়তা অনুশীলন করবার মত চেতনা আমরা নামের মধ্যে কেন পাই না। প্রাণ গেলেও নিজের ধর্ম ছাড়ব না, এমন দৃঢ়তায় মনকে যে ধর্মের সাধন—চেতনা দিতে পারে না, সে ধর্ম শক্তি হারিয়েছে বলতে হবে; কারণ মনকে তেমন অচঞ্চল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই ধর্মের স্বরূপ।

মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদগণের জীবন-লীলায় বৈষ্ণব ধর্মের এই প্রাণশক্তির প্রচুর মহিমা পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু দুঃখ এই যে, বাঙলার সেই প্রাণময় বৈষ্ণব-সাধনা শুধু কামহত অতৃপ্ত জীবনের নিরুদ্দিষ্ট বঞ্চনাতেই গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্বার্থকে কেন্দ্র ক'রে গতানুগতিক কতকগুলো কাজ করেই আমরা নিজদিগকে মহাপ্রভুর সেরা ভক্ত বলে মনে করছি এবং ব্রজবাসের আরাম ও আয়েসের একান্ত ভ্রান্ত কল্পনারই জাল বুনছি। অজ্ঞানতা, অস্পষ্টতা, অন্ধকার—বৈষ্ণবতার এই অন্ধ অহমিকা থেকে জাতিকে উপরে তুলতে হবে। এতে প্রেমের শক্তি সঞ্চার করতে হবে। আল-সেমি, কুঁড়েমি, আর দুর্বলতাকে ধর্ম বললে চলবে না। দূর করে দিতে হবে, এ সব ভেজাল; গোজামিলের কর্ম নয়। প্রাণের টানের আজ জাগরণ চাই, আজ চাই আত্মদান। দানই হ'ল প্রাণের লক্ষণ। দান করতে না জানলে প্রাণ পাওয়া যায় না। ধর্ম এই প্রাণকে—এই অমৃতকেই প্রতিষ্ঠিত করে অনপেক্ষ আত্মশক্তিতেই সে জীবনকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

বাঙলার বুকের উপর আজ ভয়াবহ পরধর্মের তাণ্ডব চলেছে। প্রকৃতপক্ষে এত বড় বিপর্যয় বাঙলায় আর কোনদিন আসে নাই। বর্বরতা এবং হিংস্রতা মানবতাকে পিষে ফেলে বীভৎস স্বার্থের

উদ্দাম বুভুক্ষা মিটাতে জিহ্বা বাড়াচ্ছে। বাঙলার সভ্যতা, বাঙলার সংস্কৃতি সবই কি এতে ধ্বংস হবে? মনে করতে পারি না; বাঙলার প্রাণ শক্তিকে এতটা অবিশ্বাস করে উঠতে ইচ্ছা হয় না। মহাপ্রভুর লীলাভূমি এই বাঙলা। প্রেমের অবতার প্রভু নিত্যানন্দের প্রেমের বন্যায় এদেশ একদিন ভেসে গিয়েছিল। মানুষ ভেদাভেদ ভুলে একে অপরকে কোল দিয়েছিল, সে দেশ বর্বরতার তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হবে এ কল্পনারও অতীত। ঠিক এমন স্থূলভাবে না হ'লেও ভয়াবহ ধর্মের উপদ্রব বাঙলায় আগেও এসেছে কিন্তু তা থেকে জাতিকে রক্ষা করবার জন্য বাঙলার সংবেদনময় সংস্কৃতি অতীতে উদ্দীপ্ত হয়েছে; আশা আছে এবারও হবে। বাইরের আচার-বিচারের অন্তঃসারহীনতা ছেড়ে বাঙলার মনীষা আবার বৈষ্ণব-সাধনার অন্তর্নিহিত প্রেমময় প্রজ্ঞাকে প্রজ্বলিত করবে। পশু বল তার কাছে নিশ্চয়ই দাঁড়াতে পারবে না। তার ক্ষণিক গর্জন স্তব্ধ হ'য়ে যাবে।

গান্ধীজী যে পথে চলছেন, বাঙলার কাছে এ পথ অপরিচিত নয়। বাঙলার বৈষ্ণবেরা আগেই এ পথ দেখিয়েছেন, তবে রাজনীতির সঙ্গে নিজকে জড়াতে হলে নিত্যলীলার রসানুভূতি থেকে ছাড়িয়ে অনেকটা কৃত্যের মধ্যে আনতে হয়। বৈষ্ণব সাধকেরা প্রেমরসানুভূতিতে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিতে নিত্যলীলাই অনুভব করেছেন। বস্তুতঃ তাঁরা মানুষের সেবা করেন নাই; সেবা করেছেন তাঁদের প্রাণের দেবতার। তাঁরা বৃন্দাবনের পথেই চলেছেন, কাঁটা বন ভাঙেন নাই। রাজনীতির সঙ্গে জড়ালে শুদ্ধসত্ত্বময় সেই প্রকাশ, অনেকটা আভাসে এসে পড়ে বলে মনে হয়। কিন্তু আমাদের জীবনে ও আমাদের সমাজে প্রেমের এই আভাসও যে নাই, প্রকাশ বা বিলাস তো দূরের কথা। ধর্মের নামে সর্বত্র অবিশ্বাস, সর্বত্র সন্দেহ—জীবনের স্থির ভিত্তিভূমি হারিয়ে আমরা স্রোতের শেওলার মত পশুবলে আপনা হারিয়ে অন্ধকারের দিকেই চলেছি। দিক-চক্রবালে কোথায়ও আলোকের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রকৃত মনীষী সাধকেরা যে সত্য অন্তরে উপলব্ধি করেন, কৃত্যের নির্দেশ দ্বারা তাঁরা সেই সত্যকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। তাঁদের জীবনের আলোকে মানুষ নিজেদের পথ করে নেয়। প্রাণ দিয়ে তাঁরা নিত্য সত্যকে সামাজিক কৃত্যের ভিতর উদ্দীপ্ত করে তোলেন। বাঙলাকে বাঁচাতে পারে এই শক্তি, আর বৈষ্ণব-ধর্মের মধ্যে সার্বভৌম এমন উদার দৃষ্টির শক্তিই রয়েছে। সে শক্তি অনপেক্ষ, পরের বিচার তাতে করতে হয় না, নিজের অন্তরেই পরকে আপন করবার বল প্রোজ্জ্বলভাবে পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে কে কি করবে বা করতে পারে, এমন ভয়ে চলবার আর দরকার হয় না। আত্মজ্যোতির অনাহত ছন্দ পরকে অসন্দিগ্ধভাবে আপন করে নেয়। প্রাণ—সেখানে প্রাণকেই পাওয়া যায়। আপন বেদনায় আপনাকে বিলিয়ে দিলে আর বঞ্চনার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এখানে পরের উপকার বলে কোন কথা নাই। কারণ এসবে আমরা আপনাকেই একান্ত করে পাই। বাঙলার বৈষ্ণবেরাও এই "অভীঃ" মন্ত্রেরই সাধনা জাতিকে দিয়েছিলেন। ভয় ঘুচিয়ে তাঁরা ভাবকেই জাগিয়েছিলেন। সকল অপচয়, আর লোকসানের পথ এড়িয়ে তাঁরা জাতিকে অনিবার্য জয়ের পথ দেখিয়েছিলেন। আবার এই কথাই বলি যে, আমাদের যদি বাঁচতে হয়, তবে এই প্রেমের সাধনা করতে হবে; এই সংবেদনের পথ ধরতে হবে। ধর্মের নামে সুপারিবাগানে ঢিল ছোঁড়ার কোন মূল্য নাই। লেগে গেলেও যেতে পারে। প্রাণময় ধর্ম কোন দিনই এই হিসাবে চলে না। তার ক খ থেকে আরম্ভ করে পরমার্থতত্ত্ব পর্যন্ত সব সবল অনুভূতিতে উজ্জ্বল থাকে। অসহায়ের মত সে পথে চলে না, প্রত্যক্ষতার বলকে আকড়ে ধরে চলে। আজ স্বার্থের লোভ, মোক্ষের লোভ, দেবতার দুয়ারে কামনাময় জীবনের বেদনা ও দৈন্য বহন করার জীবন ছেড়ে, প্রত্যক্ষ প্রেমের সংবেদনময় নিত্য চেতনার পথ জাতিকে বেছে নিতে হবে। ভুলে যেতে হবে গতানুগতিক আচার-বিচারকে; অন্তরে প্রেমের সঞ্চার করতে হবে। সেবাকে জীবনে সকল দিক থেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে—দেহে মনে এবং প্রাণে। সমাজ-জীবনে সেবার এই সংবেদন ছেড়ে বৈষ্ণব ধর্মের যে ভরম চলেছে তাকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

এমন কথাও কারো কারো মুখে বলতে শুনি যে, আমরা বৈষ্ণবমন্ত্র যখন পেয়েছি, তখন ব্রাহ্মণ হয়েছি। সেবা হল শূদ্রের ধর্ম; সুতরাং বৈষ্ণব হবার পরও আমরা তা করতে যাবো কেন? ওসব কাজ বৈষ্ণবদের নয়। ওসব শূদ্রদের কাজ। পঞ্চরাত্রমতে আমরা যে ব্রাহ্মণ! বলা বাহুল্য, এ'রা সেবাও যেমন বুঝেছেন, ব্রাহ্মণও তেমনই বুঝেছেন। বৈষ্ণবতা তো দূরের কথা। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ হলে সেবাই নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়ায়, যজ্ঞই যে ধর্মে পরিণত হয়, এ'রা সাধনাগত সেই আত্মানুভূতির সন্ধান পান নাই এবং বৈষ্ণব ধর্মের মূলীভূত প্রেমের সম্পর্ক থেকেই তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণকে যেমনভাবে তাঁর অভিমানই গ্রাস করেছে তেমনই এই সব বৈষ্ণবাভিমানীর বৈষ্ণবতাও অন্ধ আত্মম্ভরিতায় পরিণত হয়েছে। প্রকৃত বৈষ্ণবের জীবন প্রেমময় এবং প্রেম সেবাকেই পরিস্ফূর্ত করে তোলে। প্রাণবৃত্তিকে জাগিয়ে প্রথমে আলিঙ্গনে; তারপর চরণে পড়ে সকলকে আপন করতে চায়। কাছে কাছে আরও কাছে অভীষ্টকে আনতে চেয়ে শেষে নিঃশেষে আপনাকে বিকিয়ে দেয়। সেবা চরণেই পর্যবসিত হয়; কারণ চরণেই আপনার অপরোক্ষ অনুভূতি হয়ে থাকে। অভীষ্টের একান্ত আসক্তির সেখানেই পরম আসঙ্গ। এ জিনিষ বাইরে মনিবের চাকুরী করার মত নয়। এ হলো ভালবাসায় আপনাকে লয় করা। সাধক বৈষ্ণব সাধনাগত রসে সর্বত্র আপনাকে বিকিয়ে দেবার এই একান্ত আশ্লেষণের তাপ অনুভব করে থাকেন। বৈষ্ণব জীবনে সেবা কৃত্য নয়, তা নিত্য রসানুভূতিতে সত্য হয়ে উঠবেই এবং এখানেই সমাজ-জীবনে তার লীলাময় স্ফূর্তি রয়েছে। বৈষ্ণব-ধর্মের ভিতর ব্রাহ্মণত্বের বীজ রয়েছে, এ কথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না। কারণ তা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিরোধী হবে; কিন্তু সেই ধর্মের কামবীজে মজে ভজন পেলে তবে তো ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্বের সে জীবনে সেবাই সত্য হয়ে উঠবে। দুঃখের বিষয় এই যে, জাতি পাঁতির ভেদ রেখা টেনে এবং তা আকড়ে ধরে বাঙলার বৈষ্ণব সাধনাকে আমরা বিকৃত করতে বসেছি এবং সে ক্ষেত্রেও বর্ণাশ্রম ধর্মের গোঁড়ামীকে এনে ফেলেছি। বর্ণাশ্রম ধর্মের মূলে ভুল নাই। এ কথা সত্য; কিন্তু যুগোপযোগী তার পরিবর্তন আছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের মূলে সমাজ দেহরূপী সহস্রশীর্ষ পুরুষেরই সেবা ছিল। কিন্তু সেই বিরাট পুরুষের সেবার অনুভূতি নিয়ে এখনকার বর্ণাশ্রম-ধর্ম চলছে না এবং তা চলতেও পারে না। সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি পরকীয় প্রভাবে ধ্বসে গেছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের রীতি পদ্ধতিতে এখন আর সমাজরূপী বিরাট পুরুষের সেবার ভাব আমাদের জীবনে উদ্দীপ্ত হয় না। পরকে আপন করার ভাব চেতনা লাভ করে না। অন্নচিন্তার দায়ে স্বার্থ বিচ্ছিন্ন আমাদের জীবন একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে পড়েছে এবং সেজন্য স্বেচ্ছাচার চালাতে হচ্ছে। এ অবস্থায় বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্নিহিত সংহতিগত শক্তি যদি বজায় রাখতে হয় এবং ব্যবচ্ছিন্ন জীবনে অসহায়ত্ব যদি সমাজ-চেতনায় দূর করতে হয়, তবে নিতাই ছাড়া গতি নাই। নাম সাধনার পথই ধরতে হবে। কলিকালে নাম ছাড়া অন্য কোন সাধনা নাই ঋষিদেরই এই নির্দেশ। আমাদের এই ঋষিবাক্য নির্বিচারে মেনে নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে ডক্টর আনী বেসান্টের একটি কথা আমার মনে পড়ছে। কথাটা ছেলেবেলায় তাঁর কাছে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ঋষিরা এই কলিযুগে আর সব শাস্ত্র সরিয়ে নিয়ে গেছেন। এখন জাগ্রত আছেন শুধু ভাগবত, আর নামসাধনার পথে ভক্তি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও বলতেন, 'ওরে কলিযুগে শুধু নারদীয়া ভক্তি'। এ পথে সেবার ভাব আসবেই। এ পথে নিষ্ঠিত হলে জাতি ও বর্ণ-বৈষম্য টিকতে পারে না; এমন কি তা ধরে থাকতে চাইলেও এলিয়ে যায়। প্রেম যতই গাঢ় হতে থাকে, ভেদের রেখা ততই বিলীন হয়ে সকলকে কোলে বুকে টেনে আনবার একটা অপরিমিত ও একান্ত আনন্দ হৃদয়ে ফুটে উঠে। এ সব তত্ত্ব বৈষ্ণবেরা সবাই জানেন। 'এই সে বৈষ্ণব ধর্ম সবারে প্রণতি, সেই ধর্ম ধ্বজী যাঁর ইথে নাহি মতি'—এ বচন সবারই স্মরণ হবে; তবু কিভাবে এ'রা কেউ কেউ বৈষ্ণবতা থেকে সেবা বা পরিচর্যাকে পৃথক করতে চান বোঝা দুষ্কর। প্রকৃতপক্ষে প্রেমের বল তাঁদের অন্তরে সাধনার শুদ্ধ ধারা ধরে সাড়া জাগায় নাই। এরা নিত্যানন্দতত্ত্ব কিছুই বোঝেন নাই, অথচ মুখে তাঁরই দোহাই দিয়ে থাকেন। পতিত ও তাপিতের ঠাকুরের লীলারসে যাঁরা নিমগ্ন হয়েছেন তাঁরা কি নরনারীর দুঃখ বা বেদনা দেখে উদাসীন থাকতে পারেন? কিন্তু এই সব চলছে। আমার স্মরণ আছে কলিকাতা সহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় দুইটি ছোট ছোট ছেলেকে একজন বৈষ্ণবের ঘরের দুয়ারে গুণ্ডারা ধরে জখম করেছিল। সে ভদ্রলোকের কাছে, এই নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততার জন্যে অনুযোগ করলে তিনি বললেন, মশায় আমরা বৈষ্ণব মানুষ, মহাপ্রভুর দাস, আমার বাড়ীর সামনে মেরেছে বলে কি আমরা সাধনভজন ছেড়ে ঐ সব ঝঞ্ঝাটের ভিতর পড়তে যাব না কি? এ সব বৈষ্ণব স্বার্থহানির ভয়ে বা ঝঞ্ঝাটে পড়বার ভয়ে তথাকথিত সাধন ভজন নিয়ে স্বর্গ-বাসের ব্যবস্থায় থাকেন, থাকুন, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে, বৈষ্ণবতা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। আপনাকে বাঁচাবার এই যে ঘৃণ্য দৈন্য, এই যে কার্পণ্য বৈষ্ণবের জীবনে এ থাকতে পারে না। এরা ভয়ের মুগুরেই শুধু দেখছেন, ভাবের ঠাকুরকে কোন জন্মেও পাবেন না। বৈষ্ণব ধর্মের নামে এমন ভীরুতা বেড়ে চলছে। কতকগুলো অনুষ্ঠানের ধারা বজায় রাখে কাঞ্চন কৌলীন্যই, আর তাই নিয়ে বড়মানুষী আড়ম্বরই জেঁকে উঠছে। সে সাধনা থেকে দরিদ্রের বেদনা বোধ আর্তকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবার চেতনা যেন লুপ্ত হতে বসেছে। এই যে হৃদয়হীন আচারের অভিনয়, এ তো বৈষ্ণব ধর্মের বিকার।

এই তো নোয়াখালি ও চাঁদপুরে এত বড় একটা অনর্থ ঘটে গেল। আমরা জানি, কয়েকটি বড় পরিবার ছাড়া যাদের উপর এ বর্বরতার আঘাত পড়ে, তারা প্রায় সকলেই বৈষ্ণব। এদের প্রাণগণের

তুলসী বৃক্ষ উন্মূলীত হয়েছে, দেববিগ্রহ বিচূর্ণ হয়েছে, ধরে ধরে এদের কণ্ঠী ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু বাঙলার বৈষ্ণব সমাজ এদের দুঃখে সহানুভূতির জন্য কি করেছে? বৈষ্ণবদের মধ্যে ধনীর তো অভাব নাই। বড় বড় পর্বানুষ্ঠানে তাঁরা টাকা পয়সাও যথেষ্ট খরচ করে থাকেন। কিন্তু কোন বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠান নোয়াখালিতে গিয়ে নাম প্রচার করছেন শুনি নাই। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বৈষ্ণব, ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত মহাশয় তো রীতিমত যুগল বিগ্রহোপাসক; কিন্তু কোন বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিস্বরূপে এঁরা সেখানে সেবাব্রতে যান নাই। অনেকেই জানেন না, নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার খোকসা-জানিপুরে রাধারমণ সেবাশ্রম বলে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এই আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমৎশঙ্কর মহাবীর চৈতন্য এম এ নোয়াখালিতে গিয়ে ঠক্কর বাপা (অমৃতলাল ঠক্করের) নিয়ন্ত্রণে এক দল কর্মীসহ কাজ করছেন। ভগ্ন হরিমন্দিরগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হল এঁদের প্রধান কাজ। রাধারমণ সেবাশ্রমের সভাপতি বলে আমি এঁদের এই সেবাব্রতের জন্য নিজে গর্ব বোধ করছি। কিন্তু দুঃখ এই যে, এতদিনে হরিনামের রোলে নোয়াখালি চাঁদপুরের আকাশ কেন ভেসে গেল না। ভয়ের ভাব কেটে গিয়ে ভাবের বন্যা আমরা কেন এতদিনেও সেখানে আনতে, বহাতে পারলাম না এই তো হচ্ছে প্রশ্ন। আমাদের প্রাণেরই রয়েছে প্রেমের অভাব। দেশের আর্ত, তাপিত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের বুকে এদের জন্য বেদনা জেগেছিল। তিনি প্রভু নিত্যানন্দের বংশাবতংস ছিলেন। জীবনে প্রকৃত প্রেমের সাড়াও তিনি পেয়েছিলেন। তিনি দুঃখ করে বলতেন, প্রেম ছেড়ে বৈষ্ণব ধর্ম শুধু আড়ম্বর সর্বস্ব হয়ে উঠলো। ধনীদের নিয়ে শুধু মাতামাতি, গরীব দুঃখীর জন্য কারো বেদনা নাই। আর্ত, পীড়িত এবং অত্যাচারিতের অশ্রু মুছাবার জন্যে কারো তাপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী দরিদ্রের ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর নাম প্রচার করাতে তিনি আনন্দ বোধ করতেন। কার্শিয়াংয়ের যক্ষ্মা নিবাসের জন্য প্রভুপ্রাদ তাঁহার জীবনে সঞ্চিত সব অর্থই দান করে গেছেন বলা যায়। এতে তাঁর প্রকৃত বৈষ্ণবতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। অতুলকৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবেত্তা পরম পণ্ডিত ছিলেন; তিনি ভাগবতের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা ছিলেন; তিনি বাঙলার বৈষ্ণব যুগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তিনি প্রাণবান ছিলেন। আজ আমাদের জাতীয় জীবনে মহাদুর্দৈব দেখা দিয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণপূর্ণ সংস্কৃতির ধারাকে উজ্জীবিত রাখতে তাঁর মর্ত্য জীবনের সাধনশক্তি আমাদের সম্বলস্বরূপ ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব যিনি, তিনি মৃত্যুর অতীত। তাঁর মৃত্যু নাই—তাঁর বিজয়। বাঙলার এই পরম বৈষ্ণবের জীবনের সাধনা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক, আজ শুধু এই প্রার্থনাই করছি। নিত্যানন্দের প্রেমময় লীলা সকলকে আপন করবার জন্য আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক। আমরা যেন জাতি ও বর্ণের সকল বিভেদ বিস্মৃত হয়ে বাঙলা দেশের সর্বত্র মহাপ্রভুর নামগান করে যেতে পারি, আজ এই বাসনা অন্তরে নিয়ে আমরা প্রভুপাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের অগাধ শ্রদ্ধানিবেদন করছি। বুকে যে বেদনা তা ভুলতে পারছি না, যে নিষ্ঠুর এবং নির্মম দৌরাত্ম্য জাতির আত্মাকে আজ আঘাত করেছে, তার ব্যথা ভোলা সহজে যায় না। অসহায় নরনারীর আর্তনাদ কানে বাজছে। মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্না কুমারীর অশ্রু এখনও প্রাণ আকুল করে তুলছে। এমন অসভ্য, এমন বর্বর পীড়নের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতিবেশ থেকে প্রেমের ঠাকুর নিত্যানন্দ আর তাঁর অনুগ্রহে মানবতার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত ভক্তগণ আমাদিগকে উদ্ধার করুন। আসুন, তাঁরাই এগিয়ে আসুন, প্রাণ দিয়ে প্রাণ জাগাবার শিক্ষা আমাদের এই ভীত এবং পতিত জীবনে সত্য করে তুলুন। অন্য উপায় আর দেখা যায় না।*

*সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর স্মৃতিসভায় 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতার অনুলিপি।



নিউ এম্পায়ারে "ভারত নাট্যম্" নৃত্যাভিনয়

আগামী ৬ই মার্চ, বৃহস্পতিবার বিকাল ৬টায় নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী শান্তার



শ্রীমতী শান্তা

'ভারত নাট্যম্' নৃত্যাভিনয় হবে। 'ভারত নাট্যম্' ভারতবর্ষের ক্লাসিক নৃত্যকলা। দক্ষিণ ভারতে এই নৃত্যকলা প্রকৃষ্টরূপে আয়ত্ত করার পর শ্রীমতী শান্তা ১৯৪৩ সালে প্রথম মাদ্রাজে উহা প্রদর্শন করেন এবং নৃত্য-সমালোচকদের প্রশংসালাভে সক্ষম হন।

৬ই মার্চের প্রদর্শনীর পর ৯ই মার্চ, রবিবার বেলা সাড়ে দশটায় আর একটি প্রদর্শনী হবে।

ম্যাজেস্টিকে "১৮৫৭"

শুক্রবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ম্যাজেস্টিক চিত্রগৃহে মুরারি পিক্‌চারের ঐতিহাসিক চিত্র '১৮৫৭'-এর প্রদর্শন শুরু হল। ছবিখানি বিগত ১৮৫৭ সালের সিপাহী-যুদ্ধের পট-ভূমিকায় বিরচিত। চিত্রের নায়ক নায়িকার ভূমিকায় যথাক্রমে সুরেন্দ্র ও সুরাইয়া অভিনয় করেছেন। সঙ্গীত, দৃশ্যাদি, সুন্দর অভিনয় এবং ঐতিহাসিক ঘটনা-পঞ্জীর নিখুঁত সমাবেশে ছবিখানা বেশ আকর্ষণযোগ্য হয়েছে।

মন্দির প্রাঙ্গণে আজ গৌরব-তিলক—
বেদীতে তার জয়-মাল্য!
সার্থক তার দ্বার উদ্ঘাটন
সার্থক তার পূজা!
মানবতার মহান আদর্শে সমুজ্জ্বল
নব-বর্ষের সার্থকতম চিত্রার্ঘ্য!

মন্দির

এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্সের নিবেদন

কাহিনী : প্রণব রায়
পরিচালনা : ফণী বর্মা
সঙ্গীত : সুবল দাশগুপ্ত

শ্রেষ্ঠাংশে : চন্দ্রাবতী ও ছবি বিশ্বাস
অন্যান্য চরিত্রে : অহীন্দ্র, জহর, অমর, রবি, বুদ্ধদেব, মায়া প্রভৃতি।
—একযোগে চলিতেছে—

মিনার-বিজলী-ছবিঘর

(৩, ৬ ও ৮॥টা) (২, ৫ ও ৭॥টা)
অগ্রিম সিট রিজার্ভ করিবেন।

কণ্ট্রোল মূল্যে ফাউণ্টেনপেন



বিভিন্ন মনোরম রঙের ও আধুনিকতম ডিজাইনের ক্ষয়নিরোধক নিব ফিট করা, ইউ এস এ প্রস্তুত। প্রত্যেকেই সন্তোষলাভ করিবেন—ইহা গ্যারাণ্টী প্রদত্ত। মূল্য—গোল্ড প্লেটের নিব সহ ৪৸৹ টাকা, সুপিরিয়র ৫৷৷৹ টাকা, সর্বোৎকৃষ্ট ৭৲ এবং ১৪ ক্যাঃ নীরেট সোনার নিব সহ ৮৲ টাকা, মিডিয়াম—৯৷৷৹ টাকা ও সর্বোৎকৃষ্ট—১২৲ টাকা। সোয়ান পেন ১৩৷৷৹ টাকা, এভারশার্প ২৪৲ টাকা এবং গোল্ড ক্যাপসহ লাইফটাইম ৪৫৲ টাকা। ডাকব্যয় ৷৹ আনা। একসঙ্গে ৫০৲ টাকা বা ততোধিক টাকার অর্ডার দিলে শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ওয়াচ কোং পোষ্ট বক্স ৬৭৪৪ (ডি), কলিকাতা।

ঘর গোছানো

শ্রীবিভাস সেন

নিজের ঘরটা দয়া করে একটু গোছাও", মা বললেন, কি হয়ে রয়েছে ঘরটা, যেন একটা ডাস্টবিন; এ-ঘরে যে মানুষ থাকে, না দেখলে বিশ্বাস করা মুস্কিল। অর্থাৎ পরোক্ষে আমার মনুষ্যত্বের প্রতি একটু কটাক্ষপাত করলেন।

"কেন, ঠিকই তো আছে আমার ঘর" প্রতিবাদ করে ভেতরে ঢুকলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল টেবলটা। শেল্ফ থেকে একটার পর একটা বই এসে বহুদিন ধরে জমা হয়েছে টেবলের ওপরে। বই-খাতা, কাগজ-পেন্সিল সব জড়ো হয়ে সুউচ্চ স্তূপ গড়ে উঠেছে একটি। কতগুলো বই-খাতা বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে টেবলের ধার থেকে—একটু ছুঁলেই হুড়মুড় করে পড়ে যেতে পারে। টেবলক্লথটা ভীড়ের চাপের মধ্য থেকে সরে পড়বার চেষ্টায় অনেকটা বেরিয়ে মাটিতে ঝুলে রয়েছে। শেলফের বইয়ের সংখ্যা কমে যাওয়াতে বাকি বইগুলো পরম আরামে এ-ওর গায়ে হেলান দিয়ে আয়েসী আয়েসী ভাব করে পড়ে আছে। আলনায় খালি হ্যাংগারগুলো ঝুলছে, জামা-কাপড় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখি বেড-কভারটা তালগোল পাকিয়ে গেছে, বিছানা জুড়ে কতগুলো বই পড়ে রয়েছে, কিছু বন্ধ, কিছু আধখোলা। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটা উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ঘুরিয়ে দেখলাম গত মাসের পাতাটা ছেঁড়া হয়নি।

বসে পড়লাম হতাশ হয়ে। এ-ঘর গোছাবার চেষ্টা করার চেয়ে বাড়ি-বদল করা অনেক সোজা। সত্যি, সভ্যতার সংগে সংগে মানুষ যেসব অর্থহীন নিয়মকানুন বার করে স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করেছে, এই ঘর গোছানো তার মধ্যে একটি। ভেবে দেখুন তো আদি মানবদের জীবনযাত্রার কথা। থাকতো পাহাড়ের গুহার মধ্যে, আসবাব-পত্র, খুঁটিনাটির বালাই ছিল না, ঘর গোছানো কাকে বলে তাও জানতো না—কি একটা অপরিসীম শান্তি। আস্তে আস্তে মানুষ সভ্য হয়ে উঠলো—গুহা ছেড়ে তৈরী করল ঘর, আর সংগে সংগে এলো তার অভিশাপ—ঘর গোছানো। যখন মানুষ বুঝলো, কি সর্বনাশ সে স্বেচ্ছায় ঘটিয়েছে, তখন আর ফেরবার উপায় ছিল না। কোন্ অজানা পূর্বপুরুষের অবিমৃষ্যকারিতার ফল আজও আমাদের মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হচ্ছে। অসহ্য হয়ে উঠলে কেউ চীৎকার করে ওঠে—"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব-বেদুইন—", তাহলে ঘরেরই বালাই থাকতো না, ঘর গোছানোর হাত থেকে নিস্কৃতি পেতাম।

আজ পর্যন্ত যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁদের অনেকের ঘর না গোছানোর মহৎ অভ্যাস ছিল—ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেবে। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁদের বড় হবার প্রধান কারণই তাই। বড় হতে হলে বাঁধা নিয়মের বাইরে যেতে হয়, সাধারণ লোকে যা করে, তার বেশী কিছু করতে হয়। এই জন্য স্মরণীয় ব্যক্তিরা ঘর গোছাতেন না। গোছালে হয়তো সাধারণ লোকের সংগে তাঁরা মিশে যেতেন—ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম স্থান পেতো না, ঘর গুছিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটিয়ে দিতেন। ঘর গোছানোর চেয়ে বৃহত্তর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলেই তাঁরা বড় হতে পেরেছেন।

যাকগে সেসব কথা। ঘর গোছানোর ছোট-খাটো অসংখ্য অসুবিধাগুলোর কথাই একবার ভেবে দেখুন। ধরুন খাওয়া-দাওয়ার পর এক-খানা বই নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছেন। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে অথচ উঠে গিয়ে বইটা শেল্ফে রেখে আসতে হবে। কুঁড়েমি করে বইটা বিছানার ওপরে রাখলেন, কি অগোছালো হবার পথে পা বাড়ালেন। ঘুম থেকে উঠে ঠিক বইটা তুলে রাখতে ভুলে যাবেন, বইখানা আর শেল্ফে ফিরে যাবে না। কিন্তু আপনার ঘর যদি আগে থেকেই অগোছালো থাকে, তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত-মনে, বিবেকের কোন দংশন অনুভব না করে বইটা বিছানার বা মেঝের ওপর মেলে রাখতে পারেন। পরে যদি তুলে রাখবার কথা মনে পড়ে তো ভালই, ভুলে গেলেও কোন ক্ষতি নেই।

যা' আমরা সহজে পাই, তার দাম আমাদের কাছে কমে যায়, এরকম একটা তত্ত্ববাক্য আমরা প্রায়ই বলে থাকি। কিন্তু নিখুঁতভাবে গোছানো ঘরে কষ্ট করে খুঁজে কিছু বার করবার অবকাশ কোথায়। সমস্তই যেন নিতান্তই সহজলভ্য—হাতের কাছেই রয়েছে। এতে করে ঘরের আকর্ষণ কমে যায়। হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পেলে যে আনন্দ হয়, অ[illegible]সংগে সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত। সে আনন্দ পাওয়ার সুযোগ গোছানো ঘরে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এলোমেলো অগোছালো ঘরের প্রতিটি পরিচিত জিনিসও আপনাকে খুঁজে বার করতে হয়, প্রতিবারেই তাদের নতুন করে পাওয়া যায়। এ-আনন্দ বলে বোঝাবার নয়—অনুভব করবার।

একথা ভাববেন না যে, আমি সবাইকে ঘর-দুয়ার অগোছালো করে রাখতে পরামর্শ দিচ্ছি। অন্যের ঘর অগোছালো দেখলে আমার আনন্দের চেয়ে বিরক্তিই হয় বেশী; এটা খুবই স্বাভাবিক। আমরা নিজেরা যা' করি না অন্যকে তাই করতে উপদেশ দিয়ে থাকি—এই আমাদের স্বভাব। আপনার হয়তো প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার পর ঘুম লাগানো অভ্যাস। একদিন কোন কারণে ঘুমোলেন না, বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখলেন তিনি পরম আনন্দে ঘুমোচ্ছেন। অমনি তাঁকে ঠেলে তুলে বিশাল এক বক্তৃতা দিলেন দিবানিদ্রার অপকারিতা সম্বন্ধে। ডাঃ জনসন কোনদিন দুপুরের আগে বিছানা ছেড়ে উঠতেন না, অথচ তিনি সুযোগ পেলেই ভোরে-ওঠার উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন।

তবে বৈচিত্র্যের জন্য মাঝে মাঝে ঘর গোছানো মন্দ নয়। ঘরের বিশৃঙ্খলা যখন এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে, ঘরে রীতিমত স্থানাভাব হতে আরম্ভ করে, তখন কোন কোন দিন দৃঢ়সংকল্প করে ঘর গুছিয়ে ফেলি—মন্দ লাগে না প্রথম দু'একদিন। মাঝে মাঝে ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরে সাজগোজ করতে যেমন ভালোই লাগে। কিন্তু সারাদিনই যদি আপনাকে সেজে গুজে বসে থাকতে হয়, তাহলেই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। তেমনি গোছানো ঘরে খুব বেশীদিন থাকলে কেমন যেন হাঁপ ধরে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে গোছানো ঘর অগোছালো হয়ে থাকে। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি, ঘরের সেই পুরানো অবস্থা ফিরে এসেছে। সেই টেবলের ওপরে বইয়ের স্তূপ, বিছানা লণ্ডভণ্ড, জিনিস-পত্র ছড়ানো। তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি—মনে হয়, অনেকদিন পরে যেন বিদেশ থেকে নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

আর, বি, রোজ নস্য

প্রস্ফুটিত গোলাপ গন্ধে ভরপুর

ভি. পি. সমেত ২০ তোলা টিন ৩॥৵০

[illegible] পাল এণ্ড [illegible]

পোষ্ট বক্স নং ১০৮০৪. কলিকাতা—১।

কুম্ভকর্ণের আত্মীয়া

সম্প্রতি আলাস্কার এক খবরে জানা গেছে যে, সেখানকার কেচিক্যান অঞ্চলে মিসেস্ ফ্রেড ওয়েস্ট নামে এক ভদ্রমহিলা একদিন ঘুমের পর জেগে উঠে দেখেন যে তাঁর মাথার বালিশের ঠিক পাশেই পড়ে রয়েছে তাঁর ঘরের একটা মস্ত কড়ি। তিনি এমনই জবর ঘুম ঘুমিয়েছিলেন যে, অতবড় কড়িটা সশব্দে ভেঙে পড়া সত্ত্বেও তাঁর ঘুম ভাঙেনি বা তিনি কিছুই টের পাননি। এর ঘুমের বহর দেখে মনে হয় না কি যে ইনি কুম্ভকর্ণের আত্মীয়া?

নোট পুড়িয়ে আগুন পোহান

শীতের প্রকোপে মানুষ যে কতখানি বিপন্ন হতে পারে তার একটা উদাহরণ পাওয়া গেছে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পার্বত্য প্রদেশ ইডাহো থেকে। মিঃ বব্ হার্ট নামে সেখানকার এক শিকারী সম্প্রতি শিকার করতে গিয়েছিলেন বিটার রুট পর্বতে। পাহাড়ের ওপরে বরফ পড়ায় হঠাৎ তিনি একদিন এমন এক অবস্থায় পড়লেন যে, শীতে প্রায় জমে যাওয়ার উপক্রম, অথচ কাছে পিঠে আগুন জ্বালাবার মত কোনও কিছুই খুঁজে পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যে সব নোট ও আভাঙানো চেক ছিল, সেইগুলি একটির পর একটি জ্বালিয়ে সে আগুনের উত্তাপে কোনওমতে তাঁর দেহটাকে একটু গরম করে তুলে প্রাণে বাঁচলেন।

ক্রিপস্ সাহেবের দরদী বান্ধবী

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস যিনি সর্বদাই বৃটেন-বাসীদের রেশন ব্যবস্থায় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার জন্য আগ্রহান্বিত, সম্প্রতি তিনি এক বক্তৃতায় তাঁর দেশবাসীর দুঃখ কষ্টে সমবেদনা জানাতে গিয়ে নিজের দুরবস্থার কথা জানিয়ে বলেন যে, আমার বিছানার চাদর এমনই শত ছিন্ন অবস্থায় পরিণত হয়েছে যে, আমি প্রায়ই তাতে পা আটকে হোচট খেয়ে পড়ছি, অথচ এর কোনও বিহিত নেই। কণ্ট্রোলের অসুবিধা শুধু আপনাদের নয়—আমাদের সকলেরই।" তাঁর বক্তৃতায় এই কষ্টের কথা শুনে এক ভদ্রমহিলা তাঁকে একখানি চিঠি লিখে জানান যে, এ বিষয়ে তিনি তাঁকে সাহায্য করতে পারেন, কারণ মহিলাটি এমন একটি যায়গার সন্ধান জানেন—যেখান থেকে ৫ পাউন্ড দামে তিনি তাঁকে এক জোড়া বিছানার চাদর কিনে দিতে পারেন। ক্রীপস সাহেব মহিলাটির চিঠির আসল মর্মার্থ বুঝে জবাব দিয়ে জানিয়েছেন—"আমার চাদরগুলি যদিও জোড়াতালি দেওয়া তাহলেও তাতেই আমার চলে যাচ্ছে এবং এখনও নতুন এক জোড়া চাদরের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না।" আমাদের দেশেও যাঁরা রেশন ব্যবস্থা ও কণ্ট্রোলের কর্তা হয়ে বসেছেন, তাঁদের মুখেও মাঝে মাঝে ঐ রকম ব্যক্তিগত অসুবিধার বিজ্ঞাপনী শোনা যায়। এখন থেকে যখনই তা শুনবেন তখনই আপনারাও কালো-বাজারের কোথায় কোন্ জিনিসটি কত সস্তা দামে বিক্রী হচ্ছে সেটি তাঁদের চিঠি লিখে জানিয়ে দেবেন। তাতে আর কিছু না হোক তাঁরা বুঝবেন—এদেশে তাঁদেরও দরদী বন্ধুর অভাব নেই।



জাপানের রাজকুমার কেমন লেখাপড়া করছে!

আপনাদের আগেই জানিয়েছি জাপ সম্রাটের উত্তরাধিকারী যুবরাজ আকি হিটোকে গণতান্ত্রিক আদর্শে শিক্ষিত করে তোলার সব ব্যবস্থাই করেছেন জেনারেল ম্যাক আর্থার সাহেব। সে ব্যবস্থা কি রকম কার্যকরী হয়েছে কিভাবে যুবরাজ আকি হিটোর শিক্ষা চলছে—সেটা জানবার জন্য আপনারা কেউ আগ্রহান্বিত না হলেও যুক্ত-রাষ্ট্রের হর্তাকর্তারা সেটা জানতে চেয়েছিলেন। এর জবাবে যুবরাজের মার্কিন শিক্ষয়িত্রী এলিজাবেথ গ্রে ভাইনিং সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে টোকিওতে তাঁর প্রথম দু' মাসের কাজের বিবরণী পাঠিয়েছেন। তাঁর সেই বিবরণীর শেষের দিকের লাইনগুলির মধ্যে একটি লাইন আছে—'মনে হয় দীর্ঘদিন লাগবে।' অর্থাৎ যুবরাজ আহিটো খুব তাড়াতাড়ি যে গণতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারবেন তা তিনি মনে করেন না। এ ছাড়া মিসেস ভাইনিং আরও জানিয়েছেন যে, তিনি সপ্তাহে মাত্র একটি ঘণ্টার জন্য যুবরাজকে কাছে পান এবং হিরোশী কিকুচী নামক এক জাপানী অধ্যাপক যুবরাজকে ইংরাজী পড়ান এবং সপ্তাহের মোট ২৭টি পড়ার ঘণ্টার মধ্যে ৭টি ঘণ্টা তিনিই পড়ান। এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহে ৪ ঘণ্টা কাটে যুবরাজের জাপানী ভাষার পড়াশুনার ব্যাপারেই।" জাপানের যুবরাজের গণতান্ত্রিক শিক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হোক—এই কামনা না করেও কি এর পর আমরা থাকতে পারি।

স্বাক্ষর

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

আমার উন্নত শির
পাহাড় চূড়ার মত আকাশেরে ছুঁয়েছে একদা—
রক্তসমুদ্রের ঢেউ স্বপ্নের স্বাক্ষর রেখে গেছেঃ
শূন্যলোকে নীহারিকা পথ
বিচ্ছুরিত আলোক-লেখায়
দু'চোখের দৃষ্টি ছুঁয়ে গেছে।
ধ্যানের উন্নত লোকে বিদ্যুত ঝলক
প্রবাহিত হয়েছে কখনো—
আকাশ পাতাল শূন্য সে তড়িৎ বেগে
মিশে গেছে শিরায় শিরায়ঃ
ধমনীর রক্তে রক্তে বেজেছে বিপুল ঐক্যতান।
সেই অনুভূতি নিয়ে নেমেছি মাটিতে—
চৌমাথার মোড়ে দাঁড়ালেম—
জনস্রোতের ভিড়ে
আকাশের দৃষ্টি নামালেমঃ
দিগ্বিদিকে জয়ধ্বনি শুনি
রক্তসমুদ্রের ঢেউ যে স্বাক্ষর রেখে গেছে
তার সাথে তাই এনে বুনি।

দেশী সংবাদ

১৬ই ফেব্রুয়ারী—হিমায়েতপুরে (পাবনা) উত্তর বঙ্গ ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুত শশধর কর সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুত দেবনাথ দাস, শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—পাবনায় এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু বলেন যে, একতা, বিশ্বাস এবং আত্মত্যাগ—ইহাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। শ্রীযুত বসু আজাদ হিন্দ দলের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা বিবৃত করিয়া বলেন যে, সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা এবং সামরিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দল গঠন করার প্রয়োজন হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে সম্প্রদায়নির্বিশেষে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনই আজাদ হিন্দ দলের প্রধান কাজ।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অন্তর্বর্তী সরকারের যানবাহন সচিব ডাঃ জন মাথাই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম রেলওয়ে বাজেট পেশ করেন। বাজেটের উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ হইতে রেলের যাত্রীদের ভাড়া টাকা প্রতি এক আনা বৃদ্ধি করা হইবে এবং কয়েক প্রকার মালের মাশুল সামান্য বৃদ্ধি করা হইবে। ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট অনুযায়ী রেলওয়ের আয়ের উদ্বৃত্ত হইবে প্রায় ৭ কোটি টাকা।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব মিঃ মহম্মদ আলি বাঙলা সরকারের ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট পেশ করেন। উহাতে চলতি ও আগামী আর্থিক বৎসরে ১৪ কোটি টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছে। অর্থসচিব বলেন যে, বাজেটের আয় ব্যয়ের সমতা সাধনের উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিয়াছেন।

ভারত সরকারের অর্থসচিব অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বিল উত্থাপন করেন। এই বিল গৃহীত হইলে আধুলি ও সিকির মতই টাকাও নিকেল ধাতুতে তৈয়ারী হইবে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—মহাত্মা গান্ধী অদ্য নোয়াখালি জেলার দেবীপুর হইতে রওনা হইয়া ত্রিপুরা জেলার প্রথম গ্রাম আলুনিয়ায় উপনীত হন।

বাঙলা গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ১৪টি বিভিন্ন রকমের অর্ডিন্যান্স জারীর নিন্দা করিয়া ইতিপূর্বে জনৈক কংগ্রেস সদস্য যে সব প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সেগুলি ৭০—১১৮ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

কলিকাতা ট্রাম ধর্মঘট সম্পর্কে শ্রম মন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দিন আমেদ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ধর্মঘটী শ্রমিকদিগকে কাজে যোগদান করিতে অনুরোধ জানাইয়া বলেন যে, ট্রাম শ্রমিকগণ যদি সালিশী ব্যবস্থা অমান্য

সাপ্তাহিক সংবাদ

করিতেই থাকে, তবে ট্রাম কোম্পানী নূতন লোক নিয়োগ করিতে বাধ্য হইবে।

কলিকাতা নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রমিকদের কল্যাণকর বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। মিঃ এস এ ডাঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা সচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন যে, ন্যাশনাল মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক গবেষণা কার্যের জন্য অর্থ বরাদ্দ, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষার উন্নতি সাধন ও গণশিক্ষার উদ্দেশ্যে বেতার ও চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের শিক্ষা বিষয়ক কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত আছে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছে। আজ লাহোরে লাট ভবনের সম্মুখে দুইশত মুসলিম মহিলা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

২০শে ফেব্রুয়ারী—মহাত্মা গান্ধী অদ্য চরমায় (ত্রিপুরা) তাঁহার প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় প্রথম এই আভাস দেন যে, একান্ত অনিবার্য হইলে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের শেষ উপায়স্বরূপ স্থান ত্যাগ করা উচিত। মহাত্মাজী সকলকে এই পরামর্শ দেন যে, কেহ যেন ভীতি প্রদর্শনে বশ্যতা স্বীকার না করেন কিংবা স্থান ত্যাগ করিতে যে ক্ষতি হইবে গভর্নমেণ্ট যদি তাহা যথোপযুক্তভাবে পূরণ করিতে সম্মত না হন, তবে যেন কেহ নিজের বাড়ীঘর ছাড়িয়া যাইতে সম্মত না হন।

বালুরঘাটে সশস্ত্র পুলিশ ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে একজন স্ত্রীলোকসহ ১৫ জন ঘটনাস্থলেই নিহত এবং আরও বহু লোক আহত হইয়াছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী—রাষ্ট্রীয় পরিষদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে, ত্রিনিদাদ, বৃটিশ গায়েনা ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় অধিবাসীদের অবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট সদিচ্ছা মিশন পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী আজ চাঁদপুর থানার এলাকাধীন কমলাপুরে পৌঁছেন। কমলাপুর মহাত্মা গান্ধীর দ্বিতীয় পর্যায়ের সফর তালিকার পঞ্চদশ গ্রাম এবং তাঁহার ত্রিপুরা জেলায় সফর তালিকার চতুর্থ গ্রাম।

২২শে ফেব্রুয়ারী—এলাহাবাদে রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনীর সভাপতিত্বে ভারতের বিভিন্ন



অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে গান্ধীজী: রায়পুর গ্রামে গান্ধীজী একটি সার্বজনীন ভোজের রন্ধনাদির ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতেছেন।



বালুরঘাটের নিকটস্থ খানপুরে পুলিশের গুলীতে নিহত ব্যক্তিগণ। তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে এক জনতা পুলিশ দলকে আক্রমণ করে এবং পুলিশ গুলীচালনা করে।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকগণ এবং কংগ্রেস গঠনমূলক কর্মপ্রণালীর সংগঠনকারীদের তিনদিন ব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

গত নবেম্বর ও জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতা দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের যে গোপন বৈঠক হইয়াছে তাহার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশনের নিকট প্রায় ৬০০০ বিবৃতি পেশ করা হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক বিবৃতিতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ঘোষণার প্রশংসা করিয়া বলেন যে, উহা 'সুবিবেচনাপ্রসূত ও সাহসিকতাপূর্ণ' হইয়াছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—ঠাকুরগাঁওয়ের এক সংবাদে প্রকাশ, ধানতলা ইউনিয়নে কম্যুনিস্টদের সহিত সংঘর্ষের সময় পুলিশ গুলী চালায়। গুলীচালনার ফলে এক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং তাহার মাতা গুরুতর আহত হয়।

বিদেশী সংবাদ

১৮ই ফেব্রুয়ারী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছে যে, প্রশান্তমহাসাগরের জাপ ম্যাণ্ডেট প্রাপ্ত দ্বীপগুলিকে আমেরিকা নিজ নিরাপত্তার প্রয়োজনে দখলে রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর্নেস্ট বেভিন পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ প্যালেস্টাইন সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নিকট উত্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। তিনি বলেন যে, আরব ও ইহুদী উভয়ের পরস্পর বিরোধী মনোভাবের জন্যই প্যালেস্টাইন আলোচনা ফাঁসিয়া গেল।

২০শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য কমন্স সভার অধিবেশনে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ভারত সম্পর্কে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নীতি সম্বলিত হোয়াইট পেপার পাঠ করেন। উহাতে বলা হয় যে, বৃটিশ সরকার পরিষ্কারভাবে জানাইতে চাহেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করাই তাহাদের সুনিশ্চিত অভিপ্রায়। এই বিবৃতিতে যুদ্ধকালীন বড়লাট হিসাবে লর্ড ওয়াভেলের কার্যকাল অবসান এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্তরূপে লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের নাম ঘোষণা করা হইয়াছে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

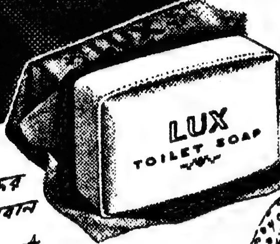
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ আসফআলী অদ্য নিউইয়র্কে পৌঁছেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী—ব্রহ্মের অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের ডেপুটী চেয়ারম্যান ইউ আউং সান অদ ফ্যাসী-বিরোধী স্বাধীনতা সঙ্ঘের সমর্থক এব বিরোধী দলের প্রতি এক আবেদন প্রচার করিয় বে-আইনীভাবে সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র কর্তৃপক্ষে নিকট জমা দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।





লাক্স
টয়লেট্ সাবানের
সাহায্যে এই হচ্ছে
স্বর্নলতার
নিয়মিত রূপ-চর্চ্চা



চিত্র-
তারকাদের
সৌন্দর্য্য-সাবান



স্বর্ণলতা জানেন যে তাঁর কমনীয় ত্বক্ মোলায়েম ও নিখুঁত রাখতে হলে ঠিক-মত যত্নের দরকার। আপনিও কি ত্বকের নিয়মিত যত্ন নেন? ৩০ দিনের জন্য এই সহজ রূপ-চর্চ্চা নিজে পরীক্ষা করে দেখুন—আপনি এই কোমল শুভ্র সাবা-নের স্নিগ্ধকর, সুগন্ধ পছন্দ করবেন, এবং এর ঘন ফেনা আপনার ত্বক্‌কে উজ্জ্বল, নির্ম্মল ও নবীন করবে। আপ-নার ত্বকের প্রয়োজনীয় যত্ন নিন—লাক্স টয়লেট্ সাবান মেখে প্রকৃত সৌন্দর্য্য চর্চ্চা করুন।

LTS. 151-50-40 BG — LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED

ধবল ও কুষ্ঠ

গাত্রে বিবিধ বর্ণের দাগ, স্পর্শশক্তিহীনতা, অঙ্গাদি স্ফীত, অঙ্গুলাদির বক্রতা, বাতরক্ত, একজিমা, সোরায়েসিস্ ও অন্যান্য চর্মরোগাদি নির্দোষ আরোগ্যের জন্য ৫০ বর্ষোর্দ্ধকালের চিকিৎসালয়

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আপনি আপনার রোগলক্ষণ সহ পত্র লিখিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপুস্তক লউন।

—প্রতিষ্ঠাতা—

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট হাওড়া।
ফোন নং ৩৫৯ হাওড়া।
শাখা: ৩৬নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।
(পূরবী সিনেমার নিকটে)

বিনা অস্ত্রে
চক্ষুছানি

ডিজল্স "আই-কিওর" (রেজিঃ) চক্ষুছানি এবং সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়। নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩৲ টাকা মাশুল ৷৵০ আনা।

কমলা ওয়ার্কস (দ) পাঁচপোতা, বেঙ্গল।

বাংলা সাহিত্যে অভিনব পদ্ধতিতে লিখিত রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ গ্রন্থমালা

শ্রীপ্রভাকর গুপ্ত সম্পাদিত

১। ভাস্করের মিতালি মূল্য ১৲
২। দুয়ে একে তিন " ১৷০
৩। সুচারু মিত্রের ভুল " ১৲
৪। দুই ধারা " ১৲
৫। হারাধনের দশটি ছেলে " ১৲

প্রত্যেকখানি বই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক আপনার পাঠাগারের জন্য শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বুকল্যাণ্ড লিমিটেড

বুক সেলার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স
১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ৪০৫৮.

পি, সি, দাস এণ্ড সন্স সুবাসিত তরল আলতা

শত বৎসরের সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রসাধন

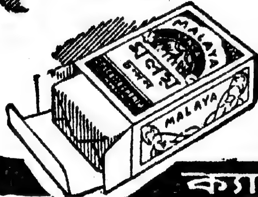
এ, পি, দাস এণ্ড কোং ৭, অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড ১নং বর্ম্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সূচীপত্র

এই বিশুদ্ধ দেবভোগ্য চন্দন সাবানের গুণে দেহ-কান্তি উজ্জ্বল হয়। ইহা সুগন্ধ, সুন্দর, প্রীতিপ্রদ ও আনন্দময় অঙ্গরাগ।



মলয়
চন্দন সাবান
ক্যালকাটা কেমিক্যাল

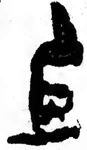
কণ্ট্রোল মূল্যে ফাউণ্টেনপেন



বিভিন্ন মনোরম রঙের ও আধুনিকতম ডিজাইনের ক্ষয়নিরোধক নিব ফিট করা, ইউ এস এ প্রস্তুত। প্রত্যেকেই সন্তোষলাভ করিবেন—ইহা গ্যারাণ্টী প্রদত্ত। মূল্য—গোল্ড প্লেটের নিব সহ ৪৬০ টাকা, সুপিরিয়র ৫।।০ টাকা, সর্বোৎকৃষ্ট ৭, এবং ১৪ ক্যাঃ নীরেট সোনার নিব সহ ৮, টাকা, মিডিয়াম—৯।।০ টাকা ও সর্বোৎকৃষ্ট—১২, টাকা। সোয়ান পেন ১৩।।০ টাকা, এভারশার্প ২৪, টাকা এবং গোল্ড ক্যাপসহ লাইফটাইম ৪৫, টাকা। ডাকব্যয় ৸০ আনা। একসঙ্গে ৫০, টাকা বা ততোধিক টাকার অর্ডার দিলে শতকরা ১৫, টাকা কমিশন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ওয়াচ কোং পোষ্ট বক্স ৬৭৪৪ (ডি), কলিকাতা।

স্বাস্থ্য ভাল রাখার পক্ষে প্রথম আবশ্যক



রক্তই জীবন-নদীর স্রোতস্বরূপ; ভাল স্বাস্থ্যের ইহাই গোড়ার কথা, রক্ত হইতে দূষিত পদার্থসমূহ নিঃসারিত করিয়া রক্ত পরিষ্কার রাখা সকলকারই প্রয়োজন।



ক্লার্কের ব্লাড মিকশ্চার রক্ত পরিষ্কার করার ব্যাপারে পৃথিবী খ্যাত এক অপূর্ব সামগ্রী। বাত, বিখাউজ, ফোড়া, ঘা ও রক্ত দুষ্টির অনুরূপ সমস্ত ক্ষেত্রে ইহা অনায়াসেই ব্যবহার করা যাইতে পারে।



সমস্ত ষ্টোরে তরল বা বাটিকাকারে পাওয়া যায়।

সতীশ কবিরাজের
শ্বাসারি
হাপানি ও ব্রঙ্কাইটীসে

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ
নিরাময়কারী মহৌষধ

১ দাগ খাইলে কমে
১ শিশিতে আরোগ্য

মূল্য—প্রতি শিশি ১৷৷০
ডাক মাশুল ৷৵০

সর্বত্র বড় বড় দোকানে
পাওয়া যায়।

কবিরাজ
এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড সন্স

আর, বি, রোজ নস্য

প্রস্ফুটিত গোলাপ গন্ধে ভরপুর
ভি পি সমেত ২০ তোলা টিন ৩॥/০
সুশীলকুমার পাল এণ্ড ব্রাদার্স,
পোষ্ট বক্স নং ১০৮০৪ কলিকাতা—১।

শ্বাস অর্থাৎ হাঁপানি কাসির দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহৌষধ। ইহা দুই দিন মাত্র সেবন করিতে হয়। মৃতপ্রায় রোগীর ইহাই একমাত্র প্রাণদাতা। মূল্য ডাকব্যয়-সহ ২৸৵০। কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী। পত্রাদির ঠিকানা—পুলশিটা, মেদিনীপুর। শাখা—৬নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এম্ব্রয়ডারী মেশিন

নূতন আবিষ্কৃত। কাপড়ের উপর সূতা দিয়া অতি সহজেই নানা প্রকার মনোরম ডিজাইনের ফুল ও দৃশ্যাদি তোলা যায়। মহিলা ও বালিকাদের খুব উপযোগী। চারটি সূচ সহ পূর্ণাঙ্গ মেশিন—মূল্য ৩, ডাক খরচা ॥৵০। ডীন ব্রাদার্স; আলীগড়, নং ২২।



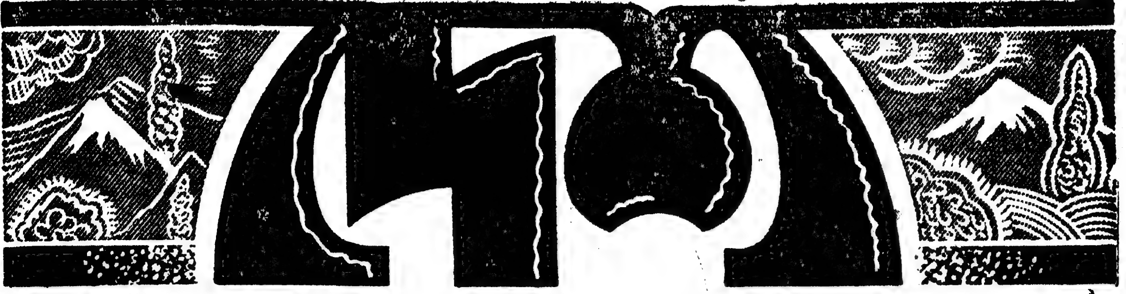
অবগাহন ব্যতীত প্রকৃত স্নান বা স্নানের প্রকৃত তৃপ্তি মেলে না—এ ধারণা আমাদের মনে বহুদিন থেকে বদ্ধমূল। দুঃখের বিষয়, এ যুগের শহরের বাসিন্দাদের ভাগ্যে এই রকম স্নানের সুযোগ বা অবসর মেলে কই? তবে ভালো সাবান দিয়ে গাত্রমার্জনা করে প্রচুর জল ঢেলে স্নান করতে পারলে সেই পরিতৃপ্তি যে মেলে না এমন নয়। আর 'রেণু' এমনই একটি ভালো সাবান যা মাখলে স্নানের আনন্দ সত্যিই বেড়ে যায়—'রেণু'-র সুগন্ধী সুপ্রচুর ফেনরাশি শরীরের প্রতিটি রোমকূপ সুপরিষ্কৃত করে স্নানের প্রকৃত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ এনে দেয়। 'রেণু' সহজলভ্য ও সুলভ।



সোল সেলিং এজেন্টস : হিন্দুস্থান মার্কেণ্টাইল কর্পোরেশন লিঃ, ৭৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

SRK 3

সোল সেলিং এজেন্টস :—ওরিয়েণ্টাল মার্কেণ্টাইল কোম্পানী লিমিটেড, ৩৬এ ও বি, প্রতাপাদিত্য রোড কলিকাতা, ফোন নং সাউথ ৮৬৪ (২ লাইন)



সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৫৩ সাল। Saturday, 8th March, 1947 [১৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙলার সমস্যা ও তাহার দায়িত্ব

বাঙলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ গত ১৭ই ফাল্গুন কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ বণিক সভার বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের আসন্ন অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বাঙলার গভর্নর তাঁহার এই বক্তৃতায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত-ত্যাগের সংকল্প স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তিনি শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন আসন্ন এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর ঘোষণার প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে পরিবর্তিত অবস্থায় নূতন ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের পূর্ণ সুযোগ থাকিবে। অবশ্য এই পূর্ণ সুযোগ বলিতে স্যার ফ্রেডারিক কি বুঝিয়াছেন, আমরা বলিতে পারি না, তবে আমাদের সত্যের খাতিরে একথা বলিতে হইতেছে যে, শ্বেতাঙ্গ বণিক সমাজ প্রায় দুইশত বৎসরকাল তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্প্রসারণে এদেশে যে সুযোগ পাইয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতেও তাঁহারা সেই সব সুযোগ উপভোগ করিবেন, এইরূপ আশা করা তাঁহাদের পক্ষে একান্তই দুরাশা মাত্র। কারণ ভারতের স্বার্থকে স্বজাতীয় শাসকদের নিয়ন্ত্রিত শোষণ-নীতিতে নির্মমভাবে পিষ্ট করিয়াই তাঁহারা ঐসব সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বিদেশী বণিকদের সেই সব স্বার্থ-সুবিধা অব্যাহত রাখিতে গেলে কোন দিক হইতেই এদেশের অর্থনীতির উন্নতি ঘটা সম্ভব নয়। স্যার ফ্রেডারিক এদেশের কৃষিসম্পদের উপর তাঁহার বক্তৃতায় জোর দিয়াছেন; কিন্তু শিল্প-সাধনার উন্নয়ন ব্যতীত কোন জাতিই বর্তমান জগতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না; সুতরাং যতদিন পর্যন্ত এদেশের যন্ত্রশিল্প-সাধনার সম্প্রসারণ না ঘটিতেছে, ততদিন পর্যন্তই শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশীর সাহায্য আমাদের পক্ষে প্রয়োজন; কিন্তু এই সাহায্য লাভের দায়ে আমরা কিছুতেই বিদেশীর কাছে দাসখত লিখিয়া দিব না কিংবা সেই সংযোগ-সূত্রে দুরভিসন্ধিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার প্রভাবে বিদেশীরা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বনাশ সাধন করিবে, ইহাও সম্ভব হইতে দিব না। বাঙলার গভর্নর আমাদিগকে এই উপদেশ-বাণী শুনাইয়াছেন যে, অতীতে সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতাতেই এই প্রদেশের সমাজ-জীবন সংস্কৃতির ভিত্তিতে সুগঠিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও সেইরূপ সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতার পথেই বাঙলা দেশের সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইবে। গভর্নর আমাদিগকে এ সত্যও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, "বাঙলার প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের স্বার্থ এত ঘনিষ্ঠ ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, হয় তাহারা একসঙ্গে বাঁচিবে অথবা একসঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ইত্যাদি। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ বণিক-সমাজই এতকাল ক্রমাগতভাবে বাঙলা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথে প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে এবং নিজেদের হীন জঘন্য স্বার্থের দায়ে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে বাঙলার সমাজ-জীবনে ভেদ-বিভেদের বিষ ছড়াইতে সকল রকমে সাহায্য করিয়াছে। গভর্নর বক্তৃতা করিবার সময় সে জ্বলন্ত সত্যটি নিশ্চয়ই বিস্মৃত হন নাই কিংবা জাতিগত স্বার্থ-সম্পর্কের সুদৃঢ় সংস্কারই তাঁহাকে এই সত্যটি বিস্মৃত করাইয়াছে। নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় নিতান্ত নিষ্ঠুর এবং নির্লজ্জভাবে এদেশে সাম্প্রদায়িকতা দুর্নীতি চালাইয়াছে। একজন ব্রিটিশ গভর্নরের মুখে তাহাদিগকে বাঙলার সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে প্রযত্নপর হইতে উপদেশ প্রদান আমাদের কানে একান্ত আন্তরিকতাবিহীন অভিনয়-রূপেই ধরা পড়িয়াছে। স্যার ফ্রেডারিকের বক্তৃতায় দেখা যায়, বাঙলার সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক উপদ্রব এবং অশান্তির দায়িত্ব হইতে তিনি নিজকে এড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এক্ষেত্রেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দোহাই দিয়াছেন এবং শাসন-নীতি পরিচালনে মন্ত্রীদের যে সর্বতোময় কর্তৃত্ব রহিয়াছে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই ধরণের যুক্তিতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। কলিকাতা, নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের বর্বর এবং দানবীয় দৌরাত্ম্যের কথা আমরা ভুলিতে পারি না। স্যার ফ্রেডারিক আজ কোন্ মুখে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহিমা প্রচার করিতেছেন আমরা বুঝি না। কলিকাতা এবং নোয়াখালির বীভৎস এবং পাশব তাণ্ডব লীলার সময় সে সম্প্রীতি বজায় রাখিবার জন্য তাঁহার বিবেকে যে কিছুমাত্র বেদনা জাগিয়াছিল, আমরা তেমন কোন পরিচয়ই পাই নাই। বস্তুত এই দৌরাত্ম্য যদি শ্বেতাঙ্গ সমাজকে কোনক্রমে স্পর্শ করিত, তবে তিনি নিশ্চয়ই নিয়মতান্ত্রিক গভর্নরের ভূমিকায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। ফ্রেডারিক বাঙলার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে এক্ষেত্রে নির্মমভাবেই উপেক্ষা করিয়াছেন এবং কার্যত তাঁহার উপেক্ষার ফলে বাঙলায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি-উপদ্রবের পথ অবাধ এবং উন্মুক্ত হইয়াছে। তথাপি বাঙলা দেশের দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের সঙ্গেই তাঁহার সম্পর্ক সমভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ রহিয়াছে, তাঁহার এমন দাবী কোন মূর্খও সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া লইতে

পারিবে না। প্রকৃতপক্ষে স্বার্থের দায় বড় দায় এবং বাঙলা দেশের সর্ববিধ সমস্যার সঙ্গে ব্রিটিশ জাতির স্বার্থের দায়ই জড়িত রহিয়াছে। স্যার ফ্রেডারিক বাঙলার সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, "আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বাঙলার সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে।" আমরা তাঁহার এই উক্তির গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করি এবং আমরা ইহাও জানি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মরণ কামড় এই বাঙলার উপরই আসিয়া পড়িবে। ইংরেজের শোষণ-স্বার্থই ইহার মূলে রহিয়াছে। সুতরাং স্বাধীনতা-লব্ধ ভারত ব্রিটিশ বণিক-দিগকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিধাদানের বেলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে এবং আগে তাহাদের বিষদাঁত ভাঙিয়া দিবে; ইহা সুনিশ্চিত।

বিহারে মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী কিছুদিনের জন্য নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা পরিভ্রমণ স্থগিত রাখিয়া গত মঙ্গলবার বিহারে গমন করিয়াছেন। গান্ধীজীকে নোয়াখালি হইতে সরাইবার জন্য বাঙলার লীগদল বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিল। মৌলবী ফজলুল হক এই বীর-ব্রত পালন করিয়া লীগের সভাপতির আসনে সমারূঢ় হইবেন, আশায় আছেন। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী ও প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙলার লীগ-সেরের সঙ্গে পাল্লা দিবার দায়ে কিছুদিন হইতে সেই সুর ভাজিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে হক সাহেব সম্প্রতি হৈমচরে গিয়া গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন। তাঁহাদের সাক্ষাৎকার এবং আলোচনার পরদিনই মহাত্মাজীর বিহার পরি-ভ্রমণে গমনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। হকসাহেবের সঙ্গে গান্ধীজীর কি আলোচনা হয়, সংবাদপত্রে সে সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত বিবৃতি প্রকাশিত হয় নাই। হকসাহেব নিজেও এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত মনের কথা খুলিয়া বলেন নাই; সম্ভবত নিজের সুবিধার উপযোগী সময়ের জন্য তিনি এতৎসম্পর্কিত তাঁহার স্বভাবসুলভ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে উদ্দীপ্ত স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা-ভাষ্য প্রদান স্থগিত রাখিয়াছেন। সময় বুঝিয়া তিনি সে চাল চালিবেন। কিন্তু বাঙলার লীগ-নীতির এই সব কুটিল এবং গূঢ় গতি গান্ধীজীকে তাঁহার সংকল্প হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি সত্য-সংকল্প পুরুষ। সুবিধাবাদী লীগ-নেতাদের স্বার্থান্ধ নীতি তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, ইহা পূর্বেই বুঝা গিয়াছিল। মহাত্মাজী দৃঢ়তার সহিতই বলিয়াছেন যে, তিনি কাহারও হুকুমে বিহারে যাইতেছেন না। মানব-সেবার কর্তব্যে প্রণোদিত হইয়া গান্ধীজী নোয়াখালিতে যান এবং সেইরূপ কর্তব্যের প্রেরণাতেই তিনি বিহারে গমন করিয়াছেন। গান্ধীজী স্পষ্ট ভাষাতেই একথা বলিয়াছেন যে, নোয়াখালিতে তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এখনও উদ্যাপিত হয় নাই। তিনি সম্ভবত একপক্ষ কাল পরেই বিহার হইতে ফিরিয়া প্রারব্ধ ব্রত উদ্যাপনে প্রবৃত্ত হইবেন। সম্প্রতি চাঁদপুর মহকুমা হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নারী-হরণ, গৃহদাহ এবং লুণ্ঠন প্রভৃতির যেসব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতেই গান্ধীজীর এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। বলা বাহুল্য, এই সব অত্যাচার আকস্মিক ব্যাপার নহে এবং সম্প্রদায়-বিশেষের এ সব উপদ্রবকারীকে সংযত করা গভর্নমেণ্টের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপারও কিছু নয়। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্রভাবশালী একদল সাম্প্রদায়িকতাবাদী এই সব ব্যাপারের পিছনে আছে। তাহারা নিজেদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই উপদ্রবকারীদিগকে আগলাইয়া রাখিয়াছে এবং নানাভাবে তাহাদিগকে ভেদ-বিদ্বেষে প্ররোচিত করিতেছে। বাঙলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডল সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত; এজন্যই বিশেষ সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদিগকে কঠোরভাবে দলন করিতে তাঁহারা সাহসী হইতেছেন না। পাকিস্থানী নীতির ইহাই অনিবার্য পরিণতি। হক সাহেবের মতে পাকিস্থানে প্রকৃতপক্ষে সাম্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি সেদিন হৈমচরে গান্ধীজীর কাছে মুসলিম শাস্ত্রানুশাসন উদ্ধৃত করিয়া এই আশ্বাস প্রদান করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু পাকিস্থানী নীতির সমর্থক লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের শাসনে কয়েক বৎসর থাকিয়া আমরা তেমন ধারা শাস্ত্র-বচনের সার্থকতা হাড়ে হাড়েই উপলব্ধি করিতেছি। বস্তুত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে নির্মমভাবে উপেক্ষা এবং কার্যত তাহাদের স্বার্থের ক্ষতিসাধন করার উপরই লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি নির্ভর করিতেছে। বাঙলার অর্থসচিব মিঃ মোহম্মদ আলী সেদিন বাজেট বরাদ্দে হিন্দু স্বার্থরক্ষায় মন্ত্রিমণ্ডলের উদাসীনতার সম্পর্কে অভিযোগের উত্তরে একথা স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোটের জোরে তাঁহাদের মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে; সুতরাং লীগের নীতি বাজেটে প্রতিফলিত হইবেই—অন্য কথায় বাঙলার অর্থসচিব ইহাই বলিয়াছেন যে, মুসলমান স্বার্থ এবং হিন্দুর স্বার্থকে পৃথক্-ভাবে বিচার করিয়াই বাঙলার বর্তমান মন্ত্রি-মণ্ডলের অর্থ বণ্টনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কার্যত এই বিচারে কোন পক্ষের স্বার্থ তাঁহাদের পক্ষে বড় হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এইভাবে শাসন-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাঙলার রাজনীতিক এবং সমাজ-জীবনকে বর্তমানে সর্ববিধ দুর্নীতিতে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে এবং শাসন-নীতিতে মানবোচিত উদারতার অবসর আর রাখিতেছে না। মানব-বিরোধী এই দুর্নীতি-জাল হইতে বাঙলাকে রক্ষা করিবার পবিত্র ব্রতে গান্ধীজী আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি অচিরেই বিহার ভ্রমণ সম্পন্ন করিয়া নোয়াখালিতে প্রত্যাবর্তন করিবেন জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

লীগ মন্ত্রীদের ধাপ্পাবাজি

কলিকাতা এবং নোয়াখালি-ত্রিপুরার ব্যাপক অরাজকতায় বাঙলার গভর্নমেণ্টের পুলিশ বিভাগের চূড়ান্ত অকর্মণ্যতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীই সে সময় পুলিশ বিভাগের কর্তা ছিলেন। এখন তাঁহার পরিচালনাধীনে বাঙলার পুলিশ বিভাগ এদেশের কৃষক আন্দোলন দমনে রুদ্র মূর্তি ধারণ করিয়াছে। কিছুদিন হইল দিনাজপুর জেলার পল্লী অঞ্চল হইতে ক্রমাগত কয়েকটি স্থানে পুলিশের গুলী চালনার সংবাদ আসিয়াছে। সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে আন্দোলনকারীদের চক্রান্তের উপর পুলিশ বিভাগের এই কঠোর নীতি অবলম্বনের দায়িত্ব চাপাইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা প্ররোচিত করিবার জন্য লীগের দল হইতে যে সময় ক্রমাগত চক্রান্ত চলিতেছিল বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি সে সময় সেই সব আন্দোলনকারীর উপর সরোষে আপতিত হয় নাই। পক্ষান্তরে লীগ নীতির আনুগত্যে প্রেমাশ্রু উদ্গত হইয়া তাঁহার দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়াছে। কিন্তু আজ দেখিতেছি, কৃষক আন্দোলন দমনে তাহা আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণ-শঙ্কর রায় পূর্ববঙ্গ, বিশেষভাবে ঢাকা জেলার পল্লী অঞ্চলে চাউলের মহার্ঘতার প্রতি বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে সুরাবর্দী সাহেব একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠেন। সুরাবর্দী সাহেবের যুক্তি এই যে, বাঙলার কোথায়ও চাউলের মহার্ঘতা দেখা দেয় নাই কিংবা অন্নকষ্টের কারণ ঘটে নাই। শুধু কংগ্রেসীরাই মিথ্যা আন্দোলন পাকাইয়া তুলিতে চায়। কিন্তু মিঃ সুরাবর্দীর এই উক্তি কতদূর অসত্য, পূর্ববঙ্গের ঘাটতি অঞ্চলের কয়েকটি স্থানের চাউলের বর্তমান দরের হিসাব লইলেই তাহা স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। বস্তুত মিঃ সুরাবর্দী

তাঁহার যুক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য কোন হিসাব উপস্থিত করেন নাই। শুধু বাঙলা দেশের শস্যের অবস্থা ভাল এবং অন্নকষ্টের কোন কারণ নাই এই এক কথার উপরই জোর দিয়াছেন। কিন্তু মিঃ সুরাবর্দীর এই ধরণের কথায় আমরা একটুও আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। গত ১৯৪৩ সালেও আমরা মন্ত্রীদের মুখে এই ধরণের ভ্রান্ত আশ্বস্তিপূর্ণ উক্তি শুনিয়াছিলাম এবং মিঃ সুরাবর্দীই তখন অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কর্তা ছিলেন। সে ক্ষেত্রে সুরাবর্দী সাহেবের কৃতিত্ব বাঙলাকে বাঁচাইতে পারে নাই; পক্ষান্তরে বাঙলা দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ঘাটতি অঞ্চলে দ্রুতগতিতে খাদ্য চালান দিবেন এবং রেশনিং পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিবেন, আমাদিগকে এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু পক্ষাধিককাল পূর্বে বাঙলার খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ হার্টলীও আমাদিগকে এতদ্বিধ আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন; অথচ তাহা সত্ত্বেও অবস্থার কোনরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই বরং অবস্থার অবনতিই ঘটিতেছে। পূর্ববঙ্গের ঘাটতি অঞ্চলে অনেক স্থানেই চাউলের মূল্য ২৫্ টাকার কম নয়; বিশেষভাবে ঢাকা জেলায় এবং ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমায় চাউলের মূল্য মণকরা ইহার মধ্যেই ৩০্ টাকার উপরে উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় শুধু মন্ত্রীদের মুখের কথায় কিংবা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঁহাদের আক্রোশ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াই দেশের লোকে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। বাঙলার সর্বত্র চাউলের মূল্য অবিলম্বে যাহাতে হ্রাস পায় মন্ত্রীরা তেমন ব্যবস্থা করুন, বস্তুত অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের উপর দেশের লোকে একান্তভাবেই আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহারা বুঝিয়াছে যে, উপদলীয় স্বার্থ সিদ্ধি করা এবং স্বজন-পোষণ ব্যতীত ইঁহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

ভারত সরকারের বাজেট

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ কেন্দ্রীয় পরিষদে নূতন বৎসরের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। মিঃ লিয়াকৎ আলীর উপস্থাপিত বাজেটে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থসচিব বলিয়াছেন, ভারতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান, তিনি বাজেট রচনা কালে তাহা সর্বদা স্মরণ রাখিয়াছেন। বস্তুত লবণ কর উঠাইয়া লওয়াতেই এ পরিচয় পাওয়া যায়। বহু আন্দোলন সত্ত্বেও এদেশের আমলাতন্ত্র জাতীয়তাবিরোধী জিদ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কোনক্রমেই এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। আজ অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্টের প্রথম বাজেটে সেই দাবী স্বীকৃত হইল। বাজেটের অপর প্রধান দ্রষ্টব্য হইল এই যে, অতঃপর প্রস্তাবে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর লাগিবে না; অথচ বর্তমানে দুই হাজার টাকার উপরে আয়ের অঙ্ক উঠিলেই আয়কর দিতে হয়। এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই পরিবর্তনে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবেন সন্দেহ নাই। বাজেটের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য অর্থসচিব কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে চায়ের উপর পাউণ্ড প্রতি দুই আনার স্থলে রপ্তানি শুল্ক চার আনা করা হইবে এবং যে সকল ব্যবসায়ীর আয় লক্ষ টাকার অধিক, তাহাদিগকে শতকরা ২৫্ টাকা হিসাবে কর দিতে হইবে। ইহা ছাড়া কর্পোরেশনের ট্যাক্স এক আনা হইতে বাড়াইয়া দুই আনা করা হইবে এবং মূলধনের উপর ক্রম-বর্ধমান হারে ট্যাক্স ধরা হইবে। মিঃ লিয়াকৎ আলীর বাজেটে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য হইবে তাহা এই যে, তিনি দীর্ঘকালের ব্যাপক ও সম্ভাবনাপূর্ণ কোন শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা লইয়া সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হন নাই। তিনি দরিদ্রের সম্প্রতিক দুঃখ-দুর্দশাকে লাঘব করিবার দিকেই সর্বাধিক দৃষ্টি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহার এই নীতির সমীচীনতা উপলব্ধি হইবে। সরকারী বিভাগের বেহুদা ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য অর্থসচিব একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতের শাসন বিভাগের বেহুদা ব্যয়, বিশেষভাবে মোটা বেতনের উপরওয়ালা পুষিবার দুর্নীতি জগতের মধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, মিঃ লিয়াকৎ আলী, গরীবের অর্থের এই অপব্যয়ের প্রতিকার সাধনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

পাঞ্জাবের সমস্যা—

স্যার খিজির হায়াৎ খাঁ পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়া মুসলিম লীগকে সেখানে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। মুসলিম লীগের সঙ্গে স্যার খিজিরের আকস্মিক এই প্রীতি এবং তাঁহার সতীর্থ মন্ত্রীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ এই কাপুরুষোচিত নীতির মূলে কি রহিয়াছে, কয়েক দিনের মধ্যেই তাহা উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। তবে মনে হয়, পাঞ্জাবের গভর্নর এবং সেখানকার ব্রিটিশ সিভিলিয়ানবর্গ এই কার্যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। বস্তুত ভারত শাসন ব্যাপারে সামরিক দিক হইতে পাঞ্জাবের একটা গুরুত্ব রহিয়াছে। বাঙলা এবং পাঞ্জাব এই দুইটির উপরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চিরদিনের নজর দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় রাষ্ট্র-নীতির আসন্ন পরিবর্তনের মুখে পাঞ্জাবে লীগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার এই চক্রান্তের মূলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দল এবং প্রগতিবিরোধী পাকিস্থানীরা একযোগে কার্য করিতেছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, সিন্ধু, বাঙলার সঙ্গে পাঞ্জাব এবং আসামকে তাহারা সমান লক্ষ্যে লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবের কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলের এইভাবে পতন ঘটাইলেও সেখানে লীগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা তেমন সহজ হইবে না। ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে যোগ দিয়া দুর্নীতির কারসাজি খেলিতে লীগওয়ালাদের ওস্তাদি আছে। সিন্ধুতে আমরা এই খেলার ঘৃণ্য এবং নির্লজ্জ পরিচয় পাইয়াছি জানি, পাঞ্জাবেও সেই খেলা সুরু হইবে কিন্তু শিখেরা জীবন্ত জাতি। তাহাদিগকে বশে আনা সহজ হইবে না। শিখদিগের দাবীকে দাবাইয়া পাঞ্জাবে পাকিস্থানী দৌরাত্ম্য উস্কাইয়া তুলিতে গেলে সেখানে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। শিখ জাতি ভারত বিভাগের দাবী কিছুতেই মানিবে না; সুতরাং স্যার খিজির হায়াতের এই পদত্যাগে লীগ মহলের আনন্দ ও উল্লাসের অতিমাত্র উচ্ছ্বাসকে আমরা অসময়োচিত অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। বস্তুত পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট দলের সদস্যেরা সকলে যদি লীগ পক্ষে যোগদান করেন, তাহা হইলেও সেখানকার পরিষদে লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘটে না। প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে লীগ দলের এই কূটনীতির খেলার প্রতিক্রিয়া ভারতের আসন্ন রাজনীতির উপর বলিষ্ঠ প্রেরণার সঞ্চার করিবে এবং তাহা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাতে অন্ধ বিবেক-বিমূঢ় লীগওয়ালাদের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলনে যথেষ্ট রকম সাহায্য করিবে বলিয়াই আমরা মনে করি। সুতরাং আশা ভিন্ন এই ব্যাপারে নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই।

ব্রিটিশের বিদায় বাদ্য

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন একপক্ষকাল পূর্বে ভারতে আসিতেছেন। তাঁহার থলিয় ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের কোন্ গোপন-প্র... আছে, আমরা এখনও বলিতে পারি না; তবে শুনিতেছি, স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যে ব্রিটেনের সন্ধিপত্রের খসড়া ভারতের এই বড়লাটে সঙ্গে আসিতেছে। ইহাও শোনা যাইতেছে যে, তিনি আসিয়া ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ সেনা অপসারণের ব্যবস্থা করিবেন এবং আগামী গ্রীষ্মকাল হইতেই ভারতবর্ষের উপকূল ভাগ হইতে ইংরেজ সেনা লইয়া বিলাতের দিকে জাহাজ ছাড়িবে। বলা বাহুল্য ব্রিটিশ শাসকবর্গ এবং তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ দল যদি এইরূপ সুবোধের মতই ভারত ছাড়িয়া যান, তবে আমরাই সর্বাগ্রে তাহাদিগকে বিদায় অভিবাদন জ্ঞাপন করিতে উদ্যোগী হইব।



হৈমচর গ্রামে প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী। এইখানে গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত হয়

কমলাপুর গ্রামে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় মহিলাদের সমাবেশ



হৈমচর গ্রামে গান্ধীজী কর্তৃক চাঁদপুরের প্রভাবতী সঙ্ঘ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পরিদর্শন

হৈমচরে উৎকল কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী ও অন্যান্য মহিলাগণ কর্তৃক গান্ধীজীর সম্বর্ধনা

বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাঁর সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, বৃটিশরা ১৯৪৮ সালের জুন মাস নাগাদ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবেন। "জুন মাসটা



...খানে ভরা বর্ষা নামিবে, তল্পিতল্পা গুটাইতে ...সুবিধা হইবে অনেক, তার আগেই একটা ...ল দিনক্ষণ দেখিয়া চলিয়া গেলে হয় না"—...লেন বিশুখুড়ো।

* * * *

রক্ষণশীল দলের পার্লামেন্টের সভ্য মিঃ ব্রেথওয়েট "কুইট ইণ্ডিয়া" প্রসঙ্গে ...লয়াছেন—"আমরা বৃটিশের পতাকা ...বনমিত হইতে দিব না—Until we ...e satisfied that something ...tter is hoisted in its place. খুড়ো ...টার উপর মন্তব্য করিলেন—"ত্রিবর্ণ ...াকাটি আপাততঃ মোটা খদ্দরের কাপড়েই ...রি বটে, তবে মিঃ ব্রেথ্ওয়েট-এর যদি ইহাই ... হয় তবে আমরা ঢাকাই মসলিনের পতাকা ...ইতে রাজী আছি, আশা করি এটি তাঁর ...ে "better" পতাকা বলিয়াই গণ্য হইবে!

* * * *

...GHA KHAN offers his services in the External Affairs Department. ...টি খবর। মহামান্য আগা খাঁ ... এ সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরুর মতামত ...নিতে চাহিয়াছেন। পণ্ডিতজী কি সিদ্ধান্ত ...বেন জানি না, আমরা আগা খাঁর কৃতিত্ব ...ন্ধে নিঃসন্দেহ, তবে ভয় হইতেছে তিনি ...াঁর সমস্ত কর্মতৎপরতা শুধু বাহির হইতে "...horough bred" আমদানীতেই ব্যয় ...েন—কথাটা অবশ্যই খুড়োর।

* * * *

"A Muslim, even if he were a drunkard or guilty of moral turpitude, was better than even Mahatma ...dhi."
...টা বলিয়াছেন করাচী পরিষদের লীগ সদস্য



মহম্মদ মারী। "মহামারী সম্বন্ধে এই জনাই বোধহয় মানুষের এত আতঙ্ক"—শ্যামলালও বলে!

* * * *

বধিরের শ্রবণশক্তি জন্মাইবার জন্য নাকি একটি যন্ত্র আবিষ্কার করা হইয়াছে, তার নাম 'অডিফোন'। "বাঙলা সরকারের জন্ম-বধিরতার উন্নতি হইতে পারিত কিন্তু কোন Tender Call-এর নোটিশ এখনও চোখে পড়ে নাই"—বলেন বিশুখুড়ো!

* * * *

দিয়াশলাই দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন যে, দিয়াশলাইর উৎপাদন হ্রাস ইহার একটি কারণ। খুড়ো বলেন, "কথাটা সত্য, তা ছাড়া আগস্ট মাসে দিয়াশলাই খরচও হইয়াছে কিছু বেশী।"

* * * *

INDIA'S help required in restocking the zoos of the world
—স্টেটস্‌ম্যানের একটি প্রবন্ধের শিরোনামা। ভারতের কাছে এর চাইতে কোন



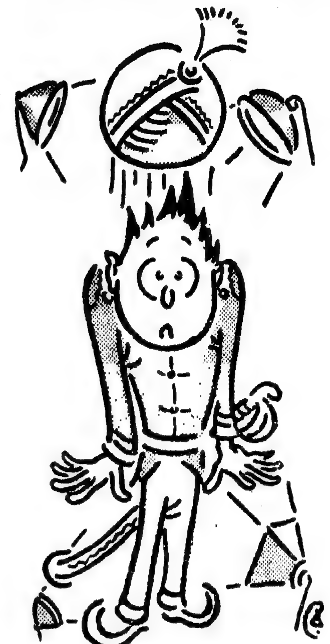
বড় রকমের সাহায্য যে প্রত্যাশা করা যায় একথা বোধহয় সহযোগী এখনও বিশ্বাস করিতে শিখেন নাই!

* * * *

ভারতের ভাবী লাট লর্ড মাউণ্ট বেটেনের সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরুর আগেই সাক্ষাৎ হইয়াছে—প্রথমে সিঙ্গাপুরে এবং পরে দিল্লীতে। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—"দিল্লীতে যখন তার সঙ্গে দেখা হয় তখন আমরা সিঙ্গাপুর হইতে ধান-চাউল আমদানীর বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। খুড়ো বলিলেন—"এবার যখন পণ্ডিতজীর সঙ্গে লর্ড [illegible]উণ্টবেটেনের আবার দিল্লীতে সাক্ষাৎ হইবে তখন নিশ্চয়ই তাঁরা বৃটিশের লোকজন ভারত হইতে রপ্তানীর বিষয়ই আলোচনা করিবেন।"

* * * *

PRINCES enter the film field—
—একটি সংবাদ। তাঁদের শূন্য সিংহাসনের জন্য কোন চিন্তা নাই, ফিল্ম



তারকারা ইতিমধ্যে অনেকেই Prince বনিয়া গিয়াছেন—উত্তরাধিকারী তাঁরাই হইতে পারিবেন। বাকী শুধু আমরাই, রুটির জন্য Strike করি নয়ত ট্রামে ঝুলিয়া দশটা পাঁচটা করি,—সিংহাসন আর সিনেমা কোথাও chance আর হইল না!

* * * *

কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযুক্তা আম্মু স্বামীনাথন একদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাঃ জিয়াউদ্দীন প্রচলিত প্রথানুসারে 'Sir' বলিয়া সম্বোধন করায় শ্রীযুক্ত মোহনলাল সাকসেনা বলিলেন যে, Sir না বলিয়া শ্রীযুক্তা স্বামীনাথনকে madam বলিয়া সম্বোধন করাই বোধহয় উচিত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত Sir সম্বোধনই চলিল। আমরা বলি ভালই হইল, এই নূতন রীতি চালাইলে মেয়েদিগকে অতঃপর your most obedient maid servant বলিয়াও স্বাক্ষর করিতে হইত এবং সেটা শ্রুতি এবং স্মৃতি কোন দিকেই সুখকর হইত না।



অশ্বত্থের অভিশাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(১)

একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ। প্রকাণ্ড। প্রাচীন। পেশীবহুল তাহার প্রকাণ্ড প্রাচীন কাণ্ড ফুলিয়া ফুলিয়া পাকাইয়া পাকাইয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত। তাহার কাণ্ডটি কিছুদূর উঠিয়া অনেকগুলি বলিষ্ঠ শাখায় বিভক্ত; আরও খানিকটা উঠিয়া শাখাগুলি আবার অনেকগুলি প্রশাখায় বিভক্ত; প্রশাখাগুলি অবশেষে অসংখ্য উপশাখায় পরিণত, আর সমস্তটাকে আচ্ছন্ন করিয়া অজস্র শিষ-ওয়ালা মসৃণ পাতা একটু বাতাসের আভাস পাইবামাত্র থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে—পাতাল ফুঁড়িয়া আলোক-উদ্গ্রীব বাসুকীর ফণা বহির্গত, তাহার সহস্র শীর্ষের সহস্র জিহ্বা মুক্ত আকাশের আলোকের জন্য, বাতাসের জন্য, জীবনের স্পর্শের জন্য লালায়িত।

অশ্বত্থ বৃক্ষটি যে কত প্রাচীন তাহা কেহ জানে না। সকলেই তাহাকে একইভাবে দেখিতেছে। প্রাচীতম ব্যক্তিরাও তাহার কোন পরিবর্তন দেখিতে পায় না। তাহারা তাহাদের পিতা পিতামহের নিকটেও ইহার কোন হ্রাস বৃদ্ধির সংবাদ পায় নাই। পিতামহ ভীষ্মের মতো এই বৃক্ষটি তাহার প্রসারিত ছায়ার তলে গ্রামটিকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আকাশ ও পৃথিবীর মতোই এই বৃক্ষটি সকলের দৃষ্টিতে অপারিবর্তনীয়, সকলের প্রশ্নাতীত, সকলে তাহাকে নিঃসংশয়ে মানিয়া লইয়াছে। তাহার অধিকার ও বয়সের প্রশ্ন কে করিবে? পিতামহের অধিকার ও বয়স লইয়া কি প্রশ্ন চলে।

পাবিবর্তনবহুল ও ক্ষণস্থায়ী মানুষের, জীবন অপরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তিতকে সমীহ করে, ভক্তি করে, একপ্রকার ভীতিমিশ্রিত বিস্ময় সে অনুভব করে শাশ্বতের প্রতি। আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও পর্বত মানুষের কাছে ভীতিভক্তির আকর। অশ্বত্থ গাছটিও সেই শ্রেণীর। গ্রাম জীবনের সে প্রধান প্রতিষ্ঠান। হিন্দু মুসলমান, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী এবং পুরুষ সকলেই তাহাকে সম্ভ্রম করিয়া চলে। এমন সম্ভ্রম, এমন সমীহা গ্রামের জমিদারগণও পাইবার কল্পনা করিতে পারে না। বৃদ্ধেরা প্রণাম করিয়া যায় তাহার তল দেশে, মুসলমানেরা সেলাম করে, অক্ষয় তৃতীয়ার তিথিতে স্ত্রীলোকেরা নৈবেদ্য আনিয়া তাহার মূলে স্থাপন করে, কাণ্ডে সিন্দুর লিপ্ত করিয়া দেয়; মুসলমানেরা ইদের দিনে শির্নি আনিয়া দেয়, তাহারা বলে ওখানে প্রাচীনকালের কোনো পীরের দেহ সমাহিত। ষষ্ঠী পুজায় বালকেরা গাছে উঠিয়া নিশান বাঁধিয়া দেয়, মায়েরা বলে—দেখিস, সাবধান, পড়বি। ছেলেরা ভয় পায় না, হাসে; পিতামহের কোল হইতে কবে কে পড়িয়াছে? গাছটারও অন্তরাত্মা যেন খুশী হইয়া উঠে। সে বালকদের ঘর্মিত ললাটে স্নিগ্ধ পত্রের ব্যজনী দুলাইয়া বাতাস করিতে থাকে। আর এক পর্ব অনুষ্ঠিত হয় বিজয়ার দিনে। গ্রামের সবগুলি প্রতিমা এখানে আনিয়া সমবেত করা হয়. মেয়েরা ধান দূর্বা খই ছিটাইয়া সাশ্রুনেত্রে এক বৎসরের জন্য পার্বতীকে বিদায় দেয়। তাহারা কৌটা খুলিয়া খানিকটা সিঁদুর দেয় পার্বতীর পায়ে, খানিকটা দেয় অশ্বত্থের গুঁড়িতে আবার সেই প্রসাদী সিঁদুর সযত্নে কৌটায় তুলিয়া নেয়, পরস্পরের সিঁথিতে ও কপালে সস্নেহে লিপ্ত করিয়া দেয়। সহস্রপত্র অশ্বত্থবৃক্ষ নিশ্চল। পিতামহ নিস্তব্ধভাবে পৌত্রীর স্বগৃহে পরিত্যাগ দেখিতে থাকে। তারপরে বাহকেরা প্রতিমা বহন করিয়া নদীর ঘাটে চলিয়া যায়। শীত-কালে ইহারই তলদেশে বসে পৌষের মেলা। কত যাত্রী, কত ক্রেতা, বিক্রেতা, কী সে জনতা আর কোলাহল। গাছটি মনে মনে খুশি হইয়া উঠে। গ্রামের জীবনচক্র এই অশ্বত্থটিকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয়।

আর ঋতু-চক্রেরও কেন্দ্র এই গাছটি। শীতান্তে পাতা ঝরিতে ঝরিতে অবশেষে আর একটি পাতাও অবশিষ্ট থাকে না। তখন শীর্ণ রিক্ত শাখা, প্রশাখা এবং উপশাখা একখানি প্রেতের জাল বুনিয়া আকাশে সঞ্চালিত করে ও দিনের সূর্য এবং রাতের চাঁদ ধরা পড়ে। ফাল্গুনের প্রথম নিঃশ্বাসের সংগে স্বচ্ছ সবুজের আভা দেখা দেয় শাখায় শাখায়—তারপরে শিল্পীর সমস্তগুলি রঙের ঘোড়দৌড় সুরু হইয়া যায় এবং অবশেষে চৈত্রের প্রারম্ভে একদিন দেখা যায় নূতন কিশলয়ের কচি লালের আভাসে বৃহৎ অশ্বত্থ নবোদিত অরুণের প্রভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মান। সহস্র পত্র সহস্র শিষ অবনমিত করিয়া সারা দীর্ঘদিন থর থর ঝর ঝর সর সর মর মর সমীরিত, প্রকম্পিত এবং মর্মরিত। গুঁড়ির কোটরে শালিখ আর ময়নার বাসা। তাহাদের নবজাত শাবকের কচি ঠোঁটের আরক্ত আভাস নবীন পাতার গৌরবে উঁকি মারে। ডালে ডালে কাকের আশ্রয়। সন্ধ্যাবেলা তাহারা কা কা রবে ফিরিয়া আসে। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। অপরাহ্নের শেষে শাখাশ্রয়ী নিম্নমুখী বাদুড়ের দল দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া চক্রাকারে উড়িতে উড়িতে আহারান্বেষণে চলিয়া যায়—শেষ রাত্রে তাহারা একে একে ফিরিতে থাকে। সকাল বেলা ছেলের দল জুটিয়া তাহাদের মুখচ্যুত বাদাম লইয়া কাড়াকাড়ি করে। রাত্রি বেলা শিয়ালের দল জোটে গাছের নীচে, শটি, ভাটি, আশশ্যাওড়ার জঙ্গলে। তাহাদের শিবাধ্বনি দূর দূরান্তের মাঠের শিবাধ্বনির প্রথম সঙ্কেত। অশ্বত্থের ঘন ছায়ার প্রলেপে বালকের দল জুটিয়া ডাণ্ডাগুলি খেলে, দূরের পথিক ক্ষণকাল জিরাইয়া লয়। বর্ষার ঘন শ্যামল পাতার রঙে এক পোঁচ করিয়া শীতাভা মিশিতে মিশিতে শীতের প্রারম্ভে শুষ্ক পীত পত্র উত্তর বাতাসে খসিয়া খসিয়া ভাসিয়া যায়। অশ্বত্থের ঋতু-চক্রের আবর্তন সমাপ্ত।

কিন্তু এই প্রাচীনের মজ্জায় মজ্জায় নবীনের কী রস প্রবাহ। এই অশ্বত্থ একাধারে প্রবীণ ও নবীন। সে বুঝি ভীষ্মের মতোই ইচ্ছামৃত্যু। পিতামহ ভীষ্মের মতোই সে প্রবীণ তবু চিরকুমার। গ্রামের লোকের চোখে সে আর বৃক্ষ নয়—সে দেবতা। গ্রামটির নাম জোড়াদীঘি।

(২)

জোড়াদীঘির ছ'আনির কাছারিতে বড়ই গোল বাধিয়া গিয়াছে। এইমাত্র নায়েব যোগেশ ডাকঘর হইতে একখানি চিঠি হাতে করিয়া ফিরিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া জমারনবিশ, শুমারনবিশ প্রভৃতি আমলাগণ নির্বাক হইয়া বসিয়া আছে—মাঝখানে খোলা চিঠিখানা

পড়িয়া, কাহারো মুখে কথা নাই। হুঁকা-বর্দার তামাক সাজিয়া আনিয়াছে—অন্যদিন তামাক লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত, আজ সে দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করিল না, বেচারী ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া অগত্যা কল্কেতে সজোরে ফু দিতেছে, কল্কের জ্বলন্ত আভায় তাহার নাসিকাগ্র ক্ষণে ক্ষণে লাল হইয়া উঠিতেছে।

যোগেশ প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল—এখন কি করা যায়?

কিন্তু কোন সদুত্তর না পাওয়ায় চুলের মধ্যে অঙ্গুলি-চালনা করিয়া সমস্যার মীমাংসা খুঁজিতে লাগিল। পঞ্চানন জমারনবিশ। কি-একটা কারণে তাহার ঘাড় দেহের সহিত শক্ত হইয়া জুড়িয়া গিয়াছে। সে ঘাড় ফিরাইতে পারে না, ঘাড় ফিরাইয়া, কথা বলিতে হইলে সমস্ত দেহটাকেই ফিরাইতে হয়। লোকে তাহাকে ঘাড়টান পঞ্চানন বলে। ঘাড়-টান পঞ্চানন বলিল—ছোটবাবু যদি আসেন তবে তো বড়ই মুস্কিল।

বদ্যিনাথ শুমারনবিশ। তাহার বয়স অপেক্ষাকৃত কম। সে বলিল—না, না হুজুরকে এই ম্যালেরিয়ার দেশে আসতে দেওয়া যেতেই পারে না।

ম্যালেরিয়ার উল্লেখে সকলে যেন মুক্তির আভাস দেখিতে পাইল। যোগেশ প্রসন্ন হাসিতে বদ্যিনাথকে পুরস্কৃত করিয়া বলিল—ঠিক বলেছে বদ্যিনাথ, হুজুরকে এমন বিপদের মধ্যে কখনই আসতে দেওয়া যেতে পারে না।

ঘাড়টান পঞ্চানন বলিল—তবে সেই কথাই ভালো ক'রে লিখে দেওয়া যাক্।

তখন সকলে মিলিয়া যৌথ-অধ্যবসায়ে পত্র রচনা আরম্ভ করিয়া দিল।

ব্যাপার আর কিছুই নহে। ছ'আনির জমিদার নবীননারায়ণ কলিকাতায় থাকেন। গ্রামে বড় আসেন না। সম্প্রতি তিনি পত্রযোগে জানাইয়াছেন যে শীতের প্রারম্ভে গ্রামে আসিবেন। সেই সংবাদেই এই গোলযোগের সূত্রপাত। গ্রামত্যাগী জমিদার গ্রামে আসিলে কর্মচারিগণ বড়ই অস্বস্তি অনুভব করে। কলিকাতা হইতে জমিদার টাকা চাহিয়া পাঠাইলে কোন রকমে একখানি পত্র দ্বারা জানাইলেই হইল যে, হুজুর এবার দেশের অবস্থা বড়ই খারাপ। ফসল ভালো হয় নাই। তারপরে নিজেদের বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বন্যা, অজন্মা, পঙ্গপাল প্রভৃতি যে কয়টা ব্যাঘাত আছে তন্মধ্যে যে কোন একটাকে বা সবগুলোকে 'রিকুইজিশন' করা চলে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি জমিদারবাবু আসিতে চান—তবে ম্যালেরিয়া আছে। কলিকাতাবাসী জমিদারের গ্রামের টাকার প্রতি লোভ থাকিলেও গ্রামের ম্যালেরিয়াকে বড় ভয়।

বদ্যিনাথ সকলের হইয়া কলম ধরিয়াছে—আর সকলে নিজ নিজ 'কন্ট্রিবিউশন' যোগ করিয়া দিতেছে। প্রথমে হুজুরের শ্রীচরণ যুগলের মহিমা ও প্রবল প্রতাপের উল্লেখ করিয়া এতদ্দেশে হুজুরের শুভাগমনের সম্ভাবনায় গ্রামস্থ ছোট বড় প্রজাসাধারণের আনন্দের সংবাদ দান করা হইল। হুজুরের কর্মচারিগণ যে তৃষিত চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করিয়া আছে—সে উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হইল না। তার পরেই আসিল 'কিন্তু'; 'কিন্তু হুজুর এদেশে ম্যালেরিয়ার বড়ই মহামার পড়িয়া গিয়াছে, যাহাকে ধরিতেছে, তাহার আর রক্ষা নাই; ব্যাধির প্রারম্ভেই রুগীর চক্ষু জবাফুলের মতো রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়া জল জল হাঁকিতে হাঁকিতে রুগী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিতেছে।' বদ্যিনাথের বাস্তবোচিত অবাস্তব বর্ণনায় লেখকবর্গেরই ভয় করিতে লাগিল। তাহারা নিশ্চিন্ত হইল যে, এই পত্র পড়িবার পরে নবীননারায়ণ কিছুতেই আর আসিবেন না।

যোগেশ বলিল—বদ্যিনাথ তোমার খাসা হাত। এমন লেখা শিখলে কোথায়?

বদ্যিনাথ মাইনার ইস্কুলে পড়িবার সময়ে গোরুর উপরে প্রবন্ধ লিখিয়া পুরস্কার পাইয়াছিল।

ঘাড়-টান পঞ্চানন বলিল—এবার কয়েকজন মৃত ব্যক্তির নাম লিখে দাও।

তখন সকলে মিলিয়া অনেকগুলি নাম বসাইয়া দিল—যাহাদের অনেকে জন্মায় নাই, অনেকে বহুদিন হইল ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছে—আর অনেকে এখনও সুস্থদেহে গ্রামেই বিচরণ করিতেছে। তবে কিনা নবীননারায়ণ গ্রামে বড় আসেন না, তাই তাঁহার ধরিবার উপায় নাই।

পত্র রচনা যখন অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে নীলাম্বর খুড়ো লাঠি ঠুক ঠুক করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রত্যহ বিকালে একবার করিয়া আসে, বেড়াইতেও বটে, আবার মাসিক বৃত্তির টাকার তাগিদেও বটে। অন্যদিন হুঁকা পাইতে তাঁহার বিলম্ব ঘটে—আজ আসিয়াই বেকার হুঁকাটি চাকরের হাত হইতে লইয়া লাঠিখানা দেয়ালের কোণে রাখিয়া ফরাসের একান্তে বসিল এবং দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া করিয়া টান দিতে শুরু করিল। কিছুক্ষণ পরে হুঁকাটি পুনরায় চাকরের হাতে দিয়া নীলাম্বর সকলের দিকে তাকাইল এবং বুঝিল অভাবিত একটা কিছু ঘটিয়াছে। তখন দু'চারবার কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া শুধাইল, ব্যাপার কি? সবাই যে চুপ।

যোগেশ সমস্যার উল্লেখ করিল। সমস্তটা শুনিয়া নীলাম্বর বলিল—তবে শোনো।

এই বলিয়া সে আসন পরিবর্তন করিয়া জাঁকিয়া বসিল। নীলাম্বরের অনেকগুলি মুদ্রাদোষ ছিল। প্রথমতঃ সে কথা বলিবার সময়ে এক চক্ষু উন্মুক্ত ও অপর চক্ষু মুদ্রিত রাখিত। মুদ্রিত চক্ষুতে চিন্তা করিত, আর উন্মুক্ত চক্ষু দিয়া শ্রোতাদের উপরে তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিত। দ্বিতীয়ত, সে কথা বলিবার সময়ে বাক্যের মাঝে মাঝে 'হুঁ' অব্যয়টি প্রয়োগ করিত। তৃতীয়তঃ স্থানে স্থানে গীতার এক-আধ ছত্র শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়া দিত, আজ শ্রীনীলাম্বর ঘোষ যাহা বলিতেছে, তাহা নূতন বা অদ্ভুত নয়, বহুকাল পূর্বে শ্রীভগবান তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান ও নিজের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ঐক্য অনুভব করিয়া সে একপ্রকার দৈব আনন্দ উপলব্ধি করিত। বসন্তের দাগ-কাটা একটা কালো মুখ স্বর্গীয় প্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া নীলাম্বর বলিতে লাগিল—'হুঁ', ওতেই যথেষ্ট হবে, ম্যালেরিয়ার কথা শোনবার পরে হুঁ, আর কিছুতেই সে এদিক মাড়াবে না।

যোগেশ বলিল—কি জানি, কুইনাইন বেঁধে নিয়ে যদি আসে—

নীলাম্বর তাহাকে হস্ত-সঞ্চালনে নিরস্ত করিয়া বলিল—হুঁ, তাকে আসতে দেবে কে? বৌমা যে শহরের মেয়ে। সে একবার এই চিঠি দেখলে কি আর রক্ষা আছে? মনে নাই, 'ভবিষ্যামি যুগে যুগে।'

গীতার এই উক্তির সহিত নীলাম্বরের যুক্তি সহজবোধ্য না হইলেও শ্রোতাগণ সন্তুষ্ট হইল। গীতার এমনি মহিমা। বিশেষ, সকলের মনে পড়িয়া গেল, বধূমাতাঠাকুরাণী শহরের মেয়ে। তাহারই জন্য নবীননারায়ণ গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে—সেই শহরবাসিনীই এ যাত্রা নবীনের আগমনের অন্তরায় হইবে। এই আশ্বাসে তাহারা শহরবাসিনী বধূমাতা ঠাকুরাণীর প্রতি ভক্তি-মিশ্র কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতে লাগিল। যদিচ ইতিপূর্বে সর্বদা তাহারা এই শহর বাসিনীকে অন্তরালে নিন্দা করিতে ছাড়িত না।

পত্র শেষ করিয়া যথোচিত শিরোনামা 'মালিক ভিন্ন খুলিতে নিষেধ' এবং খামের পশ্চাদ্দিকে সাড়ে চুয়াত্তর লিখিয়া তখনই ডাক-ঘরে প্রেরিত হইল। আজ নীলাম্বরের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। না চাহিতেই বৃত্তির টাকা সে পাইল। নীলাম্বর লাঠিখানা লইয়া ঠুক ঠুক করিতে করিতে প্রস্থান করিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল সকলেই যে যাহার বাড়ি চলিল। কেবল যোগেশের মনের মধ্যে একটা সন্দেহ খচ খচ করিয়া বিঁধিতে থাকিল—কুইনাইন বেঁধে নিয়ে যদিই বা আসে। সে ভাবিতে লাগিল—ম্যালেরিয়ার চেয়েও আরও কিছু মারাত্মক কারণ লিখিলে কি ভালো হইত না?

(৩)

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অতর্কিতে একদিন নবীননারায়ণ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগেশ, পঞ্চ[illegible] প্রভৃতি কর্মচারীর দল শঙ্কিত হইয়া উঠিল, কিন্তু অবিলম্বে তাহারা শঙ্কার উপরে হাসির যবনিকা টানিয়া হুজুরের শ্রীচরণে প্রণিপাত হইয়া গদ গদ বচনে জানাইয়া দিল যে, তাহারা দিবারাত্রি তাঁহার জন্যই অপেক্ষা করিয়া ছিল।

নবীননারায়ণ তাহাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—যাক, তোমাদের তো ম্যালেরিয়ায় ধরেনি। ভালই হয়েছে, তবু আমি কিছু কুইনাইন সঙ্গে এনেছি, দরকার হ'লে নিতে পারো।

গ্রামের বহু লোকে রক্তচক্ষু হইয়া ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে অথচ তাহারা দিব্য সুস্থ আছে—ইহা তাহাদের পক্ষে লজ্জার কথা ভাবিয়া তাহারা যখন ইতস্তত করিতেছে বদ্যিনাথ বলিল—হুজুর আমার খানিকটা কুইনাইন চাই, বাড়ীতে সবাই শয্যাশায়ী।

যোগেশ ইতিপূর্বে বদ্যিনাথের লিপি-চাতুর্যে মুগ্ধ হইয়াছিল এখন তাহার বাগ্মিতায় ঈর্ষা বোধ করিয়া ভাবিতে লাগিল, ইস কি ভুলই না হইয়া গেল, খানিকটা কুইনাইন চাহিয়া লইতে ভুল হইয়া গেল কেন?

কিন্তু নবীননারায়ণের আগমনে তাহার সমস্ত কর্মচারীই যে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল এমন বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। তাহার পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল ও চাকর খানসামার দল মনে মনে খুশিই হইয়াছিল। গ্রামের লোকেও দুঃখিত হয় নাই। জমিদার বলিয়াও বটে, তা ছাড়া, সবাই নবীননারায়ণকে মনে মনে ভালবাসিত, তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিত, লেখাপড়া শিখিলে কি হয় আমাদের ছোট বাবুর মনটা ভালো। নবীন যখন গ্রামে আসিতেন, দুঃস্থদের খাজনা মাপ দিতেন, কর্মচারীদের অবহেলায় যাহাদের পাওনা জমিয়া উঠিয়াছে তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দিতেন, যাইবার সময়ে চাকর খানসামাদের মুক্তহস্তে বকশিশ দিয়া যাইতেন।

পরদিন সকালে নবীননারায়ণ যোগেশকে সঙ্গে লইয়া গ্রাম দেখিতে বাহির হইলেন, লাঠিয়াল মিলন সর্দার লাঠি হাতে খানিকটা পিছনে পিছনে চলিল। নবীন গ্রামের মধ্যে বা গ্রামের চারিদিকে কোনখানে অজন্মা বা ম্যালেরিয়ার কোনরূপ লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। তখন কার্তিক মাসের শেষ। মাঠে মাঠে আমন ধানের ক্ষেত শস্যভারে নত। কাটা সুরু হয় নাই, কিন্তু কাটিলেও চলে। চৈতালির ক্ষেতে মটর, মসুর, সরিষার ভূমিসংলগ্ন সবুজ প্রলেপ। শিশিরে ধরাতল সিক্ত, কুয়াশার মশারিখানা তখনো সম্পূর্ণরূপে গুটাইয়া যায় নাই। নদী ও পুকুর পূর্ণপ্রায়। পুকুরে শাপলা, নদীতে জেলের নৌকা। অদূরে বিলের জল খাল বাহিয়া যেখানে নদীতে আসিয়া পড়িতেছে সেখানে মাছ ধরিবার জন্য জাঙাল দেওয়া হইয়াছে, বাধাপ্রাপ্ত জলের একটানা গোঙানি কানে আসিতেছে।

নবীন চলিতে চলিতে বাজার, ইস্কুল ও সরকারী ডাক্তারখানা বাঁয়ে রাখিয়া নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে নদীর মধ্যে কচুরিপানা জমিয়াছে। তাহার উপরে গোটা দুই বক এক পায়ে বদ্ধ-দৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে। কাছেই গোটা দুই পানকৌড়ি ক্ষণে ক্ষণে মাথা ডুবাইয়া দিয়া গভীরের রহস্য আবিষ্কারে মগ্ন। সমস্ত প্রকৃতি ফোটোগ্রাফের ভেজা প্লেটের মতো আবছা। নবীন অনেকক্ষণ সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। যোগেশ ভাবিতে লাগিল—এত কি দেখিবার আছে?

নবীন ফিরিবার সময়ে যে পথটা ধরিলেন তাহার পাশেই গ্রামের অশ্বত্থবৃক্ষটি। গাছটাকে নবীন অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু আজ যেন আবার নূতন করিয়া দেখিতে পাইল। অনেকক্ষণ গাছটাকে আপাদমস্তক ও তাহার চারিধার নিরীক্ষণ করিয়া যোগেশকে শুধাইলেন —এটা কার এলাকা?

যোগেশ সোৎসাহে বলিল—আজ্ঞে হুজুরের। যোগেশের ভাবটা এমন, যেন সে সংবাদটা মাত্র দিল না, জমিখণ্ডও জমিদারকে উপহার দিল।

নবীন কেবল বলিল—ইস্ অনেকটা জমি পতিত পড়ে আছে।

যোগেশ বলিল—আজ্ঞে, অনেকটা বইকি, প্রায় তিন বিঘে। যোগেশ কিছু বাড়াইয়াই বলিল। আর কোন কথা হইল না। নবীন বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

নবীননারায়ণের ইতিহাস একটু জানা আবশ্যক। সে জোড়াদীঘির ছ'আনির জমিদার। একরূপ বাল্যকাল হইতেই সে পিতৃমাতৃহীন। এরূপ অবস্থায় তাহার লেখা-পড়া শেখা দূরে থাকুক, অল্প বয়সেই উচ্ছন্ন যাওয়া উচিত ছিল। গ্রামে থাকিলে, লেখাপড়া না শিখিয়া জাল জুয়াচুরিতে পারদর্শী হইয়া অত্যাচারী দুর্দান্ত জমিদার হইয়া উঠিত, আর সহরে গিয়া পড়িলে নৈশ অত্যাচারের ফলে অল্প দিনেই লিভার পাকিয়া চৌত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই তাহার সাধনোচিত ধামে যাইতে হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে অদৃষ্টের এই দু-তরফা সাঁড়াশী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। লেখাপড়ার ভূত যে কেমন করিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিল, তাহা না জানে সে নিজে না জানে তাহার আত্মীয়স্বজন; কারণ জোড়াদীঘির জমিদার বংশের ঘাড়ে কালে কালে অনেক প্রকার ভূত ভর করিয়াছে, ওই একটি আধুনিক ভূত ব্যতীত। জোড়া-দীঘির জমিদারদের মধ্যে সে-ই প্রথম ম্যাট্রি-কুলেশন পাশ করিল এবং শত্রুমিত্রকে চমৎকৃত করিয়া সগৌরবে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে গ্রামের সহিত তাহার স্থায়ী যোগ ছিন্ন হইয়া গেল। প্রথম প্রথম সে ভাবিত লেখাপড়া শেষ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইবে, লেখা পড়া যখন শেষ হইল, তখন দেখিতে পাইল গ্রামের সহিত তাহার রক্তের সম্বন্ধ থাকিলেও আত্মার সম্বন্ধ আর নাই। বিমাতা নগরীর ক্রোড়ে লালিত হইতে হইতে কখন আত্ম অগোচরে বিমাতাকেই মাতার স্থান দিয়া ফেলিয়াছে। অথচ গ্রামের প্রতিও তার একটা অন্ধ আকর্ষণ আছে। সে মনে মনে অনুভব করে ষড়ানন কার্তিকেয়র মতোই সে একাধিক মাতার স্তন্যে পালিত।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও হয়তো একদিন সে গ্রামে স্থায়ীভাবে ফিরিত। কিন্তু তাহার প্রতিবন্ধক হইল তাহার পত্নী মুক্তামালা। মুক্তামালা সহরের মেয়ে। বিবাহের পরে গ্রামে যাইবার নাম শুনিয়া সে সভয়ে বলিয়া উঠিল —ওমা, সে আমি পারবো না। তাহার বড় দোষ দেওয়া যায় না। সে যে সমাজের মানুষ তাহারা গ্রামের বর্ণনা পুস্তকে মাত্র পড়িয়াছে। তখনো গ্রামের নন্দন-কল্প দৃশ্য সিনেমায় দেখাইবার রেওয়াজ হয় নাই। মুক্তামালা তাহার আত্মীয় পরিজনের মুখে শুনিয়াছে গ্রামে গাছে গাছে সাপ, উঠানে সাপ, এমন কি খাটের পায়া বেষ্টন করিয়া সাপ বিরাজ করে; সে শুনিয়াছে গ্রামে দিনে শিয়াল ডাকে, রাত্রে কাক; সেখানে কেবল জল কাদা খাল বিল বাঘ ভালুক চোর ডাকাত আর ছোট লোক। কাজেই তাহার পক্ষে ভীত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সে যখন গ্রামে যাইতে রাজি হইল না অগত্যা নবীনকেও স্থায়ীভাবে সহরে বাস করিতে হইল। কিন্তু রক্তের মধ্যে সর্বদা সে জোড়াদীঘির আহ্বান শুনিতে পাইত।

(৪)

নবীন মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল, অশ্বত্থ গাছটাকে কাটিতে হইবে। গাছটার প্রতি তাহার যে কোন আক্রোশ ছিল তাহা নয়—কিন্তু ওই গাছটা অযথা তিন বিঘা জমি অনাবাদী করিয়া রাখিয়াছে। গাছটা কাটিলে তিন বিঘা জমি উঠিবে। তাহার কিছু আয় বৃদ্ধি হইবে সত্য—কিন্তু ততোধিক সত্য, লোকের অন্নকষ্ট খানিকটা লঘু হইবে। সে সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিল শুধু এই গাছটা নয়, তাহার বিস্তৃত জমিদারির মধ্যে যেখানে যত বড় গাছ ও জঙ্গল আছে ক্রমে ক্রমে সব কাটিতে হইবে, খাস পতিতগুলিকে হলযোগ্য করিয়া প্রজার আয়ত্ত করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে প্রজাদের আয় বাড়িবে, জমিদারের খাজনা বাড়িবে—সকল পক্ষেরই মঙ্গল। দেশের জন-বৃদ্ধির তাল খাদ্য-বৃদ্ধির তালকে ছাড়াইয়া গিয়াছে—দেশের পক্ষে ইহা একটা গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যা খাতায়পত্রে তাহাকে

অনেকদিন হইল পীড়িত করিতেছে—আজ সেই পীড়ন সে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে লাগিল। নবীননারায়ণ অর্থনীতির ছাত্র, ওই সূত্রেই সে এম এ পরীক্ষার চৌকাঠ লঙ্ঘন করিয়াছে।

তাহার এত সহজে অশ্বত্থ গাছটা কাটিবার সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় জোড়াদীঘির প্রতি তাহার এক প্রকার আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও গ্রামের ইতিহাস ও ভাববস্তুর সহিত তাহার আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছ কাটিবার কথা সে কল্পনা করিতেও পারিত না। সে বিকাল বেলা যোগেশকে ডাকাইয়া তাহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিল। মনিবের সংকল্প শুনিয়া তাহার মুখ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইল না, পাশের দেয়ালে ঠেসান দিয়া কোন মতে সে পতন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ যদি তাহাকে বলিত যে, জমিদার তাহার মুণ্ডুটি স্কন্ধচ্যুত করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাতেও সে এত বিস্মিত হইত না, কারণ চাকুরী আরম্ভ করিবার সময়েই মনে মনে সে মুণ্ডুটা জমিদারের উদ্দেশ্যে দান করিয়া রাখিয়াছে। যোগেশ কোন কথা বলিল না দেখিয়া নবীন মনে করিল যে তাহাদের কোন আপত্তি নাই, তাই সে সংক্ষেপে বলিল—যাও গিয়ে করাতি ঠিক ক'রে ফেলো। এই বলিয়া পুনরায় সে এগাথা ক্রিষ্টির নবতম কাহিনীর প্রবল স্রোতে আত্ম বিসর্জন করিল।

যোগেশ কাঁপিতে কাঁপিতে কাছারীতে আসিয়া ঢুকিল। তাহার কম্পনে কেহ আর বিশেষ উদ্বেগ বোধ করে না, যেহেতু সে সর্বদাই কোন না কোন কারণে কাঁপিতেছে হয় জ্বরে, নয় ভয়ে, নয় ব্রাহ্মণীর প্রতাপে। কিন্তু আজিকার কম্পনে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যদিন বুকের কাঁপুনি কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখের বকুনিতে আত্মপ্রকাশ করে—কিন্তু আজ সে বকুনি কোথায়? অনেকক্ষণ যখন সে নীরব হইয়া থাকিল তখন ঘাড়টান পঞ্চানন তাহার দিকে ঘাড় ফিরাইবার উপলক্ষে সমস্ত দেহ কাঠামখানাকে ফিরাইয়া শুধাইল, নায়েব, ব্যাপার কি?

যোগেশ কথা বলে না। তখন সকলে মিলিয়া সাধাসাধি সুরু করিলে যোগেশ সভয়ে মৃদুস্বরে নবীনের সংকল্প সকলকে জ্ঞাপন করিল। কথাগুলি সে অতিমৃদুস্বরে বলিল, পাছে বাহিরের আকাশ বাতাস শুনিতে পায়। তাহার কথা শুনিবামাত্র কর্মচারীদের হাতের কলম আপনি খসিয়া পড়িল, তাহাদের উন্মুক্ত মুখ বন্ধ হইল না, কাছারী নীরব, মাছি দুটার ভনভনানি শ্রুত হইতে লাগিল, তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যেও কুইনাইনের প্রতিক্রিয়ার মতো ভন ভন করিতে লাগিল, বাক্পটু বদ্যিনাথ কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না।

—— [illegible] নীলাম্বর ঘোষ লাঠি ঠুক ঠুক করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। দেয়ালের কোণে লাঠিগাছাকে যথাস্থানে রাখিয়া ফরাসের একান্তে বসিয়া ধূমায়মান হুঁকোটি তুলিয়া লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। কেহ কোন কথা না বলাতে আর হুঁকার কোন দাবীদার না থাকাতে সে একমনে তাম্রকূট সেবনের অবকাশ পাইল—এমন অবকাশ জীবনে অল্পই মেলে। নেশা জমিয়া উঠিলে আর কল্কের আগুন নিভিয়া আসিলে সে মনে মনে এক প্রকার উদারতা অনুভব করিয়া হুঁকোটি সকলের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—নাও। কিন্তু কেহই হুঁকা লইবার তৎপরতা দেখাইল না। তখন সে হুঁকোটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল—শুনেছো, শশাঙ্কর কীর্তি। টোলে এসেছে কোথায় লেখাপড়া করবে না ছাই—ওপাড়ার গোয়াল ছুঁড়িটার সঙ্গে—

কিন্তু ওপাড়ার গোপবালার সহিত শশাঙ্কর রহস্যভেদের আগ্রহ কেহই প্রকাশ করিল না। টোলের ছাত্র শশাঙ্ক গ্রামের আলোচনার একটি রহস্যময় ব্যক্তি, কিন্তু আজ তাহাতে কাহারো আগ্রহ নাই। তখন বিস্মিত নীলাম্বর সকলের দিকে তাকাইয়া বলিল—তোমাদের হ'ল কি? এবার সে দুইটি চোখই খুলিয়াছে, এতক্ষণ কেবল এক চোখে পর্যবেক্ষণ চলিতেছিল।

ভগ্নজানু দুর্যোধনের পার্শ্ববর্তী অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্যের মতো অর্ধশায়িত যোগেশের পাশে পঞ্চানন ও বদ্যিনাথ নীরব। তখন নীলাম্বর আবার প্রশ্ন করিল—তোমাদের হ'ল কি?

সকলকে নীরব দেখিয়া অগত্যা সে বলিল, তবে যাই একবার ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। সে যখন উঠিতে যাইতেছিল তখন যোগেশ নীরবতা ভঙ্গ করিল, বলিল—খুড়ো একটু বসে যাও।

নীলাম্বর বসিল। তখন যোগেশ ভয়ে রাগে, খেদে, দুঃখে মিলাইয়া তাহাদের নীরবতার কারণ তাহাকে জ্ঞাপন করিল। সে যাহা শুনিল তাহা তাহার কল্পনারও অতীত। এতক্ষণে সে তাহাদের বাক্যহীনতার মর্ম বুঝিল—কারণ এরূপ ক্ষেত্রে কথা বলিবার আর কি থাকিতে পারে?

বদ্যিনাথ বলিয়া উঠিল—দেখবেন, এ গ্রাম উচ্ছন্ন না গিয়া পারে না, শেষে কিনা বুড়ো অশথে হাত। এর চেয়ে যে দশানির বড়বাবু অনেক ভালো।

নীলাম্বর তাহার মতকে সমর্থন করিয়া বলিল—হাজার গুণে ভালো। বড়বাবু অবশ্য জাল মিথ্যা মামলা, খুন জখম ঘর জ্বালানো মাঝে মাঝে করেন, কিন্তু জমিদারি রাখতে গেলে ওসব করতে হয়। কিন্তু অশ্বত্থ গাছে হাত দেবার সাহস তাঁরও নেই।

তারপরে তিনি ছোট বাবুর চরিত্রের সমস্ত দোষ ইংরাজি বিদ্যার ঘাড়ে চাপাইয়া বলিলেন—আসলে ইংরাজি পড়াটা কিছু নয়, আমি কতবার বলেছি যে ইংরাজি পড়েই দেশটা গেল।

এবারে নীলাম্বর ঘোষ কিছু ন্যূনোক্তি করিল। ইংরাজি বিদ্যার বিরুদ্ধে সে কেবল মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সে নিজেও ইংরাজি পাঠ লয় নাই, ছেলে দুটিকেও ইংরাজি শিখিতে দেয় নাই। এখন তাহারা বড়বাবুর জাল ও মিথ্যা মামলার প্রধান সাক্ষী। ছেলে দুটির ইংরাজি জ্ঞানের অভিশাপ মুক্ত উন্নত চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া গৌরবান্বিত পিতার বসন্তের দাগ কাটা কালো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বিব্রত যোগেশ বলিল—ছোট বাবুর হুকুম করাতি যোগার করবার—এখানে আমি ও কাজের জন্য করাতি পাবো কোথায়?

বদ্যিনাথ বলিল—কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম ক'রে আনাতে বলো।

তাহার কথায় এত দুঃখের মধ্যেও সকলে হাসিয়া উঠিল।

নীলাম্বর বদ্যিনাথকে সমর্থন করিয়া বলিল—হুঁ করাতিরা তো আর ইংরাজি পড়েনি, হুঁ, যে এমন কাজ করতে রাজি হবে।

পঞ্চানন এতক্ষণ নীরব ছিল। এবারে সে বলিল——ছোট বাবুর যে রোখ হয়তো নিজেই গিয়ে কুড়ুল ধরবে।

নীলাম্বর সরোষে এবং আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল—ধরুক না একবার......

আবেগের প্রচণ্ডতায় তাহার কাশি আসিল—খক্ খক্, খক্। অধিক কথা সে বলিতে পারিল না, কিন্তু আবেগের প্রচণ্ডতার সহিত মিলাইয়া লইলে ওইটুকুই যথেষ্ট।

খক্ খক্ খক্—কাশি আর থামিতে চায় না। নীলাম্বরের একটা পৈত্রিক কাশি ছিল, বিনা চিকিৎসায় ইহাকে সে সযত্নে পুষিয়া রাখিয়াছে।

খক্ খক্, 'বৃক্ষাণাং অশ্বত্থোহহং' হাক থুঃ—যুগপৎ তাহার কণ্ঠাভ্যন্তর হইতে অনেকটা কাশি ও গীতার অর্ধজীর্ণ একটা শ্লোকাংশ বাহির হইয়া আসিল। তখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিয়া দীর্ঘস্বরে উচ্চারণ করিল—হুঁ।

এবারে সে উঠিয়া পড়িল। বলিল—নাঃ, এমন ম্লেচ্ছের বাড়িতে আসাও পাপ।

নাড়া খাইয়া তাহার জামার পকেটে গোটা দুই টাকার শব্দ হইল। এ সেই ম্লেচ্ছদত্ত-বৃত্তির অবশিষ্ট।

নীলাম্বর চলিয়া গেলে যোগেশের মনে হইল এখনো যে সংসার টিকিয়া আছে তাহা ওই নীলাম্বর ঘোষের মতো লোক আছে বলিয়াই। আর একই বিধাতা নীলাম্বর ও নবীন নারায়ণকে সৃষ্টি করিয়াছেন ভাবিয়া সে এক প্রকার দার্শনিক বিস্ময় অনুভব করিতে লাগিল।

ক্রমশ

বিজ্ঞানের কথা

মানুষের কীট-শত্রু

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

কীটপতঙ্গ মানুষের যত বড় শত্রু খুব সম্ভবত মানুষ নিজেও মানুষের তত বড় শত্রু নয়। এরা আমাদের ভাতে মারে, রোগে ভোগায়, নানা উপায়ে আর্থিক ক্ষতি যে কত করে তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের ক্ষেতে খামারে এরা যে ক্ষতি করে, হিসেব ক'রে দেখা গেছে তার পরিমাণ সমুদয় উৎপন্ন ফসলের প্রায় এক দশমাংশ, ফলের বাগানের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক পঞ্চমাংশের মতো। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর (yellow fever) কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক রোগের কারণও এই সব কীট পতঙ্গ। কারণ এখন জানা গেছে মাছি মশা প্রভৃতি পতঙ্গ এক রুগ্ন ব্যক্তির দেহ হ'তে অন্য ব্যক্তির দেহে এইসব রোগ ছড়ায়। তাতে লোকক্ষয় হ'য়ে এক এক দেশ প্রায় উচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। ঘরে আমাদের জামা কাপড়ে নানা আসবাবপত্রে, ভাঁড়ারে আমাদের সঞ্চিত খাদ্য-দ্রব্যে, ঘরে বাইরে এমন জায়গা নেই যেখানে এদের উপদ্রবে মানুষকে প্রতিনিয়ত জ্বালাতন হ'তে না হচ্ছে। অথচ আয়তনে জীবটি আর কতটুকু! ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য যা এদের পক্ষে করা সম্ভব নয়, সংখ্যার শক্তিতে এরা তা পুষিয়ে নেয়।

মানুষের উপর এদের আক্রমণ পদ্ধতি অনেকটা এ যুগের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের আক্রমণের ন্যায়। জল স্থল অন্তরীক্ষ এই তিন দিক হ'তেই এরা আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। জলের তলায় ওদের যেমন দৌরাত্ম্য, মাটির তলায় ফসলের শিকড়ে গুঁড়িতে ওদের দৌরাত্ম্য চলে তেমনি সমানভাবে। ফসলের সব অংশই—শিকড় গুঁড়ি, ডাল পাতা ফুল ফল—তাদের জীবনের কোন-না-কোন এক সময়ে তাদের খাদ্য। শূক (lerva) অবস্থায় এরা খায় উদ্ভিদের পাতা ডাঁটের রস, ফুলের পাঁপড়ি, ফলের রস ও শাঁস। বড় হ'লে ওদের গায়ে গজায় ডানা। তখন এরা সৈন্য-দলের ন্যায় নতুন নতুন জায়গায় এক কর্ষিত ভূমি হ'তে অন্য কর্ষিত ভূমিতে অভিযানের জন্য বহির্গত হয়। কেউ কেউ উড়ে দূর দেশেও চলে যায়। সেইসব স্থানে তাদের ছানাদের মধ্যে কতক মৃত্তিকার উপরে ফসলের ডাঁট কুরে কুরে খেয়ে ফসল উজাড় করে, কতক যুদ্ধের সময়ে পোড়ামাটির (Scorched earth) অনুকরণে ক্ষেতের পরে ক্ষেত উজাড় করে দিয়ে অগ্রসর হ'তে থাকে। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ওদের আকার পরিবর্তন করবার ক্ষমতা থাকায় ও ইচ্ছামত স্থানান্তরে গমনের সুবিধা থাকায় আমাদের ফসলের উপর ওদের ধ্বংসকার্য অনেক সময় মানুষের ধ্বংস করবার ক্ষমতাকেও হার মানায়।

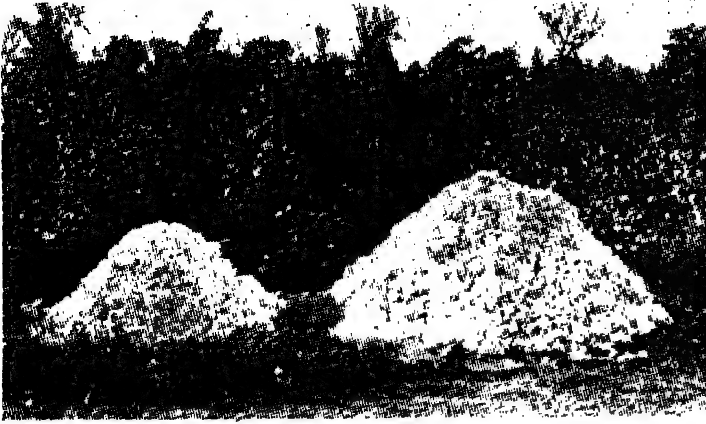


ভুট্টা ক্ষেতে পতঙ্গের আক্রমণের পূর্বের অবস্থা। ফসলের চেহারা বেশ ভালই দেখাচ্ছে।



একই ভুট্টা ক্ষেতের পতঙ্গের আক্রমণের পরের অবস্থা। ফসলে শুধু ডাঁট ভিন্ন আর কিছুই নেই।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস দিন দিনই যেন কীটপতঙ্গ সংখ্যায় বাড়ছে, সেই অনুপাতে ওদের উপদ্রবও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সত্যি কি তাই? অবশ্য কোন কোন জাতীয় পতঙ্গ যে সংখ্যায় না বাড়ছে তা নয়, ফসলের ক্ষেতে ফলের বাগানে তাদের উপদ্রবও বেশি পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। আবার এক এক স্থানে বিদেশ হ'তে নতুন নতুন কীটপতঙ্গের আমদানীও হচ্ছে। তবু কীটতত্ত্ববিদদের মতে সব জাতীয় কীটপতঙ্গই যে সংখ্যায় বাড়ছে তা নয়। আজকাল মানুষ কীট পতঙ্গের উপদ্রব সম্বন্ধে বেশি সচেতন হ'য়ে উঠেছে, সেইজন্য আজকাল এদের উপদ্রবও বেশি ব'লে মনে হয়। পূর্বে কীট-পতঙ্গের উপদ্রবকে লোকে তত বেশি গ্রাহ্য করতো না। পূর্বে আমবাগানের আমের ভিতরে পোকা হ'লে লোকে তা উপেক্ষার দৃষ্টিতেই দেখতো। আম তখন অতটা দুর্মূল্য হ'য়ে ওঠেনি, দুপয়সা চার পয়সায় হয়তো তখন এক ঝুড়ি আম কিনতে পাওয়া যেতো। তার মধ্যে থেকে কতক আম খাবার অনুপযুক্ত হ'লেও লোকের তেমন কিছু আপশোষের কারণ ছিলো না। এমনি ছিলো সব জিনিসেই। তখন লোকের প্রয়োজন ছিলো কম, জিনিসপত্রও ছিলো সস্তা। কিন্তু এখন সব জিনিসই দুর্মূল্য হওয়ায় লোকে আর কীটপতঙ্গের উপদ্রবকে ততটা



দুই সমপরিমাণ জমি হতে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ। বাম দিকের তুলোর ছুঁয়ে কীটনাশক বিষ প্রয়োগ করা হয়নি। ডানদিকের তুলোর ছুঁয়ে বিষ প্রয়োগে উইভিল্ (Weevil) নামক তুলোর কীট ধ্বংস করা হয়েছিলো।

উপেক্ষার চোখে দেখতে পারে না। কীট-পতঙ্গের উপদ্রব হ'তে সামান্য ক্ষতি বাঁচাবার জন্য মানুষ এখন প্রাণপণ চেষ্টা করিতেও প্রস্তুত। লোকে এখন কীটপতঙ্গের ধ্বংসের উপায় জানবার জন্য ব্যস্ত। এখন নানা উপায়ে কীটপতঙ্গ ধ্বংসের উপায়ও আবিষ্কৃত হয়েছে ও হচ্ছে। খবরের কাগজ, রেডিও ছায়াচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে তা লোকের মধ্যে প্রচার করবার চেষ্টাও চলছে। তাতে লোকে কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে আরো বেশি সচেতন হ'য়ে উঠেছে।

চারিদিকে এদের উপদ্রবের পরিমাণ উপলব্ধি ক'রে একথা সহজেই মনে আসতে পারে কীটপতঙ্গ ধ্বংস ক'রে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষতির পরিমাণ কমানো কি সম্ভব? এ সম্বন্ধে হতাশ হবারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

কীটপতঙ্গ সংখ্যায় নিতান্ত সামান্য নয়। যেসব জীবের তিন জোড়া ক'রে পা, দেহ তিনভাগে বিভক্ত যথা মাথা বুক পেট পিঠ, ডানা আছে, বিজ্ঞানীর পরিভাষায় তারাই পতঙ্গ নামে পরিচিত। কোন কোন জাতীয় পতঙ্গের পিঠে ডানা নেই। আমাদের অতি পরিচিত মাছি মশা ছারপোকা উকুন পিঁপড়ে প্রজাপতি মৌমাছি প্রভৃতি সকলেই পতঙ্গ-জাতীয় জীব। বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় আজ পর্যন্ত ৬ লক্ষেরও অধিক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পতঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের এক একটি শ্রেণীর সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য নয়। এক মশা মাছির সংখ্যার পরিমাণই গুণে শেষ করা যাবে না। বংশোৎপাদনের দ্বারা ওরা সংখ্যায় যে পরিমাণে বাড়তে পারে তা ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয়। এক জোড়া জাব পোকার ও তার সন্তানসন্ততিদের বংশোৎপাদনে যদি কোন রকমের বাধা না জন্মানো যায় তা'হলে এক বৎসরেই তাদের সন্তান সন্ততি গোটা আটলাণ্টিক মহাসাগরকে ভরে ফেলতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ ঘটনা কখনো ঘটে না। ওরা জন্মে যেমন এক সঙ্গে রাশি রাশি তেমনি মরেও অপরিমিত সংখ্যায়।

পূর্বোক্ত ছয় লক্ষাধিক কীটপতঙ্গের সকলেই যে আমাদের শত্রু তা নয়। তাদের অধিকাংশই আমাদের শত্রু তো নয়ই বরং তাদের কতককে আমাদের মিত্র বলা যেতে পারে; রেশমি বস্ত্রের রেশম, মৌচাকের মধু পতঙ্গই আমাদের জোগায়। প্রজাপতি, মৌমাছি, মথ ও নানা জাতীয় পিঁপড়ে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে ও রেণু সংগ্রহ ক'রে না বেড়ালে অনেক ফুলের ফল বা বীচি পুষ্ট হ'তে পারতো না। আমরা সেসব ফল ও বীচি হ'তে বঞ্চিত হতাম। এইরূপ নানা উপায়ে যেসব কীটপতঙ্গ আমাদের আর্থিক উন্নতিসাধনে সাহায্য করে, তাদের সংখ্যা এ পর্যন্ত বিশ হাজারেরও অধিক জানা গেছে। শত্রুকীটের সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য নয়। আজ পর্যন্ত প্রায় ছয় হাজারেরও অধিক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শত্রু-কীটের সংখ্যার কথা জানা গেছে। এই যে সব তা নয়, যাদের কথা এখনো জানা যায়নি তাদের সংখ্যা অনুমান করাও শক্ত।

এইসব কীট-শত্রুকে ধ্বংস করা নিতান্ত সহজ কাজ নয়। কীটনাশক বিষ আবিষ্কার করা খুব কঠিন কাজ নয়। সেরূপ নানা জাতীয় বিষ আবিষ্কার করাও হয়েছে। কিন্তু তা সব জাতীয় কীট-শত্রুর উপর প্রয়োগ করা চলে না। তাতে সবজাতীয় শত্রু-কীট ধ্বংস হবে না। এদের অধিকাংশেরই জীবনযাত্রা প্রণালী বিভিন্ন ধরণের। এরা সব দেখতে একরকম নয়, এদের আহার্য প্রণালী একরূপ নয়। এমন কোন প্রাকৃতিক অবস্থা নেই যার মধ্যে এরা জীবন ধারণ করতে না পারে। মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে, মেরুপ্রদেশের বরফস্তূপে, সমুদ্রের লোনা জলে, উষ্ণ প্রস্রবণের ফুটন্ত জলে, এমন কি পেট্রোল-কূপের ভিতরেও এদের সন্ধান পাওয়া গেছে। খায় এরা নানা উপায়ে নানা জিনিস। শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের যন্ত্রও এদের সকলের একরূপ নয়। এইসব বৈচিত্র্যের দরুণ তাদের ধ্বংস বা দমনের জন্য নানা বিভিন্ন উপায়ও অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাদের ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবনের জন্য প্রথম প্রয়োজন তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা। মশা ডিম পাড়ে জলে, তাদের ছানা ও সেই ছানাদের বৃদ্ধিও হয় জলে। সুতরাং ঘরে বসে মশা মারলে তাদের ধ্বংস বা দমনের সব চেষ্টাই শুধু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। মশার ছানা জলের মধ্যে নিঃশ্বাস নেয়, তাদের লেজের ছিদ্রপথ দিয়ে। এই নিশ্বাস নেবার জন্য ওদের বারবার জলের তলা হ'তে উপরে ভেসে উঠতে হয়। মশা ধ্বংস করতে হলে মশার ছানার লেজের ছিদ্রপথের সঙ্গে যাতে



উইভিল্ (Weevil) নামক তুলোর কীট।

উপরের হাওয়ার যোগাযোগ ঘটতে না পারে তার উপায় উদ্ভাবন করা উচিত। সেরকম একটি উপায় জলের উপর তেল ছড়িয়ে মশার ছানার নিশ্বাস নেবার পথ বন্ধ ক'রে দেওয়া। মশার ছানা ধ্বংসের জন্য জলে বিশেষ বিশেষ জাতীয় মাছও ছেড়ে দেওয়া হয়। তাতেও মশার বংশবৃদ্ধি অনেক পরিমাণে কমে।

ফসলের উপর জাব পোকা ও অন্য কয়েক শ্রেণীর পতঙ্গের উপদ্রব দমন করতে হ'লে ওদের আহার্য প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। ফসলের চারায় ওদের জন্ম হলেও অন্যান্য পতঙ্গছানার ন্যায় পাতা কুরে কুরে না খেয়ে ওরা খায় পাতার ও ডাঁটের রস চুষে চুষে। সেই রস চুষে খাবার জন্য ওদের মুখে আছে একটি চুষনী যন্ত্র (Sucking tube)। ফসলের উপর হ'তে তাদের উপদ্রব দমন করতে

হ'লে ফসলের গায়ে বিষ ছড়িয়ে কোন ফল পাওয়া যাবে না। কারণ উপরের বিষাক্ত দ্রব্যের ভিতর দিয়ে এরা চুষণী যন্ত্রটিকে চালিয়ে দেয় চারার গায়ের ভিতরে। সেই ভিতর থেকে চারার রস চুষে চুষে খেয়ে ওরা ফসলের ক্ষতি করে। ওদের ধ্বংস করতে হ'লে খাদ্যের উপর বিষ প্রয়োগ না করে ওদের গায়ের উপরে বা এমন কোন উপায়ে বিষ প্রয়োগ করতে হবে, যাতে সেই বিষ মুখের ভিতর দিয়ে প্রবেশ না করে দেহের অন্য কোন স্থান দিয়ে তাদের দেহের ভিতরে ঢুকতে পারে। কতক কতক পিঁপড়ের যেমন মিষ্টির প্রতি অতিরিক্ত লোভ তেমনি কোন কোন কীট-শত্রুরও লোভ বেশী বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উপর। তাদের ধ্বংস করতে হয় সেইসব দ্রব্যের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করে তাদের খাইয়ে। কতক কতক পতঙ্গ বিশেষ বিশেষ গন্ধে দূরে পলায়ন করে। পাড়াগাঁয়ে মশা তাড়াবার জন্য সন্ধ্যের সময় ধোঁয়ার আগুনের সঙ্গে কাঁঠালের ভূতি পোড়ায়। লিমন ঘাস বা কেরোসিন তেলের গন্ধে মশা কাছে ঘেঁসে না। মশার ন্যায় এমনি আরো অনেক পতঙ্গ আছে যারা বিশেষ বিশেষ গন্ধে দূরে পলায়ন করে। তাদের তাড়াতে হয় ফসলের উপর সেইসব গন্ধ ছড়িয়ে।

নানা রকমের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কীট-পতঙ্গের ধ্বংসের পথও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সব জাতীয় পতঙ্গকে সেইসব উপায়ে ধ্বংস করা যায় না। তাদের ধ্বংস করতে হবে অন্য উপায়ে। পর্যবেক্ষণের দ্বারা দেখা গেছে, কোন কোন জাতীয় পতঙ্গ বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ সময়ে বংশোৎপাদন করে। বেগুনের পোকা বংশোৎপাদন করে সাধারণত বর্ষার প্রথম দিকে। দেখা গেছে, সেই সময় পার করে দিয়ে বর্ষার শেষ দিকে ক্ষেতে বেগুনের চারা বসালে পোকার আক্রমণ থেকে অধিক পরিমাণে বেগুন গাছ রক্ষা করা যায়। হেসিয়ান ফ্লাই (Hessian fly) গমের ফসলের শত্রু। এরা বংশোৎপাদন করে শীতের দেশে শরতের প্রথম দিকে। যেসব স্থানে এ পোকার উপদ্রব বেশী সেইসব স্থানে চাষীরা ওদের বংশোৎপাদনের সময় পার করে দিয়ে গম বোনে। তাতে ফসল অনেক পরিমাণে রক্ষা পায়। বনের মধ্যে গাছের শত্রুও নানাজাতীয় পোকা। তাদের উপদ্রব হতে গাছকে রক্ষা করতে হলে যে-গাছে বংশোৎপাদনের জন্য এরা ডিম পাড়ে বা যে-গাছে ওদের ছানা হয় সে গাছ কেটে ফেলতে হয়। ছানাদের প্রথমাবস্থায়ই ধ্বংস করতে পারলে বনময় এরা ছড়াতে পারে না।

কীটপতঙ্গ ধ্বংসের জন্য আজকাল আর একটি বিশেষ উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। সে প্রণালী অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ন্যায়। কীট-পতঙ্গের মধ্যে অনেক আছে যারা নিজেরাই নিজেদের শত্রু। কতক কীট-পতঙ্গ ভিন্ন জাতীয় কীট-পতঙ্গের ডিম ও ছানা আহার করে প্রাণধারণ করে। উপদ্রবকারী কীটকে ধ্বংস করবার জন্য তাদের শত্রুকে খুঁজে বের করতে হয়। অবশ্য সে কাজ খুব সহজ নয়। হাওয়াই দ্বীপে (Hawaiian) আকের চাষের প্রথম অবস্থায় পোকার উপদ্রবে চাষ প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়। তখন কীট-তত্ত্ববিদদের নিযুক্ত করা হয় কীট ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবনের জন্য। ১৩ বৎসর গবেষণা ও নানাস্থানে অনুসন্ধানের পর তারা এক জাতীয় পতঙ্গের সন্ধান পায় যারা আকের পোকার শত্রু। সেই শত্রু-পতঙ্গ আকের পোকার ডিম ভক্ষণ করে হাওয়াই দ্বীপে আকের চাষকে রক্ষা করে। ক্যালিফর্নিয়ায় সাইট্রাস্ (নেবুজাতীয় ফল) ফলে পোকার উপদ্রব আরম্ভ হলে বহু অনুসন্ধানের পর অস্ট্রেলিয়া হতে একজাতীয় পতঙ্গের আমদানী করা হয়, যারা নেবু-পোকার শত্রু। তাদের সাহায্যে নেবু-পোকার উপদ্রবকে ক্যালিফর্নিয়া হতে দূর করা হয়।

অনেকের বিশ্বাস, এমন কি কোন কোন বিজ্ঞানীও মনে করেন, আমরা কীট-পতঙ্গ ধ্বংসের জন্য যত রকমের উপায়ই উদ্ভাবন করি না কেন, ওদের বংশবৃদ্ধি করবার ও নানা বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবনধারণ করবার অসাধারণ ক্ষমতা থাকায় একদিন ওরাই হয়তো পৃথিবীতে প্রাধান্য স্থাপন করে মানুষকে পৃথিবী হতে উচ্ছেদ করে দিবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ঘটনা যে না ঘটেছে তা নয়। এক সময় পৃথিবীতে ছিলো অতিকায় সরীসৃপের প্রাধান্য। কিন্তু আজ ওদের চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায় না। স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাবে ওরা পৃথিবী হতে চিরদিনের মতো লোপ পেয়ে গেছে। অবশ্য সেরূপ দিন যদি কখনো আসে তাও লক্ষ লক্ষ বৎসরের পূর্বে নয়। তার পূর্বে মানুষ এমন সব কীটনাশক উপায় হয়তো উদ্ভাবন করবে যাতে ওরাই হয়তো পৃথিবী হতে উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

কালি শুক্লা বসন্তের রাতে

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

কালি শুক্লা বসন্তের রাতে
যে পরশ পেয়েছিনু তারে আজ প্রাতে
বাঁধিয়াছি অলখে অন্তরে; মধুনিশি
জেবলেছিল গন্ধদীপ হর্ষে রসে মিশি'
দক্ষিণ ব্যাকুল; সে আলোক নির্নিমেষে
রয়েছিল চাহি'—ধীরে নিভেছিল হেসে।

কালি শুক্লা বসন্তনিশায়
মধুরে আকুল চাঁদ দিগন্ত ভাসায়,
চারিধারে কুহরিল বসন্ত-প্রলাপী
বকুল তরুর শাখে রাত্রি গেল যাপি'
প্রিয় সম্ভাষণ হেরি' জাগে পুষ্পকলি;
শিহরি' আকাশে চাঁদ পড়েছিল ঢলি'।

কালি শুক্লা বসন্ত রজনী
হরিল সকল মন; থামিল বাজনি'
দক্ষিণ বাতাস; ঘুমে অচেতন ধরা
ফুটিল রজনীগন্ধা মধুগন্ধভরা;
ঘুমানু অসহ সুখে অলকা সুদূরে,
একাকী বিনিদ্র প্রেম হেরিল বঁধুরে।



চুরিবিদ্যে

দশমহাবিদ্যা ব্যাপারটা কি, আমি কোন কালে জানিনে। সেদিন যখন এক ভদ্রলোক আমাকে ওবিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তখন আমি একেবারে বোকা বনে গিয়েছিলাম। আমি মোটামুটি জানতুম চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা। কাজেই বল্লুম, দশমহাবিদ্যা বোধ করি দশ রকমের চুরিবিদ্যা হবে। শুনে ভদ্রলোক কি পরিমাণ হেসেছিলেন তা আপনারা অনুমান করতে পারেন। কেন জানিনে ভদ্রলোকের ধারণা আমি বিদ্বান ব্যক্তি। উনি নিশ্চয় ইন্দ্রজিতের খাতা পড়েন না। নিয়মিত পড়লে ঐ মিথ্যে ধারণা এতদিনে নিশ্চয় ঘুচে যেত। বিদ্বান ব্যক্তিরা কক্ষণো অমন অবান্তর বিষয় নিয়ে বাজে বকেন না, তাঁরা স্ট্যাটিস্টিকস্ ছাড়া কথাই কন না। ও'রা সদা সত্যকথা বলেন, আমি মিথ্যে বলতে পারলে সত্য বড় একটা বলিনে। তত্রাচ উক্ত ভদ্রলোক আমার দশমহা-বিদ্যার ব্যাখ্যাটাকে নিতান্তই পরিহাস বলে গ্রহণ করেছিলেন। তা হলে দেখছি বিদ্যার ছলনা দিয়ে আমি আমার মূর্খতাকে কোনো রকমে ঢেকে রেখেছি। এটা যথার্থই মহাবিদ্যা, কারণ এটা শুধু চুরি নয়, জুয়াচুরি। ইন্দ্রজিতের মধ্যে খানিকটা চৌর্যবৃত্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। লুকিয়ে চুরিয়ে আড়াল থেকে কাজ করা তাঁর অভ্যেস ছিল। ইন্দ্রজিৎ নামটা আমি নিতান্ত বৃথা নিইনি। আমিও অনেক রকম লুকোচুরি করে থাকি।

'না বলিয়া গ্রহণ করা'কে যদি চুরি বলেন তবে আমি কখনো চুরি করিনি এমন কথা হলপ করে বলতে পারিনে এবং আমি মনে করি আমার পাঠকদের মধ্যেও অনেকেই পারবেন না। ছোট ছেলেপেলে যখন এটা ওটা খাদ্যদ্রব্য চুরি করে খায় তখন কৈফিয়ৎ তলব করলে বলে ঐটুকু নিলে বুঝি চুরি হয়। তাদের মতে চুরিটা দ্রব্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। বড়রাও অনেক সময় ওরকম যুক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকেন অর্থাৎ মনে করেন ছোটখাট জিনিস 'না বলিয়া লইলে' চুরি হয় না। সত্যি বলতে কি আমিও ওটাকে 'চুরি বলে মনে করি না। পূর্বে যেমন বলেছি সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে আমার ধারণা একটু ঢিলে, তেমনি চুরি সম্বন্ধেও আমার নীতিজ্ঞান তেমন টনটনে নয়। নেহাৎ সিঁদেল চোর না হ'লে কাউকে চোর বলতে আমার বাধে। কেননা কোন না কোন রকম চৌর্যবৃত্তি সব মানুষেই করে থাকে। সিঁদেল চুরিটা একমাত্র জাত চোরেরাই করতে পারে। ওটা আমার আপনার কম্ম নয়। কাজেই অন্য সব চোর আমাদেরই মতো ভদ্রলোক।

মানুষ জিনিসটা এতই বড় এবং এসব জিনিস এত ছোট যে তাতে মানুষ হিসাবে কারো মূল্য কমে যায় বলে আমি মনে করি না। সংসারে অনেক মহাপুরুষরাও চুরি করেছেন। গান্ধীজী আর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিলে ছেলেবেলায় লুকিয়ে স্যাকরার দোকানে গয়না বিক্রি করেছিলেন। এটা অবশ্যই চুরি কিন্তু তাই বলে কি মহাত্মার মাহাত্ম্য কিছুমাত্র কমেছে? আমি বলব বেড়েছে। তিনি আমাদের সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আমিও তোমাদের মতোই সাধারণ মানুষ, আমারও দুর্বলতা আছে। আমি সে দুর্বলতাকে জয় করেছি, তোমরাও করতে পার। এক আধটু ছলাকলা মিথ্যা চুরি ইত্যাদির মিশ্রণ যদি না থাকত তবে মহাত্মা হতেন পাথরের দেবতা। তাঁকে পুজো করা যেত, ভালোবাসা যেত না। পণ্ডিত জওহরলাল বাল্যকালে পিতার টেবিল থেকে ফাউনটেন পেন চুরি করেছিলেন। তাতে কি জওহরের ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র কমেছে? বরং জওহরলাল আজকে যা হয়েছেন ঐ ক্ষুদ্র ঘটনাটি তাঁর একটি কন্ট্রিবিউটরী ফ্যাক্টর। তা যদি না হ'ত তবে ঐ ঘটনাটি তাঁর মহামূল্য আত্মচরিতে তিনি লিপিবদ্ধ করতেন না। সবলে-দুর্বলে, আসলে-নকলে-খাঁটিতে-খাদেতে মিশিয়ে তবে, গোটা মানুষটা।

যাকগে, ফাউনটেন্‌পেনের কথাই যখন উঠল তখন আমার দুঃখের কাহিনীটাই বলি। সম্প্রতি আমার ফাউন্‌টেনপেনটি চুরি গিয়েছে। আমার পক্ষে এটা একটা মেজর ডিসসেস্টার। উৎস লেখনী চুরি যাওয়াতে আমার লেখার উৎস শুকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ইন্দ্রজিতের খাতা অচিরে বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। মানুষ অভ্যাসের দাস। ফাউনটেন-পেন-এ লিখে এমন বদ অভ্যাস হয়েছে যে দোয়াত কলমে লেখা আমার পক্ষে একটা দুঃসাধ্য কসরৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্যি ফাউনটেন পেন অভাবে লিখতে পাচ্ছিনে একথা স্বীকার করা আর লেখার অক্ষমতা স্বীকার করা একই কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ফাউনটেনপেন-এ কালি নেই বলে লিখতে পাচ্ছিনে এ কথা যে ব্যক্তি বলে সে কক্ষণো লেখক হবে না। কাজেই আমার যে লেখক হবার কোনই সম্ভাবনা নেই তা আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন।

সম্প্রতি আমি ধারকরা কলম দিয়ে কোনো রকমে কাজ চালাচ্ছি। কিন্তু ধারকরা কলমের লেখায় ধার থাকে না। আর যে লেখায় ধার নেই, শুধু ভার আছে, সে লেখা আপন ভারেই ডুববে। আমি ভারবাহী লেখক হতে চাইনে। ওসব লেখা লিখবেন বিদ্বানেরা পণ্ডিতেরা অধ্যাপকেরা যাঁদের বিদ্যার উপরে দেবযানীর অভিশাপ আছে। আমি লিখি আপন খুশিতে, ভারমুক্ত মনে। দোয়াতে কলম খুঁচিয়ে লেখা আর মাথা ঘামিয়ে, মাথা কুটে লেখা এক কথা। ও আমার ধাতে সয় না।

এখন আমার সমস্যা হয়েছে ঋণংকৃত্বা কতদিন এই সাহিত্যকার্য চলতে পারে? আমার বন্ধুটি আর কতকাল আমাকে তাঁর কলমটি ধার দেবেন! ঋণ করে ঘৃত পান করা সম্ভব হলেও কাব্যামৃত পান করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। আপনারা অবশ্য বলতে পারেন একটি কলম কিনে নিলেই গোলমাল চুকে যায়। তা যায় বটে; কিন্তু সেটাও আপাতত ঋণংকৃত্বা করতে হবে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি লিমারিক্ মনে পড়ে যাচ্ছে, তাতে আমার সমস্যার কথঞ্চিৎ জবাব পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন—

"সকল পক্ষী মৎস-ভক্ষী
মাছরাঙা হয় কলঙ্কিনী
সবাই কলম ধার করে
আমি শুধু কলম কিনি।"

অবশ্য আমি হ'লে বোধকরি 'ধার করে' না লিখে সবার কলম চুরি করে লিখতুম। তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন কলম কেনাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ধার করে' কিম্বা চুরি করে' যদি কাজ চলে যায় তবে কিনে কি লাভ?

কিন্তু আমি নতুন কলম কেনার কথা তত ভাবছিনে যত ভাবছি হারানো কলমটির কথা। আহা, কতকাল ওকে বুকে করে নিয়ে বেরিয়েছি। বক্ষের ধন আর কাকে বলে? মনের কথা ওকেই বলেছি সকলের আগে। ওর অভাবটা পরমাত্মীয় বিয়োগের মতো লাগছে।

যিনি চুরি করেছেন তিনি নিশ্চয় আমারই মতো ভদ্রলোক, কারণ তিনি সিঁদেল চোর নন। কাজেই তাঁকে অভিশাপ দেব না। বরং প্রার্থনা করছি তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়ে আত্মচরিত লিখুন এবং তাতে এই ফাউণ্টেনপেন চুরির কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করুন। প্রসিদ্ধ চোর-ডাকাতেরা যদি কেউ সাহস করে আত্মকাহিনী লেখেন তবে তা দেদার বিক্রি হবে। আমেরিকার গ্যাংস্টার কেউ যদি আত্মচরিত প্রকাশ করেন তবে সেটাই হবে এ যুগের বেস্ট সেলর।



হোলি

শ্রীসুরজিৎ শাস্ত্রী

শ্যামলিয়াকা বন্‌শী মেরা
নিকলি লাগে লাল
শ্যামলিয়াকা বন্‌শী মেরা
হো-হো—, হা-রা-রা-রা—॥

—মনিয়াকা মাতারি, দেখ্‌ত, কই হল্লা করল্‌বা!

কাঁহা হল্লা করলবা; আজ ত হোলি বা!

—ক্যা কাহা, আজ হোলি!

বুড়ো গা থেকে ছেঁড়া কাঁথাখানা সরিয়ে ফেলে দু'হাতে ভর করে উঠে বসল।—মনিয়াকা মাতারি, ছিলুম লাগা ত!

মনিয়াকা মা তামাক সেজে এনে দিলে বুড়ো দমভর তামাক টেনে, কল্‌কে রেখে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল।

মনিয়ার মা বললে—কাঁহা চলৎবা?—হোলি খেলেঙ্গে নেই।

—বাহার যাওগে, কাপ্‌ড়া কাঁহা?

বুড়ো একটু চুপ করে থেকে বললে তুহার কাপ্‌ড়াঠো দে মনিয়াকা মাতারি!

—হাঁ কাপ্‌ড়া দে দেই, ফির হারাকে আও।

কালী মাইকা কসম নেহি হারায়েঙ্গে।

মনিয়ার মা তার তো করা শাড়ীখানা বের করে দিলে। বুড়ো মালকোচা করে কাপড়খানা পরলে। হাঁড়ির ভিতর পুঁটলিপাকানো একটা পাঞ্জাবি ছিল, সেটা নিয়ে ঝেড়েঝুড়ে গায়ে দিলে।

পাঁচ বছরের ছেলে একটি, রঙিন কাপড়-পরা, একটা পোড়ানো ভুট্টা খেতে খেতে এসে বললে—বাপু, কাঁহা চলে? হাম যায়গা। বুড়ো ছেলেকে জড়িয়ে ধরে, তার চিবুক স্পর্শ করে চুমো খেতে খেতে বললে—তোম্ ঘরপর রহো! হাম হোলি খেলনে যাই: তোমারা ওয়াস্তে মিঠাই আনেঙ্গে। তোমরা কাপ্‌ড়াঠো দেওতো, হাম্ পাগড়ী বনাই।

ছেলে গলা জড়িয়ে ধরে বললে—মিঠাই আনোগে?

হাঁ।

—সাচ্?

—জরুর।

ছেলেটা ন্যাংটো হয়ে কাপড়খানা খুলে দিলে।

বুড়ো পাগড়ী বেঁধে, ময়লা গামছাখানা কাঁধে ফেলে, গোঁফে তা' দিতে দিতে বেরিয়ে পড়ল।



"তোমারা ওয়াস্তে মিঠাই আনেঙ্গে!"

ছেলে বললে, মাই, বাপু হামারাওয়াস্তে মিঠাই আনেগা।

জরুর আনেগা।

—মিঠাই তোম একেলা খাওগে?

—নে-হি. তোম্ খাওগে, হাম খায়গা, বাপুবি খায়গা।

ছেলে গিয়ে মা'র গলা জড়িয়ে ধরলে, মা তাকে আদরে আঁকড়ে ধরে চোখ বুজে রইল।

(২)

বুড়ো রাস্তায় বেরিয়েই গান জুড়ে দিলে—

"রঙ্গে হো হো হোরি
খেলত নওল কিশোরী"—

—আরে কে হো, জমাদার? এত্‌না রোজ কাঁহা রহা?

—আরে ভাই, বড়া বেমার হুয়াথা।

—আও, হোলি খেলে।

—রঙ্ লে আই, তব্ তো!

বুড়ো তার মুনিবদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে গান ধরে দিলে—

"বাজত তাল রবাব পাখোয়াজ,
সখিগণ ঘন করতারি,
রঙ্গে হো হো হোরি—"

—সেলাম বাবু, হোলিকা পরবি মিল যায়।

—কিরে সুরযু, আজকাল কামে আসিস না কেন?

—বাবু, এত্তো দিনের পুরানা নওকর আছি, আবি বুড্‌ঢা হইছি। সব কোই বোলে,—সুরযু, তুহারা মাফিক সাফা কাম কোই করতে পারে না। ক্যা করে আবি বুড্‌ঢা হইছি; পরবি মিল যায় বাবু!

কেউ কিছু দিলে, কেউ দিলে না। দুপুর অবধি ঘুরে ঘুরে সুরযু দশ আনার পয়সা পেলে। চার পয়সার আবির কিনলে, চার আনার মিঠাই কিনে, বাকী পয়সাকটা পাগড়ীর খুঁটে বেঁধে গুঁজে রাখলে। বুড়ো গাইতে গাইতে চলল—

—"কুম্‌কুম, চন্দন, আবির ঘন বরিখন জনু পিচ্‌কারি। রঙ্গে হো হো হোরি।"

শরাবের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে সুরযু দেখলে, সীতারাম, মঙ্গরু, টহলরাম হরকিষণ সবাই বসে দারু খাচ্ছে। তারা বলে উঠল—আরে জমদার ভাই, আও আও মৌজ করে!

সুরযু বললে—নেহি, ঘরপর কাম হ্যায়।

—আরে জেরা বাত তো শুন্ যাও!

বুড়ো ফিরে দাঁড়াল।

—বৈঠো, এক পিয়ালা পি লেও!

হরকিষণ মাটির খুরিতে করে মদ ঢেলে বুড়োর কাছে ধরলে। অনেক দিনের পর শরাবের গন্ধ পেয়ে, বুড়োর প্রাণটা লাফিয়ে উঠল। বুড়ো খুরিটা হাতে নিয়ে—সব কোইকো বন্দেগি, বলে সকলের দিকে তাকিয়ে সবটুকু খেয়ে ফেললে। তারপর হাততালি দিতে দিতে মাথা নেড়ে নেড়ে গাইতে লাগলে—

"হোরি হো রঙ্গে মাতি
আবির অরুণ গোরী শ্যাম কাতি।
হোরি হো রঙ্গে মাতি।"

দারু খেতে খেতে সুরযুর দিল্ খুলে গেল, মিঠাইর ঠোঙা বের করে সকলের সামনে ধরে বললে—লেও খাও!


খুরিটা হাতে নিয়ে—'সব কোইকো বন্দেগি' বলে.........খেয়ে ফেল্‌ল।

সবাই খেতে লাগলে। রামলগন একটা মিঠাই তুলে সুর্‌য্যুর হাতে দিতেই খেতে গিয়ে ছেলের কথা মনে পড়ল। বুড়োর হা-করা মুখ বুজে গেল, মিঠাই হাত থেকে পড়ে গেল।

মদ ফুরিয়ে গেল। "দারু লে আও!" "দারু লে আও!" রব পড়ে গেল। যার কাছে যা ছিল, সবাই দিলে। সুর্‌য্যু তার পাগ্‌ড়ী বাঁধা পয়সাকটা খুলে দিলে। আধা বোতল মদ এল। এক চুমুকে তাও ফুরিয়ে গেল।

শেষে সবাই সুর্‌য্যুকে ধরে বসলে, সুর্‌য্যু ভাই, তোম পুরাণা আদমি, হামলোককো ওস্তাদ: তুম কুছ্‌ খিলাও!

সুর্‌য্যু বললে—পয়সা নেহি।

রামলগন বললে—আও জুয়া খেলে!

তখন সবাই চেঁচিয়ে উঠলে—আও খেলে, আও খেলে!

টহলরাম তাড়াতাড়ি তিনটে পয়সা বের করে ছুড়ে ফেলতে লাগলে, আর বলতে লাগলে—রাণী, নেহি মোহর।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেঁচাতে লাগলে—রাণী রাণী, মোহর মোহর!

সুরয্যু পাগড়ী পণ রেখে খেলতে বসে গেল।

(৩)

এক প্রহর রাত হয়ে পড়ল। দলে দলে লোক হোলি খেলে ফিরছে, সুরযুর কোনো পাত্তা নেই। মনিয়ার মা একে ওকে পুছ করতে লাগলে, কেউ কিছু খবর বলতে পারলে না। তার ভারি ভয় হল। সে আগড় বন্ধ করে ল্যাম্‌পটা জেবলে বসে রইল।

মনিয়া ক্ষিদেয় কান্না জুড়ে দিলে, মা তাকে ভাত দিলে, ভুট্টা দিলে, চানা দিলে, সে খেলে না ছড়িয়ে ফেলে দিলে।—বাপু কাঁহা, হাম মিঠাই খায়েংগা।

এমন সময় বাইরে একটা সোর-গোল শোনা গেল। মনিয়া ভয় পেয়ে চুপ করলে; মনিয়ার মা কান খাড়া করে রইল।

পাশের বাড়ী থেকে সুন্দরী ডেকে বললে—জমাদারনী, জল্‌দি কেওয়াড়ী খোলকে দেখ্‌তো!

মনিয়ার মা তাড়াতাড়ি আগড় খুলে দেখে, সুরযুকে দুজন পাহারাওয়ালা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পাগ্‌ড়ীও নেই, পাঞ্জাবীও নেই! তার পরণে ছেঁড়া গামছাখানা।

মনিয়া আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠলে—আরে বাপু আয়া, হামারাওয়াস্তে মিঠাই লে আয়া!

সে কথা সুরযুর কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। দূরে গলির মোড়ে জড়ানো আওয়াজে গান শোনা গেল—

"রঙ্গে হো হো হোরি"—


পাগড়ীও নেই, পাঞ্জাবীও নেই, পরনে ছেঁড়া গামছা!

প্রসাদী ফুল

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

(৪)

শেখা-ধর্ম ও ফোটা-ধর্ম

শ্রীশ্রীগুরুদেব "শেখা-ধর্ম ও ফোটা-ধর্ম" এই দুইটি শব্দ অনেক সময় ব্যবহার করিতেন। বাজিকরেরা একদণ্ডের মধ্যে একটা বৃক্ষ উৎপন্ন করে, অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বৃক্ষ ফুলে ফলে সুশোভিত হয়; কিন্তু পলকের মধ্যে উহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সেইরূপ কল্পনার মায়াবলে নানা প্রকারের ভাবুকতার বৃক্ষ অল্প সময়ের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু উহার কিছুই স্থায়িত্ব নাই। প্রকৃত বীজ হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, উহা আলো, বাতাস, মাটি ও জলের সাহায্য পাইয়া স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠে। বাজিকরের মায়া-সৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায় উহা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয় না। শেখা-ধর্ম ও ফোটা-ধর্মের মধ্যেও এইরূপ প্রভেদ। কোন এক ভদ্রলোকের দুইটি পুত্র ও দুইটি কুকুর ছিল। তিনি বিদেশে গমনকালে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে একটি কুকুর দিয়া বলিলেন, "দেখ, কুকুর পরম উপকারী ও বিশ্বাসী জন্তু, দিনে অনুগত সহচর, রাত্রিতে বিশ্বস্ত প্রহরী, বিপদে সহায়, সম্পদে সুখী; কুকুরের মতন আর কোন জন্তু নাই।" এইরূপে কুকুরের অনেক গুণ বর্ণনা করিলেন এবং পালিত কুকুর কেমন করিয়া প্রভুকে রক্ষা করার জন্য নেকড়িয়া বাঘের হাতে আত্মবিসর্জন করিয়াছিল ইত্যাদি ইতিহাস অনেক করিয়া বলিলেন, পরে এই আদেশ দিলেন যে, "তুমি এই কুকুরকে ভালবাসিও।"

উক্ত ভদ্রলোক দ্বিতীয় পুত্রকে ডাকিয়া দ্বিতীয় কুকুরটি তাহাকে অর্পণ করিয়া শুধু এই আদেশ করিলেন যে, "দেখ, বৎস, তুমি আমার অনুপস্থিতিকালে এই কুকুরটিকে দুবেলা আহার করাইবে।" কুকুরের গুণের কথা কিম্বা কুকুর জাতির সৎকার্যের ইতিহাস তাহাকে কিছু বলিলেন না।

কয়েক মাস পরে পিতা যখন বিদেশ হইতে ঘরে ফিরিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, বড় পুত্রের সহিত তাহার কুকুরের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র তাহার কুকুরের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃ-মুখশ্রুত কুকুরের গুণের কথা দুইচারি দিন মনে রাখিয়াছিল, কিন্তু উহা তাহার হৃদয়ের উপর কিছুমাত্র কার্য করে নাই, সেই উপদেশ দুই চারিদিনেই পুরাতন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র যখন দুইবেলা কুকুরটিকে আহার দিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে তাহার কুকুরটির প্রতি মমতা জন্মিল, তখন সে উহাকে স্নান করাইত, সঙ্গে করিয়া বেড়াইত এবং অত্যন্ত ভালবাসিত। যদিও পিতা কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট কুকুরের কিছুমাত্র গুণ বর্ণনা করেন নাই এবং উহাকে ভালবাসিতে তাহাকে অনুরোধ করেন নাই, তথাপি স্বাভাবিক নিয়মে কর্মের মধ্য দিয়া ধর্ম ফুটিয়া উঠিল, আর "ভালবাসিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে" এরূপ চিন্তার মধ্য দিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের মোটেই ভালবাসার বিকাশ হইল না। সে ব্যক্তি দুই চারিদিন যে কুকুরের প্রতি মনোযোগ রাখিয়াছিল, তাহা তাহার "শেখা-ধর্ম", আর দ্বিতীয় পুত্রের কর্মের মধ্য দিয়া যে মমতা ফুটিয়া উঠিল, উহারই নাম "ফোটা-ধর্ম"।

"এস আমরা সকলে মিলিয়া ভগবানকে ভক্তি করি" এরূপ বাক্য সহস্র সহস্রবার বলিয়াও কেহ ভক্তিলাভ করিতে পারে না। "সর্বত্রই ঈশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন" পুনঃপুন এরূপ চিন্তা করিয়া চারিদিকে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা অনুভবের চেষ্টা কাল্পনিক ধর্ম অথবা শেখা ধর্ম। উহা দুই চারিদিনের জন্য কোন অদৃশ্য পুরুষের একটা কাল্পনিক সত্তা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইতে পারে; কিন্তু উহা দ্বারা প্রকৃত ব্রহ্মসত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। আচরণের মধ্য দিয়া যে ধর্ম ফুটিয়া উঠে, উহা ফোটা ধর্ম। শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, "যাহা সত্য, যাহা নিত্য, একবার প্রকাশিত হইলে তাহা আর কখনও বিলুপ্ত হয় না। বীজ হইতে অঙ্কুর একবার নির্গত হইলে উহা যেমন আর বীজে প্রবিষ্ট হয় না, সেইরূপ সত্য বিশ্বাস একবার উৎপন্ন হইলে উহা আর নষ্ট হয় না।"

কোন বন্ধ্যা স্ত্রীলোক পরের মুখে শুনিয়া কিম্বা গ্রন্থে পাঠ করিয়া অপত্য স্নেহ লাভ করিতে পারে না। অপরের সন্তানকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে পারে, কিন্তু উহা কদাচ অপত্য স্নেহ নহে। যতদিন না সে সন্তানের মুখ দর্শন করিবে, ততদিন কিছুতেই অপত্যস্নেহ অনুভব করিতে পারিবে না। পুত্র মুখদর্শনমাত্র বিনা উপদেশে অপত্যস্নেহ আবির্ভূত হইবে। যে বস্তুর সন্দর্শনে হৃদয়ের যে ভাবটি বিকশিত হয়, সেই বস্তুর অভাবে অন্য সহস্র প্রকার চেষ্টা দ্বারাও সে ভাব কখনই ফুটিবে না।

চিন্তা করিয়া কিম্বা পরের নিকট শিক্ষা করিয়া যেরূপ অপত্য স্নেহ জন্মে না, সেই-রূপ দাম্পত্যপ্রেম, পিতৃমাতৃ ভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ বন্ধু-বাৎসল্য স্বদেশানুরাগ স্বজাতি প্রেম বিনয়-নম্রতা দয়া উপচিকীর্ষা এমন কি ঈশ্বর বিশ্বাস ও দেবতার ভক্তি, ইহার কোনটিই শুধু চিন্তার সাহায্যে উৎপন্ন হয় না, সাময়িক ভাবে যদিবা চপল-চমকের ন্যায় কোন শুভযোগে দেখা দেয়, কিন্তু তাহা কখনও স্থায়ী হয় না, কেন না উহা ফোটা ধর্ম নহে, শেখা ধর্ম।

উপদেশ দ্বারা লোকের মনে কোন একটা ভাবের ছায়া কিছুকালের জন্য উৎপন্ন করা যায়, কিন্তু বাত্যা বিতাড়িত জলাশয়ের তরঙ্গ মালা যেমন ঝটিকার সঙ্গে বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ উত্তেজনার অবসানে পূর্বোক্ত ভাবও বিলীন হইয়া যায়। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের প্রভাব অধিকতর কাল স্থায়ী হয় বটে, কিন্তু উহাও চিরস্থায়ী হয় না, আচরণ ও তপস্যার মধ্য দিয়া যাহা বিকশিত হয়, তাহাই চিরস্থায়ী হয় এবং তাহারই নাম ফোটা ধর্ম।

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস নবদ্বীপ-দস্যু জগাই মাধাইকে দুইদিন হরিনাম শুনাইলেন। দ্বিতীয় দিবসে মাধাই কলসীর কানা নিক্ষেপ করিয়া নিত্যানন্দের মাথা ফাটাইল, ক্ষমার অবতার দয়াময় নিত্যানন্দ রক্তাক্ত কলেবরে মাধাইকে আলিঙ্গন করিলেন, "মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দিব না?" এই অদ্ভুত দৃষ্টান্ত উপদেশ দান অপেক্ষা অধিকতর কার্য করিল। নিত্যানন্দের ব্যবহারে জগাই স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার পাষাণ প্রাণ বিগলিত হইল। যে সকল সুকোমল মানসিক বৃত্তি দুরন্ত দুষ্প্রবৃত্তিসমূহের চাপে পড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, পলকের অবকাশে তাহারা প্রবলবেগে আসিয়া হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিল, শুষ্ক মরুভূমিতে অন্তঃসলিলা ভোগবতী-গঙ্গার আবির্ভাব হইল। জগাই বলিল, "নিতাইরে আর মেরোনা মাধা ভাই, মার খেয়ে যে প্রেম বিলায় এমন প্রেমিক দেখি নাই।" মাধাইও নিত্যানন্দের আলিঙ্গনে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, তাহার আর বাক্য-স্ফূর্তি হইতেছে না। বৃশ্চিক দংশনের

জ্বালার ন্যায় উভয় ভ্রাতা অনুতাপের জ্বালায় দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু ইহার পর যদি প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া সাধন প্রদান না করিতেন, তবে এই সাময়িক অনুতাপ দীর্ঘদিন কার্যকরী হইতে পারিত না। সম্ভবত উহা ন্যাকড়ার আগুনের মতন কিছুকাল দপ্ দপ করিয়া জ্বলিয়া অচিরে নিবিয়া যাইত। উপযুক্ত প্রণালী প্রাপ্ত না হওয়ায় কত শত শত ব্যক্তির হৃদয়ের ধর্মাগ্নি নিবিয়া গিয়াছে। আচরণের মধ্য দিয়া সহজভাবে বলিতে গেলে তপস্যার মধ্য দিয়া যাহা বিকাশ প্রাপ্ত হয় তাহাই ফোটা ধর্ম এবং উপদেশ শুনিয়া ও দৃষ্টান্ত দেখিয়া হৃদয়ে যে একটা সদ্ভাবের সঞ্চার হয়, উহা শেখা ধর্ম।

যাঁহারা আমাদের দেশের সাধু সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, আচরণের মধ্য দিয়া ধর্মকে ফুটাইয়া তোলাই এদেশীয় সাধনার প্রকৃষ্ট প্রণালী। কতকগুলি উচ্চ তত্ত্ব মুখস্থ করিলে ধর্ম লাভ হয় না, উপযুক্ত আচরণের মধ্য দিয়া উচ্চ তত্ত্ব সাধকের প্রাণে আপনি ফুটিয়া উঠে। অন্ধ ব্যক্তির নিকট প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করিলে সে সৌন্দর্য সে ব্যক্তি কিছুই অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু কোন মহৌষধি বলে যদি তাহার চক্ষুদান করা যায়, তবে বর্ণনা করিয়া না বুঝাইলেও সে ব্যক্তি প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়।

যিনি এইরূপ চক্ষুদান করিতে পারেন, যিনি অভিজ্ঞ ও উৎকৃষ্ট মালীর ন্যায় বীজ হইতে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে সর্বাপেক্ষা সুন্দর করিয়া বৃক্ষকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনি সদ্‌গুরু, তিনি যে ধর্ম শিক্ষা দান করেন, সেই ধর্ম ফোটা ধর্ম, আর আর চিন্তা উপদেশ ও দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া যে সাময়িক ভাব উৎপন্ন হয় উহা "শেখা ধর্ম।"

(৫)

বিকাশ ও বিকার

শ্রীশ্রীগুরুদেবকে একদিন নিবেদন করিয়াছিলাম যে, তাঁহার ধর্মমতের পরিবর্তন লইয়া লোকেরা অনেক কথা বলিয়া থাকে, বস্তুত এরূপ পরিবর্তনের কারণ অনেকে বুঝিতে পারে না, তাহারা মনে করে যে, ইহা একরূপ মানসিক চাঞ্চল্যের ফল, মতের বিকার।

তিনি উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম এই যে, "লোকেরা কি বলিবে কি না বলিবে, ইহা ভাবিয়া চলা যায় না, লোকের মন যোগাইয়া চলা এককথা, আর সত্যের সম্মান রক্ষা করা অন্য কথা। যাহা দেখিতেছি তাহাই বলিতেছি।" যে পথিক এক লক্ষ্যে নির্দিষ্ট পথে চলিতেছেন, কখন অত্যুচ্চ পর্বত, কখন গভীর গহ্বর, কখন সমতল ক্ষেত্র কখন পুষ্পোদ্যান এবং কখনও মরুভূমি তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে; যখন যাহা দেখিতেছেন, তাহাই বলিতেছেন, লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য তিনি কি বলিবেন যে, সকলই একইরূপ দেখা যাইতেছে? লোকেরা যখন বলিবে যে, তুমি একবার বলিতেছ পুষ্পোদ্যান, আবার বলিতেছ মরুভূমি, তোমার কথার কিছু ঠিক নাই; তখন তিনি বলিবেন আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিতেছি তোমাদের অনুরোধে অথবা কোন মতের অনুরোধে কিম্বা পূর্ব কথার সহিত মিল রাখার অনুরোধে আমি সত্য গোপন করিতে পারি না। *

আবার কেহ যদি বলে, "কৈ আমিত এতকাল ধরিয়া দেখিতেছি, কিন্তু আমারত দৃশ্যের পরিবর্তন হইতেছে না, আমিত বিভিন্ন কিছুই দেখিতেছি না।" একথার উত্তরে তিনি বলিবেন যে, আমিও বহুকাল তোমার মতন একবস্তুই দেখিয়াছি, তখন মনে করিয়াছি, এই দৃশ্যের আর পরিবর্তন হইবে না ইহাই একমাত্র সত্য ও সনাতন, কিন্তু পরে আরও চলিতে চলিতে বিভিন্ন দৃশ্য সকল দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। অবশেষে দেখিলাম বৈপরীত্য কোথাও নাই, যাহা আছে, তাহা বিচিত্রতা মাত্র; সেই সমস্ত বিচিত্রতা লইয়া একটি সর্বাঙ্গসুন্দর দৃশ্য দেখিলাম, পূর্বে যাহা দেখিয়াছিলাম, উহা অংশমাত্র পরে যাহা দেখিলাম তাহা সমগ্র, পূর্বের বস্তু ধর্মাঙ্গ, পরের বস্তু ধর্ম। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটিকে বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। ঐ যে বৃহৎ বৃক্ষটি দেখা যাইতেছে, উহার নাম মহুয়া বৃক্ষ। উহার মূল কান্ড পত্র পুষ্প ও ফল এই সমস্ত উক্ত বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অথবা ঐ সমস্ত লইয়াই উহার বৃক্ষত্ব।

এখন বিচার কর। এই বৃক্ষের ত্বকের স্বাদ অত্যন্ত কটু, ফুলের স্বাদ বড়ই মধুর, ফলের স্বাদ অতিশয় তিক্ত এই ছাল ফল ও ফুল যে একই বস্তুর অভিব্যক্তি বা বিকাশ, কিছুতেই তুমি তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। ছাল বলিবে আমি কটু, ফুল বলিবে আমি মধুর, ফল বলিবে আমি তিক্ত, আর যদি বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা কর সে কি বলিবে? সে বলিবে, কটু তিক্ত মধুর তিনই আমি। আবার আকৃতির বিভিন্নতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলিবে আমি মূল, কেহ বলিবে আমি কান্ড, কেহ বলিবে আমি পত্র, কেহ বলিবে আমি ফুল, কেহ বলিবে আমি ফল; আর বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কি বলিবে? সে বলিবে এই মূল কান্ড পত্র পুষ্প ফল সমস্ত লইয়া আমিই সমগ্র বৃক্ষ। ইহারা খন্ড, আমি অখন্ড; ইহারা অংশ আমি সমগ্র; আমাকে না জানিয়া যতক্ষণ খন্ডভাবে ইহাদিগকে জানিবে, ততক্ষণ তোমার ভেদবুদ্ধি থাকিবে, তুমি এক হইতে অন্যকে স্বতন্ত্র দেখিবে।

ব্যবহারিক জ্ঞানে তিক্ত আর মধুর কি বিভিন্ন রস নহে? কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, একই বস্তুর ক্রম বিকাশে কটু মধুর ও তিক্ত রস উৎপন্ন হইতেছে। তুমি অভ্র দেখিয়াছ? গোলাপী বর্ণের একখানা অভ্রকে যদি পর্দায় পর্দায় খুলিয়া পাতলা কর, তবে সেই পাতলা পাতাগুলি শ্বেতবর্ণ ধারণ করিবে, আবার যদি অনেকগুলি গোলাপী বর্ণের অভ্র এক সঙ্গে করিয়া মোটা একটা চাপ প্রস্তুত কর, তবে সেই চাপটি কৃষ্ণবর্ণ

---

* পাশ্চাত্য ঋষি Emerson বলিয়াছেন,—
"A foolish consistency is the hobgoblin of little minds, adored by little statesmen and philosophers and divines. With consistency a great soul has simply nothing to do. He may as well concern himself with his shadow on the wall. Speak what you think now in hard words, and to-morrow speak what to-morrow thinks in hard words again, though it contradict everything you said today; 'Ah, so you shall be sure to be misunderstood'; Is it so bad, then, to be misunderstood? Pythagoras was misunderstood, and Socrates, and Jesus, and Luther, and Copernicus, and Galileo ,and Newton and every pure and wise spirit that ever took flesh. To be great is to be misunderstood"—Emerson's Essays—Self-Reliance.

অর্থাৎ পাছে আগাগোড়া মতের মিল না থাকে, দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের মনে ভূতের ভয়ের মত এইরূপ একটা ভয় আছে। রাজনৈতিক (Statesman), দার্শনিক এবং ধর্মাচার্যগণের মধ্যে যাঁহারা অল্পপ্রাণ, তাঁহারা এই ভয়ে ভীত থাকেন। মহাত্মগণ এই ভয়ের ধার ধারেন না। প্রাচীরের গাত্রে পতিত আপন ছায়ার সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ আগাগোড়া মতের মিল (consistency) রাখা না রাখার সহিতও তাহাদের সেই সম্বন্ধ। আজ যাহা ঠিক বুঝিয়াছ, সজোরে তাহা প্রকাশ কর এবং কল্যকার মত যদি অদ্যকার মতের সম্পূর্ণ বিপরীত হয় তাহাও সজোরে প্রকাশ কর। তোমাকে লোকেরা নিশ্চয়ই ভুল বুঝিবে, কিন্তু এইরূপ ভুল বুঝা কি বড়ই মন্দ? পিথাগোরস, সক্রেটিস, যীশুখৃষ্ট, লুথার কপারনিকাশ, গ্যালিলিও নিউটন প্রভৃতি সমস্ত দেহধারী পবিত্রাত্মা জ্ঞানীগণকেই লোকেরা ভুল বুঝিয়াছেন। মহাপুরুষ মাত্রকেই লোকেরা ভুল বুঝিয়া থাকে।

"অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্।"
(কুমারসম্ভব ৫ম অধ্যায়)

ধারণ করিবে। এইরূপ রঙ্কের খেলা অনেক বস্তুতে দেখা যায়। পূর্বোক্ত মহুয়া বৃক্ষটি এবং অভ্র প্রভৃতি বস্তুগুলি স্থূলে চক্ষুর দৃশ্য, এজন্য উহাদের রস ও রূপের পরিবর্তনের ধারা অল্পায়াসেই বুঝিতে পারা যায় কিন্তু সাধকের মানসিক ব্যাপারগুলি এরূপ স্থূলে চক্ষুর দৃশ্য বিষয় নহে এজন্যই যতটুকু তোমার অভিজ্ঞতার আয়ত্ত, তাহার একটু ব্যতিক্রম দেখিলেই তুমি সিদ্ধান্ত করিয়া লও যে, অপর দ্রষ্টা যাহা বলিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা। কেননা কটু কখন মধুর হয় না, মধুর কখন তিক্ত হয় না এবং লাল কখন শাদা হয় না, শাদা কখন কাল হয় না। তোমার এই ভ্রান্ত ধারণা স্থূলে বস্তুতে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইলেও তোমার সংস্কার উহাকে পরিত্যাগ করে না, তাই তুমি যাহা দেখ নাই, যে বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা নাই যথাসাধ্য জোর করিয়া তাহার সমালোচনা করিতেছ। যে কখন করকা কিম্বা বরফ দেখে নাই, তরল জলের যে একটা কঠিন মূর্তি আছে, তাহা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না, জলের ধাক্কা খাইয়া যে জাহাজ ডুবিতে পারে, এরূপ কথাকে সে পাগলের প্রলাপ মনে করে। সূর্য রশ্মিতে সমুদ্র হইতে আকৃষ্ট হইয়া যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা (আমাদের চক্ষে) নিরাকার, তাহা হইতে যে মেঘ জন্মে তাহা সাকার হইলেও অস্পর্শ; সেই মেঘ যখন বারি হয়, তখন উহা আমাদের তিন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, সেই জল যখন শিলা হয়, তখন আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা উহাকে সম্ভোগ করি। দেখিলেত নিরাকার বাষ্পের সাকার মূর্তি কেমন স্তরে স্তরে বিবর্তিত হইয়াছে। ইহা জানিতে পারিয়াই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক সাধকবর কাঙ্গাল ফকির ('হরিনাথ মজুমদার) স্বরচিত সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—"তোমায় আজ ঘন হতে হ'লো। পাতল পাতল থাকলে কেবল পিপাসা কি যায় হে বল? তোমায় ঘন হ'তে হলো" ইত্যাদি। ভগবানের চিদ্‌ঘন মূর্তি, আনন্দঘন মূর্তি নিরাকার (nothing) নহে, উহা সাধকের প্রত্যক্ষ প্রাণের বস্তু, তাঁহাকে প্রাণে না পাইয়া শুনিয়া মুখস্থ করিয়া আওড়াইলে কিছুদিন পরেই শব্দগুলি পুরাতন হইয়া যায়, কেন না যে বস্তুর সঙ্গে যাহার সাক্ষাৎ নাই, তাহার ধ্যান তাহার পক্ষে অসম্ভব। বন্ধ্যা নারীর পুত্রস্নেহের ন্যায় বাস্তবিক উহা অবস্তু।

বাষ্পকে দেখা যায় না, উহা শুধু অনুমান সিদ্ধ বস্তু, মেঘকে দেখা যায় বটে, কিন্তু ধরা যায় না, অঞ্জলীতে কিম্বা কোনরূপ পাত্রে ন্যস্ত করা যায়-না এবং উহাকে পান করাও চলে না; জলকে ধরা যায়, পান করা যায়, কিন্তু উহার বর্ণ কিরূপ তাহা জানা যায় না, করকা কিম্বা বরফকে ধরা যায় এবং উহার বর্ণও প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং নিরাকার বাষ্প যতই ঘন হইতে লাগিল, ততই উহা সাকার হইয়া বিবিধ ইন্দ্রিয়ের গোচর হইল। যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে তৃষিত, সে শুধু বাষ্পের চিন্তা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, তাই সাধক গাহিয়াছেন, "তোমায় ঘন হ'তে হলো।" এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, বাষ্প হইতে বরফ পর্যন্ত বাষ্পের এই যে বিবিধ প্রকারের অভিব্যক্তি উহা তাহার বিকাশ না বিকার?

যিনি বাষ্পতত্ত্ব মাত্র অবগত হইয়াছেন, তিনি যদি বলেন যে, উহা অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়—সে কথা সত্য কথা। আবার যিনি বাষ্প হইতে বরফ পর্যন্ত সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি যদি বলেন যে, উহা সাকারও বটে নিরাকারও বটে—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ বটে এবং সর্বেন্দ্রিয়ের উপভোগ্যও বটে, তাঁহার সে কথাও সত্য কথা।

ঋষিরা তাঁহাকে অনাবৃত বলিয়াছেন এবং অণুপ্রবিষ্ট বলিয়াছেন এবং অণু হইতে অণু, বৃহৎ হইতেও বৃহৎ বলিয়াছেন—"কথং তদুপলভ্যতে" বলিয়াছেন, আবার হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় উপলব্ধি করিয়াছেন, "আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি" তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশিত হন। নামানন্দ, কীর্তনানন্দ, অপার্থিব বস্তু হইলেও উহা তাঁহার মূর্তি নহে, তাঁহার "আনন্দঘন মূর্তি" আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেব যখন মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন কোন সাধকের প্রশ্নের উত্তরে নিজ হাতে লিখিয়া দিয়াছেন, "বিষয়রস বিন্দুমাত্র থাকিতে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না।" তাঁহার নিকট দীক্ষিতা কোন এক মহিলার ১৮ (আঠার) ঘণ্টা ইচ্ছা সমাধির কথা শুনিয়া বলিলেন—"এ অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু এখনও ঈশ্বর-বিশ্বাস জন্মে নাই। এই সমাধি নামানন্দের সমাধি, এই আনন্দ চুষিয়া চুষিয়া আত্মা নিষ্পাপ হয়, তখন সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আপনি প্রাণে প্রকাশিত হন।" ইহার পরে এই মহিলা একদিন একাসনে ৩২ ঘণ্টা সমাধিস্থা থাকিয়া বলিয়াছিলেন "ঈশ্বর আমাকে বুকে করিয়া আছেন।" সেদিন হইতে উদ্দেশে পূজা অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ পূজা আরম্ভ হইল। বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা আরও দূরের কথা। তখন ঈশ্বর সাকার হইয়া সাধকের সঙ্গে নানা প্রকারের লীলা করেন। আমরা নিম্নস্তরের লোক, প্রকৃত আস্তিক্য বুদ্ধির অভাবে উদ্দেশে পূজা করিয়াই আপনাকে চরিতার্থ মনে করি এবং আপনার অবস্থাকে মাপকাঠি করিয়া অন্যের পরিমাপ করিয়া থাকি।

"কিছু না" হইতে "কিছু" হয় না, এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত আমরা করিতে পারি, কিন্তু পরমেশ্বর কিছু না (nothing) নহেন, তিনি অবশ্যই "কিছু"। অগোচর যে গোচর হয় না, নিরাকার যে সাকার হয় না, সূক্ষ্ম যে স্থূল হয় না, ইহা একটা ভ্রান্ত ধারণা। অগোচর বাষ্প কেমন করিয়া সর্বেন্দ্রিয়ের গোচর (বরফ) হইল? যদি বল "তখন তাহার অগোচরত্ব, নিরাকারত্ব থাকিল না, সুতরাং স্বরূপের পরিবর্তন হইল। ঈশ্বর "অব্যয়" তাঁহাতে কি পরিবর্তন সম্ভব? এই প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর এই যে, জড় পদার্থ একই সময় একই ব্যক্তির নিকট "গোচর" ও "অগোচর" হইতে পারে না। একথা সত্য; যদি ধরিয়া লও যে ভগবানের কোন "অচিন্ত্য-শক্তি নাই, তথাপি দোষ হয় না, কেননা তিনি "একই ব্যক্তির" নিকট "একই সময়ে" গোচর ও অগোচর, হইতেছেন, একই সময়ে এক ব্যক্তির গোচর ও অন্যের নিকট অগোচর হইতেছেন এবং কখন একই ব্যক্তির নিকট এক সময়ে গোচর ও অন্য সময়ে অগোচর হইতেছেন। ইহার মধ্যে স্ববিরোধিতা দোষ কোথাও ঘটিতেছে না। যদি বল তাঁহার আকৃতির পরিবর্তনে "অব্যয়ত্ব" বিনষ্ট হইল, সে কথার উত্তর এই যে, তাঁহার আকৃতির পরিবর্তন হয় না, তাঁহার যে আকার তোমার অগোচর ছিল, তাহাই তোমার গোচর হইল, তাঁহার পরিবর্তন কিছুই হইল না। যে সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু তোমার ব্যবহারিক দৃষ্টির অগোচরে আছে, যন্ত্র সহযোগে সে সকল তোমার প্রত্যক্ষ হইলে তুমি বলিতে পার না যে, নিরাকার জীবাণু সাকার হইল। তোমার গোচর হইল বটে, কিন্তু উহা যেরূপ ছিল, সেইরূপই আছে। পরমেশ্বর যে প্রত্যক্ষ হন, আস্তিক্য বুদ্ধির অভাববশতঃ আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না, তাই কখন উপাসনাজনিত আনন্দকে তাঁহার আবির্ভাব বলিয়া মনে করি, কখনও কতকগুলি দার্শনিক মতকে ঈশ্বর বিশ্বাস বলিয়া ঘোষণা করি, কখন বা নিজের অভিপ্রায়কে প্রত্যাদেশ মনে করিয়া প্রবঞ্চিত হই। ভগবান যে শব্দ করিয়া কথা কহিতে পারেন, সাকাররূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারেন, তাহা বিশ্বাস করিবার উপযোগী আস্তিক্য বুদ্ধি নাই। এরূপ ধর্মভাব নাস্তিকতা হইতে স্বতন্ত্র হইলেও প্রকৃত আস্তিকতা নহে, ভগবানের স্পষ্ট ব্যক্তিত্বে অবিশ্বাস গূঢ়রূপে উহার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

দেশ-বিদেশের ঋষিগণ, মহাপুরুষগণ ও অবতারগণ এ বিষয় যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, প্রকৃত আস্তিক্য বুদ্ধির অভাববশতঃ আমরা যে তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না, শুধু তাহা নহে, অহঙ্কারে তাহাদিগকে কুসংস্কারী বলিয়া ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না।

অগ্রে বিদেশের কথা বলিয়া পরে স্ব-দেশের কথা বলিব। মুসা একটা ঝোপের

মধ্যে পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইব্রাহিম পরমেশ্বরকে দেখিলেন, তাঁহার কথা-বার্তা শুনিলেন এবং পরমেশ্বরের হুকুম পাইয়া আপনার একমাত্র পুত্রকে দেবতার নিকট বলি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সুতরাং তাঁহার দর্শন ও শ্রবণ কিরূপ সুস্পষ্ট তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। * যোগীবর ঈশা তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার যে স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও নিরাকার নহে। হজরৎ মহম্মদ, তাঁহার আল্লার সহিত সর্বদা কথাবার্তা বলিয়াছেন এবং সমস্ত কোরাণ গ্রন্থখানি আল্লা তাঁহাকে অক্ষরে অক্ষরে স্পষ্ট শব্দ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

ভারতীয় ঋষি ও ভক্তগণ তিনরূপে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সে তিনটি রূপ ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান। ব্রহ্মকে জ্ঞানে, আত্মাকে ধ্যানে এবং ভগবানকে অন্তরে বাহিরে জ্ঞান-চক্ষে ও চর্ম-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব জ্ঞানের আধার ছিলেন। তাঁহার সময়ে যাঁহারা বড় বড় বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, তিনি ব্রহ্ম বিচারে তাঁহাদের সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী কে ছিল? প্রকাশানন্দ সরস্বতী, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানিগণ পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য-দিগের মধ্যে অধিকাংশই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। এ হেন জ্ঞানী-শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গ—যিনি জটিল ব্রহ্মতত্ত্বের চরম মীমাংসা "অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদ" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনি অনায়াসে বিশ্বাস করিলেন যে, গোপাল বিগ্রহ দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বহুদূর হাঁটিয়া আসিয়াছেন, এবং সেইজন্যই তাঁহার "সাক্ষীগোপাল" নাম হইল। ব্রহ্ম-জ্ঞানিগণ দলে দলে মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সাকার রাধা-কৃষ্ণের উপাসক হইলেন, তাঁহাদের মত পরিবর্তনের কৈফিয়ৎ অতি অপূর্ব, যথা,—

"অদ্বৈতবীথী পথিকৈ রুপাস্যাঃ
স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধ দীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূ বিটেন।"
(ভক্তিরসামৃত সিন্ধু)

ইহার তাৎপর্য এই যে, আমরা আত্মানন্দ (ব্রহ্মানন্দ) সম্ভোগ করিতে করিতে অদ্বৈত-পথের পথিকদিগের সহিত চলিয়াছিলাম, রাস্তায় কোন এক শঠ গোপবধূ চোর আমাদিগকে দাসী করিয়া ফেলিয়াছে।

এরূপ প্রশ্নের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উত্তর আর হইতে পারে না। কাহারও ধর্মমত পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইহা বই আর উত্তর নাই যে, ভগবান আমাকে এই পথে আনিয়াছেন। বিদেশী সলকে (সেণ্টপল) জিজ্ঞাসা কর, খলিকা ও মরকে জিজ্ঞাসা কর, স্বদেশী প্রকাশানন্দকে জিজ্ঞাসা কর, অথবা বর্তমানযুগের বিবিধ সম্প্রদায়ের প্রকৃত ধর্মার্থীদিগের মত পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা কর, যিনি যে ভাষায় যেরূপভাবে উত্তর প্রদান করুন, প্রকৃত উত্তর একই, "ভগবান আমাকে এইখানে আনিয়াছেন।"

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করা যেমন তোমার নিকট বিকৃত মস্তিষ্কের কার্য, একজন নিরীশ্বরবাদীর নিকট তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাস ও তাঁহার উপাসনা করা তদপেক্ষা অধিকতর বিকৃত মস্তিষ্কের কার্য। স্নায়ু-শৃঙ্খলা (Nervous system) পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছা যে থাকিতে পারে, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ আছে কি? যদি বা অন্ধভাবে বিশ্বাস করিয়া লওয়া যায় যে, অবলম্বন-বিহীনভাবে জ্ঞান অবস্থিতি করিতে পারে, তথাপি সেইরূপ জ্ঞান যে অবস্থিতি করিতেছে তাহার প্রমাণ আছে কি? যাঁহারা সৃষ্টি-কৌশলের মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব দেখাইতে ব্যস্ত তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, সৃষ্টি-কৌশলের মধ্যে যদি কোন স্রষ্টা থাকেন, তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির অধিকাংশ ধারায় অভিযুক্ত করা যাইতে পারে। বস্তুত আস্তিক্য বুদ্ধির অভাববশত নাস্তিক যেরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, আস্তিক্য-বুদ্ধির অল্পতাবশত তুমিও সেইরূপ বিশ্বাস করিতে পার না যে, ঈশ্বর দেখা দেন, কথা বলেন, সকল বস্তুতে সকলরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন। তোমার অপেক্ষা যে ব্যক্তি কঠিন তার্কিক, তাহাকে তুমি নাস্তিক বল, এবং তোমার অপেক্ষা যাহার আস্তিক্য-বুদ্ধি অধিক, তাহাকে তুমি অন্ধ-বিশ্বাসী বলিয়া থাক, ধর্ম সম্বন্ধে ইহা একান্তই গোড়ামী। অন্যের ধর্ম-বিশ্বাসকে তুমি তর্কের অস্ত্রে কাটিতে চাও এবং তোমার যুক্তিহীন মতগুলিকে তুমি বিশ্বাসের দোহাই দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া লও, কাজেই তোমার দক্ষিণে ও বামে সম্মুখে বা পশ্চাতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই তোমার গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া পড়ে, এবং তোমার মতের গণ্ডীর বাহিরে তুমি কিছুই দেখিতে পাও না, এইজন্যই বিকাশের ক্রম বুঝিতে না পারিয়া তুমি বিকাশকে বিকার বলিয়া মনে কর।

এই প্রবন্ধে আমি কতকগুলি দৃষ্টান্তের ব্যবহার করিয়াছি। এমন অনেক কুতার্কিক আছে, যাহারা দৃষ্টান্তের দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বক্তব্য বিষয়ের গৌরব লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। তাঁহাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, দৃষ্টান্ত কখনও যুক্তি নয়, কোন সত্যকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্যই দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত সত্যের সম্ভাবনা প্রকাশ করে। এবং জটিল ও কঠিন বিষয়কে হৃদয়ে ধারণা করার সাহায্য করে মাত্র। সুতরাং দৃষ্টান্তে ভুল থাকিলেও লব্ধ সত্য মলিন হয় না। আমি বাষ্প ও মহুয়া বৃক্ষের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাহা লইয়া বিবিধ তর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু আশা করি, আমি দেশ-বিদেশের মহাপুরুষগণের যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, আমার প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলিতে ত্রুটী থাকিলেও সে সকল উক্তির সত্যতা মলিন হইবে না।

আর একটি কথা এই যে, অনেকে দৃষ্টান্তকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে চাহেন, দৃষ্টান্তের কোন্ অংশটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। ভাবিয়া দেখুন "চন্দ্রবদন" বলিলে কেহ যদি চন্দ্রের মত গোলাকার এবং বৃহৎ কলঙ্ক-বিশিষ্ট চক্ষু-কর্ণ নাসিকা বিহীন একখানি উজ্জ্বল চেপ্টা মুখ বুঝিয়া লয়েন, তবে চন্দ্রবদনখানি কিরূপ কদর্য বদন হইয়া দাঁড়ায়। আশা করি, আমার এই প্রবন্ধের পাঠক পাঠিকাগণ আমার প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলিকে এইরূপ নির্দয়ভাবে দেখিবেন না। আমি যে সকল সত্য তত্ত্ব প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, সেই সকলের প্রতিই দৃষ্টি রাখিবেন। (ক্রমশ)

* কেহ মনে করিতে পারেন যে, এরূপ আদেশ কখনও সম্ভব নহে এবং ঈশ্বর যে ইব্রাহিমের বিশ্বাস পরীক্ষার জন্য এরূপ করিয়াছেন তাহাও বলা যায় না, কেননা, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কি ইব্রাহিমের মনের অবস্থা পরীক্ষা না করিয়া বুঝিতে পারিতেন না? এরূপ সংশয় নিরসনের যথেষ্ট যুক্তি আছে, কিন্তু এস্থলে সে চেষ্টা না করিয়া শুধু সংক্ষেপে একটা কথা বলি। কথাটা এই যে, ভক্তের মহিমা প্রচারের জন্য যুগে যুগে ভগবান এইরূপ লীলা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি ইব্রাহিমের হৃদয় জানিতেন না বলিয়া পরীক্ষা করেন নাই, জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই করিয়াছেন।

পুরস্কার
উচ্চ শ্রেণীর ঘড়ি
চামড়ার সুটকেস
প্রভৃতি পুরস্কার
দেওয়া হইবে।
নিয়মাবলীর জন্য
পত্র লিখুন
এন, পি, হাউস
পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৮
কলিকাতা

সাহিত্য প্রসঙ্গ

আজকের সাহিত্যের রূপ ও প্রকৃতি

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

শুধু মাত্র দেখা, শোনা আর জানা নিয়েই যদি সাহিত্য হত, তাহলে তার বিচরণ-ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকত ইতিহাস, ভূগোল আর ভ্রমণ-কাহিনীতে; আর শুধু ভাব-কল্পনাই যদি সাহিত্যের একমাত্র উপাদান হত, তাহলে রূপকথা বা ছেলে-ভুলানো ছড়া হওয়া ছাড়া তার আর উপায় থাকত না। কিন্তু সাহিত্য তো শুধু মানুষের বাচালতার প্রমাণ নয়, সে হচ্ছে তার নৈঃশব্দ অনুভবের প্রকাশ। মানুষ যত কিছু দেখেছে, শুনেছে এবং জেনেছে—তা সে যত আশ্চর্যজনকই হোক না কেন এবং যত কিছু কল্পনা করেছে—তা যত মনোরমই হোক না কেন, তার সুনিপুণ প্রকাশেও স্পষ্ট হবে না সাহিত্য—যদি না সে বলতে পারে, কী অনুভব সে করেছে। বাস্তববাদী এবং কল্পনাবাদী—দু'দলই চাইছে সাহিত্যের ওপরে নিজ নিজ অধিকার আরোপ করতে, আর তার প্রমাণস্বরূপ এনে হাজির করছে নিজ নিজ দলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নজির। একদল যখন আঙুল দেখাচ্ছে Ibsen-এর নাটকের দিকে, অন্যদল তখন চীৎকার করে উঠছে Oscar Wilde-এর রচনার নামে। একদল যখন আঁকড়ে ধরেছে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ', অন্যদল তখন লাফাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন' নিয়ে। এই সমস্ত রচনার মধ্যে কোনটিরই সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। তার কারণ যে-গুণে প্রথম শ্রেণীর রচনাগুলো সাহিত্য হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই একই গুণে সাহিত্য হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলো। সেই গুণটি এরা অর্জন করেছে রচয়িতার গভীর অনুভবকে বক্ষে ধারণ করে।

রবীন্দ্র-যুগের পরে বাঙলা সাহিত্যে যে আর একটা নূতন যুগ এসেছে, একথা স্বীকার করতেই হয়। আধুনিক বাস্তববাদীরা এ-যুগ সম্বন্ধে যেমন অতিমাত্রায় আশাশীল, প্রাচীন রসবাদীরা তেমনি এ-যুগ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় নিরাশাসম্পন্ন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আজকের যুগের সাহিত্যের স্বরূপ কী—একথা ভেবে দেখতে হলে আমাদের নানাপ্রকার 'ism'-এর মোহ এবং দলগত নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগ নিতান্ত নিরর্থক। সঙ্কীর্ণ মনোভাব পরিত্যাগ করে একটু উদার দৃষ্টি দিয়ে তাকালেই একথা বোঝা যাবে যে, সাহিত্যমাত্রেরই সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত দুটি বস্তু নিয়ে। একটি তার দেহ বা রূপ—যাকে ইংরেজিতে বলে form, অন্যটি হচ্ছে তার প্রাণ বা প্রকৃতি—যাকে বলা চলে spirit. ইতিপূর্বে যে দেখা-শোনা-জানা অথবা ভাব-কল্পনার কথা বলা হয়েছে, তারা সৃষ্টি করে সাহিত্যের দেহমাত্র। কিন্তু তার আত্মা সৃষ্টি করার জন্যে চাই গভীর অনুভূতি। সংস্কৃত সমালোচকগণ কাব্যের আত্মা হিসেবে যে রস, ধ্বনি ইত্যাদির উল্লেখ করে গেছেন, তা সবই আসে ওই অনুভূতি থেকে। গভীর অনুভূতির প্রকাশ না হলে সাহিত্যে কখনো রস-ধ্বনির উৎপত্তি হতে পারে না।

কিন্তু প্রাণ বা আত্মা বিরাজ করে দেহকে আশ্রয় করেই, সুতরাং সাহিত্যের বহিরঙ্গ রূপটি—তার প্রকাশভঙ্গীটিও যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, একথা তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে। সুস্থ সুন্দর দেহের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় সুস্থ সুন্দর প্রাণ। সে-জন্যেই সাহিত্যের বহিরঙ্গ রূপটি হচ্ছে তার প্রাথমিক প্রয়োজন।

আধুনিক যুগের সাহিত্য এই বহিরঙ্গ রূপের দিক থেকে অপ্রত্যাশিত উন্নতিলাভ করেছে। বহু শক্তিশালী লেখকের হাতেই আজকের সাহিত্য বাচন-ভঙ্গিতে, শব্দচয়নে, চরিত্রচিত্রণে, ঘটনা-সংস্থানে এবং সংলাপ রচনায় সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা অতিরিক্ত উৎসাহী, তাঁরা এ থেকেই তার মূল্য বিচার করে থাকেন। কিন্তু একথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, বহিরঙ্গ রূপের এই ত্রুটিহীনতা সত্ত্বেও আজকের সাহিত্য মানুষের হৃদয়কে তেমন করে স্পর্শ করতে পারছে না—সাড়া জাগাতে পারছে না মনে। এ যেন ঠিক 'শো-কেস'-এ সাজানো পুতুলের মত দেখতে শুনতে অবিকল মানুষটি, অভাব শুধু প্রাণশক্তির। আজকের সাহিত্য আমরা সাগ্রহেই পড়ে থাকি—হয়তো ভালও লাগে, কিন্তু কথা শেষ হয়ে গেলেই তার সুর যায় শেষ হয়ে। যতক্ষণ তার বাচালতা, ততক্ষণই তার আয়ু। বচনের মধ্য দিয়ে কোন স্পর্শই পাওয়া যায় না অনির্বচনীয়ের। মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি,' বনফুলের 'জঙ্গম', তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ইত্যাদি রচনা আমাদের বিস্মিত করে, কিন্তু মুগ্ধ করতে পারে না। এই সব শক্তিশালী লেখকের সৃষ্টিনৈপুণ্য যতখানি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়, তার তুলনায় অনেক কম প্রভাব রেখে যায় মানুষের মনে। বিগত যুগের রচনার মধ্যে



এমন অনেক সাহিত্য আছে, যা বীণার ঝঙ্কারের মত। সুর শেষ হয়ে গেলেও মূর্চ্ছনা জেগে থাকে তার আকাশে-বাতাসে। কিন্তু আজকের সাহিত্যে কোথায় সেই স্পর্শ—সেই মূর্চ্ছনা? কোথায় সেই রস—সেই ধ্বনি? পরিপূর্ণতার সমস্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কেন তার এই শূন্যতা—এই প্রাণহীনতা?

কারণ আজকের সাহিত্য অনুভবের প্রকাশ নয়—বুদ্ধির বিকাশ। আজকের সাহিত্যিক সমস্ত কিছুকে বুঝছে মস্তিষ্ক দিয়ে—হৃদয় দিয়ে নয়। ফলে তার সৃষ্টিতে পাচ্ছি বিচার-বিশ্লেষণের, যুক্তিতর্কের নির্ভুল নিখুঁত বিন্যাস, কিন্তু পাচ্ছি নে অনুভূতির কোনো স্পর্শ। আজকের এই বস্তুতন্ত্রের যুগ নানা আঘাতে প্রতিঘাতে আমাদের এত সচেতন করে তুলেছে, আজকের বিজ্ঞান তার অকাট্য যুক্তিতে সমস্ত রহস্যকে আজ আমাদের কাছে এত পরিষ্কার করে তুলেছে, আজকের অর্থনীতি সমস্ত দুঃখ আর অভাবের মরণকে এমন স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছে যে, প্রতি পদে পদে জাগ্রত হয়ে উঠছে আমাদের বুদ্ধি—তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে আমাদের বিবেচনা। হৃদয়ের যুক্তিহীন অনুভূতি, রহস্যময় অবোধ্য সংবেদন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে তার আড়ালে। আজ কোনো দরিদ্রকে দেখে—তার অভাবের হাহাকার শুনে আমরা তার অন্তরের বেদনাকে মনে মনে অনুভব করিনে, তার মধ্য দিয়ে দর্শন করি কার্ল মার্কসের অর্থনীতির প্রত্যক্ষ স্বরূপকে। আকাশে রামধনু দেখে আজ কবি ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ-এর মত আমাদের মন আনন্দে নেচে ওঠে না; ও শুধু জল্পনার ওপর রবিকিরণের মায়া। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আচ্ছন্ন করে আজ জেগে উঠেছে 'বোটানী', মানুষের দেহলাবণ্যকে আবৃত করেছে 'এ্যানাটমী'। হৃদয় জাগবার আগেই জেগে উঠছে মস্তিষ্ক, অনুভূতি কাজ করবার আগেই এগিয়ে আসছে বুদ্ধি-বিচার। তাই আজকের রচনা প্রায়ই চলে যাচ্ছে ইতিহাস ভূগোল আর ভ্রমণকাহিনীর কাছাকাছি অর্থাৎ সেই দেখা-শোনা-জানার রাজ্যে। সেজন্যেই তার বাস্তবতা বজায় আছে—অক্ষুণ্ণ আছে দেহসৌষ্ঠব, কিন্তু জাগ্রত হয় নি প্রাণসম্পদ—যাকে বলা যায় আত্মা। তাই আজকের সাহিত্য মনোরম হয়েও মনোহর নয়, মধুর হয়েও মহৎ নয়। অথচ বিগতযুগের সাহিত্যে এমন অনেক উদাহরণ আছে যা বহিরঙ্গরূপের দিক থেকে যথেষ্ট ত্রুটীপূর্ণ হয়েও অনুভূতির স্পর্শে প্রাণবান হয়ে উঠেছে। ময়মনসিংহের প্রাচীন গীতিকাগুলো বহিরঙ্গ রূপের দিক থেকে ত্রুটীবিচ্যুতিহীন নয়—তাদের দেহের বহু স্থানেই আছে কাঁচা হাতের অনিপুণ চিহ্ন, কিন্তু যে গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাদের মধ্য দিয়ে তা মানুষের মনে বিছিয়েছে চিরকালের আসন। শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের রচনা 'বড়দিদি', 'কাশীনাথ', 'চন্দ্রনাথ' ইত্যাদির বাইরের রূপকে কোনোমতেই ত্রুটীবিহীন বলা যেতে পারে না, তবু তারা সাহিত্যের আসরে চিরস্বীকৃতি পেয়েছে তাদের অনুভূতির প্রাণসম্পদে।

প্রশ্ন হতে পারে—তাহলে কি প্রকাশের পরিপূর্ণতাই বড়, না অনুভূতির প্রকাশই বড়? সর্বাঙ্গসুন্দর প্রাণহীন দেহের চেয়েও অপেক্ষাকৃত অসুন্দর প্রাণবান দেহ যে অনেক বেশি বাঞ্ছনীয় সে তো অনায়াসেই বোঝা যায়। সাহিত্যের দেহ বস্তু দিয়ে গঠিত হবে, কিংবা কল্পনা দিয়ে গঠিত হবে সে প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে যুগধারার ওপরে। বিভিন্নযুগের বিভিন্ন রুচি অনুসারে তার হতে পারে পরিবর্তন। কিন্তু তার আত্মা পরিবর্তনহীন—প্রতিযুগেই তার অবলম্বন অন্তরের গভীর অনুভূতি।

তাই বলে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে নিরাশার কারণ নেই। আধুনিক রচনার মধ্যেও প্রাণবান সাহিত্যের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সে নিতান্ত মুষ্টিমেয়, সম্ভাবনার তুলনায় অনেক কম তার সংখ্যা। কিন্তু এ দৈন্য একদিন ঘুচে যাবে। নবাস্বাদিত এই বুদ্ধিবিবেচনা আর যুক্তিতর্কের উগ্রতা যেদিন অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসবে, সেদিন বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হবে এসে অনুভূতি। আজকের সাহিত্যের সুস্থ সুন্দর দেহের মাঝে যেদিন সঞ্চারিত হবে প্রাণের স্পন্দন, সেদিন সাহিত্যক্ষেত্রে ঘটবে এক নব অভ্যুদয়। সে শুভদিন কবে আসবে কে জানে!



সদা জাগ্রত দৃষ্টি
সিদ্ধান্তে দ্রুত উপনীত হইতে সাহায্য করে। কিন্তু বিশ্বাসপ্রবণ ক্রেতাগণকে সহজেই অন্যায় প্রতিযোগীতার কবলে ফেলা হইয়া থাকে, ফলে আসল জিনিষের পরিবর্ত্তে নকল নিয়ে ঠকতে হয়। গুণে ও কার্য্যে "কণ্ডুদাবানল" সকল নিকৃষ্ট অনুকরণকে পরাজিত করিয়াছে। ইহাতে পাচড়া, ফোড়া, কাটা, পোড়াঘা বা যে কোনও প্রকার ক্ষত নিশ্চিত আরোগ্য হয়। সুতরাং এই মালিশযুক্ত এ্যান্টিসেপটিক কিনিবার সময় বিশেষ ভাবে, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যেন সামান্য নামান্তরে নিকৃষ্ট অনুকরণে প্রবঞ্চিত না হন্।

শুধু আসল ঔষধের জন্যই দাম দিন্!



এল, এম, সাহ শঙ্খনিধি এণ্ড কোং লিঃ - ঢাকা
ব্রাঞ্চ ৩২ই, জ্যাকসন লেন, কলিকাতা

মহাচীনে ভারতের বিস্মৃত সম্পদ

শ্রীনচিকেতা সেন

চীন ও ভারতের মৈত্রী সম্বন্ধে আজকাল আমরা সকলেই অনেকটা সচেতন হ'য়েছি, কিন্তু আরও কতটা সচেতন হওয়া দরকার সেটা বুঝতে হ'লে এই মৈত্রীর পিছনে যে কি বিরাট সম্ভাবনা ভাবীকালের সাধকদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তা জানা প্রয়োজন।

অতীত যুগে ভারতের সভ্যতা, ভারতের কৃষ্টি অনেক বড় ছিল, অনেক বিরাট ছিল, একথা আমরা কেবল মুখে মুখেই বলে আসছি। কিন্তু সত্যি কি ভেবে দেখি কি বিরাট ব্যাপার তখন ঘটেছিল? আমরা কি ভাবতে পারি অতীতের সেই বিস্মৃত যুগে সমগ্র এশিয়ার তিন-চতুর্থাংশ দেশের অসংখ্য রাজ্যের রাজধর্ম ছিল বৌদ্ধধর্ম আর ভারত-বাসীমাত্রেই ছিল দেবদেশের অধিবাসী? আমরা কি ভাবতে পারি, অতীতের সেই যুগে চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, তুর্ফান, অগ্নিদেশ, কুচী, ইয়ারকন্দ, খোটান, কাশগর বহ্লীক, গান্ধার, কপিশা, তাশকুরগান, বাদাকসান, বামিয়ান, নগরহার, উড্ডীয়ান, তুখার, সুন্দদেশ, সমরকন্দ, নিয়া, শ্যামক, রামঠ প্রভৃতি অসংখ্য দেশে ও জনপদে হাজার হাজার মঠ ও বিহার তৈরী হ'য়েছিল? বৌদ্ধশাস্ত্রের রীতিমত আলোচনা ও সংখ্যাতীত বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ তখন এসব দেশে হ'ত। কেবল অনুবাদ ছাড়া বহু মূল গ্রন্থও এই সব দেশের পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে রচনা করেছেন এবং তার অনুবাদও সেই দেশীয় ভাষায় করে গেছেন। এই সব দেশের মধ্যে অনেক দেশেরই নিজস্ব কোন সাহিত্য ছিল না। বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থের অনুবাদ-সাহিত্যই এখন পর্যন্ত অতীতের সেই সব জাতির সাহিত্যিক নিদর্শন হ'য়ে আছে। অনেক জাতি তার নিজস্ব মাতৃভাষা ছেড়ে দিয়ে তৎকালে প্রচলিত ভারতের প্রাকৃত ভাষাকেই তাদের রাষ্ট্রভাষা বলে গ্রহণ করেছিল। এই সব দেশের নানা জায়গায় যে সব বড় বড় বিহার ও সংঘারাম স্থাপিত হ'য়েছিল, তার সব কটিই ছিল বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের সংগে তুলনা ক'রলে আজকের এই সভ্য জগতের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়কেই মাথা হেঁট ক'রতে হবে। উদাহরণস্বরূপ আমি কেবল তুন্‌হোয়াংএর নাম উল্লেখ ক'রছি। প্রাচীন যুগে যে বিরাট দুটি হাঁটা পথ পারস্য থেকে মধ্য এশিয়া হ'য়ে চীনে গিয়েছিল এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতকে চীনের সংগে সংযুক্ত করেছিল, তারা চীনের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে তুন্‌-হোয়াং নামে জনপদে এসে মিশেছিল। চীনযাত্রী পরিব্রাজকেরা নানা দেশ থেকে এখানে এসে জড় হ'তেন, কিছুদিন এখানে বিশ্রাম করে পথের ক্লান্তি কাটিয়ে তাঁরা চীনের ভিতরে ঢুকতেন। কাজেই তুন্‌-হোয়াং শীঘ্রই বৌদ্ধশাস্ত্রালোচনার একটি বড় কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়াল। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক মঁসিয় পল পেলিয়ো বিপুল অধ্যবসায়ে এখানে পুরোণো কালের একটি গিরিগুহা খুঁজে বার করেছেন। এই গিরিগুহায় বিশ হাজারের উপর পুঁথি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রায় সব পুঁথিই বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে নানা ভাষায় ও নানা লিপিতে লেখা। সংস্কৃত, সুগ্দীয়, কুচীয়, তিব্বতীয়, তুর্কীয় প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় লেখা পুঁথিরা সব পাশাপাশি ভিড় করেছিল এই গিরিগুহায়। কত দূর-দূরান্তর, দেশ-দেশান্তর থেকে যে বিদ্যাপিপাসু মনীষীর দল এখানে এসে জড় হ'তেন, তার ইয়ত্তা নেই। তখনকার দিনের এই সব বিশ্ববিদ্যালয় যে কত বড় ছিল, তা এক তুন্‌-হোয়াংএর গিরিগুহায় খুঁজে পাওয়া এই লুকোনো সম্পদ থেকেই সহজে অনুমান করা যায়।

যাক্, এ ত গেল কেবল মধ্য এশিয়ার কথা। এ ছাড়া ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বালিদ্বীপ প্রভৃতি দেশেও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ঠিক এই রকমই প্রত্যক্ষ ছিল। মধ্য এশিয়ায় এবং চীনে বৌদ্ধধর্মই ছিল ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের একমাত্র বাহন। এশিয়ার দক্ষিণাংশে কিন্তু সে কাজ একা হিন্দুধর্মই মাথা পেতে নিয়েছিল। অবশ্য এই সব হিন্দুপ্রধান দেশেও যে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ শ্রমণেরা একান্ত সম্মানার্হ ছিলেন, তার অনেক প্রমাণ পণ্ডিতেরা পেয়েছেন।

কিন্তু অতীতের সেই সব জাতিই আজ বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। যারা আজও বেঁচে আছে, তারা হয় সভ্যতার সেই ধারাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে অন্য এক কৃষ্টিকে আশ্রয় করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর না হয়, সেই ধারাকে সম্পূর্ণ ভুলে আবার নিজেদের সেই পুরোণো তমিস্রার যুগে ফিরে গিয়েছে। একমাত্র মহাচীনই জগতের একটি প্রাচীনতম জাতি হিসাবে তার বিরাট ঐতিহ্য ও সভ্যতার উপর ভারতের ছাপ বহন করে এখনও বেঁচে আছে।

বৌদ্ধধর্ম ও সভ্যতা যে কত বিরাট ছিল, তা ভারতবর্ষ আজ নিজেই প্রায় ভুলতে বসেছে। এই সব দেশের অতীত ইতিহাস ও বর্তমানের এই জীবন্ত চীনকে দেখে আমরা তার সেই বিরাটত্বের কিছুটা আভাস পাই। কিন্তু কেবল আভাস পাওয়াই ত সব নয়। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক মূল্যবান দলিলই চীনের ইতিহাসের দপ্তরে চাপা পড়ে আছে। সকলেই জানেন যে কয়জন প্রাচীন সম্রাটের বিবরণ ও তাঁদের সমসাময়িক ভারতের অবস্থা আমরা কিছু পরিষ্কারভাবে জানি, তা সবই বাইরে থেকে আনা ভ্রমণকারী বা বিদেশী সম্রাটের পাঠান দূতের লেখা বিবরণ পড়ে। এই সব ভ্রমণকারী ও বৈদেশিক দূতের ভিতর চীন থেকে আনা পরিব্রাজকদের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। চীনের রাজকীয় ইতিহাসের পাতা খুঁজলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য এখনও বার করা যেতে পারে।

ভারতের সবচেয়ে দামী সম্পদ হচ্ছে তার নিজস্ব ভাবধারা ও চিন্তাসূত্র। এগুলি যে সব পুঁথিতে নিবন্ধ ছিল, তার মধ্যে বৌদ্ধযুগ ও তার চাইতেও প্রাচীন আমলের অনেক পুঁথিই এখন আর আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতের সেই চিন্তাধারার একটা বিরাট অংশ চীন-ভারত-মধ্য এশিয়া ও তিব্বতের মৈত্রীর যুগে ঐ সব দেশীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হ'য়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ও বিপুল হচ্ছে চীনা ভাষায় অনূদিত ভারতের প্রাচীন চিন্তাধারা। অতীতে এবং বর্তমানের এই তথাকথিত সর্বাপেক্ষা সভ্যতার যুগেও এত বড় বিরাট অনুবাদ-সাহিত্য আর কোন দেশেই নেই। সে যে কত হাজার হাজার বই তা সঠিকভাবে নির্দেশ করাও দুরূহ। জাপানী পণ্ডিত নানুজুর সবচেয়ে হালের জাপানী গ্রন্থতালিকায় কেবল চীনা-ত্রিপিটকেরই যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে দেখতে পাই যে ৭০০০ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত মোট ২১৮৪টি ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ এতে আছে। এ প্রায় সবই অনূদিত বৌদ্ধ-সাহিত্য। চীনে বিভিন্ন রাজবংশের শাসনকালে ত্রিপিটকের যে সব গ্রন্থতালিকা তৈরী হ'য়েছিল, তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, পণ্ডিত নানুজ উল্লিখিত ২১৮৪টি গ্রন্থ ছাড়া আরও বহু গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হ'য়েছিল। তার অনেক গ্রন্থই হয়ত এখন বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু বোধ হয় চীনের পুরোণো বৌদ্ধ বিহার ও গ্রন্থাগার খুঁজলে এখনও সে সব বই-এর কিছু কিছু মিলতে পারে।

সে সব দুর্লভ গ্রন্থের কথা আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। যে সব বই এখনও চীনে সুলভ, ভারতের পক্ষে তার দাম যে কত বেশি, সে কথাই আমরা ব'লব। বৌদ্ধশাস্ত্রের ত্রিপিটক

কথা সবাই জানেন। বিনয়পিটক এই ত্রিপিটকের অনতম একটি পিটক। এই বিনয়-পিটক ভারতবর্ষেরই অনেক ভাষায় লেখা হ'য়েছিল এবং অনেক তার সংস্করণ ছিল। আজকাল আমরা পালিভাষায় তার যে সংস্করণ পাই সেটি বৌদ্ধসংঘের মাত্র একটি শাখায় প্রচলিত ছিল। এই রকম আরও পাঁচটি শাখায় প্রচলিত বিনয় পিটকের পাঁচটি সংস্করণের সব কটির অনুবাদই চীনা ভাষায় আছে। কোথায় তাদের পার্থক্য এবং সে পার্থক্যের কারণ কি এ প্রশ্ন ছাড়া ইতিহাসের অপরিহার্য মালমসলা হিসাবেও অনেক জিনিস পাওয়া যাবে, এই ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি সংস্করণে। পালিভাষায় লেখা বিনয়পিটকের যে সংস্করণ আমরা পাচ্ছি, চীনা ভাষায় অনূদিত বিনয়পিটকের এই পাঁচটি সংস্করণ তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং পালি বিনয়পিটক থেকে অনেকাংশে অধিক তথ্যপূর্ণ। সূত্র পিটকের যে অনু-বাদ আমরা চীনাভাষায় পাই, সে অনুবাদ যে সংস্কৃত থেকে করা হ'য়েছিল, তা পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন। এই মূল সংস্কৃতসূত্র পিটক হারিয়ে গেছে। কেবল তার খণ্ডিতাংশ মধ্য এশিয়ার এখানে সেখানে নির্জন পাহাড়ের গুহায় বা মরুভূমির বালিতে ঢাকা পুরাণো বৌদ্ধ-বিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে খুঁজে পাওয়া গেছে। চীনা ভাষায় অনূদিত এই সূত্র-পিটকের সঙ্গে পালিভাষার সূত্র-পিটকের অনেক তফাৎ আছে। বৌদ্ধ-সংঘের প্রথম যুগে বৌদ্ধ-সূত্রের কি রূপ ছিল তা জানবার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই দুই সংস্করণের সূত্র-পিটক মিলিয়ে পড়া। ত্রিপিটকের ভিতর অভিধর্মপিটকে কেবল বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা করা হ'য়েছে। বিনয়-পিটক ও সূত্র-পিটকের মত চীনা ভাষায় অনূদিত অভিধর্ম-পিটকও সংস্কৃত ভাষায় লেখা অভিধর্ম-পিটকেরই অনুবাদ। বলা বাহুল্য সংস্কৃত অভিধর্ম-পিটক এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তাতে কি ছিল জানতে হলে চীনা অভিধর্ম-পিটকই আমাদের একমাত্র সম্বল। পালি অভিধর্ম ও চীনা অভিধর্ম মূলত এক। কিন্তু চীনা ভাষায় অভিধর্ম-সংক্রান্ত এমন কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ আছে যার মূল বিলুপ্ত এবং পালিভাষায়ও তা নেই। অন্য কোন ভাষায় যে তার অনুবাদ হ'য়েছিল এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। কাজেই বৌদ্ধদর্শনের পরিপূর্ণ আলোচনায় এই সব অনুবাদগুলির সাহায্য একান্ত দরকার।

এ হ'ল কেবল হীনযান সম্প্রদায়ের কি কি গ্রন্থের অনুবাদ চীনা ভাষায় হ'য়েছিল, তার অনুমান আভাস। মহাযান সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থের অনুবাদ চীন ও তিব্বতী ভাষায় হ'য়েছিল। সেই সুবিপুল গ্রন্থমালার কয়েকটি র মূল সংস্কৃত পুঁথি নেপালে পাওয়া গিয়েছে। আদি মহাযান বৌদ্ধমত কি ছিল তা জানতে হ'লে চীনা ভাষার এই বই পড়া ছাড়া অন্য কোন পথই এখন আর নেই। ভারতবর্ষে বা মধ্য এশিয়ায় তার যে কি রূপ ছিল তা এখনও আমাদের অজানা।

এ ছাড়া বজ্রযান প্রভৃতি সম্প্রদায়েরও বহু গ্রন্থ এখনও একমাত্র চীনা অনুবাদেই পাওয়া যায়।

এ হ'ল কেবল বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ। এই বৌদ্ধ-ধর্মকে কেন্দ্র করেও অনেক গ্রন্থ চীনা পণ্ডিতেরা চীনা ভাষাতেই লিখে গেছেন।

সুই বংশের শাসনকালে যে রাজকীয় গ্রন্থ-তালিকা তৈরী করা হ'য়েছিল, তাতে আমরা আয়ুর্বেদের বহু গ্রন্থের নাম পাই। নাগার্জুন, জীবক, ভারতীয় ঋষি, গন্ধমাদনবাসী ঋষি প্রভৃতি বিভিন্ন আয়ুর্বেদাচার্যের লেখা বহু খণ্ডে সমাপ্ত অনেক বই-এর নাম সেই তালিকায় আছে। এ ছাড়া জ্যোতিষ, খগোল বিদ্যা, পঞ্জিকা ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে লেখা অনেক ভারতীয় বইএর অনুবাদ যে চীনা ভাষায় হ'য়েছিল, তারও উল্লেখ পাই এই সব গ্রন্থ-তালিকায়। হয়ত এসব বই এখন চীন দেশেও পাওয়া যায় না। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের উদাসীন থাকাটা লজ্জাকর। এইসব বইএর মূল ভারতবর্ষ থেকে অনেক আগেই লোপ পেয়েছে। যদি এর কোন একটিও আজ চীনাভাষার ভিতর দিয়ে ফিরে পেতে পারি, তবে সে যে ভারতের পক্ষে কতটা সৌভাগ্যের কথা, তা সহজেই সকলে বুঝতে পারেন।

এই সব অনুবাদের কাজ যাতে সহজে করতে পারেন, সেজন্য পণ্ডিতেরা অনেক অভিধান, অনেক গ্রন্থ-তালিকা তৈরী করে-ছিলেন, সেইসব চীনা-সংস্কৃত-তিব্বতী গ্রন্থ-তালিকা ও অভিধানের সাহায্য আজও এই বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁদের কাছে অপরিহার্য।

এই সব বই ছাড়া, ভারতের শিল্পকলা, তার ভাস্কর্য, তার স্থাপত্যশিল্প, তার সংগীত প্রভৃতি অনেক বিষয়ের অনেক বিলুপ্ত ধারার সন্ধান এখনও চীনে পাওয়া যায়।

এ সবই ভারতের বিস্মৃত সম্পদ। আমরা নিজেরা ত এ সম্পদকে হারিয়েইছি। বাইরে থেকে এখনও যে তা ফিরিয়ে আনা যেতে পারে, সে সম্বন্ধেও আমরা উদাসীন। আমাদের পূর্বপুরুষ যাঁরা এ সম্পদ আমাদেরই জন্যে বাইরে গচ্ছিত রেখে গেছেন, তাঁদের তপস্যার কঠোরতা আজ আমাদের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে। কী তীব্র প্রেরণা নিয়ে সাধকের পর সাধক, ভিক্ষুর পর ভিক্ষু, চিরহিমাবৃত থিয়েন শান, কুনলুন, হিমালয় প্রভৃতি পর্বত পার হয়েছেন, দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমিতে অসহ্য তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করে দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে। কিভাবে যে তাঁরা গভীর অরণ্য, অতলস্পর্শী গহ্বর আর খরস্রোতা পার্বত্য নদী অতিক্রম করে একান্ত অপরিচিত সুদূর জনপদে যেয়ে পেঁাছেছেন, সে সব কাহিনী গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর। এ'রা যদি কেবল পণ্ডিত হ'তেন, তবে হয়ত তাঁরা চীন ও ঐসব দেশে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন না। এ'রা ছিলেন সত্যিকারের আচার্য—যে আচার্যের কথা বৈষ্ণব কবিরা বলে গেছেন, "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।" এ'দের পূত চরিত্রের প্রভায় এ'দের ধর্ম, এ'দের সভ্যতা বিদেশীদের কাছে অপূর্ব ভাস্বর হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। তাই কাশ্যপ মাতঙ্গ, ধর্ম-রক্ষা, গুণ-বর্মা, সংঘভূতি, ধর্মক্ষেম; সংঘভদ্র; কুমারজীব, লোকোত্তম, গৌতম সংঘদেব, পুণ্য-ত্রাতা, ধর্মযশাঃ, বিমলাক্ষ, বুদ্ধজীব; গুণভদ্র; বুদ্ধযশা; জ্ঞানভদ্র; জিনযশা; উপশূন্য, পরমার্থ প্রভৃতি আচার্যের নামে এখনও চীনের আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রদ্ধায় ও সম্মানে মাথা নত করে থাকেন। এ'দের কাহিনী আজও চীনে অমর হয়ে আছে।

যে পথে দিবারাত্র মৃত্যু তার হিমশীতল হাত বাড়িয়ে আছে, মৃত্যুর সেই ভয়কে উপেক্ষা করে তাঁরা এগিয়ে গেছেন সেই পথে। কী অমৃতের সম্পদ তাঁদের প্রাণে ছিল, যার ভরসায় তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় হয়েছিলেন, সেকথা আজ আমাদের ভেবে দেখতে হবে। এই জীবন যে অন্তহীন যাত্রা-পথের একটা অংশমাত্র এই সত্য তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অনন্ত বা শূন্য যা বলেই বোঝাই না কেন, তাকে না পাওয়া বা তাতে নিঃশেষে নিজেকে মিশিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত এই যাত্রার আর বিরাম নেই। যে পথিক এই সত্যকে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছে, মৃত্যু ত তার কাছে তুচ্ছ। সেই জন্যে সমগ্র জীবনকে তাঁরা নিঃশব্দে উৎসর্গ করে দিতে পেরেছেন লোক-কল্যাণের সুমহান্-ব্রতে। তাই ভারতের সন্তান এই ধর্মাচার্যদের নাম আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। অথচ চীনের অধিবাসীরা অসীমশ্রদ্ধায় তাঁদের জীবনী লিখেছেন অপরিসীম যত্নে তা রক্ষা করে এসেছেন। প্রভু বুদ্ধের শাসন ও বাণী তাঁরা নিজেদের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অমৃতের সেই আলোতেই তাঁরা তাঁদের প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদের মাঝে এসেছিলেন। মহাকালকে অগ্রাহ্য করে নিজের কীর্তির উপর তাঁরা তাঁদের ধ্যানের আসন পেতেছেন। তাঁদের কাছে আমাদের ঋষি-ঋণ যে কবে শোধ হবে, তা কে জানে? *

---

* ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচি মহাশয়ের ইংরেজি ভাষায় লেখা India and China বইটি থেকে বর্তমান প্রবন্ধের অধিকাংশ মালমশলা নেওয়া।



আমার পিতৃব্য এবং তাঁর গাভী

চুন্-চ্যান্ ইয়ে

[চুন-চ্যান্ ইয়ে আধুনিক চীনের সাহিত্যে নবাগত। ইনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডে ভ্রাম্যমাণ বক্তৃতা দানের কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই সময় তিনি কয়েকজন তরুণ ইংরেজ সাহিত্যিক ও সম্পাদকের তাগিদে ও উৎসাহে ইংরেজী ভাষায় নিজের দেশের পরিবর্তনশীল সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্র-জীবনের পটভূমিকায় কয়েকটি গল্প রচনা করেছিলেন। গল্পগুলি ইংল্যান্ডের সাহিত্যরসিকদের সমাদর পেয়েছে এবং সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তারই একটি গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হল।—অনুবাদক]

আমার ছোট বেলায় আমি আমার পিতৃব্যের গাভীটির সংগে মধ্য চীনের ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় খেলা করতাম। গাভীটি গ্রামের কৃষক-রমণীর মত মধুর স্বভাব, ধৈর্যশীল এবং কর্মনিপুণ ছিল—অবশ্য কৃষক-রমণীর মত তার মুখ দিয়ে কথার খই ফুটত না। যখন সে খুবই পরিশ্রান্ত থাকত, তখন সে শুধু মাথা নামিয়ে ধীরে ধীরে জাবর কাটত এবং তার মুখের চারদিকে ফেণা দেখা দিত। কিন্তু সে কোন সময়ই লাঙগল টানতে অসম্মত হত না। মাটি কর্ষণরত ল্যাঙগল মুঠোয় ধরে আমার পিতৃব্য তার পিছনে পিছনে চলতেন; সে শুধু মাঝে মাঝে মাথা ফিরিয়ে তার দিকে নীরবে তাকাত। কৃষিকার্যে অভিজ্ঞ আমার পিতৃব্য অমনি বুঝতে পারতেন তার সেই চাউনির অর্থ কি। তিনি তার কাঁধ থেকে জোয়াল খুলে নিয়ে তাকে আমার হাতে দিয়ে বলতেনঃ "যাও—এখন ওকে নিয়ে মজা কর।" আর তিনি নিজে ধান-ক্ষেতের পাশে পাথরের উপরে বসে ড্রাগন আকৃতির অদ্ভুত বাঁশের চোঙায় তামাক খেতেন।

আমি প্রথমেই তাকে নিয়ে যেতাম নদীর জলের কাছে, সে প্রায় দশ মিনিট ধরে আরামে জল খেত। সে জল থেকে ধীরে ধীরে মাথা তোলার সময় তার মুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ত নদীর বুকে আর তার ফলে দূরবর্তী মালবাহী কোন খচ্চরের গলার ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ হ'ত এবং সে প্রবহমান জলধারার ওপারে সবুজ পাহাড় ও গোচারণ-ভূমির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাত। আমাদের তিন হাজার মাইল দীর্ঘ প্রাচীন ইয়াংসি নদী মধ্য চীনের উপত্যকায় এসে সুপ্রশস্ত হয়েছে—তার ফলে এপার থেকে দেখলে ওপারের সবুজ পাহাড় ও গোচারণ ক্ষেত্রকে মনে হয় ভৌতিক ধরণের—অস্পষ্ট এবং কুয়াশাচ্ছন্ন। মনে হয় ওইগুলোর প্রতি তার যেন কেমন একটা আকর্ষণ ছিল—কেমন একটা রহস্যময় অনুভূতি ছিল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে বেশ কিছুক্ষণ জোর গলায় হাম্বা হাম্বা করত।

"আহা, বোকার মত কাজ করো না—ওখানে কোন ষাঁড় নেই", আমার পিতৃব্য এই কথা বলতে বলতে তার কাছে এগিয়ে আসতেন। "তোমার মত ভাবপ্রবণ উত্তেজনা-প্রবণ মেয়ে আর আমি দেখিনি।" আবার তিনি তাকে জোয়ালে জুড়তেন—আর সেও উচ্চবাচ্য না করে বিনা তোষণে যন্ত্রের মত লাঙগল টানতে সুরু করত; সে যথারীতি ধৈর্যের সংগে শান্তভাবে সুপ্রাচীন মাটির বুকে লাঙগল টেনে যেত।

আমার পিতৃব্য ভাল কৃষক ছিলেন; তার অর্থ এই যে, তিনি যে মাটিতে কাজ করতেন সেই মাটিকে এবং যে জীবটির সাহায্যে কাজ করতেন তাকেও ভালভাবে বুঝতেন। শীত শেষ হবার পর তিনি মাঠ থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে বুড়ো আঙগুল দিয়ে হাতের মধ্যে তাকে পিষতেন এবং সযত্নে তার ঘ্রাণ নিতেন। মাটিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে কিনা তিনি তা সংগে সংগে বলে দিতে পারতেন—অর্থাৎ মাটি বীজ বোনার পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে কিনা সে কথা বলতে পারতেন। ধানের চারা রোপণের পর তিনি জলমগ্ন মাটির রঙ দেখে বলে দিতে পারতেন তার পুষ্টিসাধনের প্রয়োজন আছে কিনা এবং তার জন্যে প্রকৃত পুষ্টির ব্যবস্থাই তিনি করতেন। তিনি বলতেনঃ "শূকরের সার বড় কঠিন। একাংশ গোবরের সংগে দুই তৃতীয়াংশ জল মিশিয়ে দিলেই ভাল হয়।" প্রায়ই দেখা যেত যে তাঁর কথাই নির্ভুল।

কিন্তু আমার পিতৃব্যের নিজের কোন জমি ছিল না। আমার পিতামহ পিতৃব্যের মতই সুনিপুণ কৃষিজীবী হওয়া সত্ত্বেও গভীর দারিদ্র্যের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি আমার পিতৃব্যকে মাথা গোঁজার জন্যে যে ক্ষুদ্র কুটিরটির উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন সেটি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শবাধারের খরচ জোগানোর জন্যে বিক্রী করা হয়েছিল সেই জমিদারের কাছে যার জমিতে তিনি চাষ করতেন উৎপন্ন শস্যের ষাট ভাগ খাজনা হিসেবে দিয়ে। তাঁর আর কিছুই ছিল না—যদিও তিনি ছিলেন একজন সৎ এবং পরিশ্রমী কৃষক—এ রহস্যের কারণ আমি বুঝতে পারিনি। কাজেই আমার পিতৃব্যের বয়েস দশ বৎসর হতে না হতেই তাঁকে জীবিকার সংগ্রামে নামতে হয়েছিল—প্রথমে রাখাল বালকরূপে, পরে কৃষি-মজুর রূপে। পঁচিশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি একটি অল্প বয়সের গাভী কেনার মত অর্থ সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। মা যেমন করে সন্তান মানুষ করে, তেমন করেই তিনি এ গাভীটিকে বড় করে তুলেছিলেন। তিনি গাভীটির সংগে সংগেই রোজ ভোরে উঠতেন এবং সন্ধ্যায় একই ঘরে তার সংগে শুতেন। তিনি তাকে প্রতি পদে বেড়ে উঠতে দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন তাকে বর্তমান অবস্থায় পরিণত হতে—সুমসৃণ দেহ, বিনয়ী স্বভাব—কিছুটা যেন লাজুক।

কাজেই আমার পিতৃব্য সম্পত্তির মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁর একটা গাভী ছিল এবং তার সাহায্যে কয়েক একর জমি চাষ করার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল। কিন্তু পরিশ্রমী কৃষকরা তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে পড়ে বলে তিনি অতি দ্রুত মধ্য বয়স—এমন কি বৃদ্ধ বয়সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। অথচ তখনও তিনি বিয়ে করে উঠতে পারেন নি।

তিনি নিজের মনকে এই বলে সান্ত্বন দিতেনঃ "ভাবনার কিছু নেই—আমার জমি আর একটি গাভী থাকলে আমি একটি নারী পাব।" তারপর তিনি স্বপ্ন দেখতে লাগলে একটি পরিবারের, একটি নারী—যে নারী তাঁ জন্যে রান্না করবে, তাঁর সংগে শোবে এব জমিদার যখন তাঁকে অপমান করবে কিং করসংগ্রাহক যখন তাঁকে মারবে, তখন তাঁ চোখের জল মুছিয়ে দেবে। তারপর তিনি একটি ছেলের বাবা হবার স্বপ্নও দেখত লাগলেন—যে ছেলে তাঁর নাম বাঁচিয়ে রাখবে বাঁচিয়ে রাখবে তাঁর উপজীবিকা—কৃষিকার্য ভাবতে ভাবতে তিনি আপন মনেই বলতে "কিন্তু হায়, যদি তাকে একটা বাচ্চা গরু কেন জন্যে পঁচিশ বৎসর কঠোর শ্রম করতে হয় আরও কুড়ি বৎসর কঠোর শ্রম করতে হয় বি করার জন্যে..." তাঁর মেরুদণ্ডের উপর তি একটা ঠাণ্ডা শিহরণ অনুভব করতেন। তি বুঝতেন যে, তাঁকে কঠোর পরিশ্রম কর হবেই।

কিন্তু তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত ক জন্যে কাজ সুরু করতে না করতেই দ চীনে আরম্ভ হল জাতীয়তাবাদী কর্মী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিপ্লব। ব প্রবাহের মতই এ বিপ্লবের ঝড় বয়ে মধ্যচীনের বুকের উপর দিয়ে—সংগে করে গেল সমরনায়কদের আর ম্যাজিস্ট্রেটদের গ্রামে গ্রামে পাঠাত নির্মম কর সংগ্রহক সংগে সংগে এই নতুন বিপ্লব ছড়িয়ে গ্রামগুলোতেও।

বিপ্লবী বাহিনীর একটি যুবক এল এবং স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে গ্রামের চাষ সম্বোধন করে বললঃ "তোমরা নিশ্চয়ই করভারে জর্জরিত হতে চাও না—নয়

তোমরা নিশ্চয়ই আর জমিদারদের প্রভুত্ব চাও না—নয় কি?" কেউ এ প্রশ্নের জবাব দেবার সাহস পেল না—কেননা তারা এ ধরণের কথা আগে কখনও শোনে নি।

যাই হোক, যুবকটি তাদের মৌনতাকে সম্মতি বলে ধরে নিয়ে বলে চলল: "ভাল কথা, তারা আর তোমাদের বিরক্ত করবে না।"

আমার পিতৃব্য মাথা নেড়ে আপন মনে বললেন: "ভাল—কথাটা কিন্তু মন্দ বলে নি।"

তারপর যুবক বলল: "তবে শোন, তোমাদের আত্মরক্ষার জন্যে কৃষক সমিতি গড়ে তুলতে হবে।"

আমার পিতৃব্য ভাবলেন: "ঈশ্বরের দোহাই, এটা যেন না হয়। আমি সমিতি করার সময় পাব না। আমি তো আমার জমি পতিত ফেলে রাখতে পারি না—গাভীটাকেও অনশনে থাকতে দিতে পারি না।" তারপর পাশে দাঁড়ানো গাভীটির দিকে ফিরে বললেন: "তাই না? বেশ, লক্ষ্মী মেয়ে, চলতো এবার কিছু কাজ করা যাক্।"

তিনি তাকে নিয়ে মাঠে চললেন। তাঁর সমিতি গড়বার সময় থাক্ আর নাই থাক্, তাঁকেও সমিতির একজন সদস্য করে নেয়া হল। প্রতি সপ্তাহে তাঁর একটি দিনের অর্ধাংশ কাটতো গ্রামে, স্কোয়ারে সাধারণ সভায়, অপরাংশ কাটত শহরের প্যারেডে—এই শহরে সব বড় বড় জমিদার বাস করত; আর একটি দিনের অর্ধাংশ তাঁর কাটত তরুণ বিপ্লবীদের বক্তৃতা শুনে।

এটা তাঁর কাছে কিছুটা বিরক্তিকর এবং সময়ের অপব্যয় বলে মনে হ'ত। যাই হোক, জমিদাররা তো ভয় পেয়ে উধাও হয়েছিল। বেশ কয়েকজন কর-সংগ্রাহককে গুলী করে হত্যা করা হয়েছিল। গ্রামবাসীদের মনে অপেক্ষাকৃত বেশী শান্তি ফিরে এসেছিল। আমার পিতৃব্যের পক্ষে নতুন আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। "তা হোক, তা হোক.........আমি যতক্ষণ মাঠে আমার গাভীটিকে নিয়ে কাজ করতে পারি........."

কিন্তু শীঘ্রই শহর থেকে পরস্পরবিরোধী অনেক সংবাদ আসতে লাগল—বিশেষ করে আমার পিতৃব্যের কাছে এই সব সংবাদ ছিল বিভ্রান্তিকর—তিনি কখনও রাজনীতি বুঝতেন না। শোনা গেল যে, বিপ্লবী আন্দোলন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—নতুন গভর্নমেণ্ট অনেক যুবককে হত্যা করেছে এবং পুরাতন ও নবীন শক্তির মধ্যে আরম্ভ হয়েছে সংগ্রাম। শীঘ্রই সমস্ত কৃষিজীবীর হাতে তুলে দেওয়া হল রাইফেল—তাদের সমিতির নতুন নাম দেওয়া হল—আত্মরক্ষী বাহিনী; সমগ্র গ্রামটি পরিণত হল একটা বৃহৎ পরিবারে—পরিবারের প্রত্যেকেই জমির আংশিক মালিক ও পারস্পরিক শক্তির সাহায্যে আমাদের স্বার্থ আমাদিগকেই সহযোগিতায় একই ফার্মে চাষ করার অধিকারী—গ্রামের নাপিত হল তার সভাপতি, আর তার উপদেষ্টারূপে রইল দুজন তরুণ বিপ্লবী।

নাপিত উত্তেজিতভাবে স্কোয়ারে চীৎকার করে বলল: "গ্রামের সব জমি এখন সাধারণের সম্পত্তি।" এতে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল—কেননা নাপিতকে ইতিপূর্বে সাধারণ্যে কেউ চীৎকার করতে শোনে নি। সে এত দরিদ্র ছিল যে, তার মাথা গোঁজার মত একটা আস্তাবলও ছিল না। "গ্রামের প্রতিটি বস্তুই আমাদের সকলের।" "নাপিত, আমার গাভীটি কিন্তু সকলের নয়।" আমার পিতৃব্য প্রতিবাদ করে বসলেন। বক্তা যে গ্রাম্য সমিতির সভাপতি এ বোধও তাঁর ছিল না। "সে যখন বাচ্চা ছিল, আমি তখন থেকে তাকে বড় করে তুলেছি।"

আমার পিতৃব্যের কথায় কেউ কান দিল না—কেননা সেই মুহূর্তে পাহাড়ের মধ্যে শোনা গেল বন্দুকের শব্দ।

তরুণ উপদেষ্টাদের মধ্যে একজন জনতাকে সম্বোধন করে বলল: "পুরণো সেনাবাহিনী আমাদের ধ্বংস করতে আসছে। আত্মরক্ষার জন্যে আমাদের তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।"

আর সেই জনতা উন্মাদের মত নাপিতের নেতৃত্বে এগিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে। আমার পিতৃব্য সেই স্কোয়ারে একা দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন। কি নিয়ে এত হৈ চৈ, তার তিনি কিছুই জানতেন না। গ্রামটা ছিল পূর্বের মতই পুরাতন—সেই কালো টালির ছাদ ও খড়ের চালওয়ালা বাড়ি, সেই এল্‌ম গাছ, সেই এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি যাবার জন্যে খোয়া ঢালা পথ—তার যত-দূর পর্যন্ত মনে পড়ে তাতে কোনদিনই তিনি এ সবকে রূপ বদলাতে দেখেন নি। এই নাপিতের মত লোকগুলোই শুধু পাগল হয়ে গেছে। "কি করে এটা সম্ভব হল?" তিনি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন—কিন্তু উত্তর খুঁজে পান না। মনের এমনই একটা বিশৃংখল অবস্থায় তিনি নিরাপত্তার জন্যে গাভীটিকে নিয়ে চললেন গ্রামের অপর প্রান্তে। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে রাইফেলের শব্দ পাওয়া গেল। তারপর আবার সব নীরব। গ্রামবাসীরা নীরবে ফিরে এল। সেই উপদেষ্টা দুজনকে দেখা গেল না। নাপিতেরও খোঁজ নেই। কারও যেন কোন কথা বলার মত মনের অবস্থা নেই। নিজেকে একা একা মনে হওয়ায় আমার পিতৃব্য গাভীটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন মাঠে—তিনি নিজের হাতে যে ধান্য রোপণ করেছেন, তার অবস্থা দেখতে। তাঁর হাত দুটিও ছিল বেশ বড় বড়—দশ বৎসর বয়েস থেকে এই হাত দুটি দিয়ে তিনি মাটির কাজ করে এসেছেন। সেই-খানে মাঠের পাশে পড়েছিল নাপিতের মৃতদেহ—মৌচাকে ঝাঁকের পর ঝাঁক গুলী ছুঁড়লে যে অবস্থা হয়, তার দেহেরও সেই অবস্থা। ওটা কি? তিনি তাঁর মাঠে এভাবে কখনও মানুষকে ম[illegible]ড়ে থাকতে দেখেন নি। রক্তে মাটির রঙ গিয়েছিল বদলে। আর সেই মাটির প্রভাবও পড়বে শস্যের উপর, আমার পিতৃব্য ভাবলেন। "আমার পরিচিত প্রতিবেশী বেচারী নাপিতের রক্তে পরিপুষ্ট শস্য আমি মুখে তুলব কি করে?" আমার পিতৃব্য নিজের মনে বললেন এবং উত্তরের জন্যে তাকালেন গাভীটির দিকে। গাভীটি তার সামনে দাঁড়িয়ে বোকার মত তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। উভয়ের প্রতি উভয়ের ভাষাহীন দৃষ্টি সন্নিবন্ধ। অবশেষে কেন জানি না, পিতৃব্য হঠাৎ ডুকরিয়ে কেঁদে উঠলেন। তিনি এর আগে কখনও কাঁদেন নি—এমন কি আমার পিতামহের যখন মৃত্যু হয়েছিল, তখনও নয়।

তিনি যখন গ্রামে ফিরে এলেন, তখন সারা গ্রাম সৈন্যদের দখলে। সেনানায়ক বললেন: এটা ডাকাতের অঞ্চল—আগুন জ্বালিয়ে এ অঞ্চল পুড়িয়ে দাও।" আর এই কথার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সৈন্য খড়ের চালে জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে ফেলতে লাগল। সুখের বিষয় সৈন্যদল বেশীক্ষণ গ্রামে রইল না। তারা আত্মরক্ষী বাহিনী ধ্বংস করার জন্যে অন্য অঞ্চলে চলে গেল। গ্রামবাসীরা যথাশীঘ্র আগুন নিভিয়ে ফেলে কোনমতে সারা গ্রামটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করল। আমার পিতৃব্যের চালার এক-চতুর্থাংশ পুড়ে গিয়েছিল তিনি কোনমতে খড় দিয়ে তা মেরামত করলেন। এই কাজে তাঁর প্রায় তিনদিন লাগল—এই সময় গাভীটা ছাড়া ছিল নিকটবর্তী ঊষর পাহাড়ে—তাকে প্রায় অনশনেই সময় কাটাতে হচ্ছিল।

তার পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে দেখে আমার পিতৃব্য সখেদে বললেন: "হায়, হতভাগী।" আর নাপিতের রক্তরঞ্জিত মাঠের যে ধান তিনি খেতে পারবেন না, তার কথা মনে পড়ায় আবার বললেন: "হায়, হতভাগী!"

গ্রামবাসীরা নিজেদের বাড়ি মেরামত করে আবার নতুন করে জীবন শুরু করার কথা ভাবতে আরম্ভ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে আবার একদল বিপ্লবীর আবির্ভাব হ'ল। তাদের মধ্যে সবাই ছিল রাইফেলধারী কৃষক। তাদের সঙ্গে কয়েকজন যুবকও ছিল, যাদের ঠিক পূর্ববর্তী উপদেষ্টাদের মত মনে হল। তাদের একজন আবার গ্রামের স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীদের সম্বোধন করে বলল: "পুরাতন সৈন্যদল আমাদের হত্যা করার চেষ্টা করছে, আমাদের আন্দোলন ধ্বংস করে পুরাতন রীতিনীতি পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করছে। নিজেদের রক্ষা করতে হবে।"

গ্রামবাসীরাও তাদের দলে যোগ দিল এবং সামরিক শিক্ষা পেতে লাগল। আমার পিতৃব্যও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। কি করে রাইফেল ছুঁড়তে হয়, [illegible] করে মানুষকে গুলী করতে হয়, প্রতিদিন ২।০ ঘণ্টা করে তিনি তাই শিখতে লাগলেন। তিনি যখনই বন্দুক হাতে তুলতেন, তখনই তাঁর মনে পড়ে যেত মাঠের পাশে পড়ে থাকা গুলীবিদ্ধ নাপিতের মৃতদেহের কথাঃ তাঁর হাত কাঁপত এবং তাঁর বুক ধড়ফড় করত। এক সপ্তাহ সামরিক শিক্ষা নেবার পর তিনি আর সইতে পারলেন না। তিনি শহরের যে তরুণ যুবকটি গ্রাম্য সমিতির নতুন উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিল, তার কাছে গিয়ে বললেনঃ "মশায়, এই বন্দুক চালানো শেখা আমার দ্বারা হবে না—হবে না। আমার হৃদয়টা এরূপ পুরনো ধরণের যে, আমার পক্ষে মানুষ মারা শেখা সম্ভব নয়।" এই বলে তিনি বন্দুকটা ফিরিয়ে দিলেন।

উপদেষ্টা বললঃ "ভাল কথা। আমরা মানুষকে জোর করে যোদ্ধা তৈরী করি না।"

তারপর আমার পিতৃব্য গাভীটি নিয়ে যথারীতি গোচারণ ক্ষেত্রে গেলেন। তিনি হতভম্ব হয়ে শুয়ে রইলেন ঘাসের উপরে—একবার তাকাতে লাগলেন সূর্যের দিকে, একবার তাকাতে লাগলেন, মূক জীবটির দিকে—যে জীবটি শুধু ঘাস খাওয়া আর লাঙল টানা ছাড়া অন্য কিছু বুঝত না। যে মাঠের মাটি মানুষের রক্তে কলঙ্কিত, সে মাঠে কাজ করতে যাবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর পেশা ছিল জমি চাষ করা, তাঁর দেহ বিশ্রামে অভ্যস্ত ছিল না, তাঁর মন ধান্য রোপণের কথা ভুলতে পারত না এবং তাঁর চোখও বোকার মত এদিকে সেদিকে তাকাতে অভ্যস্ত ছিল না। এই প্রথম তাঁর নিজেকে অত্যন্ত দুঃখী বলে মনে হল।

কয়েকদিন পরে আবার পুরনো সৈন্যদল ফিরে এল। গ্রামবাসীরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেল। এবার ভীষণ রকমের যুদ্ধ হ'ল—কেননা গ্রামবাসীরা বন্দুক ব্যবহার করতে শিখেছিল এবং তাদের অভিজ্ঞতা ছিল বলে তারা ভালই যুদ্ধ করল। বিরোধের উত্তেজনায় তারা ঠিক নাপিতের মতই উন্মত্ত হয়ে লড়াই করল। কিন্তু পুরনো সৈন্যদের ভাল ভাল বন্দুক ছিল বলে তারা গ্রামের নিকটে পর্যন্ত এগুতে পারল। বাড়ির ছাদগুলোর উপর দিয়ে সশব্দে গুলী ছুটতে লাগল এবং ট্রেঞ্চ মর্টারের গোলায় মাঠের বুকে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হ'ল। আমার পিতৃব্য পাহাড়ের পাশে একটি গুহায় কানে আঙুল চাপা দিয়ে লুকিয়ে রইলেন। যে যুদ্ধ তিনি বুঝতেন না, তার শব্দ শোনার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। দিনের শেষে গ্রামবাসীরা আক্রমণকারী সেনাবাহিনীকে তাদের অবস্থান-ঘাঁটি পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যেতে পারল। আমার পিতৃব্য যেন দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে কোনমতে গুহা থেকে বেরুলেন। বেরিয়েই তিনি প্রথমে খোঁজ করলেন তাঁর গাভীর। গাভীটি পাহাড়ে চ'রে বেড়াচ্ছিল, এই অবস্থায় তিনি তাঁকে রেখে গেছিলেন। প্রথমে তিনি তাকে খুঁজে পেলেন না। সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে তিনি একটা ঝোপের মধ্যে রক্তস্রোতে ভাসমান একটি গরুর মৃতদেহ আবিষ্কার করলেন। ঠিক গ্রামের নাপিতের মত গরুটিরও পেটে গুলীর অনেক চিহ্ন। তাঁর গাভীটির লেজ ছিল দীর্ঘ এবং মসৃণ; তাকে আসতে দেখলেই সে ধীরে ধীরে লেজ নাড়তো। এই লেজটি না থাকলে তিনি এই গরুর মৃতদেহটিকে নিজের গাভী বলে চিনতেই পারতেন না। আমার পিতৃব্য কাঁদতে চাইলেন—কিন্তু কাঁদতে তিনি পারলেন না। এক সময়ে যে গাভীটি ছিল মধুর স্বভাব, শান্ত, লাজুক—এখন তাকে দেখে কুৎসিত বলে মনে হল। তবু তাঁর মনে হতে লাগল, এ যেন তাঁর নিজের শিশু, তাঁর নিজের সৃষ্টি—যাকে তিনি স্বহস্তে খাইয়েছেন এবং চোখের সামনে বড় হয়ে উঠতে দেখেছেন।

সে রাত্রে আমার পিতৃব্য একটুও ঘুমোতে পারলেন না। সে রাত্রে তিনি ভাবতে লাগলেন পঁচিশ বৎসরব্যাপী কঠোর পরিশ্রমলব্ধ অর্থ-সঞ্চয়ের দ্বারা কেনা গাভীটির কথা, যে জমির চাউল তিনি মুখে তুলতে পারবেন না তার কথা যে নারীকে হয়ত তিনি জীবনে পারেন না তার কথা.........তিনি ভোর পর্যন্ত চিৎ হয়ে শুয়ে খোলা চোখে উদ্‌ভ্রান্তের মত এই সব কথা ভাবতে লাগলেন। তারপর তিনি উন্মাদ ব্যক্তির মত লাফিয়ে উঠে সোজা চলে গেলেন গ্রাম সংসদের কাছে।

তিনি উপদেষ্টাকে বললেনঃ "মশায়, আমাকে একটা বন্দুক দিন।"

যুবক প্রশ্ন করলঃ "কেন?"

"লড়াই শেখার জন্যে।"

তিনি একবার সামরিক শিক্ষা নিতে অস্বীকার করেছিলেন, একথা যুবকের মনে থাকায় সে অবিশ্বাসের ভংগীতে বললঃ "ঠিক তো?"

"একেবারে ঠিক।" আমার পিতৃব্য দৃঢ় স্বরে বললেন। তারপর নীচু গলায় যেন নিজের সংগে কথা বলছেন, এমনই বিষণ্ণভাবে তাঁর কৃষকসুলভ বড় বড় হাত দুটির দিকে চোখ নামিয়ে বললেনঃ "এ হল বিক্ষোভের যুগ। জমির ভাবনা নয়, গাভীর ভাবনা নয়, স্ত্রীর ভাবনা নয়........"

এক মুহূর্তের জন্য যুবকটি আমার পিতৃব্যের কষ্টসহিষ্ণু কালো মুখ নিরীক্ষণ করে দেখল; সে মুখে কিছুটা বিকারের চিহ্ন থাকলেও সে মুখের প্রতিটি রেখায় ছিল কৃষক-সুলভ সাধুতা ও গভীরত্বের লক্ষণ। সে তাঁকে বন্দুক দিয়ে দিল।

মধ্যাহ্নে পুরাণো সেনাদল আবার আক্রমণ করল। সকল গ্রামবাসী মিলে আবার তাদের বাধা দিতে গেল। আমার পিতৃব্য সেই নাপিতেরই মত উত্তেজিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চললেন সকলের আগে।

সেখানে লড়াই করার মত রণাংগন বলে কোন পদার্থ ছিল না—না ছিল পরিখা, না ছিল কাঁটাতার। কৃষক-যোদ্ধারা গাছ ও পাহাড়ের পিছনে এবং যবের ক্ষেতের মধ্যস্থিত খালে লুকিয়ে রইল। তারা বেশী গুলী ছুঁড়ল না। শুধু যখন ভৌগোলিক অবস্থিতি ও লুকানো কৃষক-যোদ্ধাদের সম্বন্ধে অনবহিত আক্রমণকারী সৈন্যরা এগিয়ে আসত, তখনই তারা গুলী ছুঁড়ত। হতভাগা আক্রমণকারী শয়তানদের মধ্যে যারা বেশী এগিয়ে আসত, তারা প্রায় সবাই বন্দুকের শব্দের সংগে সংগে সচীৎকারে কিংবা বিনা চীৎকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত।

আমার পিতৃব্য পাহাড়ের উপর একটা কবরের পিছনে লুকিয়ে ছিলেন। রাইফেলের শব্দে অভিভূত হয়ে তিনিই শুধু একা এদিকে ওদকে গুলী ছুঁড়ছিলেন। তাঁর হাতের মধ্যে বন্দুকের পেটটা লাফাচ্ছিল, বন্দুকের পশ্চাদ্‌ভাগটা তাঁর কাঁধে করছিল প্রত্যাঘাত—আর তিনি সেই অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যহীন গুলী ছোঁড়া দেখে শত্রুরা তাঁর অবস্থিতি বুঝতে পারল। হঠাৎ একটি সৈন্য তাঁর দিকে বন্দুক বাগিয়ে তাঁর থেকে মাত্র দশ গজ দূরে আবির্ভূত হল। তিনিও তাঁর রাইফেল বাগিয়ে ধরলেন শত্রুটির দিকে। কিন্তু সৈন্যটির মুখে কষ্টসহিষ্ণুতার যে কালো ছাপ তিনি দেখতে পেলেন, তাতে তিনি স্পষ্ট বুঝলেন যে, এর ইউনিফর্ম বাদ দিলে এ গ্রামের কৃষকদের থেকে ভিন্ন নয়। "এই কি সেই শত্রু, যাকে আমার মারতে হবে?" আমার পিতৃব্য নিজেকেই প্রশ্ন করলেন। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তরদানের সময় পাবার আগেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ল। আর তিনি সংগে সংগে পড়ে গেলেন।

সন্ধ্যার দিকে শত্রুর আক্রমণ হটিয়ে দেবার পর যুদ্ধশেষে গৃহ-প্রত্যাগমনোন্মুখ গ্রামবাসীরা আমার পিতৃব্যকে নিজেদের মধ্যে দেখতে পেল না। রণাংগনে খুব ভাল করে খোঁজ করার পর তারা পাহাড়ের পাশে একটা মৃতদেহ দেখতে পেল। সেটা দেখতে অনেকটা আমার পিতৃব্যের মত। কিন্তু কেউ এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হতে পারল না—তার কারণ মাথার অর্ধেক উড়ে গিয়েছিল।

সব শেষে আমার পিতৃব্যের প্রতিবেশী একজন বৃদ্ধ কৃষক বললঃ "ওই বড় বড় হাত দুটো দেখছ না—এ নিশ্চয়ই সে।"

পাইপ

আশু চট্টোপাধ্যায়

আমার পাইপটা আপনার পছন্দ হচ্ছে না? কি বলছেন, কই সে কথা ত আমায় একবারও বলেননি? হাঁ, ঠিক, বলেননি। কিন্তু সব কথা কি বলে' দিতে হয়, মশাই, অনেক সময় মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায়। আর এক্ষেত্রে আমার অনুমান একেবারে নির্ভুল। বিরক্ত আপনি হয়েছেনই, আর হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, আপনার ত এ জিনিস খাওয়া অভ্যেস নেই। কি করে' বুঝবেন আপনি এর মহিমা। এর গন্ধটা কড়া, সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে একটুও কি মিষ্টতার আভাস পাচ্ছেন না? একটু মধুর উত্তেজনা আপনার মগজে সুড়সুড়ি দিচ্ছে না?

স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক। পাইপ আপনি জীবনে যখন কোনদিন খাননি, তখন কি করে' এর মর্ম বুঝবেন? কতদূর যাবেন আপনি? আসানসোল? তবে ত কয়েক ঘণ্টা আপনার সঙ্গ পাওয়া যাবে। আমি যাচ্ছি? আমি যাচ্ছি মীরাটে, আমার এক বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখতে। যাই হোক, যা বলছিলাম, কয়েক ঘণ্টা আপনার সঙ্গ পাওয়া যাবে। না, সে ভয় নেই, সারাক্ষণই পাইপ টানব না। কিন্তু যাই বলুন, সিগারেট এবং চুরুটের চেয়ে এটা ঢের ভাল। কেন, তাই জানতে চাইছেন? আপনি ত ধূমপানই করেন না, আপনাকে আর কি বোঝাব বলুন! কিন্তু একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এতে ধোঁয়া বেরোয় খুব অল্প, সিগারেটের আর চুরুটের মত গগনকে অন্ধকার করে দেয় না, এটা আপনার পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু ওই অল্প ধোঁয়াতেই কি পরিতৃপ্তি তা যদি জানতেন! সুক্ষ্ম এক চিলতে ধোঁয়ার একটি রোমাঞ্চ, একটু রসাভাষ। মনের সমুদ্রের উপর দিয়ে একটি একটি করে সামুদ্রিক পাখী উড়ে যাওয়া।

না, মশাই, আমি কবি না, ওই আজকালের কবিতা লেখা দূরের কথা, পড়লেও আমার রাত্রে অনিদ্রা হয়, মাথা ঘোরে। হাঁ, তা বলতে পারেন আমায় স্বভাব কবি বলতে পারেন। আর তা আমি হয়েও উঠি, বিশেষ করে যখন আমার মুখে পাইপ থাকে। এই যে ঝিরঝির করে একটু আধটু ধোঁয়া আমার ঠোঁটের পাশ দিয়ে বেরুচ্ছে, ও ধোঁয়া আমার মগজ থেকেই বইছে, এ নিশ্চিত জানবেন। আমি ঠাট্টা করছি না, এই নতুন আলাপে আপনাকে বেমক্কা ঠাট্টা করবার আমার অধিকার কোথায়? আমার মগজ দিয়ে এখন বাইরের ওই ধেনো মাঠ নয়, ইরাণ, ইস্তাম্বুল, গিলগিট সমরকন্দ উঠে যাচ্ছে। চিন্তার জগতে আমি এখন তাতা তৈমুরলঙ, বাক যুদ্ধে আপনি এখন আমার কাছে পরাস্ত হবেন।

ও কথা ঠিক বলেছেন, এমন একদিন আমারো ছিল যখন আমি পাইপ খেতাম না এবং তখন কি আমি মানুষ ছিলাম না! নিশ্চয়, মানুষ ছিলাম বই কি, আর পাঁচজন বাঙালী ভাল ছেলের মত উত্তম মানুষ ছিলাম, নিরেট ভদ্র ছেলে ছিলাম। খেতাম, বেড়াতাম, পড়াশুনা করতাম, বাপ-পিতামোর ধারা অনুসারে শুভ চিন্তা করতাম। থ্যাকারে, কোলরিজ আর লংফেলোর লেখা ভাল লাগত, সায়েবদের ভাবতুম দেবতা আর স্বপ্ন দেখতুম কোন অফিসে চাকরি নেবার। নাওয়া খাওয়া ঠিক সময়ে হত।

তারপরই আমার জীবনে এল পাইপ। হঠাৎ একেবারে যে বেপরোয়া বাউণ্ডুলে হয়ে গেলাম এমন কথা বলছি না, কিন্তু মগজের স্নায়ুকেন্দ্রগুলিতে এল উত্তেজনা, চিন্তা জগতে এল বিদ্রোহ। চলনে বলনে হয়ত একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ছিল, কারণ দেখতে পেতাম আগের চেয়ে লোকে আমায় বেশী শ্রদ্ধা সম্মান দেখাচ্ছে। সেটা পাইপ মুখে দেওয়ায় যে একটি আত্মসমাহিত প্রশান্তি আসে তারই ফলে কি না বুঝতে পারতাম না। কথাবার্তাগুলো যে কাটা কাটা হয়ে গেল ওটা ইচ্ছাকৃত নয়, পাইপের ফাঁক দিয়ে কথা বললে, ওই রকমই হয়। আর এই ধরণে কথা বলতে বলতে স্পষ্ট কথা বলার অভ্যেস হয়ে যায়। স্পষ্ট কথা বলার অনেক দোষ তা জানি, লোকে একটু দূরে দূরে হাঁটে। ঠিকই হয়ত বলেছেন, ওই জন্যেই পাইপসেবীর ব্যক্তিত্ব বাড়ে বলে' মনে হয়। আসলে পাইপখোরদের খুব কম লোকেই পছন্দ করে। হয়ত ঠিক বলেছেন।

কিন্তু তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের একটি নিজেদের জগৎ আছে যেখানে আমরা সম্রাট। আমরা যারা পাইপের ভক্ত তাদের একটি আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব আছে। এ্যালসেসিয়ান কুকুরের মালিকদের মত। এই ত সেদিন কলকাতার কোনো এক অফিসের লিফটে দুজন সাহেব আমার পাইপ দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে' উঠলেন, "বাঙালীর মুখে পাইপ!" আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কি এদেশে নতুন এসেছেন?" তাঁরা স্বীকার করলেন।

তখন আমি বললাম, "আর কিছুদিন থাকুন পরে আরো আশ্চর্য হবেন।"

তাঁরা কারণ জানতে চাইলেন।

আমি বললাম, "এখন শুধু ইংরেজ ভদ্রলোক আছেন, কিছুদিন পরেই আপনাদের ধারণা হবে আপনারা প্রভুর জাতি, এদেশের উপর মালিকানাস্বত্ব কায়েমী রাখবার জন্য আপনাদেরও যথাসাধ্য করা উচিত, তখন নিগারের মুখে আপনাদের ধূমপানের বস্তু দেখলে বেয়াদপি মনে করে ক্রুদ্ধ হবেন।"

তাঁরা প্রচণ্ড হেসে আমার হাতটা নেড়ে দিয়ে বলে' উঠলেন, "আরে না না, আমরা ওভাবে বলিনি, আমরা ইংরেজরা পাইপ খুব ভালবাসি, তাই বিদেশীর মুখে পাইপ দেখে ভারী আনন্দ হয়েছিল।"

তারপর গন্তব্য তলায় পেঁাছে তাঁর শুভেচ্ছা ও বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেলেন। সেদিনো আমার পরনে ছিল ধুতি আর পাঞ্জাবি।

পাইপের একটা মস্ত সুবিধা হচ্ছে এ বার বার নিভে যায়। না, এতে এতটা বিস্মি হবার প্রয়োজন নেই, বার বার পাইপ জ্বালাবা সত্যই কতকগুলো সুবিধা আছে। প্রথম আমাদের সাধারণত ক্রিয়াহীন জীবনে সর্ব করণীয় একটা কাজ জোটে, যাতে অঙ্গ সঞ্চালনে প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, অপরের দৃষ্টি আকর্ষ করা যায়। যার চেহারা একেবারেই দর্শন যো নয় সেও যদি অনবরত এ পকেট ও পকে দেশলাই হাতরায়, হাওয়া বাঁচিয়ে অনেক ক পাইপটা ধরিয়ে নেয় এবং তারপর দেশল যথাস্থানে রেখে প্রায় তখনই আবার খুঁজতে থাকে তাহলে তার এই অবি সক্রিয়তা অনেক ক্ষেত্রে করুণ ও হাস্যজনক হলেও, তা সবসময় দৃষ্টি আকর্ষণ করেই।

এটা অবশ্য সাধারণত ঘটে ন শিক্ষার্থীদের পক্ষে। কিন্তু লক্ষ্য করা

বুঝতে পারবেন যারা ঘাগী আর পাইপ খাওয়ায় পুরনো পাপী তারাও ইচ্ছে আর চেষ্টা করে' এ অভ্যেসটা মেনে চলে। আমি একবার একজন নামকরা পাইপ খোরের এই ধরণের ভাবভঙ্গী দেখেছিলাম। জায়গাটা ব্রাম স্ট্রীট, লোকটি সুপ্রসিদ্ধ, বাইরে পশ্চিমের কোনো শহরে থাকেন। দীর্ঘ চেহারা, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী ার ললাট। অথচ তিনি নভিসের মত ার বার পাইপ ধরাচ্ছেন। চাদরটা রাস্তার লোয় লুটিয়ে পড়ছে—ভদ্রলোক পাইপ, চাদর আর দেশলাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু লক্ষ্য রে দেখলাম রাস্তার দুধারের দোকানগুলি থকে সবাই তাঁকে দেখছে, কয়েকজন পথচারীর ৃষ্টিও তিনি আকর্ষণ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি অবশ্য ছিলেন নির্বিকার। পরে অবশ্য নুসন্ধান করে জেনেছিলাম যে তিনি পাইপ ম্প্রদায়ে নতুন যোগদান করেননি, তাঁর অভ্যাস নেক দিনের।

ভাল কথা জিজ্ঞেস করেছেন। আমি কবে বং কেমন করে পাইপ ধরলাম। প্রশ্নটা সঙ্গিক, কারণ বাঙালীরা পাইপ সচরাচর য় না, তারা খায় সিগারেট এবং অল্পসংখ্যক য়েকজনে চুরুট। আমি চুরুট খেতাম। তরাং আমার পাইপ খাওয়ার মতি হওয়ার র্থাৎ সুমতি হওয়ার এবং সেই সুমতি বুদ্ধি ওয়ার চমৎকার ইতিহাস নিশ্চয় আছে এবং ক্ষণ যখন এই পাইপ নিয়ে আপনার ধৈর্য ং সময়ের উপর এতটা অত্যাচার করেছি, তখন ইতিহাস শোনাবার দাবীও আমি নিশ্চয় তে পারি। তবে আসানসোল পর্যন্ত যে পনাকে জ্বালাব না, এ আশ্বাস আর একবার চ্ছি।

হ্যাঁ, কি বলছেন বলুন? আপনি ঠিকই লেছেন, পাইপ পরিষ্কার সাংঘাতিক হাঙ্গামা। টি জাত-কুকুর পোষার যত ফ্যাসাদ, পাইপ ষারও তাই। আরে মশাই, ভুক্তভোগী ত বুঝবেন কেমন করে, মৌতাতের সময় াজ করে পাইপটি ধরাবেন, সবে রীতিমত ারটি সমাধা হয়েছে, এরপর স্নায়ুমণ্ডলীতে রে একটি নরম তন্দ্রালুতা—বাস, গঁজার কেতে যেন মোক্ষম টান দিচ্ছেন, ধোঁয়া আর ায় না। তখন মনে হিংস্রভাব জাগে, মর ব্যাঘাত হয়। আমাদের পক্ষে পেপসিয়ার কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার ত্র উপায় পাইপ পরিষ্কার রাখা। শুধু নয়, আমার এক বিলাত-প্রত্যাগত বন্ধুর অপরিষ্কার পাইপ সর্বক্ষণ খেলে গলায় সার হয়। কি সাংঘাতিক ভাবুন, কিন্তু কার করবে কে? চাকর? আমাদের ই চাকর ছিল, নাম আত্মারাম। একদিন র স্ত্রী তাঁকে বলেছিলেন, "যা দেখে আয় কি করছেন।" তাঁর হয়ত মতলব ছিল বের থেকে ঘুরে গিয়ে রিপোর্ট দিল, "আজ্ঞে, তিনি সেই কাঠ-টা খাচ্ছেন।" বুঝে দেখুন, আমি পড়বার সময় বসে বসে কাঠ খাই এ সংবাদ এই চাকর মারফৎ জনসমাজে প্রকাশিত হলে আমার মান-মর্যাদার কিছু বাকী থাকত! আর এইসব চাকর করবে পাইপ পরিষ্কার। হুঁকো-কলকে হলে কথা ছিল।

হ্যাঁ, হুঁকো গড়গড়া ভাল জিনিস আপনার একথা আমি মানি। কিন্তু বাহকের হাতে গড়গড়া দিয়ে নল টানতে টানতে ত আর নবাব খাঁজা খাঁর মত যত্রতত্র বিচরণ করা যায় না। আর হুঁকো হাতে করে একমাত্র জমিতে চাষ করতে যাওয়া চলে। গড়গড়া মানায় ফরাসে তাসের আড্ডায় এবং হুঁকো বৃদ্ধদের হাতে তাঁরা যখন তেল মেখে স্নান করতে যান। তবে পাইপ নিয়ে রাস্তায় বেরুনোতেও যে বিপদ নেই এমন কথা বলতে পারি না। একবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পার্ক স্ট্রীট দিয়ে হাঁটছিলাম, বন্ধু একজন বদরাগী উকিল। তিনি একটি পানের দোকান থেকে সিগারেট কেনবার জন্যে দাঁড়ালেন। আমি পাইপ খাচ্ছিলাম। ফুটপাথে বসে ছিল এক সাধু। সে বলল, "বাঃ, বিলিতি হুঁকোটি ত বেশ।" বন্ধু মহা খাপ্পা হয়ে উঠলেন, সাধুকে মারেন আর কি, অনেক কষ্টে একটা দাঙ্গা ঠেকালাম। পরে বুঝলাম, বন্ধুর বক্তব্য ছিল, সাধু সন্ন্যাসী পাইপের মর্ম কি বুঝবে। শেষ পর্যন্ত হুঁকো বলে সে কি না পাইপের অপমান করল! আর তা ছাড়া অনধিকার চর্চা ও বাক্যের অপপ্রয়োগ হলে উকিলদের ত চটবারই কথা। নিঃসন্দেহ।

একথা ঠিক যে পাইপ সবাইকে মানায় না, এবং সব রকম পাইপ সকলকে মানায় না। মুখের আদল, শরীরের গঠন ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব অনুসারে বিভিন্ন পাইপ। লম্বা লোকের এক রকম পাইপ, বেঁটে লোকের এক রকম পাইপ। রোগা এবং মোটা লোকের পাইপ বিভিন্ন। গোল মুখ, লম্বা মুখ, গম্ভীর মুখ, হাসিখুসি মুখ—এ সবেরই আলাদা আলাদা পাইপ। নির্বাচনের ভারটা দোকানদারের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। নইলে নিজে আবার আয়নার সামনে দাঁড়াতে হয় এবং তাতেও ভাল বোঝা যায় না। কারণ জামা ও জুতোর মত পাইপও একটা পরিচ্ছদের অঙ্গ। আপনি হয়ত রোগা লোক এবং আপনার মুখশ্রী সূক্ষ্ম—এমনও হতে পারে যে, আপনি একটি বেঁটে মোটা ভারী পাইপ টানতে টানতে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন এবং রাস্তার লোক অবাক হয়ে ভাবতে লাগল আপনি কোন শ্রেণীর জীব।

হ্যাঁ বলি, এইবার আপনাকে বলব, পাইপ খাওয়ার উপর ঝোঁক আমার কেমন করে এল। আমি চুরুট খেতাম এবং চুরুট থেকে পাইপ এক পদক্ষেপ মাত্র। একবার আমার পরিচিত এক ব্যারিস্টারের বাড়ী যাই। ব্যারিস্টার বেশ নাম করেছেন তবে শহরের উপকণ্ঠে নিরিবিলিতে থাকেন। ওই ধরণের স্থানে বাস করে প্র্যাক্টিস জমবার কথা নয়, কিন্তু বিলেতে গিয়ে পয়সা খরচ করে আসার একটা মাহাত্ম্য আছে ত। আপনি নিশ্চয় জানেন কতকগুলি বিশেষ নিয়ম অনুসারে ব্যারিস্টারের পসার বাঁধা ছিল, মক্কেলের খোঁজে তাঁকে ছুটোছুটি করতে হত না।

মামলাটি বোধ হয় খুব জটিল। উকীল মহাশয় সবিস্তারে আরম্ভ করলেন। সদ্য নিদ্রাভঙ্গের জন্য মস্তিষ্ক ধোঁয়াটে থাকুক বা অন্য যে কারণেই হোক, দেখলাম ব্যারিস্টার সাহেব ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। অবশ্য উকীলরা প্রায় সকলেই বলেন যে, ব্যারিস্টাররা তাঁদের চেয়ে আইন কম বোঝেন, তবু আমার মনে হয় এটা তাঁদের ঈর্ষাপ্রসূত উক্তি। ব্যারিস্টার একটা হাই তুলে আমাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। হাই তোলার জন্যে অবশ্য নয়, উকীল মশাইকে একটু থামতে বললেন, তাই।

তারপর এল তাঁর পাইপ-পর্ব। দেখলাম লেখবার টেবলের সামনে দেওয়ালে একটি র‍্যাকে সার সার পাইপ সাজানো। সব কয়টিরই গায়ে সময়ের দাগ পড়েছে, পরে বুঝেছি পাইপ যত পুরনো হবে ততই ভাল। পুরনো পাইপ অবশ্য কেনা চলে না। কিনে পুরনো করে নিতে হয়। অপরের ব্যবহৃত পাইপ ব্যবহার করা চলে না এবং ঠিক সেই যুক্তি অনুসারেই নিজের পাইপ অপরকে ব্যবহার করতে দেওয়া চলে না। এদিক দিয়ে পাইপ যে স্ত্রীর পর্যায়ে পড়ে এ বিষয়ে একটি ইংরেজি প্রচলিত বাক্য আছে। ব্যবস্থাটি পাইপসেবীর পক্ষে ভাল, সিগারেটসেবীর মত তাঁকে পরার্থে অজস্র অর্থব্যয় করতে হয় না।

যাই হোক, ব্যারিস্টার সায়েব অনেক কষ্টে একটি পাইপ নির্বাচন করতে সমর্থ হলেন এবং পাউচ বের করে পাইপে নিপুণ যত্নের সঙ্গে তামাক ভরলেন। তারপর অগ্নিসংযোগ করে দুচক্ষু নিমীলিত করে কিছুক্ষণ মশগুল হয়ে রইলেন। এই সময় লক্ষ্য করলাম তাঁর ঠোঁটের পাশ দিয়ে অল্প অল্প ধূম নিঃসরণ হচ্ছে। এরপর তিনি অবশ্য উকীল মহাশয়ের সব কথাই বুঝতে পারলেন এবং তাঁকে আইন সংক্রান্ত বহু গভীর উপদেশ ও পরামর্শ দিলেন। পাইপের মহিমা দেখে চমৎকৃত হলাম।

এর পর আর চুরুটে সন্তুষ্ট থাকা চলে না, পাইপ কেনায় সচেষ্ট হয়ে উঠলাম। অবশ্য চুরুট আমি আজো ছাড়িনি। অনবরত পাইপ খেয়ে খেয়ে যখন মুখ বদলাবার প্রয়োজন বোধ করি, তখনই চুরুট সম্মান পায়। যাই হোক, উপযুক্ত পাইপ এবং তামাক সংগ্রহে প্রথম

মশাই। ওই দুটি বস্তু সংগ্রহ করা বিশেষজ্ঞের কাজ, যাঁদের বলা হয়—কনয়সিয়র্স, আনাড়িরা পারবে কেন। কাজেই প্রথম কয়েক মাস হয় অর্থ নষ্ট, গলা নষ্ট এবং মেজাজ নষ্ট। সমস্ত ব্যাপারটার উপরই একটা বিতৃষ্ণা এসে যায়, অনেক সময় তা বিদ্বেষে পরিণত হয়। মনে হয়, পাইপসেবীরা আসলে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করে এবং বাইরে আরামের ভাণ করে, লোক ঠকায়। মনে হয়, ওদের সঙ্গে বোধ হয় পাইপ ও তামাকের দোকানদারদের একটা ষড়যন্ত্র আছে কিংবা ওরা ওই দোকানগুলির দালাল, বিক্রীর উপর একটা কমিশন পায়।

ও-কথা আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারেন, এত কষ্ট করে পাইপ ধরবার কি প্রয়োজন ছিল, এই চেষ্টাটা অন্য দিকে দিলে হয়ত ব্যবহারিক জীবনে বেশ কিছু লাভ হতে পারত। পারত কেন, হতই। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন মশাই, ব্যবহারিক জীবনের লাভ ক্ষতি দিয়েই মানুষ জীবনের যাচাই করে না, অন্তত সকলে নয়, এবং অসাধ্য সাধনের দিকে অনেকেরই ঝোঁক আছে। ভালভাবে অর্থাৎ সঠিকভাবে পাইপ খেতে শেখা একটা অসাধ্য সাধন বইকি। এবং এটা একটা সাধনাও। এবং এ-সাধনা ভাবজগতের বা চিন্তাজগতের নয়, ব্যবহারিক জগতেরই, তাই ইংরেজরা এতে সিদ্ধ হয়েছে। যারা চঞ্চল-স্বভাব ছটফটে এবং চলচ্চিত্ত, তাঁরা কখনই পাইপ খাওয়ায় অভ্যস্ত হতে পারবে না। যখন আমি বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পাইপ খেতে শিখলাম তখন পাইপসেবীদের উপর আমার সেই অযথা বিদ্বেষ কেটে গেল, তখন আমি তাদের উপর বন্ধুত্বভাব পোষণ করতে লাগলাম। আলাপ থাকুক আর নাই থাকুক, কাউকে পাইপ খেতে দেখলেই তাকে আপনার লোক বলে মনে হত। ভেবে দেখলাম কত কষ্ট করে কত হাঙ্গামার পর তাকেও পাইপ খাওয়া অভ্যাস করতে হয়েছে। নির্ভর-যোগ্য লোক, সন্দেহ নেই। আজো আমার সেই ধারণা আমি যদি কোনো ব্যবসা ফাঁদি তাতে ম্যানেজারের পদে বাহাল করব কোনো পাইপ-সেবীকে।

অবশ্য চুরুট-খোররাও নির্ভরযোগ্য। তদের ব্যক্তিত্বেও স্থিতিস্থাপকতা আছে। একবার কোনো ডাক্তার গোটা পৃথিবীর সব দেশে বহু বছর ধরে অনুসন্ধান করে জেনেছিলেন যে, যারা চুরুট খায় তারা কখনো আত্মহত্যা করে না। যারা পাইপ খায় তাদের বিষয় তিনি অনুসন্ধান করেননি, করলে নিশ্চয়ই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। কারণটা উভয় ক্ষেত্রে একই। পাইপ বা চুরুট মুখে থাকলে সাময়িক দুঃখকষ্ট ত দূরের কথা, বিশ্বসংসারকেও ভুলে থাকা যায়। সিগারেটের

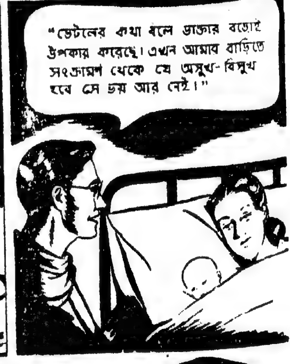
সিগারেটের যেমন পরমায়ু কম সিগারেটখোরের বক্তৃতাও বোধ হয় আমার বক্তৃতার চেয়ে ছোট হত। নির্ভুল কথা, বড় এবং গভীর আলোচনা একমাত্র পাইপ ও চুরুট সহযোগেই সম্ভব। এবং বড় কাজও। কিন্তু আপনাকে অনেক বিরক্ত করা হয়েছে, আর না। আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে এত কথার পরেও আপনি পাইপ ধরবেন না, পাইপ সম্প্রদায় আপনাকে দলে পাবে না।

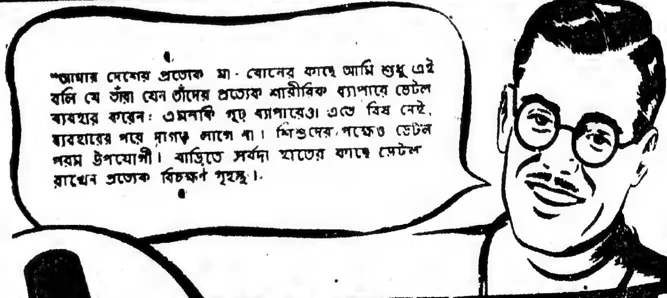
সুতরাং আপনি আপনার পান সম্বন্ধে কিছু বলুন, শোনা যাক। বাঙালীর জীবনে পান একটা প্রকাণ্ড স্থান অধিকার করে আছে এবং আপনি যেমন পানের ভক্ত দেখতে পাচ্ছি তাতে, আশঙ্কা করছি ও-বিষয়ে অনেক কথা বলে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে পারবেন।

ডাক্তার বলেন









'DETTOL'
TRADE MARK
'ডেটল' আধুনিক বীজাণুপ্রতিষেধক



বাঙলাকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত করিবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহাতে বাঙালী-দিগের মধ্যে কলহের উদ্ভব হইয়াছে। পূর্ব-বঙ্গের কতক লোক বিভাগের পক্ষপাতী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই তাহার বিরোধী; পশ্চিমবঙ্গের বহু লোক বিভাগের পক্ষপাতী এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতারা তাহার বিরোধী।

যাঁহারা বিভাগের পক্ষপাতী তাঁহাদিগের যুক্তি: পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিম বঙ্গের লোক-সংখ্যা -

লোকসংখ্যা	হিন্দুও মুসলমানাতিরিক্ত সম্প্রদায়	মুসলমান
পশ্চিমবঙ্গ—		
২৪,৫৭৬,৩৩৮	১৭,১৬৮৮৯৯	৭,৪০১,৪৩৯
	(শতকরা ৭০ জন)	(শতকরা ৩০ জন)
পূর্ববঙ্গ—		
৩৫,৭৩০,১৮৭	১০,১২৬,১৯২	২৫,৬০৩,৯৯৫
	(শতকরা ২৮ জন)	(শতকরা ৭২ জন)
মোট		
৬০,৩০৬,৫২৫	২৭,২৯৫,০৯১	৩৩,০০৫,৪৩৪
	(শতকরা ৪৫ জন)	(শতকরা ৫৫ জন)

যদি বাঙলা বিভক্ত করা হয়, তবে—

(১) পশ্চিম বঙ্গের লোকসংখ্যা ২ কোটিরও অধিক হইবে। তাহা বোম্বাই প্রদেশের ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকসংখ্যা অপেক্ষা অল্প নহে।

(২) পূর্ববঙ্গের লোকসংখ্যা যাহা হইবে, তাহা পাঞ্জাব ও উড়িষ্যা উভয় প্রদেশের লোক-সংখ্যার তুলনায় অল্প হইবে না।

কাজেই প্রত্যেক অংশই যে কোন প্রধান প্রদেশের তুলনায় ক্ষুদ্র হইবে না।

এই হিসাব দেখিয়া মনে হয় যে, পঞ্জিকায় বর্ষ ফলে বৎসরে কত "আড়া" জল হইবে তাহা হিসাব করিয়া লিখিত থাকিলেও তাহা আকমাড়াই কল দিয়া পিষ্ট করিলেও তাহা হইতে এক বিন্দু জল পাওয়া যায় না। তেমনই এই হিসাব দেখাইয়া যাঁহারা বাঙলাকে বিভক্ত করিবার অধিকারী তাঁহাদিগকে বিভাগে সম্মত করিতে পারা কি সম্ভব হইবে? বঙ্গ বিভাগ বিরোধী যে আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে—স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে, সেই আন্দোলনের সময় হইতেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজনীতিকগণ যে সর্বপ্রথমে ভেদনীতি প্রবল করিয়া আসিতেছেন, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। এখনও ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, যদি কংগ্রেসের সহিত মুসলিম লীগের মীমাংসা না হয়, তবে বৃটিশ সরকার কোন কোন বর্তমান প্রদেশকে সার্বভৌমত্ব দিতে পারিবেন। যদি তাহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত হয়, তবে যে তাঁহারা বাঙলাকে বিভক্ত করিতে সম্মত হইবেন, ইহা মনে করা যায় না। কারণ, তাহা ভেদনীতির পোষক হইবে না।

অথচ পূর্ববঙ্গের এক কোটির অধিক লোককে মুসলমান প্রধান প্রদেশে রাখিয়া আসাই হইবে। মহাভারতের বনপর্বে ঘোষযাত্রা পর্বাধ্যায়ে দেখা যায়, যখন পাণ্ডবগণ বনবাসী সেই সময় দুর্যোধন তাঁহাদিগের দুর্দশা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবার জন্য তাঁহাদিগের নিকটে গমনোদ্যত হইয়া আভীর পল্লীতে উপস্থিত হইলে গন্ধর্বগণ দুর্যোধনাদিকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলে যখন দুর্যোধনের অমাত্যবর্গ যুধিষ্ঠিরের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন ভীম তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"দেখ, কুলধর্ম কদাচ নির্মূল হইবার নহে। যদি অপর কোন ব্যক্তি বংশের অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কুলজাত সৎপুরুষদিগের কর্তব্য যে, তাঁহারা একতা-বলম্বী হইয়া পরকৃত দৌরাত্ম্যের প্রতীকার করেন।"

পশ্চিম বঙ্গের লোকরা যদি পূর্ববঙ্গে হিন্দুর অবস্থা অবগত হইয়া প্রতীকার চেষ্টা করিয়া তাহার পরে তাহা অসম্ভব প্রতিপন্ন হইলে বাঙলাকে বিভক্ত করিবার প্রস্তাবে উদ্যোগী হইতেন, তবে তাহা যেরূপ সঙ্গত হইত এখন পশ্চিমবঙ্গ বিভাগ করিয়া লইবার চেষ্টা সেরূপ সঙ্গত বলা যায় না।

বিগত জার্মান যুদ্ধে জেকোশ্লোভাকিয়াকে বিপদে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত থাকিয়াও মিস্টার চেম্বারলেন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী হইয়া যখন সাহায্য দানে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়া-ছিলেন, যদি কোন দুরস্থ দুর্বল বন্ধু দেশ তাহার সকল প্রতিবেশীর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে তাহাকে সহানুভূতি দেওয়া যায়—সাহায্য দেওয়া যায় না, তখন লোক তাঁহার প্রশংসা করে নাই—নিন্দাই করিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থায় লোক সেইরূপই করিবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন—পূর্ববঙ্গের অত্যাচার, বিশেষ নারীর লাঞ্ছনা বিহারী হিন্দুদিগকে এমনই বিচলিত করিয়াছিল যে, তাহারা উপদ্রবকারীদিগের সমধর্মী কেবল এই কারণে বিহারী মুসলমান নরনারীর উপর উপদ্রবে তাহার প্রতিশোধ লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গে যদি সেই ভাবের বিকাশ প্রত্যক্ষ করা যাইত, তবে সে স্বতন্ত্র কথা হইত। তাহা যখন প্রত্যক্ষ করা যায় নাই, তখন যদি পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা এবং অন্যান্য প্রদেশেরও হিন্দুরা মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কোনরূপে পূর্ববঙ্গের সহিত সম্বন্ধ-ত্যাগ করিয়া আপনারা নিরুপদ্রবে থাকিবার আশা করিতেছেন, তবে তাহা কি অসঙ্গত বলা যায়?

বিশেষ সকলেই বুঝিতেছেন পূর্ববঙ্গকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করা পরোক্ষভাবে—মুসলমান-দিগের পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা—অখণ্ড ভারতবর্ষের আদর্শ ত্যাগ করা।

তাহাই যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগের কাম্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিলাত হইতে যে মন্ত্রী মিশন এদেশে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু তাঁহাদিগের বিবৃতি পাঠ করিয়া কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা সিংহদ্বারপথে পাকিস্তানের প্রবেশ অস্বীকার করিলেও পশ্চাতের দ্বারপথে তাহার প্রবেশ অসম্ভব করেন নাই। মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে প্রথমে সেই প্রস্তাব স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়, তাঁহারা সেই প্রস্তাবেই ভারতবর্ষে সার্বভৌম পাকিস্তান লাভ করিবেন।

তাহার পরে গণ-পরিষদ গঠিত হইবার প্রাক্কালে বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডল কয়জন ভারতীয়কে বিলাতে লইয়া যাইয়া যে বিবৃতি প্রদান করেন, তাহাতে প্রদেশসংঘ গঠন সম্বন্ধে কংগ্রেসের ব্যাখ্যা বর্জন করা হয়। সেই ব্যাখ্যা বর্জনে কংগ্রেস স্বীকৃত হইয়া পাঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে যেমন সমগ্র আসাম প্রদেশ সম্বন্ধে তেমনই অবিচার করেন। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে সেই ব্যাখ্যায় আপত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে বহু মতে বৃটিশ সরকারের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া কাজ করা হইবে স্থির হয়। সেই জন্যই বাঙলার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। তিনি যে বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে সর্বাগ্রে বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়াছিলেন, তাহাও সেই সময়ে প্রকাশ পায়—কার্যকরী সমিতিতে তিনিই একক মূল প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সেই রাজনীতিক দূরদর্শিতা যে বড়লাটের শাসন-পরিষদে তাঁহার সহ সদস্যদিগের নিকট প্রীতিপ্রদ হয় নাই, হয়ত তাঁহার শাসন-পরিষদ ত্যাগ তাহারই পরিচায়ক।

যদি তাহাই হয়, তবে কংগ্রেসের দৌর্বল্যই

মুসলিম লীগের দাবী বর্ধিত করিয়াছে এবং বৃটিশ সরকারও পরবর্তী বিবৃতিতে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা আরও সহজসাধ্য করিয়াছে।

দ্বিতীয় বিবৃতি স্বীকার করিয়া লইবার সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাহা "রাজনীতিক চাল" বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধা করেন নাই। আর যখন বাঙলার বর্তমান সচিবসংঘকে পদচ্যুত করাইবার জন্য তাঁহাদিগকে য়ুরোপীয়দিগের সাহায্যে বঞ্চিত করিবার উপায়রূপে প্রযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ধর্মঘট (অর্থাৎ বয়কট) ঘোষণা করেন, তখন দিল্লী হইতে শাসন পরিষদের সদস্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে সে কার্যে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা গান্ধীজীর সহিত কোন বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য বাঙলায় আসেন নাই—শরৎবাবুকে নিবৃত্ত করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। সে কথা আজ বাঙালীর জানা প্রয়োজন। বাঙলার সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই করেন নাই, এই অভিযোগের উত্তরে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহানুভূতির অভাব ছিল না। কিন্তু সাহায্যদানের উপায় তাঁহাদিগের ছিল না—কারণ, বড়লাটই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধীন সরকারের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, সপার্ষদ বড়লাট তাহা পারেন না। তাহাতে প্রতিপন্ন হয় বড়লাট শাসন পরিষদের পরামর্শানুগ হইয়া কাজ করিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা পালন করেন নাই এবং তাঁহার সেই প্রতিশ্রুতিভঙ্গ পরিষদের সদস্যগণ পদত্যাগের কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

আজ বৃটিশ সরকার যাহা বলিতেছেন, তাহাতে মনে করিবার কারণ আছে—তাঁহারা হয়ত বাঙলার বর্তমান মুসলিম লীগ সচিবসংঘকে সার্বভৌম ক্ষমতা দিবেন।

এই অবস্থায় যে বৃটিশ সরকার সহজে বাঙলাকে হিন্দু ও মুসলমান দুইভাগে বিভাগে সম্মত হইবেন, তাহা মনে করা যায় না। কারণ, দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান, পাকিস্থান ও রাজস্থান তিনভাগে বিভক্ত করিয়া এদেশে আরও যতদিন সম্ভব প্রভুত্ব করাই বৃটিশ নীতির উদ্দেশ্য। গত যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে "আটলাণ্টিক চার্টার" সাম্রাজ্যবাদীদিগের দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যে অপ্রয়োজ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের বিবৃতিতে সে নীতির যে আভাস ছিল, তাহা বৃটিশ সরকারের পরবর্তী বিবৃতিসমূহে ক্রমেই অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

কাজেই যেরূপ আন্দোলন করিলে—যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করিলে বাঙলাকে দুইভাগে বিভক্ত করা সম্ভব হইতে পারে, তদপেক্ষা অনেক অল্প আন্দোলন করিলে ও অল্প শক্তি ব্যয় করিলে বাঙলায় মুসলিম লীগ সচিবসংঘের পতন অবশ্যম্ভাবী করা যায় এবং তাহা হইলেই অবস্থার পরিবর্তন সহজসাধ্য হয়। যদি অবস্থার আবশ্যক পরিবর্তন সংসাধিত হয়, তাহা হইলে বাঙলার হিন্দুদিগকেই আর পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সহায় হইতে হয় না।

দেখা যাইতেছে, বাঙলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সংগ্রামশীল মনোভাব ত্যাগ করিতেছেন। যখন ইংরেজ বাঙলাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তখন তাহার যে প্রতীকার হইয়াছিল, তাহা সহজে হয় নাই। সে জন্য প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন হইয়াছিল —বৃটিশ পণ্যবহিষ্কারসংকল্পে অবিচলিত থাকা অনিবার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এমন কি বাঙলার জন্য কংগ্রেসও বহিষ্কার বা বর্জন সংগত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

সেইরূপ আন্দোলন এবার উত্থিত হইতেছে না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—বিহারে যে বিক্ষোভের উদ্ভব হইয়াছিল (তাহা সমর্থন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হউক বা না হউক) তাহার মত কোন বিক্ষোভ পশ্চিমবঙ্গেও আত্মপ্রকাশ করে নাই। হয়ত—যাহাকে আমরা রাজশক্তি বলি তাহা বিরুদ্ধ হওয়ায় সে বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই; কিন্তু বিহারের বিক্ষোভের প্রভাব যেরূপ কার্যকরী হইয়াছিল, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। আর সেই সঙ্গে বাঙলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতাহীন অন্তর্বর্তী সরকারের কংগ্রেসী সদস্যগণ বিহারের ব্যাপারে যে উগ্রত্বর পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা একদেশদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া লোক সন্দেহ করিতেও পারে। বাঙলায় এমন মতও কেহ কেহ পোষণ করেন যে, বড়লাটের শাসন পরিষদের কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্যগণ যদি অধিক দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেন, তবে লর্ড ওয়াভেল বাঙলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইতেন। এমত যে বিহারের প্রধান সচিব শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহও প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, যদি লর্ড ওয়াভেল কলিকাতায় মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের" ঘটনার অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় যাইয়া আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, তবে—সম্ভবত—নোয়াখালীর দুর্ঘটনা ঘটিতে পারিত না এবং বিহারে নোয়াখালীর দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া নিবারণ করা সম্ভব হইত।

কংগ্রেসের নিকট বাঙলার হিন্দুরা কিরূপ সক্রিয় সাহায্য লাভ করিবার আশা করিতে পারেন, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালনী যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার পরেও—এমন কি গান্ধীজী যে অভিজ্ঞতা, দীর্ঘকাল পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অতিবাহিত করিয়া, লাভ করিয়াছেন, তাহার পরেও যদি কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃগণ বাঙলা সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত নীতি অবলম্বন প্রয়োজন মনে না করেন, তবে বাঙলার হিন্দুকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কংগ্রেস-নিরপেক্ষ হইয়া করিতে হইবে।

পূর্ববঙ্গে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়া পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র প্রদেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা "নিদানের বিধান" ব্যতীত আর কিছুই মনে করা যাইতে পারে না।

সেই জন্যই আমরা মনে করি, বাঙলার প্রতিনিধিগণকে—পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের জাতীয়তাবাদীদিগের প্রতিনিধিকে এ বিষয়ে সমবেতভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিবার জন্য সর্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বিনা আন্দোলনে অর্থাৎ বিনা সংগ্রামে সহজসাধ্য উপায়ে ঈপ্সিতলাভের আশা যে দুরাশা তাহা বুঝিতে না পারিলে অমঙ্গলই অনিবার্য হয়।

বিশেষ আপনদিগের মধ্যে মতবিরোধে উৎসাহ ব্যয় ও শক্তি ক্ষয় করা কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না।



ব্যবসা বাণিজ্য

কৃষকের ঋণ

দীনবন্ধু দাস

ভারতের কৃষক সম্প্রদায় ঋণভারে জর্জরিত। সিন্ধবাদের গল্পের বৃদ্ধের মত এই ঋণের বোঝা তাহার ঘাড়ে চাপিয়া আছে, কিছুতেই নামিতে চায় না। কৃষকের সাংবাৎসরিক উপার্জনের একাংশ তাই বছর বছর মহাজনের ঘরে সুদের আকারে চলিয়া যায়। মহাজনেরা পাইলেই খুশী। মহাজনশ্রেণীর বিলাস ঐশ্বর্য এই সুদের টাকা হইতেই গড়িয়া উঠে। ১৯৩০ সালের অর্থসংকটের পর কৃষকের ঋণ-সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। কৃষি পণ্যের মূল্য হ্রাসের ফলে কৃষকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। মহাজনের পক্ষে সুদ অথবা আসল, কোন টাকা আদায় করাই একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রদেশে প্রদেশে কৃষকের ঋণ-সমস্যা সমাধানের জন্য নানাপ্রকার আইন-কানুন প্রণয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু আসল কথা হইল এই যে, কৃষকের আয় না বাড়িলে এবং তাহাকে অত্যধিক হারে খাজনা দিতে হইলে তাহার পক্ষে মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব।

১৯৩১ সালের ব্যাঙ্কিং বিষয়ক কেন্দ্রীয় অনুসন্ধানকারী সমিতির হিসাব অনুসারে ভারতের কৃষকদের প্রায় ৯০০ কোটি টাকা ঋণ ছিল। কোন্ প্রদেশে কৃষকের ঋণের পরিমাণ কত ছিল, তাহা নীচে দেখান হইল ঃ—

বিহার ও উড়িষ্যা	১৫৫	কোটি টাকা
মাদ্রাজ	১৫০	,, ,,
পাঞ্জাব	১৩৫	,, ,,
যুক্তপ্রদেশ	১২৪	,, ,,
বাঙলা	১০০	,, ,,
বোম্বাই	৮১	,, ,,
ব্রহ্মদেশ	৫০/৬০	,, ,,
মধ্যপ্রদেশ	৩৬	,, ,,
আসাম	২২	,, ,,
কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন এলাকাসমূহ	১৮	,, ,,
কুর্গ	৩৫/৫৫	লক্ষ টাকা

সকল প্রদেশে ঋণ সমস্যা একপ্রকার নহে। সব প্রদেশে কৃষকের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ সমান নহে। কত শতাংশ কৃষক পরিবার ঋণগ্রস্ত ও পরিবারপিছু ঋণের পরিমাণ কত, সে সম্বন্ধে কোন কোন প্রদেশে বা জিলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি গবেষণা করিয়াছেন, তাহার কয়েকটির ফলাফল এখানে দেওয়া হইল ঃ—

প্রদেশের নাম	গবেষণাকারীর নাম	কত শতাংশ কৃষক পরিবার ঋণগ্রস্ত	পরিবার পিছু ঋণের পরিমাণ
১। পাঞ্জাব	ডার্লিং	৮৩%	৪৬৩ টাকা
২। বোম্বাই	১৯০১ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন	৮০%	
২। ”	ডাঃ হ্যারল্ড্ অ্যান্ন		১৩০ ,,
৪। বাঙলা (ফরিদপুর জেলা)	জ্যাক্	৪৫%	১২১ ,,
৫। কোচিন (দক্ষিণ ভারত)	স্ল্যাটার	৭৫%	

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ সরকার ডাঃ বি ভি নারায়ণস্বামী নাইডুকে মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষকদের ঋণ সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণাকার্যে নিযুক্ত করেন। ডাঃ নাইডুর উপর নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল— (১) প্রথমত যুদ্ধের মধ্যে কৃষি পণ্যের মূল্য-[illegible]গণ যে সমবায় সমিতি ও অপরাপর মহাজনের ঋণ শোধ করিতেছে, এই ঋণ শোধের পরিমাণ কত। (২) দ্বিতীয়ত কৃষকের আর কতটা ঋণ অবশিষ্ট রহিয়াছে। ডাঃ নাইডুকে যুদ্ধপূর্ব সময়ের (১৩৩৯ সালের) কৃষিঋণের অবস্থার সঙ্গে ১৯৪৫ সালের অবস্থার তুলনা করিতে বলা হইয়াছিল।

ডাঃ নাইডু মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা হইতে বাছিয়া ১৬০টি গ্রাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। এই সমস্ত গ্রামের আবার একপঞ্চমাংশ, মোট ৮৫৩০টি পরিবার সম্বন্ধে বিস্তারিত হিসাব লওয়া হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে যত পরিবার আছে, তাহাদের হাজারকরা একটিকে লইয়া ডাঃ নাইডু সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংকলন করেন। যেহেতু এই ৮,৫৩০টি পরিবার মাদ্রাজ প্রদেশের সকল এলাকা হইতে বাছাই করিয়া নেওয়া হইয়াছে এবং ছোট বড় সকলপ্রকার কৃষক পরিবারকেই আনুপাতিক হারে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে, সেই হেতু এই গণনার ফলাফল হইতে মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষকের ঋণ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ও সত্য ধারণা পাওয়া যাইবে। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। সুতরাং মাদ্রাজের এই চিত্রকে গোটা ভারতবর্ষের বিশেষ করিয়া দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত বাঙলা দেশের অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। তবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আর্থিক জীবনের মধ্যে অনেক বিষয়ে যথেষ্ট মিলও রহিয়াছে। ভারতের কৃষক জগতের হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে, তাহার একটি আংশিক ও মোটামুটি ধারণা এই গবেষণার ফলাফল হইতে পাওয়া যাইবে।

অলঙ্কার
একমাত্র গিনি স্বর্ণের তথা
রত্নখচিত অলংকার ও রৌপ্যের
বাসনাদি প্রাপ্তির প্রাচীনতম,
জনপ্রিয় ও বিশ্বস্ত
প্রতিষ্ঠান—
Jewellers
M. S. CHOWDHURY & SONS
HEAD OFFICE & WORKSHOP : 152, UPPER CHITPUR ROAD, CALCUTTA
৪।৮ ঃ ৬৩এ, কলেজ ষ্ট্রীট (মার্কেটের সম্মুখে)। ফোন ঃ বি, বি ৪৪৯৫।
১৬১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাটা জংসন, বালীগঞ্জ। ফোন—পি কে ২১৭৫।
কলিকাতা।

যে ৮৫৩০টি পরিবারের ঋণের হিসাব নেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে পাঁচটি ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। কোন শ্রেণীর কতগুলি পরিবারের হিসাব নেওয়া হইয়াছে, তাহা নীচে দেখাইতেছি ঃ—

	পরিবার সংখ্যা	মোট পরিবার সংখ্যার কত শতাংশ
বড় চাষী	২৪০	২·৯%
মাঝারি চাষী	২,০৯৭	২৪·৬%
ছোট চাষী	৩,৭৮৪	৪৪·৩%
রায়ত	১,১৩০	১৩·২%
ভূমিহীন কৃষিমজুর	১,২৭৯	১৫·০%

বড় চাষী, মাঝারি চাষী, ছোট চাষী, রায়ত এবং ভূমিহীন কৃষিমজুর এই পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে ছোট চাষী পরিবারের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী, মোট সংখ্যার অর্ধেকের কিছু কম। বড় চাষী পরিবারের সংখ্যা খুব অল্প। মাঝারি চাষীর সংখ্যা মোট সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। রায়তের সংখ্যা মোট সংখ্যার প্রায় এক-সপ্তমাংশ আর ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা এক-ষষ্ঠাংশের মত। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাঙলাদেশে ভূমিহীন কৃষকের আনুপাতিক সংখ্যা অনেক বেশী।

হিসাবে প্রকাশ, ১৯৪৫ সালে মাদ্রাজ প্রদেশের ১৬০টি গ্রামের ৮,৫৩০টি পরিবারের একত্রে ২১·৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ ছিল, ১৯৩৯ সালে তাহাদের ঋণের পরিমাণ ছিল ২৭·১৯ লক্ষ টাকা। যেহেতু প্রতি হাজারে একটি পরিবার এই হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে, সেই-হেতু এই অঙ্কগুলিকে ১০০০ হাজার দিয়া গুণ করিলেই সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষকের ঋণের পরিমাণ জানা যাইবে। এই হিসাবে মাদ্রাজ প্রদেশে ১৩৩৯ ও ১৯৪৫ সালে কৃষকের ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে ২৭২ কোটি ও ২১৮ কোটি টাকা ছিল। পরিবার পিছু কৃষকের ঋণের পরিমাণ ১৯৩৯ সালে ছিল ৩১৮·৮ টাকা, ১৯৪৫ সালে কমিয়া ২৫৫·৫ টাকা হয়। মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ১৯৩৯ সালে ছিল ৫১·০ টাকা, ১৯৪৫ সালে হয় ৪০·৮ টাকা। দেখা যাইতেছে যে যুদ্ধের মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশে কৃষকের ঋণ প্রায় ২০% কমিয়াছে।

অনুসন্ধানের ফলে আরেকটি বিষয় জানা গিয়াছে। ১৯৪৩ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের মধ্যে কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু সম্পন্ন কৃষকদের মধ্যে অনেকে বেশী দাম দিয়া জমি খরিদ করিয়াছে। অনেকে আবার জমির উৎকর্ষের জন্য জমিতে যথেষ্ট টাকা ঢালিয়াছে এবং এই কারণে তাহারা নূতন ঋণ গ্রহণও করিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই প্রকার ঋণের পরিমাণ প্রায় ২৭ কোটি টাকা। এই টাকাটা বাদ দিলে ১৯৪৫ সালে কৃষকের ঋণের পরিমাণ মাত্র ১৯১ টাকা বলিয়া ধরা যাইতে পারে, ১৯৩৯ সালে যে স্থলে ছিল ২৭৯ কোটি টাকা। তদুপরি মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকের নিকট ঋণের টাকা অনেকটা হালকা হইয়া গিয়াছে। পূর্বে ৩ মণ ধান বিক্রী করিলে তাহার যে টাকা আসিত, এখন ১ মণ ধান বিক্রী করিলেই সে সেই টাকা শোধ দিতে পারিবে। অবশ্য পরবর্তীকালে যদি আবার কৃষি পণ্যের মূল্য হ্রাস পায় তবে কৃষকের নিকট ঋণের বোঝা সেই অনুপাতে ভারী হইয়া পড়িবে। যুদ্ধের মধ্যেকার নূতন গৃহীত ২৭ কোটি টাকার ঋণ শোধ করিতে তখন এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ফসল বিক্রী করিতে হইবে।

উপরের হিসাবের মধ্যে ছোট বড় সকল প্রকার কৃষকের ঋণ একসঙ্গে করিয়া দেখানো হইয়াছে। কিন্তু সকল শ্রেণীর কৃষকের ঋণ যুদ্ধের মধ্যে সমান পরিমাণে কমে নাই। বেশি জমি-ওয়ালা বড় কৃষকেরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হইয়াছে, পক্ষান্তরে ভূমিহীন কৃষক ও রায়তের অবস্থার উন্নতি ত হয়ই নাই, কোন কোন স্থলে অবনতি হইয়াছে। ১৯৩৯ ও ১৯৪৫ সালে কোন্ শ্রেণীর কৃষকের ঋণ মোট ঋণের কত শতাংশ ছিল, তাহা নীচে দেখান হইল ঃ—

	১৯৩৯	১৯৪৫
বড় কৃষক	১৫·৪	১০·৮
মাঝারি কৃষক	৪৩·৫	৪১·০
ছোট কৃষক	৩৫·৩	৩৮·৭
রায়ত	৫·৪	৭·০
ভূমিহীন কৃষক	১·৪	২·৫
	১০১·০	১০০·০

কৃষকের ঋণের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা নির্ভরযোগ্য চিত্র পাওয়া গেল। এবারে কৃষকের সাংবাৎসরিক আয়ের সঙ্গে তাহার ঋণের পরিমাণ তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের তুলনায় মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ২৮ শতাংশ। কিন্তু জমিবিশিষ্ট কৃষক শ্রেণীগুলির আয়ের তুলনায় ঋণের পরিমাণ ৩২ শতাংশ; রায়তের ঋণ আয়ের তুলনায় ১৯·৫ শতাংশ, আর ভূমিহীন কৃষকের ঋণ আয়ের ৯ শতাংশ মাত্র। বলা বাহুল্য ক্ষুদ্র রায়তের কৃষিমজুরের পক্ষে ঋণ পাওয়া শক্ত। যেসব কৃষক জমির মালিক এবং যাহারা জমি অথবা গহনাপত্র বন্ধক দিতে পারে, তাহাদের পক্ষেই ঋণ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ।

ডাঃ নাইডুর রিপোর্টে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশের গ্রামে মজুরী বৃদ্ধির হার পণ্যমূল্য বৃদ্ধির হারের সমান। ১৯৩৯ সালের তুলনায় সর্বত্রই মজুরীর হার বাড়িয়া অন্তত দ্বিগুণ হইয়াছে। কোন কোন জেলায় ৩ গুণ হইয়াছে, আড়াই গুণের কম খুব কম জায়গায় দেখা যায়। চাষের খরচ কোথাও দ্বিগুণের বেশী বাড়ে নাই।

যুদ্ধের মধ্যে জমির ফসলের দাম বাড়ার ফলে অনেকে বলাবলি করিতেছিলেন যে, কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে। উপরে কৃষকের ঋণ সম্বন্ধে যাহা দেখা গেল তাহাতে মনে হয়, যথেষ্ট জমি আছে, এমন সব সম্পন্ন গৃহস্থ কৃষকের সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে, কিন্তু অল্প জমিবিশিষ্ট কৃষক ক্ষুদ্র রায়ত বা জমিহীন কৃষকের, অর্থাৎ মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষক সম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশের আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। বরং ভূমিহীন কৃষি-মজুর ও ক্ষুদ্র রায়তের অবস্থা খারাপই হইয়াছে। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ঋণের পরিমাণ দিয়া আর্থিক সমৃদ্ধির পরিমাণ করা যাইতে পারে না। দৈনন্দিন জীবনের অভাব অভিযোগ যাহাদের বাড়িয়া গিয়াছে, যাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ঋণের প্রয়োজন থাকিলেও তাহাদিগকে ঋণ দিবে কে? কাজেই তাহাদের ঋণ না বাড়িলেও অভাব অনটন বাড়িয়া গিয়া থাকিতে পারে। অভাব অনটন যে বাড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং যুদ্ধের মধ্যে সাধারণ কৃষকের আর্থিক উন্নতি হইয়াছে, এই ভুল ধারণা সকলেরই সযত্নে পরিহার করা প্রয়োজন।



পুস্তক পরিচয়

অগ্নি সংস্কার—প্রধূমিত বহ্নি—শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত; প্রকাশক—সমবায় পাবলিশার্স, ৩৩।২ শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রাপ্তি-স্থান—বুক ফেয়ার, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা; পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৮৮; মূল্য—৩৲ টাকা।

সুবৃহৎ উপন্যাস "অগ্নিসংস্কার"-এর প্রথম পর্ব "প্রধূমিত বহ্নি" নামক প্রায় চারশত পৃষ্ঠার গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিলাম। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব "ভস্মাবশেষ" পরে প্রকাশিত হইবে; পরে প্রকাশিত হইলেও প্রথম পর্ব পাঠে কোন অসুবিধা হয় না, কারণে ইহাতে কাহিনীর স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে। তবে সমগ্র কাহিনীটি পরিণতি লাভ করিয়াছে দ্বিতীয় পর্বে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

১৯৩২ সালের আগস্ট বিপ্লবের পটভূমিকা আশ্রয় করিয়া কাহিনীটী গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজনীতির অবতারণা থাকিলেও, রাজনীতিই এই কাহিনীর প্রধান উপজীব্য বা মূল কথা নয়। রাজনীতিগত মতভেদ, ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈপরীত্য, প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—ইত্যাদির ফলে গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রগুলি ও ঘটনা প্রবাহের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য কাহিনীটি ঘোরালো, উপভোগ্য ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৪২ সালের আগস্ট-বিপ্লব ও তাহার পরবর্তী ঘটনার পরিবেশ-বর্ণনা প্রসঙ্গে যতটুকু রাজনীতির আশ্রয় লইতে হয় এবং যে যে রাজনীতিক দলের প্রতিকূল অথবা অনুকূল কার্যকলাপের উল্লেখ অপরিহার্য হইয়া পড়ে, গ্রন্থকার সুকৌশলে তাহাই করিয়াছেন। এই জন্যই গ্রন্থখানি রাজনীতি-সর্বস্ব না হইয়া ঘটনা প্রবাহের বিচিত্র গতিতে, চরিত্র-সৃষ্টির নিপুণতায় কাহিনীর সমগ্রতায় ও রসভূয়িষ্ঠতায় সুখপাঠ্য রচনা হইয়া উঠিয়াছে।

হুগলী জেলার কারখানা অঞ্চলের শ্রমিক জীবনের নিখুঁত হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়া গ্রন্থখানি আরম্ভ করা হইয়াছে। কারখানার মজদুর ইউনিয়নের কার্য পরিচালনার সূত্রে সুবোধ, অরুণাংশু, সুভদ্রা, শ্যামাচরণ, বিমলের চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। কারখানার নার্স সুভদ্রা প্রেমের চুম্বক-শলাকার মত আকর্ষণ করিয়াছে সমাজতন্ত্রী সুবোধ আর কম্যুনিস্ট অরুণাংশুকে। একই নারীকে আশ্রয় করিয়া দুইটি যুবকের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা একই কারখানার মজদুর-ইউনিয়নের মধ্যে দুইটি রাজনীতিক মতবাদের সংঘর্ষের উপরে উঠিয়া সমগ্র কাহিনীকে রসোত্তীর্ণ ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। উল্লিখিত কয়েকটি প্রধান চরিত্র ভিন্ন আরও বহু চরিত্রের অবতারণা উপন্যাসখানিতে এমন সুকৌশলে করা হইয়াছে যে, কোথাও অনাবশ্যক চরিত্রের ক্লান্তিকর ভিড় সৃষ্টি করা হয় নাই। অথচ প্রত্যেকটি চরিত্রই সজীব,—সমাজ-জীবনে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহারা যেন আমাদের পরিচিত। লেখকের ভাষা সরল, সাবলীল, বর্ণনা ভঙ্গী প্রশংসনীয়। উপন্যাসখানির এই প্রথম পর্ব পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিবে এবং আগ্রহের সৃষ্টি করিবে।

দৃষ্টিপাত—যাযাবর প্রণীত; প্রকাশ নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ ২২নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯১; মূল্য—৩৲ টাকা।

"বেঙ্গল লেটার্স"-এর ভঙ্গীতে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। এই ধরণের গ্রন্থ রচনা বাঙলা সাহিত্যে ... নামে আত্মগোপন করিলেও আমরা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পরিচিত পথচারীর কণ্ঠই যেন শুনিতে পাইতেছি।

এই গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদ পত্রান্তরে প্রকাশিত হওয়ার সময় রসজ্ঞ পাঠক সমাজের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় রসের সমগ্রতায় তাঁহাদের অধিকতর আনন্দ লাভের সুযোগ ঘটিল।

কোন বিলাতী পত্রিকার ভারতবর্ষস্থ এক বাঙালী সংবাদদাতার জবানীতে গ্রন্থখানি লিখিত। গ্রন্থে লেখককে সাংবাদিকরূপে যতটা না বুঝিতে পারা যায়, সাহিত্যিকরূপে তাঁহাকে বুঝিতে পারা যায় তাহা অপেক্ষা বহু গুণে অধিকতর রূপে। নয়াদিল্লীকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক্রীপস-মিশন হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বিষয়বস্তু অবলম্বনে এমনই অনবদ্য চাতুর্যের সহিত পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে যে, পাঠককে একখানা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যাইতে হয়। 'যাযাবর' দৃষ্টিপাত করেন নাই নয়াদিল্লীর এমন স্থান ও সমাজ নাই। [illegible] দরিদ্র কেরাণীকুল হইতে স্যুট-বুট-সজ্জিত ধনগর্বিত ও শিক্ষা সভ্যতা-দৃপ্ত অভিজাতগোষ্ঠী পর্যন্ত সর্বত্র তাঁহার অবাধ গতি। নানা চরিত্রের নানা 'টাইপে'র রসোত্তীর্ণ বর্ণনা কশাঘাতের মত তীক্ষ্ণ, অথচ মধুর শ্লেষে একান্তই উপভোগ্য। ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ চিত্র—ইহাতে বর্ণিত হয় নাই, এমন অল্প বিষয়ই আছে। অথচ চরিত্র, স্থান, বিষয় পৃথক পৃথক হইলেও সমগ্র রচনা জুড়িয়া যে রসের সমগ্রতা তাহা একান্ত হৃদয়গ্রাহী। রচনাটির মধ্যে আগাগোড়া মার্জিত উন্নত রুচির শ্লেষ, কৌতুক থাকিলেও শেষ দিকে বর্ণিত চারুদত্তের জীবনের ট্র্যাজেডি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এবং এইভাবে রচনাটি 'সিরিও কমিক' পরিণতির দিকে মোড় ঘুরিয়া পাঠকের মনে গভীরতর দাগ রাখিয়া যায়। সস্তা ভাঁড়ামি যেখানে অধিকতর বাহবা পায়, সেখানে নিপুণ হস্তের এরূপ একখানি রসোজ্জ্বল গ্রন্থ পরিমিত সংখ্যক রসজ্ঞ পাঠকের বাহিরেও সমাদর লাভ করিবে কি না জানি না। তৎসত্ত্বেও বলিতে হয় "দৃষ্টিপাত" অভিনব সার্থক রচনা।

লেখকের লিপিচাতুর্য অনবদ্য, বর্ণনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য প্রশংসনীয়। ভাষা সরল, স্বচ্ছ, অথচ তীক্ষ্ণ। যথেষ্ট ভাষা-সম্পদ, রসবোধ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা না থাকিলে এরূপ রচনা সম্ভব নয়। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ চমৎকার ও সুরুচি-সম্মত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৯ম খণ্ড)—শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান, গীতা প্রচার কার্যালয়, ১০৮।১১, মনোহর পুকুর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

শ্রীযুত অনিলবরণ রায় এক বিরাট পরিকল্পনা লইয়া গীতা-সম্পাদনার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সর্বজন বোধ্য ব্যাখ্যাসহ মহাগ্রন্থ গীতা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানা ৯ম খণ্ড। গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের অংশ বিশেষ এই খণ্ডে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রতিটি শ্লোকের প্রত্যেক শব্দ ধরিয়া এমন বিশদ এবং সহজ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে অতি অল্পই হইয়াছে। আশা করি, অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় আলোচ্য খণ্ডটিও গীতাধ্যায়ী-দের নিকট আদরণীয় হইবে। ৯।৪৭

জয়ন্তী—মাসিক পত্র। সম্পাদক শ্রীকাত্যায়ণী-দাস ভট্টাচার্য। কার্যালয়, ৩৪এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা। প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

জয়ন্তীর আলোচ্য সংখ্যাটি (৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা—মাঘ) সুমুদ্রিত এবং ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীব্রজবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য প্রভৃতির প্রবন্ধাদিতে সমৃদ্ধ। ২৬।৪৭

সাইকেলে পশ্চিম এসিয়ায় ভূপর্যটন—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট, পোঃ গাড়িয়া, ২৪-পরগণা। ১৫২ পৃষ্ঠা, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য আড়াই টাকা।

লেখক ১৯৩৩ সনে ভ্রমণে বাহির হন এবং সুদূর প্রাচ্য ভ্রমণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইয়া মুসলমান দেশগুলি ভ্রমণ করেন। মুসলমান দেশগুলিতে ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ইরাণ, ইরাক, সিরিয়া, লেবানান, প্যালেস্টাইন এবং তুরস্ক এই দেশগুলি সাইকেলে পর্যটন করেন। যে যে দেশে গিয়াছেন, তথাকার রীতি নীতি ও জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নাই; এজন্য তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ২৫।৪৭

বিদ্রূপ ও বহ্নি—শ্রীরঘুনাথ ঘোষ প্রণীত। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা। ৬৪ পৃষ্ঠা।

বিদ্রূপ ও বহ্নি প্রায় অর্ধশত কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। নিখুঁত ছন্দ, মার্জিত ভাব এবং সুন্দর ভাবগম্ভীর শব্দ চয়ন গ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতাকেই সমৃদ্ধি দান করিয়াছে। লেখক নূতন হইলেও দরদী কবি-হৃদয় তাঁহার আছে এবং কবিতার ছন্দ ও ধ্বনি সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। ছাপা ও কাগজ ভাল। কিন্তু দীর্ঘ শুদ্ধিপত্রটি পীড়াদায়ক। ৮।৪৭

হিন্দু-মুসলমান—শ্রীবিভু কীর্তি প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—দীপায়ন প্রকাশনী, ৭, সোয়ালো লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের নিন্দা এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা আছে। এজন্য লেখকের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু এইসব পুস্তিকা বা প্রচারপত্রাদি সাধারণত যথাস্থানে গিয়া পৌঁছায় না। যেখানে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ অনবরত ছড়ান হয় এবং বিংশ শতাব্দীর এক ঘৃণ্যতম সংগ্রামের হুমকী দেওয়া হয়, সেসব জায়গায় এ সকল কথা প্রচারের ঝুঁকি লইতে পারিলে, তবেই এসব বই লেখার সার্থকতা। ৩২।৪৭

চীন-বিপ্লব—লিয়ঁ ট্রটস্কি। গুপ্ত রহমান এ্যাণ্ড গুপ্ত, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

চীনের বিপ্লবের উপর লিয়ঁ ট্রটস্কির রচনার বঙ্গানুবাদ। বিষয়বস্তু, ছাপা, কাগজ সব দিক দিয়াই পুস্তিকাটি আকর্ষণীয় হইয়াছে। ৩৫।৪৭

বিষম—শ্রীতড়িৎকুমার সরকার প্রণীত। পুস্কর প্রকাশিকা, ৭৫জি, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

এই ৮০ পৃষ্ঠার কবিতা গ্রন্থখানার অধিকাংশ রচনাই দুঃখবাদপূর্ণ। দেশের দুরবস্থা এবং নানারূপ দুঃখযন্ত্রণাই লেখককে নৈরাশ্যবাদী করিয়া তুলিয়াছে। তবে বিষয়বস্তু যাহাই হউক, আবেগ, প্রসাদগুণ ও সরল স্বচ্ছতা হইতে কবিতাগুলি বঞ্চিত নয়। ১৪।৪৭

কোরআনের শিক্ষা—হিংসা ও অহিংসা—মওলানা আহমদ আলী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ওরিয়েন্টাল এজেন্সী, ২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ পয়সা।

বইটি ক্ষুদ্র হইলেও অতীব মূল্যবান। ইসলাম যে ধৈর্য ও অহিংস নীতির দ্বারা অধৈর্য ও হিংসাকে প্রতিরোধ করিতে শিক্ষা দেয় গ্রন্থকার তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, নরহত্যাকে ইসলাম কিরূপ জঘন্যতম পাতকের কাজ মনে করে, লেখক তাহাও কোরআনের উক্তি হইতে দেখাইয়াছেন। যে সকল মুসলমান বলেন যে, ইসলাম অহিংস নীতি সমর্থন করে না, বরং প্রতিশোধ গ্রহণের শিক্ষা দেয়, তাঁহারা এই পুস্তিকা পাঠে শাস্ত্র সম্বন্ধে নিজেদের অজ্ঞতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা পুস্তিকাখানার বহুল প্রচার কামনা করি। ১০।৪৭

চয়নিকা—মাসিক পত্র। অফিস, ৪২ সাঁতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা। বড়দিনের সংখ্যা, দাম চারি আনা। অনেকগুলি গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। ২৭।৪৭

মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে নেতাজী—অনুবাদক—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগঠয়িতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিদেশ হইতে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে যে স্মরণীয় বক্তৃতা প্রচার করেন, আলোচ্য পুস্তিকায় তাহারই বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। বক্তৃতাটি গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধায় এবং পরাধীনতার বন্ধন মুক্তির জ্বলন্ত কামনায় দীপ্যমান। ১৬।৪৭

নেতাজীর আহ্বান—শ্রীজ্যোতিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান। হিন্দুস্থান বুক ডিপো, ১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ছোটদের একাঙ্ক নাটিকা। বালক-বালিকাদের মনে দেশাত্মবোধ উদ্বোধনের সহায়ক একটি ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে নাটিকাটি রচিত। ২।৪৭

মৌচাক—মহাত্মা গান্ধী সংখ্যা। অফিস, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

আলোচ্য সংখ্যায় গান্ধীজীর সম্বন্ধে নামকরা শিশুসাহিত্যিকগণের অনেক রচনা স্থান পাইয়াছে। গান্ধীজীর শৈশবের ও অন্যান্য সময়ের অনেক ছবিতে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

বন্দীবীর—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—উষা পাবলিশিং হাউস, ৩৪ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা। ৩২ পৃষ্ঠা। মূল্য বার আনা।

বন্দীবীর কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। কৃষক, মন্বন্তর, নিয়তি নদী, গৌতম বুদ্ধ, বিবেকানন্দ, তাজমহল, অখণ্ড ভারত প্রভৃতি সাধারণ বিষয়ের উপর রচিত কলাকৌশল বর্জিত কবিতা। লক্ষ্যযোগ্য

[illegible]

'জয়ন্তী' গল্প প্রতিযোগিতা

"জয়ন্তী" মাসিক পত্রিকার পক্ষ হইতে এই প্রতিযোগিতা আহবান করা হইতেছে। শ্রেষ্ঠ বিবেচিত ৩টি গল্পের লেখককে ৩টি রৌপ্যপদক উপহার দেওয়া হইবে। স্কুল কলেজের যে কোন ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। গল্প ১৫ই মার্চের মধ্যে নিম্নঠিকানায় পৌঁছাইতে হইবে। গল্প ফুলস্কেপ (ই সিট) কাগজের পৃষ্ঠা[illegible]ধিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতিযোগিতার ফলাফল চৈত্র সংখ্যা জয়ন্তীতে প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক—"জয়ন্তী"
৩৪এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা।



কাহিনী নয় খবর
ভবঘুরে

পারাবতের নসিবৎ

সম্প্রতি 'ডিউক অব নরম্যাণ্ডা' লণ্ডনের পার্ক লেনের এক হোটেলের ভোজন গৃহটি এক রাত্রির জন্য বন্দোবস্ত করেছেন বলে জানা গেছে। এই ভোজ-সভা হবে একটা অভূতপূর্ব ঘটনা, তার কারণ এই ভোজ সভায় আমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই মানুষ কিন্তু আমন্ত্রণ-কর্তা বা ভোজপতির (Host) আসন গ্রহণ করবেন একটি যুদ্ধ-বার্তাবাহী পারাবত এবং তারই নাম "ডিউক অব নরম্যাণ্ডী"। এই 'ডিউক' গত মহাযুদ্ধে নিযুক্ত ২৫ হাজার পায়রার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর বলে বিবেচিত হয়েছে এবং মাত্র কয়েকদিন আগে 'ভিক্টোরিয়া ক্রশে' ভূষিত হয়েছে। এই পায়রাটিকে জার্মানী আক্রমণের সময় এক প্যারাসুট বাহিনীর সঙ্গে এক জার্মান ব্যূহের পিছনে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে সেই সর্বপ্রথম আক্রমণ আরম্ভ করার ইঙ্গিতপূর্ণ একটি জরুরী খবর নিয়ে মাত্র ২৭ ঘণ্টায় ফিরে আসে শীত, হাওয়া এবং শত্রুর গোলাগুলি উপেক্ষা করে। শেফাল্ড বুনা বলে যায়গাটির অধিবাসী মিঃ গ্যাসটন নেল্সনই এই পায়রাটির প্রশিক্ষক—তিনিই এই 'ভোজসভার' বন্দোবস্ত করেছেন। তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কাছে বলেছেন—অন্য সকলে 'ভিক্টোরিয়া ক্রশ' পাওয়ার পর যেভাবে ভোজসভার আয়োজন উৎসব করেছে—'ডিউক' পায়রা হলেও ঠিক সেই ভাবেই তা করুক এইটাই আমি চাই। 'ডিউকে'রই দেওয়া ভোজসভা—সেই আমন্ত্রণকর্তা—কাজেই সে ঐ দিন ভোজপতির আসন গ্রহণ করবে। একেই কি বলা যায় না "পারাবতের নসিবৎ ?"

বিমানে শিশুর জন্ম

সম্প্রতি প্যান আমেরিকান বিমান-পথগামী একটি বিমান যখন বাহামা দ্বীপের ৭ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল—তখন সেই বিমানখানির এক যাত্রী, পুয়েতো রিকার অধিবাসিনী মিসেস রিটা ভেগা হঠাৎ যন্ত্রণায় অধীর হন এবং বিমানের পরিচারিকা মিস আইলিন হেবোরকে তাঁর প্রসব বেদনার কথা জানান। আইলিন বিমানের পরিচালককে সেকথা জানান। বিমান পরিচালক তখনই তাঁর সহকারীর হাতে বিমান চালনার ভার দিয়ে স্যান-জুয়ানের বিমান ঘাঁটিতে বেতারবার্তায় খবরটি পাঠিয়ে হাসপাতালের ও এ্যাম্বুল্যান্সের বন্দোবস্ত ঠিক রাখতে অনুরোধ জানান। কিন্তু স্যান্ জুয়ান বিমান ঘাঁটিতে এই বিমানটি পেঁছুবার আগেই মিসেস রিটা ভেগা উড়ন্ত বিমানেই একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। বিমানের পরিচারিকা ধাত্রীর কাজ ও বিমান চালক ডাক্তারের কাজ করেন। এরপর স্যান্ জুয়ান বিমান ঘাঁটিতে বিমানটি নামলে পর—মিসেস ভেগা ও তাঁর নবজাতক পুত্রটিকে ইউ এস ন্যাভাল হসপিটালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শিশু ও প্রসূতি ভালই আছেন। বিমান পরিচালক এই প্রসঙ্গে পরিহাস করে বলেছেন—"আমার উচিত ছিল নূতন আরোহীটির জন্য একটি টিকিট দাবী করা—তা আমি করিনি নবজাতক যাত্রীটিকে বিনা টিকিটেই বয়ে নিয়ে এসেছি।"

শতায়ুদের স্মরণীয় জন্মোৎসব

বিদেশের খবরে জানা গেছে যে, গত ১৪ই জানুয়ারী ইংলণ্ডের এমন তিনটি বৃদ্ধার জন্মোৎসব পালিত হয়েছে—যাঁদের প্রত্যেকেরই বয়স একশো বছরের বেশী। তাঁদের মধ্যে নিউকোয়ের মিসেস মেরী আনের বয়স ১০১ বছর: জন্মদিনের মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি শ্বাসনালী প্রদাহ রোগে আক্রান্ত হন, তাই তাঁর জন্মদিনের প্রীতি-উৎসব বন্ধ রাখতে হয়। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন মিসেস উইলোবাই এলিজাবেথ—ঐ দিন এঁরও ১০২ বছরের জন্মদিন অনুষ্ঠিত হয়—মার্লবোরো আরোগ্য-নিকেতনে। এর জন্মদিনের উৎসবে ১০২টি মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিল এবং তিনি ফুঁ দিয়ে ... একটি বাতি নিভিয়ে দেন এবং তারপর গান করেন—'উইলি উই হ্যাড্ মিসড ইউ'। সবশেষে তাঁর জন্মোৎসবে আমন্ত্রিত অতিথিরা গান ধরেন—'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ।' মনে রাখবেন তাঁর জন্মোৎসবের আমন্ত্রিত অতিথিরা সকলেই ছিলেন অশীতিপর। এ দুজন ছাড়া যাঁর বিশেষ জন্মোৎসব স্মরণীয় হয়েছিল তিনি হচ্ছেন মিসেস্ সারা অলিভ্ পিট বলে একটি মহিলা। ইনি বৃটেনের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠাদের একজন—১০৮ বছর বয়স হয়েছিল তাঁর। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাঁর জন্মদিনের তারিখ ঐ ১৪ই জানুয়ারী পরলোকগমন করেছেন।



ডিউক অব নরম্যাণ্ডী ও তার মালিক

কাশি ও সর্দ্দিতে
সিরোলিন 'রচি'
SIROLIN
পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়